গল্প-লহরী

বৈশাখ—চৈত্র

১৩৪১

সম্পাদক

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন,
কলিকাতা।

[মূল্য বার্ষিক ৩॥০

গল্প-লহরী

বার্ষিক সূচীপত্র

বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩৪১

(৶৵)

অঞ্জলী

শিল্পী

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪১ | প্রথম সংখ্যা

রক্তজবা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল, বি-এ

প্রকাণ্ড জলা। এ পারে দাঁড়াইলে ও পারটা খুব অস্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু কোমর জলের বেশী গভীরতা কোথাও নাই। খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ছোট একটী কুঁড়ে বাঁধিয়া রেমো বাগ্‌দী তাহার স্ত্রী গরবকে লইয়া সেই জলার পাড়ে আসিয়া বাসা বাঁধিল। জলার মাছ চুরি করা ছিল তাহার ব্যবসায়। গভীর রাত্রে জেলেরা যখন নিদ্রামগ্ন হইত, সেই অবসরে রেমো তাহার ছোট জালখানি লইয়া মাছ চুরি করিতে বাহির হইত। আশঙ্কা উদ্বেলিত অন্তরে গরব কুঁড়ের দুয়ারে আসিয়া বসিত। তাহার কেবলই মনে হইত, ওই বুঝি তাহার স্বামীকে জেলেরা ধরিয়া ফেলিল। আহা, কি ভীষণ প্রহারই না তাহারা করিবে! সেই প্রহারের আঘাত সে যেন নিজের দেহে অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিত। যতক্ষণ না রেমো ফিরিত, ততক্ষণ দূর জলার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে অস্থির-চিত্তে বসিয়া থাকিত। রেমো ফিরিয়া আসিলে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। মাছ পাইয়াছে, না শূন্য হাতে ফিরিয়াছে, এ কথা সে একবার জিজ্ঞাসাও করিত না। কুঁড়ের কোণে গিয়া জাল জড় করিয়া রাখিয়া রেমো যখন হাতের উপর মাথা দিয়া চাটাইয়ের উপর শয়ন করিত, গরব তাহার পাশে বসিয়া নিঃশব্দে তাহার দেহে হাত বুলাইয়া দিত। রেমো হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কি রে মার খেয়েছি কি না দেখছিস্?" গরব বলিল, "না রে না, বড় ছেরম হয়েছে তোর, তাই।" রেমো বলিত, "আজ মারে নি রে।" গরবের বুকের মধ্য হইতে গুরুভার নামিয়া যাইত। এক-একদিন রেমো গরবের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিত, "আজ ভারি মার মেরেছে রে গরব! পিঠটা একেবারে দাগড়া দাগড়া করে' দিয়েছে রে!" "আহা" বলিয়া গরব তাহার কম্পিত হাতখানি ক্ষতস্থানের উপর বুলাইয়া দিত, তাহার বুকের ভিতরটা ভীষণভাবে মোচড় দিয়া উঠিত। তাহার মনে হইত, কেন এমন করিয়া মারে, তাহাদের অতবড় জলাতে কত মাছই ত আছে,—দুটো মাছ না হয়

ধরিয়াছেই। তাহাদের শরীরে কি এতটুকু দয়ামায়া নাই! একটু থামিয়া রেমো আবার বলিত, "গরব রে, শুধু মেরে ছেড়ে দিলে না রে,—মাছগুলো সব কেড়ে নিলে! কাল কি খাব বল দিকি?" "তাই ত" বলিয়া গরব চুপ করিয়া থাকিত। ঘরে এক মুঠা চাল নাই, সে আর কি বলিবে। এমনই ভাবে তাহাদের দিন চলিত। এ চলার ভিতর এতটুকু অভিনবত্ব ছিল না,—সেই একঘেয়ে একটানা জীবন!

রাত থাকিতে থাকিতে রেমো মাছগুলো একখানা গামছায় বাঁধিয়া কুঁড়ে হইতে বাহির হইত। গরব বলিত, "খুব সাবধানে যাস্ রে।" ভয়, পাছে জেলেদের সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে সে ধরা পড়িয়া যায়। সোজা পথে তাহার যাইবার উপায় ছিল না। জলা হইতে গ্রাম প্রায় দুই ক্রোশ পথ। কিন্তু ঘোরা পথে যাইতে হইত বলিয়া তাহার আরও এক ক্রোশ বেশী হাঁটিতে হইত। গ্রামে গিয়া যখন সে পৌঁছিত, তখনও সূর্য্যদেবকে পূর্ব্ব গগনে দেখা যাইত না। একটা গাছতলায় সে বসিয়া থাকিত। তারপর যেমন সূর্য্যদেব আকাশ-পটে উদিত হইতেন, সেও পথে বাহির হইয়া পড়িত। বাজারে গিয়া মাছ বিক্রয় করিবার উপায়ও তাহার ছিল না, জেলেরা ধরিয়া ফেলিলে আর কি রক্ষা রাখিবে! পথে পথে ফেরি করিয়াই তাহাকে মাছগুলো বিক্রয় করিতে হইত। প্রথমেই ব্রাহ্মণপাড়া পড়িত, সেই পাড়াতেই তাহার সমস্ত মাছ বিক্রয় হইয়া যাইত, তাহার আর অন্য পাড়ায় যাইবার আবশ্যক হইত না।

চাটুয্যে-মহাশয়ের বাড়ী গ্রামের শেষপ্রান্তে। ভোর হইতে-না-হইতেই তিনি বাড়ীর সম্মুখে 'ওঁৎ' পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে এড়াইয়া যাইবার উপায় রেমোর ছিল না।

দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া চাটুয্যে-মশায় হাঁক দিতেন, "আজ কি মাছ আন্‌লি রে রেমো?"

রেমো ইতস্ততঃ করিয়া বলিত, "চুণোচানা আর কি কর্ত্তা।"

চাটুয্যে-মশায় বলিতেন, "দেখি, দেখি, খোল গামছা —যে ময়লা গামছা তোর, ছুঁতে ঘেন্না করে।"

রেমো কিন্তু গামছা খুলিত না; বলিত, "অত কম দামে মাছ বেচ্‌তে পারব না কর্ত্তা।"

চাটুয্যে ধমক দিয়া বলিতেন, "ভারি লম্বা কথা হয়েছে যে তোর? মাছ আর এ গ্রামে পাওয়া যায় না, না? খোল বেটা তোর গামছা।"

"খুলছি কর্ত্তা, দাম কিন্তু বেশী দিতে হবে।" ইচ্ছায় অনিচ্ছায় রেমো গামছা খুলিতে বসিত।

চাটুয্যে-মহাশয়ের আর দেরী সহিত না। গিঁট খুলিবামাত্র তিনি গামছাখানির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। ভাল মাছগুলি সব বাছিয়া লইয়া একস্থানে জড় করিয়া বলিতেন, "এই ত তোর মাছ,—কি দাম নিবি বল?"

মাছগুলোর দিকে চাহিয়া রেমো বলিত, "সেরা মাছগুলো ত আপনি বেছে নিয়েছ কর্ত্তা, এর দাম কিন্তু আটগণ্ডা পয়সা দিতে হবে।"

চাটুয্যে মশায় চোখ পাকাইয়া বলিতেন, "কি বল্‌লি, তোর এতটুকু ধর্ম্মজ্ঞান নেই, ব্রাহ্মণকে ঠকাতে চাস্।"

রেমো বলিত, "এতে ঠকাঠকির কথা কি হ'ল কর্ত্তা – আপনার পোষায় নেবে, না পোষায় মাছ ফেরত দাও।"

চাটুয্যে মশায় ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিতেন, "এতবড় কথা তুই আমায় বলিস্,—মাছ ফেরত নিবি,—কেন, আমি কি দাম দিই না? নে বেটা, নে তোর দাম নিয়ে যা'।" এই বলিয়া একটা দুয়ানি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিতেন।

রেমো বলিত, "ও আপনি রেখে দাও কর্ত্তা,—আট গণ্ডার কমে আমি মাছ বেচব না,—বাজারে গেলে ও মাছ একটাকায় কিন্‌তে হ'ত।"

চাটুয্যে-মহাশয় তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন। সত্যই ওই মাছগুলা একটাকার কমে পাওয়া যায় না। তাহা হইলে কি হয়। তিনি আর একটা আনি ফেলিয়া দিয়া বলিতেন, "আর কথা বলিস্ নি।"

রেমো বিরক্ত হইয়া বলিত, "ওতে হবে না কর্ত্তা। বেলা বেড়ে যাচ্ছে, না-নাও, ফিরিয়ে দাও।"

এমনই ভাবে দর কষাকষির পর শেষে মোটমাট ছয় আনাতে রফা হইত।

গৃহিণী এবং আর পাঁচজনের সম্মুখে মাছগুলা ফেলিয়া দিয়া চাটুয্যে-মহাশয় গর্ব্বভরে বলিতেন, "এ গ্রামে কে এমন আছে আমার মত সস্তায় কিন্‌তে পারে। ছ' আনার মাছ দেখেছ?" এই বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাঁসিয়া উঠিতেন। হাসি থামিলে বলেন, "ও বেটা মাছ চুরি করে; না হ'লে কোত্থেকে এত সস্তায় দেবে। তা' আমি বুঝি, তবে দর কর্‌তে জানা চাই। সবাই কি আর এ দরে কিন্‌তে পারে। হা হা হা!"

যেদিন চাটুর্য্যে-মহাশয় কোন কারণে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারিতেন, সেদিন চাটুর্য্যে-গৃহিণী রেমোকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া লইয়া গিয়া মাছ কিনিতেন। দরদস্তর করিতে তিনিও বড় কম যাইতেন না। চাটুর্য্যে-মহাশয় ধমক-ধামক দিয়া জোর জরবদস্তি করিয়া পৈতা বাহির করিয়া শাপমন্নির ভয় দেখাইয়া কাজ হাসিল করিতেন; গৃহিণী "বাবা বাছা" বলিয়া, "না হয় বামুনের মেয়েকে দুটো মাছ খেতে দিলি, তোর কত পুণ্য হবে রে" এমনই ধরণের কথা বলিয়া আধাকড়িতে মাছ সংগ্রহ করিতেন। রেমো জানিত, ইহার বেশী দর সে পাইবে না। যাহার কাছেই সে বেচুক না কেন, চোরাই মাল জানিয়া সকলেই যে দাঁও মারিতে চায়!

বৎসর দুই পরের কথা। রেমোর একটী ছেলে হইয়াছে। ছয়মাসের ছেলে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট। গরব আজ সেই ছেলের গরবে গরবিনী। ছেলেকে যে কোথায় রাখিবে, কি করিবে তাহা সে ভাবিয়া পায় না। রাতদিন ছেলেটীকে সে বুকে করিয়া রাখে। একদণ্ড কোল ছাড়া করিতে তাহার সাহস হয় না। এমন কি রেমোর কোলেও সে দিতে চায় না; বলে, "না না, তুই নিতে পারবি নি; ফেলে দিলে কি হবে বল দিকি? আরে, অমন করে' কি খোকাকে নেয়। ওর গায় ব্যথা লাগবে না? দে দে, আমার কাছে দে।" এই বলিয়া খোকাকে একবার রেমোর কোলে দিয়া, তখনই তাহার কোল হইতে নিজের কোলে তুলিয়া লয়, বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আদর করে। খোকার কচি মুখখানি চুমায় চুমায় ভরাইয়া দেয়। আগে মাছ বেচিয়া রেমো কি পাইত না পাইত গরব তাহার কোন খোঁজই রাখিত না। কিন্তু খোকাকে কোলে পাইবার পর পয়সা লইয়া সে রেমোর সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। "এত কম পয়সা হ'লে ত চল্‌বে না। খোকার দুধ চাই, তার পিরান চাই। মাছ বেশী করে' ধরতে পারিস নি, করিস্ কি?" রেমো শুধু হাসে, কিছু বলে না।

একদিন গরব হঠাৎ রেমোকে বলিল, "তোর মাছ ধরে' কাজ নেই রে।"

অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রেমো বলিল, "মাছ না ধরলে, আমরাই বা খাব কি, খোকাকেই বা কি খাইয়ে বাঁচাবি?"

গরব বলিল, "তুই অন্য কাজ কর, চুরি আর করিস্ না,—খোকার জন্যে ভয় করে যে।"

রেমো বলিল, "ভয় আবার কিসের! খাওয়াতে হবে ত?"

গরব বলিল, "তা' ত হবেই। তুই জোয়ান মরদ, মোট বইলেও তোর পয়সা হবে; আরও বেশী পয়সা হবে—চুরি আর করিস না রে। কত মার খেতে হয় বল দিকি। খোকা বড় হ'লে তোর মত চুরি করতে শিখবে ত; অমনই মারও খাবে—আহা বাছারে, তা' আমি সইতে পারব না!"

রেমো মহাখুসী হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছিল্ রে গরব, ও কথা ত আমার স্মরণে এসে নি। খোকা কি মার খেতে পারে রে, সে মরে' যাবে! তুই খুব হুঁস করিয়ে দিয়েছিস্ রে গরব, মোটই বইব।"

পরদিন হইতে রেমো মোট বহিতে আরম্ভ করিল। প্রথম প্রথম তাহার অসুবিধা হইতে লাগিল, কিন্তু পরে আর কোন অসুবিধাই তাহার রহিল না। বরং মাছ বেচিয়া যাহা সে পাইত, মোট বহিয়া তাহার অপেক্ষা বেশীই পাইতে লাগিল।

গরব একদিন হাসিয়া বলিল, "দেখ্‌লি খোকার পয়ে তোর কত রোজগার হচ্ছে।"

এমনই একটানা সুখের মধ্য দিয়া তাহাদের দিন চলিতে

লাগিল। খোকা এক পা এক পা করিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে —আধ আধ ভাষায় প্রথমে "মাম্মা" তারপর "বাব্বা" বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর আনন্দ দেখে কে! সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া খোকার সেই আধ আধ ডাক শুনিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া একনিমিষে রেমোর সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া যাইত।

একদিন হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্র পড়িল! খোকা রক্ত আমাশায় শয্যাশায়ী হইল। রেমো যত রকমের টোট্‌কা ঔষধের সন্ধান পাইল, একে একে সব কয়টি আনিয়া খোকাকে খাওয়াইল। কিন্তু খোকার পীড়ার কোন উপশম হইল না।

গরব কাতর-কণ্ঠে বলিল, "কি হবে রে, ডাক্তারের ওষুধ আন। খাওয়ালে ঠিক সেরে উঠ্‌বে।"

রেমো সহরে ছুটিল। সেদিন মোট বহিয়া যাহা পাইল, তাহা দিয়া ঔষধ কিনিয়া আনিল। শিশিটা গরবের হাতে দিয়া আগ্রহভরে বলিল, "এই নে রে ওষুধ, আর কোন ভয় নেই। খোকা ভাল হ'য়ে উঠবে।"

গরবের মনেও আশার সঞ্চার হইল; সে ব্যগ্রভাবে ঔষধের শিশিটা মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

ঔষধ খাইয়া খোকার ব্যাধির কিঞ্চিৎ উপশম হইল। রক্তও কমিয়া আসিল। পিতামাতার মনে বড় আশা হইল,—এ যাত্রা খোকা বাঁচিয়া গেল।

কিন্তু আবার একদিন ব্যাধি পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল। রেমো সহরে গিয়া আর এক শিশি ঔষধ লইয়া আসিল, কিন্তু এবার তাহাতে কোন ফল ফলিল না। পিতামাতা প্রমাদ গণিল। আর বুঝি খোকার রক্ষা নাই! তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

এমন সময় চরণ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সে জাতিতে চাঁড়াল। অনেক রকম টোট্‌কা ঔষধ-পত্র সে জানে। কাহারও রোগের সংবাদ পাইলে, সেখানে আসিয়া হাজির হয়। তাহাকে দেখিয়া পিতামাতার অন্তরে আবার আশার সঞ্চার হইল।

রোগী দেখিয়া চরণ বলিল, "কোন ভয় নেই, সেরে যাবে রে! এর চেয়ে ভারি ভারি রোগ আমি সারিয়েছি। দেখ্ রেমো, একটা কাজ তোকে করতে হবে।"

রেমো ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি কাজ বল্, এখনি যাচ্ছি।"

চরণ বলিল, "একটা রক্তজবা আন্‌তে পারিস?—দেখ্, আজই দিনের মধ্যে কেমন রোগ ভাল করে' দি'।"

"রক্তজবা, সেই লালজবা ত? দাঁড়া।" বলিয়া রেমো একটু ভাবিয়া লইল; তারপর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আন্‌তে পারব। চাটুয্যে-মশায়ের বাড়ীতে দেখে এসেছি। লালজবা ফুটে আছে। এক দৌড়ে যাব, আর আসব।"

গরব ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যা ছুটে যা, দেরী করিস্ না যেন। বলিস্, আমাদের খোকার বড় ব্যামো।"

রেমো ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

গরব পথের দিকে চাহিয়া ঠায় বসিয়া রহিল। এত দেরী! রেমো এতক্ষণ কি করিতেছে! কতটাই বা পথ। আমি গেলে কখন ফিরিয়া আসিতাম। ওই, ওই আসিতেছে। চরণের দিকে চাহিয়া আগ্রহভরা-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওই জবা নিয়ে আস্‌ছে। খোকা এইবার ভাল হ'য়ে যাবে?"

চরণ বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "হবে, হবে, তা'তে আর সন্দেহ কি! জবাটা পেলেই হয়।"

রেমো যখন কুঁড়ের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাকে দেখিলে আর যেন চেনা যায় না। কতদিন কঠিন রোগভোগ করিয়া সবেমাত্র যেন সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে।

তাহার শূন্য হাতের দিকে চাহিয়া গরব আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "জবা, জবা, লালজবা, রক্তজবা!"

অশ্রুবিজড়িত-কণ্ঠে রেমো বলিয়া উঠিল, "তানারা দিলে না রে গরব, দিলে না! খোকার ভারি ব্যামো বলে' তানার পায়ের সাম্‌নে আছড়ে পড়লাম! তানারা বল্লে, 'বাগ্‌দী বেটার আস্পর্দ্ধা দেখ্, বামুন-বাড়ী এয়েছে জবা চাইতে!' দিলে না রে গরব, দিলে না, খেদিয়ে দিলে!"

"অ্যাঁ" শুধু এই একটী মাত্র কথা গরবের মুখ দিয়া বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ রোগকাতর শিশুর শয্যাপার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল।

অবগুণ্ঠিতা

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়

চণ্ডীর মত দুঃসাহসিক যুবক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভয় কাহাকে বলে সে জানিত না। যে-সব স্থান অতিক্রম করিতে দিনের বেলা লোকে ভয় পাইত, চণ্ডী গভীর অন্ধকার রাত্রে সেই স্থানে ঘুরিয়া আসিত। বাজি রাখিয়া এমন কতদিন লোকালয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত নির্জ্জন পল্লীর শ্মশান-ভূমিতে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে। কলিকাতায় যেবার গুণ্ডার অত্যাচারে সহরবাসীরা ব্যস্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেবার চণ্ডী কলিকাতায় তাহার মাতুলালয়ে বাস করিতেছিল। জনকতক গুণ্ডাকে সে একাকী এমনই ঠেঙ্গাইয়াছিল যে, সে অঞ্চলে গুণ্ডারা ভয়ে আর পা বাড়াইতে সাহস করে নাই। তাহার সাহস ও দেহের শক্তি দুই-ই অসাধারণ ছিল। শারীর-চর্চ্চা করিত বলিয়া সে যে লেখাপড়ায় অবহেলা করিত, তাহা নহে। কি স্কুলে, কি কলেজে কোন পরীক্ষায় সে ফেল করে নাই। বি-এ পাশ করিয়া সে তাহাদের গ্রামের স্কুলেই শিক্ষকতা করিতেছে। গ্রামে একটী ব্যায়াম-সমিতি স্থাপিত করিয়াছিল; ছাত্রদের নিয়মিতভাবে সেখানে সে ব্যায়াম-শিক্ষা দিত। ছাত্রেরা তাহাকে যেমনই ভয় করিত, তেমনই ভক্তিও করিত।

অমল তাহার বাল্যবন্ধু,—গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ক, খ হইতে আরম্ভ করিয়া বি-এ পর্য্যন্ত তাহারা একসঙ্গে পড়িয়াছে। একসঙ্গে শারীর-চর্চ্চাও করিয়াছে। চণ্ডীর সমতুল্য না হইলেও তাহার দেহের শক্তি এবং মনের বলও বড় কম ছিল না।

পাঠ্যাবস্থা শেষ হইবার মাসছয়েক পরে সংসার-চক্রের আবর্ত্তনে একজন আর একজনের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। চারি বৎসর উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ নাই—তবে তাহাদের মধ্যে নিয়মিত পত্র-বিনিময় হইত। অমল বিবাহিত; চণ্ডী কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল।

অমলের শ্বশুর মৃত্যুকালে তাহার জামাতাকে কিছু নগদ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। সেই টাকা দিয়া অমল তাহার কর্ম্মস্থলে একটী ছোট একতালা বাড়ী ক্রয় করিয়াছে। বাড়ীটি উত্তমরূপে মেরামত করিয়া দিন বার পূর্ব্বে এক শুভদিন দেখিয়া অমল সস্ত্রীক গৃহ-প্রবেশ করিয়াছে—সে সংবাদ পত্রযোগে চণ্ডী পাইয়াছে। সেখানে যাইবার জন্য চণ্ডীরও আহ্বান আসিয়াছিল; কিন্তু স্কুলের দুই-তিনজন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকায় তাহার যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। তারপর এ কয়দিন অমলের নিকট হইতে কোন পত্র আসে নাই। এই চারি বৎসরের মধ্যে অমল পত্র দিতে ত কোনদিন এত দেরী করে নাই। না যাইতে পারায় সে কি অভিমান করিয়া পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছে? এই কথাই চণ্ডী ভাবিতেছিল। এমন সময় এক অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, অমলবাবুর ভয়ানক বিপদ,

তিনি যেন এই এগারটার গাড়ীতেই রওনা হন। বিপদটা যে কি, তাহা নানাপ্রশ্ন করিয়াও চণ্ডী জানিতে পারিল না। সে মনের মধ্যে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। লোকটা তাহাকে সংবাদ দিয়াই চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, ফিরিতে তাহার দিন দুই বিলম্ব হইবে, তিনি যেন অবিলম্বেই রওনা হন। তখন বেলা সাড়ে নয়টা। চণ্ডী তাড়াতাড়ি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিল এবং যতশীঘ্র সম্ভব স্নান-আহার সারিয়া লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

অমল যে ক্ষুদ্র সহরে বাস করিত, তাহার আসল নামটা অপ্রকাশ রাখিয়া সেটাকে আমরা আমবেড়িয়া বলিয়া অভিহিত করিব। চণ্ডী যখন সেখানে পৌঁছিল, তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সবে শুক্লপক্ষ পড়িয়াছে। চারিদিক অন্ধকার। আকাশের গায়ে মিটমিট্ করিয়া তারাগুলি জ্বলিতেছিল। আর নাতিপ্রশস্থ বন্ধুর পথের উপর দূরে দূরে থাকিয়া তেলের আলোগুলি জীর্ণ কাষ্ঠ ফলকের উপর দাঁড়াইয়া নিতান্ত ম্লানভাবে পথচারীদের পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছিল। ষ্টেশন হইতে অমলের বাড়ী আধ মাইলের কম নহে। সে পথটুকু অতিক্রম করিতে চণ্ডীর মিনিট ছয়েকের বেশী লাগিল না। বাড়ীটা একটা সরু গলির ভিতর,—সেখানে একটা স্তিমিতপ্রায় তেলের আলোও নাই। সে গলিটা মিউনিসিপ্যালিটীর অধিকারভুক্ত নহে, কাজেই এই যৎসামান্য সুবিধা হইতেও সে বঞ্চিত।

অন্ধকার ঠেলিয়া চণ্ডী বন্ধুর গৃহদ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। বার দুই "অমল অমল" বলিয়া ডাক দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। হ্যারিকেনের উজ্জ্বল আলোকে চণ্ডী দেখিল, অমল এবং তাহার পত্নী সুধাময়ী বিবর্ণমুখে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চণ্ডী ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে রে?"

অমল কম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আঃ, বাঁচলুম! এসেছিস ভাই। এত দেরী দেখে আমরা ভেবেছিলুম, তুই এ গাড়ী ধরতে পারিস্ নি, তোর আসতে সেই কাল ভোর। যাক্, বেঁচেছি! ভেতরে আয় সব বলছি।"

চণ্ডী ভিতরে প্রবেশ করিতেই অমল ক্ষিপ্রহস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ঘরের সম্মুখে চওড়া রক। চণ্ডী চামড়ার ব্যাগটা রাখিয়া বলিল, "ভেতরে কেন রে, এইখানে বসা যাক্।"

বন্ধুকে কাছে পাইয়া অমল মনের বল যদিও অনেকটা ফিরিয়া পাইয়াছিল, তবুও কথা বলিতে গিয়া তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। সে ব্যস্তভাবে কহিল, "না না, ওখানে নয়, ওখানে নয়, ভেতরে আয়।"

চণ্ডী রকের উপর দাঁড়াইয়া কহিল, "তোদের হয়েছে কি আগে বল দিকি,—তোদের মুখের চেহারা বদলে গেছে, কথা বল্‌ছিস্ কেমন একরকম করে'।"

অমল তেমনই বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "বলব বলেই ত তোকে ডেকে আনিয়েছি; তবে এখানে নয়, ভেতরে আয়, ভেতরে আয়, বড় বিপদ!"

চণ্ডী আর কিছু না বলিয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, এইবার বল্।"

অমল তখন নিজেকে আরও খানিকটা সাম্‌লাইয়া লইয়াছে। কতকটা সহজভাবে কহিল, "এতটা পথ এলি, একটু জিরিয়ে নে, তারপর—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া চণ্ডী কহিল, "তুই কি মনে করিছিস্, এই চার বছরে আমি এমনই অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গেছি যে, দু'-চারঘণ্টা ট্রেণে কাটাতে হয়েছে বলে' আমায় জিরুতে হবে! তোদের মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারছি, একটা ভয়ানক কিছু ঘটেছে—কি হয়েছে আগে বল্।"

অমল কহিল, "আচ্ছা, আগে ব্যাপারটা তোকে ভেঙেই বলি। তুই ত আমায় জানিস্—না না, তুই হাতে-মুখে জল দিয়ে খেয়ে নে, তারপর সব বলব দেরী হ'লে হয় ত খাবার সময়ই হবে না।" হঠাৎ সে থামিয়া গেল।

ঘড়িতে টংটং করিয়া দশটা বাজিল। চমকিয়া উঠিয়া একবার সে ঘড়ির দিকে চাহিল। তাহার মুখ আবার বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আপন-মনে বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ!"

সুধাময়ী এতক্ষণ একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। ভয়ত্রস্ত চরণে অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্বামীর দেহ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

উভয়ের এই আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া চণ্ডী নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অমল চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, "ওই ওই, আরম্ভ হয়েছে!"

তাহারা যে ঘরের মধ্যে ছিল, তাহারই সামনে রক; সেই রকের সামনে একটী ছোট উঠান। উঠানের একপাশে আর একটী ঘর—সেটা ছিল এ বাড়ীর বৈঠকখানা। সেই ঘরের মধ্য হইতে শব্দ উত্থিত হইল, "ঠকা-ঠক্, ঠকা-ঠক্, ঠকা-ঠক্!" কে বা কাহারা যেন চেয়ার, বেঞ্চি বা টেবিল মেঝের উপর সজোরে ঠুকিতেছে।

সে শব্দ চণ্ডীরও কানে গেল। কিন্তু সে শব্দই যে তাহার বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর বিচলিত হইবার কারণ হইতে পারে, তাহা সে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিস্ময়ভরা-দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কি হয়েছে রে, অমন করছিস্ কেন?"

বাহিরের ঘর হইতে তেমনই ভাবে শব্দ হইতে লাগিল, "ঠকা-ঠক্, ঠকা-ঠক্, ঠকা-ঠক্!"

অমল টানিয়া টানিয়া বলিল, "ওই ওই, শুনতে পাচ্ছিস না?"

চণ্ডী ব্যগ্রভাবে কহিল, "শুনতে ত পাচ্ছি ও ঘর থেকে একটা শব্দ আস্‌ছে। তা'তে তোরা এত বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লি কেন, তা' ত বুঝতে পারছি না। ভেঙেই বল না ব্যাপারটা কি?"

শব্দটা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ও ঘরের জিনিষগুলা কাহারা যেন ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতেছে।

অমল অসহায়-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চণ্ডী বুঝিল, অমলের নিকট হইতে কিছু জানিতে পারা অসম্ভব। সে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া দ্রুতপদে সে-স্থান ত্যাগ করিল। অমলের ইচ্ছা হইল তাহাকে ধরিয়া রাখে; প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলে, "ওরে যাস্ নি, যাস্‌নি!" কিন্তু না পারিল সে এক পা অগ্রসর হইতে, না পারিল একটা কথা বলিতে। কে যেন তাহার সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া লইয়াছিল। সুধাময়ীও পুত্তলিকাবৎ আড়ষ্ট হইয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল।

চণ্ডী বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, এই অল্প সময়ের মধ্যে ঘরখানা কে যেন চষিয়া ফেলিয়াছে। একখানি তক্তাপোষ 'কাৎ' হইয়া পড়িয়া আছে। একখানা টেবিল ও খানচারেক চেয়ার মেজের উপর গড়াগড়ি দিতেছে। ঘরের মধ্যে একটা হ্যারিকেন মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। সে তাহার আলোয় এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না। অথচ এই মাত্র জিনিষ ফেলার শব্দ সে সুস্পষ্ট শুনিয়াছে। সে আর এবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল বাহিরের দরজা উন্মুক্ত রহিয়াছে। এইবার সে ব্যাপারটা কতক অনুমান করিয়া লইল,—ইহা কোন দুষ্ট লোকেরই কাজ। যে কোন কারণেই হউক, অমলের সহিত প্রতিবেশীদের অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। অমলকে জব্দ করিবার জন্য তাহারাই চক্রান্ত করিয়া এই কাজ করিতেছে। শুধু আজ নহে, কয়েক রাত্রি ধরিয়া এই কাজ চলিতেছে। সে একা তাহাদের সহিত পারিয়া উঠিতেছে না বলিয়াই তাহাকে এখানে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিতেই বা অমল কেন ইতস্ততঃ করিতেছিল? অল্প কথায় ত সে তাহাকে ব্যাপারটা জানাইয়া দিতে পারিত। যাক্, কালই সে প্রতিবেশীদের বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে অমল এখানে নূতন আসিয়াছে বটে, কিন্তু সে নিঃসহায় নহে। এ ব্যাপারের পুনরাভিনয় যদি হয়, তাহা হইলে এমনই শিক্ষা সে তাহাদের দিবে যে, জীবনে তাহারা আর অমলের পিছনে লাগিতে সাহস করিবে না। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে কোন শব্দ ছিল না। তাহার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন করিয়া আবার সেই শব্দ আরম্ভ হইল, —ঠকা-ঠক্, ঠকা-ঠক্, ঠকা-ঠক্!"

সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিতেই সে দেখিল, দুইখানি হাত একটা চেয়ার ধরিয়া মেজের উপর সজোরে ঠুকিতেছে। সে ছুটিয়া সেই দিকে

অগ্রসর হইল। চেয়ারখানা তেমনই ভাবে ঠকাঠক্ শব্দ করিতে করিতে অন্যদিকে সরিয়া গেল। চণ্ডীও তাহার অনুসরণ করিয়া ছুটিল। সেও থামে না চেয়ারখানাও থামে না। তাহার সারা দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, তবুও সে পশ্চাদ্ধাবন করিতে বিরত হইল না। অবয়বের অন্য কোন অংশ দেখিতে না পাইলেও দুইখানি বলিষ্ঠ হাত সে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল। অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া সে ছুটিতেছিল, ওই হাত দু'খানা ধরিবার জন্য। কিন্তু ধরি-ধরি করিয়াও ধরিতে পারিতেছিল না। যেমন করিয়া হউক উহাকে ধরিতেই হইবে। দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া সে ছুটিতে লাগিল। এইবার বুঝি তাহার প্রাণপণ চেষ্টা সফল হইল। সে স্পষ্ট অনুভব করিল, সেই দুইখানি হাত সে সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছে, উত্তেজিতভাবে সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"এইবার তোর চালাকি বের করছি!" পরক্ষণেই গভীর বিস্ময়ে দেখিল,—কোথায় সে হাত দু'খানা,—সে যে চেয়ারের হাতোল দু'খানি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শুধু দাঁড়াইয়া থাকা নহে, সে যে নিজেই চেয়ারখানাকে সজোরে মেজের উপর ঠুকিতেছে। চেয়ারখানা ছাড়িয়া দিয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়িতেছিল, তাহার পদদ্বয়ও যেন কেমন অবশ হইয়া আসিয়াছিল, সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, চেয়ারের উপর 'ধপ্' করিয়া বসিয়া পড়িল।

কতকটা শ্রান্তি দূর হইলে, সে ভাবিতে চেষ্টা করিল, ব্যাপারটা কি? তাহাকে এমনই করিয়া বোকা বানাইয়া লোকটা বেমালুম সরিয়া পড়িল! লোকটা ত বলিতেছে, কিন্তু দু'খানা হাত ছাড়া তাহার দেহের আর কোন অংশই ত সে দেখিতে পায় নাই। লোকটা হয় ত যাদু জানে, তাই এমনই করিয়া তাহার চোখে ধূলি দিতে পারিয়াছে। তা দিক, কিন্তু হাত দু'খানা ত বজ্রমুষ্টিতে সে চাপিয়া ধরিয়া ছিল—সে দৃঢ়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চক্ষুর নিমিষে সে পলাইল কি করিয়া? এমন সময় চেয়ারখানা সহসা নড়িয়া উঠিল। সে চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না, অথচ সে স্পষ্ট অনুভব করিল, কে যেন চেয়ারখানা ধরিয়া প্রবলবেগে ঝাঁকানি দিতেছে। আর বসিয়া থাকা চলে না, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারখানা সশব্দে মেজের উপর আছড়াইয়া পড়িল। এইবার সে নিঃসংশয়ে ধারণা করিয়া লইল, ইহা যাদুকরেরই কাজ। হয় এই পাড়ায় কোন যাদুকর আছে কিম্বা প্রতিবেশীরা তাহাদের কোন পরিচিত যাদুকরকে স্থানান্তর হইতে আনাইয়াছে। কাল প্রাতে যেমন করিয়াই হউক ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। এ কি বর্ব্বরোচিত ব্যবহার! আজ রাত্রিটা বাধ্য হইয়া চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। অমল ও সুধার কথা মনে পড়িল। চক্রীদের চক্রে পড়িয়া বেচারীরা কি কষ্টটাই না পাইতেছে! তাহাদের এখনই গিয়া সাহস দিতে হইবে। বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ভিতরে যাইতে গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। খিলটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। খিলটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল,—বেশ মজবুত খিল। বাহির হইতে এ খিল খুলিবার কোন উপায় নাই। লোকটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল কি করিয়া? তবে কি অমল খিল বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল? না বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার অন্য কোন পথ আছে? পাঁচীল টপ্‌কাইয়াও ত ভিতরে প্রবেশ করা যাইতে পারে। ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। যাক্, অমলকে জিজ্ঞাসা করিলেই সব কথা জানা যাইবে। ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া উঠানে প্রবেশ করিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ কি! রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে! সে একবার ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিল। উষার-আলোকে আকাশ ঝলমল করিতেছে। সেখানে একটী তারাও দেখা যাইতেছে না। ওই ত পাখীর দল প্রভাত-বন্দনা সুরু করিয়াছে। সে যখন ছুটিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করে, তখন সবে মাত্র রাত্রি দশটা। এই দীর্ঘ সাতঘণ্টা ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া সেই ঘরের মধ্যে সে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে! তাহার ত মনে হইয়াছিল, রাত্রি প্রভাত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব।

এমন সময় অমল ঘর হইতে বাহির হইয়া রকের

উপর আসিয়া দাঁড়াইল। উঠানের উপর চণ্ডীকে দেখিয়া সে ক্ষিপ্রপদে রক হইতে নামিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া কহিল, "ও ঘর থেকে বেরুতে পেরেছিস্ ভাই। রাত পুইয়ে গেছে, আর ভয় নেই।"

চণ্ডী হাসিয়া কহিল, "বেরুতে পারব না কেন রে? ভয়ই বা কিসের?"

আশ্চর্য্য হইয়া অমল কহিল, "বলিস কি রে! সারা রাত ওই ঘরে কাটিয়ে এসে তবু ওই কথা বলছিস! আমি জানি তোর অসাধ্য কিছু নেই—কিন্তু যাক্, তোর যে কোন বিপদ হয় নি এই আমাদের ভাগ্যি! ভগবানের অসীম দয়া বলতে হবে! আমি জোর করে' বল্‌তে পারি তুই ছাড়া অন্য কেউ হ'লে ঠিক ঐখানে মরে পড়ে থাক্‌ত। এখন মনে হচ্ছে, কি অন্যায়ই করেছিলাম তোকে এগারটার গাড়ীতে আস্‌তে বলে'; কেজান্‌ত ভাই, গাড়ী দু' ঘণ্টা লেট করবে।"

চণ্ডী কহিল, "এসেও পড়েছি, সারারাত ওই ঘরে কাটিয়েও এসেছি, এখন তোরা কি রকম ছিলি বল্ ত?"

অমল কহিল, "সে তোকে বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না। আমাদের যে কি অবস্থায় রাত কাটে, চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। আর একটা দিন এ অবস্থায় থাকলে আমারা হয় পাগল হ'য়ে যাব, না হয় মারা যাব। যাক্, সে সব কথা পরে হবে—কাল সারারাত তোর উপোস গেছে, দিনেও নিশ্চয় ভাল করে' খাওয়া হয় নি, চায়ের জল চড়িয়েছে। চা আর কিছু খেয়ে নে, তার পর সব শুন্‌বি, শুধু শোনা নয়, আজ দিনের মধ্যে যা' হোক্ একটা তোকে বিহিত করতেই হবে—সেই জন্যেই ত তোকে লোক পাঠিয়ে আনিয়েছি। চল্ ভেতরে।" অমল বন্ধুকে লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

জলযোগের পর সুস্থ হইয়া বসিয়া এই প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ হইল। সুধাময়ীও সেখানে উপস্থিত ছিল।

অমল কহিল, "এ বাড়ীতে তুই ত জানিস্, ক'দিনই বা আমরা এসেছি—দশ-বার দিনের বেশী হয় নি। তিনদিন আমরা বেশ ছিলুম, চারদিনের দিন প্রথম এই হাঙ্গামা আরম্ভ হ'ল, তারপর সমানে চলছে। দশটা যেমন বাজে অমনই বাইরের ঘরে ওই শব্দ আরম্ভ হয়। তুইও তা' শুনেছিস্, তারপর ও ঘরে যা' হয়, তা' তুই আমার চেয়ে বেশীই উপলব্ধি করে' এসেছিস্—প্রথমদিন আমি চোর মনে করে' একটা মোটা লাঠি নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলুম, কিন্তু দু' মিনিটের বেশী থাক্‌তে পারি নি। দু'খানা হাত,—শুধু দু'খানা হাত দেখেছিস্—"হঠাৎ সে থামিয়া গেল।

চণ্ডী হাসিয়া কহিল, "কি রে ভয় পেলি না কি?"

অমল কহিল, "ভয় ঠিক পাই নি,—ওই হাত দু'খানার কথা মনে উঠ্‌লেই বুকের ভেতরটা কি রকম 'ছ্যাৎ' করে' ওঠে। দু'খানা কাটা হাত চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালে কি রকম অবস্থা হয় বল দিকি?"

চণ্ডী কহিল, "ভয়ানক রাগ হয়,—আমারও ইচ্ছে হচ্ছিল, একবার যদি ধরতে পারি, হাত দু'খানা ভেঙে গুঁড়িয়ে দি'। একবার ধরেও ছিলুম।"

অমল গভীর বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "হাত ধরিছিলি কিরে, ও হাত কি ধরা যায়?"

চণ্ডী কহিল, "বেটা ভারি চালাক, আমার হাত ছিনিয়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু এ চালাকি আর চলছে না,—আজ তাকে ধরবই।"

ভীতিপূর্ণ কণ্ঠে অমল কহিল, "না না—আর ধরবিই বা কাকে! মানুষ হ'লে ত ধরবি।"

হাসিতে হাসিতে চণ্ডী কহিল, "মানুষ নয় তা' আমি জানি—অ-মানুষ,—সেই ধ'ড়বাজের জারিজুরি আজ ভাঙব। হ্যাঁ একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করি,—পাড়ার লোকের সঙ্গে কোনরকম শত্রুতা তোর আছে?"

অমল কহিল, "না,—শত্রুতা থাকবার ত কোন কারণ নেই। তুই ব্যাপারটাকে ঠিক বুঝতে পারিস্ নি। এ মানুষের কাজ নয়;—তুই ত জানিস্ আমি কোনদিন ও সব বিশ্বাস করি নি,—কিন্তু এই ঘটনার পর আমার দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মেছে, ভূত আছে—আর এ সমস্তই ভৌতিক ব্যাপার।"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া চণ্ডী কহিল, "তাই বল, ভূতের ভয়ে তোদের দু'জনের এই অবস্থা হয়েছে।

ভূত কিরে! তুই যে আমায় সত্যি হাসালি! সাজা ভূত রে, সাজা ভূত,—আজ রাত্রের মধ্যেই ভূত সাজা-আমি বের করে' দেব।"

অমল অনুনয়ের স্বরে কহিল, "দেখ ভাই ও সব মতলব ছেড়ে দে। কোনরকমে এ বাড়ী থেকে আমাদের বের করে' নিয়ে চল্—ক'দিন থেকে বেরুবার চেষ্টা করছি; কিছুতেই বেরুতে পাচ্ছি না। কাজকর্ম্ম বন্ধ করে' ঘরের মধ্যে আট্‌কে বসে' আছি।"

চণ্ডী কহিল, "তার মানে? বেরুতে পারছিস্ নি কি রকম?"

অমল কহিল, "যেদিন রাত্রে এই সব ব্যাপার আরম্ভ হ'ল, তারপর দিনই আমরা বাড়ী ছাড়বার মতলব করে-ছিলুম, কিন্তু পারলুম না। জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে বেরুব, কে যেন আমাদের চেপে ধরে' রাখলে,—তারপর ঠিক্ করলুম, জিনিষ-পত্তর সব পড়ে' থাক, আমরা দু'জনে ত আগে বেরিয়ে পড়ি, তাও ত পারলুম না, আমাদের পা ধরে কে যেন টেনে রাখলে।"

চণ্ডী অবাক্ হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল, অমল এ সব কি বলিতেছে! তাই ত ভূতের বিভীষিকা দেখিয়া তাহার মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে! না হইলে তাহার মত শিক্ষিত বলিষ্ঠ সাহসী যুবকের মুখ দিয়া এমন সব কথা বাহির হইতে পারে! একবার তাহার মনে হইল, এখনই তাহাদের বাড়ীর বাহিরে লইয়া গিয়া দেখাইয়া দেয়,—মিথ্যা ভয়ে তাহাদের মনের কি শোচনীয় অবস্থা হই-য়াছে! কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দেওয়াটার মধ্যেও যে একটা লজ্জার ব্যাপার থাকিয়া যায়—যে ব্যাপারটা একে-বারেই অবিশ্বাস্য হাস্যাস্পদ, তাহার আবার পরীক্ষা কি? তাহা ছাড়া একবার বাড়ীর বাহির হইলে অমল আর বাড়ীতে থাকিতে চাহিবে না। কিছুতেই এ বাড়ীতে তাহাকে আর রাখা যাইবে না। তাহাকেও চলিয়া যাইতে হইবে। না; তাহা কিছুতেই হইবে না। যে শয়তানটা যাদুবিদ্যার সাহায্যে প্রতি রাত্রে এই বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে, আগে তাহাকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তখন আর অমল এ বাড়ী ত্যাগ করিবার কথা মুখে আনিবে না।

অমল কহিল, "তুই চুপ করে' বসে' কি ভাবছিস্? আমাদের বের করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর ভাই।"

চণ্ডী হাসিয়া কহিল, "তুই কি এখনই বেরিয়ে যেতে চাস্? আচ্ছা ভয় যা' হোক্ তোর! আরে, আমি যখন এসেছি তোর ভাবনা কিসের!"

অমল কহিল, "সে কথা সত্যি ভাই, তোকে কাছে পেয়ে আমাদের ভয়টা অনেকখানি কমে গেছে।"

চণ্ডী কহিল, "তবে বাড়ী ছাড়বার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? যখন ইচ্ছে হয় গেলেই হ'ল। আয় দেখি বাড়ীর ভেতরটা একবার ঘুরে দেখি।"

অমল কহিল, "বেশ ত চল্ না। বাড়ীটা কিনলুমই বৃথা, এ বাড়ী ভোগ করা দেখছি অদৃষ্টে নেই।"

চণ্ডী হাসিয়া বলিল, "তারাও যে এই চাইছে—তোকে তাড়াতে পারলে বাড়ীটা তারাও বিনাখরচায় ভোগ দখল করে,—সেটী হচ্ছে না। নে ওঠ।"

দুই বন্ধুতে রকের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সুধাও তাহাদের অনুসরণ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিল। চণ্ডী চারদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। বাড়ীটা বেশ আঁটসাট,—সহজে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। উঠানের পাচীল প্রায় দশফুট উঁচু, মাথায় ভাঙা কাঁচ দেওয়া।

এমন সময় একটী যুবক উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এই যে অমল দা', আজ কি আন্‌তে হবে?"

অমল তাহার হাতে একটী টাকা দিয়া যাহা যাহা আনিতে হইবে, বলিয়া দিল। সে চলিয়া গেল।

অমল কহিল, "এই ছেলেটী বাজার করে' দিচ্ছে বলে' খেতে পাচ্ছি, না হ'লে বোধ হয় খাওয়াই জুটত না।"

চণ্ডী কহিল, "তোর ত একজন ঝি আছে, সে বাজার করতে পারে না?"

অমল কহিল, "সে বাড়ীরই বার হতে চায় না, তা' বাজার করবে। তবে ভেতরের যা-কিছু কাজ সব বেশ

গুছিয়ে করে, কিছু বলতে হয় না,—কিন্তু বাইরে জঞ্জাল ফেলতেও যাবে না।”

এমন সময় ঝি কতকগুলি মাজা বাসন হাতে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

চণ্ডী কহিল, “ওই সেই বুঝি তোর ঝি?”

অমল কহিল, “হ্যাঁ, দেখলি ঘোমটায় কি রকম মুখ ঢেকে আছে। দিনরাত ওই রকমভাবে থাকে, একবারও মুখের কাপড় খোলে না। এমন কি সুধার সামনেও নয়; সুধাও ওর মুখ কোনদিন দেখে নি।”

চণ্ডী হাসিয়া কহিল, “খুব লজ্জাশীলা দেখছি ও ত; কিন্তু ঠিক টিকে আছে, ভয় পেয়ে পালায় নি ত? অনেকদিন আছে বুঝি?”

অমল কহিল, “না, এই ত দিন পাঁচ-সাত এসেছে। আমরা এ বাড়ীতে আসবার বোধ হয় দিন তিন-চার পরেই এসেছে—ও যে রকম মড়ার মত ঘুমোয়, ও কি আর কিছু বুঝতে পারে! ওর এমন ভয়ানক ঘুম যে, ধাক্কা মেরেও ওকে জাগান যায় না। থাক্ গে, এখানে দাঁড়িয়ে আর কি হবে, চল্ ভেতরে গিয়ে বস্‌বি। ও বেলায় কিন্তু বাড়ী ছাড়তেই হবে।”

চণ্ডী হাসিয়া কহিল, “বেশ তাই হবে।” প্রকাশ্যে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিল, আজ ত নয়ই, কাল দেখা যাইবে।

ঘরে গিয়া তিনজনে উপবেশন করিল।

চণ্ডী তাহাদের দেশের গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। কথায় কথায় সেই ভয়াবহ প্রসঙ্গটা চাপা পড়িয়া গেল। পাঁচ দিন পরে আজ এই প্রথম স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মনের মধ্যে পরম তৃপ্তি অনুভব করিল। এ কয়দিন তাহাদের ভাল করিয়া আহারও হয় নাই। কোনরকমে দু'টি চাল-ডাল সিদ্ধ করিয়া তাহারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছে। সেই কারণেও বটে, তাহা ছাড়া দীর্ঘ চারি বৎসর পরে বন্ধু আসিয়াছে, আহারের আয়োজনটা খুব ভাল রকমই হইল। যে ঘরে বসিয়া তাহারা গল্প করিতেছিল, সেই ঘরেই ষ্টোভ ধরাইয়া সুধা রাঁধিতে বসিল। একাকী রান্নাঘরে গিয়া রাঁধা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

বেলা প্রায় একটার সময় আহার শেষ হইলে, তাহারা শয়নের ব্যবস্থা করিল। কাল সারারাত্রিই তিনজনের বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছে। অবশ্য অমল ও সুধা পাঁচ-সাত রাত্রিই দুই চোখের পাতা এক করিতে পারে নাই।

চণ্ডী কহিল, “আমি কিন্তু বাইরের ঘরে শোব।”

অমল কহিল, “দিনের বেলা যেখানে ইচ্ছে শুতে পারিস্।”

সেই ব্যবস্থাই হইল। সুধা বাহিরের ঘরের ধূলিরাশি পরিষ্কার করিয়া জিনিষ-পত্রগুলি গুছাইয়া তক্তাপোষের উপর চণ্ডীর জন্য বিছানা পাতিয়া দিল। চণ্ডী মনে মনে কল্যকার ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে কোন এক সময় গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে।

বহুপূর্ব্বে অমল ও সুধার ঘুম ভাঙিয়াছিল। বন্ধুকে তাহারা জাগায় নাই। এইবার তাহার সাড়া পাইয়া উভয়ে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া চণ্ডী হাসিয়া কহিল, “খুব ঘুমিয়েছি। নারে! তোরা কখন উঠ্‌লি?”

অমল কহিল “তা' প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে। দেখ্ ভাই, পাঁচটা বেজে গেছে, আটটায় একটা গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতেই আমাদের রওনা হ'তে হবে। তুই কাছে না থাকলে আমরা বাঁধা-ছাঁদাও করতে পারব না।”

চণ্ডী যে কিছুতেই আজ এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না ইতিপূর্ব্বে সে তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। সে মনের কথা গোপন করিয়া কহিল, “সমস্ত গায়ে আমার ভয়ানক ব্যথা হয়েছে, মাথার ভেতর কেমন যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। আজ না গেলে হয় না?”

অমল অসহায়ভাবে কহিল, “তাই ত; এ যে বিপদের উপর বিপদ দেখছি। তুই যদি অসুখে পড়ে' যাস্, তা' হ'লে আমরা কি করব।”

চণ্ডী হাসিয়া কহিল, “তুই সব তাতেই বিপদ দেখছিস্ যে,—গায়ে ব্যথা হয়েছে, একটা দিন বিশ্রাম করলে সেরে যাবে। তোর কোন ভাবনা নেই, ভারি অসুখে কোন

দিন পড়িও নি, এবারও পড়ব না। একটা দিন জিরিয়ে নিতে চাই।"

অমল ভীতভাবে কহিল, "সারারাত যে আবার সেই হাঙ্গামা চল্‌বে, জিরুতে কি দেবে ?"

চণ্ডী বুঝিল, অমলের মনের মধ্যে আবার ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। তাহাকে সাহস দিবার জন্য জোর দিয়া কহিল, "আজ আর কোন হাঙ্গামা হবে না আমি তোকে বলে' রাখ্‌ছি। আজ রাত্রে এই ঘরেই আমি শোব।"

অমল ব্যগ্রভাবে কহিল, "না না, রাত্রে এ ঘরে কিছুতেই শোয়া হবে না।" একটু থামিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "এ ঘর আর ও ঘর সবই সমান,— কোথাও নিস্তার নেই।"

চণ্ডী কহিল, "তার মানে? ভেতরের ঘরেও কোন রকম হাঙ্গামা হয় না কি ?"

বিবর্ণমুখে অমল কহিল, "সে কথা তোকে আমি মুখে বলতে পারব না, সে ভয়ানক ব্যাপার!"

চণ্ডী কহিল, "বেশ, তা হ'লে এক ঘরেই সবাই থাকব। ভালই হ'ল—ও ঘরের ব্যাপারটাও দেখা যাবে। এ ঘরের চেয়ার ঠোকা ত দেখলুম,—নতুন আর কিছু ত হবে না।"

অমল কহিল, "নতুন আর কি হবে, রোজই এক ব্যাপার ঘটে। কিন্তু ভাই, আজ কোনরকমে যদি এ বাড়ী থেকে বেরুতে পারতিস্—চেষ্টা করলে পারবি নি ?

ভিতরের ঘরের এই নূতন সংবাদ না পাইলে, হয় ত চণ্ডী যাইতে রাজি হইত। কিন্তু ঐ ঘরের ভয়ানক ব্যাপারটার সন্ধান না লইয়া ত সে যাইতে পারে না। ইহা যে কোন মতলববাজ লোকের ফন্দী এই ধারণাই তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রকাশ্যে সে কহিল, "যেতে পারলে নিশ্চয়ই যেতুম গায়ে এত বেশী ব্যথা হয়েছে যে, নড়তে কষ্ট হচ্ছে—ভয় কি রে, তিনজনে একঘরে থাকব। তারা যা' খুসী করুক না, ভয় না পেলেই হবে।"

হতাশভাবে অমল কহিল, "কি আর বলব তোকে। উপায় যখন নেই, তখন থাকতেই হবে।"

* * *

রাত্রি আটটার মধ্যে আহার শেষ করিয়া তিনজনে অমলের শয়নকক্ষে গিয়া বসিল। অমল ও সুধা দুইজনের কাহারও মুখে হাসি ছিল না। ভয়ের ছাপ দু'জনের মুখের উপর সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। চণ্ডী তাহা লক্ষ্য করিয়া এমন সব গল্প ফাঁদিয়া বসিল, যাহাতে উভয়ের মনের ভাব অনেকটা লঘু হইয়া যায়। হইলও তাই। মাঝে মাঝে তাহাদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এক এক-সময় এমনও বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদের ভয় দূর হইয়া গিয়াছে। এমনই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর, চণ্ডীর একটা কথায় তিনজনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল। কোথায় গেল অমল ও সুধার মুখের সেই হাসি! এক নিমিষে উভয়ের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হইয়া গেল, চণ্ডী স্তব্ধ হইয়া রহিল। বুঝিল, এইবার সেই শব্দ আরম্ভ হইবে। তাহার অনুমান মিথ্যা হইল না,—বাহিরের ঘর হইতে শব্দ আসিতে লাগিল—ঠকা-ঠক, ঠকা-ঠক! চণ্ডীর প্রবল ইচ্ছা হইতে লাগিল,—একবার ওই ঘরে ছুটিয়া যায়, সেই হাত দু'খানা ধরিয়া ফেলে! কিন্তু সে ইচ্ছা সে জোর করিয়া দমন করিল। এই ঘরে কি ব্যাপার ঘটে, তাহাই দেখিতে হইবে। ইহাও ত সেই একই লোকের কারসাজি! এই ঘরেই আজ তাহার জারিজুরি ভাঙিতে হইবে। সে ঘরের এদিক-ওদিক একবার চাহিয়া দেখিল, ঘরের কোণে একটা মোটা লাঠি ছিল, সে উঠিয়া গিয়া সেটা লইয়া আসিল। বেশ মজবুত লাঠি, এর এক এক ঘায়ে দু'-চারজনকে 'কাৎ' করা যাইবে। অমল ও সুধা তখন পরস্পরের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া ছিল।

অল্পক্ষণ পরে চণ্ডী লাঠি হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অস্থির-চিত্তে ঘরময় পায়চারী করিতে আরম্ভ করিল। বাহিরের ঘরের সেই শব্দ তাহাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। এমনই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। চণ্ডী তখন এদিক-ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে সবে মাত্র অর্গলবদ্ধ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় সহসা খিল্‌টা সশব্দে খুলিয়া গেল এবং চণ্ডীকে

ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিয়া দরজার দুইখানি কপাট উন্মুক্ত হইয়া গেল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া খোলা দরজার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিতেই তাহার মনে হইল, কে যেন তড়িৎবেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। লাঠিটা বাগাইয়া ধরিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে, কে?" কেহ কোন উত্তর দিল না। কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না। এ ঘর হইতে বাহির হইবার অন্য কোন পথও ত নাই—গেল কোথায়? সহসা তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠের উপর দুই খানি হাতের স্পর্শ সে অনুভব করিল। কি তীব্র শীতল সে স্পর্শ! শিহরিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতেই সে দেখিল, দুইখানি হাত শূন্যের উপর ঝুলিতেছে! মিনিট খানিক সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হাত দু'-খানা এখন ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল, সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া গিয়া হাত দু'খানার উপর সজোরে লাঠির আঘাত করিল। সে আঘাত কঠিন মেজের উপর প্রতিহত হইয়া ব্যর্থতায় করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। হাত দু'-খানা স্থির নিশ্চল হইয়া সেইখানে ঝুলিয়া রহিল। চণ্ডী ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে সেই শূন্যে বিলম্বিত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হাত দু'খানার উপর লাঠির পর লাঠি চালাইতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত আঘাতই ব্যর্থ হইয়া গেল! তাহাকে উপহাস করিয়া হাত দু'খানা সরিতে সরিতে আল-নার সম্মুখে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে আল-নার উপর হইতে কাপড় ও জামাগুলি ঝপ্ ঝপ্ করিয়া মেজের উপর পড়িতে লাগিল। চণ্ডী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছিল। হঠাৎ এক সময় পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া সজোরে সেই হাত দু'খানা লক্ষ্য করিয়া সে আবার লাঠি চালাইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দু'খানা হাতের একখানা দুলিতে দুলিতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া 'খপ্' করিয়া লাঠিটাকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিল। চণ্ডী প্রাণ-পণ শক্তিতে টানাটানি করিয়াও লাঠিটাকে মুক্ত করিতে পারিল না। অপর হাতখানা তখন ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। চণ্ডী বিস্ফারিত চোখে দেখিল সে হাতখানায় মাংসের লেশমাত্র নাই। শুধু ক'খানা হাড় দেখা যাইতেছে—এ যে কঙ্কালের হাত! চণ্ডীর সারাদেহ কণ্ঠকিত হইয়া উঠিল। সে একহাত দিয়া সেই হাড়টাকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। পাঁচটা আঙুলের হাড় আঁকিয়া বাঁকিয়া আগাইয়া আসিয়া সাঁড়াশীর মত তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। চণ্ডীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অমল গভীর আতঙ্কে চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু কণ্ঠনালী দিয়া কোন স্বর বাহির হইল না। সুধা কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। চণ্ডী তখন দুই হাত দিয়া পাঁচটা হাড়কে টানিয়া গলা হইতে সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, হাড় ক'খানা যেন আরও জোরে গলার উপর চাপিয়া বসিতে লাগিল। ক্রমে চণ্ডীর জিভ বাহির হইয়া পড়িল এবং তাহার চোখ দু'টা কোটর হইতে ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল! প্রাণটাও বুঝি বাহির হইয়া যায়!

* * * *

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে চণ্ডী চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিল অমল ও সুধা তাহার শিয়রে বসিয়া আছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া অমল কহিল, "শরীরটা সুস্থ বোধ হচ্ছে ভাই?"

উঠিয়া বসিয়া চণ্ডী কহিল, "আমি ত বেশ আছি—এ কি রে সমস্ত গা ভিজে গেছে যে, এত ঘেমে উঠেছিলুম?"

অমল কহিল, "ও ঘাম নয়, জল—আধ ঘণ্টার ওপর জলের ঝাপ্টা দিতে তবে ত তোর জ্ঞান ফিরে এসেছে।"

চণ্ডী হাসিয়া কহিল, "বলিস্ কিরে, আমার এমন অবস্থা হয়েছিল!" কাল রাত্রির সেই বীভৎস দৃশ্য তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া উঠিল।

অমল কহিল, "ভোর হ'য়ে গেল, তাই রক্ষে, না হ'লে তোকে হয় ত ফিরে পেতুম না, কি ভয়ই আমাদের হয়েছিল। কেবল মনে হচ্ছিল, তোকে কেন এখানে

আনালুম, আমাদের অদৃষ্টে যা' ছিল, হ'ত। ওঃ, ভগবান্ খুব রক্ষে করেছেন!" সে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। সুধাও গলায় অঞ্চল দিয়া দুই হাত জোড় করিয়া বারবার কপালে ঠেকাইতে লাগিল।

চণ্ডী অন্যমনস্কভাবে কহিল, "তাই ত, কি হ'ল!"

অমল কহিল, "তুই ওর সঙ্গে লাগ্‌তে গেছলি বলেই ত সে তোকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল,—সে ত রোজই ঘরের মধ্যে ঢুকে জিনিষ-পত্তর সব তচ্‌নচ্ করে' ফেলে,—আমরা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' চেয়ে থাকি, তাই বোধ হয় দয়া করে' সে আমাদের কিছুই বলে না। ভূতের সঙ্গে কি মানুষ পারে।"

চণ্ডী গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমায় ভাবতে দে! বলিস্ কি, শেষে কি ভূতের অস্তিত্বও আমায় মান্‌তে হবে!"

এমন সময় অপরিচিত কণ্ঠের ডাক আসিল, "বাবু, বাবু।"

অমল উত্তর দিল, "কে, কে?"

অপরিচিত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর আসিল, "মেহেরবানী করে' একবার বাইরে আসবেন বাবু।"

"দেখি, কে ডাকছে।" এই কথা বলিয়া অমল উঠিয়া দাঁড়াইল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দাসী সমস্ত মুখখানি ঘোমটায় ঢাকিয়া ঝড়ের মত কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং একটী কোণ আশ্রয় করিয়া বসিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কেবলই বলিতে লাগিল, "যাব না, যাব না কিছুতেই যাব না,—কেমন করে' নিয়ে যাস্, দেখ্‌ব, দেখ্‌ব।"

তিনজনে অবাক্ বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

বৈঠকখানার দরজা খোলাই ছিল, সেই দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া অপরিচিত লোকটি উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল "বাবু।"

তিনজনে ঘর হইতে বাহির হইয়া রকের উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

লোকটি বিনীতভাবে কহিল, "কসুর মাপ করবেন বাবু,—সারা সহর ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে তবে সন্ধান পেয়েছি বাবু, সে আপনার এখানে আছে।"

অমল কহিল, "তুমি কার কথা বলছ, কি চাও তুমি?"

লোকটি কহিল, "ওই যে শুনছেন না বাবু; বল্‌তে আরম্ভ করেছে, যাব না, যাব না—ওরই সন্ধানে এসেছি বাবু। ও জানে ওকে যেতেই হবে, তাই ও রকম করছে।"

অমল কহিল, "তুমি আমাদের ঝিয়ের কথা বলছ—ও তোমার কেউ হয় না কি?"

লোকটি কহিল, "হ্যাঁ বাবু, আমার পরিবার, আপনাদের বড় তক্‌লিফ্ দিয়েছে, না বাবু?—বাইরের ঘরের অবস্থা দেখে মালুম পেয়ে গেছি।"

চণ্ডীর চিন্তার সূত্র জোট পাকাইয়া যাইতেছিল, সেই জোট খুলিবার খেই পাইয়া সে যেন লাফাইয়া উঠিল, কহিল, "তুমি তা' হ'লে জান কে এই সব কাজ করে?"

লোকটি কহিল, "জানি বাবু, আমার পরিবার যেখানে যায়, সেখানেই এমনি সব হাঙ্গামা হয়।"

অমল ভাবিয়া দেখিল,—লোকটি ত ঠিক কথাই বলিতেছে—যেদিন ঝিকে রাখা হইয়াছে, সেই রাত্রি হইতেই এই হাঙ্গামাটা আরম্ভ হইয়াছে।

জটিল ব্যাপারটা যেন চণ্ডীর নিকট একেবারে সরল হইয়া গেল! ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে কহিল, "হুঁ, তা' হ'লে তোমার পরিবারই এই সব করে' বেড়ায়, সে মানুষ খুন করতেও পারে।

লোকটী কিন্তু হইয়া কহিল, "খুন করার কথা ত শুনি নি বাবু,—তবে নানারকম গোলমাল হয় তা' জানি।"

চণ্ডী উত্তেজিতভাবে কহিল, "বেশী মোহিনী-বিদ্যে জানে, লোকের চোখে ধুলো দিতে খুব ওস্তাদ। আমি ধরে' ফেলেছিলুম বলে' আমায় খুন করতে গেছল। তোমাদের দু'জনকে পুলিশে দিতে হবে।"

লোকটি নম্রভাবে কহিল, "আপনি রাগ করতে পারেন বাবু,—পুলিশেও দিতে পারেন। ও কি নিজে কিছু করে বাবু?"

চণ্ডী তেমনই উত্তেজিতভাবে কহিল, "সেইটেই ত ওর সবচেয়ে বজ্জাতি! ও দেখায় নিজে কিছু করে নি, অথচ সব ওই করে। তোমাদের মতলবটা কি শুনি,—ভয় দেখিয়ে কিছু আদায় করা?"

দুই কানে হাত দিয়া লোকটি কহিল, "রাম রাম বাবু, ও কি বল্‌ছেন—আপনাকে সত্যি করে' বলছি, আমার পরিবারের কোন দোষ নেই, সে এ সবের কিছু জানে না। তাকে যে সে পেয়েছে বাবু।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চণ্ডী কহিল, "কে, কি পেয়েছে? তুমি আমাদের কি মনে করেছ, বোকা, গাধা যা' ইচ্ছা বলে' চলে' যাবে। কতদিন ধরে এ ব্যবসা চালাচ্চ? কিন্তু জেন রেখ এই শেষ!"

লোকটি কহিল, "শেষ হ'লে ত আমি রক্ষে পাই বাবু, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাই হয়। আপনাদের দয়ায় একজন গুণীর সন্ধান পেয়েছি। ভরসা ত করি সে ছাড়িয়ে দিতে পারবে।"

বিদ্রূপভরে চণ্ডী কহিল, "ধরা পড়ে খুব আবোলতাবোল বকে' যাচ্ছ যে, সহজে নিষ্কৃতি পাবে তা' ভেব না।"

লোকটি কহিল, "যখন দায়ে পড়েছি, আপনার যা ইচ্ছে বলতে পারেন। মেহেরবানী করে' আমার কথাটা একবার শুনুন—গ্রামের সবাই এ ব্যাপার জানে, আপনাদের মত লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোক, আমাদের মত মুখ্যু ছোট লোক সবাই জানে—আমার কথায় বিশ্বাস না করেন তাদের শুধোবেন।"

চণ্ডী তিক্তকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা আচ্ছা, কি বলতে চাও, বল।"

লোকটি কহিল, "আমাদের গ্রামে জগা চাঁড়াল বলে' একটা লোক ছিল। সে সকলের অনিষ্ট করে' বেড়াত,—লোকে তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে থাকত বাবু,—মার-ধোর খেয়েছে, দুচারবার জেলও খেটে এসেছে, তার চরিত্র শুধ্‌রোলো না—তবে একটা দোষ তার ছিল না বাবু, সে মেয়েমানুষের ওপর নজর দিত না,—মদ-ভাঙ্‌ খেত, সব নেশাই সে করত, ওই দোষটা কেবল ছিল না, শেষে সে দোষটাও তাকে ধরল—"

বাধা দিয়া চণ্ডী কহিল, "তুমি যে দেখছি বেশ বড় রকমের গল্প ফেঁদে বস্‌লে,—এদিকে আসল কথাটাই যে চেপে যাচ্ছ।"

লোকটি এবার চটিয়া গেল; কহিল, "না শুনতে চান্ বলুন, আমি চলে' যাচ্ছি। আপনি দেখছি আমার কোন কথা বলতে দেবেন না,—শুনবেনও না, আর কেবলই গাল পাড়বেন—আমরা মুখ্যু ছোটলোক, তাই বলে' মনে করবেন না, আমরা জোচ্চোর মিথ্যেবাদী ঠক্।"

চণ্ডীর এতক্ষণে হুঁস্ হইল, কাজটা সে ভাল করে নাই, সব কথা তাহার শোনাই উচিত ছিল। লোকটির সহিত রূঢ় ব্যবহার করাও তাহার সমীচীন হয় নাই। অপ্রস্তুতের মত সে কহিল, "হ্যাঁ, আমারই দোষ হয়েছে—তুমি বল।"

লোকটির রাগ সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গেল। তেমনই নম্রকণ্ঠে সে কহিল, "অমন কথা বলবেন না বাবু। রাগ হবারই কথা,—কি রকম হাঙ্গামা বাধায় তা' ত আমি জানি। আমি কথাটা এইবার শেষ করে' ফেলি। হ্যাঁ, কি বলছিলাম? মনে পড়েছে। গ্রামের যুবতী মেয়েছেলের ওপর জগা নজর দিতে লাগ্‌ল—একদিন আমি বাড়ী ছিলাম না, সেই ফাঁকে রাত্রে সে আমার ঘরে ঢোকে। আমার পরিবার একলা শুয়ে তখন ঘুমোচ্ছিল—সে এসেই টল্‌তে টল্‌তে তার গায়ের ওপর পড়ে। তার ঘুমও ভেঙে যায়—জগাকে এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। দৌড়ে গিয়ে জগা তাকে চেপে ধরে—ইজ্জৎ আর রক্ষে হয় না দেখে, কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমার পরিবার শিয়রের কাছ থেকে রামদাখানা তুলে নিয়েই এক চোপ বসিয়ে দেয়। সেই এক চোপেই জগা শেষ হ'য়ে যায়।"

চণ্ডী, অমল ও সুধা তিনজনেই শিহরিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ!

লোকটি বলিতে লাগিল, "তারপর খুনের দায়ে আমার পরিবার ধরা পড়ল। পুলিশ চালান দিলে—দায়রায় গেল। সব শুনে জুরীরাও বল্লেন, জজসাহেবও বল্লেন,—ঠিক করেছে—কোন দোষ করে নি,—এ না করলে তার ইজ্জৎ রক্ষা হ'ত না।" বলিতে বলিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

একটু থামিয়া সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "আমার পরিবার ত বেকসুর খালাস পেয়েও গেল—সরকার থেকে দু'শ টাকা এনামও পেলে। সবই হল বাবু, কিন্তু শয়তান জগাটা মরেও ত তাকে ছাড়ল না। তার আর গতি কে করবে—আর ও সব লোকের গতিও হয় না! প্রেতযোনি হয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ছ'টা-আটটা মাস বেশ গেল, তারপর কোন্ ফাঁকে একদিন আমার পরিবারকে পেয়ে বস্‌ল। সেই থেকে, আমার পরিবারকে কেবল ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—আর আপনাদের কি বলব, আপনারা ত দেখছেন কি রকম সব অত্যাচার আপনাদের বাড়ী হচ্ছে। আপনারা সন্ধান নিয়ে দেখুন, ও যেখানে থাকে সেইখানেই ওই রকম হাঙ্গামা। ওর কোন দোষ নেই বাবু, সব ওই সয়তান জগার কাজ—মরেও সে শয়-তানী ছাড়ে নি। এক গুণীন্ আমায় একটা শেকড় দিয়েছেন—সেই শিকড় দেখলে ও বেরিয়ে আসতে পথ পায় না। আমার সঙ্গে ওকে যেতেই হবে—ও যতই কেন না বলুক না, এ আমার পরখ করে দেখা। আপনাদেরও এখনই দেখিয়ে দেবো বাবু।"

ভিতরের ঘর হইতে সেই রমণীটী তখন পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছিল, "ওরে, আমি যাব না, যাব না!"

মিতে

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অতীতকালের অন্ধকার গর্ভে এমন অনেক সুন্দর সুগন্ধময় লুপ্ত সাহিত্য-পুষ্প পড়িয়া আছে, যাহার সহিত গল্প-লহরী বর্ত্তমান নবীন পাঠক-পাঠিকার পরিচয় না থাকাই সম্ভব।

তাহাদের গঠনসৌন্দর্য্য ও গন্ধমাধুর্য্য বর্ত্তমানের বহু 'টব'-শোভিত ঋতুপুষ্প হইতে উচ্চস্তরের শিল্প নিদর্শন। অতীত ও বর্ত্তমানের পরিচয় আকাঙ্ক্ষায় প্রতিমাসে পুরাতন পত্রিকাগুলি হইতে একটি করিয়া গল্প সঙ্কলন করা হইবে। গঃ সঃ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামপুরের জমীদার পুত্র সুবোধকুমার ভৈরব নদের জলে কাগজের নৌকা ভাসাইতেছিল। নৌকা যখন খানিক দূর ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন সে একটা কঞ্চি দিয়া নৌকাখানি টানিয়া তীরের কাছে আনিতেছিল। এমন করিয়া সে ও তাহার নৌকা গ্রাম ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গেল।

গ্রামের বাহিরে আসিয়া বালকের চমক ভাঙিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, পাখীরা কলরব করিতে করিতে কুলায়ে ফিরিতেছে, কৃষকেরা মাঠের কাজ সারিয়া লাঙল কাঁধে বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। অপরিচিত স্থানে রাত্রি আসিল দেখিয়া সুবোধকুমারের প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাহার মা তাহার কাছে নাই, সে 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

সুবোধকুমারের সমবয়স্ক একটি বালক একগোছা ছোলার শাক হাতে করিয়া সেইদিকে আসিতেছিল· সে সুবোধকুমারকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোত্থেকে এসেচ ভাই? কোথায় যাবে?"

সুবোধ বলিল, "আমি পথ ভুলে গেছি—আমি বাড়ী যাব।"

বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোথায়?"

সুবোধ বলিল, "ইসলামপুর, জমীদারদের বাড়ী।"

বালক বলিল, "তুমি ভয় কোরো না, আমি তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেব। এখন আমাদের বাড়ী আমার মার কাছে চল।"

অপরিচিত স্থানে বন্ধুলাভ করিয়া সুবোধ চক্ষের জল মুছিল। বালক সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

সে বলিল, "আমার নাম সুবোধকুমার।"

বালক বলিল, "আমারও ভাই তাই নাম। ভারি মজা না! আজ থেকে তুমি আমার মিতে।"

সুবোধকুমারের মুখে হাসি ফুটিল। সুবোধ তাহার মিতের হাত ধরিয়া তাহাদের বাড়ীতে আসিল। ছোট্ট একতলা বাড়ী। বাড়ীর বাহিরে খানিকটা জমি পরিষ্কার করিয়া বেগুণের ক্ষেত করা হইয়াছে, বাড়ির দেয়াল বাহিয়া কুমড়োর গাছ উঠিয়াছে। বাড়ির ভিতর উঠানের একপাশে তুলসী-মঞ্চে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। আর একপাশে মাচার উপর শসা ঝুলিতেছে। ভিতরে দুইটি মাত্র ঘর—একটি ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে আর একটি ঘর অন্ধকার।

বালকদের গৃহ প্রবেশ শব্দে একটি স্ত্রীলোক ত্রস্তপদে যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আরে হাবলা, এসেছিস? আমি সন্ধ্যে থেকে ঘর আর বার করছি। এত দেরী করলি কেন? আমি ভেবে ভেবে মরছিলাম। সঙ্গে এ কে?

হাবলা বলিল, "মা, সেই কথাটাই আগে জিজ্ঞাসা করতে হয়। বল দেখি কে?"

মা বলিল, "আমি যদি তাই জানবো, তবে জিজ্ঞাসা করবো কেন!"

হাব্লা বলিল, "একটা আন্দাজ করে বল না।"

হাব্লার মা বলিল, "ক্ষ্যাপা ছেলে, এতে কি আন্দাজ করবো—তুই বল্ না কে?"

"বলবো, তবে বলবো, এ আমার মিতে।" এই বলিয়া হাব্লা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাব্লার মা হাবলার মুখে সব শুনিয়া সুবোধকে আদর করিয়া ঘরে লইয়া গেল। তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কোন ভয় নেই বাছা, আমরা তোমায় বাড়ী দিয়ে আসবো।"

হাবলা বলিল, "মা, মিতে 'মা মা' বলে কাঁদছিল।"

"বাছা আমার, বাবা আমার" বলিয়া হাব্লার মা সুবোধকে কোলের ভিতর টানিয়া লইল এবং স্বহস্তে তাহাকে খাওয়াইল—খানকতক শসা, একটু ছানা, একটু মোহনভোগ—বিধবার ঘরে আর কিছু ছিল না। খাওয়া হইলে হাব্লার মা পুত্রের হাত ধরিয়া এবং সুবোধ-কুমারের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে কোলে করিয়া জমীদার বাড়ী চলিল। জমীদার বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। দরওয়ান, চাকর-বাকর হাঁক ডাকে গ্রামখানি সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। গালপাট্টাধারী আকালী সিং দীর্ঘ যষ্ঠিহস্তে "খোকাবাবু কিধার গিয়া, খোকাবাবু কিধার গিয়া" বলিতে বলিতে একদিক দিয়া চলিয়াছে। চাকর-বাকর লণ্ঠন হাতে আর একদিক দিয়া ছুটিয়াছে।

এমন সময় হাবলার মা সুবোধকে কোলে করিয়া বাড়ীর ভিতর হাজির। গৃহিণী এতক্ষণ সপ্তমে স্বর চড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন, সুবোধকে দেখিয়া স্বর নামাইয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া, প্রশ্নের পর প্রশ্নে হাবলার মাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। সমস্ত শুনিয়া গৃহিণী উঠিলেন, চাবির গোছা ঝম্ ঝম্ করিতে করিতে উপরে গেলেন এবং খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া হাবলার মার হাতে দুইটা টাকা দিয়া বলিলেন, "ওগো ভালমানুষের মেয়ে, এই দু'টাকা দিয়ে তোমার ছেলেকে নতুন কাপড় কিনে দিও।"

হাবলার মা অপমানিত বোধ করিয়া "আমরা ভিখিরী নই গো—আমরা গেরস্তঘরের মেয়ে"—এই বলিয়া হাবলার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সুবোধ ছুটিয়া আসিয়া হাবলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, এ আমার মিতে! একে আজ আমাদের বাড়ীতে থাকতে বল।"

গৃহিণী হাব্লার মার উত্তর শুনিয়া রাগে গস্‌গস্ করিতেছিলেন। ঠাস্ করিয়া সুবোধের গালে চড় মারিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়া ছেলে মিতে পাতাবার আর লোক পাও নি? চল্ ওপরে চল্।" সুবোধ হাবলার গলা ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল। হাবলার চোখ ছল্ ছল্ করিতেছিল, সে আস্তে আস্তে মার সঙ্গে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

তারপর হাবলার সঙ্গে সুবোধকুমারের অনেকবার দেখা হইয়াছে। মাঠে ঘাটে সুবোধ হাবলার হাত ধরিয়া সমস্ত সন্ধ্যা সমস্ত সকাল বেড়াইয়া বেড়াইয়াছে। চাষাদের ক্ষেতে চাষাদের সঙ্গে আলু তুলিয়াছে, বাগানে ফুল তুলিয়াছে, নদীতে নৌকা ভাসাইয়াছে, পুকুরে মাছ ধরিয়াছে,—সুবোধের মা অনেক মারিয়া ধরিয়াও সুবোধকে পারিয়া উঠেন নাই। সুবোধ জলখাবারের যাহা পয়সা পাইত, খাবার কিনিয়া মিতেকে খাওয়াইত,—তাহার মিতেও তাহাকে বাড়ী লইয়া গিয়া মাকে দিয়া লুচি ভাজাইয়া মোহনভোগ তৈয়ারী করাইয়া খাওয়াইত। বিধবার এই হাবলা ব্যতীত সংসারে আর কেহই ছিল না। তাহার কিছু ভূসম্পত্তি ও নগদ টাকা ছিল, তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইত।

এইরূপে যখন সুবোধের সঙ্গে হাবলার বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে চলিয়াছে, তখন একদিন সুবোধ সন্ধ্যার সময় হাবলাদের বাড়ী আসিয়া বৃষ্টির জন্য সকাল সকাল বাড়ী ফিরিতে পারিল না; সেদিন হাবলা জেদ ধরিল, "মা আজ মিতে আমাদের বাড়ী থাক্—তুমি আজ খিচুড়ী কর।" মা, কিন্তু জমিদার গৃহিণীর স্বভাব জানিত—সেইজন্য একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হাবলাও কিছুতে ছাড়িবে না। তার মা বলিল, "আমরা গরীব

লোক, সুবোধ যদি আজ রাত্রে আমাদের বাড়ী থাকে, তা'হ'লে সুবোধকে ওর বাপ মা দু'জনেই খুব বকবেন, হয় ত মারবেন - সেটা কি ভাল।"

হাবলা তাই শুনিয়া সুবোধের মুখের দিকে চাহিল। সুবোধ মারের ভয় করিলেও মিতের বাড়ী একদিন থাকিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।

দুপুর রাতে হাবলাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়ার মত গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। কেহ দরজা ভাঙে, কেহ পাঁচিল টপকাইয়া উঠে। হাবলার মা বাহির হইয়া দেখিল—সকলেই জমীদার বাড়ীর লোক। তাহারা হাবলার মাকে দেখিয়া গালি দিয়া বলিল, "খোকাবাবু কোথায় আছেন শীগ্‌গির বল্!" সুবোধ বাহির হইয়া তাহাদিগকে অনেক বকিল, কিন্তু তাহারা সুবোধের কথা মোটেই গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, "মা ঠাক্‌রুণ হুকুম দিয়েছেন—মাগীর চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে যেতে।" হাব্‌লার মা তাই শুনিয়া বলিল, "চল আমি যাচ্ছি।"

সেই রাত্রে সুবোধ তাহার পিতার নিকট এমন মার খাইল, যাহা তাহার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই। সে মার খাইয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। গৃহিণী হাবলার মাকে বলিলেন, "ছোটলোক মাগী, তুই আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকিস্—তোর এত বড় আস্পদ্দা তুই জমিদারের ছেলেকে বাড়ীতে রাখিস?"

হাবলার মা বলিল, "দিদি, আমরা ছোটলোক নই—আমরা গেরস্থ"

জমীদার গৃহিণী নথ নাড়িয়া বলিলেন, "ওমা কি হবে! ছোটলোক নচ্ছার মাগী আমাকে বলে দিদি! আস্পদ্দা কম নয়! তুই না কি আমার ছেলেকে খিচুড়ী খাইয়েছিস! ওমা, কি ঘেন্নার কথা!"

হাবলার মা বলিল, "দিদি, আমারাও ভাল জাতের মেয়ে—আমাদের বাড়ী খেতে দোষ কি?"

কথা শুনিয়া গিন্নি তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ফের যদি আমার ছেলেকে নে যাস্ ত তোদের ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করবো!"

সুবোধ চোরের মত তাহার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে তাহার ঘুম হইল না—সমস্ত রাত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাবলা আর সুবোধের দেখা পায় না। সে সুবোধদের বাড়ীর আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, নদীর ধারে গিয়া বসে, বাগানে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে—কিন্তু সুবোধ আর আসে না। সে তাহার মিতের জন্য চারিখানি ঘুড়ী তৈয়ারী করিয়াছে। দুইখানি ভেলা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কঞ্চি কাটিয়া ভাল ছিপ তৈয়ারী করিয়াছে। নদীতে ছিপ ফেলিয়া ভাবে—সুবোধ এখনই পিছন হইতে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিবে, সে কিন্তু প্রথমেই বলিবে না যে, মিতে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিয়াছে। সে প্রথমে হরিদাস, গৌরসুন্দর, নিতাইচাঁদ আরও কত কি নাম করিবে, তাহার পর বলিবে মিতে। তখন উভয়ের মধ্যে মস্ত হাসাহাসি পড়িয়া যাইবে। ছিপে বড় মাছ উঠিলে হাবলা ভাবে, এ মাছটা মিতেকে দেখাইতে হইবে। তিন চারিদিন বাড়ীতে রাখিয়া মাছটা যখন পচিয়া যায়, দুর্গন্ধ ছোটে, তখন সে মাছটাকে ফেলিয়া দিয়া আসে। বাগানে গিয়া রাশিরাশি ফুল তোলে, টগর, বেল, মল্লিকা যুঁই—বড় একটা মালা গাঁথে, ভাবে মিতের গলায় দেব। যখন ফুলগুলি শুকাইয়া যায়—তখন হতাশ হইয়া মালাটি ফেলিয়া দেয়। আবার সন্ধ্যার সময় সুবোধের বাড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে—যদি একবার দেখা পায়—তবে ডাকিবে।

একদিন যখন হাবলা লুকাইয়া সুবোধদের বাড়ীর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেখিল, সুবোধদের বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে। কেহ ডাক্তার আনিতে ছুটিয়াছে, কেহ ঔষধ আনিতে চলিয়াছে, কেহ "বরফ আন" বলিয়া চীৎকার করিতেছে—লোকজন ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। হাব্‌লা শুনিল সুবোধের কলেরা হইয়াছে। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে উর্দ্ধশ্বাসে তাহার মা'র নিকট ছুটিয়া

গিয়া বলিল, "মা মিতের কলেরা হয়েছে। চল্ মা, দেখে আসি চল্।"

সেদিন মা ও ছেলে কাহারও খাওয়া হইল না। দুজনে জমীদার বাড়ী গিয়া জমীদার গৃহিণীর পায়ে ধরিল, বলিল, "আমরা সুবোধের শুশ্রূষা করবো।" জমীদার গৃহিণী আজ তাহাতে কোনও আপত্তি করিলেন না। হাবলা ও তাহার মা সুবোধের কাছে বসিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। তাহাদের শুশ্রূষার গুণেই সুবোধ যে এ যাত্রা রক্ষা পাইল সকলেই তাহা একবাক্যে বলিতে লাগিল। হাবলা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুবোধের কাছ ছাড়া হয় নাই।

সুবোধ যখন আরোগ্য লাভ করিল, তখন ডাক্তারকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল, একশত টাকা ব্রাহ্মণ দিগকে বিতরণ করা হইল, এবং প্রায় চারিশত টাকা খরচ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার পূজা দেওয়া হইল। তখন গৃহিণী ভাবিলেন, হাবলা ও হাবলার মাকে কিছু দেওয়া হইল না এই মনে করিয়া পাঁচটি টাকা হাবলার মাকে দিতে গেলেন। হাবলার মা বলিল, দিদি, আমরা ওর জন্যে আসি নি।

আবার সেই দিদি! গৃহিণী মুখভার করিয়া বলিলেন, "আমরা বাছা ওর বেশী দিতে পারবো না।" হাবলা ও হাবলার মা কোন কথা না কহিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

এবার হাবলার পালা। সে এই সাত আটদিন নিজের শরীরের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করে নাই। সে স্নান করে নাই, পেট ভরিয়া খায় নাই, রাত্রে ঘুমায় নাই। কলেরা সুবোধকে অব্যাহতি দিল, কিন্তু তাহাকে চাপিয়া ধরিল। হাবলার মা হাবলার জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না।

হাবলা ঔষধ খাইতে চাহিত না। কেবল বলিত, "আমার মিতেকে একবার এনে দাও, আমি তাকে দেখবো।"

হাবলার মা তিন চারিবার জমিদার বাড়ী গিয়া সুবোধের মার নিকট অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু কোন কিছুই খাটিল না। সুবোধের মা বলিলেন, আমার সুবোধ তোমাদের বাড়ী যেতে পারবে না বাছা, কেন বিরক্ত করছো। আমি বলছি সে যেতে পারবে না।" হাবলার মা কর্ত্তাকে গিয়া ধরিল, বলিল, "আমার ছেলে একটি বার সুবোধকে দেখতে চায়, সে একবার আমার সঙ্গে আসুক।" কর্ত্তা বলিলেন, "সুবোধের শরীর খারাপ, যেতে পারবে না।" হাবলার মা হতাশ মনে ফিরিয়া চলিল।

সুবোধ ঘরে বসিয়া হাবলার মার সকল কথা শুনিয়াছিল। সে খিড়কীর দরজা দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে হাবলার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

হাবলার মা তখন অর্দ্ধেক পথে। হাবলা সুবোধকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিছানায় উঠিয়া বসিল। সুবোধ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, "মিতে!" হাবলা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "মিতে!"

হাবলার মা যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন সুবোধ হাবলার মৃতদেহ বুকে করিয়া বসিয়া আছে।*

---

*'প্রবাসী,' বৈশাখ, ১৩১৮

সুইজারল্যাণ্ডে ক্লারাবো

[হলিউড্ বর্ত্তমান পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের গোপন রহস্য লোক। সেখানকার নরনারীর বৈচিত্রবহুল জীবনযাত্রার সত্য-ঘটনা—কল্পনা অপেক্ষাও মধুর—সাধারণ গল্পের অপেক্ষা চিত্তচমকপ্রদ। সেইজন্য প্রতিমাসে আমরা একটি করিয়া ছায়াচিত্র জগৎ সম্বন্ধে লেখা প্রকাশ করিয়া পাঠক-পাঠিকার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিব] গঃ সঃ

[চলচ্চিত্র-জগতে ক্লারাবো'র নাম বিশেষ ভাবে পরিচিত। ২৯শে জুলাই নিউইয়র্ক, ব্রুকলিন সহরে ক্লারাবোর জন্ম হয়। যখন স্কুলের ছাত্রী সেইসময়েই একটী সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় ইনি প্রথমস্থান অধিকার করেন। ফলে বহুবাধাবিঘ্নের পর এলমার ক্লিফটন পরিচালিত "ডাউন টু দি সি ইন স্পিস্ ছবিতে একটী ছোট ভূমিকা প্রাপ্ত হন। এরপর "ক্যামেলি" ও "গ্রিট" চিত্রে ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করার পর, হলিউড্ থেকে ডাকা আসে। হলিউডে সুবিখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক এলিনোর গ্লিনের চেষ্টায় তাঁর নিজের লেখা বইয়ে 'ইটে'র কঠিন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং এই ভূমিকাতেই ক্লারা তারকাশ্রেণীভুক্ত হন। এছাড়া হলিউডে তোলা তাঁর নানা ছবির মধ্যে ''উইংস্'' "ওয়াইলড পার্টি" "ডেন্‌জারাস্ কার্ভস্" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কথক-ছবির আবির্ভাবে তিনি চিত্রজগত থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর স্বামী রেক্সবেলের কাছে নেভেডায় চলে যান। কিন্তু ছায়ার মায়া কাটাতে না পেরে আবার ফিরে এসে "কল্ হার স্যাভেজ" ছবিতে অভিনয় করেছেন। ক্লারার বর্ত্তমানে তোলা ছবির নাম "হোপলা"।]

সে অনেকদিনের কথা—

তখন আমি খুব ছোট, তখন থেকে আমার মনে মনে প্রবল বাসনা ছিল ইউরোপের বিখ্যাত সুইজারল্যাণ্ড সেই চিরতুষার আর বহু হ্রদের দেশ দেখবার। কিন্তু তখন আমাদের যা অবস্থা তাতে বাড়ী থেকে কোথাও এক পা বেড়াতে যাওয়ার সাধ্য নেই—এত অর্থের অনটন। সুইজারল্যাণ্ড তো আমার কাছে তখন একটা রঙীন স্বপ্ন। আমাদের বাড়ীর কাছে কত ভ্রমণকারী আড্ডা গাড়তো—তাদের মুখে আমি মুগ্ধ নয়নে বসে বসে শুনতাম—ইউ-রোপের নানা দেশের কথা। হঠাৎ এক সময়ে এসে পড়তো সেই তুষার-রাজ্যের কথা। বর্ণনা শুনতে শুনতে আমি সারাদেহে একটা রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। সেইদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখতাম—আমি যেন জানালার ধারে কাঁচের আড়ালে ইজিচেয়ারে বসে বরফ পড়া দেখ্‌ছি। উঁচু পাহাড়ের গায়ে পর পর সাজানো "সালে" গুলি তাদের ত্রিকোণ ছাদ বরফে ঢাকা। গ্রামের পাশে সবুজ ঢেউ খেলানো মাঠ—সাদা হয়ে গেছে—পাইন বনের সবুজ রঙ বরফে ঢাকা—তুষারের অবগুণ্ঠনে সব কিছু ঢাকা পড়েছে।

তারপর ধীরে ধীরে আমাদের ভাগ্যচক্র ঘুরেছে—জীবনে

এসেছে নানা পরিবর্ত্তন। কোথায় ছিলুম পৃথিবীর কোন প্রান্তে পড়ে এক অজ্ঞাত বালিকা—আর আজ হয়েছি পৃথিবী-বিখ্যাত অভিনেত্রী। জীবনে আশাতীত অনেক কিছু পেয়েছি—এমন কী শতকরা নব্বইজন হলিউডের অভিনেত্রীর ভাগ্যে যা জোটে না—প্রেমিক স্বামী—আমি তাও পেয়েছি। রেক্সবেলকে আমি প্রাণ মন দিয়ে ভালবাসি আর সে যে আমায় কতখানি ভালবাসে তা আমি লিখে জানতে পারবো না। "ইট" গার্ল বলে সারাজগতে আমার নাম ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু কর্ম্মের চাপে শৈশবের অনেক আশা পূরণ হয় নি। কারণ অর্থের স্বচ্ছলতা থাকলেও আর সেই পূর্ব্বেকার চোখ দিয়ে তাদের দেখতে পাই না—মন দিয়ে তাদের অনুভব করতে পারি না। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের মায়া এখনও আমায় আকর্ষণ করে তাই যখন শীত নেমে এল—আমার মন ছুটলো সেই দেশের দিকে—আমার বাল্যের সেই স্বপ্নরাজ্য তুষারের দেশে। রেক্সকে ধরে বসলাম—এবার সুইজারল্যাণ্ডে যেতেই হবে সেও রাজী হয়ে গেল (এইখানে তোমাদের চুপি চুপি বলে রাখি আমায় কোন কথাই সে আজ পর্য্যন্ত অমান্য করেনি)

এইবার আরম্ভ হবে যে কয়দিন আমি সুইজারল্যাণ্ডে কাটিয়েছিলাম তারই বিবরণ। এইবার যা ব'লব সে সব সম্পূর্ণ আমার মনের কথা। কিন্তু সব কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয় কারণ সেই সব বিচিত্র ছোটখাট ভাব আর খুঁটিনাটির কথা ভাল করে গুছিয়ে লিখলে একটা বই হয়ে যাবে। কারণ সুইজারল্যাণ্ডে দর্শনীয় বস্তুর সংখ্যা খুব কম নয়—আর আমার লেখবার অবসরও বেশী নেই। আমি এখানে আমার ভ্রমণকালে লেখা ডায়েরী থেকে দু-চারটে পাতা তুলে দেবো। কিন্তু গোড়াতেই বলে রাখি আমি সাহিত্যিক নই—সুতরাং আমার লেখায় কথার ঠাসবুনোন নেই—বর্ণনার লীলা বৈচিত্র নেই আছে সেই সব জিনিষের সাদাসিদে বর্ণনা যেগুলো আমার মনে খুব ছাপ ফেলে ছিলো। এর ভেতরে অনেক অবান্তর কথা আছে—নানা ব্যক্তিগত অভিমত আছে—তারিখের গতানুগতিকতা নেই—তাই মনে হয় এ লেখা তোমাদের আনন্দ দিতে পারবে না।

তোমরা হয়ত অবাক হয়ে যাবে দেখে যে কী-কী জিনিষ আমার ভাল লাগে। হয়তো সকলের আশা যে আমি পুরাতন দুর্গ বা গির্জ্জার বর্ণনা দোব কিন্তু এই সব সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক গবেষণা আমার ভাল লাগলেও ডায়েরীতে এদের স্থান নেই। এই সবের বিবরণ জানতে হোলে গাইড বুক খুঁজতে পার—তাছাড়া আমার আগে এখানে অনুসন্ধিৎসু পর্য্যটকের অভাব হয়নি। এ ভিন্ন একটা দেশের যা কিছু বিখ্যাত সেগুলোর নাম তো আর কারুর কাছে সচরাচর অজানা থাকে না—এসবের জন্য অনেক বই আছে—প্রচুর গবেষণা আছে—কিন্তু আমার বক্তব্য এদের থেকে ভিন্ন—অত্যন্ত সরল।

আঠারই জানুয়ারী :—

সেণ্ট্ মরিত্‌স ওঃ কী সুন্দর জায়গা। কোন দেশ বা বস্তু দেখে এত আনন্দ আমার আর কখনও হয় নি। এখান কার বরফে ঢাকা পাহাড় সাদা পাইন বন সূর্য্যের মৃদু মিষ্টি আলো এদেশকে সব দেশ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। প্রথমে চারিদিকে চেয়ে চোখে যেন সাদার ছোঁয়াচ ধরে যায়। এখানে এসে একদিনেই আমার খিদে আর ঘুম বেড়ে গেছে। যাকে দেখি তার সঙ্গেই দুটো কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

বিশ-এ জানুয়ারী :—কাল প্রথম 'স্কী' চড়লাম। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। প্রথম প্রথম একটু বিশ্রী লাগলেও ক্রমশঃ সেটা সয়ে গেল। প্রথমদিনই আমি 'স্কী' খেলার যা' কিছু শক্ত কাজ আছে সেগুলো শিক্ষকের কাছে শিখতে চাইলুম। তিনি আমার প্রতি খুব খুসী—ভেবে দেখ—প্রথমদিনেই আমি তাতে চড়ে শূন্যে একটা ডিগবাজী খেয়ে একেবারে উপর থেকে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নীচে নেমে এলাম। কী ভয়ঙ্কর! যে সব পাহাড় তুমি লাফাবার এমনিতে কল্পনাও করতে পারো না—সেগুলোই একলাফে পার হয়ে যাবে। আমি আজ একটা চোদ্দশ' ফুট উঁচু খাড়াই পার হয়েছি। এখানে নানা দেশ থেকে ভ্রমণকারী জড় হয়—খেলতে—খেলা

দেখতে। তাদের দলে পড়ে আমিও মেতে উঠেছি। জীবনকে এমন ভাবে অনুভব আর কখনও করি নি।

তেইশ-এ জানুয়ারী :—আজ আর আমার পালা নয়—রেক্স আজ 'স্কী' করতে বেরিয়েছে।

শিক্ষকের মতে সে একজন দুর্দ্দান্ত ও পাকা খেলোয়াড়। (চুপি চুপি শোন—এ কথা শুনে আমার মনে কম গর্ব্ব হয় নি)। সে নানারকম খেলা দেখাতে লাগলো। অন্যে যা' করবে তারও করা চাই। সে ভালরকম কিছুই জানে না—তবুও চেষ্টা করবে। সব ভীষণ ভীষণ লাফ আর ডিগবাজী আর চক্র। দেখতে দেখতে আমি শুধু অবাক হয়ে যাই। বিকেলে সে স্থির করলে 'লুজ'-এ চড়ে শূন্যে ডিগবাজী খাবে। এ খেলাটা বড় ভয়ঙ্কর—মিনিটে মাইল জোরে যেতে যেতে ডিগবাজী—আর একটু বেকায়দায় পড়লেই—চিরবিদায়। আমি তো তা'কে নিষেধ করলাম—কিন্তু দুর্দ্দান্ত রেক্স সেই খেলা দেখাবেই দেখাবে। ভীষণ উৎকণ্ঠার মধ্যে তার খেলা শেষ হলো।

ছাব্বিশ-এ জানুয়ারী :—

সবে সকাল হয়েছে। বরফ পড়ছে—সমস্ত রাত তুষার বর্ষণের পর এখনও তার শেষ হয় নি। প্রভাতের আলো ভোরের আলোর মত স্তিমিত। সাদা ফুলের পাপড়ির মত বরফ ঝরছে। এ বরফ পড়া যে দেখে নি - তা'কে এ যে কী সুন্দর বোঝান অসম্ভব। হোটেলের বারান্দায় পায়চারি করছি—এমন সময় দেখা হলো ভিল্মা ব্যাঙ্কির সঙ্গে। তোমরা সকলেই ভিল্মাকে ভালভাবে চেনো। আজ কথক-ছবির যুগে ভিল্মার নাম আর শোনা না গেলেও একদিন ছিল যখন ভিল্মার নাম দর্শককে মাতিয়ে দিত। ভিল্মার সঙ্গে কে এয়েছে তোমরা সহজেই ভেবে নিতে পার—রড়-লারক—ভিল্মার স্বামী। একটা কথা শুনেছি হলিউডে না কি বিবাহবন্ধন বেশীদিন থাকে না—হয়তো সেটা সত্যি—কিন্তু এদের দুজনকে দেখলে অন্যরকম মনে হয়। আজ আমরা তার মানে, আমি—ভিল্মা আর অন্য দুজন এখানকার পরিচিত মহিলা—'স্লেজ' এ চড়ে বেড়াতে গেছলাম। রেক্স যেতে চাইলেও সঙ্গে নিই নি কারণ আমার মতে স্বামী-স্ত্রী অন্ততঃ দিনে চারঘণ্টা আলাদা থাকবে—তা'তে প্রেম সতেজ থাকে।

আটাশ-এ জানুয়ারী :—আজ এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যার জন্যে আমি ভগবান্‌কে শতসহস্র প্রণতি জানাচ্ছি। একজন ইংরেজ বিমানবিহারী এখানে এসেছেন—তিনি তাঁর এরোপ্লেনএ চড়ে বেড়িয়ে আসতে অনুরোধ করলেও আমি রাজী হয়নি। কারণ আকাশে ওড়া আমি পছন্দ করি না—প্রথম যেবার আকাশে উঠি সেবার অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলাম। আমরা না যাওয়াতে তিনিও গেলেন না—কিন্তু তার সহকারী আকাশে উড়তে গেল—এবং অত্যন্ত দুঃখের কথা পথে তার 'প্লেন' একটা পাহাড়ে ধাক্কা খায়—ফলে মৃত্যু।

একত্রিশ-এ জানুয়ারী :—আজ একটু আমোদ করবার জন্যে একজন ভদ্রলোক আমার একটা ফটো বিক্রীর প্রস্তাব করলেন—দামটা কোথাও দান করা হবে। আমি নিজেই ভাবতে পারি না—সে থানার দাম হাজার টাকা উঠলো। সেটা কিনলেন একজন ফরাসী ধনী ভদ্রলোক।

এখানকার এই মুক্ত জীবন আমায় দিনের পর দিন প্রলুব্ধ করছে। সমস্তদিন বাইরে বাইরে ঘোরা—ফলে প্রচণ্ড খিদে। রাতে আগুনের পাশে বসে গল্প করা বা নাচ বা তাস খেলা। এ এক নতুন জীবন আমার কাছে এর আস্বাদন অপূর্ব্ব। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এখানে অত্যধিক; আর সমস্ত ইউরোপে এইটাই আমায় সকলের চেয়ে আকৃষ্ট করে।

দোসরা ফেব্রুয়ারী :—দিনের পর দিন আমি 'স্কী' খেলায় উন্নতি করছি। শিক্ষকের মতে কিছুদিন অভ্যেস করলে আমি অলিম্পিক খেলায় নাম দিতে পারি। আমি খেলতে ভালবাসি এটা—আমার জন্মগত স্বভাব। একমাত্র আকাশে ওড়া ছাড়া সব খেলাই আমার পছন্দ—তারমধ্যে সাঁতার আর ঘোড়ায় চড়া প্রধান আর বর্ত্তমানে এই 'স্কী' করা।

এখানে বলে রাখি আর একটা জিনিষ আমি কোন

দিন ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারি নি—দর্শকের সামনে মুক্তভাবে কথা বলা।

এখানে এসে আমার আর নতুন অভিজ্ঞতা হলো—জন্তুদের আমি ভয় করতাম—সেটা দিন দিন কেটে যাচ্ছে। এখানে একটা 'সেণ্ট বার্ণাড' কুকুর এসেছে আমার ইচ্ছে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই কারণ তার সঙ্গে আমার ভীষণ ভাব হয়ে গেছে। কিন্তু এখান থেকে আমেরিকায় কুকুর নিয়ে যাওয়ার নানা গোলমাল। 'স্নুকি' বলে একটা ক্যাঙ্গারুও আমার ভক্ত হয়ে পড়েছে—কিন্তু আমার পোষা সাদা ইঁদুর 'পিঙ্কি'র সঙ্গে তার মিলবে না—তাই তাকেও নোয়া হলো না।

চৌঠা ফেব্রুয়ারী :—আমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল, কিন্তু মন যেতে চায় না। কাল আবার ম্যানেজারের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি—আজই আমায় প্যারী যেতে হবে কারণ দক্ষিণ ফ্রান্সে কিছুদিন কাটিয়ে আমরা নিউ-ইয়র্কে যাব। একবার 'মন্টিকার্লো' দেখবারও ইচ্ছে আছে। হয়তো পথে এর চেয়ে সুন্দর অনেক জায়গা আমাদের চোখে পড়বে কিন্তু সেণ্ট মরিত্‌সকে এই ক'দিনেই আমি ভালবেসেছি। এখানকার প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে এই ক'দিনে আবার আলাপ হ'য়ে গেছে—প্রত্যেকে যেতে বারণ করছে; এমন কী, পাইন গাছগুলোর মর্ম্মর-ধ্বনির ভেতর দিয়ে বলছে—"যেয়ো না, যেয়ো না!" বাল্যের আশা আজ আমার পূর্ণ হলো; স্বপ্ন রূপ পোলো! কিন্তু যতই দেখি প্রতিটী বস্তু আমার চোখে নতুন হ'য়ে ওঠে, দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে।

বিদায় সেণ্ট মরিত্‌স! আশা করি জীবনে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

অনুবাদক—শ্রীমণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ফল্গুধারা

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

সদ্যপিতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রী শৈশবে মা-হারা কল্পনাকে সঙ্গে লইয়া নীলিমা ভাগিনেয় অমরেশের গৃহে ফিরিয়া আসিল। অমর সম্মুখেই ছিল, কল্পনাকে দেখিয়াই মুখ বাঁকাইয়া বিরক্তির সঙ্গে বলিল, এই আবার এক আপদ এনে জোটালে মামীমা। একে পুষবে কে তাই শুনি?

নীলিমা যেন এই ধরণের কিছু একটা শুনিবার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাই ততটা বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইল না। ব্যথাভরা-দৃষ্টিতে শুধু পার্শ্বস্থিতা ভাগ্যহীনা মেয়েটীর দিকে চাহিল। নিতান্ত দুর্ভাগ্য তার, তাই পর-গৃহে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। আর কোন কথা বলিবার আগে মেয়েটীকে লইয়া নীলিমা ব্যস্তসমস্তভাবে স্থান ছাড়িয়া যাইবার পথ খুঁজিতেছিল। অমরেশ কিন্তু সে সুযোগটুকুও দিল না, রুক্ষদৃষ্টি নীলিমার দিকে রাখিয়া একভাবেই বলিতে লাগল, "কথায় বলে না 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে'।" তোমার হয়েছে তাই। নিজে তো বাবু সগোষ্ঠি মিলে আছ আমার ঘাড়ে, তার ওপর আর একটা পুষ্যি জোটালে কোন হিসাবে তাই বল ত? ওর খাওয়া পরার খরচ নেই? দেবে কে? তা' ছাড়া, বিয়ের বয়সও ত হয়েছে দেখ্‌ছি, সে ব্যবস্থাই বা করবে কে? তাতে রূপের যা' ছটা, বরপক্ষ দেখেই একশ' হাত দূরে পালাবে এ নিশ্চয়। বাবা, কি চেহারা!

সংকোচের সঙ্গে নিবিড় ব্যথায় কল্পনার কুশ্রী কাল মুখখানা যেন আরও কুদর্শন হইয়া উঠিল। চোখের প্রান্ত দুইটাও যেন ভিজিয়া আসিল। নিজের মধ্যকার রিক্ততার মাত্রা যত বেশী হোক্, অন্যের মুখে তার উল্লেখ শোনা কখনই কারও তৃপ্তিকর হয় না। তার মনোভাবটা অনুমান করিয়াই একটু অপ্রসন্নভাবে নীলিমা কহিল, চেহারার ভালমন্দ তো কারুর ইচ্ছাধীন নয় অমর, ভগবান ওকে সব রকমে বঞ্চিত করেছেন, নইলে এই বয়সে বাপ-মা যাবে কেন? লোকের দোরে অনুগ্রহ-প্রত্যাশী হ'য়ে আসবেই বা কেন? আমি কি ইচ্ছে করে ওকে এনেছি! নিজেই আছি তোমার গলগ্রহ হয়ে।"

"বেশ করেছ, উত্তম কাজ করেছ, আমার ঘাড়ে এনে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়েছ। জান কি না এ বড় শক্ত ঘাড়, কিছুতে ভাঙে না।"

"তা অমর তোমার তো টাকার অভাব নেই বাবা। একটা মেয়েকে খেতে দিতে কত খরচই বা পড়বে। একটা অনাথ মেয়েকে আশ্রয় —"

অমরের কণ্ঠস্বরে নীলিমার কথা অর্দ্ধপথেই থামিয়া গেল, "হয়েছে, হয়েছে, আর বাজে বকতে হবে না। তোমরা তো কেবল আমার টাকাই দেখ, তবু যদি থাকত দশ-বিশলাখ।"

এবার হাসিয়াই নীলিমা বলিল, "নেই?"

"না নেই। কোথা থেকে থাকবে তাই শুনি?"

"কোথা থেকে থাকবে তা জানি না, তবে আছে এটা জানি।"

"জানি? তা তো জানবেই, পরের টাকা সকলেই বেশী দেখে। তাই জন্যেই বুঝি নিজেরা সবাই মিলে আর তারপর যতসব আপদ-বালাই জুটিয়ে এনে আমার টাকার শ্রাদ্ধ করছ? কত হিতৈষী তোমরা" রাগ করিয়াই অমর স্থান ত্যাগ করিল।

সন্তর্পণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীলিমা চাহিল কল্পনার দিকে। একই বিপদে সর্ব্বস্বহারা দুইজন যেমন সমব্যথাভরাদৃষ্টি লইয়া চায় পরস্পরের দিকে, তেমনই ভাবে। ক্লিষ্টকণ্ঠে কল্পনা ডাকিল, "পিসীমা।"

"কল্পনা, মা, দুঃখ করিসনি, তোর ভাগ্য! নইলে—"

"পিসীমা, আমি ফিরে যাই, আমাদের সেই খড়ের ঘরখানা তো এখনও আছে, তার মধ্যে অন্ততঃ পড়ে থাকতে ত পারব, তারপর অদৃষ্টে যা আছে হবে।"

হাত বাড়াইয়া তাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া নীলিমা অশ্রুসজলকণ্ঠে বলিল, "তা যে হয় না মা!"

আঁচলে চোখ মুছিয়া গাঢ়কণ্ঠে কল্পনা বলিল, "কিন্তু আমার জন্যে তোমায় যে কষ্ট পেতে হবে। কত কথা—"

প্রাণহীন শুষ্ক হাসির রেখা ওষ্ঠ প্রান্তে টানিয়া নীলিমা বলিল, আমার ওতে কিছু কষ্ট নেই রে, ও আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওটা ওর স্বভাব। আমাকে ওর মামাকে চব্বিশ ঘণ্টাই অম্‌নি করেই কথা শোনায়; অথচ, আমাদের যে অযত্ন অসুখে রেখেছে বা ওই এক মুখের কথা ছাড়া কোন বিষয়ে কষ্ট দেয় এমন কথা যদি বলি তা হ'লে আমাদের পাপের সীমা-পরিসীমা থাকবে না। স্বচ্ছন্দে সুখেই আমরা আছি।"

"বলতে আর হবে না পিসীমা, বাড়ীতে পা দিতেমাত্রই বুঝেছি।" ব্যথিত স্বরে নীলিমা কহিল।

"তাই তোর জন্যেই ভাবছি মা, তুই কি করে এসব সহ্য করবি? এধরণের কথাবার্ত্তা শোনা তোর তো অভ্যাস নেই। কি আর বলব একটু বুঝে চলিস মা, তোর ওপর যেন বিরক্ত হবার সুযোগ না পায়। তবে শালগ্রামের শোওয়া-বসা বুঝবে কে, ওর সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট যে বোঝাই যায় না। মুখে কখন মিষ্টি কথা নেই, কি যে অদ্ভুত লোক! ওকে বোঝাই ভার।

"বলি মামীমা, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে হাতটা-মুখটা ধুয়ে একটু শান্ত-সুস্থ হয়ে তারপর সারাক্ষণ ধরে আমার সুনাম প্রচার কল্লেই কি ভাল হত না। আমি যে অতি খারাপ লোক, নতুন লোকটা এসেছে তাকে সে কথাটা ভাল করে জানিয়ে দিতে হবে বৈকি। তবে এতটা দূর থেকে এলে, তাই বলছি যে, ও কাজটা খানিক খণের জন্যে স্থগিত রেখে নিজেদের একটু ঠাণ্ডা করে নিলেই হয় ত হতো ভাল।"

অমরেশের আকস্মিক আগমন দুইজনকে যতটা চকিত করিল, তেমনই কুণ্ঠিত সন্ত্রস্ত করিল তার সুদীর্ঘ বাক্যাবলী। নীলিমার মুখখানা ছাইয়ের মত পাংশু বিমলিন হইয়া উঠিল। দুই চোখে দেখা দিল ব্যাকুল বিহ্বল শঙ্কিত দৃষ্টি। বাঁকা চাহনিতে একবার তাকে দেখিয়া লইয়া অমরেশ বলিল, "আমি জানি আমার নিন্দে করার মত রুচিকর প্রীতিপ্রদ কাজ তোমার আর দ্বিতীয় নেই, তাই তোমায় কিছু বলছি না। কিন্তু ওই যে কাকে একটা সঙ্গে করে এনেছ, ওর তো হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাওয়া দরকার, না ওকেও এর মধ্যেই তোমার শিষ্যা করে ফেলেছ।"

নীলিমা কষ্টে শুষ্ককণ্ঠে ভাষা ফুটাইয়া কহিল, "নিন্দের কথা কিছু তো বলি নি বাবা, এই বলছিলুম যে—"

"হ্যাঁ সে আমি জানি মামীমা। আর ওতে আমি কিছু মনে করি নি। ও-রকম একটু-আধটু বুঝিয়ে না দিলে কি চলে। আমি লোকটা যখন যথার্থই একটুও ভাল নয়, তখন তোমার কথায় কিছু মনে করাই আমার পক্ষে অন্যায়। যাক্, পরে প্রাণভরে বলো যা খুসি; কিন্তু আগে ওই মেয়েটাকে একটু সুস্থির হতে দাও। এসেছে যখন আমার বাড়ীতে, তখন আমাকেই এগুলো দেখতে হবে তো।"

"এই যে বাবা, যাই। কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে—"

অসংলগ্নভাবে আর দুই-একটা কথায় নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নীলিমা কল্পনাকে লইয়া বাড়ীর ভিতরে যাইতেছিল, অমর ডাকিয়া বলিল, "শোন মামীমা, একটা কথা—"

নীলিমা দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিল। অমরেশ বলিল, এ মেয়েটার জামা-কাপড় আছে তো? না থাকে বল: সরকার-মশায়কে বলে দিই কিছু কিনে আনতে।"

মাথা নাড়িয়া নীলিমা বলিল, "না এখন কিছু আনতে হবে না, ওর কাপড় আছে।"

"বলছ তো এখন আনতে হবে না, আর কাল দেখব ছেঁড়া কাপড় পরে ঘুরছে। তোমাদের আর কি? লোকে আমাকেই পাঁচ কথা বলবে। তার চেয়ে ঝঞ্ঝাটে কাজ কি বাপু, আনতেই বলি। যত সব আপদ আসে আমার ঘাড়ে, প্রাণ অন্ত আর কি! খরচেরও অবধি নেই, হাঙ্গামাও যথেষ্ট। এতেও কারুকে খুসী কর্ত্তে পারি না, কপাল আমার!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ মুখে চোখে এমন একটা হতাশময় ভঙ্গী আনিল, যাহা দেখিয়া অতি গভীর প্রকৃতি লোকের পক্ষেও না হাসিয়া থাকা দুষ্কর। কল্পনা ও নীলিমার ওষ্ঠে হাসির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেই অমর কহিল, "কারু সর্ব্বনাশ, কারু পোষ মাস। আমি মরি, তোমরা হাসছ।"

"যা রকম বাছা তোমার, না হেসে পারি কই? কিন্তু হাঁ। অমর, এতই যদি তোর জ্বালা, এত যদি ঝঞ্ঝাট, তা হ'লে আমাদের সব বিদেয় করে দিলেই তো পারিস।"

"তা বই কি, তা নইলে আরও ভাল করে লোকের কাছে আমায় ছোট কর্ব্বে কিসে? বলবে সবাই, এমন ভাগ্নে, অক্ষম মামাকে সে খেতে দেয় না। বেশ মামীমা, বেশ তোমার বিবেচনা! আমার যেমন দুর্ভোগ, তাই তোমাদের মত অকৃতজ্ঞদের বাড়ীতে রাখি।"

অত্যধিক রাগে অমরেশ দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া বসিল। ভৃত্য নিতাই দ্বারপ্রান্তে যেন তার প্রতীক্ষাতেই দাঁড়াইয়া ছিল। ভয়ে ভয়ে সে ডাকিল, "দাদাবাবু।"

"বলুন, বলুন, কি চাই আপনার বলে ফেলুন!"

প্রভুর এ-ধরণের কথাবার্ত্তায় ভৃত্য অভ্যস্ত। তাই নিতাই কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া একভাবেই বলিল, "বাইরে একদল ছেলে গান গেয়ে ভিক্ষে কচ্ছে। দুর্ভিক্ষ—"

"থাম্, থাম্ ব্যাটা উল্লুক, আর বলতে হবে না। কোথায় দুর্ভিক্ষ দাও তার জন্যে টাকা। টাকার গাছ আছে আমার? হাত বাড়াব আর ছিঁড়ে দেব, নয়? যত সব গুণ্ডার পাল, দলে দলে গান গেয়ে ভিক্ষে করা এক ধরণ হয়েছে। আইন করে ওদের ধরে জেলে দিতে হয়। এক পয়সাও দেব না। যেতে বল তাদের। দরওয়ানটা করে কি? ওদের বাড়ীর মধ্যে আসতে দেয় কেন?"

তথাপি নিতাই গেল না, দাঁড়াইয়া রহিল। অমর বলিল, "কি গেলি না যে? বলছি তো দেব না কিছু। যা তুই।

নিতাই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। "আচ্ছা দাঁড়া একটু। দেখি, মামীমা যদি কিছু দেন। ওঁর আবার বেশী দয়া কি না, জিজ্ঞাসা করে আসি।"

অমর ঘরের বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া নিতাইয়ের হাতে দুইখানা দশ টাকার নোট গুজিয়া দিয়া কহিল, মামীমা দিলেন। দিয়ে আয় ওই গুণ্ডার দলকে। মামীমার দয়া উছলে ওঠে কি না ভিখিরী দেখলে। আমি হ'লে চাবুক দিয়ে বিদায় করতুম। যাও, তাদের দিয়ে এস। বাবু ভিখিরীরা কি আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন, হয় ত চলেই গেছেন।"

নিতাই নির্ব্বিকারভাবে হাত পাতিয়া নোট দুইখানা লইয়া চলিয়া গেল। এ বাটীতে প্রার্থী কেহ আসিয়া নিরাশচিত্তে ফিরে না, এ সে জানে। অমর যেমন প্রার্থী দেখিলেই তাদের বিদায় হইতে আদেশ দিয়া যায়, অমনই অন্তরাল হইতে মাতুলানীর করুণার শীতল ধারা নিদাঘ তপ্ততার বুকে স্নিগ্ধ সরস বর্ষার বারির মত নামিয়া আসিয়া তাদের তৃপ্ত করে। আজও এর ব্যতিক্রম হইবে না জানিয়াই নিতাই প্রভুর বলা সত্ত্বেও যায় নাই, দাঁড়াইয়াছিল। সে চলিয়া গেলে একখানা মোটা বই খুলিয়া অমর পড়িতে বসিল। বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, পশ্চিম দিক্‌কার জানালাটা খোলা। অস্তরবির বিদায় কিরনের লাল আলো ঘরখানায় আবীর ছড়াইয়া দিয়াছে। ভিক্ষার্থীদলের মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি দূর হইতে তখনও ভাসিয়া আসিতেছিল। অমর বই রাখিয়া উঠিল।

নীলিমা দ্বারপ্রান্ত হইতে ডাকিয়া বলিল, "তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে অমর, খাবে এস।" অমর বিকৃতমুখে রুষ্টস্বরে কহিল, "নিজেরা আগে একটু সুস্থির হও, তারপর আমার ব্যবস্থা হবে। জ্বালাতন! কে বলেছে এসেই তোমায় আমার জন্যে ব্যস্ত হতে। যাও, নিজেরা ঠাণ্ডা হও গে।"

নীলিমা ভয়ে ভয়ে সরিয়া পড়িল।

রুক্ষ কঠোর প্রকৃতি ও দুর্ম্মুখতার জন্য অমরেশের বন্ধু-বান্ধব বলিতেও যেমন কেহ ছিল না, আত্মীয়স্বজনও তেমনই তার সান্নিধ্য সাধ্যমত এড়াইয়া চলিত।

বিমলেন্দু যে সপরিবারে তার আশ্রয়ে ছিলেন, সে নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই। যাকে বাঁধিয়া মারে তাকে সহিতেই হয়। উপায় নাই যার, সে করে কি? চিররুগ্ন সর্ব্ব কার্য্যে অসমর্থ, কোন সম্বল নাই, তাই বাধ্য হইয়াই ভগিনীর গৃহে তাঁকে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তারপর ভগিনী গত হইলে যখন মাতৃপিতৃহীন অমরেশই গৃহস্বামীর স্থান লইল, তখন চলিয়া যাইবার কথা বিমলেন্দু একবার তুলিয়াছিলেন। অমরেশই যাইতে দেয় নাই। সম্পূর্ণ একাকী সে, কে তাকে দেখিবে, কেই বা তার ঘর-সংসারের তদারক করিবে সেই অজু হাতে। বিমলেন্দু তাই রহিয়া গেলেন। কিন্তু অমরেশ গলগ্রহ বলিয়া নিয়ত যে ভাবে তাঁদের কথার স্বরে বিঁধিত, তাহাতে মরা মানুষও বুঝি সচেতন হইয়া উঠে। তবে সহিতে সহিতে আগুণের তাপও সহ্য হয়, বিষও জীর্ণ করা চলে। সময়ে তার কথার তাপ তাদের গায়ে আর জ্বালা ধরাইতে পারিত না। গোল বাধিল আবার কল্পনাকে লইয়া। ওই ভাগ্যহীনা গলগ্রহটাকে কত লাঞ্ছনা যে সহিতে হইবে ভাবিয়া নীলিমার উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। দুঃখ ভোগই যার ভাগ্যলিপি, তাহার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াই বা লাভ কি? -যেমন করিয়াই হোক্ তাহাকে সে ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

গৃহকর্ম্মের শেষে আপন ঘরে বসিয়া নীলিমা নানা কথাই ভাবিতেছিল। মুখর পায়ের শব্দে তাকে চকিত করিয়া অমর কাছে আসিয়া দাড়াইল। "আচ্ছা মামীমা, তোমার কি রকম বল দেখি? ওই মেয়েটাকে পাঠিয়েছ আমার ঘর ঝাঁট দিতে, বিছানা কত্তে, কেন নিতাই চাকরটা কি মরেছে? হরে? সেও যমের বাড়ি গেছে না কি?"

শঙ্কিতভাবে তার মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমা কহিল, "হরি দেশে গেছে বাবা। নিতাই একা কত কাজ কর্ব্বে, তাই ওকে বলেছিলুম তোমার ঘরটা—"

কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিরক্তভাবে অমর কহিল, "হরি দেশে গেছে যদি তো তার বদলে অন্য লোক রাখা হয় নি কেন? না, সে কাজটাও আমারই জন্য রাখা হয়েছে। আমি লোক ঠিক করব, তবে হবে? তোমাদের কারও দ্বারা তো কোন উপকার আমার হবার যো নেই। খাবার বেলাই সব আছ।"

আহতভাবে নীলিমা কহিল, "লোক রাখবার দরকার থাকলে আমিই তার ব্যবস্থা করতুম অমর, দরকার নেই তাই আর লোক রাখি নি।"

"দরকার নেই, কেন শুনি? সংসারের কাজকর্ম্ম সব উঠে গেছে না কি?"

"না উঠে নি, কিন্তু গলগ্রহ যখন এক জন বেড়েছে, তখন তার দ্বারা যতটা কাজ পাওয়া যায় সেটা করিয়ে নেওয়াই ভাল। তাকে যখন খেতে-পরতে দিতে হবেই, তখন আর বেশী টাকা খরচ করে অন্যলোক রাখবার দরকার কি? হরির কাজটা কল্পনাই কর্ব্বে এখন।"

অমরেশ স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নীলিমার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া কহিল, মামীমা, এই তোমায় প্রণাম কচ্ছি। এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এত হিসেব তোমার, এর তুলনা নেই জগতে! আমার ভাবনা হচ্ছে, জগতের ভাগ্যক্রমে তোমার মত মেয়েমানুষ বেঁচে থাকলে হয়! ধন্য ধন্য, শত ধন্যবাদ তোমায়! ওকে খেতে পরতে দিতে হবে বলে ঝি চাকরের মত খাটিয়ে নেবে?"

"তা কি করব বল, ওর যেমন ভাগ্য! শুধু শুধু বসিয়ে রেখে কে কাকে খেতে দেয়? যেটুকু তোমার আশ্রয় হয় তা' তো দেখতে হবে।"

অমরেশ এবার চেঁচাইয়া বলিল, "না, দেখতে হবে না। আমার অত উপকার করে কারুর দরকার নেই। কেন আমি কি বলেছি যে, চাকর না রেখে ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নাও। ওঃ, কি ভয়ানক লোক তোমরা! এমনি করে লোকের কাছে আমায় ছোট করতে চাও। বলবে এমন ছোটলোক যে, দুটো খেতে দেয় বলে দাসী-চাকরের কাজ করিয়ে নিচ্ছে। কি শত্রু তোমরা!"

এ সব কথা শোনা নীলিমার প্রতিদিনকার অভ্যাস, তাই উত্তর না দিয়া নীরবে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

মুখভাবে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। অমরেশ স্তব্ধভাবে কয়মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঈষৎ কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটা লেখা-পড়া কিছু জানে?"

"জানে, অল্প কিছু, দাদাই ওকে পড়াতেন।"

"বেশ, কাল থেকে একজন টিউটর আসবে ওকে পড়াতে। তার কাছে যেন ও পড়ে। বুঝলে? বলে দিও ওকে।"

নীলিমা বিস্মিতভাবে অমরেশের দিকে চাহিল। অমর যেন কিছু অপ্রতিভ হইল। অন্যদিকে চাহিয়া কহিল, "মেয়েটার রূপ তো ওই। অন্ধকারে দেখলে শিউরে উঠতে হয়। বিয়ের সময় হবে কি? লেখাপড়া একটু জানা থাকলে তবুও কতকটা আশা থাকে। আমাকেই তো কর্ত্তে হবে ওর বিদায়ের ব্যবস্থা, তাই। জ্বালা আর কি! কি সম্পর্ক, না মামীর ভায়ের মেয়ে। তার বিয়ে দিতে হবে আমাকে। কেন না আমার সামর্থ্য আছে। আছে বলেই দু' হাতে টাকা ছড়াতে হবে আমায়। গ্রহের ভোগ! যাক্, উপায় তো নেই। ঘাড়ে এনে যখন ফেলেছ, গতি তো কর্ত্তেই হবে। তাই বল্‌ছি, দয়া করে ওকে একটু পড়াশোনা করতে বল।"

এ কথাগুলার মধ্যে রুক্ষতার মাত্রা যত বেশী থাক, উদ্দেশ্য যা ছিল তাহা নীলিমার বা কল্পনার পক্ষে অনুকূলই। তাই ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং কিছু খুসী হইয়াই নীলিমা বলিল, "বেশ তো, ওর পড়ার ব্যবস্থা যদি করে দাও, তা হলে পড়বে বৈকি। কিন্তু তাও তো খরচ আছে, মাষ্টারের মাইনে—বই?"

"বল্‌লুম তো গ্রহের ভোগ! মূর্ত্তিমান শনিগ্রহরূপী তোমরা যখন ঘাড়ে চেপে আছ, তখন টাকা যে জলের মত খরচ হবে, তাতে আর বৈচিত্র্য কি? বড় রকম একটা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে যেমন ছোট ক্ষতিকে সহ্য করা, এই আর কি। নইলে ও পড়ুক না পড়ুক, সে জন্যে তো আমার আর ঘুম হচ্ছিল না"

কল্পনা যে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নীলিমা বা অমর তাহা লক্ষ্য করে নাই। ধীরস্বরে সে বলিল, "আমি পড়ব না।"

বিস্মিত চকিতভাবে অমর তার দিকে চাহিল; বলিল, "পড়বে না; কেন তাই শুনি? ওই তো রূপ, লেখা-পড়া যদি একটু না জানা থাকে তা হ'লে কেউ যে বে কর্ব্বে না তা জান?"

"জানি, কিন্তু বে যে কর্ত্তেই হবে এমন কথা নেই।"

"নেই না কি!" অমর কৌতুকভরে বেশ একটু মনোযোগের সঙ্গেই খানিকক্ষণ কল্পনার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "হিন্দুর ঘরে চিরকুমারী থাকার প্রথা তো এখন আর চলিত নেই।"

"আজ নেই, দু'দিন পরে হবে, চালালেই চলবে।"

"আগে ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যে গানবাজনা করাই ছিল নিন্দনীয়। এখন গানবাজনা না জানাই মেয়েদের পক্ষে অসভ্যতা। নাচ জিনিষটা আগে শ্রেণী-বিশেষের মেয়েদের মধ্যে চলিত ছিল, এখন কত ভদ্রঘরের মেয়ে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার লোকের সামনে নেচে গেয়ে বাহবা নিচ্ছে। কিছুদিন পরে হয় ত দেখব সাধারণ নর্ত্তকী বলে কিছু আর থাকবে না। ভদ্র-ঘরের মেয়েরাই ও-কাজটা নিয়েছে। এ আর্টের যুগে এটা—না হওয়াই আশ্চর্য্য। তা তুমি তা হ'লে কুমারী হ'য়ে আজীবন থাকতে চাও?"

"হাঁ।"

"ভাল, ভাল! কিন্তু চিরজীবন বসে তোমায় খাওয়াবে কে?"

কল্পনার মুখখানা শুকাইয়া উঠিল। এ কথাটা এতক্ষণ একবারও সে ভাবে নাই। তার দিকে চাহিয়া শ্লেষভরা-কণ্ঠে অমর কহিল, "তেমন শিক্ষিতা নও যে, কিছু একটা কাজ কর্ব্বে? অথচ বলছ বে কর্ব্বে না। খরচটা তোমার চলবে কোথা হ'তে তাই শুনি?"

কল্পনা নীরব রহিল। শুষ্কভাবে একটু হাসিয়া নীলিমা বলিল, "ওর কথা ছেড়ে দাও অমর, তুমি টিউটরকে আসতে বল, পড়বে ও।"

মুখ তুলিয়া এবার নীলিমার দিকে চাহিয়া কল্পনা কহিল, "কিন্তু কেন পিসীমা অনর্থক ওঁর খরচ বাড়ান?"

নীলিমা কথা কহিবার পূর্ব্বেই অমর বলিল, "আচ্ছা

ঠাকরুণ, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। তোমায় যা বলা হচ্ছে তাই কর। এত যদি দয়া, তবে আমার স্কন্ধে এসে ভর করলে কেন তাই শুনি?"

"অন্যায় হয়েছে। একশবার অন্যায় হয়েছে। আগে যদি জানতুম আপনি এমন লোক, তা হলে কি আসতুম।"

"শুনে বাধিত হলুম। কিন্তু আসতে না, থাকতে কোথায়? খেতে কি? চুরী কর্ত্তে? না ভিক্ষে?"

অগ্নি-দৃষ্টিতে একবার অমরের দিকে চাহিয়া কল্পনা পরক্ষণেই কাঁদিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি আপনার বাড়ীতে এসেছি যখন, তখন যা খুসী বলতে পারেন আপনি। কিন্তু এটা জানবেন, গরীব হলেই মানুষ নীচ হয় না। অনেক অর্থহীন লোকের মধ্যে এমন মহত্ত্ব আছে, যার শতাংশের একাংশও নেই আপনাদের মত স্বার্থপর বড় মানুষদের ভেতর।"

অমর বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে কল্পনার অশ্রু-সজল ক্ষুব্ধ মুখখানার দিকে চাহিয়া হাসিমুখেই কহিল, "বাঃ, তুমি তো বেশ কথা জান দেখছি! আমি তো ভাবছিলুম, তুমি কথা বলতেই জান না। কিন্তু গরীবেরা যদি এত মহৎ, তবে যত চুরী-জোচ্চুরী ডাকাতি এসব করে কারা? বড় লোকে? আমি তো গরীবদের মানুষ বলেই ভাবি না।"

"সংসারে আপনার মত লোকের মতামতের মূল্য খুব বেশী নয় সেটা জানবেন।"

কল্পনা চলিয়া যাইতেছিল, অমর ডাকিয়া বলিল, "শোন, শোন, একটা কথা বলি। একটা উপদেশ শুনবে? যখন রাগ হয়, তোমার তখন সে ভাবটা আর মুখে ফুটিয়ে তুলো না। একেই তো ওই সুন্দর মুখ, ওতে রাগের প্রকাশে যা ছবি দাঁড়িয়েছে সে একেবারে চমৎকার! ঘরে গিয়ে বরং আর্শিতে দেখ। বাস্তবিক মানুষ দেখ্‌তে এত বিশ্রী হয় আমার ধারণা ছিল না।"

কল্পনা একবার জলন্তদৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়াই ত্রস্তপদে স্থান ত্যাগ করিল। অমরেশ ফুল্লমুখে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

ক্ষুব্ধভাবে নীলিমা কহিল, "চেহারা ভগবান যাকে যেমন দিয়েছেন তা' নিয়ে বারবার বলে কি লাভ তোমার। শুধু লোকের মনে কষ্ট দেওয়া বই ত নয়।"

"বা রে, সত্যি কথা শুন্‌তে আবার কষ্ট কি? যে যে রকম তা লোকে বলবে না? এই যে আমি অতি বদ্-লোক তোমরা সবাই দিন-রাত বল, তা'তে কি আমি রাগ করি? যাক্। মামীমা, তোমার রূপসী ভাইঝিকে বলো, কাল থেকে অনুগ্রহ করে যেন পড়তে আরম্ভ করেন। আর তুমি দয়া করে একজন চাকর রাখবার ব্যবস্থা কর। ওকে দিয়ে যেন কাজ করিয়ে আমার খ্যাতির মাত্রা বাড়িও না।"

কল্পনা হয় ত কাছেই কোথাও ছিল, ঠিক অমরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি বড়লোক যখন, তখন অখ্যাতিকে এত ভয় কেন? বড়লোকেরা তো ও সব গ্রাহ্য করে না।"

অমরেশ কতকটা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তারপর পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "গ্রাহ্য না করাই উচিত। কিন্তু—"

"আপনার যেমন কিন্তু আছে, আমারও থাকতে পারে। গলগ্রহ যখন হয়ে পড়েছি, তখন আপনার খেতেই হবে। কিন্তু যতটা সম্ভব আপনার ভাত-কাপড়ের দাম পরিশোধ না করলে চলবে কেন? চাকর রাখা হবে না। আমিই আপনার চাকরের সব কাজ করব।"

নীলিমা সাশ্চর্য্যে চাহিলেন কল্পনার দিকে। অমরের মুখের উপর এত নির্ভয়ে কথা শুনাইয়া দিতে কেহ যে পারে এ ধারণা তার ছিল না। পরক্ষণেই শঙ্কা জাগিল এই উদ্ধত মেয়েটার কথার উত্তরে অমর কি কঠিন কথাই না জানি তাকে বলিয়া উঠে। কিন্তু আশ্চর্য্য, অমর কিছু বলিল না। নীলিমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ভাইয়ের মেয়েটী কথা বলতে শিখেছিলেন কোন স্কুল থেকে মামীমা? চমৎকার বলতে পারে তো!"

নীলিমাকে কথার উত্তর দিতে হইল না; কল্পনাই বলিল, "গরীবের মেয়েদের স্কুল-কলেজে গিয়ে তো শিক্ষা হয় না, তারা শেখে প্রকৃতির পাঠশালা থেকে, জানলেন।"

অমর একবার শুধু তার দিকে চাহিল। তারপর

নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শোন মামীমা, আমি সরকারকে বলে দিচ্ছি, এখনি যেন একজন চাকর দেখে ঠিক করে। তোমার ওই সুন্দরীকে যদি কোন কাজ কর্ত্তে দেখি এরপর, তা' হ'লে কিন্তু তোমাদের কারও ভাল হবে না। তা' ছাড়া, গলগ্রহ ঋণ-পরিশোধ—এমনি ধারা বড় বড় কথা শোনবার অবসরও আমার নেই। আমার বাড়ীতে থাক্‌তে গেলে চল্‌তে হবে আমার মতে, বুঝেছ ?"

নীলিমা নীরবে মাথা হেলাইল।

বিকালবেলা অমর বেড়াইতে বাহির হইতেছেন, বিমলেন্দু আসিয়া বলিলেন, "অমর, এধারে একটু এস তো।"

বাহিরের দিক্‌কার একটা ঘরে বসিয়া বিমলেন্দু কি কতকগুলা কাগজ দেখিতেছিলেন। অমর আসিয়া টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইল। কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া বিমলেন্দু বলিলেন, "মাধববাবুর নামে নালিশ করবার কথা ছিল, হয়েছে সেটা ?"

ভয়ানক রকম একটা যেন ভুল হইয়া গিয়াছে এমনই একটা ভাব ফুটিয়া উঠিল অমরেশের মুখে। ব্যস্তভাবে বলিল, "তাই তো মামা, ভারী ভুল হয়ে গেছে তো আমার ও কথা একেবারে স্মরণই ছিল না। তুমি কেন আমায় মনে করে দিলে না।"

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে দারুণ বিস্ময়ে বিমলেন্দু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিলেন, "বল কি, নালিশ কর নি! সব তামাদি হয়ে গেল যে!"

"কি জানি মামা, ভুল হয়ে গেছে।"

"ভুল! দশ-বারহাজার টাকা একেবারে বেমালুম বেশ ভুলে বসে রইলে, আবার বল্‌ছ আমি কেন মনে করে দিই নি? আমি তো প্রত্যহ বলছি। তুমি বল, আচ্ছা, হবে এখন। আর ভুল্‌লে চল্‌বে না, কালই নালিশ করে দিতে হবে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অমর বলিল, "যাক গে মামা, লোকটার সম্বল ওই বাড়ীখানা। টাকা দিতে হ'লে ও বাড়ী বিক্রী করা ভিন্ন আর উপায় নেই।"

"তা নেই সত্যি, কিন্তু তাই বলে অত টাকা ছেড়ে দেওয়া ত যায় না।"

"না, হ্যাঁ, তা মামা, থাক গে। লোকটা গৃহহীন হবে। মামীমা বলছিলেন, 'মানুষকে গৃহহীন করার মত পাপ আর নেই'!"

"কে বলছিল? কে বলছিল? তোমার মামীমা? সে আবার কখন বললে? তোমাদের কোন্ বিষয়েই বা সে কথা বলে? এ্যাঁ!"

অতি বিস্ময়ে বিমলেন্দু ভাগিনেয়ের দিকে চাহিলেন।

অমর অপ্রতিভভাবে কহিল, "না না, মামীমা বলেন নি। কিন্তু কে যেন বলছিল। তবে কথাটা সত্যিই বাড়ীখানা গেলে লোকটা থাকে কোথায় বলুন—যাক্ গে, সামান্য ক'টা টাকা তো। ও না হয় গেলই।"

বিস্ফারিত-নেত্রে কিছুক্ষণ তার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিমলেন্দু কহিলেন, "তোকে বাপু আমি বুঝে উঠতে পারলুম না। এদিকে দেখি একটা পয়সা তোর গায়ের রক্ত। ওদিকে এমন ভাবে টাকা নষ্ট করিস যে, বলবার নয়। গেল মাসে তিনখানা হ্যাণ্ডনোট ফেললি হারিয়ে, আবার এতগুলো টাকা, দশহাজার আসল, সুদ কোন না দু'-তিনহাজার হবে। বার-তের হাজার টাকা বলিস কি, ছেড়ে দিবি? ওসব ছেলেমানুষী রাখ। কালই মাধব দত্তর নামে নালিশ করে দিবি!"

"সে আর হবে না মামা। কাগজ-পত্র সব আমি তাঁকে কাল দিয়ে দিয়েছি।"

"দিয়ে দিয়েছিস!"

নির্ব্বাক হইয়া মাতুল অমরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিপন্নভাবে অমর বলিল, "কি করি, বড় কান্নাকাটি করতে লাগল। তা ছাড়া দেখলুম, তমসুক ত তামাদি হয়েই গেছে, কাজে ত আর লাগবে না, ফাঁকতালে একটু নামই কিনে নেওয়া যাক্। দিলুম গম্ভীরভাবে সব ফেলে।" বলিয়া আর কিছু শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

বিমলেন্দু আপন-মনে প্রকাণ্ড রাগের ভরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "কর বাপু তোর যা খুসী, আমার কি?

নেহাৎ আছি তোর বাড়ীতে, তোর খাচ্ছি পরছি, তাই ভালমন্দ দেখি। নইলে আর কার কি? অতি হতভাগা!"

বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া মলিনবসন এক ব্যক্তি নিতাইকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিল। অমরকে দেখিয়াই সশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। লোকটীকে দেখিয়া ভদ্রশ্রেণীর বলিয়া বোধ হয়। তবে ম্লান ছিন্নবেশে মেঘাবৃত আকাশের মত তার ভদ্রত্বের চিহ্নটুকুও যেন অবলুপ্তপ্রায়। মুখে-চোখে একটা করুণ ক্লিষ্টভাব। অমর জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিল। কুণ্ঠিত ভাবে লোকটা বলিল, "আমি এই পাড়াতেই থাকি, নিতান্ত দায়গ্রস্থ হয়ে এসেছি—"

কথা শেষ হইবার আগেই স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষকণ্ঠে অমর কহিল, "আমার কাছে দায়গ্রস্থ না হয়ে কেউ আসে না সে আমি জানি। তা আপনার প্রয়োজনটা কি শুনি?"

তার কথার ধরণে লোকটার সংকোচজড়িত ম্লান কৃশ মুখখানা আরও মলিন হইয়া আসিল। সন্ত্রস্তভাবে বলিল, "আপনার পিতা স্বর্গীয় কর্ত্তা-মশায়ের কাছে এসে তো কখনও নিরাশ হই নি। তার মত দয়া—"

এবারও বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই অমর বলিল,"হ্যাঁ, তা জানি। তাঁর বড় দয়া ছিল, তাই যথাসর্ব্বস্ব দান-খয়রাত করে আমায় পথে বসিয়ে গেছেন। আর যত সব ছোট-লোকদের স্পর্দ্ধা দিয়ে গেছেন বাড়িয়ে। এখন আপনার উদ্দেশ্যটা কি তাই বলুন দয়া করে।"

অমরের কথা শুনিয়াই লোকটী যাহা বলিতে আসিয়াছিল, সে কথা বলিবার ইচ্ছা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। কোনমতে স্থান ত্যাগ করিবার সুযোগই সে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু সহজে ছাড়িবার লোক অমর নয়; তাড়া দিয়া বলিল, "কই মশায়, কি বলবেন বলুন না। বোবা হয়ে যান কেন?"

"আজ্ঞে।"

"আজ্ঞে, কি বলতে এসেছেন, বলুন দয়া করে। বাধিত হই শুনে।"

নিরুপায় হইয়া লোকটী বলিল, "বড় গরীব আমি। তিনটী মেয়ে। বড়টীর বে না দিলে নয়। অনেক কষ্টে সম্বন্ধ স্থির করেছি। গরীবের উপর দয়া করে তাঁরা বিশেষ কিছু নেবেন না। তবুও খরচ আছে তো? তাই এসেছিলুম, যদি গরীবের উপর দয়া হয় আপনার। সামান্য কিছু—"

"না মশায়, আমি কিছু দিতে পারব না।"

"আজ্ঞে বড় গরীব আমি, সামান্য কিছু—"

"কিছু না কিছু না, আপনি গরীব তা আমি কি করব।"

লোকটীর মুখে-চোখে আহত ভদ্রত্বের সঙ্গে নৈরাশ্যের ক্ষুব্ধ ব্যথা সুগভীর ছায়া ফেলিল। একান্ত দীন অবস্থা বলিয়াই ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে। তথাপি এতগুলা রূঢ় কথার পর প্রার্থনার বাণী পুনরায় উচ্চারণ করিতে মন না চাহিলেও হয় ত আপনার একান্ত নিঃস্ব অবস্থার কথা ভাবিয়া আবার কি বলিতে যাইতেছিল। অমর তাড়া দিয়া উঠিল, "বলছি তো, কিছু হবে না। বাড়ী যান না মশায়।"

আর কথা না বলিয়া নীরবে নমস্কার করিয়া লোকটী ফিরিল। কয় পা যাইতেই অমর ডাকিল, "ও মশায়, শুনুন, শুনুন।"

লোকটী বিস্মিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল। অমর বলিল, "দাঁড়ান একটু, দেখি মামা যদি কিছু দেন। তাঁর আবার এসব অভ্যেস আছে কি না। আমি কাউকে কিছু দিই না।"

দ্রুতপদে অমর বাড়ীর মধ্যে গিয়াই ফিরিল। খানকতক নোট আনিয়া লোকটীর হাতে দিয়া কহিল, "যান, বাড়ী যান।"

লোকটী দুই-চারিটাকার বেশী আশা করে নাই; তাও সন্দেহের মধ্যে। পরিবর্ত্তে নোটের গোছা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইল। খুলিয়া একবার দেখিয়া লইয়া জড়িত-স্বরে বলিল, "দু'হাজার টাকা!"

অমর খিচাইয়া উঠিল, "হ্যাঁ, দু'হাজার টাকা, কি হয়েছে তা'তে?"

বিহ্বলভাবে লোকটী কহিল, "এত টাকা তো আমার দরকার নেই।"

"আজ নেই, কাল দরকার হবে তো? তিনটী মেয়ে বল্লেন না? দু'দিন পরে আসবেন তো তাদের জন্যে ভিক্ষে কর্ত্তে! তাই সে টাকাটা মামা আগেই দিয়ে দিলেন। যান এখন।"

অন্তর যখন ভরিয়া যায়, ভাষাও তখন আপনাকে হারাইয়া ফেলে। সীমাহারা বিস্ময় ও নিবিড় কৃতজ্ঞতা এই দরিদ্র ভদ্রসন্তানটীকে ক্ষণেকের জন্য মূক করিয়া ছিল। তার অন্তরের ভাষা জ্ঞাত রহিলেন একমাত্র শুধু অন্তর্য্যামিই। কোটরগত নিষ্প্রভ দৃষ্টিটায় দুই চোখ ঝাঁপাইয়া অশ্রুর ধারা বড় বড় করিয়া ফোঁটায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অমর কহিল, "একটা কথা মশায়, আপনি যেন একথা পাড়াশুদ্ধ লোককে বলে বেড়াবেন না, কিম্বা মামার কাছে গিয়েও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস প্রকাশ কর্বেন না। তিনি এ সব মোটেই পছন্দ করেন না। আচ্ছা, আসুন তবে।"

লোকটী নীরবে মাথা নোয়াইয়া বাহির হইয়া গেল। তার সারাচিত্ত তখন সেই দয়ালু লোকটী, যিনি নিঃশব্দে তার মাথা হইতে এতবড় দুর্ব্বহ দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, দুঃখের বোঝাটা নামাইয়া দিয়াছেন, সেই অদেখা মহান চিত্ত লোকটীর ঐকান্তিক কল্যাণ কামনায় ভরিয়া গিয়াছিল।

অমরের বিবাহ আসন্ন। বাড়ীতে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পাত্রী অপূর্ব্ব সুন্দরী। ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। বিমলেন্দু খুসীমনে বিবাহের বাজার করিতে গিয়াছেন। অন্তঃপুরে নীলিমাও কল্পনার সাহায্যে খুঁটি-নাটি সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিতেছে। ব্যস্ততার সীমা-পরিসীমা নাই। অমরও খুব ব্যস্ত।

মধ্যাহ্নে কল্পনার সাহায্যে নীলিমা ফর্দ্দ মিলাইয়া আনীত দ্রব্যাদি তুলিয়া রাখিতেছিল। অমর আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। বিমলেন্দু ঘরের একপাশেই একখানা ছোট কাঠের টুলে বসিয়া আর কি কি আনিতে হইবে সেই কথাই পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। অসময়ে অমরকে এখানে দেখিয়া তিনি একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কিছু দরকার আছে না কি?"

"আছে।" বলিয়া অমর ভূমিতলেই বসিয়া পড়িল। স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ কার্য্যরতা কল্পনার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিমলেন্দুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ওর না কি কোথায় বের ঠিক হয়েছে?"

"হ্যাঁ, এই কাছেই। দেবেন মিত্তিরের বড়ছেলের সঙ্গে। অল্পকিছু দিলেই হবে বল্লেন। শ' পাঁচেক টাকাতেই হবে।"

"তাই জেনে-শুনে সেই বিশ্ববখাটে, রাজ্যের লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা ছেলেটার হাতে ওকে চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলে! তোমরা ওর খুব হিতৈষী তো!"

আহতভাবে বিমলেন্দু বলিলেন, "করি কি বল, তা' ওর চেয়ে ভালছেলে কোথায় পাওয়া যাবে? ওই যে জুটছে, এই ভাগ্য! মেয়ের না আছে রূপ, না আছে—"

"তাই বলে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে হবে ওকে। আমার বাড়ীতে ও আছে, এখান থেকে বে হবে। ওই রকম একটা বাঁদর ধরে যে তার গলায় ওকে ঝুলিয়ে দেবে সে চল্‌বে না। লোকে আমাকেই দুষবে। কাজেই নিজেকে বাঁচাবার জন্য একটু বেশী কিছু দিতে আমি রাজি আছি। তুমি চেষ্টা কর, যাতে ভাল ছেলে মেলে। যত টাকা লাগে আমি দেব।"

আগ্রহভরে বিমলেন্দু বলিলেন, "একটী ছেলে আছে অমর, সাধ্যের অতীত বলে এতদিন চেষ্টা করি নি। হাজার পাঁচ টাকা পেলেই সে ওকে বে করে। রূপের জন্যে তার আপত্তি নেই।"

অমর হাসিয়া বলিল, "সে তা' হ'লে টাকাকেই বে কর্ত্তে চায় মামা, ওকে নয়। ও রকম লোকের হাতে মেয়ে দেওয়া যায় না। এমন ছেলে চাই, তার কাছে ও আদর-যত্ন স্ত্রীর মর্য্যাদা পাবে। ওর কুরূপ তাকে ক্ষুব্ধ করবে না।"

হতাশভাবে বিমলেন্দু বলিলেন, "সে কোথায় পাব অমর। সকলেই চায় সুন্দরী স্ত্রী, শ্বশুরের টাকা; কালো মেয়ে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে এমন কে আছে?"

"কেউ নেই?"

মাথা নাড়িয়া বিমলেন্দু বলিলেন, "না, কেউ নেই।"

"তা' হ'লে ওর বিয়ে দিও না, এমনই থাক্। ও তো একদিন তাই বলেছিল।" কথার সঙ্গে অমর কল্পনার দিকে চাহিল।

মাথাটা প্রায় মাটির সহিত মিশাইয়া দিয়া কিছুদূরে বসিয়া কল্পনা অমরের ভাবীবধূর জন্য ক্রীত দেশী শাড়ীগুলার ভাঁজ খুলিয়া রাখিতেছিল, কুঁচাইয়া দিবার জন্য।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাতুলের দিকে চাহিয়াই অমর বলিল, "এই বল্লুম, সব বিষয়ে ভাল ছেলে হবে, ওকে দেখে ইচ্ছাপূর্ব্বক আদর করে গ্রহণ কর্ব্বে। এমন পাত্র পাও, বিয়ের ঠিক কর্; টাকা যা' লাগে আমি দেব। না হ'লে একটী পয়সাও দিচ্ছি না। ছায়ে ঘি ঢালতে আমি রাজি নই। তোমরা একটা যা' তা' দেখে ওর বে দেবে, লোকে আমায় ছি ছি কর্ব্বে, অথচ আমি টাকাও দেব, সে হবে না।"

"কিন্তু বের পর ওকে যত্ন কর্বে কি অযত্ন কর্বে সে আমি আগে হতে বুঝব কি করে তাই বল দেখি। ওপর থেকে যতটা হয়, তাই মানুষ কর্ত্তে পারে, তার বেশী তো হয় না। ছেলেটী পাঁচ হাজার চাইছে, সেই সব দিক্ দিয়ে দেখ্ছি ভাল। তুই যদি টাকাটা দিস, তা' হ'লে ঔই সম্বন্ধই ঠিক করি।"

"উঁ হুঁ, তা' হবে না। আগেই যে বলে টাকা পেলেই সে বে কর্বে, স্ত্রীর রূপে তার দরকার নেই, সে লোক সুবিধের নয়। তার হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে আগুনে দে য়াও ভাল।"

বিরক্তভাবে বিমলেন্দু কহিলেন, "এত বাপু তুই আচ্ছা ঝঞ্ঝাট বাধালি! ওর ভাগ্যে যা' হবার সে হবেই; তোর যদি ইচ্ছে হয় কিছু টাকা দিয়ে দে। অত বেশী ভাববার দরকার তো তোর নেই।"

"মামা, বেশ কথা বললে ত। টাকাটা দেব, অথচ টাকা দিয়ে যে কাজটা হচ্ছে তার পরিণামটা কি রকম দাঁড়াবে সেটা আমি ভেবে দেখব না। বেশ যা' হোক্। সে হচ্ছে না যেমন বল্লুম, অমনি একটী ছেলে খুঁজে বার কর, তবে টাকা দেব।"

"তোর আবদার মত কাজ কর্ত্তে গেলে ওর বিয়ে আর এ-জন্মে হবে না। থাক্, তবে ওর বিয়ে হয়ে কাজ নেই।"

কৌতুক-মিশ্রিত চক্ষে মাতুলের দিকে চাহিয়া অমর কহিল, "সে হবে না মামা, আমার বিয়ের আগেই ওকে বিদেয় কর্ত্তে হবে। আমার যে বউ হবে, সে কত সুন্দর জান তো? সুন্দরীরা কালো চেহারা মোটেই দেখতে পারে না এ আমি জানি। সে এসে ওর ওই চেহারা দেখে হয় ত ফিট্ হ'য়ে পড়বে। সে বিপদ ঘটবার আগেই ওকে সরান চাই।"

"আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনার সুন্দরী স্ত্রী আমার ছায়াও দেখতে পাবে না, এমন ভাবে আমি লুকিয়ে থাকব।"

কল্পনার উষ্ণ কণ্ঠস্বরে কয়জনেই চমকিয়া তার দিকে চাহিল। অমর কি একটা বলিতে গেল, তার পূর্ব্বেই কাপড় কয়খানা তুলিয়া লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

পূর্ণিমার রাত্রি। গলিত রজতধারার মত প্রস্ফুট চন্দ্রালোক সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নীল আকাশের মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের টুকরা কে যেন খেলাচ্ছলে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়াছে। কতকগুলা ছোট ছোট কালোপাখী মেঘলোকের তলে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। দূর হইতে মনে হয় যেন কালির বিন্দু। জ্যোৎস্নাধারাকে দিনের আলো ভাবিয়া দু'-একটা বায়স মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া উঠিতেছিল। কি একটা নিশাচর পক্ষী আপন-মনে অবিরাম শিষ্ দিতেছিল।

ত্রিতলের খোলা বারাণ্ডার একধারে রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কল্পনা আপন-মনে তার সেই ব্যথাভরা দুঃখময়

জীবনটার কথাই ভাবিতেছিল। তার অজ্ঞাতেই হয় ত বিন্দু বিন্দু অশ্রু কপোল বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। উজ্জ্বল চন্দ্রকরে মুখখানা অত্যন্ত পাংশু ম্লান দেখাইতেছিল। পিঠের উপর কার হাতের স্পর্শ পাইয়া অত্যন্ত চমকিয়া কল্পনা ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, তার একান্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়া অমরেশ। কল্পনার সারাদেহ কাঁপাইয়া একটা আকস্মিক চমক একটা অননুভূতপূর্ব্ব অজ্ঞাত শিহরণ বিদ্যুৎ পরশের মত বহিয়া গেল। অমরকে এভাবে তার কাছে দেখিয়া কল্পনা কয় পা সরিয়া একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল। অমর হাসিল। স্মিত চন্দ্রকিরণ অমরেশের কাঁচা সোণার মত উজ্জ্বল বর্ণকে আরও দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। সুশ্রীমুখে নূতন একটা শ্রী ফুটাইয়াছে। আপনার অজ্ঞাতেই কল্পনার বিমুগ্ধ দৃষ্টি কয় মুহূর্ত্ত তাহাতে বদ্ধ রহিল। তারপর যেন কুণ্ঠিত হইয়াই সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। অমরও তার দিকে চাহিয়াছিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কল্পনা, তুমি কাঁদছিলে? কেন?"

সিক্ত চোখ দুইটা মুছিবার কথা কল্পনা ভুলিয়াই গিয়াছিল। অমরের কথায় ব্যস্তভাবে চোখ দুইটা মুছিয়া ফেলিল। অমর সরিয়া পুনরায় তার কাছে আসিয়া দাড়াইল; বলিল, "বল না কল্পনা, কেন কাঁদছিলে তুমি?"

"গরীবের কাঁদবার কারণ জগতে অনেক থাকে। আপনার শুনে কি হবে?"

অমর অল্প একটু হাসিল; বলিল, "তুমি না বল্লেও আমি জানি কেন তুমি কাঁদছিলে। ভবিষ্যৎ জীবনটা তোমার কেমন হবে সেইটাই ঠিক বুঝতে পাচ্ছ না বলেই তুমি কাঁদছ। তাই নয় কি?"

চোখ মুছিয়া কম্পিত কণ্ঠে কল্পনা কহিল, "হয় ত তাই। কিন্তু একটা কথা বলি, আমায় বিদায় করবার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন? আপনার বাড়ীতে ত দাসী-চাকরেরও দরকার আছে, তাদেরই একজন করে নিয়ে আমাকে একটু স্থান দিতে পারেন না কি?"

অমর অকস্মাৎ হাত বাড়াইয়া কল্পনার হাত দুইখানা ধরিয়া ফেলিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "আমি ত সেই কথাই তোমায় বলতে এসেছি কল্পনা, এ বাড়ী তোমাকে চিরদিনের মত স্থান দিতে চায় কি ভাবে জান? এই বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে।"

কঠিন পাষাণ স্তূপ ভেদ করিয়া সহসা শতধারে উৎসারিত স্নিগ্ধ বারিধারা আকণ্ঠ শুষ্ক তৃষিত পথিকের সম্মুখে ঝরিয়া পড়িতে থাকিলে সুগভীর বিস্ময়ে দিশাহারা হইয়া সে যেমন নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে, তেমনই ভাবে চাহিয়া রহিল কল্পনা অমরের দিকে। একটা অজানা পুলক-তরঙ্গ অমরের স্পর্শের মধ্য দিয়া তার সারাদেহে স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল। কয় মুহূর্ত্ত তার শুষ্ক কণ্ঠে ভাষা ফুটিল না। অমর কোমলস্বরে ডাকিল, "কল্পনা!"

কল্পনার স্বাভাবিক সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। ব্যস্তভাবে সে হাত দু'টায় টান দিল। অমরের সবল হাতের বাঁধন শিথিল হইল না। হাত দু'খানা তেমনই আবদ্ধ রহিল। তার সৌন্দর্য্যলেশহীন মুখখানার দিকে চাহিয়া অমর বলিল, "শোন কল্পনা, ভেবে দেখলুম, তোমায় দূরে সরান আমার পক্ষে দুঃসহ। আমার সমস্ত মনে এমন ভাবে তুমি জড়িয়ে গেছ, যাতে কোনমতেই তোমায় তফাৎ করা চলে না, তাই—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে একান্ত বেদনার সঙ্গে কাঁদিয়া কল্পনা বলিল, "আমি অসহায়, আপনার আশ্রিত, তাই আপনি আমায় এভাবে অপমান কচ্ছেন! হাত ছাড়ুন।" সে আবার হাতে টান দিল।

অমর হাত ছাড়িল না বরং নিজের দিকে তাকে একটু টানিয়া আনিয়া সস্নেহ স্বরে বলিল, "ভুল বুঝো না কল্পনা, ভগবানের নাম করে বলছি, যা' বলেছি আমি, তার একটুও মিথ্যা নয়।"

কল্পনার সারাদেহ কাঁপিতেছিল। দারুণ বিস্ময়ে অমরের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে শুধু বলিল, "তা' কি হয়?"

"কেন হবে না কল্পনা! এইটাই হবে। এই কথা এইমাত্র মামাবাবু মামীমাকে জানিয়ে তোমায় বলতে এলুম। আমি ক'দিন থেকেই ভাবছি। দেখলুম, তোমায় ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু আমি যে কুরূপ—"

"ভালই তো। লোকে বলে, আমি দেখতে না কি খুব ভাল; আমার রূপ দিয়ে তোমার রূপের সব দৈন্য ঢেকে যাবে। তা' ছাড়া, তোমার রূপ না থাকা সত্ত্বেও যখন তোমায় এত ভালবাসি, তখন আমার ভালবাসা যে নিছক খাঁটি, তা'তে আর কিছুমাত্র সন্দেহ করার অবসর তোমার থাকবে না। তোমার এই রূপহীন মূর্ত্তিকেই আমি ভাল-বেসেছি কল্পনা!"

নিবিড় স্নেহে অমর কল্পনার নত মুখটা তুলিয়া ধরিল। জড়িতস্বরে কল্পনা কহিল, "কিন্তু আপনার বিয়ে তো স্থির—"

কথা শেষ করিতে না দিয়াই অমর কহিল, "আগে ঠিক বুঝি নি কল্পনা, তুমি আমার মন কতটা অধিকার করে আছ, তাই ওটা স্থির করা হয়েছিল। তাদের খবর দিতে বলে এসেছি মামাকে। সে বড়লোকের মেয়ে, সুন্দরী, তার বিয়ের জন্য চিন্তা নাই। কিন্তু কল্পনা, একটা কথা,—এই নীরস কঠোর প্রকৃতি দুর্ম্মুখ লোকটার জীবনের সাথী হ'য়ে তুমি সুখী হতে পারবে তো?"

গাঢ়স্বরে কল্পনা কহিল, "উষ্ণ বালির নীচেকার শীতল স্নিগ্ধ জলের ধারার মত তোমার কঠোর প্রকৃতির অন্তরালে যে স্নেহ-কোমল মহান হৃদয়টী লুকিয়ে আছে, তাকে যখন চিনেছি, তখন ভুল আর হবে না।"

পট পরিবর্ত্তন

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

আদালত হইতে বিভূতি সেদিন একটু শীঘ্রই ফিরিয়াছিল।

বৈকালিক জলযোগান্তে নিজের ঘরটিতে বসিয়া সে অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল ; কিন্তু না, আভার আজ আর দেখা নাই...

অগত্যা বিভূতি উঠিল। উপরের বারান্দা হইতে রেলিংয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—শুনছো, আমার চাবিটা দিয়ে যাও, আমায় যে একবার বেরোতে হবে...

নীচে আভা তখন রান্নাঘরে বামুন-ঠাকুরকে আনাজ তরকারী বুঝাইয়া দিতেছে। সংসারটি দেখিতেই ছোট, কিন্তু কাজ ত আর নিতান্ত কম নহে। আর যে কাজটি সে নিজে না দেখিবে, সেটি পণ্ড না হইয়া আর যায় না। উড়ে বামুনের উপর বিশ্বাস করিয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিলেই যদি চলিত, তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিত না। অবশ্য জেঠাইমার বয়স হইয়াছে, তাঁহার কথা ধরা চলে না, তিনি আর কত করিবেন।

বিভূতির ডাক শুনিয়া আভা ঘোমটার মধ্যে নিজের মনেই গজ্‌রাইতে লাগিল,—বাবা, বাবা, এমন মানুষও দেখি নি!...আর তর্ সইছে না...ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে এসেছেন...দু' দণ্ড বাড়ী থাকতে যেন কি হয়? .....

জেঠাইমা ভাঁড়ার-ঘর হইতে হাঁক দিয়া বলিলেন,—তুমি ওপরে যাও বউমা; বিভূ সেই থেকে একলাটি বসে আছে।...আমি এদিককার সব দেখছি।

এমন সময় মন্টি আসিয়া পড়িল। বলিল—সত্যি বৌদি', তুমি যাও না ভাই...আমিও ত' আছি, কি করতে হবে বলে' যাও...

কিন্তু আভা কাহারও কথায় কাণ দিল না। কহিল—হাঁা, তা' নয় আরও কিছু; তুমি দু'দিনের জন্যে ভায়ের কাছে এসেছো—না, না, কতক্ষণই বা লাগবে, শুধু বাট্‌না টা বেটে দেওয়া বই ত নয়। বলিয়া শিলনোড়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

বিভূতি মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে ততক্ষণে অতিষ্ঠ হইয়াছে। কী হইল আজ আভার? সংসারের কী যে কাজ করে এত সে, তাহার ঠিক নাই। কতই বা বয়স তাহার, অথচ ইহার মধ্যেই যেন সে গৃহিনীপনায় পাকিয়া গিয়াছে।...বাঙালী মেয়েদের ধরণই এই; অথচ সাহেবদের মেয়ে হইলে হয় ত এই বয়সে মাঠে 'স্কিপ্' করিয়া বেড়াইত।

সহসা দরজার বাহিরে একবার চাবির শব্দ হইতেই বিভূতির চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল ও পরক্ষণেই আভা স্মিতহাস্যে গৃহে প্রবেশ করিল।—বাবা, বাবা, কি বেহায়া তুমি! ডাকাডাকি করে' বাড়ী যেন মাথায় করেছো;...আমার এমন লজ্জা করছিলো...ঠাকুরঝির সাম্‌নে ..

—তা' তুমি আগে চলে' এলেই ত' পারতে গো;...আমাকে আর চাবি চাবি করে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করতে হ'ত না, আর তোমারও লজ্জায় মাথা কাটা যেত না।

আভা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—বারে, হাতের কাজগুলো না সেরে কি করে' আসি;...বেশ যা' হোক্, এমন অবুঝ তুমি;...আচ্ছা, বেরোবার এত তাড়াই বা কিসের মশায় শুনি;...এক্ষুনি কোথায় যেতে হবে?

বিভূতি তাড়াতাড়ি বলিল,—না না, যাবো আর কোথায়?...একলাটি ছিলাম, তাই। পরে একটু রহস্য করিয়া বলিল, . তোমার ত' আবার গল্প করার সময় নেই, সব কাজ বোধ হয় ফেলে এসেছো...

আভা বাধা দিয়া বলিল,—না গো না, সব সেরেই এসেছি, সেইজন্যেই ত' একটু দেরী হ'ল।...সব তাতেই

তোমার ঠাট্টা। সংসারের দিকে একটু না দেখলে কি চলে?…নাও, এবার কত গল্প করবে কর। পরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, সেই যে সেই গল্পটা বলবে বলেছিলে…

—কোন্ গল্পটা আবার?

—সেই যে আমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে একটা কোন্ মেয়ের সঙ্গে তোমার ·বলিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বিভূতির মাথায় সহসা এক দুষ্টবুদ্ধি চাপিল।—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, সবিতার সঙ্গে সেই ব্যাপারটার কথা বলছ ত' তুমি? ·· সে কিছু না, বাজে…

আভা মনে করিল বিভূতি কথাটা চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। সে ক্ষুব্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—ও, আমায় বলবে না বুঝি?…তা' বলবেই বা কেন?… বেশ ত'…

মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছে; ধারাবর্ষণের আর দেরী নাই বুঝিয়া বিভূতি তাহাকে সহসা বুকের উপর টানিয়া লইল।

—না না বলবো না কেন আভা? তোমার কাছে কি আমার গোপন কিছু আছে? বলিয়া ফোঁস্ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।—কিন্তু সে ব্যাপারটা তুমি না শুনলেই ভাল করতে আভা।

—না না, কিছু হবে না, তুমি বল দিকিন্। বলিয়া আভা একখানা চেয়ার টানিয়া বিভূতির ঠিক সম্মুখে আসিয়া বসিল।—নাও আরম্ভ কর।

বিভূতি নিজের হাতের মধ্যে আভার হাতখানি টানিয়া লইল।—নেহাতই যদি শুনতে চাও, তা' হ'লে শোনো। কিন্তু এরপর আমায় দোষ দিও না বলে' দিচ্ছি। সেবার বি-এ একজামিনটা দিয়ে দার্জ্জিলিং চলেছি। শিলিগুড়িতে বড় গাড়ী বদল করে' ছোটগাড়ীর একটা কামরা দখল করে' বসে' আছি।…সে রকম গাড়ী তুমি বোধ হয় দেখ নি আভা;·· খুব ছোট্ট গাড়ী, সাম্‌নাসাম্‌নি মাত্র দু'খানা বেঞ্চি।…আমার সাম্‌নের বেঞ্চিটার এককোণে দুটো ফিরিঙ্গি অনর্গল বকে' যাচ্ছে। গাড়ী ছাড়বার বেশী দেরী নেই, এমন সময় একজন আধাবয়সী বাঙালী ভদ্রলোক একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের গাড়ীর দরজার কাছে এসে খুব ব্যস্তভাবে ভেতরে জায়গা আছে কি না দেখতে লাগলেন ··তেমন সুন্দরী মেয়ে,—মানে, মেয়েমানুষের তেমন রূপ—আমি আর দেখি নি।

বিভূতি আভার হাতে একটু চাপ দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—বুঝতেই পারছো আভা, তখন আমার সেই বয়েস, যে বয়েসে চুড়ির একটু শব্দ শুনলে মানুষের মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে,—যে বয়েসে পুরুষের মন নারীসঙ্গ কামনায় উন্মুখ হ'য়ে থাকে।—আমি সাদরে তাঁদের গাড়ীর ভেতর জায়গা করে' দিলাম।

এই সময়ে আভার সদাপ্রফুল্ল মুখখানির উপর এক অব্যক্ত বেদনার ছায়া আসিয়া পড়িল।

—শিলিগুড়ি থেকে দার্জ্জিলিং যেতে সে যে কী আনন্দ আভা, সে আর কী বললো তোমাকে;—একদিকে প্রকাণ্ড পাহাড় আর ঘন জঙ্গল, আর একদিকে কত শত ফিট্ গভীর খাদ,—মাঝখান দিয়ে আমাদের গাড়ী একটা বিরাট সরীসৃপের মতন ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠছে।—সে সময় সহযাত্রী নারী কি পুরুষ, পরিচিত কি অপরিচিত কিছুকালের জন্যে ভুলে যেতে হয়। সহজ আনন্দের মধ্যে দিয়ে খুব অল্পক্ষণে পরস্পরের সঙ্গে অতি নিবিড় একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে কোন বাধা থাকে না। আমাদেরও তাই হলো। সতীশবাবু আর সবিতার সঙ্গে সেই ক'ঘণ্টার মধ্যে পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো যে, তা'র ফলে দার্জ্জিলিং-এ গিয়ে একই হোটেলে ওঠা, প্রত্যহ একসঙ্গে 'মল্ রোডে' বেড়াতে যাওয়া, 'অবজারভেটারি হিলে' চড়া, কিছুই আর বাকী রইল না।

আভা স্পন্দিতবক্ষে জিজ্ঞাসা করিল,—হোটেলে কি একঘরেই থাকতে না কি?

বিভূতি মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল,—না, একঘরে ঠিক্ নয়, তবে পাশাপাশি বটে।

আভা কৌতূহলে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তারপর?

—তারপর, কোলকাতায় ফিরে এসেও তাঁদের বাড়ী যাতায়াত চললো। শেষে একদিন সতীশবাবু ধরে' বসলেন তাঁর নাতনীটিকে গান শেখাতে হবে।···বুঝতেই পারছো আভা, আমি সেই বয়সে এমন সমীচীন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না।...আর কেই বা পারে বল না?···সেই থেকে রোজ সন্ধ্যায় নিয়মিত সবিতাকে গান শেখানো চললো।...সে যেন কী একটা নেশা! সকাল থেকেই সারা মন উন্মুখ হ'য়ে থাকতো, কখন সন্ধ্যা হবে, কখন সবিতার কাছে যাব।···আর যে ঘরটাতে সবিতা গান শিখতো, সে ঘরটাও ছিল দিব্যি নিরিবিলি।···শুনছো ত' তুমি আভা, না কি...

আভা রুক্ষস্বরে বলিল,—শুনছি গো, তুমি বলে' যাও না।

—আচ্ছা আভা, এবার তুমিই বল দেখি শেষকালটা কি হলো।

আভা তখন রীতিমত অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। একটা ঝাঁকানি দিয়া মাথাটা একপাশে ফিরাইয়া এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া বলিল,—জানি না, যাও, বলতে হয় ত' বল।

—হ্যাঁ, সবিতাদের সেই নিরিবিলি ঘরটির মধ্যে নির্জ্জনে দিনের পর দিন গানের চর্চ্চা যখন বেশ অগ্রসর হ'য়ে চলেছে, সেই সময়ে সতীশবাবু একদিন আমাকে আলাদা একপাশে ডেকে আমতাআমতা করে' এক অদ্ভুত কথা পেড়ে বসলেন : সবিতা না কি আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, সে তিনি বুঝেছেন ; আর তাঁর নিজেরও বিশেষ ইচ্ছা ··

আভা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল,—কম ধড়িবাজ শয়তান ত' নয় বুড়ো—টোপটি ত' ফেলেছিলো দিব্যি।··আর ধন্যি, তোমাদের মতন পুরুষ,···এমন মেয়ে-ক্যাঙলা ··

বিভূতি তাহার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—বটে?...আরে শোনোই আগে শেষটা ·

—বল।

—আমি সেদিন থেকেই বেমালুম কেটে পড়লাম; আর সে মুখো হই নি। শেষে বুড়ো বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করতে ছাড়ে নি, বুঝলে আভা; ইনিয়ে-বিনিয়ে বেহায়ার মতন সে কত কথা : মেয়েটার মুখে না কি সেই থেকে আর হাসি নেই...গান গাওয়া ত' দূরের কথা, সে না কি সব সময়ে মুখ শুকিয়ে থাকে, এম্নি ধারা আরও কত কি।···কিন্তু ওসব ছেঁদো কথায় এ শর্ম্মারামকে আর ভোলাতে···

আভা যেন এতক্ষণ একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল; এইমাত্র সে উহাকে অলীক স্বপ্নমাত্র বলিয়া বুঝিয়াছে। হৃদয়ের নিশ্চিন্ত প্রসন্নতা তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষুতারকায় প্রতিফলিত হইল। সে আবেগভরে বিভূতির হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া যেন তাহার অন্তরের মৌন অভিনন্দন জানাইল।—মাগো, যেম্‌নি পাজি বুড়ো, আর তেমনি বেহায়া বজ্জাত কি তার ওই ধুমসী নাতনি ছুঁড়িটা!·· ঝাঁটা মারো মুখে অমন মেয়ের··বেশ করেছো, উচিত শিক্ষা দিয়ে দিয়েছো।

—তবে যে সবটা না শুনেই আমাকে যা' তা' বলছিলে? বলিতে বলিতে বিভূতি আভাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিল; আভা তাহাতে কোন বাধা দিল না।

•

কৃষ্ণপক্ষের নিস্তব্ধ রাত্রি তখন আপন গভীরতায় থমথম্ করিতেছে। জাগরণের ক্ষীণতম সাড়াও শুনিতে পাওয়া যায় না···

সহসা পার্শ্বশয়ানা নিদ্রিতা আভা বিভূতিকে জড়াইয়া ধরিয়া ঠক্‌ঠক্ করিয়া রীতিমত কাঁপিতে সুরু করিয়া দিল। তাহার পর গোঙানি তাহার আর থামিতে চায় না; যেন সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে চায়।

বিভূতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না। তাহার পর ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আভাকে ঠেলিতে লাগিল, —আভা, আভা, ও আভা শুনছো···

আভার তখন ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; কিন্তু বুক ধড়ফড় করিতেছে, কপাল মাথার চুল সব ঘামিয়া উঠিয়াছে।

বিভূতি উঠিয়া আলো আনিল; তাহার পর পাখা লইয়া আভাকে বাতাস করিতে বসিল।—কি হয়েছে তোমার? ভয় পেয়েছো? স্বপ্ন দেখেছিলে বুঝি কিছু খারাপ?···

আভা কিছুক্ষণ থতমত খাইয়া বিভূতির মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর চোখ মুছিতে মুছিতে তাহার বুকের উপর ধীরে ধীরে মাথা রাখিল। বলিল,—বল তুমি আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না;···একটা বড় বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।

বিভূতি আভার মাথাটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল—কি স্বপ্ন দেখেছো আভা?—সেই যে সেই গল্পটা তুমি বল্‌লে না, সন্ধ্যাবেলা?—মনে হ'ল আমিই যেন সেই মেয়েটা;—তুমি যেন আমায় রোজ গান শেখাতে আসো,—আমাদের দু'জনে খুব ভাব হয়েছে, আর ..বলিতে বলিতে আভা বিভূতির দৃষ্টিতে তাহার স্তিমিত দৃষ্টি মিলাইয়া অর্থপূর্ণ সলজ্জ হাসিতে ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি আরক্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু তারপরেই যেন দেখলাম, তুমি দূরে—অনেক দূরে—অনেক দূরে—যেন খুব ঘন কুয়াসার মধ্যে কোথাও মিলিয়ে যাচ্ছো।—আমি কত কান্নাকাটি করে', কাকুতি মিনতি করে', কত করে' তোমায় ডাকছি, তুমি যেও না, ফিরে এসো, ওগো, ফিরে এসো! তুমি শুধু দূর থেকে বল্‌ছো: না, না, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই, আজ থেকে আর সে হ'তে পারে না—

আভা মুদিত নেত্রে যেন সেই অবস্থা স্মরণ করিয়া আবার শিহরিয়া উঠিল।

—মাগো, এমন বিশ্রী স্বপ্ন! গোবিন্দ, গোবিন্দ! সত্যি সত্যি কি আর তুমি অমন—বলিয়াই কি মনে করিয়া আভা স্তব্ধ হইয়া গেল।

বিভূতি কৌতুকভরে হাসিতে হাসিতে বলিল,—তুমিও যেমন পাগল আভা, সে গল্পটা যে একদম ডাহা মিথ্যে···আমার মনগড়া।
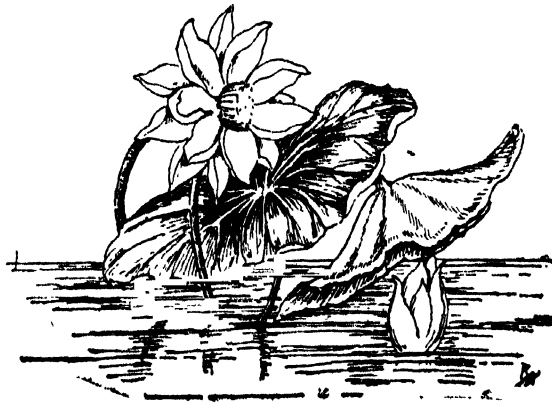
রহস্যের রঙমহল

সন্তান-বিভ্রাট !

শ্রীবাসব বর্ম্মা

সুধীরা বলিল, "অশোকার জন্যে জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বের অবতারণা হয়েছে ; জানি না, কতদিনে এর পরিসমাপ্তি হবে।"

তরুণ গম্ভীর, চিন্তান্বিত। ঘটনাটা আগ.গোড়া প্রণিধানে সে যেন মগ্ন হইয়া গিয়াছে। সুধীরা বলিল, "পথ আমাদের চোখে ঠেকছে না ; কারণ, আমরা অন্ধ। কিন্তু আপনি, আপনিও কি কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না ?"

তরুণ বলিল, "সুশান্তের খবর কতদিন পান নি ?"

সুধীরা বলিল, "প্রায় দেড় মাস। এর আগে হপ্তায় একখানি করেও সে পত্র দিত। কি যে হয়েছে ! অশোকা নিজেকেই অপরাধিনী স্থির ক'রে মলিন হ'য়ে পড়েছে। আপনি একটু চেষ্টা করুন ; খুঁজে দেখুন, ব্যাপার কি ?"

তরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "এর আগে এরূপ ভাব পরিবর্ত্তন কোনদিন দেখা গিয়েছিল কি ?"

সুধীরা বেশ সহজ কণ্ঠেই উত্তর দিল "না, সেই জন্যেই ত বেশী ভাবনা। দু'টিতে ছিল যেন মাণিকজোড় ; কেউ কাউকে একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারত না—এবার দেশে গিয়ে কি যে হ'ল ?"

তরুণ বলিল, "অশোকা ত বাড়ীতে ছিল না শুনেছি ; সহরে বোর্ডিংয়ে থাকত।"

সুধীরা বলিল, "না, এক শিক্ষয়িত্রীর বাড়ীতে। সেখানে ঠিক কয়েদীর মত ছিল না ; বাড়ীর মেয়ের মতই আদর-যত্ন ও স্বাধীনতা পেয়েছিল। আমরা দু'জনে একত্রই বেড়াতে বেরতুম—সেই ফাঁকেই সুশান্তের সঙ্গে আলাপ।"

তরুণ বলিল, "পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার ফাঁকে কোনদিন কি সে আত্মীয়দের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা তুলেছিল ; যেমন, এক ব্রাহ্ম-পরিবারের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে সংযুক্ত হ'লে জাতীয়তার দিক্ দিয়ে তা'কে সমাজের কাছে ছোট হ'য়ে যেতে হবে বা এমনি কিছু ?"

সুধীরা বলিল "না, বরং আমিই মধ্যে মধ্যে সেই কথা তুলে পরিহাস করলে বেশ শান্তকণ্ঠেই সে জবাব দিত, 'তুমি আমার মাকে চেন না সুধীরা ! তিনি অশোকাকে পেলে স্বর্গের ফল হাত বাড়িয়ে পাওয়ার সুখ অনুভব করবেন।"

তরুণ বলিল, "আচ্ছা, যাবার দিন সে কি বলেছিল মনে আছে ?"

সুধীরা বলিল, "আছে। একসঙ্গে সে দু'খানা তার পায় ; আর সেই তারের খবরই তাকে ব্যস্ত ক'রে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বিরক্তভাবে সে বলেছিল, 'অদ্ভুত, এ এক নূতনতর রহস্য বটে ! গেরো আর কি !' তারপর চেষ্টা করেও আমরা সেদিন তার কাছ থেকে কোন কথাই বার করতে পারি নি ; সে অসম্ভব রকমের গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিল।"

গ্রামের নাম জানিয়া লইয়া তরুণ সেদিনের মত সুধীরাকে বিদায় দিল।

—দুই—

"সুধা, তোর চা এনেছি রে, খেয়ে নে। আহা, বাছা আমার ডাইনী মাগীর চোখে চোখে আধখানা হ'য়ে গিয়েছে !"

বৃদ্ধা একপাত্র চা বড় যত্নের সহিত সুধার সম্মুখে রাখিল। ঝড়ের গতিতে ছুটিয়া আসিয়া অন্য এক বৃদ্ধা পাত্র পার্শ্বে আর একটী পেয়ালা রাখিয়া বলিল, "ছুঁসনি শান্ত, ছুঁসনি, ও বিষ ! মাগী আর কোন পথ না পেয়ে বিষগুলো তোকে খাওয়াতে এনেছে।"

দুই প্রবীণার দিকে একবার শুধু রুক্ষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশান্ত বলিল, "আমায় কি তোমরা পাগল তৈরী করতে চাও ? এর চেয়ে দু'খানা ছুরী দিচ্ছি, দু'জনে দু'ধার থেকে আমার গলায় বসিয়ে দাও।"

কথাটায় দু'জনেই থতমত খাইয়া গেল এবং পরস্পর পরস্পরের দিকে রোষ-কটাক্ষ-দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। অল্প কিয়ৎকাল পরেই এক ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠিল। তারপর আবার সব চুপচাপ।

সুশান্ত তরুণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখছেন আমার জীবন! দুই স্নেহবাৎসল্য-পীড়িতা নারীর মধ্যে আজ আমি ভাগের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। এ চায় আমায় সম্পূর্ণ নিজস্ব ক'রে পেতে; ও বাধা দেয়; বলে, 'না, তুমি আমার গর্ভের সন্তান। ও আবাগীর ছেলে নেই, মারা গেছে।' পরস্পরের মধ্যে এই একই অভিযোগ—আমার জীবন দুঃসহ ক'রে তুলেছে! বলুন ত, এমন সঙ্কটময় জীবনের মধ্যে বাস করে কেউ কি?"

তাহার কথায় বাধা পড়িল। এক প্রাচীনা একখানি ডিসে নানাবিধ ফল সাজাইয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিল; তারপর নিজের আঁচল দিয়া ঠিক কচি ছেলেটীর মত তার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "অনেক তপস্যার ফলে তোকে পেয়েছি রে শান্ত! না না, আমি তোকে কিছুতেই হারাতে পারব না; ও ডাইনীর মায়া মুন পড়ায় আমি ভাঙব।"

অন্যজন একপ্লেট কচুরী, সিঙাড়া, পাঁপর ইত্যাদি আনিয়া বলিল, "আমি নিজে হাতে তৈরী ক'রে এনেছি সুধা, তুই খা।"

পরক্ষণেই উভয় বৃদ্ধার মধ্যে চুলাচুলি বাধিয়া গেল। ছাড়াইয়া দিবার জন্য তরুণ উঠিতেছিল; হস্ত ইঙ্গিতে তা'কে বাধা দিয়া সুশান্ত বলিল, "ওর খাবার তুমি খেয়ে পরখ ক'রে দাও; আর এর খাবার খাও তুমি। আমায় পরীক্ষা ক'রে তবে খেতে হবে ত?"

দুই নারীই সন্তুষ্ট হইল। পরস্পর পরস্পরের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া দুইখানি প্লেট দু'জনে তুলিয়া লইল। ইত্যবসরে চাকর চা আনিলে সুশান্ত নিজে এক পেয়ালা লইয়া তরুণের দিকে অন্য পেয়ালা আগাইয়া দিয়া বলিল, "বলুন ত, এমন সুখের জীবন যার, সে কি অন্য কোন সুখের কল্পনা করতে পারে?"

তরুণ ধীরকণ্ঠে শুধু বলিল, "দু'জনেই বদ্ধ পাগল!"

সুশান্ত বিষণ্ণতা ভরা চক্ষু তুলিয়া বলিল, "বড় অপ্রিয় কথা; কিন্তু স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে, আপনার অনুমানটা ভ্রমপূর্ণ নয়। এদের মধ্যে কে যে আমার যথার্থ গর্ভধারিণী, আমি তা' জানি না; তাই কারও প্রাণে-ব্যথা দিতে পারি না; অথচ, তিলে তিলে আমার জীবনটা বিষময় হয়ে উঠছে।"

তরুণ উৎসাহ দিয়া বলিল, "আমিই এ সংশয়ের মীমাংসা করব। বলুন, এ সম্বন্ধে আপনার কতটা কি জানা আছে? অর্থাৎ, আপনার জন্মদিনের ইতিহাস থেকে আজ পর্য্যন্ত আমূল ঘটনা আমি শুনতে চাই।"

সুশান্ত বলিল, "কথাটা আমার চেয়ে রামকানাই ভাল বোঝাতে পারবে। চলুন, তারই কাছে আপনাকে নিয়ে যাই।"

—তিন—

রামকানাই বলিতে লাগিল, "ওঁর আসল নাম সুশান্ত নয় বাবু, সুধাশান্ত। আমিই দুটোয় ছাঁটকাট ক'রে মিলিয়ে দিয়েছি।"

তরুণ প্রশ্ন করিল, "তা' হ'লে এ দুয়ের বিবাদ বহুদিনের?"

রামকানাই বলিল, "হ্যাঁ, দাদাবাবুর জন্মদিন থেকেই। সেটা ছিল দুর্য্যোগের রাত, যেমন জল, তেমনি ঝড়! এরা দু'জনেই ছিলেন পূর্ণ গর্ভবতী; দু'জনেই সদ্য স্বামীহারা। কি ভাবে যে এখানে এসে মিশে ছিলেন বলা শক্ত; কারণ, তখনকার ইতিহাস আমার সম্পূর্ণ অজনা।

"হ্যাঁ, জল-ঝড়ের মধ্যে বাড়ীর সে সময়ের দাসী ময়না আমায় এসে খবর দিলে, দাই ডাকতে। মুস্কিলে পড়লুম; সে দুর্য্যোগে যাই কোথায়? ময়নাই সে সমস্যার সমাধান করলে। বল্লে, তার এক বোন্ মায়া, সাতপুরে থাকে; দাইগিরি করে সে। গাড়ী দিন, আমি তা'কে আনিয়ে দিই। হ্যাঁ, আমি তখন এ বাড়ীর মালিকের তরফ থেকে সরকারের মত ছিলুম। পরে এরা মালিক হ'লে সেই ভাবেই আছি।

"আধঘণ্টাও লাগল না, দাই এল; প্রায় সঙ্গে সঙ্গে

শুনলুম, দু'জনেরই দু'টি খোকা হয়েছে। দুই শিশুকে একত্রে একখানা কম্বল পেতে শুইয়ে দাইকে ছুটে আসতে হ'ল প্রসূতিদের পাশে ; কারণ, প্রসবের পরই তাঁরা জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

"চেতনা ফিরল রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে। দু'জনেই একসঙ্গে তাঁদের সন্তান প্রার্থনা করলে। কিছুক্ষণ পরে একটী শিশুকে নিয়ে বিষাদ-ভরা মুখে দাই ফিরে এল। শত জিজ্ঞাসায়ও সে বোঝাতে পারলে না শিশুটী কার? অন্য শিশু নীলমূর্ত্তি হ'য়ে একপাশে পড়েছিল ; সনাক্তে এল না সে শিশুই বা কার? সেইদিন হতেই দাদাবাবুর ওই দুই মা। আমি তঁাদের অন্যায় অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ওঁকে কেড়ে নিয়ে এক শিশু-প্রতিষ্ঠানে রেখে দিয়েছিলুম। সেখান থেকেই উনি যান বডিংয়ে। মাস মাস টাকা অবশ্য সমানভাবে এ দুই মায়ের কাছেই আদায় পেয়েছি।

"পারতপক্ষে আমি দাদাবাবুকে উত্যক্ত হ'তে দিই নি। কোন্ ফাঁকে, কা'কে দিয়ে ওঁরা ওঁর কাছে তার পাঠিয়েছিলেন, সেটা আমার জানা নেই। আমি এখন অবাক্ হ'য়ে যাই, পাগলেরা ঠিকানা সংগ্রহ করলে কোন্ আশ্চর্য্য কৌশলে!"

তরুণ ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা রামকানাইবাবু, বলতে পারেন, সে দাই বা দাসী বেঁচে আছে কি না?"

রামকানাই হাসিয়া বলিল, "তাদের কাছ থেকে যদি কিছু আদায় করবেন ভেবে থাকেন, সেটা ভুলে যাওয়াই ভাল ; কারণ, এর আগে বহু চেষ্টা হ'য়ে গেছে—কিছুতেই কিছু ফল পাওয়া যায় নি। হয় মাগীরা শয়তানের জাসু, নয় কিছুই তারা জানে না। এ দুয়েতেই জানতে চাওয়া সমান অসম্ভব।"

তবু ঠিকানা লইয়া তরুণ বাহির হইয়া পড়িল। বলিয়া গেল, "আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, এ দায় থেকে তোমায় বাঁচিয়ে তুলবই তুলব সুধাশান্ত। অশোকা মেয়েটীকে আমার বড় ভাল লেগেছে। তার জন্যে আমায় এটুকু করতেই হবে।"

তরুণ চলিয়া গেলে সুধাশান্ত ওরফে সুশান্ত বলিল, "আচ্ছা রামকানাই মামা, এঁরা দুজনেই কি একসঙ্গে এসে বাড়ী কিনে নিয়েছলেন? কিন্তু তাই যদি, পরিচয় কতদিনকার?"

রামকানাই বলিল, "বাড়ীটা দু'জনেরই নেবার ইচ্ছা হয় ; কিন্তু দাম দেখে দু'জনেই পিছিয়ে পড়েন। তারপর আমিই পরামর্শ দিই, ভাগাভাগি ক'রে কিন্তে। কথাটায় দু'জনেই রাজী হ'য়ে যান। সেই অবধি এক বাড়ীতে আমার দুই মালিকান। প্রথম থেকেই এদের বিভিন্ন রুচিকে বাঁচিয়ে কাজ ক'রে যাওয়া আমার পক্ষে কম শক্ত হয় নি—শুধু একা আমিই টেঁকে যেতে পেরেছি। সহর ছেড়ে কেন যে এঁরা দু'জনেই এসে পল্লীর বাস পছন্দ করলেন, তা' আমার জানা নেই।"

—চার—

এবার সত্য-সত্যই তরুণ দুশ্চিন্তা সাগরে ঝাঁপ দিল। উপায় যে কি, সূত্র যে কোন্ পথে, তাহার কোনটাই আপাততঃ দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল না। তথাপি চেষ্টা করিতেই হইবে কর্ত্তব্যের খাতিরে।

গ্রামে জন্ম বা মৃত্যুর নিয়মিত কোন রেজিষ্টারী অফিস নাই। এক নির্ভর থানাদারের রিপোর্ট ; তাও আবার এতদিনের ঘটনা—কোথায়, কোন্ অফিসে গিয়া পড়িয়াছে, কে জানে!

একখানা দোকান এক প্রকাণ্ড অশত্থগাছের নিম্নে অবস্থিত। প্রয়োজনানুযায়ী সব কিছুই গ্রামের লোক সেস্থান হইতে কিনিতে পায়। সূচ-সূতা হইতে কাপড়-জামা লণ্ঠন পর্য্যন্ত। আবার ঘি-চিনি, ময়দা-মিষ্টান্নের জন্যও ভিন্ন স্থানে যাইতে হয় না। তরুণ এই দোকানখানার একপার্শ্বে আশ্রয় লইয়া কিছু জলযোগ সারিয়া লইতেছিল ; সহসা শুনিল, "কি মায়া, মণিঅর্ডার এল?"

মায়া, এ না সেই দাইয়ের নাম! চকিতে তরুণ ফিরিয়া চাহিল। দেখিল এক বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া দোকানদার কথাগুলি বলিতেছে।

মায়া জবাব দিল, "ন্যারে দাদা, আজ ছ'মাস হ'য়ে গেল মাসহারা বন্ধ; কি যে হ'ল?"

তরুণ উৎকর্ণ হইল। কিসের মাসহারা এ?

দোকানদার বলিল, "হয় ত যে পাঠাত, সে মরে গেছে ঠানদি', তাই আর পাচ্ছ না।"

মায়া উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "হবেও বা; মরণের কি আর ধরণ আছে বাছা।"

দোকানদার আবার বলিল, "নয় ত মনে করেছে ঠানদি', তুমিই আর বেঁচে নেই।"

এ কথায় মায়ার ঠিক ঠিক বিশ্বাস হইল না; কারই বা হয়। জীবিত অবস্থায় এ মরার নাম করাটাও যে গালাগালি; তথাপি কথাটাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়াও ত চলে না। অল্প কিছুক্ষণ চিন্তার পর মায়া বলিল, "তা' হ'লে কি খোঁজটাও নিত না। এত বছর ধ'রে যা' মাসের পর মাস দিয়ে এসেছে, আজ একটু তল্লাস না করেই বন্ধ ক'রে দিলে?"

এ কথার উত্তর দোকানদার দিতে পারিল না; বলিল, "বুড়োবয়সের পাওনা-মাসহারা, কষ্ট হয় বটে; কিন্তু ঠান্‌দি', তোমার অভাব ত কিছু নেই।"

মায়া বলিল, "অভাব সবারই আছে নিতাই। পাওনা যার যেমন, খরচাও তার তেমনি দাদা। তুমিও ত সংসার কর, এটুকু আর বোঝ না?"

তরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধার নিকট আসিয়া বলিল, "তা' হ'লে মায়া, তুমি বেঁচে আছ! আমার মনিব মনে করেছিলেন, বুঝি এ পারে আর তোমার সন্ধান পাওয়া যাবে না।"

এ ভাবের জিজ্ঞাসায় বৃদ্ধা থতমত খাইয়া গেল। বলিতে কি যেন চাইতেছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই নিতাই বলিয়া বসিল, "মণিঅর্ডারের ভাবনা তা' হ'লে ঘুচল ঠান্‌দি'। যাক্‌, বাঁচা গেল! বাবু, আমার দোকানেই ওনার একচল্লিশ টাকা পাঁচ আনা দেনা হয়েছে। সামান্য লোক; কিন্তু বুড়োমানুষ না দিলে শুকিয়ে মরবে, তাই। আপনারা মহাশয় লোক—"

বৃদ্ধা কিন্তু চঞ্চল হইয়া পড়িল; দোকানে দাঁড়াইয়া তরুণের সহিত আলাপ করিতে সে যেন সম্পূর্ণ নারাজ। বলিল, "দয়া ক'রে আমার কুঁড়েয় আসবেন বাবু?"

নিতাই দোকানী বলিল, "আহা, যান যান, তাই যান! বুড়ী ত ভেবেই অজ্ঞান হয়েছিল। শুন্‌ছ ঠানদি',—যা' যা' দরকার হয়, মুগের ডাল, ঘি, মিষ্টি সব নিয়ে যাও। সে কি কথা, ভদ্রলোক এসেছেন!"

তাহার এ সহানুভূতির তলে যাহা কিছুই নিহিত থাক্‌, ভাষাটা স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী বড়ই মিষ্ট লাগিল। বুড়ীর সহিত তরুণ অগ্রসর হইয়া চলিল।

পথের ওদিক্‌টায় একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় আসিয়া মায়া বলিল, "মা ভাল আছেন?"

তরুণ বলিল, "ঠিক ভাল নয়, মধ্যে বড় অসুখ গিয়েছিল; সেরে উঠেছেন। ছেলেটী—"

বুড়ী চমকিয়া চারিদিকে একবার চাহিল; বলিল, "একটু আস্তে; কেউ এখুনি হয় ত শুন্‌তে পাবে। তা' হ্যাঁ, এ বয়সে ওই দশটী টাকার ওপর নির্ভর; খাটতে ত আর পারি না—কাজেই কোথা দিয়েও এক পয়সা আসে না। এ ছ'মাস আমি ত ভাবনায়—"

তরুণ তাড়াতাড়ি বলিল, "সে আর একবার ক'রে বল্‌তে। তবে তিনি এ গোটা ছ' মাসই বিছনায় পড়েছিলেন কি না।"

বৃদ্ধা বলিল, "তুমি যখন এসেছ বাবা, তখন জানি টাকার ভাবনা আর নেই। তবু জিজ্ঞেস করি, কিছু পাঠিয়েছেন কি?"

পকেট হইতে তিনখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া তরুণ বলিল, "বেঁচে যে আছ, তা' ত তিনি জান্‌তেন না, তবু এ টাকাটা দিয়েছেন। বাকী আমি গিয়ে পৌঁছুলেই পাবে। তারপর, আমাদের রাজাবাবু ভাল আছেন ত?"

মায়া চকিত দৃষ্টিতে আর একবার ভাল করিয়া তরুণের দিকে চাহিয়া রহিল; বলিল, "আছেন। তবু এখনও জানেন না, যথার্থ তিনি কার ছেলে। দুটো পাগল বুড়ীর পাল্লায় প'ড়ে বেচারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। মুখ ফুটে বলতেও

কিছু পারি না; শুধু জুলজুল ক'রে চেয়ে থাকি—আর লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদি; বলি, হে ভগবান, এ কি করলে!"

কুটীরের দ্বার খুলিয়া দু'জনে ভিতরে আসিলে অন্য একজন বৃদ্ধা বলিল, "কে?"

তরুণ শীঘ্রহস্তে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "আমি পুলিশের লোক ময়না। জান্‌তে এসেছি, সুধাশান্তের যথার্থ পরিচয়টা কি?"

দু'জন বৃদ্ধাই ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। কিছু পরে ময়না বলিল, "তখনি বলেছিলুম মায়া, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে; এ ধরা পড়বেই! পাঁচশ' টাকার লোভ বড় বেশী হ'ল, এখন?"

মায়া বলিল, "তবে যে তুমি বল্‌লে রাণী করুণাময়ীর কাছ থেকে এসেছ; সেটা কি মিথ্যে?"

তরুণ হাসিল; বলিল, "তা' না হ'লে তোমায় পাওয়া যেত কি? না, আমি করুণাময়ীর লোক নই। আমি গোয়েন্দাগিরি করি; আসল কথাটা জান্‌তে এসেছি।"

মায়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আসল-নকল কিছু জানি না মশায়, আপনি বেরিয়ে যান।"

ময়না কিন্তু বাধা দিল; বলিল, "বলে দে মায়া, এখনও সিধে পথে আয়।"

মায়া মুখঝামটা দিয়া বলিল, "তুমি বোঝ না দিদি। জান ত সব। ভদ্রলোকের ঘরের কেলেঙ্কারী চাপা দিতে অত টাকা তারা ঢেলেছেন, আর আমরা নুন খেয়ে এত-বড় বেইমান হব? বল্‌ছ কি, ছিঃ!"

তরুণ বলিল, "তুমি না বল্‌লেও আমি বলাব। আদালতে মোকর্দ্দমা তুলে হাকিমের মুখ দিয়ে জান্‌তে চাইব, দুই মরা ছেলের বদলে এ ছেলে তুমি পেলে কোথায়?"

মায়া চকিত হইয়া বলিল, "দুই মরা ছেলে! খবর আপনি পেলেন কোথায়?"

তরুণ মিথ্যাই বলিল; কহিল, "পুলিশের ডায়েরীতে।"

মায়া চমকিয়া উঠিল; তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "গণশা চৌকীদার এমন বেইমান, ছিঃ!"

তরুণ আবার মিথ্যা বলিল; কহিল, "সেই গণেশই অকপটে আমার কাছে সব স্বীকার করেছে।"

মায়া এবার ভড়কাইয়া গেল; বলিল, "তবে শুনুন, আমি আর কিছু লুকুব না। এই ধর্ম্মের কল!"

সে বলিতে লাগিল—

"সে রাত্রে যেমন জল, তেমনি ঝড়! ওঁদের দু'জনেই প্রসব করলেন। ছেলে দু'টি তখনও মরে নি; তাদের শুইয়ে মায়েদের জ্ঞান ফেরাতে এসে দেখলুম, এই খানেই নতুন কিছুর আরম্ভ বাবু।

"গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। ময়না তাঁকে ভেতরে এনে জায়গাও দিয়েছিল। দেখলুম, তাঁরও প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়েছে। কাজেই অজ্ঞান যারা, তা'দের জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা আমায় দিয়ে হ'ল না। সে ভার ছেড়ে দিলুম আমার বোন্ ময়নার ওপরে। হ্যাঁ, স্বীকার কচ্ছি, রাণীমা নেমেই আমার হাতে একতাড়া নোট গুঁজে দিয়েছিলেন।

"তাঁরও একটী ছেলে হ'ল। সবল, সুস্থ, সুন্দর ছেলেটী! অন্যের তুলনায় এ যেন স্বর্গের আশীর্ব্বাদ!

"ঠিক সেই সময় ময়না খবর দিলে, দুটো ছেলেই মারা গেছে; একেবারে কাঠ! মায়েদের জ্ঞান হয়েছে; তাঁরা দু'জনেই ছেলে চায়।

"উঠছিলুম সঠিক সত্যই জানাতে; কিন্তু রাণী করুণাময়ী বাধা দিলেন। তাঁর ছেলেটীকে তাদের বলেই চালিয়ে দিতে বারবার ক'রে অনুরোধ করলেন। সে উপরোধ এড়াতে পারলুম না; কিন্তু কিছুতেই প্রাণ ধরে বলতে পারলুম না, মরা ছেলের মা-ই এর মা। তাই একটু চালাকি খেলেছি।

"তারপর দশটী ক'রে টাকা প্রতিমাসে পেয়ে এসেছি; আজ ছ'মাস তাও বন্ধ।"

করুণাময়ী! স্মৃতির পাতা উল্টাইয়া এই করুণাময়ীর অন্বেষণ তরুণ বারবার করিয়া করিল; তারপর দ্রুত স্থান ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পথে যে আক্রমণ করিল, তা'কে দুর্দ্দান্ত লাঠিয়াল বলিয়া তরুণ চিনিত। পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বলিল, "রাঘব, তোমার লাঠির চেয়ে বড় অস্ত্র আমার কাছে। হাত নামাও।"

রাঘব শুনিল না; সে মাথা নাড়িয়া লাঠি ঘুরাইয়া

অগ্রসর হইল। তরুণ তার পা লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলে লোকটি পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমি নেমকহারাম হ'তে পারব না মশায়, একেবারেই মেরে ফেলুন।"

তরুণ ধীরকণ্ঠে মিষ্ট ভাষায় জানিতে চাহিল, তার নিয়োগ-কর্ত্তা-কে ?

লোকটা মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "না না, অনেক নুন খেয়েছি বাবু, বল্‌'তে পারব না। এ সব বড় ঘরের কথা ; আমাদের আদার ব্যাপারীর দরকারই বা কি ? সাবধান বাবু, সাবধান !"

কিন্তু তরুণ ফিরিয়া দাঁড়াইবার অগ্রেই গুলি আসিয়া তার হাতে লাগিল ; কিন্তু উপরের আচ্ছাদনের নীচে এক প্রকার ইস্পাতের তারের জালে ঠেকিয়া পড়িয়া গেল— দেহ ভেদ করিতে পারিল না।

ঠিক্ সেই সময় কে একজন অশ্বারোহী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "তোরা মিছে গোলাগুলির অপব্যয় করিস নি রে। রাজা-বাহাদুর মারা গেছেন ; রাণীমা তাঁর ছেলে,—আমাদের এখনকার রাজাকে ফিরিয়ে চান।

—পাঁচ—

ব্যাপারটা এই—

রাজা চরণভূষণ ছিলেন খেয়ালী। কিন্তু এই বলিলেই তার সঠিক পরিচয় হয় না। ঘোর উন্মাদ না হইলেও কোন কোন বিষয়ে তাঁর উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইত। যেমন, তার ধারণা, স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে তা'কে হত্যা করা প্রয়োজন ; কারণ, মা হওয়ার দায়িত্ব লইয়া তাঁরা কখনই অটুট সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারে না।

তাই রাণী করুণাময়ী গর্ভলক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পলাইয়া পিত্রালয়ে গিয়া আশ্রয় লন ; কিন্তু যেদিন প্রসবের সম্ভাবনা, ঠিক্ সেই দিনই রাজা আসিতেছেন শুনিয়া আবার পলায়ন করেন। পথিমধ্যে শিশুর জন্ম ও পরগৃহে বাস এই কারণেই সঙ্ঘটিত হয়।

এখন সুধাশান্ত আর পাগল মায়ের ছেলে নয় ; সে বিশাল রাজ্যের সম্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়। কথাটা পুরাতন ; রাজা ব্যতীত রাজ্যের অন্য সকলেই প্রায় জানিত। তাই পাগলের হাত হইতে ভবিষ্যৎ রাজবংশকে রক্ষা করিতে তাদের এই আপ্রাণ চেষ্টা ; তা'তে তাঁরা সফলতা লাভও করিয়াছিল।

* * * *

বিবাহের পর বরবধূ 'কুঞ্জধামে' আসিলে দুই পাগল মা অগ্রসর হইয়া বরণ করিয়া ঘরে তুলিতে আসিল। এখন তাদের মধ্যের চির বিবাদের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে; তারা বলিয়াছে, না, তাদের ছেলে মরিয়াছে তা'তে ক্ষতি কি ? কিন্তু দু'জনে এতদিন যে সন্তানকে স্নেহ-বাৎসল্য দিয়া মানুষ করিয়া আসিয়াছে, তা'কে ছাড়িয়া, না, তাঁরা কিছুতেই যাইতে পারিবে না।

গান্ধারী বলিল, "ছেলে তোর গঙ্গা কিন্তু বউ আমার। আহা, এ মেয়েকে আমি বুকে ক'রে রাখব ; মাটিতে পা দিতে দেব না !"

গঙ্গা মুখভঙ্গী করিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "আহা, হা আমার যেন দরদ নেই ! আমিই কি দেব ?"

এ দুই বৃদ্ধা সারা জীবনে কিন্তু পুত্রত্বের অধিকার ছাড়িতে চাহে নাই। রাণী করুণাময়ী কেবল হাসিতেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিতেন, "তুমিই ত এই ধ'রে ভদ্র ঘটিয়ে এসেছ মা ! এর দাম সারা পরমায়ু দিয়েও কি আমি শোধ করতে পারব !"

অমনি তিন দিক্ হইতে তিন মায়ে বলিয়া উঠিত, "ষাট্ ষাট্ ষাট্ !"

অশোকা মুখে কাপড় দিয়া কেবলি হাসি চাপিবার প্রয়াস পাইত।

নালুপণ্ডিত

শ্রীহরগোবিন্দ সেন

নালুকে নিয়ে বুঝি আর গল্প লেখা হ'লো না! তার চেহারাটা এত কুৎসিৎ—অবশ্য চেহারার সঙ্গে গল্পের কতটুকুই বা সম্বন্ধ, কিন্তু নায়িকা সম্বন্ধে তো একটা সুবিচার চাই। তা ছাড়া নালুকে নিয়ে সত্যিই গল্প হয় না।

জনমত, নালু বোকা;—আমি বলি, নালু আস্ত বোকা। বোকা দ্বিবিধ। এক,—পড়াশুনা না ক'রে বোকা, আর এক—যাকে দেখলে পড়াশুনা করা-না-করা কোন সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না; অর্থাৎ মাথায় গোবর-পোরা বোকা। নালু আমাদের সেই বোকা। বোকা হ'লেও কিন্তু নালু পণ্ডিত।—কারণ সবাই ডাকে নালুপণ্ডিত। বেড়ালের বাচ্চা যেমন বেড়াল,—মানুষ নয়; পণ্ডিতের বাচ্চা তেম্নি পণ্ডিত,—মূর্খ নয়।—এটা সহজ সিদ্ধান্ত। নালুর গোড়াকার কথা অর্থাৎ স্কুলজীবনের কথা মোটামুটি এই:—প্রমোশন সে কোনদিনই পেতো না—পাবার আশাও রাখতো না। কিন্তু এ ক'রে তো আর চলে না—মানে, বাপের চলে না। তাই অতি সহনশীল বাপেরও একদিন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। বাপ টোলের পণ্ডিত। এযাবৎ তিনি এই দৃষ্টান্তই দেখে এসেছেন, পণ্ডিতের বংশ কখন মূর্খ হয় না। ছেলে সম্বন্ধে তাঁকে এত বিচলিত করেছিলো যে, তিনি নিজের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধেও অনেক সময় ভ্রমে পড়তেন, হয়ত তিনিই মূর্খ!

যাক্, নালুর ইস্কুলে আর কিছু হ'লো না, গেল সংস্কৃত টোলে—বাপের তাড়ায়। কিন্তু সন্ধি পরিচয় হবার আগেই নালু পণ্ডিত হ'য়ে বেরিয়ে এলো। বিদ্যার সঙ্গে সেই দিন থেকে হ'লো বিচ্ছেদ। নালু গ্রাম ছাড়লে। গেল কোথায় তা কেউ জান্‌তো না। যেদিন ফিরলো নালু-পণ্ডিত, সেদিন তার বার আঙুল টিকি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে নালু এলো এক আবির্ভাবের মত।

টিকিকে বাদ দিলেও নালুর থাকে অনেকখানি,—তিলক ও ফোঁটাচন্দনের চারুচিত্রণ। শুনলাম, সে বৃন্দাবনে ছিলো! বৃন্দাবনের অনেক অভ্যাসই সে আয়ত্ত ক'রে এসেছিলো। গেল কতক বাপের তিরস্কারে, কতক প্রতিবেশীর ভয়ে। কিন্তু লোকে যাই বলুক, নালু ভণ্ডামি ক'রে এসব করে না—আমি বলি। কারণ ভণ্ডামি করবার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি তার ছিলো না। তাই যে যা বুঝিয়েছে, তাই সে গ্রহণ করেছে। যদি কেউ বল্‌তো, নালু, হিন্দুধর্ম্মটা ভাল নয়, তুমি মুসলমান হও;—অকাট্য প্রমাণ পেলে—অবশ্য তার বুদ্ধিতে, সে মুসলমানই হতো। সুতরাং নালুর পক্ষে বৈষ্ণব হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়।

আমাকে সে ভারী ভয় করে। ভয় করে, পাছে তাকে নিয়ে কোনদিন গল্প লিখে বসি। কতবার বলেছি, নালু, তোমাকে নিয়ে গল্প হয় না,—তোমার বৃথা ভয়।

যাক্, যে কথা বল্‌ছিলাম। নালুর ভয়াবহ বৈষ্ণবীয় ঘটা দেখে বাপেরও একদিন বুদ্ধিভ্রংশ হলো। ছেলের বিয়ে দিলেন। নালু তখন 'সংসার অসার' 'কা তব কান্তা' এই সব বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে।

বৌ অপরূপ সুন্দরী—জনমত। বাপ ছেলেকে সংসারী করবেন,—তা তপস্যা ভঙ্গ করবার মত উপকরণ বটে!

নালু পণ্ডিতের জীবনে সে এক স্মরণীয় ঘটনা। স্ত্রীকে নিয়ে যে সে কি করবে, কি ভাবে রাখবে, তার একটা সমস্যা! নালু বলে, বৃন্দাবনের রাধা ঠিক অমনটি ছিল। ছিল কি না জানি না,—ধ'রে নেওয়া যাক,—ছিলো। রাধার পায়ে নূপুর এলো, গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসী মালা এলো, তিলক কাটবার রকমারী ছাপ এলো।

কিন্তু পরে কে? রাধা বেঁকে বসলো—বলে, মরণ আর কি! নালু কথা খুব কম বলতো। সে ভালই কর্‌তো: কথা বলবার জন্যে যে ও-মুখ নয়! বিধাতা যেন

তার মুখখানা খাবার জন্যেই তৈরি করেছিলেন। লোকে বলে, অমন বিস্তৃত 'হাঁ' কেউ কখন দেখে নি। একসঙ্গে ছ'খানা লুচি ডেলা পাকিয়ে সে মুখে পুরে দিতে পারতো! বল্‌তো, ব্রাহ্মণের ছেলে এটুকু পারবো না?

তা খেতে সে খুব পারতো। কিন্তু অমন পর্য্যাপ্ত খাবার কোত্থেকে জুটবে? বল্‌তাম, নালু, তোমার এত লোভ কেন?—তুমি বৈষ্ণব মানুষ। নালু অম্নি জিভ কাট্‌তো। বৈষ্ণব বলে তাকে দিয়ে অম্নি অনেক কিছু করিয়ে নেওয়া যেতো। কিন্তু একটা বিষয়ে তার সংশোধন আর কিছুতেই হ'লো না। সেটা হচ্ছে তার রাগ। কারণে অকারণে সে রেগে উঠ্‌তো। বল্‌তাম, তুমি বৈষ্ণব হবার অনুপযুক্ত। সে কেঁদে ফেলতো। বুঝতাম, সে ক্রোধ জয় করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। নালুর চেহারাটা ভাল ছিলো না—মানে কুৎসিৎ, তাই স্ত্রীর ওপর তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি: অর্থাৎ সন্দেহের দৃষ্টি।

একদিন নালুকে বলেছিলাম, নালু, তোমার স্ত্রী দেখতে কেমন? নালুর সে কি রাগ! নালুকে আমি কটুকথা কোনদিনই বলি নি, নইলে বল্‌তাম,—'বানরের গলায় স্বর্ণহার।' যাক্, তার স্ত্রীর কথা এখন থাক্। নালুকে বল্লাম, নালু, তোমার বাপ বুড়ো হয়েছেন—এবার তুমি সংসারের ভার নাও, ওসব ধর্ম্মকর্ম্ম করলে কি এখন চলে?

নালু চুপ ক'রে শুনলে।—এই চুপ করেই তার একবছর কেটে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই:—এই একবছরে তার অনেকখানি পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল! ত্রিকণ্ঠীমালা গেল, তিলোক ফোঁটা গেল, বার আঙুল টিকি গেল। কিন্তু কেন গেল, আজও তার কূল কিনারা পাই নি। একটা কথা শুনেছিলাম, তার স্ত্রী এসব ভালবাসে না। স্ত্রীর মনস্তুষ্টি—একটা জোরাল কারণ বটে। আমার স্ত্রী বলে, নালু পণ্ডিত নাকি আজকাল 'হিমানী' মাখ্‌ছে।

কথাটা একদিন স্পষ্ট করে নিলাম। নালু হাস্‌তে লাগলো। নালুকে কেউ ফর্সা বল্লে তার আনন্দ আর ধরে না।

'বিজ্ঞানের যুগ মাখবে বই কি ভাই! রাধার যুগে ছিলো না, নইলে তিনি কি আর কৃষ্ণকে মাখাতে কসুর করতেন।'

নালুর হাসি আর ধরে না। বল্লে, বৌ জানে না, আমি তার বাক্স থেকে চুরি ক'রে ক'রে মাখি।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই: নালু আজকাল গান গায়! বাপ গেলেন শিষ্য বাড়ী, অম্নি নালুর কণ্ঠ সপ্তমে উঠলো। পাশা-পাশি বাড়ী, ধৈর্য্য আর রইল না। বল্লাম, তোমার গলা ভাল, খাদে অভ্যাস কর।

সেদিন দুপুর বেলায় কি-একটা গল্প লিখবার বৃথা চেষ্টা করছি; বৌ এসে বল্লে,—ওগো শুনছো, তোমাদের নালু পণ্ডিতের সঙ্গে যে আজ বৌটার ঝগড়া হ'য়ে গেল।

আকাশ থেকে পড়্‌লাম!—নালুপণ্ডিতের সঙ্গে তার বৌ-এর ঝগড়া!

বিষয়টা হচ্ছে: বাপের বাড়ীর সম্পর্কে কে একজনের সঙ্গে তার বৌ হেসে কথা বলেছিল—নালুই বল্লে। 'দেখ দেখি কি অন্যায়,—পুরুষ মানুষ তো।—কথায় বলে ঘৃত আর অগ্নি।'—নালু বলে আর চোখ মোছে।

মনে হ'লো ঠাস্ ক'রে একটা চড় মারি। রসিকতা করবার ইচ্ছা ছিলো না, নইলে এটা বুঝতে দেরী হয় না যুবকটি সুপুরুষ; গাত্রদাহ সেইখানেই।

বল্লাম, ব্যাটাছেলে কাঁদা কেন?

নালু কি গজ্ গজ্ ক'রে বল্লে বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

বৌকে এসে বল্লাম, ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন। স্ত্রী একটা বড়রকম কিছু শুনবো ব'লে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ছিলো।

বল্লাম, আমি সুপুরুষ,—এ ভগবানের আশীর্ব্বাদ। বৌ হেসে ফেল্লে।

তুমি হাস্‌ছো?—কুৎসিৎ হ'লেই মনে হ'তো, তুমি দুনিয়ার সুশ্রী পুরুষগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে বুঝি বা চেয়ে আছো।

'তোমাদের নালুপণ্ডিতের ঝগড়া বুঝি এই নিয়ে?'

কিন্তু বৃথা। নালুপণ্ডিতের সংশোধন আর হ'লো না।

সজাগ প্রহরীর মত সে সারাদিন বাড়ীতে বসে স্ত্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতির হিসাব-নিকাশ করে।

আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হ'তো—যেমন ইচ্ছা হয়, খাঁচার পাখীকে খাঁচা থেকে মুক্তি দিতে: ঐ বৌটাকে সবার অলক্ষ্যে তার বন্দীজীবন থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসে বিশাল পৃথিবীর বুকে ছেড়ে দি'।

নালুকে দৈত্য-পরীর গল্প বল্লাম। বল্লাম, সরল হ'তে শেখো, বিশ্বাস কর; নইলে পাহারা বসিয়ে কেউ কাউকে বাঁধ্‌তে পারে না।

নালু বুঝ্‌তো কিনা কে জানে। তবে যতদিন কাছে ছিলাম, সৎবুদ্ধিই দিয়ে এসেছি। কেউ একথা বল্‌তে পার্‌বে না,—অসৎ সংসর্গেই নালুর সর্ব্বনাশ হয়েছে।

কিন্তু সর্ব্বনাশ তার হ'লো। নালু চুরি করলে। আর আমারই পকেট থেকে চুরি করলে। একথা কে বিশ্বাস করবে? কিন্তু চুরি সে করলে। বুঝ্‌লাম, নালুর এতদিনে দুর্দ্দিন উপস্থিত হ'লো। আজ পর্য্যন্ত তার একটি পয়সারও প্রয়োজন হয় নি। কারণ, মনে প্রাণে সে বৈষ্ণব ছিলো। আর আজ?

এর উত্তর কি-ই বা দেবো?

নালু সহরে যায় আর সাবান এসেন্স পকেট ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে আসে।

একটা কি সাড়ী উঠেছে,—নালু তার নাম জানে না: তার ভারী ইচ্ছা ঐরকম একখানা সাড়ী সে কেনে। কিন্তু দাম বলেছে তিন টাকা। বল্লাম, নালু, আমি টাকা দেবো, তুমি সাড়ী কিনে এনো।

নালুর সে কি আনন্দ! বল্লে, দেবে দাদা তুমি? সত্যিই তুমি দাদার কাজ করলে।

হাস্‌লাম।

গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিতটা গেল ম'রে। বল্লাম, নালু, তুমি পাঠশালার ঐ কাজটা নাও: পয়সা নইলে কি বৌ ভালবাসে।

'ঠিক বলেছ দাদা, ও শালীর জাতই অম্নি! কিন্তু আমাকে দেবে কেন?'

আচ্ছা, সে ব্যবস্থা আমি ক'রে দোবো এখন।

অতবড় পণ্ডিতের বংশ,—চাকরি অবশ্য সহজেই হ'লো। আমিও মুক্তি পেলাম—এ যেন আমারই মুক্তি!—আহা, বেচারি বৌটা!

নালু পণ্ডিত সত্যিই এবার পণ্ডিত হ'লো। একমাস যায়, দু'মাস যায়, নালু পণ্ডিত বেশ ইস্কুল চালায়। মাইনে ব'লে যা পায় তা অবশ্য বেশী কিছু নয়: গ্রামের স্কুলে ছোট ছোট ছেলেরা পড়ে, বারটা ক'রে টাকা দেয়।—তা খুব দেয়। আমি তো বলি তাই যথেষ্ট। নালুর আবার খরচ কি? হাতখরচটা চলে গেলেই হ'লো। বাপ রয়েছেন মাথার ওপর, এখন তার মাথা ব্যথা কি?

কিন্তু নালু আজকাল মাইনের কথাটাই বড় বেশী বলে। একদিন স্পষ্টই বল্লে, আমার ওতে কুলায় না দাদা!

বড় রাগ হ'লো। বল্লাম, নালু, মাইনের কথা অত চিন্তা ক'রো না,--এই বা কে দেয়?

আত্মীয়স্বজন বাড়ী আসা বন্ধ করেছে—মানে, তারা আর আসে না নালুর ব্যবহারে। তাই ব'লে বৌটার নির্য্যাতন কিছুমাত্র কমে নি। কমবার কথাও নয়; সন্দেহ বরং আরো বেড়েছে। সারা দুপুর সে যে বাড়ী থাকে না,—এই দীর্ঘ সময় তার রাধার কি ঘুমিয়ে কাটে? না, এতটা সময় কেউ ঘুমুতে পারে?

নালুর আনন্দের দিন এলো—পূজোর ছুটি হ'লো। দীর্ঘ একমাস তার পাঠশালা বন্ধ। এইবার সে তার বৌকে চোখে চোখে রাখবে। নিশ্চয় রাখবে,—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌বে। হয়ত গত কয়েক মাসের অভ্যাস চোখে পড়্‌লেও পড়্‌তে পারে।

বৌ সব বোঝে। স্বামীর এই প্রবৃত্তিতে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা ধরে।

একদিন ভয়ানক ঝগড়া হয়ে গেল;—বাপ ছিল না বাড়ীতে সেই অবসরে। বৌটার কণ্ঠ শোনা গেলেও অত ঝাঁঝালো নয়। কিন্তু নালুর প্রচণ্ড প্রতাপোক্তির প্রতিটি বর্ণ সুস্পষ্ট কানে এলো। নালু আর যাই হোক, কাপুরুষ নয়: এইটেই সে বড় গলায় হয়ত বোঝাতে চাইলো।

নালু একদিন এলো। বল্লে, দাদা, আর তো পারি না, আমি বৃন্দাবনে ছিলাম—বেশ ছিলাম। বিয়ে ক'রে আমার ইহকাল পরকাল দুই-ই গেল।

আমাকে বল্‌বার অবসর না দিয়েই ব'লে চল্লো,—আমি কিন্তু আর একটি পয়সাও দিচ্ছি না।—যত ক'রে মরবো—

বল্লাম, নালু, মেয়েমানুষকে বেশী নাই দিতে নাই।

'আবার!' বলে, নালু কি সব গজ্ গজ্ করতে লাগ্‌লো।

নালুকে বল্লাম, আচ্ছা পণ্ডিত, তুমি যদি একশো টাকা ক'রে কোনদিন মাইনে পাও?

নালু একগাল হেসে বল্লে, তা' হ'লে?—ঐ একশো টাকা আমি একবার ঐ হারামজাদীর হাতে ধরে দি'।

মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল। নালু কি তবে দিবা রাত্র আজকাল টাকার চিন্তাই করে?

খবর পেলাম মাস দুই আগে নালুর হাতে কিছু মোটা টাকা জমিদার বাড়ী থেকে এসে পৌচেছে: স্কুলঘরটার নাকি এবার সংস্কার হবে।

নালু আমাকে কোন কথা গোপন করে না, অথচ কেন যে সে এই কথাটা এযাবৎ গোপন ক'রে এলো—কেমন যেন খট্‌কা লাগ্‌লো।

জানা অবশ্য গেল, কিন্তু বড় দেরীতে। জমিদার কিছুতে ছাড়্‌লে না, নালুকে চালান দিলে। জামিনে খালাস ক'রে এনে নালুকে বল্লাম, টাকাটা ফেলে দাও নালু,—আমি নিজে গিয়ে জমিদারকে দিয়ে আস্‌ছি।

নালু কেঁদে ফেল্‌লে। বল্‌লে, টাকা তো আমার নেই,—সব খরচ ক'রে ফেলেছি।

'সর্ব্বনাশ! অত টাকা কিসে খরচ করলে?'

নালু হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো। বল্‌লে, তবু হারামজাদীর মন পাই নে।

এইবার—এতদিন পরে নালুর বৌএর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটলো—মানে, নালুই তার অন্দরের দিকে আমাকে ঠেলে দিলে।

বেশ বৌ।—এতদিন যাকে দেখি নি, আজ তাকে না দেখলে দুঃখ ছিলো না, কিন্তু আজ আমি একথাটা কিছুতেই বলতে ছাড়বো না,—এই আমার পরম দুঃখ তাকে না দেখলেই ছিলো ভাল। এমন স্ত্রী পেয়েও নালু সুখী হ'তে পারলো না: এই কথাটাই বার বার ক'রে মনে হলো।

অসঙ্কোচে নালুর বৌ আমার কাছে এগিয়ে এসে বল্লে, গয়না বলতে আমার অবশ্য বেশী কিছু নেই—কিন্তু যা আছে, এই বিক্রী ক'রে আপনি ওকে বাঁচান।

আমি গয়না নিতেই এসেছিলাম স্বীকার করতে লজ্জা নেই। কিন্তু শুধু হাতেই ফিরে এলাম। বলে এলাম, বৌদি', তোমার স্বামীকে বাঁচাবার ভার আমি নিলাম।

নালু বাইরেই কোথাও অপেক্ষা ক'রে ছিলো। আমাকে শুধু হাতে ফিরতে দেখে লাফিয়ে উঠলো। বল্লে, হারামজাদী দিলে না তবে?

ঠাস্ ক'রে তার গালে একটা চড় মেরে বেরিয়ে এলাম। তার জেল হওয়াই উচিত, মন যেন চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো।

টাকা পেয়ে জমিদার নালুকে মুক্তি দিলেন; কিন্তু চাকরি আর দিলেন না।

সেইদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লাম, নালুপণ্ডিত জেলে পাথর ভাঙ্‌ছে। তার ক্ষুদি ক্ষুদি চোখ দুটো জোনাকির মত জ্বল্‌ছে। আমাকে দেখে সে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, হারামজাদীর গায়ে ক'খানা গয়না আর উঠ্‌লো?

চট্ ক'রে ঘুমটা ভেঙে যেতেই আমার প্রথম মনে এলো,—নালু পণ্ডিতকে নিয়ে গল্প এবার একটা হ'লেও হ'তে পারে।

———

নীলাঞ্জন

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বাভাস

কেতকী ও অতসী দুই ভগ্নী। পিতার সহিত কলিকাতা হইতে দুইশত মাইল দূরে এক স্বাস্থ্য-নিবাসে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আসিয়াছিল। জনৈক আত্মীয়া রমা পিসী, মনীষা দেবী নাম্নী এক প্রতিবেশিনীর চরিত্রে নানা দোষারোপ করেন এবং বলেন—নিশীথ সেন বলিয়া এক যুবক উঁহার পাল্লায় পড়িয়া উৎসন্ন গিয়াছে। তাহারা যেন তাহার সহিত আলাপ না করে। কিন্তু আলাপ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

বেড়াইতে বাহির হইয়া কেতকী এই দুইজনকে দেখিতে পাইল। তাহারা তাহাদেরই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। হঠাৎ কি একটা শব্দে চকিত কেতকী ফিরিয়া দেখিল, তাহার পিতা মাঠের মধ্যে পড়িয়া আছেন। ছুটিয়া সে অতসীকে ডাকিয়া আনিল। দুই ভগ্নীর শুশ্রূষায় পিতা সুস্থ হইলেন। তাঁহার মুখে—"এ জীবনে আবার কেন তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়ালে? যাও, তুমি যাও!" শুনিয়া কেতকীর মনে সন্দেহের সহিত আশঙ্কা জাগিল।

একটা ছোট্ট কুকুর পা ভাঙিয়া তাহাদের বাড়ী আসিলে কেতকী 'আইডিন' দিয়া তা'কে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল। তারপর আসিলেন সেই কুকুরের মালিক নিশীথ সেন। কেতকীর পিতা জগদীশ মিত্র আসিলেন তারও পরে। এ দুইয়ে যে-ভাবে আলোচনা হইল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল, উভয়েই পরস্পরের উপর বিদ্বেষ বহন করেন। ইহার পিছনে যে একটা অতীত ইতিহাস বর্ত্তমান, কেতকী তা' স্পষ্ট বুঝিল।

পরদিন বেড়াইতে বাহির হইয়া ঝড়-বৃষ্টির মুখে পড়িয়া কেতকী বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। মনীষা দেবী তাহাকে আশ্রয় দিতে নিজ বাড়ীতে ডাকিয়া লইলেন। আলাপ-ব্যবহারে রমা পিসীর ছড়ান বিষের রিষ হয় ত অনেকটাই লুপ্ত হইত, কিন্তু এখানেও নিশীথ সেনকে দেখিয়া কেতকীর বিদ্বেষভাবটা আবার যেন জাগিল; কিন্তু শেষ অবধি মনীষা দেবীর ব্যবহারে তাহা স্থায়ী হইতে পারিল না।

ফিরিবার পথে পিতার সহিত সাক্ষাৎ। কেতকী ওই নিষিদ্ধ স্থানটীতে যাওয়ার জন্য পিতার নিকট হইতে কোন না কোনপ্রকার ঝঞ্ঝাঘাতের প্রতীক্ষায় সারাদিন রহিল; কিন্তু কিছুই আসিল না। এমন কি, দুই ভগ্নীর বাদ-প্রতিবাদে কেতকী যখন রমা পিসীকে মনীষা দেবী সম্বন্ধে মিথ্যাবাদিনী ঘোষণা করিল, তখনও তিনি কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

ডাক আসিল। একখানি পত্র বোম্বাই হইতে আসিয়াছিল। পত্র পড়িয়া জগদীশবাবুর মুখে সুস্পষ্ট ভাবান্তর দেখা গেল। তিনি সেইদিনই কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ভগ্নীর কথায় কেতকী বুঝিল, তাহার বোর্ডিং-বাসকালে এরূপ পত্র আসিত এবং ইহা পাইয়া পিতা ঠিক এইভাবেই কলিকাতা চলিয়া যাইতেন।

পরে আসিলেন নিশীথ সেন। তিনি কেতকীকে তাহার পিতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন এবং কলিকাতা গিয়াছেন শুনিয়া একখানি পকেট টাইম-টেবিল বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সেই সময় একখানি পত্র পড়িয়া গেল। কেতকী নিশীথকে সেখানি দেখাইয়া দিবার মুখে পিতার পত্রের সহিত তাহার ঐক্য দেখিয়া বিস্মিত হইল।

রমা পিসীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে গিয়া কেতকী বিজয়লাল দত্ত বলিয়া একটী লোকের সহিত পরিচিত

হইল। লোকটী বম্বে হইতে আসিয়াছিল। কথায় কথায় কেতকী স্পষ্ট বুঝিল, তাহারই লিখিত পত্র পাইয়া পিতা কলিকাতা গিয়াছেন।

কয়দিন অতীত হইলেও পিতাকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া দুই ভগ্নী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। মনীষা দেবীর বাড়ীতে নিশীথ সেনকে দেখিয়া কেতকী তাঁহাকে পত্রের কথা বলায় তিনি উড়ো কথায় তাহা এড়াইয়া যাইতে চাহিলেন। এখানে কিন্তু মনীষার ভাব পরিবর্ত্তন ঘটিল। উপায়হীন কেতকী তখন পিতার জীবনের আশঙ্কা করে বলিল; আর বলিল, যদি নিশীথ স্পষ্ট কথা না বলেন, তবে সে পত্রপ্রেরক বিজয় দত্তের কাছে যাইবে। মনীষা সাগ্রহে বাধা দিলেন; বলিলেন—তোমার বাবা ও বিজয় দত্ত পরস্পর ভীষণ শত্রু; তাঁর কাছে তুমি যেও না। তিনি তার দেখা পান নি; কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তা'কে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবেন।

এই সময় নিশীথ বলিলেন—আপনার আর চিন্তা করবার আবশ্যক হবে না; আপনার পিতা ফিরে এসেছেন। দেখা গেল, পথ দিয়া মন্থরপদে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

পিতা পুত্রী মাঠে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। কেতকী হঠাৎ বিজয়লাল দত্তের সহিত রমা পিসীর বাড়ীতে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা বলিতেই তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—এত কাছে!

তারপরই সেই বিজয় দত্তের সহিত উভয়ের সাক্ষাৎ! তার বিহ্বল-ভাব দেখিয়া জগদীশবাবু জানিতে চাহিলেন, সে পথ হারাইয়াছে কি না?

লোকটী কম্পিত দেহে ও স্বরে বলিল—আমি ওঁকে নিশীথ সেনের বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছি।

জগদীশবাবু তাহাকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিতে চলিলেন। মেয়েকে বিশেষ একটী কাজের অছিলায় অন্যস্থানে পাঠাইলেন। কেতকী দেখিল, বিজয় অনিচ্ছায় তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে।

পরদিনের প্রার্থনায় জগদীশের বাণী উপস্থিত শ্রোতৃমাত্রকেই মোহিত করিয়া তুলিয়াছিল; ঠিক সেই সময় দ্বারবানের সহিত পুলিশ উপাসনা-স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সভা ভঙ্গ হইল। এক অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় কেতকীর মন দুলিয়া উঠিল। পথে শুনিল, নিশীথ মনীষাকে বলিতেছে—কে বিজয়কে খুন করেছে।

কথাটায় কেতকী মাথায় এক তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করিল; মনে হইল, তার সম্মুখে অতল অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে।

সাতদিনের পর জ্ঞানহারা কেতকীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে দেখিল 'টিপয়ে'র 'ভাস' গোলাপফুলে ভরা। শুনিল, নিশীথবাবু প্রত্যহ-ই দিয়া যান। বাপের খবর জানিতে চাহিয়া শুনিল, তিনি ভালই আছেন। হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই সময় তাহার পিতা আসিলেন। কন্যাকে সুস্থ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। বিজয় সম্বন্ধে সে কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করে নাই, এজন্য তাঁর মুখে প্রশংসার বাণী বাহির হইয়া আসিল। কথাটায় কেতকীর কৌতূহল বৃদ্ধি হইলে তিনি বিরক্ত হইয়া নিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

একজন মহিলা তিনদিন পরে জগদীশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে বিজয়ের ভগ্নী চন্দ্রা। সে ফণি মজুমদারের সন্ধান জানিতে চাহিল। কেতকী জানে না; কাজেই তাহাই বলিল। চন্দ্রার মুখে শুনিল, হত্যাকারী সম্ভবতঃ সেই। পিতাকে চন্দ্রার কথা বলায় তিনি সাক্ষাৎ করিতে রাজী হইলেন না; শুধু এখনকার জন্য নয়—জীবনে কোনদিনই নয়।

চন্দ্রাকে বলায় সে দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বলিয়া গেল, সে জীবনের পরপার পর্য্যন্ত খুঁজিয়া ফণি মজুমদারকে বাহির করিবে। পরদিন পিতার বুকের বামদিকে রক্তরঞ্জিত ব্যাণ্ডেজ দেখিয়া কেতকী ডাক্তারকে খবর দিতে চাহিল; কিন্তু জগদীশবাবু কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না।

নিশীথের কথায় বোঝা গেল, তিনি অনেক কিছুই জানেন না। কেতকী পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে বলিলেন, এ সব বিষয় নিয়ে আপনার মাথা না ঘামানই উচিত।

দু'জনে মনীষার বাড়ীতে আসিলেন। সেখানে চন্দ্রার সহিত সাক্ষাৎ! তাহার কথায় বুঝা গেল, এক বিপদে নিশীথ তাহার জীবন-রক্ষা করিয়াছিলেন। ফণি মজুমদারকে তাঁহারা দু'জনেই চেনেন না বলিলেন। একটী দেরাজের প্রতি চন্দ্রার মন আকৃষ্ট হইল। সে একটা কল টিপিলে এক গুপ্তটানা বাহির হইয়া আসিল। তাহার ভিতরে একখানি ফটো দেখিয়া সে বলিল—এই ফণি মজুমদার!

মনীষা দেবী বলিলেন—এ ফটোর লোকটী আজ বিশ বৎসর মারা গিয়াছে। চন্দ্রা বিশ্বাস করিল না; কিন্তু নিশীথের সহিত চলিয়া গেল। কেতকী ফটো দেখিয়া বুঝিল, এ তাহারি পিতা—হত্যাকারী তাহা হইলে তিনিই।

অতসী পিতার কাছে চন্দ্রার সহিত সাক্ষাতের খবর এবং সে যে তাঁহাকেই চায় সে কথা বলিল। সঙ্গে আরও বলিল—তোমাদের এ অন্ধ যবনিকা সরিয়ে দাও বাবা! আমি সত্য চাই! পিতা পুত্রীকে সময়মত সব কথা বলিবার আশ্বাস দিয়া নিবৃত্ত করিল। কেতকী মনে করিয়াছিল, চন্দ্রা চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু নিশীথের মুখে শুনিল, না, চন্দ্রা যায় নাই—সে ফণি মজুমদারকে বাহির করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। আর শুনিল মনীষা দেবীর মুখে, তিনিই তাহার মা। বিজয়ের সঙ্গে তাঁহার কোন অন্যায় সম্বন্ধ ছিল না; সে কামনা করিত সত্য, কিন্তু কোন অঘটন ঘটে নাই। নিশীথের সহিত পরিচয় বাল্যে; সে অনেকদিনের ছোট হইলেও তাঁহার বিশেষ বন্ধু।

চন্দ্রা হঠাৎ একদিন আসিয়া কেতকীর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল। কেতকী সত্যই বলিল—তিনি চ'লে গেছেন।

চন্দ্রা বিশ্বাস করিল না, বিষম রাগিল। তাহার ধারণা, তিনিই ফণি মজুমদারের সংবাদ দিতে পারেন। ইহারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেছে না। পণ করিল, সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেই।

একুশ

বাড়ীর সামনে বারান্দায় বসেছিলাম একা! বাদল আকাশের মত সারা মন ভারী হ'য়ে উঠেছে—যে আবর্ত্তের মধ্যে পড়েছি, মনে হচ্ছে যেন, তা' থেকে মুক্তি নেই... মুক্তি নেই...

সহসা ফটকের কাছে মানুষের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে অপার বিস্ময়ে দেখলাম, চন্দ্রা আমাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করছে! দূর থেকে আমাকে দেখে সে মাথা নেড়ে অভিবাদন জ্ঞাপন করলে; তারপর ক্ষিপ্রপদে কাছে এসে উপস্থিত হ'ল।

পাশে একখানা সোফা ছিল, তার উপর ব'সে সে আমার মুখের পানে তাকিয়ে স্বল্প হাসি হেসে বল্‌লে—খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছ, না?

মাথা নেড়ে বল্‌লাম—খুব না হলেও, আশ্চর্য্য হয়েছি বটে।

চন্দ্রা নিম্নকণ্ঠে বল্‌লে—একটি প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। সে কথা শুনে তুমি রাগ কোরো না; আগে আমার সব বক্তব্য শোনো, তারপর যা' বলবার, বোলো।

—কি আপনার বক্তব্য, বলুন। আমি রাগ করব না।

চন্দ্রা আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করলেও, তার সঙ্গে অতখানি আত্মীয়তা করবার স্পৃহা আমার ছিল না।

আমার কথা শুনে সে কিয়ৎকাল নির্নিমেষ নেত্রে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর গাঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—তুমি কি কোনদিন কারুকে, মানে, কোন পুরুষকে ভালবেসেছ?

একান্ত অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন! অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ-চোখ বোধ করি আরক্ত হ'য়ে উঠেছিল; যতদূর সম্ভব সংযত কণ্ঠে বল্‌লাম—আপনি যে-ভাবে বলছেন, সে-ভাবে আমি—না, আমি কারুকে ভালবাসি নি।

চন্দ্রা বল্লে—কিন্তু আমি বেসেছি। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আমি একজনকে ভালবেসেছি। যেদিন সে আমার প্রাণরক্ষা করেছিল, সেদিন থেকে সারাক্ষণ তার প্রতি প্রেমে আমার দেহ-মন আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। সে লোকটি কে, তা' বোধ করি তুমি জানো?

মাথা নেড়ে জানালাম, জানি বই কি।

চন্দ্রা বলতে লাগ্‌লো—বহুদিন পরে ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁর দেখা পেয়েছি। তাঁকে দেখে আমার ভালবাসা আরও গভীর আরও দুর্নিবার হ'য়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, তাঁকে বাদ দিয়ে আমার জীবনের কোন অস্তিত্বই নেই।

শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম—আপনার প্রতি নিশীথবাবুর মনের ভাব কি রকম?

—ঠিক জানি না। তিনি আমায় যে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমায় ভালবাসেন কি না, তা' ঠিক জানি নে। যাই হোক্, সেই ভালবাসা আমায় অর্জ্জন করতে হবে। সেই জন্যেই আমি তোমার কাছে এসেছি।

সবিস্ময়ে বললাম—সেই জন্যে আমার কাছে এসেছেন!!

চন্দ্রা বলতে লাগলো—হ্যাঁ, তাই। তোমায় ভয় করি। তোমার মতো রূপ আমার নেই—সেই কারণে আমি তোমায় ভয় করি। আমি জানি, নিশীথবাবু তোমায় প্রশংসার চোখে দেখেন—ভক্তের মতো মুগ্ধ চোখে! কিন্তু তুমি, তুমি তো তাঁকে সে ভাবে দ্যাখ না? বল, তুমিও কি তাঁকে…

মাথা নেড়ে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লাম—না।

—বেশ, তা' হ'লে শোন। আমি জানি, ফণি মজুমদার কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে, আর তার সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার কোন সম্পর্ক আছে। কিন্তু সে-সব কথা আমি ভুলে যেতে রাজী আছি। ফণি মজুমদারকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতে রাজী আছি, তুমি যদি আমায় সাহায্য কর।

অবুঝের মতো বল্লাম—কেমন ক'রে আপনাকে সাহায্য করব?

—সেই কথা বলতেই ত আমার আসা। নিশীথবাবুর সঙ্গ তুমি পরিত্যাগ কর। তাঁর প্রতি মনোযোগ দেওয়া দূরের কথা,—তাঁর প্রতি তুমি অবহেলা প্রদর্শন কর। যদি তিনি তোমার কাছে কোন প্রস্তাব করেন—আমার মনে হয় শীঘ্রই তিনি তোমার কাছে তাঁর মনের কথা বলবেন—সে প্রস্তাব তুমি রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান কোরো; তাঁর প্রতি তুমি এমন ভাব দেখাবে, যাতে তিনি বুঝবেন, তুমি তাঁকে ঘৃণা কর। তা' হ'লে তিনি তোমার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে স্বাভাবিকভাবে আমার কাছে ফিরে আসবেন। তখন আমি তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পাবো। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে—আমি বাঁচবো। বল তুমি? আমায় সাহায্য করবে?

চন্দ্রার কথা শুনে ক্রোধে ঘৃণায় আমার সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ল, এ-ছাড়া বাবাকে বাঁচাবার হয় ত অন্য কোন পথ নেই, এবং তাঁকে বাঁচাতেই হবে। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে শান্ত অকম্পিত কণ্ঠে বল্লাম—আপনাকে সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত! কিন্তু…

'কিন্তু' কি বল?

কিন্তু আপনি যাঁর জন্য এত কাণ্ড করছেন, শেষ অবধি তাঁকে যদি না পান, তখন কী হবে! এতখানি অনিশ্চিতের পিছনে…

চন্দ্রা আমায় থামিয়ে দিয়ে বল্লে—ও কথা বলো না—তোমার কথা শুনলে ভয়ে আমার মন আকুল হ'য়ে ওঠে। অনিশ্চিত নয়, আমি জানি, তোমার কাছ থেকে যদি তাঁকে দূরে নিয়ে যেতে পারি, তা' হ'লে তাঁকে লাভ করা আমার পক্ষে কঠিন হবে না। তুমি রাজী ত?

কথা বলার শক্তি লোপ পেয়েছিল। মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলাম।

চন্দ্রা উঠে দাঁড়িয়ে সস্মিত মুখে বল্লে—তোমার কাছে আমরণ কৃতজ্ঞ রইলাম। তুমি নিশ্চিন্ত হও—ফণি মজুমদার

নামে যে কোন লোক কোনদিন এ পৃথিবীতে ছিল, সে-কথা আমি ভুলে গেছি।

সে লঘু চঞ্চল পদে প্রস্থান করলে। আমি যেমন বসেছিলাম, তেমনি নিস্পন্দভাবে ব'সে রইলাম—বুকের ভিতর কান্নার সমুদ্র উথ্‌লে উঠ্‌ছে, কিন্তু বেরুবার পথ পাচ্ছে না; সারা দেহ আমার যেন স্তব্ধ বজ্রাহত হ'য়ে গেছে !

বাইশ

মায়ের কোলের ওপর মাথা রেখে বল্লাম—তোমায় আমি সব কথা পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে পারবো না; মা, কিন্তু আর আমি সইতে পারছি নে—সকলে মিলে আমাকে যেন শ্বাসরোধ ক'রে হত্যা করবার চেষ্টা করছে। এই অসহ অবস্থা থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। আমি এখান থেকে অনেক, অনেক দূরে কোথাও চ'লে যেতে চাই। তুমি তার উপায় ক'রে দাও।

তিনি আমার মনের কথা বুঝলেন কি না জানি না; ধীরে ধীরে আমার মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে বল্লেন—কিছুদিন অন্য কোথাও থাকা এখন তোমার পক্ষে ভালই হবে। আমি ত শীগ্‌গিরই কোলকাতায় যাচ্ছি; তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

—যাব! নিশ্চয়ই যাব! তা' হ'লে ত আমি বেঁচে যাই!

তিনি বল্‌লেন—আমার একজন সহকর্ম্মিণীর প্রয়োজন হয়েছে। দেখতেই ত পাচ্ছো, একা থাকি; লেখা-পড়া এবং অন্য কাজের জন্যে একজন সেক্রেটারী-গোছের মেয়ে আমার দরকার। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। তুমি যদি সে কাজগুলি কর, তা' হ'লে সে বিজ্ঞাপন উঠিয়ে নি।

দু'হাতে তাঁর কটিদেশ বেষ্টন ক'রে বল্‌লাম—করবো! আজ থেকে তোমার সমস্ত কাজের ভার আমি নিলাম!

আমার কথা শুনে তাঁর দু'চোখ অশ্রুপ্লাবিত হ'ল।

কিছুক্ষণ পরে মায়ের কাছ থেকে ফিরবার পথে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে নিশীথবাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।

তিনি ক্ষিপ্রপদে একেবারে আমার সম্মুখে এসে গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লেন—নমস্কার মিস্ মিত্র।

কোনরকমে প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন ক'রে আমি তাঁর পাশ কাটিয়ে প্রস্থান করবার চেষ্টা করলাম। তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে আমার পথরোধ ক'রে ক্ষুব্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লেন—ব্যাপার কি মিস্ মিত্র। আমি কী করেছি, যার জন্যে আপনি আজ ক'দিন ধ'রে আমাকে এ-ভাবে এড়িয়ে চলছেন ?

আরক্ত মুখে স্খলিত কণ্ঠে বল্‌লাম—আপনি কী বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না। দয়া ক'রে আমায় যাবার পথ দিন।

না। যতক্ষণ না আপনি বল্‌বেন আমার কি অপরাধ, কেন আপনি আমার ওপর বিমুখ হয়েছেন, ততক্ষণ আমি পথ ছাড়ব না। আর আমি কাল দু'বার ধ'রে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসেছিলাম, কিন্তু দু'বারই আপনি দেখা করেন নি। কিন্তু কেন ?

কী উত্তর দেব? অসহায়ভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বল্‌লাম—আপনার ওপর এতদিন আমার এতটুকুও বিরাগের কারণ ঘটে নি। কিন্তু এইবার ঘটবে। আপনি যদি এ ভাবে আমার পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন, তা' হ'লে সত্যিই আমি ক্ষুণ্ণ হব। পথ ছাড়ুন। আমার তাড়াতাড়ি বাড়ী যাবার দরকার আছে।

নিশীথবাবু ত্রস্ত হ'য়ে পথের পাশে দাঁড়ালেন। আমি মৌন বিবর্ণমুখে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলাম। তাঁর সুন্দর প্রশান্ত মুখের ওপর ক্ষণকালের জন্যে যে বেদনার ছায়া ফুটে উঠ্‌লো, তা' আমার চোখ এড়াল না!

ভগবান! এ কী মর্ম্মন্তুদ পরীক্ষার আগুনে তুমি আমাকে নিক্ষেপ করলে!

সেইদিন সন্ধ্যায়—

ঘরের বাইরে বারান্দার ওপর ব'সে বোধ করি নিজের ভবিষ্যতের কথাই ভাবছিলাম, এমন সময় পদশব্দ শুনে চকিত হ'য়ে দেখলাম—নিশীথবাবু সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছেন!

এমন অসময়ে তাঁকে দেখে বুক কেঁপে উঠ্‌লো। কী ব'লে তাঁকে অভ্যর্থনা করব, ভেবে পেলাম না।

অভ্যর্থনার তোয়াক্কা তিনি করলেন না; সুমুখের চেয়ার অধিকার ক'রে উপবেশনান্তে বল্‌লেন—শুনলাম, আপনি কাল মনীষা দেবীর সঙ্গে কোলকাতা যাচ্ছেন?

মৃদুকণ্ঠে বল্‌লাম—হ্যাঁ; যাচ্ছি তো।

—কেন, যাবার এমন কী দরকার পড়ল?

বল্‌লাম—আমি যে মনীষা দেবীর কাছে কাজ নিয়েছি—সেক্রেটারীর কাজ।

শুনে নিশীথবাবু যারপরনাই বিস্মিত হলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকবার পর তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমার একান্ত সন্নিকটে এসে আমার চোখের ওপর চোখ রেখে কী যেন বলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর সেই দুই আকুল চোখের পানে চেয়ে মুহূর্ত্তের জন্য আমার আত্মবিস্মৃতি ঘট্‌ল—চেয়ারের হাতলের উপর দু'হাতের মধ্যে মুখ রাখলাম।

আমার এই দৌর্ব্বল্য তাঁর কাছে ধরা পড়ল না; স্থির মৃদুকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন—আপনার সঙ্গে ক'দিন ধ'রে কেন যে আমি সাক্ষাৎ করতে চাইছি, তা' ভেবে হয় ত আপনি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছেন। আপনাকে আজ আমি সেই কথাই বলতে এসেছি।

তাঁর মুখের ভাবে এবং কথার ধরণে আমার বুকের অন্তরতম তল পর্য্যন্ত দুলে উঠ্‌লো; কিন্তু তাঁকে বাধা দিতে পারলাম না—মনের সমস্ত শক্তি নিমেষ মধ্যে কে যেন নিঃশেষে হরণ ক'রে নিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রে তিনি বল্‌লেন—আমি আপনার পাণিপ্রার্থনা করছি, মিস মিত্র! আপনি জানেন নিশ্চয়, বাক্‌পটু আমি নই; কাজেই গুছিয়ে মিষ্টি ক'রে আমার মনের কথা আপনাকে জানাতে পারবো না। অনেকদিন থেকেই মনের এই কথাটি আপনাকে জানাবো ভাবছিলাম। আপনি সম্মতি দিলে আমি নিজের জীবনকে কৃতার্থ জ্ঞান করব। আমার ভিতরকার অনেক জিনিষই হয় ত আপনার পছন্দসই হবে না। কিন্তু এ কথা জানবেন, আপনার প্রতি আমার যে ভালবাসা তার মধ্যে খাদ্ নেই।

তাঁর এই কথার পর নিজেকে সম্বরণ করা একান্ত দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু এ চরম পরীক্ষা আমায় পার হতেই হবে। যথাসাধ্য নিঃস্পৃহ কণ্ঠে বল্‌লাম—আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি ত কারুকে বিবাহ করতে প্রস্তুত নই।

—কেন?

—আপনিও ওই কথা জিজ্ঞাসা করছেন। আপনি কী জানেন না, আমার জীবন কত দুঃখের? আমার এই দুর্ভাগা জীবনের সব কথাই ত...

নিশীথবাবুর মৃদু হাসির শব্দে আমার কথা রুদ্ধ হ'য়ে গেল। বুঝলাম, ও-ভাবে নয়, অন্য ভাবে আমার আপত্তি জানানো উচিত ছিল। আমার পাশে ব'সে মৃদু স্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—আপনি কি মনে করেন, তার জন্যে আপনার প্রতি আমার ভালবাসার এতটুকু বিকার ঘট্‌বে কোনদিন?

বল্‌লাম—কিন্তু ঘটা তো উচিত! আমার কী-ই বা আছে? আপনি জানেন না...

—থাক্। ওসব বাজে কথা শুনে সময় নষ্ট করবার ইচ্ছে আমার নেই। আপনি শুধু আমায় বলুন, আপনার মনের কোণে আমার জন্যে এতটুকুও স্থান কি শূন্য আছে? আমার প্রার্থনা কি মঞ্জুর হবে?

জীবনে এমন মধুর মুহূর্ত্ত আর কবে পেয়েচি, আর কবেই বা পাবো? মনে হচ্ছে যেন সারা পৃথিবী গীতময়ী হ'য়ে উঠেছে—চারিদিকে সৌন্দর্য্যের সমারোহ!

কিন্তু উপায় নেই। নারীর জীবনের এই পরমতম ক্ষণটিকে নিজ হাতে হত্যা করতে হবে—অবিচলিত মুখে, একান্ত সহজভাবে। বুকের ভিতর কোন স্পন্দন নেই। সারা দেহ নিস্তেজ নির্জ্জীব হ'য়ে পড়েছে যেন।

আমাকে নীরব দেখে তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন—বলুন। আমার প্রার্থনা কি মঞ্জুর হবে?

নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে বল্লাম—না।

—না!!

মাথা নেড়ে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বল্‌লাম—না। আমি আপনাকে একটুও……

নিশীথবাবুর মর্ম্মস্থল ভেদ ক'রে গভীর একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। করুণ কোমল কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—ধন্যবাদ! আপনি বেশ স্পষ্টভাবেই আপনার কথা আমায় জানিয়েছেন! আপনাকে হয় ত অনেক বিরক্ত ক'রে গেল্‌াম – মার্জ্জনা করবেন।

ধরে ধীরে তিনি প্রস্থান করলেন। তাঁকে আহ্বান ক'রে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আমার অন্তরাত্মা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। কিন্তু মুখ ফুটে তাঁকে ডাকতে পারলাম না। চন্দ্রার কাছে আমি কথা দিয়েছি। বাবাকে বিপদ-মুক্ত করবার জন্যে সে-কথা আমায় রক্ষা করতেই হবে।

তেইশ

ঝড়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে প্রকৃতি যেমন স্তব্ধভাব ধারণ করে, আমার কোলকাতার দিনগুলি তেমনি স্তব্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হ'তে লাগ্‌লো। অতসীর কাছ থেকে প্রায় প্রত্যহ-ই চিঠি পেতাম; কিন্তু সে সব চিঠিতে বাবার প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন খবর না পেয়ে আমি দিন দিন অধিকতর চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌ছিলাম; এমন সময় দিন-পাঁচেক পরে অতসীর কাছ থেকে নিম্নলিখিত পত্রখানি পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'লাম।

অতসী লিখ্‌ছে—"দিদি, পরশু বাবা ফিরে এসেছেন। কাল সকালেই আমরা রূপনারায়ণপুরের বাড়ীতে চ'লে এসেছি। কাল সারাদিন বাড়ী গোছগাছ করতে ভারী ব্যস্ত ছিলাম, তাই তোমায় চিঠি দিতে পারি নি; তার জন্য দিদি ভাই, তুমি কিন্তু রাগ করো না যেন। তোমার ঘরখানি সাজাতেই আমার সব চেয়ে বেশী সময় লেগেছে তা' জেনো!

"বাবার শরীর আগেকার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। তিনি বেশ প্রফুল্ল মনে আছেন। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তুমি হঠাৎ মনীষা দেবীর সঙ্গে কোলকাতা গেছ শুনে বাবা শুধু একটু বিস্মিত হলেন; কিন্তু রাগ করেন নি মোটে-ই। তা' ব'লে তুমি আর বেশীদিন কোলকাতায় ব'সে থেকো না—তুমি কাছে না থাকলে বাবার কাজের সুবিধা হয় না, তা' ত তুমি জানোই।

"তা' ছাড়া, সামনে রবিবার একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেই সভায় বাবা বক্তৃতা করবেন। রবিবারের মধ্যে তোমার আসা চাই-ই চাই।

"দিদি, লক্ষ্মী ভাই, যত শীঘ্র পারো চ'লে এসো। এখানে আমাদের বাড়ীটার সুমুখে পাহাড়ের দৃশ্য আছে, চমৎকার! দেখে তোমার আশ্‌ মিটবে না। শুধু তাই নয়, বাড়ীর সাম্‌নে একটা বকুলগাছ আছে, তা'তে এমন সব সুন্দর সুন্দর পাখীরা এসে বসে যে, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আরও কত কী যে আছে, লিখে শেষ করা যায় না। তুমি শীগ্‌গির শীগ্‌গির চ'লে এসো। ইতি, অতসী।"

মাকে চিঠিখানা দেখাতে তিনি বল্লেন—যাক্‌, অনেক দুর্ভাবনা ঘুচলো। সেখানে তোমার প্রয়োজন আছে। তোমার যাওয়া দরকার।

পরদিন সকালে রূপনারায়ণপুরের সুদূর বিস্তারি মাঠের উপরকার পায়ে আঁকা পথ দিয়ে যখন বেড়াতে বার হলাম, তখন আমার মনে হ'ল যেন, জীবনের সব দুঃখ আমার শেষ হ'য়ে গেছে; প্রকৃতির এই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের সুমুখে পৃথিবীর যত কিছু কালো, যত কিছু অন্যায়, যত কিছু কলুষ সব গেছে লুপ্ত হ'য়ে। আমি নির্ভয়। আমি নির্ব্বিঘ্ন।

কিন্তু মনের এ প্রশান্তি কী বেশীক্ষণ থাকবে? এখুনি হয় ত মন আবার অনির্দ্দেশ্য আতঙ্কে দুলে উঠ্‌বে—মনে হবে যেন, চারিপাশের এই যে সমাহিত স্তব্ধতা, এ যেন ঝড়ের আগে প্রকৃতির ছদ্মবেশ, সুনীল আকাশের কোণে যে মেঘের টুকরো দেখা যাচ্ছে, এখনি সেই মেঘ ভীষণ মূর্ত্তিতে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে,—ঝড় উঠ্‌বে সর্ব্বনাশা!

আগামীবারে সমাপ্য)

অমরনাথ

শ্রীমতী সুহাসিনী মিত্র

আমার কোনদিনই অমরনাথ যাবার কথা মনের মধ্যে উদয় হয় নি ; কারণ, আমার ধারণা ছিল, অমরনাথ নাগা সন্ন্যাসীরাই যায় ; সংসারীর পক্ষে, বিশেষ করে' আমাদের মত আয়াস-বিলাসী সংসারীর পক্ষে সেখানে যাওয়া দুঃসাধ্য। আমি যদি বলি দেবাদিদেব মহাদেবের লীলাভূমি কৈলাস যাব ; সে কথা শুনে লোকে যেমন হাসবে, আমার অমরনাথ যাবার কথা শুনে লোকে ঠিক তেমনই হাসবে। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার অপার করুণায় সেই অমরনাথ দর্শনই আমার ঘটলো। বরাবরই খুব ইচ্ছে যেত কি করে' কেদারবদরী যাব। অলকানন্দা মন্দাকিনী নীলধারার বর্ণনা যথায়-তথায় নানাবর্ণে পড়ে' পড়ে' চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের মহা ঔৎসুক্য মনের মধ্যে জেগে ছিল ; কিন্তু, অর্থ সামর্থ্য সুবিধা ও সাথীর অভাবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হবার সুযোগ আজও ঘটে ওঠে নি। পাহাড়-পথে অমরনাথই আমার প্রথম যাত্রা। হঠাৎ একদিন এক আত্মীয় এসে বল্‌লেন—"আমাদের বাড়ীর সবাই অমরনাথ যাবেন কথা হচ্ছে ; যদি যান, আপনি কি যাবেন ?" আমি ত তখুনি বলে' দিলুম—"আমি যাব।" তারপর আমার এই যাব শুনে আমার চেনা-অচেনা আত্মীয়-বন্ধু যে যেখানে ছিল "যেও না যেও না" রবে উপস্থিত হলেন।—সে পথ ভীষণ বিপদসঙ্কুল, অতীব দুর্গম, ভয়ানক ঠাণ্ডা, ভয়ের যত কিছু বিশেষণ আছে, কিছুই তাঁরা বাদ দিলেন না। আমারও কেমন ঝোঁক চেপে গেল। যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা মানুষ, আমিও মানুষ ; তাঁরা যদি পারেন, আমি কেন পারবো না ? অনেক বাধা-বিপত্তি তর্ক-বিতর্কের পর আমার যাওয়াই শেষে ঠিক হলো।

রবিবার সাত-ই শ্রাবণ, তেইশ-এ জুলাই শুভদিনে বোম্বে মেলে আমরা দশজন স্ত্রীলোক, তিনজন পুরুষ অমরনাথ উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু করলুম। পরদিন সকালে মোগলসরায়ে বোম্বে মেল ছেড়ে দিয়ে লাহোর এক্সপ্রেস ধরবার জন্য নেমে পড়লুম। দু' ঘণ্টা সময় মধ্যে পাওয়া যায় ; সেই অবসরে ওয়েটিং-রুমে স্নান করে' ফল-মিষ্টি কিছু খেয়ে আবার অপর ট্রেণে উঠলাম। মঙ্গলবার বিকালে রাওলপিণ্ডি পৌঁছলাম। ষ্টেশনে আমাদের জানিত এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন ; তিনি সঙ্গে করে' সেখানকার ৺কালীমাতার বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গেলেন এবং একটা রাত সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। মন্দিরের পুরোহিত অতি সজ্জন ব্যক্তি, বাঙ্গালী ; তাঁর দয়ায় বাজার-হাট করা, স্নান-আহার-নিদ্রার কোনও অসুবিধাই ভোগ করতে হয় নি। তিনিই শ্রীনগর যাবার 'বাসে'র বন্দোবস্ত করে' দিলেন। খুব ভোরেই বেরুবার ঠিক করে' সে রাত্রি বিশ্রাম নেওয়া গেল। ভোর পাঁচটায় বাস এসে হাজির হলো। তাড়াতাড়ি প্রাতকৃত্য সমাপন করে' নবীন উৎসাহ নিয়ে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা সুরু হলো।

ঘণ্টা দুই সহরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পাহাড়-পথ পাওয়া গেল। সে কি সুন্দর দৃশ্য! সবুজের মেলা! পাহাড়ের স্তরে স্তরে এক এক জায়গায় সারি সারি একই মাপের একই রকম গাছ যেন কে সাজিয়ে রেখেছে। ক্রমশঃ বাস উঁচুতে উঠতে লাগলো; সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ হতে লাগলো অল্প অল্প। মাঝে মাঝে পাহাড়ীদের বাড়ী দেখতে পাওয়া যায়। দূর থেকে মনে হয় যেন পুতুল খেলার ঘর। খানিক পর থেকে নদী পাওয়া গেল—তা'কে ঝিলামও বলে, তার কতকটাকে লীডাকও বলে। নদীও আমাদের সাথে সাথে এঁকে-বেঁকে সমান চল্‌লো শ্রীনগর পর্য্যন্ত। কখনও আমরা নদীর সাততলা উপর দিয়ে যাচ্ছি, আবার কখনও তার ধারে ধারে যাচ্ছি। নদী স্থিরা নয়; অস্থিরা, চঞ্চলা। তার উত্তাল তরঙ্গ পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে গর্জ্জন করে' ওঠে। মাঝে মাঝে পাথরের ধাক্কা খাওয়ায় ফোয়ারার মত ছিটকে পড়ার অপরূপ সৌন্দর্য্য চোখ ধাঁদিয়ে দেয়। তখন মনে হয়—

"কেমনে রচিব তোমার রচনা।
কেমনে বর্ণিব তোমার মহিমা।
কেমনে গলাব হৃদয়-প্রাণ তোমারি মধুর প্রেমে।"

ভয়ও খুব হয়। মনে হয়, যদি বাস একটু অসাবধান হয়, সে আর ভাবতে পারা যায় না—কোন অতলে পড়ে যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে,—এই জনশূন্য স্থানে মৃত্যুর আর্ত্তনাদও কারো কাণে পৌছবে না।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ 'উরী' বলে ছোট একটা গ্রামে এসে বাস পৌছল। আর যাওয়া হয় না; রাত্রি এখানে কাটাতে হবে। পাহাড়ের গায়ে ডাকবাংলো; সেখানেই নামা হলো। কাছাকাছি খান দশ-বারো দোকান—মুদিখানা ও খাবারের। খাদ্যের মধ্যে ফুলকা (মোটা রুটি), আচার ও ক্ষীরের পেড়া পাওয়া যায়; কিন্তু জল নাই। নদী এখানে প্রায় একতলা নীচু। দিনের আলো নিভে গেছে—সেখান থেকে জল আনা অসম্ভব। খানসামার সঞ্চিত বালতি চার জলে একটু মুখ হাত ধোয়া ত সারা হলো। পানের জল কই! দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনে তাদের 'বড় ভালোলোক' বলে' বলে' সামান্য একটু জল মিললো। তারই এক এক চুমুক খেয়ে গলাটা কোন-রকমে ভিজিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া গেল। মালসমেত বাস ডাকবাংলার ধারেই দাঁড়িয়ে রইলো। পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বাস-চালকের ডাকাডাকিতে উঠে পড়া গেল। সেই জলের ভাবনা। যাই হোক্, প্রভাতের আলোকে আবার তোমরা বড়া ভালো'র দৌলতে কিছু জল আনিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে যাত্রা সুরু করা গেল। সেই মনোরম দৃশ্য—কত রকমের বনফুল, কত রকমের গাছ! মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে একজাতীয় গাছ দশ-বিশ গজ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। নীচেটা তার এতো পরিচ্ছন্ন, মনে হয় যেন একখানি সযত্ন-রক্ষিত বাগিচা। এই অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে বেলা এগারটা নাগাদ 'বারামুল্লা'য় এসে পৌছলাম।

সমতল পথ। দু'ধারে পাইন গাছ; দূর থেকে চমৎকার দেখায়। দূরে দূরে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী। দু'ধারে ভুট্টা, ধানের ক্ষেত দেখতে দেখতে সহরে এসে ঢুকলাম। খুব বর্ষা। রাস্তায় কাদা, মধ্যে মধ্যে জল দাঁড়িয়েছে। দু'ধারে দোকান। বাড়ী কাঠের তৈরী। ভগবানের প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য বর্ণনা করি এমন ভাষা আমার নেই। কিন্তু শ্রীনগর রাজধানী অত্যন্ত নোংরা। রাস্তায় কাদা, জল পচার দুর্গন্ধ। কাশ্মীরবাসী খুব সুশ্রী; কিন্তু অত্যন্ত নোংরা। গায়ের ময়লায় স্বরূপ ঢেকে গেছে।

আমাদের পরিচিত বাঙ্গালী মিষ্টার বোসের গৃহে এসে পৌছলাম। তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের আদর-যত্নে আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করলাম। আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করে' সহর দেখতে বেরুলাম। বেরুবো কি, আর দেখবই বা কি, যে বৃষ্টি! যাই হোক, বাসে করে' সহর, 'ডাল লেক', রাজার বাড়ী, রাজার বাগান, 'নিষাদ বাগ', 'হারিবন' ইত্যাদি দেখতে দেখতে প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে এল। ফেরবার মুখে দেখলাম রামধনু। জীবনে রামধনুর এমন সুন্দর অপরূপ-রূপ কখনো দেখি নি। অর্দ্ধেক পাহাড়ের গা মেঘে ঢাকা, তায় রামধনুর গাঢ় পাঁচটি রং পাঁচ সাত হাত করে' পাশাপাশি জমিন থেকে আসমান অবধি পড়ে রয়েছে। সে যে কি তা' বর্ণনার অতীত!

তারপর মুগ্ধচিত্তে বাড়ী ফিরে সেই মামুলী আহার আর শয়ন।

পরদিন ক্ষীরভবানী দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে বাসে করে' রওনা হলাম। খুব বৃষ্টি। কাঁচা রাস্তায় খানিক দূর গিয়ে হুড়মুড় করে' বাস উল্‌টে গেল। আর সে কি হৈচৈ! মহাভয়ে সমস্বরে আর্ত্তনাদ! কিন্তু বাস উল্‌টে যাওয়া সত্ত্বেও বাবা অমরনাথের দয়ায় কারও বিশেষ আঘাত লাগে নি; কারণ, পাশের মাঠে বর্ষার জল জমে পাঁক হয়েছিল; তা'তে কাদায় মাখামাখি হলুম বটে, আঘাতটা কারও গুরুতর হয় নি। অল্পসল্প কেটে-কুটে একটু-আধটু রক্তপাত হয়েছিল। তারপর বাস নিয়ে মহামুস্কিল—শ্রীনগর ও ক্ষীরভবানীর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এই বিপদ। এদিকেও দু' মাইল, ওদিকেও দু' মাইল। জনশূন্য পথ; অন্য কোন যান-বাহন নাই। এতো কাদা, রাস্তা চলা দুষ্কর; পা পিছলে যায়। মোটর-চালক ত মাঠ ভেঙে চাষাভূসো গোছ জন ষোল লোক ডেকে এনে গাড়ীখানা কোনরকমে তুললে; কিন্তু এঞ্জিনে জল কাদা ঢুকে সেটা তখন অচল হ'য়ে গেছে! তারাও গাড়ী মেরামত করতে লাগলো; আমরা সেই কর্দ্দমাক্ত দেহে ধূলার শরীর ধূলাতে মিশাবেই জেনে উপায়ান্তর বিহীন হয়ে সেই রাস্তার বসে' রইলাম।

ঘণ্টা দুই পরে বাস একটু 'ষ্টার্ট' নিলে। আবার গাড়ীতে উঠলাম। আমার ভয়টা কিছু বেশী; আমি ত শ্রীনগর ফিরে আসতে অনেককে বললুম। কিন্তু যে ক্ষীর-ভবানীর দয়ায় সকলে দুর্বিপাকে বেঁচে গেছে, তাঁকে দর্শন না করে' কেহ-ই ফিরতে রাজি হ'ল না। ভয়ে হোক্, আর ভক্তিতেই হোক্ উপায়ান্তর না দেখে ক্ষীরভবানীর দিকেই রওয়া হওয়া গেল। গাড়ী দু' হাত এগোয়, আবার বন্ধ হয়ে যায়। এমনি করে' অতি কষ্টে প্রায় বেলা একটায় দেবী সমীপে পৌছনো গেল।

একটা বাগানের মত ঘেরা জমি—তার মধ্যে দু'-চার-খানা যাত্রী থাকার ঘর আছে, দু'-চারখানা পূজাদ্রব্যের দোকান, খাবারের দু'-চারখানা দোকান, একটা ছোট পুকুর। একটা ঘরের মত বড় চৌবাচ্ছা; চারিদিক রেলিংঘেরা। মধ্যে মন্দির-প্যাটার্নের ছোট একটি ঘর—তার মধ্যে চেলি ঢাকা ফুল ছড়ান ঠাকুর। কোনও মূর্ত্তি নাই। ধারে বসে' ফুল ছুঁড়ে পাণ্ডারা পূজা করান।

সেখানেই পুরী ভাজিয়ে সবাই কিছু কিছু খেয়ে বাড়ী ফেরবার জন্যে এসে দেখি বাসের অবস্থা শোচনীয়! সারাদিনেও তারা বিশেষ কিছু করে' উঠতে পারে নি; কাদাগুলো ধুয়েছে, পেটরোল ট্র্যাঙ্ক ফুটো। চলি চলি পা পা' করে' অতিকষ্টে বাসায় এসে পৌছনো গেল। সেখানে মিষ্টার বোসেরা এবং আমাদের সাথের পুরুষেরা খুবই দুর্ভাবনায় পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন এতো বিলম্ব দেখে। তাঁরাও বাঁচলেন। তারপর শাখা-প্রশাখায় বাস ওল্‌টাবার গল্প। গায়ের ব্যথায় নড়বার উপায় ছিল না, তাই আর বেশী গজলা হলো না, সকাল সকাল আহার সেরে শয্যার আশ্রয় নেওয়া গেল। পরদিন আহারাদি সেরে বেলা দুইটা নাগাদ 'পহল গাঁ' যাত্রা করা হলো। মধ্যে এক দিন 'মটলে' পাণ্ডাবাড়ী থেকে পহল গাঁ যাবার ঠিক ছিল। সময় অল্প; ফিরে শ্রীনগরের অন্যান্য দেখা হবে। বাবা অমর-নাথের দর্শন আগে মিলুক, সেই সকলের ইচ্ছা। বাস ঠিক করে' আমরা যে সমস্ত জিনিস পথে লাগবে,—গরম জামা, খাবার, দু'-চারখানা বাসন, অল্পস্বল্প বিছানা নিয়ে আর সব মাল শ্রীনগরে রেখে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা ভাল, দৃশ্যও অপরূপ! একপাশে পাহাড়, একপাশে ঝরণার নদী, তার কলকল ছলছল শব্দ। পাহাড়ের গায়ে খণ্ড খণ্ড মেঘ আটকে আছে। ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যেই মটলে পৌছনো গেল। পাণ্ডারা খুব সুন্দর লোক। আমাদের তেতলায় এবং পুরুষদের জন্য দোতলায় ঘর জুড়ে বিছানা পেতে রেখেছে। মেয়েরা রান্না করে' রেখেছে। ভারি বাদলা; সেজন্য আর সেদিন কোথাও বেরুনো গেল না। সবাই বসে গল্প-গুজব করে' খাওয়া-দাওয়া সেরে নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় নেওয়া গেল। পাণ্ডা-বাড়ীর মেয়েদের রান্না অতি সুন্দর! যদিও আমাদের দেশীয় নয়, তথাচ খুব সুস্বাদু।

পরদিন ভোরে সূর্য্যকুণ্ডুতে স্নান করে' অনন্ত নাগ ঠাকুর, সূর্য্য ঠাকুর দর্শন করে' রাজার নিশান চারটি সাধু-

সন্ন্যাসী এবং সহর দোকান-পসার ঘুরে দেখে আবার পাণ্ডাবাড়ী ফিরে আহারাদি সেরে বাসে করে' পহল গাঁ অভিমুখে যাত্রা করা হলো। রাস্তার দু'ধারের শোভা যতই এগুনো যায়, ততই বেশী নয়ন-মন মুগ্ধ করে' ফেলে। বেলা চারটা-পাঁচটা নাগাদ পহল গাঁ পৌছলাম। পহল গাঁ ছোট সহর। ইংরাজি হোটেল একটি আছে; বাঙ্গালীর (কাশ্মিরী) হোটেল দু'-তিনটি আছে। পোষ্ট-আফিস, দোকান-পসারও আছে। এখান থেকে তাঁবু, ঘোড়া, ডুলি, কুলি যার যা' দরকার নিতে হয়; কারণ, অমরনাথ যাবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এখানে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে পাহাড়ের উপর খানিকটা সমতল ভূমি আছে। আমাদের তাঁবু, ঘোড়া, মালবাহী ঘোড়া, তাঁবু খাটাবার কুলি যত দরকার ঠিক করা হলো। কাঠকয়লা, কেরোসিন তেল, ছোট ছোট লোহার উনান, এক রকম ভাঁড়—ওপরে বেত-বোনা সাজির মত—তা'কে 'কাঁকড়ি' বলে; প্রত্যেক লোকের একটি করে' ত সেই কাঁকড়ির দরকার। তা'তে কাঠকয়লার আগুণ করে' গলায় ঝুলিয়ে নিতে হয়। বড় ঠাণ্ডা; শরীর গরম থাকে। এখানে যে সমতলভূমি আছে, তার উপরে সন্ন্যাসীবা নিশান বা ঝণ্ডা পুঁতে সেখানে তাঁবু খাটালেন; আর নীচের সমতলভূমিতে যত যাত্রীর তাঁবু পড়লো। দেখতে দেখতে বেশ একটি ছোটখাট তাঁবুর সহর করা হ'য়ে গেল। দোকান বসলো,ভেন চড়লো। পানওয়ালা, জুতাসারান, কম্বলওয়ালারা হাঁকডাক সুরু করে' দিলে—জায়গাটা বেশ সরগরম হ'য়ে উঠল। ভারি আনন্দ! এরকম বাস জীবনে এই প্রথম। খোলা জায়গা, নদীর ঝরণার কুলুকুলু ডাক, ঘাসের উপর চ্যাটা কম্বলের শয্যা, যেদিকে চাও ঝাঁঝাঁ কচ্ছে।

পরদিন ভোরবেলা উঠে নদীতে স্নান করে' চারিদিকে একটু বেড়ান হলো; কিন্তু এতো জোর বৃষ্টি এলো যে, আর তাঁবুর বাহিরে কারও বেরুবার উপায় রইল না। সারাদিনে সে বৃষ্টি থামলো না। কমে, বাড়ে। ভিজে ভিজে ঘোড়ায় চড়ে' সব দেখা হলো। যারা সাহসী ও ক্ষীণাঙ্গী তাঁরা ঘোড়া নিলেন; আর যারা স্থূলাঙ্গী,ভীতু, তারা ডুলি ঠিক্‌ঠাক্ করে' বিকাল চারটায় 'চন্দনবাড়ী' অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। ঘণ্টা চার পরে চন্দনবাড়ী পৌছলাম। পথে জল-কাদায় ভারি নাকাল হওয়া গেছে। রক্ষা যে,এখানে সাড়ে আটটায় সন্ধ্যা হয়; তাই আলো থাকতে থাকতে পৌছনো গেল। সেখানকার পর্ব্বত আকাশচুম্বি। কোথাও সবুজ ঘাস, কোথাও সাদা সাদা মেঘ আটকে আছে। ছোট ছোট ঝরণা এঁকে-বেঁকে ঝরে' পড়ছে। সৌন্দর্য্য যেন চারিদিকে তার আঁচল বিছিয়ে রয়েছে! আবার তাঁবু পড়লো, ঘরকন্না গুছান সুরু হলো, কিন্তু রান্নার কি হবে? সারা-দিনের বৃষ্টিভেজা গাছের ডাল, সে কি জ্বলে! শীতের কন-কনানিতে একটু গরম চায়ের জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করতে লাগল। ষ্টোভ জ্বালানর চেষ্টা চললো। অনেক দুঃখে যদিও জ্বললো, জলও চড়লো, কিন্তু দুধ নেই—কি করা যায়? শেষে 'র' চাই একটু খাওয়া হলো। অনেক কষ্টে একটা ভাতে-ভাত ফুটিয়ে রাত্রের আহারটা শেষ করা গেল। তখন প্রায় রাত দশটা। তারপর নিদ্রা। যেমন শীত, তেমনি বৃষ্টি। আমরা ত তাঁবুর মধ্যে—কিন্তু কি কষ্ট গরীব ঝাঁপানওয়ালা, কুলি, ঘোড়ার সহিস, মোটবাহী-দের! সারারাত তারা বিনা আচ্ছাদনে ভিজছে। শুধু মুখে 'আহা আহা' ছাড়া প্রতিকারের কোনও হাত নাই। যাই হোক্, সুখে-দুঃখে রাত পোহাল; বৃষ্টিও কমে গেল। তখন সবারি এক লক্ষ্য তাঁবু খোলা, বিছানা বাঁধা। হৈহৈ পড়ে' গেল। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আবার যাত্রা সুরু। আজ আমরা চোদ্দহাজার ফিট্ উঠবো। মনে যেমন আনন্দ হচ্ছে, ভয়ও তেমনি হচ্ছে। এ ত আর দারজিলিং, শিলিগুড়ি নয়। ভীষণ পর্ব্বত, জনশূন্য; তার গা কেটে কেটে দু' হাত চওড়া রাস্তা। খালি চড়াই; উঠছি আর উঠছি। একটা বাঁক যখন ঘুরে আর একটা তলায় উঠছে, তখন ঝাঁপানওয়ালারা সেই দারুণ শীতেও গলদ ঘর্ম্ম। তাদের কি প্রাণ উৎসর্গ করে' সাবধানতা! কি আশ্বাস বাণী! কি ভগবানকে ডাকা, 'রক্ষা করো, রক্ষা করো' রবে! ধন্য তারা! ধন্য তাদের শক্তি! ধন্য তাদের যত্ন! সেই সুদূর দুর্গম পথে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে তারাই যেন দেবদূত! আর ভগবানের রচা

প্রকৃতির কি অসীম সৌন্দর্য্য! রূপসাগরে মন ডুবে যায়! চোখে সৌন্দর্য্য ভরে' নেওয়া যায় না! যত ওপরে উঠি, শোভাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে। ইট-পাথরঘেরা লোকালয়, সঙ্কীর্ণ যায়গায় যাঁদের বসতি, তাঁদের অসীম অনন্ত প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধতা অনুভব করার শক্তি কোথায়! ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমরা উঠছি উপরে; আকাশ পাহাড়ের চূড়ায় এসে ঠেকেছে। আমরা তার মধ্যে যাচ্ছি; নীচের কিছুই দেখা যায় না। বেলা তিনটা নাগাদ আমরা 'শেষ-নাগ' বলে' একটা জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম। জানি না স্বর্গ কি, তার সৌন্দর্য্যই বা কত তৃপ্তিকর। কিন্তু এ কি দেখলাম! চারিদিকে আকাশচুম্বি পর্ব্বত। পাঁচ-সাতটা ঝরণা হু হু করে' বেয়ে পড়ছে; মাঝখানে খানিকটা গোল পুকুরের মত জমা হয়ে একধার দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে; তার জল গাঢ় নীল—ঠিক শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রংয়ের যেমন বর্ণনা পড়েছি বা শুনেছি সেইরূপ নবঘনশ্যাম! তখন মনে পড়লো—"নম হে নম, ক্ষম হে ক্ষম, তোমায় স্মরি হে নিরুপম! নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে; বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আর সঙ্গীতে বিরাজে!" সেইখানে সমস্ত যাত্রী থামলো। সেটা প্রায় তিনতলা উঁচু। সব একে একে যার যার যান-বাহন থেকে নীচে নেমে কেউ স্নান কেউ স্পর্শ করলে। সেখান থেকে চলে' আসতে প্রাণ আর কিছুতে চায় না—কিন্তু উপায়বিহীন। পুরুষেরা তাড়া দিতে লাগলো; আবার উঠে এসে যে যার বাহনে উঠলাম। মাইলখানেক গিয়ে সে রাত্রির মত তাঁবু পড়লো। আবার সংসার পাততে হ'ল; রান্না-খাওয়া, বিছানা-পাতা, সোরগোল পড়ে' গেল। আমরা যখন আসি, সবাই ভয়ই দেখালে; কিন্তু কি কি জিনিষ নিলে কষ্ট কমে, অসুবিধা না হয়, তা' কেউ বললে না। আমরাও জানি না। খাবার জিনিষ মোটে মেলে না। যারা আমাদের সঙ্গে দোকান পাততে যায়, তাদের কাছে শুধু 'ফুলকা' আর আচার পাওয়া যায় - সে পাঞ্জাবীদের আহার্য্য; আমাদের রোচেও না, খাওয়ায়ও অসম্ভব। সচ্ছন্দে শ্রীনগর থেকে শুকনো গজা, নিমকি, পেড়া, ডালমুট নিয়ে আসা যেত; তা' হ'লে আর সারাদিন উপবাসী থাকতে হতো না। তারপর শুকনো কাঠ নেই; গাছের ডাল ভেঙে জাল দেওয়া—সে কি ধরে! নাকাল ভোগ করে' রাত দশটা নাগাদ আধসেদ্ধ কাঁচা ডাল-চাল-আলু ফুটিয়ে সে না ভাত, না খিচুড়ি! তাই অমৃতবৎ খাওয়া হলো। তার পর সব শ্রান্তি দূর হ'ল নিদ্রাদেবীর আশ্রয়ে।

পরদিন আমরা 'পঞ্চতরী' নামে একটা জায়গায় যাব। সেখান থেকে অমরনাথ তিন মাইল। এ পর্য্যন্ত আমরা শুধু স্তরে স্তরে উঠছি, সে জন্য শীতও ক্রমে বেশী পাচ্ছি। আবার গোছগাছ করে অন্যদিনের মত যাওয়া আরম্ভ হলো। সন্ধ্যাবেলা আমরা পঞ্চতরীতে গিয়া পৌছলাম। কি ভীষণ বৃষ্টি! সঙ্গে সঙ্গে জোর হাওয়া অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এখান থেকে পাচটি নদী বেরিয়ে পাঞ্জাব অভিমুখে ধাবিত হয়েছে। সেই পাচটি নদী পরস্পর পাশাপাশি এখানে বইছে—সে জন্য এ স্থানটির নাম পঞ্চতরী। নদীগুলির গভীরতা এখানে দেখা যায় না; 'মধুপুর' 'দেওঘরে'র নদীর মত ঝিরঝির করে' বয়ে চলেছে। স্রোত খুব বেশী; বরফ গলা জল ভীষণ কনকনে। এখানে সমতল জমি অনেকখানি। এখানে যাত্রীরা শ্রাদ্ধাদি-তর্পণ ভোজ্য দান করে। সেদিন বৃষ্টির জন্য কিছু হলো না। সকলে আকাশের অবস্থা ও বৃষ্টির বহর দেখে খুব ভীত হ'য়ে পড়ল।—এই বুঝি বরফের 'ধস্' নামে! ঘাটে এসে তরী বুঝি ডোবে! সকলের মুখে শুধু 'জয় জগদীশ হরে' ছাড়া বাক্য নেই। 'রক্ষা করো অমর-নাথ, রক্ষা করো!' তাঁবুর মধ্যে বসে' এই করছি, এমন সময় রাজ-সরকারের লোক প্রত্যেক তাঁবুতে ঢেঁড়া দিয়ে গেল,—প্রাতে যতক্ষণ না হুকুম আসে, ততক্ষণ কোনও যাত্রী যেন আর অগ্রসর না হয়। যদি কেউ যায়, রাজ-সরকার তার জন্যে দায়ী নয়। ভয়ে ত সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। সারারাত কারও ঘুম নেই। প্রার্থনা—'ভগবান রক্ষা করো! হে সূর্য্যদেব মুখ তুলে চাও! যাই হোক্, অল্প অল্প রাত থাকতে শয্যা ছেড়ে উঠে প্রাতঃকৃত শেষ করে' সেখান-কার দান তীর্থনীতি সেরে নিতে প্রায় সাতটা বাজলো। এত লোকের আন্তরিক প্রার্থনা সূর্য্যদেব শুনলেন; তিনি মেঘ অন্তরাল থেকে হাসতে হাসতে উঁকি দিলেন। রাজ-সরকারের লোকও দেবদূতের অভয়-বাণী ঘোষণা করে' গেল—পথ নিরাপদ; চল, চল। তাঁবু আজ খোলা হলো না;

কারণ, অমরনাথ মাত্র তিন মাইল চড়াই, আজই দেখে ফিরতে পারা [illegible] কাটাতে হবে। তাড়াতাড়ি আবার যে যার বাহনে উঠে যাত্রা করা হলো। এক ঘণ্টা নাগাদ উঠে কি দৃশ্য দেখলাম! দূরে উচ্চে অমরনাথ দেবের গুহার প্রকাণ্ড গহ্বর! আর শুধু সাদা বরফ—দু'ধারে বরফ, পায়ের তলায় বরফ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়ের দু'ধার বরফাবৃত! বরফের উপর দিয়ে চলেছি, যাত্রীর পায়ের চাপে একটা মচমচ শব্দ হচ্ছে। মাঝে মাঝে বরফের ফাটলে ফাটলে কুলকুলু করে' নীলজল কোনখানে গোল হ'য়ে কোনখানে একে-বেঁকে ফোয়ারার মত ঝরণার মত আবার কোথাও নদীর মত বয়ে যাচ্ছে। তখন আর কিছু ভয় থাকে না। মন সৌন্দর্য্যে ডুবে যায়। ভগবানের বিশ্বরূপ মনে হয়। নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস হয় যে, এ স্বপ্ন নয় ত! আমি কি জাগ্রত? এ চর্ম্মচক্ষু স্বর্গীয় শোভা ঠিক দেখছে ত! ধীরে ধীরে গুহার নিকট আমরা উপনীত হলাম। আর যানবাহন উঠবার পথ নেই; এবার সবাইকে পদব্রজে যেতে হবে। এখান থেকে গুহার প্রবেশ পথ প্রায় তিনতলা উঁচু। একটু উঠি আর হাঁপিয়ে পড়ি—মনে হয় বুঝি হার্ট ফেল হলো। ঝাঁপানওয়ালারা ত টেনে টেনে নিয়ে চল্‌লো। গুহার পাশ দিয়ে একটী বড় ঝরণা বয়ে যাচ্ছে—সেটিকে 'অমরগঙ্গা' বলে। সেখানে স্নান বা তার জল স্পর্শ করে' কাপড় ছেড়ে অমরনাথ দর্শন করতে হয়। বড় ঝরণাটীর গভীরতা এখানে একেবারেই নেই, কারণ, এ স্থান ভয়ানক উঁচু। এটি নীচে নদী হ'য়ে বয়ে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে জল দেখা যাচ্ছে; আর বেশীর ভাগ জল বরফ হ'য়ে জমে আছে। মাটী এখানে আর দেখা যায় না—পর্ব্বত রাজ্য। উপরে আকাশ, নীচে বরফ। চারিদিকে গগনস্পর্শী পাহাড়। আস্তে আস্তে আমরা গহ্বরে প্রবেশ করলাম। কি অপরূপ সে দৃশ্য! বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়ে যায়! তখন ঠাণ্ডাবোধ, সৌন্দর্য্য-জ্ঞান, ভক্তি, প্রণাম কিছুই মনে আসে না—শুধু অপলক নেত্রে বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে যায়! বিশ্বাস হয় না—সত্যই কি আমি চর্ম্মচক্ষে জাগ্রত অবস্থায় এই কৈলাস দেখছি! মিনিট পাঁচ-সাত পর চেতনা ফিরে এলো। তখন চারিদিকে চেয়ে দেখি মস্ত বড় গুহা—প্রায় দুই শত লোক ধরে। উচ্চে দেড়তলা সমান। গুহার শেষপ্রান্তে অমরনাথ মহাদেব—বরফের লিঙ্গমূর্ত্তি! পিনাকটী লম্বা প্রায় পাঁচ ছয় হাত, চওড়া তিন হাত—সাদা বরফের ঢালাই করা। মহাদেবের মস্তকে হাত স্পর্শ ছোঁয় না। যত যাত্রী ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফুল দিচ্ছে। পিনাকটীর উপর লুটিয়ে পড়ে' প্রণিপাত কচ্ছে। ঘোর কাটলে অনুভব হলো, কি ভীষণ ঠাণ্ডা! পা দুটোর সাড় নাই; সমস্ত শরীর ঝিমঝিম কচ্ছে! আমার ঘোর সম্পূর্ণ কাটছে না—পূজা, প্রণাম-মন্ত্র, প্রার্থনা সব ভুলে যাচ্ছি! শুধু মনে-প্রাণে কণ্ঠে ধ্বনিত হ'তে লাগলো—

"পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনম্
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ।১
নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্যচ।
নিরালম্বস্যোপবীতং পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ ॥২
নির্লেপস্য কুতো গন্ধো রম্যস্যাভরণং কুতঃ।
নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং তাম্বূলঞ্চ কুতো বিভোঃ ॥৩
প্রদক্ষিণাহ্যনন্তস্য চাদ্বয়স্য কুতো নতিঃ।
বেদবাক্যৈরবেদ্যস্য কুতঃ স্তোত্রং বিধীয়তে ॥৪
স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনং বিভোঃ।
অন্তর্ব্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথমুদ্বাসনং ভবেৎ ॥৫
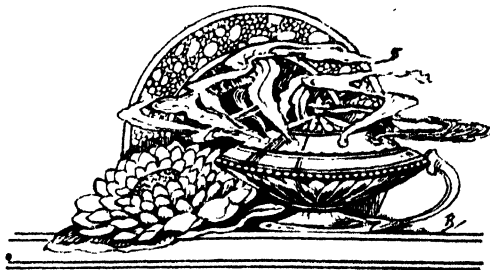
দাঁড়কাকের কথা

[সেকোভ হইতে]

এক ঝাঁক দাঁড়কাক উড়ে এসে মাঠের মধ্যে গোল হয়ে বসেছিল। সেখানে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম তাদের মধ্যে দার্শনিক গোছের একটি কাক একপাশে বসে' আছে। তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে দেখলাম কাকটি পরম দার্শনিক ও ভাবুক; সুতরাং, আলাপটা তেমন জম্‌লো না।

এইভাবে কথাবার্ত্তা সুরু হোলো :

আমি।—আচ্ছা, শুনতে পাই তোমরা কাকেরা নাকি বহুকাল ধরে বেঁচে থ'াক! প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেন কাকের আর কচ্ছপের পরমায়ু সকলের চেয়ে বেশী। তা' তোমার বয়স কত হোলো?

কাক।—আমার বয়স তিনশো ছিয়াত্তর বছর।

আমি।—ওরে বাস্‌রে,—এতদিন তুমি বেঁচে আছ? দেখ কাক বুড়া, আমি যদি তোমার মত হতাম,—তা' হ'লে এতদিনে কত মাসিকপত্রে কত প্রবন্ধই না লিখে ফেলতাম! তিনশো ছিয়াত্তর বছর বাঁচলে আমি যে কত নাটক, নভেল, গল্প, কবিতা এর মধ্যে লিখতাম তা' ভাবতেই পারি না,—আর তা'তে কত পয়সাই উপায় করতাম! তা' কাক বুড়া, এত বছর ধরে' তুমি কি কি কাজ করলে?

কাক।—কিছুই না। কেবল খেয়েছি, ঘুমিয়েছি, আর বংশবৃদ্ধি করেছি।

আমি।—ছি ছি, এ কি লজ্জার কথা! পৃথিবীতে এসে তিনশো ছিয়াত্তর বছর কাটিয়ে তুমি বুড়া হ'য়ে গেলে, তবু তিনশো বছর আগে তুমি যা' ছিলে এখনও তুমি তাই রয়ে' গেলে! এতদিনে তোমার সিকি পয়সারও জ্ঞান জন্মালো না?

কাক।—দেখুন মানুষ মশাই, জ্ঞান কখনো বয়সে বাড়ে না, জ্ঞান বাড়ে শিক্ষা পেলে! চীন দেশ দেখুন,—আমার চেয়েও সে দেশ তো কত পুরানো,—কিন্তু হাজার বছর আগেও সে দেশ যত বড় বোকা ছিল, আজও তাই আছে।

আমি।—(আশ্চর্য্যের সহিত) তিন শো ছিয়াত্তর বছর, বল কি? একযুগ বল্‌লেও হয়! এতকালের মধ্যে আমি পৃথিবীর সব বিদ্যা শিখে ফেলতে পারতাম; বার কুড়িক্ আমার হয় তো বিয়ে হ'য়ে যেতে পারতো; ঘুরে-ফিরে পৃথিবীর সব রকম ব্যবসা করে' ফেলতে পারতাম; পৃথিবীতে কত উঁচু পদে উঠতে পারতাম, শেষে হয়তো একটা রথ্‌চাইল্ড্ হ'য়ে মরতাম। সে যাক্‌গে; তুমি যত বড়ই বোকা হও, একটা সামান্য কথাই ভেবে দেখ। দুশো তিরাশি বছর আগে ব্যাঙ্কে যদি একটা টাকাও ফেলে রাখতে,—শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ ধরলে আজ সুদে আসলে সে টাকা হাজারে গিয়ে দাঁড়াতো। হিসাব কষ্‌লেই বুঝতে পারবে। অর্থাৎ তোমার প্রথম জীবনে যদি একটা টাকা সুদে খাটাতে, আজ তা' হ'লে তুমি হাজার টাকার মালিক! কি মূর্খ, কি বোকা! এখন তোমার লজ্জা হচ্ছে তো,—বুঝতে পারছো তো যে, তুমি কত বড় বোকা?

কাক।—মোটেই না। আমরা বোকা বটে; কিন্তু এই ভেবে আমরা সুখী থাকি যে, মানুষ চল্লিশ বছরের মধ্যেই যত ভুল কাজ করে' বসে, আমরা চারশো বছরের মধ্যেও তার চেয়ে ঢের কম ভুল করি। দেখুন মানুষ মশায়, আমি তো তিনশো ছিয়াত্তর বছর বেঁচে আছি,—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটাও কাকের ঝাঁক-লড়াই দেখলাম না, একটা কাককেও হত্যা করতে দেখলাম না,—কিন্তু তোমাদের এমন একটা বছর যায় না যাতে লড়াই না হয়। আমরা কেউ কারুর জিনিষ চুরী করি না, আমরা ব্যাঙ্কও খুলি না, আবার ভাষা নিয়ে তার নতুন নতুন সংস্করণও বের করি না, স্কুলও খুলি না; আমরা মিথ্যা সাক্ষীও দিই না, সম্পত্তি নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়িও করি না; আমরা ওঁচা নভেলও লিখি না, বেহায়া কবিতাও লিখি না, পরের কুৎসা রটাবার জন্য খবরের কাগজও বের করি না।...এই তো তিন শো ছিয়াত্তর বছর কেটে গেল, এর মধ্যে আমাদের সঙ্গিনীদের মধ্যে কা'কেও বিশ্বাসঘাতক হ'তে দেখলাম না,—বা কাকেও দেখলাম না যে, স্বামীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তোমাদের মানুষের মধ্যে এসব কেমন? আমাদের মধ্যে কারো পেঁচোয়া বুদ্ধি নেই, কেউ বিশ্বনিন্দুক নেই, কেউ তোষামুদে নেই, কেউ প্রতারক নেই, কেউ দালাল নেই, কেউ ধাপ্পাবাজ নেই, কেউ...

বল্‌তে বল্‌তে দূরে আর একটা কাক ডেকে উঠলো,—তার ডাক শুনে এই কাকটি হঠাৎ উড়ে চলে' গেল,—কথাটা আর শেষ হোলো না।

অনুবাদক—ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য।

নির্ম্মিতনা

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ { দ্বিতীয় সংখ্যা

পল্লী-নারী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খুব সামান্য কারণ, কিন্তু তাহার পরিণতির কথা স্মরণ করিতে গেলে বুক কাঁপিয়া উঠে।

ক্রমাগত যন্ত্রনা পাইয়া কাদম্বিনী পিত্রালয়ে পত্র পাঠাইয়া পিতাকে আনাইল। পিতা হরিশবাবু কন্যার শরীরের নানাস্থানের আঘাত চিহ্নের কদর্য্যতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "এ কি বেয়াই, আমি কি তোমার বাড়ীতে এই কর্ত্তে মেয়েকে রেখেছি?"

চণ্ডীচরণ সম্পূর্ণ উদাসীনের ভাব অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "আমি বেয়াই ও-সব সংসারী কথায় থাকি না। বিশেষ মেয়েদের বাদ-বিসম্বাদে।"

হরিশবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "বেশ, থেকেও কাজ নেই, আমার মেয়েকে আমি নিয়ে যাব।"

উদাসীনের কিন্তু এবার সুর ফিরিল। চণ্ডীবাবু মোলায়েম স্বরে বলিলেন, "তা' কি ক'রে হ'তে পারে বেয়াই। মা চলে গেলে, তাঁর এ বুড় ছাকে দেখবে কে? আমি যে এতদিন এই দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, তা' কেবল মায়ের যত্ন-আত্তির জোরে। উনি গেলে এ হাড়-মাসের খাঁচায় কি আর প্রাণ থাকবে? থাকবে না।"

হরিশ তীব্রস্বরে বলিলেন, "তাই মায়ের এতবড় যত্ন-আদর, কি বল? মানুষ এতবড় পাষণ্ড হ'তে পারে, তা' আমি আজ এই প্রথম দেখলুম।"

তর্ক-বিতর্ক হয় ত অনেকদূর অগ্রসর হইত, কিন্তু সহসা এক ঝোড়া ছাই ও গোবর গোলা জলের কলসী লইয়া বাটীর গৃহিণী বেহায়ের অভ্যর্থনা করার ফল অনেকদূরই গড়াইল। সেই দিনই পুলিশের সাহায্যে হরিশবাবু কন্যাকে কেবল স্বগৃহে লইয়া গিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, আদালতের আশ্রয় লইলেন।

চণ্ডীচরণ পেয়াদার দেওয়া সমন হাতে লইয়া অন্তরে

জ্বললেও মুখে বেশ মৃদু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "রাজার নিমন্ত্রণ যখন, বুঝেছ, যেতেই হবে; তবে এভাবে আদালত দর্শন জীবনে বৌমা আর তার বাপের দ্বারাই প্রথম হ'ল।"

অঘোর পাঠক একান্তে বসিয়া ধূমপানের সুখ চক্ষু মুদিয়া অনুভব করিতেছিলেন। বলিলেন, "চায় কি, খোর-পোষ?"

চণ্ডীবাবু বলিলেন, "তা' হ'লে ত বাঁচতুম্। এক কথায় আইনের প্যাঁচে ফেলে বুঝিয়ে দিতুম, যে ছেলের বৌ ঘরে স্বভাবে থাকে, সেই কেবল খোরপোষ পেতে পারে, নচেৎ নয়। দেখি, কামিনী ডোমনীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করবার দরকার হ'য়ে পড়েছে।"

উঠানের অন্যপাশ দিয়া বলদেব বাজার চলিয়াছিল। রোজই যায়। আজ হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "কামিনী 'টেমাটী' গিয়েছে কাকা, এ দেশে ত নেই, কেন?"

চণ্ডীবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "গেছে, যাক্। ভোলার পরিবার, নস্তের বোন্ সুখী, রজনী কত আছে। যে কাউকে ডেকে পাঠালেই চলবে।"

বলদেব কথাটা কিছু বুঝিল না; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কাকা, মেজবৌ সবে ত আটমাসের শুনেছি, তা' হ'লে কি?"

চণ্ডী বিকট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আছে রে আছে, সে তুই বুঝবি না। ছেলেমানুষ।"

গৃহিণীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তাড়াতাড়ি চাদরটা দাও ত, বাপ-মেয়ের একসঙ্গে শ্রাদ্ধের যোগাড়টা ক'রে আসি।"

গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "পারবে, তাতে তপ-জপের নামগন্ধ নেই, সেটা মরদের কাজ।"

চণ্ডীচরণ ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "সময়ে দেখ্‌তে পাবে। মানুষের বাইরের আবরণটাই সব নয় গিন্নি, সময়ে দেখ্‌তে পাবে।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "মতলবটা কি, শুনিই না।"

দুই

সাঁঝের সূর্য্য তখন অনেকখানি পশ্চিম-আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। পথভোলা একটা শৃগাল আনমনে বাটীর দুয়ারে আসিয়া এদিকে ওদিকে চাহিল, তারপর সবেগে একদিকে পলাইয়া গেল।

সুখলতা ঘরবার করিতেছিল। কচি খোকাকে অনেকক্ষণ ঘুম পাড়াইয়াছে। প্রথমকার সন্তান চন্দ্রনাথ আহার সারিয়া এতক্ষণ মায়ের সহিত কত কি গল্প-আলাপে কাটাইতেছিল। এইমাত্র সেও ঘুমাইয়াছে। সুখলতা অন্য কোন কিছু হাতের গোড়ায় খুঁজিয়া না পাইয়া চরকা নামাইয়া তুলা কাটিতে বসিল।

শৃগাল আবার আসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া নালি-পথে মুখ ঢুকাইবার চেষ্টা করিল। তাহার অঙ্গস্পর্শে দ্বার দুলিয়া উঠিল। সুখলতা 'কে' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শব্দে চকিত শৃগাল পলাইয়া গেল। সুখলতা চরকা সরাইয়া তেঁতুল কাটিতে বসিল। তারপর আপন-মনেই বলিল, "সহর কতদূর? গেলে মানুষ এখনও ফিরতে পারে না।"

তাহার কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া সম্মুখের জামগাছটা হইতে পেচা ডাকিয়া উঠিল। হিন্দুকুলনারীর কুসংস্কার পূর্ণমন সে ডাক সহিতে পারিল না, দুলিয়া উঠিল। "এখন ঘরের মানুষ ঘরে এলে হয় বাবু; কেন মরতে যে পরের দায়ে মাথা দিতে পাঠালুম।"

দ্বার নড়িয়া উঠিল। কড়া নাড়িয়া বলদেব ডাকিতে-ছিল, "চন্দ্র, ওরে চন্দে, ওগো, তোমরা সবাই কি ঘুমুলে?"

হাসিতে হাসিতে দ্বার খুলিয়া দিয়া সুখলতা স্বামীকে অভ্যর্থনা করিল, বলিল, "এলে, বাঁচলুম; এমনি ভাবনা হয়েছিল।"

বলদেব হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তুমিই ত ঠেলে পাঠালে সুখু, তবে এ মিছে ভাবনা কেন?"

সলজ্জ হাসিতে সঙ্কুচিত হইয়া সুখলতা প্রদীপ উসকাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি এক গাড়ু জল ও গামছা আগাইয়া দিয়া বলিল, "কষ্ট হয়েছে খুব?"

বলদেব বলিল, "হ'ত, কিন্তু একখানা জলজ্যান্ত মুখ সঙ্গে ছিয়েছিল যে, সেই সব শ্রম ভুলিয়ে দিয়েছিল।"

স্খলতা কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল, "অমন যা'তা' যদি বল—"

বলদেব বলিল, "থাক্ আর রেগে কাজ নেই। হ্যাঁ, ওদের সব ভুর ফাঁক হ'য়ে গিয়েছে; আমায় কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় নি। বলেছে, টেঁপী দাই-ই সব। কত টাকা দিয়ে বুড়ো তা'কে কিনতে চেয়েছিল, কত টাকা অগ্রিম দিয়েছিল। সব, কিছু সে লুকোয় নি। ওঃ, বুড়োর যে রাগ একদম চেহারা বদলে গিয়েছিল! তারপরেই কিন্তু আশ্চর্য্য, সয়তান বলতে হয় তাকেই!"

স্খলতার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; বলিল, "তা' হ'লে ছুঁড়ির আর বদনাম কিন্‌তে হয় নি ত? আহা, বড় ভাল মেয়ে সে! গায়ে খুন্তি পুড়িয়ে ঘা ক'রে দিত, কিন্তু একদিনের জন্যে মুখে কি তার প্রতিবাদের 'রা'-টি পর্য্যন্ত থাক্‌তে নেই! বড় মায়া হয় বাবু! স্বামীও কি তেমনি! কি দিয়ে ছুঁড়ী মহাদেব পুজো করেছিল কে জানে!"

বলদেব বলিল, "শুনানী মুলতুবী রইল গো। যে দিকে হাওয়া বইছে, সব প্রমাণ হ'য়ে যাবে, কিছু আটকাবে না। এর জন্যে ওদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। দেখলুম, একটা ঘরোয়া আপোষের চেষ্টায় আছে। দেখ কি হয়। হ্যাঁ, কেলেঙ্কারী বদনাম যা' কিছু হয়েছে এদেরই, তার গায়ে আঁচটীও লাগাতে পারে নি।"

স্খলতা কাহার উদ্দেশ্যে যোড়হাতে প্রণাম করিয়া বলিল, "সতী মা তার নিজের মেয়ের আবরু এমনি করেই রক্ষে করেন।"

তিন

সেইদিন অন্যপক্ষে বাঁশ-বাগানের মধ্যস্থিত ঘরের দাওয়ার উপর হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া চণ্ডীবাবু বলিতে-ছিলেন, "হাওয়াটা একদম উত্তরে গিন্নি! যে ঘোর বাদল আকাশ ছেয়েছে, জানি না, কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে!"

গৃহিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দাই মাগীকে হাত করেও কিছু হ'ল না।"

চণ্ডীবাবু বলিলেন, "সেই ত সব ফাঁস করিয়ে দিলে। তার কথার ওপর হাকিম রুকে উঠলেন; সঙ্গে সঙ্গে ওপক্ষে একজন বড় উকিল গজিয়ে উঠলো। বেটা যেন জাঁদরেল বাঘ! জেরায় কচাকচ সবার কথারই মানে উল্‌টে গেল। জানি না, এখন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!"

গৃহিণী একটা অভিশাপপূর্ণ কুৎসিত ভাষা বধুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া নিরস্ত হইলেন।

চণ্ডীবাবু কথাটার প্রতিশব্দ যোজনা করিতে কিছুমাত্র ইতঃস্তত করিলেন না। খানিক নীরবতার মধ্যে কাটাইয়া দিয়া বলিলেন, "এখন যে অবস্থায় ঘুরে দাঁড়াল, হাজার চার টাকার কমে পরিত্রাণ পাওয়া শক্ত। কি যে করব!"

গৃহিণী অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "হাকিম সাহেবকে বুঝিয়ে বলো, এই পাঁদাড়ে ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে থাকি, পেটে ভাত জোটে না, এত টাকা আমাদের স্বপ্ন।"

চণ্ডীবাবু বলিলেন, "কিন্তু সেই স্বপ্নই ভাঙবার যোগাড় হয়েছে গিন্নি। হাকিমের সাম্‌নে মুখ তোলবার উপায় আর নেই; তা'ছাড়া, বেয়াই আমার জমিদারী আমার হাজার মন বাৎসরিক ধানের খবর সব আদালতে পেশ ক'রে দিয়েছে। প্রজাগুলোও কি তেমনি! পটাপট স্বীকার ক'রে গেল। বাধ্য হ'য়ে ঘরের কড়ি দিয়ে মাঝ দরিয়ায় ডুবে মরত হবে গিন্নি, উপায় নেই।"

গৃহিণী বলিলেন, "তখনি ত বারণ করেছিলুম, শুনলে কই? হাজার হোক্, মিথ্যে কখন সত্যি হতে পারে!"

ঠিক সেই সময় পুত্র অময় আসিয়া চোখ লাল করিয়া বলিল, "বেটাকে এবার দেখে নেব! সত্যি বল্‌ছি বাবা, আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, এবার 'বলদা'র রক্ত দেখে তবে আজ মুখে জল দেব!"

গৃহিণী কাতরভাবে বলিলেন, "কি হ'ল রে?"

অময় বলিতে লাগিল, "ষ্টেশনে এসে শুনলুম, পরের 'মন্থলী' টিকিট নিয়ে যাওয়ায় আজ বাবাকে রেলের কুকুর-

গুলো যাচ্ছেতাই অপমান করেছে—একবার সদরে, একবার এখানে। আর জ্ঞাতি হ'য়ে 'বলা' জ্ঞাত-শত্রুতা সেধে এসেছে—ওরই মুখ থেকে তারা জেনেছে বাবা হরিশ মুখুর্য্যে নয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি; চেনে না তোমার বাবা—তার ফল ভুগ্‌ছেন। বৌকে এ চিঠি লিখে বিভ্রাট ঘটালে কে, 'বলদা'ই ত?"

চণ্ডীবাবু সোৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওহো, তাই! আজ আদালতে ওকেও দেখ্‌ছিলুম বটে। ওই আমার সাক্ষী ভাঙিয়েছে। এর সাজা ওকে হাতেনাতে দিতে হবে; দেরী করলে চল্‌বে না। ডাক তাকে।"

চার

বলদেবকে সেদিন স্বখলতা কিছুতেই বাহির হইতে দিবে না, কিন্তু মিষ্টকথায় বুঝাইয়া সে বলিল, "এতে যে অপরাধই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয় স্বকু! তা' যখন আমি নই; তখন একবার যাওয়াই ভাল।"

স্বখলতা মানিল না; বলিল, "ওরা বড় চাঁড়াল; রাগে হন্নে কুকুরের মত ছুটে এসেছে। আজ থাক্, কাল তখন যেও।"

কিন্তু বাহিরের অবিশ্রাম ডাকাডাকির ফলে বলদেবকে বাহিরে আসিতেই হইল। অময় বলিল, "তোমায় বাবা ডাক্‌ছেন।"

এক পা আমগাছের গুঁড়ির সিঁড়ির উপর রাখিয়া বলদেব সবে চণ্ডীমণ্ডপে পা তুলিয়াছে, বৃদ্ধ চণ্ডীচরণের হাতের তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আসিয়া তাহার উদরে প্রবিষ্ট হইল।

ক্ষতস্থান এক হাতে চাপিয়া বলদেব ছুটিয়া পলাইল। অময় পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া আর একবার সজোরে পশ্চাৎ দিক হইতে তাহার পৃষ্ঠে আমূল ছুরিকাঘাত করিল।

উঠানের মাঝে আসিয়া আহত বলদেব পড়িয়া গেল। অময় আর একবার ছুটিয়া আসিয়া তাহার বক্ষপঞ্জরে আঘাত করিল। বৃদ্ধ চণ্ডীচরণ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "অমনি অমনি ছাড়লে চলবে না, দাঁড়া।"

পাড়ার লোক সমবেত হইয়া যখন খুনী আসামী দুইজনকে ছাড়াইল, তখন তাহারা বলদেবের বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া তাণ্ডব নৃত্য স্বরু করিয়া দিয়াছে। তাহার ক্ষত মুখ দিয়া 'ভলকে ভলকে' রক্ত বাহির হইয়া আসিতেছে।

পাঁচ

আদালত শুদ্ধ লোক অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। হাকিম গম্ভীর হইয়া গেলেন; বলিলেন, "তুমি যা' বলছ, তার অর্থ বুঝ্‌ছ?"

কাদম্বিনী উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি একবার কাঠগড়ায় অময়ের দিকে ফিরাইল, তারপর মাথা নত করিয়া বলিল, "আমি যা' বল্‌ছি, তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। ওরা যা' বল্‌ছেন, আমি তাই!"

হাকিম ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "আমি বুঝেছি, তুমি স্বামীর জন্যে এতবড় নারীত্বের অপমান মাথা পেতে নিচ্ছ, কিন্তু মানুষ তার মনের যথার্থ স্বরূপ লুকুতে পারে না। চেষ্টার ত্রুটী হয় ত সে করে না, তবু পারে না। সেই দিকে চেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি, এ সাপকে আইনের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখে কি ফল আসবে তোমার?"

আসামী পক্ষের উকিল বাধা দিয়া বলিল, "হুজুর নিজে যদি এই সব কথায়—"

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নেই। আপনার এ নির্ব্বোধ নারীর কথার সূত্রটীর উপরের অবলম্বন, যাকে বলে আইনের ফাঁকি, আমি মুছে ফেল্‌তে চাই না। চাই জান্‌তে, হিন্দু-সমাজে এর স্বামী, পিতৃকুল এর এতবড় আত্মত্যাগের মহিমা বুঝবে না। বেচারী তাড়িত গলিত পত্রের অনুরূপ হ'য়ে ব্যথাই পাবে; সে সময় ওকে আশ্রয় দেবে কে?"

দুইটি বালক সঙ্গে স্বখলতা আদালত গৃহের একপাশে দাঁড়াইয়াছিল। অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "যদি অনুমতি দেন, ওকে আশ্রয় আমি দেব।"

হাকিম হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তোমার কোন কথাই আমার অজানা নেই মা! আইনের প্যাঁচে তোমার অত-বড় সর্ব্বনাশের পরও ওরা মুক্তি পেলে কেমন করে তাই ভাবি!"

রোঘো চাঁড়াল বেগে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমার মায়েদের আমি আশ্রয় দেব ধর্ম্মাবতার। আমি বড়লোক নই, ভদ্রলোক নই, বামুন নই, কাজেই, অত ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারি না। আর দেবে প্রজারা, আমি তাদেরই চাই। ভয় নেই চকোত্তী, তোমার পাওনায় আমরা কেউ হাত দেব না; কারণ, সেটা আমরা জানি ময়লার চেয়েও ময়লা, তা'তে হাত দিয়ে হাত ময়লা কেউই করব না। অনুমতি হোক্। আয় মা।"

কাদম্বিনীর স্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোনমতে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "তোমাদের দয়া আমি জীবনে ভুলব না বাবা, যদি কখন দরকার হয় নিজে হতেই হাত পেতে দাঁড়াব।

মকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। স্বর্ণলতার হাত ধরিয়া আদালতের বাহিরে আসিয়া কাদম্বিনী যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সহসা তাহার কর্ণে আসিয়া বাজিল—তখনই বলেছিলুম অমে ও বৌ নিয়ে ঘর করা চল্‌বে না কিছুতেই! দেখলি ত, নিজের মুখে স্বীকার করতে পথ পেলে না। হু হু বাবা, চণ্ডীচরণের চ'খে ধূল দিতে পারে আজও তার জন্ম হয় নি!"

স্বর্ণলতা কাদম্বিনীর মুখের পানে চাহিল। কাদম্বিনী হাসিয়া বলিল, "আর আমি পথ ভুলব না দিদি, যেদিন তো'মাকে চেনবার অবসর পেয়েছি, সেদিন আমার সব ভাবনার শেষ হয়ে গেছে। আর কেউ না জানুক, আমি ত জানি, শুধু ছোট বোনটীর মুখ চেয়ে তুমি কত বড় ক্ষতি সহ্য করেছ।"

স্বর্ণলতা বাধা দিয়া বলিল, "কি সব বাজে বক্‌ছিস্ কাদম্বিনী!"

"বাজে নয় দিদি, সত্যিই বল্‌ছি, ক'দিন থেকে সারাদিন রাত্রি ধরে ভেবেছি, তুমি দেবী না তার বাড়া কিছু! আমি তোমার কে দিদি, যে আমার জন্যে স্বামী হারালে—আমার মুখ চেয়ে ফাঁসীর আসামীকে মুক্তি দিলে, আজ মান বাঁচাতে সাক্ষীর কাটগড়ায় দাঁড়াতে এসেছিলে!"

"কাদম্বিনী!"

"জানি, দিদি সব জানি! মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তিনি বলে গেছ্‌লেন আমাকে দেখতে, আমায় ভাল করতে, তাই স্বামীর শেষ আদেশ তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছ! তোমার ভক্তি, তোমার নিষ্ঠাই ত আমায় বলে দিলে ওকে ক্ষমা করতে!"

স্বর্ণলতা কথা কহিল না। কাদম্বিনীকে জোর করিয়া বুকে টানিয়া লইল।

চলচ্চিত্রের মোহ

শ্রীপঙ্কু চৌধুরী

আজ যার কথা বল্‌বো, তার নাম উইলি। বয়স তের-চোদ্দ বছর। কি ক'রে চলচ্চিত্রের মোহ একটি ছোট্ট বালকের মনেও প্রভাব বিস্তার ক'রেছিলো এবং উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিলো, সেইটুকুই বল্‌বো। অবশ্য শুধু এইটুকু বল্লেও দোষের হবে, যদি না চলচ্চিত্রের প্রয়োজনের কথা বলি।

চলচ্চিত্রের বয়স খুব বেশী নয়, কিন্তু এরই মধ্যে সে জগতের সকল শ্রেণীর লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।--বিস্ময়ের কথাও যেমন আনন্দের কথাও ঠিক তেমন। আজ ইউরোপ, আমেরিকায় এমন কোন জিনিস নাই যা চলচ্চিত্রের এলাকার বাইরে। অর্থাৎ শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য যা কিছু education চলচ্চিত্রের সাহায্যে সবই হচ্ছে। অবশ্য ভারতবর্ষেও এই অনুকরণ সুরু হয়েছে এবং এই অনুকরণই একদিন ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধিশালী ক'রে তুল্‌বে—ঠিক ওদেরই মত অম্নি ক'রে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

ওদের দেশে Visual Education ব'লে একটা কথা আছে। Visual Education অর্থে শিক্ষা বিষয়ক সকল জিনিস (ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ণ, পাটিগণিত ইত্যাদি) চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদান। এগুলি বহুবার পরীক্ষিত; এরূপ শিক্ষা সহস্র বক্তৃতায় হয় না, আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে পুঁথি মুখস্থ করেও হয় না। আমাদের দেশে—ভারতবর্ষে এ শিক্ষা প্রণালী বর্ত্তমানে গ্রহণ করলেও বিস্তৃত হয় নি। এতবড় অভাব Education এর দিক দিয়ে আমাকে সত্যই বড় পীড়া দেয়। অবশ্য একদিন আস্‌বে, যেদিন ওদের দেশের মতই চলচ্চিত্রের সাহায্যে আমাদের শিক্ষায়তন গড়ে উঠ্‌বে।

আমাদের দেশে আজ যাঁরা প্রযোজক, আলোক চিত্র-শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী,—তাঁদের পূর্ব্ব-ইতিহাস খোঁজ করলে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, তাঁদের প্রায় সকলেই বাল্যকাল থেকেই এই চলচ্চিত্রের প্রতি অনুরাগী। এমন কি, অতি বড় দুঃখ কষ্টেও তাঁদের সে অনুরাগ কিছুমাত্র কমে নি। এর কারণ কি? যথার্থ-অনুরাগই তো শিল্পি-মনের বড় কথা। লেখকের নিজের কথা বেশ মনে পড়ে, যেদিন প্রথম চলচ্চিত্র দেখি, ছবি দেখ্‌বো কি Projection Room-এর সেই ক্ষুদ্র গর্ত্ত থেকে যা বেরুচ্ছে হাতি ঘোড়া, উট, জাহাজ, পাহাড়, নদী তাই দেখব? বিস্মিত নেত্রে শুধু সেই দিকে চেয়েই আমার সময় কেটে গেল! সে দিন আর ছবি দেখা হলো না। না হোক্, কিন্তু সেই থেকেই আমার শিশু-মনে এর প্রভাব যে কাজ করছিলো, আজ মর্ম্মে মর্ম্মে তা বুঝতে পারছি। তাই বল্‌ছিলাম, চলচ্চিত্রের প্রভাব শিশু-মনেই সব চাইতে বেশী। এবং সেই জন্যেই চলচ্চিত্রের সাহায্যে শিক্ষা, শিশু-মনে অতখানি ছাপ দেয়।

চলচ্চিত্রের প্রভাব শুধু আমাদের দেশেই নয়—আমেরিকার হলিউডে এম্নি অনেক গল্প আছে। একটি গল্প বলি:—

ইং ১৯২৯ সালে তখন আমি বার্লিনে, Terra Studio

তে Dr. Hoffman Harniseh প্রযোজকের অধীনে কাজ শিক্ষা করি। একদিন Germanyর সুপ্রসিদ্ধ Stage ও Screen সমালোচক Dr. Alexander Von Sachermacho, আমায় টেলিফোনে ডাকলেন,—এই Dr Sachermacho-ই আমাকে প্রযোজক Dr. Harniseh এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।

সন্ধ্যার সময় Dr- Sachermacho র গৃহে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, তিনি তাঁর স্ত্রী ও একটি তের-চোদ্দ বৎসরের বালক চা পানে রত। আমাকে দেখে বল্লেন, এই যে পঙ্কু এসেছ, বসো চা খাও! বালকটি আমার দিকে অগ্রসর হ'য়ে জার্ম্মাণ ভাষায় বল্লে, Glten Abend (Good Evening বা সান্ধ্যপ্রণাম) আমি তার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে আসন গ্রহণ করলাম। তারপর একটু পরেই Dr. Sachermacho বল্লেন পঙ্কু, এই ছেলেটির কথা বল্‌বার জন্যেই তোমাকে Phone করেছিলাম।

এই ছেলেটির নাম Willy, বয়স প্রায় তের চোদ্দ, জার্ম্মানীর অন্যতম সমৃদ্ধিশালী নগর Bremen এ বাড়ী। Bremen প্রায় Berlin থেকে ৩৮৫ মাইল দূরে অবস্থিত। Willy স্কুলে পড়তো এবং ইউরোপে ছেলে মেয়েরা যেমন অত্যধিক বায়স্কোপ দেখে, এরও সেই বাতিক ছিল। অবস্থা খুবই খারাপ, কারণ পিতার মৃত্যুর পর দুঃখিনী মাতাই উপার্জ্জন করে কোনরকমে সংসার চালাতেন।

Cinema দেখে Filmএ অভিনয় করবার সখ Willyর একদিন প্রবল হয়ে উঠলো কিন্তু Bremenএ কোন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান নাই, তাই অনন্যোপায় হয়ে একদিন কাউকে কিছু না বলে নিজের cycle ও পকেটে দুই-পাঁচ মার্ক (টাকা দেড়েক) নিয়ে Berlin যাত্রা করে। তের চোদ্দ বৎসরের বালক সাইকেল ৩৮৫ মাইল রাস্তা একলা আড়াইদিনে অতিক্রম করে। পকেটে যে টাকা দেড়েক ছিল রুটির খরচের তা যথেষ্ট নয়, প্রায় অনাহারেই তাকে পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। বার্লিনে পৌছে, আমার এক বন্ধুর বাড়ীর সিঁড়িতে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে প'ড়, বন্ধু Willyর মুখে সকল কথা শুনে আমার কাছেই অবশ্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি এমন অনুরাগ আর কোথাও দেখেছো, পঙ্কু? এত বড় প্রবল কামনার অতি বড় প্রাপ্তি অপেক্ষা করে আছে, এ আমি বিশ্বাস করি। আমি আমার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান চলচ্চিত্র-অভিনেতা Harry Peel কে Willyর কাজের জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলাম। Harry Peel উত্তরে জানিয়েছেন একখানা নূতন বইয়ের casting দু-চার দিনের মধ্যেই হবে এবং তাতে অমি একটী বালকেরও প্রয়োজন, তুমি ওকে দু-তন দিন পরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি নিশ্চয় একটা chance দোবো।

সে দিন বাড়ী ফিরবার পথে willyর কথাই মনে করতে করতে বাড়ী ফিরলাম।

Willyর কথা ভুলি নি। দিন পনের পরে ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে শুনলাম willy নাই। ডাক্তারের মুখেই শুনলাম,—Willyকে তিনি যথা সময়ে Hurry Peel এর কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু, সমস্ত দিন গেল, রাত গেল Willy আর ফিরিলো না। Hurry Peelকে ফোন করে জানলেন, সে সেখানে যায় নি। তারপর প্রায় ছয় সাত দিন পরে ডাক্তরের স্ত্রী Bremen থেকে Willyর একখানি চিঠি পান, Willy লিখেছে :—

মা,

আমি এখান থেকে চলে যাবার পর আমার মা সমস্ত জার্ম্মান পুলিসকে আমার ফটো দিয়ে অনুসন্ধানে লাগিয়েছিলেন এবং যখন আমি আপনাদের বাড়ী থেকে Harry Peel এর সঙ্গে দেখা করতে যাই, পথে বার্লিনের পুলিস হেড কোয়ার্টার Hlevander Platy এর কাছে একজন অফিসর আমায় arrest ক'রে Bremen এ আমার মার কাছে পাঠিয়ে দেয়। যাই হোক, আমার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সাধ অপূর্ণ রইল; আমি আমার স্কুলের পড়া শেষ করে আবার Berlin এ গিয়ে চেষ্টা করবো। বার্লিনে যে ক'দিন আপনাদের আশ্রয়ে ছিলাম তা জীবনে কখনও ভুলবো না।

ইতি আপনার—
Bremen এর ছেলে।

এই সঙ্গে মা পুত্রকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ডাক্তারের স্ত্রীকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে একখানি চিঠি পাঠিয়েছেন।

ক্লার্ক গ্যেবল

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক শীল

১৯৩০ অব্দের মে মাসে তরুণ এবং সুদর্শন অভিনেতা ক্লার্ক গ্যেবল যখন কালিফোর্ণিয়ায় 'লাষ্ট-মাইল' পুস্তকে 'কিলারে'র ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন, তখন তাঁহাকে কেহ-ই চিনিত না। অথচ,আজ মাত্র চারি বৎসরের ভিতর অসাধারণ অধ্যবসায় এবং সুতীক্ষ্ণ প্রতিভার বলে'হলিউডের' বিখ্যাত ছয়জন শিল্পীর মধ্যে তিনি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত

করিয়া লইয়াছেন। এই চার বৎসরের চিত্র-জীবনে তিনি প্রায় পঁচিশখানি পুস্তকে অভিনয় করিয়াছেন এবং অভিনয় নৈপুণ্যে প্রায় সমস্ত পুস্তকেই নিজের যশোবিভা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। 'সুসান লেনক্স'-এ 'গার্ব্বো'র সহিত, 'ড্যান্সিং লেডী'তে 'জোয়ান ক্রফোর্ড'-এর সহিত তাঁহার অভিনয় বেশ সাবলীল। 'নর্ম্মা শিয়ারার', 'মেরিয়ান ডেভিস্', 'জিন-হার্লো' প্রভৃতি হলিউডের অন্যান্য বিখ্যাত অভিনেত্রীর সহিতও তিনি বহু পুস্তকে অভিনয় করিয়াছেন এবং সব-গুলিতেই অসাধারণত্ব প্রকাশ করিতে না পারিলেও প্রায় ছবিতে তাঁহার অভিনয় যে উচ্চ অঙ্গের এ-কথা স্বীকার করা যায়।

গ্যেব্ল চিত্র-জগতে আজ এতখানি পরিচিত হইলেও হলিউডের বিখ্যাত শিল্পী 'ল্যায়োনেল ব্যারিমুরে'র নিকট তিনি সর্ব্বাংশে ঋণী। কেন না, তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভার সন্ধান ব্যারিমুরই প্রথম আবিষ্কার করেন। এবং একথাও সত্য, ব্যারিমুর থিয়েটার হল হইতে ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে চিত্র-জগতে জোর করিয়া প্রবিষ্ট না করাইলে, তাঁহার ভগবানদত্ত এই ক্ষমতা প্রকাশ করিবার কোনদিনই সুযোগ ঘটিত না এবং আজ তিনি সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয়পাত্র হইতে পারিতেন না।

এত অল্পদিনের মধ্যেই গ্যেবল হলিউডের 'ষ্টার' পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই এখনো অবগত হওয়া সম্ভব হয় নাই। তবে নিঃসঙ্কোচে ইহা স্বীকার করা যায়, তিনি একজন রসলিপ্সু অধ্যাবসায়ী, উদীয়মান অভিনেতা। 'পেন্টেড্ ডেসার্ট' পুস্তকে তিনি একটী অশ্বারোহীর চরিত্রে অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়, এই পুস্তকে অভিনয় করিবার পূর্ব্বে তিনি অশ্বারোহন করিতে জানিতেন না। অথচ, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই ওই চরিত্রের জন্য বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করেন। তিনি দিবারাত্রি অশেষ পরিশ্রম করিয়া কয়দিনের মধ্যে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া লন। তাঁহার জনৈক বন্ধু এই অশ্বারোহনে অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন : বইখানি তুলিতে অন্ততঃ পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগিবে জানিয়াই ওই চরিত্র লইতে সাহসী হইয়াছিলাম। তাঁহার এই উক্তি তাঁহার মতো অভিনেতারই উপযুক্ত এবং অসীম অধ্য-বসায়ের পরিচায়ক।

ক্রীড়া-কৌতুকও তিনি খুব ভালবাসেন। ক্যালি-ফোর্নিয়ায় সাঁতার, শিকার প্রভৃতিতেই তিনি বেশীর

ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। তাই ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়িয়া ক্যালিফোর্নিয়া ত্যাগ করিতে পর্য্যন্ত তিনি নারাজ। তিনি বলেন: একমাত্র ইউরোপে বেড়াইবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা আছে এবং এজন্য তিনি অনেকগুলি ভাষা এখনও শিক্ষা করিতেছেন। নতুবা তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নন।

গ্যেবল একদিন তাঁহার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন: "থিয়েটারে বা বায়স্কোপে অভিনয়কালীন আমি কাহারো মন্তব্যে কাণ দিই নাই—এবং আমার মতে অন্য অভিনেতাদিগেরও কাণ দেওয়া উচিত নহে। কারণ, ওই বিভিন্ন মন্তব্য-ই শেষ পর্য্যন্ত জীবনে উন্নতির পথে একান্ত অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

GRETA GARBO and CLARK GABLE in "SUSAN LENOX (Her Fall and Rise)"

JEAN HARLOW and CLARK GABLE in "RED DUST"

'মেন ইন হোয়াইট্' পুস্তকে অভিনয় করিয়া তিনি উপস্থিত ছুটিতে আছেন। শীঘ্রই 'চায়না সীজ্' কিংবা 'সোভিয়েটে' অভিনয় করিয়া তিনি ছায়া-প্রদীপের সম্মুখে দর্শকদিগকে অভিনন্দন করিবেন আশা করা যায়।
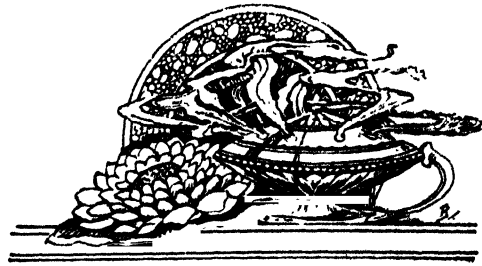
পরেশনাথ ও সূর্য্যকুণ্ড

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

দারুণ গ্রীষ্ম।

'গিরিডি'র আমাদের 'প্রফুল্ল-কুটীর' বাড়ীটিতে আর গরমে টেঁকা যায় না। দরজা জানালা বন্ধ করে 'মৌচাক' পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কতকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না (ঘণ্টা দু'-তিন হতেও পারে) হঠাৎ ঘুম ভাঙতে দেখি আর মোটেই গরম নেই! জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া আসচে।... ব্যাপার মন্দো নয়তো? তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে এলুম। দেখি আঁধিতে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। ভীষণ ঝড়—কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এল বৃষ্টি, গা গেল ভিজে। ইচ্ছা করেই ভেজালুম। এমন সময় ম-বাবু বললেন—ওহে, আজ বৃষ্টি হয়ে গেল। কাল বেশ ঠাণ্ডা পড়বে। চল, কাল পরেশ-নাথ বেরুন যাক্।"

অনেকেই সায় দিলেন। অতএব ঠিক হ'ল কালই যাওয়া যাবে। সেইদিন সন্ধ্যায় গিরিডি বাজারের কাছে গিয়ে একটী মোটার ভাড়া করা গেল। ভাড়া হ'ল সাড়ে সাত টাকা। আগামী কাল প্রত্যূষে চারটার সময় আমরা যাত্রা করব। বাজার হতে কমলালেবু, পাউরুটী, মাখন ইত্যাদি কিনে আনা হ'ল—পাহাড়ে গিয়ে সমস্তদিন কিছু খেতে পাওয়া যাবে না।...বাড়ী ফিরে সেদিন একটু সকাল সকালই নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করলুম—যেহেতু পরের দিন ভোরে উঠতে হবে।...

...পরদিন। ঘুম ভাঙলো মোটারের হর্ণের শব্দে। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে যা হোক কিঞ্চিৎ চা সহযোগে উদরস্থ করা গেল। তারপর তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে ওঠা হ'ল। আমি, অ-বাবু, ম-বাবু আর আট-নয় বছরের ছোট দু'টী ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে দু'জন। পাঁচজনে বসিবার গাড়ী। কিন্তু 'ড্রাইভার,' 'ক্লিনার' নিয়ে আমরা সর্ব্বসমেত হলাম নয় জন। গাড়ী ছাড়ল।...

শেষ রাত্রের পাণ্ডুর চাঁদ আকাশের একদিকে হেলে পড়েচে। চারিদিকে অপরিমেয় নিঃশব্দতা। কেবল আমাদের মোটারের এঞ্জিনের সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া পৃথিবী নিদ্রিত। ক্রমশঃ গিরিডি সহরের গণ্ডী ছেড়ে গেলুম। এবার আমরা এসে পড়লুম কয়লা-খাদের সীমানার মধ্যে। বাঁদিকে 'ভাদুয়া' পর্ব্বত-মালা দেখা যাচ্ছিল, তারি আশেপাশে চারিদিকে অসংখ্য কয়লার 'খনি'। 'খাত'গুলির নিকটে বহু বৈদ্যুতিক আলোক, মালার মত সারি সারি জ্বলছিল। কয়লা-খাদের সীমানা ছেড়ে আমরা ডানদিকে 'হাজারীবাগ রোড' ধরলুম। এ রাস্তাটীর নৈসর্গিক দৃশ্যনিচয়ের জন্য প্রসিদ্ধ বলে শুনেছিলুম। দেখলুম, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। তখন প্রায় সকাল হয়ে আসচে। আশপাশের ঘন বন জঙ্গল চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠচে। ক্ষীণ আলোক-আঁধারে

সে গুলোর রহস্য যেন আরও জটিল মনে হচ্ছে। হঠাৎ বাঁদিকে একটা মজার জিনিষ নজরে পড়ল। একটা মস্তবড় পাহাড়, কিন্তু তার চারপাশ দু' ফিট ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েচে। একি, গুলিসূতা দিয়ে হাতি বেঁধে রাখা হয়েচে নাকি? ম-বাবু বললেন—তা নয়, ওটা এক রাজার বাড়ী। পাহাড়ের বুকের ভিতর গর্ত্ত কেটে রাজার বাঙ্‌লো তৈরী হয়েচে। ওটা তাঁর সীমানা (bound ry) নির্দ্দেশের পাচিল। দেখলুম সখ ঠিক রাজার মত বটে!

অন্ধকারের ওড়না পৃথিবীর বুক থেকে খসে গেল। ধরণীর বুকে নবজাত প্রভাতের কলকাকলি ফুটে উঠ্‌ল। আমরা বরাকর নদীর পুল পার হয়ে গেলুম। উনিশ্‌শত তেইশ খৃঃ এই পুল তৈরী হয়েচে। তার পূর্ব্বে পায়ে হেঁটে নদী পার হতে হতো। নদীতে জল নাই। চারিদিকে বালুকার উপর গর্ত্ত করে লোকে জল সঞ্চয় করে গেছে। জলের একটু ক্ষীণ প্রস্রবন বালুকার বিছানার ভিতর ঘুমিয়ে আছে হয়তো।..বরাকর পার হ'য়ে আমরা আরও কিছুক্ষণ হু হু করে চলে গেলুম। এবার 'সাতচড়াই।'
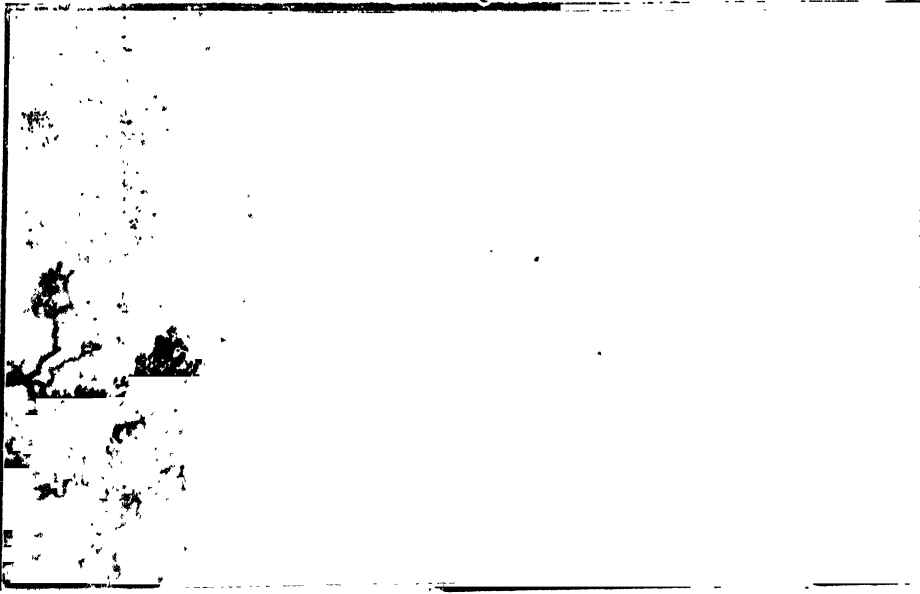
দূর হইতে পর্ব্বতের উপর পরেশনাথের মন্দির

ড্রাইভার 'স্পীড' বাড়িয়ে দিলে। হু হু করে গাড়ী চলতে লাগল। হঠাৎ সম্মুখে গগন-চুম্বী পরেশনাথ পাহাড় দৃষ্টির পথে এসে দাঁড়াল। কিন্তু আশ্চর্য্য! সমস্ত পাহাড়টা কে যেন আলোকমালায় সাজিয়ে রেখেচে!... [illegible], পাহাড়ে দিবারাত্রি দাবানল জলে। পাহাড়ের বুকের জঙ্গলের ভিতর কাঠে কাঠে ঘর্ষণ লেগে যে আগুণ জ্বলচে, তার আর নির্ব্বাণ নেই। কত যুগ আগে ও আগুণ জ্বলেচে ঠিকানা নেই, এখনও দিবারাত্র জ্বলচে, আরও কতদিন জ্বলবে কে জানে!...

পৌছালুম। এখানে পাহাড়ের উপর সাতটা চড়াই উঠতে হ'ল। চড়াইগুলির সম্মুখে 'অটো মোবাইল এসোসিয়েসন' একটা ত্রিভুজের উপর লিখে দিয়েছেন—'ফাট আরম্ভ হ'ল, আস্তে গাড়ী চালাবেন—বিপদ আছে।' সাতচড়াই পার হয়ে প্রায় পঁচিশ 'মাইল-ষ্টোন' বরাবর এসে বাঁদিকের রাস্তার দিকে আমরা গাড়ীর মোড় ফেরালুম। রাস্তার একপাশে লেখা আছে—পরেশনাথের পথ। যে রাস্তা আমরা ছেড়ে এলুম সে রাস্তা সোজা গিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে মিশেচে।

আমরা এবার যে স্থানে এলুম এটা 'মধুবন' নামে খ্যাত। মধুবনের পথ দু'মাইল এসে আমরা পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হলুম। এখানে তিনটী জৈন ধর্ম্মশালা আছে। এগুলির নাম ১। শ্বেতাম্বর ২। দিগম্বর ৩। তেয়রাপন্থী। গাড়ী থেকে নেমে আমরা ধর্ম্মশালাগুলি একটু বেড়িয়ে নিলুম। দেখলুম প্রশস্থ এগুলি। বহু-লোকের থাকবার আস্তানা আছে। এগুলির ভিতর অনেকগুলি মন্দির আছে দেখলুম। সেগুলিতে বহু বুদ্ধমূর্ত্তি এবং প্রাচীন চিত্র রক্ষিত আছে। মূর্ত্তিগুলি কলিকাতার পরেশনাথ মন্দিরের মূর্ত্তিগুলির অনুরূপ।

ক্রমশঃ আমরা পাহাড়ে একটু একটু করে উঠতে আরম্ভ করলুম। সমস্ত পাহাড়টা চূড়া পর্য্যন্ত উঠবার সোজা পথ ছয় মাইল। এপথটুকু সমতল ভূমিতে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর—কিন্তু পাহাড়ে উঠতে এই পথটুকুতে প্রায় সাড়ে চারঘণ্টা সময় লাগল। আমরা চলতে লাগলুম। একটী উপত্যকায় এসে একটী বস্তি পাওয়া গেল। বস্তির ভিতর হতে ও-দেশীয় লোকেরা এসে আমাদের এক এক গাছি লাঠি দিলে। এগুলির পরিবর্ত্তে তাদের কিছু পয়সা দিতে হ'ল। সুউচ্চ পর্ব্বতারোহনের পক্ষে বাঁশের লাঠির ন্যায় পরার্থপর বন্ধু বোধ হয় আর পাওয়া যায় না।

জ্যোস্নালোকে পরেশনাথের মন্দির

আমরা এইবার পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করব ঠিক করলুম। মেয়েদের জন্যে দু'টী 'ডুলি' ভাড়া করলুম। প্রত্যেকটীর ভাড়া পড়ল তিন টাকা করে। তারপর আমরা 'জয়বাবা পরেশনাথ জি কি জয়!' বলে হট্টগোল করতে করতে পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করলুম। হাতের ঘড়িতে তখন বেজেচে ছয়টা কুড়ি মিনিট। বেশ জোরে জোরেই চলতে লাগলুম। কিন্তু ম-বাবু বললেন—সাড়ে চারহাজার ফিট পাহাড়ে ওঠার পক্ষে ওটা কিন্তু 'ব্যাড একনমি;' একথার মূল্য পরে বেশ বুঝতে পেরেছিলুম।

আবার চলতে লাগলুম। আশপাশের জঙ্গল ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠলো। জঙ্গলের ভিতর হতে নানা জীবজন্তুর ডাক শুনতে পাওয়া গেল। ময়ূর, বানর, নানারঙের পাখী আমাদের এদিক ওদিক দিয়ে চলে যেতে দেখলুম। বাঁদিকে একটী চা-বাগান দৃষ্টিপথে পড়ল। জঙ্গলে নানা রকমের গাছ আছে। হরিতকী, আমলকী, ভেলা, করমচা ইত্যাদি বহু গাছের তলায় পড়েছিল। যত পারলুম কুড়িয়ে নিয়ে পকেটস্থ করলুম। দু'-একটা অত্যন্ত অদ্ভুত গাছ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একটী গাছে কড়াইশুঁটির

মত একপ্রকার শুঁটি হয়েছিল; কিন্তু সেগুলো প্রায় হাত দুই লম্বা। উপরটা ঠিক 'মখমলে'র মত—ভিতরে কাঠের কঠিন আবরণ। এই জিনিষটির একটী টুক্‌রা সংগ্রহ করলাম। এইবার প্রায় আড়াইমাইল পথ এসে 'সীতা-নালা' পেলুম। এখানে একটী পার্ব্বত্য ঝরণা ঝির্‌ঝির্‌ করে বয়ে যাচ্ছে। বেশ ক্লান্তি এসেছিল। ধূলায় হাত-পা-পড়লুম। দেখলুম সহস্র উপলের উপর আছাড় খেয়ে ঝরণার বিক্ষুব্ধ জলরাশি অজস্রধারায় বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করে কোন অনির্দ্দিষ্ট লোকের দিকে আকুল আবেগে চলেচে। আমরা জলের ভিতর হাত পা মেলে দিয়ে আরামে বসে রইলুম অল্পক্ষণ। মনে বিশেষ আনন্দ পেলুম। জলখাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু

জিতনাথের মন্দিরে নিকটের টোকা
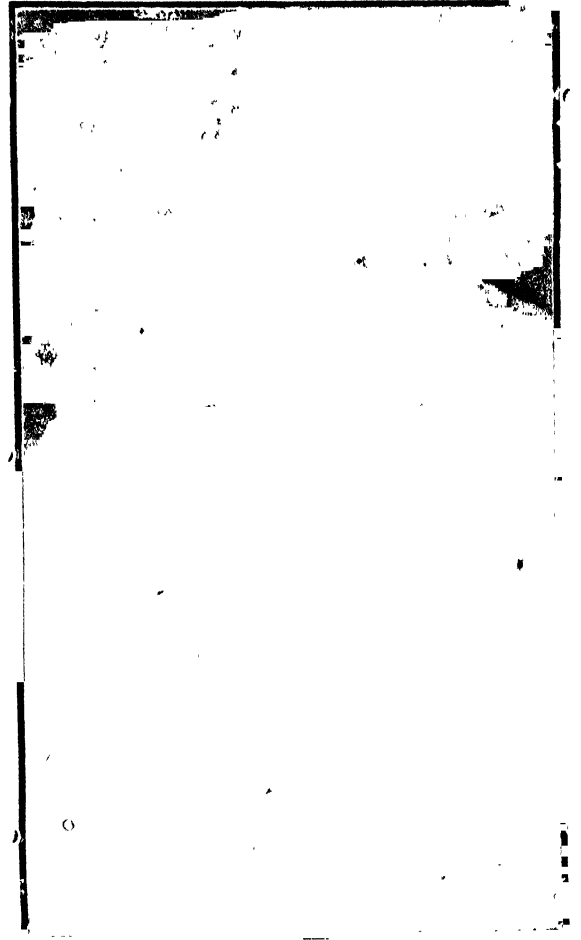
নিম্নতম সোপান হইতে পরেশনাথের মন্দির দৃশ্য

গুলোর চেহারা দেখে মায়া হয়! আয়নাতে দেখ্‌লে যে-যার চেহারাকে আপনার প্রেতাত্মা বলে ভ্রম হতেও পারতো। মহিলা এবং ছোট ছেলেদের সেখানে রেখে আমরা পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে ঝরণার ভিতরে নেমে জলের ভিতর বহু পচা-পাতা জমেছিল বলে সে জল খেতে সাহস হ'ল না। জলের ভিতর ছোট ছোট চিংড়ি মাছ নজরে পড়ল। আমরা আবার উঠে যাত্রা করলুম। বলতে ভুলে গেছি, আমরা যখন পাহাড়ের তলা থেকে উঠি তখন

দু'টী কুকুর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এতদূর এসেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত আমাদের পিছু পিছু চলেছিল।

আবার আমরা চলতে লাগলুম। এবার যেখানে এলুম, সেখানে চারিদিকে দাবানল জলচে এবং পুঞ্জীকৃত ধূম নির্গত হচ্ছে। দেখলুম, প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িগুলা দাউদাউ করে জলচে। চারিদিকে পোড়াগাছের ছাই ছড়ান—যেন শ্মশানচারী মহাদেবের লীলা। আরও চলতে ভরসা করে আমরা আবার পথ চলতে লাগলুম। প্রায় দশটার সময় আমরা আমাদের মাথার উপর ডাক-বাঙলো দেখতে পেলুম। এই স্থান হতে ডান দিকে পাহাড়ের গা দিয়ে একটি রাস্তা আছে। তার সম্মুখে লেখা আছে—'নিমিয়া ঘাটে'র পথ। এই রাস্তাটি পাহাড়ের তলদেশে গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের 'নিমিয়া ঘাট' ষ্টেশনে গিয়ে মিশেচে।

আবার চলতে লাগলুম। এবার একেবারে ডাক-

জল-মন্দির

লাগলুম। এবার পথ কষ্ট বেশ বুঝতে পারচি। দশ-বার হাত যাই আর অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে 'দম্' নিয়ে নিই।—পথ এবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। বাঁদিকের পথ গেছে 'জল-মন্দিরে' এবং ডানদিকের পথ সোজা 'ডাক-বাঙলো' ঘুরে মূল পরেশনাথ মন্দিরে—পাহাড়ের শিখরে। আমরা ডানদিকের পথ দিয়ে চলতে লাগলুম। বনের ভিতর জীবজন্তুর ডাক ক্রমশঃ বেশ স্পষ্ট হয়ে কানে বাজতে লাগল। মাঝে মাঝে গাছের উপর নোটিশ টাঙান—শিকার বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। ডুলি বাহকেরা আমাদের আশ্বাস দিল, বাবা পরেশনাথজীর কৃপায় কোন জন্তু যাত্রীদের কোন ক্ষতি করে না। সেই আশার উপর বাঙলোয় এসে পৌছলাম দশটা কুড়িমিনিটের সময়। ডাকবাঙলোর ঘরগুলি সুপরিসর। প্রত্যেক ঘরে চিমনি আছে। শীতকালে এখানে বেজায় শীত। ডাক-বাঙলোর একটি ঘরের একদিক গত ভূমিকম্পের ফলে ভেঙে গেছে দেখলুম। ডাকবাঙলোর বারান্দার ওপর আমরা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লুম। বেশ ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া দিচ্ছিল। অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করা গেল।—এবার রাস্তা বেজায় সরু হয়ে গেছে। রাস্তার একদিকে একটি প্রস্তরফলকে লেখা আছে—"None but Jains and Hindus of high caste can enter the large temple and the 25 little temples of

Jain Sitambaris, which are situated on the Pareshnath Hill.

"If any other person than a Jain or a Hindu of high caste enters the said temples he will be prosecuted under chapter 15 of Indian Penal Code." ইত্যাদি।
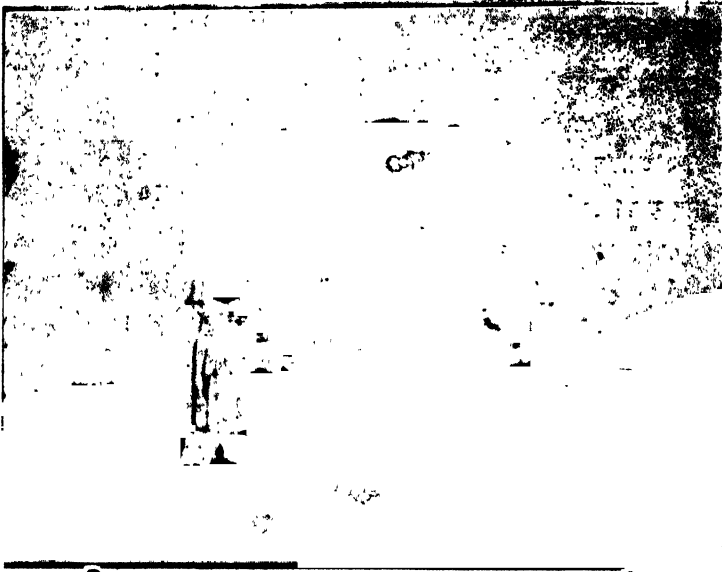
জ্যোৎস্নালোকে মন্দিরের একাংশ

ফলকটি উনিশ শত চার সালের পয়লা জানুয়ারী বসান হয়েচে।

তারপর আমরা আস্তে আস্তে উঠে মন্দিরে পৌছালুম। মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড সিঁড়ি। মন্দিরে যখন পৌছালুম তখন দশটা চল্লিশ মিঃ। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কুকুর দু'টী এসে মন্দিরের সিঁড়ির তলায় বিশ্রাম নিতে বস্‌ল। আমরা উপরে মন্দিরটী ভাল করে দেখতে লাগলুম। মন্দিরটির ভিতরের গঠনভঙ্গিমা বড় সুন্দর। পরেশনাথজির অঙ্গে বহু হীরা পান্না বসান আছে। আমরা মন্দিরের বারান্দার উপর বেড়িয়ে নিলাম। বেশ ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস আসছিল। বৈশাখ মাস, কিন্তু তবুও গা শিরশির করতে লাগল। মন্দিরের বারান্দা হতে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়; গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাজারিবাগ রোড, গ্রাণ্ড কড লাইনের 'গুমো' ষ্টেশন ইত্যাদি বেশ দেখা গেল। বারান্দার এক কোণ হতে পাহাড়ের এক প্রান্তে 'তোপচাচি' হ্রদটীর নীল জলরাশি দেখে একটী নীলোৎপল বলে ভ্রম হয় যেন। মন্দির দেখা শেষ করে আমরা আবার অন্যরাস্তা ধরে জল-মন্দিরের দিকে চললুম। মন্দির হত জল-মন্দিরের রাস্তাটী বেজায় সরু। একটি বাঁকের মুখে রাস্তা প্রায় দেড়হাত চওড়া। এবং তার নীচে প্রায় দেড়হাজার দু'হাজার ফিট নীচু খাত। এখানটাকে ও-দেশের লোকে 'সুড়সুড়িয়া' বলে; যেহেতু, নীচের দিকে তাকালে ভয়ে গা শির-শির করে ওঠে। জল-মন্দিরের দিকে অনেকগুলি 'টোকা' বা ছোট মন্দির দেখা গেল। জল-মন্দিরে কয়েকটী সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। এস্থানটার নামকরণের বিশেষত্ব এই যে, এস্থানে বৃহৎ একটী চৌবাচ্চা আছে। তা'তে পাহাড়ের পথ দিয়ে জল চুঁইয়ে এসে ভর্ত্তি হয়ে যাচ্ছে। জল-মন্দিরে জলযোগ সেরে বিশ্রাম করে বেলা দুইটা পয়তাল্লিশ মিনিটের সময় আমরা ফেরবার পথে যাত্রা করলুম। আমাদের সঙ্গে যে কুকুর দু'টী এসেছিল, তারা আমাদের সঙ্গে ভোজন করে বিশ্রাম নিতে লাগল, আর ফিরল না। আমরা যে রাস্তা দিয়ে উঠেছিলুম, পিছনে সে রাস্তা ছেড়ে রেখে উল্টা পথ দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম। এ পথের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে রাস্তার মাঝে প্রায় হাজার ফিট্ স্থানে ছোট ছোট সিঁড়ি আছে। সেগুলি অতিক্রম করে নামতে হ'ল। এ পথে দ্রষ্টব্য কিছু ছিল না। আমরা আড়াইঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ের নীচে পৌছে গেলাম। উঠতে সময় লেগেছিল প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা। নীচে পৌছে মোটরে করে সেদিন সন্ধ্যায় প্রফুল্ল-কুটীর ফিরে আসা গেল।···

পরদিন।—

পাহাড়ে ওঠার জন্য সবার ভয়ানক গায়ে ব্যথা। তবুও বেড়ান চাই! আজ ঠিক হ'ল পরেশনাশ পাহাড় ছেড়ে সোজা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে 'ভারকাট্টা' চলে যাওয়া যাবে 'সীতাকুণ্ড' দেখতে। এটী একটী উষ্ণ প্রস্রবণ। আজও আমরা প্রায় সংখ্যায় আট-ন'জন হলুম। চ-বাবু তাঁর 'র‍্যাইফ্যাল'টী নিয়ে এলেন। বল্লেন—ফিরতে যদি রাত হয়ে যায়, তখন পথে বাঘটাঘ এক-আধটা 'ব্যাগ' করে আনা যাবে।

গাড়ী ছাড়ল। হু হু করে গিরিডি ছেড়ে, হাজারিবাগ রোডে পঁচিশ মাইলের মাথায় পরেশনাথ পাহাড় ছাড়িয়া আমরা 'ডুমরী'র দিকে চল্‌তে লাগ্‌লুম। বেলা তখন প্রায় দেড়টা। প্রায় ত্রিশ মাইল এসে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরলুম। এখানে ডুমরী ষ্টেশন। আমরা গাড়ী থেকে নামলুম। ড্রাইভার আর ক্লিনার জল ঢেলে গাড়ীর চাকা ঠাণ্ডা করতে লাগল। ত্রিশ মাইল চলেই চাকা অসহ্য তেতে উঠেচে। আমরা এখানে একটী দোকান থেকে সরবৎ কিনে খেলুম। স্রেফ বাতাসার জল, কিন্তু দাম দিতে হ'ল গ্লাস পিছু দু'আনা করে। আবার আমরা গাড়ীতে চড়লুম। রাস্তার দু'পাশে জঙ্গল, চমৎকার প্রাকৃতিক আবেষ্টনী এ স্থানটীর। প্রায় পোনের মাইল গিয়ে 'বগোদর' ষ্টেশন মিলল। বগোদরের বাজার হতে আলু, লঙ্কা, শশা, তরমুজ প্রভৃতি কিনে নিলুম।

বগোদর ছেড়ে যাবার পর রাস্তা আরও চমৎকার! ক্রমাগত চড়াই উৎরাই করে আমরা যাচ্ছিলুম। গাড়ীর 'স্পীডোমিটারে' তখন পড়া যাচ্ছিল ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ। এত জোরে এবং ক্রমাগত চড়াই উৎরাই করে চলেছিলুম বলে নাগরদোলা চড়ার আরাম উপভোগ করতে করতে যাচ্ছিলুম। আর নাগরদোলায় উঠলে নামবার সময় যেমন পেটের ভিতর সুড়সুড়ি লাগে, এখানেও প্রত্যেকটী উৎরাইয়ের সময় সেইরূপ সুড়সুড়ি খেতে খেতে যাচ্ছিলুম। এস্থানটায় কেমন এক শান্ত সৌম্যভাব। কয়েকটী শিয়াল দৌড়ে গেল। আবার কখন গাছের ডালে বনের পাখীরা ভয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠল। প্রকৃতি দেবীর আঙিনায় আমরা অনধিকার প্রবেশ করেচি যেন! চ—বাবুর ভাব জেগে উঠ্‌ল। তিনি 'রাইফ্যাল' রেখে পকেট থেকে 'পিকলু' বার করে সুর ধরলেন—

"পথ গেছে কোন্‌খানে!
কোন্ পাহাড়ের পারে
কোন্ সাগরের ধারে
কোন্ দুরাশার দিক্‌পানে
কে জানে! কে জানে!"

দুইশত ত্রিশ লেখা মাইল-ষ্টোনের পাশ দিয়ে গাড়ী জঙ্গলের পথে নেমে পড়ল। খানিক দূর গিয়ে একস্থানে থামল। আমরা নেমে পড়লুম। এইটীই সূর্য্যকুণ্ড। কুণ্ডের মুখটী প্রায় চার ফিট চওড়া হবে। কুণ্ডের জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটচে। কুণ্ডের ভিতর হতে ভীষণ গরম বাষ্প বেরিয়ে আসচে। আমরা একটী গামছায় করে আলু এবং ডিম বেঁধে কুণ্ডের ভিতরে ঝুলিয়ে দিলুম। এই কুণ্ডটীর নাম সূর্য্যকুণ্ড। এর আশেপাশে আরও চার-পাঁচটী কুণ্ড আছে। সেগুলির নাম—সীতাকুণ্ড, লক্ষণকুণ্ড, ইত্যাদি। কুণ্ড হইতে অল্প একটু দূরে কয়েকটী চৌবাচ্ছা আছে। তার ভিতর অল্প উষ্ণ জল রক্ষিত রয়েচে। আমরা এই চৌবাচ্ছাগুলির ভিতর নেমে স্নান করতে আরম্ভ করলুম। জলে কিন্তু বেজায় গন্ধকের গন্ধ। মুখে দিলে বমি আসে। এখানে একটী মহিলাদের স্নান করবার স্থান আছে। সেটী পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কুণ্ডের একপাশে একটী বিশ্বকর্ম্মার মন্দির দেখলুম। মন্দিরটী জীর্ণ। জঙ্গলের ভিতর বহু উনান তৈরী করা পড়ে আছে। শুনলাম শীতকালে মেলা বসে। কুণ্ডের চারিপাশে বিশ্রী 'সল্‌ফিউরেটেড হাইড্রোজেনে'র গন্ধ। কুণ্ডের ঠিক উপরে একটী গাছ আছে। গন্ধকের ধোঁয়া লেগে সে গাছটীর একটীও পাতা নেই—ছালও উঠে গেছে। আলু ও ডিম সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেগুলি উদরস্থ করে আবার মোটারে উঠলাম। বলা বাহুল্য, চ-বাবুর সেদিন নেমে অপেক্ষা করতে হ'ল। রাইফ্যাল নিয়ে যাওয়া বৃথা হয়েছিল। বাঘ মেলে নি, তবে প্রচুর শৃগাল এবং বন্যবিড়াল দেখা গিয়াছিল—তিনি মারতে রাজ হন্ নি।*

---

* এই প্রবন্ধের ব্লকগুলি "পঞ্চপুষ্প" মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের সৌজন্যে পেয়েছি।

হাস্যময়ী

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়

কলিকাতার আশপাশে গঙ্গার ধারে আমাদের একটা বাড়ীর প্রয়োজন। খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা দুই বন্ধুতে বরাহনগরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একখানি বাড়ীর সন্ধানও মিলিয়া গেল। আমাদের ঠিক এই রকম প্রয়োজন ছিল। ছোট দোতলা বাড়ী। সাম্‌নে পাচীল দিয়া ঘেরা ফুলবাগান। কথাটা ঠিক বলা হইল না, এককালে সেখানে ফুলবাগান ছিল, এখন কাঁটাবনের ফাঁকে ফাঁকে দুই একটা ফুলের গাছ কোনরকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া অসহায় অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও সাহায্য পাইলে হয় ত আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেও পারে। ছোট একটা ফটকের গায়ে একখানি জীর্ণ কষ্ঠফলকে রেখা রহিয়াছে—এই বাটী ভাড়া দেওয়া যাইবে। নিকটে অনুসন্ধান করুন। অক্ষরগুলি এরূপ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, দেখিলেই মনে হয় বহুদিনের রৌদ্রবৃষ্টির অত্যাচার ইহাদের সহ্য করিতে হইয়াছে এবং ইহাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে বাড়ীটিও বহুদিন খালি পড়িয়া আছে। হয় ত কিছু কম ভাড়ায় পাওয়া যাইতে পারে। আমরা তৎক্ষণাৎ মালিকের সন্ধানে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

মালিকের সহিত দেখা হইলে কহিলাম, "আপনার গঙ্গা ধারের বাড়ীখানা আমরা ভাড়া নিতে চাই।"

মালিক আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; তারপর কহিলেন, "বাড়ী কি আপনারা দেখে এসেছেন?"

আমি কহিলাম, "হ্যাঁ, বাইরে থেকে দেখে এসেছি—তা'তে বুঝলাম, ও বাড়ীতে আমাদের চলবে। অবশ্য ভেতরটা একবার দেখা দরকার। এখনই আমরা দেখতে চাই।"

মালিক কহিলেন, "এই ত কাছেই, চলুন আপনাদের দেখিয়ে আন্‌ছি।" একটু থামিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "সেখানে কাউকে দেখলেন কোন মেয়েছেলে?"

বিস্ময় পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলাম, "বাড়ী ত চাবিবন্ধ রয়েছে—ভেতরে যে কেউ থাকে তাত বোধ হ'ল না।"

মালিক যেন আপন-মনে বলিতে লাগিলেন, "আর সে আসবে না—এক বছর ফেলে রেখে কাজ হয়েছে।" একটু থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ভালই হয়েছে—বাড়ী আপনাদের পছন্দ হবে, বেশ ভাল বাড়ী। "দেখুন, ও বাড়ীর ভাড়া অনেক বেশী, তবে আমি কমেই দেব। অনেকদিন খালি রয়েছে, আর ফেলে রাখ্‌তে চাই না। চলুন বাড়ী আপনাদের দেখিয়ে আনি।"

বাড়ী দেখিলাম। উপর নীচে ছয়খানি ঘর। তাহা ছাড়া রান্নাঘর ভাঁড়ার-ঘর, চাকরদের থাকিবার ঘরও আছে। বেশ গোছাল বাড়ী। ঘরের সামনে খোলা বারান্দা, তাহার কয়েক হাত দূরেই গঙ্গা। আমার ভারি পছন্দ হইল। এইবার আমি ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

মালিক কহিলেন, "আচ্ছা, আপনারা কত ভাড়া দিতে পারেন?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আমি কহিলাম, "এই ধরুণ টাকা পঁচিশ।"

মালিক সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন, "বেশ, তাই দেবেন।

খালি পড়ে থাকাতে বাড়ী খারাপ হ'য়ে যায়। এর ভাড়া পঞ্চাশ হওয়া উচিত, কিন্তু লোকে এখন অত ভাড়া দিতে পারে না। আপনারা কবে আসতে চান, বাসের উপযোগী করে' দিতে হবে ত? দিন তিন-চারের ভেতর আমি ঠিক করে দিতে পারব। আমার কিছু খরচ-পত্র আছে ত, একটী মাসের ভাড়া আমায় আগাম দিতে হবে।"

আমি ভাবিয়াছিলাম, পঁয়ত্রিশের কমে পাওয়া যাইবে না তাই এককথায় এত কমে রাজি হওয়ায় আমি কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। ইহার কারণ কি? কিন্তু তাহা ভাবিয়াই বা আমার লাভ কি? বাড়ী আমাদের দরকার এবং যখন পছন্দ হইয়াছে, তখন কারণ অনুসন্ধান করিবার কোন আবশ্যকতা আমার নাই। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাবে রাজি হইয়া বলিলাম, "আমি বৈকালে এসে আপনাকে একমাসের ভাড়া দিয়ে যাব।"

এমন সময় পদশব্দ শুনিয়া পিছনের দিকে চাহিতেই দেখিলাম, একটী ভদ্রমহিলা সেইদিকে আসিতেছেন। আমরা সরিয়া তাঁহার পথ করিয়া দিলাম। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া তিনি বারন্দার একপাশে দাঁড়াইলেন।

মালিকের মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল—তাঁহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া পড়িল, তীব্রস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আবার এসেছ, আমার সর্ব্বনাশ না করে' ছাড়বে না।"

মহিলাটি তাঁহার কথার কোন উত্তর দিলেন না, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া আমরা হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

মালিক যেন আপন-মনে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না ভাড়া দিতে দেবে না, কিছুতেই দেবে না। বাড়ী আমার শ্মশান না করে ছাড়বে না।"

আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়াইয়া মহিলাটি তেমনই নিরুত্তরভাবে দাড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার অনাবৃত মুখের উপর তখনও তেমনই মৃদু হাসি খেলিয়া বেড়াইতেছিল।

আমাদের বিমুগ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া মালিক অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "পারবেন, থাকতে এর সঙ্গে?"

আমরা তাঁহার কথার কোন অর্থই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। মুহূর্ত্ত পরে দেখিলাম, মহিলাটী তেমনই নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মালিক সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "দেখলেন, দেখলেন মশায়, কি সয়তান! বাড়ী কেনা অবধি এমনই করে আমার পেছনে লেগে আছে। যখনই ভাড়ার কথা হয়, অমনই এসে উপস্থিত হয়।" তাই প্রায় এক বছর বাড়ী আমি খালি ফেলে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, সে আর আসবে না। কিন্তু দেখলেন ত?'

অপরিচিতা মহিলাটীকে দেখিয়া অবধি মনের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। তিনি চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও বেশ হাল্কা হইয়া গেল; কহিলাম, "কে উনি, কেন আসেন?"

বিরক্তিপূর্ণ-কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "তা' জানলে ত সব গোলই মিটে যেত।"

আমি কহিলাম, "সন্ধান নিলেই ত সব জানতে পারতেন।"

তেমনই বিরক্তির সহিত তিনি কহিলেন, "কার কাছে কি করে' সন্ধান নেব। এমনই হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলে যায়। আশেপাশে সন্ধান নিয়েছি, কেউ কিছু বলতে পারে না। আমি ত এবাড়ীর আশাই ছেড়ে দিয়েছি। যাক্, এরপরে আপনারা নিশ্চয়ই এ বাড়ী আর ভাড়া নেবেন না। অনর্থক কষ্ট ভোগই সার হ'ল।"

মহিলাটী কে, কি জন্যই বা নিঃশব্দে আসেন, নিঃশব্দে চলিয়া যান তাহা জানিবার জন্য কি জানি কেন, আমি মনের মধ্যে অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করিতেছিলাম। আমি বলিলাম, "অনর্থক কেন বলছেন, আমি যখন কথা দিয়েছি, এবাড়ী আমি নেব। আমার কাছে দশ টাকা আছে, আমি বায়না হিসেবে এখনই আপনাকে তা' দিয়ে যাচ্ছি।" এই বলিয়া মনিব্যাগ খুলিয়া আমি দশ-টাকার নোটখানি বাহির করিলাম।

ভদ্রলোকটি আমার মুখের দিকে বিস্ময়পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি পারবেন ওর সঙ্গে থাকতে?"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "ওঁর সঙ্গে আমায় থাকতে হবে, একথা আপনি ধরে' নিচ্ছেনই বা কেন? আর তিনিই বা আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হবেন কেন?"

ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর কহিলেন, "সেই কথা ত আমিও বুঝতে পারিনি মশায়। প্রায় এক বছর পরে এই প্রথম এ বাড়ীতে ঢুকলাম, দেখলেন ত ঠিক সন্ধান নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে। সে আসবে জানলে আপনাদের বাড়ী দেখাতেই আনতাম না। ও যখন এসেছে, তখন ও কি আর বাড়ী ছেড়ে যাবে।"

আমার কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই মহিলাটীর গোপন রহস্য ভেদ করিবার জন্যও আমারও কেমন যেন জিদ্ চাপিয়া গেল। আমি কহিলাম, "আপাততঃ ত উনি বাড়ী ছেড়ে চলে' গেছেন,—পরে আসেন, তখন দেখা যাবে। যাক্ সে কথা,—ভাড়া দিতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?"

ভদ্রলোকটী কহিলেন, "আমার আপত্তি থাকবে কেন মশায়—"

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া কহিলাম, "আপনি এই দশ টাকা নিন। বাকী টাকা আমি বিকেলেই দিয়ে যাব। যাতে দিন তিনেকের মধ্যে বাড়ী মেরামত হ'য়ে যায়, দয়া করে' তার ব্যবস্থা আপনি করে দেবেন।"

ভদ্রলোকটী কহিলেন, "যাক্, আমার তা' হ'লে আর কোন দোষ নেই,—আপনি জেনে-শুনেই ভাড়া নিচ্ছেন।"

আমি কহিলাম, "হ্যা, তা' ত নিচ্ছিই।" একটু থামিয়া হাসিয়া কহিলাম, "তাঁর ব্যবস্থার ভার আমার ওপর। তিনি থাকতে চান থাকবেন, তা'তেও আমাদের কোন আপত্তি নাই।"

ভদ্রলোকটি অসহায়ভাবে কহিলেন, "আপনারা বুঝবেন, আমি আর কি বলব। হ্যাঁ দেখুন, একটা কথা আপনাদের বলি, ওর সঙ্গে যে কোন রকম একটা ব্যবস্থা করে বাড়ীতে থাকতে পারেন—এক বছরের ভাড়া আপনাদের দিতে হবে না। এক মাসের ভাড়া দিয়ে আপনারা এক বছর এমনই থাকতে পারবেন—আমি রীতিমত লেখাপড়া করে' দেব।"

তাহার এই কথা শুনিয়া হঠাৎ আমার মনের মধ্যে কেমন খট্‌কা লাগিল। তাহা হইলে কি এই পঁচিশ টাকাই আমাদের লোকসান যাইবে? সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল তা' যায় যাক্, এ রহস্য ভেদ করিতেই হইবে। তাহা ছাড়া, আমরাও ত দলে ভারি থাকিব, এবং গুরুদেবও আমাদের সঙ্গে থাকিবেন। একজন ভদ্রঘরের বধূ আমাদের কি অনিষ্ট করিতে পারিবে? সে হয় ত, হয় ত কেন নিশ্চয়ই, তাহার পিছনে লোক আছে। তা' থাকুক, আমরাও সহজে ছাড়িব না। গুরুদেবের কাছে তাহাদের মাথা নত করিতেই হইবে।

প্রকাশ্যে কহিলাম, "আমাদের গুরুদেবের জন্যে এই বাড়ী ভাড়া নিচ্ছি, তিনি এখানে আশ্রম করবেন। পাঁচজনের দানে এই আশ্রমের খরচ চলে,—আপনার বাড়ী ভাড়ার টাকাটা আমরা আশ্রমের দান বলেই গ্রহণ করব।"

ভদ্রলোকের মুখ বেশ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "এইবার আপনাদের গুরুদেবের কৃপায় তা' হ'লে আমার বাড়ীটী উদ্ধার হবে। সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে সে ঘেঁসতে পারবে না,—যত বড় শয়তানই সে হোক্ না কেন। এক বছর কেন, আমি যে ক'টা দিন বাঁচব, সে ক'টা দিন এই বাড়ীতেই আপনাদের আশ্রম থাকবে, ভাড়া আপনাদের দিতে হবে না। দেখুন, একমাসের ভাড়া আপনার কাছে চেয়েছিলুম, তাও আপনাকে দিতে হবে না, দশটাকার নোটখানাও আপনি রেখে দিন। আমি তিন দিনের মধ্যেই বাড়ী ভাল করে' মেরামত করে' দেব।"

আমি কহিলাম, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ,—গুরুদেব এলেই তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। দেখবেন, কত বড় দরের সাধু তিনি। তাঁর সংস্পর্শে একবার যে এসেছে, তার পুনর্জন্ম হ'য়ে গেছে।"

ভদ্রলোকটী যোড় হাত করিয়া কহিলেন, "আপনাদের

দয়ায় যদি সাধুদর্শন হ'য়ে যায়, সেটা আমি পরম ভাগ্য বলে' মেনে নেব। আপনারা কিছু ভাবেবন না, তিনদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

*   *   *

চতুর্থ দিন বেলা আটটার সময় আমরা মালপত্র লইয়া সেই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গত রাত্রে আমাদের এখানে পৌছাইবার সময় জানাইবার জন্য গৃহস্বামীর নিকট একটী লোক পাঠাইয়াছিলাম। দেখিলাম, গৃহস্বামী আমাদের অপেক্ষায় পথের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনিও আমাদের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমরা সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া জিনিষপত্রগুলি উপরে লইয়া গেলাম এবং আপাততঃ একটী ঘরে রাখিয়া দিলাম। বাজার আমরা পথ হইতে করিয়া আনিয়াছিলাম। আমাদের আশ্রমের নিয়ম ছিল, প্রত্যেক কাজ নিজের হাতে করা, ভৃত্য পাচক রাখিবার নিয়ম ছিল না। আমরাই পালা করিয়া সব কাজ করিতাম। সেদিন আমরা মাত্র চারিজন আসিয়াছিলাম, তিনজনের কাল আসিবার কথা। গুরুদেবের সঙ্গে আরও দশ জন আসিবেন। তাঁহাদের আসিতে চার-পাচ দিন দেরী ছিল।

আমরা সকলে বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। গৃহস্বামীও আমাদের সঙ্গে আসিলেন। তিনি এতক্ষণ নিঃশব্দে আমাদের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত কথা বলিবার অবসর পাই নাই।

এইবার তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারপর, সেই মহিলাটী এ বাড়ীতে আর পদার্পণ—"

আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তিনি গম্ভীরমুখে বলিয়া উঠিলেন, "তিনদিনই সে এসেছিল।"

আমি তেমনই ভাবে হাসিয়া কহিলাম, "বটে!"

ভদ্রলোকটি হতাশভাবে কহিলেন, "আমি নিরুপায়; আপনারা যদি কিছু করতে পারেন দেখুন।"

আমি কহিলাম, "দেখা যাক্। আচ্ছা, তিনি কিছু বলেন না, আসেন আর চলে যান?"

ভদ্রলোকটি কহিলেন, "না মশায়, কোন কথাই বলে না,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু হাসে,—সেদিন যে রকম দেখলেন না, ঠিক সেই রকম।"

আমি কহিলাম, "বেশ মজার লোক ত তিনি,—আচ্ছা, আপনি তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

ভদ্রলোকটি হঠাৎ যেন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "হ্যাঁ, না, তা, না,—কি জিজ্ঞেস করব!"

তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমি সত্যই বিস্ময় বোধ করিলাম। এইরূপ অসংলগ্ন উত্তর দিবার কারণ কি? মহিলাটী নিঃশব্দে আসেন, নিঃশব্দে চলিয়া যান,—তিনিও কিছু বলেন না, ভদ্রলোকটীও কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না? যাক্, যখন এখানে বাস করিতে আসিয়াছি, তখন হয় ত একদিন তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে—তখন। আমার মনের কথা মনেই রহিয়া গেল। গৃহস্বামীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া সম্মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলাম,—সেদিনকার সেই মহিলাটী বারান্দার কোণে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। আমার বন্ধু তিনজনের দেখিলাম, একই অবস্থা! গৃহস্বামীর ত কথাই নাই। তাঁহার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর যখন বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়া গেল, আমি রমনীর দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিলাম, "কি চাই আপনার?"

তিনি তেমনই নিঃশব্দে হাসিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

আমি আবার তাঁহাকে সেই প্রশ্ন করিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। এবং বারবার একই প্রশ্ন করিয়া যখন কোন উত্তরই পাইলাম না, তখন আমার মনে হইল মহিলাটী নিশ্চয়ই হাবা-কালা। প্রশ্ন করিয়াও কোন লাভ নাই। লেখাপড়া শিখিয়াছেন কি? খুব সম্ভব শেখেন নাই। শিখিলে তাঁহার বক্তব্য নিশ্চয়ই লিখিয়া আনিতেন।

তাহা হইলে উপায়? আমি গৃহস্বামীকে সে কথা বলিলাম। তিনি হাঁ না কিছুই বলিলেন না। মহিলাটী তখন তেমনই মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। তাই ত কি করা যায়? আচ্ছা, কাগজ পেন্‌সিল ত সঙ্গেই আছে, লিখিয়া প্রশ্ন করি। তাহাই করিলাম, "কি চাই?" বড় বড় অক্ষরে এই দুইটী কথা লিখিয়া কাগজখানা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ধরিলাম। তিনি কাগজখানার দিকে চাহিলেন বটে, কিন্তু সে চাহনি যেন অর্থহীন। বুঝিলাম, আমার অনুমান মিথ্যা নহে, ইনি লেখাপড়া জানেন না। তখন অন্য পথ ধরিলাম, মুখ নাড়িয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফল একই হইল। তাঁহার দিক্ হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু তাঁহার মুখের উপর সেই মৃদু হাসি তেমনই ভাবে খেলা করিতেছিল। অতঃপর?

মহিলাটী বারান্দার এককোণে দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ একেবারে যেন আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলেন। আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এমন সময় নারীকণ্ঠে স্পষ্ট ধ্বনিত হইল, "এ বাড়ী ছেড়ে এখনই চলে যাও।" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রমনী বারান্দা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গৃহস্বামী অমনই বলিয়া উঠিলেন, "দেখলেন ত মশায়, শয়তানী কি রকম শাসিয়ে গেল। দেবে না আপনাদের এ বাড়ীতে থাকৃতে।"

গম্ভীর হইয়া আমি কহিলাম, "হুঁ, শয়তানী যে তা' এইবার বেশ বুঝতে পেরেছি,—কি চমৎকার হাবাকালা সেজেছিল! তাই ত আমরা পাঁচ পাঁচ জন এখানে রয়েছি, আর একজন স্ত্রীলোক আমাদের ভয় দেখিয়ে গেল। ওর পেছনে লোকবল আছে। আচ্ছা, দেখা যাবে।"

গৃহস্বামী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা' হয় করবেন। বাড়ী ত এখন আপনাদের। কিন্তু গুরুদেব না এলে, গুরুদেব না এলে—যাক্, দেখুন আপনারা চেষ্টা করে, আপনারা ত তাঁর মন্ত্রশিষ্য, হয় ত কিছু জানতে পারেন, আমি আজ বিদায় হলাম।" বলিয়াই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

এইবার আমরা চারিজনে এই ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। ভিতরে একটা কিছু রহস্য আছে, তাহা আমরা স্থির করিয়া ফেলিলাম; কিন্তু এতটুকু আঁচ করিতে পারিলাম না।

নির্ম্মল বলিল, "আশপাশের লোকের কাছে খোঁজ নেওয়া যাক্—তারা নিশ্চয়ই কিছু খবর দিতে পারবে। এ নতুন ব্যাপার নয়, বাড়ীওয়ালার কথা থেকেই তা' বোঝা যায়।"

আমি বলিলাম, "কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে' দরকার নেই। লোকে মনে করবে আমরা ভয় পেয়েছি। হয় ত আশপাশের কোন কোন লোক ও মেয়েটার দলে আছে; তারা আরও মজা পেয়ে যাবে। দেখা যাক্ না, কি করে।"

হেমন্ত হাসিয়া কহিল, "করবে পলায়ন।"

যতীশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "এটা আমাদের ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম, একজন নারী যে এভাবে যাতায়াত করবে, এ ত হতে পারে না। আশ্রমের সুনাম নষ্ট হবে—অবিলম্বে এর বিহিত করা প্রয়োজন।"

আমি বলিলাম, "যতীশ দা', তুমি ঠিক কথা বলেছ। ওই স্ত্রীলোক যাতে বাড়ীর মধ্যে আর ঢুকতে না পারে, তারই ব্যবস্থা আমাদের আগে করতে হবে। চল, আমরা গিয়ে ফটকটা ভেতর থেকে তালাবদ্ধ করে' আসি।"

যতীশ কহিল, "হ্যাঁ, তাই চল; গুরুদেব আসা পর্য্যন্ত আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকৃতে হবে।"

আমরা চারিজন তখনই নীচে নামিয়া গেলাম। যাইবার সময় একটা বড় মজবুত কুলুপ সঙ্গে লইলাম। ফটকটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বেশ দৃঢ়। আমরা মোটা শিকলের সঙ্গে কুলুপ লাগাইয়া ফটক বন্ধ করিলাম। তারপর চারিপাশের পাঁচীল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বেশ উঁচু; স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পাঁচীল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব নহে।

হেমন্ত কহিল, "সাবধানের মার নেই। কিন্তু এ সবের কোন দরকার ছিল না। সে ভয় দেখিয়ে গেল বটে কিন্তু সেও বুঝে গেছে, এখানে বড় সুবিধে হবে না। এখন চল, নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ীর কাজ করা যাক্।"

নিৰ্ম্মল এবং আমার উপর আহারের ব্যবস্থার ভার পড়িল। হেমন্ত আর যতীশ ঘর গোছাইবার কাজে ব্যাপৃত হইল। আমরা দুইজনে নীচে রহিলাম, উহারা উপরে চলিয়া গেল।

তরকারী কুটিয়া রাখিয়া উপরে চাল আনিতে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলাম! সেই রমণী এবং হেমন্ত মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। রমণীর মুখে সেই মৃদু হাসি! আর যতীশ দা' অদূরে দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতেছে! এ কি ব্যাপার! একজন স্ত্রীলোক অতখানি উঁচু পাঁচীল টপকাইয়া বাড়ীর ভিতর আসিয়াছে! আমি ত সিঁড়ির সম্মুখে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলাম, সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল, অথচ আমি দেখিতে পাইলাম না!

হঠাৎ যতীশের চীৎকারে আমার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

যতীশ বলিয়া উঠিল, "স্ত্রীলোকের সাহায্য আমরা চাই না,—কে তোমায় এখানে আসতে বলেছে, চলে' যাও।"

রমণী তাহার কথায় কানও দিল না, তেমনইভাবে হাসিতে লাগিল। হেমন্ত কহিল, "উনি ঘর গুছিয়ে দিতে চাচ্ছেন দিন্ না,—তাতে কেন তুমি আপত্তি করছ'?"

যতীশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "এটা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, ওসব এখানে চলবে না—বেরিয়ে যাও এখান থেকে!"

এইবার রমণীর কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, "কেন যাব।"

আমারও মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল; তীব্রকণ্ঠে কহিলাম, "কে তোমায় এখানে আস্‌তে বলেছে। জোর করে, এখানে থাকবে না কি! এটা বদমায়েসের আড্ডা নয়, এখনই তোমায় যেতে হবে।"

রমণী-কণ্ঠে উত্তর আসিল, "যেতে হবে আপনাদের, আমায় নয়,—জিনিষ-পত্তর নিয়ে এখনই সরে পড়ুন!

'যতীশ দা' ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ও সব চালাকী রেখে দাও। ভাল চাও ত এখনই বেরিয়ে যাও। নেহাৎ স্ত্রীলোক, না হ'লে ঘাড় ধরে' বার করে' দিতুম।"

রমণী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। কি অদ্ভুত হাসি! আমার সারা দেহের মধ্যে রি রি করিয়া উঠিল। নারী-কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হইল, "তা' যখন সম্ভব নয়, তখন কি করে' তাড়াবেন?"

যতীশ দা' অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল; কহিল "ঘাড় ধরে বার করবারই ব্যবস্থা করতে হবে।"

রমণী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসি যেন আর থামিতে চাহে না। রাগে আমার সর্ব্বশরীর জলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু কি যে করিব, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না।

হাসি থামিলে রমণীকণ্ঠে উত্তর আসিল, "একবার চেষ্টা করে' দেখুন না, আপশোষ আর থাকে কেন?"

"দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি" এই বলিয়াই যতীশ দা' ক্ষিপ্তের মত তাহার দিকে ছুটিয়া গেল।

হেমন্ত সঙ্গে সঙ্গে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এ অন্যায় আমি তোমায় করতে দেব না।"

যতীশদা' তাহাকে সবলে ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিয়া কহিল, "খবরদার!"

হেমন্তও ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "খবরদার" দুইজনের হাতাহাতি বাঁধিয়া গেল। আমি এতক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়াছিলাম, এইবার অগ্রসর হইয়া গিয়া দুইজনের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। দুই দিক হইতে কিল ও চড় আমার দেহের উপর পড়িতে লাগিল। আমি যথাশক্তিতে আত্মরক্ষা করিয়া উভয়কে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমে উভয়ে শান্ত হইয়া আসিল। হাতাহাতি থামিল বটে, কিন্তু তীব্র বচসা আরম্ভ হইল!

যতীশদা' কহিল, "ওকে মেরেও তাড়াব।"

হেমন্ত কহিল, "ওকে তাড়াতে দেব না।"

যতীশদা' কহিল, "দেখি কার সাধ্য আমাকে ঠেকিয়ে রাখ।"

হেমন্ত উত্তর দিল, "দেখি তোমার কি সাধ্য তাকে এখান থেকে তাড়াও।"

রমনীটী সেই ফাঁকে কখন যে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহা আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই।

তাহা উপলব্ধি করিয়া যতীশদা' বিজয়-উল্লাসে বলিয়া উঠিল, "যাবে না,—ও যাবে না।"

হেমন্ত যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অবসন্নভাবে মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "গেল, চলে গেল! সত্যিই চলে গেল!"

হেমন্তর একি গর্হিত নিলর্জ্জ আচরণ। তাহার মনটা এত কলুষিত। রুক্ষকণ্ঠে আমি কহিলাম, "হেমন্ত, তোমার মত অসংযমীর স্থান এখানে হবে না। আহারের পর তুমি এ বাড়ী ত্যাগ করে যাবে। গুরুদেব যদি তোমায় ক্ষমা করেন, তখন তুমি আবার এ বাড়ীতে প্রবেশ করবার অধিকার পাবে।"

হেমন্ত কোন কথা বলিল না, মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। যতীশদা' অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। আমি আর কোন কথা না বলিয়া চাল লইয়া নীচে চলিয়া গেলাম। নির্ম্মলের কথা এতক্ষণ আমার মনে পড়ে নাই। উপরে এত চেঁচামেচি হইল, অথচ সে একাকী নীচে বসিয়া রহিল। একবার উপরে আসিল না। উনুন ধরাইতে এতক্ষণ লাগে। তাহা ছাড়া গোলমাল শুনিয়া তাহার ত একবার উপরে আসা উচিত ছিল। সবই যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল।

রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নির্ম্মল প্রাণপণ শক্তিতে উনুনের মুখে পাকা চালাইতেছে। আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি হে, এখনও পাকা চালাচ্ছ, একটা উনুন ধরাতে এতক্ষণ লাগে।"

নির্ম্মল আমার মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলাম, তাহার সমস্ত মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "কি বলব হরেনদা' উনুন কিছুতেই ধরছে না,—যতবার উনুন ধরে উঠ্‌ছে, ততবার কে যেন নিবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমি ত আর পারছি না।"

বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে কহিলাম, "নিবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কি রকম? এখানে ত কেউ নেই, নিবুচ্ছে কে?"

নির্ম্মল কহিল, "তা কি করে বলব,—দেখতে ত কাউকে পাই নি।"

এইবারে আমি হাসিয়া কহিলাম, "উনুন ধরাতে দেখছি ভুলে গেছ নির্ম্মল। ও ত দু'মিনিটের কাজ আমি এখনই ধরিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁহে নির্ম্মল ওপরে এত গোলমাল হ'ল তুমি একবার গেলে না?"

নির্ম্মল বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "গোলমাল! কিসের গোলমাল? আমি ত কিছু শুনতে পাইনি।"

হয় ত আওয়াজ নীচে পৌঁছায় নাই। যাক। প্রকাশ্যে কহিলাম, "আগে উনুনটা ধরিয়ে ফেলি, তারপর ওপরের কথা শুন'বন।"

কয়লা ফেলিয়া দিয়া আবার নতুন করিয়া উনুন ধরাইতে বসিলাম। ঘুঁটে সাজাইয়া তাহার ওপর অনেকখানি কেরোসিন ঢালিয়া দিয়া দিয়াশলাই জ্বালাইয়া দিতেই দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। একটু পরে একখানি আস্ত ঘুঁটে আগুনের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর কয়লা ঢালিয়া দিলাম।

নির্ম্মল এক দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াছিল, ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওই দেখ হরেনদা'; ওই আগুন নিবিয়ে দিলে। টুএক আগুনও আর দেখা যাচ্ছে না।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম, কথাটা ত ঠিক। ঘুঁটের আগুন ত একেবারেই নিবিয়া গিয়াছে। হঠাৎ এরূপভাবে নিবিল কি করিয়া? আমি এদিক্ ওদিক চাহিতেই দেখিলাম, সেই রমনীটি রান্নাঘরের এক কোনে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কি জানি কেন আমার সারা দেহ কাঁটা দিয়া উঠিল।

রমনী কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "উনুন ধরাবে পারবে না, ধরালেই নিবিয়ে দেব। এ বাড়ীতে থাকতে পাবে না, বুঝলে। জিনিষপত্তর সবই রাস্তায় বের করে দিয়েছি, দেখ গে আর এ বাড়ী ঢোকবার চেষ্টা কর না।"

আমি যেন কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছিলাম, আমার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। রমনীটির মুখের দিকেও আর চাহিতে পারিলাম না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, সে যেন হাসিতেছে। হাসির মৃদু শব্দ আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আমার সারাদেহ কণ্ঠকিত করিয়া তুলিতেছিল।

এমন সময় যতীশদা' ও হেমন্ত ছুটিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। যতীশাদা' ভয়ত্রস্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হরেন, হরেন, শীঘ্র এস, আমাদের জিনিষ-পত্র সব রাস্তায় বের করে দিয়েছে, অনেক চেষ্টা করেছিলুম, রাখতে পারলুন না, টেনে রাস্তায় ফেলে দিলে—সেই, সেই মেয়েটা। অ্যাঁ ঐ যে, ঐ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। পালিয়ে এস, পালিয়ে এস, শীগ্‌গীর পালিয়ে এস।"

* * *

বরাহনগর থানার যিনি ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, তিনি যতীশদা'র একজন সহপাঠীবন্ধু। তিনি আমাদের গুরুদেব একজন মন্ত্রশিষ্য। আমরা জিনিষপত্তর লইয়া তাঁহার ওখানে গিয়া উঠিলাম। আমারের তখনও বিশ্বাস ছিল, ইহা কতকগুলা বদমায়েস লোকের কাজ।

কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। শুনিলাম, একদিন ঐ বাড়ীর মালিক ওই রমনীই ছিলেন। নগদ টাকাও তাঁহার অনেক ছিল। সেই অর্থ ও বাড়ীখানি হস্তগত করিবার জন্য তাঁহার এক দেবর তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। তাহার পর হইতে ঐ বাড়ীতে এই ব্যাপার চলিতেছে। বাড়ীটি ইতিমধ্যে চার পাঁচ হাত ফেরতা হইয়াছে। তবু কেহ একটা দিনের জন্যও ও বাড়ীতে বাস করিতে পারে না।

অ-লিখিত ইতিহাস

বগলা ভট্টাচার্য্য

ট্রেনে দেখা।

হু'টি পুরুষের তত্ত্বাবধানে সে আমাদের কামরাতেই এসে উঠলো। পুরুষ দু'টির কোন্‌টি স্বামী আর কোন্‌টি ভাই বোঝা অত্যন্ত কঠিন। সত্যি কথা বলতে কি, আজকাল অন্ন-সমস্যার মতই এ আর এক সমস্যা। যাক্‌—আপাততঃ সেটা না বুঝলেও গাড়ীটা যথাসময়ে দেওঘরে পৌছিবে এই সান্ত্বনা।

দেখতে যে সে খুব সুন্দরী তা' নয়,—এমন কি অক্টো। ফটোর দোকানে গিয়েও তোলাবার মত নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য তার চোখ! এক্‌জোড়া বড় বড় চোখে ওকে মানিয়েছে খুব! অজগরের দৃষ্টির মত তা' যেন মুহূর্ত্তে স্নায়ুগ্রন্থি সব শিথিল করে' আনে। দেহময় একটুখানি প্রচ্ছন্ন পারিপাট্যের আভাসও যে নেই—এমন কথা প্রতিজ্ঞা করে' বলা চলবে না।

মোটের উপর সে দেখতে ভালই। গাড়ীর গাদা-গাদির ভেতর ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে—মাঝে মাঝে ওর দিকে চাইলে—সময় কাটবে। গাড়ী ছাড়তেই সঙ্গী দু'টির একটি পিছু হটলেন—বোঝা গেল তিনি শুধু পৌছে দিতে এসেছিলেন। যিনি রয়ে গেলেন, তাঁর সম্বন্ধে একেবারে কিছু না বলাটা ভাল হবে না—কাজেই বলি। ভদ্রলোক অসাধারণ কুৎসিত,—অত্যন্ত বিস্ময়কর কুৎসিত। সুবিশাল দেহখানির কোথায় এতটুকু ছন্দ নাই—অনাবশ্যক রকমে এখানটা মোটা ওখানটা সরু। বেশ ভাল করে' জাঁকিয়ে বসে' প্রকাণ্ড একটি পানের ডিবে বার করে'—(পানের ডিবের চেয়ে সেটাকে পানের সুটকেশ বল্‌লেই ঠিক বলা হবে) গোটাদশেক খিলি,—দোক্তা সহযোগে—মুখে পুরলেন—এবং ঠিক তার এক মিনিট অন্তর উঠে দাঁড়িয়ে—দেখি দাদা—দেখি দাদা—বলতে বলতে কারুর ঘাড় ধরে—কারুর মাথায় হাত দিয়ে—কারুর পা মাড়িয়ে—জান্‌লা দিয়ে পিক্‌ ফেলতে সুরু করলেন। খুব ভাল স্বাস্থ্য আর অবিচলিত চিত্ত না হ'লে এ রকম সহযাত্রীকে স্বীকার করে' নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ—ভয়াবহ ব্যাপার!

কিন্তু আশ্চর্য্য ওই নারী! ও কি একবারটি কথা কইবে না—একটু কি হাসবে না! ডাগর দু'টি চোখের নিষ্পাপ নিরাসক্ত দৃষ্টি মেলে—বাইরের চলমান ঘনান্ধকারে কিসের অন্বেষণে সে মগ্ন? গোটা কামরাটার প্রত্যেকটী মানুষের মুগ্ধ চাহনি উপেক্ষা করে'—এই আনমনা মেয়েটী যেন এখানেই নেই।—বন্ধু সুধাংশু জমি নিলো—তা'কে জিজ্ঞাসা করে' জানা গেলো—তার শরীর নাকি বিশেষ ভাল নেই—বুকের কাছটায় কি রকম ব্যথা করছে—চিন্তার কথা। আমাদের বয়সী যুবকদের মধ্যে এ রোগটা বেশ ব্যাপক হ'য়ে পড়লো দেখ্‌ছি। বল্লাম—সুধাংশু! তারপিন তো নেই ভাই—সুটকেশে খানিকটা 'স্নো' আছে—

—স্নো কি হবে?

—তাই নয় এখনকার মত মালিশ করে' দিই! তবুও তো ওতে খানিকটা কমনীয়তার সংস্রব আছে।—সুধাংশু মার্‌ মার্‌ করে' উঠলো।

সুধীর আর ভোলা আমাকে ডেকে চুপি চুপি বল্লে—ওকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। কারণ ওর বুক ব্যথা কর্‌বার উপকরণ কখন যে কোথায় দেখা যাবে তার যখন কোন স্থিরতা নেই আর আজকাল নাকি ওর ঘন ঘন এ রকম হচ্ছে—অতএব তুই চুপ করে' থাক্‌। বুঝতেই তো পারছিস্‌—হঠাৎ বুক ব্যথা করার কারণটা কি? একটু পরেই সেরে যাবে।

মেয়েটির দিকে চোখ পড়তেই দেখি সে আমার দিকেই অপলক চোখে চেয়ে আছে। ভয়ানক বিস্মিত হ'য়ে আবার চাইলাম—না, এখনও সে চোখ নামায় নি। গভীর কালো দু'টি চোখ আমার মুখের ওপর আট্‌কে রয়েছে। কী কোরব—কিছু স্থির করতে পারলাম না—

এ অমনি আকস্মিক—যে একে দেখাও যায় না—সহাও যায় না। সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা কাঁপন অনুভব করতে লাগলাম।

সুধাংশু চেঁচিয়ে উঠলো,—শোনা গেল তার বুকের ব্যথাটা আরও বেড়ে গেছে।·· ব্যাপারটা নিয়ে সুধাংশুকে অতখানি ঠাট্টা না করলেও চল্‌তো।

ভোররাত্রির শীতল স্বচ্ছ অন্ধকারে—'জসিডি'র প্ল্যাট-ফর্ম্মে নেমে দাঁড়ালাম। সেই বিপুলকায় ভদ্রলোক ও তাঁর ক্ষীণাঙ্গী সহযাত্রিনীও এখানেই নামলেন। বুঝলাম তাঁরাও দেওঘর যাবেন।

সেই ভদ্রলোক ও আমার বন্ধুবর্গ যখন লগেজ নির্ণয়ে ব্যস্ত—সেই সময় মেয়েটী ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এল। বল্ল—আচ্ছা, আপনি কি সাহিত্যিক?

বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লাম—কেন বলুন তো?

—না এম্নি বলছি। 'কল্লোলিনী'তে কি আপনি কোন দিন লিখেছিলেন?

—প্রায়ই লিখি। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে'?

—আমি তার একজন গ্রাহিকা। ওঁরা যখন আপনার নাম ধরে' ডাকছিলেন, কেন জানি না আমার মনে হ'ল আপনিই সেই লোক।

—আপনিও লেখেন বুঝি?

—না আমি লিখি নে, আমি পড়ি। কোথায় উঠবেন?

বলতে পারছি নে তো। তবে বন্ধুর বাড়ী আছে।

—ও! আচ্ছা নমস্কার!

—নমস্কার!—সে চলে' গেল। সমস্ত রাত্রির জাগরণের ক্লান্তির যে কালিমা আমার দুই চোখ জড়িয়ে ধরেছিল—তা' যেন এক মুহূর্ত্তে পরম চরিতার্থতায় দীপ্যমান হ'য়ে উঠলো। আমার মনে হ'ল—ওই মেয়েটির আর আমার মধ্যে এতক্ষণ ধরে' যে অ-পরিচয়ের অন্ধকার কালো হ'য়ে জমেছিল, আর তা' নেই। এখন আমরা পরস্পরের পরিচিত—খুবই পরিচিত—এমন কি আত্মীয় বল্‌লেও হয়।

বন্ধুদের গণ্ডগোল কিছুই কাণে যাচ্ছিল না। অন্য-মনস্ক হ'য়ে ভাবছিলাম—যে আমি লিখি আর ও পড়ে,—মানুষের সঙ্গে মানুষের এমন সহজ এবং স্বচ্ছন্দ পরিচয়ের পথ এতকাল আমার বুদ্ধির বাইরে ছিল কেমন করে'?

সুধাংশুর ব্যথাটা কমেছে।

—

পুরান্দায় রোহিনী রোডের প্রান্তে—একটা নির্জ্জন অংশে আমাদের বাসা। পিছনে সুদূর প্রান্তর আর তার পারে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়। সাতটী বন্ধু যেন আমরা সাতটী মহাদেশ থেকে এসেছি। কারুর সঙ্গে কারুর সাদৃশ্য নেই আর যাতে না থাকে তার জন্যে চেষ্টা আছে।

বাঙলার বাইরে আমাদের বিশ্রামের দিনগুলিকে গায়ক বন্ধুটী তাঁর সুমধুর সঙ্গীত অবিশ্রান্ত পরিবেশন করে' বেশ মুখরোচক করে' তুলেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিরাম একটা আনন্দ গুঞ্জন। আবার গোপাল—আমরা যার অতিথি—প্রচুর অর্থব্যয়ে সুপ্রচুর জাতীয় বিজাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করে' এরই মধ্যে বেশ একটু অভি-নবত্বের সৃষ্টি করেছে।

বেশ আছি। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি নে সে ওই মেয়েটী। যাকে চোখে দেখলাম—অথচ বুঝলাম না। অন্ধকার রাত্রির শেষে ঊষার উদয়ের মত যার আবির্ভাব মেঘে ঢাকা পড়লো, তা'কে ভাল করে' জান্‌বার জন্য মনের মধ্যটা আমার অস্থির হ'য়ে রইল। হয়ত সে এখানেই কোথাও উঠেছে—হয়ত ওঠে নি। দেখাও আর হয়ত হবে না, কিন্তু সে তার ডাগর দু'খানি চোখ ভরে' পৃথিবীর কোন্ গভীর দুঃখ কিম্বা বেদনার ইতিহাস বহন করছে, তাতো কই আমার জানা হ'ল না।

নারীজাতির সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই। আমি জানি বিধাতানির্দ্দিষ্ট জীবনযাপনের সঙ্কীর্ণ পন্থা অতিক্রম করবার সাহস ওদের নেই। আধুনিক শিক্ষাকে ওরা ওদের প্রাচীন সংস্কারের খাঁচায় ধরে' পোষ মানিয়ে তার গর্ব্ব করে। পুরুষের প্রাপ্তি পরিশোধ করে' যা' ওদের অবশিষ্ট থাকে—তা' নিয়ে গল্প লেখা তো চলেই

না—এমন কি ডায়েরী লেখার মত খুব সস্তা কাজও হয় না।

সবই জানি। কিন্তু ওই মেয়েটী—নিকট-বর্ত্তিনী অথচ সুদূর শৈলশিখরের শুকতারার মত রহস্যময়ী ওই মেয়েটী, মনে হয় যেন ওর সম্বন্ধে এই সব কথা কিছু খাটে না। এই সব বাদানুবাদ ও কথার ইন্দ্রজালের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ও যেন ওর বিশাল দুই চোখ মেলে বসে' আছে তাপসী শৈলসুতা পরম প্রিয়ের প্রতীক্ষায়।

বন্ধুরা সব বাজারে গেছে বেড়াতে আমাকে তাদের নতুন রচা সংসারের খবরদারীর কাজে নিযুক্ত করে'। সামনের খোলা বারান্দায় একখানি ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় একমনে সিগারেট টেনে যাচ্ছি। এমনি সুন্দর অপরাহ্নে নিজেকে বড় অসহায় বড় ক্লান্ত বলে' মনে হয়। মনে হয় যেন জীবনের সমস্ত দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে এসেছি—আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব কেউ কোথাও নাই, এই রকম সিগারেট ফুঁকে ফুঁকে পরমায়ুর চমৎকার দিনগুলি একটি একটি, অনন্ত শূন্যে উড়িয়ে দেবো। তারপর যেখানে খুসি তারা চলে' যাক্—কোন ক্ষোভ নেই।

—নমস্কার! চমকে উঠে সোজা হ'য়ে বস্‌লাম। দেখি আমার সেই স্বপ্নচারিণী আমাকে দেখে রাস্তার উপর থম্‌ক দাঁড়িয়েছে।

—নমস্কার! আমি বল্‌লাম।

—এই বুঝি আপনাদের বাসা?

—হ্যাঁ, আপনিও এইদিকেই থাকেন না কি?

—হ্যাঁ—ওই তো খানচারেক বাড়ীর পরেই।

—অ-ও!

—কি দেখছেন? বন্ধুরা সব কোথায়?

—বাজারে গেছে—বেড়াতে।

—আপনি বুঝি এখন একলা?—তা' আসুন না একটুখানি বেড়িয়ে আসি।

—চলুন। রইলো বন্ধুদের সংসারের তত্ত্বতল্লাস—রইলো সব। তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে জামাটা টেনে নিলাম। তারপর দরজায় চাবি দিয়ে আমার পথিক-বন্ধুর সঙ্গে পথে নেমে পড়্‌লাম।

হু হু করে' মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে হাওয়া বইছে—সব উড়িয়ে নিয়ে যাবার হাওয়া। সঙ্গিনী পথ ছেড়ে মাঠে নামলো। বললাম—যাচ্ছেন কোথায়—ওদিকে যে পথ নেই। সে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্‌লো—বিপথেই তো যাচ্ছি। কেন, ভয় করছে নাকি? বল্লাম—না, ভয় কি! মনে মনে বল্লাম—ভয় কি-ই বটে!

চুপচাপ দু'জনে মাঠ ভাঙছি। বাতাসে আমার সঙ্গিনীর আঁচল উড়ছে। মাঝে মাঝে তার ঝাপ্‌টা এসে আমার মুখে লাগছে—তার এলায়িত চুলের সুগন্ধ পাচ্ছি। সত্যি একটা আনন্দই জাগ্‌ছে মনে- সহযাত্রার আনন্দ—সাহচর্য্যের আনন্দ।

বললাম—পথ যখন একই, আর যাবো যখন এক-সঙ্গেই—তখন কথা কন, তা'তে আনন্দ পাবো—

—কথা আমি কচ্ছি, কিন্তু মনে রাখবেন আনন্দ পাবার জন্যে আপনাকে আমি আনি নি।

—তবে কী জন্যে এনেছেন?

—কিছুর জন্যেই না—এমনি।

সামনেই বাড়োয়া নদী। যেন হৃতযৌবনা তপঃক্লিষ্টা পার্ব্বতী। সুগভীর বালুচরে তার পথচিহ্ন আঁকা। বালুতলশায়ী জলের বার্ত্তা ওপর থেকে কিছুই পাবার জো নেই।

দু'জনে নিঃশব্দে এসে বসলাম। নূতন পরিচয়ের যে জড়িমা তা' ওর মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই। অত্যন্ত সহজে এবং অনায়াসে যে যেন আমাকে স্বীকার করে' নিয়েছে। ওকে আজ এই বিকেলের ক্রমবিলীয়মান গোধূলির আলোতে দেখার সঙ্গে ট্রেণের দেখার অনেক তফাৎ হ'য়ে যাচ্ছে দেখছি। আজ্‌কে ও সুন্দরী নয়—এই কথার প্রতি-বাদ করতে আমি আমার কণ্ঠের শেষ শক্তিটুকু পর্য্যন্ত ব্যবহার করতে পারি।

বল্লাম—আপনার নামটা বলবেন দয়া করে' ?

—কেন বলবো না। আমার নাম দীপ্তি।

—বড্ড বেশী স্পষ্ট আপনার নাম। বল্লাম। ম্লান চোখে চেয়ে সে একটু হাসলো। মেয়েদের নাম স্পষ্ট হওয়াটা আমি পছন্দ করি না। মেয়েদের নাম হবে গোপন, শ্রাবণের আকাশের মত। থাকুক না তার ভেতর বজ্র—থাকুক না কেন বিদ্যুৎ অন্তরের সুগোপনতার অন্তরালে—তা'কে স্বীকার করে' নিয়ে যেন হয় কাব্যরচনা—তবেই না নাম!

হঠাৎ দীপ্তি বলে' উঠলো—আচ্ছা, আপনি যে সব গল্প লেখেন, তা' কি চোখে দেখে নেওয়া না স্বপ্ন থেকে নেওয়া?

হেসে বললাম—সেই স্বপ্ন তো চোখই দেখে—তা'কেও দেখাই বলে। দু' রকমই আছে।

—আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখবেন?

—আপনাকে নিয়ে!

—হ্যাঁ।

—আপনাকে নিয়ে গল্প হ'তে পারে—এ ভুল ধারণা আপনার হ'ল কেমন করে'?

—ভুল নয়—এ আমার সত্যিকার ধারণা। আমাকে নইলে আপনাদের গল্প হবে না,—আপনাদের প্রত্যেক গল্পেই তো আমি আছি—দেখেন নি?

—হঠাৎ আমার মনে হলো—মেয়েটী পাগল নয় তো। বল্লাম—উঠুন—সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। আর দেরী করলে অনেকটা পথ—ফিরতে ভয়ানক কষ্ট হবে। সে কোন উত্তর দিল না—অন্ধকারে আমি ওর মুখটা আবছা দেখতে পাচ্ছি।

ছোট্ট ক'রে বলবো—শুনবেন আমার কথা? দেখুন না যদি লিখতে পারেন! খুব—

—যাবার আশা ছেড়ে ভাল করে' বসে' বল্লাম—বলুন।

আমার বাড়ী নদীয়ার কোন এক ছোট্ট গ্রামে। পৃথিবীতে আমাকে প্রতিনিধি রেখে মা মারা যান। দুঃখে-সুখে, শোকে-আনন্দে পাঁচ বছর বয়স পর্য্যন্ত বাবা আমাকে প্রতিপালন করে'—সংসারের মায়া কাটালেন। বিরাট পৃথিবীতে আমি একা। প্রত্যেক প্রতিবেশীর বাড়ীতে একদিন করে' আমার খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল—শোয়াও তাই। এইভাবে অনেকদিন কেটে গেল। একদিন ভোরে উঠে খবর পেলাম কোলকাতা থেকে আমার মামা আসছেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। তবু তো সংসারে আমার একজন আপনার লোক আছেন—আমার নিরাশ্রয় অবস্থানের কথা যিনি শুনেছেন—তিনি আমাকে নিতে আসছেন—আঃ, ভগবান! তবু তো একটা নিশ্চিত আশ্রয় পাওয়া গেলো। সমস্ত দিন এই আনন্দে আমি বনে বনে খুব বেড়ালাম। মামা এলেন। অত্যন্ত রাশভারী লোক—বাছা বাছা দু'-একজনের সঙ্গে দু'-একটী প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া তিনি আর বাক্যব্যয়ই করলেন না।—সেইদিন রাত্রে আমি মামার সঙ্গে কোলকাতায় চলে' এলাম।

মামাবাড়ীর আবহাওয়া আমার পক্ষে খুব স্বাস্থ্যকর হোল না। মামীমা তৃতীয় পক্ষের। অল্প বয়সের বুদ্ধিহীনতা এবং ক্রোধ দু'টিতে মিলে তাঁকে দুর্ব্বিসহ করে' তুলেছিল আমার জীবনে। সামান্য একটুখানি ত্রুটি কিম্বা সামান্য একটু অপরাধের জন্য অসামান্য লাঞ্ছনা আমাকে ভোগ করতে হ'ত। মামীমার সতর্ক ও সন্দিগ্ধ চক্ষু দিন-রাত্রি আমাকে পাহারা দিয়ে ফিরতো। মামা স্কুলে ভর্ত্তি করে' দিয়েছিলেন। স্কুলে আর বাড়ীতে শিক্ষা আর সহিষ্ণুতা এগোতে লাগলো।

গেল কয়েক বৎসর কেটে।—ভাগ্নীর বয়স ও গঠন লক্ষ্য করে'—মামা বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। আজকালকার বাজারে চাকরী পাওয়া আর পাত্র পাওয়া একই কথা। কিন্তু এই পাত্র-দুর্ভিক্ষের দিনেই মামাতো বোন্ নীলার বিয়ে হ'য়ে গেল—একজন সদ্য বিলেত-ফেরৎ ব্যারিষ্টারের সঙ্গে। যদিও সে আমার চেয়ে বছর দু'য়েকের ছোট। এইবার আমার বিয়ের সুমহান দায়ীত্ব মামীমা নিজের হাতে নিলেন। তাঁর বাপের বাড়ীর দেশে এক দূরসম্পর্কের ভাই আছেন—হবিগঞ্জের জমীদার বংশের রিটায়ার্ড গোমস্তা—বেশ দু'পয়সা আছে। তা'ছাড়া

স্নানের ঘাটে

বাড়ী-ঘর ধানের গোলা জোতজমি কিছুরই অভাব নেই। স্ত্রী মারা যাবার পর তার শোকে মুহ্যমান হ'য়ে মাসখানেক হ'ল অন্নজল পরিত্যাগ করেছেন। চেষ্টা করলে কিম্বা বললে-কইলে হয় ত হোতে পারে। এমন সুযোগ ছাড়া আমার পক্ষে যদি বা সম্ভব ছিল—কিন্তু মামীমা তা' হ'তে দিলেন না—অতএব হোলো বিয়ে। একদিকে পিতৃমাতৃহীনা অসহায় বয়স্থা বালিকা—অন্যদিকে আটচল্লিশ বৎসরের মৃতদার বৃদ্ধ - একেবারে রাজযোটক। আমার স্বামীকে আপনি তো ট্রেণে দেখেছেন,—লোভনীয় কিনা বলুন তো?

এই পর্য্যন্ত বলে' দীপ্তি থামলো। আমাদের চারপাশ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা। ডিগ রিয়া পাহাড় সে অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে। আকাশ ভরে' তারা উঠেছে, আজকে চাঁদ উঠতে বোধ হয় একটু দেরীই হবে। বুঝতে পারলাম সে কাঁদছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে একসময় বল্লাম - তারপর?

—তারপর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে দেখলুম, আমারই বয়সী একটি বিধবা মেয়ে আমার জায়গা জুড়ে বসে' আছে। স্বামীকে সে কুকুরের মত ওঠায়-বসায়। তারই সাহায্যের দরকার হওয়াতে স্বামী আমাকে এনেছেন। আমি এ আগেই জান্তাম,তাই এ বিধান মাথা পেতে নিতে একটুও কষ্ট হয় নি। কারণ, মামীমার খররসনা পৃথিবীর দুর্গম পথে আমাকে বেশ শক্ত করে' ছেড়ে দিয়েছিল। স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী সেই নারী আমাকেও দু'-একদিন ঔদার্য্য দেখিয়ে পতির সঙ্গে রাত্রিবাসের অনুমতি দান করেছিলেন, কিন্তু আমি সে অনুগ্রহ নিই নি। কেনই বা নেবো—জন্মের পর থেকে সকলের কাছেই আমি অল্পবিস্তর ঋণী হ'য়ে রইলাম—পাওনাদারের সংখ্যা আর বাড়িয়ে লাভ কি? এই প্রত্যাখ্যানের পর থেকেই আমার সত্যিকারের লাঞ্ছনা সুরু হ'ল—কথায় কথায় উঠতে-বসতে তিনি আমায় তিরস্কার করতে লাগলেন,—কখনো স্বামীকে জানিয়ে—কখনো বা তাঁর অজান্তে।

একদিন, সারারাত্রি গরমের জন্য আমার ঘুম হয় নি বলে'—সকালে উঠতে একটু দেরী হয়েছিল। তিনি কড়াভাবে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন—আমারও শরীর খুব ভাল ছিল না—তাই উত্তরটাও কড়া হ'য়ে গিয়েছিল। ফলে স্বামীর বৈকালিক ভ্রমণের ছড়িগাছটা দিয়ে তিনি আমাকে এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেন—সমস্ত দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে'। স্বামী বাড়ীতে এসে তা'কে জিজ্ঞাসা করেন—দীপ্তিকে অমন করে' মেরেছ কেন?—তিনি একটা চোরা চাউনি হেনে বল্লেন—বেশ করেছি—আমার খুসি। স্বামী তৎক্ষণাৎ নিভে গেলেন।

আধুনিক শিক্ষা আমার নেই—কিন্তু তবুও আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে একে স্বীকার করতে পারি নি। যে নির্লজ্জ কুৎসিত বৃদ্ধ—রক্ষিতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ধর্ম্মপত্নী সংগ্রহের চেষ্টা করে, বলুন তো আপনি, কী করে' —আমি তা'কে গ্রহণ করি?

স্বামী স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের জন্য দেওঘরে এসেছেন,—তিনি আসতে পারেন নি তাই আমাকে আসতে হয়েছে—স্ত্রীলোক নইলে একটা দিনও তিনি কাটাতে পারেন না কি না। অভ্যেস নেই—বড় কষ্ট হয়।

দীপ্তি এইখানেই থেমে গেল।

আশ্চর্য্য হবার কি-ই বা আছে এতে? তবুও মনটা আমার খারাপ হ'য়ে গেল। ঘটনাটা কিছুই নয়,—গল্পের জটিল অংশটুকু আমাদের অত্যন্ত পরিচিত, কিন্তু এই সুদূর প্রবাসে—এই দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে—অন্ধকারের মধ্যে বসে' আজ এর মানে বদলে গেল। আমার মনে হ'ল—এই যে ব্যথা—এর যেমন কোন শেষ নেই, তেমনি এর কোন প্রতীকারও নেই। সমস্ত জাতির মজ্জার মধ্যে এই ব্যথা দেবার অপরিসীম লোলুপতা ও সইবার প্রতিবাদহীন সহনশীলতা রয়েছে।

পূর্ব্বদিগন্তে একটুখানি চাঁদ দেখা দিয়েছে। তারি অনতিস্পষ্ট আলোয় পথ চলছি। কাঁকরমেশানো বালির ওপর দু'জনের জুতোর খস্‌খস্ করে' শব্দ হচ্ছে। কথা ওর ফুরিয়েছে—আমারও আরম্ভ করবার উৎসাহ নেই। যেতে যেতে দীপ্তি হঠাৎ একসময়ে বলে' উঠলো—লিখবেন?

অন্যমনস্ক হ'য়ে পথ চলছিলাম। বুকের মাঝখানটাতে কিসের যেন একটা মৃদু যন্ত্রণা ক্রমাগত মোচড় দিচ্ছে। ভাল লাগ্‌ছে না—সত্যিই কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। ধীরে ধীরে না শোনার মত করে' উত্তর দিলাম—লিখবো।

নীলাঞ্জন

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নূতন স্থানে, নূতন পদে, নব অনুষ্ঠানের নূতন কাজকর্ম্মে বাবা তেমনি অবিচলিত, মহিমামণ্ডিত মর্য্যাদায় তেমনি প্রদীপ্ত; তাঁর মুখ দেখে মনের ভাব অনুধাবন করবার উপায় নেই। আশ্চর্য্য তাঁর আত্ম-সম্বরণের ক্ষমতা!

মাঠ পার হ'য়ে ইষ্টিশনের পথে এসে পড়লাম। আশে-পাশে কয়েকটি দোকান। অদূরে বাজার। দেশওয়ালী মেয়েরা-দল নানাপ্রকারের জিনিষ মাথায় নিয়ে বাজারে চলেছে।

কয়েক পা অগ্রসর হবার পর সহসা একান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে নিশীথবাবুর সঙ্গে মুখোমুখী সাক্ষাৎ হ'ল। প্রথমে তিনি আমায় দেখতে পান নি, ইষ্টিশনের দিক্ থেকে আপন-মনে শহরের ভিতর চ'লে যাচ্ছিলেন, কাছাকাছি আসতে আমি আর থাকতে পারলাম না; মৃদুকণ্ঠে তাঁকে আহ্বান করলাম।

আমার ডাক শুনে তিনি বিষম চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে সহজ কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন—একি! আপনি! কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! আমি আপনাদের বাড়ীই যাচ্ছিলাম যে।

তাঁকে আহ্বান করবার পর মুহূর্ত্ত থেকে আমি প্রতি ক্ষণে অধিকতর বিব্রত বোধ করতে লাগলাম! তাঁর কাছে কেন আজ নিজেকে পূর্ব্বের ন্যায় সহজ এবং স্বাভাবিক রাখতে পাচ্ছি না?

কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থেকে বল্‌লাম—আমাদের বাড়ী যাচ্ছিলেন বুঝি? বাবার সঙ্গে দেখা করতে বোধ হয়? চলুন, আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

দু'জনে পাশাপাশি চল্‌তে লাগলাম। ইষ্টিশানের পথ পার হ'য়ে আবার নির্জ্জন মাঠের ওপর এসে উপস্থিত হ'লাম। কিয়ৎকাল পরে (এতক্ষণ ধ'রে তিনি বোধ হয় কী বলবেন, তাই ভেবে স্থির করছিলেন) নিশীথবাবু বল্‌লেন—আপনাদের বাড়ী যাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু আপনার বাবার কাছে নয়, আপনার সঙ্গে দেখা করতে। এখানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়ে ভালই হয়েছে—বাড়ীর মধ্যে হয় ত আপনার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেতাম না। আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। যদি বিরক্ত বোধ না করেন, তা' হ'লে ওই যে গাছতলায় মাটীর বেদী রয়েছে, চলুন ওইখানে বসা যাক্! আসুন!

গাছপালায়-ঘেরা নির্জ্জন নিরালা বেদীর উপর ব'সে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে মনে ত্রস্ত শঙ্কিত বোধ করতে লাগলাম। এখানে আমার না আসাই উচিত ছিল। কেন এলাম? কেন তাঁর আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না?

আমার মৌনভাব দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন—আপনি কি আমার ওপর বিরক্তি বোধ করছেন? আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আপনাকে আট্‌কে রাখতে চাই নি। বলেন ত···

বল্‌লাম—আপনার কি বলবার আছে বলুন। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করি—চন্দ্রা কোথায়?

আমার প্রশ্নের উত্তরে নিশীথবাবু এক বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকালেন—অনুকম্পা এবং কৌতুক মেশান সে দৃষ্টির অর্থ বুঝলাম না। চন্দ্রা কি তাঁকে সব কথা ব'লে দিয়েছে? হয় ত! কিম্বা? না, তাই বা কেমন ক'রে উনি জানবেন?

নিশীথবাবু গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—আমার বোধ

হয় চন্দ্রা কোলকাতায় চ'লে গেছেন। আমার কাছে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয় কি?

চকিত হ'য়ে বল্‌লাম—কেন?

তাঁর ঠোটের ফাঁকে মৃদু হাসি দেখা দিল:

—চন্দ্রার সঙ্গে এক জোট হ'য়ে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন ব'লে।

সতর্কভাবে বল্‌লাম—আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। আমি নিজে আপনার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তের সৃষ্টি করি নি।

—না, তা' করেন নি বটে, কিন্তু অপরের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। আমি সব কথাই জেনেছি, সুতরাং এখন আপনার অকপটে স্বীকার করাই ভাল। চন্দ্রা ফণি মজুমদারের বিরুদ্ধে আর কোন তদন্ত করবে না এবং তার পরিবর্ত্তে আপনি আমায় প্রত্যাখ্যান করবেন—এই ছিল আপনাদের বন্দোবস্ত। দেখ্‌ছেন—আমি সমস্তই জানতে পেরেছি।

বল্‌লাম—যখন জেনেছেন, তখন আমার স্বীকারোক্তি চাওয়া বাহুল্য মাত্র।

ঘাড় নেড়ে তিনি বল্‌লেন—তা' বটে। কিন্তু তা' হলেও আপনার মুখ থেকে ঘটনাটি বিশদ্‌ভাবে জানতে আমার কৌতুহল হ'চ্ছে।

বল্‌লাম—আমি আপনাকে কোন কথাই বলতে পারবো না। ক্ষমা করবেন।

—তা' জানি। তা' হ'লে শুনুন, আমিই বলছি।

—সে কথা আমি জানতে চাই না। আমি শুধু শুনতে চাই, চন্দ্রা আপনাকে কি বলেছে?

নিশীথবাবু প্রশান্ত কণ্ঠে বল্লেন—চন্দ্রা আমাকে সমস্ত কথাই বলেছে। তার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে। আমরা দু'জনে...

—আপনাদের বিবাহের কথা কি পাকা হ'য়ে গেছে?

উত্তরে নিশীথবাবু মৃদু হেসে বল্লেন—শেষ পর্য্যন্ত আগে শুনুন, তারপর প্রশ্ন করবেন। চন্দ্রার কাছ থেকে থেকে ন্যাকামি-ভরা ভালোবাসার কথা শুনে শুনে উত্যক্ত হ'য়ে আমি একদিন তাকে কঠিন তিরস্কার করেছিলাম। ভৎর্সনা শুনেই সে যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। তখন তার মুখের অসংলগ্ন কথা থেকে বুঝলাম, কেন আপনি ক'দিন ধ'রে আমার সঙ্গে অমনতর নিষ্ঠুরের মতো আচরণ করেছিলেন এবং কেনই বা আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার কথা শুনে আমি সমস্তই বুঝতে পারলাম এবং তৎক্ষণাৎ রূপনারায়ণপুরে চ'লে এলাম।

প্রশ্ন করলাম—আপনি কি আজ সকালে এখানে এসেছেন?

—হাঁ। বেশী দূর ত নয়। ট্রেণে আধঘণ্টার পথ।

ক্ষণকাল নীরব থাকার পর প্রশ্ন করলাম—চন্দ্রা কবে কোলকাতায় গেছে?

—পরশু। বোধ হয় আর আসবে না।

মনে মনে পরম একটি স্বস্তি অনুভব করলাম।

এমন একটি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার দিন যে আমার জীবনে আর কোনদিন আসবে, কয়েকদিন আগে তা' যেন কল্পনাও করতে পারতাম না।

নিশীথবাবু শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগলেন—আমার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে চন্দ্রা চ'লে গেছে। হয় ত আমাদের দু'জনার জীবনে অশান্তি ঘটাতে আর সে আসবে না। আমি আজ কি জন্য আপনার কাছে এসেছি জানেন?—এসেছি এই প্রার্থনা জানাতে যে, যদিও আমি যোগ্য নই, যদিও আমার ভিতরে সহস্র ত্রুটি মাথা উঁচু ক'রে আছে, তবুও সেদিন আমার অন্তরের যে-দিকটি আপনার সুমুখে উদ্ঘাটিত ক'রে আমি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলাম, সে সত্য, তার মধ্যে এতটুকুও কলুষ এতটুকুও মিথ্যা নেই...

তাঁর আবেগ কম্পিত বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লাম—আমি জানি। কিন্তু তা' হলেও আপনার প্রার্থনা আমি ত কোনদিন পূরণ করতে পারবো না। আমার প্রকৃত পরিচয় আপনি যদি জেনে থাকেন, তা' হ'লে এ কথা নিশ্চয়ই জানবেন যে, কারুকে বিবাহ ক'রে সুখী হওয়া আমার ভাগ্যে নেই।

নিশীথবাবু সহাস্যে ব'লে উঠ্‌লেন—এই কথা! হ্যাঁ; আমি সমস্তই জানি। কিন্তু এই যদি শুধু তোমার আপত্তি হয়, তা' হ'লে সে আপত্তি আমি মানবো না। তুমি যতক্ষণ না আমার কথায় সম্মতি প্রদান কর, ততক্ষণ আমি তোমায় এখান থেকে চ'লে যেতে দেব না।

এই ব'লে তিনি সত্যি-সত্যিই এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন। তাঁর স্পর্শে আমার সারা দেহের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুতের প্রবাহ ব'য়ে গেল! রক্তের তালে অসহ্য উন্মাদনা!

আরক্ত মুখখানাকে ওঁ'র পানে ফিরিয়ে বলবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু···আমি···

আমার কথা শেষ হ'ল না; তিনি একবার চারিধারে দৃষ্টিপাত করলেন, তারপর, কাছে দূরে কেউ কোথাও নেই দেখে, দু'হাতে আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীরভাবে আমার মুখ চুম্বন করলেন।

তাঁর এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আচরণে ক্ষণ-কালের জন্য আমি বিহ্বল হ'য়ে গেলাম। আমার রাগ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য রাগের পরিবর্ত্তে আমার মন কি না অনির্ব্বচনীয় খুসীতে ভ'রে উঠ্‌লো! দুই চোখ জলে ভ'রে উঠেছে—দুঃখে নয়, অসহ আনন্দে! এ আনন্দ যেন বেদনার মতোই তীক্ষ্ণ—তেমনি তীব্র, তেমনি করুণ।

বাড়ী ফিরবার সময় মনে হ'ল যেন মেঘের উপর দিয়ে ভেসে চলেছি। পায়ের নীচে পৃথিবী যেন আজ সৌন্দর্য্যময়ী হ'য়ে উঠেছে—কুসুমাস্তীর্ণ জীবন-পথের মাঝে দুঃখ বেদনার আবর্ত্তগুলি আজ ভরাট হ'য়ে উঠেছে; দুশ্চিন্তার যে পাষাণ-ভার এতদিন আমাকে ক্লিষ্ট ক'রে তুলছিল, সে বোঝা অদৃশ্য হয়েছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে জীবনের অভিশাপরূপী কাণা রাক্ষসটার মৃত্যু ঘটেছে।

অসংলগ্নভাবে কত কথাই যে মুখ দিয়ে বার হচ্ছে!—তাদের না আছে অর্থ, না তাৎপর্য্য! মনে হচ্ছে যেন যুগ-যুগান্ত ধ'রে আমি তাঁর কাছে এমনি অনর্গল আমার মনের কথা ব'লে যেতে পারি! আমার দেহ-মন যেন আর্জ্জ বাঙ্‌ময় হ'য়ে উঠেছে!

কথা বলতে বলতে কখন যে বাড়ীর ফটকের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম, তার খেয়াল ছিল না। তাঁর প্রশ্নে চমক্ ভাঙ্‌লো:

—এই বাড়ীটি না কি! চমৎকার বাড়ীখানি তো? তারপর!

মাথা নেড়ে কি বলতে গেলাম, কিন্তু মুখের কথা আমার মুখের মধ্যেই মরে' গেল; সবিস্ময়ে সভয়ে দেখলাম, চন্দ্রা আমাদের বাড়ীর ভিতর থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে।

কাণা রাক্ষসটা বুঝি আবার জেগে উঠ্‌লো। আকাশে-বাতাসে তার নিষ্ঠুর অট্টহাস্য ধ্বনিত হচ্ছে। চোখের সাম্‌নে সকালের আলো বিবর্ণ কুৎসিত আকার ধারণ করল।

কাছাকাছি আসতেই আমি তা'কে প্রশ্ন করলাম—আপনি এখানে এসেছেন কেন? কি চান আপনি?

কুটিল হিংস্র হাসিতে চন্দ্রার মুখ বীভৎস হ'য়ে উঠল:

—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। দুঃখের বিষয়, তিনি এখন বাড়ী নেই। না থাকুন, আমি আবার আসবো। যতক্ষণ না তাঁর দেখা পাই, ততক্ষণ বারবার আমি আসবো। আমার এখান থেকে যাবার তাড়া নেই। এ-জায়গাটি ভারী সুন্দর। আমি এখন কিছুদিন এইখানেই রইলাম।

তারপর আমাদের দু'জনের পানে বারকয়েক বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বল্লে—তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি! চল্লাম। কিছুক্ষণ পরে আবার আসবো।

ধীরে ধীরে চন্দ্রা অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আমরা দু'জনে বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রৈলাম।

কাণা দানবের পায়ের তলায় প'ড়ে আমার আশা আকাঙ্ক্ষার তাসের ঘর নিষ্পিষ্ট নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল।

রবিবার দিন সভাস্থলে দু'জনের মাঝে আর আড়াল রইল না। পরস্পর পরস্পরের দিকে স্তব্ধ কঠিন নেত্রে দৃষ্টিপাত করলে। চেয়ে দেখলাম, চন্দ্রার মুখের ওপর ক্রুর হাসি ফুটে উঠেছে।

বাবা ধীরে ধীরে তাঁর আসন ছেড়ে বক্তৃতা করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ উন্নত দেহ তাঁর আজ যেন অধিকতর তেজে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে—মুখের ওপর দৃঢ়তার ছায়া; পৃথিবীর কারুকেই আজ যেন তিনি ভয় না করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। সে দৃষ্টির অবজ্ঞা-জ্ঞাপক অর্থ বুঝতে পেরে চন্দ্রার মুখ কঠিন-হিংস্রতর হ'য়ে উঠ্‌লো।

যে ধর্ম্ম-কথা তিনি সেদিন আবৃত্তি করতে লাগলেন, তার মধ্যে অস্পষ্টতা ছিল না, স্খলন ছিল না—প্রত্যেকটি শব্দ যেন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনা-আপনি উৎসারিত হচ্ছিল। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ অন্তরে তাঁর বক্তৃতা শুনতে লাগলো।

বাবার প্রত্যেকটি কথার মধ্যে সেদিন এমন একটি আবেগ, অন্তরের এমন একটি করুণ আকুতির সুর ধ্বনিত হচ্ছিল, যার রেশ অনেকের মনে ঝঙ্কার তুললো; দেখা গেল, বহু নর-নারীর বিমুগ্ধ নয়ন বাবার কথা শুনতে শুনতে সজল হ'য়ে উঠেছে।

তিনি মৃত্যুর কথা বলতে লাগলেন—পৃথিবীর সকল কিছু বন্ধন-কে এড়িয়ে মানুষের যে মহাপ্রয়াণ, সেই মৃত্যু কি নর-নারীর বন্ধন-কে শেষ-পর্য্যন্ত ছিন্ন করতে পারে? এ-জগতের পরে যে জীবন, সেখানেও কি এই বন্ধনের অমৃত-আস্বাদ লাভ করা যায় না? এ-বিষয়ে চূড়ান্ত কথা কি কেউ বলেছে আজ পর্য্যন্ত?

কথা ছিল, বাবা করবেন বক্তৃতা। কিন্তু এ ত বক্তৃতা নয়; এ যেন তিনি নিতান্ত আপন-জনের সঙ্গে মর্ম্মের কথা আলাপ করছেন। তাঁর বক্তব্য যখন শেষ হ'ল, তখন মুগ্ধ জনতা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্পন্দ হ'য়ে রইল—তারা এমনি অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল।

বক্তৃতা শেষ হবার পর কুমুদবাবুর মেয়ে সুনীলা একখানি গান গাইলে; তারপর উপস্থিত ভদ্রলোকেরা একে একে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন।

ঘরের বাইরে থেকে বল্‌লাম—ভিতরে আস্‌বো?

বাবা উত্তর দিলেন—এসো।

বিছানার ওপর আধশোয়া অবস্থায় ব'সে বোধ হ'ল তিনি এতক্ষণ গভীর চিন্তায় আছন্ন ছিলেন, আমাকে দেখে স্মিত-প্রশান্তমুখে বল্‌লেন—অতসী বাড়ী ফিরেছে?

বল্‌লাম—না। তার আস্‌তে এখনো দেরী আছে।

বাবা আর কোন কথা বল্‌লেন না। চোখ মুদে কী যেন ভাবতে লাগলেন। কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ব'সে বল্‌লাম—বাবা, চন্দ্রাকে দূরে রাখ্‌বার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু···

এমন সময় বাড়ীর দরজায় মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। মুখ সভয়ে তুলে দেখলাম, চন্দ্রা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করছে। বাবা চোখ মিলে প্রশ্ন করলেন—কে এলো?

ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে ব'লে উঠলাম—কী আস্পর্দ্ধা! বলা-কওয়া নেই, বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌লো? তুমি কখনো ওর সঙ্গে দেখা করো না! আমি এখুনি ওকে বিদায় ক'রে দিয়ে আসছি।

বাবা মাথা নেড়ে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লেন—তা'তে কোন লাভ হবে না, কেতকী। ওকে আসতে দাও আমার কাছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল; তারপর বুধুয়া এসে খবর দিতে চন্দ্রাকে এই ঘরে পাঠিয়ে দিতে বল্‌লাম। মিনিটখানেক পরে সে দৃঢ়-পদে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। তার চোখ-মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠেছে, নিশ্বাস জোরে জোরে বইছে। নারীর এমনতরো সর্ব্বনাশা মূর্ত্তি আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি।

বাবার মুখের পানে তাকিয়ে বিজয়গর্ব্বে সে বল্‌লে—এতদিনে সকল রহস্যের সমাধান হ'ল। ফণি মজুদার মশায়, আমাকে কি চিনতে পারছেন না?

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রশান্ত গম্ভীর মুখে

কোন ভাবান্তর ঘট্‌ল না। শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন—না, তোমায় ভুলি নি, চন্দ্রা। কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ করবার প্রবৃত্তিও আমার নেই। তোমার কি বল্‌বার আছে ব'লে, চ'লে যাও।

চন্দ্রা তীক্ষ্ণকণ্ঠে হেসে উঠলো:

—আপনার চিন্তা নেই; আমি এখানে থাকতে আসি নি। আমি যাচ্ছি পুলিশ-ষ্টেশনে। তার আগে একবার দেখা ক'রে যাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। আপনার এই মেয়ে যে আমার খুব বন্ধু, তা' জানেন না বুঝি?

বাবা সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌লেন—পুলিশের থানা এখান থেকে অনেকটা দূর। তাড়াতাড়ি যাও, নইলে বন্ধ হ'য়ে যাবে। আজ রাত্রেই যদি আমায় ধরিয়ে দিতে চাও, তা' হ'লে আর দেরী কোরো না।

চন্দ্রা বিস্মিত-নেত্রে বাবার মুখের পানে তাকালো। আমিও। বাবা স্থির অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। বিন্দুমাত্র ভয় তাঁকে অধিকার করতে পারে নি। হিমালয়ের শুভ্র চূড়ার মতোই তিনি যেন আজ সুদূর আয়ত্তাতীত।

চন্দ্রা কঠিন-কণ্ঠে বল্‌লে—তাই যাব। জগতের লোক-কে আমি দেখাবো যে, তাদের পূজ্যপাদ জগদীশ-বাবু কী ভীষণ লোক! তারা জানবে যে, তিনি নরঘাতক!

বাবা ক্ষীণ হেসে বল্‌লেন—কথাটা বড় কঠিন শোনালো চন্দ্রা!

—কিন্তু সত্যি কথা। আপনি আমার দাদাকে হত্যা করেচেন। এ-কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।

—অস্বীকার আমি করছিও না, চন্দ্রা। সে আমায় আগে আক্রমণ করেছিল। সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইচ্ছা না থাকলেও আমার হাতে সে আঘাত পেয়েছিল। কিন্তু এখন আমি তার তার জন্যে দুঃখিত নই।

স্তব্ধ বিহ্বল-মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। চন্দ্রাও নীরব। বাবা বল্‌তে লাগলেন—আমি তা'কে বারবার বারণ করেছিলাম—যে নারী তাকে ঘৃণা করে, যে তার সঙ্গ একেবারেই কামনা করে না, তার সামনে উপস্থিত হ'য়ে তা'কে উত্যক্ত করবার কোন অধিকার তার ছিল না—এ কথা আমি তা'কে বারম্বার বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তবুও সে জোর ক'রে তার সামনে যাবে—এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। সেই নারীর মান-মর্য্যাদার জন্য যে আমি দায়ী, এ কথা তাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম, কিন্তু আমার কথা সে উপহাস ক'রে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারপর সেই ক্রোধে হিংসায় অন্ধ হ'য়ে প্রথমে আমাকে আক্রমণ করে; সেই আঘাতের পর হঠাৎ দৈব-দুর্বিপাকে তার নিজেরই অস্ত্র নিজের দেহে বিদ্ধ হয়—আমি ছিলাম উপলক্ষ মাত্র। তোমার ভাই ছিল কাপুরুষ। পিছন থেকে সে আমায় অকস্মাৎ আক্রমণ করেছিল। সে আঘাত চিহ্ন এখনো আমার দেহে বর্ত্তমান। এই দ্যাখো!

এই ব'লে তিনি গায়ের চাদরখানা সরিয়ে ফেল্‌লেন। চন্দ্রা সে দৃশ্য দেখে মুহূর্ত্তের জন্য শিউরে উঠে চোখ বুজ্‌লো। বাবা বল্‌তে লাগ্‌লেন—এ আঘাত থেকে আমি সাম্‌লে উঠ্‌তে পারবো না। তোমার দাদার অস্ত্র আমার ফুস্‌ফুস্‌ পর্য্যন্ত আহত করেছে। ডাক্তারেরা আশা দিয়েছে ছেড়ে। কিন্তু তা'তে আমি এতটুকুও কাতর নই। আর তোমাকে এত কথা বলছি ব'লে, তুমি যেন মনে করো না আমি তোমার করুণা উদ্রেক করবার চেষ্টা করছি। তুমি যাও, তোমার যা' ইচ্ছে তুমি কর। শুধু অনুরোধ, তুমি আর এ-বাড়ীর মধ্যে পদার্পণ করো না। কেটি, একে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসো।

চন্দ্রা একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে বল্‌লে—বেশ, আমি যাচ্ছি। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি চল্‌লাম, থানায়। যাক্‌, কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে কারুকে আসতে হবে না।

এই ব'লে ক্ষিপ্রপদে চন্দ্রা বাড়ী থেকে বার হ'য়ে গেল।

পথের ওপর একটি সাঁওতালী মেয়ে তখন প্রিয়-বিচ্ছেদ-বেদনার গান গেয়ে গেয়ে চলেছে :

"এমন দিন যে আসবে, তা' আমি জানতাম। বসন্তের দিনে আকাশ যখন কালো হ'য়ে উঠেছিল, তখনই বুঝেছিলাম, বজ্র প'ড়ে বুক ভাঙ্‌লো! ঘুম থেকে উঠে যেদিন দেখলাম বন্ধুয়া পাখীটি চিরদিনের মতো আমায় ছেড়ে গেছে, তখনই বুঝেছিলাম, কপাল আমার ভাঙ্‌লো!..."

চব্বিশ

আজ রাত অতন্দ্র থাকবার পর ভোরের দিকে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙ্‌লো, তখন অনেকখানি বেলা হ'য়ে গিয়েছে। ঘুম ভাঙতেই প্রথমে মনে পড়্‌ল, বাবার কথা। তিনি কেমন আছেন? কাল চন্দ্রা চ'লে যাবার পর অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন। সকালে তাঁকে শুশ্রূষা করা দরকার।

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে বাবার ঘরে ঢুক্‌লাম। তিনি ঘরে নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বুধুয়াকে প্রশ্ন করলাম। বুধুয়াও ঠিকমতো জবাব দিতে পারলে না। অতসী আমার ভীত ত্রস্তভাব দেখে, কোন কথা বুঝতে না পেরে 'হাঁ' ক'রে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ এধার-ওধার ঘুরে আমি পুনরায় বাবার ঘরে প্রবেশ করলাম।

চারিদিকে লক্ষ্য করতেই নজরে পড়ল, ছোট স্যুট-কেশ্‌টি নেই। আন্‌লা থেকে কোট এবং চাদরখানিও অদৃশ্য হয়েছে। ঘরের কোণে একটি ছোট লেখবার টেবিল ছিল; তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখ্‌লাম, টেবিলের ওপর একখানি কাগজ ভাঁজ করা রয়েছে; তার ওপরে একটি কাগজ-চাপা বসানো। কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম, একখানি চিঠি। ওপরে আমারই নাম লেখা। বাবার হাতের লেখা।

কম্পিত অন্তরে চিঠি খুলে ফেল্‌লাম। তা'তে লেখা আছে :

"কেতকী, অতসী আজ তোমাদের কাছ থেকে এ-ভাবে হঠাৎ বিদায় নিতে হ'ল ব'লে আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। আমি বুঝেছি ধর্ম্ম-প্রচারের কাজ আমার শেষ হয়েছে। চন্দ্রার কথা যখন সকলে শুনবে, তখন আর কেউ-ই আমায় আগের মতো শ্রদ্ধার চোখে দেখবে না। সেই জন্যে আমি চিরদিনের জন্য লোকালয় পরিত্যাগ কর্‌লাম। আচার্য্য-দেবকে একখানি পত্র দিয়েছি; তিনি তোমাদের সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। সেদিক থেকে তোমাদের কোন চিন্তা নাই।

"কেতকী, একটি কথা আজ তোমাকে বল্‌ব। আমার জীবনের আর একটি দিক্ আছে, যা' তুমি বা অতসী, তোমরা কেউ জানো না। আমার এই অপ্রকাশিতব্য জীবন-যাত্রার কাহিনী জানে সেই একটি মাত্র নারী, যার কাছে আমার কোন কথা অজানা বা অ-বলা নেই। ছোট ঘটনা থেকে সে-জীবন আমার আরম্ভ হয়েছিল, এখন তা' এমনি অচ্ছেদ্যভাবে আমাকে মোহাবিষ্ট করেছে যে, তা'কে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার অবশিষ্ট দিনগুলি আমি সেই অমুদ্ঘাটিত জীবন-যজ্ঞে নিবেদন ক'রে দিইছি। তোমাদের সঙ্গে হয় ত আর দেখা হবে না! তা' না হোক্, অনাবশ্যক আমার জন্যে চিন্তা করো না—এ-জীবন যেদিন শেষ হবে, তার আগে খুব সম্ভব তোমাদের খবর দিতে পারবো।

"আর একটি কথা। নিশীথ-কে আমি মনে মনে ভালবাসি। কেন জানো? তোমার এবং আমার এক অতি আপন-জনকে বিপদের সময় সে সাহায্য করেছিল। নিশীথের যোগ্যতা কারুর চেয়ে কম নয়—ওর সম্বন্ধে এই কথাটি আমার মনে রেখো, এবং যদি পারো, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করো। ইতি,

তোমাদের চির-শুভাকাঙ্ক্ষী

জগদীশ মিত্র"

চিঠি প'ড়ে অতসী বিশেষ কোন কথা বুঝতে না পেরে বল্‌লে—কী হবে দিদি!

সাহস দিয়ে বল্‌লাম—ব্যস্ত হোস নি। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। বুধুয়াকে ডাক, একখানা গাড়ী আন্‌তে পাঠাই। আমাকে এখুনি কোলকাতায় যেতে হবে।

—কোলকাতায়? এখুনি! কার কাছে যাবে?

—মনীষা দেবীর কাছে।

অতসী বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে বল্‌লে—তাঁর কাছে! কেন? তিনি কি জানেন?

বল্‌লাম—তিনি সমস্তই জানেন, অতসী; আমাদের জীবনের কথা তাঁর কিছুই অজানা নেই। সব কথা ফিরে এসে তোকে বলব, ভাই; এখন আমার যাবার যোগাড় ক'রে দে।

ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলাম, গাড়ী আসবার তখনো বহু বিলম্ব। মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। অদূরে একখানি শূন্য বেঞ্চ্ পড়েছিল; ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হলাম।

কাছাকাছি গিয়েছি, এমন সময় ওধার থেকে একটি স্ত্রীলোক ত্বরিতপদে একেবারে আমার সাম্‌নে এসে উপস্থিত হ'ল। মুখ তুলে তা'কে দেখে আমার মাথা ঘুলে উঠ্‌লো। বেঞ্চিখানা না থাক্‌লে হয় ত মাটির ওপরেই ব'সে পড়তে হ'ত।

চন্দ্রা কিন্তু এখন আমায় দেখে বিশেষ কোন ক্রুদ্ধ-ভাব প্রকাশ করলে না। আমার পাশে ব'সে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে—তোমার বাবা চ'লে গেছেন, তা' আমি জানি। তুমি তাঁর কাছে যাচ্ছো। কিন্তু তাঁর দেখা পাবে কি? আমিও তাঁর কাছে যাচ্ছি এবং আমি তাঁর দেখা পাবোই; কারণ, আমার নিয়োজিত লোক তাঁকে অনুসরণ করেছে।

চন্দ্রার কথা শুনে আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। কী চতুর আর কী নির্ম্মম এই নারী!

চন্দ্রা বল্‌লে—তোমায় কি বলতে চাই, শোনো। নিশীথবাবুও এই ট্রেণে কোলকাতায় যাবার জন্য ষ্টেশনে এসেছে। সে এখন টিকিট কিনছে। তুমি যদি এখনো ইচ্ছা কর, তা' হ'লে তোমার বাবাকে বাঁচাতে পারো। আমি চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বল্‌লাম—কিন্তু আমি ত চেষ্টার ত্রুটি করি নি।

চন্দ্রা বল্‌লে—আবার চেষ্টা কর। এবার হয় ত কৃতকার্য্য হবে। নিশীথ তোমার সঙ্গে যেতে চাইবে, তার সাহায্য তুমি প্রত্যাখান কর। তা' হ'লে, হয় ত আমার আশা পূর্ণ হবে। ওই, সে আসছে!

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারী পায়ের শব্দ আমার পিঠের কাছে থাম্‌লো। কণ্ঠস্বর শোনা গেল—মৃদু মিষ্ট কণ্ঠস্বর—তার স্বরে অনন্ত নির্ভাবনার আভাস:

তোমাদের বাড়ী হ'য়ে আসছি। তোমার ভগ্নীর কাছে সমস্ত শুন্‌লাম। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

এই ব'লে নিশীথবাবু সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। আমি কোন কথা বল্‌তে পারছি না—হৃদয় উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। চন্দ্রা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে। নিশীথবাবু তা'কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে আমার পাশে বসলেন। চন্দ্রা আরও কয়েক মুহূর্ত্ত তেমনি স্থাণুর মতো নিশ্চল হ'য়ে দাড়িয়ে রইল; তারপর ধীরে ধীরে সে-স্থান পরিত্যাগ করল।

তখন আমি মৃদুকণ্ঠে বল্‌লাম—চন্দ্রার সঙ্গে আপনি কথা বল্‌লেন না কেন?

নিশীথবাবু তিক্তকণ্ঠে বল্‌লেন—কেন বলব? যে মেয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে, তার সঙ্গে আমি কথা বলতে যাব কিসের জন্যে, ও আমাদের শত্রু।

বল্‌লাম—আপনার শত্রু হ'ল কেমন ক'রে। ও ত আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বই স্থাপন করতে চায়।

নিশীথবাবু সরল স্পষ্ট ভাষায় বল্‌লেন—তোমার যখন শত্রু, তখন আমারো। ওর বন্ধুত্বও আমি চাই না।

বল্‌লাম—ও আমায় এখনো বল্‌ছিলো, যদি ওকে সাহায্য করি তা' হলে...

—বুঝেছি, বুঝেছি, ওকথা আমি আর শুনতে চাই না। অল্পবুদ্ধি মেয়ে না হ'লে এমন চক্রান্ত আর

কেউ করতে পারে। যাক্, ওসব আমায় আর বোলো না—আমি শুনবো না। ট্রেণ আসছে, ওঠ।

দু'জনে একটি কাম্‌রায় উঠে বস্‌লাম। চন্দ্রাকে দেখতে পেলাম না। সে এই ট্রেণে উঠ্‌লো কি না, কে জানে।

সহসা দেখ্‌লাম, কামরার মধ্যে আমরা দু'জন ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি নেই। নিশীথবাবু অদূরে ব'সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। গভীর লজ্জায় আমার সারা দেহ যেন অবশ হ'য়ে এলো।

পাশের কামরা থেকে একটি ছেলের গানের স্বর ভেসে আসছে,—

"যে-পথে বন্ধু বন্ধুর সাথে চলে বন্ধুর পথে
আমি সেই পথে যাব সাথে।"

কোলকাতার উপকণ্ঠে এক অজ্ঞাত পল্লীর সম্মুখে গিয়ে আমাদের ট্যাক্‌সী যখন থাম্‌লো, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। মা আমার হাতে ধ'রে বল্‌লেন—নেমে এসো।

তিনজনে পথের ওপর নেমে দাঁড়ালাম। সম্মুখে ছিল একটা বস্তি, মা সেইদিকে আঙুল বাড়িয়ে বল্‌লেন—এর ভেতর আমাদের যেতে হবে।

অবাক্ হয়ে বল্‌লাম—এই নোংরা বস্তীর মধ্যে! এর মধ্যে বাবা আছেন।

নিশীথবাবু বল্‌লেন—বস্তি বলেই যে নোংরা হবে, তার মানে কি? এখান থেকে যা' দেখছি, তা'তে ত খুব নোংরা ব'লে মনে হচ্ছে না।

অভিভূত অন্তরে মায়ের হাত ধ'রে সাবধানে ভিতরে অগ্রসর হ'লাম। দু'পাশে ছোট ছোট খোলার ঘর। ঘরের সাম্‌নে দাওয়া। দাওয়ার ওপরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাদের মায়েরা বসে আছে; কেউ বা হয় ত তাদের ঘুম পাড়াচ্ছে; কেউ বা খাওয়াচ্ছে। একটা ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত ক'রে সবিস্ময়ে দেখলাম, একটি আধাবয়সী মেয়ে একটি ছোট ছেলেকে পড়াচ্ছে—ছেলেটি একমনে বানান ক'রে পড়ছে আর স্ত্রীলোকটি মাঝে মাঝে তার উচ্চারণ শুধ্‌রে দিচ্ছে।

ক্রমে আমরা বস্তির শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হ'লাম। সেখানে একখানি টালিখোলার ঘরের ভিতর থেকে উজ্জ্বল আলোর রেখা এসে বাইরে পড়েছে। ঘরটি বেশ বড়। তার জানলায় লাল নীল পরদা ঝুলছে। ঘরের সামনে এসে দেখলাম, তার দরজার মাথায় বড় বড় অক্ষরে একটা স্কুল বা সমিতির নাম লেখা রয়েছে, (আলো অভাবে স্পষ্ট ক'রে সেটা দেখতে পেলাম না) এবং তার নীচে সাদা কাগজের ওপর বাঁকা বাঁকা হরফে লেখা রয়েছে—

"সত্যম শিবম সুন্দরম
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

ঘরের ভিতর থেকে বহুতর লোকের কলগুঞ্জন ভেসে আসছে।

মা আমার হাত ধ'রে ভিতরে ঢুক্‌লেন। পিছনে নিশীথবাবু। ঘরের ভিতর ঢুকে যে দৃশ্য দেখলাম, তা' ভুলব না—আমার সমস্ত কৌতূহল এক নিমিষে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! ঘরের মধ্যে কম-বেশী পঞ্চাশ জন শ্রমিকগোছের লোক মেঝের ওপর ব'সে আছে। অদূরে একখানি উঁচু তক্তাপোষে ব'সে আমার বাবা!!

এতগুলি লোক, কিন্তু সকলেই নীরব। সকলেরই উন্মুখ দৃষ্টি বাবার মুখের পানে নিবদ্ধ। দু'-একজন ফিস্‌ফিস্ ক'রে অতি সাবধানে কথা বল্‌ছে—জোর ক'রে কথা বলা যেন এখন গুরুতর অপরাধ...

ক্ষণকাল পরে বাবা উঠে দাঁড়ালেন। আমরা তিনজনে স্তব্ধ নিস্পন্দ হ'য়ে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি আমাদের দেখতে পেলেন না। জনতাকে উদ্দেশ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন—রামহরির দৃষ্টান্ত থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, মদ খাওয়ার পরিণাম কী ভীষণ! আজ পাঁচ বছর ধ'রে চেষ্টা করেছি, কিন্তু রামহরিকে আমি ওই পাপ কাজ থেকে বিরত করতে পারি নি। যাক্, আজ সব পরিশ্রমের শেষ হ'ল! রামহরি আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে পালালো!

এই কথা বলার পর তিনি কিছুক্ষণের জন্য নীরব হ'লেন; মনে হ'ল যেন মনে মনে তিনি রামহরির জন্য প্রার্থনা করলেন; তারপর আবার আরম্ভ করলেন।

এবার সুরু হ'ল মদ খাওয়ার কুফলের বর্ণনা; তার শোচনীয় পরিণতির জলন্ত বিবৃতি। লোকগুলো 'হুঁ' ক'রে তাঁর প্রত্যেকটি কথা যেন গ্রাস করতে লাগ্‌লো।

বর্ণনার শেষে তিনি বল্‌লেন—আজ আমি অনেক দূর থেকে তোমাদের কাছে এই কথাগুলি বলতে এসেছি; কারণ, আমি হয়ত আর বেশীদিন তোমাদের কাছে থাকবো না। কিন্তু আমি যেখানেই থাকি, সেখান থেকেই আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করব যদি দেখি যে, আমার কথা তোমরা অবহেলা করছো, তা' হ'লে জেনো, আমার দুঃখের শেষ থাকবে না…

তাঁর কথা শুনে চকিত হ'য়ে উঠ্‌লাম। জনতার ভিতর থেকে একজন পুরুষ ব'লে উঠ্‌লো—সে কি কর্ত্তা! তুমি কি আমাদের ছেড়ে যাবে?

তার কথার উত্তরে বাবা মৃদুভাবে হাসলেন। বিহ্বল হ'য়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম। অপূর্ব্ব আভায় তাঁর মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে ডান হাতখানি বুকের ওপর রেখে করুণ কোমলকণ্ঠে তিনি তাঁর এই সকল পতিত অবহেলিত বন্ধুদের কাছে তাঁর শেষ বিদায়-বাণী বল্‌তে লাগ্‌লেন।

কী সে আশ্চর্য্য সহানুভূতিভরা কণ্ঠস্বর! লোকগুলি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলো। আমাদের মতো তাদের চক্ষুও সজল হ'য়ে উঠ্‌লো। বক্তৃতার শেষে বাবা ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করলেন।

নিশীথবাবু পিছন থেকে চাপাকণ্ঠে বল্‌লেন—'ওয়াণ্ডারফুল্'!

আমার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়েছিল।

মা নিম্নকণ্ঠে বল্‌লেন—এই সব লোকগুলোর ওপর উনি অসাধারণ প্রতিপত্তি বিস্তার করেছেন। ওঁকে এরা বলে—দেবতা।

ক্রমে শ্রোতারা একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আমরাও বেরিয়ে এসে ফাঁকা স্থানে দাঁড়িয়ে কি করা উচিত তারই পরামর্শ করতে লাগলাম। এখন এ-অবস্থায় বাবার সঙ্গে দেখা করা কি যুক্তিসঙ্গত? তিনি রাগ করবেন না?

মা বল্‌লেন—উনি এ-অঞ্চলে কোথায় থাকেন তা' আমি জানি না। কিন্তু তা' জানা বিশেষ শক্ত হবে না। তা' হ'লে কি বাড়ীতেই ওঁর সঙ্গে দেখা করবে?

নিশীথবাবু বল্‌লেন—সেই ভাল।

এমন সময় দু'জন লোক অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের ব্যস্ততা দেখে একজন প্রশ্ন করলে—কি হে চরণদাস! ব্যাপার কি?

'আর ব্যাপার! কর্ত্তা হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন। অবস্থা দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না। আমি ডাক্তার আন্‌তে যাচ্ছি।

লোকটার কথা শুনে আতঙ্কে অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম। নিশীথবাবুও অব্যক্ত কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে ক্ষিপ্রপদে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। তাঁর পিছনে পিছনে আমরাও ভিতরে প্রবেশ কর্‌লাম।

তক্তাপোষের ওপর আধ-শোয়া অবস্থায় বাবা ব'সে আছেন—তাঁর মুখ পাংশু বিবর্ণ হ'য়ে গেছে; দুই চোখ ভাবহীন। আমার আগেই মা তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং যে লোকটি তাঁকে ধরেছিল, তা'কে সরিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর মাথাটি নিজের কোলের ওপর টেনে নিলেন। বাবা একবার চোখ মেলে মার মুখের পানে তাকালেন; তারপর ধীরে ধীরে দেহ এলিয়ে দিলেন। বুঝলাম, শেষ হবার আর বিশেষ বিলম্ব নেই।

মা তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন—আমি একা আসি নি। আরও কে কে এসেছে ভাখো। কেতকী এসেছে।

মায়ের কথা শুনে বাবা চোখ খুল্‌লেন; আমাদের দেখে তাঁর মুখের ওপর আনন্দের ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠ্‌লো; কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লেন—পরমেশ্বরকে নমস্কার! তোমাদের দেখবার জন্য আমি কিছুক্ষণ থেকে ব্যাকুলতা অনুভব করছিলাম।

তিনি অতিকষ্টে তাঁর ডান হাতখানি তুলে আমার

কপালে রাখলেন; তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বল্‌লেন—কাঁদিস্‌ না, কেতকী! আমার বাবার ক্ষণকে অশ্রুজলে সিক্ত করিস নি মা। তোর সম্বন্ধে আমার ভাবনা ছিল, কিন্তু আজ আমি নিশ্চিত হলাম। যাঁদের কাছে তোমায় রেখে গেলাম, তাঁদের যোগ্য হও তুমি—এই আশীর্ব্বাদ করি।

সহসা দ্বারের কাছে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চকিত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম—মূর্ত্তিমতী অভিশাপের মতো চন্দ্রা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের দেখে সে শুধু বল্‌লে—এই যে! পেয়েছি এতক্ষণে।

নিশীথবাবু ক্ষিপ্রপদে তার সুমুখে গিয়ে তার পথরোধ ক'রে বল্‌লেন—আর কেন? প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। তুমি যাও এখান থেকে।

তার কথা শুনে চন্দ্রা বোধ করি বিস্মিত হ'ল। তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে এগিয়ে এসে বাবার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। বাবা তাঁর দুই শান্ত চক্ষু নিমীলিত করলেন।

দ্বার ঠেলে দু'জন পুলিসের লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। একজন এগিয়ে এসে চন্দ্রাকে সেলাম জানিয়ে তার আদেশের অপেক্ষা করতে লাগ্‌লো।

মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে চন্দ্রা তা'কে বল্‌লে—আমি ভুল করেছি, ইন্‌স্‌পেক্টার! ইনি সে লোক নন।

চন্দ্রার কথা শুনে লোক দু'জন তাকে সেলাম ক'রে প্রস্থান করল। ঘরের মধ্যে অটুট নিস্তব্ধতা! এতগুলি লোকের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে ঘর যেন মুখর হ'য়ে উঠেছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে চন্দ্রার কথায় সেই নিশ্ছিদ্র নীরবতা ভঙ্গ হ'ল। বাবার সুমুখে গিয়ে অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে সে বল্‌লে—আপনাকে মার্জ্জনা করলাম—সর্ব্বান্তঃকরণে মার্জ্জনা করলাম। আর কখনো আপনি আমায় দেখতে পাবেন না। বিদায়!

এই কথা ব'লে সে আমাদের প্রত্যেকের মুখের পানে চেয়ে করুণ-নেত্রে বিদায় জ্ঞাপন ক'রে ঘর ছেড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

মা মুখ নীচু ক'রে বল্‌লেন—সে চ'লে গেছে। এইবার চোখ মেলে চাও। এখন কেমন বোধ করছ?

উত্তরে বাবা তাঁর কপালের ওপর ন্যস্ত মায়ের হাতের ওপর তাঁর দুর্ব্বল ডানহাতখানি স্থাপন করলেন। তাঁর অবসন্ন মুখের ওপর ক্ষণকালের জন্য পুনরায় একটি আনন্দের দীপ্তি ভেসে উঠ্‌লো।

শেষ

যে-যা-চায় না

শ্রীহরেন হালদার

'এ্যারিষ্ট্রকেট' হতে হলে লক্ষ্মীর সহায়তা চাই খুব বেশী এবং বিমান তা পেয়েছিলো সম্পূর্ণভাবে। ফটকে তকমা আঁটা দরওয়ান, বাড়ীতে চারটার যায়গায় পাঁচটা চাকর, 'গ্যারেজে' দু'খানা 'ক্যাডিলাক্' ও সামনে গাড়ীবারান্দার নীচে এক খানা টু সিটার' সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত। 'টেনিস্ লন্,' 'বিলিয়ার্ড রুম', 'বাথ্ রুম্' 'ড্রয়িং রুম' ফুলের বাগান প্রভৃতি 'এ্যারিষ্ট্রকেসি'র কোনও অঙ্গেরই তার অভাব ছিলো না। গৃহলক্ষ্মীর বাপমায়ের দেওয়া নাম হরিভাবিনীকে বিমান বদ্‌লে করেছিলো ইলা সেন। মোট কথা, বিমান সব সইতে পারতো, কিন্তু এ্যারিষ্ট্রকেসির পরীক্ষায় বরাবর প্রথম ডিবিশনে পাশ করাই ছিলো তার জীবনের সাধনা এবং এই নিয়ে সেদিন ইলার সঙ্গে খুব ঝগড়াও হয়ে গিয়েছে; কারণ, ইলা 'স্যাণ্ডেল'ও পায়ে দিত, টেনিসও খেলত এবং হাতে 'রিষ্টওয়াচ' বাঁধতেও তার আপত্তি ছিলো না, কিন্তু নতুন 'নভেলটি'র দোহাই দিয়ে সে তার একপিঠ চুল্‌কে কেটে 'বব্‌ড' করতে মোটেই রাজী হয় নি। যাক্ সে সব কথা, কোল্‌কাতার প্রায় অধিকাংশ ব্যাঙ্কেই বিমান চেক্ কাট্‌তে পার্‌তো এবং এমন কি, দু'-একটা ব্যাঙ্ক থেকে তার 'ফিক্সড্ ডিপোজিট' উঠিয়ে নিলে ব্যাঙ্ককে কোনও একটা বিশেষ বর্ণের বাতি জ্বালতে হতো। কিন্তু এত কিছু থেকেও বিমানের মনে ছিল না শান্তি; কারণ, সে ছিল অপুত্রক। যদিও বিমান্ জান্‌ত যে,এ্যারিষ্ট্রকেট্‌সদের সন্তান কামনা করা 'এটিকেট' বিরুদ্ধ, তথাপি সে চাইতো একটী ছেলে; অবশ্য, পিতা হবার লোভে নয়, তার এই বিরাট এ্যারিষ্ট্রকেসির উত্তরাধিকারী কর্‌বার জন্য। ইলা কিন্তু সমান ব্যথার ব্যথী হয়েও একটী ছেলেকে চাইতো কেবল মা হবার লোভে আর কল্পনায় বা বাস্তবে যতই সে দেখত কোনও একটী ছোট ফুট্‌ফুটে শিশু একটী নারীর গলা জড়িয়ে ডাক্‌ছে 'মা' ও 'মা', ততই সে তার মাতৃত্বের ক্ষুধাকে বাড়িয়ে তুল্‌তো এবং এ্যারিষ্ট্রকেসির কোনও বস্তুই আর তাকে শান্তি দিতে পার্‌তো না।

*　　*　　*　　*

রাত্রি এগারটা। ইলা তার শোবার ঘরে একখানা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বিমানের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছিলো। নীচে বাগানের পাশে একটী ছোট কোয়ার্টার, অর্থাৎ চাকর্‌দের থাক্‌বার জন্য তৈয়ারী হয়েছিল। কিন্তু ড্রাইভার অনুকূল যেদিন বিমানকে বল্‌লে যে, সে দেশ হতে তার স্ত্রীকে আন্‌তে চায়, কারণ দেশে তার বৃদ্ধা পিসী মারা গেছে এবং তার স্ত্রী ছেলেপিলে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছে, সেদিন হতেই চাকরদের ঘরগুলো অনুকূলবাবুর কোয়ার্টারে পরিণত হ'ল। অনুকূলবাবুর দেড় বছরের মেয়ে রাণু চীৎকার করে কাঁদতে সুরু করেছে আর অনুকূলের স্ত্রী মোক্ষদা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ইলার কাণে আসে রাণু ও মোক্ষদার আলাপ। প্রথমটা খারাপ লাগ্‌লেও ক্রমে বেশ ভাল লাগ্‌তে লাগ্‌ল; কারণ, ওই আলাপ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে মনে মনে আঁক্‌ছিল আর একখানা ছবি, ঠিক ওদেরই মতো; তবে মোক্ষদার স্থানে বসিয়েছিল সে নিজেকে।

বিমান ঘরে ঢুকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে বারোটা বেজে গিয়েছে। ইলা জানলার সার্সি ধরে তন্ময় হয়ে তখনও রাণুর ক্রন্দন ও মোক্ষদার সান্ত্বনার পরিণতি তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনছে। 'গুড্ মার্ণং ডার্লিং!' ইলা চম্‌কে উঠে পেছন ফিরে তাকাতেই বিমানের বাহুবন্ধনে ধরা পড়ে গেল ও কোনও কথা বল্‌বার আগেই গালের ওপর পেলে কিছুর পরশ, যার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

"যাও কি কর, আঃ ছাড়ো, উঃ, লাগে—"

বিমান তৃষ্ণা শান্ত করে ইলাকে ছেড়ে দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "স্বামীর অনুপস্থিতিতে

জানলা দিয়ে পরের বাড়ীতে কি হচ্ছে শোন্‌বার শাস্তি দিতে গেলে একটু-আধটু লাগে, বুঝেছ !"

"খুব হয়েছে, যাক্, এখন কেমন নেমন্তন্ন খেলে বল দিকিন ?"

"খুব সুবিধা নয় ; কারণ, খিদে আজ আমার মোটেই ছিল না ; তবে আয়োজন হয়েছিল মন্দ নয়।"

ইলা মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে, "নেমন্তন্ন-বাড়ীতে গিয়ে খিদে ছিল না আর বাড়ীতে এসেই বুঝি এত খিদে পেয়ে গেল যে, আর সবুর সইল না, নয় ?"

বিমান মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য এনে বল্‌লে, "মোটেই তা নয় ; কারণ, এইমাত্র যেটা খেলাম, সেটা খিদের জন্য নয়, তৃষ্ণার জন্য এবং অন্ততঃ বড় বড় কবিরা এটাকে তৃষ্ণাই বলে থাকে, বুঝ্‌লে ?"

ইলা আর কথার জবাব খুঁজে না পেয়ে বুঝ্‌লে, সে পরাজিত এবং জয়ীকে আবার কিছু শাস্তি আদায়ের উদ্যোগ কর্‌তে দেখেই তাড়াতাড়ি বিমানের পোষাক খুল্‌তে আরম্ভ করে দিলে।

বিমান পোষাক-পরিচ্ছদ খুলে বিছানায় শুতে গেল। ইলা বড় আলোটা নিভিয়ে সবুজ আলোটা জেলে দিয়ে বিমানের পাশে শুয়ে পড়্‌ল। দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্। হঠাৎ ইলা বিমানকে বল্‌লে, "আজ তোমায় একটা সু-খবর দোব, শুনবে ?"

বিমান ইলার কাছে সরে এসে বল্‌লে, "কি বল না, শুনি ?"

বিমানের কথা বলার ভঙ্গী দেখে ইলার এতক্ষণকার কথাটা যেন সব গোলমাল হয়ে গেল ; অর্থাৎ, লজ্জাকে সে অনেক কষ্টে দূরে রেখেছিল, কিন্তু বিমানের অভিনয়-ভঙ্গীতে কথা বলায় আবার রাজ্যের লজ্জা এসে ইলাকে রাঙিয়ে দিলে। আম্‌তাআম্‌তা করে সে বল্‌লে, "অনুকুলবাবুর আবার ছেলে হবে।"

বিমান বুঝ্‌লে, আসল ব্যক্তব্যটা সে চেপে গেছে ; কারণ, অনুকুলবাবুর ছেলে হওয়ার মধ্যে যে বিমানের পক্ষে আনন্দের কিছু থাক্‌তে পারে না তা সে জান্‌তো, তাই ইলাকে বুকের কাছের টেনে নিয়ে বিমান আদর করে বল্‌লে, "আসল কথাটা কি বল্‌তে চাইছিলে তা বল্‌তে এত লজ্জা কেন ? ছিঃ, বলো না।"

ইলা অনেক চেষ্টা করেও বল্‌তে পারে না ; শেষে বিমানের আদর ও জেদাজেদিতে বল্‌লে, "ক্ষীরোর মা বল্‌ছিল—"

আবার চুপ।

বিমান একটু বিস্মিত হ'ল ; কারণ, বাড়ীর ঝি ক্ষীরোর মা যা বলেছে, তা সমাপ্ত কর্‌তে ইলা এত লজ্জা পায় কেন ? তবে কি—হঠাৎ ইলাকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে নিজের কানটা তার মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা কানে কানে বলো।"

ইলা তাড়াতাড়ি ছোট একটু অস্পষ্ট কথা বল্‌তেই বিমান ইলাকে জড়িয়ে ধরে এত বেশী তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে পড়ল যে, বড় বড় কবিরা তার তৃষ্ণা শান্তি দেখলে এটার নাম তৃষ্ণা না দিয়ে অন্য কিছু দেবার চেষ্টা কর্‌ত।

* * *

ছয়-সাতমাস পরের কথা। বিমানের বাড়ী ডাক্তারের ভিড় লেগে গেছে। পাশে অনুকুলবাবুর বাড়ীতেও ডাক্তারের প্রয়োজন ; কিন্তু অনুকুলবাবুর বাড়ীর প্রয়োজনের জন্য এ বাড়ীর ঝি ক্ষীরোর মাকে রেখে বিমানের গাড়ী নিয়ে খালি বড় বড় ডাক্তার আনা-নেওয়া কর্‌ছে।

সন্ধ্যের একটু আগে বিমান ইলার ঘরের দরজায় উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে দু'-একটা কথা বলাবলি কর্‌ছে। ইলার ঘরে দু'-তিনজন সহরের বিখ্যাত পাশকরা ধাত্রী তাদের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে ইলার মৃদু আর্ত্তনাদ বিমানের কানে আস্‌ছে আর বিমান ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ছে। ডাক্তারেরা বাইরের হলে দাঁড়িয়ে তাকে খুব উৎসাহ দিচ্ছে। সেও মনে মনে আঁকছে ছোট্ট একখানি মুখ ; ঠিক্ তারই মত চোখ-মুখ-নাক সবই আর তারই পাশে সলজ্জ হাসিতে ভরা আর একখানি মুখ, সেটা ইলার।

অনুকুল তাড়াতাড়ি এসে বিমানকে বল্‌লে, "বাবু, আমি একবার বাড়ী থেকে আস্‌ছি।"

বিমান যদিও বুঝলে এখুনি তাকে প্রয়োজন হ'তে পারে, তবুও না বল্‌তে পার্‌লে না; কারণ, তখনও অনুকূলের কোয়ার্টার হ'তে ক্ষীরোর মার গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে, "পাঁচ ছেলের মায়ের আবার এত চেঁচামেচি কেন বাপু। দাই আন্‌তে গেছে, তা তোমার একটু তর্ সইছে না, বাপ্‌রে বাপ্! প্রথম পোয়াতি হ'ত ত কথা ছিল।"

ইলার ঘরে হঠাৎ যেন একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ইলার আর্ত্তনাদও শোনা যাচ্ছে না। দরজার পর্দা সরিয়ে একজন 'নার্স' এসে একজন ডাক্তারকে ডাক্‌লে। ডাক্তার তাড়াতাড়ি ব্যাগ হাতে করে ঘরে ঢুকে পড়্‌ল। বাকী দু'-তিনজন ডাক্তারও বাইরে যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। বিমান তাড়াতাড়ি ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা কর্‌লে "কি হলো ডাক্তারবাবু, ছেলে না মেয়ে?" ডাক্তারেরা তাকে কিছু বল্‌বার আগেই নার্স এসে আবার কি ইসারা কর্‌লে। বাকী কয়জনও ইলার ঘরে ঢুকল। বিমান আর থাক্‌তে না পেরে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুক্‌তে যাচ্ছিলো, দরজার কাছে একজন নার্স তাকে বাধা দিলে, বিমান বাইরের হলে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌ল, মিনিট দশেক পরে ডাক্তার কয়জন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বিমান উৎসুকভাবে তাঁদের দিকে চাইতেই এক-জন বল্‌লে, "ভয় নেই বাবু, তোমার স্ত্রী নিরাপদ।" আর একজন বল্‌লে, "কেসটা খুব শক্ত হলেও ধাত্রীরা খুব ভালভাবেই প্রসব করিয়েছে।"

বিমান আনন্দে ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরে বল্‌লে "কি ছেলে হ'ল?"

একজন ডাক্তার তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলে, "বেটা ছেলে।"

অধীর আনন্দে বিমান বল্‌লে "আমার ছেলেকে আমি এখন দেখ্‌তে পারি ডাক্তারবাবু?"

ঘরের ভেতর থেকে তখন একজন নার্স তোয়ালে জড়িয়ে বিমানের ছেলেকে নিয়ে এসে বল্‌লে, "বাবু, আট মাসেই তোমার এ ছেলেটী মারা গিয়েছে। তোমার স্ত্রীর বরাৎ ভাল, তাঁকে বিশেষ কষ্ট পেতে হয় নি।"

বিমান তাড়াতাড়ি পাশের দেয়ালটা না ধর্‌লে ঘুরে পড়ে যেতো। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ডাক্তাররা নেমে গেল। ইলার ঘরের দিকে বিমান আস্তে আস্তে অগ্রসর হলো। ঘরের ভেতর তখন নার্সদের কথা-বার্ত্তা শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ ইলা চীৎকার করে উঠল, "আমার ছেলে—ওগো, আমার ছেলে তোমরা কোথায় নিয়ে গেলে!"

বিমান আর ঘরে ঢুক্‌লো না, বাইরে এসে দাঁড়ালো। অনুকূলবাবুর বাড়ীতে তখন ক্ষীরোর মা-র গলা শোনা যাচ্ছে, "মা গো মা, মাগীর আর দাই আস্‌তে তর্ সইলো না—আর মিন্সেও তেম্‌নি! হলেই বা বাপু তিন মেয়ের উপর আবার মেয়ে, তা বলে মেয়েটাকে দেখ্‌তে নেই বাছা!"

বড়দিনের উপহার

শ্রীমণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এক ডলার আর সাতাশী সেণ্ট। দিনের পর দিন এক পেনী করে জমিয়ে—শেষকালে এসে ঠেকছে কি না এই একটা ছোট সংখ্যায়। প্রায় তিনবার ডেলা গোনবার চেষ্টা করলে—কিন্তু এক পেনীও বেশী নেই। কাল বড়দিন আর আজ সে হাতে কেবল মাত্র এক ডলার আর সাতাশী সেণ্ট নিয়ে বসে আছে। ডেলা আর কিছু করতে না পেরে কোচের ওপর শুয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে—আর এ ছাড়া তার মত গরীবের করবারই বা কী ছিল?

বাড়ীর কর্ত্রী যখন এই অবস্থায়—আমরা এই অবসরে একবার বাড়ীর ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিই। মাসিক আট ডলার ভাড়ার একটা ছোটখাট ফ্ল্যাট—বেশ সাজানো-গোছানো। ঘরের ভেতর দেখলে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে কোন ধারণা করা খুব সোজা না হলেও কঠিন নয়। দারিদ্র্যের ছাপ ঘরের আশপাশে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

বাড়ীর দরজায় একটা চিঠি ফেলার বাক্স টাঙানো ছিল—কিন্তু তার ভেতর বর্ত্তমানে কোন চিঠি ফেলা হয় না—কারণ চিঠি উদরস্ত করবার অবস্থা তার নেই। বাক্সর ওপরেই একটা 'বেল' ছিল—কিন্তু কোন মানুষের পক্ষে তাকে বাজান সম্ভব ছিল না। সকলের ওপরে একখানা কার্ড আঁটা—তাতে লেখা বাড়ীর কর্ত্তার নাম—"জেমস্ ডিলিংহাম ইয়ং।"

ডিলিংহাম বংশের অবস্থা যখন ভাল ছিল—তার মানে মাসে যখন তাদের আয় হতো প্রায় ত্রিশ ডলার—তখন এতবড় গালভরা নামটা শোভা পেলেও—এখন যেকালে আয় কুড়ি ডলারে নেমে এসেছে, তখন নামটাও ছোট হওয়া দরকার। তাই যখন বাড়ীর কর্ত্তা জেমস্ ডিলিংহাম দিনের কাজ সেরে সন্ধ্যেবেলা তাঁর ঘরে এসে ঢুকতেন, তখন তাঁর স্ত্রী ডেলা তাঁকে আদর করে জিম বলে ডাকতো—স্বামী স্ত্রীর পক্ষে এই সময়টুকু ছিল অত্যন্ত মধুর।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর ডেলা কান্না থামিয়ে উঠে বসে একবার গালের ওপর পাউডার বুলিয়ে নিলে। তারপর জানলার ধারে দাঁড়াইতেই চোখে পড়ল একটা ধূসর রঙের বেড়াল বাগানের বেড়ার পাশ দিয়ে চলেছে—আর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—কাল বড়দিন আর আজ তার হাতে আছে মাত্র এক ডলার, সাতাশী সেণ্ট। এই ক'টা পয়সা দিয়ে সে জিমকে কী বা উপহার কিনে দেবে। মাসের পর মাস জমিয়ে এই তার ফল—আর কুড়ি ডলারের ভেতর থেকে কী-ই বা বাঁচানো যেতে পারে। চিরকাল যা হয়ে আসছে—আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী—এই অবস্থায় আর কত

জমতে পারে। কিন্তু তার প্রিয়তম স্বামী জিমকে সে ওই পয়সা দিয়ে কী-ই বা উপহার কিনে দিতে পারে। তার কত সুখময় মুহূর্ত্ত কেটে গেছে জিমের উপহারের কথা ভাবতে ভাবতে—তাকে এমন একটা কিছু দিতে হবে যা কেবল তার প্রিয়তম স্বামী জিমেরই উপযুক্ত।

ঘরের দেওয়ালে একটা আর্শী টাঙানো ছিল—সাধারণ আর্শী। একটা আট ডলারের ফ্ল্যাটে আর কত দামী আয়না টাঙানো থাকবে। অত্যন্ত রোগা কোন লোকের পক্ষে বহু কষ্ট করে তার ছায়া সেই আয়নায় দেখা সম্ভব। ডেলার শরীর এমন কিছু মোটা নয় আর সে বেশ ভালভাবেই সেই আয়নায় মুখ দেখবার কৌশলটা আয়ত্ত করেছে। হঠাৎ সে জানলা ছেড়ে এসে দাঁড়াল একেবারে আয়নায় সামনে—চোখে তার ফুটে উঠেছে একটা উজ্জ্বল জ্যোতি, কিন্তু মুখের ওপর পড়েছে একটা ধূসর ছায়া। তাড়াতাড়ি সে তার চুলের গোছাকে খুলে ছড়িয়ে দিলে।

এখানে বলে রাখি এই দম্পতীর দুইটী মহা গর্ব্বের বস্তু ছিল—একটী জিমের সোণার ঘড়ী—তার পিতৃ-পিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত—আর দ্বিতীয়টী ডেলার চিকন চুলের রাশি। যদি স্বর্গের রাণী এসে ডেলাদের বাড়ীর সামনে থাকত—তা হলে ডেলা জানলা দিয়ে তার চুল রৌদ্রে ঝুলিয়ে দিয়ে খুব সহজেই তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্য আর রূপকে লজ্জা দিতে পারত। আর স্বর্গের রাজা যদি তার সমস্ত রত্ন নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসতেন, তবে তিনিও জিমের ঘড়ী দেখে লোভে দাড়ী চুলকাতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ডেলার সুন্দর চিকন চুলের রাশি চারিদিকে তার পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ল—চুলে তার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে গেল। খানিকক্ষণ সে তার চুল নিয়ে খেলা করলে—তারপর তার মুখের ওপর ফুটে উঠল একটা আনন্দের রেখা—সে ছুটে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

ডেলা সোজা এসে দাঁড়ালো একটা দোকানের সামনে। ওপরে তার লেখা—"এখানে সকল রকম চুল পাওয়া যায়।" ডেলা বাড়ী থেকে এই পথটুকু ছুটে আসার দরুণ দোকানের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিলে, তারপর একেবারে যেখানে মোটা বুড়ী বেচাকেনায় ব্যস্ত, সেখানে গিয়ে বললে—"আমার চুলগুলো আপনি কিন্‌বেন ?"

বুড়ী উত্তর দিলে—"চুল কেনাই তো আমার ব্যবসা—তোমার টুপি সরিয়ে নাও—দেখি চুলের অবস্থা কী রকম।"

একটা মর্ম্মরধ্বনি করে চুলগুলো ছড়িয়ে পড়লো।

ক্ষিপ্রহস্তে চুল নেড়ে বুড়ী বললো—"কুড়ি ডলার দোব বাপু।"

ডেলা ব্যস্তভাবে বলে উঠলো—"কই, তাড়াতাড়ি দিন।"

তারপর দুটো ঘণ্টা যেন ফুলের পাখায় ভর করে এক-নিশ্বেসে উড়ে গেল। ডেলাকে দেখা গেল দোকানে ঢুকছে আর বার হচ্ছে।

এইবার সে খুঁজে পেয়েছে। ওঃ, এ জিনিষটা যেন জিমের জন্যেই তৈরী হয়েছে—আর কারও জন্যে নয়! সে এতগুলো দোকান খুঁজে এল, কিন্তু ঠিক এইরকমটী আর কোথাও দেখতে পায় নি। 'প্ল্যাটিনামে'র তৈরী একটা চেন—অত্যন্ত সাদাসিদে, কিন্তু সুন্দর—তার দাম তার আসল গুণে, নকল রূপে নয়। এমন কী চেনটা সেই বিখ্যাত ঘড়িতেও খাপ খাবে। এটা যদি জিমের জন্যে নাই হবে তো এত জিনিষের মধ্যে ওইটাতেই বা তার চোখ পড়ল কেন—আর কিনতেই বা এত মন চাইছে কেন? জিমের জন্যেই ওটা তৈরী হয়েছে। ডেলা তখনি সেটা একুশ ডলার দাম দিয়ে কিনে নিলে—তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল। ওঃ, এটা পেয়ে যে কোন জায়গায় জিম নিশ্চয় খুব তাড়াতাড়ি সময় দেখ্‌বে—আর আগের মতন পুরোণো 'চামড়ার বন্ধনী' বলে ঘড়ী দেখতে লজ্জা পাবে না।

ডেলা যখন বাড়ী ফিরে এল, তখন তার মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, তাই সে কল্পনা ছেড়ে বাস্তবে একটু মন দিলে। কাটার দরুণ চুলগুলো অত্যন্ত বেশী ছোটবড়

হয়েছিল। যদিও ভালবাসার জন্যে এটুকু ত্যাগ সামান্যই, তবু সভ্যতার খাতিরে সে সেগুলোকে কেটে-ছেঁটে থাকের পর থাক্ সাজিয়ে নিলে। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে তার মাথা আবার ছোট ছোট কোঁকড়ান চুলে ভরে উঠ্‌লো। তাকে তখন ঠিক একটী ছোট স্কুলের মেয়ের মতন দেখাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে ডেলা আয়নায় তার ছায়া দেখলে, মনে মনে বললে—"জিম যদি আমাকে প্রথমে দেখেই না মাথা গরম করে তো সে নিশ্চয় বলবে—আরে, তোমায় যে একেবারে ছোট খুকিটী দেখাচ্ছে: কিন্তু আমায় খুকীই হ'তে হ'ল—এক ডলার আর সাতাশী সেণ্ট নিয়ে আমি কী-ই বা করতে পারতাম।

তারপর সে রান্নায় মন দিলে—সাতটার মধ্যে কফি হয়ে গেল—চপ ভাজবার পাত্রটা ষ্টোভের ওপর বসান রইল—জিমের বাড়ী ফেরবার সময় হয়ে এল। জিম কখনও ফিরতে দেরী করে না। ডেলা চেনটা হাতে করে ঢোকবার দরজার পাশে একটা চেয়ার টেনে উন্মুখ প্রতীক্ষায় বসে রইল। কিছুক্ষণ বাদেই তার কাণে গেল—সিঁড়ির ওপর জিমের পায়ের শব্দ। কিন্তু সেই সময় আনন্দের বদলে তার মুখ সাদা হয়ে গেল—মনে মনে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে—"হে ঈশ্বর, জিম যেন আমায় আগের মত সুন্দর দেখে!"

দরজা খুলে জিম ঘরের ভেতর এল। তার সমস্ত শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত—বাইশ বছরের যুবকের ঘাড়ে সংসারের ভার পড়লে যা হয় আর কী। অভাবের তাড়নায় তার মুখে কালি পড়ে গেছে। এই শীতে তার না আছে একটা ওভারকোট—না একজোড়া দস্তানা। ঘরের ভেতর যন্ত্রচালিতের মত ঢুকে—সে প্রথমেই ডেলার দিকে চাইলে। জিমের চোখের ওপর এমন একটা জ্যোতি ছিল, যা দেখবামাত্র ডেলার প্রাণে কেমন ভয় হ'ল। সেই দৃষ্টিকে ঠিক ক্রোধ বা বিস্ময় বলা যায় না—না আছে তাতে অসন্তুষ্টির আভাস না বা ভয়ের চিহ্ন—সে দৃষ্টির সঙ্গে সে যে রকম কল্পনা করেছিল, তার কোন মিল নেই। জিম কিছুক্ষণ ডেলার দিকে সেইভাবে চেয়ে রইল।

ডেলা ধীরে ধীরে উঠে জিমের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তার চোখের কোণ বেয়ে নেমে এল অশ্রুর ধারা—সে আস্তে আস্তে বললে—"তুমি রাগ করো না জিম—অমন করে আমার দিকে চেও না—আমি কী করব বল—বড়দিনের এই উৎসবে তোমায় উপহার কিনে দোবার মতন একটা পয়সা ছিল না প্রিয়তম, তাই চুলগুলো কেটে বিক্রী করে দিয়েছি। তুমি কিছু ভেবো না—আমার চুল আবার হবে—তুমি তো জানই আমার চুল কত তাড়াতাড়ি বাড়ে। এস জিম, আমরা বড়দিনের জন্যে আনন্দ করি। তুমি জান না যে, তোমার জন্যে কী সুন্দর উপহার আমি এনেছি।"

জিম উদাসভাবে বললে—"কী বলছ, তোমার চুল কেটে ফেলেছ।" যেন সে সমস্ত ব্যাপার এখনও ঠিক বুঝতে পারে নি।

—"হ্যাঁ আমি সেগুলোকে বিক্রী করে দিয়েছি" ডেলা উত্তর দিলে।—"তোমার কী আমায় এখন ভাল লাগছে না।"

জিম একবার ঘরের চারপাশ দেখে নিয়ে বোকার মতন বললে—"তোমার চুলগুলো বেচা হয়ে গেছে?"

ডেলা একটু মিষ্টি করে বললে—"ওর জন্যে কিছু ভেবো না—যা হবার হয়ে গেছে—এস, এই বড়দিনের সময় একটু আনন্দ করি। এটা কেন ভুলে যাচ্ছ জিম, যে, আমার চুলগুলো হয়তো গোণা যেত, কিন্তু তোমায় যে আমি কত ভালবাসি তা কেউ বলতে পারে না। তাই আমার চুলের জন্যে কোন দুঃখ নেই প্রিয়তম—তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নাও—আমি চপগুলো ভাজি।"

জিমের যেন এইবার আচ্ছন্নভাব কেটে গেল। সে তাড়াতাড়ি ডেলাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে একটা চুমো খেলে। তারপর তার পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললে—"আমায় ভুল বুঝো না ডিল—তোমার চুল থাক বা না থাক তুমি আমার কাছে সেই আগের ডেলই আছ। কিন্তু তুমি ওই প্যাকেটের ভেতরকার জিনিষটা দেখলেই বুঝতে পারবে, কেন আমি একটু চুপ করে ছিলাম।"

তাড়াতাড়ি ডেলা প্যাকেটটা খুলে ফেললে—প্রথমে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হর্ষধ্বনি—তারপরই সে কেঁদে মাটীর ওপর লুটিয়ে পড়ল। প্যাকেটের ভেতর রয়েছে একটা কচ্ছপের খোলার চিরুণী—তার ধারগুলো পাথর বসানো। এই চিরুণীটা সে একটা বড় দোকানের 'শো কেসে' কতদিন দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে—তার পাবার আশা নাই বলে। কতদিন ভেবেছে তার চুলে ওই চিরুণী কি সুন্দরই না মানাবে। আজ সেই চিরুণী তার হাতে—কিন্তু যাতে সে ওই চিরুণী ব্যবহার করবে, সেই চুলগুলো আজ সে বেচে এসেছে। কিছুক্ষণ কাঁদবার পর সে চিরুণীটা নিয়ে উঠে বসলা—মুখে তার মৃদু পাণ্ডুর হাসি। তারপর জিমকে বললে—"ভয় নেই জিম, আমার চুল খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।"

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—তার উপহার এখনও জিমকে দেখানো হয় নি। তাড়াতাড়ি সে চেনটা বার করে জিমের সামনে মেলে ধরলে। চেনটা হাতের ওপর চক্‌চক্ করে উঠল। ডেলা তাড়াতাড়ি বললে—"কী সুন্দর দেখ জিম—অনেক ঘুরে একে কিনে এনেছি। দাও, তোমার ঘড়ীটা দাও দিকিনি—দেখি কী রকম মানায়।

কথা শুনতে শুনতে জিম কোচের ওপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে ম্লান হেসে বললে—"ডেল, আমাদের বড়দিনের উপহার দুটোকে একটু আলাদা করে রেখে দাও—ওদুটো এখনকার পক্ষে অত্যন্ত সুন্দর। কিন্তু আমি তোমার চিরুণী কেনবার জন্যে ঘড়ীটা বাঁধা দিয়েছি।" এই বলে সে ডেলাকে আস্তে আস্তে তার বুকে টেনে তার ঠোঁটের ওপর একটা চুমো এঁকে দিয়ে কাণে কাণে বললে—"এই আমাদের বড়দিনের শ্রেষ্ঠ উপহার!"*

---

* [উইলিয়াম্ সিডনী পোর্টার (ও' হেনরী) এর গল্প অনুসরণে]
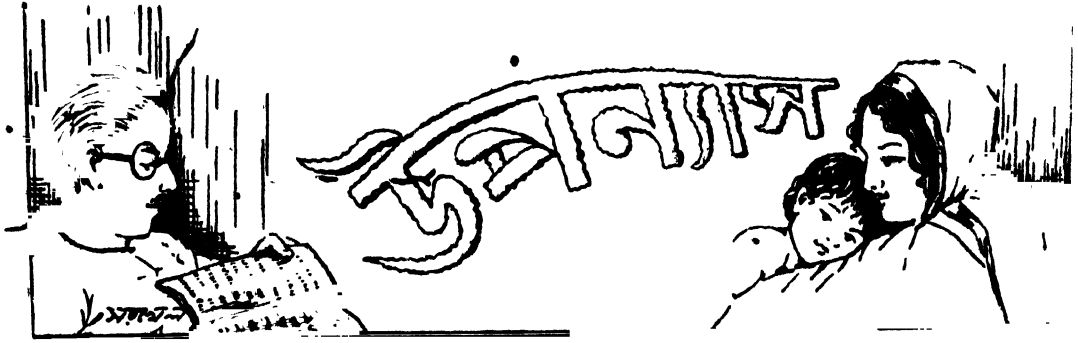
বিস্ময়

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্ব্বাভাস :—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন বীণার নামের সহিত সন্তোষের নাম যুক্ত হইয়া অনেক কথা উঠিয়া পড়িল। সন্তোষের ইহাতে বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না; কিন্তু বীণা কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না; এমন কি, ইহা যে একদিন উঠিবেই, ইহা যেন তাহার জানাই ছিল। এই বীণার স্বামী ধ্রুবেশ সন্ন্যাসী না হইয়াও গৃহত্যাগী; ঘরে তাহার মন নাই, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেই তাহার ভাল লাগে। সন্তোষের ধ্রুবেশের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা, তেমনই আবার ভক্তি। যে কথা লইয়া গ্রামে কানাঘুষা চলিতেছিল, তাহা অতুল চক্কোর্ত্তী সতীশ রায়ের পুত্রের পৈতার দিনে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে সন্তোষ যখন পরিবেশন করিতেছিল, তখন স্পষ্টভাবে তুলিয়া বসিল। সন্তোষ তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়া সে সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বীণা কিন্তু সন্তোষকে সেদিন কোন সান্ত্বনাই দিল না, বরং অতুল চক্কোর্ত্তী কিছু আর মিথ্যা বলে নাই বলিয়াই তাহার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। তারপর দিনের পর দিন সন্তোষকে বীণা প্রেমের অভিনয় করিয়া খেলাইতে লাগিল। সন্তোষ বীণার অভিনয় বুঝিতে না পারিয়া সত্যই একদিন তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। তখন বীণা আবার উল্টা গাহিতে সুরু করিল। স্বামীকে ফিরাইয়া পাওয়ার জন্য, গৃহের প্রতি তাহার মন বসাইবার জন্য সে নিজেকে এমন করিয়া কলঙ্কিত করিয়াছে মাত্র। অতুল চক্কোর্ত্তী এসব শুনিয়াছিল আবার চিনুর মায়ের কাছ হইতে। এই চিনুর মায়ের স্বভাব চরিত্র মোটেই ভাল ছিল না, আর গ্রামের লোক তাহা ভাল করিয়াই জানিত। সন্তোষের বন্ধু শৈলেশ সতীশ রায়ের বাড়ীর ঘটনার দিনে অতুল চক্কোর্ত্তীকে অপমান করিয়া বিদায় করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সতীশ রায়ের বড় মেয়ে তরুবালা তাহাতে বাধা দেয়, কাযেই সম্ভব হয় নাই। শৈলেশ সন্তোষকে ভালবাসিত সন্তোষের অভিনয়-দক্ষতার জন্য এবং বীণাকে সে সত্যই শ্রদ্ধা করিত। শৈলেশের স্ত্রী চৈতীও বীণাকে শ্রদ্ধা করিত, কিন্তু এই কলঙ্ক কেন জানি না সে অবিশ্বাস করিতে পারে নাই। শেষে শৈলেশের তাড়নায় অতুল চক্কোর্ত্তীকে একদিন গ্রাম ছাড়িতে হইল; কারণ, শৈলেশ আর সবার মত বীণার এই কলঙ্ক তখনও বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ধ্রুবেশের বড় ভাই নিখিলেশ কলিকাতায় চাকরী করিত। একদিন একথা তাহারও কাণে উঠিল। সে ছুটিয়া

দেশে আসিল ইহার বিহিত করিতে। কিন্তু বীণার শাশুড়ী জগত্তারিণী দেবী পুত্র নিখিলেশের সহিত একমত হইতে পারিলেন না। নিখিলেশ চাহিয়াছিল, মাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে, কিন্তু জগত্তারিণী দেবী স্বামীর ভিটে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে রাজী হইলেন না। নিখিলেশ ব্যর্থমনোরথ হইয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।—লেখক]

ঠিক যেমনটী ছিল, তেমনটি আর নাই।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই নিখিলেশ তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিল। তাহার পাণ হইতে চুণ খসিলেই প্রলয় বাঁধে এবং বাসায় রঘুনাথ ব্যতীত আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই বলিয়া ঝড়-ঝাপট্ যা' কিছু তাহারই উপর দিয়া বহিয়া যায়। প্রভুর এ স্বভাব রঘুনাথ প্রথম দিনই টের পাইয়াছিল। এই সব অতি তুচ্ছ ব্যাপারে প্রলয় দেখা রঘুনাথের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম মনে মনে সে প্রায়ই ভাবিত, খাটিয়াই যখন খাইতে হইবে, তখন কথা শুনিবে কেন? এ চাকরী ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ দেখিবার সংকল্পও সে বহুবার করিয়াছে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অনুতপ্ত প্রভু টাকাটা-সিকিটা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া নিমিষে তাহার সমস্ত সংকল্প ভাসাইয়া দিয়াছে।

রঘুনাথ খুব শান্ত মেজাজের লোক। সে এই দুই বৎসরে প্রভুর মেজাজের সঙ্গে নিজেকে এমন খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে যে, এখন প্রভুর শত তিরস্কারেও আর ছাড়িয়া যাওয়ার সংকল্প মনেও স্থান দেয় না।

অনাহারে অনিদ্রায় পথশ্রান্তিতে নিখিলেশ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে আবার ক্ষোভে দুঃখে অপমানে সে যেন জর্জ্জর হইয়া উঠিয়াছিল। এমন হইলে, দেহ বা মন কোনটাই বোধ করি কাহারও ভাল থাকে না। নিখিলেশের বিধ্বস্ত মস্তিষ্কে একেই আগুণ জলিতেছিল, তাহার উপরে সুশৃঙ্খলায় রাখিয়া যাওয়া জিনিষ-পত্র হাত পা না গজাইয়া উঠা সত্ত্বেও যেরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত পড়িয়াছিল, তাহাতে সে আর আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিল না।

রূঢ় কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, রঘুনাথ।

রঘুনাথ ত্রস্তে আসিয়া বলিল, রান্না চড়িয়ে দিয়ে এসেচি বাবু। হ'তেও তো সময় লাগবে, তা' কিছু পয়সা দিলে পরে খাবার এনে দিতাম। সেই ভাল হতো।

নিখিলেশের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। একটা ধমক দিয়া বলিল, বেটা উল্লুক কোথাকার! তোর মত মেড়োর বুদ্ধি নিতে তো তোকে ডাকি নি।

রঘুনাথ জাতিতে হিন্দুস্থানী। জীবনের কুড়ি বছরের মধ্যে বার বছর বাংলা দেশে কাটাইয়া দিয়া সে বাঙালী বনিয়া যাইতে একটুও কসুর করে নাই। সে কথাবার্ত্তায় চালচলনে পুরাদস্তুর বাঙালী। অপরিচিত নবাগতের কাছে সে নিজেকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু মেড়ো বলিয়া যদি কেহ তাহাকে অভিহিত করে, তাহা হইলে সে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণও হয় না। মোটের উপর জন্মগত জাতির ঘেরাও টপ্‌কাইয়া সে আর কোন জাতিতেই বাঁধা পড়ে নাই।

রঘুনাথ তাহার চিরাভ্যস্ত হাসি হাসিয়া বলিল, খিদে পেলে যে খেতে হয়, এতো সবাই জানে দাদাবাবু। একে কি আর বুদ্ধি দেওয়া বলে?

নিখিলেশ অধিকতর রাগোষ্ণ-কণ্ঠে বলিল, তুই থাম্ বল্‌চি। যা' বলি আগে তার উত্তর দে। আমার ঘরে কেউ এসেছিল কি?

রঘুনাথ একটা অপ্রত্যাশিত ভুলের জন্য বিশেষভাবে লজ্জিত হইয়া উঠিল। দ্বিধা ও সঙ্কোচের বাধা সচেষ্ট হইয়া কাটাইয়া উঠিয়া কোনরকমে কহিল, দাদাবাবু, বলতে ভুলে গেচি, ছোটদাদাবাবু এসেচেন যে।

নিখিলেশ অস্বাভাবিকরকম বিকৃত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কে ধ্রুবেশ?…পর মুহূর্ত্তেই আবার নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিল। ধ্রুবেশের আগমনই যেন সে এ কয়দিন একান্তভাবে কামনা করিতেছিল। তাহার অপ্রত্যাশিত আগমন-সংবাদে নিখিলেশের

কাছে অত্যন্ত জটিল ব্যাপারও মুহূর্ত্তে সহজ সরল হইয়া উঠিল। একটী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে নীরব হইয়া রহিল।

রঘুনাথ ছোট্ট একটি 'হু' বলিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, তারপর প্রভুকে মৌন দেখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল, সহসা নিখিলেশ তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিল, কবে এলো? কোত্থেকে এলো? এখন গেচে কোথায়? আবার আসবে কখন?

রঘুনাথ একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমে নিজেকে বিপন্ন মনে করিল। কিন্তু বিপদ যে কেমন করিয়া কাটাইয়া উঠিয়া সে উত্তর করিল, কাল সকালে এসেচেন—তাহা সে নিজেও ভাবিয়া পাইল না। নিখিলেশ কবে এলো ভিন্ন অন্য কোন প্রশ্ন করিয়াছে বলিয়াও তাহার মনে হইল না। সব কিছু তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা রঘুনাথের ছিল।

নিখিলেশ আবার বলিল, কোথায় গেচে? আসবে কখন?

এই কথাগুলির উত্তর যে ইতঃপূর্ব্বে দেওয়া উচিত ছিল, তাহা বুঝিয়াই রঘুনাথ সলজ্জভাবে কহিল, বেড়াতে বেরিয়েচেন, এখুনি ফিরবেন হয় তো।

নিখিলেশের দুর্ব্বল মস্তিষ্কে চিন্তার ধারা আবার নূতন করিয়া খেলিতে সুরু করিল। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সে যাহা ভাবিয়া অপার তৃপ্তি, বহুদিন অনাস্বাদিত আনন্দ, আকাঙ্ক্ষিত স্বস্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার ভাবিতে গিয়াই সে বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল, উত্তেজিত হইয়া উঠিল। চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, রঘুনাথ, তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে' ফেলা চাই। আমি একবার ঘুরে আসচি। আর ধ্রুবেশ যদি এরই মধ্যে এসে পড়ে তো তুই-ই তাকে বলে দিস্, আমার এখানে আর তার স্থান হবে না। পারবি তো?

রঘুনাথ পারিত কি না খুবই সন্দেহজনক; কারণ, তাহার ভাব-বিপর্য্যয় উল্টা সাক্ষ্য দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। পারার প্রয়োজনও তাহার হইল না; কারণ, ধ্রুবেশ নিজ কানেই তাহা শুনিল।

নিখিলেশ পশ্চাতে ফিরিয়া ধ্রুবেশকে দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল। মৃতের আবির্ভাবেও মানুষ হয় তো এমন করিয়া চম্‌কাইয়া উঠে না। নিখিলেশ সভয়ে পরিত্যক্ত চেয়ারটার হাতল চাপিয়া ধরিল।

ধ্রুবেশ অগ্রসর হইয়া অগ্রজের পায়ে প্রণাম জানাইয়া কহিল, এসে পড়ে' ভালই করেচি বড়দা', যা' বলতে হয়, করতে হয়, তা' তুমি নিজেই কর; আবার চাকর-বাকর দিয়ে কেন?

রঘুনাথ ধ্রুবেশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই লজ্জায় আরক্তিম মুখ নীচু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল।

নিখিলেশ একবার দৃষ্টি তুলিয়া সেই রঘুনাথ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শূন্য স্থানটা লক্ষ্য করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল; কিন্তু ধ্রুবেশের পানে না চাহিয়াই আবার দৃষ্টি নত করিল। চেষ্টা করিয়াও সে ধ্রুবেশের কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

ধ্রুবেশ আবার বলিল, স্থান আমার কোথাও হ'ল না; এখানেও যে হবে না, তার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কারণটা কি তা' জানা যায় না?

নিখিলেশ নীরবে একটা নিদারুণ আঘাত করিবার মত শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া লইতেছিল। পরে দৃঢ়-কঠিন-কণ্ঠে বলিল, আমাকে সমাজে বাস করতে হয়। কাজেই—বৌমা যা' না থাক্, সে সব অপ্রিয় আলোচনা। তোমাদের সঙ্গে একত্র বাস করতে গেলে সমাজে আমার মুখ তুলে দাঁড়াবার আর কোন পথ থাকবে না।

ধ্রুবেশ তাহার কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না এবং বীণা যে তাহাদের একত্র থাকার পক্ষে কি করিয়া বাধা জন্মাইল, তাহা জানিবার জন্য কোন আগ্রহও প্রকাশ করিল না। উত্তরে শুধু বলিল, সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার যদি আপনার একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে একত্র বাস করতেও তো আমি বলি না।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে কাটাইয়া দিল। তারপর

সে নীরবতা অসহ্য হইয়া উঠাতেই ধ্রুবেশ কথা কহিল, আচ্ছা, বীণার অপরাধ কি তা' শুনতে পাই না বড়দা' ?

নিখিলেশ বলিল, সে আমি স্পষ্ট করে' কিছু তোকে শোনাতে পারবো না। কিন্তু গাঁয়ে গেলেই তা' আর অজানাও থাকবে না।

—আচ্ছা থাক্ ; তার আর কোন প্রয়োজনই নেই বড়দা'। আপনি যা' ব্যবস্থা করতে চান, আমি তা'তেই রাজী আছি।

নিখিলেশ এত সহজে মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়া গেল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া জোর দিয়া কহিল, আমি চাই সম্পত্তি ভাগ করে' ফেল্‌তে।

ধ্রুবেশ এমন কিছু পূর্ব্বে হইতে ভাবিয়া না রাখিলেও বিস্মিত হইল না। বলিল, এ আর বেশী কথা কি ? আজই আমি রাত্রের গাড়ীতে বাড়ী চলে' যাচ্ছি, পরে যা' বন্দোবস্ত করবেন আমাকে জানবেন, তা'তেই আমি রাজী হব।

নিখিলেশ কোন কথা কহিতে পারিল না। তারপর ধ্রুবেশ যখন রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিয়া দিল যে, আজ রাত্রে সে বাড়ী যাইবে, ন'টার আগেই রান্না শেষ হওয়া চাই ; তখন নিখিলেশ মুখ তুলিয়া বলিল, আজ তা'হ'লে তোর কি করে' যাওয়া হবে ?

বাধা থাকলে অবশ্য হবে না বলিয়া ধ্রুবেশ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণে রঘুনাথ উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, দাদাবাবু, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, চান করে' আগে চারটি খেয়ে নাও।

একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় ভৃত্য রঘুনাথের বুকটাও কাঁপিয়া উঠিল।

নিখিলেশ বলিল, আচ্ছা তেল নিয়ে আয় তো।

ক্রমশঃ

ভূকম্প

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মজঃফরপুর। ঘটনাস্থল 'কল্যাণী'র একটি ধ্বংসাবশেষ বাড়ী। বাড়ীটি প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত। একদিকের একটি কক্ষের তিন পার্শ্বের প্রাচীরের খানিকটা করিয়া উঁচু হইয়া আছে। তাহারই উপর ত্রিপল খাটাইয়া কোনপ্রকারে মাথা গুঁজিয়া আছে এক তরুণ দম্পতী। রূপেশ বয়সে নবীন—প্রফেসর। সবিতার বয়স উনিশের উপর হইবে না; তবে বয়স অপেক্ষা তাহাকে কিছু ছোটই দেখায়।

ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে পনের-ই—আজ পঁচিশ-এ। রূপেশের মাথায় আঘাত লাগিয়াছিল, এখন তাহাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সবিতা বাহিরে কোন আঘাত পায় নাই—পাইয়াছে মনে। তাহার একমাত্র শিশুপুত্র মণ্টু ওই ভগ্নস্তূপের মধ্যে সমাধিলাভ করিয়াছে। বেদনায় সবিতার সর্ব্বাঙ্গ অবশ অসাড় হইয়া গিয়াছে। পরণে তাহার একখানা মলিন আটপৌরে শাড়ী, কিন্তু গায়ে ছিল অনেকগুলি অলঙ্কার।

একটা দড়ির উপর রহিয়াছে দুই-চারখানা কাপড়, একটি পিতলের তোবড়ান ঘড়া, পাশাপাশি দুইটা খাটিয়া, বিছানার মধ্যে দু'খানা করিয়া কম্বল, একপার্শ্বে একটা ভাঙা টিনের বাক্স। তাহার উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছিল সবিতা। পার্শ্বে রূপেশ প্রাচীরের গায় দেহের ভার রাখিয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখের জল তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। দূর হইতে মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল ক্ষুধার্ত্ত, নিরাশ্রয়, সর্ব্বহারাদের করুণ আর্ত্তনাদ। পূর্ব্বে যেখানে ছিল প্রাঙ্গণ, এখন সেখানে হইয়াছে পথ। সেই পথ দিয়া মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করিতেছিল বিধ্বস্ত মজঃফরপুরের নিরাশ্রয় কয়েকটী নরনারী। দুই-একটি অনাথ বালক, 'রিলিফ-সঙ্ঘে'র দুই-চারিজন স্বেচ্ছাসেবক।

সবিতা তেমনি নীরবে কাঁদিতেছিল। রূপেশ পার্শ্বে আসিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ডাকিল—সবিতা!

সবিতা কোন কথা কহিল না।

রূপেশ—সবিতা! সবিতা!

সবিতা তেমনি পড়িয়া রহিল। রূপেশ আসিয়া বসিল সেই ভাঙা বাক্সের একপার্শ্বে। সবিতার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সে বলিল—সবিতা—সবিতা!

চক্ষু তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া সবিতা কহিল—আমার খোকা! আমার মণ্টু সোনা!

রূপেশ—স্বর্গে!

সবিতা—খোকা—খোকা আমার!

রূপেশ—কেঁদ না সবিতা! কি হবে কেঁদে! বুক বাঁধ—সহ্য কর!

সবিতা—সহ্য কর—সহ্য কর—বলে দাও তুমি কি করে সহ্য করি—কেমন করে সহ্য করি?...আমি দেখে এসেছিলাম সে খেলা কচ্ছিল—মুখে তার লেগেছিল আনন্দের হাসি, পশমের মত চুলগুলো তার মুখের উপর এসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। সে খেলছিল নেচে নেচে; আমায় দেখে নাচতে-নাচতেই ছুটে এল। আমি তাকে বুকে নিয়ে চুমু খেলাম; সে তার ছোট ছোট হাত দুটো দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে বল্‌ল—খেলবে মা, খেলবে আমার সঙ্গে? আমি তাকে আদর করে বলে এলাম—তুমি খেল মণ্টু, আমি কাজ করি গে···কেন আমি তাকে নিয়ে এলাম না বুকে করে—কেন এলাম না!—

বাহির হইতে নারীকণ্ঠের ক্রন্দন শুনা গেল।

রূপেশ—ওই শোন সবিতা, আজ কত মা কাঁদে। খোকা ত আজ একটি যায় নাই, গেছে শত শত। তাদের

মায়েদের বেদনার কথা ভেবে তুমি তোমার মন বাঁধ সবিতা।

স্বামীর কথা কানে না দিয়াই সবিতা বলিল—তার যদি অসুখ হ'ত, রোগের যন্ত্রণায় সে যদি কেঁদে উঠত - তার সেই যন্ত্রণা-মাখা কাতর মুখখানায় আমি বারবার চুমু খেতাম, তার সেবা করতাম, শুশ্রূষা করতাম—সহরের বড় বড় ডাক্তার ডেকে আনতাম। তারপরও যদি ভগবান তাকে তাঁর কাছে ডেকেই নিতেন, আমি হয় ত এমনই কাঁদতুম, কিন্তু তাতে যে আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেবার কিছু খুঁজে পেতাম।

রূপেশ—খোকাকে ভগবানই ত ডেকে নিয়েছেন সবিতা।

সবিতা—নিয়েছেন, কিন্তু এ কি নিদারুণ নেওয়া! উঃ!—

রূপেশ পত্নীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহ-বিগলিত স্বরে ডাকিল—সবিতা!

সবিতা—গৃহ কেঁপে উঠ্‌ল, বুঝতে পারলাম না। যখন বুঝলাম যে এ ভূকম্প—খোকার কথা মনে হ'ল—ছুটে এলাম গৃহের দ্বারে। কিন্তু আমি ত ঢুকতে পারলাম না সেই ঘরে…পারলাম না মণ্টুকে আমার বুকে করে নিয়ে আসতে। ভেঙে পড়ল ঘরের ছাদ—ভেঙে পড়তে লাগল দেওয়ালগুলো—ইটের পর ইট এসে জমা হ'তে লাগল—সেই স্তূপের মাঝে খোকা আমার কোথায় লুকিয়ে গেল!…

রূপেশ—কলেজে ছিলাম। পৃথিবী কাঁপতে লাগল, সে কি কাঁপন! প্রকৃতির সে কি উদ্দাম খেলা!…ছুটলাম বাড়ীর পানে। বারবার মনে হ'তে লাগল তোমাকে আর খোকামণিকে। কেবল ভগবানকে ডাকতে ডাকতে ছুট্‌তে লাগলাম। পথের দু'পাশের বাড়ীগুলো ভেঙে পড়তে লাগল—যেন বালির ওপর তাসের ঘর। পায়ের নীচে মাটি কাঁপে, তারই মাঝে গুরুগুরু শব্দ হয়। চোখের সামনে মাটীতে ধরল চিড়, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তার পরিধি হ'তে লাগল বিস্তীর্ণ, আর সেই ফাটল দিয়ে উঠ্‌তে লাগল তপ্ত জল, উঠ্‌তে লাগল কাদা, উঠ্‌তে লাগল বালি—বেরুতে লাগল বিধাত্রীর বিষাক্ত বমন… আমার ছোট বাড়ী তখন প্রায় ভেঙেই পড়েছে। উন্মাদের মত সেই ভাঙা বাড়ীর দ্বারে এসে দাঁড়ালাম। ডাকতে লাগলাম—মণ্টু, মণ্টু! চীৎকার করে ডাকলুম—সবিতা, সবিতা!…খোকাকে পেলাম না, এই ঘরের ছাদ তখনও পড়ে নাই, ওই ঘরে যাবার দ্বারের সম্মুখে তুমি ছিলে মূর্চ্ছিতা হয়ে। যে মুহূর্ত্তে তোমাকে বুকে তুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম, সেই মুহূর্ত্তেই ভেঙে পড়ল ঘরের ছাদ। একখানা ইট ঠিক্‌রে এসে লাগল আমার কপালে। তারই রক্তে তোমার গা ভিজতে লাগল। তোমাকে কেবল বুকে চেপে ধরে বলতে লাগলাম—ভগবান, এ কি তোমার নিঠুর লীলা!

সবিতা—ও গো, কেন আমায় আনলে ঘরের বাইরে! আমার যে আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না…আমি যেতুম সেইখানে—যেখানে আমার মণ্টু গেছে! সেই হ'ত ভাল—ওগো সেই হ'ত ভাল!

রূপেশ—কিন্তু আমি কি নিয়ে সংসারে থাকতুম; তোমাদের দু'জনকে হারিয়ে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকতুম—কেমন করে বাঁচতুম সবিতা!

সবিতা কোন কথা কহিল না, নীরবে কাঁদিতে লাগিল। রূপেশ বলিতে লাগিল—দুঃখ ভোল সবিতা! বিধাতা দিলেন যে আঘাত, সে আঘাত ত আমাদের সইতেই হবে।

সবিতা—তুমি ত মা নও – এ আঘাত যে কি আঘাত তুমি ত তা' বুঝবে না · তুমি বুঝবে না!

রূপেশ—মায়ের ব্যথা বুঝি সবিতা। কিন্তু ব্যথা ত আমারও কম নয়। সে আমার পুত্র, আমার রক্তের সে একটি ধারা, আমারই ভবিষ্যৎ সে। কিন্তু কি করব! বিধাতা দিয়েছিলেন—নিলেনও তিনি। কার ওপর অভিমান করব, কার কাছে নালিশ করব এর জন্য!… সবিতা!

সবিতা—বল।

রূপেশ—সারাদিন ওইখানে ওইভাবে পড়ে আছ। আমি আর পারছি না সবিতা—পারছি না আর তোমার

দিকে চাইতে! ওঠ লক্ষ্মী, একবার উঠে দাঁড়াও। সে আমাদের কেউ ছিল না—এসেছিল শত্রু হয়ে—গেছে. যাক্! কি হবে শত্রুর কথা ভেবে সবিতা?

সবিতা (উদভ্রান্তের মত)—ওই ঘরে—ওই ঘরে—দেখ, তুমি ত বল্‌লে বিধাতার খেয়াল—ইটের স্তূপের মধ্যেও শিশু বেঁচে থাকে। দেখ না ইটগুলো সরিয়ে—সেও ত বেঁচে থাকতে পারে—পারে না? (সেইদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া) শোন।

রূপেশ—বল।

সবিতা—দেখ, রোজ রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখি...তুমি দেখ না?

রূপেশ—কিসের স্বপ্ন সবিতা?

সবিতা—খোকার—আমার খোকার!

রূপেশ অশ্রু গোপন করিতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

সবিতা—তুমি দেখ না। কিন্তু আমি দেখি। দেখি, রোজ রাত্রে সে আসে। এসে বলে, মাগো, পাষাণের চাপে দম যে আমার আট্‌কে গেল! এখানে বাতাস নাই, আলো নাই—আমি যে আর নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না মা! আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাও আলোর রাজ্যে! অন্ধকার আমায় গ্রাস করে ফেল্‌ল মা গ্রাস করে ফেল্‌ল! ...ও গো, কাউকে কি পাওয়া গেল না! তোমার বন্ধু যারা, তাঁরাও কি এসে ওই ইটের পাহাড় ভেঙে ফেলতে পাবেন না?

রূপেশ—সবিতা!

সবিতা—কি?

রূপেশ—সবিতা!

সবিতা—বল গো!

না বলিয়া আর উপায় নাই এইভাবে রূপেশ কহিল—তারা—তারা ত এসেছিল।

সবিতা—কারা?

রূপেশ—আমার বন্ধুরা।

সবিতা—এসেছিলেন?

রূপেশ—হ্যাঁ।

সবিতা—কবে? কখন?

রূপেশ—ভূকম্পের পরক্ষণেই; তোমার মূর্চ্ছা তখনও ভাঙে নাই।

সবিতা—এসেছিলেনই যদি, তবে কেন তাঁরা এলেন না আমার মণ্টুকে উদ্ধার করতে? কেন তুমি তাঁদের বল্‌লে না একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে?

রূপেশ—চেষ্টা তারা করেছিল।

সবিতা—তবে—তবে? তবে কি খোকাকে পাওয়া গেল না?

রূপেশ গিয়েছিল।

সবিতা—গিয়েছিল?

রূপেশ—হাঁ।

সবিতা—খোকাকে?

রূপেশ—না।

সবিতা—না?

রূপেশ—না। পায় নাই তারা আমাদের মণ্টুকে, তারা পেয়েছিল—

সবিতা—কি?

রূপেশ—তার কঙ্কাল!

সবিতা—উঃ! বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রূপেশেরও চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

বাহির হইতে নারীকণ্ঠের ক্রন্দন ভাসিয়া আসিল—আমার সোনা আমার মাণিক—আমার রতন।

সবিতা—কে—ওকে কাঁদে?

রূপেশ—কাঁদে মা।

সবিতা—মা? কার মা—ও কার মা?

রূপেশ—মণ্টুর মত আর এক মণ্টুর।

সবিতা—উঃ! (কাঁদিতে লাগিল)

বাহির হইতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল বহুজনের বিলাপ—খেতে দাও—এক মুঠো খেতে দাও!

সবিতা সেইদিকে চাহিল।

—জল—একটু জল—প্রাণ যায়!

সবিতা দুই হাতে চোখ ঢাকিল।

—আশ্রয়—একটু আশ্রয়!

রূপেশ—সারা বিহার জুড়ে উঠেছে আজ এমনি হাহা-কার। যারা চলে গেছে, বেঁচে গেছে তারা ; কিন্তু রইল যারা, আজ শুধু ক্রন্দনই তাদের সম্বল। এমনি করেই শুধু কেঁদে তারা বলে—আহার দাও—আশ্রয় দাও—বস্ত্র দাও! কিন্তু দেবে কে? দেবার মত কে আছে আজ বিহারে?

বাহিরে পুনরায় বহুজনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল—চোর—চোর—ধর—ধর—পুলিশ - পুলিশ—পালিয়ে গেল—পালিয়ে গেল—ধরা গেল না—উঃ, ব্যাটা ইট ছুঁড়তে ছুঁড়তে সরে পড়্‌ল!

সবিতা—চোর? এই দুর্দ্দিনের মাঝেও আসে চোর?

রূপেশ—দুর্দ্দিনই ত হয়ে উঠে তাদের কাছে সুদিন।

সবিতা—কিন্তু তাদের মনে কি একবারও দ্বিধা হয় না! হাত কি তাদের একবারও কাঁপে না! মানুষ তারা?

রূপেশ—মানুষ নয় সবিতা, অমানুষ—সত্যই তারা অমানুষ।

ধীরে ধীরে আকাশে মেঘ করিতেছিল। ক্রমে সেই মেঘ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। সেই শীতের দিনে বহিতে লাগিল ঠাণ্ডা বাতাস। বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। গুরুগুরু মেঘ ডাকিতে লাগিল। অবশেষে এক সময় নামিল বৃষ্টি। উন্মুক্ত প্রান্তরে যাহারা এতদিন ধরিয়া কাপড় টাঙাইয়া ত্রিপল খাটাইয়া সামান্য কিছু খড়ের ছাউনি দিয়া কোনপ্রকারে দিন কাটাইতেছিল, এই বৃষ্টি-বাতাসে তাহাদের করিয়া দিল উদ্‌ভ্রান্ত। শিশুরা উঠিল কাঁদিয়া, মেয়েদের চোখে দেখা দিল অশ্রু, পুরুষেরা নিঠুর বিধাতাকে স্মরণ করিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

সবিতা—কোন্ পাপে বিহারের এই শাস্তি! কিসের জন্য বিহারের আজ এই অকাল মৃত্যু!

রূপেশ—কি পাপ—কার সে পাপ জানি না। কিন্তু আজ মনে প্রশ্ন জাগে। ইচ্ছে হয়, ডেকে জিজ্ঞাসা করি—হে দেবতা! তুমি কি পাষাণের দেবতা? পাষাণ - দেবতা হয়েছেন আজ পাষাণে রূপান্তরিত সবিতা!

আবার বাহিরে গণ্ডগোল উঠিল। নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ—বহুজনের কলরব শুনা গেল।

—মা—মাগো!

—ধর—ধর—মার ব্যাটাকে - একেবারে মেরে ফেল।

—উঃ, উঃ! না, আর মের না, তোমাদের পায়ে ধরছি! এ কাজ জীবনে আর আমি করব না! দোহাই তোমাদের, ছেড়ে দাও আমাকে!

—না ছাড়িস না। আজ ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে,—নারীর উপর যারা অত্যাচার করতে যায়, তাদের এমনিই সাজা হয়।

—মা, মা, তুমিই আমার মা, তুমি আমাকে রক্ষা কর! আমার প্রাণ যায়—

—দে ছেড়ে। মা ব'লে ডেকেছে, তবে দে ব্যাটাকে ছেড়ে।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ সবিতা বলিল—পশু পশু মানুষ আজ হয়েছে পশু। হোক্ তাদের শাস্তি, দিন বিধাতা তাদের অভিসম্পাত। করুণা ত তারা চায় না, তারা চায় অভিশাপ, তারা চায় মৃত্যু।

বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছে। আকাশও বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। সবিতা আর কোন কথা কহিল না। রূপেশও নীরবে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে সে সবিতাকে ডাকিল—সবিতা!

সবিতা—কি?

রূপেশ—চল সবিতা, এই অভিশপ্ত দেশ ছেড়ে। জীবনের শ্রেষ্ঠ যে সম্পদ ছিল, হয়ে গেছে তার বিসর্জ্জন! আর কিসের মোহে থাকব এ দেশে—কি হবে থেকে?

সবিতা—যাবে?

রূপেশ—হ্যাঁ, চল। তুমি ত আর এখানে থাকতে পারবে না—বন্ধন গেছে যে ছিন্ন হয়ে! এবার চল ফিরে আবার সেই পল্লী-মায়ের কোলে।

সবিতা—তাই চল। সত্যই, থাকতে আর পারব না এখানে। চল, দেশেই ফিরে যাই।

দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে সবিতা আবার কহিল—শোন।

রূপেশ—বল।

সবিতা—যাবার আগে পার যদি আমায় কিছু ফুল এনে দিও। আমি ওইখানটায় ছড়িয়ে দেব সেগুলো।

তারপর জেলে দেব একটা প্রদীপ। এখানে তাকে একলা ফেলে আমরা দু'জনে যাব চলে—যাবার আগে একটা আলোও রেখে যাব না?

সবিতার দুই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। রূপেশেরও চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। বাহিরে শোনা গেল গান—কর্ম্মীরা ভূকম্পের গান গাহিয়া ফিরিতেছিল। দেশের যাহারা বাঁচিয়া আছে, যাহাদের সামর্থ্য আছে—তাহারা দিতেছিল অর্থ, দিতেছিল বস্ত্র। সামর্থ্য যাহাদের ছিল না—তাহারা দিতেছিল সহানুভূতি, দিতেছিল অশ্রু।

সবিতা একে একে গায়ের সমস্ত গহনাগুলি খুলিয়া স্বামীর হাতে দিয়া কহিল—ওদের ডেকে আন—ডেকে এনে দাও এই গয়নাগুলো। কি হবে আর এসব নিয়ে! আমার সত্যিকারের সোনাই যখন গেল চলে—তখন এ মিথ্যা সোনা নিয়ে কি করব আমি! ওদের হাতে তুলে দাও এইগুলো। এতে যদি বেঁচে ওঠে আমার মণ্টুর মত আর কোন মণ্টু—তাতেই আমি সুখী হব—তাতেই আমি তৃপ্তি পাব! আর—আর—

রূপেশ—আর?

সবিতা—আর হয় ত—হয় ত এতেই তৃপ্ত হবে আমাদের সেই দেবতা···

রহস্যের রঙমহল

দানের প্রতিদান

শ্রীবাসব বর্ম্মা

পুলিশ-সাহেব আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এ চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ একটি সুন্দর উপহার। কে বা কাহারা পাঠাইয়াছে, তাহার কোন নিশানা নাই; কোন্ পথে কি ভাবে আসিয়াছে, তাহারও নিরাকরণ হইতেছে না; অথচ, সম্মুখের উপহার আধারটি বড় সুস্পষ্ট —তাহাকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

মিসেস্ হোম্ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। প্রাতের স্নিগ্ধ শীতল বায়ু তাঁহার অটুট স্বাস্থ্যের কমনীয়তায় যে মাধুরিমা লেপিয়া দিয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়।

প্রবেশ-পথে ভৃত্যগণের শঙ্কিত মুখ দেখিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন, আজ অঘটন কিছু ঘটিয়াছে; তাই ভ্রমণ বেশ পরিবর্ত্তনের অবসরমাত্রও না লইয়া তিনি স্বামীর কক্ষের দিকে পা বাড়াইলেন।

মিষ্টার হোম্ গম্ভীর-মুখে উপহার আধারটির সম্মুখে বসিয়া ক্রোধে ফুলিতেছিলেন। পত্নীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "দেখেছ গেরো, এমন ঘুমন্ত চাকর-বাকর নিয়ে আমি কি করি বল ত?"

মিসেস্ হোম্ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এটা তাদের অপরাধ বটে; কিন্তু এ ছাড়া যখন লোকই পাওয়া যায় না, তখন কি আর করবে? ওদের দিয়েই—কি সুন্দর!"

চক্ষু ঘুরিয়া উপহার-বস্তুটীর উপর পড়ায় মিসেস্ হোম্ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

মিষ্টার হোম্ গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক ওই জিনিষটাই আমায় ক্ষেপিয়ে তুলেছে লিলি। আমি জান্তে চাই, এ পাঠানর কর্ত্তা কে?"

লিলি হাসিয়া বলিলেন, "কেন তা'কে কি ফাঁসি-কাঠে চড়াবে, না যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—"

মিষ্টার হোম্ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, তাই তাদের ব্যবস্থা। উপহার পাঠিয়ে যারা হাত করতে চায়, তাদের অভিসন্ধি একেবারে ভাল হ'তে পারে না। বিশেষ তারা যখন আত্মগোপনের এতদূর প্রয়াস পেয়েছে।"

মিসেস্ হোম্ হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "পুলিশ-লাইনটা মানুষকে এমনি সন্দেহপ্রবণ ক'রে তোলে বটে! কোন অজ্ঞাত বন্ধুর পরিহাস যে এটা নয়—"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই পুলিশ-সাহেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বন্ধু! তাই খুনীলাস পাঠিয়ে তামাসা করেছে, কি বল? মড়া উপহার যে বন্ধু পাঠায়, তার রসিকতা যত বড়ই সুষ্ঠু হোক্, আমি তা'কে খুনী পদবী ছাড়া আর কোন আখ্যাই দিতে রাজী নই।

মিসেস্ হোমের মুখ সহসা সান্ধ্য তিমিরে ঢাকিয়া গেল; তিনি বলিলেন, "খুনীলাস! বল কি?"

ফুলের ভিতর হইতে একটী রৌপ্যাধার টানিয়া বাহির করিয়া হোম্ সাহেব বলিলেন, "এই দেখ।"

স্বামী বা স্ত্রীর মুখে আর কোন ভাষা ফুটিল না; উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠিক এই সময় সহাস্য-মুখে তরুণ ডিটেক্‌টিভ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মুখে প্রশান্ত হাস্য, চক্ষে তীক্ষ্ণবুদ্ধির অকপটলীলা, দেহে চাঞ্চল্যের লেশমাত্রও নাই।

দম্পতী অকূলে যেন কূল পাইলেন।

সব শুনিয়া তরুণ পকেট হইতে একটা 'ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস' বাহির করিয়া পরীক্ষায় নিযুক্ত হইল—শবাধারের প্রত্যেকটী কোণ, বাহিরের প্রত্যেক অলঙ্কৃত অংশ, উপরের পুরু ঢাকন কাঁচখানি, পুষ্পগুচ্ছের প্রত্যেকটী

ফুল, বিশেষ করিয়া শবের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ঝাড়া একঘণ্টা পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিষ্টার হোম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা' হ'লে—"

তরুণ সহাস্য-মুখে বলিল, "যদিও সূত্র কিছুই পাচ্ছি না, তবু কেস্টা আমি হাতে নিলুম।"

এস্ পি হোম্ স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত শবাধারের একদিকে হাত দিয়া বলিলেন, "কেন এটা?"

তরুণ হাসিল; বলিল, "জে কে', ওটা সম্পূর্ণ বাজে; আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্তে দেওয়া। হ্যাঁ, আপনার ভগ্নী থাকেন কোথায়?"

পুলিশ-সাহেব বিস্মিত নয়ন তুলিয়া বলিলেন, "তার সঙ্গে এর—"

বাধা দিয়া তরুণ বলিল, "কর্ত্তব্যের খাতিরে আপনাকে জানাচ্ছি, কথায় বাধা দেবেন না; শুধু জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে যান।"

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া মিসেস্ হোম্ বলিলেন, "ও নেলি, সে সাহেবের ভগ্নী নয়, আমার ছোট বোন্।"

দুই

বাসায় আসিয়া তরুণ একখানি পত্র পাইল—

"তরুণ গোয়েন্দা, তুমি চতুর জানি, কিন্তু তোমার উপরেও চাতুরী খেলিবার লোক পৃথিবীতে আছে। নিরস্ত হও, পারিতোষিক পাইবে।

জে কে।"

তরুণ স্বল্প একটু হাসিল মাত্র। পত্রখানি কিন্তু যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল। পত্রের একপার্শ্বে একটী পিস্তল চিহ্নিত; অন্যপার্শ্বে মিত্রতার পরিচয়-চিহ্ন করমর্দ্দনের চিত্র দেখিয়া তরুণ আর একবার মৃদু হাস্য করিল।

পাচক ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার দেব বাবু?"

তরুণ ফিরিয়া বলিল, "ও, বেলা হ'য়ে গেছে, না। আচ্ছা রোসো, স্নান সেরে আসি।"

বিদেশে স্রোতের জলে স্নান তরুণের নিত্য অভ্যাস। নদীও কাছে। গামছা এবং সাবান হাতে সে বাহির হইয়া গেল।

নদী প্রশস্ত নয়, কিন্তু খুব খরগতি। একধারে একখানা জেলেদের নৌকা বাঁধা। কিছু দূরে উচ্চ জমির উপর কয়েকটী গাছ। গত বন্যায় তাহাদেরই একটী সমূলে উৎপাটিত হইয়া নদী-গর্ভে আসিয়া পড়িয়াছে। নদী কি জানি কেন নিজের এতবড় অপকীর্ত্তির অপসারণ করে নাই; গাছটা এখনও ঠিক পূর্ব্ব অবস্থায় নদী-গর্ভে পড়িয়া আছে।

তরুণ নিত্য তাহারই উপর কাপড় রাখিয়া স্নানে নামে; আজও তাহার কোন ব্যতিক্রম হইল না। স্নান সারিয়া তীরে উঠিয়া কি দেখিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। একদিকে একখানা শানিত ছুরিকা-সহ একটা কার্ত্তুজ পূর্ণ পিস্তল; অন্যদিকে একটী মল্লিকা ফুল। কে রাখিয়া গেল এ সব?

সতর্ক-দৃষ্টিতে তরুণ চারিদিকে চাহিল। দূরে একজন অন্ধ ভিখারী গান গহিতেছিল। নিত্যই গায়। কাজেই তাহাকে সন্দেহ করিবার কারণ কিছুই ছিল না। তরুণ গম্ভীর-মুখে বাড়ী ফিরিল, অবশ্য অস্ত্র দুইটি সঙ্গে লইতে ভুলিল না।

আহার শেষ করিয়া তরুণ নিজের হাত-বাক্সটা গুছাইতেছে, হঠাৎ এক টুকরা পাথর গবাক্ষ-পথে তাহার সম্মুখে পতিত হইল। পাথরের গায়ে সুতা দিয়া বাঁধা একখানা কাগজ। তরুণ খুলিয়া পড়িল—

"তা' হ'লে যুদ্ধ। আচ্ছা, আমিও প্রস্তুত।"

বিদ্যুৎগতিতে তরুণ বাতায়ন-পার্শ্বে আসিল; কিন্তু— কই কাহাকেও ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এ কি অদ্ভুত রহস্য! বাড়ীটার সেই দিক্টায় দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। মাঠে লুকাইবার স্থান ত কোথাও নাই—তবে?

তাহার সে প্রশ্নের উত্তর আসিল একটা গুলিতে। তরুণ চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া চলিল। লোকটা নিকটে কোথাও থাকিয়া তাহার উপর খরদৃষ্টি রাখিয়াছে; অথচ, কোথায় সে?

হাতবাক্স গুছান ফেলিয়া তরুণ একমনে ভাবিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে হস্তলিখিত একখানা মোটা খাতা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি পাতা উল্টাইতে লাগিল। তারপর বিরক্তির সহিত সেখানা ফেলিয়া

রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ-চোখে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের চিহ্ন।

হঠাৎ তাহার ধূমায়িত মস্তিষ্কের এককোণে কৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়া যেন কিছু আলোকের উদ্ভব হইল। চঞ্চল চরণে সে গৃহ ছাড়িয়া পথে নামিয়া পড়িল।

"ওগো! এত কুড়েমি ভাল নয়, ওঠ, মোটব'য়ে ক্ষেপে দশটাকা পেলে, সে পয়সা ত মদে ফুকে দিলে, এখন সংসার চলে কিসে?"

কথা কয়টা হয়ত খুব সামান্য, কৌতুহল উদ্দিপ্ত করিবার মত কোন কিছুই নাই, তথাপী তরুণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিল; সে পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিছু দূরে একজন মদ্যপকে এক তরুণী হাতে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে দেখিতে পাইল।

অতি নিকটে আসিয়া সে ভাল মানুষটীর মত বলিল, "হ্যাগা এখানে মুটে পাওয়া যায় না?"

তরুণী ফিরিয়া বলিল, "আছে বাবু! এরাই মুটে, কোথায় যেতে হবে?"

তরুণ মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিল, "দেখ, আমি পাড়া-গেঁয়ে লোক, সহরের পথ ঘাট তেমন চিনি না। চাকরী করব বলে এখানে এসেছি, পুলিশ সাহেবের হাতে চাকরী থাকবেই মনে ভেবে, তাঁকে ডালি পাঠাতে চাই, কোথায় কি কিনি বল ত?"

পতিত লোকটী সহসা উঠিয়া বসিল, বলিল, "ভেট পাঠাবে বাবু, ভেট?"

তরুণ বলিল, "মনে ত কচ্ছি, কিন্তু ভাল ফুল সহরে কোথায় যে পাওয়া যায় জানা নেই, তাই—"

মুটে বলিল, "আমি দেখিয়ে দেব বাবু তোমার কিছু ভয় ভাবনা নেই, চুপচাপ আমার সঙ্গে যাবে, আর পয়সা ফেলে জিনিষ উঠিয়ে নেবে ব্যাস্! কথাটী কইবে না।" কিন্তু মুটেভাড়া পুরো দশটাকার একখানা নোট চাই, নইলে চলবে না।"

তরুণ অবাক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মুটে বলিল, "মুখের দিকে তাকিয়ে মিছে কি দেখছেন বাবু, কাল দুজনে একটা বাক্স বয়ে ওই পুলিশ সাহেবের ঘরে রেখে এসে, কুড়ি টাকা পেয়েছি! সেও ফুলের সওগাদ, তোমায় ত আবার সঙ্গে নিয়ে বাগানে বাগানে ফিরতে হবে?

তরুণ অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেবল চারটী ফুল বয়ে দিয়ে আসতে দশ দশ টাকা দেয় এমন লোক কেহে ভাই?"

"জয়মল কুর্ম্মি! এত বুকের পাটা আর কার! কথা ছিল সাহেবকে দিয়ে আসতে হবে কিন্তু এত সাবধানে যেন পিপড়েটীও টের না পায়, করেছিও তাই! কাজেই বকসিস সমেত মিলেছে, পুরো একখানা নোট!

তরুণ সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমি কে জান!"

লোকটী থতমত খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে?"

তরুণ কঠোর দৃষ্টিতে লোকটীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি পুলিশের লোক, জানতে চাই, সে সওগাদ পাঠাবার মালিকের নাম আর ঠিকানা; বল, নইলে থানায় নিয়ে গিয়ে আটকাব?

লোকটী থতমত খাইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বিবর্ণমুখে বলিল, "তোর জন্যেইরে মনিয়া! জয়মল আর কি আমায় আস্ত রাখবে, রাখবে না। এদিকেও পুলিশের হিড়িক!"

মনিয়া মেয়েটী ভারি চতুর; কথাটা তাড়াতাড়ি ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "পথে কত লোক কত মোট ঘাট বইতে দেয় বাবু, তার সবার খপর কি আর আমরা রাখি! মোট বই, পয়সা নিই ব্যাস, এই পর্য্যন্ত! এই যে তোমাকে, কে কোথাকার লোক, জানি কি? একবার বলছ পাড়াগেঁয়ে, একবার বলছ ফাঁড়ির আমরা কোনটা বিশ্বেস করি বল ত?

তরুণ হাসিয়া বলিল, "সত্য যদি বল তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি জানতে চাই এ পাঠানর কর্ত্তা কে?"

হঠাৎ নাকের উপর একটা প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত পাইয়া তরুণ পথেরই উপর ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। যখন জ্ঞান

ফিরিল তখন, সে পথেই সে ছিল না, একটা মাঠের মধ্যে গাধার পিঠে হাত পা বাঁধা অবস্থায় সে চলিয়াছে।

তিন

সহরের এক নিকৃষ্টতম অংশে আসিয়া তাহার যাত্রা শেষ হইল। একটা ভাঙা কুঁড়ের দ্বারে আসিয়া সে আঘাত করিতে করিতে ডাকিল, "মনিয়া, মনিয়া।"

দ্বার খুলিয়া একটী তরুণী বাহিরে আসিলে তরুণ তীক্ষ্ণদৃষ্ট তাহার মুখের উপর ন্যস্ত রাখিয়া পরুষকণ্ঠে বলিল, "কুর্ম্মি কোথায়?"

মেয়েটী হতাশভাবে মাথার কাপড় টানিয়া বলিল, "আর বাবু কুর্ম্মি, আজ সাতাশ দিন বিছানায় পড়ে দিন গুনছে। আসুন, আসুন না, দেখে যান।"

তরুণ একটু যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল; তারপর দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া চলিল। ঠিক সেই সময় ভিতর হইতে হাহাকার-ধ্বনির সহিত দু'-একজনের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। মেয়েটী তরুণকে ছাড়িয়া ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই তাহার আর্ত্তকণ্ঠের করুণ ক্রন্দন দিক্ কম্পিত করিল, "আরে, তু হামে ছোড়কে কাঁহা চল্‌তা হ্যায়?"

এ ভাবের অভ্যর্থনা তরুণ কল্পনাও করে নাই, তাই কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে উপস্থিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পথ খুঁজিয়া লইল। তারপর অটল পদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

এক, দুই, তিনপদ অগ্রসর হইতেই কে একজন আসিয়া তাহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল; বলিল, "আর কেন বাবু, ও ত মরে গেছে—আর আপনাদের শাসন মানতে আসবে না। এখন যান, আপনাকে আর আমরা সইতে পাচ্ছি না।"

তরুণ বলিল, "তোমার মুখের কথায় আমি যেতে পারি না মনিয়া; আমি নিজের চোখে তার মরা দেহটা দেখতে চাই।"

মনিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "আপনার ভেতর মানুষের প্রাণটা কি শুকিয়ে গেছে বাবু? বেশ, আসুন; কিন্তু একটা কথা, ওর ওপর কোন—"

তরুণ তাহার আপত্তির সূত্র বুঝিয়া বলিল, "আমিও মানুষ। কর্ত্তব্যের খাতিরে শুধু নিজের চোখে দেখতে চাই,—জয়মল কুর্ম্মি সত্য গেছে, কি তোমরা সবাই মিলে এ একটা ধাঁধার সৃষ্টি—"

নারী রুখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অগ্নিবর্ষী-দৃষ্টিতে তরুণের দিকে চাহিল; তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল, "বেশ, আসুন তবে।"

পথে নামিয়া তরুণ হতাশ-কণ্ঠে আত্মগতভাবে বলিতে লাগিল, "যুদ্ধে হত শত্রু যেমন আততায়ীর মনে নয়নে একটা শঙ্কা-বিজড়িত বৈরাগ্যের সঞ্চার করে এবং স্বকীয় কর্ম্মের জন্য অনুতাপ এনে দেয়, এক্ষেত্রে সেরূপ হ'ল কি না কে জানে!"

একটা জোর নিশ্বাসের সহিত তরুণ আপনাকেই যেন প্রশ্ন করিতে সহসা বলিয়া উঠিল, "এখন কোন্ পথে?"

পশ্চাতে কে একজন বলিয়া উঠিল, "সিধে শান্ত হ'য়ে ঘরের ছেলে ঘরে—"

তরুণ বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কই সে কোথায়? পথের একপাশে এক বুড়ি ঝুড়ি হাতে গোবর কুড়াইতেছিল। সে তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "তুমি আমায় কি বল্‌লে?"

কিন্তু বুড়ি বোধ হয় বদ্ধকালা। তাহার পরুষকণ্ঠের স্বর সে শুনিতে পাইল না। যেমন ভাবে গোবর কুড়াইতেছিল, ঠিক তেমনি কুড়াইতে লাগিল। তরুণ সজোরে তাহার কাঁধ ধরিয়া নাড়া দিল; বলিল, "চালাকী চলবে না, তুই কে তা' বল?"

বুড়ী তরুণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আছে, কিন্তু ঘুঁটে শুকোয় নি!"

চার

মাঠে পড়িয়া তরুণ হন্‌হন্ করিয়া চলিয়াছিল। পশ্চাতে এক, দুই, তিন, কয়বার পিস্তলের আওয়াজ হইল। একটা

প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছে একঝাঁক পাখী বসিয়াছিল; তাহারই কয়েকটা ভূলুণ্ঠিত হইল। তরুণ বক্ষের পিস্তল বাহির করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কোথায় কে?

একজন পুলিশ পদাতিক শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসিল। তরুণ তাহাকে দূরের ঝোপের দিকে পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। লোকটা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাকে তাহার কাজে পাঠাইয়া তরুণ ধীরপদে আবার অগ্রসর হইল। এমন সমস্যায় যেন সে কখনও পড়ে নাই।

কে একটী ছেলে তাহার হাতে একখানা পত্র দিল। তরুণ চঞ্চল চক্ষু সেখানির উপর ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "এ চিঠি তোমায় কে দিলে খোকা?"

খোকা উত্তর দিল, "এ, আমি বুঝি খোকা! আমি নন্দলাল।"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "তা' বেশ। নন্দলাল, এ চিঠিটা তোমায় কে দিলে?"

বালক হাত তুলিয়া বলিল, "ওই টমটমের গাড়োয়ান। যাঃ, চলে' গেছে ত! কখন গেল, আমায় সে লজঞ্চুস দেবে বল্‌লে—দিলে না।"

তরুণ তাহার হাতে চারিটী পয়সা দিয়া বলিল, "সে লোকটা দেখ্‌তে কেমন খোকা?"

আশ্চর্য্য! বালকের বর্ণনায় তরুণ বুঝিল এইমাত্র যাহাকে মৃত দেখিয়া আসিয়াছে, এ লোকটার বর্ণনা হুবহু যে তাহারই অনুরূপ।

পত্রখানি আবার পড়িল—

"মূর্খ গোয়েন্দা, আমায় ধরা তোমার কাজ নয়। এখনও এ পথ ছাড়। আমি তোমায় হাজার টাকা দেব। বন্ধু হও। দেখ, প্রাণের চেয়ে বড় কিছুই নেই।

তোমার বন্ধুত্ব আকাঙ্ক্ষী জে কে।"

তরুণ দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া প্রায় রক্ত বাহির করিয়া ফেলিল। তারপর চঞ্চল-পদে সহরের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। সূত্রহীন, অথচ চতুর আততায়ী পিছনে পিছনে ঘুরিতেছে। এ লোককে কেমন করিয়া ধরা যায়? আর তাহার গতাগতি সম্বন্ধে সন্ধানই বা কেমন করিয়া পাওয়া যায়?

একজন পাহারাওয়ালা সেলাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার হাতে একখানি পত্র। তরুণ তাহা খুলিয়া পড়িল। তাহাতে লেখা—

"মূর্খ গোয়েন্দা, পদে পদে ভুল করিতেছ, তবু জ্বালাইতে ছাড়িবে না। আমি তিনদিন সময় দিলাম, হয় পাণ, নয় পিস্তল। একটা কিছু সত্বর ঠিক করিয়া লও। মূর্খ, আমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ছদ্মবেশে তোমার কাছে গিয়াছিলাম। তুমি আমায় পুলিশ পদাতিক ঠাওরাইলে। আমায় আমারই সন্ধানে পাঠাইলে; নিজে কিছু দেখিলে না। মূর্খ, এভাবে মামুলি সন্ধান চলিতে পারে হয় ত, কিন্তু আমায় বাহির করিতে পারা যায় না। আশা ছাড়; এখনও বলিতেছি,—হয় পাণ, না হয় পিস্তল। তুমি দেখিতেছ, দয়া করিয়া কেবল তোমায় বাঁচাইয়া রাখিয়াছি; নচেৎ একগুলিতে তোমায় মাটিতে শোয়াইতে বিশেষ দেরী হয় না। কি বল, আমার বন্ধুত্ব কি এতই হেয়? শান্তি উভয়পক্ষেরই প্রার্থনীয় নয় কি?"

পত্রখানির একদিকে একটী অস্পষ্ট শিল; যেন ভ্রমক্রমে শিল করিয়া তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ পদাতিকের সহিত কথা কহিতে কহিতে তরুণ অগ্রসর হইবার পথে জানিল, পত্র-বাহককে আটক রাখা হইয়াছে।

নানা প্রশ্নেও লোকটার নিকট কোন কথা জানিতে পারা গেল না; ভবিষ্যতে যে জানা যাইবে, সে আশাও নাই; কারণ, লোকটা বদ্ধ কালা এবং বোবা।

প্রখর আলোক এবং অতসী কাচের সাহায্যে তরুণ লুপ্ত শিলের পাঠোদ্ধার করিল—রাজবাড়ী। ইহার পূর্ব্বের বা পরের একটী অক্ষরও কিন্তু বুঝিবার উপায় নাই।

মিষ্টার হোমের সহিত তরুণ সাক্ষাতের প্রয়োজন বোধ করিল। শুনিল, প্রাতে তিনি ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।

মিসেস্ হোম্‌কে জিজ্ঞাসাবাদেও কোন সন্ধান মিলিল

না। অগত্যা সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই রহিল না।

ধরিত্রীর বুকে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিল। সঙ্গে আসিল অসংখ্যের মিলন-হাসি। পথের যাত্রী মিষ্টার হোম্ তখনও গৃহে ফিরিলেন না।

আর অপেক্ষা করা চলে না; অন্ততঃ, সাহেবের কোনও বিপদ ঘটিল কি না জানা দরকার। উৎকণ্ঠিত মিসেস্ হোম্‌কে সান্তনা দিয়া তরুণ পথে বাহির হইয়া পড়িল। এবার তাহার সন্ধানের পথ ভিন্ন; অর্থাৎ, চালানী উপহারের পাঠানর মালিককে ছাড়িয়া সে পুলিশ-সাহেবকে অগ্রে বাহির করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিল।

একজন পদাতিক একটা পথনির্দ্দেশ করিয়া বলিল—সাহেব মিস কালো একটা ঘোড়ায় চাপিয়া সেইদিকে গিয়াছেন। তরুণ সেই পথেই চলিল।

বহুদূর গিয়া পল্লীর মেটে-পথে একস্থানের একজন চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সাহেব সেই পথে গিয়াছেন সে দেখিয়াছে; কিন্তু ফিরিতে দেখে নাই। তরুণ অগ্রসর হইল।

পাঁচ

একটা প্রাচীর-ঘেরা প্রকাণ্ড উদ্যান-বাটিকা। তরুণ সেইস্থানে থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, একস্থানের মাটিতে যেন কয়েকটা ঘোড়ার খুরের দাগ রহিয়াছে। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সে ভাল বুঝিতে না পারিয়া 'টর্চ্চ' জালিল এবং হামাগুড়ি দিয়া স্থানটার অবস্থা দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। পথে একটা পুলিশের চিহ্নিত চাক্‌তি পাইয়া সে বুঝিল, সাহেব এই স্থানেই আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আর কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সে রক্তচিহ্ন দেখিতে পাইয়া শিহরিয়া উঠিল।

এখন রক্তচিহ্নের অনুসরণ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা সে খুঁজিয়া পাইল না এবং সেই অনুসরণের পথই বাছিয়া লইল। দেখিল, কয়েকটা ঘোড়ার খুরের দাগের মাঝে মাঝে রক্ত চিহ্ন তখনও সুস্পষ্টভাবে তাহাকেই যেন আহ্বান করিতেছে।

চিহ্ন উদ্যান-বাটিকার গেটের দিকে গিয়াছে। সে পথ ছাড়িয়া একটা গাছে উঠিল। সেখান হইতে প্রাচীর এবং প্রাচীর হইতে উদ্যানে অন্য এক বৃক্ষের সহায়তায় নামিয়া পড়িল।

সম্মুখে আস্তাবল। দেখিল, পুলিশ-সাহেবের কাল ঘোড়া সেখানে বাঁধা রহিয়াছে। বাড়ীটার অন্য অংশে তখন ছুটাছুটি ডাকহাঁক চলিতেছিল। তরুণ বিস্মিতভাবে সেদিকে একবার চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে পথ ছাড়িয়া আস্তাবলেই ঢুকিয়া পড়িল।

একখানি ঘর; বেশ দৃঢ় শক্ত লোহার পেটিতে ঘেরা। প্রবেশ দ্বার ভিতর দিকে। মনে হয়, কোন কোষাগার বা এমনই একটা কিছু।

আস্তাবলের একদিকের দেয়ালে কয়টা মোটা গরাদে-ঘেরা একটা জুলি পথ। তাহা দেখিয়া তরুণ হর্ষোৎফুল্ল হইল এবং বাগানে পতিত একটা সাবল তুলিয়া আনিয়া সে নিজের প্রবেশ-পথ সেই পথেই বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

ঘণ্টাখানেক পরিশ্রমের পর সেখানকার দুইটা গরাদে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলিল। দেখিল, শেয়ালের মত হামাগুড়ি দিয়া সেই পথে ভিতরে যাইতে পারা যায়। তখন সেই-ভাবেই সে চলিতে লাগিল। মিনিট কয়েক পরে সেই লোহার পাটঘেরা গৃহের মধ্যে গিয়া অবাক্ বিস্ময়ে সে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

এস্থানে মিষ্টার হোম্ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়িয়া-ছিলেন। সে শীঘ্রহস্তে তাঁহার বন্ধন কাটিয়া দিয়া অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিল; অর্থাৎ, তাঁহার অসাড় দেহটী সম্মুখের দিকে ক্রমাগত আগাইয়া দিয়া সে ওই জুলি পথেই বাহির হইয়া আসিল। তারপর সাহেবকে কাঁধে লইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

মুক্ত হাওয়ায় সাহেবের চৈতন্য হইলে তিনি বলিলেন, "লোকটা এখানেই আছে। তরুণ, আমি সন্ধান পেয়েছি।"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "তার বাড়ীতে এতলোকের

মধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে না। চলুন, হেড কোয়ার্টারেই এখন যাওয়া যাক্।"

সাহেব কিন্তু সম্মত হইলেন না; বলিলেন, তোমার কাছে একজোড়া পিস্তল নেই কি? আমারটা এরা কেড়ে নিয়েছে।"

তরুণ আবার তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে চাহিল; কিন্তু মিষ্টার হোম্ কিছুতেই সে কথা কানে তুলিলেন না। তখন অগত্যা উভয়ে সদর দেউড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

খানকয়েক মোটর দাঁড়াইয়াছিল। কয়জন লোক কিন্তু সেভাবে তাঁহাদের আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। পরক্ষণেই একদল চীৎকার করিয়া উঠিল, "আসামী পালাল! ধর্ ধর্!"

কিন্তু উদ্যত পিস্তলের সম্মুখে তাহারা অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না, প্রাণভয়ে পলাইল। কয়েকজন সম্ভ্রান্তগোছের লোক উপর হইতে নামিয়া আসিলেন—বোধ হয় ডাক্তার। তাঁহাদের একজনকে ডাকিয়া তরুণ নিজের পরিচয় দিল এবং রাজা জয়ঙ্কর খৈতানের সহিত সাক্ষাতের কথা জানাইল।

তাঁহারা বলিলেন, "তিনি ভীষণ আহত—এমন কি জীবন শঙ্কটাপন্ন; এ সময় তাঁকে বিরক্ত না করাই ভাল।"

তরুণ ফিরিয়া সাহেবের দিকে চাহিল। সাহেব ততক্ষণে সোপানের অর্দ্ধপথে। তাড়াতাড়ি সেও তাঁহার অনুসরণ করিল।

জয়ঙ্করের গৃহে ঢুকিয়া সাহেব বলিলেন, "এইবার—"

তিন-চারজন লোক একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল। জয়ঙ্কর বিছানা হইতেই বলিলেন, "থাম। তোমারি দোষের প্রতিফল তুমি পেয়েছ হোম্—মানুষকে মরা ইঁদুর উপহার দেওয়ার উত্তর পেয়েছ। তার ফল অনেক দূর গড়িয়েছে। আমি মৃত্যুশয্যায়, আর কেন?"

সাহেবের দিকে তরুণ চাহিয়া দেখিল, তাঁহার মুখ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে।

জয়ঙ্কর বলিতে লাগিলেন, "প্রথম উনিই আমায় মরা ইঁদুর ভোজ-সভায় উপহার দিয়াছিলেন তরুণবাবু। আমি শুধু তার জবাব দিয়েছি। না, হত্যা নয়, গোর থেকে তুলে। খবর পেয়েছিলুম কয়দিন আগে একটা মেয়ে—"

কথা বন্ধ হইয়া গেল। দুইজন ডাক্তার ছুটিয়া আসিয়া কি একটা ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু বল পাইলে জয়ঙ্কর হাসিয়া পুনরায় কহিলেন, "ধন্যবাদ ডাক্তার! হাঁ, আমায় সাজা দিতে তোমরা এসেছ, কিন্তু সে সাজা আমি তোমার হাতেই পেয়েছি, আর কেন? না, আর বেশী কিছু তুমি করতে পারবে না। আমি হেরেও জিতে গেছি—মরণ আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তার সাদর নিমন্ত্রণ মাথা পেতে নিয়েছি। ফিরে যাও। আমার লোকজন তোমরা যত বড়ই হও, হয় ত ক্ষমা করবে না; কারণ, এরাও স্বাধীন জাত।"

ভোরের দিকে পথে নামিয়া তরুণ বলিল, "এর আর কিছু—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "না না, এ আমারই কাজের প্রতিফল আমি পেয়েছি। আর নয়, থাক্। লোকটা মানুষটা মোটের ওপর ভালই ছিল!"

সঙ্কলন

ইরাণীর মৃত্যু

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্‌-এ, সি-এস্‌

প্রচণ্ডদাবানলপ্লাবিত গগনপ্রাঙ্গণে রবি একখণ্ড দ্রবীভূত জ্যোতিষ্কণার ন্যায় ধুঁকিতেছিল। চৌদিকে গিরি, উপত্যকা, মরু, বন, নদী, পশুপক্ষী, তপনের দারুণ উত্তাপে ক্লিষ্ট ও মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

দুই খণ্ড অগ্নিনিশ্বাসী শৈলপদতলে তমালবেষ্টিত নীল হ্রদ। সেই হ্রদকূলে বোখারার সুলতানের গ্রীষ্মপ্রাসাদ। প্রাসাদমধ্যে স্ফটিকনির্ম্মিত একটি শীতল কক্ষ; চৌদিকে খস্‌ খস্‌ প্রভৃতি সুগন্ধি তৃণ আচ্ছাদনে সযত্নে রবিকিরণ অপসৃত। গৃহতলের কিয়দংশ সুকোমল বহুমূল্য পারস্য গালিচায় আবৃত, নানাবিধ সরাব, সরবৎ ও অন্যান্য শীতল পানীয় চৌদিকে ছড়ান রহিয়াছে।

কক্ষমধ্যে দুইটি মাত্র মনুষ্যমূর্ত্তি। গালিচার উপর বহুমূল্য রেশমি শয্যার উপর বসিয়া বোখারার সুলতান করিম সাহ। অস্পষ্ট আলোকে মুখাবয়ব পরিষ্কার দেখা যাইতেছে না। শয্যাপ্রান্তে অনাবৃত মর্ম্মরে অর্দ্ধশয়নে, সুলতানের আরব্য দাসীকন্যা—ইরাণী। সর্ব্বাঙ্গ শীতল পদ্মপত্রে আচ্ছাদন করিয়াছে, মসৃন কুঞ্চিত অবেণীবদ্ধ আর্দ্র কেশকলাপ সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া রহিয়াছে। গবাক্ষরন্ধ্র হইতে রশ্মিকণা আসিয়া ইরাণীর মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে, সেই অস্পষ্ট আলোকে তাহার নয়নযুগল সর্পিণীর মস্তক-নিহিত মণির ন্যায় জলিতেছে। দুই জনেই নিস্তব্ধ।

করিম প্রথমে কথা কহিল। "মায়াবিনী, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই; এখনও মনে করিয়া দেখ, তোমার আর কিছু অভিলাষ আছে কি না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যাহা চাহিবে, অবশ্যই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।"

"বাদশাহ আলম, দাসীর শ্রীচরণে আর কোনও ভিক্ষা নাই, কৃপা করিয়া একটি অভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া, আজ অনেক আশায় সে নিধি পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি।"

"ব্যস্ত হইও না, করিমের কথা কখনও বৃথা হইবে না; তোমার নিধি তুমি পাইবেই, কিন্তু মনে করে দেখ ইরাণী, চিরজন্মের জন্য আজ আমায় ছাড়িয়া চলিলে, এক দিনের জন্য এক মুহূর্ত্তের জন্য কি আমায় তোমার হৃদয়ে স্থান দিবে না?"

"বাদশাহ আলম, আমি আপনার দাসীমাত্র; আমার দেয় যা কিছু, তা এত দিন সকলি আপনাকে দিয়াছি, এখনও যা আজ্ঞা করেন, আমার শিরোধার্য্য।"

"কুহকিনী, তোমার শরীর যৌবন তীব্র বিষ; হৃদয়ের তৃষ্ণা আর তাহাতে মেটে না, তোমার হৃদয়—ভালবাসা—এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার হৃদয় আমাকে দাও।"

"বাদশাহ আলম, দাসীর তাহা অসাধ্য,—বৃথা সে আজ্ঞা করিতেছেন; আমার দেহ কলুষিত; এ অপবিত্র গৃহ ছাড়িয়া হৃদয় অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। আজ তাহাকে কোথায় পাইব?"

করিম আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় সরোষে চীৎকার করিল—"পিশাচিনী, হৃদয়—তোমার হৃদয়—করিমের কথা কখনই মিথ্যা হইবে না; তোমার হৃদয়েশ্বরকে এখনি পাইবে। আবদুল্লা, বন্দীকে—উন্মাদ প্রেমিক বন্দীকে এই দিকে লইয়া আয়।"

আদেশমাত্র আরও দুই জন গৃহে প্রবেশ করিল। বাদশাহ করিম সাহ আপনি উঠিয়া একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত করিলেন। রবি-কিরণ সমস্ত গৃহ প্লাবিত করিল। এক হস্ত গবাক্ষের উপর রাখিয়া করিম ফিরিয়া দাঁড়াইল। নয়নে বন্যপশুর হিংসানল—অধর স্থিরবদ্ধ; সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা দুরন্ত পাশবিক হিংস্র ভাব। বর্ণ গভীর কৃষ্ণ,

সুবিশাল দেহ, ক্ষুদ্র স্কন্ধোপরিস্থ মস্তকে কেশ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র;—জনতা চিরদিন করিমকে 'পিশাচ করিম' বলিয়া ডাকিত।

পূর্ণযৌবনা, বিদ্যুৎরূপিনী রমণী, তেমনি সর্পিনীর ন্যায় গুটাইয়া নিশ্চল দক্ষিণ হস্তে মাথা রাখিয়া চাহিয়া রহিল। সম্মুখে দাঁড়াইয়া আবদুল্লা ও তাহার বন্দী। বন্দীর বিশীর্ণ শরীর—নয়নে ভাবহীন, হৃদয়হীন চাহনি। শূন্যের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক।

রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সমস্ত হৃদয়ের আকুল আবেগ লইয়া বাহুযুগল বন্দীর দিকে প্রসর্পিত হইল। সে একবার ফিরিয়াও চাহিল না—তেমনি নিশ্চল! নয়নে সেই জড় বুদ্ধিহীন চাহনি।

রমণীর নয়ন আপনি মুদিয়া আসিল। তড়িৎ স্বপ্নের মত স্মৃতিপথে সেই এক পূর্ণকৌমুদীপ্রতিভাসিত শুভ্র শীতল সৈকতশয্যার কথা মনে পড়িল। কঠোর রজ্জুবদ্ধ অঙ্গে অঙ্গে সেই সুশীতল স্পর্শ, লজ্জা, প্রেম, লালসা কৌমুদী-আলোকে কৃষ্ণ নয়নের সেই রক্তিম কোমল বিভা, আজ অশরীরী গন্ধের ন্যায় প্রাণে মুহূর্ত্তের জন্য বহিয়া আসিল। সেই বীর কোমলকান্তি পুরুষের পরিবর্ত্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ এ কে? এই কি সেই? যদি উন্মাদ—তবে কি নৃশংস বিষপানে এই দুর্গতি হইয়াছে?

কিন্তু এ পূর্ব্বস্মৃতি, নিরাশা ভয় জীবনান্ধ ক্রোধ সুধু নিমেষের জন্য। পরমুহূর্ত্তেই সেই রবি কিরণপূরিত গৃহে বিদ্যুৎশিখার মত কি ঝলসিয়া উঠিল। চক্ষের নিমেষে জানুতলে করিমকে ফেলিয়া, সেই মৃণালকোমল করে ছুরিকার বিলোল সুতীব্র ধার রবি-কিরণে ঝলসিতে লাগিল, কিন্তু নাবিল না।

"নরকের কুক্কুর, মরণ তো তোর মহা অব্যাহতি—জীবনই তোর নরক তোমাকে মারিয়া সে মহাপাপ আমি করিব না।"

তার পর, সেই নিশ্চল, নিস্পন্দ মূর্ত্তিকে হৃদয়ে টানিয়া লইল। পর মুহূর্ত্তে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে দুইটি কোমল হৃদয়পদ্ম ছিন্ন করিয়া দুই জনে অনন্ত বাসর-শয়নে ঘুমাইয়া পড়িল।*

---

* 'সাহিত্য', ৪র্থ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, মাঘ, ১৩০০

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর বাংলা পৌরাণিক বাণী চিত্র "দক্ষ যজ্ঞে" 'সতীর' ভূমিকায় শিক্ষিতা ও সুন্দরী অভিনেত্রী **শ্রীমতী চন্দ্রাবতী।**

মেল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা

গল্পলহরী

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪১ | তৃতীয় সংখ্যা

স্বয়ংবরা

শ্রীবজ্রাচার্য্য

শৈলেনের বোন্ সুলোচনার বিবাহ; কিন্তু কেমন করে' সম্বন্ধ করা হবে, এই নিয়ে তর্ক ও বিচার।

শৈলেন বলে—মামুলী মতে হোক্, যেমন করে' সকল মেয়েদের সম্বন্ধ স্থির হয় · দেখাশোনা, যাতায়াত, সুপারিশ, ইত্যাদি···

শৈলেশের স্ত্রী মানদা বলে—সে সব চলবে না···অন্য কিছু চাই।

এই নিয়ে ঘোর মতভেদ চলেছে দু'দিন উপর্য্যুপরি পারিবারিক বৈঠক বসলো, কিন্তু কোন কিছু নিষ্পত্তি হ'ল না। এই নিষ্ফলতার একমাত্র কারণ মানদার ঘোরতর আপত্তি।

মানদা বলে—কনে দেখিয়ে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। পাত্রের তরফ থেকে যতরকম অত্যাচার পাত্রী দেখার সময় হয়, সে তার যে সুদীর্ঘ তালিকাটী প্রস্তুত করে' রেখেছিল, সেটী এনে বৈঠকে ধরে' দিল। দেখা গেল, প্রধান প্রধান আপত্তি হচ্ছে এই :

"বস তো···ওঠ তো···"

"মুখ উঁচু কর তো···নীচু কর তো···"

"একবার হাস তো···"

"একটু চল তো..."

"এদিকে চাও তো···ওদিকে চাও তো..."

"পায়ের বুড়ো আঙুল দেখি···"

"গায়ের রং ঘসে দেখি ··"

"খোঁপা খোল তো...চুল কত লম্বা দেখি···"

"একটু পড় তো···"

"একটা গান গাও তো..."

মানদার অভিযোগ এই যে, পাত্রী দেখার সময় এ রকম বেয়াড়া ফরমাজের অন্ত থাকে না। পাত্রী বেচারী ঘেমে নেয়ে ওঠে।

তার আরও দুঃখ এই যে, শিক্ষিত ভদ্রসমাজের লোকেরাও এই দোষে দোষী। এই বলেই মানদা শৈলেনের দিকে এক তীব্র কটাক্ষ করলে। তার মানে এই যে, বিবাহের আগে যখন বন্ধুবান্ধব নিয়ে শৈলেন মানদাকে দেখতে গিয়েছিলো, তখন তাকে এই রকম

অনেক জ্বালাতন সহ্য করতে হয়েছিল। শেষে যখন ঘেমে নেয়ে উঠেছিল, আর রাগে দুঃখে দুই চোখে দরদর করে' জল ঝরছিল, তখন সে অব্যাহতি পেয়েছিল… "তুমি এইবার যেতে পার।"

সুলোচনা শৈলেনের বড় আদরের বোন্। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ বসু স্ত্রী-বিয়োগের তিনমাস পরেই মারা যান। সুলোচনা তখন সবে তিন মাসের। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন এই বালিকাটীকে শৈলেন ও তার স্ত্রী অনেক কষ্টে লালন-পালন করেছে। আজ সুলোচনা লেডি হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজ হ'তে এম-বি, পাশ করে' ডাক্তার হয়েছে। তার বিবাহ মানদা খুব ঘটা করেই দিতে চায়। কিন্তু…সেই সেকেলে মামুলী উপায়ে সম্বন্ধ করা…ছি ছি…!

পারিবারিক বৈঠকের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে ঠিক হ'ল যে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বরের দরখাস্ত আনা যাক্। দরখাস্ত এলে পাত্রী নিজে বিচার করুক, কারা উপযুক্ত। পরে মনোনীত পাত্রদের ডাকিয়ে পরীক্ষা, শেষে স্বয়ংবর ও বিবাহ।

পরদিনই কলিকাতার ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র-সমূহে যে বিজ্ঞাপন বেরুলো, তা' এই রকম :—

"ডাঃ মিস্ সুলোচনা বসু বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। বসু ভিন্ন অন্য যে কোন কায়স্থ যুবক তাঁহার পাণিগ্রহণে অভিলাষী থাকিলে বক্স নম্বর দুই, সম্পাদকের নিকট হইতে ছাপা ফর্ম লইয়া দরখাস্ত করুন। স্বয়ংবর খরচাবাবদ দশ টাকা দরখাস্তের সহিত পাঠাইতে হইবে। পৌষের শেষদিনের পর আর দরখাস্ত লওয়া হইবে না।

"সাক্ষাৎ করিতে বা ফটো দেখিতে চাহিবেন না। সুপারিশ নিষিদ্ধ।

"দরখাস্তকারিগণের মধ্যে পাত্রী যাঁহাকে মনোনীত করিবেন, তাঁহারাই স্বয়ংবর বোর্ডে উপস্থিত হইবার জন্য ডাকযোগে আহুত হইবেন।

"পাত্রীর বৌদি' মিসেস মানদা বসু, বাংলার বিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী গোধুলি দেবী ও পাত্রী নিজে এই তিন-জনে মিলিয়া স্বয়ংবর বোর্ড গঠিত হইবে। এই স্বয়ংবর বোর্ডই আহুত পাত্রগণকে পরীক্ষা করিবেন।

পরে স্বয়ংবর ও বিবাহ।"

পৌষমাসের শেষ তারিখেও দশখানি দরখাস্ত পাওয়া গেল। একুনে দু'শ সত্তরখানি দরখাস্ত এসেছে। পয়লা মাঘ বেলা বারটা হ'তে পাঁচটা পর্য্যন্ত পরীক্ষার ফলে দু'শ কুড়িখানা দরখাস্ত নামঞ্জুর হ'ল; মাত্র পঞ্চাশখানা স্বয়ংবর বোর্ডে বিচার করবার উপযুক্ত বলে' স্থির হ'ল। কতগুলো দরখাস্ত কি কি কারণে নামঞ্জুর হ'ল, তার সংক্ষিপ্ত হিসাব তুলে দেওয়া হ'ল :—

কারণ	নামঞ্জুর দরখাস্তের সংখ্যা
(১) পাত্রের সংসারে দশ বৎসরের কম বয়স ননদ ও দেবরের সংখ্যা পাঁচের বেশী; অবিবাহিতা ননদের সংখ্যা তিনের বেশী।	… ১০১
(২) উপরোক্ত কারণ বর্ত্তমান, অধিকন্তু সংসারে উপার্জ্জনক্ষম কেহ নাই; অদূর ভবিষ্যতে উপার্জ্জন করিবে, তাহারও আশা নাই	… ৭৬
(৩) বংশগত রোগ—যথা হাঁপানি, কাশি ইত্যাদি; নিজের রোগ অথবা বিপত্নীক	… ১৫
(৪) পৈতৃক বাড়ী বা ভিটা নেই; ভাড়াটে বা পরগৃহে বাস	… ১১
(৫) বংশ-পরিচয় ভাল করিয়া দেওয়া হয় নাই; ছাপা ফর্ম এরূপভাবে পূরণ ক[illegible] হইয়াছে, যাহাতে সন্দেহ হয় প্রকৃত পরিচয় গোপন করা হইয়াছে	… ১০
(৬) অসাবধানতাবশতঃ অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক ফর্মে ছাপা অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই; অথবা নাম স্বাক্ষর করিতে ভুল হইয়াছে	… ৭
	২২০

স্থির হ'ল, পনেরই মাঘ স্বয়ংবর ও বিবাহ। ওই দিনই বেলা ছ'টা হ'তে স্বয়ংবর বোর্ড পঞ্চাশজন পাত্রকে পরীক্ষা করবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পঞ্চাশজন পাত্রকে ডাকযোগে সংবাদ দেওয়া হ'ল এবং অন্যান্য আয়োজন চল্‌তে লাগ্‌ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পনেরই মাঘ এসে পড়ল। স্বয়ংবর-মণ্ডপ বিচিত্র সজ্জায় ভূষিত। প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি সমবেত। কলিকাতার গণ্যমান্য লোক বোধ হয় কেউ বাকী ছিল না। পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে নিমন্ত্রিতগণের মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা হ'ল। বিশ্রামের পর বেলা তিনটা হ'তে স্বয়ংবর বোর্ডের কার্য্য আরম্ভ হ'য়ে গেল। সভাশুদ্ধ লোক উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লো।

সভামণ্ডপের অতি নিকটেই একটী সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে স্বয়ংবর বোর্ডের তিনজন মেম্বর বসে। মধ্যে প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী গোধূলি দেবী; বামে মানদা, দক্ষিণে সুলোচনা। সাম্‌নে রাখা আছে একটী ওজনের কল, টেব্‌লের ওপর লেখবার সরঞ্জাম, দরখাস্তের ফাইল, মাপ নেবার ফিতা, যন্ত্রপাতি ও ঘড়ি। দরজায় কিংখাপের পরদা, বাইরে দ্বাররক্ষীরূপে উপবিষ্ট শৈলেন।

শৈলেনের কায শুধু পাত্রের তালিকা দেখে এক-একটী নাম উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা, এবং তার পরীক্ষা শেষ হ'লে অপর একজনকে ডাকা।

প্রথমেই ডাক পড়লো বিধুভূষণ সরকার, এম-এস্‌-সি।

শ্রীমানের ভিতরে প্রবেশ; সকলকে অভিবাদন; প্রেসিডেণ্ট তাঁর ওজন নিলেন, ফিতে দিয়ে উচ্চতা ও বুক [illegible]তি দেখলেন, পরে—

প্রশ্ন—টাকায় সাতটা ইলিশ বাজারে বিক্রী হচ্ছে, আপনার গৃহিণী আপনার হাতে একটী টাকা দিয়ে বল্‌লেন—ওগো, অনেকদিন ইলিশের মুখ দেখি নি, বাজার থেকে নিয়ে এসো না। আপনি কি কর্‌বেন?

উত্তর—আমি বাজারে গিয়ে একটাকা দিয়ে সাতটা ইলিশমাছ কিনবো, সক্ষম হই নিজে বহন করবো; না হই, মুটের মাথায় নিয়ে আসবো।

প্রশ্ন—সাতটা ইলিশমাছ খাবে কে? কতদিনে খাবেন?

উত্তর—তা' বটে; পাড়া-পড়শীদের বিলিয়ে দোব।

সকলের মৃদু হাসি; প্রেসিডেণ্ট বললেন—যেতে পারেন। শ্রীমানের অভিবাদন ও গৃহত্যাগ।

শৈলেন পুনরায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলে—অমলেন্দু রায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌। পূর্ব্ববৎ পরীক্ষা হ'ল।

প্রশ্ন—আপনার স্ত্রী রোগী দেখে চৌষট্টি টাকা ফি বাবদ পেয়েছেন, আপনি আদালতে উপার্জ্জন করেছেন আশী টাকা। দু'জনেই একসঙ্গে বাড়ী ফিরে এলেন। পরস্পর জান্‌তে পারলেন, পকেটে টাকা আছে। আপনি টাকার বিষয় কি করবেন?

উত্তর—আমি বলব দাও, কি পেয়েছ, রেখে দি'; আমিও কিছু পেয়েছি একসঙ্গে রেখে দি'।

সকলের ঈষৎ ভ্রূকুটি; প্রেসিডেণ্ট বল্‌লেন—যেতে পারেন। শ্রীমানের অভিবাদন ও গৃহত্যাগ।

ক—প্রফেসর

প্রশ্ন—আপনি প্রফেসর, কিন্তু কি পড়ান লেখেন নি কেন?

উত্তর—'ফিলসফি' পড়াই, লিখ্‌তে ভুল হয়েছিল।

প্রশ্ন—আর কিছু ভুল হয়েছিল না কি?

উত্তর—বাপের নাম। যে নাম শৈলেনবাবু ঘোষণা করলেন, সেটী আমার বাপের নাম ৺দীনবন্ধু বড়াল। ফর্মে বাপের নামের স্থানে যে নাম লেখা আছে, সেইটীই আমার নাম—ত্রিবিক্রম বড়াল।

প্রশ্ন—এরূপ ভুল হ'ল কেন?

উত্তর—বড় জটিল ব্যাপার, শুনুন। দরখাস্তে আমার নাম সই করবার কথা ছিল এক জায়গায়, যেখানে পাত্রের নাম সই করবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বাবা জীবিত থাক্‌লে ফর্মে 'বাপের নাম' এইখানে বাবার সই করাতুম। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হওয়ায় আমাকে জীবিত ও মৃত এই দুই সত্তার নাম সই করতে হয়েছে। মানবাত্মার প্রকট হবার ইচ্ছা এতই প্রবল যে, আমার, অর্থাৎ চলৎসত্তার নামই প্রথমে আমার লেখনীমুখে নিসৃত হয়েছে এবং নাম সই

করবার প্রথম স্থানেই তা' লিখিত হয়েছে—যদিও সেটা ভুল স্থান। মৃত সত্তার নাম পরে আমার লেখনীমুখে এসেছে এবং নাম সই করবার দ্বিতীয় স্থানে ভুলক্রমে লিখিত হয়েছে। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ একে আত্মার 'প্রাইমারী' ও 'সেকেণ্ডারী ভলিসন্' বলে' থাকেন। এখন বুঝুন, আপনাদের ফর্মে নাম সই করবার দুইস্থানের কোন মূল্য নেই; কিন্তু আমার এই স্থান ভুল করে' নাম লেখার একটা বিশেষ মূল্য আছে। এই ভুলের ভেতর দিয়ে একটা গভীর তত্ত্ব প্রমাণ হ'ল কি না?

[সকলের কৌতূহল দৃষ্টি; বক্তা কিন্তু উৎফুল্ল]

প্রশ্ন – সংসারে আপনার কি কি ভুল দৈনিক হয়।

উত্তর—জুতা, জামা, কাপড়, গামছা, তেলের বাটী, বই এ পর্য্যন্ত কখনও স্বস্থানে পাই নি। এ আমার ভুল, কি পরিবারবর্গের ভিতর কেউ স্থানভ্রষ্ট করে, ঠিক বুঝ্‌তে পারি না। এ বিষয়ে গভীর গবেষণা করবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সময়াভাবে এখনও পর্য্যন্ত করে' উঠতে পারি নি।

সকলের মৃদুহাস্য: শ্রীমানের বিদায় গ্রহণ।

খ—গ্রন্থকার

প্রশ্ন—আপনার পড়াশুনার বিশেষ অভ্যাস আছে লিখেছেন; সেটা কিরূপ?

উত্তর—আমি গ্রন্থকীট— যা' কিছু উপার্জন, তার বার আনা রকম অংশ বই কিনতে যায়। নাওয়া-খাওয়া ছাড়া আমি সব সময় পড়ি। কোন কোনদিন নাওয়া-খাওয়া হয় না।

প্রশ্ন—বাড়ীভাড়া ছাড়া আর কিসে উপার্জন হয়?

উত্তর—টাকা ধার দেওয়া আছে, তার সুদে।

প্রশ্ন—আদায় করে কে?

উত্তর—পৈতৃক আমলের বিশ্বাসী সরকার পীতাম্বর।

প্রশ্ন—আপনি কিছুই দেখেন না?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—আপনি বিবাহ করবেন কি আশায়?

উত্তর—আমার হাতের ওপর বই পৌঁছে দেবে বলে; আমায় আর বই নেবার জন্য নড়তে হবে না।

খ—লাজুক

প্রশ্ন—লিখেছেন যে, আপনি বড় লাজুক। কি করে' নিজের বিষয় নিজে জান্‌লেন?

উত্তর—মা, পিসীমা, জ্যাঠাইমা, কাকীমা, ঠানদিদি, অফিসের ছোট সাহেব, সকলে প্রায়ই একথা বলেন। তাই শুনে শুনে।

ঘ—দোকানদার

প্রশ্ন—দোকান আছে লিখেছেন; কিসের দোকান?

উত্তর—সন্দেশের।

প্রশ – লাভ হয় কেমন?

উত্তর—যে সন্দেশটুকু বেচলে খরচা আদায় হ'য়ে লাভ হবে বুঝি, সেটুকু নিজেই খেয়ে ফেলি।

প্রশ্ন—সে কি? তার কারণ।

উত্তর—মনে করুন, আমার দোকানে যে সন্দেশ হয়, তা' কোলকাতায় দুর্লভ। দুনিয়ার লোক তা' খেয়ে সন্তোষ লাভ করছে, আর আমি শুধু তার বিনিময়ে পয়সা ভিন্ন কিছু পাব না! এ রকম 'আইডিয়া'ই আমি ঘৃণা করি। কাযেই, দোকানচলার খরচামত বিক্রী করি, বাকী যা' হ'তে লাভ হবে, তা' আমার নিজের ভোগে লাগাই। মূলধন বজায় রইল, অথচ সন্দেশ খাওয়া হ'ল। আমার দোকান বেশ চল্‌ছে।

এইভাবে ছত্রিশজন পাত্র যথাক্রমে পরীক্ষা দেবার পর লাবণ্যকুমার মিত্র, এম্‌-এ, এম্‌-এস্‌-সি, শৈলেন কর্ত্তৃক ঘোষিত হ'য়ে স্বয়ংবর বোর্ডের সামনে উপস্থিত হ'ল। আশ্চর্য্য! মানুষের এত রূপ! যথারীতি পরীক্ষার পর প্রেসিডেণ্ট-মহোদয়া স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—

প্রশ্ন—আপনার নাম রেখেছিল কে?

উত্তর—আমার দিদিমা, তিনি এখন স্বর্গে।

প্রশ্ন—আপনার পছন্দসই কি কি?

উত্তর—খেলার মধ্যে 'ক্রিকেট' আর 'রোয়িং' খাবার মধ্যে মুড়ি আর নারকেল; কার্য্যের মধ্যে [illegible] সেবা; বিজ্ঞানের মধ্যে 'কেমিষ্ট্রি'; বইয়ের মধ্যে উপনিষদ্; সহরের মধ্যে দার্জ্জিলিং আর পুরী; মানুষের মধ্যে দাদু—আর এখন দেখছি আচার্য্য রায়।

সকলে মুগ্ধ। এমন সুন্দর, বলিষ্ঠ, সুস্থ দেহ সচরাচর দেখা যায় না।

প্রেসিডেণ্ট-মহোদয়া নীরব; তিনি ভাবছেন, বাস্তব জগতে এ মহান সৌন্দর্য্য তাঁর কল্পনাকেও পরাভূত করেছে।

মানদা ভাবছে, এই লোকটা কি যাদুকর?

সুলোচনার 'লভ্ ইন্ দি ফার্ষ্ট সাইট।' সে ভাব্ছে, যুগ-যুগান্তর এই লোকটাকেই লক্ষ্য করে' সে চলেছে, তার অন্তরতম মর্মের চাহিদা ত এই লোকেরই; তার জীবন সুন্দর, স্বপ্নময় ও সাফল্যমণ্ডিত করতে দুনিয়ায় মাত্র ওই লোক ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তার মস্তিষ্কে কামনার 'মেসিন গ্যান্' বসে' গেল, প্রতি মুহূর্ত্তে একে চাই,—চাই—চাই—চাই—চাই—চাই…এই 'চাই'য়ের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী 'গ্রেপ্ সট্' সেই কামান হ'তে চতুর্দ্দিকে ছুটতে লাগল; প্রেসিডেণ্টকে বিঁধল, মানদাকে বিঁধল, লাবণ্যকে বিঁধল, শৈলেনকে বিঁধল, বাহিরে নিমন্ত্রিত সকলকে বিঁধল, দেওয়াল, ছাদ, পরদা ভেদ করে' অজস্র গুলি, অবিরাম, বায়ু অপেক্ষা বেগে দিগ্ দিগন্তে ছুট্তে লাগ্ল। প্রকৃতির তীব্র আকর্ষণে পুরুষ ধরা দিল; লাবণ্য ও সুলোচনার চকিতে দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। সুলোচনা মনে কর্‌ল প্রেসিডেণ্টকে বলে—"আর কেন, এই ত মিলেছে, 'রেজাণ্ট ডিক্লেয়ার' করুন।" কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে কেমন করে' বলে। সুলোচনা তার স্বেদসিক্ত সুন্দর মুখখানি অবনত করে' রইল।

প্রেসিডেণ্ট-মহোদয়া একবার সুলোচনার দিকে তাকালেন; হেসে বল্লেন—"আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। আর একটা মাত্র প্রশ্ন করব, উত্তর দিন।"

সুলোচনার মন বল্ল—"আর প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন।"

প্রশ্ন—আপনার স্ত্রী রাগ করে' যদি 'হান্গার ষ্ট্রাইক্' করেন্, আপনি কী করবেন?

উত্তর—যে বিষয় নিয়ে রাগ করবেন, তার ওপর আমার রাগ মিটোবার চেষ্টা নির্ভর করবে। সাধারণভাবে বলতে পারি যে, তিনি যে সব খাদ্য ভালবাসেন, তাই ঘরের মধ্যে রেখে, মায় জল, পান ও ভাল একখানি নভেল, আমি নিঃশব্দে গৃহত্যাগ কর্‌ব। সাধ্য-সাধনা, বাদানুবাদ করে' তাঁকে বিরক্ত করবো না।

সকলে হেসে উঠলেন; আর প্রশ্ন না থাকায় শ্রীমান্ অভিবাদন করে' বিদায় হ'ল। যাবার সময় আবার দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। সুলোচনার নয়নদ্বয় হ'তে নির্গত 'গ্রেপ্ সট্' নীরব ভাষায় জানাল—"বন্ধু হে, এ বিদায় অভিনয় মাত্র, ক্ষণিকের। একটু অপেক্ষা কর, আজই রাত্রে তোমাকে আমার শ্রেষ্ঠতম আপনার করে' নেব এবং তোমাতেই আমার সকল অস্তিত্ব ঢেলে দেব। অপেক্ষা কর্‌তে বল্‌তাম না, কিন্তু কি করব, সমাজ! আমায় ক্ষম কর।"

এরপর যে তেরজন ছিল, তাদের পরীক্ষা অতি শীঘ্রই শেষ হ'য়ে গেল; কেন না, ভেতরের কথা এই যে, লাবণ্যই মনোনীত হয়েছে, তারপর আর কোন পাত্রকে দেখা, সময় নষ্ট মাত্র। প্রেসিডেণ্ট-মহোদয়া বল্লেন,—"চলুন, আমরা সভায় গিয়ে স্বয়ংবর সম্পন্ন করে' আসি; রাত্রি আটটার সময় বিবাহ।"

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। সভামণ্ডপ আলোকোজ্জ্বল ও পুষ্পগন্ধে আমোদিত। সভায় নিমন্ত্রিতগণ একধারে—পাত্র পঞ্চাশজন আর একধারে সমবেত। সরবৎ, চা, ফলমূল, মিষ্টান্ন সকলকে দেওয়া হ'ল।

প্রেসিডেণ্ট-মহোদয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"পাত্রী শ্রীমতী সুলোচনা পতি নির্ব্বাচন করে' তাঁকে মাল্য ও চন্দন দিয়ে বরণ করবেন, পরে রাত্রি আট ঘটিকায় বিবাহ।"

পাত্রী, মানদার সহিত সভায় প্রবেশ করলে। সকলে দণ্ডায়মান হ'য়ে সুলোচনাকে অভিনন্দন কর্‌লেন। সুলোচনা যুক্তকরে, অবনতমুখে নমস্কার করে', যেখানে পাত্রগণ উপবিষ্ট, সেখানে উপস্থিত হ'ল; কম্পিতবক্ষে লাবণ্যের নিকট গিয়ে তার গলায় পুষ্পমাল্য পরিয়ে দিল, মানদার হস্ত হ'তে চন্দন নিয়ে লাবণ্যের কপালে টিপ দিল এবং নতজানু হ'য়ে লাবণ্যকে প্রণাম কর্‌ল। লাবণ্য স্মিতমুখে সুলোচনার দু'টী হাত ধরে' ওঠাল। এবার শঙ্খধ্বনির সহিত উলুধ্বনি মিশল। সমগ্র সভা উচ্চকণ্ঠ উল্লাসরবে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। ক্ষণপরে বৃদ্ধ দাদু রামানুজ এসে আশীর্ব্বাদ করলেন এবং রাত্রি আটটার সময় লাবণ্য ও সুলোচনার শুভ-বিবাহ হ'য়ে গেল।

দাদু হেসে বল্লেন—"হাঁ, দিদিমণির চোখ আছে বটে,—ঠিক্ চিনে নিয়েছে।"

বজ্রাচার্য্য

পুরাতনের পরিচয়

বৈশাখী

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

পল্লীগ্রামে বাস। কুলীনের সন্তান। বসতবাটী মন্দ ছিল না। অতি উচ্চ সারি সারি আম্রবৃক্ষ ও শ্যামল দুর্ব্বাদলে সুশোভিত উদ্যান। প্রায় পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর ভূমি। সবৎসা গাভী প্রায় ত্রিশটি। শৈশবাবধি খাঁটি গোদুগ্ধ পান করিয়া ও আদরে প্রতিপালিত হইয়া উন্নত, সুচিক্কণ; সবল দেহ। অনায়াসে দশ ক্রোশ হাঁটিয়া শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতাম। বাটীর অনতিদূরে বিশাল স্বচ্ছ পুষ্করিণী, সেখানে অবগাহন করিয়া মধ্যে মধ্যে দেহ ক্লান্তি দূর করিতাম। গ্রীষ্মাবকাশে কখন কখন তটস্থিত আম্রকাননে বসিয়া নূতন উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মিলনস্থল বাছিয়া পাঠ করিতাম। অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু কোথায় এবং কাহার সহিত তাহার স্থির সিদ্ধান্ত বিশ বৎসর বয়সেও করিয়া উঠিতে পারি নাই। শুনিয়াছিলাম, বর্দ্ধমান জেলায় শ্বশুরালয়।

যাহা হউক, শীঘ্রই জানিতে পারিলাম। পিতার মৃত্যুর পর আমিই পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর, উদ্যান ও বসতবাটীর সম্পূর্ণ অধিকারী হইলাম। কলেজের পড়াও বন্ধ হইয়া গেল। বন্ধুগণ বলিলেন, এ হেন স্বাধীন ও সুখের জীবন সস্ত্রীক ভোগ না করা মহাপাপ। অগত্যা অনেক অনুসন্ধান ও ব্যয় করিয়া আমার বাল্যবিবাহিতা সহধর্ম্মিণী মন্দাকিনী দেবীকে বর্দ্ধমান জেলার শ্বশুরালয় হইতে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। মন্দাকিনী এই নূতন ঘটনায় কিছু আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া অধোবদনে অবগুণ্ঠনাবৃতাবস্থায় আমার সহিত নীরবে নূতন জীবন পত্তন করিতে বসিয়া গেল।

আমার প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা প্রভৃতি অপূর্ব্ব বিষয়ের চর্চ্চা অতি অল্প ছিল, সুতরাং বর্দ্ধমান হইতে আসিতে আসিতে দুই একবার গলদ্ঘর্ম্ম ও একবার সামান্য একটু আতঙ্কও হইয়াছিল। রক্তের চাঞ্চল্য ও প্রথম হইতে একটু অভ্যাস না থাকিলে প্রথম প্রেমের অভিনয় সহজেই কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। শারীরিক ও মানসিক উপাদান সকলের সমান হয় না। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, রেলের গাড়ীতেই প্রেমের সঞ্চার হইবে; কিন্তু যখন বাস্তুভিটায় পদার্পণ করিয়াও সঞ্চারের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, তখন হতাশ হইয়া পড়িলাম। মন্দাকিনী ২৩।শ হইয়াছিল কি না, জানি না।

মন্দাকিনী সুন্দরী। মন্দাকিনী একটু লিখিতে পড়িতে জানে। মন্দাকিনীকে সকলেই ভালবাসিল। বাড়ীর মধ্যে ছিলেন কেবল আমার সেকালের পিসী মহামায়া 'দেব্যা'। তাঁহার নাম কেহই জানিত না, কিন্তু পিতা ঠাকুরের উইলে পিসীমাতার অংশে শামলী গাভী পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সূত্রে লোকসমাজে তাঁহার নাম প্রচারিত হয়। লজ্জায় পিসীমাতা সে গাভী লইলেন না। পিসীমাতা বলিলেন, "ছি, ছি, নরোত্তমের (অর্থাৎ আমার পিতার) কি আসন্নকালে বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল?" ইহা বলিয়াই কাঁদিয়াছিলেন। সকলে অনেক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাঁহার নামপ্রচার করিয়া নরোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়, বংশে যে বিশেষ কোনও কলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে; এবং তাঁহার উদ্দেশ্যও নিতান্ত মন্দ ছিল না; তবে আসন্নকালে চতুর্দ্দিক স্থির রাখা সুকঠিন।

পিসীমাতাও মন্দাকিনীকে ভালবাসিলেন। আমিও সকলের ন্যায় মন্দাকিনীর গুণে বদ্ধ হইলাম; এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদিগের মধ্যে কখন কোন কলহ হয় নাই। কখনও হয় ত মন্দা সন্ধ্যার পরে আম্রকাননে গিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আসিত (এরূপ আমার

সন্দেহ হইয়াছিল) ; কিন্তু তাহার কোন কারণ ছিল না। স্নেহলালিত বালিকা-জীবন, শৈশবের সহচরী, জনক-জননীর স্নেহ মমতা প্রভৃতি দূরে রাখিয়া আসিলে কাহার না একটু লুকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা হয় ?

দুই

কিন্তু এ দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। যদি কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে যে, হয় ত মন্দাকিনী পিত্রালয়ে অবস্থানকালে লুকাইয়া হৃদয় অন্য কাহাকেও দিয়াছিল, সেটাও ভুল। সে হৃদয়ে পাপচ্ছবি কখনই প্রতিবিম্বিত হয় নাই! সে হৃদয় নিষ্কলঙ্ক। সেখানে দীর্ঘনিশ্বাসের অঙ্কুর কোথা হইতে আসিল, তাহা মানবচরিত্রের একটি কঠিন প্রহেলিকা। হয় ত বসন্তসমাগমে যেমন মলয়পবন বহে, সেইরূপ জীবনে যৌবনবসন্ত আসিলে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতির তারতম্য হয়। তবে মন্দাকিনীর স্বামিসন্নিধানে থাকিয়াও বোধ-হয়-কোন-আশা-মিটিল-না রকমের ভাবটা দেখিলে মধ্যে মধ্যে একটু কষ্ট হইত।

প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। মন্দাকিনীর যত্নে ও পরিশ্রমে সংসারটা এক প্রকার টিঁকিয়াছিল। কিন্তু আমি নিজে পূর্ব্বেকার সরল রেখা হইতে কিছু এ দিক ও দিক হেলিতে দুলিতে লাগিলাম।

সকলেই বলিল, "অনেকদিন হইয়া গেল, কিন্তু ঘন-শ্যামের একটি পুত্র সন্তান হইল না।" কুলীন ব্রাহ্মণের বংশরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ হেন বংশ সহসা লুপ্ত হইলে হুগলী জেলায় সদ্ব্রাহ্মণ পাওয়া দায় হইয়া পড়িবে। এই আসন্ন বিপদ গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই সম্ভাবিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমেই বন্ধুগণ প্রস্তাব করিলেন যে, পূর্ব্বপ্রথা-অনুসারে আমার পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। সময় কাহারও হাতধরা নয়, এবং একবার গেলে আর আসে না, অতএব আলস্যে পড়িয়া একটি বিবাহের সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়াটা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কথাটা লইয়া ঘোর তর্ক বিতর্ক হইয়া গেল। লেখাপড়া শিখিলেই ন্যায়-বিচারশক্তি আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। আমি তাহারই উপর ভর দিয়া সকলকে বুঝাইলাম যে, আমার পুনরায় বিবাহের প্রয়োজন নাই।

আমার রূপের ও যৌবনের তৃষ্ণা মিটিয়াছিল। সেবা যত্ন পরিচর্য্যা প্রভৃতি কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। মন্দার ন্যায় স্ত্রী দুর্লভ। অমন স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী ঘরে থাকিতে আবার বিবাহ কেন ?

সকলে ঘাড় নাড়িয়া কহিল যে, কথাটা আমি ভাল করিয়া বুঝি নাই। একটা গাভী থাকিলেও গৃহস্থ দুই তিনটা গাভী সংগ্রহ করে। বিশেষতঃ যখন পুত্রার্থ ভার্য্যার প্রয়োজন, এবং পিণ্ডার্থ পুত্রের প্রয়োজন, তখন স্বতঃই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভার্য্যাই পিণ্ডের মূলধন ; যতই বর্দ্ধিত করিবে, পিণ্ডের সার্থকতা তত অধিক পরিমাণে উপলব্ধ হইবে। এরূপ শাস্ত্রীয় বচন ও প্রমাণ সত্ত্বেও এ কালের যুবা পুরুষ যে প্রণয় প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন, তাহা ঘোর পরিতাপের বিষয় ! অহো !

তর্কে পরাস্ত হইয়া আমি মন্দাকিনীর নিকট গেলাম।

গৃহের এক কোণে বসিয়া মন্দাকিনী আমার পুরাতন কোটের জীর্ণ অংশ সংশোধন করিতেছিল। আমি ধীরে ধীরে কথাগুলি তাহাকে বুঝাইলাম।

মন্দাকিনীর শুষ্ক ম্লান মুখে হাসি ফুটিল। আমি কিছু আশ্চর্য্য হইলাম।

আমি। ইহাতে তুমি রাগ করিবে না ?

মন্দা। আমার একজন সাথী হইবে, সে ত আহ্লাদের বিষয়।

আমি। তবে ভালবাসার ভাগটা ?

মন্দা। যে সম্পত্তি নাই, তাহার আবার ভাগ কিসের ? তুমি সুখে থাক, এবং সুখী হও, তাহা হইলে আমার মনের দুঃখ যায়। আর সত্যকথা বলিতে কি, আমি একাকিনী আর থাকিতে পারি না।

আমি। আর ভবিষ্যতের ব্যয় ?

মন্দা। সুখের জন্য অনেকে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করে। সঞ্চয় করিবার আমার কি আছে ? যদি ভবিষ্যতে ব্যয়

সম্বন্ধে আমি বোঝা হইয়া পড়ি, তবে যথাবিহিত উপায় করিব।

এই বলিয়া মন্দাকিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মন্দ মন্দ সান্ধ্য বায়ু বহিতেছিল। তাহার সহিত জীবনের আগামী অঙ্কের সুখস্বপ্ন, আশা, ভয়, প্রেতচ্ছায়ার ন্যায় অন্ধকারে মিশিতেছিল। ক্রমে গৃহ অন্ধকার হইয়া আসিল। আমি নিঃশব্দে অনেক ক্ষণ পালঙ্কে বসিয়া রহিলাম। মন্দাকিনী কি করিতেছিল, জানি না। কিন্তু তখনও সে ঘর হইতে যায় নাই। পুষ্করিণীর পাড়ে আম্রবৃক্ষে পেচক ডাকিয়া উঠিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মন্দাকিনী, তুমি কোথায়?" কেহ উত্তর দিল না। সে ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়াছিল, বোধ হয়।

তিন

পুত্রার্থে যে নূতন ভার্য্যা বিবাহ করিলাম, তাহার নাম 'বৈশাখী'।

এমন নাম আপনারা পূর্ব্বে বোধ হয় শুনেন নাই। বৈশাখীর ১লা বৈশাখে জন্ম হয়। দারুণ গ্রীষ্মপ্রযুক্ত বৈশাখীর পিতা মাতা অন্য কোন সুশ্রাব্য ও সুমধুর নাম খুঁজিয়া পায় নাই।

বৈশাখীর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর, কিন্তু দেখিতে বালিকার ন্যায়। গঠন মন্দ নয়। কেহ বলিত, নিখুঁত সুন্দরী; কেহ বলিত, কদাকার। যেমন পত্র-প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী হইতে পারেন না, তেমনই স্ত্রীর রূপ সম্বন্ধে পরের মতের উপর নির্ভর করিয়া স্বামী চলিতে পারে না। আমার মতে, বৈশাখী দেখিতে বেশ, কিন্তু বোধ হয়, একটু পাগলের ছিট ছিল। তজ্জন্য পিতা মাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা পর্য্যন্ত দায়ী নহেন। বোধ হয়, আমার ও তাহার, উভয়েরই কর্ম্মফল।

বন্ধুবর্গ মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াই অপসৃত হইলেন। আমি রঙ্গালয়ে একাকী বৈশাখী ও মন্দাকে লইয়া রহিলাম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমার প্রণয় সম্বন্ধে কিছুই অভিজ্ঞতা ছিল না। মন্দাকিনী এ পক্ষের সাহায্যার্থ আসরে অবতীর্ণ হইল।

এরূপ প্রায় ঘটিয়া থাকে, এবং উপন্যাসেও দেখা যায়। স্বামীর সুখের জন্য স্ত্রীর আত্মত্যাগ চিরপ্রসিদ্ধ। অবশ্য, এ প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই, কিন্তু ভারতে রমণী-চরিত্র অতুলনীয়।

ক্রমে ক্রমে মন্দাকিনীর দৌলতে আমি ভালবাসার সরল ও বক্র প্রণালীগুলি আয়ত্ত করিলাম, এবং তাহা বৈশাখীতে আরোপিত করিলাম।

ক্রমে ক্রমে হাহুতাশ, বিরহদমন, মানভঞ্জন, ক্রন্দন, অভিশাপ ও সাধারণতঃ প্রণয়লীলার অঙ্গগুলি অভ্যস্ত হইয়া গেল।

আহ্লাদে একদিন মন্দাকিনীর হাত ধরিয়া বলিলাম, "মন্দা, তুমি যদি এত জান, তবে পূর্ব্বে শিখাও নাই কেন?"

মন্দাকিনী ধীরে ধীরে হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "পূর্ব্বে এত আগ্রহ কোথায় ছিল?"

মনে মনে মন্দাকে ধন্যবাদ দিলাম। বলিলাম, "মন্দা, তুমি বেশী লেখাপড়া শিখিলে বালিকা-বিদ্যালয়ের এক জন সর্ব্বাগ্রগণ্য শিক্ষয়িত্রী হইতে পারিতে।"

এইরূপে মন্দাকিনীর আত্মত্যাগের সহিত বৈশাখীর প্রতি আমার প্রেম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

কিন্তু বৈশাখীর হৃদয়ের কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। সে সময় পাইলেই পুষ্করিণীর পাড়ে বসিয়া আপন মনে বকিত।

এত বড় চেষ্টা পণ্ড হইলে সকলেরই মনে অবসাদ উপস্থিত হয়। জীবন একরূপ সুখে কাটিতেছিল। জীবনস্রোত কখনও কোনও বাধা পায় নাই। ক্রমে বিরক্তি ও অকারণ একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল।

আমি বলিতাম, "বৈশাখী! তুমি পাগল!"

বৈশাখী তাহাতে হাসিত, এবং আমি ক্রোধে জলিয়া যাইতাম।

মন্দাকে বলিতাম, "বৈশাখী কেমন কেমন।" মন্দাকিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত। তাহাতেও ক্রোধে জলিয়া যাইতাম।

জীবনসমস্যার শেষ পাদপূরণ করিতে বসিয়াছিলাম। মানব-জীবনের আদি অন্ত স্থিরভাবে বিচার করিতে গেলে অনেক অধ্যয়ন আবশ্যক। আমি ক্রমে দর্শনশাস্ত্র ও পুরাণাদির আলোচনা করিতে বসিলাম।

যখন গভীর নিশীথে তিমিরাবৃত গৃহে জীবাত্মার শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতাম, তখন বৈশাখী নির্বিঘ্নে ঘুমাইত। প্রেমের অযথা আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বৈশাখীর অনেকটা শান্তির আশা হইয়াছিল।

কিন্তু মন্দাকিনী ঘুমাইত না।

আমি বলিলাম, "মন্দা, তোমার ঘুম হয় না, তুমি বৈশাখীর নিকট শুইয়া থাকিও, ঘুমাইতে পারিবে।"

উত্তর না শুনিয়াই আমি পুরাতন পাঠগৃহে রাত্রি-যাপনের বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম।

ক্রমে ভাবিলাম, এই দুইটা জঞ্জাল লইয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি?

শাস্ত্র উত্তর করিলেন, "আত্মজ্ঞান।"

ভাবিলাম, এ আত্মাকে একবার দেখিতে হইবেই। দুঃখের বিষয়, আত্মা সম্বন্ধে পল্লীগ্রামে সচরাচর কেহই কোনও খবর দিতে পারে না। ইচ্ছা হইল, সহরে যাই।

ইত্যবসরে বাকি জলকর ও পথকরের দায়ে নিষ্কর ভূমি বিক্রীত হইয়া গেল। বিবাহের ঋণে ভিটা-বিক্রয় হইবার উপক্রম হইল।

চার

পিণ্ডের এ পর্য্যন্ত কোন যোগাড় হইল না, উপরন্তু স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের সহিত নিজের হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হইল। বন্ধুবর্গের অমূল্য পরামর্শ সহসা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে হয় ত এরূপ অচিন্তনীয় দুরদৃষ্ট ভোগ করিতে হইত না; কিন্তু বন্ধুবর্গ বুঝাইয়া বলিলেন যে, সংসারে সুখ দুঃখ বিধির লিপি অনুসারে ঘটিয়া থাকে; তাহাতে মানবের কোনও হাত নাই। এ বিবাহে ভালও হইতে পারিত, মন্দও হইতে পারিত। যেরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাতে অচিরাৎ পুত্র-সন্তানের মুখ দেখিয়া হয় ত আমি কাশীবাসী হইতে পারিতাম। তবে হঠাৎ গৃহে আগুন লাগিল, হঠাৎ কোনও বিপদ উপস্থিত হইল, হঠাৎ গাভী মরিয়া গেল, কিংবা হঠাৎ স্ত্রীর মৃতবৎসা রোগ দেখা দিল, এ সব দৈব; ইহার জন্য বন্ধুগণ দায়ী নহেন। আমি শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম; তাহার ফলে বুঝিতে পারিলাম যে, হয় ত বিশ্বে সবই অদৃষ্ট, কিংবা কিছুই অদৃষ্ট নহে। খানিকটা নিবার্য্য এবং খানিকটা অনিবার্য্য, ইহা কখনই হইতে পারে না। তবে যাহার যত দূর শক্তি, ততদূর সে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলে। যাহা আপাততঃ ঘটল, হয় ত সেটা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতাম। কিন্তু আবার ভাবিলাম, সে বুদ্ধি ত ছিল, তবে খরচ করি নাই কেন? কে আসিয়া আমার বুদ্ধিভ্রংশ করিল? শাস্ত্র উত্তর দিলেন, "জীবাত্মা!" এই জীবাত্মার উপর আমার ক্রমেই একটা জাতক্রোধ জন্মিল।

পিসীমা কোথায়? তিনি যদিও কুলীনের ঘরে বহুবিবাহ অনেক দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি কি ভাবিয়া বৈশাখীর বিবাহের কিছু দিন পরে বীরভূম জেলায় তাঁহার কোনও দূরসম্পর্কীয়া বৃদ্ধা ভগ্নীর মরণকালে সেবা করিতে গিয়াছিলেন।

পরামর্শদাতা কেহই নাই। মন্দাকিনীর নিকট গেলাম, কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া মন্দাকে আমার বিপদের কথা বলিলাম। মন্দাকিনীর মুখমণ্ডল বিষাদ-ছায়ায় মলিন হইয়া গেল।

মন্দা। আমার কিছু গহনা আছে, বিক্রয় করিয়া বিষয়টা রাখ।

আমি। যে খরিদ করিয়াছে, সে আর বিক্রয় করিবে না। সুবিধায় পাইলে কে এক শত টাকায় পঞ্চাশ বিঘা ছাড়িয়া থাকে? নিষ্কর ভূমি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। জলকর প্রভৃতি দেনা শোধ করিয়া আমার অবশিষ্টাংশ ত্রিশ টাকা প্রাপ্য।

মন্দা। তবে উপায়?

আমি। তোমার গহনাতে কেবল নূতন বিবাহের ২০০৲ টাকা দেনা শোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আমার হস্তক্ষেপ অবৈধ।

মন্দা। অবৈধ কেন? আমার যাহা আছে, সবই তোমার। বৈশাখী আমার ভগ্নী। তাহার দায়, তোমার দায়, আমার দায়, সবই সমান।

আমি। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। ভবিষ্যৎ?

মন্দাকিনী ভবিষ্যৎ শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "মন্দা! সবই অন্ধকার-গর্ভে। এখন কেবলমাত্র উপায় চাকুরীর অন্বেষণ। শীঘ্র জুটিবে না। জুটিলেও অতি অল্প বেতনের সম্ভাবনা। যত দিন কিছু স্থির না হয়, তত দিন উপায়?"

মন্দা। আমি বাপের বাড়ী যাই।

আমি। বৈশাখী?

মন্দা। তোমার সঙ্গে যাইবে।

আমি। আপাততঃ কোথায় থাকিবে? বোধ হয় তাহাকেও বাপের বাড়ী যাইতে হইবে।

মন্দা কিছু ইতস্ততঃ করিয়া চারিদিকে চাহিল। যেন মনের কোনও কথা বলিতে চাহিয়া বলিল না। অবশেষে বলিল, "আমার একটা কথা আছে।"

আমি। কি?

মন্দা। বৈশাখীর মনের স্থিরতা নাই। মাথারও স্থিরতা নাই। আমার ইচ্ছা, তুমি যত শীঘ্র পার, তোমার নিকটে লইয়া যাইও।

আমি। কেন? বৈশাখীর উপর তোমার কোন সন্দেহ হয়?

মন্দা। কিসের সন্দেহ! তবে নারী-চরিত্র চঞ্চল। তোমার ও বৈশাখীর উভয়ের মঙ্গলের জন্য কথাটা বলিলাম। মনে রাখিও।

তৎপরদিন মন্দাকিনী আমার পদধূলি লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। বোধ হয়, অনেক কাঁদিয়াছিল। এবং বোধ হয়, যেন আজীবনের আক্ষেপ-গাঁথা হতাশ জীর্ণ-কন্থাবৎ হৃদয়টুকু লইয়া অতি কষ্টে আমার পানে চাহিয়াছিল। বৈশাখী পিত্রালয়ে পদার্পণ করিয়া একবার বলিল, "আচ্ছা, এস।"

পাঁচ

অনেক চেষ্টাতেও একটা ভাল চাকরী মিলিল না। অবস্থা ঘোরতর মন্দ দেখিয়া আর্মেণীঘাটে ষ্টীমার-ডেকে বায়ুসেবন করিতে গেলাম।

জীবনের আদি অন্ত ভাবিয়া লইব, এমত চেষ্টা করিতেছিলাম। ধীরে ধীরে হরিদাস বাবু হুঁকা হস্তে ষ্টেশন হইতে আমার নিকটে আসিয়া একটা সেকালের সম্ভাষণ করিলেন।

হরিদাস বাবু এককালে সহপাঠী ছিলেন।

হরিদাস। কি হে? গলাটা এখন কেমন?

আমি সেকালে গাহিতে পারিতাম।

আমি। উষ্ট্রের মত।

হরিদাস। সাংসারিক অবস্থা?

আমি। উষ্ট্রশালার মত।

হরিদাস। তোমার উষ্ট্রবচন রাখিয়া দিয়া একটা গাও।

কি করি, মনের দুঃখে একটা গাহিলাম।

হরিদাস। তোমার মন ভাল নাই।

আমি। না।

হরিদাস। কেন?

আমি সংক্ষেপে জীবনের কথা হরিদাস বাবুকে বলিলাম। তিনি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "একটা চাকরী খালি আছে।"

আমি। কোথায়?

হরিদাস বাবু বুঝাইয়া বলিলেন, "হিজলি খালের কোনও লকের টোল বাবুর এক জন সহকারী কেরাণীর আবশ্যক। কোম্পানী তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। বেতন ত্রিশ টাকা। যেহেতু আমি এল্. এ. পাশ, এবং হরিদাস বাবুর তাহাতে অনেকটা হাত ছিল; তিনি বলিলেন, একটু চেষ্টা করিলে চাকুরিটি হইতে পারিবে।

তাহাই হইল।

১লা বৈশাখ ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম। জলপথে

যাত্রা পূর্ব্বে কখনই করি নাই। বিবাহের কর্ম্মসূত্রে ও পুত্রার্থ, কিংবা পিণ্ডার্থ, তাহাও করিতে হইল। প্রভাত-বাতাহত নদীতরঙ্গ যাত্রিগণকে ইঙ্গিত করিতেছিল। অসংখ্য জীবাত্মার ন্যায় অসংখ্য সূর্য্যকিরণ তরঙ্গশীর্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া নাচিতেছিল এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া যাইতেছিল। কত যাত্রী আসিল। কেহ স্থান পরিবর্ত্তনে, কেহ বায়ু পরিবর্ত্তনে, কেহ বা এ জন্মের মত দেহ পরিবর্ত্তনে সারি সারি অস্থাবর সম্পত্তি হস্তে করিয়া ডেকে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। সকলেই সাথী। কেহ গাহিতেছিল। কেহ পুরাতন তাস লইয়া জুড়ি বাঁধিয়া গ্রাবু খেলিতে বসিয়া গেল।

আমার নিকটেই একটি বৈষ্ণব বসিয়াছিল। তাহার তামুকসেবনের উৎসাহ দেখিয়া আমি এক ছিলিম সাজিয়া দিলাম।

বৈষ্ণব। আপনি বড় সৌভাগ্যবন্ত পুরুষ।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঠিক তাই।"

বৈষ্ণব তাহার বড় বড় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "আমি সে কথা বলিতেছি না। সাংসারিক হিসাবে সুখ দুঃখ, অদৃষ্ট দুরদৃষ্ট আছে, কিন্তু যাহার আত্মচৈতন্য হয়, সেই সম্পূর্ণ সৌভাগ্যবান।"

আমি। আমার আত্মচৈতন্য হইয়াছে?

বৈষ্ণব। না শীঘ্রই হইবে।

আমি। আত্মচৈতন্য কিরূপে হয়?

বৈষ্ণব। আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

আমি। আত্মা কি দেখা যায়?

বৈষ্ণব। মনে মনে দেখা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। জ্ঞান সম্পূর্ণ হইলে যাহার উপলব্ধি হয়, তাহাই আত্মজ্ঞান।

আমি। জ্ঞান সম্পূর্ণ কিসে হয়?

বৈষ্ণব। দুঃখে, কষ্টে, বৈরাগ্যে, ভক্তিপথে, তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ নাই; নির্দ্দিষ্ট সময় নাই।

আমি। আমার আপাততঃ জ্ঞানের মূল্য দেখিতেছি ত্রিশ টাকার চাকুরী।

বৈষ্ণব। ওটা অবশিষ্ট অজ্ঞানের মূল্য। আপনার জ্ঞান পূর্ব্বজন্মে অনেকটা হইয়া গিয়াছে, এ জন্মে সেই কারণে কর্ম্মচাঞ্চল্য বড় নাই। তবে যাহা কিছু আছে, তাহা শেষ অঙ্কমাত্র।

আমি। আমারও আত্মাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কবে দেখা পাইব?

বৈষ্ণব। যেদিন—যেদিন—নারী প্রকৃতির ও মানব-প্রকৃতির অসারতা দেখিতে পাইবেন।

আমি। তখন কি হইবে?

বৈষ্ণব। সে অতি ভয়ানক কথা। যাহা হউক, সেদিন আমার সহিত দেখা হইবে।

আমি। পরম বাধিত হইলাম। অনেক মহাপুরুষ বাক্যব্যয় করিয়া চলিয়া যা'ন। আপনার পুনরবতীর্ণ হইবার বার্ত্তা শুনিয়া আমার আশার সঞ্চার হইল।

তৎপরদিন হিজলী খালে ষ্টীমার পঁহুছিল। আমি কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইলাম।

বলা বাহুল্য, টোলের বড় বাবুর বড় বড় দাড়ী, এবং তাহা হইতেও বড় বড় কথা। আমি আত্মপরিচয়-প্রদানের পূর্ব্বেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জানি জানি, এ কালের 'এলে' 'মেলে' পাশ কোনই কাজের নয়; এখন তুমি বহি খাতা বুঝিয়া লও।"

বহিখাতা বুঝিয়া লইলাম, কিন্তু বুঝিতে অনেক দিন গেল। যখন বুঝিলাম, তখন সর্ব্বনাশ উপস্থিত। টোল-ইনস্পেক্টর সাহেব আসিয়া বহি খাতা পরিদর্শন করিলেন। তাহার মন্তব্যের সার এই যে, বহি খাতা 'ঝুঠা'। নৌকা প্রভৃতির আয়তন অনুসারে টোল অর্থাৎ মাশুল আদায় হইত। সেই আয়তনের মোটের সহিত অন্য নিকটবর্ত্তী লকের মোটের সহিত মিল হয় নাই। যখন আমার বহিখাতায় বর্ণিত আয়তনের মোট কম, তখন তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, তিন মাসের মধ্যে প্রায় ৫০০৲ টাকা আমি চুরি করিয়াছি।

আমি বলিলাম, "সাহেব, আমি দরিদ্র, নির্দ্দোষ। যাহা বড় বাবু বলিয়াছেন, আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এবং সব টাকাই আমি প্রত্যহ তাঁহার হস্তে দিয়াছি।"

সাহেব। আমি সমস্ত বিষয় তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি।

বড় বাবুর তোমার উপর সম্পূর্ণ চক্ষু রাখা উচিত ছিল; কিন্তু চোর তুমি, তোমাকে আমি পুলিসে দিব।

ইহা বলিয়াই সাহেব আমার বিরুদ্ধে "চার্জশীট" প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অপরাধের তালিকা একই,—জাল বহি রাখিয়া তহবিল ভাঙ্গা।

অবশেষে স্থির হইল, গেঁয়োখালি মোকামে এঞ্জিনীয়র সাহেবের তদন্ত শেষ হইলে আমার সম্বন্ধে যাহাই হউক একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে।

গেঁয়োখালি যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই মন্দাকিনী ও বৈশাখী উভয়কেই টেলিগ্রাম করিলাম।

শ্রাবণের বারিধারা মাথায় করিয়া গেঁয়োখালি উপস্থিত হইলাম। থানার অনতিদূরে একটি বাজারে উড়িষ্যাযাত্রী-দিগের চটীর এক কোণে অপরাধীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

তদন্ত চলিতে লাগিল।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে নিশাকালে আমার কুটীরের সম্মুখে একটি আগন্তুক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে ইছাপুরের কেহ থাকেন?"

আমি বলিলাম, "থাকি।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি আপনার স্ত্রী মন্দাকিনী দেবীকে সঙ্গে লইয়া অদ্য প্রাতঃকালে এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। তিনি মৃত্যুশয্যায়।"

আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। জীবন-গ্রন্থি একে একে শিথিল হইতেছিল।

আগন্তুক ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, মন্দাকিনী টেলিগ্রাম পাইয়া অনেক অনুসন্ধান ও ব্যয় করিয়া এখানে আসিয়াছে। ব্রাহ্মণ তাহার সম্পর্কে মাতুল। মন্দাকিনী আজ তিনদিন উপবাসিনী। যেখানে তাঁহারা আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেখানে জনকতক উড়িষ্যাযাত্রী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়। তাহারা সকলেই মরিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনীও রোগাক্রান্তা হইয়াছে। কোন ডাক্তার পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।

আমি তাড়াতাড়ি সাহেবের অনুমতি লইয়া মন্দাকিনীর বাসস্থানের দিকে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে একটি অট্টালিকার সম্মুখে দেখি, বৈশাখীর ভ্রাতা দণ্ডায়মান!

তাহার নিকট শুনিতে পাইলাম, বৈশাখীর ভ্রাতা তিন দিবস পূর্ব্বে সেখানে আসিয়াছে, এবং বৈশাখীর পিতার কোনও পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু জমীদার শ্যামচাঁদ বাবুর সাহায্যে আমার মোকদ্দমার তদ্বির হইতেছে।

আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৈশাখী ভাল আছে ত?"

ভ্রাতা। আছে।

আমি। সে কোনও সংবাদ আমাকে দেয় নাই কেন? আমি তাহাকে ত অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছি।

ভ্রাতা। বৈশাখী স্বয়ং এখানে।

আমি। তবে আমার সঙ্গে একবার দেখা করিবার অবসর জুটিয়া উঠে নাই?

ভ্রাতা। সে সংবাদ শ্যামচাঁদ বাবু জানেন।

কিছুক্ষণ পরেই শ্যামচাঁদ বাবুকে দেখিলাম। হৃষ্টপুষ্ট যুবাপুরুষ এবং বর্ষাকাল সত্ত্বেও মনোহর বেশ। তিনি জুতায় কাদা লাগিবার ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া আমাকে একটা ছোট নমস্কার করিলেন।

আমার মোটেই ভাল লাগিল না। আমি তাঁহাকে আমার গন্তব্য স্থানের পরিচয় দিয়া শীঘ্র মন্দাকিনীকে দেখিতে গেলাম।

দেখিলাম, কর্দ্দমের উপর ক্ষীণালোকে আমার ফটো-গ্রাফখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া মুমূর্ষু মন্দাকিনী। আমি ক্ষীণ কাতর কম্পিত স্বরে ডাকিলাম, "মন্দা!"

মন্দাকিনীর উত্তর পাইলাম না। যখন বৈদ্য আসিল, তখন আমি প্রস্তরের ন্যায় মন্দাকিনীর অতুলনীয় কর্দ্দম-লুণ্ঠিত দেহের দিকে চাহিয়াছিল মাত্র।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কম্পিতকরে মন্দার অঞ্চল হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া কম্পিতস্বরে বলিলেন, "এই যথাসর্ব্বস্ব সম্বল লইয়া মন্দাকিনী এখানে আসিয়াছে।" আমি বৈদ্যকে সেই নোট দিলাম।

"আপনি যদি ইহাকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারেন, তবে ইহা আপনারই; এবং ভবিষ্যতের জীবনও আপনার নিকট বাঁধা থাকিবে।"

বৈদ্য নাড়ী দেখিয়া কাতরভাবে বলিল, "আপনি

আসিবার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকটির আত্মা ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছে।”

আমি নোটখানি প্রদীপের শিখায় পুড়াইলাম। প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিলাম। মন্দাকে কোলে লইতে গেলাম, পাইলাম না।

তখন গভীর নিশীথিনী। সেই মলপরিপূর্ণ কর্দ্দমের উপর দেহ লুটাইয়া আমি আবার ডাকিলাম, “মন্দা!—কোথায় তোমার আত্মা?—”

বোধ হয়, তখন আমি উন্মত্ত—মন্দাকে পাইলাম না। সে গিয়াছে, না, আমি অন্ধ? তাহার শবদেহ কোথায়?

ছয়

তিন দিবস পরে জ্ঞান হইয়াছিল। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার শিয়রে বসিয়া।

আমার স্মৃতি জাগরূক হইল। বৃদ্ধের নিকট শুনিতে পাইলাম, আমিও বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, এবং সকলে আমাকে শব মনে করিয়া খালের অপর পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়াছিল।

আমি। মন্দার সৎকার করিল কে?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদিলেন। তিনি ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া কুটীরে কাহাকেও দেখিতে পান নাই। বোধ হয়, মুর্দ্দাফরাস মন্দাকে ও আমাকে—উভয়কেই শব মনে করিয়া, অন্য শবের সহিত ফেলিয়া দিয়াছিল। মন্দাকিনীর দেহ জোয়ারে ভাসিয়া গিয়াছে।

বৈশাখী ও শ্যামচাঁদ বাবু কোথায়? বৃদ্ধের নিকট শুনিলাম, তাহারা আমাকে মৃত মনে করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই শ্যামচাঁদ বাবুর তদ্বিরে তহবিল তছরূপ মোকদ্দমা হইতে আমি অব্যাহতি পাইয়াছিলাম।

শুনিয়া আহ্লাদ হইবার কথা।

আমি বলিলাম, “আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার লাসটা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, সে জন্য আপনি ধন্যবাদের পাত্র, এবং শ্যামচাঁদ বাবু সৎকারের আয়োজনটা না করিয়াই আমার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া প্রস্থান করিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।”

ব্রাহ্মণ। আপনার যে প্রকার শরীরের অবস্থা, দেশে গেলে হয় না?

আমি স্থির ও কঠিন ভাষে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, আপাততঃ আমি কোনও বন্ধুর আলয়ে যাইব। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হরিনামস্মরণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

সকলেই চলিয়া গেল। আমার সকলের সহিত পার্থিব সম্বন্ধ ঘুচিল। আমি নীল আকাশের তলে নদী-তটে বিমল বায়ু সেবন করিতে করিতে বিকট হাস্য করিলাম।

জলের মধ্যে আকাশের ছায়া, তাহারই সহিত আমার প্রতিবিম্ব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুই কি আত্মা?”

ধীরে ধীরে ছুরিকা বাহির করিলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িল, “এখনও আত্মজ্ঞান হয় নাই।” বোধ হয় আরও কোন অদৃষ্ট অবশিষ্টাংশ বাকী আছে। ঠিক তাহাই।

মনে মনে বুদ্ধির বলিহারী দিয়া সমুদ্রগামী একখানি ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম।

জাহাজের কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে?”

আমি। কুলি।

সাহেব। কয়লার কাজ করিবে?

আমি বলিলাম, “অবশ্য।”

সেই জাহাজে রহিয়া গেলাম। জাহাজ, চাঁদবালি ও সাগরসঙ্গমে যায়, এবং তথা হইতে আসে। সানন্দে কয়লার বোঝা ডেক হইতে অগ্নিকুণ্ড পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিতাম।

জীবনে কি ছিল? সেই ত রথের উপর ভগবান, এবং নিম্নে জীর্ণ চক্র। কর্ম্মের দড়িতে ভগবানকে বাঁধিয়া যে টানিতেছে, আমাদিগকেও সেই চক্র-রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ভক্তি ও জ্ঞানের ডোর কোথায়? কেবল পুরাতন তৈলবিহীন চক্রের শুষ্ক রুক্ষ আর্ত্তনাদ ও আক্ষেপ। উর্দ্ধে বৃদ্ধ জরদ্গাব ভগবান পরমাত্মা,

এবং নিম্নে কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ জীবাত্মা। চক্র ঠেলিয়া উর্দ্ধে তুলে,—কাহার বাবার সাধ্য।

মরিতে গিয়াও নিস্তার নাই। তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মরিবার এখন সাধ নাই, তাহাও বলা গেল। কি যেন বাকি আছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে সকাল কেবল এঞ্জিন হইতে ডেক এবং ডেক হইতে এঞ্জিনের অগ্নিকুণ্ড।

একদিন জাহাজের সেরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার চেহারা ভদ্রলোকের ন্যায়, তুমি কখনই কুলীর কর্ম্ম কর নাই, এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল কেন?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি আত্মাকে দেখিব।"

সেরাঙ্গ। আত্মা কি জাহাজে দেখা যায়?

আমি। কোথায় আত্মার দর্শন হয়, তাহা কি বলা যায়? আমাদের শাস্ত্রে স্তম্ভে, স্ফটিকে, এমন কি, নারিকেলের মধ্যে আত্মা দেখা যায়।

সেরাঙ্গ। যেদিন দেখিবে, আমাকে বলিও।

আমি। আচ্ছা।

ক্রমে শীত আসিল। আমি জীর্ণ কম্বলখানি মুড়ি দিয়া আত্মার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলাম। ক্রমে সাগরসঙ্গমদর্শনাভিলাষী যাত্রীর দল বাড়িতে লাগিল। প্রসিদ্ধ সাগরের মেলায় অনেক যাত্রী আমাদিগের জাহাজে আরোহণ করিত। আমি তাহাদিগকে দেখিতাম।

আমার স্বার্থ কি?

আকাশে খেচর, জলে হাঙ্গর কুম্ভীর তাকাইয়া থাকে, তাহাদিগেরই বা স্বার্থ কি?

জঠর যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইলেও জীবের অন্য অশেষ যন্ত্রণা আছে। পশু হইতে মানবেই সে যন্ত্রণার সমধিক বিকাশ।

জীবনের নীরবতা ও শান্তির মধ্যেও যন্ত্রণা ও পিপাসা আছে।

উদ্দেশ্যহীন জীবনের মধ্যেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা আছে।

আমার কোনটা ছিল, তাহা জানি না। যে জলে আমার মন্দাকিনী ভাসিয়াছিল, সেই জলের উপর থাকিতেই কি এত সাধ হইয়াছিল? ইহাই কি মায়া?

সাত

বৈশাখী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। জাহাজের পশ্চিম দিকে আঁধার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আকাশে নক্ষত্র ক্ষীণালোকে জ্বলিতেছিল। কত যাত্রী ডেকে শয়ন করিয়াছিল। আমি প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনের দিকে জোয়ারের গতি দেখিতে গেলাম।

এই চতুর্দ্দশীর জোয়ারে মন্দাকিনীর দেহ ভাসিয়া গিয়াছিল।

সহসা গ্যাসের আলোকে কামরার মধ্যে দুইটি চিত্র দেখিলাম। চঞ্চল-যৌবনা বৈশাখী শুইয়া, এবং তাহার পদপ্রান্তে শ্যামচাঁদ বাবু মানভঞ্জনরত!

বোধ হয়, ইহাই দেখা বাকি ছিল। প্রেমের বাজারে অনেক প্রাণী সাধ করিয়া আসে যায়। ঐ যে দুইটি প্রাণী, উহাদেরও ত সাধ আছে?

উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, রাক্ষসী নিশি। সাগরসঙ্গমে জাহাজ ছুটিতেছে, জীবের জীবনও ছুটিতেছে। ইহাদিগের গতিরোধ করে, কাহার সাধ্য? তবে পাপস্রোত রুদ্ধ কে করিবে? ভগবান কোথায়?

ছুরিকা বাহির করিয়া রক্তপূর্ণনয়নে ক্যাবিনের দিকে ছুটিলাম। সে দিক নিঃশব্দ, জনহীন।

হঠাৎ প্রতিধ্বনি হইল, "আহা মারিও না, উহাদেরও ত জীবনে সাধ আছে!"

সে ধ্বনি করুণাপূর্ণ, বড়ই মধুর!

শক্তির গতি রুদ্ধ হইল। নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রকিরণের ন্যায় একটি রেখা অন্ধকারে দেখিতে পাইলাম। সেই রেখাতে নয়ন আরোপিত করিয়া দেখিলাম, যেন অদূরে মন্দাকিনীর শীর্ণ প্রতিমা দাঁড়াইয়া আমাকে বারণ করিতেছে, "মারিও না।" এই কি মন্দার প্রেতদেহ?

স্তম্ভিত হইয়া বসিলাম। পূর্ব্বদিক হইতে ঝঞ্ঝা-বায়ু বহিতেছে। অন্ধকারে প্রেতমূর্ত্তি বিলীন হইল।

আমি ডাকিলাম, "মন্দা! যাইও না!" কিন্তু ছায়াদেহ চলিয়া গেল।

আমার ত জীবনে সাধ নাই, উহাদের যেন আছে। তবে আমি জোয়ারে ভাসিয়া যাই না কেন?

ছুরিকা উত্তোলন করিলাম।

সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া ডাকিলাম, "আত্মা তোমাকে রক্ষা কর!"

বোধ হইল, অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ আত্মা সম্মুখে!

বক্র মুষ্টিতে আত্মাকে ধরিলাম। "আজ তোমাকে রাখে কে?" ক্ষুদ্র পুত্তলিকার ন্যায় আত্মা হাসিয়া কহিল, "আমি অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অরূপ।"

আমি। তবে তুমি একাকী দেহ হইতে বাহির হইয়া চলিলে কোথায়?

আত্মা। ভেদ তোমার "মনে"।

আমি। আত্মহত্যা করে কে?

আত্মা। মন।

আমি। আমার মন, না, তোমার মন?

আত্মা। বুঝিয়া লও।

আমি। কিন্তু তোমাকে ছাড়িব না। তোমার আদি অন্ত দেখিব।

আত্মা। তুমি আমার অর্দ্ধেক জয় করিয়াছ, অতএব আমি অর্দ্ধ-অঙ্গ হীন!

আমি। বাকি অর্দ্ধেক কোথায়?

আত্মা। মায়াবিরূপে। তুমি এখনও মন্দাকিনীর মায়া ও স্নেহে আবদ্ধ!

আমি। ভাল, দেখি সে মায়া বিদূরিত হয় কি না।

ছুরিকা লইয়া হৃদয়ে আরোপিত করিলাম। কিন্তু বাহুতে শক্তি পাইলাম না। স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা কোমল মৃণালবৎ দুইখানি বাহুর স্পর্শ অনুভব করিলাম। চতুর্দ্দিক বিমল পরিমলে ভরিয়া গেল। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া বীণার সুমধুর ঝঙ্কার কর্ণকুহর পরিপ্লুত করিল।

কতক্ষণ সে সুখ ভোগ করিয়াছিলাম, মনে নাই। জ্ঞান হইলে দেখিতে পাইলাম, সাগরসঙ্গমে কুটীরের মধ্যে শয়ন করিয়া আছি। শিয়রে আমার মন্দাকিনী বসিয়া সেবা করিতেছে।

বোধ হইল, স্বপ্ন। আবার দেখিলাম। না, সবই সত্য। কুটীরের দ্বারে পূর্ব্বপরিচিত বৈষ্ণব দাঁড়াইয়া।

তিনি মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, "বৎস, আজ তুমি বৈষ্ণবীশক্তি দ্বারা কাল জয় করিয়াছ, তুমি যথার্থই সৌভাগ্যবান। তোমার জীবন এখনও শেষ হয় নাই। প্রেম ও করুণার বলে তুমি চারিটি জীবের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করিয়াছ। কিছুদিন ভোগ কর। বাসুদেব তোমার মঙ্গলসাধন করিবেন। আমি আজ চলিলাম। ঐ যে মঠ দেখিতেছ, উহা আমার স্থাপিত। ধনের অভাব নাই। ঐ মঠে হরিহরসেবায় কালযাপন কর। যে হরিহরের মধুর ও রুদ্র শক্তি প্রেম ও করুণায় গাঁথিয়া গলায় পরিধান করিয়াছে, সে আমার প্রিয়।"

বৈষ্ণব সন্ন্যাসী চলিয়া গেল।

মঠে গিয়া মন্দাকে হৃদয়ে লইলাম। উভয়ে হরিহরের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিলাম। সংসার কি সত্য সত্যই শ্মশান? বোধ হইল, না।

আর বৈরাগী? সে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে থাকিয়া গেল।

দুই বৎসর পরে সেই মঠে পুরাতন বন্ধু হরিদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হরিদাস। কি হে! তুমি ঘনশ্যাম না?

আমি। অবশ্য।

হরিদাস। গান টান ভুলিয়া গিয়াছ?

আমি। মোটেই না। উপরন্তু একটা প্রেমের হিল্লোলে ভাসিতেছি।

হরিদাস। তবে গলাটা এখন উষ্ট্রের মত নয়?

আমি। না; এখন অনেকটা গরুড় পক্ষীর মত।

আনন্দে গাহিলাম। দিগ্‌দিগন্ত হইতে মধুরধ্বনি আসিয়া সেই গানের সহিত যোগদান করিল।

কিন্তু পিণ্ডের যোগাড় করিতে পারিলাম না, সেইজন্য মনে ক্ষোভ রহিয়া গেল। পিণ্ডগুলি খাইয়া বসিয়াছিলাম।*

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

* 'সাহিত্য', চতুর্দ্দশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১০

মার্লিন ডিয়েট্রিচ।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

মার্লিনের পরিচয় আজকের দিনে কিছুই দেবার নেই—কারণ, কথাছবি যাঁরা দেখেছেন—তাঁরা মার্লিনকেও দেখেছেন—আর যাঁরা দেখেন নি (যদিও আমার জানা নেই এমন লোক সত্যিই দেশে আছেন কি না) তাঁরাও তাঁর নাম শুনেছেন। কাজেই এই বিশ্বপ্রিয়া মেয়েটীকে নতুন ক'রে পরিচিত করবার চেষ্টা করলে—লজ্জার কারণ ঘটবে ব'লে মনে করি।

মার্লিনের বয়স এখন সাতাশ বছর। তিনি জার্ম্মানীর মেয়ে। তাঁর স্বামী থাকেন সেইখানেই—কর্ম্মোপলক্ষে। মার্লিনের স্বামীর নাম—রুডল্‌ফ, আর বছর চারেকের মেয়েটীর নাম—মেরিয়া। সে 'হলিউডে' মায়ের কাছেই থাকে। এই অদ্ভুত মেধাবী মেয়েটীর কথা পরে বল্‌ছি।

মার্লিন যখন হলিউডে আসেন, তখন থেকে এই সেদিন পর্য্যন্তও তাঁর জীবন একটা অশ্রান্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কেটেছে। বিরুদ্ধ জনরবের কাঁটা-বিছানো পথ দিয়ে তিনি তাঁর জয়যাত্রা সুরু করেছিলেন। অনেকদিক থেকে এসেছিল অনেক বাধা—অনেক ব্যথা—ও তাঁকে অপমানিত কর্ব্বার অনেক আয়োজন—কিন্তু সেদিকে দৃকপাত মাত্র না ক'রে—এই নির্ভীক তরুণী তার ডিরেক্টর জোসেফ ভন্ ষ্টার্ণবার্গের হাত ধ'রে এগিয়ে গেছেন—সাফল্যের সিংহদ্বার পানে। তাঁর হলিউডে প্রথম পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই—সেখানে তিনি পরিচিত হ'লেন 'দ্বিতীয় গ্রেটাগার্ব্বো' ব'লে। ফলে পৃথিবীবিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটাগার্ব্বোর ভক্তবৃন্দের ও অনেক অভিনেত্রীর তিনি হ'লেন চু'-চক্ষুর বিষ। এই তিক্ত জনরবের জন্য মার্লিন বাস্তবিকই দোষী ছিলেন না। তিনি আজও মনে প্রাণে রহস্যময়ী গার্ব্বোকে ভালবাসেন। সেখানে গিয়েই গার্ব্বোর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু গার্ব্বোই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন নি।

তারপর আরও দু'-একজন সুবিখ্যাত অভিনেতার বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণস্বরূপে তাঁকে জড়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল—কিন্তু বুদ্ধিমতী মার্লিন এ বিপদও অতিক্রম করেন। সেই সময় তাঁর 'মরক্কো' নামীয় সুন্দর ছবিখানি—অত্যন্ত অসন্তোষজনক আবহাওয়ার মধ্যে তোলা হয়েছিল। কারণ এর নায়ক গ্যারীকুপার এই নবাগতা অভিনেত্রীর সঙ্গে অভিনয় কর্ত্তে প্রথমে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। পরে অত্যন্ত অনিচ্ছা নিয়ে তিনি রাজী হয়েছিলেন।

তাই বলছিলাম—হলিউডে মার্লিনের আবির্ভাব—মোটেই আনন্দের ছিল না। কেউ তাঁকে দেখতে পারতো না—আড়ালে অনেকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো। তাই সুদৃঢ় চিত্ততার সঙ্গে এই সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম ক'রে মার্লিন যেদিন সত্যিই সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, সেদিন এই সব ঈর্ষ্যান্বিত সতীর্থদের লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা রইলো না। সত্যি বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়—হলিউডের আর কোন অভিনেত্রীর ভাগ্যে মার্লিনের মত এত দুঃখ আর লাঞ্ছনা ঘটে নি।

মার্লিনের পারিবারিক জীবন খুব সুখের। দিনরাত্রির প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি তাঁর মেয়ে মেরিয়ার তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত থাকেন। তার শিক্ষা, তার স্বাস্থ্য, তার সৌন্দর্য্য-বোধ কি ক'রে চরম উৎকর্ষ লাভ করবে সেই চিন্তায় মার্লিন ব্যস্ত।

মেরিয়া এরই মধ্যে খুব ভালভাবে গড়ে উঠেছে। যদিও তার শিক্ষার জন্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত আছেন—তবুও পুঁথিগত বিদ্যার বাইরের শিক্ষাটুকু তার মা নিজের হাতেই রেখেছেন। সে টাকার বাজারদর জানে, দোকানে গিয়ে পোষাক-পরিচ্ছদ কিনতে পারে এবং ডিনারের

খাদ্য-তালিকা তৈরী করতে পারে। তার বাবা জার্ম্মানী থেকে প্রায়ই তাকে অনেক খেলনা পাঠিয়ে দেন—কিন্তু সেগুলো প্রায়ই সব শিক্ষাবিষয়ক। সে সব খেলার মধ্য দিয়ে তার শিশুচিত্ত ধীরে ধীরে জ্ঞানালোকিত হ'য়ে উঠবে।

মার্লিন খুব শিশুপ্রিয়া। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দেখ্‌তে পেলেই তিনি তাঁদের কাছে ডেকে আদর করেন। মেরিয়ার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে প্রতিমাসেই তাঁর বাড়ীর বাগানে যখন তিনি পিক্‌নিকে ব্যস্ত থাকেন—তখন তাঁকে দেখে কে বলবে যে, তিনি বিশ্ববিজয়িনী মার্লিন ডিয়েট্রিচ! শিশুদের খেলার সাথী প্রাণোচ্ছল মার্লিন মায়ের স্নেহে, মেয়ের সখীত্ব অর্জ্জন করেছেন।

মার্লিন খুব ভাল রান্না করতে পারেন, এবং আমাদের দেশের মেয়েদের মতই এতে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পান। মেরিয়ার জন্য প্রত্যেক দিন তিনি নিজের হাতে খাবার তৈরী করেন। যদি কোনদিন 'ষ্টুডিও'র কাজের জন্য তাঁকে আগে চ'লে যেতে হয়, তবে ফিরে এসে সেদিন তিনি বারংবার মেয়ের খাদ্য-তালিকা পরীক্ষা করতে থাকেন। সে সারাদিন তাঁর অনুপস্থিতিতে কী করেছে—কী খেয়েছে—এ না জেনে তাঁর মায়ের মন তৃপ্তি পায় না। ঠিক আমাদের দেশের মত নয় কী?

কিন্তু অভিনেত্রী মার্লিনের সঙ্গে উপরোক্ত মার্লিনের কোন মিল নেই। সেখানে তিনি ধীর, স্থির, গম্ভীর। বিশেষভাবে চিন্তা না ক'রে সেখানে তিনি এক পা-ও বাড়ান না।

অভিনয়-শিক্ষার আগ্রহ তো আছেই—তা' ছাড়াও, ক্যামেরার চালনকৌশল এবং ছায়াচিত্রের যান্ত্রিক বিভাগেও তাঁর অপরিসীম অনুসন্ধিৎসা। শুনে হয় তো অনেকে আশ্চর্য্য হবেন যে, তিনি অনেক নামজাদা ডিরেক্টর ও ক্যামেরাম্যানের চাইতে ছায়াচিত্রে আলোকপাতের কৌশল ভাল জানেন।

মার্লিন কখনও কোন পার্টিতে (আনন্দ সম্মেলন) যোগদান করেন না। কারণ এই সব সম্মেলন শুধু পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও বাজে গুজবের জন্মস্থান। অপরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই। তিনি এগুলোকে অন্তরের সঙ্গে অপছন্দ করেন।

সুবিশাল হলিউডে তাঁর মাত্র কয়েকজন বন্ধু ও বান্ধবী আছেন। তাঁদের নাম হচ্ছে—যোশেফ্‌ ভন্‌ ষ্টার্নবার্গ (যাঁর নির্দ্দেশ এবং সহায়তায় আজ মার্লিন জগৎজোড়া প্রশংসার অধিকারিণী) গ্যারী কুপার, জর্জ্জ ব্যাংক্রাফ্‌ট, মরিস শিভালিয়ে, বেব ড্যানিয়েল, কনষ্টান্স ট্যালমেজ,—ইত্যাদি।

তাঁর প্রিয়বস্তু হচ্ছে—বাজার করা, মোটর চালানো এবং সাঁতারকাটা।

আজ এই পর্য্যন্ত……

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

পরলোকে

গত মঙ্গলবার, পয়লা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গ-রঙ্গালয়ের পরমহিতৈষী, নাট্যকলার একনিষ্ঠ সাধক, স্বনামখ্যাত নট, নাট্যকার, শিক্ষক ও কর্ম্মাধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র নাম-শেষ হইলেন। গিরিশ-যুগের যে স্বর্ণ প্রদীপটি এতদিন মিটিমিটি জ্বলিতেছিল, কালের ফুৎকারে তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল!

'একে একে নিভিছে দেউটী!'

দেশের নাট্যাকাশ আজ ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন! রঙ্গমঞ্চের এই ঘোর দুর্দ্দিনে অপরেশচন্দ্রের ন্যায় সুযোগ্য কর্ণধারের তিরোধান যে কতবড় ক্ষতিকর, লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। হে বাঙলার নট-নটি, অশ্রুর গঙ্গোদকে তোমরা অপরেশচন্দ্রের স্মৃতির তর্পণ কর! আমরাও তোমাদের সহিত একযোগে এই বিদেহীর আত্মার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ সম্মান এবং তাঁহার পরিবারবর্গের গভীর শোক ও মর্ম্মান্তিক দুঃখে আমাদের অন্তরের সহানুভূতি এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

গিরিশের সৃষ্ট আদর্শ,—যাহা অপরেশচন্দ্র প্রথম যৌবনে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং জীবনের অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহাতে অনুপ্রাণিত ছিলেন, বাঙলার রঙ্গালয়ে তাহা অক্ষয় ও উজ্জ্বল হইয়া থাকুক।

হেলেন হেজ্

শ্রীমতী প্রতিভা শীল

আজ যাঁর কথা বল্‌ব, ইনি কিন্তু এখনো 'মেট্রো'র 'তারকা' 'নক্ষত্র' বা, 'চন্দ্রিমা' কোনটারই একটা-ও বিশেষণে বিভূষিতা হ'তে পারেন নি। তা' না হ'লে-ও, বোধ করি এ কথা বলা অসঙ্গত, বা এমন আশা করা আমাদের পক্ষে দুরাশা হবে না যে, তিনি ও খুব শীঘ্রই 'হলিউডে'র একজন তারকা-শ্রেণীভুক্তা হ'য়ে যাবেন। এই সুদর্শনা অভিনেত্রীর নাম হেলেন হেজ্ ব্রাউন,—বাড়ী, ওয়াশিংটন। এর চিত্র-জীবন সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলেই আমাদের এই বলে' আরম্ভ করা উচিত যে, এই মেয়েটী ছেলেবেলায় এত বেশী থিয়েটারে অভিনয় করেছেন যে, একুশ বছর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি চিত্রাভিনয় কর্‌বার মত সামর্থ্য ফিরে পান নি।

থিয়েটারে যোগদানকালীন পারিপার্শ্বিক ঘটনাটী-ও তাঁর জীবনে ভারী চমৎকার। একদিন হেলেন তাঁর পুতুল প্রভৃতি নিয়ে খেলায় ভারী ব্যস্ত, এমন সময় তাঁর পিতার এক বন্ধু তাঁদের বাড়ী এসে উপস্থিত। এই বন্ধুটী ওয়াশিংটনের বিখ্যাত একটী থিয়েটারের ম্যানেজার। 'দি রয়াল ফ্যামিলি' পুস্তকে একটী ছোট চরিত্র অভিনয় করার জন্যে একটী সুশ্রী অভিনেতা খুঁজে বার কর্‌তে ম্যানেজার তখন সশব্যস্ত। হেলেনকে দেখেই তাঁর মন একবার অজ্ঞাত উল্লাসে এবং পরমুহূর্ত্তে পরাজয়ের নৈরাশ্যে আন্দোলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। হেলেনের পিতা তাঁর বিশেষ বন্ধু;—কাজেই মনে মনে অনিচ্ছা থাকলে-ও তাঁর মত নিয়ে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। কিন্তু যত মুস্কিল হ'ল হেলেনকে নিয়ে। তিনি তাঁর পুতুল কিছুতেই ছাড়তে চান্ না। অনেক বলে' অবশ্য শেষে রাজী করা গেল, কিন্তু সদ্যপ্রবিষ্ট 'ইটন্ স্কুলে'র নানাবিধ স্মৃতি তাঁকে তখন ব্যাকুল করে' তুল্‌ল। পরিশেষে, কমলালেবুর 'কেক্' অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাঁকে রাজী করা হয়। এবং মহলা হবার শেষে প্রত্যহ-ই তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণ কেক্ দেওয়া হ'ত এবং তিনি-ও আগ্রহসহকারে খেতেন। অবশ্য তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বৎসর। এখনো তাঁকে তাঁর বাল্য জীবনের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিলে হেলেন হাসেন এবং বলেন: ছেলেবেলায় স্বাস্থ্য ভাল না থাকার দরুণ বাবা আমার জন্যে পৃথক এক গাই রেখেছিলেন, সে দুধে অন্য কারও ভাগ বসাবার অধিকার ছিল না। দুগ্ধপ্রিয় মেয়ে যে কমলালেবুর কেকের লোভ সাম্‌লাতে পারবে না, এ আর বিচিত্র কি?...

হেলেন কিন্তু বইখানিতে এমন সুন্দর অভিনয় করলেন যে, সকলেই তা'তে বিশেষ প্রীত হলেন এবং অন্যান্য থিয়েটার থেকে তাঁকে নেবার জন্যে ঘন ঘন আমন্ত্রণ আস্‌তে লাগ্‌ল। তাঁর লেখাপড়া কিছু হবে না দেখে, তাঁর পিতা অমত কর্‌তে লাগ্‌লেন; অথচ, মনে মনে মেয়ের সাফল্যগৌরবে বুক-ও ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শেষে ঠিক হ'ল সারা গ্রীষ্ম হেলেন অভিনয় করবেন এবং শীতকালটা স্কুলে কাটাবেন।

এই গেল হেলেনের অভিনয়-জীবনের প্রথম স্তর। পূর্ব্বেই বলেছি একুশ বছর পার হবার আগে হেলেন চিত্রে অভিনয় করবার সুযোগ পান নি। ওইভাবে স্কুল এবং অভিনয় করে' তিনি কিরূপে হলিউডে এসে জুটলেন, এবার সেই কথাই বল্‌ব। এটা বলবার আগে একটা কথা বলে' নিতে চাই। হেলেনের মা ক্যাথারিন বেশ ভাল অপেরা গায়িকা ছিলেন। সেই সূত্রে দু'-চারটা ভাল ভাল অপেরা হাউসে তাঁর আধিপত্য ছিল। মেয়ের অভিনয়সাফল্যে বিশেষ গর্ব্বিত হ'য়ে একদিন তিনি মনে মনে ঠিক কর্‌লেন, হেলেনকে একটা ভাল জায়গায় ঢুকিয়ে দিতে হবে।

একদিন হেলেন ওয়াশিংটনে একটী থিয়েটারে 'গিবসন্' বালিকার অনুকরণে অভিনয় কর্‌ছেন, এমন সময় 'ওয়েবার এণ্ড ফিল্‌ডে'র মিঃ লিউফিল্‌ড হঠাৎ সেখানে এসে পড়লেন। মিঃ ফিল্‌ড্‌ ওঁর নাম জিজ্ঞেস কর্‌লেন এবং উক্ত থিয়েটারের ম্যানেজারকে বলে' গেলেন: এই মেয়েটী যদি কখনো নিউইয়র্কে যায়, সে যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে। ভাগ্য আর কা'কে বলে! ··

ম্যানেজারের মুখে এই খবর শুনে হেলেনের মা অতি-মাত্রায় উৎফুল্ল হলেন এবং ফিল্‌ডের মতো লোকের উক্তি শুনে মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে মনে মনে আশাতিরিক্ত উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন।

এরপর অনেক দিন কেটে গেল। ওয়াশিংটনে অভিনয় করে' পয়সার দিক্ দিয়ে বিশেষ সুবিধা না দেখে একদিন তিনি মেয়েকে নিয়ে মিঃ ফিল্‌ডের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। তখন হেলেনের বয়স বার তের।

আশ্চর্য্যের কথা, এতদিন পরে হেলেনকে দেখেই মিঃ ফিল্‌ড ঠিক্ চিনে ফেল্‌লেন এবং তাঁর অধীনে তাঁকে থাক্‌তে বল্‌লেন। প্রায় চার বছর তাঁর তাঁবেদারী কর্‌বার পর একদিন হঠাৎ মিঃ জন ড্রু 'প্রডিগাল হাস্‌বাণ্ড' পুস্তকে তাঁকে অভিনয় কর্‌বার জন্যে আমন্ত্রণ করেন। তখন হেজ্ একদিকে নিজের লেখাপড়া, ফ্রেঞ্চ শিক্ষা এবং রাত্রে থিয়েটারের মহলা দেওয়া নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত, আবার অন্যদিক থেকে এলো এই ডাক। হেলেন বলেন: এই সময়টা তাঁর জীবনটা কেটেছে, দোটানার মাঝে। অনেকটা ডক্টর জেকিল এবং মিঃ হাইডের 'ডিমিনিউটিভ'-এর মতো। ··

যাক্, প্রডিগাল হাস্‌বাণ্ডে তিনি সুন্দর অভিনয় করেন। তা'তে চমৎকৃত হ'য়ে মিঃ ড্রু 'পলিয়ানা' পুস্তকে অভিনয় করবার জন্যে তাঁকে খুব চেপে ধরেন। এই পুস্তকে তিনি নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর অভিনয়ের সুনাম সমস্ত আমেরিকায় বিশেষরূপে ছড়িয়ে পড়ে।

তখন চার্লস্ ফ্রোমান-এর নজর পড়ল হেলেনের ওপর। তিনি 'ডিয়ার ব্রুটাস্' পুস্তকে উইলিয়াম গিলেটের সঙ্গে তাঁকে রাণীর চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে অনুরোধ করেন। হেলেন বলেন: এ-রাণী, শুধু সাজা রাণী নয়,—এ রাণী সাজতে হ'লে, অনেক কিছু রাণীর কাজ জানা চাই। আট সপ্তাহ অর্থাৎ দু'মাস এই বইয়ের মহলা দিয়ে হঠাৎ ম্যানেজার হুকুম করলেন: এটা এখন থাক্, এখন 'টু দি লেডিস্' বইখানির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত কর।

আমাদের দেশের মেয়েরা হ'লে কি করতেন বল্‌তে পারি না, কিন্তু হেলেন একটু-ও প্রতিবাদ না করে' তাঁর কথামত কাজ করে' গেলেন। এবং ক্রমান্বয়ে একটীর পর একটী পুস্তকে অভিনয় করতে লাগলেন। তার মধ্যে আলফ্রেড্ লাণ্ট-এর সহিত 'ক্লেয়ারেন্স' পুস্তকে এবং

অন্যান্য অভিনেতার সঙ্গে 'কোয়ারান্টাইন্ড্', 'ড্যান্সিং মাদাম্স্' ও 'সিজার এণ্ড ক্লিওপেট্রা' পুস্তকে তাঁর অভিনয় অতি সুন্দর। তারপর তিনি 'বাব্স্ দি সাব-ডেব্' পুস্তকখানিতে অতি চমৎকার অভিনয় করেছেন। এই বইখানিতে তাঁর অভিনয় এত উচ্চঅঙ্গের যে, কেউ কেউ তাঁকে তারকা-শ্রেণীভুক্তা করতে দ্বিধা করেন নি।

এর মধ্যে হেলেনের জীবনে আরো একটা অভিনব জিনিষ ঘটে গেল,—সেটা হচ্ছে তাঁর বিবাহের 'পাকা দেখা'। কথাটা একটু বিচিত্র শোনালে-ও সত্য। হেলেন এমন ই এক শুভক্ষণে রঙ্গমঞ্চকে বরণ করেছিলেন যে, রঙ্গমঞ্চ বাদ দিয়ে তাঁর কোন সত্তা-ই বজায় রইল না। এইবার তাঁর পাকা দেখা অনুষ্ঠানটির কথা বল্‌ব—এটা বেশ 'রোমান্টিক্'-ও বটে!...তখন হেলেন সিজার এণ্ড ক্লিওপেট্রা পুস্তকে অভিনয় কর্‌ছেন, হঠাৎ একদিন চিকাগোর বিখ্যাত নাট্যকার চার্লস ম্যাকার্থার-এর সঙ্গে তাঁর দেখা। শুধু দেখা নয়, যাকে বলে 'লভ্ এ্যাট্ ফার্ষ্ট সাইট্' তাই-ই। নাট্যকার-মশায় ভাবুক এবং প্রেমিক লোক; তিনি একমুঠো চীনাবাদাম নিয়ে হেলেনের দিকে অগ্রসর করে' বললেন: আমি ইচ্ছা করি, এই বাদামগুলি আপনার হাতে গিয়ে জহরৎ-এ পরিণত হোক্।...অদ্ভুত হ'লে-ও, এতবড় শুভেচ্ছা উপেক্ষা করা সোজা কথা নয়! কথাগুলো হেলেনের বুকের তারে গিয়ে ঘা দিলে।..এরপরই হ'ল তাঁর চায়ের নিমন্ত্রণ। আগেই বলেছি, নাট্যকার-মশায় ভাবুক লোক,—সাধারণের উপহাস-বিদ্রূপের গণ্ডী অনেকদিনই তিনি কাটিয়ে বেরিয়ে গেছেন। কাজেই একখানি খোলা ফিটন গাড়ী করে' সহস্র সহস্র পথের দর্শকদের কৌতূহল উৎপাদন কর্‌তে কর্‌তে তিনি টেনে আনলেন হেলেনকে তাঁর নিজের বাড়ীতে। (অবশ্য হেলেনের এতে বিশেষ অমত ছিল না)।

এরপর কয়েক সপ্তাহ-ই আর নাট্যকার চার্লিকে দেখতে পাওয়া গেল না।—নাট্যকার, কবি মানুষ,—সবই সম্ভব!

একদিন হেলেন অভিনয় কর্‌ছেন, কয়েকজন মিলে চার্লিকে থিয়েটারে ধরে' নিয়ে এলো। বাঁধাধরা নিয়মমত সেদিন চলে' যাবার সময় তিনি হেলেনের অভিনয়ের অতিমাত্রায় প্রশংসা করে' গেলেন এবং বলে' গেলেন: অভিনয় তাঁর এত ভালো লেগেছে যে, তিনি ফের কাল দেখ্‌তে আসবেন।...কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা!'—পরদা উঠ্‌লেই হেলেন চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকেন। কিন্তু কোথায় চার্লি আর কোথায় তাঁর প্রতিজ্ঞা!

NEIL HAMILTON and HELEN HAYES in "THE SIN OF MADELON CLAUDET"

হেলেন একটু বিমর্ষ হ'য়ে তাঁর এক বন্ধুকে তখন নিজের দুঃখের কথা বল্‌লেন। তিনি মতলব দিলেন চার্লিকে 'টেলিফোন্' করতে; এবং এ-ও বল্‌লেন যে, তাঁর জীবনে যদি এরকম ঘটত, তা' হ'লে তিনি তাঁকে 'রিং' করে' এমন বিব্রত করে' তুলতেন যে, হয় তা'তে তিনি বাড়ী ছাড়তেন, না হয় টেলিফোনের নম্বর বদল

করতেন।...কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, এ সত্ত্বে-ও হেলেন কিছুই করলেন না।

..এরপর একদিন হঠাৎ চার্লি এসে হেলেন এবং তাঁর মাকে সান্ধ্য-ভোজের নিমন্ত্রণ করে' গেলেন এবং হেলেনের মা-ও প্রতিদানে তাঁকে একদিন তাঁদের বাসায় নিমন্ত্রণ করলেন।
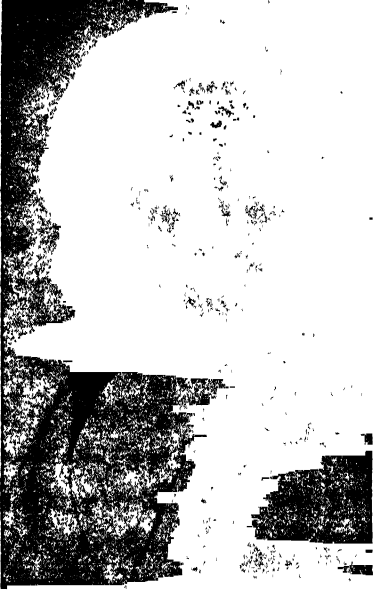
এই নিমন্ত্রণ-ই তাঁদের জীবনে সামঞ্জস্য এনে দিলে। এরপর আর হেলেনকে পরদা উঠলেই আগ্রহসহকারে চাইতে বা রিং করবার মতলব ভাঁজতে হয় নি। এই নিমন্ত্রণের পরেই তাঁদের বিবাহ হ'য়ে গেল।

বিবাহের পর তিনি 'হোয়াট্ এভ্রি ওয়্যান্ নোজ' পুস্তকে মাত্র চার সপ্তাহের জন্যে অভিনয় করেন এবং এরপর অসুস্থ হন।

স্বতস্বাস্থ্য লাভ করবার জন্তে তিনি কয়েকজনের পরামর্শে কালিফোর্ণিয়ায় যাবার জন্তে বদ্ধপরিকর হন্। এবং কালিফোর্ণিয়ার টিকিট কাটার সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজেই মেট্রো অবসর বুঝে তাঁকে তাঁদের 'কন্ট্রাক্ট ফর্ম্মে' সই করিয়ে নেন। মেট্রোতে তাঁর প্রথম ছবি হচ্চে 'সিন্ অফ্ ম্যাডিলন্ ক্লডেট'। চিত্র-জগতে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা-শূন্যা হ'য়ে-ও তিনি বইখানিতে এমন অভিনয়নৈপুণ্য এবং চাতুর্য্য দেখিয়েচেন যে, বিধিদত্ত প্রতিভা ছাড়া তা' কখনই সম্ভবপর নয়। সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হয়েচে: তাঁর চিত্রাভিনয়, রঙ্গাভিনয়ের চেয়ে নিকৃষ্ট ত নয়ই, বরং আরো উৎকৃষ্ট।

এরপর তিনি 'এ্যারোস্মিথ,' 'ফেয়ারওয়েল টু আর্ম্‌স' র‍্যামান্ নোভারোর সঙ্গে 'সান্ এণ্ড ডটার', 'নাইট্ ফ্লাইট্' এবং মণ্ট গোমারির সঙ্গে 'এ্যনাদার লাঙ্গুয়েজ' অভিনয় করেছেন।

নিজের অভিনয় সম্বন্ধে-ও হেলেনের উক্তি ভারী চমৎকার। তিনি বলেন: যদি অভিনয় করার চিন্তা-মাত্রেই কোন অভিনেতা মনে মনে উত্তেজিত না হন্, তা' হ'লে তাঁর এ কাজে হাত দেওয়াই উচিত নয়। তাঁর জানা আবশ্যক, কিভাবে অভিনয় করলে মানুষের মনে ঘা দেওয়া যায়—তা' না পারলে, কোনদিনই তিনি এদিকে কৃতকার্য্য হ'তে পারবেন না।

আমরা হেলেনের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে অনুমোদন করি।

প্রতিভা শীল

বিস্ময়
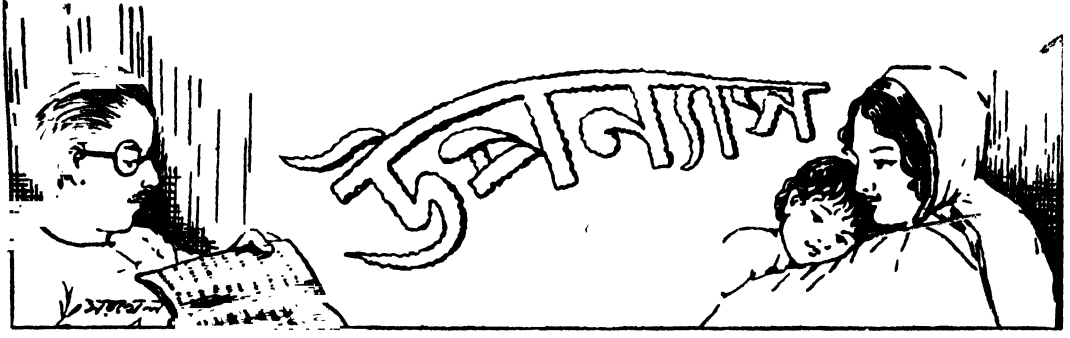
[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

শিয়ালদহ ষ্টেশনে ধ্রুবেশ বিমনার মত দাঁড়াইয়াছিল।

একজন ভিখারিণীর করুণ কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। ভিখারিণীর বেশ-বাস বিপর্য্যস্ত, মুখ-চোখ অনাহার-অনিদ্রায় বিশুষ্ক, শীর্ণ দুর্ব্বল পা দু'খানি অতিকষ্টে দেহভার বহন করিয়া আছে মাত্র। প্রাণহীন ম্লান করুণ কাতর দুইটি চক্ষু তুলিয়া ততোধিক দীন করুণ-কণ্ঠে ভিখারিণী কহিল, বাবু, দয়া ক'রে একটা পয়সা দিয়ে যান না।

ধ্রুবেশ ভিখারিণীর দৈন্যদীর্ণ অবয়ব অপাঙ্গে একবার দেখিয়া লইয়া একটি ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পকেটে হাত দিয়া প্রথম যাহা উঠিল। তাহাই ভিখারিণীর প্রসারিত করে তুলিয়া দিয়া যেন পরম স্বস্তি অনুভব করিল।

ভিখারিণী আশাতীত দানে বিস্মিত হইয়া কহিল—বাবু, আপনার ভুল হ'য়ে থাক্‌বে হয়তো, এটা যে আধুলি।

ধ্রুবেশ অত্যন্ত সহজভাবেই বলিল, আধুলি? ও—তা' হোক্।

দাতার মুখের পানে চাহিয়া ভিখারিণী অধিকতর বিস্ময়ে ভাষা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিল। তারপর নিঃশব্দে একটা নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, ওমা, ধ্রুবেশ! তুই?

অন্য কোন অবস্থায় ধ্রুবেশ সামান্য একজন পথের ভিখারিণীর মুখে নিজের নাম শুনিয়া হয়তো চকিত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইত, কিন্তু বিদায়ের পূর্ব্বে নিখিলেশের মুখে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারায় কাহার ভাগে কি পড়িল শুনিয়া তাহার মনটা একেবারেই ভাল ছিল না। তাহার ভাগে শূন্য পড়িলেও সে বিচলিত হইত না। তাহার ভাগে পড়িয়াছে,—পুরীর বাড়ী ও নগদ কুড়ি হাজার টাকা; আর নিখিলেশের ভাগে পড়িয়াছে,—দেশের বাড়ী ও নগদ কুড়ি হাজার টাকা—এক পয়সাও বেশী নয়, কম নয়। হিসাব করিয়া দেখিলে ধ্রুবেশেরই জিত হইয়াছে, কিন্তু এমন জিত সে চাহে নাই। নিখিলেশ স্পষ্ট করিয়াই শুনাইয়া দিয়াছে যে, মা আজীবন তাহার ছোট ছেলেটিকেই ভালবাসিয়াছেন, তাহাকে দিয়াই তাঁহার সুখশান্তি হইবে মনে করেন, কাজেই বড় ছেলের সঙ্গে আজ তাঁহার কোন সম্বন্ধই রহিল না।

ধ্রুবেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, দেশের বাড়ীতে তা' হ'লে মায়ের আর ভবিষ্যতে স্থান হবে না?

নিখিলেশ উত্তরে বলিয়াছিল, হবে সেইদিনই, যেদিন তিনি তাঁর ছোট ছেলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেল্‌বেন।

ধ্রুবেশ আর কোন কথা কহিতে পারে নাই।

এই সব কারণেই মন ও হৃদয় তাহার এমন হইয়াছিল যে, সেখানে বিস্ময় আর জাগিয়া উঠিতে পারে নাই।

ধ্রুবেশ ভিখারিণীর মুখের পানে আর একবার চাহিতেই সে বলিল, ধ্রুবেশ, আমার মত আবাগীকে যদি চিন্‌তে না পেরে থাকিস তো আর চিন্‌তে চেষ্টা ক'রে কাজ নেই।

ধ্রুবেশ আর একবার ভাল করিয়া ভিখারিণীকে নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু চিনিয়া উঠিতে পারার মত কিছুই সে ও বিকৃত মুখে দেখিতে পাইল না।

ভিখারিণী বলিল, তোর সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভালুই হলো। তোর দাদার বাসার ঠিকানাটা আমাকে দিতে পারিস্ ধ্রুবেশ ?

ধ্রুবেশ অপরিচিতার কাছে মুখে মুখে ঠিকানা বলিয়া গেলে সে বলিল, ও কি আমার মনে থাকবে ছাই! তুই যদি কাগজে একটু লিখে দিস্ ধ্রুবেশ।

পকেট হাতড়াইয়া কাগজ পেন্সিল যখন মিলিল না, তখন ধ্রুবেশ বলিল, কই, কাগজ পেন্সিল তো নেই। ও আর মনে থাকবে না ?

ভিখারিণী কি যেন মনে মনে ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, ওতেই হবে।

ধ্রুবেশ তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের দেয়াল ঘড়িটার পানে চাহিয়া কহিল, আমার ট্রেনের সময় হ'য়ে গেল। কিন্তু আপনার পরিচয় তো—?

ভিখারিণী মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, আজ থাক্, আর একদিন বরং শুনিস্।

না, আজই শুনতে চাই। যদি আমার দ্বারা—

ভিখারিণী সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, আর একদিনই ভাল। আমার পরিচয় পেলে হয় তো আধুলিটাও কেড়ে নিবি।—তারপর উন্মাদিনীর মত হাসিয়া ভিখারিণী ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

ধ্রুবেশের স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল ট্রেণের ঘণ্টা শুনিয়া। চকিতে গেট্ পার হইয়া টেণে উঠিয়া পড়িল। ট্রেণ ধীরে ধীরে চলিতে সুরু করিলে ধ্রুবেশ বৃথাই এই পরিচয়হীনা ভিখারিণীকে স্মরণের গ্রন্থিতে খুঁজিয়া মরিল।

দিব্য পাকা পূজারিণী।—

গলায় গরদের কাপড়ের আঁচল জড়াইয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল।

ধ্রুবেশ আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া কহিল, গরদের কাপড়, ফল-ফুলে সাজানো থালা, পুরোদস্তুর পূজারিণীর বেশে দেখ্ছি যে ?

বীণা সলাজ সহাস মুখ তুলিয়া কহিল, পূজো দিতেই তো যাব। মা কিছুতেই ছাড়লেন না। আজ না'কি শিববাড়ী পূজো দিলে—

লজ্জায় বীণার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল।

ধ্রুবেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, কি হয় বীণ্ ?

বীণা মুখ নত করিয়া বলিল—যে যা' কামনা করে, তার তাই সফল হয়।

সত্যি ?...আচ্ছা, কি কামনা আজ তুমি জানাতে চলেছিলে শুনি ?—বলিয়া ধ্রুবেশ বীণার লজ্জায় রাঙিয়া ওঠা মুখের পানে সকৌতুকে চাহিয়া রহিল।

বীণা বলিল, যাও, সে বুঝি তুমি আর জান না ?

ধ্রুবেশ বলিল, জানি, তবু তোমার মুখে শুন্তে চাই।

বীণা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, মা শিখিয়ে দিয়েছেন বলতে, 'ঠাকুর, এমন স্বামীই যদি দিলে তো তাঁকে ধ'রে রাখবার ক্ষমতা দাও।'

একটু হাসিয়া আবার বলিল, দূর ছাই! ওসব আমি বল্‌তে পারবো না। বলবো, তাকে সুখী কর—বড় জোর এই পর্য্যন্ত।

ধ্রুবেশ ক্ষণিক মৌন থাকিয়া বলিল - কিছুরই আর দরকার হবে না বীণ্। আমি আজই তোমাদের নিয়ে যেতে চাই।

বীণা সবিস্ময়ে কহিল, সেকি! কোথায় নিয়ে যাবে ?

ধ্রুবেশ বলিল, দাদা যে আলাদা ক'রে দিলেন।

বীণার অলক্ষ্যে তাহার হাতের থালা হইতে কয়েকটি ফুল ও ফল মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া গেল—হয় তো সে একটু অন্যমনস্ক হইয়াই পড়িয়াছিল।

ধ্রুবেশ যেদিন কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছিল, সন্তোষ সেদিনই মেস বদ্‌লাইয়াছিল।

সন্তোষের নূতন মেস দেখিয়া শৈলেশ যেমন বিস্মিত হইল, তেমন ক্ষুণ্ণও হইল। মুখ ভার করিয়া বলিল, মানুষ

যে এখানে বাস করতে পারে তা' এর পূর্ব্বে আমার কোন দিনই ধারণা ছিল না।

সন্তোষ বলিল, সবাই হয়তো পারে না, কিন্তু আমি পারি।

পারলেও আমি তোকে থাক্‌তে দেব না।

এর বেশী খরচ চালিয়ে থাকা আমার পোষায় না।

আসল কথা:—সন্তোষ কয়েকদিন ধরিয়া এমনই একটা আলো বাতাস পরিবর্জ্জিত নির্জ্জন নিরালা বাসা খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। কোনরকমে জগতের পরিচিত লোকগুলির দৃষ্টি এড়াইয়া থাকিতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যাইত। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া এই মেসের একটী ঘর মনোনীত করিয়া সে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু শৈলেশকে সে চেষ্টা করিয়াও ফাঁকি দিতে পারিল না।

সন্তোষ পুরাতন মেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া যখন চলিয়া যাইতেছিল, তখন শৈলেশ আসিয়া বলিল, কিরে, তুই নাকি মেস বদ্‌লাচ্ছিস্ শুনলাম ?

সন্তোষ বলিল, কে বললে ?

সন্তোষের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া শৈলেশ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, যেই হোক্ একজন নিশ্চয় বলেচে ; কিন্তু কাউকে না জানিয়ে যেতে চাস্—তার মানে ? কই কালও তো এসেছিলাম, কিছু তো এসম্বন্ধে বলিস্ নি।

সন্তোষ মুখ নীচু করিয়া বলিল, না।

শৈলেশ হাস্যোজ্জ্বল মুখেই বলিল, মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে বটে, যখন সে নিজেকে দণ্ড দিয়েই সুখী হয়। এসব কি তোর পাগ্‌লামী বলতো সন্তোষ ?

পাগ্‌লামী ?—বলিয়া সন্তোষ একটু হাসিল।

শৈলেশ নূতন মেসের চেহারা দেখিয়া একপ্রকার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। উচ্চকণ্ঠে বলিল, খরচ না চল্‌লেও এখানে থাক্‌তে পারবি না, আমি থাক্‌তে দেবও না।

সন্তোষ কোন উত্তর করিল না।

অনেক অনুরোধ উপরোধের পর সন্তোষ রাজী হইল;—শৈলেশ তাহার মনোমত আর একটা মেস যতদিন না খুঁজিয়া পায়, ততদিন সে এখানেই থাকিবে।

সন্তোষ ভাল একটা মেসের সন্ধানে আপনাকে মোটেই নিয়োজিত করিল না, কিন্তু শৈলেশ দিবারাত্র তাহাকে এ বিষয়ে তাগিদ দিতেছিল। নিজেও সে খোঁজ করিতেছিল।

ধ্রুবেশ দেশে যাওয়ার দিন শৈলেশদের ভবানীপুরের বাড়ীতে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু শৈলেশের সাক্ষাৎ মিলে নাই। শৈলেশ আর সন্তোষ সেদিন একটা ভাল মেসের সন্ধানে ফিরিতেছিল। রাত দশটায় বাড়ী ফিরিয়া শৈলেশ ধ্রুবেশ দা' আসিয়াছিল শুনিয়াই নিখিলেশের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে রঘুনাথের মুখে শুনিল যে, ধ্রুবেশ এইমাত্র দেশে রওনা হইয়া গিয়াছে। হাতঘড়িতে সময় দেখিয়া শৈলেশ হতাশ হইয়া পড়িল। এতক্ষণে ট্রেণ হয়তো ছাড়িয়া গিয়াছে। তবু একবার তাহার ইচ্ছা হইল ষ্টেশনে যায় ; কিন্তু রাস্তায় আসিয়াই তাহার মনে হইল, বৃথা ঘুরিয়া আসিয়া লাভ কি !

পরদিন সকালেই সন্তোষের সঙ্গে দেখা করিয়া শৈলেশ বলিল, ধ্রুবেশ দা' টেহেরাণ থেকে ফিরে এসেচেন।

সন্তোষ আনমনার মত বলিল, সঙ্গে এসেচেন না কি ? —বলিয়াই তাহার মুখ শুষ্ক ম্লান হইয়া উঠিল।

সঙ্গে এলেই বা কি, হা, হা, হা···তোকে খেয়েতো আর ফেলতে পারবে না।

শৈলেশের কথা সন্তোষের কাণে প্রবেশ করিল না। সভয়ে অন্যদিকে সে মুখ ফিরাইয়া লইল। কাছে, দরজার সাম্‌নে ধ্রুবেশের শান্ত সমুজ্জ্বল চোখ দুইটি রোষে ঘৃণায় ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিল তাহারই ঠিক চোখের উপরে। সে মুখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিবার সামর্থ্য কে যে কবে কোথা দিয়া কেমন করিয়া হরণ করিয়া লইয়া গেল তাহা সে ভাবিয়াও পাইল না।

অনাগত ভীষণ মুহূর্ত্ত তাহার চোখ খোলার অপেক্ষা করিয়াই যেন বসিয়া আছে।

শৈলেশ বিপুল হাস্যে তাহাকে অভয় না দিলে সে নিমীলিত চক্ষুদ্বয় আর খুলিতেও পারিত না।

বুকের অনেকখানিই তাহার শূন্য হইয়া আসিয়াছিল।

ক্রমশঃ

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

হিংলাজ বা ব্রহ্মযোনি-তীর্থে

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাইপো আসিয়া বলিল, "খুড়ো, এবার হিংলাজ। চল, মুসলমানের দেশে নিয়ে গিয়ে তোমায় মুসলমান করে' আনা যাক্।"

"তথাস্তু" বলিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে মণিলাল করাচীর চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পত্র দিয়াছিল। তিনি খুব শীঘ্রই তাহার উত্তরে আমাদের জন্য সব কিছু বন্দোবস্তের আশা দিলেন।

আঠারই শ্রাবণ, তের শত ছত্রিশ সাল, ইংরাজী তেসরা আগষ্ট, উনিশ শত উনত্রিশ আমাদের যাত্রার দিন। বারবেলা, কালবেলা, যোগিনী ইত্যাদি কোন বাধাই যখন খাটিল না, তখন আত্মীয়স্বজন মলিন-মুখেই বিদায় দিলেন। মনে আছে, তাঁহাদের প্রত্যেক বাধার উত্তরেই মণি বলিয়াছিল, "যাচ্ছি ব্রহ্মযোনি আদ্যা-পীঠ মায়ের কোলে। ভয় নেই, যোগিনী আপনি সরে' দাঁড়াবে।"

পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে দুই রাত এবং একটা গোটাদিন বসবাস যে কত আরামের, আমাদের মত ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে তাহা বুঝিবে না। বিশ্রামের প্রয়োজন, তাই সোমবার পাঁচই আগষ্ট, বেলা সাড়ে আটটায় লাহোরে নামা গেল। বিশ্রাম কিন্তু বেলা বারটার কমে মিলিল না। আশা ছিল, কালীবাড়ীতে আশ্রয় পাইব। কিন্তু আমাদের পক্ষে রাম উল্টাই বুঝিলেন; অর্থাৎ, কালী-বাড়ী লোকে পূর্ণ, স্থান পাইলাম না। হয় ত বিদেশে মায়ের টান দেখিয়া দেশের মা বিরূপা হইলেন। চুয়ান্ন নম্বর লজ রোডে 'এস পি লজে' আশ্রয় পাইলাম।

চন্দ্রমোহনবাবুর পিত্তাধিক্য ছিল কি না, সঠিক জানি না, তবে কিছু পটোল লইতে আদেশ দিয়া-ছিলেন। লাহোরে তাঁহার সে অনুজ্ঞা পালন করা গেল।

মঙ্গলবার, ছয়ই আগষ্ট পথের আহ্বানে আবার ট্রেনে চাপিলাম। এবার করাচী মেল। মরু-প্রদেশের বক্ষ চিরিয়া যাত্রাপথ। পলে পলে ধূলি-বালিতে স্নান; অন্যদিকে সহযাত্রীদের মুখের ও দেহের বিকট উগ্রগন্ধ; কাজেই, যাত্রাটা উপভোগ্য বলিতেই হইবে। শীঘ্রই কিন্তু মরু-মায়ায় আত্মহারা হইলাম। দিগন্তবিস্তৃত শ্বেত বালুকা, তাহার উপর সূর্য্য কিরণের লুটাপুটি। সে যে কি, তাহা বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। কোন কোনও স্থানে ওই বালিরই পাহাড়; আবার কোথাও মনে হয় তরঙ্গায়িত সমুদ্র বুঝি তাহার অবস্থিতির চিহ্ন রাখিয়া কোন অগস্ত্য-যাত্রার পথে গিয়া পড়িয়াছে। বাস্তবপক্ষে এ দৃশ্যাবলী আমাদের মনোহরণ না করিলে যাত্রাপথ ভীষণ হইয়া পড়িত। ধন্য উদ্যমশীল ইংরাজ! বৃহৎ বৃহৎ খাল কাটাইয়া এ মরুভূমিকেও তাঁহারা সরস শস্যশ্যামলা করিবার চেষ্টায় আছেন।

চন্দ্রমোহনবাবু একজন পরম অতিথিপরায়ণ। তাঁহার দয়াতেই একপ্রকার এ যাত্রার দুর্গম পথও সুগম হইল। রাম ভারতী এবং যমুনা ভারতী দুই ভাই—কতকটা যাত্রী ধরিবার দালালগোছের। এদের অন্ত কারবারও আছে। চন্দ্রবাবু ইহাদের সহিত আমাদের যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

করাচীতে বাধ্য হইয়া কয়দিন থাকিতে হইল। গৃহস্বামী দর্শনীয় কয়টী স্থান নিজের মোটরে তুলিয়া ঘুরাইয়া আনিলেন। দেখিবার মত হয় ত অনেক কিছু ছিল, কিন্তু নিম্নলিখিত কয়টীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—

প্রথম। ম্যানোরা দ্বীপ—জাহাজ ছাড়া গতি নাই। কাজেই দর্শনেচ্ছুকে পোত সন্ধান করিতেই হয়।

দ্বিতীয়। চিপ্‌টন—সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভ্রমণ স্থান।

তৃতীয়। গান্ধীবাগ—যুগ-ঋষির নামে নামকরণ হইলেও যথার্থপক্ষে এটি একটী জু গার্ডেন। নিরীহ ও হিংস্র উভয়বিধ পশুর একত্র সমবেশে তপোবন শোভা ধারণ করিয়াছে।

চতুর্থ। পোতাশ্রয় বা ডক্।

পঞ্চম। কুষ্ঠাগার—সহর হইতে এটী প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। একটী উষ্ণ প্রস্রবণ রোগীদের নিরাময়ের প্রধান ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়। আশ্চর্য্য, এখানে কয়েকটা কুম্ভীরও আছে; তাহাদের বসবাসের জন্য পৃথক গৃহ নির্ম্মিত হইতেও বাকী ছিল না।

ষষ্ঠ। এরোপ্লেনের আড্ডা।

এ পথের, অর্থাৎ হিংলাজের পথে যাত্রার পূর্ব্বে বড় বা ছোট আখড়ার শরণ লইতেই হয়; কারণ, এরাই একপ্রকার পথের মালিক, পাণ্ডা। কাশীতে কালভৈরবকে পূজা না করিলেও হয় ত বিশ্বনাথ দর্শন দেন, কিন্তু এঁদের উপাসনা ব্যতীত মায়ের দর্শন মিলে না। এখানে হিঙ্গুলা দেবীর প্রতিমূর্ত্তির নিকট (যাহা প্রত্যেক আখড়াতেই আছে।) পূজা বা পাণ্ডার নিকট অর্থদণ্ড দিয়া ছড়ি পূজান্তে পথে বাহির হইতে হয়। এ পূজার দণ্ড আবার তিন শ্রেণীর। গৃহস্থের পক্ষে একরূপ। সন্ন্যাসী গৃহস্থ, অর্থাৎ, পূর্ব্বে সন্ন্যাসী হইলেও এখনও নামমাত্র গিরি, পুরী, ভারতী উপাধি লইয়া আছেন। ব্যবসায় আছে, স্ত্রী-পুত্রেরও অসদ্ভাব নাই, এরূপ লোকের ব্যবস্থা ভিন্ন। সম্পূর্ণ উদাসীন, তাহাদের ব্যবস্থা আবার অন্য প্রকারের। ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হইলেও গৃহী সন্ন্যাসীর শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু পাণ্ডা বাবাজীরা যাহার নিকট হইতে যাহা পান, লুটিয়া লইতে ছাড়েন না। ব্যবস্থা কতকটা এইরূপ—(১) সাধারণ গৃহস্থপক্ষে ছড়িপূজা, ১।০, উদাসীন সন্ন্যাসীর পক্ষে ।/০ (২) মায়ের ভোগের পরসাই সাঃ গৃঃ ৫৲ সঃ ৩॥০ (৩) গদীপূজা গৃঃ ১।০ সঃ ।০ (৪) চন্দনা বা তিলকধারণ কেবল সন্ন্যাসীদের ।/০ (৫) সন্ন্যাসী, কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের জরিমানা ৩।০ (৬) ভাগুয়া, অর্থাৎ দুই হাত কাপড় মস্তকে বাঁধিবার জন্য প্রত্যেকেরই ১।০ (৭) হিঙ্গুলা দেবীর পূজা ২৲ (৮) কালীপূজা ১।০ (৯) কালীয়া ভৈরব ১।০ (১০) হিংলাজ মায়ের কপাট পূজা ১।০ (১১) প্রদক্ষিণ ১।০ (১২) পঞ্চক্রোশী ১।০ (১৩) ছড়িপূজা ১৲ (১৪) আগুয়ার খাবার একখানি করিয়া আধপোয়া আটা বা রুটি, এইরূপ দুইবেলা দিতে হয়; কিন্তু এখানে আড়াই টাকা ধরিয়া দিলে তাহা আর দিতে হয় না। প্রত্যেক যাত্রীকে এটি দিতেই হইবে (১৬) শরীর ট্যাক্স ৪।০

পথে নানাস্থানে সাতাইশ জায়গায় পূজা দিতে হয়। এ পূজার পূর্ব্বেই কিন্তু পাণ্ডাকে পূজাদণ্ড দিয়া যাইতে হয়। পথে ছড়িদার বা আগুয়া যাহা পারে, শোষণ করে। তাহাদের হাতে ধন-প্রাণ; কাজেই, যাত্রীরা দিতে বাধ্য। পথের এই সাতাইশ জায়গার খরচের তালিকা নিম্নে দিলাম—

( ) ছড়িপূজা ১৲ (২) গোরক্ষ কাম্‌লী ।/০ ৩) বাটিয়া ভৈরব ১।/০ (৪) নাগদাও ।/১০ (৫) শাকিয়া ভৈরব ।৫ গোরক্ষ ধুনী ॥/০ (৬) লোটন নদী ।০ (৭) নানকাশ্রম (৮) সিংহভবানী ।৫ (৯) হনুমান ।৫ (১০) সীতামণ্ডী ।ঃ (১১) কারু নদী ১॥৵১০ (১২) গুরু চেলা (১৩) গুগরিয়া ।৵০ (১৪) চন্দ্রকূপ ।৵৫ (১৫) অঘোর নদী ।৵৫ (১৬) শুইয়া ভৈরব ।৫ (১৭) কাটিয়া ভৈরব (১৮) গুদরিয়া ভৈরব (১৯) হিঙ্গুল নদী ।/০ (২০) মুণ্ডকাটা গণেশ ।/৫ (২১) আশাপুরী ।৫ (২২) কালী ১॥/৫ (২৩) হিংলাজ কপাট ও চৌকাট পূজা ১.০ (২৪) অনিল কূপ ১।০ (২৫) চৌরাশী ।০ (২৬)

খিচুড়ীওয়ালী, (ফিরিবার সময়ে) ।৫ (২৭) গদীপূজা ১।• (২৮) ভাগুয়া ।০ সাধুদের জন্য মায়ের ভোগ ৩।০, উটভাড়া, ইহাতে কেবল তাহাদের মাল যাইতে পায়, ১॥৵০, গদীপূজা ।০, এই ৫।৵০ মোট দিতেই হয়। আসলে এর একটিকেও কিন্তু খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ছড়িদার ইট-পাথর যোগাড় করিয়া সিঁদূর মাখায়, আর তাহাই পূজা করিতে হয়।

করাচীতে আবশ্যকমত সব দ্রব্যই লইতে হইল—কি পূজার কি আহারের; কারণ,পথে কোথাও কিছু মিলে না। উপরন্তু আমরা একটা তাঁবু দশটাকায় ভাড়ায় লইলাম। পথের রৌদ্র, বালুকা বা সম্মুখাগত বর্ষার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য। হিংলাজ-তীর্থ করাচী হইতে কমবেশী দুই শত মাইল পথ।

যাত্রাপথের বাহন উট। ন্যুব্জ পৃষ্ঠ, কুব্জ দেহ। প্ররোচনায় ভুলিয়া দুইটী উট লইতে হইল ; একটী মালের,একটী আরোহণের—কিন্তু পরে জানিলাম, এক উটেই মাল ও দুইজন করিয়া যাত্রী যাওয়া চলে। এই উটওয়ালাদের খোরাক প্রত্যেক যাত্রীকে আগুয়া বা ছড়িদারের মত একখানি রুটি দিতেই হয়। বহুযাত্রী না হইলে ইহারা যায় না; কাজেই দিনের খোরাক ইহাদের বেশ পোষায়।

উট আমাদের পক্ষে তের টাকা করিয়া পড়িল; কিন্তু পরে জানিলাম, ছড়িদারদের সঙ্গে এদের বাঁধা বন্দোবস্ত আছে—সাড়ে আট টাকা। যতটা বাড়ে, তাহা ছড়িদারেরই পকেটে যায়।

বৃহস্পতিবার,পনেরই আগষ্ট জুনা বা আমাদের পাণ্ডাশ্রম ছোট আখড়ায় আসিয়া পূজাদি সারিয়া পথে বাহির হইলাম। তখন বেলা প্রায় তিনটা। মণি বলিল, "খুড়ো, দেখ্‌ছো, এখানেও কালীঘাট, পেছনে ধাওয়া করেছে।"

সত্যই সিঁদূরের ফোঁটা দিয়া হাত পাতা, যাত্রীদের এখানেও সমান বিরক্ত করিয়া তুলে।

সহযাত্রী জুটিল তিনজন। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, যোধ গিরি এবং হরি পুরী। শেষোক্ত জন নাগা সম্প্রদায়ের। এছাড়া, আগুয়া, তিনজন উটওয়ালা, আমরা দুই খুড়া-ভাইপো। ভাইপো বলিয়া উঠিল, "খুড়ো, গতিক ভাল নয়, একদম 'নয়ের আড়ি'।"

আড়ি যাহারই হউক, আমরা বাহির হইলাম এবং সোৎসাহে মাতাজীর নাম গান করিতে করিতে পথে অগ্রসর হইয়া চলিলাম। করাচী হইতে হাব নদীর পরপার প্রায় সাড়ে চোদ্দ মাইল। নদীতে জল অতি সামান্য। আমরা হাঁটিয়া পরপারে আসিলাম। সেখানে প্রকৃতির খেয়ালে স্থানে স্থানে কাঁটাগাছের ঝোপ আছে। সেইস্থান হইতে নদীর জল প্রায় দশ মিনিটের পথ। মণি জল আনিতে গেল. নচেৎ উপায় ত নাই। রাত্রের আহার চাটুর্য্যে-মহাশয়ের বাড়ীর সযত্ন-প্রস্তুত লুচি ও আলুর দম।

এইস্থানে আর একদল অগ্রগামী যাত্রীর সহিত ভিড়িলাম। ইহাদের আগুয়া, অর্থাৎ পথপ্রদর্শক চৃতর, দক্ষ, কর্ম্মপটু ; শুধু তাহাই নহে, রাস্তা-ঘাট তাহার নিকট দর্পণের মত স্বচ্ছ। আমাদের ছড়িদার শ্রীমান্ কৈলাস পুরী একদম বোম্ ভোলানাথ! গঞ্জিকা পান বিলক্ষণ দুরস্ত করিয়া লইয়াছে—অন্য গুণ থাক, আর নাই থাক। সব ছড়িদারই এইরূপ মাদকসেবী।

তারপর দুইদল একত্র হইয়া চলিলাম। যখন পৌছিলাম, তখন একদল রান্নায় ব্যাপৃত হইল। দেখিলাম, আধপোয়া ওজনের এক একটী লাল পেঁয়াজ, সামান্য আলু এবং প্রচুর ঝাল। এই এদের শাক; অর্থাৎ, তরকারী। কি আনন্দেই যে এরা খায়!

মণি বলিল, 'খুড়ো, চাখ্‌বে না কি? ভয় নেই, বাঙলা ছেড়ে অনেক দূর এসেছ। এখানে অবিচারই বিচার। চাখ ত বল, চেয়ে এনে দিই।"

এইস্থানে অবধূত চন্দন গিরি নামে এক বাঙালী সাধুর সহিত আলাপ হয়। তিনিও সহযাত্রী ছিলেন।

সামান্য জল-বৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসীদের তাঁবুর মধ্যে ডাকিয়া লওয়া গেল। তারপর কয়জনেই একত্র বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ভোর রাত্রে আবার চলা সুরু করিয়া সাড়ে পাঁচ মাইল দূরের একটী ধর্ম্মশালায় বেলা নয়টায় আসিয়া আশ্রয় লওয়া হইল। শুক্রবার, ষোলই আগষ্ট।

এখানে বলিয়া রাখি, রান্না খুব প্রত্যুষেই করিয়া লইতে হয় ; নচেৎ বালির ঝড় বহিয়া সব কিছু অভক্ষ্য করিয়া তুলে। আমরা একবেলাতেই ভাত ও রুটী তৈয়ারী করিয়া লইতাম ; তাহাই দুইবেলায় চলিত।

প্রবাদ আছে, হিংলাজ যাত্রীমাত্রেই মুসলমানত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহাদের করাচীতে ফিরিয়া কোটেশ্বর শিবদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন। সেখানে নারায়ণ-সরোবরে স্নান ও বাবার অর্চ্চনায় আবার লুপ্ত হিন্দুত্ব ফিরিয়া আসে। এই কোটেশ্বর করাচী হইতে দুইদিনের পথ। নৌকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ভাড়া প্রায় যাত্রী পিছু আড়াই টাকা।

আমাদের দ্বিতীয় আস্তানা হইতে সিংভবানী যাওয়া গেল। রাস্তা প্রায় দুই কি আড়াই মাইল—পথেই পড়ে। এখানে অত্যন্ত জলকষ্ট। তৃষ্ণায় প্রাণ গেলেও জল মিলিবে না। এইজন্য চলিবার পথে প্রত্যেক যাত্রীকেই জল বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। ধর্ম্মশালার নিকট দুইটী গভীর কূপ আছে,—একটী হিন্দুর,একটী মুসলমানের। এখানে আমাদের লোটাটী সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন জল তুলিতে গিয়া কূপের মধ্যে ফেলিয়া আসেন। এ যাত্রায় জিনিষ হারাণ এই প্রথম এবং এই শেষ।

পূর্ব্বদিনের মত এখানেও দুইবেলার পাকশাক একবেলায় সারিয়া লওয়া গেল। মণি বলিল, "দেখ্‌ছ খুড়ো, মানুষ এ পথে ভগবানের ওপর কলম ডেলেছে ; অর্থাৎ, দিনে ঘুম, রাত্রে যাত্রা।"

শনিবার, সতেরই আগষ্ট, রাত্রি সাড়ে এগারটায় যাত্রা। আমরা কেহ উটে, কেহ পায়দলে সারারাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে সকাল ছয়টায় নাকায় আসিয়া পৌছিলাম। শনিবার আমাশার ভাব দেখা দেয় ; কাজেই রাত্রে চিপিটক ভক্ষণ। মাণর রুটি আহার।

রবিবার, আঠারই, মধ্যাহ্নে দুই খুড়া-ভাইপোরই এক দশা ; অর্থাৎ, চিপিটক যাহা করেন। এক বালুকাময় নদীর মাঝখানে আমাদের তাঁবু খাটান হইয়াছিল। রৌদ্র-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালু-ঝটিকা বহিয়া আমাদের শ্বাসরোধ করিতে লাগিল। এ দেশের নদী নামে আছে, কিন্তু জলহীন। বর্ষাকালে যদি খুব বৃষ্টি হয়, তবে এ সব নদীতে জল আসে ; তাহাও দুই-একদিনের জন্য।

নাকায় জাম-সাহেবের কাছারী বা চৌকী আছে। এখানে যাত্রীদের খোঁজ লওয়া হয়, গণনা করা হয়। ফিরিবার পথে সেই হিসাবের সহিত মিলাইয়া দেখা হয়।

করাচী হইতে রাজভেলা পর্য্যন্ত মোটর সার্ভিস আছে। যাত্রী পিছু প্রায় তিনটাকা পড়ে। এখানে মোটরের যাত্রী ও মালপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু মোটরে আসা সুবিধার নয়। উট পথপ্রদর্শক পাওয়া কঠিন ; পাইলেও তাহারা সঙ্গে যাইতে নারাজ হয় ; কারণ ব্যবসায় ক্ষতি।

হাব নদীর পশ্চিম পাড় হইতে জাম-সাহেবের রাজত্ব। পাকা রোয়ালী হইতে নাকা প্রায় তের মাইল রাস্তা। আজ খুড়া-ভাইপোর এ বেলায়ও একই দশা ; অর্থাৎ, চিঁড়া ভক্ষণ। রাত্রি নয়টার সময় নাকা হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় দুইটায় আম্বাওয়ালীতে আসিয়া পৌছান গেল। স্থানীয় লোকেরা বলে প্রায় কুড়ি মাইল ; বস্তুতঃ, প্রায় দশ মাইল মাত্র। সামান্য কয়টী আমগাছের একটী বাগান থাকায় নাম হইয়াছে—আম্বাওয়ালী।

এখানে পৌছিয়া যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেইভাবেই বালুর উপর শুইয়া পড়িল। আমরা কম্বলের উপর গায়ের কাপড় চাপা দিয়া শয়ন করিলাম।

সোমবার, উনিশ-এ আগষ্ট বালুকাময় মরুর মধ্যেই সারাদিন কাটাইয়া অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় রওনা হওয়া গেল। এখানেও আমাদের ভোজনের বন্দোবস্ত চিড়া। প্রায় কুড়ি মাইল পরে খারী নদী অতিক্রম করা গেল।

মঙ্গলবার, বিশ-এ আগষ্ট শোন বন্দরে পৌছিলাম। আম্বাওয়ালী হইতে শোন মাত্র চব্বিশ মাইল। এখানে রান্না করা গেল। কয়দিনের পর ভেতো বাঙালী ভাত বেশ মিষ্টই লাগিল। রাত্রে আবার যথা পূর্ব্বং তথা পরং, অর্থাৎ সেই চিপিটক।

এখানেও একটী চৌকী বা কাছারী আছে। হরিদ্বার গিরি বলিয়া একজন সাধু এখানে প্রত্যেক যাত্রীকে প্রশ্ন করেন এবং যথার্থ সন্ন্যাসী জানিলে ছাড়িয়া দেন।

বলা বাহুল্য, ইনিও জাম সাহেবের নিয়োজিত। এখানে গৃহীদের নিকট হইতে দুই টাকা, পুরী, গিরি, ভারতী ইত্যাদির নিকট হইতে চার আনা এবং উদাসীন সম্প্রদায়ের নিকট কিছুই না লইয়া ছাড়িয়া দেন। তবে দুইটী পয়সা যাত্রীমাত্রকেই আরও দিতে হয়; কিসের জন্য ঠিক বুঝিলাম না। ছড়িদারদেরও নিস্তার নাই। সওয়া চার টাকা এবং আ ও অতিরিক্ত চার আনা দিয়া তবে তাহারা যাইতে পায়।

এদেশের নিয়ম আমাদের দেশের চিলের ছাতের মত একটী করিয়া ঘর প্রত্যেক বাড়ীতেই থাকে। গৃহগুলি সবই সমুদ্রাভিমুখে। সাগরের বাতাস ঘরে প্রবেশ করানই নাকি এ গুলির উদ্দেশ্য। গৃহ মৃত্তিকানির্ম্মিত, ছাদও তাহারই। এখানে একটী ধর্ম্মশালা এবং তাহাতে একটী শিবমন্দির আছে। আমরা এই ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। হিন্দু বা মুসলমান পরিচয় ব্যতীত চেনা ভার। একই সাজ-পোষাক, আচার-ব্যবহার। কেবল হিন্দুত্বের নিদর্শন শিখা, বা কানে মাকড়ী।

হিংলাজ-যাত্রীদের একটী নাম আক্কেল পন্থী; কারণ, এ কষ্টদায়ক পথে আক্কেল নিশ্চয়ই লুপ্ত থাকে না, সজাগ হইয়া উঠে।

কূয়ার জল ঈষৎ লবনাক্ত। সমুদ্র কাছে, হয় ত সেই-জন্য।

বুধবার, একুশ-এ আগষ্ট শোন বন্দর হইতে কৈলা-ওয়ালীতে পৌঁছান গেল। প্রায় বার মাইল পথ সমুদ্রের ধারে ধারে। একটু বেচালে চলিলেই বিপদ। উটের পা চোরাবালিতে বসিয়া যাইবে। তবে ভগবানের দয়ায় জ্যোৎস্নালোকের মত একপ্রকার আলো সমুদ্র হইতে ভাসিয়া আসে। লোকে তাহাকে বলে 'ফস্‌ফরাস'। ইহাতে পথ অনেকটী চন্দ্রালোকের মত আলোকিত হয়।

এখানে উভয়শ্রেণীর জন্য পৃথক ধর্ম্মশালা আছে, কূপ আছে। কূপওয়ালা প্রতি যাত্রীর নিকট হইতে অর্দ্ধ রুটী বা পয়সা পায়।

বেলা চারিটার সময় আবার যাত্রা। পথ বড় খারাপ। প্রতিপদেই ভুল হইবার সম্ভাবনা। ঢেউয়ের মত বালুর স্তূপের মধ্য দিয়া রাস্তা। আমরা যদিও ঠিক পথেই চলিতেছিলাম, কিন্তু রাত্রি প্রায় নয়টার সময় এরূপ এক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম, যাহার সব দিকই স্তূপে ঘেরা। প্রদর্শক ও উটওয়ালা উভয়েরই সন্দেহ হইল, বিপথে চলিতেছি। তাহা ভিন্ন সন্ধ্যা হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে-ছিল। এই সব কারণে আমরা সে রাত্রি সেখানেই তাঁবু খাটাইলাম।

আমরা পথে ভরওয়ারা ও কাটিওয়ারা, অর্থাৎ ওই দেশ-বাসী কয়জনকে সঙ্গী পাইয়াছিলাম। ভয়ানক অপরিষ্কার জাত। আহার থালার মত এক-একখানা রুটি এবং পেঁয়াজ-আলুর শাক। কিন্তু তেমনি চলনদার, পরিশ্রমীও খুব বেশী। এই প্রকারের লোকই বেশীর ভাগ এই পথের যাত্রী। তবে অন্য সম্প্রদায়ও আছে।

রাত্রি চারিটায় বাহির হইয়া পরদিন বৃহস্পতিবার, বাইশ-এ আগষ্ট প্রায় চোদ্দ মাইল পথ ডাব্বাওয়ালীতে বেলা আন্দাজ সাড়ে ছয়টায় পৌঁছিলাম। এখানে শৌচাদি সারিয়া লওয়া হইল। পরে রন্ধন এবং আহারের শেষে বিশ্রাম। যাত্রাপথে দুইটী নদী পাইয়াছিলাম। একটী খাল বিশেষ, অন্যটী তদপেক্ষা বড়।

এদেশে অর্থাৎ করাচীতে বা বেলুচিস্থানে হিন্দুর দেবালয়ে মুসলমানের প্রবেশ নিষেধ নাই। এইদিন সাড়ে চারিটায় আবার রওনা হওয়া গেল। প্রায় এগারটার সময় মঙ্গলওয়ালীতে আসা গেল। সোল মাইল রাস্তা। তবে পথের অবস্থা ভাল। কিছুদূরে আসিলেই পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়।

শুক্রবার, তেইশ-এ আগষ্ট। এখানকার সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে যে, এই পর্ব্বতের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানের নাম মঙ্গলওয়ালী হইবার কারণ, এখানে মঙ্গল বলিয়া একজন মুসলমান ছিল। সে সাধারণের জলপানের জন্য দুইটী কূপ খনন করাইয়া দেয়। সেই হইতে তাহারই নামানুসারে গ্রামের নাম হইয়াছে।

আমরা এই লোকটীর পুত্র কালু মিয়ার উট ভাড়া লইয়াছিলাম। লোকটী বেশ মিশুক এবং সকলের মন বুঝিয়া কথা বলিতেও অভ্যস্ত। একটী কূয়ার নিকট বিশ্রাম করিয়া

দিন কাটাইলাম। এ কূয়ার জল সব সময় ভাল থাকে না।

শুনিলাম, তিন বৎসরের পর এ দেশে বৃষ্টি হইয়াছে। কৃষাণ তাই মনের আনন্দে চাষ-আবাদ করিতেছে। সেদেশে উটই বেশীর ভাগ, গরু কম; কারণ, গোজাতি সেখানে আহার পায় না। উটের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে।

এখানের মুসলমানেরা হিঙ্গুলা দেবীকে 'নানী' বলে এবং দর্শনও করিতে যায়। পুত্র-কামনায় মানত করে, পূজাও দেয়। কালু মিয়ার স্ত্রী আমাদের সহিত দেবীদর্শনে গিয়াছিল। মেয়েটী বেশ শান্তশিষ্ট। ভিন্নজাতীয়া বলিয়া মনেই হয় না, এমনই তার আচার-ব্যবহার।

বিকালে কালু মিয়া খবর দিল, উট হারাইয়া গিয়াছে। বিশেষ অসুবিধায় পড়িলাম; কারণ, পথে এভাবে আরও দেরী হইলে জন্মাষ্টমীর দিন মায়ের দর্শন পাওয়া যাইবে না। সকলেই মিয়াকে নানাপ্রকারে সে কথা বুঝান গেল। রাত্রি এগারটার সময় খবর পাইলাম, উট মিলিয়াছে। সেদিন যাত্রা করিতে প্রায় সাড়ে বারটা হইল।

শনিবার, চব্বিশ-এ আগষ্ট সকাল সওয়া সাতটায় কাণ্ডাওয়ালীতে আসা গেল। ব্যবধান প্রায় তের মাইল। এখানেও জাম-সাহেবের কাছারী আছে। কর্ম্মচারীরা যাত্রীর সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং আগুয়া বা উটওয়ালার দ্বারা কষ্ট পাইলে যাহাতে তাহারা আর সেরূপ করিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

রবিবার, পঁচিশ-এ আগষ্ট রাত্রি দেড়টায় বাহির হইয়া সকাল আটটায় চন্দ্রকূপে পৌছিলাম। এখানে একটী কূয়া আছে। তাহাতে স্নান করিয়া চন্দ্রকূপ দর্শন করিতে হয়। রাস্তা প্রায় চোদ্দ মাইল। কূয়া ও পাহাড় দুই মাইল ব্যবধান।

বেলা নয়টার সময় রওনা হইলাম। সঙ্গে 'রেট'; অর্থাৎ, আটা ঘৃত ও গুড়মিশ্রিত তাল আগুনে পোড়াইয়া প্রস্তুত করা একরূপ দ্রব্য। নারিকেল, ধূপ, কর্পূর ইত্যাদিও লওয়া হইল। রেট দ্রব্যটী কাণ্ডাওয়ালীতে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়; নচেৎ সময় ও সুবিধা হয় না।

চন্দ্রকূপে তিনটী পাহাড় দেখা যায়। উচ্চতায় কিছু কম বেশী। সেই সব পর্ব্বতের শীর্ষদেশ মোচার মাথা কাটিয়া ফেলিলে যেমন হয়, তদ্রূপ; অর্থাৎ, দেখিতে কড়াইয়ের ন্যায় গোলাকৃতি। এই পাহাড়গুলিতে আগ্নেয়গিরির প্রখরতা আছে। তাহাতে কাদা বা এই প্রকার কিছু সর্ব্বদাই ফুটিতে দেখা যায়। এই ফুট লিঙ্গাকৃতিতে পরিণত হইয়া উঠে। পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর খুব বড় বড় লিঙ্গাকৃতি ফুট দেখা যায়। উহা প্রায়ই ফাটিয়া যায়।

পাহাড় তিনটীর নাম যথাক্রমে, কপিলমণি, গাণ্ডাবাবা ও চন্দ্রকূপ, অর্থাৎ, ভৈরব। গাণ্ডাবাবার তেজ সংহত হইয়াছে। তাহাতে আর কিছু ফুটিতে দেখা যায় না। কপিলমণি এবং চন্দ্রকূপ এখনও কার্য্যকরী। তবে কপিল মণিতে চন্দ্রকূপের ন্যায় জোর দেখা যায় না।

যাত্রীরা চন্দ্রকূপের সান্নিধ্যে পূজা উপহার দেয় এবং 'বোম্ বোম্' শব্দ করিয়া লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন প্রার্থনা জানায়। এই পাহাড়ে আসিবার সময় আগুয়া প্রত্যেক যাত্রীর পূর্ব্বকৃত পাপ জানিতে চায় এবং সে পাপের জন্য সে দায়ী নয়, চন্দ্রকূপই দায়ী এই কথা বলে।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। একদিকে আরব্য সাগরের আকাশচুম্বী নীলিমা। জনমানব শূন্য বালুকাময় উপকূল। অন্যদিকে গম্ভীর পর্ব্বতোপরি প্রকৃতির এই লিঙ্গলীলা। এ সৌন্দর্য্য আমি লিখিয়া বুঝাইতে অক্ষম। এই ফুটের গলিত কর্দ্দম পর্ব্বত-গাত্রে জমিয়া আছে দেখিলাম। সেদিন আহার বেলা সাড়ে চারিটায় হইল।

সোমবার, ছাব্বিশ-এ আগষ্ট চন্দ্রকূপ হইতে রাত্রি সাড়ে বারটায় বাহির হইয়া সকাল সাড়ে ছয়টায় সিঙ্গেলা আসিলাম। ইহা প্রায় বার মাইল। চন্দ্রকূপ বামে রাখিয়া কতকটা উত্তর-পশ্চিমে আসিতে হয়। সেইখানে সকল যাত্রীকে তাহাদের সব কিছু রাখিয়া যাইতে হয়। কেবল তিন-চারিদিনের আহারীয় এবং পূজার দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে হয়, ইহাই নিয়ম। সমস্ত মালপত্রের তত্ত্বাবধান উট-ওয়ালাই করে। আমরা সামান্য বিছানা, রান্না এবং পূজার দ্রব্য লইয়া অগ্রসর হইলাম। সেখানে রাত্রে শীত অনুভূত হইল।

মঙ্গলবার, সাতাশ-এ আগষ্ট সিঙ্গেলা হইতে রাত্রি দেড়টার সময় রওনা হইয়া ভোর সাড়ে চারিটায় অঘোর

পৌঁছিলাম। এ নদীতে স্নান করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেককে পাঁচটা করিয়া দাঁতন কাষ্ঠ আগুয়াকে দিতে হয়। সে ফিরাইয়া দিলে তাহাতে দাঁতন করা চলে। এইস্থানে শয়ন ভাই অর্থাৎ, গুরুভাই করিতে হয়। মায়ের পূজারীর নাম মুল্লা মহম্মদ। এখানে ছড়িদার, অঘোর ও কপাটের জন্য তুইখানি রুটী এবং নয়টী পয়সা আদায় করিয়া লয়।

দেড়টায় অঘোর নদী পার হইয়া চলিতে আরম্ভ করা গেল। নদী আঁকিয়া-বাকিয়া যাওয়ায় এই নদীই আমাদের একাধিকবার পার হইতে হইল। পয়সার জন্য আগুয়া ইহার হিঙ্গুলা বা অন্য নাম দেয়। পার্ব্বত্যপথ বালুকাময় এবং অত্যন্ত কদর্য্য। যাহা হউক, এক ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌঁছান গেল। আড়াই কি তিনটায় ছাগবলি হইল। যাঁহারা বলি দেন, সিঙ্গেলা হইতে তাঁহাদের ছাগ সঙ্গে করিয়া আনিতে হয়। এ স্থান হইতে মায়ের পাহাড় অর্দ্ধমাইল মাত্র।

অঘোর হইতে হিংলাজ ছয়-সাত মাইল পথ। মায়ের মন্দির-সংলগ্ন একটী কুণ্ড আছে। তাহাতে বিস্তর মাছ। মন্দিরটী লম্বমান পাথরের গাঁথুনী। একটী বাঁধান রকও আছে। যাত্রীরা বসিয়া বা শুইয়া আরাম করে। ঘরটী বিস্তৃত পর্ব্বতগুহার মধ্যবর্ত্তী। তিনধারে দেওয়াল গাঁথা। এখানে বহু লাল করবীর গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে মায়ের স্থান প্রায় দেড় মাইল। তুই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া রাস্তা; ক্রমশঃ উপরে উঠিতে হয়।

কালীমূর্ত্তি নাই। পর্ব্বত-গাত্রে কড়াইয়ের ন্যায় গর্ত্ত। তাহাতে কালী ও সিন্দুর মাখান। কালীমূর্ত্তি হইতে আরও উপরে মন্দির—ইহাই হিঙ্গুলা বা আদ্যা-শক্তি ব্রহ্মযোনি। পূজার জন্য নারিকেল, সিন্দুর, রেট, ধূপ, কাপড়, নথ, মেওয়া, সুপারী, আতর, লবঙ্গ, ছোটএলাঁচ ইত্যাদি দিতে হয়। আমরা শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর দিনে হিংলাজ মায়ের পূজা করি। রাত্রি হইয়াছিল।

পূজান্তে স্নান সারিয়া মায়ের স্থানের বেষ্টনী সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া অর্দ্ধচন্দ্রপ্রায় পরিক্রমণ করিতে হয়। একজন লোক বসিয়া কোনপ্রকারে চলিতে পারে। ছড়িদার সঙ্গে থাকিয়া অনবরত সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। ইহাই যোনি-ভ্রমণ—প্রবাদ, আর যোনিতে আসিতে হয় না।

বাহির হইতে চক্ষু বাঁধিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া প্রদীপের সম্মুখে খুলিয়া দেয়। ইহার নাম আলোক-দর্শন।

পূর্ব্বোক্ত সুড়ঙ্গ মায়ের ডান দিকে অবস্থিত। ছাত গাছের ডাল ও মাটিতে ছাওয়া। মায়ের বামদিকে সুড়ঙ্গ-দ্বারে প্রবেশ করিয়া ডানদিক দিয়া নিষ্ক্রামন। ইহার একমুখ হইতে অন্যমুখ মায়ের নিজ স্থান। তুইখানি পাথর আছে, একখানিতে রূপার চক্ষু বসান, অন্য পাথর পদতল। আসন প্রায় তুই হাত উচ্চ।

এখানে মায়ের প্রসাদ মেওয়া-মিশ্রিত হালুয়া বিশেষ। হাতে মালা লইয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। এ মালা করাচীতেই লইতে হয়। তুই ছড়া আবশ্যক; একটী পূজার, নিজের এবং অপরটী আগুয়ার প্রাপ্য। দাম আট কি নয় আনা। ভাল, অর্থাৎ সাদা মালার দাম কিছু বেশী। মালাটী পাথরের।

মায়ের আসন রেলিঙে ঘেরা। এখানে আগুয়ারা মালা ও প্রসাদ মুখে দেয়। যাত্রীরাও তাহাকে মালা পরাইয়া দেয়।

মায়ের গৃহের ছাদ নাই, কেবল প্রাচীর-ঘেরা বলিয়াছি। এই প্রাচীর কতক মনুষ্য-নির্ম্মিত, কতক পর্ব্বত গাত্র। ছোট একটী ঘর আছে; ইহার ভিতর দিয়া মায়ের স্থানে যাইতে হয়। তারপর আরতি ও শান্তিপাঠ।

এখান হইতে 'অনিল কুণ্ড' ছয়-সাত মাইল চড়াই। মধ্যে আর একটী ছোট জলাশয় আছে, তাহাকে ছোট অনিল কূপ বলে। 'চৌরাশী' অনিল কূপের নিকটবর্ত্তী স্থান। কোন বিশেষত্ব নাই।

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অনাদৃতা

শ্রীদেবীরঞ্জন দে, এম-এ

ঘরে ঢুকতেই টেবিলে রাখা একখানা চিঠি নীরেনের চোখে পড়লো। অলকার চিঠি সে তো বুঝতেই পারলে না। ব্যাপার কি! বিস্মিত হ'য়ে বাইরের জামা-কাপড়েই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিঠিখানা পড়তে লাগলো।

আজ তোমাকে ডাকবার ভাষা নেই আমার, তাই সম্বোধনের আড়ম্বর আর করলুম্ না। অনেকদিন ধরে' যে কথাগুলো তোমাকে বলবো মনে করছিলুম, শুধু সেই কথাগুলোই আজ বল্‌ছি। সাম্‌নে বসে বলা সব হয় তো সম্ভব হতো না, তাই এই চিঠি লিখ্‌তে হোল। প্রায় এক বৎসর আমাদের বিবাহ হয়েছে, কিন্তু স্ত্রীর প্রাপ্য আমি কিছুই পাই নি। আমি বেশ জানি এ প্রাপ্য নিয়ে জোরও নেই, নালিশও চলে না। তাই আমি তোমার সঙ্গে কোনদিনই এ বিষয়ে আলোচনাও করি নি, অনুযোগও করি নি। তুমি আমাকে দেখ্‌তে অনেকটা শিক্ষকের চোখে। তা'তেও আমার আপত্তি ছিল না, যদি তোমার ব্যবহারের মধ্যে প্রাণের সাড়া পেতুম। তোমার প্রতিদিনের কাজের মধ্যে কথার মধ্যে মহত্বের পরিচয় পেয়েছি, দয়ার পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু ভালবাসা,—যা' আমার বুভুক্ষ মন আকুল হ'য়ে চাইছিল, তা' পাই নি। রাণীর গরিমা যার প্রাপ্য, ভিখারিণীর দয়ায় তার মন ওঠে কি? তোমার বিবাহের প্রস্তাব প্রথম যখন আমার কাণে এসেছিল, আমার মন মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল তোমার মহত্ব দেখে। ভেবেছিলুম, মন যার এত উদার, অন্তরের ভালবাসা না জানি তার কত গভীর। তাই রাজি হয়েছিলুম। বিবাহের পর দেখ্‌লুম, তুমি আমাকে চেয়েছিলে,—তোমার পূর্ব্বস্ত্রীর ছেলেমেয়ে মানুষ করবার জন্যে, তোমার সংসার গুছিয়ে রাখবার জন্যে, তোমার ভালবাসায় আমাকে সিক্ত করবার জন্যে নয়। আজ আমি মনের মাঝে এতটুকুও গোপন রাখবো না। সব কথা অকপটে বলে' যাবো।

জগৎ আমার ওপর অবিচার করে, তাই করুক; কিন্তু তুমি যে আমার ওপর অবিচার করবে, এ কথা যেন এখনও ভাবতে পারি নি। একদিন যাকে আপনহারা হ'য়ে ভালবেসেছিলুম, প্রতিদান পাই নি সত্য, কিন্তু তাকে একেবারে উপেক্ষা করি কি করে' এখন? সেই দুর্ব্বলতার জের আমার মন যে আমায় এখনও টানছে। আমি তোমাকেই বিচারকের আসনে বসিয়ে আমার এই ব্যথিত অন্তরের কাতর নিবেদন জানাচ্ছি। তুমিই বল,—যে দোষ মানুষের ইচ্ছাকৃত নয়, যে দোষ কেবল দেহকেই অপবিত্র করে মনকে কলুষিত করে না, সে দোষের জন্যে যদি সে সমাজের কাছে হেয় হয়, স্বামীর অন্তরে স্থান না পায়, তা' হ'লে তুমিই বল, কি সুখে সে সমাজে বাস করবে? কিসের আশায় সমাজের উপহাস সে মাথা পেতে নেবে? তুমি আমাকে অযত্ন করেছো একথা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু অযত্ন না করাটাই কি সব? এর চেয়ে বেশী কিছু কি স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে আশা করে না? তোমার এ যত্ন করবার চেষ্টাটাই কি ঘৃণার একটা মুখোস নয়? তুমি শিক্ষিত, তাই তুমি মনের ঘৃণাকে লুকিয়ে রেখে বাইরের যত্ন দিয়ে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করতে। কেন, আমি ঘৃণিত হলুম কিসে? আমি তো তোমায় সেবাযত্ন ভালবাসা দিতে একটুও কার্পণ্য করি নি—তবে তুমি কেন আমায় ভালবাসতে পারলে না?

স্কুলের কাজ করে' ছেলে পড়িয়ে যখনই তোমার একটু অবসর হোত, সেই অবসর সময়টুকুর সদ্ব্যয় করতে তুমি আমাকে উপদেশ দিয়ে—রামায়ণ, মহাভারতের গল্প বলে'। সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তীর গল্প তোমার মুখে শুনে শুনে আমারই প্রায় মুখস্থ হ'য়ে গেছে। আমি কি এতই বোকা? আমি কি বুঝি না তোমার ওসব গল্প বলা কেন? তোমার কেবল ভয় পাছে আমি [illegible] যাই। পুরুষ তুমি, শিক্ষিত তুমি, সামান্য একজন নারীর মন তুমি বোঝ না—যে মনকে কাচের মত স্বচ্ছ করেই তোমার সাম্‌নে

ফিরেছিলুম। আমার ভালবাসা সে তো লাঞ্ছিতার কাকুতি—তার কোন দাম নেই পুরুষের কাছে—তাই তুমি ভুলেও সেদিকে ফিরে চাও নি। অনু যেমন অনুর পিছনে ধায়, পরমাণু যেমন পরমাণুতে মিশায়, আমি চেয়েছিলুম দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে সে ভাবে তোমার সাথে মিশে যেতে। তুমিই রেখে দিলে আমায় দূরে ঠেলে। বিশ্বের উপেক্ষা আমি সইতে পারি, কিন্তু তোমার অনাদর আমার অসহ্য। তোমার ভালবাসার কাছে আমার প্রাণেরও কোন মূল্য ছিল না। মনে পড়ে সে দিনের কথা, যেদিন তোমায় সাপে কাম্‌ড়েছিল। ওঝা এসে বল্‌লে—ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে যদি কেউ রক্ত চুষে নিতে পারে, তবেই প্রাণের আশা—তবে যে চুষবে তার প্রাণের আশঙ্কা আছে। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে' কে তোমার ক্ষতস্থান মুখ দিয়ে চুষে ছিল, মনে পড়ে? প্রাণের বিনিময়েও ভালবাসা পেলুম না—এতবড় হতভাগিনী আমি! আর একদিনের কথা, তোমার হয় তো মনে নেই, কিন্তু আমার বুকে শেলের মত বিঁধে আছে। তোমার এক বন্ধু ঠাট্টা করে' বল্‌লেন—সমাজের বুকের ওপর বসে কি করে' নীরেন তুমি এই বিবাহ করতে সাহস করলে? তুমি তখন হেসে কি উত্তর করেছিলে মনে আছে—আমার এই বয়সে ছেলেমেয়ে দেখে কোন্ ভালঘরের সুন্দরী যুবতী মালা হাতে করে' আছে আমার বিয়ে করবার জন্যে বল? এর নিজের একটু গলদ আছে, বয়সও নেহাৎ কম নয়, আমার সংসার করার পক্ষে এই ভাল। তোমার সেই কথাই আমার মনের সন্দেহকে সত্যের কঠোরতা দিয়েছিল। তারপর থেকে আমার কেবলই মনে হতো সাধারণ লোক-চক্ষুর অন্তরালে আশ্রমবাসই আমার পক্ষে ছিল ভাল। কতবার সঙ্কল্প করেছি, কতবার ভেঙেছি। আজ আমার মন শক্ত, সঙ্কল্প দৃঢ়। হিন্দু-সমাজে ধর্ষিতা নারীর পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীর গৌরব লাভ বিড়ম্বনা মাত্র। তাই পা দিলুম সমাজ ছেড়ে অজানা পথে। জানি, পথে বাধা অনেক। তবু চল্‌লুম অজানার আকর্ষণে। ইতি,

পত্নীত্ব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্না
অলকা

দেবীরঞ্জন দে, এম্-এ
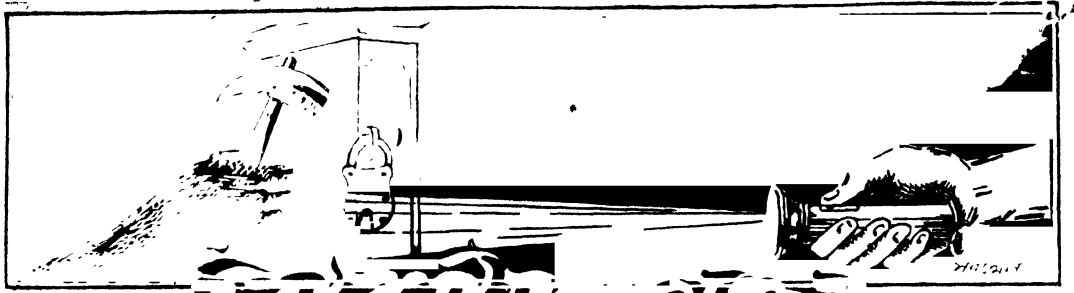
তদারক

শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রকাণ্ড লাইব্রেরী-ঘর। মেহগ্‌নী কাঠের সুদৃশ্য ক্যাবিনেটের ওপর দামী একটি ঘড়ি বসানো ছিল। তার সাম্‌নে প্রকাণ্ড এক 'সেকরেটারিয়েট টেবল্‌,' সেই টেবল্‌-এর সাম্‌নে চেয়ারে বসে আছেন মৃত মিঃ মিটার—ফোজ-দারী কোর্টের বিখ্যাত এড্‌ভোকেট্‌।

ডিটেক্‌টিভ্‌ ইন্‌স্‌পেক্‌টর মিঃ রায় তাঁর সঙ্গী নীলমণি নামক পুলিশ অফিসারটিকে বল্‌লেন—টাকা থাক্‌লেই পছন্দ থাকতে হবে তার কোন মানে নেই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখ্‌ছি, মিত্তির-সাহেব ভাগ্যবান, তাঁর অর্থও ছিল, পছন্দও ছিল। দেখছ কী চমৎকার এই ঘড়িটা!

নীলমণি তার ছোট ছোট দুটো চোখ চারধারে ঘুরিয়ে নিয়ে মাথাটা একটু দুলিয়ে দিলে।

ঘড়ির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মিঃ রায় বল্‌লেন—আচ্ছা, খুনটা ক'টার সময় হয়েছে তোমার মনে হয় নীলমণি?

নীলমণি তখন বসে পড়েছে হত মিঃ মিটারের সাম্‌নেই একখানা কৌচে। তার ভাঁটার মতো শরীরটি কৌচের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করেছে, শুধু মাথা আর সাম্‌নের দরজার দিকে নিবদ্ধ চোখ দু'টি দেখা যাচ্ছে। মিঃ রায়ের আহ্বানে সে কেবলমাত্র একটু নড়ে উত্তর দিলে—য়্যাঁ, কি বলছেন?

—না, কিছুই নয়, আচ্ছা, পুলিশ লাইনে তোমাকে কে ঢোকালে বলতো?

একটু হেসে নীলমণি বললে—মেসোমশায়।

—অতি ভুল করেছেন তিনি, তোমাকে 'সি, এস্‌, পি, সি'—তে না ঢুকিয়ে পুলিশ-লাইনে ঢুকিয়ে। কিন্তু তোমার বরাতটা ভালো বল্‌তে হ'বে, পদ্মপুকুরের ডাকাতি কেস্‌টা বেশ ধরিয়ে দিয়েছ—দেখ্‌ছি তোমার মাথা না থাক্‌লেও কপাল আছে। ওই কেস্‌টা না ধরিয়ে দিতে পারলে তুমি 'পারমেনাণ্ট'-ই হ'তে পারতে না এত শীগ্‌গির, পুরস্কার পাওয়া তো চুলোয় যাক্‌।

নীলমণি বল্‌লে—আজ্ঞে আমার মাসীমা বলেন, বরাত কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

মিঃ রায় বল্‌লেন—যা' হোক্‌, দেখ, কি ভাবে অনুসন্ধান করতে হয়। ঘড়ির দিকে চেয়ে বল্‌তে পারো আন্দাজ ক'টার সময় খুন হয়েছে?

নীলমণি কোন জবাব না দেওয়ায় রায় বল্‌লেন—খুন হয়েছে রাত প্রায় এগারোটা কুড়ি মিনিটের সময়। এই দেখ, একটা সবুজ দাগ, [illegible] মতোন রয়েছে বরোটা থেকে চার[illegible] ঘরের মধ্যে। দাগটা সবুজ তেল রঙের—হুঁ, জানলা-দরজায় নতুন রঙ করা হয়েছে

দেখছি ; খুনী অসাবধানতায় বা অন্য কোন কারণে দরজায় হাত দিয়ে ফেলেছিল। সে বুঝ্‌তে পারিনি যে, নতুন রঙ লেগে আছে দরজায়, তারপর সেই হাত দেয় ঘড়িতে।

নীলমণি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কিন্তু খুনী সে সময় ঘড়ির কাচ খুলে ডায়েলে হাত ঘস্‌তে যাবে কেন ?

ডিটেক্‌টিভ্‌ রায় তখন দরজার কাছে এগিয়ে গেছেন। পকেট থেকে 'লেন্‌স্‌' বার করে খানিকক্ষণ বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখে তিনি বল্‌লেন—হুঁ, আঙুলের দাগ রবারের দস্তানা দিয়ে ঢাক্‌লেও এটা বোঝা যাচ্ছে লোকটা ঘরটার মধ্যে হাতড়ে বেড়িয়েছে। দেখ্‌ছো নীলমণি, কতকগুলো আঙুলের আঁচড় পড়েছে দরজায় আর দেওয়ালে।

নীলমণি উত্তর দিলে—কিন্তু প্রমাণ তো পাওয়া গেছে ঘরেতে আলো জ্বলছিল, যখন মিঃ মিটার খুন হন্‌। দু'শো পাওয়ারের লাইটেও কি খুনী দাদা চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছিলেন ?

রায় বল্‌লেন—খুব সম্ভব, খুনী অন্ধ। হাতড়াতে হাতড়াতে সে ঘরে ঢুকেচে—পাছে কিছু আঙুলে লাগে তাই দস্তানা দিয়ে আগে হ'তেই হাত ঢেকে এসেছে, তারপর দরজায় নতুন রঙ লাগানো আছে বুঝতে না পেরে তাইতে হাত লাগিয়ে ফেলেছে।

নীলমণি বাধা দিয়ে বল্‌লে—আমার মাসীমা বলেন, যাদের দৃষ্টি শক্তি একেবারে নেই, তাদের প্রাণশক্তি আছে খুবই বেশী। রঙের গন্ধ আমাদের নাকে লাগ্‌চে আর সে অন্ধ মানুষ তার নাকে ঢুক্‌লো না।

রায় বল্‌লেন—একটা ভীষণ চিন্তা তার মাথায় খেল্‌ছিল, খুব সম্ভব সেই জন্য গন্ধ তার কাছে পৌছয় নি। তারপর দেখ, খুনের পর ক'টা বেজেছে জানবার জন্য সে ঘড়িটা হাত্‌ড়ে দেখেছে। আমি জানি, অন্ধেরা এই রকমে ঘড়ি থেকে সময়ের একটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে।

—কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পারছি না লোকটা খুন করে হঠাৎ ঘড়ি দেখ্‌তে যাবে কেন, তাও আবার অত মেহন্নত করে ?

—হয়তো কারো সঙ্গে 'এন্‌গেজমেণ্ট' ছিল, কিংবা কোন মোটরের এখানে আস্‌বার সময় ঠিক করা ছিল তাকে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে। ..খুনী যে চোখে দেখ্‌তে পায় না তার আরও সুন্দর প্রমাণ হচ্ছে—এদিকে সরে এস, দেখ, কত কাছ হ'তে গুলি করা হয়েছে, একেবারে পিঠের ওপর এসে, একটিমাত্র গুলিতেই মিঃ মিটার মারা গেছেন, অথচ লোকটি উপরি উপরি চারটে গুলি করেছে, তার দুটো ফস্কে দেওয়ালে গিয়ে লেগেচে। এক বিঘৎ তফাৎ থেকে অন্ধ ভিন্ন কার গুলি ব্যর্থ হয় ?

নীলমণি বল্‌লে—আর একটা প্রমাণ আমিও আপনাকে দিতে পারি। লোকটি অন্ধ বলেই মৃতের হাতের পাশে দশ টাকার পাঁচখানা নোট রয়েছে তা' ছোঁয়ও নি—অথচ দেরাজ থেকে সব টাকাগুলো নিয়ে সরলো। চোখের মাথা না খেলে সে ভদ্রলোক বোঝার ওপর এই আঁটিটা চাপাতে কিছুতেই মনঃক্ষুণ্ণ হতো না।

রায় বল্‌লেন—যখন ঘটনাটা ঘটে, তখন মিত্তির-সাহেব এই চিঠিখানা লিখ্‌ছিলেন। লেখা সম্পূর্ণ হবার আগেই হঠাৎ পেছন থেকে গুলি এসে লাগে ; দেখ্‌ছো না, শেষ লেখাটার ওপর খানিকটা কালি ছিট্‌কে পড়েছে। এই-খানেই লেখক পড়ে গেছ্‌লেন, আর তারপর লেখা হয় নি।

নীলমণি চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে—চিঠিখানা লেখবার সময় তাঁর মাথায় প্রেমের চিন্তা নিশ্চয়ই ছিল না। আর যে রকম তাড়াতাড়ি চিঠিটা লিখ্‌ছিলেন, তাতে বোধ হয় তিনি সবেমাত্র চিঠিখানা লিখ্‌তে বসেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল যত শীগ্‌গির পারা যায় চিঠিটা পাঠিয়ে দেওয়া। বলে নীলমণি চিঠিটা পড়্‌লো—"তোমার জন্য আমি জ্বালাতন হচ্ছি। ফোনে তো জানালুম যে, আমার দ্বারা আর কোন রকম সাহায্য হ'বে না, তবু তুমি আমায় বিরক্ত কর্‌ছ—যা' হোক্‌···

চিঠিটা শুনে মিঃ রায় উত্তর দিলেন—যাকে চিঠিখানা

লিখ্‌ছিলেন, সেই-ই যে খুনী, এ বিষয়ে আমার অন্য ধারণা নেই। তবে দেখ্‌তে হ'বে · ওহে, চিঠিটা পকেটে পূরে ফেল, মিঃ মিটারের ক্লার্ক আস্‌ছেন।

নীলমণি তাড়াতাড়ি চিঠিখানা পকেটে পূরে ফেল্‌লো। তখনই সাম্‌নের দরজা দিয়ে ঢুক্‌লেন এক পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়সের যুবক। চোখে চশমা, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, দোহারা পাতলা। ভদ্রলোকের চেহারা দেখ্‌লে সহজেই বোঝা যায় যে, মিঃ মিটারের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন ইনি—কারণ, তাঁকে দেখাচ্ছিল শোকের এক মূর্ত্তিমান প্রতীক।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুক্‌তেই মিঃ রায় তাঁকে নমস্কার করে বল্‌লেন—আসুন সতীশবাবু, আমি খুবই উদ্বিগ্ন হ'য়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। আচ্ছা, আপনি বল্‌তে পারেন মিঃ মিটারের ড্রয়ারে কতো টাকা আন্দাজ ছিল?

সতীশবাবু বল্‌লেন—হাজার ছয়েক।

—হুঁ, কিন্তু আপনি জান্‌লেন কেমন করে?

—টাকাটা আমাকেই গুণে নিতে হয়েছিল এক মক্কেলের কাছ থেকে।

—চেক্ না দিয়ে এতগুলো নগদ টাকাই বা মক্কেল দিলে কেন? আর মিত্তির সাহেবও টাকাগুলি ব্যাঙ্কে না পাঠিয়ে টেব্‌লের ড্রয়ারে, এরকম আল্‌গা যায়গায়ই বা রাখ্‌লেন কেন?

একটু ম্লান হেসে সতীশবাবু মিঃ রায়ের কথার জবাব দিলেন—টাকাগুলি যে দিয়েছে, তার ধনসম্পত্তি যথেষ্ট থাকলেও ব্যাঙ্কে চেক্ কাটবার ক্ষমতা নেই—সবই তাকে গোপনে করতে হয়। আর টাকাটা পেয়েছেন সাহেব তাঁর মৃত্যুর মাত্র আধঘণ্টা আগে।

রায় বল্‌লেন—বুঝ্‌তে পেরেছি টাকাটা কার হাত থেকে এসেছে। নিশ্চয় কোন বিখ্যাত দস্যু হ'বে। আচ্ছা, তার চেহারা রোগা, মুখের বাঁ দিকে একটা পোড়া দাগ আছে? একবার বন্দুকের ছর্‌রা লেগে তার ডান চোখটা কাণা হ'য়ে গেছে।

সতীশবাবু বল্‌লেন—আপনি চেনেন দেখ্‌ছি তাকে।

—হ্যাঁ। সে একটা ভীষণ চুরি কেসে লিপ্ত হয়েছে—জারোয়ারের মহারাণীর সমস্ত অলঙ্কার চুরির অপরাধে। সেই জন্যেই বোধ হয় মিত্তির-সাহেবকে কৌঁসুলী দিয়েছিল।···আচ্ছা, সে কতক্ষণ এখানে ছিল বলতে পারেন?

—মিনিট কুড়ি।

—হুঁ, তারপর আপনি কখন টের পেলেন যে মিঃ মিটার খুন হয়েছেন!

—সেই লোকটি চলে যাবার কিছু পরেই টেলিফোনে তাঁকে কে ডাক্‌লে, তিনি রাগতভাবে তার দু'-একটা জবাব দিয়েই সেই চুরি মাম্‌লার কাগজপত্র দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর আমি খেতে যাচ্ছি দেখে আমাকে বল্‌লেন—সতীশ, তুমি খেয়ে একবার আমার কাছে এস, একজায়গায় যেতে হ'বে। অত রাতে কোথাও যেতে হবে শুনে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম—আমি তাড়াতাড়ি খেতে চলে গেলুম।

—রাত তখন কত আন্দাজ হবে?

—প্রায় এগারোটা।

—হুঁ। আচ্ছা, বল্‌তে পারেন সতীশবাবু, আপনার মনিবের এমন কোন লোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল যিনি অন্ধ।

—কেন মশায়?

কথাটা বল্‌তে সতীশবাবুর মুখটা যেন একটু কেঁপে উঠ্‌লো।

মিঃ রায় বল্‌লেন—আমার মনে হয়, খুনী খুব সম্ভব চোখে দেখ্‌তে পায় না।

—কিন্তু যে অন্ধ ব্যক্তির সঙ্গে আমার মনিব পরিচিত, তাঁর দ্বারা তো খুন হওয়া সম্ভব নয় মশায়; তিনি যে মিত্তির সাহেবের আপন ভাই।

—তিনি কোথায় থাকেন?

—এলগিন্ রোডে নিউ হোটেলে। অন্ধ ব'লে তিনি বিবাহ করেন নি। ওই হোটেলে একটা ঘর নিয়ে থাকেন। খরচপত্র সব মিত্তির সাহেবই দিতেন।

—খরচপত্র নিয়ে কখনও [illegible] বচসা হয়েছে কি?

—তা' মশায় প্রায়ই হ'ত, আবার তখনই মিটে যেত। মিত্তির-সাহেবের ভাই ব্রজবাবুর একটু পানদোষ আছে

কি না, তাই প্রায়ই তাঁর টাকার অনাটন ঘটে। কিন্তু মশায়, মাতাল হলেও লোক তিনি বড়ই অমায়িক, খুন-খারাপী কখনও কল্পনায়ই আন্‌তে পারেন না।

—হুঁ। নীলমণি, তুমি আর সতীশবাবু, এখানেই একটু অপেক্ষা করো, আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরছি। বলে ডিটেক্‌টিভ্ মিঃ রায় তাঁর মোটরে উঠ্‌লেন।

দুই

যে সোফাটায় নীলমণি বসেছিল, তার পাশের আর একখানা সোফায় বস্‌লেন সতীশবাবু। মিত্তির-সাহেবের মৃত্যুতে তার মুখ ম্লান, দেহ অবসন্ন। তিনি মাঝে মাঝে মিঃ মিটারের দিকে চাইছেন, মাঝে মাঝে মাথা নীচু করে ভাব্‌ছেন, মাঝে মাঝে চোখের কোণে ভেসে উঠ্‌ছে স্বল্প অশ্রুকণা। নীলমণি নিজের সোফাটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে সতীশের দিকে চেয়ে আছে—এক চোখ তার বোজা, আর এক চোখ সতীশের দিকে নিবদ্ধ।

হঠাৎ সতীশবাবু বল্‌লেন—আচ্ছা মশায়, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে, ব্রজবাবু তাঁর ভাইকে খুন করেছেন। তিনি অতি সৎলোক। তা' ছাড়া, অন্ধ তিনি, হাতড়াতে হাতড়াতে ঘরে ঢুক্‌লেন—হাতড়াতে হাতড়াতে টেবিলের পাশ দিয়ে আমার মনিবের পিছনে গিয়ে গুলি ছুঁড়লেন, আর আমার মনিব কিছুই টের পেলেন না! এ কি সম্ভব?

নীলমণি তার চোখের দৃষ্টি সতীশের চোখের ওপর ফেলেই জবাব দিলে—কেন, এমনও তো হ'তে পারে, কোনরকমে মিত্তির-সাহেবের অজ্ঞাতে সে এসে ওই খানটায় লুকিয়ে ছিল।

—হ্যাঁ, তা' হ'তে পারে বটে। ভাল কথা, একটা জিনিষ আপনাদের বল্‌তে ভুলে গেছি—যে মক্কেলটি আমার মনিবকে ছ'হাজার টাকা দিয়ে গেছ্‌লো, তার এক চোখ কাণা বটে, কিন্তু অন্য চোখেও ভাল দেখতে পায় না বলে আমার সন্দেহ। বিশেষ রাত্রিবেলা আমি তাকে অতি সন্তর্পণে পা ফেল্‌তে দেখেছি।

—এক চোখের অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য অন্য চোখ খারাপ হ'য়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়।

তারপর সহসা নীলমণি প্রশ্ন কর্‌লে—আচ্ছা, আপনাকে তো খুবই টাইপ করতে হয়, বিরক্ত বোধ হয় না?

কি কর্‌ব বলুন বিরক্ত লাগ্‌লে, আমার কাজই যখন ওই।

—আমরা মনে হয় বেশী টাইপ করলে হাতের আঙুল-গুলো ক্ষয়ে যায়। একটু দেখি আপনার আঙুলগুলো।

সতীশবাবু একটু হেসে তার হাত দুটো নীলমণির সাম্‌নে ধরে বল্‌লেন—কি বলেন মশায়, আঙুল বুঝি ক্ষয়ে যায় টাইপ করে।

নীলমণি আঙুলগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে—আমার তো তাই মনে হয় মশায়। খট্‌খট্ করে অনবরত ধাক্কা লাগে, তাতে ক্ষয়ে যাওয়াই সম্ভব।

আচ্ছা, আপনি কতক্ষণ আগে টাইপ করেছেন বলুন তো?

সতীশবাবু জবাব দিলেন—মিঃ মিটার খুন হওয়ার কিছুক্ষণ আগে।

নীলমণি জিজ্ঞাসা করলে আপনি কি টাইপ শেষ হ'লে সাবান দিয়ে হাত ধোন।

সতীশবাবু বল্‌লেন—কখনো কখনো।

—অন্ততঃ আজতো ধুয়েছেন, কিন্তু কি গন্ধ সাবানই ব্যবহার করেন আপনি! এখনও গন্ধ ভুরভুর করছে।

ম্লান হেসে সতীশ উত্তর দিলে—আমার অভ্যাস। কিন্তু এ দুঃখের সময় এসব অবান্তর কথা কেন?

—দেখুন, আমি ভেবে দেখলুম যে, মিত্তির-সাহেবের মক্কেল তাকে কখনই খুন করতে পারে না; কারণ, সেই নিজে ওই টাকাটা দিয়েছিল তারই বিপদ উদ্ধারের জন্য।

—তার কারণ থাকতে পারে। আমার মনিব কাগজ-টাগজ দেখে বলেছিলেন যে, এ বিপদে তার উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব; সেইজন্যে সে বলেছিল—যখন উদ্ধারের কোন

উপায় নেই, তখন মামলা করে অনর্থক টাকা নষ্ট করে লাভ কি? এবং সে মাম্‌লা না চালিয়ে টাকা ফেরৎ চায়। সাহেব কিন্তু তাতে রাজী হন্ নি।

—তা' হোক্, তবু ভবিষ্যৎ বিপদের মুখ চেয়েও সে হত্যা করতে পারবে না। আমার মনে হয়, ও টাকা বাড়ীর মধ্যেই কোথাও লুকোনো আছে। এমন কি, হঠাৎ যদি মৃত মিত্তির-সাহেবের জুতোর ভেতর থেকে নোটগুলো বেরিয়ে পড়ে, তা' হ'লেও আমি আবাক্ হবার কোন কারণ পাব না। আপনি কি বলেন সতীশবাবু?

কথাটা শেষ করেই নীলমণি সতীশের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। সতীশ বিরক্তস্বরে বললে—কি করে বলি বলুন, খুন করা বা চুরি বিদ্যাটা জানা থাকলে আপনার প্রশ্নের হয়তো একটা উত্তর দিতে পারতুম। আপনারা মশায়, পুলিশের লোক, অনেক রকম বিদ্যাই জানা থাকা সম্ভব। কিন্তু দোহাই মশায়, এ বিপদের সময় ভাঁড়ামীটা করবেন না, ভাল লাগ্‌চে না। নীলমণি সতীশের কথার জবাব না দিয়েই পেছনের অফিস-ঘরটায় গিয়ে ঢুক্‌লো। পেছনে পেছনে এলেন সতীশবাবু।

নীলমণি জিজ্ঞাসা করলে—এই ঘরটায় বোধ হয় আপনার অফিস?

—হ্যাঁ।

টাইপ মেসিনটা নাড়তে নাড়তে নীলমণি প্রশ্ন করলেন —আপনার মেসিনের ফিতে সবুজ রঙের কেন? সাধারণতঃ বেগুনি রঙের ফিতেই তো বাজারে চল্‌তি।

—সাহেবের সবুজ রঙটাই পছন্দ ছিল। তিনি বল্‌তেন —সবুজ রঙের টাইপ্ পড়তে চোখে কোন কষ্ট হয় না, অন্য রঙের টাইপে চোখে আঘাত লাগে।

সতীশবাবু যখন কথা বল্‌ছিলেন, তখন তাঁর অজ্ঞাতে নীলমণি কাগজ ফেলা ঝুড়ি থেকে একটা 'কার্ব্বণ'-কাগজ নিয়ে পকেটে পূরলো। এবং সতীশবাবুকে বল্‌লে—আপনি একটু বসুন সাহেবের ঘরে, আমি এখনই বাইরে থেকে আস্‌ছি।

নীলমণি তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, যাবার সময় ফটকের কন্‌স্টেবলকে বলে গেল—বাড়ী থেকে কোন লোক যেন বেরিয়ে না যায়, বা কেউ যেন বাড়ীতে না ঢোকে, খুব সাবধান।

নীলমণি চলে যাবার কিছু পরেই মিঃ রায় উপস্থিত হ'লেন, সঙ্গে অন্ধ একটি যুবক। তিনিই ব্রজবাবু, মৃত এড্‌ভোকেট্ মিঃ মিটারের সহোদর ভাই।

ব্রজবাবু সেই ঘরটায় ঢুকে নিতান্ত চক্ষুষ্মান লোকের মতোই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লেন, এবং মিঃ রায়কে উদ্দেশ করে বল্‌লেন—আমি বড়ই আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি মশাই, এত ভোরে দাদা কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

রায় বল্‌লেন—কাল আপনি তাঁর কাছে কি বিশেষ আবশ্যকের জন্যে টাকা চেয়েছিলেন, তিনি সে সময় আপনাকে সে টাকা দিতে রাজী হন্ নি…

ব্রজবাবু বাধা দিয়ে বল্‌লেন—তবে কি তিনি এখন টাকা দিতে রাজী হয়েচেন? আঃ, বাঁচালেন মশায়—টাকাটা না পেলে আমার যে কি অবস্থা হতো! মান-সম্ভ্রম কিছুই থাকতো না সামান্য শ'তিনেক টাকার জন্যে।

মিঃ রায় বল্‌লেন—এমন কি জরুরী দরকার—আপনার দাদাকে বলেছিলেন?

—বলেছিলুম, কিন্তু তিনি হয়তো তখন বিশ্বাস করেন নি—অথচ ভগবান জানেন, আজ বেলা দশটার মধ্যে টাকাটা না যোগাড় করতে পার্‌লে…

—আজ বেলা দশটা? আচ্ছা, এখন ক'টা বেজেছে বল্‌তে পারেন?

—নিশ্চয়।

ব্রজবাবু দিব্য সাধারণ লোকের মতই ঘড়ির সাম্‌নে গিয়ে ডায়েলের কাচটা খুলে ফেল্‌লেন, এবং ডায়েলের ওপর হাত বুলিয়ে বল্‌লেন—বোধ হয় পাঁচটা বেজে পনের মিনিট হয়েছে। একেবারে সঠিক বলা বড় শক্ত নয় কি? বলে একটু হেসে সেখান থেকে সরে এলেন।

মিঃ রায় লক্ষ্য করছিলেন ব্রজবাবুর প্রত্যেক গতি, প্রত্যেক ভঙ্গী। একটুও ইতস্ততঃ ভাব নেই। তাকে লক্ষ্য করতে-করতেই রায় বল্‌লেন—হ্যাঁ, আপনি প্রায়

ঠিকই বলেছেন, এখন পাঁচটা আঠারো; আপনার দেখ্‌ছি অসাধারণ ক্ষমতা।

—অন্ধ লোকেদের এশক্তি প্রবল; তা' ছাড়া, এ বাড়ীর প্রত্যেকটি জিনিষের সঙ্গে আমি এতই সুপরিচিত যে, কিছুতেই আমি দৃষ্টিশক্তির অভাব বোধ করতে পারি না।

মিঃ রায় হঠাৎ তাঁর ওপর দৃষ্টি রেখেই বল্‌লেন—এখন পাঁচটা বেজে আঠারো মিনিট হয়েছে, আর এগারটা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় মিঃ মিটার মারা গেছেন।

চম্‌কে ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—অ্যাঁ! কি বল্‌ছেন?

—মিঃ মিটার মারা গেছেন রাত এগারটা কুড়ি মিনিটের সময়।

—মারা গেছেন!

—হ্যাঁ, আপনাকে ফোন্ করবার খানিক পরেই মিঃ মিটার আপনাকে পঞ্চাশটা টাকা পাঠাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়টিতেই তিনি খুন হন্।

—খু..ন হয়েছেন!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এবং এও জানা গেছে তাঁকে হত্যা করেছে কোন অন্ধ ব্যক্তি।

ব্রজবাবুর মুখ শুকিয়ে ইট্ চাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাসে সাদা হ'য়ে উঠ্‌লো—অন্ধ চোখের কোণ দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়্‌লো। জড়িত স্বরে তিনি বল্‌লেন—তবে কি বল্‌তে চান—

—হ্যাঁ, বল্‌তে চাই, আমি নির্ম্মল রায়, ডিটেক্‌টিভ্ ইন্‌স্পেক্টর আপনাকে মিঃ মিটারের হত্যাকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করছি। আপনি আপনার নষ্ট করবার টাকাটাই বুঝ্‌লেন। নিলজ্জর মার পেটের ভাই, যিনি আপনার শত অত্যাচার স্নেহের সঙ্গে সহ্য করে আসচেন, তাঁর জীবনটার কথা একবারও ভেবে দেখ্‌লেন না।

অন্ধ ছুটি ব্যাকুল দৃষ্টি দিয়ে ব্রজবাবু ডিটেক্‌টিভ্ ইন্‌সপেক্টরকে দেখ্‌তে চেষ্টা করলো।

মিঃ রায় বল্‌লেন—গ্রেফতারের পূর্ব্বে আরও দু'-একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি...

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে সতীশ বল্‌লে—আপনার জেরা ততক্ষণ চলুক মিঃ রায়, আমি একটু ভেতর থেকে আস্‌চি।

এমন সময় সেই ঘরে প্রবেশ করলো নীলমণি। তার গোল গোল চোখ দু'টির তারায় যেন হাসি নেচে বেড়াচ্ছে। সতীশকে সম্বোধন করে নীলমণি বল্‌লে—কোথা যাবেন সতীশ বাবু। বসুন একটু। প্রভাবতী যে এখনই আস্‌চে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

নির্ম্মল রায় বল্‌লেন—ও আবার কি রসিকতা হে নীলমণি? প্রভাবতীটি আবার কে?

একগাল হেসে সতীশের দিকে চেয়ে নীলমণি জবাব দিলে—সতীশবাবুর আনন্দদায়িনী। অতিকষ্টে ঠিকানাটি সংগ্রহ করে লোক পাঠিয়েছি তাঁকে সাদরে এখানে নিয়ে আস্‌বার জন্যে। জানেন সতীশবাবু, প্রভাবতীর ঠিকানাটা যদিও সংগ্রহ হয়েছে আপনার কাছ থেকে···চম্‌কাবেন না। আপনি নিজে হাতে না দিলেও আপনার কাগজ ফেলা ঝুড়ি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছি···তা' স্বত্ত্বেও আমাকে হায়রাণ কম হ'তে হয় নি। আপনাকে একা বসিয়ে রেখে ছুট্‌তে হলো পোষ্ট অফিসে। ডাকবাক্স খুলিয়ে এই চিঠিখানাকে উদ্ধার করতে হ'বে তো।

বলে নীলমণি পকেট থেকে একটা খাম সতীশকে দেখিয়ে নির্ম্মল রায়ের হাতে দিয়ে বল্‌লে—খুলে ফেলুন চিঠিখানা, প্রেমপত্র বলে লজ্জা পাবার কিছু নেই। প্রেম জিনিষটা যদিও গুপ্ত রাখার বিষয়, কিন্তু পুলিশের কাছে তার 'ফ্রি এন্‌ট্রেন্স' শ্রীমতী প্রভা বা সতীশবাবু যদি রাগ করেন তো নাচার।

চিঠির ভেতর থেকে বেরুলো একখানা ছোট চিঠি, আর পাঁচ হাজার ন'শো পঞ্চাশ টাকার ক'খানা ভাঁজ করা নোট।

তিন

বিচার হলো। কোর্টে সতীশবাবু তাঁর দোষ স্বীকার করলেন। বল্‌লেন—আমার মনিব মিঃ মিটারের আমি খুবই প্রিয়পাত্র ছিলুম। প্রায় দশ বছর আমি তাঁর কাছে

চাক্রি করেছি, কোনদিনই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি নি। কিন্তু আমার কাল হ'ল প্রভাবতী নামে এক বারবণিতা। তারই মোহে পড়ে আমি হিতাহিত বিবেচনাশক্তি, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, জ্ঞান সবই হারালুম। অর্থের ঘট্‌লো অনাটন, তবু কোনরকমে চালিয়ে আস্‌তুম। আমার মনিব মিত্তির-সাহেব লোক ছিলেন ভালো, সময় সময় মাইনে ছাড়াও অনেক টাকা বক্‌শিস্ করতেন। ক্রমে প্রভার মুখে আনন্দ ফোটাতে সে টাকাতেও অকুলান হ'তে লাগ্‌লো। অর্থ-চিন্তায় আবার মাথার ঠিক ছিল না, এমন সময় একদিন রাতে শুন্‌লুম—ব্রজবাবু ফোনে সাহেবের কাছ থেকে তিনশো টাকা চান্, কিন্তু সাহেব তাঁকে অনবরতঃ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে রাজী হন্ না, এই নিয়ে ফোনে খুবই বচসা হয়। আমি আমার অফিস্-ঘরে বসে সবই শুন্‌তে পাই এবং তখনই আমার মনে দারুণ লোভ জন্মালো; কারণ, কিছুক্ষণ আগে এক মক্কেল সাহেবকে ছ'হাজার টাকা দিয়ে যায়। আমার মাথায় সয়তান এসে বাসা নিলে। ভাব্‌লুম, যদি কোনরকমে সাহেবকে হত্যা করা যায়, তা' হ'লে নিজের ঘাড়ে কোন দোষই পড়ে না—সমস্ত দোষ চাপানো যেতে পারে ব্রজবাবুর স্কন্ধে; অথচ, এতগুলো টাকা আত্মসাৎ করা যায়। এই দুষ্প্রবৃত্তি আমার মনে আরও শেকড় গাড়্‌লে, যখন সাহেব আমাকে ডেকে বল্‌লেন—দেখ, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে এসে ব্রজকে এই টাকাগুলো দিয়ে এসতো।

দেখ্‌লুম, তাঁর হাতে পঞ্চাশ টাকার নোট আর একটা চিঠি—লিখ্‌ছেন ব্রজবাবুকে।

আমি ভাব্‌লুম, মিত্তির-সাহেবের লিখিত এই চিঠি ব্রজবাবুর বিপক্ষে মস্ত বড় প্রমাণ হ'য়ে দাঁড়াবে। আমি ফিরে গেলুম আমার আমার অফিস-ঘরে, সেখানে ছিল আমার মনিবের রিভলভর, তাই নিয়েই তাঁকে পেছন থেকে গুলি করি। ব্রজবাবুর ওপর পুলিশের সন্দেহ দৃঢ় করবার জন্যে আমি অনেকগুলি পন্থা অবলম্বন করলুম—পেছন থেকে, একেবারে পিঠের ওপর এসে গুলি করাতে একগুলিতেই সাহেব মারা গেছ্‌লেন, তবু আমি এধার-ওধার কতকগুলো গুলি ছুঁড়ি। ঘড়িটার ওপর দাগ ঘসে রাখি, দরজায় হাত ঘসার দাগ রেখে দি'। এ গুলো দেখ্‌লেই চট্ করে যে কেহ সন্দেহ করবে [illegible] অন্ধলোক হত্যা করেছে, এবং তা' হ'লেই [illegible] বুকে নিয়েই পুলিশ ব্যস্ত থাক্‌বে।

তারপর, ড্রয়ার থেকে টাকাগুলো তুলে নি। সাহেবের হাতের কাছে যে পঞ্চাশ টাকা ছিল, তাতে আমি হাতও দিই নি। পুলিশের লোক ভাব্‌বে অন্ধ বলেই ও টাকাটা হত্যাকারীর নজর এড়িয়ে গেছে। টাকাগুলো আমার কাছে রাখ্‌তে সাহস হচ্ছিল না, কিন্তু সে সময় বাড়ী ছেড়ে যাওয়াও অসম্ভব; সেই জন্য নোটগুলো খামে এঁটে প্রভার ঠিকানায় পাঠাই। সাম্‌নেই ডাকবাক্স, খা[illegible] ডাকে দিয়েই পুলিশে ফোন্ করলুম হত্যার খবর দেবার জন্য—যেন আমি খেয়ে এসে দেখি, সাহেবকে কে হত্যা করে চলে গেছে।

আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, অফিস-ঘর থেকে প্রভার ঠিকানা লেখা কারবনটা পেয়েই নীলমণিবাবু আমাকে সন্দেহ করেছেন। কিন্তু আমাকে খুনী বলে সন্দেহ করেছিলেন কি করে?

নীলমণি তার ক্ষুদে চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিয়ে বল্‌লে—আমার চোখ মশায়, সন্দেহ করেছিল যখন আপনি প্রথম ঘরে ঢুক্‌লেন। আপনি মিঃ মিটারের মুখের দিকে চেয়েই ভয়-ব্যাকুল হ'য়ে চম্‌কে উঠেছিলেন, সেটা আমার লক্ষ্য এড়ায়নি। আপনি যদি দোষী না হ'তেন, তবে অতটা চম্‌কাতেন্ না; কারণ, আপনি মৃত অবস্থায় তাঁকে আগেই দেখেছেন। তারপর, আপনি যতক্ষণ ঘরে ছিলেন, ততক্ষণ আপনি চেষ্টা করছিলেন যাতে মৃতের দিকে না চাইতে হয়, এবং যখনই আপনার ওদিকে দৃষ্টি পড়ছিল, তখনই আপনার মন অনুশোচনায় ভরে উঠছিল, আপনার মুখই তা' বলে দিচ্ছে! সন্দেহ আরও একটু গাঢ় হ'ল ঘড়ি দেখে। মিঃ রায় ঘড়িতে রঙের দাগ দেখতে পেয়ে যখন ব্রজবাবু হত্যাকারী ভেবে নিঃসন্দেহ হচ্ছি[illegible], আ[illegible] তাঁকে নির্দ্দোষ বলেই স্থির কর[illegible]ছিলুম; কা[illegible]ণ, অন্ধলোক একটা হত্যাকণ্ডের পর অত জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করে

হত্যার নিদর্শন রেখে যাবে না। আমার তখনই মনে হয়েছিল, অন্য কেউ মিত্তির-সাহেবকে হত্যা করে' নির্দ্দোষ ...বাবুর স্কন্ধে ভ্রাতৃহত্যার অভিযোগটা চাপাবার মতলবে আছে।

আমি যখন আপনার টাইপ মেসিনটা পরীক্ষা করি, তখন দেখ্‌তে পাই,—কাগজ পরাবার রোলারের ধারে একটু সবুজ রঙের দাগ; তারপরই দেখলুম, কারবনে প্রভাবতীর ঠিকানা। তখনই বুঝ্‌লুম যে, কার হাত থেকে রঙের দাগ এসে পৌঁছেছে এখানে। আপনার দস্তানার পাশ দিয়ে একটু রঙ আপনার কব্জির ওপর এসে লেগেছিল, যা' দিয়ে আপনি ব্রজবাবুকে ফাঁদে ফেল্‌তে যাচ্ছিলেন, তা' আপনার পায়েই জড়িয়ে ধরল। পাছে সবুজ রঙের টাইপ থাক্‌লে সন্দেহ হয়, সেই জন্য আপনি কারবন চড়িয়ে লেখাটাকে টাইপ করেছিলেন।

আমি তখন ভাবলুম, এমন একটা কাণ্ড করে' যখন আপনি প্রিয়তমাকে পত্র দিতে ব্যস্ত, তখন তার মধ্যে নিশ্চয়ই বাস করছে চোরাই নোটগুলো। তখন তাড়াতাড়ি চলে' গেলে লোকে সন্দেহ করবে। বাড়ীতে নোটগুলো রাখাও দায়। সুতরাং, ও ছাড়া আর সুন্দর উপায় নেই; বিশেষতঃ, টাকাগুলো যখন ওই শ্রীচরণেই যাবে। আমি তখন ঠিক করেই নিলুম, নিশ্চয়ই সাম্‌নের কোন ডাকবাক্সে চিঠিটা ফেলে দিয়ে এসে তাড়াতাড়ি থানায় ফোন্ করেছিলেন—'আমি খেয়ে এসে দেখি, আমার মনিব মিঃ মিটারকে কে খুন করেছে। শীগ্‌গির আসুন।'

আমি আপনাকে বসিয়ে রেখে সামনের ডাকবাক্সে দেখ্‌লুম, ছ'টার আগে সেটা খোলা হবে না। পোষ্ট-অফিস থেকে লোক নিয়ে এসে বাক্স খোলালুম; দেখলুম, শ্রীমতী প্রভাবতীর হরফ বুকে নিয়ে খামখানা দিব্যি সেখানে ঘুমুচ্ছে।

আমার আরও আহ্লাদ হ'ল যখন দেখ্‌লুম, খামের কোণের দিকটায় একটু রঙের দাগ লেগে রয়েছে। বোধ হয়, তাড়াতাড়ির মাথায় আপনার সেটাও নজরে আসে নি।... তারপর, বুঝ্‌তেই পারছেন...খামখানা যখন মিঃ রায় আপনার সাম্‌নেই খুলে ফেল্‌লেন, তখন আপনার মুখের অবস্থা দেখে আমার মনের অবস্থাটা কি রকম হ'ল।

তবে হ্যাঁ, একটা কথা আপনাকে মিথ্যা বলেছি, প্রভাবতীকে কোন খবর দিয়ে ত্যক্ত করা তখন আমি প্রয়োজন মনে করি নি। মিঃ রায় পরে 'ইন্‌ভেষ্টিগেসানে'র-এর সময় তাকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেন।

মোকদ্দমার রায় বেরোবার দিনকতক পরে একদিন ডিটেক্‌টিভ্ ইন্‌স্‌পেক্‌টর নির্ম্মল রায়ের সঙ্গে পথে নীলমণির দেখা। মিঃ রায় বল্‌লেন—গুড মর্ণিং মিঃ য়্যাসিস্‌ট্যান্‌ট্ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট! হাজার টাকা বখ্‌শিস্ পেলেন, খাওয়াচ্ছেন কবে?

হাস্‌তে হাস্‌তে নীলমণি বল্‌লে—মাসীমা বলেন, নির্ব্বোধেরা ভোজ দেয়, আর বুদ্ধিমানেরা আহার করে; তা' আমার সে হিসাবে খাওয়ানই উচিত। আপনি কিন্তু আমাকে য়্যাসিস্‌ট্যান্‌ট্ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট না বলে' নীলমণি বলেই ডাক্‌বেন।

নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ব্যথা

শ্রীমতী দুর্গা দেবী

দক্ষিণ আফ্রিকার আঙ্গিনাম্ উপত্যকায় একখণ্ড জমি ইজারা নিয়ে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরে' বুয়ার কৃষক জুরিয়ান্ ও তার স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় একত্রে বাস করে' আসছিল।

পাহাড়ের গা-ঘেঁসে উত্তরমুখী তার জমি। জমিদারের বাড়ী সেখান থেকে একঘণ্টার পথ। এমন জমিতে ফসল খুব কমই হয়; এখানকার চাষীরা তাই বড় গরীব। জুরিয়ান আবার তাদের সকলের চেয়ে গরীব। দেখতে লম্বা, শীর্ণ, দুর্ব্বল চেহারা, ধীরে ধীরে অল্প কথা বলে, ধীরে ধীরে চলে। চুলগুলো রুক্ষ, ধুলিধূসর, অবিন্যস্ত, কিন্তু তা'তে উগ্রতা প্রকাশ পায় না, তার অন্তর যেমন নরম, চেহারাটাও তেমনি নরম দেখায়। স্ত্রী দেল্‌জির প্রতি ভালবাসার টান তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছিল; উপস্থিত দেল্‌জির ব্যায়রাম হবার পর থেকে সেটা আরো বেড়ে গেছে। বুড়ী দেখতে বেশ মোটাসোটা, গায়ের চামড়া কচিছেলের মত নরম তুলতুলে, মেজাজ বড় ঠাণ্ডা, রোগের যন্ত্রণায় কাতর হলেও মুখের হাসিটি মিলোয় না, কাযেই যৌবন-বয়সের চেয়ে এখন সে জুরিয়ানের আরো প্রিয় হ'য়ে উঠেছে। বিয়ের আগে সে এক মনিবের বাড়ী চাকরী করে' অতিকষ্টে দিন চালাতো, সেখান থেকে এক কাপড়ে একখানি বাইবেল মাত্র সম্বল করে' সে স্বামীর ঘর করতে আসে। তার মনিব চোখে ভাল দেখতে পেতো না, তাকে বই পড়ে' শোনাবার জন্য দেল্‌জিকে একটু লেখাপড়া শিখ্‌তে হয়েছিল। জুরিয়ান একেবারে নিরক্ষর; দেল্‌জি যখন এসে বিয়ের রাত্রে তাকে বাইবেল পড়ে শোনাতে লাগলো,-তার মনে হলো পৃথিবীতে কোনো সঙ্গীতের সঙ্গে এর বুঝি তুলনা নেই। এখন বয়সের দোষে গলার স্বর পাখীর আওয়াজের মত সরু হ'য়ে গেছে, তবু এখনও তার বইপড়া জুরিয়ানের খুব ভাল লাগে। এরা চিরদিনই অতি দরিদ্র, তবু কখনো দু'জনে ঝগড়া হয় নি;—এরা চিরদিনই নিঃসন্তান, তবু মনের কখনো অমিল হয় নি;—এতেই যেন বরং এদের আরও ঘনিষ্টভাবে মিলিত করে' রেখেছে। দেল্‌জির রোগ হওয়াতে যেন দু'জনেরই সমান দুঃখ। এতদিন পর্য্যন্ত দু'জনেরই স্বাস্থ্য বরাবর ভাল ছিল,রোগ কা'কে বলে জান্‌তোনা,হঠাৎ যেন দু'জনেরই কি এক নতুন আপদ এসে উপস্থিত হয়েছে; যেন কে এক প্রবল শত্রু এদের দু'জনকে কষ্ট দিতে এল। কি এক অবোধ্য কারণে থেকে থেকে দেল্‌জির পাঁজরার নীচে খাম্‌চে ধরে' প্রবলবেগে নাড়া দেয়, আর দেল্‌জি তার ছোট ঘরটিতে তক্তার উপর

পড়ে' নিতান্ত অসহায়ের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে।

ওদের কুঁড়ের ভিতর তিনখানি ছোট ছোট মেটেঘর। সাম্‌নেই কয়েকটা পীচের গাছ, তার সাম্‌নেই ছোট একটি ঝরণা। বছর বছর এই গাছের ফল শুকিয়ে তারা দেবতার পূজা দিয়ে আস্‌তো, আর তার বিচিগুলো ঘরের মাটির মেঝে শক্ত করবার জন্য তার মধ্যে পিটে পিটে বসিয়ে দিত। প্রতিদিন ভোরে উঠে দেল্‌জি ঝরণা থেকে জল তুলে আন্‌তো; ঘরের মেঝেয় সেই জল ছিটিয়ে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার কর্‌তো। রান্নাঘর, শোবার ঘরের মেঝে প্রত্যেক দিন গোবর দিয়ে নিকিকে তক্‌তকে করে' রাখতো। তারপর সে কাফি ভাজতো, গুঁড়ো করতো, রুটি সেঁকতো, এর একটা মিশ্রিত সুগন্ধ রান্নাঘর থেকে পাওয়া যেতো।

শোবার ঘরে তিনখানি চেয়ার চামড়ার তাঁত দিয়ে বোনা, একটি হল্‌দে রংয়ের টেবিল ঘষা-মাজার গুণে নিত্য ঝক্‌ঝক্‌ করছে, একদিকে নতুন রংকরা একটা বড় কাঠের বাক্স। পাশে আর একখানি ছোট বসবার ঘর, তা'তে এক কবাটের একটি মাত্র দরজা। দাওয়ায় উঠে এই দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকতে হয়, বাড়ীর মধ্যে আর কোনো দরজা নাই। এ-ঘর থেকে ও ঘরে যেতে যে পথ, তাতে শুধু মাটির ফাঁকা খিলান, কবাট নেই। ঘরের ভিতরকার দেওয়ালগুলো চাল পর্য্যন্ত উঁচু নয়, মানুষ-সমান উঁচু, আর এই সব দেয়ালের মাথায় মাথায় কুমড়া, তামাক পাতা, পুঁটলি বাঁধা নানারকম ফসলের বীজ, সাজিমাটি, ঘরের তৈরী মোমবাতি, আরো কত কি জিনিষ জমা করা আছে। চালের বাতা থেকে নানারকম শিকা ঝুলছে, তাতে লাউ ঝুলছে, তরমুজ ঝুলছে। ছোট ঘরটায় একটী মাত্র জানলা, সেটা কাঠের তক্তা দিয়ে বন্ধ করা থাকে। বাইরের ঘরের দিকে দেওয়ালে কুলুঙ্গির মধ্যে তিনটে ছোট ছোট তাক্‌ গাঁথা, ওদের যা' কিছু সম্পত্তি দেল্‌জি এর মধ্যেই রাখে; তাঁর বাইবেলখানি, মোটা মোটা দুটো চায়ের ডিস্‌ বাটি, তার গায়ে লাল রং দিয়ে বড় করে' আঁকা, বোধ হয় গোলাপফুলই হবে, কিন্তু দেখলে মনে হয় লাল বাঁধাকপি, একটি ছোট গোলাপী রংয়ের মগ্‌, তার একদিকে সোনার জলে লেখা 'প্রীতি-উপহার', অন্যদিকে আঁকা সোনালি রাজপ্রাসাদ; একটি ছোট আসন লাল ও সবুজ পশম দিয়ে বোনা; কালো বর্ডার দেওয়া একখানি নিমন্ত্রনের কার্ড; জমিদারের মায়ের শ্রাদ্ধের সময় সেখানা এসেছিল—তারই স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ এখনো তোলা আছে; এছাড়া, একটি উটপাখীর ডিম,—আর একটি ছোট বাক্স নীল সাটিন সিল্ক দিয়ে মোড়া, মাঝখানে এক ইঞ্চি পরিমাণ একটি আয়না, তার চারদিকে ছোট ছোট সমুদ্রের ঝিনুক বসানো। এই ক'টি ওদের সরল মনের কাছে পরম গৌরবের জিনিষ। পঞ্চাশ বছর একত্র বাসের ফল এইগুলি ওদের বড় মূল্যবান সম্পত্তি।

এ ছাড়া, আজ এক বছর ধরে' এই কুলুঙ্গির ওপর তাকে দেল্‌জি 'শূলনাশক বিন্দুর' কয়েকটা শিশি জমা করে' রেখেছে। দেল্‌জির ব্যথার জন্য এই ওষুধ জুরিয়ান মাঝে মাঝে সহর থেকে কিনে আনতো। প্রথম প্রথম এই ওষুধে দেল্‌জির ব্যথা একেবারে সেরে যেতো,—আর ওদের সেই শত্রুটা যেন দূর হ'য়ে যেতো; তারপর যখন ব্যথা বেড়ে উঠে ক্রমশঃ ঘন ঘন দেখা দিতে লাগলো, তখনো এই ওষুধের বিজ্ঞাপনের ছাপার লেখার জোরে ওদের দু'জনেরই বিশ্বাস অনেকদিন পর্য্যন্ত অটুট রইল। কিন্তু শেষে জানুয়ারী মাসে জুরিয়ানের সে বিশ্বাস একেবারে ভেঙে গেল। এই মাসে প্রত্যেক দিনই উপর্য্যুপরি ব্যথা উঠতে লাগলো, আর ওই ওষুধ খেয়ে খেয়ে একেবারে ফুরিয়ে ফেল্‌লেও কিছু ফল হোলো না,—দেল্‌জি ক্রমে দুর্ব্বল হ'য়ে কচিছেলের মত নেতিয়ে বিছানায় পড়ে রইল। তাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে জুরিয়ান আবার সহরে ছুটলো ওষুধ আনতে।

সেদিন জুরিয়ান যখন দোকানে গিয়ে পৌছালো, সেখানে দেখলে দিসেল্‌মান্‌ বসে' দোকানীর সঙ্গে কি কথা কইছে। দিসেল্‌মান্‌ এ সহর থেকে ও সহরে মাল নিয়ে যাতায়াত করে। সে খুব জোরগলায় ডাচ্‌দের সুখ্যাতি

করছে, আর ইংরেজদের নিন্দা করছে। বল্‌ছে, ডাচ্ সহরে নতুন হাসপাতাল খুলেছে, জুরিয়ান তার নামও কখনো শোনে নি ; এ দেশের মধ্যে এই না কি প্রথম হাসপাতাল তৈরী হোলো। এবার থেকে ইংরেজদের সহরে হাসপাতালের অভাবে শত শত লোক মরতে থাকবে, কিন্তু ডাচদের সহরে আর কাউকে রোগে কষ্ট পেতে হবে না। এই হাসপাতালে যতই মুমূর্ষু অবস্থায় যে কোনো রোগী যাচ্ছে, কিছুদিন পরে তারা সবাই সেরে উঠে ভগবানের নাম করে' হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসচে।

দিসেল্‌মানের মুখে এই হাসপাতালের কথা শুনে জুরিয়ানের চোখের ওপর দেল্‌জির সেই কাতর সজল মুখখানি ভেসে উঠলো, আর বুকের ভিতর কি এক অদ্ভুত আশায়,ব্যাকুলতায় ও ভয়ে একসঙ্গে তোলপাড় করে' উঠ্‌তে লাগলো। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করে' থেকে থেকে শেষকালে সে কম্পিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, বড় লোক ছাড়া বুঝি আর কাউকে সেই হাসপাতালে ঢুক্‌তে দেয় না?"

দিসেল্‌মান্ চেঁচিয়ে হেসে উঠলো—"বড়লোক, এতে বড়লোকের কি কথা আছে? যে যতই গরীব হোক্ না কেন, হাসপাতালে তো সকলকেই নেবে!

জুরিয়ান অবাক্ হ'য়ে ভগবানের নাম করতে লাগ্‌লো। ওই দিসেল্‌মানের দিকে চেয়ে চেয়েই সে দেল্‌জির মুখখানি স্পষ্ট দেখ্‌তে লাগ্‌লো,—সেই শিশুর মত নরম গোলগাল মুখখানি যেন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে, হাসতে হাসতে ভগবানের নাম করতে করতে এখনই যেন সেও হাসপাতালের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে।

জুরিয়ান বাড়ী ফিরে গেল। দেখ্‌লে দেল্‌জি যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই শুয়ে পড়ে' আছে। তাকে আগে খানিকটা ওষুধ খাইয়ে দিয়ে কাফি তৈরী করলে, তার সঙ্গে কিছু রুটি নিয়ে এসে খেতে দিলে। তারপর একখানা টুল নিয়ে এসে তার কাছে বসে' নতুন হাসপাতালের বিষয় সব কথা বল্‌লে। দিসেল্‌মান যা' যা' বলেছিল, সমস্ত কথা ধীরে ধীরে গুছিয়ে বল্‌লে। তারপর দেল্‌জির হাত দু'খানি ধরে' বল্‌তে লাগ্‌লো,—তার গরুর গাড়ীতে কেমন করে' তোষকটা পেতে দেবে, খড় দিয়ে থলে দিয়ে ওপরে ছই করে' ঢেকে দেবে, যত্ন করে' তার প্রাণের লক্ষ্মীটিকে তার ভেতর শুইয়ে দেবে, পাখী যেমন করে' তার নীড়ের মধ্যে শুয়ে থাকে ; তারপর খুব সাবধানে আস্তে আস্তে গাড়ী চালিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, তখন তার সব ব্যথা ভাল হ'য়ে যাবে। দিসেল্‌মান যেমন বলেছিল, সেখান থেকে রোগীরা সব ভাল হ'য়ে ভগবানের নাম নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে, সে কথা বল্‌লে। তখন দু'জনেরই মনে এমন বিশ্বাস জন্মে গেল, যাতে তারা এখন থেকেই অন্তরে অন্তরে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

পরের দিন ভোরবেলা উঠেই জুরিয়ান যাত্রার আয়োজন করতে লেগে গেল। আগে সে গেল পাড়ার মধ্যে, সেখানে গিয়ে একজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে' এল তাকে কতকটা তামাকের মোড়া দেবে,এর বদলে সে তার ছাগলগুলোর আর মুরগীগুলোর তত্ত্বাবধানের ভার নেবে। জমিগুলো আপাততঃ এমনি পড়ে' থাকবে। এই বন্দোবস্ত করে' বাড়ী ফিরে এসে বাঁশ দিয়ে গাড়ীর ছই বাঁধলে, তার ওপর ছেঁড়া পাল বিছিয়ে ছাত তৈরী করলে। গাড়ীর তলার দিকে দড়ি দিয়ে বড় কেট্‌লিটা আর দু'-একখানা বাসন যা' সম্বল ছিল, বেঁধে নিলে। নদী থেকে এক কলসী জল এনে তাও গাড়ীর তলার দিকে বেঁধে নিলে। রং-করা কঠের বাক্সটা এনে গাড়ীর সুমুখ দিকে রাখলে, গাড়ী চালাবার সময় সেটা হবে তার বসবার জায়গা। যা' কিছু পথের সম্বল তা' এই বাক্সের ভেতর রৈল ;—একটা কাফির পুঁটলি, থলে ভরা শুক্‌নো রুটি, খানিকটা ময়দা, নুন দিয়ে জরান কতকটা ছাগলের টাট্‌কা মাংস,ছইয়ের পেছন দিকে কিছু বিচালি বেঁধে নিলে গরুদের খাবার জন্য, তার মাঝে একটা ছোট টুল গুঁজে রাখলে। গাড়ীর ভেতর পালক-দেওয়া তোষকটি পেতে দিলে ; তার ওপর কম্বল বিছিয়ে বালিস দিয়ে দেল্‌জির জন্য বিছানা করে' দিলে।

সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে' চাষের বলদ দু'টাকে নিয়ে এসে গাড়ীতে জোতা হলো, তখন দেল্‌জি এসে গাড়ীতে উঠলো। তার পরণে কালো রংয়ের গাউন, মাথায় বনেট্ বাঁধা,—পায়ে জুরিয়ানের তৈরী জুতো, হাতে সাদা বুটির

লাল রুমালে বাঁধা একটি পুঁটলি,—তার মধ্যে আছে কেবল তার বাইবেলখানি, তার উপহারের জগ্‌টি, আর মুক্তো-ঝিনুক-বসানো ছোট বাক্সটি। যাবার উত্তেজনাতেই হোক্ বা শূলনাশকের জোরেই হোক্, এ সময় তার কোন ব্যথা নেই,—ভগবানেও তার অসীম বিশ্বাস, জুরিয়ানকেও তার পরম নির্ভর, হাসপাতালেও তার গভীর আস্থা; এখন সে পরম নিশ্চিন্ত, সরল বিশ্বাসে তার নিষ্পাপ গোল মুখখানি উদ্ভাসিত। চিরদিনের অভ্যাসমত নানা আদরের নামে ডাকতে ডাকতে তার হাত ধরে আস্তে আস্তে জুরিয়ান তাকে গাড়ীতে এনে তুল্‌লে।

গরুর গাড়ীতে ডাচ্ সহরে পৌছাতে ওদের তিনদিন তিনরাত্রি সময় লাগ্‌লো। দেল্‌জির ব্যথার জন্য খুব ধীরে ধীরে চল্‌তে হয়েছে, গরুকে বিশ্রাম দেবার জন্য পথে অনেকবার থাম্‌তে হয়েছে। খানিকটা পথ এদের পরিচিত, কিন্তু অনেক বছর এদিকে তারা আসে নি। শুক্‌নো মাঠের মধ্য দিয়ে ধূসর নির্জ্জন পথ সোজা চলে' গিয়েছে, দুপুরে রোদ খাঁ খাঁ করছে, দূর দূর অন্তর শূন্য মাঠের মধ্যে কচিৎ দু'-একখানা ঘর দেখা যায়, ওদের তাই দেখ্‌তেই ভাল লাগ্‌ছে। রাত্রে যখন বলদ দুটো অন্ধকারের সঙ্গে সমান তাল রেখে একটানা মন্থরগতিতে চল্‌তে থাকে, কিংবা যখন তাদের জোয়াল খুলে দিয়ে পথের ধারে জুরিয়ান আগুন জ্বালিয়ে বসে, আর তার শিখাগুলি আকাশের তারার দিকে নেচে নেচে উঠতে থাকে,—নিস্তব্ধ শান্তিতে ওদের মন তখন ভরপূর হ'য়ে ওঠে। দিসেল্‌মান যে হাসপাতালের পাথরের অট্টালিকার কথা বর্ণনা করেছিল, তার বদলে ওরা দিবারাত্র মনে মনে এক সোনার প্রাসাদ দেখে,—দেল্‌জির মগের গায়ে সোনার জল দিয়ে যেমনটি আঁকা আছে। দারুণ যন্ত্রণায় দেল্‌জি যখন নিতান্ত অবলা পশুর মত চুপটি করে' কুঁকড়ে শুয়ে অনবরত ঘামতে থাকে, তখন দু'জনে মিলে সেই পীড়িতের একমাত্র আশ্রয় অত্যাশ্চর্য্য স্বর্ণ-মন্দিরের কল্পনা করে' একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে মনে মনে তাকেই কেবল্ আঁকড়ে ধরে।

চারদিনের দিন দুপুরবেলা ওরা ডাচ্‌দের সীমানার মধ্যে পৌছালো। সেখানে ঝাম্‌কা নদীর পূর্ব্বধারে এক বিস্তীর্ণ সহর। তার চওড়া বড়রাস্তার একপাশে চুণকাম করা বাড়ীগুলি সাজানো,—প্রত্যেক বাড়ীর পিছনে খানিকটা বাগান কিংবা ঘাসের জমি নদী পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে। রাস্তার দুই ধারে দেওদার, ঝাউ, ইউক্যালিপ্‌টাসের বড় বড় গাছ সার বেঁধে আছে,—তার শেষ প্রান্তে এদিকেও পাহাড়, ওদিকেও পাহাড়। সমতল সহরটাকে ঘিরে চারিদিকেই পর্ব্বতমালা। নদীর পশ্চিম পাড়ে কেবল একখানি বড় বাড়ী পাথর দিয়ে গাঁথা, সেইটাই হাসপাতাল। নতুন বাড়ী, এখনও পাঁচিল ঘেরা হয় নি, গাছও পোঁতা হয় নি, বাগানও করা হয় নি,—ফাঁকা মাঠের মধ্যে ন্যাড়া পাথরের বাড়ীটা একা দাঁড়িয়ে আছে। দেল্‌জির মগে আঁকা অপূর্ব্ব প্রাসাদের সঙ্গে কোনই মিল নেই,—কিন্তু প্রথম নজরে পড়তেই আশায় আনন্দে ওদের চোখ অশ্রুজলে ঝাপ্‌সা হ'য়ে এলো, এই ফাঁকা বাড়ীটা আর তার বিস্তীর্ণ সিঁড়ির ধাপগুলো ওদের কাছে অপরূপ বলে' মনে হলো। গাড়ী নিয়ে নদী পার হ'য়ে ওরা ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো।

ওরা যখন সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো, তখন রোদের ভয়ে হাসপাতালের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে' দেওয়া হয়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ; গাড়ীটার ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ আর বিড়্ বিড়্ করে' বুড়োর ভগবানের নাম উচ্চারণ ছাড়া আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। যে সিঁড়িতে তারা আশা করেছিল কত মেয়েপুরুষ আরোগ্য হ'য়ে হাসতে হাসতে নেমে আসছে দেখতে পাবে, সে সিঁড়িতে জনপ্রাণী নেই, এতে অন্য লোক হয় তো কিছু হতাশ হোতো,—কিন্তু ওদের বিশ্বাস এতে কিছুই দম্‌লো না। দ্বিপ্রহরের এই নিস্তব্ধতার মধ্যে শান্তিময় বিধাতার কোন নিভৃত সুষমাই ওরা প্রত্যক্ষ করলে। দরিদ্র আর বৃদ্ধ লোকেরা যেমন অসীম ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করতে পারে, কখনো প্রশ্ন করে না,—তেমনি করে' ওরা কপালে কখন কি জুটবে তারই জন্য ধৈর্য্য ধরে' অপেক্ষা করে' রইল।

আধঘণ্টাখানেক পরে হাসপাতালের মেট্রন্ (কর্ত্রী) সিঁড়ির কাছে গরুর গাড়ীটা দেখতে পেলে। মহিলাটি

মধ্যবয়সী, সুদক্ষ এবং দয়াশীলা। জুরিয়ান টুপী খুলে বিনীতভাবে তাঁর কথার জবাব দিতে লাগলো। তার নাম জুরিয়ান, বয়স পঁচাত্তর পার হয়েছে, আঙ্গিনাম্ উপত্যকায় ইজারায় জমি নিয়ে চাষ করে,আর ওই যে গাড়ীর মধ্যে সে তোষক বালিশ দিয়ে বিছানা তৈরী করেছে, তার মধ্যে তার স্ত্রী দেল্‌জি, বয়স সত্তর বছর, পেটের ব্যথা আরাম করবার জন্য তাকে এখানে এনেছে।

এই রুক্ষ চেহারার বিনয়ী বুড়োর আদ্যোপান্ত ইতিহাস আর না শুনে রোগিনী যেখানে গাড়ীর মধ্যে তার পুঁটুলিটি হাতে নিয়ে বসে' আছে, মেট্রন সেইখানে গেল। জুরিয়ানের সাহায্যে তাকে ধরাধরি করে' গাড়ী থেকে নামালে, তারপর সিঁড়ি বেয়ে এদের দু'জনকে তার অফিস-ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে এদের রেখে মেট্রন অন্যত্র চলে' গেল, এরা দু'জনে সেই অন্ধকার নির্জ্জন ঘরে একটি কৌচের ওপর ছেলেমানুষদের মত হাত ধরাধরি করে' বসে' রইল। তারা কোনো কথা বল্‌লে না, কিন্তু বুড়ো থেকে থেকে বুড়ীকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে' কানে কানে তাকে আদর করতে লাগলো,—সে তার চোখের মণি, তার গলার মুক্তামালা, তার গোলাপ ফুল, তার ময়না পাখী, তার আরো কত কি!

মেট্রন্ ফিরে এলো একজন অল্পবয়সী প্রিয়দর্শন নার্সকে সঙ্গে নিয়ে। এদের বুঝিয়ে বলে' দিলে—এই নার্স রবার্ট, দেল্‌জিকে মেয়েদের ওয়ার্ডে নিয়ে যাবে, সেখানে ডাক্তার বৈকালে এসে তাকে পরীক্ষা করবে, জুরিয়ানকে সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, ততক্ষণ সে গাড়ীটা একধারে নিয়ে গিয়ে গরু খুলে দিয়ে বিশ্রাম করুক। ডাক্তারের কাছে খবর শুনে তারপর সে আঙ্গিনাম্ উপত্যকার দেশেই ফিরে যাক্, কিংবা নদী পারে সহরে কোনো চেনাশোনা লোকের কাছে গিয়েই থাকুক, যেমন তার খুসী।

এতক্ষণে ওরা প্রথম বুঝতে পারলে যে, হাসপাতাল ওদের দু'জনকে পৃথক ক'রে দেবে,আর দেল্‌জিকে যে এখনই সরিয়ে দেওয়া হবে এমনও কোনো সম্ভাবনা নেই। নার্স যখন বুড়ীকে হাতে ধরে' নিয়ে চল্‌লো, তখন সে নির্ব্বাক-ভাবে লাল রুমালের পুঁটলিটা হাতে নিয়ে যেতে যেতে কি ভাবছিলো তা' ঈশ্বর জানেন। কিন্তু জুরিয়ানের মনে হলো বুঝি পৃথিবীর অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে। হঠাৎ এইভাবে আহত হ'য়ে, মানুষ যেমন কোনো নতুন জায়গায় এসে হঠাৎ অন্ধ হ'য়ে গেলে পথ হাতড়ে বেড়ায়, তেমনি করে' সে এই চোখ ঠিক্‌রানো রৌদ্রের মধ্যে বেরিয়ে গিয়ে গাড়ী খুল্‌তে লেগে গেল।

বৈকালে কাফি খাবার সময় যখন এগিয়ে এল, বুড়ার কাফি তৈরী করার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না। তারপর মেট্রনের ঘর থেকে ডাক পড়লো; সেখানে ডাক্তার তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ডাক্তার একজন ইংরাজ, তবু যে তিনি ডাচ্‌দের দেশে এসেছেন, একথা দুই দিকের লোক সকলেই জানে। বুড়ো তাঁর সাম্‌নে এসে হাতযোড় করে' দাঁড়ালো। তিনি তাকে দেল্‌জির ব্যথার স্বরূপটা কি তাই বোঝাতে লাগলেন। রোগটি ভাল নয়,—অল্পবয়সে হ'লে এ রোগ চেষ্টা করে' হয় তো সারানো যেতে পারতো, কিন্তু এত বেশী বয়সে আর সারবার কোনো আশা নেই, তবে চিকিৎসা করলে কিছুদিনের জন্য কতকটা ভাল থাকবে। জুরিয়ান যদি তাকে কয়েক সপ্তাহের জন্য হাসপাতালে রেখে যায়, তা' হ'লে তিনি যতটা করা সম্ভব তা' করবেন, হয়তো তা' হ'লে সে অনেকটা সুস্থ হ'য়ে দেশে ফিরতে পারবে। অতঃপর দেল্‌জিকে এখানে রাখবে কি না জুরিয়ান সে কথা বুঝে দেখুক,—আর ততদিনের জন্য সে দেশেই ফিরে যাবে কি ওপারে কোথাও থাকবে তাও নিজে স্থির করুক।

বুড়ো ডাক্তারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলে। তারপর আস্তে আস্তে থেমে থেমে যেমন করে' বলা তার স্বভাব, তেমনি গম্ভীর হ'য়ে বল্‌তে লাগলো—দেল্‌জির ব্যথা তিনি যদি হাসপাতালে রেখে ভাল করতে পারেন, তা' হ'লে হাস-পাতালেই তাকে থাকতে হবে। তার নিজের পক্ষে,—জীবনের একমাত্র সঙ্গিনীটিকে ছেড়ে, তার দেশে ফিরে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। ওপারেও তার এমন কেউ নেই, যার কাছে গিয়ে সে থাকবে। এখনে সে নতুন

এসেছে, কাউকে চেনে না, সারাজীবন সে পাহাড়ের ধারে আঙ্গিনাম্ উপত্যকায় কাটিয়েছে, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে' স্রীটিই তার একমাত্র সঙ্গিনী। তার রোগটি আর সারবে না এই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, ডাক্তার তাকে যতখানি আরাম করতে পারেন করুন, আর তাঁর যখন এতই দয়া, তখন তাকেও তিনি হুকুম দিন হাসপাতালের একপাশে সে একটু ছাউনি মত করে' নিয়ে থাকবে। যতদিন দেল্‌জিকে নিয়ে যাবার মত না হয়, ততদিন যেন সে তার কাছে কাছেই থাকতে পারে।

ডাক্তার মেট্রনের দিকে ফিরে সংক্ষেপে আদেশ দিলেন—"তাই থাকুক। ওকে এখন একবার রোগীর কাছে নিয়ে যাও।"

মেট্রনের পিছু পিছু জুরিয়ান মস্ত টানা বারান্দা পার হ'য়ে এক তক্‌তকে প্রকাণ্ড লম্বা ঘরের মধ্যে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে সাদা রংয়ের ছয়টি ছোট ছোট খাট সারি সারি পাতা। প্রত্যেক খাটের পাশে একটি করে' ঝক্‌ঝকে 'লকার' (ছোট পিঁজরা-আলমারি), আর প্রত্যেক বিছানার মাথায় একটি করে' সাদা টিকিট ঝোলানো। লকারগুলো যেমন ঝক্‌ঝক্ করছে, ঘরের মেঝেটাও তেমনি চক্‌চক্ করছে। এখানে ঢুকেই এই ঔজ্জ্বল্য ও পরিচ্ছন্নতায় বুড়োর ধাঁধা লেগে গেল। প্রথমে এ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লো না; তারপর সে লক্ষ্য করলে তিনখানি খাটে তিনটি মেয়ে, তাদের মাথায় ঝালর দেওয়া সাদা সাদা কাপড়ের টুপি, তা'তে যেন তাদের কচি খুকীর মত মনে হচ্ছে। ক্রমে তার নজরে এল এই তিনটি খুকীর পোষাক-পরা মেয়ের মধ্যে একটি তারই দেল্‌জি।

টুপি মাথায় দেল্‌জির সেই পরিচিত নিরীহ গোল-মুখখানি কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল,—কিন্তু তাকে দেখতে পেয়ে, এটা যে কোনো অপরিচিত স্থান সে কথা জুরিয়ান ভুলে গেল, পাশে যে মেট্রন দাঁড়িয়ে আছে, তাও হুঁস রইল না। তার সেই আনন্দরূপিনীকে ছাড়া সে আর তখন চোখে কিছুই দেখলে না। তার বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে' তার হাত দু'খানি নিয়ে নিজের বুকের কাছে একেবারে চেপে ধরলে।

বিয়ের পর সেই প্রথম রাত্রি জুরিয়ান আর দেল্‌জি পৃথক হ'য়ে শুলো। সমস্ত রাত্রি বুড়োর চোখে ঘুমও নেই, বিশ্রামও নেই। নদীর ওপারে মিট্‌মিট্ করে' কত আলো জ্বলছে, বুড়ো অনেকক্ষণ ধরে' তাই দেখতে লাগলো। ক্রমে একে একে আলোগুলি নিভে গেল, তখন সে আকাশের তারার দিকে চেয়ে রইল। একবার করে' গাড়ীর বিছানায় গিয়ে শোয়, একবার করে' মাটিতে নেমে এসে শোয়। কখনো বা নিস্তব্ধ হাসপাতালের চারিধারে ভূতের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আবার যখন তার গাড়ীর কাছে ফিরে আসে, তখন বুকের কাছে কেমন একটা ব্যথা উঠে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে,—কিন্তু কোথা থেকে এই ব্যথা উঠছে, তা' বুঝতে পারে না। এখন আর তার মুখে ভগবানের নাম নেই। এই যে রাত্রি নীরব হ'য়ে আছে, ওই যে পাথরের প্রকাণ্ড বাড়ীটা তার সর্ব্বস্ব রত্নকে বুকে নিয়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে, এও বুঝি সেই ভগবানের অসীম শাস্তির আর একরূপ। কিন্তু সেই ভগবান এখন যেন তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে' গেছে,—আর যেন কখনো তার নাগাল পাওয়া যাবে না।

দেল্‌জির পক্ষেও এ রাত্রি আর ফুরোতে চায় না। জীবনে এই প্রথম সে নিজের কাপড়ে না শুয়ে হাস-পাতালের লম্বা গাউন পরে' অপ্রশস্ত গদির ওপর শুয়েছে। অনভ্যস্ত আল্‌গা পোষাকে শুয়ে তার এই সরু বিছানাই মরুভূমি বলে' মনে হচ্ছে। ব্যথার অবসরে যখন তার এক একবার তন্দ্রা আসছে, তখনই স্বপ্ন দেখছে জুরিয়ান মরে হিম হ'য়ে তার পাশে পড়ে' আছে—যতই তার কাছে ঘেঁষে যাচ্ছে, কিছুতেই যেন গরম পাচ্ছে না। যখন সকাল হলো, তখন দু'জনেই অনুভব করলে দেল্‌জির রোগের ব্যথার জন্য তারা যেন আর তত কাতর নয়, কিন্তু পরস্পরের মনের ব্যথাই ওদের জীবনে এখন এক প্রহেলিকার সৃষ্টি করে' তুলেছে।

তারপর থেকে প্রত্যেক দীর্ঘ দগ্ধদিন আর প্রত্যেক নিঃশব্দ জ্যোৎস্না রাত্রি ওরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটাতে লাগলো—আর জুরিয়ানের মন থেকে ভগবানের দূরে সরে' যাওয়ার ভাবটা যেন দিন দিন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

হাসপাতালের কায়দা-কানুন আর সু-শৃঙ্খলে কাজ চালাবার যে সব বাঁধা বন্দোবস্ত,—তা' ওদের দু'জনের কাছেই দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে রইল। পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ আঙ্গিনাম্ উপত্যকায় বাস করে' ওদের মনও যেমন সরল, ওদের জীবন-যাত্রাও তেমনি অনাড়ম্বর, ওদের প্রতিদিনের প্রয়োজনও তেমনি সামান্য। এই নতুন অপরিচিত জগতে এসে একধার থেকে ডাক্তারের অযাচিত অনুগ্রহ, মেট্রনের দয়া, নার্শের যত্ন, এসব ওদের কাছে যেন বোবা জন্তুর প্রতি দয়ালু মানুষের মমতার দানের মত বোধ হোতো। দুই পক্ষের কেউ কাউকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারতো না, এবং তার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। দেল্জির কোথায় কি রকম ব্যথা হয়, ডাক্তার ও মেট্রন তার ভালরকমই খোঁজ নিতো। কিন্তু বুকে তার কি ব্যথা, কিংবা জুরিয়ানের কি কষ্ট হচ্ছে, তার খবর তারা জানতো না। ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীরা এ বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করলে বুড়ী একেবারে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়তো, এইজন্য তার নিঃসঙ্গতা আরো বেশী হ'য়ে উঠতো।

সেই প্রকাণ্ড বাহুল্যবর্জ্জিত শূন্য ঘরের ভিতর অপরিচিতদের মধ্যে দেল্জি একাটি চুপ করে' শুয়ে থাকতো, কখনো কিছু অভিযোগ করতো না। শুয়ে শুয়ে কেবল তার পাহাড়তলীর ঘরটির কথা ভাবতো,—সেই ছোট ঘরটীতে তার কত আরামের গরম বিছানা, জানলায় কাঠের তক্তাটি দড়ি দিয়ে বাঁধা, পাহাড়ের এলোমেলো হাওয়া একটু লাগলে তাতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়,—একটা পরিচিত গন্ধ নাকে এসে লাগে; পীচের আঁটি বাঁধানো ঘরের মেঝে, দরজা দিয়ে তা'তে রোদ এসে পড়ে; নদীর ধারে পীচের গাছগুলি, কখনো পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যার ফলধরা বন্ধ হয় নি; পীচ শুকিয়ে গির্জ্জায় পুজো দিতে যাওয়া; পুজো দিতে গিয়ে পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে থেকে মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে তার দিকে চেয়ে জুরিয়ানের মৃদু মৃদু হাসি; তারপর আবার হেঁটে বাড়ী ফিরে আসা,—পথে আস্তে আসতে দূর থেকে পথের বাঁকে উঁচু পাহাড়ের গায় ঝরণার ধারে পীচগাছের ফাঁক দিয়ে সেই মাটির দেওয়াল দেওয়া ছোট কুঁড়েটি যখন প্রথম নজরে পড়ে …

জুরিয়ান নিজের হাতে ওই ঘরখানি তার জন্য বেঁধে ছিল। পঞ্চাশ বছর ধরে' ওই ছোট ঝরণাটির জল খেয়ে ওদের তৃষ্ণা মিটেছে—আর এখন ওদের খেতে হয় ট্যাঙ্কে ধরা জল, যার একটুও কোনো স্বাদ নেই। পঞ্চাশ বছর ওরা একসঙ্গে শুয়েছে, আর জানলার সেই পরিচিত ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ শব্দ হ'তে শুনেছে,—এখন শুতে হয় আলাদা আলাদা।…কেন তারা এখানে এলো?…ও, তার সেই ব্যথার জন্য…আচ্ছা, এখন তো আর সে ব্যথা নেই। যা' কিছু ব্যথা এখন মনে। প্রত্যেকদিন সে নার্সকে ডেকে বলে,—আর তার কোনো ব্যথা নেই। নার্স তাই শুনে হাসে, একটুখানি ঘাড় বেঁকিয়ে বলে—"আমায় কি কচি খুকী পেয়েছ? আর ক'টা দিন সবুর কর বাপু—আর ক'টা দিন সবুর কর! কখন তোমার ব্যথা সারবে সে কি আর আমায় বলে' দিতে হবে?" কিন্তু তার মনের ব্যথার কথাটা সে কেবল জুরিয়ানকেই বলে, যখন সে সন্ধ্যাবেলা আধঘণ্টার জন্য তার কাছে এসে বসে…

হাসপাতালের একপাশে মেয়েদের ওয়ার্ডের দিকে বুড়ো ছেঁড়া পালের একটুখানি ছাউনি মত করে' নিয়েছে, সেখান থেকে যখন উনুনের ধোঁয়া পরিষ্কার আকাশে উঁচু হ'য়ে ওঠে,দেল্জি তার বিছানা থেকে দেখ্তে পায়। এখান থেকে জুরিয়ান কোথাও বড় যায় না, কেবল এক-একবার হাসপাতালের চারদিকে আনমনা একটু হয়তো ঘুরে আসে, কিংবা হয়তো গরুগুলোকে একবার চরিয়ে নিয়ে আসে। দিনে দু'বার করে' সে দেলজির কাছে গিয়ে বসে। দেল্জি তখন সেই সরু গলায় তাকে বাইবেল পড়ে' শোনায়। কিন্তু এই ফাঁকা ঘরে, এত আলোর ভেতর, চারিদিকে ওষুধের গন্ধের মধ্যে শুনে তার প্রাণে তৃপ্তি আসে না। তার ভগবান তখনও দূরে সরে' থাকে। দিনরাত তার বুকে ব্যথা লেগে আছে, একটুও তার শান্তি নেই। সে যেন কিসের ঘোরে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। একবার তাকে নদীর ওপারে

সহরের মধ্যে যেতে হ'ল। সেখানে বড় রাস্তার ধারে দোকানে দোকানে কত জিনিষ সাজানো রয়েছে, সে জীবনে কখনো এমন সব জিনিষ চোখেও দেখে নি, কখনো দেখবেও না। দারুণ বিমর্ষতায় সে যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে রাস্তা পার হ'য়ে চলে গেল, ও রাস্তায় আর কখনো ফিরে এলো না।

সেই প্রিয়দর্শন অল্পবয়সী নার্স রবার্ট তাকে সহরে পাঠিয়েছিল। তার যৌবনসুলভ আত্মগর্ব্ব নিয়ে সে এদের বিচার করতো; সে ভাবতো, এই দু'টি নির্ব্বোধ প্রাণী যখন তার কাছে এসে জুটেছে, তখন তাকেই এদের মুরুব্বির মত হ'তে হবে। তার মনে দৃঢ় ধারণা, সে যেমন ভাবে ওদের চালাতে ইচ্ছা করে সেটা ওদের ভালর জন্যই, সেই জন্য সে ওদের জন্য যা' কিছু করে তারই মধ্যে একটা অনুগ্রহের ভাব থাকে। ডাক্তার যখন 'ওয়ার্ডে' 'রাউণ্ড' দিতে আসেন, তখন সেই দেল্‌জির হ'য়ে সব কথা বলে, আর দেল্‌জি যখন তা'তে মৃদু আপত্তি করে' জানাতে চায় যে, তার ব্যথা এখন সেরে গেছে, তখন ওর বোঝবার ক্ষমতা নেই বলে নার্স সে কথা একেবারে চাপা দিয়ে দেয়। এই নার্স রবার্টই জুরিয়ানের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় ঠিক করে' দিয়েছে, আবার দরকার মনে হ'লে এক-একবার তাকে ওয়ার্ড থেকে তাড়িয়েও দেয়। এ বেচারীরা স্বভাবতই বিনীত ও নরম প্রকৃতির,—কিন্তু তা' হ'লেও এদের জীবনে কখনো কারো বাধ্য হ'য়ে থাকতে হয় নি, কেবল ভগবানে বিশ্বাস ও পরস্পরের ভালবাসা দিয়েই এদের সরল পার্ব্বত্য-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। হাসপাতালের আর কিছুই তেমন আপত্তিকর নয়, কিন্তু এই ব্যক্তিগত কৃপাদৃষ্টি ওদের ব্যতিব্যস্ত করে' তোলে। এটা যেন ওদের অসহ্য হ'য়ে উঠলো। এই নার্সটিকে যত ওরা ভয় করতে লাগ্‌লো,—জীবনে কাউকে এত ভয় করে নি। সে যেন ডাক্তার, মেট্রন, আর ওদের মাঝে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দেল্‌জির ব্যথা ভাল আছে সে কথা সে মান্‌তে চায় না; জীবনে কোনো আনন্দ যেন আর সে ওদের পেতে দেবে না। আল্পিনাম্ উপত্যকার নাম নিয়ে সে ঠাট্টা করে, কথায় কথায় এ দেশের সঙ্গে তার তুলনা করে;—এমন কি, তার জলটা নিয়েও তর্ক করে। ওরা বিহ্বল হ'য়ে চুপ করে' থাকে,—শেষে মনে মনে ভাবে, এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

এই জলের কথা নিয়েই ওদের দুঃখ চরমে গিয়ে পৌছালো। এই সহরের নদীর জল এতই লোনা যে, মাটিতে সে জল শুকিয়ে গেলে মাটির ওপর নুনের একটা স্তর পড়ে' থাকে। সেই জন্য এখানে খাবার জন্য বৃষ্টির জল বড় বড় লোহার ট্যাঙ্কে ধরে' রাখা হয়। দেল্‌জির এ জল খেতে বড় বিস্বাদ লাগে, কিন্তু নার্স রবার্টের বিবেচনায় এটা নিতান্ত বাড়াবাড়ি। এই জল সম্বন্ধেই বুড়ীর একমাত্র অভিযোগ; কারণ, জলের পরেই সখটা খুব বেশী,—এবং যদিও সে কথা কেউ জানতে পারতো না, তবু যতই দিন যেতে থাকে আর বুড়ী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হ'য়ে আসতে থাকে,—ততই তার সেই ঝরণার জলের কথা মনে হ'তে থাকে, যে জল পঞ্চাশ বছর তার তৃষ্ণা মিটিয়ে এসেছে। একদিন সে দুর্ব্বলতার ঝোঁকে ঝরণার কথা বল্‌তে বল্‌তে বাইবেলোক্ত স্বর্গ-রাজ্যের কুয়ার কথা, সে জল খাবার জন্য কত লোকের হাহাকার, এই সব অসংলগ্ন কথা বল্‌তে লাগ্‌লো। অসহায় জুরিয়ান তার পাশে বসে' সব কথাই বুঝতে পারলে, দুঃখে তার বুক ফেটে যাবার উপক্রম হ'ল, বুকের এ দারুণ যন্ত্রণা সে আর সইতে পারে না এই দারুণ যন্ত্রণা এড়াবার জন্য ভেবে ভেবে শেষে এক সংকল্প করে' বসলো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় নার্স রবার্ট যখন তাকে ওয়ার্ড থেকে চলে' যেতে বল্‌লে,—তখন সে দেল্‌জির খাটের পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এই দরজাটায় রাত্রে কেবল খড়্‌খড়ি বন্ধ করা থাকতো। জুরিয়ান জান্‌তো এই খড়খড়ির পাখীর ভেতর দিয়ে ছুরি চালিয়ে চাড় দিলেই দরজার খিল খোলা যায়। দেল্‌জির কাপড়চোপড় তার খাটের পাশের লকারে থাকে, এ সন্ধানও জানতো। এ ওয়ার্ডে এখন আর একটি মাত্র রোগী ছিল ঘরের অপর কোণে। সে অতি বৃদ্ধা, তার জীবন প্রদীপ প্রায়

নিবু নিবু হ'য়ে এসেছে। হাসপাতালে কোনো শক্ত রোগী ছিল না বলে' তখন রাত্রে কারো ডিউটিও থাকতো না। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বলদ দু'টির খোঁজ করতে করতে সে একে একে এই সব কথাগুলো ভেবে নিল। তাদের খুঁজে এনে খাইয়ে গাড়ীর সঙ্গে বেঁধে রাখলে। তারপর আগুন জ্বেলে খানিকটা কাফি তৈরী করে' পান করলে, এ ছাড়া আর কিছু খেলে না। নিজের খাবার তাকে কিছু খেতে হোতো না; কারণ, হাসপাতাল থেকেই তার খাবার আসতো—তবু তার খাদ্যের সম্বল যা' ছিল, সেটুকু সে যত্ন করে' রেখে দিলে। তোষক বালিশগুলো গাড়ীর মধ্যে ভাল করে' পেতে রেখে সে গাড়ীর কাছে মাটিতে শুয়ে রইল। তার মাথার ওপর তারায় তারায় আকাশ ছেয়ে গেছে, কিন্তু সে দিকে তার দৃষ্টি নেই,—ভগবান যদি ওখানে স্বয়ং এসে দেখা দিতেন, তাও সে জানতে পারতো না। তার ভগবান এখন দূরে সরে' আছেন। দুঃখই তার একমাত্র সাথী।

ক্রমে নদীর ওপারের শেষ আলোটি যখন নিভে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, তখন সে উঠে আস্তে আস্তে এসে বলদ দুটোকে জুতে দিয়ে চাকার সাম্‌নে দুটো ভারী পাথর আট্‌কে দিলে। আবার হাসপাতালে ফিরে গেল, সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠ্‌লো, খড়খড়ির ভিতর আস্তে আস্তে ছুরি দিয়ে দরজার খিল খুলে ফেল্‌লে, তারপর নিস্তব্ধ ওয়ার্ডের মধ্যে যেখানে দেল্‌জি চুপ করে' শুয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলো। তার কাছে গিয়ে কোনো ব্যস্ততা প্রকাশ করলে না, কিছু ভয়ের লক্ষণও দেখা গেল না, ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ে' আদর করে' বল্‌লে—"শোন শোন, লক্ষ্মী আমার, একবার চেয়ে দেখ! গাড়ীর মধ্যে তোমার বিছানা আবার ঠিক করে' রেখেছি, বুঝ্‌লে? বলদ দুটোও জোতা হ'য়ে গেছে! এইবার সরে পড়ি চলো, কোলে করে' তোমায় গাড়ীতে নিয়ে যাই,—তারপর একেবারে সেই অঙ্গিনাম্ পাহাড়ে! কেমন?"

এই কথা বলে' নীচু হ'য়ে বসে' লকার থেকে তার কাপড়চোপড়গুলি সব বের করে, ফেল্‌লে। অতি সাবধানে দেল্‌জিকে পেটিকোট পরিয়ে দিলে, একে একে তার বাইবেল, ফুলকাটা মগ্, আর ঝিনুকের বাক্সটা বেঁধে নিলে। যে ঔষধের শিশিটা তার লকারের ওপর রাখা থাকতো, সেটাও নিজের পকেটে ভরে' নিলে। তারপর বুড়ীকে কচি ছেলের মত কোলে তুলে নিয়ে রাত্রে জ্যোৎস্নার মধ্যে বেরিয়ে গেল।

তার পালকের তোষকে আপন নীড়টির মধ্যে শুয়ে দেল্‌জি বড় আরাম পেল। আগে সে কাঁপ্‌ছিল, এখন কাঁপুনিটা থেমে গেল, জুরিয়ান যা' করলে তাতে কোন অন্যায় হলো কি না সে কথা একবারও বল্‌লে না। জুরিয়ানকে কাছে পাওয়াতে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় তার বুকে যে জোর পেল, তাতেই তার অন্তঃকরণ ভরে' রইল। এখনই তার মনে হ'তে লাগ্‌লো হাসপাতাল বাসটা যেন নিতান্ত স্বপ্নের মত কেটে গেছে,—তাতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাদের পৃথক করে' রেখেছিল। বুকের ব্যথাটা একেবারে চলে' গেছে। পেটের ব্যথার কথা আর সে ভাববেই না। হাসপাতালে থেকে তো শিখে নিয়েছে কেমন করে' সেটা চেপে রাখতে হয়। পাহাড়ে ঝরণার ধারে বসে' সে প্রাণভরে তার সুমিষ্ট জল খাবে, তা' হ'লে আর কোনো ব্যথা থাকবে না ··সমস্ত রাত জুরিয়ানের পাশে শুতে পেলে তার ব্যথাই উঠবে না···বালিশে মাথা রেখে শুয়ে মরণ-পথের যাত্রী এই নির্ব্বোধ নারীর হৃদয় স্নিগ্ধ শান্তিতে উপ্‌ছে উঠতে লাগলো।

গাড়ীর সুমুখ দিকে বাক্সটার ওপর বসে' জুরিয়ান মাঠ পার হ'য়ে, নদী পার হ'য়ে বড় রাস্তায় পড়ে অবিচলিতভাবে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। তার নিস্পন্দ বুকের মধ্যে এতক্ষণে স্পন্দন ফিরে এসেছে। এখন সে অনুভব করছে তার ভগবান তার কাছেই রয়েছেন। এইখানে, এই গাড়ীর মধ্যে তার ওই ভালবাসার পাত্রীটির কাছেই তার ভগবান আছেন।

সহরের শেষ সীমান্তে যে উঁচু পাহাড়টা, তার চূড়ার ওপর উঠে সে গাড়ী থামিয়ে বলদ দুটোকে একটু বিশ্রাম দিলে। এখান থেকে জ্যোৎস্নার আলোয় ঘুমন্ত সহরটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নদীর ওপারে চেয়ে দেখ্‌লে পাথরের উলঙ্গ বাড়ীটা একধারে একা দাঁড়িয়ে আছে। এক মুহূর্ত্ত চেয়ে দেখে তারা চোখ ফিরিয়ে নিলে। গাড়ী আবার চল্‌তে সুরু হলো। *

দুর্গা দেবী

* পলিন স্মিথ হইতে

যা'-হয়-তাই

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, বি-এ

প্রবেশিকার প্রবেশ-দ্বারে বাধা পাইয়া যাহারা রবীন্দ্রনাথের নজীর দেখাইয়া পরীক্ষার উপর বীতরাগ হয়, অমিয় ঠিক সেই ধরণের নয়। বুক ফুলাইয়া সে ন্যায় ও অন্যায় দুই করিতে পারে, ন্যায় কি অন্যায় ইহা লইয়া বিচারের ধার সে বড় ধারে না এবং তাহার এই বিচার-বৈরাগ্য শক্তির অভাবেই ঘটিয়া থাকে, এমন অপবাদ সে যে নীরবে সহ্য করিবে, এ দুর্ব্বলতাও তাহার নাই। সুতরাং, নির্ব্বিচারে সব কিছুই সে করিতে পারে এবং এরূপ করার তাহার অধিকার আছে, এ বিষয়ে অপরের যত সন্দেহই থাকুক, তাহার বিন্দুমাত্র নাই। তাই সে যখন বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসের বৈচিত্র্যহীনতা উপেক্ষা করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিল, সকলে 'ছি ছি' করিলেও সে দমিল না বরং কথা উঠিলে সকলকে জানাইয়া দিল, সে কি করিতেছে বা করিবে, ইহা লইয়া আলোচনা হয় ইহা সে মোটেই চাহে না—কিন্তু লোকে শুনিল না। সে যতই সাহস এবং যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহার কার্য্যের পোষকতা করে, লোকে ততোধিক তাহার কার্য্যের সমালোচনা করে।

বয়স বেশী নয়, রক্তে রুদ্রের না হোক্, নটরাজের তাণ্ডব সুরু হইতে বাধা নাই ; ফলে, ষোল হইতে বাইশ বৎসর বয়সের যুবকদিগের পক্ষে বাহিরে যতখানি বেপরোয়া হওয়া সম্ভব, অমিয় তদপেক্ষা অধিক বেপরোয়া হইয়া খাইয়া ও ঘুমাইয়া এবং আবশ্যকক্ষেত্রে সোরগোল তুলিয়া একপ্রকার সুখেই দিন কাটাইতেছিল। হঁ্যা, আর একটা কাজ সে নিয়মিত করিত ; নৈতিক বিধান অমান্য করিয়া প্রকাশ করার ফলে যে সকল সদ্‌গ্রন্থের প্রকাশ আইনের সহায়তায় নিষিদ্ধ, সেই সকল দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তথ্য এবং জ্ঞান অর্জ্জনে তাহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত। সখ্যে তাহার বয়সের বিচার ছিল না ; আবাল-বৃদ্ধ সকলের সহিত সে অনায়াসে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া যাইত—এমন কি, পিতামাতার সমক্ষে গূঢ়রহস্য প্রকাশ করিতেও-তাহার বাধিত না।

এমনি অসাধারণ চরিত্রের অমিয় অকস্মাৎ যেদিন সাধারণের পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইল, সেদিন একটা ভয়ানক কিছু যে কেন ঘটিল না, তাহা বেচারা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। এই না বুঝিবার কারণ তাহার বুদ্ধির অভাব কি অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য্য, সে মীমাংসা হয় কি না ইহাই তাহার এক মাত্র চিন্তা ; কিন্তু কোন কিনারা সে করিতে পারে নাই।

ঘটনাটা এই—বয়সে নবীন হইলেও অভিজ্ঞতায় সে না কি অনেক প্রবীণের গুরুস্থানীয়, সুতরাং নারী-হৃদয় জয় সে কেন করিতে পারিবে না ? পারা উচিত, শুধু উচিত বলিলে তাহার মনের অভিপ্রায়ের সঠিক মর্ম্মার্থ প্রকাশ হয় না, পারা তার কর্ত্তব্য, ইহা তাহার পুরুষ হওয়ার অধিকার, এই নির্ভীক উক্তি সে এই সেদিনও করিয়াছে, কিন্তু—

এই কিন্তুটাই খুলিয়া বলা দরকার। অমিয় যেদিন গেজেটে তাহার নাম খুঁজিয়া না পাইয়া বীরবিক্রমে পাঠাভ্যাস ত্যাগ করিল, সেদিন হইতেই তাহার তরুণ প্রাণের গোপন কন্দরে ভালবাসার একটুখানি কেমন করিয়া না কি আশ্রয় লাভ করে। এবং তাহাই ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আজ তাহাকে সাধারণের পর্য্যায়ে টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা যে তাহার পতনের আভাস, একথা সে আজিও স্বীকার করে না ; কারণ, সে যদিও বিবাহ নামক সামাজিক বিধানের সমর্থন করে না, তথাপি বিবাহ-সম্বন্ধে তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং এই মতের পরিবর্ত্তন হওয়ার ফলে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে।

মেয়েদের সম্বন্ধে তাহার ধারণা একপ্রকার। সে কোন-

দিন ইহাদের সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করে না, তবে পুরুষের দৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ দেহমনকে টানিয়া লইবার কেমন একটা শক্তি যে নারীজাতির আছে, এ সত্য বহুদিনের সাধনায় সে আবিষ্কার করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বিশিষ্ট বয়সের নারী-সম্বন্ধে একটা আকর্ষণ সে নিয়ত অনুভব করে। আকর্ষণের প্রাবল্য ক্রমবিবর্দ্ধমান এবং সময় সময় তাহাকে অনর্থক বহু পথ পরিভ্রমণের পরিশ্রম সহিতে বাধ্য করে।

তাহাদের ঠিক পাশের বাড়ীটা এতদিন খালি পড়িয়াছিল। মাসতিনেক সেখানে অনেকগুলি চুম্বকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সকাল সন্ধ্যা অমিয়কে ইহাদিগের দর্শন লালসায় জানালায় বসিয়া থাকিতে হয়। ফলে, সে বাড়ীর মেয়েদের ইচ্ছানুরূপ ছাদে বা বাড়ীর অপর কোন মুক্তস্থানে আগমন প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই তিনমাসের মধ্যে একের পর এক করিয়া প্রায় সব কয়টি চুম্বকের আকর্ষণ সে বিশেষভাবে অনুভব করিয়া এখন প্রায় সকল কয়টার যুক্ত আকর্ষণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মানসিক বিপর্য্যয়ে বিশেষ ক্ষতি কাহারও ছিল না, কিন্তু বিষয়টা যে কোন উপায়েই হোক্ কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আসিয়া তাহাকে অতিশয় অশোভন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

সেদিন অফিস হইতে ফিরিয়া পিতা অপূর্ব্ববাবু কোনসময়ে যে ঘরে আসিয়া পুত্রের প্রতিবেশিনী-প্রীতির তন্ময়তা লক্ষ্য করিতেছিলেন, অমিয় তাহা বুঝিতে পারে নাই। একটা বিড়াল বোধ হয় তখন শিকারের লোভে ঘরের কোথাও বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, হঠাৎ কি মনে করিয়া জানালায় লাফাইয়া পড়িতেই সে ফিরিয়া চাহিল। পিতার মুখশ্রীতে অপত্যস্নেহের ছাপ বোধ করি ছিল না। অমিয় তাঁহার দিকে স্থিরলক্ষ্য হইয়াই অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, অপূর্ব্ববাবু বলিলেন—"ওদিকে নয়—বাইরের দিকে যাও। এ বাড়ীতে তোমার আর যায়গা হবে না।"

অমিয়র তেজস্বিতা মাথা তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পিতার রূঢ় কঠিন মুখের দিকে চোখ পড়িতে উদ্যত তেজ লুপ্ত হইয়া গেল—সে একবার সদর ও একবার অন্দরের দিকে করুণ-দৃষ্টিতে তাকাইয়া পুনরায় অপূর্ব্বের দিকে চোখ ফিরাইতেই তিনি অঙ্গুলী নির্দ্দেশে যে দিক্‌টা দেখাইলেন, সে দিক্‌টা অন্দর নয়, সদর।

অমিয়র মুখে বোধ হয় প্রশ্নসূচক চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু অপূর্ব্ববাবু সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না, বলিলেন—"অমানুষের জায়গা আমার ঘরে নেই। একটী কথাও নয়, একেবারে বাড়ীর বাইরে।"

অমিয় আর অসাধারণ থাকে কি বলিয়া। প্রবল বিদ্রোহে পিতার অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল—কিন্তু পিতা যদি কায়িক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অমিয়র উদ্যত বিদ্রোহের অপমানের শেষ থাকিবে না। পিতা বিশ বৎসর ওকালতি করিলেও ওজনে দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছেন।

ইহার পরের ঘটনা প্রাঞ্জল। মায়ের মধ্যস্থতায় এবং অমিয়র প্রতিজ্ঞার পর তাহাকে পথে দাঁড়াইতে হয় নাই এবং তিন বৎসর স্বাধীন জীবন-যাপনের পর তাহাকে পুনরায় প্রবেশিকা লইয়া ব্যস্ত হইতে হইয়াছে।

পিতার প্রতি বিরূপতাই ইহার কারণ কি না জানি না, অমিয় এবার সুবোধ বালকের মত এবং অতিশয় সুনামের সহিত প্রবেশিকার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কলেজে কায়েম হইল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিনা প্রতি-বন্ধকতায় উকিল হইয়া পিতা অপূর্ব্ববাবুর পৃষ্ঠপোষণে আদালতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একেবারে কাজের লোক হইয়া গেল।

কিন্তু প্রেমের বৈচিত্র্য কৈশোরে হৃদয় অধিকার করিয়া ক্রমশঃ অমিয়ের সর্ব্বস্ব অধিকার করিবে বলিয়া যাহারা ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিল, তাহারা বিস্ময়ে হত-বাক্ হইয়া দেখিল, অমিয় সেই দিক্ হইতে সম্পূর্ণ ফিরিয়া কৌমার্য্য গ্রহণের উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়াছে।

দুই

সমাজের অবস্থার দোষে কৌমার্য্যরক্ষা বঙ্গদেশে পূর্ণ-মাত্রায় কৃচ্ছ্রসাধন। সময়ে অসময়ে বিবাহযোগ্যা কুমারীর

অভিভাবকের আক্রমণে অটল থাকার মত বীরত্ব দুর্লভ। ইহার উপর বন্ধুবান্ধবের ষড়যন্ত্র। অমিয়কে লইয়া একটা আন্দোলন সৃষ্টি হইবার মত হইল। বন্ধুমহলে সেদিন এমনি একটা ষড়যন্ত্রের যুক্তি চলিতেছিল। হিমাংশুর প্রাজাপত্যাধিকারে হাতযশ অবিসংবাদী। বন্ধুর দল তাহাকে অমিয়র একটা ব্যবস্থার উদ্যোগ করিতে বলিতেই সে বলিল—"আজকাল বাজার বড় খারাপ ভাই, ও সব হাঙ্গামায় আমি আর নেই।"

কে একজন আপত্তি তুলিল—"কেন আর ছোকরার পিছনে লাগছ—বিয়ে করার মজা কত সে কথা সবাই বেশ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ—থাক্ না, ও বেশ আছে।"

সমস্বরে তাহাকে প্রতিবাদ করিয়া সকলে বলিল—"তোমার পরোপকার এরপরে অপর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করো মহিম—অমিয়র ওপর অত দরদ নাই বা দেখালে।"

হিমাংশুর ভাণ্ডারের রত্নরাজির একটা বর্ণনা শুনিবার আগ্রহে বন্ধুর দল মহিমের ক্ষীণ আপত্তি বিপুল তর্কে বাতিল করিয়া দিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিয়াছে। অমিয় ধীরে ধীরে আসিয়া একপাশে চুপ করিয়া বসিল।

হিমাংশু জিজ্ঞাসা করিল—"বিয়ে করবি না অমি ?"

অমিয় একবার চারিদিক চাহিয়া কি ভাবিয়া বলিল—"হুঁ !"

হুঁতে মিত্রগণের চলে না; তাহারা উত্তেজিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"হুঁ মানে ?"

অমিয় প্রাচীনকালের কথক-মহাশয়ের মত আসনস্থ হইয়া বলিল—"অত চেঁচিয়ে নয় ভাই, সবই ক্রমশঃ প্রকাশ কর্‌ছি।"

বন্ধুবর্গের ঔৎসুক্য সীমা ছাড়াইবার উপক্রম করিল। মহিম স্বগতোক্তির সুরে বলিল—"রহস্য আছে তা' হ'লে ? খাম্‌কা আমি তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে মরচি।"

অমিয় বলিল—"ভবিষ্যৎ ভাবা সুলক্ষণ, সে নিজেরই হোক্ আর পরেরই হোক্; কিন্তু আমার বক্তব্য তা' নয়। আমার কথা, বিয়েতে আমার আপত্তি নেই—সুবিধা হ'লে প্রতিনিধি একটা ক'রে করতেও হয়। কিন্তু আপত্তি পরবর্ত্তী ব্যবস্থায়।"

হিমাংশু এতক্ষণ দলে যোগ দেয় নাই, এবারে কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পরবর্ত্তী ব্যবস্থায় ?"

—"হ্যাঁ ভাই, একের সম্পত্তি হ'য়ে থাকাতে আমার বিশেষ আপত্তি। মানুষের মন বদ্‌লাবেই। জগতে নারী-জাতির সংখ্যা কত, সে সমস্যা কাগজওয়ালাদের সমাধানের বিষয়; কিন্তু এমন দিন যায় না, যেদিন অন্ততঃ একাধিক সুন্দরীর প্রতি মন আকৃষ্ট না হয়। এই আকর্ষণীর এক-একটাকে কল্পনায় নিজস্বে পরিণত করা এবং দু'-একটাকে সুবিধা হ'লে বাস্তবে আন্‌বার চেষ্টায় যে কত মাধুরী, সে তোমরা পরাধীনেরা বুঝবে না।"

মহিম হিসাবী লোক; সজ্জন বলিয়া একটা নামও তাহার আছে। অমিয়র বক্তৃতা তাহার ভাল লাগিবার কথা নয়, লাগিলও না। সে বলিল—"তা' হ'লে তুমি যা' ছিলে তাই আছ দেখ্‌ছি। একটুও বদ্‌লাও নি।"

—"বদ্‌লাই নি! বল কি মহিম! তখন ছিলাম পনের এখন পঁচিশ। তখন ছিলাম প্রবেশিকা ফেল, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র। তখন প্রকাশ্যে যে কাজ করেছি, এখন তা' গোপনে করি, এতেও বদ্‌লাই নি ? মহিম তোমার চোখ নেই।"

বন্ধুর দল এই দার্শনিক-তত্ত্বে আমোদ পাইল না। কে একজন অধীর হইয়া বলিল—"তোমার মতবাদ পরে শুন্‌ব অমিয়, এখন বিয়ে কবে কর্‌ছ বল ?"

—"দিন স্থির হ'লে লাল চিঠি একখানা আশা করতে পার। তারপর হিমাংশু তোমার প্রস্তাবটা কি শুনি ?"

—"প্রস্তাব বিবাহযোগ্যা একাধিক পাত্রীর সন্ধান আছে, আর তোমার বয়স, বিদ্যা ও অবস্থায় তুমি অরক্ষণীয় পাত্র; সুতরাং, তোমার এবং সেই পাত্রীগণের মধ্যে নির্ব্বাচিত একটীর বৈধ মিলন হউক।"

সকলে সমস্বরে এই প্রস্তাব সমর্থন করিল।

মহিম বাধা দিয়া বলিল—"আগে বিবেচনা···।"

তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া অমিয় বলিল—"ভোটের জোরে ভগবান ভূত হয় এ কথা মানি, কিন্তু

ভোটের জোরে মানুষের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয় না বন্ধু।"

মহিম বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"তা' হ'লে তুমি···"

—"বিয়ে করব।"

মহিম—"তোমার যে রকম ধারণা, তা'তে ওটা না করাই আমার মতে—"

হিমাংশু—"বেশ মহিম, তোমার মত অমূল্য এবং অন্যান্য মহার্ঘবস্তুর মতই দুশ্চর; সুতরাং, অমিয় এই মতকে পরম শ্রদ্ধা করে—কিন্তু তোমার মতে কাজ সে করতে পারে না।"

অমিয় হাসিয়া বলিল—"বুঝলে মহিম, তোমার মনোমত কাজ আমি করতে পারি না। এইবার হিমাংশু তোমার অক্ষয় ভাণ্ডারের একটা ফিরিস্তি শুনিয়ে দাও। বন্ধুরা সব অনেকক্ষণ থেকে তোমার বর্ণনা শুনে একটু চঞ্চল হবার আশা রাখে।"

হিমাংশু একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—"তোমার অবশ্য শুনে বিশেষ লাভ হবে না—কেন না, তোমার আকর্ষণের পথ শ্রবণ নয়। তুমি যদি রাজী থাক, তা' হ'লে নয়ন সফল করবার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব হবে না।"

—"রাজী আমি চিরদিন আছি বন্ধু—তবে গুণাগুণ না বুঝে সম্মতি দেওয়ার পক্ষপাতী হই কি করে?"

হিমাংশু উঠিয়া বলিল—"তা' হ'লে এখনি চল, তোমার গুণাগুণের পরিচয়টা সেরে আসা যাক্।"

অমিয় বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িয়া বলিল—"এখন নয়, তোমার অসুবিধা না হ'লে ও-বেলায় যাওয়া যাবে।"

মহিম মাথা নাড়িয়া বলিল—"না, তোমার মতলব খারাপ অমিয়।"

হিমাংশু যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—"তা' হ'লে ও-বেলায় যেন তোমার আর অমত না হয়।"

অমিয় মহিমের কাছে আসিয়া বলিল—"দেখ মহিম, আমার মতটা তুমি সবচেয়ে ভাল বোঝ, তাই তোমায় বলি।" আর সকলের দিকে ফিরিয়া বলিল—"মহিম তোমাদের চেয়ে বড় সমজদার, তোমরা ভাই রাগ কোরো না।"

—"শোন মহিম, ছেলেবেলায় একবার একটী মেয়েকে দেখে লোভ লেগেছিল বিয়ে করতে, তাকে আজও ভুলতে পারি নি। তাকে দেখার পর থেকে অনেক কাব্য অনেক কল্পনা মাথায় খেলে গেছে, কিন্তু খুঁজে তাকে পাই নি কোথাও, তবে আশা আজও ছাড়ি নি ভাই।"

কে একজন বলিল—"তোমার আশায় সে এখনও তপস্যা কর্‌ছে, এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে?"

—"কেউ বলে নি, আমি তা' মনেও করি না—তবে তাকে পাবার আশা ছাড়তে পারি না।"

—"যদি সে অপরের—"

—"হ্যাঁ, যদি কেন, বাঙালীর মেয়ে সে যে এখনও আইবুড়ো থাক্‌বে না তা' জানি। তবু—"

মহিম চটিয়া বলিল—"এ কথা ভাবাও পাপ তা' জান?"

—"তা' জানি না, তবে সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা হয়, তা' বুঝি। কিন্তু বন্ধু—"

"তোমার ওই অভদ্র 'কিন্তু'র পরের কথা শোন্‌বার প্রবৃত্তি এবং সময় আমার নেই।" বলিয়া রাগিয়া মহিম সে স্থান ত্যাগ করিল। তাহার প্রস্থানের পর সভা আর তেমন জমিল না, সকলেই একে একে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

অমিয় তাহাদিগকে বসাইয়া বলিল—"আমার মতলব শোন ভাই। বিয়ে আমায় করতে হবে; কিন্তু একনিষ্ঠা, অর্থাৎ, আমি সর্ব্ববিষয়ে একমাত্র পত্নীর অধিকারে, এ অবস্থাটা আমার সহ্য হবে না। কোন মেয়ে আমার এই মত জেনে যদি আমার সঙ্গে তার অদৃষ্টের পরীক্ষায় রাজী হয়, তবে আমিও রাজী।"

—'হিমাংশুকে তা' হ'লে মিথ্যা আশা দিলে কেন?"

—"মিথ্যে কেন হবে, আমি যাব।"

—"অথচ তাকে বিয়ে করবে না।"

—"তাকে মানে হিমাংশুকে বিয়ে করবার ইচ্ছে আমার কোনদিন নেই ভাই।"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

অমর বলিল—"হিমাংশুকে নয়, হিমাংশুর প্রস্তাবিত মেয়েকে।"

—"আচ্ছা অমর, তোমার বিয়ে উপলক্ষ্য ক'রে পাত্রী দেখার ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে অনেক যায়গায় গিয়েছি, কিন্তু সেই সব ক'টীকে তুমি বিয়ে কর নি নিশ্চয় ?"

অমিয়র বিবাহ লইয়া পূর্ব্বে ও পরে একটা প্রচুর আমোদের আশা বন্ধুগণের মনে ছিল, কিন্তু অমিয়র আলোচনা শুনিয়া ব্যাপারটা তেমন জমিল না।

অমর ত রাগ করিয়া উঠিয়াই পড়িল।

অমিয় হাসিয়া বলিল—"মেয়ে দেখাটা এদেশে যাচাই করা বই ত নয়। মেয়ের বাপ সে কথা জানে ভাই, তা'তে তাঁদের অসম্মান হয় না। তা' ছাড়া, হিমাংশুকে কথা দিয়েছি। দাঁড়াও ভাই, আমরাও উঠব।"

সকলে উঠিয়া পড়িল। বন্ধুমহল একটা বিশিষ্ট অবস্থার কল্পনা করিয়া অমিয়র বিবাহ-বিষয় স্থির লক্ষ্য হইয়া রহিল।

তিন

অমিয় বিবাহ করিল। বিবাহের পূর্ব্বে ভাবীবধূর সহিত তাহার মতামতের আলোচনার সুযোগ হইয়াছিল কিনা সে সংবাদ জানা নাই, তবে বধূ হইবার পর তাহার সহিত অমিয়র আলোচনা হইয়াছিল এবং তাহার পরিণাম দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া উঠিল। অকৃতী সন্তানের প্রতি পিতামাতার অন্তঃকরণ যাহাই হউক, কৃতী সন্তানের প্রতি অনুরূপ আচরণ এ যুগে সম্ভব নয়। ফলে, যে পুত্র ও বধূর আচরণ অমিয়র জনক-জননীর ভাল লাগে নাই, তাহাকে বাচনিক বা ব্যবহারিক শিক্ষা দ্বারা অসন্তোষ বুঝাইবার চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই।

ফুলশয্যার রাত্রির স্বামী-সম্ভাষণের মাধুর্য্য না কি নারী-মাত্রেরই সারাজীবনের সম্বল। পরিত্যক্তা পত্নীও দুঃখের দিনে সেই স্মৃতি মনে করিয়া সান্ত্বনা পায়, কিন্তু আমাদের নব-দম্পতীর প্রথম মিলনে যে বস্তু উভয়ের মধ্যে স্থান পাইল, তাহা তটিনীর হয় ত চিরদিন মনে থাকিবে, তবে সে স্মৃতি মধুর কি আর কিছু, সে কথার বিচার আজিও হয় নাই।

অমিয় বিনা ভূমিকায় তটিনীকে কহিল—"তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অনুষ্ঠান হিসেবে যা' হয়েছে, তা' মান্‌তে আমার আপত্তি নেই ; তবে আমার জীবন-যৌবন একমাত্র তোমার অধিকারে এই কথা যদি ভাব, তা' হ'লে তোমার ভুল হবে।"

নববধূ শিক্ষিতা এবং আধুনিকা। প্রথম স্বামী-সম্ভাষণের মামুলী শিহরণ বেপথু তাহার নাই। অমিয়র কাছ হইতে দূরে সরিয়া একটু সামান্য হাসিয়া সে বলিল—"আমিও ঠিক ওই কথাই তোমাকে বলব ভাবছি। ওটা আমাদের দু'জনেরই বিশেষত্ব।"

উত্তরটা ঠিক এমনি হইবে, অমিয় এ আশা করে নাই। বিস্মিত ঠিক নয়, তবে অমিয়র চোখ দুইটা একটু বড় হইল। সে বলিল—"খুসী হ'লাম তটিনী, কোন বাঙালীর মেয়ের মুখে ঠিক ফুলশয্যার রাত্রিতে এ ধরণের কথা শোনবার আশা করি নি।"

"বাঙালীর মেয়েরা যদি অবাঙালী পুরুষের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেতো, তা' হ'লে আশা করা সম্ভব হ'ত, কি বল ?"

অমিয় রীতিমত বিস্মিত হইল। কাটা জবাব শুনিয়া রাগও বড় কম হইল না। বলিল—অবাঙালীর গুণাগুণের অভিজ্ঞতা নিয়েই আসবার সুবিধা হয় নি বলে' আক্ষেপ রেখ না। হয় ত চিরজীবন আফ্‌শোষ থেকে যেতে পারে।"

তটিনী একটু হাসিয়া অমিয়র মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া বলিল—"তোমার কথাগুলো এলোমেলো হলেও উত্তর দিতে বাধ্য হলাম। তুমি যে কালে আনুষ্ঠানিক প্রভু, আদেশ কর, না হয়, চেষ্টা ক'রে দেখব।"

দুঃসহ ক্রোধ অতিকষ্টে দমন করিয়া অমিয় জিজ্ঞাসা করিল—"লোভ হয় তা'হ'লে ?"

—"রিপুজয় কি এত সহজ মনে কর না কি ?"

"প্রশ্ন চাই নি তটিনী, চেয়েছি জবাব। সোজা উত্তর দাও।"

তটিনী গম্ভীর হইয়া বলিল—"সোজা উত্তরই দেব, কিন্তু সহ্য হবে না তোমার। কি বলব, বাঙালীর ছেলেদের মধ্যে দু'-একজন ছাড়া মেয়েদের চোখে পড়ে না; সুতরাং, তারা লাভের পাত্র নয়, শুধু অনুষ্ঠান বজায় রাখার বেশী তাদের সঙ্গে আর সম্বন্ধ রাখা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

অমিয় হঠাৎ স্বর নরম করিয়া বলিল—"আজ এই অবধি থাক; ঘর করাটা কিছুদিন যখন আবশ্যকের মধ্যে, তখন মাঝে মাঝে এই রকম আলোচনা পরেও চলতে পারবে।"

তটিনী খোঁচা দিয়া বলিল—"এই জন্যেই দুর্ব্বল পুরুষ-গুলোর সঙ্গে আমার বনে না। তবে তুমি যখন বলছ, অনুষ্ঠান বজায় আমাকে রাখ্‌তেই হবে।"

শয্যার দুই প্রান্তে দুই জনে শুইয়া পড়িয়া বোধ করি নিদ্রার আয়োজন করিল, কিন্তু উষ্ণ মস্তিষ্কের দাপটে নিদ্রা দূরে সরিয়া গিয়াছে। তটিনী সেই অবস্থায় থাকিয়াই প্রশ্ন করিল—"ঘুমিয়েছ?"

—"না।"

"কালই আমি একবার বাড়ী যাব ভাবছি।"

অমিয়র আপত্তি ছিল, কিন্তু দুর্ব্বলতা প্রকাশের ভয়ে আপত্তির ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল—"আমি বাধা দেব এই আশা কর না কি?"

—"তোমার কাছ থেকে আমি আশা বা আকাঙ্ক্ষা কোনটাই করি না। মনে হ'ল, তোমায় জানান দরকার, তাই কথাটা বল্‌লাম।"

—"না হ'লে সোজা গাড়ী ক'রে চলে যেতে?"

—"পারি না মনে কর না কি?"

অমিয় উঠিয়া বসিল। রাগ তাহার প্রথম হইতেই হইয়াছিল, আজিকার দিনে তাহা প্রকাশ করিয়া নাটক রচনা করার লজ্জায় এতকাল তাহা দমন করিয়াছিল, এই-বার তটিনীর কথা শুনিয়া নিজের অজ্ঞাতেই সে বলিয়া বসিল—"তুমি যে মেয়েছেলে, একথা আমি ভুলে যাব কি না তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি। স্বাধীনতা তোমার কিছুরই নেই তা' জান?"

তটিনী ভাল হইয়া শুইয়া বলিল—"এখন শুয়ে থাক, স্বাধীনতা আমার আছে কি না সে বিচার আমার, তোমার নয়।"

অমিয়র স্বামীত্বের সংস্কার রুকিয়া উঠিল; সে শয্যা ত্যাগ করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল—"যাওয়া তোমার কোথাও হবে না, আর আমার মতামতের অপেক্ষা না রেখে যদি এ বাড়ীর বাইরে যাও, তা' হ'লে মনে রেখ, বাঙালীর ছেলের সনাতন স্বামীত্ব এখনও দেশ ছাড়া হয় নি।"

তটিনী এই বিভীষিকায় ভয় পাইয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু পিতৃগৃহ গমন তাহার আটকায় নাই।

তটিনীর প্রতি যে কারণেই হউক, সংসারের কর্ত্তা ও গৃহিণীর প্রথম হইতেই কোন আকর্ষণ ছিল না। ইহার পরে সে নির্ভয়ে একবার মাত্র "আমি আজ বাড়ী যাচ্ছি" বলিয়া চলিয়া যাওয়াতে তাঁহারা বধূ-সম্বন্ধে একেবারে নীরব হইয়া গেলেন। অমিয় নিষ্ফল আক্রোশে কিছুকাল অন্তরে দগ্ধ হইয়া নিষ্ঠুর কিছু একটা করিবার কল্পনায় সুস্থ বোধ করিল।

ব্যাপারটার নূতনত্ব দূর হইতে বেশী দিন লাগিল না। তটিনীর দিক্ হইতে তাহাকে মনে করিবার মত কিছু সে রাখিয়া যায় নাই; সুতরাং, অমিয় পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে কি না ইহা লইয়া একটা অশোভন আলোচনার সূত্রপাত হইল।

কথাটা গোপন রহিল না, তটিনীর কাণে পৌঁছিল। এবং মাস দুই পরে কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া একদিন সে স্বামীগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অমিয় বাড়ী ছিল না। অমিয়র জননীর মৌনভঙ্গ হইল এবং অমিয়র ফিরিয়া আসার পূর্ব্বেই যাহাতে তটিনী চিরতরে দূর হইয়া যায় ভাষার চাতুর্য্যে তাহার চেষ্টায় তিনি প্রায় ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু বধূ নড়িবার নামও করে না। শাশুড়ীর তিরস্কারের জবাবে এইটুকু মাত্র জানাইয়া দিল, তাহার ঘরে সে আসিয়াছে, ইহা লইয়া চীৎকার করা বৃথা। অনর্থক কতগুলা কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া লাভ কিছু হইবে না—তাহার এ গৃহ ত্যাগের সঙ্কল্প বর্ত্তমানে নাই।

সুদীর্ঘ বৎসর হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যবহারজীবীর সহধর্ম্মিণীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অমিয়র জননী যে সাংসারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বধূর স্বাধিকার

প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পের দৃঢ়তার সংঘর্ষে আসিয়া তাহা কোন কাজেই আসিল না, কিন্তু বধূর এই দুঃসহ ঔদ্ধত্যের প্রতীকার না করিলেও তাঁহার মর্য্যাদা যে লোপ হইয়া যায়। অপূর্ব্ববাবু শুনিয়া এবং দেখিয়া 'গুম্' হইয়া গেলেন। তটিনী বিনাবাধায় স্বপদে প্রতিষ্ঠালাভ করিল।

মায়ের মন শান্ত হইল না, না হইলেও বধূর সহিত পুত্রের মনের মিল নাই, একথা তাঁহার জানা ছিল; সুতরাং, অমিয় ইহার একটা সঙ্গত ব্যবস্থা করিবে কল্পনা করিয়া তিনি অমিয়র প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় মুহূর্ত্ত গণনা করিতে লাগিলেন।

চার

অমিয় আসিল। তটিনীর সহিত সাক্ষাতে না কি তাহার ইচ্ছামাত্র ছিল না; কিন্তু তাহার নিজেরই ঘরে যে-কালে তাহাকে প্রবেশ করিতে হইবে, তখন একান্ত অনভিমতেও তটিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

প্রেমের আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের প্রতি কার্য্যতঃ কাহারও লক্ষ্য আছে কি না সে আলোচনা, আলোচনা-ক্ষেত্রের জন্য স্থগিত রাখিয়া এই কথা বলা চলে, অমিয় সূক্ষ্ম-তত্ত্বের ধার ধারে না; সুতরাং, দিন দু'য়ের পরিচয়ে যে তটিনীর প্রতি সে স্বর্গীয় প্রেম অনুভব করিবে, এ আশা দুরাশা। অথচ, মাস দু'য়ের ব্যবধানে তটিনী এমনটী হইয়া আসিয়াছে যে, তাহার দিকে তাকাইলে মনটা দুলিয়া না উঠিয়া পারে না। অমিয় কি করিবে, নিরুপায় ক্রুদ্ধ স্বামীত্ব লইয়া সে শুধু পত্নীর মুখের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল।

মুখশ্রীতে বিরাট গাম্ভীর্য্য আনিয়া তটিনী প্রশ্ন করিল—"দিন স্থির হ'ল কবে?"

অমিয় প্রশ্নটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া বলিল—"এখনও হয় নি বোধ হয়।"

—"তা' হ'লে আর হবে না।"

অমিয় ফাঁক পাইয়া এবার জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু দিন-তারিখ কিসের বুঝলাম না ত?"

—"কেন বালীগঞ্জে তোমার…"

অমিয় বাধা দিয়া বলিল—"তোমার সে আলোচনার কোন অধিকার নেই।"

তটিনী দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"আছে! আর সেই থাকা যে কতখানি, সেইটাই তোমাকে শেখাবার ইচ্ছে আছে!"

অমিয়—"তা' থাক্। তুমি স্কুল খোল আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমি আবার বিয়ে করব কি না সে আমার বিবেচ্য। তবে তুমি যদি মনে ক'রে থাক যে, তোমার ফিরে আসায় তার প্রতিবিধান হবে, তা' হ'লে তোমাকে আশাভঙ্গের দুঃখ পেতে হবে, ব'লে রাখ্‌লাম।"

তটিনী হাসিয়া বলিল—"আশাভঙ্গে আমাদের দেশের মেয়েদের দুঃখ হয় না—তা' হ'লে তোমার 'আনুষ্ঠানিক' হওয়ার দুঃখে অনেককাল আগেই ভেঙে পড়তাম। কিন্তু কথা তা' নয়।"

—"তবে কি?"

—"যেখানে অনুষ্ঠানের দাবী আমার আছে, সেখানে আমি তার একবিন্দুও ছাড়ব না।"

—"তাই দখল করতে এসেছ?"

—"সত্যিই তাই এসেছি।"

—"তা' না হ'লে আসতে না?"

—"তখন আসা-না-আসার কোন প্রশ্ন নেই। আমার নিজের এবং পাঁচজনের বিচারে যেটা আমার লৌকিক অধিকার ব'লে স্থির হয়েছে, সেখানে আমার প্রতিষ্ঠা স্থান-কালের অপেক্ষা রাখে না।"

অমিয় কোন জবাব করিল না। মুখে তাহার চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। তটিনী নিপুণতার সহিত লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তোমায় একটু ভাবিয়ে তুলেছি, না?"

—"একটু কেন, অনেকখানি ভাবনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়ালে।"

—"আমি চ'লে যাওয়ার পর বেশ নির্ভাবনায় ছিলে?"

—"নির্ভাবনা নয়, তবে সে ভাবনায় একটা মাধুর্য্য ছিল।"

—"আর আমার আসায় সে মাধুর্য্য দূর হ'য়ে গেছে?"

মাধুর্য্যের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে তটিনীকে দেখিয়া

অমিয় সে কথা স্বীকার করিতে পারে না; কেন না, এত তর্ক-বিতর্কের পরেও তটিনীর নৈকট্য বেশ লোভের বিষয় বলিয়াই মনে হইতেছিল।

সে বলিল—"না, স্থায়ীত্বের আশা যার নেই, তাকে আছে ব'লে মানাও যেমন চলে না, তেমনি লোভের বস্তুতে মাধুর্য্য নেই, একথাও স্বীকার করা সম্ভব নয়।"

—"লোভ, অর্থাৎ আমার..."

—"হ্যাঁ, তোমার এবং তোমার স্বজাতীয়া আরও অনেকের মধ্যে পুরুষের লোভ জাগাবার সম্পদের অভাব নেই—কিন্তু সে কথা এখন থাক্। আমার নাটক-উপন্যাসের উপাদান যোগাবার উৎস অজস্র, অভাব আছে সংসার চালাবার মত উপাদানের। সেই উপাদান-সংগ্রহ আমাকে করতে হবে।"

তটিনী মৃদুকণ্ঠে বলিল—"তোমার এই উপাদন-সংগ্রহে 'আনুষ্ঠানিক' সাহায্য করবার আগ্রহ আমার অতিশয় প্রবল। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার ছেলেবেলাকার সেই বালিকা-বন্ধুর সঙ্গে একদিন আলাপ হ'ল?"

অমিয় চমকিয়া উঠিল! এ রহস্য তটিনীর কাছে সে প্রকাশ করে নাই—কিন্তু তটিনী জানিল কি করিয়া? অমিয়র মুখে উদ্বেগ ও বিস্ময় প্রকাশ পাইল। সে অন্য-দিকে চাহিয়া বোধ হয় ইহাই চিন্তা করিতেছিল। হিমাংশু আসিয়া প্রবেশ করিল।

অমিয়র বিস্ময় ও সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছে। হিমাংশুকে দেখিয়া সে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিল—"এস, নিয়তির বাহন, তোমার লীলার প্রকট অবস্থা প্রত্যক্ষ কর।"

হিমাংশু হাসিয়া বলিল—"তোমার দ্বিতীয় সংস্করণ কত দূর?"

তটিনী—"সে কথা এখন আর ওঁকে জিজ্ঞাসা না ক'রে আমাকে জিজ্ঞাসা কর হিমাংশু-দা'।"

—"কেন তুই কি অমিয়র প্রাইভেট সেক্রেটারী না কি?"

—"অত কমে উনি রাজী নন্; সর্ব্বগ্রাসের উচ্চাভিলাষ আছে। কিন্তু তুমি স্বয়ং বিশ্বস্ততার উপযুক্ত নও, তোমার নামে নালিশ আছে। তবে সে কথা এখানে চলে না—তুমি এস লাইব্রেরী-ঘরে।"

অমিয় বাহির হইয়া যাইতেই হিমাংশুর কাছে আসিয়া তটিনী বলিল—"এ যুদ্ধ আর আমার ভাল লাগে না হিমাংশু-দা'। আমি যে সকলেরই কাছে চক্ষুশূল হ'য়ে গেলাম।"

—"আর বেশীদিন নয় বোন্; আর দু'দিন পরে এই শূলই অঞ্জন হ'য়ে দাঁড়াবে। এখন ও ঘরে যাই, তুই চা নিয়ে আয়।"

পাঁচ

বছরখানেক কি জানি কোনখান্ দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। অমিয়র বালীগঞ্জের অনুরাগ আর প্রকাশ পায় না। বন্ধুমহলে বিষয়টা লইয়া একটা উত্তাপের লক্ষণ দেখা যাইত এবং উষ্ণতা প্রবল হইয়া উঠিলে চা পানে শীতল হইত। এখন আলোচনার উত্তাপ কমিয়াছে, চা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। অমিয়কে বড়-একটা পাওয়া যায় না। বন্ধুর দল বিশ্বের সকল বিষয় লইয়া চীৎকার করিয়া নির্দ্দিষ্ট এককাপ মাত্র চা গলাধঃকরণ করিয়াই বিদায় লইতে বাধ্য হয়।

তটিনীর অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, হিমাংশুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। অমিয়র মায়ের এখন আর বধূকে না হইলে একদণ্ড চলে না। তিনি যে প্রাচীনা হইয়াছেন এবং এখন সংসারের তাড়না সহ্য করার শক্তি তাহার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, এই সত্য সদ্য আবিষ্কার করিয়া 'হাঁফ' ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন।

অপূর্ব্ববাবুর বয়োবৃদ্ধির ও অর্থাগমের প্রাচুর্য্যবশতঃ অন্য কোনদিকে মন নাই। চিরদিন সংসারের 'ঝক্কি' সাম-লাইবার বাসনা তাঁহার আর নাই; সে ভার অমিয়কে প্রদান করিতে না পারিয়া বধূর স্কন্ধে চাপাইয়া তিনি মক্কেল আর নথির মধ্যে ডুবিয়াছেন।

হিমাংশু আসিলে অমিয়র সহিত তুমুল কোলাহলের পর বিশেষ বিশেষ ভোজ্যদ্রব্যে জলযোগ সারিয়া তৃপ্ত হইয়া প্রস্থান করে। তাহার মতে ঘটকালীতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী

নাই। অমিয়র এবং তটিনীর যোগাযোগ ঘটাইয়া সে এই বিষয়ে একেবারে 'ওস্তাদ' হইয়া গিয়াছে।

সেদিন অকস্মাৎ অমিয় ঘরে আসিয়াই ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তটিনী বাধা দিয়া বলিল—"ফিরে যেতে হবে না। ও চারুদি'; তোমার একান্তই আপনার।"

অমিয় ফিরিল এবং পাঁচ-ছয়টী পুত্র ও কন্যা পরিবেষ্টিতা বাল্যসখীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। বলিল—"আর কয়টী কি বাড়ীতে রেখে এসেছিস্ চারু ?"

চারু হাসিয়া উত্তর করিল—"না, এই ক'টীই সব, তবে এখন অবধি। কিন্তু তুমি বৌদি'কে কি সব বলেছ ?"

—"আমি বলি নি ভাই, ও সব ওদের ভাই-বোনের কাজ; আমাকে জব্দ করবার কৌশলমাত্র।"

—"বৌদি' কি ক'রে জানবে, তুমি কোনসময়, গল্প করেছ নিশ্চয়।"

—"গল্প যে কোনদিন করি নি, তা' বলছি না, তবে ওর কাছে নয়, আর ওরকমেও নয়।"

তটিনী খোঁচা দিয়া বলিল—"জান চারুদি', আমার কাছে গল্প করবার ওঁর সময় কোথায়—আমার সঙ্গে ঝগড়াটা বেশ জমে।"

চারুর এসব ঝঞ্ঝাট নাই। শিশু কয়টী এবং তাহাদের নিতান্ত গো-বেচারী পিতাটীকে এই সংসারের নানা অসুবিধার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া, খাইয়া ঘুমাইয়া এবং সময় পাইলে একটু সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া একরকম নির্ব্বিবাদে চলিয়া যাইতেছে।

সে বলিল—"কি জানি ভাই, এখন বিয়ে হলেই দেখি কথা কাটাকাটি, আমরা ভাই ও পারি না।"

—"নীরদবাবু ও ঝগড়া করেন না, কেন না, ওটা তাঁর আসে না। তা' হ'লে তোরা আছিস ভাল।"

চারু কাহাকেও উদ্দেশ না করিয়া যেন আপন-মনেই বলিয়া গেল—"কিসের ঝগড়া যে মানুষ করে, তা' বুঝি না। যে সম্বন্ধটা একটু চেষ্টাতেই সব চেয়ে মধুর হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, তার মধ্যে কেন যে তোমরা যুদ্ধ বাধিয়ে দাও, তা' তোমরাই জান।"

—"নীরদবাবুকে একলা কি সংসার আগ্‌লাতে রেখে এসেছিস্ ?"

চারু মুচকি হাসিয়া বলিল—"ও কাজটা কোনদিন তাঁকে দিয়ে হলো না দাদা। যেখানেই যাই, সঙ্গে তাঁর আস্‌তেই হবে; তা' ছাড়া, ও লোককে একলা কোথাও ফেলে আস্‌তে পারি না।"

অমিয় শুইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া বলিল—"কোথায় সেই দলছাড়া লোকটী বল ত একবার" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

তটিনী কি যেন ভাবিতেছিল, এবার চেতনালাভ করিয়া বলিল—"তোমার কথা বিশ্বাস হয় না চারুদি'। তা' ছাড়া, ছেলেবেলায় যার সঙ্গে…"

চারু তটিনীর মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—"হ্যাঁ, ছেলেবেলা, ছেলেবেলার চাইতে বেশী নয়। তখনকার বন্ধুত্ব চির-অক্ষয় হ'লেও তার মধ্যে ভুল নেই; তা'তে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনদিন দুশ্চিন্তার উদয় হয় না। এ কথাটা আমার বিশ্বাস করো ভাই, সংসারে সুখী হ'তে পারবে।"

তটিনী কথাটা ঠিক বিশ্বাস করিল বলিয়া মনে হইল না; বলিল—"তোমার কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারলে হয় ত সংসারের চেহারা বদ্‌লে যেত; কিন্তু তা' হয় না। তা' ছাড়া, এখনকার ছেলেমেয়েদের মনে সহজে বিশ্বাসের স্থান হওয়া শক্ত। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটা—"

চারু বাধা দিয়া বলিল—"একটা গোয়েন্দাগিরির ভাব না থাক্‌লে ফাঁকা কথার জাল বুনে প্রকাণ্ড কিছুর কল্পনায় দুঃখ পাবার সুবিধা হয় না—কি বল ? কিন্তু কি দরকার বল ত স্বামীর দু'-একটা দুর্ব্বলতার কথা জেনে—তা' নিয়ে হৈ-হৈ ক'রে বেড়াবার।"

তটিনী জবাব দিল না; কিন্তু কথাটা যে তাহার মনঃপূত হয় নাই, মুখ দেখিয়া চারুর তাহা বুঝিতে দেরী হইল না। সে বলিল—"পড়াশুনো ক'রে শুধু অহঙ্কারটাই বড় ক'রে

তুলেছ বৌদি', শিক্ষার আসল দিক্‌টার সন্ধান পাও নি। তোমায় উপদেশ পরামর্শ দেবার বিদ্যে আমার নেই; শুধু এইটুকু বল্‌তে পারি, জেনে দুঃখ পাওয়ার চেয়ে না জেনে সুখী হওয়া অনেক ভাল।"

তটিনী এবার হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল। চারু প্রথমে বুঝিল না, পরে তটিনীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল—"আমায় বাঁচালে ভাই। যে সব কথা শুনিয়েছ, তার একবিন্দুও যদি তুমি বিশ্বাস করেছ ব'লে বুঝ্‌তাম, তা' হ'লে আমার আজীবন একটা দুঃখ থেকে যেত।"

তটিনী সংযত হইয়া উঠিয়া বলিল—"থাক্ ও সব কথা। এখন চল, বামুন-ঠাকরুণ বোধ হয় ব'সে আছেন; ছেলেদের নিয়ে আমার সঙ্গে এস।"

চারুর দলকে লইয়া তটিনী বাহির হইবার কিছু পরে নীরদবাবুকে টানিয়া লইয়া অমিয় ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

চারিদিক অনুসন্ধিৎসুদৃষ্টিতে তাকাইয়া নীরদ হতাশার সুরে বলিল—"না, এখানেও ত নেই।"

তারপর হাতযোড় করিয়া অনুনয়ের সুরে বলিল—"দোহাই অমিয়, আমায় লক্ষ্মীছাড়া করো না ভাই, কোথা লুকিয়ে রেখেছ, বল?"

অমিয় নীরদের মুখের চেহারা দেখিয়া হাসিয়া বলিল—"প্রফেসারি না ক'রে যদি থিয়েটারে ঢুক্‌তে নীরদ, তোমার অনেক বেশী উন্নতি হ'ত।"

নীরদ মুখে সহস্রগুণ কারুণ্য আনিয়া বলিল—"থিয়েটার নয় ভাই, একেবারে প্রাণের ভিতরকার কথা। এ বয়সে টালা থেকে লেক্, আর লেক্ থেকে টালা ছুটোছুটি কর্‌তে পার্‌ব না।"

বাহিরে অনেকগুলি পদশব্দ শুনা গেল। নীরদ আশ্বস্ত হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

নবগৃহ-প্রবেশ-উৎসব

গত শনিবার, উনিশ-এ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার বিখ্যাত কাগজ-ব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্সের নবগৃহ-প্রবেশ-উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলাম। কর্ত্তৃপক্ষ আদর-যত্ন-অভ্যর্থনায়, সুমিষ্ট ব্যবহার এবং সুপ্রচুর মিষ্টান্নে নিমন্ত্রিতগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের দেশের এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করি।

সতীন

শ্রীহরিপদ গুহ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্য-ভারতী

টেলিগ্রামে শ্যালকের বিবাহের সংবাদ পাইয়া হঠাৎ ..রাজকে স-স্ত্রীক মথুরাপুরীর উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল। তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী বৎসরাধিককালযাবত দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তারেরা শেষ জবাব দিয়া গিয়াছেন। তাহার শ্বশুর বেশ অবস্থাপন্ন লোক, অকাতরে অর্থ ব্যয় এমন কি কয়েকজনের পরামর্শে তিনি তারকেশ্বর গিয়া হত্যা পর্য্যন্ত দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোন ফলই হয় নাই।

সরোজের শ্বাশুড়ী ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী। তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আর বেশী দিন তিনি বাঁচিবেন না। পাছে তাঁহার মৃত্যুর পর স্বামী আবার বিবাহ করিয়া তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে একেবারে ভাসাইয়া দেন, তাই তিনি পুত্রের বিবাহের জন্য স্বামীকে জোর তাগিদ দিতে লাগিলেন।

স্বামীও পত্নীর শেষ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। স্ত্রীর অন্তিম বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি পাত্রী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং শীঘ্রই একটী বয়স্থা কন্যাকে পছন্দ করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন।

বেশ ধুমধামের সহিতই সরোজের শ্যালকের বিবাহ হইয়া গেল। নববধূকে শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া তাহার গায়ে মাথায় স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শ বুলাইয়া সরোজের শ্বাশুড়ী তাহাকে অনেক উপদেশ দিলেন, শেষে আদর করিয়া নিজের হারছড়া খুলিয়া বধূর গলায় পরাইয়া দিলেন। একটা অপরিসীম তৃপ্তিতে তাঁহার সারা অন্তর ভরিয়া গেল।

ফুলশয্যার রাত্রিতে হঠাৎ সরোজের শ্বাশুড়ীর অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িল। সকলে বলিল—এ' ক'দিনের গোলমাল এবং অনিয়মে রোগ বেড়েছে, সেরে যাবে'খন।

রোগ কিন্তু কমিল না, ক্রমে বাড়িয়াই চলিল। আবার ডাক্তার আসিলেন; রোগিণীকে দেখিয়া তিনি মুখ বাঁকাইলেন। ব্যাপারটা বুঝিতে কাহারো আর বাকী রহিল না। একটা দারুণ দুশ্চিন্তা লইয়া সকলেই প্রহর গণিতে লাগিল।...

পরদিন দুপুরবেলায় রোগিণীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল; বেশ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তিনি চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। মৃদুকণ্ঠে সকলের সহিতই তিনি দুই-একটি কথা কহিলেন। লোকের ভীড় কমিয়া আসিলে তিনি স্বামীকে কাছে ডাকিয়া তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ডাগর ডাগর চোখ দু'টি তুলিয়া ব্যথাভরা-কণ্ঠে বলিলেন—'তুমি আমাকে ক্ষমা করো। ছেলেমেয়েরা সব রইল, ওদের দেখো তুমি। ডাগর দেখে বউ এনেছ, সেই তোমার সংসারের ভার নিতে পারবে। আমার শেষ অনুরোধ রেখো, তুমি কিন্তু আবার বিয়ে করে' আমার

ছেলেমেয়েদের একেবারে ভাসিয়ে দিও না।' তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, তিনি কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সরোজের শ্বশুরের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। তিনি ধরা-গলায় বলিলেন—'ছি, ও কথা বলো না, তুমি ভাল হ'য়ে উঠে তোমার সংসারের ভার নাও।'

তিনি কোন উত্তর দিলেন না, ক্ষীণ একটু হাসিলেন, কী অপূর্ব্ব সে হাসি!...

সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িল। তখনই আবার ডাক্তারকে খবর দেওয়া হইল; কিন্তু তিনি আসিবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যার সময় সব শেষ হইয়া গেল। ক্রন্দনের উচ্চরোলে সমস্ত বাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। বিধাতার কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া শব শ্মশানে লইয়া যাইতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। স্থানটাকে ঠিক্ শ্মশান বলা চলে না। বাড়ী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পুষ্করিণীর তীরে ছোট একটি মাঠে শব দাহ করা হইবে। তখনো সমাজের সকলে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন নাই।

রাত্রি প্রায় একটার সময় শবে আগুন দেওয়া হইল। অগ্নি তাহার লেলিহান জিহ্বা বাহির করিয়া দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

গভীর রাত্রি, চারিদিক খাঁ খাঁ করিতেছে।

সকলে মিলিয়া তখন সরোজের শ্বশুরের পুনরায় বিবাহ সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলেন। বিবাহ তাঁহাকে করিতেই হইবে, নতুবা সংসারটাই একেবারে মাটি হইয়া যাইবে। এই রকম অনেক আলোচনাই হইতেছিল। কে একজন বলিলেন—নাকি কাহার একটি বয়স্থা কন্যা আছে। কথাটা কানে যাইতেই সরোজের শ্বশুর হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, 'কোথায়?' কথাটা এত বিশ্রী শুনাইল যে, সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলেন।

গভীর নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে সহসা একটা চাপা হাসি শোনা গেল। সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু কোথা হইতে যে এই হাসি আসিল, তাহা কেহই ঠিক্ করিতে পারিলেন না। অনেকের ধারণা হইল যে, শব-দাহকারীদের মধ্যেই হয় ত কেহ হাসিয়া থাকিবে।...

স্নান করিয়া যে যাহার গৃহে ফিরিয়া গেলেন। পরদিন সরোজের শ্বশুর একখানি ঘরে 'গুম্' হইয়া বসিয়াছিলেন; কিছুক্ষণ পরে সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—'এ' সব কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কি করে' আমার চল্‌বে? কে এদের সব দেখাশোনা করবে? ভাল ঘর দেখে বিয়ে আমায় করতেই হবে।'

সকলে একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। আজ দুই দিন হয় নাই স্ত্রী মরিয়াছে, ইহার মধ্যে আবার বিবাহের কথা! ছিঃ! কোথায় গেল অতদিনের অত প্রেম-ভালবাসা? ছি, ছি, পুরুষ এমনই হৃদয়হীন বটে!

পরিচিত অপরিচিত অনেকগুলি ঘটককে সরোজের শ্বশুর পাত্রী অনুসন্ধান করিবার ভার দিয়াছিলেন। তাহারা রোজই এক একটি করিয়া সম্বন্ধ লইয়া হাজির হইতে লাগিল। বাঙলা দেশে আর যাহারই অভাব থাকুক না কেন, বিবাহযোগ্যা কন্যার যে অভাব নাই, ইহা অতি সত্য কথা। নহিলে সরোজের শ্বশুরের অত-গুলি পুত্র-কন্যা এবং নাতি-নাতিনী থাকা সত্ত্বেও কন্যার পিতা তাহার সহিত নিজ দুহিতার বিবাহ দিতে রাজী হইবে কেন?...

শ্রাদ্ধের দিন তিনেক পূর্ব্বেই ঘোরাঘুরি করিয়া তিনি একটি বয়স্থা মেয়েকে পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। এবং সেখানেই দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা এক প্রকার পাকাপাকি করিয়া আসিলেন।

তখনো পাকা দেখা হয় নাই।

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ সরোজের শ্বশুরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। অনেকক্ষণ নিদ্রা না আসায় তিনি আপন-মনে একাকী ভাবীপত্নী সম্বন্ধে কত আকাশ-কুসুমের সৃষ্টি করিতেছিলেন, সুখের রঙীন নেশায় তাঁহার প্রাণ-সমুদ্রে বান ডাকিল।

সহসা তীব্রকণ্ঠে কে ডাকিল—'শুনছ?'

এ স্বর যে তাঁহার চির পরিচিত, তিনি শিহরিয়া

উঠিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার তাসের প্রাসাদ ভাঙিয়া গেল। ভয়ত্রস্ত হৃদয়ে তিনি উপাধান হইতে মস্তক তুলিয়া কম্পিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন 'কে, কে ও?'

শিয়রের পাশ হইতে গম্ভীরভাবে উত্তর আসিল—'চিনতে পার্‌ছ না? এরি মধ্যে ভুলে গেলে না কি?'

সরোজের শ্বশুরের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল, বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল। কাতরভাবে তিনি শিয়রের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল—অন্ধকারে তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তির চোখ দুইটা যেন দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তিনি স্ত্রীর এমন ভীষণরূপ দেখেন নাই। তিনি একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

ছায়ামূর্ত্তি কর্কশকণ্ঠে বলিল—'ছি, ছি, তুমি কি! অত করে' বারণ করলুম, তবু শুন্‌লে না? এ' বয়সে আবার বিয়ে কর্‌ছ কেন? কিসের অভাব ছিল তোমার? মনে করো না, আমার ছেলেমেয়েদের ভাসিয়ে দিয়ে, তাদের অসুখী করে' তুমি নিজে সুখী হ'তে পার্‌বে? কখনো না, কিছুতেই তোমাদের সুখী হ'তে দেবো না। দেখে নেব, আমার সোনার সংসারে সে ছুঁড়ি কেমন করে' উড়ে এসে জুড়ে বসে' দখল করে' নেয়? তার সমস্ত গর্ব্ব আমি চূর্ণ কর্‌ব!' সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়ামূর্ত্তির চোখ দুইটা যেন আরও জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; নাক দিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল।

সরোজের শ্বশুর কাতর-কণ্ঠে বলিলেন—'এ' বিয়েতে আমার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না, শুধু তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যই—'

সেই ছায়ামূর্ত্তি বাধা দিয়া তীব্রস্বরে বলিল—'থাক্‌, ন্যাকা সেজে আর মিথ্যে কথা বল্‌তে হবে না? আমি, কিছু বুঝি না? জগতের সব পুরুষ হৃদয়ই কি পাষাণে তৈরী! তোমাকে বল্‌বার আর আমার কিছু নেই!'

তিনি আর কোন উত্তর দিলেন না। পাশবালিসটা শক্ত করিয়া ধরিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলেন। একটু পরে মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তিনি আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পূর্ব্ব-স্ত্রীর স্মৃতি মনে পড়ায় তাঁহার বড় কষ্ট হইল, অশ্রুধারায় বালিশ ভিজিয়া গেল।...

পরদিন সকালে যখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন অনেকখানি বেলা হইয়াছে। গত রজনীর সমস্ত ঘটনাটা তাঁহার নিকট একটা অলীক স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল।

পরের মাসে বিবাহের প্রথম তারিখেই সরোজের শ্বশুর দ্বিতীয়পক্ষের পাণিগ্রহণ করিলেন। কয়েকদিন তাঁহাদের খুব আনন্দেই কাটিল। সেদিন রাত্রে নববধূ স্বামীকে প্রশ্ন করিল—'হ্যাঁ গা, দিদি দেখতে কেমন ছিলেন বল্‌ত?'

হঠাৎ স্ত্রীর এই প্রশ্ন শুনিয়া সরোজের শ্বশুর মহিমবাবু বলিলেন—'কেন বল ত? সে দেখ্‌তে শ্যামবর্ণ, লম্বা ধরণের ছিল।'

নববধূর মুখখানা একেবারে কালিমাখা হইয়া গেল। সে ভয়বিহ্বল-স্বরে বলিল—'দু'দিন রাত্রে আচাতে গিয়ে তোমাদের ঢেঁকি ঘরের পিছনে লাল পাড়ে শাড়ীপরা ঐরকম একজন মেয়েমানুষকে আমি দেখেছি সে আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে' তাকিয়েছিল। উঃ, সে কী চাহনি! আমার পা আর চলে না, চীৎকার করতে চাইলুম, পারলুম না।'

মহিমবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। তবুও স্ত্রীকে একটু সাহস দিবার জন্য বলিলেন—'ও কিছু নয়, তোমার দেখ্‌বার ভুল।

সেইদিন বৈকালে নববধূ পুকুর হইতে গা ধুইয়া বাড়ী আসিয়া হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পিস্‌শাশুড়ী ও বাড়ীর অন্যান্য সকলে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। একটু পরেই সে চোখ মেলিয়া চাহিল। তখন কখন হাসে, কখনও বা ফুলিয়া কাঁদিতে থাকে। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া পাড়ার অনেকেই একে একে তাঁহাদের বাড়ী আসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধারা বলিলেন-'পেত্নীতে পেয়েছে, এখনই ওঝার ব্যবস্থা কর।'

একটু পরেই এক মুসলমান ফকির আসিল। সে দুই-একবার মন্ত্র পড়িয়াই বলিয়া উঠিল—'আমার কর্ম্ম নয়, বড় ভীষণ জিনে ভর করেছে মা ঠাক্‌রুন!' তারপরই সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ওঝাকে পলাইতে দেখিয়া নববধূ খিল্‌খিল্‌ করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সকলে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—'তোমার কি হয়েছে?' বউটী কোন উত্তর দেয় না। শুধু কাঁদিতে থাকে। দুই হাত দিয়া মাথার চুলগুলি সব ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে জোরে জোরে মাটিতে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, মাথার কেশগুচ্ছ এলাইয়া পড়িয়াছে। এই উগ্রচণ্ডা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকে দূরে সরিয়া গেলেন। কেহ বলিলেন—'হয় ত এর ফিটের অসুখ আছে।'

মহিমবাবু তখন বাড়ী ছিলেন না, একটু পরেই তিনি বাড়ী আসিয়া সব শুনিয়া নববধূর কাছে যাইতেই সে তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল—'এখান থেকে যাও বলছি। নইলে ভাল হবে না; ভারি সোহাগ দেখাতে এসেছেন! একে আজ আমি মেরে ফেল্‌লে তুমি কি কর্‌তে পার?

সকলে মহিমবাবুকে টানিয়া সরাইয়া আনিলেন।

পাড়ায় একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধার্ম্মিক এবং গুণী বলিয়া সকলে তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। তিনি আসিতেই বউটি একটু শান্ত হইল।

ঠাকুর বউটীর নিকটে গিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—'ছি, মা, তোমার গায়ে মাথায় কাপড় নেই, তুমি গেরস্থ ঘরের বউ।'

নববধূ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—'আমার আর লজ্জা কি বাবা! আমার কথা কেন শুন্‌লে না ও। কেন আবার বিয়ে কর্‌লে?'

ঠাকুর বলিলেন—'ছি, মা, অমন করো না, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি তোমার দুঃখ। সত্যি, মহিম আবার বিয়ে করে' বড় অন্যায় করেছে। তার বিয়ে করা উচিত হয় নি, বিশেষতঃ, তুমি যখন অত করে নিষেধ করেছ। কিন্তু মা, এই বউটিকে কেন অত কষ্ট দিচ্ছ? ও ত নির্দ্দোষী। ও ত কোন অন্যায় করে নি? ওকে আর শাস্তি দিও না, ওকে ছেড়ে দাও মা।'

বউটি বলিল—'যে কষ্ট দু'দিন বাদে আমার ছেলে-মেয়ে ভোগ কর্‌বে, তার তুলনায় এত কিছুই নয় বাবা!'

মহিমবাবু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—"ওকে ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি, বড় কষ্ট হচ্ছে ওর। তোমার ছেলেমেয়েদের ওপর কোন দুর্ব্যবহার হবে না, কখন তারা কষ্ট পাবে না, সত্যি বল্‌ছি আমি।'

নববধূ খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া বলিল—'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না, তুমি সব পার এখন। সে তুমি আর নেই। নইলে অত অনুরোধ সত্ত্বেও দুটো মাস গেল না, আবার বিয়ে করে' বস্‌লে। ছিঃ ছিঃ!' বউমাকে আমার গলার হার দিয়ে গেলুম, সে হার তুমি কেন খুলে নিয়ে এই রাক্ষুসীকে দিলে? আমার হার কিছুতেই ও পর্‌তে পাবে না। দাও, এক্ষুণি খুলে বউমাকে পরিয়ে দাও।'

সরোজের শ্বশুর তখনই তাহা করিলেন।

বউটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া বলিল—'ঠাকুর, আপনি বল্‌লে আমায় যেতেই হবে। আমি যাব; কিন্তু, যাবার আগে ও আপনার পা ছুঁয়ে বলুক যে, আমার সন্তানদের কখনও দুঃখ-কষ্ট দেবে না, এই রাক্ষুসীর কাছ থেকে দূরে রাখ্‌বে। সঙ্গে সঙ্গে বউটা মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল।

মহিমবাবু ঠাকুরের পা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ছেলেমেয়েদের কখন কষ্ট দিবেন না।

বউটী তখন আবার কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমাকে ছেড়ে এসে, এখানে কি আমার কম কষ্ট হচ্ছে! কিন্তু কি করব? ক্ষমা করো। তুমি সুখী হ'লেই আমার তৃপ্তি।" বলিয়া সে আগাইয়া গিয়া মহিমবাবুর পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

একটু পরেই নববধূর লুপ্তজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। চঞ্চল দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া নতমুখে উঠিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল।...

হরিপদ গুহ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ২১ নং পটুয়াটোলা লেন, ক্লাসিক প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ৮নং রাধামাধব গোস্বামীর লেন হইতে প্রকাশিত।

জেনেট্‌ ম্যাকডোনাল্ড

দীপালীর সৌজন্যে।

ডয়েল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৪১ | চতুর্থ সংখ্যা

সতী-অসতী

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক বলিয়া বাহিরে হয় ত একটু-আধটু খ্যাতি ছিল, কিন্তু গৃহিণীর নিকট ইহাই ছিল অখ্যাতির একটা মুখ্য কারণ।

বাপ-পিতামহের অনুগ্রহে কলিকাতার একখানি বাড়ী এবং ব্যাঙ্কের খাতায় যৎসামান্য কিছুর মালিক হইয়া খোস মেজাজে এবং বহাল তবিয়তে ঘর-সংসার নির্ব্বাহ করিতে-ছিলাম। মোটা ভাত এবং মোটা কাপড় হয় ত ইহার দ্বারা সঙ্কুলান হইতে পারে, কিন্তু শ্রীমতীর সই-এর মত দৈনিক বাইশ টাকার তেল পোড়াইয়া মোটর চালাইবার অবস্থা না থাকাই না কি তাঁহার মর্ম্মান্তিক ক্ষোভের হেতু হইয়াছে এবং সমস্ত কল্পনার পুরোভাগে আমার এই কলাচর্চ্চাই যে কলা দেখাইতেছে, এ কথা পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষে বুঝাইয়া দিতে তিনি কোনোদিনই কৃপণতা করেন নাই।

শাস্ত্রে বলে—নিজের সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করিতে নাই। অশাস্ত্রের বিধানেও ইহা সঙ্গত। কেন না, গৃহিণীর কর্ণকুহরে সে কথা প্রবিষ্ট হইলে সুফল যে লাভ করিব না, তাহা বলাই বাহুল্য।

কিছুদিন হইতে বাজার মন্দা। পাড়ায় বাড়ীর কতকাংশ ভাড়া দিয়াছিলাম। সম্প্রতি ভাড়াটে উঠিয়া গিয়াছে। কয়দিন তলব-তাগাদায় উদ্ব্যস্ত করিয়া গৃহিণী কয়েকখানি কাগজে ঘরভাড়া লিখাইয়া লইয়া বাড়ীর সদর দরজায় এবং কোথা কোথাকার 'গ্যাসপোষ্টে' না কি কাহার সাহায্যে লাগাইয়া দিয়াছিলেন এবং এইমাত্র দুই ঘর ভাড়াটিয়া ঠিক করিয়া আমি যে কতবড় অপদার্থ এবং তিনি যে কতটা সারবান তাহাই বুঝাইয়া দিতে চাহিতেছিলেন।

গল্পের নায়িকা তখন নায়কের কণ্ঠলীন হইয়া প্রেম-বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বর্গ রচনা করিতেছিলেন। অন্তরে বিরক্ত হইলাম, কিন্তু মুখে কিছু বলিবার দুঃসাহস বুদ্ধিমানের মত দমন করিয়া বলিলাম—তাই না কি?

নয় ত কি? তোমার মত! এবার বুঝেসুঝে ভাড়াটে

রেখেছি। দু'টি ঘর বটে, কিন্তু 'ন্যানজারি' নেই। একটার ত ছেলেপুলেই হয় নি! অন্যটির সবে একটা খোকা। তার ওপর ভাড়া দু'খানা ঘরে চোদ্দ টাকা; পনেরই বলেছিলুম, নেহাৎ ধরলে—

তাহার পরের কথা জানিবার কৌতূহল আমার ছিল না, কাজেই তখনকার মত চুপ করিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার দিকে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া দেখি—ভাড়াটিয়া ইহারই ফাঁকে আসিয়া ঘর দখল করিয়াছে।

গৃহিণী বলিলেন—একঘর আজই এসে গেল। বউটি কিন্তু বড় ভাল। চেনা নেই শোনা নেই, একটু ইতস্ততঃ করলে না গা, একেবারে ছোট্ট মেয়ের মত এসে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। বল্লে—আপনার মত আমার একটা বোন্ আছেন। আপনাকে আমি বড় দি' বলে' ডাক্‌ব, কেমন? আচ্ছা, দাদা কি করেন বড় দি'?

—পরিচয় দিতে গিয়ে মাথা কাটা যাচ্ছিল, কিন্তু তাইতেই তার চোখ একবারে বড় হ'য়ে উঠ্‌ল—কবি! দেখ গে না, তোমার ঘরের কি দশা করে' এসেছে।

মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম—এমনই অহেতুক করুণা দেখাইলে বেশীদিন ঘরভাড়া আদায় করিবার প্রয়োজন হইবে না দেখিতেছি।

ঘরে ঢুকিয়াই কিন্তু বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম। বোধ করি দোকান হইতে আসিবার পর আজ প্রথম 'সেক্রেটারিয়েট' টেবিলটার উপরকার আবর্জ্জনা পরিষ্কার হইল। যেখানে যেমনটী রাখিলে মানায়, ঠিক্ তেমনিটী করিয়া সাজান হইয়াছে। কলমের মুখের নিবগুলা বহুদিন হইতেই গোতামুখ ভোঁতা করিয়া অভিমানে ফুলিতেছিল, আজ যেন তাহারা নবজীবন লাভ করিয়া হাসিতেছে। অসমাপ্ত গল্পটা এখানে ওখানে ছড়ান পড়িয়াছিল, তাহাকে সাজাইয়া-গুছাইয়া একটা পিন্ দিয়া আঁটিয়া একপাশে একটা কাঁচের 'পেপারে ওয়েট' দিয়া চাপা দিয়া রাখিয়াছে।

গৃহিণী বলিলেন—কেমন দেখ্‌লে?

উৎসাহ দেখাইলে যে বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা আছে, তাহা গল্পলেখক হইয়া না জানিলে চলিবে কেন? গম্ভীর হইতে চাহিয়া বলিলাম—মন্দ কি।

তিনি ত চটিয়া আগুন। মন্দ কি! নেমকহারাম আর কা'কে বলে!

প্রতিবাদ করিলাম না। জ্ঞানবানেরা বলেন—বৃহত্তর লাভের জন্য ক্ষুদ্রতম ক্ষতি নির্ব্বিচারে সহ্য করিতে হয়।

দীর্ঘ সাতদিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু বাড়ীতে যে একটী সতন্ত্র জীব আসিয়াছে, ইহা একদিনও বুঝিতে পারি নাই।

আর একখানি ঘরের ভাড়াটে বাড়ীতে পদার্পণ করিতেই কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলাম।

ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠেই নবাগত বলিলেন—শরীর বয় না, অদৃষ্ট আর কা'কে বলে! পড়লুম কি না এমনই লোকের ঘরে, দু'দিন হাত-পা ছড়িয়ে যে 'হাঁফ্' ফেলে বাঁচব, তার যো নেই।

কর্ত্তার স্বর শোনা গেল—তুমি একটু বসো না সাবিত্রী, আমি এখনই সব গুছিয়ে ফেলছি, কতক্ষণই বা লাগ্‌বে।

—আর আত্তি জানাতে হবে না। মুখে সবাই বলে, কিন্তু কাজের বেলা কেউ নয়। অদৃষ্টে সুখই যদি থাক্‌বে ত, নগাছার জমিদার-বাড়ী না পড়ে' পড়লুম কি না কেরাসিন তেলওয়ালার এক কেরাণীর হাতে।

ব্যাপারটা মন্দ লাগিল না। গৃহিণী সবেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—ও মা, যাবো কোথা! মাগী রইল বসে', আর মিন্‌সে কি না কোমর বেঁধে ছুট্‌ল ঘর গোছাতে। তাও বলি, ব্যাচারী ত দেখ্‌ছি ধুঁক্‌ছে। ক'দিন জর হয়েছিল, আজ সবে পত্তি পেয়েছে।

একে ছোট চোখ বড় হয় না, তবু যতটা সম্ভব বড় করিয়া বলিলাম—তাই না কি? বড় অন্যায় ত।

—অন্যায় বলে' অন্যায়। কবে কোন্ জমিদার না কি

ওঁকে পছন্দ করেছিলেন, তারই দেমাকে পা পড়ছে না—তবু যদি সেখানে বিয়ে হ'ত।

বলিলাম—বিয়ে হ'লে নেহাত মন্দ হ'ত না, কিন্তু তোমার ভাড়াটে হ'য়ে আসত কেমন করে', তাই ভাব্ছি?

—তোমায় আর ভাব্তে হবে না, তার চেয়ে ওই ছাই-পাঁশ নিয়ে বসো, তবু কাজ হবে। বলিয়া গৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বিদ্যুৎছটা কি অন্য কিছুর সহিত এই গমনভঙ্গীর তুলনা করা যায়, তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

সেদিন গৃহিণী ঘরে ঢুকিয়া যখন আমার সম্মুখে, আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন আসন্ন বর্ষণভারে তাঁহার চোখ দু'টী ঝুলিয়া পড়িতে চাহিতেছে।

বলিলাম—ব্যাপার কি? আজ আবার সেই 'ধুঁকছে লোকটীকে' কোন জুলুম করা হচ্ছে না কি?

—যাও, ঠাট্টা কর্তে হবে না।

—তবে?

—জানি না। বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। জানি, মানি না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলে এ সব ক্ষেত্রে ফল অবশ্যম্ভাবী। হইলও তাহাই। যখন ফিরিবার জন্য কোন কথাই বলিলাম না, তখন তিনি নিজেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—মানদার স্বামী মাতাল। মদ খায়।

—খায় না কি?

—কথার ছিরি দেখ না! বল্ছি-ই ত খায়। শুধু খায় না, ব্যাচারীর গয়নাগুলো সব খেয়ে ফেলেছে।

আশ্চর্য্য না হইয়া উপায় নাই। বলিলাম—গয়নাগুলো খেয়ে ফেলেছে, বল কি?

—ঝকমারী তোমার সঙ্গে কথা কইতে আসায়। মানুষে কি গয়না খায়? তাই বেচে টাকাগুলো দিয়ে মদ খেয়ে খেয়ে একেবারে—

বিপদের কথা হ'ল ত। ওদের কাছ থেকে ঘরভাড়া আদায় করাই মুস্কিল। দিয়েছে ত এ মাসেরটা?

—না, তোমার সঙ্গে কথা কইতে নেই। ঘরভাড়া নিয়েই ত হ'ল এত কথা। বেচারী কি মুখফুটে বলেছে কিছু। ওর ঘরের পাশ দিয়ে আসছি, শুন্লুম, মিনসে বল্ছে—টাকা নেই কি রকম? ওসব চালাকী চলবে না, যেখান থেকে পার, টাকা চাই। এই ভাড়ার টাকাগুলো দিলুম, এরই মধ্যে সেগুলো উড়ে গেল।

মানদা বল্লে—উড়ে যাবে কেন, যাঁদের পাওনা, তাঁদের দিয়ে এসেছি।

—মাথা কিনেছ! বড় দরদ দেখছি! কেন কিছু আছে না কি এর ভেতর?

মানদা বল্লে—কি থাকবে?

—মা গো, লোকটা এমনি বিতিকিচ্ছিরি! বল্লে কি জানো—কেন সুন্দর কবি বাড়ীওয়ালা পেয়েছ, আর চাই কি। তার ওপর কবিতা তুমিও ত লিখ্তে দেখেছি। খাতাগুলো না পুড়িয়ে দিলে কি আর এতদিন ঘর করতে পারতুম মনে করেছ? ওই সব কাব্যিরোগগুলোকে আমি ভয় করি—বাঘের চেয়েও ভীষণ বলে'।

—এমনই রাগ হ'ল লোকটার ওপর! বলিয়া সপ্রেম-দৃষ্টিতে গৃহিণী আমার পানে চাহিলেন।

স্বামীগর্ব্বে হৃদয়টা উল্লসিত হইয়া উঠিবার হেতু খুঁজিয়া পাইল না। নিজের পোষা বিড়ালটার নিন্দা অপরের মুখে সহ্য করা যায় না, আমি ত মানুষ। কিন্তু অদেখা মেয়েটীর জন্য মনের কোথায় যেন হা-হা করিয়া উঠিল। কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না, গৃহিণীই বলিয়া চলিলেন—অমন ভাড়াটের মুখ দেখতে নেই, শুধু মেয়েটার জন্যেই যা', নইলে—এই দেখ না, ছুটে এসে ভাড়াগুলো দিয়ে গেল। বল্লে কি জান?—কর্ত্তা না কি কখন থেকে তাগাদা করছে দিয়ে আসবার জন্যে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—তবু ভাল, ধর্ম্মভাব আছে বলতে হবে।

নগাছার জমিদার গৃহিণী হইবার অধিকার-বঞ্চিতা কিন্তু প্রথম মাসের ভাড়া হইতেই আমাদের বঞ্চিত করিয়া দিলেন। ঘরে বসিয়াছিলাম, শুনিবার অসুবিধা

হইল না; বেশী গুছাইয়াই তিনি বলিয়া গেলেন যে, কর্ত্তা ভাড়াটা ফেলিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার ভায়ের মুখে অন্ন দিতে হইবে—সম্মানের অনুপাতে ব্যয় করিতে গেলে কর্ত্তার মাহিনার অঙ্কে তাহা কুলাইবে না, বাধ্য হইয়া কিছু টাকা দেনা করা হইয়াছে এবং ভাড়াটাকেও দেনার সামিল করিয়া লওয়া হইল। থাকিতে যখন হইবেই, তখন ভাড়া না দিয়া উপায় কি?

গৃহিণীর কণ্ঠ প্রতিবাদের সুর বহন করিয়া আনিবে জানিতাম, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা দেখিলাম না। তিনি আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন—দেখ্‌লে আক্কেলটা?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম—দেখিয়াছি।

এ মাসটা যাক, পরের মাসে যদি এমনই করে, বাধ্য হ'য়ে উঠিয়ে দিতে হবে।

বলিলাম—কাজেই।

তিনি মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—তা'ত বল্‌বেই। বেটা-ছেলে, ঘরের মধ্যে অকেজো হ'য়ে বসে' থাক্‌লে যা' হয়, তাই হয়েছে। মুখ নাড়্‌ছ কোন্ লজ্জায়—বাইরে গিয়ে দু'কথা বল্‌তে পার না?

আর যাই থাক্, যাহা পারি না, তাহাকে পারি বলিয়া বাহাদুরী লইবার মোহ আমার মধ্যে নাই। তাই চুপ করিয়া গেলাম।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙিয়া গেল নগাছার জমিদার-বঞ্চিতার কণ্ঠস্বরে। তিনি বলিতেছেন—ক'দিন ধরে' লক্ষ্য কর্‌ছি, মুখ ফুটে বলি নি; কিন্তু আজ বল্‌তেই হলো বাবু। পরের খুঁটে-কয়লা চুরী করে' এমন বড়লোকী কর্‌তে লজ্জা করে না।

ঘটনাটা একঘেয়েমীর গণ্ডী ছাড়াইয়াছে দেখিতেছি। উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

অতি অস্ফুটকণ্ঠে কে যেন বলিল—ও কথা বল্‌বেন না দিদি, আমি আপনার খুঁটে চুরী কর্‌তে যাব কেন?

—যাবে কেন, এদিকে ত ভাঁড়ে মা ভবানী! ক'দিন এক পয়সাও ত বাড়ী ঢোকে নি, চল্‌ছে কিসে তাই বল ত?

—চল্‌ছে না বলেই আমি চুরী কর্‌তে যাব কেন বলুন?

—আলবৎ যাবে, এখনো কয়লাওয়ালার দাম চোকান হয় নি, ঘুঁটেউলি এসে তাগাদা করে' যাচ্ছে। অমনি সব ফুরিয়ে গেল—আমা'কে বোকা পেয়েছ?

কথা বলার মধ্যে বাহাদুরী আছে ইহা মানিতেই হইবে। ভাবিয়াছিলাম, মেয়েটী বলিবে—দাম দেওয়া হয় নাই বলিয়া জিনিষগুলা ফুরাইবে না, ইহার যুক্তি কোথায়? মেয়েটির উত্তর কিন্তু সে ধার ঘেঁষিয়া গেল না, সে বলিল—আপনি বিশ্বাস করুন, আমি নিই নি। তবু যদি সন্দেহ হয় বল্‌বেন, আমি দিয়ে দেবে 'খন।

—দিয়ে দেব 'খন, দিয়ে দেব 'খন মুখে ত খুব বার-ফট্টাই করছ, কিন্তু দেবে কোত্থেকে, তাই শুনি? এমনই অদৃষ্ট, পড়লুম কি না হাভাতের ঘরে! সঙ্গীও তেমনই জুট্‌বে না ত কি! নগাছার জমিদার-বাড়ীর আস্তাবলও ছিল এর চেয়ে ঢের ভাল।

গৃহিণীর কণ্ঠের প্রতিবাদ আশা করিয়াছিলাম, হঠাৎ ঘরভাড়া চোদ্দ টাকার কথা মনে পড়িয়া গেল। মন্ত্রমুগ্ধ ফণিনীর মত তিনি আজ নির্বিষ হইয়া পড়িয়াছেন দেখিতেছি।

আমার উপর 'বিষ' ঢালিবেন জানিতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে সতন্ত্র ব্যবস্থা দেখিলাম। তিনি ঘরে ঢুকিলেন বটে, কিন্তু এ সব কোন কথাই তুলিলেন না।

আপাততঃ বিপদপাতের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এক কাপ চা'র প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

রাত্রের গভীরতা তখন কমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ ভূমিকম্পের বেগ অনুভব করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বসিলাম। মজঃফরপুর কি কলিকাতায় আসিল না কি? কিন্তু উদ্বেগের পরিবর্ত্তে লজ্জাই পাইলাম। ভূমিকম্প নহে, শ্রীমতী গৃহিণী আমাকে গভীর নিদ্রার কবল হইতে কণ্ঠস্বরে উদ্ধার করিতে না পারিয়া দেহের সাহায্য লইয়া নাড়া দিতেছিলেন।

বলিলাম—ব্যাপার কি ?

—চুপ, এস না। বলিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করা ছাড়া অন্য পথ খুঁজিয়া পাইলাম না।

জানালার পাশে গিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি কি দেখাইলেন। দেখিলাম—বালতী করিয়া কে যেন কয়লা না কি তুলিতেছে।

কথা বলিতে যাইতেছিলাম, চুপ করিতে বলিয়া তিনি শয্যায় ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন—দেখ্‌লে একবার নগাছার জমিদার-বাড়ীর বউয়ের কাণ্ডখানা !

দেখিলাম ত নিশ্চয়ই।

—বলে কি জান, মানদা কয়লা চুরী করে। বিশ্বাস হয় নি, আবার হয়েও ছিল একটু। অভাবের হাত, ঠিক্ করে' ত বলা যায় না। কিন্তু নিজের চোখে না দেখে-স্থির থাকাও অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। এমন কি, এজন্যে ক'দিন ঘুম পর্য্যন্ত হয় নি। ও মা, কোথায় যাবো! এই মাগীই কি না শেষে উল্টোচাপ দেয়, চুরী করে'। কাল সকালেই মানদাকে বল্‌ব। তারপর—

তারপর লইয়াই ত যত বিভ্রাট। প্রশ্ন করিবার সাহস হইল না।

সকালটা কোনরকমে কাটিয়া গেল। খাইতে বসিতেই অতি নিকটে আসিয়া গৃহিণী পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে আমার নিজেরই বিশ্বাস কম—কেন না, স্কুলে হিষ্ট্রিতে ফেল করিয়াছি প্রতি বৎসরই। তবু যতটা মনে পড়ে, বিবাহের পর বার দুই এই পাখার হাওয়া খাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি—একবার গহনা গড়াইবার সময়, আর একবার বাপের বাড়ী যাইবার সময়, আর আজ। ভয় যে একটু হইতেছিল না, তাহা হলপ করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু কথাটা উত্থাপন করিতেই আশ্বস্ত হইলাম। মানদা মেয়েটী লেখাপড়া জানিলে কি হয়, আস্ত গাধা! এমন কি, আমার মত বোকাও তাহার তুলনায় সেয়ানার শিরোমণি।

কথাটা শুনিয়া সে ঝগড়া করা ত দূরের কথা, তাঁহাকে পায়ে ধরিয়া না কি নিষেধ করিয়া দিয়াছে কোন কথা বলিতে। মানুষ অভাবে না পড়িলে কি আর তুচ্ছ জিনিষগুলো হাত তুলিয়া লয়। সময় হইলেই সে আবার দিয়া দিবে নিশ্চয়। ইত্যাদি।

ব্রহ্মতত্ত্ব দেখিতেছি কণ্ঠায় কণ্ঠায় জমা হইয়া উঠিয়াছে !

ভাড়াটিয়া-বিভ্রাট লইয়া দিন মন্দ চলিতেছিল না, কিন্তু একদিন অচল হইয়া উঠিল।

কি একটা কার্য্যোপলক্ষে কয়দিনের জন্য বাড়ী ছিলাম না। শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম।

পুলিশের 'সফিনা'র তাগাদায় অসময়ে বাড়ী ফিরিতে হইল।

মানদাসুন্দরীর সুন্দর স্বামীটী না কি একদিন মত্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া ব্যাচারীকে এমন ঘা কতক প্রহার দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন, যাহাতে তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে এবং তিনি নিজে গিয়াছেন পুলিশের হেফাজতে। কেস উঠিয়াছে আমাকে জড়াইয়া; কাজেই আমার হাজির চাই। গৃহিণীর দিকে চাহিলাম, কিন্তু কোন সুবিধাজনক উত্তর আশাও করি নাই, পাইলামও না।

বন্ধু ঘটোৎকচ পুলিশ কোর্টের উকিল। তাহারই শরণাপন্ন হইলাম। মোকর্দ্দমা মন্দ নয়। মানদার বিরুদ্ধে প্রহার-কর্ত্তাটী জবানবন্দী যাহা দিয়াছে, তাহাতে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে—এই রমণীটি তাহার বিবাহিত স্ত্রী নয়; তবে দয়াপরবশ হইয়াই সে এতদিন ইহাকে দেখিয়া আসিয়াছে; ইদানীং বাড়ীওয়ালার সহিত তাহার সম্বন্ধে কুৎসিত সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া সে তাহার সঙ্গে মেলামেশা নিষেধ করিতে গিয়াছিল। বিনীত

হওয়া দূরের কথা, অত্যন্ত অশ্লীলভাবে তাহাকে আক্রমণ করায় সে উত্তেজনা মুহূর্ত্তে তাহাকে আঘাত করিয়াছে কি না বলিতে পারে না। ইত্যাদি।

অত্যন্ত রাগ হইল, কিন্তু তবু মেয়েটীর কথা মনে পড়ায় কেমন বিমনা হইয়া গেলাম। বন্ধুকে সর্ব্বপ্রথম তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তারপর কেস 'ডিফেণ্ড' করিবার বন্দোবস্ত করিব বলিয়া সরাসর হাসপাতালে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

মনে মনে অনেক কথা জল্পনা-কল্পনা করিয়া লইয়াছিলাম। পুরুষ পশু হইলে তাহার শাস্তি হওয়া উচিত, না হইলে ভগবানের বিচারের অমর্য্যাদা করা হয়। ইত্যাদি। কিন্তু মেয়েটীর সাম্‌নে উপস্থিত হইতেই সব কথা গুলাইয়া গেল। আমি না চিনিলেও সচ্ছন্দে সে আমাকে চিনিয়া ফেলিল। কোনমতে জোর করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া 'ঢিপ' করিয়া পায়ের উপর একটা প্রণাম করিয়া বলিল—বড়দি' কেমন আছেন দাদা ? বসুন।

চাহিয়া দেখিলাম। কি দেখিলাম, মনে পড়ে না—তবে কবির কল্পনা করা চলে হয় ত ইহাকে লইয়া। সব মানুষের একপর্য্যায়ে ফেলিবার মত যেন সে নয়। সে যেন কি, আমি ঠিক তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

সে বলিল—আমি জান্‌তুম, আজই আপনি আস্‌বেন। কাল মোকর্দ্দমা, না ?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—হ্যাঁ।

—আচ্ছা পাগল সব! এর মধ্যে মোকর্দ্দমার কি আছে বলুন ত ? ঘর করতে গেলে কার বাড়ী না ঝগড়া-ঝাঁটি হয়, তাই নিয়ে পাড়া মাথায় করতে হবে না কি ?

ঢোক গিলিয়া বলিলাম—তা' বটে।

অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলুম, যখন জ্ঞান হ'ল দেখ্‌লুম, হাসপাতালে। দেখুন না কি বিপদ, আপনাকে ছুটিয়ে আন্‌তে হ'ল! বড়দি' কি বল্‌লেন শুনে ?

বড়দি' কি বলিলেন মনে পড়ে না, তবে অপরিসীম শ্রদ্ধায় আমার সারা অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। উকিলের নিকট হইতে সদ্যআনা স্বামী-দেবতার জবানবন্দীর নকলখানা তাহার দিকে আগাইয়া দিলাম।

সে নিঃশব্দে সেখানার উপর চোখ বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া গেল।

ইহার পর কি বলিয়া যে কথা সুরু করিব খুঁজিয়া না পাইয়া বসিয়া বসিয়া ঘামিতে লাগিলাম। তারপর কোনমতে বলিয়া ফেলিলাম—প্রশ্ন কঠোর হলেও না করে' থাক্‌তে পার্‌লুম না দিদি। এ কি সত্যি ?

মানদার দুইটী আয়ত নয়ন আমার দিকে প্রশ্নমুখর হইয়া চাহিয়া রহিল। সে বলিল—কি সত্যি দাদা ?

—এই, এই, 'উনি' তোমার স্বামী নন্।

মাথা নীচু করিয়া সে একবার কি ভাবিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—অন্য কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌লে কি উত্তর দিতুম জানি না। তবে আপনি কবি—মানুষের হাসির মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে হাসির সন্ধান আপনারই পাওয়া সম্ভব। তাই আপনাকে বল্‌তে আমার বাধা নেই, উনি আমার শুধু স্বামী নন্, তার বাড়া যদি কিছু থাকে, তাও!

বাক্‌হীন-দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। সে আবেগভরে বলিয়া চলিল—মনে পড়্‌ছে সেদিনের কথা, যেদিন আমাদের বাড়ী থেকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া নামঞ্জুর করে' বাবা তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। প্রথমটা তিনি ছেলেমানুষের মত দিনরাত বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ালেন; তারপর পাগলের মত সুরু করলেন উপবাস করতে। এক, দুই, তিন, চার করে' একেবারে একমাস। কেমন করে' ও দুষ্ট মতলব তাঁর মধ্যে এল, কে জানে! তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকা কিন্তু দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। একদিন পালিয়ে এলুম তাঁর কাছে। প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম দু'জনে—যে বিয়ের কথা আমাদের এত ব্যথা দিয়েছে, তা' আর এ জীবনে উচ্চারণ করব না।

গৃহিণীর কথা মনে পড়িয়া গেল। কাব্যরোগ মানুষকে যতটা দুঃখ দেয়, জীবনে অপদার্থ করিয়া তুলে, তাহার নিদর্শনরূপে ইহাকে পুরোভাগে রাখা চলে বটে।

কোর্টে হাজির না হইয়া যাহাতে মোকর্দ্দমা মিটমাট

হইয়া যায় সেই আশ্বাস দিয়াই ধীরে ধীরে হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

কি একটা জিনিষ আনিতে গিয়া মাথায় আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া মানদা এজাহার দিতেই মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আদালত-ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, তাহারা দু'টীতে একখানা গাড়ী করিয়া সম্ভবতঃ আমারই গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে।

কেমন একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছিলাম বলিয়া তখনকার মত বাড়ী যাওয়া স্থগিত করিয়া অন্যদিকে চলিলাম।

রাত্রে যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। চোখ কি জানি কেন সহসা মানদার ঘরের দিকে পড়িল—ও কি, ও ঘরে আলো জলিতেছে না কেন?

কিন্তু কথা বলা সমীচীন বোধ করিলাম না। গৃহিণীই সে উদ্বেগের নিরাকরণ করিলেন। বলিলেন—মা গো, মা! জান্‌লে কে অমন ভাড়াটে ভদ্রলোকের ঘরে রাখ্‌ত বল? বিয়ে করা বউ নয়, তাই বলি—অত ভিজে বেড়ালটি কেন!

বলিলাম—তাই না কি?

—থাক্, আর ন্যাকা সাজ্‌তে হবে না। কোর্টে কেস হ'ল, বেহায়া মিন্‌সে সব ঢাক করে' দিলে। খবরের কাগজে বেরুল। বাবুর আবার দরদ কত, আমার কাছে লুকোন হয়েছে! ভাগ্যিস্ বউটী ছিল, তাই ত জান্‌তে পার্‌লুম। ওই ত কাগজ এনে পড়িয়ে শোনালে।

বিপদ বুঝিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

গোমুখী নিঃস্রাবের মত গৃহিণীর বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

—আমায় আর বল্‌তে হয় নি, বউটীই বল্‌লে—ও সব বেউশ্যে নিয়ে ঘর করা চল্‌বে না। হয় ওরা উঠুক, না হয় সেই যাবে।

—মেয়েটা একবার আমার মুখের কথা শুন্‌তে চাইছিল হয় ত। ঘর থেকেই বার হই নি। ঘরে ঢুক্‌লে আচ্ছা করে' শুনিয়ে দিতুম। ভয়ে ভয়ে দরজার সাম্‌নে এসে সে বল্‌লে—আপনার লোকসান করব না বড়দি', উনিই থাকুন; আমি চল্‌লুম। ভাড়ার টাকাটা—

—মুখ না ফিরিয়েই বল্‌লুম—থাক্, আর দিতে হবে না। এখন ঘর ছাড়লে বাঁচি!

—লজ্জা করে না গা একটু! বল্‌লে—বড়দা'কে বল্‌বেন যাবার কথা, দেখা হ'ল না।

—সুবিধে হ'ত বোধ হয় থাক্‌লে! পুরুষ জাতকে ত আর আমার জান্‌তে বাকী নেই! চড়াই পাখীও এর চেয়ে ঢের ভাল!

প্রতিবাদ করিলাম না। অপাত্রে সম্মান প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া গল্পের যে অংশটা এ কয়দিন ভাবিয়া কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না, তাহাই লিখিতে সুরু করিয়া দিলাম।

নগাছার জমিদার বঞ্চিতার স্বামী বোধ হয় বাড়ী ফিরিলেন। স্ত্রী কাংসকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—হতচ্ছাড়া লোকের হতভাগা ব্যবস্থা! যাবার সময় যে 'পইপই' করে' বলে' দিলুম 'ব্লাউজ'টা আন্‌তে। ভুলে মরেছ ত? আমি যাই সতী মেয়ে, তাই এখনো ঘরে রয়েছি—অন্য লোক হ'লে কবে মুখে নুড়ো দিয়ে সরে' পড়ত। নগাছার জমিদার-বাড়ীর যারা চাকর হবার উপযুক্ত নয়, তারা যে কোন্ সাহসে বিয়ে করতে আসে, তাই ভাবি।

কথাগুলা মন্দ লাগিল না। ভাবার মধ্যেই ত চিরদিন মানুষের গল্প লুকান রহিয়াছে।...

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়ার মায়া

শ্রীঅপূর্ব্বমণি, দত্ত

মনসাতলার বারোয়ারীতে এবার আর সমারোহের অন্ত নাই।

কাপড়জামা, পিতলকাঁসার বাসন, কাঁচের খেলনা প্রভৃতির দোকান এবারেও অনেক আসিয়াছে। বাঘের খেলা দেখাইতে যে লোকটী প্রতিবৎসর আসিয়া থাকে, সেও এবার তাহার শীর্ণকায় চিতাবাঘটীকে লইয়া একটা সামিয়ানা খাটাইয়াছে। একটী গরুর দুইটী মাথা দেখাইয়া গত বৎসর যে ব্যক্তি বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহারও একটা ছেঁড়া তাঁবু একপাশে খাটানো হইয়াছে।

কিন্তু এই পল্লী-উৎসবের মধ্যে একটা মস্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে এবার—এক বায়োস্কোপ কোম্পানী। প্রকাণ্ড সামিয়ানার সামনে একটা লোক মুখে মুখোস পরিয়া নাচিতেছে, আর বিকট শব্দ করিয়া লোকের কাছে বায়োস্কোপের গুণগরিমা কীর্ত্তন করিতেছে। আজিকার পালা 'নিতাই গৌর'—মহাপ্রভুর লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিবার এমন সুযোগ কেহ ছাড়িবেন না। টিকিটের দাম দুই আনা মাত্র। ছবিতে গৌর নাচিবেন, হরিনাম গাহিবেন—ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। দু' দু' আনা!

মাণিকপোতার বলাই আগুরির মা তাহার গঙ্গাজলের সঙ্গে মনসাতলার মেলা দেখিতে আসিয়াছিল।

আজ তিন বৎসর হইল তাহার বলাই তাহাকে ফাঁকি দিয়া গিয়াছে। এই অবলম্বনহীন জীবন-সন্ধ্যায় আজও বুড়ী দেখিতে পায় তাহার অতীতদিনের সুখস্মৃতি মাখা দিনগুলি। তাহার স্বামী শ্রীদাম আগুরির গোলাভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল, তিনখানা আটচালা ঘর ছিল। একমাত্র ছেলে বলাই তখন পনেরো-ষোল বৎসরের, একটীমাত্র মেয়ে নন্দরাণীর বেশ ভাল ঘরেই বিবাহ হইয়াছে,—কানাইডাঙার মহেশ ঘোষ উকীলের মুহুরীগিরি করিয়া বেশ অবস্থাপন্ন, তাহারই ছেলের সঙ্গে নন্দরাণীর বিবাহ হইয়া গেল। নন্দরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীতে উঠিল, আর শ্রীদাম চোখের জল মুছিতে মুছিতে হঠাৎ বলিল, "কাঁথাখানা দ্যাও তো বড় বউ, গাটা যেন কেমন শীত শীত ক'রে উঠলো।"

সে জ্বর আর তাহার সারিল না। এগারো দিনের জ্বরে ভুগিয়া শ্রীদাম আগুরি তাহার জমজমাট সংসার রাখিয়া মহাযাত্রা করিল। উঃ, সে তো সেদিনের কথা! বড় বউকে দুইদিন কেহ উঠাইয়া বসাইতে পারে নাই। সেই সর্ব্বনাশের দিনে তাহার গঙ্গাজল তাহাকে অনেক কষ্টে সান্ত্বনা দিয়াছিল।

তারপর কি করিয়া কি হইল—সে যেন এক ভোজ-বাজীর ব্যাপার। মহাজন দেনার দায়ে ধান ও গরুগুলি বেচিয়া লইলেন, জমীদার বাকী-খাজনার দায়ে ভিটা নীলাম করাইলেন। জীবনের সেই অন্ধকার দিনে বলাইয়ের হাত ধরিয়া বড় বউ মাণিকপোতায় আসিয়া গঙ্গাজলের আশ্রয় লইল। তখনও মস্ত একটা আশা ছিল বলাই মানুষ হইলেই এ দুর্দ্দিনের অবসান ঘটিবে।

কিন্তু 'মানুষ হওয়া' অর্থে লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে, বলাই তাহার কোন লক্ষণই দেখাইল না। গ্রামে একটা হরিসভার আখড়া ছিল, সেইখানেই হইল বলাইয়ের আড্ডা।

একদিন আর তাহার মায়ের সহ্য হইল না। বলাইকে বলিল, "দিন দিন ধিঙ্গী হ'য়ে বেড়াচ্ছিস, একটা পয়সা রোজগারের ক্ষ্যামতা নাই, চাল নেই, চুলো নেই, মা রয়েছে পরের বাড়ী, তোর কি ঘেন্নাও হয় নারে বলাই, গলায় কি তোর একগাছা দড়িও জোটে নারে হতভাগা।"

দিন দুয়েক পরে বলাই বলিল, "চল্লাম মা এইবার। চাকুরী পেয়েছি, কিন্তু যেতে হবে সেই যশোর।"

বলাই গেল। দিনের পর দিন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় তাহার মায়ের কাটিয়া গেল। শেষে একদিন একখানা পোষ্টকার্ড আসিল। বলাই লিখিয়াছে, যশোহরের কাছে কি একটা জায়গায় একটা যাত্রার দলে সে চাকরী পাইয়াছে। পাঁচ টাকা মাহিনা এবং খোরাকী। এ মাসে তাহার নিজের অনেক দরকার। আগামী মাসে মাহিনা পাইলেই সে মায়ের কাছে মণি-অর্ডারে টাকা পাঠাইয়া দিবে।

মায়ের প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। চিঠিখানা লইয়া সারা গ্রামের সকলকে দেখাইল। পাঁচ টাকা মাহিনা এবং যাত্রার দল সম্বন্ধে যাহারা একটু মন্তব্য প্রকাশ করিল, বলাইয়ের মা তাহাদের উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল।

পাঁচ টাকা মাহিনা কি সোজা টাকা?—কই, কেউ পাঁচটা পয়সা দিক্ দেখি?—গঙ্গাজলকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মণি-অর্ডারে কি করিয়া টাকা আসে? পথে যদি মণি-অর্ডার মারা যায়?—ঠিক আসিবে তো?

কিন্তু সত্যই একদিন মণি-অর্ডার আসিল। পাঁচ টাকা বটে। একটি টাকা মনসাতলার ঠাকুরের নামে তুলিয়া রাখিয়া বাকী টাকা কয়টাও সে যত্ন করিয়া আর একটা জায়গায় তুলিয়া রাখিল। না খাইয়া মরিলেও এ টাকা কয়টি সে খরচ করিতে পারিবে না।

কিন্তু তাহার পর মাস তিনেক চলিয়া গেল। বলাইয়ের আর কোন চিঠিও নাই, টাকাও নাই। আবার দুশ্চিন্তার একশেষ।

ক্রমে বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর হঠাৎ একদিন একখানি রেজেষ্টারী চিঠি আসিয়া উপস্থিত। কলিকাতা হইতে কে একজন লিখিয়াছেন যে, বলাই তাঁহার নিকট থাকিত, হঠাৎ 'নিউমোনিয়া'য় মারা গিয়াছে। সে এখানে চাকরী করিত। তাহার বেতনের ত্রিশটি টাকা তাঁহার নিকট ছিল, তিনি রেজেষ্টারী চিঠিতে পাঠাইলেন।

আশার প্রাসাদ চুরমার হইয়া গেল। বুকের ভিতরে ভবিষ্যতের যে সুখ কল্পনা ইন্দ্রধনুর বর্ণ সৃজন করিতেছিল, দেখা গেল, কেবলমাত্র কালো ছাড়া আর তার কোন রংই নাই।

বলাইয়ের মা আবার আছাড় খাইয়া পড়িল। জীবনের এ ব্যর্থ দিনগুলির শেষ তাহার কবে হইবে, হইবে গো—কেহ বলিয়া দিতে পার কি? কোথায় কি ভাবে ইহার পরিসমাপ্তি?

তিনটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। গ্রামের কাছে রেল-ষ্টেশন, বুড়ী মাঝে মাঝে সেইদিকে যায়। রেলের ফটকের কাছেই গুম্‌টি, তাহার চৌকিদার আবদুল। আবদুল বলে, "আর এগিয়ে যেও না বুড়ি মা, ন'টার গাড়ী আস-বার সিগ্নেল পড়েছে।"

"ও গাড়ী কোথায় যায় রে আবদুল? যশোর?"

আবদুল হাসিয়া বলে, "না গো বুড়ি মা, যশোরের ওদিকে এ গাড়ী যায় না।"

"তবে? কোলকেতা?"

"না। এ গাড়ী যায় হুই দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ের দিকে।"

জায়গার নামটা যেমন অপরিচিত, উচ্চারণের তেমনি কষ্ট। গঙ্গাজল দেখিল এমনিভাবে কোনদিন হয়তো বুড়ীর মাথা খারাপ হইয়া যাইবে। সে বলিল, "না হয় দিনকতক নন্দর বাড়ী থেকে ঘুরে এসো না কেন গঙ্গাজল।"

কিন্তু বুড়ী রাজী হয় না। বলে, "ছি, তারা যেতে বলে নি কিছু না, শুধু শুধু কি কুটুম-বাড়ী যাওয়া যায়? —না যেতে আছে?"

"এ আর ত নতুন কুটুম নয়।"

এমনি করিয়া দিন কাটে…

এমন সময় একদিন গঙ্গাজল বলিল, "যাবি ভাই গঙ্গাজল, মনসাপোতার মেলায়? কতরকম জিনিষ-পত্তর রং-তামাসা, চ' না কেন দুটো দিন কাটিয়ে আসি।"

তাহারা মনসাপোতার মেলায় আসিল।

দুই

মুখোসপরা লোকটা হাঁকিতেছিল, "ছবিতে হাত-পা নাড়বে, চলে' বেড়াবে, সবই করবে, কেবল কথা কবে না।

অদ্ভুত কাণ্ড! আসুন মা ঠাকরুণরা, গৌর-নিমায়ের লীলা স্বচক্ষে দেখে চক্ষু সার্থক করুন—দু' দু' আনা। গৌর নিতায়ের লীলা—চোখের সাম্‌নে—দু' দু' আনা।"

গঙ্গাজল বলিল, "যাবি ভাই গঙ্গাজল, দু'গণ্ডা পয়সা বই ত নয়, দেখেই আসি না কেন গৌর-নিতায়ের লীলা। যা' বল্‌ছে তা' যদি না হয়, তবে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব ওই হতভাগা মিন্সের।"

সত্যই অবাক্ হইবার ব্যাপার বটে। লোকটাকে ঝাঁটাপেটার কথা বলিয়াছিল বলিয়া গঙ্গাজল দুঃখ অনুভব করিল। নবদ্বীপ-ধাম একেবারে চোখের সাম্‌নে, মায় পুকুরপাড়ের খেজুর গাছটার পাতাগুলিও নড়িতেছে, নিতাই-গৌরের লীলা দেখিয়া চোখে জল আসিলই বটে। কিন্তু লোকটা যে বলিয়াছিল, ছবিতে নড়িবে, কিন্তু ছবি কি করিয়া এমন হইল?

নিত্যানন্দকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিরাট হরি-সংকীর্ত্তনের দল বাহির হইয়াছে। আত্মভোলা নিত্যানন্দ ভাবে বিভোর হইয়া নাচিতে লাগিলেন, চারিপাশের কীর্ত্তনের দলের লোকগুলিও সংকীর্ত্তনে যেন মাতিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ, যে লোকটি খোল বাজাইতেছে, সে যেন ভাবে বিভোর, একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বুড়ী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে, ওযে আমার বলাইরে, আমার বলাই! ও বলাই, ওরে বাবা, এই যে আমি এইখানে—ও গঙ্গাজল।"

চারিদিকে একটা মস্ত হৈচৈ উঠিল। ঝুড়িতে বসানো 'পাঞ্চ লাইট'টা খেলা আরম্ভ হইতেই বাহিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেটাকে পুনরায় আনানো হইল। যে ফিল্ম দেখাইতেছিল, সেও হঠাৎ ফিল্ম চালানো বন্ধ করিল। বুড়ী তখনও চেঁচাইতেছে, "ও বলাই একটীবার আমার দিকে ফিরে চারে বাবা!"—

গঙ্গাজল প্রথমটা হকচকাইয়া গিয়াছিল, তারপর লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, ছবির পর্দ্দায় যে ব্যক্তি খোল বাজাইতেছে, সে ব্যক্তি বলাই তো বটে! কি আশ্চর্য্য, যে তিন বৎসর মরিয়া গিয়াছে, সে আজ চোখের সামনে—একেবারে প্রত্যক্ষ—অবাক কাণ্ড!

জনকয়েক চেঁচামেচি করিয়া উঠিল, "বার ক'রে দাও বুড়ীকে, এই ও বুড়ী—"

গঙ্গাজল তাড়াতাড়ি বুড়ীকে ধরিয়া বাহিরে আনিল। কিন্তু বুড়ীর চীৎকার আর থামে না। সে বলিল, "আমি আর কোথাও যাবো না রে—আমার বলাইকে ফেলে আমি কোথাও যাবো না রে, তিনটী বচ্ছর পরে আজ যে তাকে দেখেছি—"

অতিকষ্টে গরুর গাড়ী করিয়া গঙ্গাজল বুড়ীকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিল।

তিন

তাহার পরদিন বুড়ী সকালে উঠিয়াই মনসাপোতার সেই তাঁবুর দিকে যাত্রা করিল। পথ খুব বেশী নয়, তবু এইটুকু আসিতেই তাহার পায়ের কয়েক জায়গা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, কাপড়খানা কাঁটায় বাধিয়া দুই-তিন জায়গায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

তাঁবুর সাম্‌নে একটা লোক বসিয়া চা পান করিতেছিল, বুড়ী সেখানে গিয়া বসিয়া পড়িল।

লোকটা বলিল, "কি চাই গো?"

"তোমাদের গৌর-নিতাই কখন হবে বাবা! একবার দেখাও না আমাকে। আমার ছেলে বলাই রয়েছে যে ওর মধ্যে—ওই যে গো খোল বাজাচ্ছিলো।"

কালকের ঘটনাটা লোকটার মনে পড়িয়া গেল। সে তখন বুড়ীকে চিনিতে পারিল। বলিল, "ও তোমার ছেলে বুঝি?"

"হাঁ বাবা। আজ তিন বচ্ছর হলো—"বুড়ীর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

লোকটার মনে কেমন দয়া হইল। বলিল, "এখন তো আমরা খেলা দেখাবো না বুড়ীমা। সেই বিকেলে খেলা হবে। তুমি খাওয়াদাওয়া ক'রে বরং বিকেলে এসো—বুঝলে? আর বাপু, তোমাকে বলি, ছেলেকে তো আর ফিরে পাবে না, কাজেই শুধু শুধু যদি কালকের মতন চেঁচামেচি কর, তা' হ'লে আমরা 'ফিলিম' তোমাকে দেখ্‌তে দেব না।"

বুড়ী বলিল, "না বাবা, চেঁচামেচি আর করবো না। আমি চুপটী ক'রে থাকবো বাবা। আমার উপর রাগ রো না। হ্যাঁ বাবা, তোমরা ওকে কোথায় পেলে বাবা—"

লোকটা বিজ্ঞের মতো হাসিয়া বলিল, "হুঁ হুঁ, ওকি আর এখানকার জিনিষ। ও সব কোলকেতার বড় বড় ফিলিম। তোমার ছেলে হয়তো সেই সময় দলে ছিল।"

বুড়ীর শুনিয়া আর তৃপ্তি হয় না।

যথাসময় বুড়ী আবার সেখানে আসিয়া হাজির। সেই লোকটী মুখোস পরিয়া প্রতিদিনের মতো চেঁচাইয়া দর্শক আকর্ষণ করিতেছে। বুড়ী দুই আনার টিকিট করিয়া ভিতরে গিয়া চ্যাটাইয়ের উপর বসিল।

কিন্তু নবদ্বীপের দৃশ্য, পুকুরপাড়ের খেজুর গাছ, সে সব আর বুড়ীর ভালো লাগে না—তাহার কেবলই মনে হয়, কখন সেই হরি-সংকীর্ত্তনের দল আসিয়া পড়িবে।

সংকীর্ত্তনের দল ক্রমশঃ আসিয়া পড়িল। প্রতিদিনের মত আজও তাহার বলাই তেমনিভাবে খোল বাজাই-তেছে, তেমনি তাহার চোখের সাম্‌নে নাচিতেছে। কিন্তু কই, তাহার মায়ের দিকে তো একটিবারও চাহিল না বা একটী কথাও কহিল না। বুড়ী কালকের মত আজও চীৎকার করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ মনে হইল যে, আজ চীৎকার করিলে আবার তাহাকে বাহির করিয়া দিবে এবং হয়তো আর এখানে আসিতে দিবে না।

তাহার পরদিনও বুড়ী যথাসময়ে গিয়া উপস্থিত। মুখোস পরিহিত ব্যক্তিটী সেদিন আরও একটু ঘনিষ্ঠতা করিয়া বলিল, "এই যে এসো বুড়ী মা, এখনো দেরী আছে খেলা আরম্ভ হ'তে। বসো। বাতাসা দেবো দু'খানা, খেয়ে এক ঘটী জল খাও না।"

আজ বুড়ী নিত্যানন্দের তন্ময়ভাব, জগাই-মাধাইয়ের তাণ্ডব-লীলা সব ভুলিয়া দেখিতে লাগিল সেই খোলবাদক —তার বলাইকে। ও বাবা বলাই, এই যে আমি তোর সাম্‌নে ব'সে—তোর মা। দুই-একজন চেঁচাইয়া উঠিল, "এইও চুপ।" বুড়ী বুঝিল, সে আত্মবিস্মৃত হইয়া আজও চেঁচাইয়া উঠিয়াছে। সংকীর্ত্তনের দৃশ্য শেষ হইবামাত্র দর্শকদল একসঙ্গে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, বুড়ীর মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। সংকীর্ত্তন যাহারা করিয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য সত্য বাহাদুরী দেখাইয়াছে তো তাহার বলাই। ও হরিধ্বনি—ও প্রশংসা তো তাহারই উদ্দেশে। চোখটা সঙ্গে সঙ্গে ঝাপসা হইয়া আসে।

পরের দিনও যথাসময়ে যাইবে, এমন সময় ভীষণ মেঘ করিয়া বৃষ্টি আসিল। গঙ্গাজল যাইতে দিল না। বুড়ীর সে একটা রাত্রি যেন আর কাটে না। শেষে কি না বিধাতাও বাদ সাধিলেন।

তার পরের দিনও বুড়ী যথাসময়ে সেখানে গিয়া উপস্থিত। সেই মুখোসওয়ালা লোকটাকে বলিল, "কাল কি দুর্‌যুগ বাবা! বেরুতে যাবো, এমন সময় আকাশ যেন ভেঙে এলো। কাল আর আসা হলো না বাবা।"

লোকটা বলিল, "কাল আসো নি, বেশ করেছিলে বুড়ী মা। কাল আর খেলা দেখানো হয় নি। আমাদের তাঁবু ভিজে সব একেবারে—"

"আজ হবে তো বাবা?"

"হবে কি না ভাবছি। তাঁবু আজও ভিজে রয়েছে, চ্যাটাইও ভিজে; তা' ছাড়া, আজ কি আর 'অডিয়েন্স' হবে।"

শেষের কথাটা বুড়ী বুঝিল না, কিন্তু আজও দেখানো হইবে না শুনিয়া তাহার মন দমিয়া গেল। বলিল, "আজকে আর বন্ধ রেখ না বাবা। এতটা পথ, এই জলকাদায় কষ্ট ক'রে এসেছি, আজ একবারটী দেখাও বাবা।" বুড়ীর স্বরে সে কি ব্যকুলতা!

অভিনয় সেদিনও দেখানো হইল।

চার

তাহার পরদিনও বুড়ী যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত মুখোসওয়ালা বলিল, "আজ প্রোগ্রাম 'চেঞ্জ' বুড়ীমা।"

"সে আবার কি বাবা?"

"মানে, ও বই আর দেখানো হবে না। রোজই এক বই দেখালে লোক আস্‌বে কেন? সেই জন্য আজ অন্য

বই। দেখ্‌বে বুড়ীমা, সমুদ্দুরের তলায় ইয়া এত বড় মাছ হাঁ ক'রে—"

সমস্ত পৃথিবীর আলো যেন 'দপ' করিয়া একটী ফুৎকারে নিবিয়া গেল। বুড়ী বলিল, "বলাইকে আর দেখ্‌তে পাবো না?"

লোকটা অম্লানবদনে বলিল, "না।"

বুড়ীর মনে হইল, ঠিক এমনি এক মেঘমেদুর তমসাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় বলাই তাহার একবার কোলশূন্য করিয়া গিয়া আবার তাহার কাছে মাত্র এই কয়দিনের জন্য ফিরিয়া আসিয়াছিল। আজ আবার বলাইয়ের যেন পুনর্ব্বার মৃত্যু হইল। একদিন ভগবান তাহার কোল হইতে বলাইকে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন, আজ এই মুখোসপরা লোকটা তাহার চোখের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে তাহার বলাইকে আবার কাড়িয়া লইল। বুড়ীর বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, একটা চাপা আর্ত্তনাদ বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া গেল। মন বুঝি তাহার বলিতে চাহিল, "বলাই রে, দিনান্তরে তোকে একটু কেবল চোখের দেখা দেখ্‌-ছিলাম, তাও কি আর পাবো নারে!"—

লোকটা বলিল, "সে ফিলিম আজ চ'লে গেছে রানা-ঘাটে। সেখানকার বাজারে আমাদের আর একটা তাঁবু পড়েছে কি না—আজ রাত্তির থেকে সেটা সেখানে দেখানো হবে।"

বুড়ীর হৃৎপিণ্ডটা ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল। রানাঘাটে! সে তো মাত্র তিন-চার ক্রোশের ব্যবধান। এখনও বেলা আছে, একটু জোরে যদি পা চালাইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে কতক্ষণই বা লাগিবে।

বুড়ী চলিল। ক্ষুদ্র গ্রাম্যপথ। দু'পাশে কোথাও বা লোকালয় আছে, কোথাও বা নাই। পথের দুইপাশে আশ্যাওড়া, ঘেঁটুর জঙ্গল। আকাশে আজও মেঘের ঘন-ঘটা। আসন্ন সন্ধ্যায় একটা মহাপ্রলয়ের প্রতীক্ষায় পৃথিবী যেন স্থির, স্পন্দহীন।

কিছুদূর যাইতেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। আর বুড়ীর নজর চলে না। লতাগুল্মের কাঁটায় কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, অন্ধকারে জলকাদায় বুড়ী হুমড়ি খাইয়া পড়ে, আবার উঠিয়া তাহার গন্তব্যপথের দিকে চলিতে থাকে।

দীর্ঘপথ। এপথের আর অবসান নাই, বিরাম নাই। বুড়ী তবু চলিয়াছে। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, পরিশ্রমে সর্ব্বদেহ ঘর্ম্মাক্ত—

অন্ধকার গাঢ়তর হয়। দৃষ্টি আর চলে না। বিদ্যুৎ-স্ফুরণের সঙ্গে-সঙ্গেই একবার ঘন গর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। তারপরেই সুরু হয় পাগলা হাওয়ার তাণ্ডব-নৃত্য। পথের দু'পাশের আমগাছগুলা যেন মত্তদেহে দুলিয়া উঠিল; একটা শুকনো গাছের ডাল মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল—

সারা পৃথিবী আজ উন্মত্ত···

আর কতদূর! এই দেহের গুরুভার আর কতদূর টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে। বলাই রে! তুই কোথায়? কতদূরে? নিত্যানন্দের হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তোর মৃদঙ্গের যে ধ্বনি তাহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল, আর কতদূরে সে ধ্বনির ঝঙ্কার!

হঠাৎ একটা কিসে হোঁচট লাগিয়া সারা দেহটা যেন ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিল। বুড়ী উঠিতে গেল, পারিল না। সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ, অসাড় একটা অস্ফুট শব্দ শুধু তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, "বলাই রে!" *

অপূর্ব্বমণি দত্ত

* গল্পের কঙ্কালটী স্পেনীয়। লেখক।

প্রেম?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এবার পূজোর ছুটীটা মুসুরীতে কাটান যাবে স্থির ক'রে, পূজোর পাঁচদিন আগেই যাত্রা করা গেল। বিনয়ের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুনীল আর উপেন 'মুভিং লগেজ নট্ অ্যালাউড' ব'লে ঘোরতর আপত্তি তুল্‌তে বেচারী একেবারে মুসড়ে পড়্‌ল। আমি উপেনকে জানি, ডাক্তারী-বিদ্যায় পারদর্শী হ'য়ে ছুরি 'ফরসেপে'র সংস্পর্শে এসে, তার হৃদয়ের ওপর এঁকটা কঠিন স্তর জমে গিয়েছে, কিন্তু সুনীলের এতটা অধঃপতন হ'ল কিসে? যা' হোক্, অবশেষে সুনীলের কথামত পথে নারী বিবর্জ্জিত অবস্থায় আমরা চারজনে যাত্রা কর্‌লুম। পথে লছমনঝোলার সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয়ের লোভে যখন হরিদ্বার ষ্টেশনে নাম্‌লুম, তখন প্রকৃতিদেবীর রীতিমত প্রলয়ের মাতন সুরু হ'য়ে গিয়েছে। একে দারুণ শীত, তায় বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল বাতাসের হিমশীতল সুখস্পর্শে একরকম মরিয়া হ'য়ে প্রথম শ্রেণীর 'ওয়েটিং রুমে'র মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম। দরজাটা বন্ধ কর্‌তেই শুনলুম, ভাঙা-গলার অস্পষ্ট শব্দের সঙ্গে দরজার ওপর সঘন করতাড়ন চল্‌ছে।

উপেন বেশ বিরক্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বল্লে, "কোন্ হ্যায়?"

সহসা বাধা দিয়ে বিনয় সহাস্যে বল্লে, "আস্তে ডাক্তার, সুরটা অমন কড়ি মধ্যমে চড়িও না—কেবল খাদ পরদার মীড় টেনে যাও দাদা। ব্যাপারটা তোমরা সম্যক উপ-লব্ধি কর্‌তে না পার্‌লেও, আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি ও আর কিছু নয়, হিন্দুস্থানী 'নাদনা'। যাত্রাটা যেভাবে সুরু করা গিয়েছে, ওর 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হবে, বোধ হচ্চে ওই নাদনার ওপর দিয়েই।"

এত দুঃখেও আমরা হাসলুম। বলা বাহুল্য, আমরা সব দেড়ামাশুলের যাত্রী ছিলুম।

ডাক্তারের দরজা খোলার সঙ্গে ঘরে ঢুক্‌লো এক হিন্দুস্থানী মূর্ত্তি আর তার সঙ্গে তুষারশীতল প্রবল বাতাস। সুনীল লাফিয়ে উঠে বল্লে, "আগে দরজাটা বন্ধ কর্‌কে যা' যা' বক্তব্য বলো বাবা।"

দরজাটা বন্ধ ক'রে এগিয়ে এল, এক জীর্ণবসন পরিহিত হিন্দুস্থানী। মৃদু আলোকে দেখা গেল তার সমস্ত শরীর জলে ভিজে গিয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

কম্পিত হাতখানি আমার দিকে এগিয়ে বেদনার উৎস ঢেলে বল্লে, "কাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি বাবু, কিছু খেতে দিন।"

রেলওয়ে কর্ম্মচারী নয় দেখে সুনীল আগেই অনেক-খানি সাহস সঞ্চয় করেছিল, এখন একেবারে বীরদর্পে সাম্‌নে রুখে দাঁড়িয়ে বল্লে, "বেরোও বল্‌ছি এখান থেকে, বেরোও।"

ভিক্ষুক কাতরভাবে বল্‌লে, "দয়া করুন বাবু। বাইরে বড় ঝড় জল, আমি একপাশে একটু দাঁড়িয়ে থাকব।"

বিনয় 'সুটকেশে'র ভিতর টর্চ্চ লাইটের অনুসন্ধান কর্‌তে কর্‌তে নিষেধের সুরে বল্‌লে, "আঃ, কি কর সুনীল। এই দারুণ বৃষ্টিতে লোকটা বাইরে যাবে? থাক্ না এককোণে দাঁড়িয়ে, ভিক্ষা না হয় নাই দিলে। কাল সকালে আমাদের 'লগেজ'গুলো পিঠে ক'রে তুলে দিলেও ত কিছু দিতে পারি।"

সুনীল প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, "ও রকম 'সেন্টিমেণ্টে' চল্‌লে আখেরে কষ্ট আছে। আমি বল্‌ছি ওই সব ব্যাটারা চোরের ইষ্টি। কাল সকালে ওকে ডেকে আন্‌লেই হবে। এখন স'রে পড় বাবা। কি ডার্টি, বাপ্! ওইগুলোই 'ব্যাক্‌ট্রিয়া কেরিয়ার।' কি বলো ডাক্তার?"

ক্ষণেকের জন্য ভিক্ষুকের চোখ দুটো প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠলো। পরক্ষণে বেশ কাতরভাবে বল্লে, "ক্ষমা কর্‌বেন

আমায়। যে ভুল ক'রে ফেলেছি, তার ত উপায় নেই। সত্যই কাল থেকে আমার পেটে দানাটি পর্য্যন্ত পড়ে নি। তাই আপনাদের ঘরে ঢুক্‌তে দেখে ভিক্ষা চাইতে এসেছিলুম। আজ আমাকে ভিখিরী দেখে চোর বল্‌তে পারলেন যেদিন থেকে ভিক্ষা কর্‌তে সুরু করেছি,আত্মমর্য্যাদা কি জিনিস তা'ত ভুলতেই হয়েছে, তা'তে আমার দুঃখ নেই; কিন্তু বাবু এমন দুর্য্যোগে একটা শিয়াল-কুকুরকেও কি বাইরে তাড়িয়ে দেয়? যাই হোক্, দোষ আমার বাবু, আমার অদৃষ্ট! ভগবান এই হাতখানাই যখন নিলেন, প্রাণটাকেও ত তখন নিতে পার্‌তেন। আমায় পরের দোরে মোট বইবার ক্ষমতাটুকুও তিনি রাখ্‌লেন না। আমি চল্লুম বাবু, আর এখানকার, হাওয়া আমি দূষিত কর্‌ব না।

টর্চ্চের প্রদীপ্ত আলো ভিক্ষুকের বামহস্তহীন দেহটার ওপর প'ড়ে যখন তার দীনতা আমাদের চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট ফুটিয়ে তুল্‌লে, অন্তরটা আমার তখন হাহাকার ক'রে একটা তিক্ত গ্লানিতে ভ'রে গেল।

পিছন ফির্‌তেই ডাক্তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ভিক্ষুকের পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, তোমার নাম বল ত? ভর্ত্তু?"

কম্পিতকণ্ঠে ভিক্ষুক বল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, কিন্তু আমি ত আপনাকে চিন্‌তে পার্‌চি না। আপনি কেমন ক'রে আমায় চিন্‌লেন বাবু?"

ডাক্তার নিকটে একখানা চেয়ারে তাকে বস্‌তে ব'লে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "হাসপাতালের কথা তোমার মনে নেই?"

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ভিক্ষুক বল্লে, "ও! চিনেছি ডাক্তারবাবু, আপনার সদয় যত্ন কি এ জীবনে ভুল্‌তে পার্‌ব!" তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, "হাতটা আমার আর ভাল হ'ল না! এই যে হাতটার খানিক খ'সে গিয়েছে।"

ডাক্তার বিষাদ গম্ভীর-স্বরে বল্লে, "অমন সময়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যাওয়াটা তোমার উচিত হয় নি। আচ্ছা, তুমি ত বেশ যত্নে ছিলে, হঠাৎ অমন পালিয়ে গেলে কেন?" পরে আমার দিকে চেয়ে বল্লে, "সত্যি নরেশ, ও প্রথম দু'দিন 'জেনারেল বেডে' থেকে পরে 'কেবিন' ভাড়া করেছিল।"

মেঘলা দিনের ম্লান জ্যোৎস্নার মত মুখে একটু হাসি টেনে ভিক্ষুক বল্লে, "সে অনেক কথা ডাক্তারবাবু, আমার পারিবারিক অবস্থা আমার কাছে এমন অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল যে, হাতের দারুণ যন্ত্রনাকেও তুচ্ছ ক'রে আমি পালাতে বাধ্য হয়েছিলুম।"

বিনয় একখানা কাপড় আর র‍্যাগটা সাম্‌নে এগিয়ে দিয়ে বল্লে, "শীতে কষ্ট পাচ্চ কেন? কাপড়টা ছেড়ে ফেলে র‍্যাগটা গায়ে জড়িয়ে বসো। বৃষ্টিটা থাম্‌লে তোমার উপায় যা' হোক্ ক'রে দোব আমরা।"

ভর্ত্তু কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ক'রে কি বল্‌তে গেল, কিন্তু স্বরটা তার গলার মধ্যে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। র‍্যাগটা গায়ে জড়িয়ে যখন বস্‌লো—দেখি দু'টী বড় বড় অশ্রু তার চোখের কোণে ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে।

ভর্ত্তু বস্‌লে, ডাক্তার সোৎসাহে বল্লে, "দেখ ভর্ত্তু, তুমি হিন্দিকথা ক'য়ে হিন্দুস্থানীর মত থাক্‌লেও আমার প্রথমদিনই কেমন মনে হয়েছিল তুমি হিন্দুস্থানী নও। আর সেই বাঙালী মহিলার তোমার ওপর যত্ন দেখে আমার সে সময় আরও অনেক কথা মনে হয়েছিল; শুধু অভদ্রতা হয় ব'লে তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করি নি।"

বিনয় বল্লে, "হিন্দুস্থানী ত নয়ই, কথা শুন্‌লে কোন বাঙালী ভদ্রসন্তান বলেই মনে হয়।" পরে উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "মহিলাটী কে ডাক্তার?"

ডাক্তার সন্ত্রস্ত হ'য়ে বল্লে, "আমি ঠিক জানি না ভাই, আর ভর্ত্তুর বল্‌তে যদি কোন বাধা থাকে, ও প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল।"

ভর্ত্তু বিনীতভাবে বল্লে, "না ডাক্তারবাবু, বাধা আমার যা' ছিল, তা' কাটিয়ে উঠেছি। আমার দুঃখের ইতিহাস শুন্‌তে যদি আপনাদের আগ্রহ হ'য়ে থাকে, শুনুন।"

ভর্ত্তু তার করুণ কাহিনী বল্‌তে লাগল। আমরা র‍্যাগ মুড়ি দিয়ে যখন কৌতূহল চরিতার্থ কর্‌তে ব্যস্ত, বাইরে প্রকৃতিদেবীর দাপাদাপি তখনও সমানভাবে চলেছে।

"আমার নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। বাড়ী ছিল বেনারসে। বাবা পৌরহিত্য ক'রে অতিকষ্টে সংসার চালাতেন। প্রায় মাসের শেষে দেখা যেত বাড়ীভাড়া দেবার টাকা আর নেই ; সুতরাং, কতবার যে বাড়ী বদল করতে হয়েছিল, গুণে তা' বল্‌তে পারি না। আমি কোন-রকমে এন্‌ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়েছিলুম ; কিন্তু এখন ভাবি এতদূর পর্য্যন্ত বাপের তাগাদায় না পড়া আমার ছিল ভাল ; অন্ততঃ, বাপকে তা'হ'লে দারুণ দৈন্যে টাকার ভাবনা ভাবতে ভাবতে মরতে হ'ত না। আমার চেয়ে বরং আমার একমাত্র অবিবাহিতা ভগ্নী চোদ্দ বছর বয়সে মারা গিয়ে বাবার বেশী উপকার করেছিল। আমারও যে উপ-কার করেছিল সে, তা' বলা বাহুল্য। বছর চৌদ্দ বয়স থেকে সতের বৎসর বয়সের মধ্যে আবগারি বিভাগের তিনটী লাইন আমার দখলে এল। হিন্দুস্থানী 'লোফার ক্লাসে'র মধ্যে তখনই মারপিঠ বিদ্যায় পারদর্শী ব'লে আমার বেশ নামডাক হয়েছে ; কিন্তু অত গুণের মধ্যেও মা, বাবার আমার অল্পবয়সে বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূর মুখ দেখ-বার সাধ হ'ল। আমারও সে সাধে বাদ সাধবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। বিয়ের ফলে এক বৎসর পরে দেখ্‌লুম, পত্নীর সামান্য যা' দু'-একখানা গহনা ছিল, বিক্রয় ক'রে বেশ দিল-খোলসাভাবে খরচ করতে পারছি। ওই একটা বৎসরের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। বাইরে ইয়ার-মহলে আর ঘরে পত্নীর মোহে আমার দিনগুলো বেশ কেটেছিল। কিন্তু বছরের শেষের দিকটায় বড় কষ্ট পেলুম বাবার মৃত্যু হওয়াতে। লচ্ছুর কাছে কিছু টাকা ধার ক'রে আর তাকে ব্যবসার অংশীদার ক'রে নিয়ে ফলের ব্যবসা সুরু ক'রে দিলুম। মাসের শেষে হিসাব ক'রে দেখ্‌তুম, লাভের পয়সা শেষ হ'য়ে গিয়েছে, লচ্ছুর কাছে নতুন ক'রে ধার করতে হবে। এইভাবে আরও মাস কয়েক কাট্‌ল। ফলে মা গেলেন রাঁধুনি-বৃত্তি করতে, স্ত্রী ঘরে পৈতা কাটা সুরু ক'রে দিলেন—কিন্তু স্বভাবের উচ্ছৃঙ্খলতা আমার এতটুকুও কম্‌ল না। মায়ের ওপর স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে বাড়ী আসা প্রায় বন্ধ করতুম। অত দুঃখেও আমার স্ত্রীর আমার ওপর যত্ন কমে নি।

"আট বৎসর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে, মা যখন শেষশয্যা গ্রহণ করলেন, তখন আমার স্ত্রীকে মায়ের পরি চর্য্যার সঙ্গে তাঁর পদও গ্রহণ করতে হ'ল। এই প্রথম তিনি রাঁধুনি-বৃত্তির জন্য বাড়ীর বাইরে পা দিলেন। মায়ের শেষদিনের দিকে চেয়ে কেমন আমার সংসারে টান হ'ল। কিন্তু উপায়ের নাম নেই, মাথার উপর রাশি-কৃত টাকা তখন দেনা। মাঝে মাঝে মনে হ'ত, চুরি করি। কিন্তু শুন্‌লে বোধ হয় হাস্‌বেন, আমার মত লোকেরও পরস্বহরণ করতে কেমন আভিজাত্যে ঘা লাগ্‌ত—আমি চুরি করতে পারি নি। আর একটা দলের সর্দ্দার হ'য়ে আমি মাথায় মোটও বইতে পারলুম না। বলা বাহুল্য, কাশীতে চাকরী জোটা বোধ হয় আমার সুনামের জন্যই হয় নি।

"যাই হোক্, স্ত্রীর কার্য্যভার লাঘব করবার জন্য দিন-কতক মায়ের শুশ্রূষার ভার নিলুম আমি, আর আমার স্ত্রী সংসারের বাকী কাজটুকু সম্পন্ন ক'রে আমাদের তিনজনের দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থা করতে যেতেন। ওই কয়দিনের মধ্যে দেখেছি, শিবনারায়ণবাবু—যাঁর বাড়ীতে আমার স্ত্রী কাজ করতে যেতেন, প্রায় আমাদের বাড়ীতে আস্‌-তেন। কিছু কিছু অতিরিক্ত টাকাও দিতেন। তাঁর মুখে আমার স্ত্রীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে, স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে মনে কেমন আমার সন্দেহ জাগল। অশান্তির আগুনে অন্তরটা পুড়্‌তে লাগ্‌ল। স্ত্রীকে প্রহার পর্য্যন্ত করেছি ; কিন্তু তার মৌনী স্বভাবের জন্য রাগ আমার আরও বেড়ে যেত। তারপর আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি, তখন থেকে আমার স্ত্রীর ঔদাসীন্য যেন বেড়েই চলেছিল।

"প্রায় দিন পনের হবে মায়ের মৃত্যু হয়েছে। রাত্রি দশটার সময় বাড়ীতে ফিরেছি, আমার শানিত ছুরিকাখানা নিয়ে কেদার ঘাটে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য। দেখি সদরে তালা বন্ধ। স্ত্রী আমার ঘরে নেই। একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য মন আমার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হ'য়ে পড়্‌ল। এমন ক'রে অন্তরের সঙ্গে লড়াই ক'রে আর পারা যায় না। বাড়ীর সাম্‌নে রাস্তার ওপারে একটা পোড়োবাড়ীতে গিয়ে লুকিয়ে থাকলুম। ঘণ্টা-

খানেক বাদে দেখি শিবনারায়ণবাবু, আমাব স্ত্রী, আর একটি কে স্ত্রীলোক, তাঁকে আমি চিন্‌তে পার্‌লুম না, আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাড়ীর সাম্‌নে কি কথাবার্ত্তা হ'ল। পথে যেতে শিব-নারায়ণবাবু বিনীতভাবে বল্লেন, 'আপনাকে আজ বড় কষ্ট দিলুম।'

উত্তরে আমার স্ত্রী হেসে কি বল্লে কিছু বুঝ্‌তে পারলুম না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে দেখি আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ ক'রে সেখানে ব'সে পড়্‌লুম। মাথা দিয়ে তখন আগুন ছুট্‌ছে। উন্মত্তের মত যখন ঘরে ফিরে এলুম, দেখি শরীর আমার অসীম শক্তি সত্ত্বেও অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে।

"টল্‌তে টল্‌তে ঘরের ভিতর ঢুকতে মায়া বল্লে, 'আবার ধরেছ ? মার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, মদ আর ছোঁবে না। প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে ভাত জোটাতে পারচি—মদের খরচ জোটাতে পার্‌ব না।'

"রাগে তখন আমার সর্ব্ব শরীর থরথর ক'রে কাঁপছে। বিদ্রূপ ক'রে বল্লুম, 'কেন তোমার বাবু আছে, ভাবনা কি ? আমায় না হয় একটা ফাউ মনে ক'রেই নিলে।'

"মায়া হঠাৎ প্রদীপ্ত হ'য়ে বল্লে, 'দেখ, বারবার ওকথা নিয়ে তুমি আর আমায় দগ্ধে মের না বারণ ক'রে দিচ্ছি।' তারপর হঠাৎ আকুল হ'য়ে কেঁদে বল্লে, 'কি সুখে যে আমার দিন কাট্‌ছে, তা' ভগবান জানেন ! তার ওপর তুমি যদি অমন কর, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব।'

"তার অভিনয় দেখে ঘৃণায় আমার শরীরের সমস্ত মাংসপেশী সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌ল। শ্লেষের স্বরে বল্লুম, 'মরা তোমার অনেকদিন আগেই উচিত ছিল ; কিন্তু জানি, অত সাহস তোমার হবে না কোনদিন, আমাকেই তার পথ ক'রে দিতে হবে।'

"ঘৃণার দৃষ্টি আমার মুখের ওপর ফেলে, সরোষে মায়া বল্লে, 'হ্যাঁ, ভাত-কাপড় দেবার ক্ষমতা নেই, ওইটাই তুমি পার্‌বে। তাই কর না কেন, আমি ম'রে জুড়িয়ে যাই।'

"ক্রোধে তখন জ্ঞান হারিয়েছিলুম। 'আচ্ছা' ব'লে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে সেই শানিত ছুরিখানা তার গলায় বসিয়ে দিলুম।

"দারুণ চীৎকার ক'রে উঠানে লাফিয়ে প'ড়ে মায়া অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। ছুরি মেরেছি অনেককে, ছুরি মেরে দাঁড়িয়ে থাকি নি কোথাও এক মুহূর্ত্ত ; কিন্তু সেই আমার প্রথম হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকা। আমি এক পাও নড়্‌তে পার্‌লুম না। পরে পুলিসের লোকে মায়াকে নিয়ে গেল দূরে কোন্ হাস-পাতালে, আর আমায় রাখ্‌লে হাজতে। 'মায়া'-হীন হ'য়ে তিনমাস জেলে থাক্‌বার সময় মন আমার প্রতিক্ষণ উন্মুখ হয়েছিল মায়ার সংবাদটা পাবার জন্য।

"তিনমাস পরে শুনলুম, মায়া ভাল হয়েছে। কোর্টে আমার বিচার আরম্ভ হ'ল। সেই ছুরি আর বাড়ীর পাশের লোকগুলো সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌লুম। অন্তরটা আমার অনুশোচনার গ্লানিতে ভ'রে গেল, যখন শুন্‌লুম মায়া 'ষ্টেট্‌মেণ্ট' দিয়েছে যে, সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। একবার মনে হয়েছিল মায়ার কাছ থেকে ভিক্ষা পাওয়া জীবনটা নিয়ে বুঝি তার সাম্‌নে ঘুরতে হবে, কিন্তু শিবনারায়ণবাবুর প্রভূত চেষ্টার ফলে আমার মুক্তির পথ বন্ধ হ'য়ে গেল। বিচারে যখন রায় বার হ'ল ছয় বৎসর আমার সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে, তখন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে আমি জেলে গেলুম।

"ছয় বৎসর পরে বেনারসে ফিরে গিয়ে মায়ার অনেক অনুসন্ধান কর্‌লুম, কোথাও তার সংবাদ পেলুম না। মায়াকে ছুরি মারার পর থেকে দীর্ঘ ছয় বৎসরের অনু-শোচনার আগুন অন্তরটাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে, সেই থেকে আর আমি কোন লোককে আঘাত কর্‌তে পারি নি।

"তারপর দু'বৎসরের কথা হবে। সেদিন শনিবার। চটকল থেকে কাজ ক'রে ফির্‌ছি। তখন আমার মত্ত অবস্থা। একটা মোটর লরি এসে ঘাড়ে পড়্‌ল ; সঙ্গে সঙ্গে আমি অজ্ঞান হ'য়ে গেলুম। ডাক্তারবাবু জানেন আমি জেনারেল বেডে ছিলুম।

"কোলকাতায় আসার পর থেকে আমি ভর্ত্তু নাম নিয়েছিলুম, আর সেই নামেই আমি হাসপাতালে পরি-

চিত। বহুদিন নীচ হিন্দুস্থানীদের সংস্পর্শে থেকে আমার আচার-ব্যবহার সবই তাদের মত হ'য়ে গিয়েছে।

"হাসপাতালে যখন ভজুয়া আর করিমের প্রতীক্ষা করছি, তখন দেখ্‌লুম, একজন বাঙালী ভদ্রলোক আমার খোঁজ নিতে এসেছেন। তাঁর আগ্রহ আর যত্ন দেখে অন্তর আমার কৃতজ্ঞতায় ভ'রে গেল। তাঁর সঙ্গে বাঙলায় কথা বল্‌লে, তিনি বলেছিলেন, 'তুমি ত বেশ বাঙলা বল্‌তে জান।' আমি শুধু মনে মনে হেসেছিলুম।

"পরদিন সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট আমায় হিন্দিতে বল্লেন, 'সেই ভদ্রলোকের বড় ইচ্ছা, তুমি পাঁচ টাকার কেবিনে থাক। খরচা সব তাঁরই, তাঁর বাড়ী থেকেই তোমার খাবার দিয়ে যাবে।'

"আমি বিমূঢ়ের মত তাঁর মুখের দিকে চাইতে ডাক্তার বল্লেন, 'তুমি কি ওই ভদ্রলোকের চাকর নও?'

"আমি কলের পুতুলের মত ঘাড় নাড়্‌লুম, 'না।'

'তুমি তাঁকে চেন না?'

'নেহি বাবুজি।'

"ডাক্তার বল্লেন, 'সেই ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী তোমাকে রেখে গেছেন। আজ এক সপ্তাহের আগাম টাকা দিয়ে রসিদও নিয়ে গেছেন।'

"কেবিনে আছি, প্রবল জ্বর। সেই ভদ্রলোক সস্ত্রীক কেবিনে ঢুক্‌লেন। মহিলাটী আমার পাশে একটী টুলে ব'সে মাথায় হাত বুলুতে লাগ্‌লেন। জ্বরের ঝোঁকে দু'দিন কেটে গেল। একটা আবছায়া স্বপ্নের মত সব মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

"সেদিন বেশ সুস্থ, মনে মনে প্রতিক্ষণ সেই মহাপুরুষ আর তাঁর মহিমময়ী স্ত্রীর প্রতীক্ষা করছি, ঘরে ঢুক্‌লেন মহিলাটি। এবার সে ভদ্রলোক সঙ্গে আসেন নি। ঘরে এসে মহিলাটী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'আজ কেমন আছ ভর্ত্তু?'

"আমি কৃতজ্ঞতায় হাতজোড় ক'রে বল্লুম, 'আজ ভাল আছি·মা, আপনাদের ঋণ—'

কথায় বাধা দিয়ে মহিলাটী বল্লেন, 'থাক্, ও কিছু নয়, ও'সি মানুষের কর্ত্তব্য।'

"নার্শ ঘরে ঢুকে বৈদ্যুতিক আলো জালিয়ে মহিলাটীর উদ্দেশে বল্লে, 'একি! অন্ধকার ঘরে এক কোণে বসে আছেন কেন?'

"মহিলাটীকে দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'ল। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখে মনের মধ্যে কেমন যেন অনেকদিনের কথা এসে তোলপাড় কর্‌তে লাগ্‌ল। মনে মনে তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল আমার বেড়ে গেল।

"নার্শ 'থার্মোমিটার' দিয়ে জ্বর দেখ্‌লে। মহিলা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'এখন কত জ্বর দেখ্‌লেন?'

'আজ জ্বর নেই, ভালই আছেন।'

"পীড়িত লোক কুপথ্য হাতে পেয়ে যেমন ক'রে প্রাণপণ শক্তিতে লোভ দমন ক'রে মনের মধ্যে কষ্ট পায়, নার্শের সামনে আমার কৌতূহল দমনের চেষ্টা তার চেয়েও কষ্টকর হয়েছিল। সেই পরিচিত স্বর, যেন তারই আবছায়া—এ যদি সেই হয়, এ যে আমার এমন ক'রে পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াই ভাল ছিল।

"প্রবল আগ্রহে ঘাড় ফিরিয়ে যা' দেখ্‌লুম, তা'তে আমার সমস্ত শরীরের রক্তটা বুকের ওপর এসে হৃদ্‌পিণ্ডটায় আছাড় খেয়ে পড়্‌ল। মনে হ'ল, এ যেন আমার অজ্ঞান হবার পূর্ব্ব অবস্থা। এ যে সেই। আমারই হাতের কাটা দাগটা এখনও আমার গ্লানি আর তার বিষাক্ত স্মৃতি নিয়ে তার গলার ওপর ব'সে রয়েছে।

"যার এইটুকু পরিচয় মনে বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দিলে, তার আরও পরিচয় পাবার আগ্রহ যে কেমন ক'রে মনকে পাগল ক'রে তুল্‌ল বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। নার্শ ঘর থেকে চ'লে গেলে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, 'আচ্ছা, আপনাকে যেন বড় চেনা বোধ হচ্ছে, আপনার বাড়ী কোথায়?'

"উত্তর পেলুম না। ঘাড় ফেরাতেই দেখি মহিলা হাতে মুখ ঢেকে কান্নারোধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন।

"কিছুক্ষণ পরে সংযত হ'য়ে মহিলা বল্লে, 'আমায় তুমি ক্ষমা কর, আমায় দয়া কর।'

"কি একটা দারুণ যন্ত্রনায় অন্তরটা মুচড়ে উঠে কিছুক্ষণের জন্য আমার বাক্‌শক্তি নষ্ট ক'রে দিলে। পরে একে একে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লুম মায়া এখন ওই ভদ্র-

লোকের রক্ষিতা। মোটর ক'রে আসার পথে দুর্ঘটনা দেখে যখন তাদের মোটরে আমাকে তুলে নেয়, তখনই সে আমায় চিনেছিল। তারই চেষ্টায় আমার সুখ, স্বচ্ছন্দ, কেবিনে থাকা, আর তারই পয়সায় আবার আমার খাওয়া।

"মায়া বল্লে, আগে আমি তাকে মিছে সন্দেহ ক'রেছিলুম। শিবনারায়ণ বাবুর ছেলের ভাতে তাকে রাঁধতে হয়েছিল, সেইজন্য অত দেরী হয়, পথে তারই নিরাপদের জন্য ঝি সঙ্গে ক'রে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন। পরে বল্লে, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কতকষ্টে রাঁধুনি-বৃত্তি করেছে। কিন্তু কেমন ক'রে তার অধঃপতন হ'ল লজ্জায় বলে নি। আবার একবার আমার আশ্রয় পাবার জন্যে সে বড় কান্না কেঁদেছিল। আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলুম, অকপট সত্য বল্লে আমি তাকে আশ্রয় দোব। সে বলেও ছিল সব, কিন্তু চ'লে যাবার পর মনের মধ্যে এমন বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দিলে যে, সে রাত্রে তার প্রদত্ত দুধ বেদানা আর মুখে তুল্‌তে পার্‌লুম না। সারারাত পাগলের মত থেকে, রাত্রি তিনটার সময় অসহ্য জ্বালায় ছট্‌ফট ক'রে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেলুম আড্ডায়। সেখানে আমার যা' কিছু টাকা কড়ি ছিল নিয়ে একেবারে হরিদ্বারে চ'লে এলুম। সেই পর্য্যন্ত হরিদ্বারে আছি। এক সাধু বাবার কাছে থাকি। ভিক্ষে ক'রে নিজে খাই, আর তাঁকে খাওয়াই। এখন আছি শুধু শেষ দিনের দিকে চেয়ে—জানি না পরপারটা কেমন। এ জীবনে শুধু যা' অন্যায় তাই ক'রে গেলুম, আর তার বিনিময়ে কড়া-ক্রান্তি হিসাব ক'রে শাস্তি পেলুম।"

ঘরের নিস্তব্ধতা প্রথমে ভঙ্গ করলে বিনয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, "বুঝ্‌লেন নরেনবাবু, ও বাবাজীর আড্ডায় সুখ নেই। যদি মানুষের মত হ'য়ে শান্তিতে থাক্‌তে' ইচ্ছা করেন, আমি আপনার ভার নিলুম। কোলকাতায় ফিরে চলুন, আমার বাড়ীতে থাক্‌বেন। আপাততঃ আমাদের সঙ্গে মুসুরি পর্য্যন্ত চলুন।"

স-বিষাদস্বরে ভর্ত্তু বল্লে, "আবার কোলকাতা বাবু?"

পরে এমন বিষাদ-করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাস্‌ল যে, তার হাসির চেয়ে কান্নাই ছিল ভাল।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
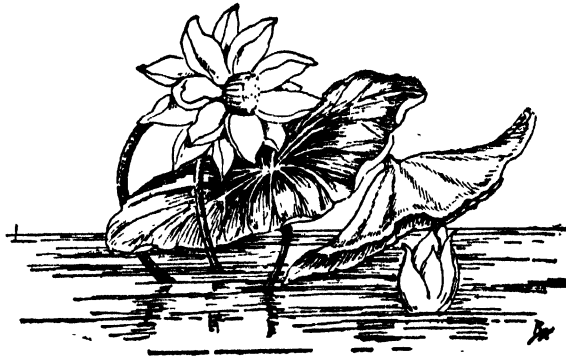
হাওয়া বদল

রায়বাহাদুর শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
ও-বি-ই, বি-এ

দেবেন বড় মানুষের ছেলে। পিতার একমাত্র সন্তান। অল্পবয়সে মাতৃহীন হইয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর আত্মীয়স্বজন আর কেহই ছিল না। দেখিতে সুপুরুষ, হৃদয় উদার এবং চরিত্র নির্ম্মল। বয়স ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, কিন্তু উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে বিবাহ করা হইয়া উঠে নাই। উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশ-ভ্রমণ, পুস্তক পাঠ ও জমিদারী দেখা ভিন্ন আর কিছুই কাজ ছিল না। এবার শীতকালে গয়াতে চেঞ্জে যাইবেন স্থির করিলেন।

ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের নীচে একখানি ছবির মত বাংলা ভাড়া লইয়া গয়ায় উপস্থিত হইলেন। স্থানটী অতি মনোহর ও স্বাস্থ্যকর। সহরের দুর্গন্ধ ও ধূলি এখানে নাই। অদূরে একটি প্রস্রবণ নির্ম্মল জল দিয়া কত লোককে তৃপ্তি দিতেছে।

দেবেনের পার্শ্বেই মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ী। তাঁহার স্বামী বিলাতফেরৎ ডাক্তার ছিলেন। তিনি কন্যা সুষমা ও স্ত্রীকে লইয়া অনেকদিন বিলাতে ছিলেন। গয়াতে জমিদারী ক্রয় করিয়া অবধি ওইখানেই ডাক্তারী করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা ওইস্থানেই রহিয়া গেলেন। স্বামী পরিত্যক্ত সম্পত্তির বেশ আয় ছিল। সুখেই দিনপাত হইত। মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ীর পার্শ্বে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণবাবুর বাড়ী। তিনি অবসর-প্রাপ্ত কেরাণী। একমাত্র সন্তান, কন্যাকে লইয়া এই কুটীরে বাস করেন।

মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ী বিলাতী ধরণে প্রস্তুত ও সজ্জিত। সম্মুখে সুন্দর ফুল বাগান। যুঁই, চামেলী, চাঁপা, বেলা ইত্যাদি দেশী ফুলে ও বিলাতী সাময়িক ফুলে বাগানটি যেন হাসিতেছে। লতা ও ফুলের কুঞ্জবনটীও যেন ব্রহ্মযোনী গিরির শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। কৃষ্ণবাবুর বাড়ীটী সেকালের ঋষিদের কুটীরের মত। নানাপ্রকার ফল ও ফুলের গাছে চারিদিক ঘেরা। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন দালান ও উঠান, যেন চারিদিকে শান্তির ছবি। এই দুইখানি বাড়ী দেখিলেই মনে হয়, একখানি ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের ও অন্যখানি দারিদ্র্যের ও শান্তির ছবি।

মিসেস্ চৌধুরীর কন্যা সুষমা, বিদুষী; হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাশ। রূপ ও যৌবন সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান। চিত্রবিচিত্র বেশবিন্যাসে উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। মাতা ও কন্যা বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে সংলগ্ন বাড়ীতে দেবেনকে দেখিতে পান। এই তিনদিনেই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, দেবেন বড়লোক। 'রোলস্ রয়েস্' মোটর গাড়ী ও ভৃত্যের আড়ম্বরে বুঝিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা প্রতিবেশীর আর্থিক অবস্থা অনেক উচ্চে। দেবেনের সহিত আলাপ করিবার জন্য মিসেস্ চৌধুরী ব্যস্ত হইয়া সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। রূপবান, ধনী, এবং গৃহে অভিভাবকহীন একাকী যুবককে দেখিয়া কোন্ যুবতী কন্যার মাতা স্থির থাকিতে পারেন?

একদিন বৈকালে দেবেনকে বাগানে বেড়াইতে দেখিয়া মিসেস্ চৌধুরী বেড়ার নিকট বেড়াইতে লাগিলেন। যখন উভয়ে পরস্পরের কাছে আসিলেন, তখন মিসেস্ চৌধুরী দেবেনের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। দেবেন আত্মপরিচয় দিলেন ও বলিলেন যে, শীতের তিন মাস গয়াতে থাকিবেন। অবিবাহিত ও সংসারে দেবেনের আর কোন আত্মীয় নাই শুনিয়া মিসেস্ চৌধুরীর আনন্দের সীমা রহিল না। তখনই দেবেনকে বাড়ীতে আসিতে বলিলেন।

দেবেন প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন যে,

বিলাতী সভ্যতার চরম আদর্শে বাড়ীখানি সুসজ্জিত। বিস্তৃত ড্রয়িং রুমে (বৈঠকখানায়) মকমল মণ্ডিত সুবৃহৎ সোফায় বসিয়া মিসেস্ চৌধুরী ও দেবেন উভয় পক্ষের বিস্তারিত পরিচয় লইতে আরম্ভ করিলেন। খানিকক্ষণ পরে মিসেস্ চৌধুরী কন্যাকে ডাকিলেন। সুষমা পার্শ্ব-বর্ত্তী ঘর হইতে আসিলে দুইজনের পরিচয় হইল। সুষমা দেবেনের সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিয়া তাঁহাকে নানাবিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্নে অভিভূত করিতে লাগিলেন। তাঁহার রূপ, বাক্‌চাতুরী, বেশবিন্যাসের পারিপাট্য ও যৌবন দেখিয়া দেবেন মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন। মুখ কথা বলিতেছে, কিন্তু কি কথা বলিতেছে, মন তাহা জানে না। সুষমার গঙ্গাযমুনার মত বেণীদ্বয় একটী পৃষ্ঠদেশে ও একটী বক্ষঃস্থলে পড়িয়াছে। শত বাসনাপূর্ণ চঞ্চল চক্ষুর কি আকর্ষণী শক্তি! রাজহংসের মত উচ্চ শ্বেত গ্রীবা, রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর, শুভ্র বাহুযুগল, সকলই যেন পূর্ণ যৌবনের সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিতেছে। যন্ত্রের মত দেবেন কথা কহিতেছেন, কিন্তু মনে মনে সুষমার রূপের, গুণের ও জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন। খানিকক্ষণ পরে মাতার আদেশানুযায়ী সুষমা পিয়ানো বাজাইয়া গান করিয়া শুনাইলেন। স্বরের কি মাদকতা, কি মিষ্টতা! অনেক রাত্রে দেবেন বিদায় লইয়া গৃহে আসিলেন। সারারাত্রি সুষমার স্বপ্ন দেখিলেন।

মিসেস্ চৌধুরী দেবেনের বন্ধু ও অভিভাবক হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আজ 'বুদ্ধগয়া', কাল 'একতারা জলপ্রপাত', অন্যদিন 'বরাবর গুহা' এই সব দেখাইতে লাগিলেন। দেবেনও শিক্ষিতা সুষমাকে সহচরী পাইয়া ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় মিসেস্ চৌধুরীর বাগান ও লতাকুঞ্জে নবদম্পতীর মত দেবেন ও সুষমা ভ্রমণ ও আলাপে কাটাইতে লাগিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে রোজই দেবেন দেখিতে লাগিলেন যে, পাশের বাড়ীতে একটী বৃদ্ধ কুটীরের দালানে বসিয়া সন্ধ্যার সময় জপ করেন ও একটী মলিনবসনা যুবতী রুক্ষ ও আলুলায়িত কেশে তুলসীতলে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া প্রদীপ দেয়। কৌতূহলবশতঃ সুষমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের প্রতিবেশী কে? সুষমা বলিলেন—"ও এক বুড়ো পেন্সনভোগী কেরাণী আর তার মেয়ে। মেয়ের মা নেই, বুড়োই মানুষ কচ্ছে।" মেয়েটীর সুষমার মত মার্জ্জিত রূপ না থাকিলেও, দেখিতে গৌরাঙ্গী ও সুশ্রী। বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর, সুষমার চেয়ে চার-পাঁচ বৎসর বয়সে ছোট মনে হয়। একদিন সন্ধ্যার সময় দেবেন ও সুষমা যখন কুঞ্জবনে প্রেমালাপ করিতেছিলেন, মেয়েটীকে প্রদীপ হস্তে আসিতে দেখিয়া সুষমা বলিয়া উঠিল—"কি জ্বালা! আমরা যখনই একটু নির্জ্জনে বসি, মেয়েটা অম্‌নি আড়ি পাত্‌তে আসে।" মেয়েটী কিন্তু তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য করে না, অবনতমস্তকে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া চলিয়া যায়। সুষমার মন্তব্যে দেবেনের মনে কষ্ট হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওরা কি খুব গরীব?"

সুষমা—হ্যাঁ, কেরাণী ছিল বৈত নয়।

দে—কাল ওদের বাড়ী যাব। গরীবেরইত খোঁজ নেওয়া উচিত।

সু—ওদের বাড়ী যাবেন, বস্‌বার জায়গাও দিতে পার্‌বে না। গিয়ে কি হবে?

দে—তা' হোক্। বেচারী বুড়ো আমায় রোজ দেখেন, হয়ত গরীবের কোন উপকার কর্‌তে পার্‌ব। কথাগুলি সুষমার ভাল লাগিল না। যাহা হউক, দেবেন পরদিন গরীবের কুটীরে আসিলেন।

কৃষ্ণবাবু তখন দাওয়ায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। দেবেনকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বারান্দায় একখানি সতরঞ্চির উপর বসিতে বলিলেন। কি করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন যেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। বলিলেন—"বাবা! আমরা গরীব, আমাদের ঘরে তোমার যোগ্য স্থান কোথায়? ক'দিন তুমি এসেছ দেখ্‌ছি। ভাবি, গিয়ে জিজ্ঞাসা করি কোনো জিনিষের অভাব হচ্ছে কি না। কিন্তু সাহস হয় না, মনে হয়, তুমি কি মনে কর্‌বে। কোনো জিনিষের অভাব হ'লে বোলো, আমি বাজার-হাট সবই নিজে করি, না হয় তোমারও করে' দেবো।

দেবেন বলিলেন—"ভগবানের চোখে গরীব ও বড়লোক নেই। তিনি ত দু'জনকেই গড়েছেন। সামান্য টাকার জোরে বড় হয় না; মনের জন্যই বড়, ছোট হয়। আপনার মন ত খুব বড়।

কৃষ্ণবাবু—বাবা, আমার স্ত্রী অনেকদিন মারা গেছেন। একটি ছেলে ছিল, অনেক কষ্টে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে এখানে উকীল করে' দিয়েছিলাম, সেও ত হঠাৎ মারা গেল। এখন একটী মাত্র জীবনের সম্বল—মেয়ে তরু। তাকে বোধ হয় দেখেছ—তরু! এদিকে এস।

যুবতী যখন দেবেনের সম্মুখে আসিয়া দেবেনকে প্রণাম করিলেন, তিনি দেখিলেন যেন দেবীপ্রতিমা। মলিন বস্ত্রের মধ্য হইতে রূপ যেন ভস্মাবৃত অগ্নির মত বাহির হইতেছে। শান্ত, স্নিগ্ধ আকর্ণ চক্ষু দু'টী বাসনাশূন্য অন্তরের পবিত্রতার পরিচয় দিতেছে। নিরাভরণা হইলেও যেন কমনীয়তা অলঙ্কারকে ধিক্কার দিতেছে। কৃষ্ণবাবু বলিলেন যে, তিনি নিজে কন্যাকে মোটামুটি ইংরাজী, বাংলা ও অঙ্ক শিক্ষা দিয়াছেন এবং গৃহকর্ম্মে সে পটু। দরিদ্র বলিয়া উপযুক্ত পাত্রে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। কি করিয়া কন্যার বিবাহ দিবেন এই ভাবনায় তাঁহার আহার ও নিদ্রা হয় না। এই বলিয়া বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দেবেনের মনে কষ্ট হইল। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, মেয়ের বিয়ের সময় আমায় খবর দিবেন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিব। বৃদ্ধ ইংরাজীমতে ধন্যবাদ দিতে পারিলেন না, শুধু বলিলেন—"বাবা! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" দেবেন কৃষ্ণবাবুর নিকট বিদায় লইলেন। পথে দেখিলেন, বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সুষমা তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। তিনি যেন দেখিতে পান নাই এই ভাণ করিয়া বাসায় ফিরিয়া সন্ধ্যাহ্নিকে বসিলেন।

খানিকক্ষণ পরে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল—"মেমসাহেব আয়া।" দেবেন তাঁহাকে বসিতে দিতে বলিলেন। সুষমা কিন্তু বসিতে পারিলেন না। মানসিক উত্তেজনায় বাগানে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তরুকে দেখিয়া দেবেন মোহিত হইয়াছেন কিনা এই জানিবার জন্য ব্যস্ত! খানিকক্ষণ পরে দেবেন আসিলে বলিলেন—"বাবা! পুজো আর হয় না। ভেবেছিলাম, লেখাপড়া শিখে ওসব ত্যাগ করেছেন। বাহিরে ত বেশ সাহেব, আবার ঘরে এসে ভট্‌চায্যি বামুন।" দেবেন হাসিয়া বলিলেন—"লেখাপড়া শিখেছি বলে' কি ধর্ম্ম ছেড়ে দোবো? কেন সাহেবরাও ত গির্জ্জায় যায়।"

সু—থাক্ ও সব ধর্ম্মের কথা। তরুর বাড়ী গিয়ে যে ওঠ্‌বার নামটি নেই। একেবারে প্রথম দৃষ্টিতেই পরাজয় নাকি?

দে—পরাজয় হয়েছিল তোমায় প্রথম দেখে। তরুকেত তুলসীতলায় ক'দিনই দেখ্‌ছি। আর ও গরীবের মেয়ে, ওর কি চাঁদ ধরবার আকাঙ্ক্ষা আছে?

সু—তবু ভাল। মজে যান্ নি এই ঢের। ও সব মেয়ে পালিস কর্‌তে সারাজীবন যাবে।

দে—তা' হ'তে পারে, কিন্তু জানত হীরাও অনেক কেটে পালিস কর্‌তে হয়। তবেত তার দাম হয়। যাক্ ও সব কথা, এখন এস বাগানে বেড়ান যাক্।

দুইজনে চন্দ্রালোকে বেড়াইতে বেড়াইতে ভবিষ্যৎ জীবনের আলোচনা করিতে লাগিলেন। দেবেন তখনও লক্ষ্যহীন, কিন্তু সুষমার লক্ষ্য স্থির। ভাবিলেন, দেবেনই তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা।

* * *

রাত্রে বিছানায় শুইয়া দেবেন দুইটী নারী চরিত্রের তুলনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, সুষমা হয়ত আদর্শ শিক্ষিতা স্ত্রী হইবেন। বন্ধুবান্ধবদের আদর-আপ্যায়িত করিতে পারিবেন। জ্ঞানে ও আমোদে তাঁহার উপযুক্ত সহচরী হইবেন। কিন্তু দরিদ্র কৃষ্ণবাবুর উপর কটাক্ষে সুষমার চরিত্রের উদারতা নাই মনে হয়। হয়ত তাহা তরুর উপর হিংসার জন্য। পাছে তরু দেবেনের হৃদয় জয় করে। কিন্তু তরুর চন্দ্র কিরণের মত স্নিগ্ধ রূপ, কামনাশূন্য চক্ষু, ধর্ম্মে আস্থা, পিতৃভক্তি, গৃহকর্ম্মে পটুতা, পবিত্র চিত্ত এই সকল গুণও উপেক্ষার নয়। হয়ত তাঁহাকে শিক্ষা

দিয়া উপযুক্ত সহচরী করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু গরীব কেরাণীর কন্যাকে বিবাহ করিলে তাঁহার বন্ধুবর্গ কি বলিবে? ধনীসমাজে তরুর স্থান কোথায়?

* * *

একদিন সন্ধ্যাকালে 'কাটারি পাহাড়ে'র উপর সুষমা ও দেবেন বসিয়া আছেন। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে অস্তাচলে যাইতেছেন। তাঁহার কিরণের রক্তিম আভায় সুষমার মুখমণ্ডল উজ্জলতর হইয়াছে। সন্ধ্যার পর চন্দ্রালোকে যেন সুষমাকে রজতমূর্ত্তির মত দেখাইতে লাগিল। অনেক আলাপের পর সুষমা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কত দিন একলা থাকবেন?"

দেবেন—যতদিন তুমি থাক্‌তে দেবে।

সু—আমি ত আর থাক্‌তে দেব না।

দে—কই, একথাত আগে বল নি। তুমি কি আমায় বিয়ে করে' সুখী হবে?

সু—নিশ্চয়ই, এই তু'মাসত সুখী হয়েছি। এবার চিরকালের জন্যে সুখী হ'তে চাই।

দেবেন সুষমাকে বাহুবদ্ধ করিয়া প্রেমচুম্বন দিলেন। ঠিক্ সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা পেচক কর্কশ-কণ্ঠে ডাকিয়া উড়িয়া গেল। দেবেন ভাবিলেন, অলক্ষণ।

* * *

আজ মিসেস্ চৌধুরী খুব বড় একটী চা পার্টি দিতেছেন। অনেক ভদ্রলোক ও মহিলা আসিয়াছেন। দেবেনকে সকলের কাছে পরিচয় করিয়া দিলেন। ভোজের পর সুষমা পিয়ানো বাজাইয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। সভাভঙ্গের কিছু পূর্ব্বে মিসেস্ চৌধুরী জানাইয়া দিলেন যে, দেবেন তাঁহার জামাতা হইবেন। রূপ জ্ঞান ও অর্থবান পাত্রের সহিত রূপবতী ও শিক্ষিতা সুষমার বিবাহ হইবে, ইহাতে সকলেই আনন্দিত হইলেন। ভাবী দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অতিথিরা চলিয়া গেলেন। কিন্তু অনেক রাত্রি হইলে দেবেন সুষমাদের বাড়ী হইতে ফিরিলেন। সারারাত্রি সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে দেবেনের শরীর তেমন ভাল মনে হইল না। মাথায় তীব্র যাতনা ও জ্বরের মত মনে হইল। সুষমাও তাঁহার মাতা আসিয়া বলিলেন যে, উহা রাত্রি জাগরণের ফল, কোন ভয় নাই। দিবানিদ্রায় সারিয়া যাইবে। বৈকালে কিন্তু মাথার যন্ত্রণা ও জ্বর বাড়িয়াই উঠিল। রোগী অস্থির হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার আনা হইল। তিনি ঔষধ দিয়া মাথায় বরফের ব্যবস্থা করিলেন। সুষমা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রোগীর মস্তকে বরফ দিতে লাগিলেন। যখন মনে হইল রোগী ঘুমাই-য়াছে, তখন বাড়ী চলিয়া গেলেন।

* * *

আজ অনেকদিন পরে দেবেনের জ্ঞানের প্রথম সঞ্চার হইয়াছে। মনে হইল, সুষমার কোমল হস্ত তাঁহার মাথার উপর রহিয়াছে। বুঝিতে চেষ্টা করিলেন কেন শুইয়া আছেন, তাঁহার কি হইয়াছে? খানিকক্ষণ চিন্তার পর মনে হইল, তাঁহার অসুখ হইয়াছে। ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন—"সুষমা।" ভাবিলেন, সুষমা সেবা করিতেছে। আবার তন্দ্রার মত ঘোর আসিল, জ্ঞানহারা হইলেন। পরদিন আবার যখন পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞান হইল, তখন বুঝিলেন যে, সেই নারীর কোমল হস্তের স্পর্শ। আবার ডাকিলেন—"সুষমা।" নারী বলিল—"আপনি কথা কবেন না। কথা কইলে অসুখ বাড়্‌বে।" দেবেন বলিলেন—"সুষমা! তুমি স্বর্গের দেবী, না জানি কত সেবা করেছ।" নারী বলি-লেন—"ডাক্তারবাবুর মানা, কথা বল্‌বেন না, সেরে উঠে ধন্যবাদ দেবেন।" দেবেন অতিকষ্টে প্রাণের আবেগে নারীর হস্তটি শিরোদেশ হইতে সম্মুখে আনিতে সেবিকাও শয্যাপার্শ্বে আসিলেন। জড়িতস্বরে "সুষমা" বলিতে বলিতে চক্ষু অল্প বিস্ফারিত করিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কোথায় তাঁহার দেবী সুষমা? এ যে দরিদ্রা তরু! উত্তেজনায় আবার সংজ্ঞাহীন হইলেন।

*   *   *   *

অনেক পরিচর্য্যার পর বৈকালে যখন পূর্ণজ্ঞান হইল, দেবেন চাহিয়া দেখিলেন যে, ডাক্তারবাবু, কৃষ্ণবাবু ও তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য পাঁড়েজী তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। ডাক্তারবাবুকে দেবেন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কি হইয়াছিল? ডাক্তার—"আপনার 'মেনিন্‌জাইটিস্' (মস্তিষ্কের স্ফীতি) হয়েছিল, বাঁচবার কোন আশাই ছিল না, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁর মেয়ের অক্লান্ত সেবায় বেঁচে গেলেন।"

পাঁড়েজী বলিল—"আরে বাবু! এ লেড়্‌কী ত দেবী, রাতদিন তুম্‌হাকে সেবা করেছে, ঘুমাই না, খায় না: আর যখন ডাক্তার বাবু কহেছেন যে, তুম্‌হি জীবে না, তখন লেড়্‌কী কত দেওতা ডেকে কেঁদেছে।"

দেবেন অশ্রুপূর্ণনেত্রে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুষমা কই?" ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তাঁরা যেদিন শুন্‌লেন যে, আপনার সংক্রামক মেনিন্‌জাইটিস্ হয়েছে, সেইদিনই গয়া থেকে চলে' গেছেন।" কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে দেবেনের প্রবৃত্তি হইল না।

*   *   *

ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিবার পর দেবেন দেশে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণবাবু ও তরু তাঁহার আসন্ন বিদায়ের জন্য দুঃখিত হইলেন। গয়া ছাড়িবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে দেবেন কৃষ্ণবাবুর কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তিনজনেই কাঁদিতে লাগিলেন। তরুকে বলিলেন—"তরু, তুমিই স্বর্গের দেবী। ভুলে সুষমাকে তোমার স্থান দিয়েছিলাম। আমার বাড়ীতে তোমার মত দেবী প্রতিষ্ঠা কর্‌ব। তোমায় ছাড়া আর কাউকেও হৃদয়-আসনে বসাব না।"

তরু বলিল - আপনার সেবা করে' নারীজন্ম সার্থক করেছি, আপনার স্ত্রী হবার আমার যোগ্যতা কি? আশাও করি নি। তবে যেন দাসী বলে' চিরকাল মনে রাখেন, এই আমার একমাত্র ভিক্ষা। এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তরু বসিয়া পড়িল। দেবেন তাহার কোমল হস্ত দু'টী ধরিয়া বলিলেন—"পাঁড়েজীর কাছে সব শুনেছি। চল, আমার মোটর দাঁড়িয়ে আছে। তোমার জিনিষ-পত্র আমার চাকরেরা পরে গুছিয়ে নিয়ে যাবে।"

কৃষ্ণবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমি আপনাদের সেবা ও যত্নের উপযুক্ত প্রতিদান আর কি দেব, আমি আজ ভিখারী, এই দেবীকে ভিক্ষা চাই। আর আমার অভিভাবক নাই। আপনি আমাদের দু'জনেরই অভিভাবক হবেন। চলুন, আর দেরী কর্‌বেন না।" দেবেনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পুরাতনের পরিচয়

"পরকীয়া"

বিপিনচন্দ্র পাল

সেও এই রকমই শরৎকাল। দেবী-পক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। আমি প্রয়াগে গুরুদেবের আশ্রমে তিন বৎসারান্তে তিন মাসের ছুটী লইয়া গিয়াছিলাম। আশ্রমটি একেবারে গঙ্গার উপরে। বর্ষা সে বারে দেরিতে হয়। গঙ্গা কূলে কূলে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, জ্যোৎস্না না ফুটিলেও নক্ষত্রালোকে রাত্রি উজ্জ্বল হইয়া আছে।

আমাদের নিয়ম ছিল, সন্ধ্যা আরতির পর, আহারান্তে সকলে দশটা না বাজিতেই ঘুমাইয়া পড়িতাম। গুরুদেব জিতনিদ্র; শয্যা পাতিয়া ঘুমাইতেন না! আসনে বসিয়াই সারারাত কাটাইতেন। তিনটা বাজিতে না বাজিতে আমরা সকলে উঠিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, তাঁর নিকটে যাইয়া বসিতাম। কখনও কথাবার্ত্তা হইত, কখনও সঙ্গীত হইত, অধিকাংশ সময়ই নীরবে যে যার আসনে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করিতেন।

আমি ঘরে ঢুকিবার সময় দেখিলাম আমার গুরু-ভাই—শা সাহেব আনমনে বাহিরে যাইতেছেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কি জানিতাম না। ইনি জাতিতে মুসলমান। গুরুদেবের কৃপা পাইয়া, বহুদিন তাঁহারই নিকটে ছিলেন। আমরা তাঁহাকে শা সাহেব বলিয়াই ডাকিতাম। কেহ কেহ বা হরিদাসও বলিতেন। গুরুভাইদের মধ্যে গোঁড়া ব্রাহ্মণও দু'চার জন ছিলেন। তাঁরা শা সাহেবকে লইয়া খাওয়াদাওয়া করিতে রাজি ছিলেন না। এই জন্য প্রথম হইতেই গুরুদেব ইঁহাকে নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেন। গুরুদেবের আসনের নিকটেই শা সাহেব দিন রাত শুইয়া, বসিয়া, কাটাইতেন। গুরুদেবের আশ্রমে ভোজনাগারে যে যার জাত রাখিয়া চলিতেন; ভজনক্ষেত্রে কোনও জাতবর্ণের বিচার ছিল না। গুরুদেব কহিতেন সাধন-ধর্ম্মে—

> লোকের মধ্যে লোকাচার,
> সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার—

ইহাই এ কথার সত্য অর্থ।

দুই

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় শা সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গুরুদেব কহিলেন—"সে স্ত্রীলোকটিকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

শা সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। মুখে কথা সরিল না। আমরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। শা সাহেবের ব্রত কি তবে ভঙ্গ হইয়াছে? আমাদের সাধনে বেশী কিছু ধরা বাঁধা ছিল না। গুরুদেবের বিধি ছিল তিনটি—

(১) নিত্য তিন বেলা নাম জপ করিবে।

(২) প্রাতঃ-সন্ধ্যা অন্ততঃ পঁচিশ মিনিট করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

(৩) সর্ব্বদা সাধু-সেবা করিবে।

সাধু কারা? এই প্রশ্ন তুলিয়া গুরুদেব কহিতেন যাদেরে দেখা মাত্র অন্তরে ভগবদ্ভাব আপনা হইতে জাগিয়া উঠে, তাঁরাই প্রকৃত সাধু। এখানে আর কোনও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নাই।

গুরুদেবের সাধনে নিষেধও ছিল তিনটি—

(১) পরস্ত্রীর মুখ দেখিবে না।

(২) সুরাপান করিবে না।

(৩) পরনিন্দা করিবে না।

এই নিষেধবাক্য মনে করিয়াই গুরুদেব যখন এই গভীর রাত্রে শা সাহেবের নিকটে অপরিচিতা স্ত্রীলোকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। শা সাহেবের মতন নিষ্ঠাবান সাধক আমাদের ভজন-গোষ্ঠীতে আর কেউ ছিলেন না।

শা সাহেব কহিলেন—"প্রভো! আমি এত ভঙ্গ করি নাই, তার মুখ দেখি নাই।"

গুরুদেব—"সে কথা জানি। তুমি ত গুরুর কৃপায় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, ইহা কি আমার জানা নাই? কিন্তু সে বেচারিকে কোথায় ফেলিয়া আসিলে?"

শা সাহেব—"সে আপনার পথে আপনি চলিয়া গিয়াছে।"

গুরুদেব—"সব ঘটনাটা খুলিয়া বল। দেখ্‌ছ না, এঁরা সকলে শুন্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।"

শা সাহেব ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন—

"প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ—আপনার অগোচর ত কিছুই নাই। তবু আপনি যখন হুকুম কল্লেন, তখন সব খুলেই বল্‌ছি। আমি ত আপনার পায়ের কাছেই বসে-ছিলাম। হঠাৎ প্রাণটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। মনে হলো কে যেন ঘোর বিপদে পড়ে কাকে ডাকছে। আমি সে ডাকে অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। আমার প্রাণের ভিতরেও কে যেন বার বার বল্‌তে লাগ্‌ল—জল্‌দি যাও, জল্‌দি যাও—নইলে স্ত্রীহত্যার পাতকী হবে। তাই আমি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে, যন্ত্রারূঢ়ের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। সোজা একেবারে গঙ্গার ঘাটে গেলাম। গঙ্গা প্রবলতরঙ্গে কূল ছাপাইয়া ছুটিয়াছে। ঘাট নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। কিন্তু সাম্‌নে কে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। একটা কলসীতে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি নিজের গলায় বাঁধিয়াছে। আর বুক জলে নামিয়া সেই কলসীতে জল ভরিতেছে। দেখিয়া আমি লাফাইয়া পড়িয়া তাহার হাত ধরিলাম।" সে বলিল—তুমি কে?

আমি—তুমি কে? আত্মহত্যা কচ্ছ কেন? জান না এ বড় পাপ?

সে—পাপের জ্বালা জুড়াইতেই মর্‌তে এসেছি। আমায় আট্‌কাইও না।

আমি—পাপের জ্বালাটা কোথায়? শরীরে না মনে?

সে—শরীর মন দুইই জ্বলে যাচ্ছে।

আমি—ঐ জ্বালাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। মর্‌তে গিয়ে প্রায়শ্চিত্তের ব্যাঘাত দিচ্ছ—দেখ্‌ছ না?

সে—অত শত বুঝি না। আমায় মরতে দাও। মরা ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই।

আমি—মরলেই কি জ্বালা যাবে? পাপের জ্বালা ত স্মৃতির জ্বালা। মরলে কি পাপের কথা ভুলে যাবে? একথা তোমায় কে বল্লে?

সে—সে কি কথা? সব ভুলব, সংসার আঁধার হবে, কাউকে দেখ্‌ব না, কারো কথা শুন্‌ব না—আর কেবল পাপের কথাই মনে থাক্‌বে? এই কি সম্ভব?

আমি—সাধু-শাস্ত্রে ত তাই বলেন। মরণে সব নষ্ট হয়, কিন্তু স্মৃতি নষ্ট হয় না। ঐ পাপের স্মৃতিই মরণের পরেও মানুষকে পুড়াইয়া মারে। এখানে তবু পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। যে আত্মহত্যা করে, তার এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

সে—তবে আমি যাই কোথায়?

আমি—ঘরে ফিরে যাও।

সে—ঘর নাই।

আমি—আপনার জন যেখানে আছে, সেখানে ফিরিয়া যাও।

সে—আমার কেউ নেই। যারা আছে তারা মুখ দেখ্‌বে না। তাদের মুখ দেখাতে পারব না। কোথা যাব? কোথা গেলে সব ভুল্‌ব?

আমি—চল, আমি তোমাকে এমন জায়গায় রেখে আসি—যেখানে কেউ তোমাকে চিনে না, যাদের কাছে থাক্‌লে, কেউ তোমার খোঁজখবর পাবে না। সে'ও মরার মতনই হবে। চল, আমি তোমাকে তাদের কাছে রেখে আসি।

এই কথা শুনে সে আমার সঙ্গে জল হতে উঠে চল্‌ল।

আমি নিকটের মস্‌জিদের মৌলবীর কাছে তাহাকে লইয়া গেলাম। মৌলবী আমার বাল্যবন্ধু। তাঁকে সকল ঘটনা বল্‌লাম। তিনি বল্‌লেন—বেশ। আমার এখানে আশ্রয় পাবে। তখন আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে ডেকে বল্‌লাম—মা তুমি এঁর কাছে থাক। ইনি তোমাকে নিজের মেয়ের মতন রাখ্‌বেন।

অতক্ষণ তার বাহ্যজ্ঞান ছিল না বল্লেই হয়। পুতুলের মতন আমার পেছনে পেছনে এসে, মস্‌জিদের দাবায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল। আমার কথায় যেন তার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। খানিকটা এদিক ওদিক চেয়ে, আমার বন্ধুটিকে দেখে—চম্‌কে উঠে বল্লে—"এ যে মুসলমান।"

আমি—ইনি আমার বন্ধু—তুমি নিরাপদে, আদরে মেয়ের মতন ইঁহার কাছে থাকবে।

সে—আমি যে বামুনের মেয়ে। মুসলমানের ঘরে থাকব কি করে?

আমি—জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলে, সে স্থান কি এর চাইতে ভাল?

সে—সে যে গঙ্গা—পতিতপাবনী। গঙ্গায় ডুব্‌লে পাপ ধুয়ে যে'ত। আমার সাহসে কুলাইল না। ভেব না বুড়া, তোমার কথায় ফিরে এসেছি, প্রাণের মায়া ছাড়তে পার্‌লাম না—আর···। না আমি চল্‌লাম। জাত ধর্ম্ম খুয়াতে পারব না।

এই বলিয়া সে ফিরিয়া চলিল। আমার বন্ধুটি সহজেই চটিয়া যান। ইহার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'রোখ্‌—হারামজাদি। ইঁহাসে জানে নেই সেকেগী।' এই বলিয়া গেট বন্ধ করিয়া, পথ আট্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন।

সে বলিল—যে মরতে যাচ্ছে, তুমি তাকে কি ভয় দেখাও?

মৌলবী—মরতে পারবে না। ভাল ভাবে থাকৃতে চাও—অন্দরে যাও। নইলে বান্দি কুত্তির মতন বেঁধে রাখব।

সে তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে দেউড়ীর দরজার দিকে চল্‌ল। মৌলবী তখন তার হাত ধর্‌তে গেলেন।

সে-খবরদার সাহেব। আমায় ছুঁইও না।

মৌলবী—খবরদার কাকে বল্‌ছ জান না—এই বলিয়া তাহাকে ধরিতে হাত বাড়াইলেন। চক্ষের পলকে ... নারী তখন তীক্ষ্ণ ছুরি বাহির করিয়া বলিল—"সাহেব, স্ত্রীলোক যখন গভীর নিশাকালে জলে ডুব্‌তে যায়—তখন সে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেই বাহির হয়। তোমার মতন দস্যু পথে ঘাটে থাকৃতে পারে সে জানে। সাবধান—আর এক পা এগোবে তো এই ছুরিতে প্রাণ হারাবে।

মৌলবী থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আমি এগিয়ে বলিলাম—ছেড়ে দিন। জোর জবরদস্তি করে রাখা যাবে না। তখন তিনি "কাফের, বান্দি, কুত্তি—জাহান্নমে যাবি যা", এই বলিয়া দরজা খুলিয়া, তাহাকে লাথি মারিয়া বাহির করিয়া দিলেন।

গুরুদেব—তার পর?

শা সাহেব—তার পর তার কি হ'ল জানি না। হয়ত সে আবার গঙ্গায় ডুব্‌তে গেছে।

গুরুদেব—শা সাহেব এখনও চিত্ত নির্ম্মল হয় নি যে। এখনও বুঝলে না আমরা যেখানের যাত্রী সেখানে—

টুটে যায় সব ধন্ধা
য়হা রাম রহিম এক বান্দা
কাফেরে মুসল্‌মানা।

আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন—এদের কেউ যদি কোনও মুসলমান স্ত্রীলোককে এ অবস্থায় পেত, হিন্দুর ঠাকুর বাড়ীতে নিয়ে যেত না—মুসলমানের আশ্রয়েই রেখে আস্‌ত। শা সাহেব, এখনও তুমি হিন্দু মুসলমানে ভেদ কর?

শা সাহেব—আপনি অন্তর্যামী। আমি যে মুসলমান একথা ভুলতে পাচ্ছি না।

গুরুদেব—ভুলতে কে বলে? আমি যে হিন্দু, তাই কি ভুলেছি, না ভুল্‌তে পারি, বা ভুল্‌তে চাই? তবে শ্রীগুরুর এই শিক্ষা—হিন্দু বলে আমি মুসলমানের চাইতে বড়—

এ অভিমান করব না। যিনি জগতের মালিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁরই সৃষ্টি। সবারই ভিতরে তিনি আছেন। আর হিন্দু, হিন্দুর পথে, মুসলমান মুসলমানের পথে তাঁরই কাছে যাবে। তাঁকেই পাবে। তাঁর চরণে সকলেই দাস হয়ে থাকবে। এইটি মনে করে রাখবার জন্যই ত আমাদের ভজন গোষ্ঠীতে আমরা হরি নামও করি, আল্লা নামও করি।

পাশের ঘরে এক সাধক তখন গান ধরিয়াছেন—

"হরিসে লাগি রহরে ভাই।"

এই গান শেষ হইলেই গুরুদেব গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন :—

"হরদমে আল্লার নাম লইও।"

তখন শা সাহেবও তাঁর সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন—

"দমে দমে লইওরে ভাই, দমে দমে লইও।"

আমরা তখন সকলে মিলিয়া এই হিন্দু সাধুর আশ্রমকে, পবিত্র আল্লা-নামে মুখরিত করিয়া তুলিলাম।

প্রভাতের আলো ফুটিতে ফুটিতে আর সকলে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমার মনটা কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটির ভাবনায় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সকলে চলিয়া গেলে, গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই অভাগিনীর শেষ দশা কি হইল?"

গুরুদেব কহিলেন—"তাঁর জন্য কোনও ভাবনার কারণ নাই। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী তাঁহাকে গঙ্গার ঘাট হইতে আবার ফিরাইয়া আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছেন।"

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আমাদের সাধনেরই লোক। বয়স্থা ব্রাহ্মণ বিধবা। তাঁর একটিমাত্র পুত্র ছিল। একই সঙ্গে ঠাকুর তাঁহার পতি পুত্র দুইকেই কাড়িয়া লইয়া যান। সেই সময়েই এই পতিবিয়োগবিধুরা ও পুত্রশোকাতুরা ব্রাহ্মণ কন্যা গুরুদেবের আশ্রয় লাভ করেন। সে আজ চল্লিশ বৎসরের কথা। দশপনেরো বছর হইতে ইনি এই আশ্রমেই আসিয়া বাস করিতেছেন। আরও দুচারিজন গুরুভগিনীও তাঁর সঙ্গে থাকেন। আশ্রমের আহারাদির ব্যবস্থা ইঁহাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। এই অসহায়া রমণী অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর আশ্রয় পাইয়াছেন শুনিয়া আমার ভাবনা দূর হইল।

গুরুদেব কহিলেন—কথাটা যেন বাহির না হয়। মেয়েরা ইঁহার ইতিহাস কিছুই জানেন না। যে স্ত্রীলোকটির কথা শা সাহেব কহিলেন, তিনি যে এই আশ্রমেই আসিয়া উঠিয়াছেন, তুমি ছাড়া আর কেহই একথা জানে না। তোমাকে আর একটা কথাও বলিয়া রাখি। ইঁহার পিতামাতা তোমাদের সাধনেরই লোক ছিলেন। সে সম্পর্কে ইনি আমাদের পরিবারভুক্ত বটে।

তিন

দিন চার পাঁচ পরে আমি প্রথমে ইঁহাকে দেখিলাম। সেই দিন প্রাতঃকালে গুরুদেবের নিকটে ইঁহার দীক্ষা হয়। সেই সঙ্গে আরও দুই তিনটি মহিলা দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গুরুদেবের আশ্রমে নিয়ম ছিল যে, কোনও নূতন লোক দীক্ষা লইতে আসিলে, গুরুদেব তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলে, দীক্ষাকালে আমাদের ভজন গোষ্ঠীর একটা সঙ্গত হইত। গুরুদেব যাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে ডাকিতেন, তাঁরাই এই সঙ্গতে উপস্থিত থাকিতেন। এই দিনেও গুরুদেব আমাদের পাঁচ সাত জনকে দীক্ষাকালে উপস্থিত থাকিতে বলেন। দীক্ষার অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনও কিছুর বাহুল্য ছিল না। দীক্ষার্থীরা স্নানান্তে নিজেদের সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি করিয়া গুরুদেবের নিকটে উপস্থিত হইতেন। প্রথমে দু'চারিটি ভজন হইত। তারপর গুরুদেব ইঁহাদিগকে তাঁহাদের ইষ্টনাম দান করিতেন। এবং শক্তি সঞ্চার করিয়া, কি করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেন। সেই সময়ে শিষ্যেরা সকলে প্রাণায়ামের সঙ্গে নিজ নিজ নাম জপ করিত। এই দিনও আমরা সকলে উপস্থিত হইলে এইরূপেই নতুন দীক্ষা-প্রার্থিনীদের দীক্ষা হইল।

নাম দিবার পূর্ব্বে গুরুদেব দীক্ষার্থিনীদের জনে জনের নাম করিয়া ভজন গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তখন শুনিলাম ইঁহার নাম হৈমবতী।

নাম পাইয়াই হৈমবতী কাঁপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান

হইয়া গেলেন। একটি মহিলা ইঁহার অবস্থা দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার মুখে জল ছিটাইতে গেলেন।

গুরুদেব ইঙ্গিত করিলেন, ইঁহাকে কেহ যেন স্পর্শ না করে। কহিলেন, শ্রীগুরুর নাম ইঁহার ভিতরে যে কাজ করিতে চাহে করুক, তাহার ব্যাঘাত জন্মাইও না। আমাদিগকে ভজন গাহিতে কহিলেন। আমরা দু'তিনটি ভজন গাহিলাম। কিন্তু হৈমবতীর বাহ্য চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না। তখন গুরুদেব নিজে ভাবাবেশে গাহিতে লাগিলেন,

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এই নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় তিনচার ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এদিন ভজনের যেমন জমাট হইয়াছিল, বহুদিন এমন জমাট দেখি নাই। যেমন হৈমবতীর, সেইরূপ গুরুদেবেরও বাহ্য লোপ পাইয়াছিল। গুরুদেব 'বোল্, বোল,' বলিয়া চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

বলিয়া প্রাণমন ঢালিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আর হৈ বতী নিশ্চল, নিস্পন্দ হইয়া প্রায় মৃতের মতন সেখানে পড়িয়া রহিলেন। গুরুভাইদের দশা অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু এমত দশা আর কখনও দেখি নাই। আমাদের কারও কারও প্রাণে ভয় হইল, বুঝি বা এই রমণী মহাপ্রয়াণ করিয়াছে। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী একটু তুলা আনিয়া তাঁর নাসিকাগ্রে ধরিয়া শ্বাস বহিতেছে কি না দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ গুরুদেব বাহ্য লাভ করিয়া আমাদের আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন,—তোমরা ভয় পেয়েছ কেন? সাধকের সমাধি কি কখনও দেখ নাই? নাম কর, উচ্চৈঃস্বরে নাম কর। সমাধি ভাঙ্গিবে, বাহ্যজ্ঞান আবার ফিরিয়া আসিবে। এই বলিয়া তিনি হৈমবতীর কাণের কাছে মুখ দিয়া, আবার ধ্যানস্থ হইয়া,—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥—কহিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহার বাহ্য, চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। হৈমবতী চোক খুলিয়া চাহিলেন কিন্তু সে দৃষ্টি আমাদের কাছে অর্থহীন বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যখন পূর্ণ বাহ্য হইল, তখন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া সসঙ্কোচে উঠিয়া বসিলেন। তখনও দেহ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে; স্বেদ জলে কাপড় ভিজিয়া অঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে। গুরুদেব তখন কহিলেন, যাও মা, একটু সুস্থ হইয়া আহারাদি করগে।

চার

দীক্ষা শেষ হইয়া গেলে গুরুভাইরা এসে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওই করিতে লাগিলেন। এই আগন্তুক রমণী কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। আমি শা সাহেবের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, শা সাহেব ইঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। দেখিয়া গুরুদেবকে মনে মনে প্রণাম করিলাম। আমাদের কুতূহল দেখিয়া গুরুদেব কহিলেন,—তোমাদের নিকট অপরিচিত হইলেও, বহুদিন হইতেই আমি ইঁহাকে জানি। ইঁহার পিতামাতা উভয়েই তোমাদের সাধনের লোক ছিলেন। সে বহুদিনের কথা। শৈশবেই ইনি পিতৃমাতৃহীন হন। তার পর মাতুলালয়ে চলিয়া যান। সেখান হইতেই ইঁহার বিবাহ হয়। তখন ইঁহার বয়স আট বৎসর মাত্র। দুই বৎসরের মধ্যে বৈধব্য ঘটে; এবং এতাবৎ কাল নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আসিয়াছেন। আজ তোমরা যা দেখিলে তাহা এই দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যেরই ফল। অমন উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে নামের বীজ পড়িবামাত্রই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে না।

গুরুদেবের কথা শুনিয়া আমরা বুঝিলাম, শুদ্ধ দেহ না হইলে অমন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রূপ ফুটিয়া উঠে না। আকুল তরঙ্গায়িত যৌবনের অমন শান্ত মূর্ত্তি, জন্মে কখনও দেখি নাই। শ্রী আছে অথচ সঙ্কোচ নাই, কমনীয়তা আছে অথচ সে কমনীয়তার ভিতরেই যেন আলোকসামান্য শক্তির প্রভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। এরূপ দেখিয়া মানুষের মন চঞ্চল হইয়া উঠে না, কিন্তু শ্রদ্ধাভরে যেন নুয়াইয়া

ম্যাজ্ ইভান্স

মি-গ্ল্যাণ্ডের সৌজন্যে

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা

পড়ে। এ রূপ ভোগ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হয় না, কেবল পূজা করিতেই সাধ যায়। অমন রূপ জন্মে আর কখনও দেখি নাই।

পাঁচ

আমাদের ভজন গোষ্ঠীতে সেবারে সেখানে একটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে আমরা 'ব্রহ্মচারী' বলিয়াই ডাকিতাম। গুরুদেব কহিতেন ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তি দুই, সত্য রক্ষা ও বীর্য্য ধারণ। এই ব্রহ্মচারীও অত্যন্ত সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। মনের কথা বা ভাব কখনও গোপন করিতেন না। এ বিষয়ে তিনি বালকের মতন ছিলেন। যখন যে খেয়াল মনে আসিত, তখনই তাহা মুখ ফুটিয়া কহিতেন, এবং কাজেও তাহা পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। হৈমবতীর দীক্ষার পরে আমাদের ব্রহ্মচারীর মধ্যে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিলাম। তাঁর নিত্যসিদ্ধ প্রসন্নতা যেন হঠাৎ কে চাপিয়া মারিয়া দিল। বালকের মত সরল প্রকৃতি যেন হঠাৎ বদলাইয়া গেল! ব্রহ্মচারীকে দেখিলাম আর কারও সঙ্গে বেশি কথাবার্ত্তা কহেন না, গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ আর করে না, অধিকাংশ সময় একেলা একেলা গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করেন, আশ্রমেও একেলা চুপটি করিয়া বসিয়া থাকেন। দিন দুই তিন পরে এক দিন প্রত্যুষে গুরুভাইরা সকলে স্নানাদি করিতে উঠিয়া গেলে,ব্রহ্মচারী গুরুদেবের নিকট আসিয়া বসিলেন। আমি তখনও এক কোণে বসিয়া ছিলাম। বোধ হয় আমাকে দেখিতে পান নাই। গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া উঠিয়া কহিলেন,—আমায় আদেশ করুন, আমি বিবাহ করিব।

গুরুদেব কহিলেন,—তা বেশ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরেইত গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়।

ব্রহ্মচারী—আমি ভাবিয়াছিলাম, আমরণ ব্রহ্মচর্য্যই পালন করিব, কিন্তু সে শক্তি আমার নাই। আমার ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে।

গুরুদেব হাসিয়া কহিলেন,—সে কি কথা? স্বভাবের বশে থাকাই যে ধর্ম্ম। যাহা অস্বাভাবিক তাহা ত ধর্ম্ম নয়। লোকে ব্রহ্মচর্য্যের সত্য অর্থ বোঝে না। ব্রহ্মচর্য্য উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে। ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য শরীর মনকে বিশুদ্ধ করিয়া নিষ্কাম সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালনে সাধককে সক্ষম করা। তোমার ব্রত ভঙ্গ হয় নাই। ব্রতের সফলতা লাভ করিবার জন্যই তোমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতেছিলে, ততদিন তাই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল। এখন তোমার অন্য অবস্থা উপস্থিত। স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া তুমি এখন সাধন রাজ্যে কালেজে প্রবেশ কর, এজন্য সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? এত আনন্দের বিষয়।

ব্রহ্মচারী—তবে আপনি আমাকে বিবাহ করতে আদেশ কর্চ্ছেন?

গুরুদেব—আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সংসার করিয়া কৃতার্থ হও। বিবাহের কোনও সম্বন্ধ আসিয়াছে?

ব্রহ্মচারী—সম্বন্ধ আর কে আনিবে? আমার প্রাণই সে সম্বন্ধ করিতেছে। আমি হৈমবতীকে বিবাহ করিতে চাহি।

গুরুদেব—হৈমবতী বিধবা তুমি জান?

ব্রহ্মচারী—জানি। কিন্তু বিধবাবিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে। আর আপনার এখানে ত কোনওই বাহিরের বন্ধন নাই। যাদের সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, তারাও ত আপনার আশ্রিত।

গুরুদেব—হৈমবতী কি বিবাহ করিতে চান?

ব্রহ্মচারী—জানি না। কিন্তু আমার প্রাণ যখন তাঁকে অমন করিয়া চাহিতেছে, তখন তাঁর প্রাণ আমায় টানিতেছে, ইহাই বিশ্বাস করি।

গুরুদেব—সে তোমায় দেখেছে?

ব্রহ্মচারী—জানি না। না দেখে কি অনুরাগ হয় না? নক্ষত্রে নক্ষত্রে আলোকের ভিতর দিয়া কথা হয়, প্রাণে প্রাণে কি নীরব পরিচয় হয় না?

গুরুদেব—হয় না কে বল্লে? হয়েছে কি না, তাই জানতে চাই।

ব্রহ্মচারী—তাকে আপনি ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহলেই জানা যাবে।

গুরুদেব—নিজেই তাহা জানিয়া লও না কেন?

ছয়

দিন দুই পরে গুরুদেবের সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে গেলাম। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী, হৈমবতী এবং ব্রহ্মচারীকেও গুরুদেব সঙ্গে লইলেন। আর সকলে প্রয়াগের আশ্রমেই রহিলেন।

একদিন অপরাহ্নে গুরুদেব একলা বসিয়া আছেন, এমন সময় হৈমবতী আসিয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন—"আপনি অন্তর্য্যামী, সকল কথাই ত জানেন। আমি যে মহাপাতকে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম, এ আশ্রমের আর কেউ তাহা জানে না—কিন্তু আপনার অবিদিত নাই, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, আমায় বলিয়া দিন।"

গুরুদেব কহিলেন—তুমি যাহাকে পাপ বলিতেছ, বস্তুতঃ তাহা ত পাপ নহে, অনাচার মাত্র। পাপ ভিতরকার কথা। অজ্ঞানে মানুষ যে অনাচার করে, তাহাতে তার দেহাদি দুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রাণ কলুষিত হয় না। তুমি লোভে পড়িয়া কিছু কর নাই। সজ্ঞানে তোমাতে কোনও পাপ স্পর্শ করে নাই। জ্ঞান হওয়া মাত্রই তোমার সমস্ত শরীর, সমস্ত মন, সমস্ত প্রাণ এই অনাচারের স্মৃতিতে জলিয়া উঠিয়াছিল। সেই জালাতেই তুমি আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলে। লোকের চক্ষে তুমি অপরাধী ভাবিয়াই অত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলে। নইলে তোমার প্রাণে কোনও পাপ স্পর্শ করে নাই। আমি তোমাকে প্রাণ খুলিয়া আশ্বস্ত করিতেছি, তোমার ব্রত ভঙ্গ হয় নাই। নিষ্পাপ তুমি, তোমার দেহ, মন, প্রাণ সকলি শুদ্ধ রহিয়াছে। মিথ্যা পাপ কল্পনা করিয়া প্রাণের শান্তি নষ্ট করিও না।

হৈমবতী—শান্তি ত পাই না।

গুরুদেব—সংস্কার সহজে যায় না। অহনিশ নাম কর, আপনি শান্তি আসিবে।

হৈমবতী—ব্রহ্মচারী আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন।

গুরুদেব—তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তাতে আপত্তি কি?

হৈমবতী এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তখন গুরুদেব কহিলেন—তুমি কোনও সংস্কারের দাস নও, আমি জানি। লোকভয়, সমাজভয়, তোমার নাই। তবে শঙ্কিত হইতেছ কেন? আমার সাধনেও এসকল বিষয়ে কোনও বাঁধাবাঁধি নাই। নিজের কাছে খাঁটি থাকিয়া সকলেই যাতে তাঁদের চিত্তের প্রসন্নতা নষ্ট না হয়, যাহাতে আত্মার প্রসাদ লাভ হয়, সেরূপ কাজ করিতে পারেন। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যে তোমার দেহ মন বিশুদ্ধ হইয়াছে। এরূপ শুদ্ধদেহে শুদ্ধ প্রাণে যে সংসারে প্রবেশ করে, তারই সংসার সার্থক হয়। তারই সংসার পথে পরমপুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। তুমি আত্মসুখেচ্ছায় কোন কাজ করিবে না জানি বলিয়াই, যদি ইচ্ছা হয়, বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পার, ইহা অসঙ্কোচে কহিতেছি।

হৈমবতী—আমার দেহ ত অপবিত্র হয়েছে। এ দেহ ত আমি কাহাকেও দান করিতে পারি না।

গুরুদেব—যাকে দান করিবে, সে যদি অপবিত্র মনে না করে, সে যদি তোমার অতীতকে ধুইয়া মুছিয়া, তোমার বর্ত্তমান শুদ্ধসত্ত্ব দেহকেই অকৈতব প্রেমভরে বরণ করিয়া লয়, তাহাতে আপত্ত কি?

হৈমবতী—তিনি আমাকে শুদ্ধ বলে ভাবছেন বলেই, তাতে আমার অপরাধ হবে না কি? এ প্রবঞ্চনা ত করিতে পারি না।

গুরুদেব—সকল কথা তাঁকে খুলিয়া না বলিলে, প্রবঞ্চনা হবে বটে; কিন্তু বলিলে ত আর সে অপরাধ হবে না।

কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—সকলের গোড়ার কথা—তাঁহার প্রতি তোমার সত্য অনুরাগ হয়েছে কি?

হৈমবতী উত্তর দিলেন না। গুরুদেব কহিলেন—"সত্য অনুরাগের লক্ষণ—প্রিয়জনের নাম শুনিবামাত্র দেহ মন প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে, তাঁহার দর্শনে কেবল চক্ষু

নহে, কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয় অপূর্ব্ব উল্লাসে ভরিয়া উঠে, তাঁহার প্রতি অঙ্গের জন্য, প্রেমিকের প্রতি অঙ্গ আকুল হইয়া, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাঁহাকে পাইতে চাহে। সত্য অনুরাগ দেহ এবং মন সকলই অধিকার করে। এ অনুরাগ তোমার জন্মেছে কি? যদি এ শুদ্ধ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তবে বিবাহ কর, তাহাতে মঙ্গল হইবে।"

হৈমবতী কিছু কহিলেন না। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গুরুদেবের কথাতে পুলকে পূরিয়া উঠিল। এমন সময় ব্রহ্মচারী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গুরুদেব কহিলেন—"ব্রহ্মচারী, হৈমবতী এবং তুমি এখন হইতে একসঙ্গে বসিয়া সাধনভজন করিবে। তোমার ইষ্টনামের সঙ্গে হৈমবতীর রূপ ধ্যান করিবে। আর, হৈমবতী, তুমিও তোমার ইষ্টনামের সঙ্গে ব্রহ্মচারীর রূপ ধ্যান করিবে। এইরূপে দেখিবে তোমরা উভয়ে একে অন্যের নিকটে ভগবদ্বিগ্রহরূপে ফুটিয়া উঠিবে। তোমরা এমন অবস্থা লাভ করিবে, যখন পরস্পরকে নিজ নিজ ইষ্টমূর্ত্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, তখন একে অন্যের সেবাতে তোমাদের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার সেবা হইবে। ইহাই প্রেমের চরম অবস্থা, এইরূপেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হয়। এই কর্ম্মযোগের মধ্য দিয়াই তোমরা ব্রজের শুদ্ধপ্রেম লাভ করিতে পারিবে।"

সাত

আমার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। গুরুদেবকে বিন্ধ্যাচলে রাখিয়াই আমাকে আমার কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইতে হইল। ইহার অল্পদিন পরেই শুনিলাম হৈমবতীর সঙ্গে ব্রহ্মচারীর বিবাহ হইয়াছে। গুরুদেবের উপদেশে ইঁহারা দু'জনে নাসিকে যাইয়া নর্ম্মদাতীরে একটি কুটির বাঁধিয়া ঘরকন্না করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বুঝিলাম কি জানি অন্য গুরুভাইরা ইঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করেন, এইজন্যই গুরুদেব তাঁহাদের এই অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। নাসিকে বাঙ্গালী নাই। বিদেশীয়দের মাঝখানে এই নবদম্পতী নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের ঘরকন্না ও সাধনভজন করিতে পারিবেন।

আট

তিন বৎসর পরে আবার পূজার ছুটীতে গুরুদেবের পাদপ্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। একদিন একলা পাইয়া ব্রহ্মচারী ও হৈমবতীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। গুরুদেব কহিলেন ব্রহ্মচারী আবার বিবাহ করিয়াছেন। শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম—"সে কি? ব্রহ্মচারীকে ত এমন নীচ প্রবৃত্তির লোক কল্পনা করি নাই!"

গুরুদেব কহিলেন—বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই এরূপ ভাবিতেছ কেন?

আমি—এক স্ত্রী থাকতে কেবল কামপরবশ হইয়াই লোকে আবার বিবাহ করিতে পারে।

গুরুদেব—বিবাহ ব্রহ্মচারী করে নাই। হৈমবতীই তাহাকে আবার বিবাহ করাইয়াছেন।

আমি—এও ত অদ্ভুত কথা। হৈমবতীর কি সন্তানাদি হয় নাই?

গুরুদেব—হৈমবতীর একটী পুত্র সন্তান আছে।

আমি—তবে আবার বিবাহ কেন?

গুরুদেব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও ভাবিতে লাগিলাম—এ হল কি? গুরুদেব ইঁহাদের যে রাগমার্গের সাধনা দিয়াছিলেন, তার পরিণাম কি এই? তিনিও কি ইঁহাদের ভিতরকার প্রকৃতিটা ধরিতে পারেন নাই? এই সকল প্রশ্ন মনের ভিতরে তোলপাড় হইতে লাগিল।

দিন তিন চার আমি এই সন্দেহে পড়িয়া অস্থির হইয়া রহিলাম। গুরুদেবের প্রতি আমার পূর্ব্বকার অবিচলিত শ্রদ্ধা যেন টলিয়া উঠিল। এই সন্দেহে মনটা এতই খারাপ হইল যে আর সেখানে থাকা অসম্ভব হইল। একদিন প্রত্যুষে আর সকলে স্নানাদি করিতে চলিয়া গেলে, গুরুদেবকে একেলা পাইয়া কহিলাম—"আমি আজই দেশে ফিরিয়া যাইব।"

গুরুদেব—তোমার মন যখন চঞ্চল হইয়াছে, তখন যাওয়াই ভাল। তবে এখনও ত ছুটী ফুরাইবার বিলম্ব আছে। একবার হৈমবতী ও ব্রহ্মচারীকে যাইয়া দেখিয়া আইস না কেন? তারাও আপ্যায়িত হইবে, তুমিও দেখিয়া সুখী হইবে।

আমি একথার হাঁ, না কোনও উত্তর করিলাম না দেখিয়া গুরুদেব কহিলেন—"দেখ, আমরা ভগবান নাই। অন্তর্য্যামী ভগবান কাকে কোন্ পথে লইয়া যান, তার মর্ম্ম কিছুই বুঝি না। ব্রহ্মচারীর পক্ষে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় হইয়া

পড়িয়াছিল, ইহা বুঝিয়াই আমি তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছি। লোকে যাকে বিবাহ বলে—হৈমবতীর সঙ্গে ব্রহ্মচারীর সে বিবাহ হয় নাই। ইহারা কখনও স্বামী স্ত্রীরূপে পরস্পরের সঙ্গে বাস করে নাই। হৈমবতী এই সর্ত্তেই ব্রহ্মচারীকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মচারীও এই সর্ত্তেই হৈমবতীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

আমি—এও তো একরূপ প্রবঞ্চনা নয় কি ?

গুরুদেব—প্রবঞ্চনা কাকে ?

আমি—সমাজকে।

গুরুদেব—বিধবা বিবাহ এখনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই। বিধবা-বিবাহ করিয়া ব্রহ্মচারী সমাজের বাহিরে গিয়াছেন। সে সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়াছে। সমাজের বিধিনিষেধের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নাই। সুতরাং তাঁরা সমাজকে প্রতারিত করিতে পারেন না।

আমি—তবুও হৈমবতীর পুত্রকে ত লোকে ব্রহ্মচারীর পুত্র বলিয়াই জানিবে! এই কি প্রবঞ্চনা নহে ?

গুরুদেব—লোকে দত্তক গ্রহণ করে ত। প্রাচীনেরা ক্ষেত্রজ পুত্রের দায়াধিকার মানিয়াছেন। আর সকলের চাইতে বড় কথা—এই গরিব বেচারা কি পাপ করেছে যে আমরণ পর্য্যন্ত সে সমাজে ঘৃণিত হইয়া থাকিবে? হৈমবতীর দেহ যদি অপবিত্র হইত, হৈমবতী যদি কামাতুরা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলেও অন্য কথা ছিল। হৈমবতীকে নিদ্রায় অচেতন পাইয়া এক ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করে। সে ব্যক্তিও ঠিক কামাতুর ছিল না। সেও ভাবাবেশে নিদ্রিত অবস্থাতেই তোমরা যাকে ইংরাজীতে somnambulist' এর অবস্থা বল, সেই অবস্থায় নিদ্রাভিভূতা স্বপ্নাবিষ্টা হৈমবতীর সঙ্গে যুক্ত হয়। সজ্ঞান হইবা মাত্র উভয়েই অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া পড়ে,—হৈমবতী আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল—ঠাকুরের ইচ্ছায় করিতে পারে নাই। সে ব্যক্তি সেই দিন হইতেই নিরুদ্দেশ—বাঁচিয়াছে কি মরিয়াছে কেউ জানে না। তার অগাধ বিষয়সম্পত্তি ফেলিয়া সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। হৈমবতীর পুত্র যে পাপে জন্মে নাই, ইহা ত মানতেই হবে। তথাপি সমাজ ত অত শত বুঝত না। অত জানবেই বা কি করিয়া? অথচ হৈমবতী যদি বিবাহ না করিত, তাহা হইলে এই বেচারাকে কি দুর্ব্বিষহ জীবনভার বহন করিতে হইত। এসকল ভাবিয়াই হৈমবতী রাজি হন। এসকল জানিয়াই ব্রহ্মচারী তাঁহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

আমি—ব্রহ্মচারীর চরণে কোটি প্রণাম করি। পুরুষে এ মহত্ত্ব দেখি নাই।

গুরুদেব—ভুল বুঝিও না। ব্রহ্মচারী পতিতোদ্ধারের জন্য বিবাহ করেন নাই। যাঁহাকে আপনার ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন, তাঁহার সকল কর্ম্মভার নিজে ভাগ করিয়া লইবার জন্যই বিবাহ করিয়াছেন। হৈমবতীর প্রতি তাঁর শুদ্ধ প্রেম জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি হৈমবতীর সুখ ও শান্তি কামনায় তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন।

আমি—হৈমবতীর কথা কি ?

গুরুদেব—হৈমবতীও ব্রহ্মচারীর প্রতি শুদ্ধ অনুরাগিনী হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের সংস্কার সহজে যায় না। হৈমবতী কিছুতেই তাঁর দেহ যে পরপুরুষ সংস্পর্শে অপবিত্র হইয়াছে, ইহা ভুলিতে পারেন নাই, তারই জন্য এই অপবিত্র দেহকে পবিত্র পতিসেবায় অর্পণ করিতে পারিলেন না। পতিকে আপনার আর যা-কিছু সকলই অর্পণ করিলেন—দেহটা অর্পণ করিলেন না। জন্মান্তরে শুদ্ধদেহে যাহাতে পতিসেবা করিতে পারেন, অহর্নিশ হৈমবতী এই কামনাই করিতেছেন।

আমি—আবার বিবাহ করাইলেন কেন ?

গুরুদেব—ব্রহ্মচারীকে আমরা ব্রহ্মচারী বলিয়া ডাকি বটে, কিন্তু ব্রহ্মচারী একেবারে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নহেন। এ অবস্থায় তাঁর দারান্তর পরিগ্রহ করা নিজের ধর্ম্ম এবং হৈমবতীর ব্রত রক্ষা—উভয় কারণেই অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। হৈমবতীকে দেখিয়াছ। তাঁর সপত্নী কোনও অংশে হৈমবতী অপেক্ষা খাটো নহেন। রূপে, কুলে, গুণে, সকল বিষয়েই তিনি হৈমবতীরই মতন। হৈমবতীই নিজে এই অলোকসামান্য রূপগুণবতী রমণীকে খুঁজিয়া আনিয়া আপনার সপত্নী করিয়াছেন। হৈমবতী নিজে প্রতিদিন সপত্নীকে সাজাইয়া, সপত্নীর পতিসেবার ভিতর দিয়া, আপনার দেহমনপ্রাণ দিয়া পতিসেবার সাধ মিটাইয়া থাকেন। হৈমবতী এইরূপে এখন "যুগল-সাধন" করিতেছেন। হৈমবতীর সাধনবলে তাঁহাদের নাসিকের আশ্রমে নূতন বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নব বৃন্দাবনে, নবযুগল উপাসনা দেখিয়া আইস; কৃতকৃতার্থ হইবে।

আমার নাসিকে যাইতে হইল না। এখান হইতেই এই অপূর্ব্ব লীলা ধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলাম।*

বিপিনচন্দ্র পাল

---

* 'বঙ্গবাণী', দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৩০

কুনাল

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত

প্রথম দৃশ্য

পাটলীপুত্রের রাজোদ্যান

মহারাজ অশোক ও মহারাণী তিষ্যরক্ষিতা

তিষ্যরক্ষিতা। মহারাজ, কুনালকে নির্ব্বাসিত কেন কর্লে'ন?

অশোক। কর্ব না—এতবড় কুলাঙ্গার, তোমায় কু-দৃষ্টিতে দেখে।

তিষ্যরক্ষিতা। লঘুদণ্ড দিলেই হ'ত।

অশোক। তাই দিয়েছি, ওর উপযুক্ত দণ্ড কি জান?

তিষ্যরক্ষিতা। কি মহারাজ?

অশোক। উত্তপ্ত সন্দংশ দ্বারা চক্ষুরুৎপাটন।

তিষ্যরক্ষিতা। [স্বগত] মহারাজ, তোমায় আমি চিনি,—তোমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না, অপত্যস্নেহ তোমার অস্থি-মজ্জায়—

অশোক। কি ভাব্‌ছ?

তিষ্যরক্ষিতা। ভাব্‌ছি যে, হাস্‌তে হাস্‌তে ছেলেটাকে আপনি বনবাস দিলেন! কি করে' পার্লে'ন?

অশোক। রাজধর্ম্ম—বিচারকের দায়ীত্ব তুমি তো জান রাণী।

তিষ্যরক্ষিতা। আচ্ছা মহারাজ, আপনি যখন রোগ-শয্যায় অচেতন, তখন কে আপনাকে মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা কর্লে'। আপনার কি মনে আছে?

অশোক। আছে। তোমার কাছে আমার সে ঋণ আমি আমার শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করে' যাব।

তিষ্যরক্ষিতা। শোধ কর্তে' চান সে ঋণ?—দেবেন কি আমায় একটি ভিক্ষা মহারাজ, সেই সেবার বিনিময়ে?

অশোক। বিনিময় নয় রাণী—এমনি চাও, তোমায় অদেয় কিছু নেই।

তিষ্যরক্ষিতা। দেবেন মহারাজ?

অশোক। দেবো।

তিষ্যরক্ষিতা। দেবেন?

অশোক। সন্দেহ কর্ছ'? দেবো—দেবো।

তিষ্যরক্ষিতা। তিন সত্য কর্ছে'ন!

অশোক। কর্ছি'।

তিষ্যরক্ষিতা। তবে আমায় সপ্ত দিবসের রাজক্ষমতা দিন মহারাজ।

অশোক। রাজক্ষমতা! রাজপরিচ্ছদে রাজসভায় যাবে না কি?

তিষ্যরক্ষিতা। তাই আমার সাধ মহারাজ।

অশোক। সাধ!—আচ্ছা দিলাম।

তিষ্যরক্ষিতা। এখন ব্যবহার কর্তে' পারি?

অশোক। না—দাঁড়াও। কে আছ?

পুররক্ষীর প্রবেশ

অশোক। তুরী।

পুররক্ষীর প্রস্থান

[নেপথ্যে তূর্য্যনিনাদ।]

অশোক। দাঁড়াও—আস্‌ছি।

প্রস্থান

তিষ্যরক্ষিতা। কুনাল, এত দর্প—এত তেজ তোমার! ভারত সম্রাজ্ঞীকে প্রত্যাখান! এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার! কিন্তু, কিন্তু তোমার ওই আঁখি,—কি অসহ্য তার আকর্ষণ! মূর্খ বালক, কেন—কেন তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান কর্লে'!

অশোকের প্রবেশ

অশোক। এইবার ব্যবহার কর। আজ হ'তে সপ্ত

দিবস, আমার অমাত্যগণসহ আমি মন্ত্রমুগ্ধ কেশরীর মত তোমার আদেশ প্রতিপালন কর্ব।

তিষ্যরক্ষিতা। মহারাজ, আপনার প্রেমের প্রতিদান দিতে পারি, এমন সাধ্য আমার নেই—কে আছ ?

পুররক্ষীর প্রবেশ

তিষ্যরক্ষিতা। ঘাতক।

পুররক্ষীর প্রস্থান

অশোক। কুনালকে তুমি বধ কর্বে না কি ?

তিষ্যরক্ষিতা। না।

অশোক। তবে ?

ঘাতকের প্রবেশ

তিষ্যরক্ষিতা। দ্রুতগামী অশ্বে, যেখানে পাও, যুবরাজের চোখ উপ্‌ড়ে আমার কাছে নিয়ে এস। বল্‌বে, মহারাজের আদেশ। আন্‌লে পুরস্কার, না আন্‌লে শূল। যাও।

ঘাতকের প্রস্থান

অশোক। এ কি পরিহাস রাণী!

তিষ্যরক্ষিতা। পরিহাস নয় রাজা—এ আমার আদেশ। প্রস্থান

অশোক। তোমার আদেশ! কিন্তু কেন এই নিষ্ঠুর আদেশ।

উদভ্রান্তের মত প্রস্থান করিলেন

[বৃদ্ধ ভৃত্য কুরুবক, মন্ত্রী রাধাগুপ্ত এবং কুরুবকের স্ত্রী বৃদ্ধা দাসী করবীর প্রবেশ।]

কুরুবক। আটঘাট সব বন্ধ করেছে করবী, ঢুক্‌তে দিলে না। মাকড়সার জালে জড়িয়েছে। সাতদিন কারুর সঙ্গে রাজার দেখা-সাক্ষাৎ হবার যো নেই।

রাধাগুপ্ত—এ খবর তোমাকে দিলে কে ?

কুরুবক—করবী। ও আড়াল থেকে সব শুনেছে।

করবী। মন্ত্রী-মশায়, পায়ে পড়ি—বাছাকে বাঁচাও!

রাধাগুপ্ত। যে ফিকির আমি কুরুবককে শিখিয়ে দিয়েছি, যদি ও তা' কর্তে পারে, আর ঘাতকের আগে পৌঁছুতে পারে, তা' হ'লে কুমার রক্ষা পায়।

কুরুবক—পার্ব পার্ব! আমাকে পার্তেই হবে যে! চল্লাম করবী, কাঁদিস্ নি—তোর কুমারকে আমি বাঁচাবই! মন্ত্রী-মশায়, তুমি এস আমার পিছনে পিছনে।

রাধাগুপ্ত—ভগবান তোমার সহায় কুরুবক। চল, আমি যাচ্ছি।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

[তিষ্যরক্ষিতা অর্দ্ধশায়িতা। করতলে চিবুক বিন্যস্ত।]

কবে পাঠিয়েছি—দেখা নেই। এদিকে সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়; আজকের দিন অবশিষ্ট। মহারাজ কতকগুলো চিরক্রিয় দীর্ঘসূত্রকে পুষে রেখেছেন। কষাঘাতে সংযত কর্তে হয়। অপদার্থের দল! [উঠিলেন]

করবীর প্রবেশ

তিষ্যরক্ষিতা। কি সমাচার ?

করবী। কোটাল প্রণাম জানাচ্ছে।

তিষ্যরক্ষিতা। ডেকে আন।

করবীর প্রস্থান

তিষ্যরক্ষিতা। সব চক্রান্ত করেছে, নইলে ছ'দিনে একটা কাজ শেষ হয় না ?

করবীর প্রবেশ

[নগররক্ষককে বহির্দেশে রাখিয়া আপনি ভিতরে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।]

নগর রক্ষক। [নত মস্তকে] ভৃত্যকে ডেকেছেন কেন মা ?

তিষ্যরক্ষিতা। ঘাতক ফির্লে ? কই, কুমারের চোখ ?

নগররক্ষক। আজ্ঞে যে লোক পাঠিয়েছিলুম, সে কর্ম্মঠ ব্যক্তি; কেন দেরী কর্ছে বুঝ্‌তে পার্ছি না।

তিষ্যরক্ষিতা। আরো লোক পাঠান, না যায়—কর্ম্মচ্যুত করুন, অর্থদণ্ড করুন, কষাঘাত করুন,—চোখ আমি চাই। না পারেন, অবসর গ্রহণ করুন।

তিষ্যরক্ষিতার প্রস্থান

[করবী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।

নগররক্ষক। অবসর গ্রহণ বড় কর্তে হবে না, আর আজকের দিনটা। এ মহারাজ অশোক, চুল চিরে বিচার। ঘাতকের বিলম্ব এখন কুমারের পক্ষে মঙ্গল। অমন সোণার চাঁদ কুমার, মাগীর যেন চোখের শূল।

[কিয়ৎক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষিতা ও অশোকের প্রবেশ।]

তিষ্যরক্ষিতা। কেন বিরক্ত কচ্ছে'ন মহারাজ। যে চোখে আমায় সে দেখেছে, আমি সেই চোখ চাইছি।

অশোক। এ নির্ম্মম দণ্ড প্রত্যাহার কর রাণী। কুমার অবোধ, তাকে বোঝ্‌বার অবসর দাও। এমন করে' তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করো না।

তিষ্যরক্ষিতা। ভিক্ষা ফিরিয়ে নিন মহারাজ, আমার রাজক্ষমতায় কাজ নেই। জান্‌তাম না যে, রাজার কর্ত্তব্য পুত্রস্নেহের মুখাপেক্ষী।

অশোক। অশিষ্টা, মহারাজ অশোক কখন দান পুনর্গ্রহণ করেছে? তুমি নারী—না নারীরূপধারিণী পিশাচী! স্নেহ, দয়া, মমতা, একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েছ! আমি তোমার মুখদর্শন কর্তে চাই নে; আজ হ'তে তুমি আমার পরিত্যজ্যা!

অশোকের প্রস্থান

তিষ্যরক্ষিতা। হাঃ, হাঃ, হাঃ!

[পাগলের মত হাসিতে লাগিলেন। পরে হাসি থামাইয়া] কি করবী, কাঁদছো কেন?

করবীর প্রবেশ

করবী। ঘাতক চোখ এনেছে।

তিষ্যরক্ষিতা। বটে, ডেকে আন।

করবীর প্রস্থান

ঘাতকের প্রবেশ

ঘাতক। এই নিন রাণী-মা, কুমারের চোখ।

তিষ্যরক্ষিতা। এই নাও পুরস্কার। [কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন] কই, দাও।

[ঘাতক চক্ষুর্দ্বয় রাণীর হাতে দিল।]

তিষ্যরক্ষিতা। চোখ দেবার সময় কি বল্লে?

ঘাতক। টুঁ শব্দ কর্লে'ন না—হাস্‌তে হাস্‌তে খুলে দিলেন।

তিষ্যরক্ষিতা। আচ্ছা, যাও।

ঘাতকের হার কুড়াইয়া প্রস্থান

তিষ্যরক্ষিতা। [চক্ষু লইয়া লুফিতে লুফিতে] উদ্ধত বালক! কেমন? আর কবে' আমায় প্রত্যাখান! মহারাণী তিষ্যরক্ষিতার প্রেম—তোমার দৃষ্টিহরণ করে' আজ সৃষ্টিজয়ী! আজ আমার উৎসবের দিন!·· ওরে কে আছিস্, মহারাজকে ডাক—রাজাধিরাজ অশোককে—পত্নীব্রত সম্রাটকে—ডাক, ডাক!

প্রস্থান করিল

তৃতীয় দৃশ্য

বনপথ

অনতিদূরে একখণ্ড শিলা

কুমার কুনাল ও তাহার পত্নী কাঞ্চন

কাঞ্চন। চল্‌তে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

কুনাল। না। তুমি ত আমার হাত ধরে' রয়েছ।

নিঃশব্দে অশোকের প্রবেশ

কাঞ্চন। আচ্ছা, চোখ্ উপ্‌ড়ে দিতে তোমার কষ্ট হ'ল না?

কুণাল। সে কথা আবার তুল্‌ছ কেন? কতবার তা' বলেছি—কষ্ট আমার হয় নি—হ'তে পারে না।

কাঞ্চন। সে দৃশ্য দেখ্‌তে পাব' না বলে' দাসীকে সরিয়ে দিয়েছিলে; তাই মনে হচ্ছে, শুন্‌লে পাছে যদি কষ্ট পাই, সেজন্য হয় ত ঢাকছ।

কুনাল। পিতা—যাঁর কৃপায় দেহ পেয়েছি, স্নেহের ছায়ায় বড় হয়েছি, তাঁর প্রীত্যর্থে, তাঁর আদেশ পালনে কখন কষ্ট হয়!

কাঞ্চন। যন্ত্রনা কিছুই টের পেলে না?

কুনাল। না, পিতার আশীর্ব্বাদে একজন সৌম্যাকৃতি শ্রমণ আমার চক্ষু দু'টি স্পর্শ করে' রইলেন; বল্লেন, ভয় নেই।

কাঞ্চন। তারপর?

কুনাল। ঘাতক ললাটস্থ টিপের মত চক্ষু দু'টি খুলে নিলে।

কাঞ্চন। কে সেই শ্রমণ?

কুনাল। তোমার কি মনে হয়?

কাঞ্চন। ভগবান বুদ্ধ।

কুনাল। আমারও তাই মনে হয়। যেই হোন্, তিনি এই পটি বেঁধে দিয়ে, এক সপ্তাহ খুল্‌তে নিষেধ করে' অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেলেন।

কাঞ্চন। বড় আশ্চর্য্য ত!

অশোক। কুমার, তোমার প্রতি অবিচার হয়েছে।

কুনাল। কে?

কাঞ্চন। [কাণে কাণে] পিতা।

কুনাল। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমংতপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

প্রণাম করিলেন

অশোক। কে আছ?

রাধাগুপ্তের প্রবেশ

অশোক। মন্ত্রী, সপ্তাহ উত্তীর্ণ হ'তে কত দেরী?

রাধাগুপ্ত। আর কয়েক পল মাত্র অবশিষ্ট।

অশোক। আমি এইখানে, এই শিলাসনে বসে' বিচার কর্ব'। [বসিলেন] রাণীর কোন খবর পেলেন?

রাধাগুপ্ত। চারিদিকে অনুচর পাঠিয়েছি, বোধ করি পাব।

[নেপথ্যে কোলাহল।]

অশোক। কিসের কোলাহল?

রাধাগুপ্ত। [নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া] রাণী-মা আস্‌ছেন।

[উন্মাদিনীবেশে তিষ্যরক্ষিতার প্রবেশ। সঙ্গে কতিপয় অনুচর, কুরুবক ও করবী।

[তিষ্যরক্ষিতা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সহসা কুনালকে দেখিয়া] তুমি কাদের ছেলে গা? মহাপাত্রের? ও, চিনেছি! তুমিই বুঝি কুনাল? আহা রে!

রাধাগুপ্ত। এ যে উন্মাদিনী!

তিষ্যরক্ষিতা। না না, আমি পাগল নই। আমায় পাগল করেছে ওই—ওই চোখ আমায় পাগল করেছে! [ক্ষণেক আত্মস্থা হইয়া] তুমি ত ভালবাস? চল না, দু'জনে বনে যাই। যাবে? [কিয়ৎক্ষণ পরে] ভুল দেখেছ? তার ত আর চোখ নেই। আমিই নষ্ট করে দিয়েছি যে! আহা রে!

অশোক। কুমার, নিরপরাধ তুমি, পুনর্বিচার প্রার্থনা কর। আমি রাণীকে দণ্ড দেব।

তিষ্যরক্ষিতা। দাও, দাও, দণ্ড দাও! [অধীর হইলেন] ওগো দণ্ডাধিপ, আমি যে আর সইতে পার্ছিনে। দাও, দাও তোমার নিষ্ঠুরতম দণ্ড—বাঁচাও আমাকে!

কুনাল। পিতা, দণ্ডিত না হ'য়ে, নিয়ন্তার নিয়মে উনি যে ভাবে দণ্ডিত হচ্ছেন, তাই ওঁর পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি নয় কি?

অশোক। ওর ওই শাস্তিতে তোমার চোখ হারানর সান্ত্বনা নেই কুমার।

রাধাগুপ্ত। আছে বৈকি। সপ্তাহ উত্তীর্ণ, খুল্‌তে বাধা নেই। কুরুবক, পটি খুলে দাও।

[কুরুবকের তথাকরণ।]

অশোক। চক্ষু অক্ষত!

[কুরুবক দুই হস্তে অশোকের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। অশোক স্তব্ধ ও নির্ব্বাক।]

[তিষ্যরক্ষিতা বিহ্বল-দৃষ্টিতে কুনালের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

রাধাগুপ্ত। মাকে যেন প্রকৃতিস্থা মনে হচ্ছে।

[তিষ্যরক্ষিতা অঙ্গাবরণ সংযত করিয়া অশোকের দিকে অগ্রসর হইলেন। অশোক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র তিনি কাতরভাবে পদতলে পতিত হইলেন।]

তিষ্যরক্ষিতা। আমায় ক্ষমা করুন মহারাজ!

অশোক। তুমি ক্ষমার অযোগ্যা। কুমারের প্রতি নির্য্যাতন করেছ, সে জন্য তার কাছে ক্ষমা চাও।

[তিষ্যরক্ষিতা কুনালের দিকে অগ্রসর হইলেন।

কুনাল। মা, আমায় আশীর্ব্বাদ কর।

[ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তিষ্যরক্ষিতার নয়নযুগল হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রুধারা ভূলুণ্ঠিত কুনালের মস্তক স্পর্শ করিল।]

বিস্ময়
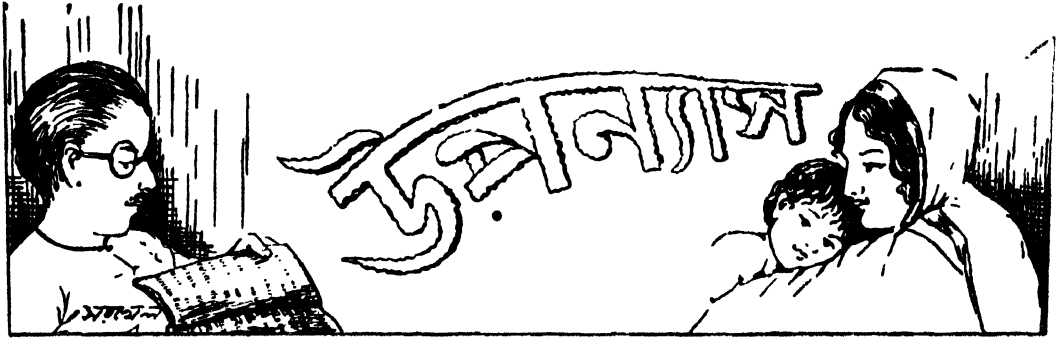
[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

কদর্য্য বস্তির মধ্যে বহুকালের পুরাতন ছোট দ্বিতল একখানা জীর্ণ ব্যারাকবাড়ী। বাড়ীটা নানারকমের ভাঙাচোরা ধড়াচূড়া পরিয়া বহুরূপী সাজিয়া বসিয়া আছে। ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের লোক যে এই অল্পপ্রসর বাড়ীটার মধ্যে নাই, তাহা বলা খুবই দুষ্কর। ভারতবর্ষ ভ্রমণের যে পুণ্য, তাহা এই বাড়ীর মধ্যে একবার প্রবেশ করিলেই সঞ্চয় হইয়া যায়। অন্ততঃ, লোকে সেইরূপই বলিয়া থাকে।

কিন্তু প্রবেশ করিতে ভয়ও করে, প্রবৃত্তিও হয় না। এত কদর্য্য, এত নোংরা, আর এমনি বীভৎস যে, না দেখিলে ঠিক ধারণা হয় না।

অব্যবহৃত শূন্য আস্তাবলের পাশ দিয়া ব্যারাকের মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ। মধ্যাহ্নের দাবদাহে যখন সমস্ত সহরটা ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তখনও এই পথটুকু ছায়াশীতল,—কন্‌কনে অন্ধকার বুকে করিয়া বসিয়া থাকে। অন্ধকারও কাটে না, দুর্গন্ধও ঘোচে না, আবর্জ্জনাও কোনদিন মুক্ত হইতে দেখা যায় না।

এমন পথের বুকে মরিয়া থাকিবার লোভ ইঁদুরও মাঝে মাঝে সংবরণ করিতে পারে না।

আসন্নপ্রায় সন্ধ্যায় এই পথের বুকে দাঁড়াইয়া একজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক কথা কহিতেছিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল, ওগো পাষাণ, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমার মেয়ের ঠিকানা আমাকে ব'লে দাও।

পুরুষটি জড়িতকণ্ঠে বলিল, কালই তো তোমাকে ব'লে দিয়েচি যে, আমি জানি না। ফের্ এখানে তুমি এলে কেন?

তুমি জান, নিশ্চয় জান।—স্ত্রীলোকটি অস্বাভাবিক একপ্রকার চীৎকার করিয়া উঠিল।

পুরুষটি আর একটু কাছে আসিয়া বলিল, চীৎকার করো না এখানে। সত্যি বলচি, আমি জানি না।

স্ত্রীলোকটি একটা বিশ্রী উগ্রগন্ধে ভয় পাইয়া দুই হাত পিছাইয়া গিয়া বলিল, তুমি মদ খাও!

খাই বই কি! হো, হো, হো! বলিয়া পুরুষটি এমন কুৎসিৎ হাসি হাসিল যে, স্ত্রীলোকটি অধিকতর ভয় পাইয়া গেল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্ত্রীলোকটি আবার বলিল, তুমি মদ খাও, আর আমার দু'বেলা ভাতও জোটে না। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—স্ত্রীলোকটি সত্য সত্যই তাহার পা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, আমাকে দেখেও কি তোমার একটু দয়া হয় না? আমি বাঁচবো না, এমন ক'রে কেউ কোনদিন বাঁচতে পারেও না। মরবার আগে তবু মেয়েটাকে একবার—

পুরুষটি শ্লেষ হানিয়া কহিল, হা, হা, হা! মেয়ের খেয়ে বাঁচতে চাও? আরে পাগল না কি! সে কি এখন তোমায় মা ব'লে স্বীকার করবে যে—বলিয়া আর একবার হা হা করিয়া অট্টহাসি হাসিল।

স্ত্রীলোকটি মুস্‌ড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে আবার চীৎকার করিয়া কহিল, না গো না, বাঁচতে আর আমার সাধ নেই। তার ঠিকানাটা আমায় ব'লে দাও; দেখি, তাকে যদি বাঁচাতে পারি।

পুরুষটি সকৌতুকে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, তার হয়েচে কি যে, তাকে বাঁচাতে চাও, শুনি। তার তো রাজরাণীর হাল;—রূপ আছে, যৌবন আছে, আর এ দু'টো যদ্দিন আছে, তদ্দিন তাকে মারে কে? তোমার মেয়ে তো রাজরাণী বেন্দা।

চিন্নুর মা নীরব হইয়াই রহিল।

অতুল চক্কোত্তি আবার বলিল, বেন্দা, মেয়েকে ভারী হিংসে হয় তোমার, না?

চিন্নুর মা চোখের জল আঁচলে মুছিয়া লইয়া বলিল, বেশ, বল্‌বে না তো? যতদিন বাঁচবো, ততদিন তার খোঁজ করবো। তুমি তার জানো সবই, বলো। ও এই বুঝি তুমি আমাকে ভালবাসতে?

শেষের কথাটা ঠিক উন্মাদের কণ্ঠনিঃসৃত গরল বলিয়া মনে হইল। মাতাল অতুল চক্কোত্তিও সে স্বরে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিল।

অতুল চক্কোত্তি মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, আমি আর কিছুই জানি না। যদি নিজের ভাল চাও তো এ ব্যারাক-বাড়ীতে আর কখনো ভুলেও পা দিও না। আর নইলে, পুলিশ ডেকে এক্ষুণি ধরিয়ে দিতে বাধ্য হব।

চিন্নুর মা পুলিশের নামে কিছুমাত্র ভয় পাইল না। কহিল, তা' যা' কর্‌তে হয় করো।

অতুল চক্কোত্তি ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় চিন্নুর মা উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, দাঁড়াও। তোমাকে আমার একটা জিনিষ দেবার আছে।—বলিয়া মাতালের ঘোলাটে দৃষ্টির সম্মুখে একটা চক্‌চকে পদার্থ তুলিয়া ধরিল। অন্ধকারে ভাল করিয়া কিছুই চেনা গেল না।

চিন্নুর মা বলিল, এই সেই আংটটা, যা' কোনদিনই কাউকে প্রাণ ধ'রে দিতে পারি নি।

মাতাল অতুল চক্কোত্তি ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

চিন্নুর মা বলিল, তোমাকে বড় ভালবেসেছিলাম। তোমারই হাতে পরিয়ে দি', এসো।

লুব্ধ মাতাল ত্রস্তে হাত বাড়াইল।

চিন্নুর মা অস্ফুট আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিয়া দেহের সমস্ত শক্তি দাঁতে সংহত করিয়া তাহা অতুল চক্কোত্তির প্রসারিত শীর্ণ হাতের উপর বসাইয়া দিল। দাঁত ভীষণভাবে সেখানে চাপিয়া রাখিয়াই হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

যন্ত্রনায় একটা ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া অতুল চক্কোত্তি নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য শীর্ণ দুর্ব্বল চিন্নুর মাকে সবলে একটা লাথি মারিয়া দূরে সরাইয়া দিল।

চোখের সাম্‌নে সমস্ত পৃথিবী একবার ওলট্‌পালট্ হইয়া যাওয়ার পরেই চিন্নুর মা দরজার কাছে গিয়া লুটাইয়া পড়িল। তাহার অস্বাভাবিক চীৎকারে দেখিতে দেখিতে আলো আসিয়া গেল, ভিড় জমিয়া গেল।

মাতাল অতুল চক্কোত্তি তখনও কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আর তাহারই কিছুদূরে একজন পরিচয়হীনা মুমূর্ষু ভিখারিণী ধূলায় লুটাইয়া ধুঁকিতেছিল।

মরণের প্রয়োজন যে তাহার কত বেশী, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল।

অতুল চক্কোত্তির হাত দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল।

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

রমার পরিণাম

কবিশেখর—শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমার এক বন্ধু ছিল নাম তার রমা। সে বোধ হয় আমার থেকে চার পাঁচ মাসের ছোট। তার বাপ মা খুব বড় লোক—রমার বয়স হ'তেই ভাল পাত্র খুঁজতে লাগলেন। আমি আমার দাদার সঙ্গে তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ঠিকুজী কুষ্টীর মিল হয় নি। সেই বছরেই ভরা পনেরোতে, আমার বিয়ের আগেই তার খুব বড় ঘরে বিয়ে হ'য়ে গেল।

রমা দেখ্‌তে আমার চেয়ে খুব ফরসা। ভোগে থাকাতে তার গাল দু'টী দিয়ে গোলাপ ফুলের মত আভা ফুটে বেরুতো। মুখ চোখ বেশ তরতরে ছিল। মোট কথা, সে সুন্দরীদের মধ্যে একজন বড় সুন্দরীই ছিল।

বিয়ের পর বছরেই তার স্বামী শচীন্দ্র এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হ'য়ে আইন পরীক্ষা দেয়, তাতেও বেশ সুফল হয়। শ্বশুরের আর বাপের ইচ্ছায় শচীন্দ্র বিলেতে থেকে আই-সি-এস পাশ করে' খেতাব নিয়ে ফিরে এল। রমা ততদিন বাপের বাড়ীতেই ছিল—মাঝে মাঝে শ্বশুর-বাড়ী দু'চারদিনের মত যেতো। যে বছর শচীন্দ্র বিলেত যায়, সেই বছর আমার বিয়ে হয়।

আমাদের দু'জনের মধ্যে এত ভাব এত মাখামাখি ছিল যে, সে রকম খুব কমই দেখা যেত। আমার স্বামীও আইন দিয়েছিলেন, তবে তেমন সুফল হয় নি; বোধ হয় তাই বিলেতেও যান নি। সেক্রেটারিয়েটে সাত আট বছর থাক্‌বার পর দিল্লীতে বদলী হন, আমি সেই সঙ্গে আসি।

শচীন্দ্র ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ হ'য়ে রমাকে নিয়ে সদরে চ'লে যায়। রমা তার যোগ্যা স্ত্রীই ছিল। কেন না, লেখাপড়ায়, নাচগানে, সূচী ও শিল্পকর্ম্মে, বেশ বিন্যাসে সে বড় পটু ছিল। তার আবার ব্যাভার সব চেয়ে ছিল সুন্দর। তাদের স্বামী স্ত্রীতে মিলও বেশ হয়েছিল—এক আত্মা এক প্রাণ বলাও চলে।

রমা যখন চব্বিশ-পচিশ বছরের হবে, তখন তার বাপ মারা যায়। সেই সময় এসে দিনকতক বাপের বাড়ী ছিল, সে সময় আমিও সেখানে ছিলাম। অনেক দিনের পর আবার দু'জনে দেখা। তাকে দেখে প্রথমে চিন্‌তে পারি নি—সে যেন রম্ভা উর্ব্বশীর মত বদলে গেছে।

আমি তখন তিন ছেলের মা—তার কিছুই হয় নি। মা বাপ অনেক ঠাকুর-দেবতার মানত করেছিলেন, দু'-একটা ওষুধ-পত্রও দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই হয় নি।

শ্রাদ্ধের পর তার এক বন্ধু—তার নাম শোভনা, বয়স তখন আটাশ-উন্‌ত্রিশ হবে, হঠাৎ পুকুরে ডুবে মারা যায়; তাতে রমার শোকটা বাপ মরার চেয়েও খুব বেশী হয়। শোভনার শ্রাদ্ধের আগেই সে সদরে স্বামীর কাছে চ'লে গেল। সেই আমার সঙ্গে তার শেষ দেখা।

মাঝে মাঝে তার চিঠি আস্‌তো, আমিও উত্তর

দিতাম। তার স্বামীও আমায় দিদি ব'লে বিশেষ খাতির কর্‌তো—মাঝে মাঝে এটা-সেটা পাঠিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা বজায় রাখ্‌তো।

রমার শেষ চিঠিগুলোতে প্রায়ই শোভনার কথা লেখা থাক্‌তো। সে নাকি প্রায় রাত্রেই আসে—তার সঙ্গে অনেক কথা কয়—এমন কি, তার মনের সাধ-আহ্লাদ মিটাবার সুযোগ-সুবিধা সে আগে থেকেই ক'রে দিত।

* * *

রমা যেন দিন দিন বিবর্ণ হ'য়ে যেতে লাগ্‌লো, শচীন্দ্র বড় বড় ডাক্তার-বৈদ্য দেখাতে লাগ্‌লো, কিন্তু কেউ কোন প্রতীকার কর্‌তে পারলেন না—শেষটা হাওয়া বদলের জন্য ওয়ালটেয়ার পাঠানর বন্দোবস্ত হ'ল। শচীন্দ্র ছ'মাসের ছুটী নিয়ে সস্ত্রীক পুলিশ থেকে ঠিক্ করা ভাল বাংলোতে গিয়ে উঠ্‌লো। সেখান থেকে তারা রোজই আমায় চিঠি দিত।

সেখানে পৌছবার পর পাঁচদিন পর শচীন্দ্রর চিঠিতে জানলাম যে, আগের চেয়ে অনেকটা ভাল বলেই বোধ হচ্ছে—একটু সাম্‌লে উঠ্‌লে তারা আমাদের এখানে মাসখানেকের মত অতিথি হ'য়ে থাক্‌বে।

রমার চিঠিতে শোভনার অত আদর-যত্ন মাখামাখি আমার ভাল ব'লে বোধ হ'ল না। মরা মানুষের সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়—শোভনার শ্বশুর-বাড়ীতে খবর নিয়ে জান্‌লাম যে, তার শ্রাদ্ধশান্তি সব হ'য়ে গেছে ; তবে গয়ার কাজটা পরে হবে, এখনও সময় নি।

আমার মনটা খুবই চঞ্চল হয়েছিল। গয়াতে পিণ্ডটা শীঘ্র দেবার জন্য চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম। মনের বিশ্বাস যে, প্রেতশীলায় পিণ্ড দিলেই নিশ্চয়ই সে রমার সঙ্গ ছাড়্‌বে।

দু'-চারদিন পরে রমার একখানা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, এখানের বাড়ীখানি বড় সুন্দর—যেন ঠিক্ একখানি ছবি। চারদিকে ফুলের বাগান—মাঝে মাঝে ফোয়ারা। হাওয়া বড় মনোরম—কিন্তু বড় ফাঁকা। উনি আর আমি, ঝি-চাকর ভিন্ন বড় আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে সাহেব মেম, ভাটিয়া, মান্দ্রাজী মেয়েছেলেরা আসে বটে, কিন্তু তারা আসে সঙ্কোচ নিয়ে।

আমার ইচ্ছা হ'ল যে ওঁকে বলি, দিনকতকের ছুটী নিয়ে একবার রমার ওখানে যাই। এ বিষয় জানিয়ে ছিলাম—কিন্তু তখন কাজের খুব চাপাচাপি ছিল ব'লে আস্‌ছে মাসে যাওয়া ঠিক্ ক'রে রমাকে পত্র দিলাম যে, আমরা শীঘ্রই তোমাদের অতিথি হব।

পাঁচ-ছ'দিন পরে চিঠি পেলাম যে, তারা দু'জনেই ভারি খুসী হ'য়েছে আমরা যাচ্ছি শুনে। আমরা গেলে তারা আকাশের চাঁদ হাতে পাবে। চিঠির শেষদিক্‌টা যা' প'ড়লাম, তা'তে মোটে ভাল বোধ হ'ল না, মনটা বড়ই দমে গেল। রমা লিখেছে, তিন সপ্তাহ পরে আজ দু'দিন রাত্রেই শোভনা আমার সঙ্গে দেখা ক'রে অনেক দুঃখ জানিয়েছে—তাকে না ব'লে চ'লে আসায় তার বড় কষ্ট হ'য়েছে—সেখানকার পেস্কারের কাছ থেকে আমাদের ঠিকানা নিয়ে এখানে এসেছে।

সে ঠিক্ তেমনিটিই আছে, কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নি। সেই রকম হাসি হাসি মুখ, সেই রকম প্রাণমাতান মিঠে সুরে আব্‌দার, বোধ হয় ম'রে গিয়ে তার প্রাণটা আরও সরল সরস হয়েছে।

ঘুম থেকে উঠে দেখি—আমার কাজ সব শোভনা সেরে রেখেছে। তার কাজকর্ম্ম আমার চেয়েও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার স্নান করবার ঘরে কাপড়খানি কুঁচিয়ে একপাশে রেখে দেয়—গামছা, তোয়ালে, সাবান, তেলের বাটী সাজিয়ে রাখে। শুধু যে আমার তা' নয়, ওঁরও অনেক কাজে সাহায্য করে ; এমন কি, বসে আছেন, ভাবলেন বাক্সটা খুলে একখানা বই আনি—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে বই দিয়ে গেল।

তিনিও এই সব দেখে বড় আশ্চর্য্য হন। কিন্তু এটা যে মোটেই ভাল নয়, তা' আমরা দু'জনেই বুঝি, কিন্তু উপায় নেই।

* * *

সপ্তাহ পরে শচীন্দ্রের পত্রে জান্‌লাম, কে এক অজ্ঞাতনামা তাদের সঙ্গে এমন আত্মীয়তা পাতিয়েছে যে, তারা উভয়েই বেশ একটু অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। দিনের বেলাটা বেশ চ'লে যায়; রাতটা কিন্তু বড়ই অশান্তিতে কাটে। দু'-চারজন দৈবজ্ঞকে জানান হয়েছিল; তাঁরা ভৌতিক কাণ্ড বলেন। শান্তি শীঘ্রই করান হবে।

আমি দেরী না ক'রে আমার অন্য কাজ ফেলে তখনি শোভনা ও রমার মধ্যে ছেলেবেলার ভালবাসা, দু'জনের বন্ধুতার কথা, শোভনার অপঘাতে মৃত্যু সমস্তই খুলে লিখে দিলাম; আরও জানালাম যে, তার গয়াতে শ্রাদ্ধ ও প্রেতশিলায় পিণ্ড দেবার জন্যও ওঁর শ্বশুর-বাড়ীতে জানিয়েছি—যাতে শীঘ্র হয় তার চেষ্টাও করছি। আমার বিশ্বাস যে, গয়ার কাজ হ'লে ও মুক্ত হবে—আত্মীক্ উদ্ধার হ'লেই তখন আর কোন উৎপাতই থাক্‌বে না।

উত্তরে জান্‌লাম যে, রমা শোভনা-ঘটিত কোন কথাই শচীন্দ্রকে জানায় নি। শচীন্দ্র বিলেত-ফের্ত্ত হ'লেও একেবারে নাস্তিক নয়। রমার জন্য যত টাকাই হোক্ সে অকুণ্ঠিতভাবে খরচ করবে। পত্রে আরও জানিয়েছে যে, শোভনার শ্বশুর-বাড়ীর ঠিকানা পেলে সে গয়ার কাজ-কর্ম্মের জন্য যত টাকার দরকার হবে পাঠিয়ে দেবে। রমা ঠিকানা বল্‌তে পারলে না যত শীঘ্র পারে ঠিকানা পাঠাবে।

আমিও সেই দিন রাত্রেই চিঠির উত্তর লিখে রাখ্‌লাম; সকালে উঠেই প্রথম ডাকে পাঠাব।

*　　*　　*

সকালে উঠে বেয়ারাকে ডেকে চিঠি দিতে গেলাম, দেখি তার হাতে একখানি পত্র। খামের ওপরের লেখা দেখেই বুঝ্‌লাম শচীন্দ্রের। অন্য কাজ রেখে আগে খামটা খুলে ফেল্‌লাম। সমস্ত চিঠিখানা প'ড়ে আমার সারা দেহটা যেন কেঁপে উঠ্‌ল; আমি তাড়াতাড়ি চিঠিখানা সদরের ঘরে ওঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

শচীন লিখেছে—"পরশু রাত্রে এখানে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড হ'য়ে গেছে। বিকেলে আমরা সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে বাসায় ফিরে এসে দেখি—বাংলোখানি কে যেন পত্রপুষ্পে এমন ক'রে সাজিয়েছে যে, দূর থেকে দেখ্‌লে একখানি ফুলের বাড়ীর মত দেখায়। এমন সুন্দর চিত্র-বিচিত্র করা, এমন লতায় পাতায় ফলেফুলে সাজান এমনতর ফুলের বাড়ী বড় বড় মজলিসে বা উৎসবে এমন কি, বিলেতেও দেখি নি। এরকম সুন্দর কল্পনাতেও আনা যায় না—এ যেন ঠিক কোন' স্বর্গপুরীর দৃশ্য।

"আমরা ফটকের কাছে যেতেই দরোওয়ানেরা ফটক খুলে দিলে। ফুলভরা গাছগুলি সব দুলে দুলে মাথা নীচু ক'রে আমাদের যেন অভ্যর্থনা করতে লাগ্‌লো। পাখীর কলতানে কানে যেন একটা মাদকতা ঢেলে দিলে।

"রমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, তার চোখ দুটো যেন বেশ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে—মুখখানিতেও হাসি মাখান। আমি তার দিকে চেয়ে বল্‌লাম—'এ দেখ্‌ছি তোমার বন্ধুর সব কীর্ত্তি—এ রকম ক'রে আমাদের জ্বালাতন করাটা কি তাঁর উচিত হচ্ছে ?'

"আমার মুখের দিকে তার বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দু'টী রেখে সে বল্‌লে—'কি করবো, বড় অবুঝ, বল্‌লে সে শোনে না। বলে—তোমাদের সুখের জন্য কাজ ক'রে আমি বেশ শান্তি পাই। আমায় এতে বঞ্চিত করো না।'

"দু'জনে হলে এসে ঢুকতেই চারদিক থেকে যেন অভ্যর্থনার মৃদু গুঞ্জন আস্‌তে লাগ্‌লো—সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য-যন্ত্রের মধুর আলাপ সারা বাংলোখানিকে মাতিয়ে হাওয়ায় ভেসে যেতে লাগ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আশপাশ থেকে প্রতিবেশীরা সব একে একে আস্‌তে লাগ্‌লো। প্রায়ই সন্ধ্যায় তারা আসে। সকলেই এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে, হৃদয়স্পর্শী মনোরম বাদ্যের ঝঙ্কারে মোহিত হ'য়ে গেল। তারা স্বপ্নরাজ্যে এসেছে কি! কোথায়? সে বিচার শক্তিও তারা হরিয়ে ফেলেছে।"

*　　*　　*

আমি চিঠিখানা ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে ওঁর প্রতীক্ষায় বসে আছি, এমন সময় অন্দরে এসে আমায় ব'ল্‌লেন

"আমি ত ভাল বুঝ্‌ছি না—ব্যাপারটা যে খুব সঙ্গীন,তার আর কোন ভুল নেই। ভাব্‌ছি, আজই শোভনার শ্বশুর-বাড়ীতে সত্যেনকে পাঠিয়ে দিই; সঙ্গেও গোটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিই—গয়ার কাজটা শেষ না কর্‌লে আমি কিছু ভাল দেখ্‌ছি না।"

সেই দিনের মেলে সত্যেনকে টাকা দিয়ে পাঠান হ'ল। জানান হ'ল, যদি আরো টাকার দরকার হয়, তবে গয়া থেকে তার করলেই তারে টাকা পাঠান হবে।

এই মর্ম্মে একখানি পত্র শচীন্দ্রের কাছেও পাঠান হ'ল। আমিও রমাকে আলাদা চিঠি সেই দিনেই লিখে বিকে-লের ডাকে দিলাম।

আমার সে রাত্রিটা ভাল ঘুম হ'ল না—কেমন একটা দুশ্চিন্তায় সারা দেহ মন আচ্ছন্ন ক'রে দিলে। সকালে উঠে কাজকর্ম্ম সেরে ঠাকুর-ঘরে যাচ্ছি, এমন সময় ডাকে শচীন্দ্রের একখানি পত্র পেলাম। সব কাজ ফেলে রেখে আগেই চিঠিটা খুলে এক নিশ্বাসে সবটা প'ড়ে ফেল্‌লাম। সে লেখা প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠা। শচীন্দ্র লিখেছে—

"সেদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ভিতর থেকে তালা দিয়ে দু'জনে শুই। রাত্রি তখন সাড়ে ন'টা হবে। আলোগুলো সব বেশ জোর ক'রে চারদিকে রোজই জ্বেলেই রাখ্‌তাম। সেদিন বিকেলে ওই কাণ্ড দেখে পুলিশের জনকতক সেপাই এনে রাত্রে বাড়ীর আশপাশে পাহারার বন্দোবস্ত ক'রে ম্যাজিষ্ট্রেটকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে সাহায্যের জন্য টেলিগ্রামও তখনি করেছিলাম। উত্তরও রাত্রে পেয়েছি—পুলিশ কমিশনর নিজে, ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব খোদ ও আরও জনকতক বিশিষ্ট পদস্থ কর্ম্মচারী সত্বরই এখানে আস্‌বেন। সকালে উঠে তাঁদের বাসের জন্য আমার খালি কামরা সাজিয়ে-গুছিয়ে দেব মনে কর্‌ছি, রমা বল্‌লে—'তোমায় কর্‌তে হবে না, সে আমি সব করিয়ে দেব।'

"রাত্রি বারটার সময় আমার ঘরের দরজায় কে যেন আস্তে আস্তে ধাক্কা মারছে, আর তার সঙ্গে চুড়ীর মৃদু শব্দও তালে তালে হচ্ছে। প্রথমটা ভাবলাম উত্তর দেব না—কিন্তু শেষটা তার করুণ ডাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'কে?' শুন্‌লাম, শোভনা। রমার কাছে তার একটু বিশেষ দরকার আছে—আজ রাত্রেই দেখা কর্‌তে হবে।

"রমা তখন বেশ শান্তিতে ঘুমোচ্ছিল। আমি আস্তে আস্তে উঠে দরজার কাছে এলাম। বেশ ক'রে তাকে বুঝিয়ে অনুরোধ ক'রে বল্‌লাম—কাল সকালে দেখা কর্‌বেন। আজ ওর শরীরটা খুবই খারাপ, বড়ই ক্লান্ত, ঘুমের ব্যাঘাত কর্‌বেন না। বোধ হয় কি ভেবে চ'লে গেল। তারপর থেকে আর ঘুমই হ'ল না। সমস্ত রাত বিছানায় শুয়ে এ পাশ ও পাশ কর্‌তে লাগ্‌লাম—নানান ভাবনায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌লে। রাতটা পোহালেই সাহেবরা সব আস্‌বেন,তখন পরামর্শ ক'রে যা' হয় কর্‌বো। শোভনার শ্বশুর-বাড়ীর ঠিকানা পেয়েছি, সেখানেও টেলি-গ্রাম বিকেলে করেছি। আতিথ্যটা আজকালের মধ্যে গ্রহণ কর্‌লে বড় সুখী হ'তাম। রমার একজন সঙ্গীর বিশেষ আবশ্যক।"

* * *

সেইদিন বৈকালের ডাকে রমার একখানি চিঠি পেলাম—এইখানি তার শেষ পত্র। সে লিখেছে—"ভাই, তুমি আসবে শুন্‌লাম; কিন্তু বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না—শোভনা আমায় ছাড়তে পারবে না। সে বল্‌ছে—এক্‌লা তার বড্ড অভাব, বড় কষ্ট বোধ হচ্ছে। তাকে বল্‌লাম—'তুইও এখানে আমার সঙ্গে থাক্।' সে রাজী নয়—বলে তা'তে সংসারের নাকি অকল্যাণ হবে। স্বামীর ভালমন্দ শুন্‌লে নারীর প্রাণটা কেমন হয়, তা' ত বুঝ্‌তে পারছো? স্বামীর জন্য স্ত্রীর তুচ্ছ প্রাণটা দেওয়া কিছু মস্ত শক্ত নয়—হাস্‌তে হাস্‌তে দিতে পারে। আমি তারই সঙ্গে যাব, একরকম ঠিক্ করেছি। দিনটাও বলে রাখি—অমাবস্যার মধ্যে।"

আমি চিঠিখানি ওঁকে দেখিয়ে তখনি সেইখানি রেজেষ্টারী ক'রে শচীন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলাম।

শোভনার শ্বশুর-বাড়ী থেকে সত্যেন টেলিগ্রাম করেছে যে, কাল তারা গয়ায় যাবে; শোভনার স্বামীই সেখানকার সব কাজ কর্‌বে।

বিকেলে সত্যেনের আর একখানি টেলিগ্রাম পেলাম।

লিখেছে—শচীন্দ্রবাবুর প্রেরিত একশত টাকা তারা আজ পেয়েছে। শ্রাদ্ধটা বেশ ঘটা করেই হবে। এখান থেকে আরও জনকতক যাবে। বোধ হয় আমাদের টাকা খরচ হবে না। গয়ার কাজ হ'য়ে গেলে ওইখান থেকে আমি দিল্লী যাব।

টেলিগ্রাম পেয়ে উনিও শচীন্দ্রকে তারে জানালেন—কাল ওরা গয়াতে যাচ্ছে। পরশু শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেলেই সমস্ত উৎপাত যাবে—কোন ভয় নেই। তোমার টাকা ওরা পেয়েছে। এই ক'টা দিন খুব হুঁসিয়ার থাকতে হবে।

রাত্রে শচীন্দ্রের টেলিগ্রাম পেলাম। বেশ বড় গোছের লিখেছে—"সাহেবরা সব এসেছেন। তাঁরা ভূত মানেন না। যতকিছু রকমের সুবন্দোবস্ত করবার তাঁরা সব করেছেন। 'পুরী' থেকে দু'জন খুব ভাল রোজাও এসেছে। পত্র দিলাম; অন্যান্য সংবাদ তা'তে আছে।"

রাত্রিটা কোনরকমে কেটে গেল। সেদিন রবিবার। আদালত বন্ধ; রান্নার তাড়াও নাই। যদিও বামুন আমাদের সবই করে, তবু ছুটির দিন হ'লে দু'-একখানা তরকারী আমি নিজে করি।

সকালের কাজকর্ম্ম সেরে খানকতক ফুলকো লুচী ও হালুয়া ক'রে ওঁকে খেতে দিলাম। চাকরে চা ক'রে এনে দিয়ে গেল।

আমি কাছে ব'সে রমার কথাই বলছি, এমন সময় চাকর ডাকের চিঠি দু'খানা এনে দিয়ে গেল। একখানা খুব পুরু, বোধ হয় আট-দশ পাতা লেখা; আর একখানা পাতলা, সেখানা আমার নামে। ঠিকানার অক্ষরগুলি রমার নয়—কাঁচা হাতের লেখা দেখেই বুঝতে পারলাম। দুটোতেই ওয়ালটেয়ারের ছাপ আছে।

পুরু খামখানা উনি চা খেতে খেতেই খুললেন। আমি পাতলাখানা খুলে যা' পড়লাম, তা' বলবার নয়—আমি তখন কেমন হতভম্ব হ'য়ে গেলাম—হাতটা কেঁপে উঠলো—চিঠিখানা হাত থেকে প'ড়ে গেল।

আমার যখন জ্ঞান হ'ল দেখলাম, আমার মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে মাথার চুল বুকের কাপড় ভিজিয়ে দেছে। উনি বসে আছেন। ঝি মাথায় জোরে জোরে বাতাস করছে। আমি ওঠবার চেষ্টা করলাম। উনি বারণ করলেন বটে, কিন্তু আমি তাচ্ছিল্য ক'রে সেটা উড়িয়ে দিলাম। উঠে বসলাম—তখনও মাথাটা বেশ ভার।

আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"বেশ সুস্থ বোধ করছো ত?" আমি উত্তরে জানালাম—"হ্যাঁ, ও কিছু নয়।"

উনি বললেন—"এখন ওসব চিঠি পড়বার দরকার নেই। খাওয়াদাওয়ার পর পড়বে।" এই ব'লে তিনি আমার হাত থেকে প'ড়ে যাওয়া চিঠিখানি তুলে নিয়ে বাহিরে চ'লে গেলেন।

চিঠিতে লেখা ছিল—"দিদি, আমায় ভোল নি নিশ্চয়। আমার যে কি কষ্ট, তা' তোমায় বোঝাবার নয়—আমার সময়ও নেই। আমি রমাকে ছাড়তে পারবো না। হয় ত বা কিছুদিন পরে ওকে নিয়ে যেতাম; কিন্তু সে সুযোগও তোমরা নষ্ট করছ—আমায় এই অমাবস্যার মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। বাড়ীতে এত সব লোক এসেছে যে, আমি দুটো প্রাণের কথাও রমাকে বলতে পারছি না—তাই তোমায় দু'-একটা কথা জানিয়ে দিলাম। আমার দোষ নাই।

"রমার স্বামী আর জন্মে আমার স্বামী ছিল। ঠিক্ এমনি সুপুরুষ। তবে সে জন্মে অস্থি-চর্ম্মসার রুগ্ন—আর এজন্মে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। আমার ওপর বড় অত্যাচার করতো। ভয়ানক মাতাল ও লম্পট ছিল। বিনা দোষে আমায় ভয়ানক নির্য্যাতন করত। এক-একবার হাত পা মুখ বেঁধে আমার ওপর এমন অত্যাচার করত যে, মানুষ হ'য়ে তা' কখন পারে না—আর সে যে কি রকম রাক্ষুসে কাণ্ড, তাও লিখে বোঝাতে পারবো না। আমি নীরবে সব সহ্য করতাম। কিন্তু এখন আর নয়। সময় পেয়েছি—তাই ওর বড় সাধের প্রাণের প্রাণ রমাকে ওর কাছ থেকে নিয়ে চললুম। রমার বিরহে আজীবন দগ্ধে দগ্ধে তিলে তিলে মরবে, তবে আমার অসহ্য জ্বালার কতকটা শান্তি হবে। ওরই মুণ্ডপাত কোরবো ভেবেছিলুম—আর কোরতুমও তাই; কিন্তু রমার মুখ চেয়ে তার সর্ব্বনাশ করতে বুকটা কেঁপে উঠলো, কাজেই এই

রাস্তা নিতে হ'ল। রমার যেতে ইচ্ছে নেই ; ওর স্বামীর জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে—স্বামীকে ছেড়ে স্থির হ'য়ে থাকতে পারবে না। ইচ্ছে ছিল বছর কতক পরে নিয়ে যাব—রমা আমাকে ওর সঙ্গে থাকতেও বলেছিল—কিন্তু ওর স্বামীর সঙ্গে আমার থাকা হ'তে পারে না ; কেন না, যাকে আমি ঘৃণা করি—যার অত্যাচারে আমি সারাজীবনটা দগ্ধে দগ্ধে মরেছি—তার সঙ্গে—তাকে চোখের উপর দেখে কেউ কি থাকতে পারে? যাক্, মনের সব কথা তোমাদের জানাতে পারলাম না, সময় খুবই কম—তার ওপর এরা রীতিমত নানা গোলযোগ বাধিয়েছে। আমার প্রণাম নিও। কিছু মনে করো না।

শোভনা"

একটু পরেই উনি বাহির থেকে এলেন। মুখ চোখ বেশ লাল। এসেই বললেন—"আজই সাহেবকে ব'লে পাঁচ-ছ'দিনের মত ছুটী নিয়ে মেলে চ'লে যাই।"

আমার কেমন সাহস হ'ল না। বললাম—"অমাবস্যাটা ভালয় ভালয় কেটে যাক্, তারপর দু'জনেই যাব। শোভনার চিঠিতে বেশ স্পষ্ট ক'রে লেখা আছে যে, যেমন করেই হোক্ অমাবস্যার মধ্যে তাকে সব কাজ শেষ করতে হবে ; কেন না, ও বুঝতে পেরেছে যে, গয়ায় শ্রাদ্ধ করলেই ওর সব চালাকি ভেঙ্গে যাবে, প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

"তবে আমি শুনেছি, ভূতেরা যা' বলে তা' ঠিক্ করে—কিছুতেই কেউ কিছু করতে পারে না। আমরা যে ভেতরে ভেতরে ওর উদ্ধারের চেষ্টা করছি, সেটা ও বেশ বুঝতে পেরেছে—তাই লিখেছে যে, যদি উদ্ধারের চেষ্টা আমরা না করতাম, তা' হ'লে বোধ হয় এত শীঘ্র রমাকে হারাতে হ'ত না।"

উনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"তা'হ'লে রমার সর্ব্বনাশের জন্য ধরতে গেলে আমরাই দায়ী ; কেন না, কেউ ত এ বিষয়ে চেষ্টা করে নি—প্রথমেই আমরা করি। কোনরকমে যদি অমাবস্যাটা কেটে যায়, তবে রমার অনিষ্টের আর ভয় থাকবে না।" এই ব'লে তিনি টেলিগ্রাম করতে চ'লে গেলেন।

উনি চ'লে যাবার পরেই আমি উঠলাম। সেই পুরু চিঠিখানিতে কি লেখা আছে দেখবার জন্য প্রাণটা অস্থির হ'য়ে উঠলো। চিঠি নিয়ে এসে খুলে পড়লাম—কি সর্ব্বনাশ! শচীন্দ্র যা লিখেছে প'ড়ে হাত পা যেন সব পেটের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগলো। সে লিখেছে—"ভূতের সঙ্গে মানুষের লড়াই জীবনে এই প্রথম দেখলাম। কাল সকাল থেকেই আকাশটা মেঘে ঢাকা, বাতাসও মন্দা। সাহেবরা সকালের চা খাবার খেয়ে শোভনার বিষয় নিয়ে নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন।

"রোজারা নানান মন্ত্র প'ড়ে সরষে, ধান, কড়ি, ছেঁড়া চুল সব বাড়ীর আশেপাশে পুঁতে দিলে, মাঝে মাঝে এখানে সেখানে সরষে ছড়িয়েও দিলে। একরকম লতা এনে রমার চুলেতে বেঁধে দিয়ে বললে—'যদি এ লতা চুলের সঙ্গে থাকে—তবে ভূতের বাবারও সাধ্য নেই যে, ওর কোন' ক্ষতি করতে পারে।' আমি মনে কতকটা সাহস পেলাম বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পেলাম না।

"রমাও এ ক'দিন যেন আমায় তার চিরসঞ্চিত প্রেম, ভালবাসা, সোহাগ সব ঢেলে দিয়ে আমায় পাগলের মত ক'রে তুলেছে। তার চোখ দুটো সব সময়েই অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে রেখে সে এক অতুল আনন্দে বিভোর হ'য়ে রয়েছে।

"স্নান আহার এ ক'দিন সময়ে করছে না—আমার সঙ্গ সে ছাড়তে চায় না। সাহেবদের কাছেও অমনি অকুণ্ঠিতচিত্তে সরল মনে মেলামেশা করছে।

"কাল হঠাৎ রমার সাধ হ'ল যে, সে নিজে খাবার ক'রে অতিথিদের খাওয়াবে। আমি আপত্তি করলাম। পুলিশ-সাহেবও দু'-একবার জানিয়েছিলেন যে, একটু ভাল হ'য়ে করলেই হবে।

"সেদিন মধ্যাহ্নে সবাই রমার হাতের রান্না খেয়ে খুব সুখ্যাতি করলেন। খাওয়াদাওয়ার পর আমরা হলঘরে সবাই এসে বসলাম। রমা আমার পাশেই আরামকেদারায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

"একটু পরেই পাশের ঘর থেকে আস্তে আস্তে রমার নাম নিয়ে চাপা গলায় মেয়েলী সুরে কে ডাকৃতে লাগ্‌লো। আমার বুকের ভেতর 'ছাঁৎ' ক'রে উঠ্‌লো—এই সেই সেদিনের রাত্রের স্বর! পুলিশ-সাহেব তাঁর পিস্তলটা ঠিক ক'রে নিয়ে পাশের ঘরের দিকে উঠে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার-সাহেবও কি মনে ক'রে গেলেন।

"রমা তখনও বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে—তার ঘুমের ব্যাঘাত যাতে না হয়, এ জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব খুব আস্তে আস্তে গল্প করৃছিলেন।

"পুলিশ-সাহেব যাবার মিনিট দুই পরেই একটা বিকট হাসির রোল বাঙ্‌লোখানিকে কাঁপিয়ে তুল্‌লে। রমার ঠোঁট দু'টী আস্তে আস্তে সামান্য একটু কেঁপে উঠ্‌লো—সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের আওয়াজ—কিন্তু একটা হাসির রোলে সে শব্দটা চাপা দিয়ে ফেল্‌লো।

"ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব রমার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে আমায় বল্‌লেন—আপনি কাছে থাকুন; আর এঁরা সবাই রইলেন। আমি ব্যাপারটা দেখে আসি। দিন দুপুরে এ কি কাণ্ড!

"একটু পরেই ডাক্তার-সাহেব পুলিস-সাহেবকে ধ'রে হলঘরের মাঝখানে খোলা জান্‌লার পাশে আরামকেদারায় শুইয়া দিলেন। পকেট থেকে একটা শিশি বার ক'রে দু'-চারবার শুঁকিয়ে দিলেন। তার তীব্র গন্ধটা হলঘরময় ছড়িয়ে পড়্‌লো।

"ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব ঘরে ঢুকে একবার ডাক্তার-সাহেবের কাছে গেলেন। আস্তে আস্তে কি কথা ব'লে আমার কাছে তাঁর আসনে এসে ব'সে বল্‌লেন—'আশ্চর্য্য! মিষ্টার ষ্টিফেনের মত অতবড় বীর, অমন যোদ্ধা এ বাঙ্‌লায় খুব কমই আছে; ডাক্তার-সাহেব সিভিল সার্ভিসের লোক হ'লেও একজন ভাল যোদ্ধা। সেপাইরাও কর্ম্মদক্ষ ও সাহসী।

"ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে মানুষকে দেখ্‌তে পেয়ে ষ্টিফেন দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—'কে তুমি, রমাকে ডাকছো কেন?'

"মেয়েটা হেসে উঠ্‌লো। ষ্টিফেনও দরজার দিকে পিঠ রেখে রিভলভার তুলে বল্‌লে—'এ বাড়ীতে কি ক'রে ঢুকলে—সত্যি কথা বল', নইলে গুলি করৃবো।'

"মেয়েটা বল্‌লে—'গুলি করবার আগে তোমার অবস্থাটা কি হ'তে পারে, সেটা একবার মনে ভেবে গুলি করলে ভাল হয়।'

"ষ্টিফেন ঘোড়া টিপ্‌লেন; আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও ঘাড়ের উপর এসে তাঁকে মাটিতে ফেলে গলা টিপে বুকে হাঁটু দিয়ে বস্‌তেই, ডাক্তার ফিচেল সজোরে এক লাথি মেরে মেয়েটাকে ফেলে দিলেন। দিতেই মেয়েটা হো হো ক'রে হেসে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখ্‌তে পেয়েই দু'জন সেপাইকে ওর পাছু নিতে পাঠিয়ে ষ্টিফেনের চৈতন্যের জন্য হলে পাঠিয়ে দিয়ে ফটকের দিকে গেছ্‌লাম। শুন্‌লাম, মেয়েটা বাগানের ভেতর খানি-কটা দৌড়দৌড়ি ক'রে শেষটা কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল—আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পাহারার বন্দোবস্ত ক'রে তবে আস্‌ছি।

"মিষ্টার ষ্টিফেন বেশ একটু সুস্থ হ'য়ে আমার সুমুখে তাঁর আসনে এসে বস্‌লেন। তাঁর চোখ দুটো বেশ লাল। বসেই বল্‌লেন—'আমি প্রতিজ্ঞা করৃছি, ও মেয়ে-টাকে যেমন করেই হোক্ ধরৃবো। আমি আগে জানতে পারৃলে দেখ্‌তাম কেমন ক'রে ও আমায় ফেলে দিত। ওঃ! কি আশ্চর্য্য! তার হাত দুটো যেমন নরম, তেমনি বরফের মত ঠাণ্ডা—ও হাত খানিকক্ষণ গলায় চেপে ব'সে থাক্‌লেই রক্ত জমাট বেঁধে মারা যেতে হ'ত।'

"রমা তখনও বেশ শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। ষ্টিফেনের মুখের দিকে চেয়ে আমি বল্‌লাম—'মুখখানা কি দেখ্‌তে পেয়েছিলেন?'

"ষ্টিফেন্—'না; তবে ঘোমটার কাপড় ভেদ ক'রে যেন চোখ দু'টো থেকে আগুন ঠিক্‌রে বার হচ্ছিল।'

"আমি—'সে কি খুব মোটা?'

"ষ্টিফেন্—'না না, ছিপ্‌ছিপে পাত্‌লা; তবে গায়ে অসীম জোর—অমানুষিক শক্তি।'

"আমি—'ভূতেদের শুনেছি অস্তিত্ব নেই—তবে কি ক'রে লড়াই করৃলে?'

"ফিচেল—শুনেছি, তারা মায়ার দ্বারা নানা রকম হ'তেও পারে; এ দু'-চারজনের মুখে বাঙলা দেশেই শুনেছি।'

"আমি—'আপনার কি মনে হয়, কাল রাতটা ভালয় ভালয় কেটে যাবে?

"ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব বেশ বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বল্লেন—'ও—নিশ্চয়! আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও কিছু করতে পারবে না।'

"এমন সময় হঠাৎ বাহিরে একটা গোলমাল হ'তেই সাহেবেরা সব সেই দিকে চ'লে গেলেন। রোজা দু'জন, আমি ও রমা ঘরে রইলাম। বেলা তখন চারটে বেজে গেছে।

"শব্দটা ক্রমে এমন বেড়ে গেল যে, আশপাশ থেকে লোকেরা সব এসে উপস্থিত। রমারও ঘুম ভেঙে গেল। এ বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত রমা একদিনও এমন শান্তিতে এতক্ষণ ঘুমায় নি।

"ঘুম থেকে উঠেই আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—'অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি, বেলাও শেষ হ'য়ে আস্‌ছে, চায়ের সময় হ'য়ে গেছে, সাহেবদের টিফিন দেওয়া হয় নি?' এই ব'লে সে উঠ্‌লো; দু'-একবার আলস্য ভেঙে, বাথ্‌রুমের দিকে চ'লে গেল। রোজারা ইঙ্গিতে আমায় জানালে—সঙ্গে থাকবেন

"গোলমাল আর বন্দুকের আওয়াজটা ক্রমশঃ বেশ বেড়ে যেতেই লাগ্‌লো। রমা মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে এসে বল্লে—'ব্যাপার কি?' এই ব'লে আমার সঙ্গে একেবারে বারান্দার সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। রোজারাও পেছনে দাঁড়াল।

"রমা যেতেই খুব একটা হাসির তরঙ্গ ফুলবাগানের চারিদিকে অনেক্ষণ ধ'রে ছুটোছুটি করতে লাগ্‌লো।

"বাগানের মাঝখানে ফোয়ারার গায়ে হেলান দিয়ে একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল। পরণে ঢাকাই শাড়ী, চওড়া লাল পাড়। রঙটা খুব ধব্‌ধবে তা' দেখেই বোঝা যায়।

"রমা তাকে দেখেই শিউরে উঠে আমায় বেশ শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধর্‌লে। আমিও রমাকে ধরে রইলাম। রোজারা মন্ত্র প'ড়ে কতকগুলো সরষে ছড়িয়ে দিলে; গোটাকতক মেয়েটার দিকেও ছুঁড়লে।

ঠিক জানি না সরষে মেয়েটার গায়ে লেগেছিল কি না—সে কিন্তু এমন একটা বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো যে, অনেকে ভয়ে আঁৎকে উঠেছিল। সে শব্দে ওখানকার লোকেরা প্রায় সবাই পালিয়ে গেল।

"সাহেবরা উপর্য্যুপরি চার পাঁচ বার গুলি করলেন। ফোয়ারার সিমেণ্ট কতকটা ভেঙে গেল। মেয়েটা একবার ঘোমটার আবরণ খুলে সবার দিকে চেয়ে খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লো।

"কি ভয়ানক! ও রকম মুখ হ'তে পারে, স্বপ্নেরও অগোচর—সে লিখে জানাবার বা মুখে বোঝাবার নয়। কেবল হাড়গুলি সাজানো—চক্ষু কোটর মধ্যে—তা'তে জলন্ত ভাঁটার মত দুটো আগুনের গোল ঘুর্‌ছে—মাঝে মাঝে তার ভেতর থেকে আগুনের ঝল্‌কা ঠিক্‌রে বার হচ্ছে।

"রম দেখেই আমার কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজ্‌লে। সাহেবেরা প্রথমটা দমে গেলেও তখনি অসীম সাহসে এসে তাকে ঘেরাও ক'রে গুলি ছুঁড়লেন—মেয়েটা পালাবার জন্য উঁচু দিকে শূন্যে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

"গুলির পর গুলি। কিন্তু আশ্চর্য্য! মেয়েটা ঠিক সেই রকম আস্তে আস্তে উপরে উঠে শেষটা একবারে মিলিয়ে গেল।

"সাহেবরা ফিরে এসে একে একে বাথ্‌রুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে কাপড়চোপড় ছেড়ে বাগানে এসে বস্‌লেন। টিফিন্‌ এল। রমাও তখন বেশ সাম্‌লেছে; সেও আমার সঙ্গে টিফিনে যোগ দিলে। টিফিনের সময় কেউ কোন কথা বল্‌লেন না। টিফিনের পর রোজাদের ডেকে পাঠান হ'ল।

* * *

"রোজাদের মধ্যে যে প্রবীণ, সে এসে বল্লে—'আজ চতুর্দ্দশী রাত্রি বারটা, তেতাল্লিশ মিনিট পর্য্যন্ত আছে। তারপরই অমাবস্যা কাল রাত্রি বারটা কুড়ি মিনিট পর্য্যন্ত থাকবে। আজকের রাতটা ঠিক্‌ এই রকম ক'রে যদি কাটান যায়, তবে কাল আর তত ভাবনা থাকবে না।'

"দ্বিতীয় রোজা বল্‌লে—'যে লতা চুলের সঙ্গে আছে সেটা যদি খুলে প'ড়ে না যায়, তবে কিছুতেই ওঁর অনিষ্ট হবে না এটা জোর ক'রে বল্‌তে পারি।'

"রমা একবার তার খোলা চুলের গোছাটা সুমুখ দিকে টেনে এনে দেখ্‌লে, যে, ঠিক্ বিনিয়ে রাখাই আছে।

"সাহেবরা এই সব কাণ্ড দেখে রোজাদের উপর কিছু কিছু বিশ্বাস যে করেছিলেন, সেটাও স্পষ্ট বোঝা গেল।

"ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব বল্‌লেন—'কতকগুলো 'পঞ্চ-লাইটে'র বন্দোবস্ত আমি করেছি। বাগানে, বাড়ীর আশে-পাশে, রাস্তার চারদিকে টাঙিয়ে দেওয়া হবে—রাতটাকে দিনের মত ক'রে রাখ্‌তে হবে।'

"ষ্টিফেন বল্‌লেন—'খুব ভালই হবে। আমিও বল্‌বো ভাবছিলাম।'

"ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব বল্‌লেন—'শুধু তাই নয়, ছাদের উপর জনকতক পুলিশ লাঠি ও বন্দুক নিয়ে থাক্‌বে। তারপর বাংলোর চারিদিকে দস্তুরমত কড়া পাহারা ত থাক্‌বেই।' রোজাদের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—'আজ তোমরা ঘুমুতে পার্‌বে না—রমা দেবীর কাছে সব সময় তোমাদের যত বড় বড় মন্ত্র তন্ত্র আছে তাই নিয়ে থাকবে।'

"এই রকম বন্দোবস্ত সব ঠিক্ হ'য়ে গেল। পিস্তল ও বন্দুকে রীতিমত গুলি বারুদ ভরা রইল। পঞ্চ লাইট সত্য-সত্যই চারিদিকে টাঙান হ'ল।

"রমা কিন্তু তারপর থেকে আর হাসে নি। তার মনোরঞ্জন করবার জন্য সবাই চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছু হ'ল না। আমাদের সঙ্গে চা না খেয়ে এক গেলাস সরবৎ শুধু খেয়েছিল—তাও অনিচ্ছায়।

"আজ এই পর্য্যন্ত সংবাদ দিলাম। পরের খবর কালকের মেলে যাবে। টেলিগ্রাম পেয়েছি, তারা অমাবস্যার দিন বেলা দশটার মধ্যে কাজ শেষ করবে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ভালয় ভালয় রাতটা কেটে যায়।

"ভাল কথা। রমা এখন মাঝে মাঝে কেঁপে উঠ্‌ছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হচ্ছে, মুখখানি কেমন ভয়ে শুকিয়ে গেছে। তার চেহারা দেখ্‌লে সত্যি বুক ফেটে চোখে জল আসে।

"তাকে সাহস খুব দিচ্ছি। সে আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে আছে—যেন তার প্রাণটায় খুব আতঙ্ক হয়েছে।"

উনি টেলিগ্রাম ক'রে ফিরে ঘরে এসে বল্‌লেন—"চিঠিখান পড়্‌লে? কি ব্যাপার বুঝ্‌লে? এ রকম ত আজ পর্য্যন্ত কোন কেতাবে পড়ি নি, বা কারো মুখেও শুনি নি। আমার বিশ্বাস—রমাকে কিছুতেই রাখা যাবে না। ভূতেদের অসাধ্য কিছুই নেই; ওরা ভালও কর্‌তে পারে, আবার মন্দও করে।"

তাঁর কথা শুনে মনটা আমারও কেমন ক্ গাইতে লাগ্‌লো। ভালর চিহ্ন কিছুই দেখ্‌লাম না। রমার মুখে হাসি নাই, উৎসাহ নাই। সে জীবনে একদিনও নিরানন্দে থাক্‌তে পারতো না, সুখে দুখে সব সময়েই তার মুখে হাসি লেগে থাক্‌তো, চোখ জলভরা হ'লেও মুখ সদা হাস্যময়ী ছিল। তার এরকম পরিবর্ত্তনে আমার মনটা দমে গেল। কে যেন কানে কানে ব'লে গেল—"আজ আর রাত কাটবে না। শোভনা তাকে নিয়ে যাবেই যাবে।"

গাটা শিউরে উঠ্‌লো। মুখে চোখে জল দিয়ে পূজার ঘরে চ'লে গেলাম।

উপসংহার

পরের দিন সাতটার সময় টেলিগ্রাম এলো—"সব শেষ! রমা নাই!"

প্রাণটা ডুকুরে কেঁদে উঠ্‌লো। বাল্যের ছবিগুলি চোখের সাম্‌নে একে একে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তার অভাব, তার বিরহ আমার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো।

শেষটা কি ক'রে মারা গেল জানবার জন্য বড় অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লাম। উনি টেলিগ্রামের কি জবাব দিলেন তা' জানি না; আর জিজ্ঞেস কর্‌বার সময়ও পাই নি। সেদিন সোমবার। আদালত আছে। ঝি-বামুনেরা আমার অবস্থা দেখে নিজেরাই সুবিধামত রান্নাবান্না করলে। আমার আর সেদিন খাওয়াদাওয়া হ'ল না। কেবলি

রমার হাসি হাসি মুখ, তার লাজনম্র সরল সরস মধুর কমনীয়তা আমায় অস্থির ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌লো। বিবাহের পর এই দীর্ঘ ক' বৎসর একে একে চ'লে গেছে। একদিনও রমাকে ভাব্‌বার সময় পাই নি। চিঠি এসেছে উত্তর দিয়েছি। কিন্তু কই, এত গভীরভাবে বুকের মধ্যে এরকম ক'রে সে ত একদিনও ভেসে ওঠে নি। কোনরকমে সেদিন রাতটাও কেটে গেল। সকালে প্রথম ডাকেই চিঠি এল—

"অনেক চেষ্টা ক'রেও রাখ্‌তে পার্‌লাম না। দস্তুরমত ভূতে মানুষে লড়াই রাত্রি আটটা থেকে ন'টা পর্য্যন্ত হয়েছে। কি চীৎকার! কি ভয়ানক প্রাণ কাঁপান হাসি! কল্পনাতেও আন্‌তে পারা যায় না।

"রমা সন্ধ্যার পর থেকেই কেমন নিঝুম নিস্তেজ হ'য়ে গেল। রাত্রিতে কিছুই খায় নি—আট্‌টার কিছু আগেই ঘুমিয়ে পড়্‌লো। আমি রমাকে ও রোজাদের নিয়ে হল-ঘরেই রইলাম; শোবার ঘরে গেলাম না।

"তিন তিনজন ষণ্ডামার্ক সাহেবকে ওই একটা মেয়ে হিম্‌সিম্ খাইয়ে দিলে। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবকে দু'-দুবার দালান থেকে বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তেড়ে তেড়ে যতবার ঘুরে ঢুক্‌তে এসেছে, ততবারই বাধা পেয়েছে, ততবারই লড়াই বেধেছে।

"রোজারা ঢোকবার পথ মন্ত্র দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখেছিল। তারা বল্‌লে—'আট্‌কাবেন না, ছেড়ে দিন। কি ক'রে ঢোকে, আর কত বড় ভূত আমরা তাই দেখতে চাই।'

"সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোলে বাংলো খানা কেঁপে উঠল। অত গোলমালে, অত শব্দে রমার ঘুম ভাঙ্‌লো না। সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে কেবল ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠ্‌ছে, কখন বা মুখখানি ম্লান হ'য়ে যাচ্ছে।

"সাহেবরা দূরে স'রে দাঁড়াতেই দরজার কাছে এসে রমার নাম ক'রে বারকতক ডাক্‌তেই রমা ধড়মড় ক'রে চম্‌কে উঠ্‌লো। চারদিকে চেয়ে আমাকে পাশে দেখ্‌তে পেয়েই জোর ক'রে হাস্‌তে গেল, কিন্তু পারলে না। ছল-ছল চোখে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে—'আমি যাচ্ছি—আমার কাজ আছে—তোমায় ছেড়ে যেতে আমার প্রাণটা ফেটে যাচ্ছে!' এই ব'লে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লো। আমিও তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে তার খোলা চুলগুলি গুছিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বল্‌লাম—'ছি, কাঁদ্‌ছ কেন? দেখ্‌ছো না, বড় বড় সব সাহেবরা, রোজারা তোমার জন্য আজ ক'দিন থেকে কিরকম প্রাণপাত চেষ্টা কর্‌ছেন। কোন ভয় নেই! আমার বুকের ধন তুমি, আমার বুকেই থাক—কে তোমায় ছিনিয়ে নে যাবে!'

"কথার সঙ্গে সঙ্গে হাসির তরঙ্গ হলখানাকে প্রতিধ্বনিত ক'রে আমার বুকটাকেও কাঁপিয়ে দিলে।

"মেয়েটা দরজা থেকে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—'রমাপতি! শচীন্দ্র! আমায় চেন কি? গত জন্মের কথা মনে পড়ে কি?' সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি। হাসির লহরটা কমে এলে আবার বল্‌লে—'আমি নিয়ে যাব আমার সইকে, তোমায় দগ্ধে দগ্ধে তিলে তিলে মারবার জন্য। রাত্রি এখন এগারটা। আর আধ ঘন্টা সময় দিলাম—সাধ-আহ্লাদ জন্মের মত মিটিয়ে নাও। তোমার রোজার ঠাকুর্দ্দাকেও আমি ভয় করি নি।'

"সঙ্গে সঙ্গে তুমুল ঝড়। আলোগুলো রাখা গেল না—সমস্ত নিভে ঘরবাড়ী বাগান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। সাহেবদের 'টর্চ'গুলোর আলোতে জমাট অন্ধকারের মধ্যেও তবু কিছু দেখা যাচ্ছিল।

"ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের টর্চ খুব বেশী পাওয়ারের ছিল। তিনি উঁচু ক'রে হলের মধ্যে আলো ফেল্‌লেন। সবাই মহা আতঙ্কে অভিভূত—তার মধ্যেও সাহেবরা মেয়েটাকে ধরবার জন্য চেষ্টা কর্‌ছেন।

"হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে ঘরের জিনিষ-পত্র উল্‌টে দিলে। রোজারা চীৎকার ক'রে উঠল। রমা আমার বুকের উপর একবার শুধু কেঁপে উঠ্‌লো—সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা আমার কাঁধের উপর থেকে 'কাৎ' হ'য়ে প'ড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি মাথাটা বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আদর ক'রে ডাক্‌লাম—কিন্তু সাড়া নেই! জোরে ডাক্‌লাম—উত্তর নেই!

"দুর্য্যোগ সব থেমে গেছে। আকাশ নক্ষত্রে ভরা। বাগানের, বাড়ীর, রাস্তার সব আলোই পূর্ব্বের মতই জোরে জ্বল্‌ছে। ভাল ক'রে দেখ্‌লাম—রমার প্রাণ নেই! দেহ ক্রমে হিম হ'য়ে আস্‌ছে। চুলের সঙ্গে যে লতাটা বাঁধা ছিল, সেটা চেয়ারের তলায় প'ড়ে আছে। উঃ! ভূতের এরকম প্রতিশোধ হ'তে পারে! হাত কাঁপছে, আর লিখ্‌তে পার্‌লাম না।

সুদেব চট্টোপাধ্যায়

শিলং ভ্রমণ

সেখ্ মোহাম্মদ ইয়ারল

অনেকদিন হইতে শিলং যাইবার ইচ্ছা ; কিন্তু সেটা যে কোনদিন পূর্ণ হইবে, তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। শিলংয়ের একটী ছেলে কলিকাতায় আসিয়া আমার সহপাঠী হওয়ায় তাহার উদ্যোগ ও চেষ্টায় এতদিনে বাসনা সফল হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছুদিন পরে শিলং যাওয়ার দিন স্থির করা হইল। আমার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল এবং যতদিন কলিকাতায় ছিলাম, ততদিন শুধু শিলংয়েরই স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমরা ঠিক করিয়াছিলাম, গুড ফ্রাইডের ছুটীর আগের দিন এখান হইতে যাত্রা করিব ; কিন্তু কোন কারণবশতঃ ছুটীর পূর্ব্বদিনে যাওয়া হইল না। শেষে ঠিক করিলাম, দশই এপ্রিল এখান হইতে রওয়ানা হইব। মাঝে কয়েকটা দিন অতি কষ্টের সহিত কাটাইয়াছি। কেবল মনে হইয়াছে, দিন আর শেষ হইতে চায় না ; শুধু ভাবিয়াছি, কবে দশই হইবে।

শিলং মেল বেলা দেড়টার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ছাড়ে। দশই সকালবেলা হইতেই আমার মনে হইতেছিল, এই বুঝি দেড়টা বাজে। যাহা হউক, জিনিষ-পত্র গুছাইয়া লইয়া বেলা বারটার সময় বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি, বন্ধু বাড়ী নাই, কি কিনিতে গিয়াছে। শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিলাম, আজও হয় ত আমাদের যাওয়া হইবে না। সাড়ে বারটার সময় বন্ধু ফিরিল। ইতিমধ্যে আরো দুইটী বন্ধু আমাদের বিদায় দিবার জন্য আসিল। আমরা বারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হইলাম। ষ্টেশনে গিয়া দেখি, গাড়ী আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমরা পূর্ব্ব হইতেই ইন্‌টার ক্লাসের টিকিট সংগ্রহ করিয়া ছিলাম ; সেজন্য আর টিকিট কিনিবার বিপদ ছিল না। একেবারে ট্রেণে গিয়া উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে দেড়টা বাজিল। ঘণ্টা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী হুস্ হুস্ শব্দ করিতে করিতে প্ল্যাটফরম ছাড়িয়া চলিল। আমাদের বন্ধুরা, যাহারা বিদায় দিতে আসিয়াছিল, তাহাদেরও আমাদের সঙ্গে শিলং যাওয়ার কথা ছিল ; কিন্তু কোন কারণবশতঃ তাহাদের যাওয়া হইয়া উঠে নাই। যখন গাড়ী ছাড়িয়া দিল, তখন তাহাদের মুখ দেখিয়া মনে হইল, তাহারা আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিলে আনন্দ অনুভব করিত। অবশ্য আমরাও আনন্দিত হইতাম ; কারণ, কেহই বন্ধু ছাড়া হইতে চায় না—যতক্ষণ একসঙ্গে থাকা যায়, ততক্ষণই ভাল। যখন তাহাদের যাওয়া হইলই না, তখন আর মিথ্যা মন খারাপ করিয়া লাভ কি ?

আমার মনে হইতেছিল, ট্রেণ যেন শীঘ্র কোথাও না থামে। যত শীঘ্র শিলং যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল ; কারণ, গরম আর যেন সহ্য করা যাইতেছিল না। গাড়ী গর্জ্জন করিতে করিতে পথ, ঘাট, গ্রাম, মাঠ ছাড়িয়া হু হু শব্দে ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া যাইতেছিল। ট্রেণ এক-বার মাত্র বারাকপুরে থামিয়া আবার গর্জ্জন করিতে

মোট বহন করার ধরণ অন্য রকম। উহারা মাথা হইতে একটী ফিতা পিঠের ঝুড়ির সহিত বাঁধিয়া দেয় এবং সাম্‌নের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পথ চলিতে থাকে।

আমরা আগে ঠিক করিয়াছিলাম, 'পাহাড়িয়া মেসে' উঠিব; কারণ, বন্ধুর বাড়ীতে তখন কেহ ছিলেন না, সকলে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তা'ছাড়া, চাকর রাখিয়া বন্দোবস্ত করা পোষাইবে না। যে দুইটী বন্ধু আমাদের লইতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন পাহাড়িয়া মেসে থাকিত, আর একজনের বাড়ী জেল রোডে। আমরা জেল রোডে এই বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। বন্ধু আমাদের গরম জল করিয়া দিল; কারণ, কিছু পূর্ব্বে খুব জল হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য শীত করিতেছিল। আমরা মুখ হাত ধুইবার পর খাবার আসিল। বেশ ক্ষুধা পাইয়াছিল; কোন কথা না বলিয়া আহারে বসিয়া গেলাম।

এখানে একটীমাত্র সিনেমা; সেটী ম্যাডান কোম্পানীর —তাহার নাম দিয়াছে 'কেল্‌ভিন্‌ সিনেমা' 'সো হাউস'টী বেশ। এঁরা নিজের 'ইলেট্রিক কারেণ্ট' ব্যবহার করেন। কোন ভাল বই আসিলে টিকিটের মূল্য বার আনা হয়, আর বাজে বই থাকিলে আট আনা (চতুর্থ শ্রেণী)। ভিতরে গিয়া দেখি, খাসিয়া পুরুষ ও রমণীতে ভর্ত্তি। বন্ধুরা জানাইল, ইহারা সিনেমার কিছু বুঝে না, অথচ প্রায় আসে। এদের সিনেমা দেখার একটা বিশেষ বাতিক আছে। প্রত্যহ যাহা উপায় করে, তাহা হইতে কিছু দিয়া মদ খায় ও কিছু জমাইয়া সিনেমা দেখে। যাহারা আধুনিক শিক্ষা পাইয়াছে, তাহারা জিনিষটা বেশ বুঝিতে পারে। তবে আজকাল তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও শিক্ষিতার সংখ্যা কম নহে। আমার মনে একটা ভুল ধারণা ছিল যে, জাতিটা ভয়ানক নোংরা; কিন্তু দেখি, আমাদের দেশীয় লোকের অপেক্ষা তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গায়ে কোনরকম গন্ধ নাই; তবে মাঝে মাঝে মুখে মদের গন্ধ পাইতেছিলাম। ইহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই মদ খায়। তবে প্রায় ইহারা বিদেশী মদ খায় না; নিজেরা তৈয়ার করিয়া খাইয়া থাকে। সিনেমায় একটী ভয়ের কারণ আছে যাহা আমি আগে জানিতাম না। বন্ধুরা আমাকে সাবধান করিয়াছিল যেন কোনপ্রকারে তাহাদের ধাক্কা না দিই; কারণ, তাহাদের বিরক্ত করিলে তাহারা ছুরি বসাইয়া দেয়। আমি তখন নিজের বসিবার স্থান ছাড়িয়া বন্ধুদের মধ্যে বসিলাম; কারণ, কি আবশ্যক একটা হাঙ্গাম বাড়াইয়া।

কলিকাতা হইতেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, এখানে পাঁচটার সময় উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হইব। কিন্তু এখানে কোনদিন ছয়টার আগে উঠিতে পারিতাম না; কারণ, ভীষণ শীত। লেপ ছাড়িয়া অত সকালে উঠিতে ইচ্ছা করিত না। আমি প্রত্যহ ছয়টার সময় উঠিয়া একাই বেড়াইতে বাহির হইতাম; কারণ, বন্ধুরা আটটার আগে উঠিত না। নিজে পথ ভাল জানি না; তাই চেনা পথেই বেড়াইতাম। এখানে আমি একদিন খুব ভুল করিয়াছিলাম; সে কথা মনে পড়িলে এখন আমার হাসি পায়। একদিন মেস হইতে নিকটবর্ত্তী 'পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটে' ছবি তুলিতে গিয়াছিলাম। আমাদের মেস হইতে বোধ হয় তিন-চার মিনিটের পথ। সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইয়া 'রেস কোর্স' ধরিয়া উপরে উঠি, ইন্‌ষ্টিটিউটের সাইন্‌বোর্ড দেখিয়া তখন মনে হইয়াছিল, বোধ হয় দুইটী পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট আছে। তারপর ওখান হইতে নামিয়া অন্য পথ দিয়া যাইতেছিলাম, দেখি, আমাদের মেসের নীচের পথ দিয়া মোখারের পথে চলিতেছি। প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না যে, সেটা আমাদের মেস। পরে বহুক্ষণ লক্ষ্য করিবার পর বুঝিলাম, আমাদেরই মেস বটে। একথা বন্ধুদের বলাতে তাহারা উপহাস করিল না; বরং আমাকে বুঝাইয়া দিল, শিলংয়ে যাহারা নূতন আসে, তাহাদের প্রথম প্রথম পাহাড়ের পথ চিনিতে এই রকম ভুলই হয়। যাহারা চিরকাল সমতল ভূমিতে বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাদের পাহাড়ের পথ চিনিতে একটু অসুবিধা হইবেই। দূরের পাহাড়গুলি দেখিয়া মনে হয়, খুব কাছে; একবার গিয়া বেড়াইয়া আসি। কিন্তু আমার সঞ্জীববাবুর 'পালামৌ ভ্রমণে'র কথা মনে পড়িল—"বাঙ্গালীর পক্ষে পাহাড়ের দূরতা স্থির করা সহজ নয়।" কথাটা ঠিক।

আমি একদিন একটা পাহাড় দেখিয়া বন্ধুদের বলিলাম—"চলো, ওই পাহাড় হইতে ঘুরিয়া আসি।" তাহারা আমায় এক কথায় শান্ত করিল—আগে ছোট ছোট পাহাড় উঠিবার চেষ্টা কর, তারপর বড় পাহাড়ে উঠিবে; তা' ছাড়া, ওই পাহাড় এখান হইতে ছয় মাইল দূর। আমি 'লাবাম' পাহাড় দেখাইয়া বলিয়াছিলাম—"ওই পাহাড় এখান হইতে দুই মাইলের বেশী হইবে না।" শেষে নিজে একদিন সকালে লাবামের অভিমুখে চার মাইল পথ হাঁটিয়া বুঝিলাম, বাস্তবিক পাহাড়টা সেখান হইতে অনেক দূরে—তখনও প্রায় দুই মাইল। শেষে বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

যাঁহারা চিরকাল গরম দেশে বাস করিয়া শিলংয়ে আসে, তাঁহাদের প্রথমে একটু বেগ পাইতে হয়। জলে লৌহের ভাগ খুব বেশী; সেই জন্য ভীষণ ঠাণ্ডা। পানীয় জল ঝরণা হইতে লইয়া আসে। মাঝে মাঝে সকালে জল পাওয়া যায় না; কারণ, জল জমিয়া গিয়া বরফ হয়। জল প্রায় সারাদিনই পাওয়া যায়। শিলংয়ের জল খাওয়া অভ্যাস না থাকিলে হজম হয় না। 'হিল্ ডাইরিয়া' ধরিয়া বসে। অবশ্য এতে বিশেষ ক্ষতি করে না। এখানে অনেকেরই বাত ও দাঁতের অসুখ আছে। শীঘ্র দাঁত পড়িয়া যায়। এখানে একটী 'লেক্' আছে, তাহাতে কেহ নামে না; কারণ, আণ্ডার কারেন্ট এত বেশী যে, লোককে নীচের দিকে টানিতে থাকে। লেক্‌টী অতি চমৎকার। চারিদিকে পাহাড়, তার মধ্যে লেক্। ইহা অবশ্য কলিকাতার বালগীঞ্জ লেকের মত বড় নহে। একটী ছোট খাল বলিলেও চলে। শুধু ছোট নহে, চওড়ায়ও কম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে তুলনা করিলে বালীগঞ্জ লেক্ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। আর শুধু লেক্ হিসাবে তুলনা করিলে বালীগঞ্জেরটীই উত্তম। এই লেক্‌টী এত সুন্দর হইবার কারণ, সমতল ভূমি খুব কম। কলিকাতা-বাসীরা সেখানকার লেক্ অপেক্ষা এখনকার পাহাড়ই বেশী ভালবাসেন; তবে যাঁহারা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চান, তাঁহারা যে এখানে আসিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। আমার অবশ্য বালীগঞ্জ লেকের তুলনায় এ লেক্ ভাল লাগে নাই।

শিলংয়ের মোটর চালান দেখিলাম; একটু নূতন ধরণের বটে। এখানে প্রত্যেক মোড়েই পুলিশ থাকে। তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ কলিকাতার পুলিশেরই মত, তবে খাকি রংয়ের। পুলিশের লোকেরা নেপালী ও হিন্দুস্থানী। এখানকার ড্রাইভারদের প্রথমে হাত দেখাইতে হয় কোন্ পথে যাইবে, পরে পুলিশ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কয়েকটি পথ আছে, যেখানে শুধু যাইতে পারিবে, আসিতে পারিবে না। এটা অবশ্য খুবই ভাল; কারণ, পথ খুব প্রশস্ত নহে—তাহার উপর কখন উঠিয়াছে, কখন নামিয়াছে। অনবরত টার্ণ নেয়। মোটরের গতি খুব কম। গাড়ীতে 'পেট্রল' খরচা অত্যন্ত বেশী পড়ে; এক কথায় মোটর রাখা ভীষণ ব্যাপার। 'টায়ার', 'টিউব' খুব নষ্ট হয়; কারণ, একে পাথুরে পথ, তাহার উপর আবার উঠা নামা। আজকাল সেখানে অনেক ট্যাক্সি হইয়াছে। মনে হয়, তাহার ভাড়া কলিকাতার অপেক্ষা বেশী; কারণ, এক 'গ্যালন' পেট্রলে গাড়ী প্রায়ই কুড়ি মাইলের বেশী যায় না। তবে এটা আমার অনুমান মাত্র।

শিলং সহরটী যদিও তেমন বড় নহে, কিন্তু বেশ সুন্দর। আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। এখানে চার-পাঁচটী বড় বড় পথ আছে; তাহার মধ্যে দু'-একটীর উপরেই সব দোকানপসার। 'জেল রোড', 'পুলিশ বাজার', ও 'গৌহাটী রোড'ই বিখ্যাত। এখানকার দোকানে প্রায় সব জিনিষই পাওয়া যায়। সেইজন্য এখানকার ব্যবসায়ীরা বেশ উপার্জ্জন করে। এখানে লোকসংখ্যা খুব বেশী; সেই জন্য ব্যবসায়েরও খুব উন্নতি। শিলংয়ে সপ্তাহে তিনদিন বাজার বসে। প্রথম দিনের বাজারের নাম 'বড় বাজার', তার পরের দিন 'লারস বাজার' এবং শেষের দিন 'ছোট বাজার।' এরূপ নাম হওয়ার কারণ বুঝিলাম না। যখন একস্থানে তিনটী বাজারই বসে, তখন নাম কেন তিনরকম হইল? বড় বাজারের নামও যেমন, কাজও তেমনি; সে এক ভীষণ ব্যাপার। বাজারের দিন বহুদূর হইতে খাসিয়া

মেয়েরা জিনিষ-পত্র লইয়া বেচিতে আসে। কলিকাতায় যেমন পুরুষেরা জিনিষ-পত্র লইয়া বিক্রী করিতে আসে, তেমনি এখানে স্ত্রীলোকেরাই সব বেচাকেনা করে। অবশ্য পুরুষ মানুষ নাই এমন নয়; তবে এ দেশীয় পুরুষ খুব কম। এখানকার একটী কথা আমার মনে পড়িতেছে। একদিন বন্ধুর সঙ্গে বাজারে যাই। বাজারে গিয়া দেখি, খাসিয়া রমণীর চায়ের দোকান। বাজার দেখা শেষ করিয়া দোকানে চা খাইবার জন্য উপস্থিত হইলাম। ভিতরে গিয়া খাসিয়া রমণীর বেশভূষার পরিপাট্য দেখিয়া মনে হইল, নিশ্চয় শিক্ষিতা। বন্ধুদের নিকট হইতে জানিলাম, সে প্রবেশিকা পাশ করিয়া এই দোকান করিয়াছে। তাহার সঙ্গে দু'-একটী কথায় বুঝিতে পারিলাম, শিক্ষিতাই বটে। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চা দিবার আগে দু'-তিনবার কাপগুলি ধুইয়া ফেলিল, তারপর চা তৈয়ার করিল। পরে কি হইল, আমরা কিছু বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু সে সব ফেলিয়া দিল। আমার বোধ হয় চায়ের রং ঠিক হয় নাই বলিয়া। আমরা যাহাদের অসভ্য জাতি বলিয়া ঘৃণা করি, তাহাদের মধ্যে এতটা হিতাহিত জ্ঞান; অথচ, আমাদের দেশে যাঁহারা সভ্য বলিয়া পরিচয় দেন, কই, তাঁহাদের মধ্যে ত এরূপ পরিচ্ছন্নতা এবং দায়িত্বজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায় না। একজন সামান্য খাসিয়া রমণী দুই পয়সা মূল্যের এক কাপ চা বিক্রয় করিয়া এতটা ভদ্রত দেখাইল যে, বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না।

বাজারের নিকটেই গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল। এখানে ইংরাজী বিদ্যালয় ওই একটী। অবশ্য এম-ই স্কুল অনেকগুলি আছে। মহিলাদের জন্যও হাই স্কুল এবং এম-ই স্কুল আছে। এখানে খাসিয়া ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। ছেলেরা খেলাধূলার মধ্য দিয়া শিক্ষায় বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

পাসতুর ইন্‌ষ্টিটিউটের নাম হয় ত অনেকেই শুনিয়াছেন। কুকুরে কামড়াইলে এখানে চিকিৎসা করাইতে আসে। এই ইন্‌ষ্টিটিউটটী অতি চমৎকার একটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। উপরে যাইতে হইলে খুব বেশী ঘুরিয়া যাইতে হয়; কারণ, ইহার সোজা পথ নাই। সোজা পাহাড়ে উঠা বড় কষ্টকর; কারণ, 'সরল' গাছের পাতায় পথ এত পিচ্ছিল যে, সহজে উপরে উঠা যায় না। শুনিলাম, এখানকার ব্যবস্থা খুব ভাল; চিকিৎসকেরা যত্নসহকারে রোগীদিগকে দেখিয়া থাকেন। রোগীদের থাকিবার জন্য কয়টী ঘর আছে। এখানে কালাজ্বর রোগী থাকিবারও বন্দোবস্ত আছে। কালাজ্বর খুব শীঘ্র ভাল হয়। আমার মনে হয়, বাত ও দাঁতের বেদনা ছাড়া এখানে অন্য কোন অসুখ হয় না।

এখানে এমন একটী জিনিষ আছে, যাহার জন্য শিলং জগতে বিখ্যাত—সেটী হইতেছে 'গল্‌ফ ক্লাব।' পৃথিবীর মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, তাই শিলংয়ের অপর নাম 'স্কট্‌ অফ্‌ দি ইষ্ট।' বাস্তবিক ক্লাব ঘরটী অতি চমৎকার। পাহাড়ের উপরে। পাহাড়ের উপর হইতে একটী মাঠ ধীরে ধীরে নামিয়া আর একটী পাহাড়ে গিয়া উঠিয়াছে। এ স্থানটী অতি মনোরম; একবার দেখিয়া সাধ মিটে না। সকালে বেড়াইবার সময় আমি প্রায় এখানে আসিতাম। এখানে আর অন্য কোন পাহাড় এত সুন্দর নহে। ক্লাবের সভ্যেরা সকলেই ইংরাজ।

শিলংয়ের ঘরগুলি ছিটেবেড়ার উপরে টিনের ছাউনী। খড়ের ছাউনী খুব কম। বড় লোকের ঘরও এইরূপ। যাঁহারা রাস্তার সঙ্গে মিলাইয়া ঘর করিয়াছেন, তাঁহারা নীচু হইতে প্রায় একতলা উচ্চে ঘর তৈয়ার করিয়াছেন এবং নীচের তলাটী কোন কাজে না লাগাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন; কারণ, নীচের ঘরটীতে এত বেশী কাঠের 'ঠেক্‌' দেওয়া থাকে যে, তাহা ব্যবহার করা চলে না। তবে আজকাল যাঁহারা বাড়ী করিতেছেন, তাঁহারা দু'তলা করিতেছেন। এখানে দু'তলা বাড়ী খুব কম; তিনতলা একেবারেই নাই। এখানকার ঘর নির্ম্মাণের নিয়ম এই যে, প্রথমে বাঁশের কঞ্চি দিয়া বাঁধিয়া দেয়, তাহাতে মাটী, গোবর ও সরল পাতা লেপিয়া দেয়; তাহার উপর চূণকাম করে। দেখিলে মনে হয়, যেন ইটের প্রাচীর। কেহ কেহ কাঠের 'পার্টিসন' দিয়া ঘর তৈয়ারী

করে। এখানকার ঘরের একমাত্র প্রাণ কাঠ ; ইহার কারণ, কাঠ এখানে খুব সস্তা। এখানে সরল কাঠ খুব বেশী পাওয়া যায়। আমরা যাহাকে 'পিছপাইন' বলি, এদেশের লোকেরা তাহাকে সরল গাছ বলে। এখানে সরল গাছ খুব বেশী। এই সরল কাঠ খসিয়ারা বাড়ী বাড়ী দিয়া যায়। ইহা জ্বালানীতে ব্যবহার হইয়া থাকে। এখানে কাঠের ঘর করিবার কারণ, কাঠ দিয়া ঘর তৈয়ারী করিলে বেশী ভারী হয় না। এখানে প্রায় ভূমকম্প হইয়া থাকে ; এই ভূমিকম্প হইতে ঘর বাঁচাইবার জন্যও কাঠের ঘর করিয়া থাকে। ঘরের তলাতেও কাঠ বিছাইয়া দেয় ; কারণ শীত বড় বেশী। কেহ কেহ আবার মটাও দেয়। কোন কোন গৃহে অগ্নির ব্যবস্থা আছে ; ঘরের এক কোণে গর্ত্ত করা আছে, সেখানে কয়লা জ্বালাইয়া আগুন করিয়া রাখে। অবশ্য আমরা যে সময় গিয়াছিলাম, তখন আগুন করিতে হইত না ; কারণ, গরম পড়িয়াছিল।

এখানকার 'বেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউটে' আমি প্রায়ই যাইতাম। ছেলে হইতে বুড়া পর্য্যন্ত সকলেই এখানকার সভ্য। ছেলে বলিতে ম্যাট্রিকের ছাত্র। ঘরের একদিকে পাঠাগার ও অন্যদিকে 'কনসার্ট রুম'। সন্ধ্যার সময় প্রায় সকলেই একবার করিয়া 'ক্লাবে' আসেন। এখানে আরো একটী ক্লাব আছে ; সেটী 'মোটর ইন্‌ষ্টিটিউট্।' এই উভয় ক্লাবের সাহায্যে মাঝে মাঝে থিয়েটার হইয়া থাকে। দুইটি বাঁধা 'ষ্টেজ' আছে। একটীর নাম 'অপেরা হ'ল', অপরটীর নাম 'কুইন্‌টন হল।' এই রঙ্গমঞ্চ দুইটী স্থানীয় ক্লাবের সভ্যদিগের সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছে। দুইটীরই পৃথক পৃথক দৃশ্যপট ও পোষাক-পরিচ্ছদ আছে। ক্লাবের সভ্যেরা থিয়েটার করিলে বিনা খরচে অভিনয় করিতে পারেন। অন্য কেহ যদি করেন, তাহা হইলে ভাড়া দিতে হয়। আমার মনে হয়, এখানকার লোকেদের মধ্যে পরস্পর বেশ মিল আছে। সেই জন্য বেশ সুখেই আছেন।

শিলং আসামের রাজধানী। এখানে বড় বড় অফিস আছে। ব্যবসা-বানিজ্যের অবস্থা সেই জন্য বেশ ভাল। যাঁহারা চাকুরী করেন না, তাঁহারা দোকান করিয়াছেন।

এখানকার একটী নিয়ম যাহা আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। একদিন বন্ধুদের সহিত 'রিলবংয়ে' একজনের বাড়ী বেড়াইতে যাই। রিলবং সহর হইতে বেশী দূর নহে। চলিতে চলিতে একস্থানে দেখিলাম—'মিলিটারী ক্যাম্প' পথের পাশে একটা ছোট ঘরে একজন নেপালী পাহারা দিতেছে। বন্ধুদের নিকট হইতে জানিলাম, সেটা 'বারুদ-ঘর।' এখানে রাত্রি নয়টা দশটার পর পথিককে জিজ্ঞাসা করে—বন্ধু না শত্রু ? যদি বন্ধু বলে, তাহা হইলেই রক্ষা ; নচেৎ, তৎক্ষণাৎ পায়ে গুলি করিবে। পরে দেখিবে, সে শত্রু কি মিত্র। যদি শত্রু বলিয়া মনে ধারণা হয়, তাহা হইলে তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে। আমি একটী গল্প শুনিয়াছি, অবশ্য সত্য ঘটনা। একটী নেপালী সৈন্যের রাত্রিতে বারুদ ঘরে পাহারার ভার-পড়ে। তাহার পিতাও একজন সৈনিক ছিল। সে রাত্রিতে যখন ওই পথ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন তাহার ছেলে জিজ্ঞাসা করে—বন্ধু না শত্রু ? পিতা কোন উত্তর না দিয়া ভাবিয়াছিল, আমি ত এখানকারই লোক, আমাকে নিশ্চয় চিনিতে পারিবে। এমন সময় হঠাৎ 'গুড়ুম' করিয়া শব্দ হইতেই পিতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল এবং পুত্র আসিয়া পিতাকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে তুলিয়া হাসপাতালে দিল। কিন্তু আঘাত এত ভীষণ লাগিয়াছিল যে, দুই-একদিনের মধ্যে সে মরিয়া গেল।

আমি বন্ধুদের অনুরোধ করিয়া সন্ধ্যার আগেই সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আরো একটী কঠিন নিয়ম আছে—যদি কেহ অন্যায় কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাকে শিলং হইতে একেবারে তাড়াইয়া দেয়। তবে তাহাকে তিনবার সাবধান করিয়া দেওয়া হয়।

কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া মোটরে করিয়া 'লাইমোখারে' ছবি তুলিতে যাই। যাহা যাহা দেখিয়াছি. সে সকল উল্লেখযোগ্য। লাইমোখারের 'সেণ্ট এ্যানিস হাই স্কুল', 'এ্যানিস ওয়ার্কসপ্'—এখানে যাবতীয় ইঞ্জিনিয়ারীং কার্য্য হইয়া থাকে। 'এ্যানিস সু ওয়ার্কসপ'—ইহা ভাল জুতা তৈয়ারীর জন্য বিখ্যাত। 'এ্যানিস হোষ্টেল'—এখানে স্কুলের এবং ওয়ার্কসপের সমস্ত ছাত্র ও লোকজন থাকে। 'সেণ্ট এ্যানিসের অফিস' দেখিবার পর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া 'রোমান ক্যাথলিক চার্চ' দেখিলাম। অতি সুন্দর। একবার দেখিয়া সাধ মেটে না। আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। পথ হইতে গির্জ্জাটী অনেক উচ্চে বলিয়া একটী সিঁড়ি আছে। সিড়িটীর দৃশ্য অতি চমৎকার ; কারণ, অনেকখানি স্থান লইয়া সিঁড়িটী নির্ম্মিত হইয়াছে। সহর অপেক্ষা লাইমোখার অনেক উচ্চে।

আমি রিলবংয়ে বেড়াইতে গিয়া একটী সন্দেহ মিটাইয়াছিলাম। কলিকাতার বালীগঞ্জ লেক্ দেখিতে

গিয়া বন্ধু আমাকে বলিয়াছিল—শিলংয়ে একটী ঝোলা-পুল আছে। এখন সেই ঝোলাপুল দেখিয়া তুলনা করিলাম। কথায় বলে—'চাঁদে আর জোনাকী পোকায়।' শিলংয়ের সহিত কলিকাতার পুলের কোনমতেই তুলনা করা হয় না। একটী ছোট খাল, তাহার উপর এই পুলটী।

এখানে কমলালেবু, নাসপাতি, কুল ও লিচু প্রচুর মেলে। এখানে আঙ্গুরগাছও দেখিয়াছি। আমগাছ মাত্র একটী বাড়ীতে আছে, অন্য কোথাও নাই। এখানকার কলা মোটে খাইতে পারা যায় না; এদেশের লোকেরা কলা হইতে দেয় না, মোচা কাটিয়া খাইয়া লয়; কারণ, কলার এত বেশী বিচি হয় যে, তাহা মুখে দেওয়া যায় না। এখানকার মাটীর কি রকম গুণ বুঝিতে পারিলাম না। ধান সামান্য পরিমাণ হয়; কারণ, সমতল ভূমি খুব কম। আলু, বেগুন, কপি ও মূলা সবই হয়। দরও সস্তা। এখানকার আলুর স্বাদ কলিকাতার মত নহে। একরকম গন্ধ পাওয়া যায়। মাছ একেবারেই পাওয়া যায় না; বাহির হইতে আসিলে তবেই মেলে। প্রায় পচা মাছ খাইতে হয়; তবে শীতপ্রধান দেশ বলিয়া শীঘ্র পচিয়া যায় না। মাছের স্বাদ বেশ ভাল। আমি যে সময় গিয়াছিলাম, তখন মাছের দর বার আনা, চৌদ্দ আনা করিয়া। যত গরম পড়ে, দরও তত বাড়িয়া যায়। ছাগ মাংস নিয়মিত পাওয়া যায়; দরও তেমন বেশী নহে। এখানে খুব মুরগী পাওয়া যায়; দামও বেশ সস্তা।

খাসিয়ারা কি ধর্ম্মাবলম্বী, তাহা আমার ঠিক জানা নাই। তবে মনে হয়, অন্য পাহাড়ীয়া জাতির যে ধর্ম্ম, তাহাদেরও তাই। তাহারা না কি 'মনসা দেবী'র পূজা করিয়া থাকে। পূজায় মানুষ বলি দেয়। পূজার একমাস আগে হইতে এখানকার অধিবাসীরা সকলেই সাবধানে থাকে। পাহাড়ে কিংবা কোন নির্জ্জন স্থানে প্রায় যায় না। বেশী রাত্রিতে কেহ বাড়ী হইতে বাহির হয় না। আমি নিজ চক্ষে উহাদের একটী পূজা দেখিয়াছি। এক দিন আমি বাসা হইতে সকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি, পথের ধারে একটী গাছের তলায় কয়েকটী ছেলে বসিয়া কি করিতেছে। আমার কৌতূহল হইল। নিকটে গিয়া দেখিলাম, কিছু ফল, কয়েকটী ডিম এবং যা' তা' গাছের পাতা লইয়া পূজা করিতেছে। পূজার পদ্ধতি দেখিয়া মনে হইল, ঠিক্ আমাদের দেশীয় হিন্দুর ন্যায় পূজা করিতেছে। পূজার মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার চিহ্ন নাই। বৃদ্ধ পূজারী ময়লা কাপড় পরিয়া বসিয়া আছে। স্নান না করিয়া এমনি পূজা করিতে বসিয়াছে। পূজার মধ্যে যে একটা তৃপ্তি থাকে, সে রকম কিছুই দেখিলাম না। অবশ্য আমায় তৃপ্তি দিতে পারে নাই বলিয়া যে তাহাদেরও দেয় না, একথা বলা চলে না। আমাদের দেশীয় হিন্দুরা যেমন পূজা-অর্চ্চনার সময় মদ বর্জ্জন করে, তাহাদের তেমনি পূজার সময় মদ চাইই। এক কথায় বলা চলে, তাহারা তাহাদের সরল অন্তঃকরণ লইয়া সুখে বাস করিতেছে।

শিলংয়ে বেশ আনন্দে ছিলাম। হঠাৎ বাড়ী হইতে 'তার' যাওয়ায় আর আমার সেখানে থাকা হইল না। আমি সেই দিনই ফিরিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু সেদিন আসিবার আর কোন উপায় ছিল না—কারণ, তখন আর মোটর বাস ধরা যায় না, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাধ্য হইয়া আমায় সেদিন থাকিতে হইল। সেদিন শিলংয়ে যদি আমার না থাকা হইত, তাহা হইলে এখানকার জলপ্রপাত দেখা হইত না। অবশ্য আমি ইহা পূর্ব্বেই দেখিতে পারিতাম। দেখি নাই তাহার কারণ, কলিকাতা হইতে আমার এক সহপাঠী আসিবার কথা ছিল, তাই ঠিক করিয়াছিলাম, বন্ধু আসিলে দুইজনে একসঙ্গে দেখিতে যাইব। যেদিন আমি ফিরিব, সেইদিন দশটার সময় বন্ধুদের মোটরে 'সতী ফল্‌স্' দেখিতে গেলাম; কারণ, ইহা সকলের অপেক্ষা নিকট। জলপ্রপাত দেখা আমার জীবনে এই প্রথম। দেখিলাম, ভীষণ গর্জ্জনে জল পাথরের উপর দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে। জল বেশ পরিষ্কার; কোন রকম ময়লা নাই। ঝরণা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না, এ জল কোথা হইতে আসে, আবার কোথায় যায়। আমি মনের সাধ মিটাইয়া ঝরণা দেখিতেছিলাম। বন্ধুরা আমার তন্ময় ভাব দেখিয়া বলিল—"কি হে, ঝরণা ছেড়ে কি কোলকাতায় যেতে মন চায় না? বাস্তবিক, আমার মনের ভাব তাই হইয়াছিল বটে; কারণ, মোটর বাস ধরিবার সময় যে হইয়া আসিয়াছিল, আমার সে খেয়ালই ছিল না। বন্ধুদের মুখে শুনিলাম, এইটিই সবচেয়ে ছোট ঝরণা। এখানে কয়েকটী বড় বড় ঝরণা আছে; যথা—'এলিফেন্ট ফল্‌স্', 'বিডন ফল্‌স্', 'বিসপ ফল্‌স্।' বিডন ফল্‌স্ হইতে ইলিকট্রিক কারেন্ট লওয়া হইয়াছে। এলিফেন্ট্ ফল্‌স্ সর্ব্বাপেক্ষা বড় জলপ্রপাত। যাহা হউক, বড় দুঃখের বিষয় আমি সে সব জলপ্রপাত দেখিতে পাই নাই। এখানকার অনেক কিছু দেখা হয় নাই; তার মধ্যে প্রধান 'চেরাপুঞ্জী'—যেখানে পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। আশা আছে, আর একবার শিলং গিয়া বাকী দর্শনীয়গুলি মনের সাধ মিটাইয়া দেখিয়া লইব। তবে ভাগ্যে পুনরায় শিলং ভ্রমণ আছে কি না, ভগবানই জানেন।

সেখ্ মোহাম্মদ ইয়ারল

সুন্দর মুখ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আকাশ অন্ধকার। বাদলধারা সুরু হয়েছে। আমার প্রতি ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলের আদেশ হ'ল, কোল্‌কাতার বাইরে যেতে হবে। 'বকচরা' গ্রামে ভীষণ ডাকাতী হ'য়ে গেছে। এই অদ্ভুত ডাকাতীর যোগাযোগ করেছে—এক নারী। আশ্চর্য্য বটে!

বিলাতী গল্প উপন্যাসে এমন রমণী অনেক দেখেছি সত্য, কিন্তু বাংলাদেশে এত বড় দুঃসাহসী মেয়ে থাক্‌তে পারে কল্পনাও কর্‌তে পারি নি। রিপোর্ট তন্ন তন্ন করে' পড়ে' বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম, তার প্রতিটী কার্য্যের মধ্যে রসবোধের এবং বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় আছে বটে।

কেউ কেউ বলেন—মেয়েটী প্রৌঢ়া এবং স্থূলাঙ্গী। তার দক্ষিণ দিকের গণ্ডস্থলে একটা দাগ আছে। সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা—মাতঙ্গিনী নামে নিজেকে অভিহিত করে। আবার এমনও শোনা গেছে যে, সে পূর্ণযৌবনা অপূর্ব্ব সুন্দরী।

বকচরা গ্রাম থানা থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে। ট্রেণ নেমে দারোগা-সাহেবের কাছে গিয়ে জান্‌তে পার্‌লুম—হঠাৎ এক অন্ধকার রাত্রিতে বন্দুকের আওয়াজে গাঁয়ের লোক চম্‌কে ওঠে। চৌধুরী-বাড়ীর মধ্যে চীৎকার উঠ্‌তে থাকে—"ও গো, আমাদের বাঁচাও—কে কোথায় আছ, আমাদের বাঁচাও!" বাইরে পাইক, দারোয়ান, বরকন্দাজ থেকেও কিছু হয় নি; কেন না, ভেতর-বাড়ী যাবার পথ বন্ধ। এই অবসরে সশস্ত্র ডাকাতের দল অট্টালিকার মধ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ করে' গহনাপাতি টাকাকড়িগুলো বেমালুম হজম করে' ফিরে গেছে।

দরজা ভেঙে সেপাই-শান্ত্রী যখন ঘরে ঢুক্‌ল, তখন বড়বাবু হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে' আছেন—আর তাঁর চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে' জল গড়িয়ে পড়্‌ছে। অনুসন্ধানে জানা গেল—দিন চারেক আগে একটী স্ত্রীলোক এসে গৃহিণীর বাপের বাড়ীর লোক বলে' আপনার পরিচয় দেয়। বলে—"মা ঠাকরুণ, আপনাদের দেখ্‌তে এলুম, সেই কতদিন আগে তরুর বিয়ের সময়…"

তরু—গিন্নির বোন-ঝি।

আর যায় কোথা, নিজের দুঃখ জানিয়ে সে এখানেই থাক্‌বার স্থান করে' নিয়েছিল। তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

* * *

আপাতদৃষ্টিতে কি করা যায় ভেবে ঠিক্ কর্‌তে না পেরে খানিক 'গুম্' হ'য়ে বসে' রইলুম। তারপর উঠে দাঁড়ালুম। না, চুপ করে' ভাবা আমার চল্‌বে না—কোন

মতেই না। হঠাৎ মনে হ'ল, ঘটনা-স্থানটা একবার দেখে এলে মন্দ হয় না। কিন্তু পুলিশের সাজে নয়, অন্য বেশে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই গ্রামে একটা দল আছে, যারা জমিদারের প্রতি বিরূপ। বোধ হয়, তাদের চেষ্টায় এবং শ্রীমতীর অনুগ্রহে এ সব ঘটেছে।

চেহারা বদ্‌লে ফেল্‌লুম। পরণে আমার শতছিন্ন ময়লা কাপড়, গায়ে ছেঁড়া কালো জামা, মাথায় পরচুলা, নগ্নপদ এবং বগলে একটা পোঁট্‌লা, চোখ দু'টী আরক্ত, ঢুলুঢুলু। দারোগা-সাহেব বল্‌লেন—"বেশ মানিয়েছে, পাগল ভিন্ন আপনাকে আর কিছু মনে করা যায় না।"

দ্বিপ্রহর। দু'ধারে মাঠ খাঁ খাঁ করছে। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথার ওপর। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সুপ্রশস্ত পথ চলে' গেছে থানাটাকে ডাইনে রেখে। অদূরে দেখা যাচ্ছে 'শালিকদহে'র বিল—ধব্‌ধবে অতি বিস্তৃত চাদরের মত। আর তারিই ধারে ধারে উড়ে বেড়াচ্ছে বলাকা, শঙ্খচিল। চলেছিলুম সেই পথ ধরে' গাঁয়ের উদ্দেশে।

গাঁয়ের ভিতর প্রবেশ করে' পেলুম, অজস্র মেঠো ফুলের গন্ধ, আর দেখ্‌লুম দল বেঁধে চলেছে কলসী কাঁখে জল আন্‌তে পল্লী-বধূরা।

জমিদার-বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম। যেমনই প্রকাণ্ড বাড়ী, তেমনই তার চারপাশের প্রকাণ্ড দেওয়াল বটে। মানুষ ত দূরের কথা, এ দেওয়াল টপ্‌কে বাড়ী ঢোকবার শক্তি স্বয়ং পবন নন্দনেরও নেই। তবে?

ধীরে ধীরে বাড়ীখানা প্রদক্ষিণ করতে লাগ্‌লুম। বাড়ীর শেষে একটা বড় বাগান এবং বাগানের উত্তর দক্ষিণ কোণে একটা দরজা রয়েছে তালা দেওয়া। সম্ভবতঃ, সম্ভবতঃ কেন নিশ্চয়ই এই পথ দিয়ে মহাত্মারা এসেছিলেন এবং অন্তর্দ্ধানও হয়েছেন।

হঠাৎ একজনকে এই পথে আস্‌তে দেখে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিড় বিড় করে' বক্‌তে বক্‌তে গাছের একটা শুকনো ডাল টেনে নিয়ে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে রইলুম।

লোকটা এসে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাইলে, তারপর 'পাগল' বলে' ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে' গেল। নেই কাজ ত খই ভাজ আর কি! আমিও তার অনুসরণ করলুম।

বেলা পড়ে' আস্‌ছে। একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল। দেখ্‌লুম, লোকটা তার মধ্যে ঢুকে গেল। উল্লাসে মনটা দশ হাত হ'য়ে উঠ্‌ল। তবে ত অনুমান মিথ্যা হয় নি। খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আমিও আস্তে আস্তে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

বাড়ীটা দু' মহলা। অন্ধকারময় ঘুল্‌ঘুলির মধ্য দিয়ে চলে' গেলুম ভিতর মহলে। একটা দালানে কতকগুলো পায়ের দাগ। সেগুলো লক্ষ্য করে' বুঝ্‌লুম, এখানে মানুষের প্রাদুর্ভাব রোজই হয়। আর একটু এগিয়ে গিয়ে একটা সিঁড়ি পেলুম। সোজাসুজি দোতলায় উঠ্‌লুম। তখনও সূর্য্যের ক্ষীণ রশ্মি ম্লান হ'য়ে যায় নি। মৃদু সন্তর্পিত পদক্ষেপে চলেছি। গাটা ছম্‌ছম্ করে—একটা উদগ্র আশঙ্কায় এক ঝলক রক্ত বুকের ভেতর লাফিয়ে উঠ্‌তে চায়। ছেঁড়া জামাটার তলায় রিভলভার লুকানো ছিল, তাই ভরসা।

খানিকটা গিয়ে ছাদের আল্‌সের কাছে পেলুম একখানা চিরকুট—টুক্‌রো টুক্‌রো করে' সেখানা এম্‌নি ছেঁড়া যে, জোড়াতাড়া দিয়েও 'ঝিকরগাছা' ভিন্ন আর কিছুই পড়্‌তে পারলুম না। ঝিকরগাছা? একটা গ্রামের নাম বলেই জানি। লেখাটা কুড়িয়ে পকেটে রেখে বাড়ীটার চতুর্দ্দিক দেখ্‌তে লাগ্‌লুম।

কিন্তু লোকটা গেল কোথা? ভূত না কি? কিন্তু ভয় পাওয়ার ধাত নিয়ে জন্মাই নি, কাজেই হেসে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌লুম।

হঠাৎ একটা চোর-কুটুরীর কাছে এসে আমার আর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না! আরব্য উপন্যাস আর কা'কে বলে! চোর-কুটুরীর মধ্যে আলো জ্বলছে আর ক্ষণপূর্ব্বে দৃষ্ট লোকটা দিব্যি বসে' কার সঙ্গে গল্প করছে। আস্তে আস্তে দরজার সাম্‌নে এসে উঁকি মেরে দেখি—এক পরমাসুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি। আর যায় কোথা! উল্লাসে এক রকম দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়েই রিভলভারটা হাতে উঁচিয়ে ধরে' ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম।

মেয়েটা চীৎকার করে' উঠ্‌ল। তারপরই দেখি সে শুয়ে

পড়েছে। বুঝ্‌তে দেরী হ'ল না যে, সে মূর্চ্ছা গেছে। আরও বুঝ্‌তে পার্‌লুম, সে এ ডাকাতের দলের কেউ নয়। নইলে এত অল্পে মানুষ জ্ঞান হারায় কখন?

লোকটা ত কেঁদেই আকুল। যা' বল্‌লে তা' তরুণ সাহিত্যিকদের গল্প। কাজেই এইখানে তার ইতি হওয়াই সঙ্গত। কতকটা বেকুফের মত সেখান থেকে ফিরে এলুম।

থানায় এসে দারোগাবাবুর ঘুম ভাঙিয়ে গল্প কর্‌তে লাগ্‌লুম। তিনি চিরকুট দেখে বল্‌লেন—এই রকম হাতের লেখা রুদ্রপুরের জমিদার-বাড়ীতে পাওয়া গেছে। সেখানে ডাকাতী হবে বলে' যে একখানা উড়ো চিঠি এসেছিল, তার অক্ষরগুলোর ধরণ এই রকম—আমরা তা'কে 'এক্‌জিবিট্‌' করেছি। চিঠিখানা আমাকে দেখালেন। আমি বল্‌লুম—"ভোরের ট্রেণে ঝিকরগাছায় রওনা হব—দেখি যদি কিছু কর্‌তে পারি।"

সারারাতের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যেও কিন্তু চোখের পাতায় ঘুম এল না।

আর কিছু পাই আর না পাই, ঝিকরগাছায় যে 'মহোদয়া' এখন বাস কর্‌ছেন, এটা ত জানা গেছে। আর এবার যে তারা ঝিকরগাছাতেই শীকার কর্‌বেন, তা'তেও সন্দেহ নাস্তি। কিন্তু ঝিকরগাছা ত একটু ছোট গ্রাম নয় যে, 'হুট্‌' বল্‌তেই সন্ধান পেয়ে যাবো। উপায় কি?

অনেক ভেবে স্থির কর্‌লুম—ফেরিওয়ালার বেশে প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী খোঁজ নিতে হবে। যত বড়ই ধড়িবাজ হোক্ না কেন, মেয়েমানুষ ত। কোন না কোন উপায়েই তা'কে পেয়ে যাবো—জিনিষ কিন্‌তে ঠিক বেরুবেই।

ক'দিন কেটে গেল, কিন্তু কোন সন্ধানই মিল্‌ল না। ক্রমে উৎসাহ কমে' আস্‌ছিল। সেদিন ঠিক্ কর্‌লুম—এ পথে আর নয়, নতুন কিছু পন্থা আবিষ্কার কর্‌তে হবে। এক পশলা বৃষ্টির পর সবে আকাশটা ধরেছে। একটা বাড়ীর রকে দাঁড়িয়েছিলুম, আস্তে আস্তে পথে নেমে চল্‌তে সুরু কর্‌লুম। হঠাৎ কে ডাক্‌লে—"এই কাপড়ওয়ালা!"

চেয়ে দেখ্‌লুম, একটী তরুণী। মুখ নয় ত একখানি ছবি।

এগিয়ে এসে বল্‌লুম—"কি কাপড় নেবেন, ব্লাউজ?"

"দেখি, কি আছে" বলে' সে আমার পোঁটলাটা নিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। তারপর দু'-একটা জিনিষ নিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে' গেল। যখন দাম দিতে সে ফিরে এল, তখন ভাল করে' তার মুখের পানে চাইতেই হঠাৎ মনে হ'ল, এ মুখ যেন দেখেছি কোথাও।

মেয়েটী বল্‌লে—"আবার পরশু জিনিষ নিয়ে এসো, কেমন?"

"আচ্ছা" বলে' পথে নেমে পড়্‌লুম। কিন্তু কোথায় দেখেছি একে? কোথায়?—হঠাৎ মনে পড়ে' গেল—পোড়োবাড়ীটার কথা। তাই ত! এ নিশ্চয়ই সেই মেয়ে। এখানে এল কেমন করে'?

পরিচয় যা' দিয়েছিল, তা'তে মনে হয়, সে জমিদার বাড়ীরই বউ...তবে?

হয় ত পালিয়ে এসেছে। পালানও বিচিত্র নয়। কিন্তু আর একটা জিনিষও ত হওয়া সম্ভব। যা' অতি সাধারণ লোকেরও মাথায় আসে, তা' আমার মাথায় এতক্ষণ আসে নি কেন?

হয় ত এ সরলতা তার ভাণ, হয় ত এ সেই দস্যুদলের দলনী বেগম। যাই হোক্, আজ থেকে নজর রাখ্‌তেই হবে এই বাড়ীটার ওপর।

থানায় এসে ইন্‌স্পেক্টারকে বলে' বাড়ীটার ওপর কড়া নজর রাখবার জন্যে জন দুই লোক পাঠিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ইজি চেয়ারটার ওপর ঢলে' পড়্‌লুম। কিন্তু বিশ্রামের বরাত নিয়ে জন্মাই নি—আপ্‌শোষ কর্‌লে চল্‌বে কেন? একজন লোক ফিরে এসে খবর দিলে—তারা যাবার আগেই আসামীরা সাফ্ হ'য়ে গেছে। দরজায় তালা বন্ধ।

তালা বন্ধ। এরই মধ্যে পাখী উড়েছে। "তাই ত বড় বিপদে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি" বলে' ইন্‌স্পেক্টার আমার মুখের দিকে চাইলেন।

আমি বল্‌লুম—"বিপদ নয়, এতদিনে 'কেসটা'র সুরাহা হ'ল ইন্‌স্পেক্টারবাবু।"

"কি রকম?"

"কি রকম পরে জান্‌তে পার্‌বেন। উপস্থিত আমাকে বিদায় দিতে হচ্ছে" বলে' দশ মিনিটের মধ্যেই তৈরী হ'য়ে নিলুম।

*　*　*　*

রাত্রি প্রায় দশটা—অতি সন্তর্পণে পূর্ব্বকথিত পোড়ো বাগান-বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ালুম। পায়ে রবার সোল জুতা।

মুখ পর্য্যন্ত কালো বোরখায় ঢাকা, শুধু চোখ দু'টী যা' খোলা। চোরের গতিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌লুম। কিন্তু চোর-কুঠুরিতেও ত আলো নেই? তবে কি অনুমান আমার মিথ্যা—পরিশ্রম ব্যর্থ হ'ল?

নৈরাশ্যে মুসড়ে পড়্‌ছিলাম, হঠাৎ 'কড়াৎ' করে' একটা শব্দ হওয়ায় সাম্‌নে খিলেন মত কি একটা দেখে তা'তে ঢুকে পড়্‌লুম।

নারীকণ্ঠে কে বল্‌লে—"লোকটা ধড়িবাজ বটে! জিনিস কিন্‌ব বলে' ডেকে যে মুস্কিলে পড়েছিলুম, তা' আর কি বল্‌ব। তবু রক্ষে যে, সে চিন্‌তে পারে নি। পরশু দেখা কর্‌তে বলে' এসেছি, নিশ্চয় সে যাবে। রঘুয়াকে বলা আছে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে ঢোকাবে—তারপর আর জন্মের মত বেরুতে হবে না। 'ইঁদুরখালি'র জমিদার-বাড়ীর অষ্টমের খাজনা প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা মজুত করা আছে, এই ফাঁকে সেটা হাত করে' নেওয়া যাক্, কি বল?"

পুরুষকণ্ঠে কে বল্‌লে—নিশ্চয়।

তারা সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে চল্‌ল। অনুসরণ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করে' তাদেরই পরিত্যক্ত ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ কর্‌লুম।

হঠাৎ নীচের সদর দরজায় কিসের গোলমাল উঠ্‌ল। বুঝ্‌তে দেরী হ'ল না যে, আমারই রক্ষিত লোকের সঙ্গে ওদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে। মজাটা দেখা যাক্ ভেবে তাড়াতাড়ি কালো পোষাক ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলুম। দেখি মেয়েটী চোখ লাল করে' কি বল্‌তে চাচ্ছে। পুরুষটীর হাত দু'খানা বাঁধা হ'য়ে গেছে এরি মধ্যে।

মেয়েটী আমাকে দেখেই মাথা নীচু কর্‌লে। মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে—বিপদ দেখ্‌ছেন? এরা চোর মনে করে' ধরেছে। আপনি একটু বলে' না দিলে কাল আর মুখ দেখাতে পার্‌ব না। অপমানের ভয়ে জমিদার শ্বশুর আমার হয় ত আত্মহত্যা কর্‌বেন।

সে কথায় উত্তর না দিয়ে একজনকে ইঙ্গিত কর্‌তেই সে দু'খানা বালা তার হাতে পরিয়ে দিলে। বল্‌লুম—"জমিদার শ্বশুর আত্মহত্যা করুন দুঃখ নেই, ইঁদুরখালির জমিদার বেঁচে থাকুক এইটেই আমি চাই।"

"কি বল্‌ছেন আপনি?"

"কিছু না। সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। দোহাই আপনাকে, এবার আর মূর্চ্ছা যাবেন না। কেন না, বিশেষ ফল হবে না তা'তে; বৃথাই ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি খাবেন। চল হে।"

*　*　*　*

বিচারে তাদের দু'জনের হ'ল দশ বৎসর জেল, আমার হ'ল এই ডেপুটী সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট পদপ্রাপ্তি। আর তোমাদের হ'ল সেই উপলক্ষে ভুরিভোজন বলে' অভিলাষ পাকড়াশী থাম্‌লেন।

নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে তখনও একটা আচ্ছন্নভাব খেলা করছে। কেউ কথা বল্‌তে পার্‌লে না। একজন এসে সংবাদ দিলে—পাতা হয়েছে।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বিচিত্র-হলিউড

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

চলচ্চিত্রের যুগ। এক এক সময় একটা করে' উত্তেজনার ঢেউ এসে পড়ে সভ্যজগতের বুকে, আর অমনি তা'কে কেন্দ্র করে' গড়ে' ওঠে সাহিত্য, জীবন আর জল্পনা। মানুষের পক্ষে এইটাই স্বাভাবিক। একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত না থাক্‌লে চল্‌বে কেন। অনেক কিছুর মত আজকাল ছায়াছবিই হ'য়ে উঠেছে সকলের চেয়ে আলোচ্য বিষয়। অথচ একদিন ছিল, যেদিন আজকের যারা ছবির সকলের চেয়ে বড় সমালোচক, তারাই ওকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। আর আজ।

যেদিকে চাও—ফিল্ম আর হলিউড—মেট্রো আর ইউফা—গ্রেটাগার্ব্বো আর চার্লি চ্যাপ্‌লীন। বাঙালীর মুখে মুখে ঘুরছে—কোন 'তারকা' অভিনেতার মুখে আছে সব সময় সিগারেট, কোন্ অভিনেত্রীর চোখের ভুরু কামানো নয়—আর কে কাল তার স্বামীকে করেছে 'ডাইভোর্স।' বিচিত্র আলোচনা—বিচিত্র নেশা! ওসব থেকে তুমি নিজেকে দূরে রাখ্‌তে পারবে না—তা' হ'লে তো তুমি সভ্যতার কিছুই আয়ত্ত করতে পার্‌লে না। হলিউডের কথা তোমায় পড়তেই হবে—কারণ, প্রধান প্রধান সম্পাদক পর্য্যন্ত ধরা পড়েছেন ছায়ার মায়ায়। যে কোন মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক ওল্‌টাও, দেখ্‌তে পাবে—তা'তে কমপক্ষে একটা-না-একটা ছায়াছবির প্রবন্ধ আছেই। ক্রমশ চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে' লেখা প্রবন্ধ আর টুক্‌রো খবরগুলো হ'য়ে পড়্‌ছে বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গ—প্রধান প্রধান লেখক আরম্ভ করেছেন ওই সব প্রবন্ধ লিখ্‌তে। এবার যতদূর দেখা যাচ্ছে, রবিবাবুও বোধ হয় বাদ যাবেন না এই হুজুগ থেকে। কোন্‌দিন দেখ্‌বো, তিনিও লিখেছেন—'রহস্যময়ী গার্ব্বো' প্রবন্ধ। সেদিন বাঙলা সাহিত্যের সুদিন কি দুর্দ্দিন—তা' ভাববার ভার প্রধান প্রধান সম্পাদকদের ওপর। আমরা লেখক—যা' পাই, তাই লিখি।

আজও সম্পাদকের কাছ থেকে হুকুম এসেছে—লিখ্‌তে হবে একটা যা' হোক্ কিছু—হলিউডের খবরের ওপর। কিন্তু লেখা তো কম হয় নি—কোন্ তারকা অভিনেতা, অভিনেত্রীর হাঁড়ির খবর আর জান্‌তে বাকী আছে। কত কথাই তো বলা হলো—মন থেকে বানিয়ে বা বিলাতী কাগজ থেকে চুরি করে'। আর পারা যায় না—এই সব মহামানব আর মানবীর বর্ণনা কর্‌তে। দিনের পর দিন মার্লেন আর হেলেন হেজ্—জন গিলবার্ট আর ক্লার্ক গ্যাবেল। লিখ্‌তে লিখ্‌তে প্রাণ অতিষ্ট হ'য়ে উঠেছে। এবার এদের এই বিশ্বজোড়া নামের ভার থেকে

মুক্তি চাই। মুক্তি চাই এদের এই সব ফেনিল প্রেম আর করুণ বিচ্ছেদের কথা থেকে। নেমে আস্‌তে চাই সাধারণ গণ্ডীতে। অতি সাধারণ অভিনেতার কথা বল্‌তে চাই। যার জীবনে আবর্ত্ত আছে, কিন্তু আর্ত্তনাদ নেই। সেই সব কথা আমার ভাল লাগে। তাই আজ বল্‌বো এমন একজনের কথা, যে বোধ হয় অনেকের কাছেই অপরিচিত —কিন্তু হলিউডে তার নাম আছে, এ সান্ত্বনা দিতে পারি।

হ্যাঁ, নাম তো আছে—আপনারাও কি আর তা'কে না চেনেন? এই সেদিনও তো আপনারা 'দি সিন্ অফ্ ম্যাডিলন ক্লডেট্' দেখে মেতে উঠ্‌লেন—হেলেন হেজের সুখ্যাতিতেও সহর মাতিয়ে তুল্‌লেন। এমন কী, তা'তে অভিনয় করে' সে গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হ'য়ে গেল —আর সেই ছবির সেই তরুণ, সুন্দর চিকিৎসকটীকে মনে নেই—নিশ্চয় আছে। রবার্ট ইয়ংকে ওই ভূমিকায় মনে না রাখ্‌বার উপায় নেই—কারণ, অভিনয় তার হয়েছে অনবদ্য।

রবার্ট ইয়ং মোটেই অতি বিখ্যাত অভিনেতা নন। তা' হ'লে তো আমি তার সম্বন্ধে লিখ্‌তামই না। কিন্তু নাম না থাকলেও ববের (রবার্টের আদরের নাম) ভেতর যে বৈশিষ্ট্য আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—আর তা' আছে বলেই তো সে আমার এত প্রিয়। শুধু অভিনয়ের দিক্ দিয়ে নয়—সাধারণ জীবন-যাত্রা—এমন কী মতা-মতের দিক্ দিয়ে হলিউডের অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। প্রভেদ একেবারে মূলে।

তার সম্বন্ধে এত কথা বল্‌বার হয় তো কোন দরকার হতো না, যদি না দেখ্‌তাম, উদীয়মান তরুণ অভিনেতা —যার সুখ্যাতিতে সারা আমেরিকা পঞ্চমুখ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যার সাম্‌নে পড়ে' আছে—সেই কি না বিয়ে করলে কবেকার বাল্য-প্রণয়ী বেটী হেণ্ডারসনকে। হলিউডবাসীর পক্ষে এইটাই একেবারে আশ্চর্য্য—কিন্তু ববের কাছে এইটাই সকলের চেয়ে স্বাভাবিক। ববের এই মিলনের পেছনে বেশ একটী ছোট প্রেমের কাহিনী আছে—সেইটুকুই আমার বল্‌বার মুখ্য বিষয়—আর তার সঙ্গে ববের দু'-চারটে ছোটখাট মতামত।

ববের জন্ম উনিশ শত সাত সালে, চিকাগো সহরে। তাদের ছিল এক বৃহৎ সংসার—কে কার ওপর নজর রাখে। ববকে গোড়া থেকে নিজেকে নিজে চালিয়ে নিতে হ'য়েছে—তাই তার মন গড়ে' উঠেছে একটী সুষ্ঠু সবল নিজস্ব আবহাওয়ার মধ্যে। তাদের সংসার লস্ এঞ্জেল্‌সে আসবার পর বব হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়। তখন তার বয়স মাত্র দশ বৎসর। এইখানেই তার প্রথম আলাপ হয় বেটীর সঙ্গে।

বব বলে—"আমাদের দু'জনের মন প্রায় একই সুরে বাঁধা ছিল—কারণ, আমরা ভালবাসতাম একই কাজ করতে—এমন কী, সময় সময় দু'জনে একই ঘটনার কথা ভাবতাম। সমস্ত স্কুলের মধ্যে দু'জনে ছিলাম এক সূত্রে গাঁথা।"

কিন্তু বন্ধুত্ব থাকলেও তাদের মনে তখনও ওর বেশ। কোন আশা জাগে নি। তাই বব গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে চলে' গেল কর্ম্মের সন্ধানে। জীবনে দাঁড়াবার আশায় সে লেগে গেল কাজ করতে—দিন নেই, রাত নেই, কেবল কাজ আর কাজ। ব্যাঙ্ক থেকে দোকানে—সেখান থেকে কোন ফ্যাক্টরীতে এইভাবে সে দিনের পর দিন চেষ্টা করে ভাল থেকে আরও ভাল কাজ পাবার। এই সময় সে 'পাসাডেনা কম্যুনিটি প্লেয়ার্স'-সঙ্ঘে একটা কাজ পেয়ে গেল।

এদিকে বেটী চলে' গেল স্কুল ছেড়ে দক্ষিণ কালি-ফোর্নিয়ার কলেজে পড়্‌তে। দু'জনে দু'জনের পথ বেছে নিলে।

বব সেই সঙ্ঘে কিছুদিন কাজ করবার পর আর একটা ভ্রাম্যমান থিয়েটারে প্রবেশ করে। এই সময় তার প্রবল ইচ্ছা হয় একবার ছায়াছবিতে অভিনয় কর্‌-বার। দিনের পর দিন আপ্রাণ চেষ্টা আর ব্যর্থ আশা পোষণ। এই সময়ে মেট্রোর একজন এজেণ্ট তা'কে নিয়ে গেল—কোম্পানীতে। সেইখানে বব চুক্তিবদ্ধ হলো।

জীবনে সে যা' চেয়েছে, তাই পেলে। দু'বছর আগে যে ছেলে ভিড়ের মধ্যে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে ডগ্‌লাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ বা আর কোন নামজাদা অভিনেতাকে

দেখ্‌বার চেষ্টা করতো, সেই কি না এসে পড়লো একেবারে ছায়ার মায়াপুরীতে। তারপর একটার পর একটা ছবিতে অভিনয়—আর যশ আর অর্থ। কিছুদিনের মধ্যেই ববকে দেখা যেতে লাগ্‌লো নামজাদা অভিনেত্রীদের সঙ্গে ঘুর্‌ছে—পার্টির পর পার্টিতে। তার নামে গুজব উঠ্‌তে লাগ্‌লো—এই বুঝি বব ভার্জিনিয়া ব্রুস্‌কে (বর্ত্তমানে জন গিলবার্টের স্ত্রী) বিয়ে করে। আবার ক'দিন বাদে সকলে বল্‌লে—ফ্লোরিণ ম্যাকিনের সঙ্গে তার মিলন হ'তে আর দেরী নেই।

কিন্তু বব তার সেই বাল্যকালের সাথীটীকে ভোলে নি। তার মনে তখনো তার স্মৃতি উজ্জ্বল ছিল। ওদিকে কালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটিতে বসে' বেটীও প্রতীক্ষা করছিল—বরের ডাকের।

হলিউডে তখন ববের নামে নানা গুজব—নানা কথা। কিন্তু ববের ডায়েরী থেকে এই সময়কার দু'-চারটে কথা তুলে দিচ্ছি—"আমি একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়্‌লাম ছায়াছবির রাজ্যে। এ যেন এক রাতের জন্যে রাজা হওয়া। আমি যে সেদিন কেমন করে' মাথা ঠিক্‌ রেখেছিলাম, তাই ভাবি। যাই হোক্‌, আমার তখন অবাধগতি—পার্টির পর পার্টি—আমি নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে দেখা করি, তাদের সঙ্গে কথা কই।

"কিন্তু ক'মাস বাদেই আমি হলিউডের ওপরকার এই জাঁকজমক ছাড়িয়ে দেখ্‌তে পেলাম—তার ভেতরকার জীবন। আমি দেখি, মেয়েরা যেন প্রেমের ব্যবসা কর্‌ছে—আর তার বদলে রীল পেছু টাকা পাচ্ছে। তরুণীরা শুধু দিনের পর দিন কাজই কর্‌ছে—টাকা আর নাম, এ ছাড়া তাদের ভাববার আর কিছুই নেই। তাদের মন গেছে ঠাণ্ডা হ'য়ে—যৌবনের উদ্দীপনার হয়েছে মৃত্যু। তা' ছাড়া, বিবাহিত স্বামী স্ত্রী, আমি দেখি—কেউ কারুর কথা ভাবে না—যে যার নিজের নিয়েই ব্যস্ত।

"এই সময় আমি 'টুডে উই লিভ' ছবিতে অভিনয় কর্‌ছি। এক তরুণ অভিনেতার সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি আমায় তাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ করে' তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রী সুন্দরী—কিন্তু অভিনেতাটী তাঁকে যেন ঘর সাজাবার জন্যে কিনে এনেছেন। খাওয়াদাওয়ার পর পথে এসে আমি তাঁর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ কর্‌লাম।

"আমি বল্‌লাম—'আপনার স্ত্রী খুব সুন্দরী—কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।'

"তিনি বল্‌লেন—'না না—তা' ছাড়া, আমার স্ত্রী একজন অভিনেত্রী।'

"আমি জিগ্‌গেস্‌ কর্‌লাম—'তা'তে একটু অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক।'

"তিনি উত্তর দিলেন—'কিছুই নয়। কারণ—বিয়ের সময় আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি যে, কেউই কারুর কোন কাজে বাধা দিতে যাব না। আমি আমার মেয়ে বন্ধুর দল নিয়ে আছি, আর আমার স্ত্রীর তো একদল পুরুষ বন্ধু আছেই। বুঝ্‌ছেন তো আমরা আধুনিক—কেউই সন্তান বা সংসার কামনা করি না।'

"আমি বল্‌লাম—'দেখুন, আমিও খানিকটা আধুনিক—কিন্তু আমার এরকম বিবাহ সুখের হয় না বলেই মনে হয়।'

"তিনি অতি শান্তভাবে উত্তর দিলেন—'তা' ঠিক্‌—আমাদের এ বিয়েও আর বছরখানেকের বেশী টিঁক্‌বে না।'

"এই ঘটনা আমার মনে ভীষণভাবে ছাপ ফেল্‌লে—আমি মিলনের এই পরিণতিতে প্রায় ভয় পেয়ে গেলাম। আমার মনে বিবাহের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রেম—যা' কেবল দু'জনে উপভোগ কর্‌বে—জগতের কোলাহল থেকে বহুদূরে। মাত্র এক বছরের মিলনের আশায় বিবাহ তো আমি ভাবতেই পারি না—কারণ, প্রেম এমন জিনিষ নয়, যা' যাকে ইচ্ছে তা'কে দেওয়া যায়। জগতে ভালবাসা যায় একজনকে—সেটা সাধারণকে বিলিয়ে দেওয়া যায় না।

"এই সময়েই আমি ঠিক্‌ কর্‌লাম—বেটিকে আমার মনের কথা জানাতে হবে। সহজেই তখন আমি কোন নামজাদা অভিনেত্রীকে মিলনের ডোরে আবদ্ধ কর্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু আমার কাছে সেই রকম মেয়েকে—যে

আমার চেয়ে একঘণ্টা দেরীতে ষ্টুডিওর কাজ সেরে ফিরবে রুক্ষ মেজাজ নিয়ে—জড়িয়ে ধরে' ছুটো মিষ্টি কথা সেই সময় বল্‌তে যাওয়া তো অসম্ভব। যে মেয়ে ছবির পর্দ্দায় খুব প্রেম কর্‌ছে—সাধারণ জীবনে তার কাছে প্রেম দাবী কর্‌লে এককণা মিলবে না। তা' ছাড়া, আমি কখনও স্ত্রীর নামের ভারে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাই না।

"এতদিন আমি বিয়ে করি নি—কারণ, আমার আয়ের অঙ্ক তখন এমন পুষ্ট হয় নি, যা'তে ছু'জনের বেশ ভালভাবে চল্‌তে পারে। কারণ—আমি চাই না যে, একই সংসারে স্বামীর আর স্ত্রীর ব্যাঙ্কের খাতা আলাদা হবে। ছু'জনেই উপায় কর্‌বে এ আমার পছন্দ নয়। স্ত্রী হবে সংসারের লক্ষ্মী—তার ভার ঘরের ভেতরের—বাইরে যা' কিছু, তা' আমিই করবো। এইবার প্রায় ছু'বছর বাদে আমার যখন এগারোখানা নামজাদা ছবিতে ('মেন মাষ্ট ফাইট', 'ষ্ট্রেন্‌জ ইন্‌টারলিউড', 'কিড্‌ ফ্রম্‌ স্পেন', 'টুডে উই লিভ্‌', ইত্যাদি অন্যতম) অভিনয় শেষ হয়েছে—এখন আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি আমার পক্ষে বেটীকে জানান চল্‌তে পারে। আর বেটীও তো সেদিন ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে—এবার তাকে আমার মনের কথা জানান যেতে পারে।

"তাই একদিন ফোনে তা'কে সব কথা জানালাম—আমি সে যে রাজী হবে, তা'ত আমি জান্‌তামই।

"হ্যাঁ, নিশ্চয় বিয়ে আমাদের হ'য়ে গিয়েছে। এখন দিনের পর দিন আমরা চেষ্টা কর্‌ছি—পূর্ব্বেকার যতকিছু কল্পনাকে কাজে লাগাতে। আমরা যে এখন সুখী তা'তে কোন সন্দেহ নেই।"

রবার্ট জর্জ ইয়ংয়ের কথার শেষ এখানে। তার কথাগুলো একটু অস্বাভাবিক। সহজেই তো হলিউড সম্বন্ধে আপনাদের স্বপ্নকে বিকৃত করে' দিতে পারে। ববের কথাই ঠিক—তা'তে একবিন্দু মিথ্যে নেই। হলিউডের মেয়েরা তাদের জীবন সম্বন্ধে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। দিনের পর দিন ষ্টুডিওতে আর পার্টিতে প্রেম বিক্রী করে' করে' তারা প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তিকে বসেছে ভুল্‌তে।

আমাদের পাঠকদের ধারণা ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। হলিউড স্বর্গরাজ্য নয়—সেখানে কেবল সুখ আর শান্তি নেই—সেখানে অর্থের প্রাচুর্য্য আছে বটে, কিন্তু প্রাণের স্পন্দন এসেছে থেমে। সেখানে ভালবাসার জন্যে বিয়ে হয় না—বিয়ে হয় কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার খাতিরে।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

চিত্র-জগতের পঞ্চশস্য

সুন্দরী জীন্‌ হার্লোর শরীরে বিখ্যাত কবি এডার এ্যালান পো'র রক্তধারা প্রবাহমান।

* * *

জন্‌ এবং ল্যারোনেল দুই ব্যারিমুর ভ্রাতাই কথা-চিত্রে যোগ দেবার পূর্ব্বে ছবি আঁকতেন এবং ছু'জনেই ভাল চিত্রকর ছিলেন।

* * *

পিতার আপত্তি না হ'লে জিমি ডুরান্তেকে আজ আমরা পাদপ্রদীপের পরিবর্ত্তে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীরূপে দেখ্‌তুম।

* * *

থিয়েটারের পরদা ওঠবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটী অভিনয়ের নায়ক হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় শিল্পী ফ্রাঙ্কট্ টোন্‌ অভিনেতা হিসাবে ষ্টেজে দাঁড়াবার সৌভাগ্য লাভ করেন—একেবারে আন্‌কোরা অবস্থায়। এঁর পূর্ব্বে কোন' অভিনেতা প্রথমেই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি।

* * *

'দি ট্রায়াল অব্‌ মেরী ডুগ্যান' পুস্তকে জয়টীকা লাভ করার জন্যে কালো রং-এর শিল্কের বোরখাটী নর্ম্মা শিয়ারার বড় প্রিয়। আজো তিনি অতিশয় যত্নের সঙ্গে সেটীকে তুলে রেখে দিয়েছেন।

আমরা গ্রাহক-গ্রাহিকার কাছ থেকে অজস্র অভিযোগ-পত্র পেয়েছি। সকলেই জান্‌তে চেয়েছেন—বাঙ্‌লার ফিল্ম শিল্পীদের কথা।

আগামী সংখ্যা থেকে আমরা বাঙ্‌লার চিত্র অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ দেবার চেষ্টা কর্‌ব—কিন্তু বৈচিত্র্যহীন বাঙালী-জীবন সম্বন্ধে কি ই বা বল্‌বার আছে!

গ্লোরিয়া স্টুয়ার্ট

দীপালীর সৌজন্যে

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪১ | পঞ্চম সংখ্যা

নিয়তি

শ্রীঊষা বিশ্বাস, এম-এ, বি-টি

আজ রবিবার। অফিসে যাবার তাড়া নেই। সকাল-বেলায় চা খেয়ে খানিকটা ঘুরে এসে নিজের ঘরে ইজি চেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্‌টাচ্ছিলাম। ছুটির দিন। স্নান ক'র্‌তে খেতে যে অন্ততঃ বেলা বারোটা বাজবেই সে কথা আমার এবং বাড়ীর কারুরই অজানা নেই। হঠাৎ পাশের বাড়ী থেকে উলুধ্বনি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে শাঁখও বেজে উঠ্‌ল। আপন-মনে খবরের কাগজটাতেই চোখ বুলাতে লাগ্‌লাম। পাশের বাড়ীতে অসময়ে মঙ্গলধ্বনির যে কি কারণ ঘট্‌তে পারে তা' জান্‌বার জন্যে আমার মনে কিছুমাত্র আগ্রহ বা ঔৎসুক্য জাগল না। দেখ্‌লাম স্ত্রী ইন্দিরা খুব ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ঘরে ঢুক্‌ল। আমাদের ঘরের পূবের জানালাটা দিয়ে পাশের বাড়ীর সব দেখা যায়। ছোট্ট একটি একতলা বাড়ী। ছোট ছোট দু'টি মাত্র ঘর। সাম্‌নে একটুখানি বারান্দা। তা'রই একপাশটা দরমা দিয়ে ঘিরে নেওয়া হ'য়েছে রান্নাবান্নার জন্যে। খাওয়াদাওয়া বারান্দাতেই হয়। নেহাৎ বৃষ্টির সময় বারান্দা জলে ভিজে গেলে ঘরে খাওয়া হয়। বারান্দার সাম্‌নে ছোট্ট একফালি উঠানের মত। তা'র একপাশে কল চৌবাচ্চা পায়খানা ইত্যাদি। বাড়ীতে লোক বেশী নয়। একটি ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী ও মা। ভদ্রলোকটি কোল্‌কাতার কোনও সওদাগরী অফিসে কাজ করেন। মাইনে মোটা পঞ্চাশেক টাকা পান বোধ হয়। রোজ সকাল ন'টায় দু'টি ভাত খেয়ে বেরিয়ে যান। বাড়ী ফির্‌তে ফির্‌তে তাঁর সন্ধ্যে হ'য়ে যায়। বাড়ীতে কোনও ঝি চাকর নেই। শাশুড়ী বউ দু'জনে মিলেই ঘরের সমস্ত কাজকর্ম্ম করে। বউটির মাত্র বছর দুই বিয়ে হয়েছে। সে সম্প্রতি এখানে নেই, বাপের বাড়ী গিয়েছে। তার বাপের বাড়ী কোল্‌-কাতার কাছেই। গত রবিবারে রমেনবাবু (ভদ্রলোকটির নাম) শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে দেখে এসেছেন। কয়েকদিন হ'ল বউটির একটি ছেলে হ'য়েছে। ইন্দিরা প্রায়ই জানালা দিয়ে ও বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে

কথাবার্ত্তা বলে। এসব খবর তা'র কাছ থেকেই শোনা।

ইন্দিরা ঘরে ঢুকে আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে তাড়াতাড়ি পূবের জানালাটার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। পর্দ্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে অত্যন্ত কৌতূহলভরে কি যেন দেখ্‌তে লাগ্‌ল। পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকটির মা তা'কে কি বল্‌লেন, শুন্‌তে পেলাম না। আমি খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লাম -"কি গো, অত কি দেখ্‌ছো ওখানে? সাধে কি ইংরিজিতে একটা কথা আছে—'কিউরিওসিটি উওম্যান্‌স্ কার্স' —'কৌতূহল মেয়েদের অভিশাপ।' পাশের বাড়ীতে ব্যাপার কি? শাঁখ বাজ্‌ছে কেন?"

ইন্দিরার কৌতূহল বোধ হয় ততক্ষণে মিটে গিয়েছিল। সে আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে জানালার কাছ থেকে স'রে এল—মুখখানা ভার ক'রে খাটের উপরে এসে বসে পড়ল। আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। পাশের বাড়ীর উলুধ্বনি ও শাঁখ বাজার সঙ্গে তা'র মুখভার ক'র্‌বার কোনও যোগাযোগ দেখ্‌তে পেলাম না। কাগজখানা রেখে জিজ্ঞেস ক'র্‌লাম—"কি গো, কি হ'ল হঠাৎ? মুখখানা ভার যে? ও বাড়ীতে আজ কি?"

—"বউ এল।"

—"বউ এল? কা'র বউ?"

—"কার আবার? রমেনবাবুর।"

—"রমেনবাবুর বউ? সে এত শীগ্‌গির বাপের বাড়ী থেকে চ'লে এল না কি? তুমি না বল্‌ছিলে—"

—"না গো না, সে বউ বাপের বাড়ীতেই আছে, সে আর এখন আস্‌বে কি ক'রে? তার শ্বশুরবাড়ীও ঘুচে গেল। এ রমেনবাবুর নতুন বউ এল।"

—"রমেনবাবুর নতুন বউ? তুমি কি বল্‌ছো ইন্দিরা, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

—"এতে আর না বুঝ্‌বার কি আছে? রমেনবাবু আর একটা বিয়ে ক'রে আজ নতুন বউ নিয়ে এলেন।"

—"বল কি? বড় বউএর অপরাধ? তোমার কাছেই ত শুন্‌তাম বউটি নাকি বড় লক্ষ্মী। তা'র বাপের বাড়ীর অবস্থা মন্দ নয়। তবু সে এখানে হাসিমুখে দিনরাত খাট্‌ত, মুখটি বুজে।"

—"আহা! অমন লক্ষ্মী মেয়ে প্রায় দেখা যায় না আজ-কালকার দিনে।" ব'লে ইন্দিরা সেই হতভাগিনীর দুর্ভাগ্যের কথা মনে ক'রে আঁচল দিয়ে চোখ মুছ্‌ল।

—"রমেনবাবুকে ত ভাল লোক ব'লেই জান্‌তাম। লোকটার পেটে পেটে এতও ছিল! হঠাৎ এই দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল কেন তা'র?"

—"তাঁর মায়ের হুকুম। বুড়ীর মুখে আর ছেলের প্রশংসা ধরে না! বলে—এমন ছেলে আর কা'রও হয় না। এতবড় হয়েছে, তবু মা'র কথায় ওঠে, আর বসে। মা কাছে না ব'সে থাক্‌লে না কি তাঁর খাওয়াই হয় না। মা'র একটু অসুখ করলে আহার-নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে সেবা করেন—দিনরাত বিছানার পাশে ব'সে থাকেন।

—"হ্যাঁ, তুমি ত প্রায়ই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তাঁর মাতৃভক্তির প্রশংসা ক'র্‌তে। তা' এ যে মাতৃভক্তির একবারে পরা-কাষ্ঠা দেখালেন! বাঙালী ছেলেরা আর কোনও সময়ে না হোক্, বিয়ের সময় মা বাবার খুব বাধ্য হয়। রমেন-বাবু মা'র আজ্ঞায় একটি নিরপরাধা মেয়েকে পরিত্যাগ ক'রলেন! ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে যা'কে বিয়ে করেছেন, তা'র উপরেও কি কোনও কর্ত্তব্য নেই?"

—"তা' তোমরা বোঝ কই?"

—তাই না কি? এম্‌নি স্ত্রীর উপরে তাঁর টান! তুমি চাও, তোমার উপরে আমার ওরকম টান হয়?"

—"ধ্যেৎ! তুমি কোন্ দুঃখে অমন হ'তে যাবে?" বলেই ইন্দিরা ফিক্ ক'রে হেসে ফেল্‌ল। তারপর একটুখানি চুপ ক'রে থেকে ছোট একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌তে লাগ্‌ল—"আমার শাশুড়ীও ছিলেন তেম্‌নি—একেবারে যেন মায়ের বাড়া! অমন শাশুড়ী পাওয়াও কপাল!"

আমি সকৌতুকে বল্‌লাম—"শুধু দেখ্‌ছি শাশুড়ীরই গুণ গাইছ, বল্‌লে না—এমন স্বামীটিও পেয়েছো অনেক পুণ্যের জোরে?"

ইন্দিরা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বল্‌লে—"যাও! বেশী বেশী আর আত্মপ্রশংসা ক'র্‌তে হবে না।"

তারপর তা'কে একটু রাগাবার জন্যেই বল্‌লাম—"ও বাড়ীতে বউ বরণ হচ্ছে। তোমার নেমন্তন্ন হয় নি? তুমি যা'বে না?

—"হ্যাঁ, আমার দায় পড়েছে যেতে! যা' না বউ।"

—"কেন এ বউটি খুব খারাপ দেখ্‌তে না কি? এই খানিক আগেই ত দেখ্‌ছিলাম নতুন বউ দেখ্‌তে তোমার কৌতূহলের সীমা নেই।"

একটু সলজ্জ হাসি হেসে ইন্দিরা বল্‌ল—"না, একটু দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'ল এ বউটি কেমন হ'ল। মেয়েটি কিন্তু দেখ্‌তে শুন্‌তে নেহাৎ মন্দ নয়। কেন যে ওর বাপ মা সতীনের ঘরে দিল ওকে। তাঁদের বুকের পাটাও খুব যা' হোক্‌। একটা বউকে যা'রা ওরকম ক'রে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ল, আবার তা'দেরই ধরে মেয়ে দিতে ওদের বুক কাঁপ্‌ল না?"

—"কি ক'রে? কন্যাদায়। আমাদের বাঙলাদেশে মেয়েও এম্‌নি সস্তা। এখানে গঙ্গাযাত্রীরও বোধ হয় কনের অভাব হয় না।"

নিজের অজ্ঞাতেই আমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস প'ড়ল। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে ইন্দিরাকে জিজ্ঞেস ক'রলাম—"আচ্ছা, রমেনবাবুর মা তোমায় আগে কিছু বলেছিলেন যে, তিনি আবার ছেলের বিয়ে দেবেন?"

—"না, আমি ত কিছুই জান্‌তাম না। এই খানিক টেবিল গোছাতে এ ঘরে এসেছিলাম। জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই রমেনবাবুর মা আমায় খবরটা দিয়ে বল্‌লেন—বউ দেখতে যেতে। শুনে আমি ত অবাক্‌! আমায় এর আগে কিছুই বলেন নি, কথাটা আমার কাছে সম্পূর্ণ চেপে গিয়েছিলেন। আমি অবিশ্যি জান্‌তাম, শাশুড়ী বউএর উপরে মোটেই খুসী নন্‌। সে বেচারা সারাদিন গাধার খাটুনি খেটে শাশুড়ীর মন পেত না, কিছুতেই। শাশুড়ী তার প্রত্যেক কাজেই খুঁৎ ধরতেন—দিনরাত গঞ্জনা দিতেন বড় মানুষের মেয়ে ব'লে। তবু আমি এতটা ভাবতে পারি নি। জিজ্ঞেস ক'রলাম—'বড় বউএর অপরাধ কি?' তা'তে বুড়ি বল্‌ল—'সে বড় মানুষের মেয়ে। তা'র যা' বড়মানুষী চাল! তার কি আমাদের মত গরীব গেরস্তঘরের বউ হওয়া পোষায়? বউ যখন তখন তার বাপের বাড়ীতে গিয়ে ব'সে থাক্‌বে। আমার বুড়ো হাড়ে কি আর এত খাটুনী সয়?' শুনে আমার বড্ড রাগ হ'ল। বল্‌লাম—'আজ দু'বছ'রের মধ্যে এই ত প্রথম তাকে বাপের বাড়ী যেতে দেখ্‌লাম। তা'ও নেহাৎ দায়ে ঠেকে। শরীরটা তা'র যে রকম খারাপ হয়েছিল।' বুড়ি তা'তে বল্‌ল—'শরীর খারাপ হলেই কি বউকে নবাবী ক'রে বাপের বাড়ীতে গিয়ে বস্‌তে হবে? আর কি কা'রও শরীর খারাপ হয় না দুনিয়ায়? তা'র কি বাছা, কম বড়-মানুষী চাল ছিল! আমাদের এই গরীবের ঘরের খাওয়া তার মুখে রুচ্‌ত না। বড় মানুষের ঝি বাপের বাড়ীতে চিঠি লিখে লিখে পাঠাত, আর অম্‌নি তার বড়-মানুষ ভাইও আনাজ-পত্তর সব পাঠিয়ে দিত। তা' অতই যদি বাপু তোর বোনের উপর দরদ ত বড় লোকের ঘরে বোনের বিয়ে দিলেই পারতিস। আর আনাজ-পত্তরই যদি বাপু পাঠাবি ত, সঙ্গে তেল ঘি মসলাও পাঠা। আমাদের গরীবের ঘরে অত সব পাব কোথায়? মোটে ত রমুর এই ক'টা টাকা মাইনে সম্বল? এর মধ্যে থেকে তিন-তিনটা লোকের খাওয়াপরা, বাড়ীভাড়া সব খরচ।' শুনে আমার রাগ সামলানো দায় হ'য়ে উঠ্‌ল, একবার ভাব্‌লাম বলি—'বউএর বাপের বাড়ী থেকে কিছু পাঠালেও দোষ, আবার না পাঠালেও দোষ।' কিন্তু তা' আর বল্‌লাম না। জিজ্ঞেস ক'র্‌লাম 'আচ্ছা বউ না হয় বড় মানুষের মেয়ে! তা'র বড়মানুষী চাল! আপনার নাতিটিকে কি কর্‌বেন? তা'কে ত আর ফেল্‌তে পার্‌বেন না!' শুনে বুড়ি বল্‌ল—'ও কি আমার নাতি যে, ওকে নেবো? ঘরের কথা বল্‌তে নেই মা। ঘরের বউকে কি কেউ আর অম্‌নি অম্‌নি ত্যাগ করে?' বুড়ি আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিল, শুন্‌তে আমার আর প্রবৃত্তি হ'ল না, ধৈর্য্যও থাক্‌ল না। বল্‌লাম—'যাই, আমার অনেক কাজ আছে এখন।' বাপ্‌রে! মেয়ে-

মানুষ হ'য়ে মেয়েমানুষের এতবড় সর্ব্বনাশও ক'রতে পারে কেউ!"

কিছুক্ষণ আমরা দু'জনেই চুপ ক'রে বসে রইলাম। খানিক পরে ইন্দিরা বল্‌ল—"কথাটা শুনে অবধি বউটির জন্যে মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। সমস্ত কাজের মধ্যে থেকে থেকে খালি তা'র কথাই মনে হচ্ছে! সে বাপের বাড়ীতে না গেলেই পার্‌ত।"

—"সে বেচারা কি ক'রে জান্‌বে যে, বাপের বাড়ী গেলেই তা'র এই দশা হবে? জান্‌লে কখনই সে যেত না।"

—"সে এবারে বাপের বাড়ী না গেলে তা'কে আর বাঁচ্‌তে হ'ত না। তার পক্ষে অবিশ্যি মরাই ভাল ছিল।"

—"সে এখানে থাক্‌লেই বা কি হ'ত? বউকে যা' তা' একটা অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিতে কতক্ষণ লাগে, সত্যিই যদি কা'রও ওরকম কুঅভিসন্ধি থাকে?"

—"তা' অবিশ্যি।" ব'লে ইন্দিরা টেবিলের উপরকার ঘড়ির দিকে চেয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"মা গো, কত বেলা হ'য়ে গিয়েছে! আমার ছিষ্টির কাজ প'ড়ে রয়েছে যে গো!"

ইন্দিরা চ'লে গেলে আমি খবরের কাগজখানা আবার বৃথা পড়্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লাম। কিছুতেই তা'তে আর মন দিতে পার্‌লাম না। সেখানা হাতে নিয়েই ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। যাকে কখনও চোখে দেখি নি, সেই অপরিচিতার দুঃখেই আজ আমার মনটা কেমন ক'র্‌তে লাগল। এ রকম ধরণের ঘটনা গল্পে-উপন্যাসেই প'ড়েছিলাম। এ যে কারও বাস্তব জীবনে ঘটতে পারে, সে কথা কোনদিনই ভাবি নি। মনে হ'ল, এ ঘটনাটা চোখের সামনে ঘটল ব'লেই না আমরা জান্‌তে পার্‌লাম। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে কত রমেনবাবুই হয় ত রয়েছে, কে তা'র খবর রাখে! আমি ভাবুক নই বা সমাজসংস্কারকও নই। সামাজিক সমস্যা নিয়ে এর আগে কখনও মাথা ঘামিয়েছি ব'লেও ত মনে পড়ে না। কিন্তু তবু আজ বারবার মনে হ'তে লাগল—একটি মানুষ একটি নিরপরাধী স্ত্রীলোকের প্রতি এতবড় যে একটা অন্যায় ক'রল, এর কি কোনও প্রতীকারই নেই? সমাজ এতবড় একটা অবিচার মেনে নেবে নির্ব্বিচারে?

এমন সময়ে আমার ছেলে সতু এসে বল্‌ল—"বাবা, মা তোমায় স্নান ক'র্‌তে যেতে বল্‌লেন। অনেক বেলা হ'য়ে গিয়েছে।"

তারপর প্রায় চার মাস কেটে গিয়েছে। আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম রমেনবাবুর প্রথম স্ত্রীর কথা। ইন্দিরা আর ও জানালার ধারে গিয়ে বড় একটা দাঁড়ায় না। ওর মনটা ওঁদের উপরে একটা গভীর বিরক্তিতে ভ'রে গিয়েছে। সেজন্যে ও আর ওঁদের সঙ্গে ভাল ক'রে কথাবার্ত্তাও বল্‌তে পারে না। সে বড় বউকে এখনও ভুল্‌তে পারে নি—প্রায়ই তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে। বউটিও নাকি তার শ্বশুরবাড়ীর খবর জান্‌বার জন্যে ইন্দিরাকে এর মধ্যে দু' তিনখানা চিঠি লিখেছে। কিন্তু ইন্দিরা তা'কে এ নিদারুণ সংবাদটি কিছুতেই দিতে পারবে না ব'লে তার কোনও চিঠিরই জবাব দেয় নি।

সেদিন শনিবার। আমি সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরেছি। ঘরে ঢুকে দেখি ইন্দিরা বিমনা হ'য়ে চুপ্‌টি ক'রে বসে আছে। হাতে তার একখানা খোলা চিঠি। পাশেই খাটের উপরে সতু ঘুমোচ্ছে। আমি যে কখন ঘরে ঢুকেছি ইন্দিরা টেরই পায় নি। এম্‌নি অন্যমনস্ক ছিল সে। আমি তা'কে এই সময়ে এই অবস্থায় দেখে একটু অবাক্ হ'য়ে গেলাম। ভাব্‌লাম—কোনও দুঃসংবাদ এসেছে না কি! তারপর আস্তে আস্তে সাহস ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলাম—"ওটা কা'র চিঠি? কখন এল?"

ইন্দিরা অম্‌নি চম্‌কিয়ে আমার দিকে চাইল। বল্‌ল—"প'ড়ে দেখ না? পাশের বাড়ীর বড় বউ লিখেছে আমায়। এম্‌নি একটা কিছু যে হ'বে, আমিও ভয় করেছিলাম।"

চিঠিখানা হাতে নিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লাম—

"দিদি,

—"এর আগে তোমাকে তিনখানা চিঠি লিখেছিলাম,

তা'র একখানারও জবাব পাই নি। এখন বুঝ্তে পার্ছি ভাই, কেন তুমি আমার চিঠির উত্তর দাও নি। এতদিন আমি কি উদ্বেগেই যে দিনরাত কাটিয়েছি, সে শুধু ভগবানই জানেন। কিন্তু এখন শান্তি পেয়েছি—কারণ, জীবনের পথ আমি বেছে নিয়েছি—জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়াও চুকে গেছে আমার। তুমি বল্লে বিশ্বাস করবে না হয় ত দিদি, আমার এতবড় দুর্ভাগ্যের কথা শুনেও আমি একফোঁটা কাঁদি নি, এম্নি পাষাণী মেয়ে আমি। এজন্মে এমন কোনও পাপ করেছি ব'লে মনে পড়ে না ত যা'র জন্যে ভগবান আমায় এতবড় শাস্তি দিতে পারেন। হয় ত পূর্ব্বজন্মের কোনও দুষ্কৃতির ফলে আজ আমার এই দশা। নিজের মনকে বারবার এই বলেই বুঝাচ্ছি।

—দিদি, আমার দুর্ভাগ্যের কথা আমি এতদিন মোটে জানতামই না—তা' বোধ হয় তুমি আমার চিঠিগুলি প'ড়েই বুঝ্তে পেরেছো। মাত্র দিনকয়েক আগে শুনেছি। খোকার বাবাকে ও আমার শাশুড়ীকে চিঠি লিখে লিখে জবাব পাই না। ওঁদের কোনও খবর না পেয়ে মনে যে কী ভাবনাই হ'ত বল্তে পারি না। খোকা মাস দেড়েকের হ'তেই আমি বাপের বাড়ী থেকে চ'লে আস্তে চেয়েছিলাম। ভাবলাম—আমি এখন বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছি, শাশুড়ী বুড়োমানুষ, তাঁকে একা-একাই সংসারের সব কাজ করতে হচ্ছে, এখন আমার সেখানে যাওয়া নিতান্ত দরকার। দাদাকে ব'ল্তে তিনি কথাটা কানেই তুল্লেন না। মা বল্লেন—'আরও কিছুদিন যাক্ না, শরীরটা তোর আর একটু সুস্থ হোক্, তখন গেলেই হবে।' তারপর ও বাড়ীর কোন খবরই না পেয়ে আমি যখন ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি, মা ও দাদা দেখি তখনও বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে রয়েছেন। দেখে আমার মনে কেমন যেন খটকা লাগ্ল। আমি ও বাড়ীর কথা তুল্লেই মা ও দাদা যেন কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করেন। আমি একদিন জোর ক'রেই দাদাকে ব'ল্লাম—'দাদা, আর ত আমি এখানে থাকতে পারি নে। আজ প্রায় চারমাস হ'তে চল্ল ওঁদের কোনও খবরই পাই না। ওঁরা সব কেমন বা আছেন। আমায় তোমরা শীগ্‌গির ওখানে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত ক'রো।' শুনে মা কেঁদে সেখান থেকে উঠে চ'লে গেলেন, দাদা একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লেন—তোর কি ভাই, আর ও বাড়ীতে স্থান আছে আজ! আমার প্রাণ থাক্তে ও বাড়ীতে তোকে আর কোনও দিনও যেতে দেব না আমি। রমেন আবার বিয়ে করেছে যে। তোকে খবরটা এতদিন দিতে পারি নি। 'তোর শাশুড়ী আবার তোর চরিত্র সম্বন্ধেও অপবাদ দেয়। বলে—'এ ছেলে না কি ওদের নয়।' এম্নি ইতর!' আর শুনতে পারলাম না। দু'চোখে অন্ধকার দেখ্তে লাগ্লাম, মাথাটা যেন ঘুরে উঠ্ল। খানিকক্ষণ পরে নিজেকে একটু সাম্লে নিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলাম—'দাদা, উনিও কি আমায় সন্দেহ করেন?' দাদা বল্লেন—'না, সেকথা অন্ততঃ মুখ ফুটে সে বল্তে পারে নি। তবে সে এম্নি কাপুরুষ যে, মা'র কথার উপরে জোর ক'রে কোনও কথা বল্বারও সাহস তার নেই।'

—"তারপর থেকে ভাই, আমি অনেক ভেবেছি—সারাটা জীবন আমার কেমন ক'রে কাটবে। এর পরে আমি লোকসমাজে মুখ দেখাবো কি ক'রে? দাদা বৌদি' আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। তারা কোনদিনই আমায় অযত্ন করবেন না—তাদের উপরে এ বিশ্বাসটুকু আমার আছে। তবু মনে হয় আমার এ জীবনের সার্থকতা কী? জীবনটাকে যে অন্যরকমভাবে গ'ড়ে তুল্ব, আমার সে শিক্ষা বা উৎসাহ কই? সারাটা জীবন ভাই, আমায় পরাশ্রিত হ'য়ে থাক্তে হ'বে। আত্মীয়-বন্ধু সকলেই আমায় করুণার চক্ষে দেখ্বে এ আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। আমার ছেলে যখন বড় হ'য়ে আমায় জিজ্ঞেস ক'র্বে—তা'র বাবা আমায় ত্যাগ করেছেন কেন, আমি তা'কে কি জবাব দেবো? আমি তাই আজ ম'রে এ দুঃসহ লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই, আর এই সঙ্গে আর একজনকেও নিষ্কৃতি দিয়ে গেলাম। মরবার আগে একটিবার তাঁকে দেখ্বার বড় সাধ ছিল ভাই। সে ইচ্ছা আমার আর পূর্ণ হ'ল না। দেখা হ'লে একবার

তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম—'তিনিও আমাকে অসতী মনে করেন না কি। তিনি যদি আমায় বিশ্বাস করেন, তবে আমার কোন দুঃখই নাই। আমায় কি তিনি এ দু'বছরের মধ্যেও চেনেন নি? আজ তাঁকেও একখানা চিঠি লিখে গেলাম। আমার শ্বাশুড়ীর বিরুদ্ধেও আজ আমার কোনও অভিযোগ নেই। আমাকে যে তাঁর পছন্দ হয় নি, সে বোধ হয় আমারই কপালের দোষ। শুধু দুঃখ হয় এই মনে ক'রে যে, তিনি মিছিমিছি এ মিথ্যে কলঙ্ক ও অপবাদের বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিলেন সব জেনে শুনেও। এম্‌নিই ত আমায় ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌তেন, এ অপবাদ না দিয়েও। ভগবান জানেন আমি নির্দ্দোষ।

—"ভাই, যাবার সময় ছেলেটার জন্যেই যা' দুঃখ হ'চ্ছে। তার জন্যেই বাঁচ্‌বার লোভ হচ্ছে একটু একটু। না হ'লে আমার মত হতভাগিনীর আর বেঁচে থেকে লাভ কি? বাপ ত তার থেকেও নেই, মাকেও সে হারাল। তার ভার ভগবানের উপরে দিয়ে গেলাম। তিনিই তাকে রক্ষা করবেন।

"আজ এ জন্মের মত আমায় বিদায় দাও ভাই। আমার অনেক ভালবাসা নিও। আস্‌ছে জন্মে আমরা দু'টিতে যেন এক বাড়ীতে দু'টি বোন্‌ হ'য়ে জন্মাই। আমার শ্বাশুড়ী যখন আমায় নির্য্যাতন ক'রতেন, তখন তোমার সেই মমতাস্নিগ্ধ সুন্দর মুখখানিতে যে সমবেদনার ব্যথা ফুটে উঠ্‌ত, আজও তা' আমি ভুল্‌তে পারি নি। আশীর্ব্বাদ ক'রো দিদি, পরের জন্মে যেন আমার ভাগ্য অন্যরকম হয়। ইতি—

হতভাগিনী কমলা"

চিঠিখানা আগাগোড়া পড়্‌লাম। প'ড়তে প'ড়তে আমার চোখের পাতা ভিজে উঠল। ঠিক্‌ এম্‌নি সময়ে শুন্‌তে পেলাম পাশের বাড়ীতে ভীষণ গোলমাল। শ্বাশুড়ী বউএ ঝগড়া লেগেছে। এ ত প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে আজকাল। তা'দের একজনের গলা আর একজনের গলাকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। কেউই থাম্‌বার পাত্র নয়। শুন্‌লাম শ্বাশুড়ী ব'ল্‌ছে—"আমার অমন লক্ষ্মীর প্রতিমার মত বউকে বিদায় দিয়ে শেষে নিয়ে এলাম কি না এই ডাইনী রাক্ষুসীকে।"

শুনে ভাব্‌লাম—পাপের প্রায়শ্চিত্তও সুরু হ'ল বোধ হয়।

উষা বিশ্বাস

খোকার অসুখ

শ্রীঅসিতকুমার সেন, বি-এল

আমাদের বটু—বটকৃষ্ণ বরাট এম্-বি পাশ করে মামার বাড়ীর দেশে সুলতানপুরে ডাক্তার এন, আর, দাশের ডিস্‌পেনসারীতে বেরুচ্ছে। লোকটা এদিকে মন্দ নয়, তবে বড় বাজে বকে। সব বিষয়েই ফুটকাটা' চাই। ডাক্তার দাশ তাকে স্নেহ করলেও তার স্বভাবের জন্য মধ্যে মধ্যে বড় চটে যান। কারণ, অনেক সময়ে তার জন্য ডাক্তার দাশকে বন্ধুদের কাছে রুগীর কাছে বড় অপ্রস্তুত হ'তে হয়।

এই ধরুন না সেদিন। একঘর লোক বসে আছে, ডাক্তার দাশ একজনকে পরীক্ষা করছেন, এমন্ সময় মোটরে করে এক সম্ভ্রান্ত লোক এলেন। ডাক্তার দাশ্ রোগী দেখা স্থগিত রেখে দরজার গোড়ায় এগিয়ে নমস্কার করে বল্লেন, "আসুন, আসুন, আজ আমার কি সৌভাগ্য, স্বয়ং উকীল-সাহেব আমার বাড়ী!"

কোথাও কিছু না, একঘর লোককে স্তম্ভিত করে বটু বল্লে "ওঃ! উকীল!! উকীলরা তো পয়সার চাকর, পয়সা দিলে তারা সব করতে পারে!"

সবাই হতবাক্। ডাক্তার দাশ নিজেকে সংযত করে বল্লেন "দেখ বটুবাবু, যা'তা' বলা তোমার ভয়ানক বদ অভ্যাস হয়ে গেছে। জানো আজ কাকে লক্ষ্য করে একথা বলছ? ইনি এই জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর। জেলার মধ্যে এঁর যা' মান তা' কারও নেই বললেই হয়। আর তা'ছাড়া আইন-ব্যবসাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সৎ ও সম্ভ্রান্তসূচক—এটা সবাই মানে। যাক্, ফের যদি এরকম ধারা শুনি তা' হ'লে আমার এখানে তোমার আর থাকা হবে না। এখন যাও, ওই রতন বোসের বাড়ী থেকে ঝি এসেছে তাদের খোকার কি অসুখ, তাকে 'এ্যাটেণ্ড' করে এসো। আমার যেতে দেরী হবে।"

কিন্তু ঝি শুনবে না। বাড়ী থেকে বৌমা না কি স্বয়ং দাশ-সাহেবকে যেতে বলে দিয়েছেন 'পই পই' করে। ওসব নতুন ডাক্তারের কম্মো নয়। আর কেউ গেলে বৌমা তাকে 'অনর্থ' করবে।

ডাক্তার দাশ তাকে অনেক বোঝালেন—তিনি এখনই একজন রোগীর বড় একটা 'অপারেশন' করবেন, নইলে তার প্রাণ সংশয়। আর ইনিও ভাল ডাক্তার, নতুন হ'লে কি হয়—আর খোকার অসুখতো—

এখানে পাবলিক প্রসিকিউটার মহাশয় টিপ্পনী কাটলেন "হ্যাঃ, খোকাদের অসুখ যদি নাই সারাতে পারল, তা' হ'লে মিছেই ডাক্তারী পাশ করা।"

এতক্ষণে বটুর মুখটা লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠেছে।

বটুর গুণপনা প্রকাশের সুযোগ বেশী নেই। নতুন ডাক্তার বা উকীলকে কেউ ভরসা করে ডাকে না। না হ'লে সে নিজের কেরামতি দেখিয়ে দিত। তার নামে দেশের ছোকরারা ছড়া বেঁধেছিল গোটাকতক। বটু বলে, হিংসুক লোকেরা তার সৌভাগ্যের সূচনা দেখে ওরকম করছে। অবশ্য ভাগ্য তার ফিরতে পারে—কারণ তার গুরু ডাক্তার দাশের দেশযোড়া নাম। বটুর নামের একটা ছড়া আমার এখনও মনে আছে।

বরাটকৃষ্ণ বট
লম্বায় একটু খাট
এম্-বি তিনি পাশ
দেখতে জানেন লাশ
জ্যান্ত রোগী দেখতে গেলে
—কাটেন তিনি ঘাস!!

যা' হোক্, ডাক্তার দাশের কথায় নিমরাজী হয়ে ঝি বলল "তা' হ'লে তাই-ই হোক্ গে, তোমরা যা' জান কর বাপু, মুই জানি না কিচ্ছুক।"

পথে যেতে যেতে ঝি পরিচয় দিল। রতন বোসের ছেলের অসুখ—কি জানি কেন 'হাকোড় পাঁকোড়' করতেছে। দাদাবাবু (রতন) কোলকাতায় চাকরী করতে গেছে—রাত্রে ফেরে। সারদা দিদি এসে বসে আছে, কত কি বল্‌তেছে। এবং ঝি সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনিয়ে দিল; অর্থাৎ, তার মায়ের আমল থেকে তারা ও বাড়ীর ঝি, বাবুদের অবস্থা খুবই ছিল; সব মরে হেজে গেছে, নৈলে—

বল্‌তে বল্‌তে বাড়ী এসে পড়াতে ঝি থাম্‌ল। নইলে হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ইত্যাদি হয়ে শেষে পাঠশালে পড়ুয়ার দল পর্য্যন্ত আমরা দেখ্‌তে পেতাম। বাড়ী পৌঁছে ঝি নীচে থেকে সাড়া দিল "অ বৌমা, এই নাও বাপু ডাক্তার এসেছে, বড় ডাক্তার আস্‌তে না'লে, এই ছোটখাটো একজন পাঠালেক। মুইতো আন্‌বো নি তা তিনি খুব ব্যস্ত কে না কি মরতেছে। তা বাপু এই ডাক্তারটি মন্দ নয়, দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ, মুখে রা-টি নেই—তবে জানে কি রকম তাই—"

হঠাৎ তাকে থাম্‌তে হ'ল, কারণ তার বৌমা অর্থাৎ রতনবাবুর স্ত্রী অমলা বল্‌ল—"থাম বাপু, তুই ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ওপরে আয়।"

দোতলায় একটি ঘরে ঢুকে দেখে একটা ছোট পালঙ্কে একটি শিশু এবং তার পাশে একটা চেয়ারে বসে ওদেশের সারদাদিদি একাধারে ডাক্তার ধাত্রী যা' কিছু সব। একে দেখে বটু ডাক্তারের যুগপৎ রাগ ও ভয় হ'ল। এই-ই প্রথম বটুর ডিস্‌পেন্‌সারীর বাইরে স্বাধীনভাবে রোগী দেখা। পাশে ডাক্তার দাশও নেই। শেষে কি বলতে কি বল্‌বে, কি করতে কি করে বস্‌বে—এবং ওই মিস্ সারদা মাইতির সাম্‌নে। তা' হ'লে গাঁময় তৎক্ষণাৎ সেকথা রাষ্ট্র হয়ে যাবে। এই সব ভাব্‌তে ভাবতে সে বস্‌তেও ভুলে গেল। তারপর অমলার উপদেশানুযায়ী মোক্ষদার কথায় তার হুঁস হ'ল—সে হঠাৎ 'ধপ্' করে চেয়ারে বসে পড়ল।

অমলা মোক্ষদাকে দিয়ে বলাল "খোকার অসুখ কেমন কেমন—সারদাদিদিও বুঝ্‌তে পারছে না, তা' হ'লে কি হবে ডাক্তারবাবু—"

শেষের কথাগুলি আর মোক্ষদাকে বল্‌তে হ'ল না, অমলা জোরে উচ্চারণ করেই চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

অভিজ্ঞ ডাক্তার হ'লে এসময় সত্যামিথ্যা নানারকম বোঝাতেন—কিন্তু আমাদের বটু ডাক্তার নতুন—সে নিজেই ঘামতে লাগল এবং গলার মধ্যে হাত দিয়ে কলার ঠিক করতে লাগ্‌লো।

রোগী দেখ্‌তে গিয়ে ডাক্তার হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে এ কার সহ্য হয়! মিস্ সারদা বল্লে—"আপনিই বুঝি ডাক্তার দাশের নতুন এ্যাসিষ্টান্ট। তা রোগী দেখুন—চুপ করে বরের মতন বসে রইলেন কেন? ওই শুনুন, খোকার মধ্যে থেকে বাঁশীর আওয়াজ বেরুচ্ছে।"

তাইতো! আর আওয়াজটা একটু জোরও বটে। বটু আরও ঘাম্‌তে লাগ্‌ল। সে মোক্ষদাকে বলল "দেখ ঝি, জানলার পরদাগুলো সরিয়ে দাও, আমি আলোতে দেখ্‌ব।"

সারদা তার বিরাট দেহ একটু নেড়ে চেড়ে বল্‌ল "কেন আলোতো বেশ আছে, দরকার হয় আর একটা লণ্ঠন নিয়ে এসো। পর্দ্দা সরানো হবে না। শীতের সন্ধ্যে, ঠাণ্ডা লেগে আবার বিপরীত হোক্। একেই তো ছেলের অসুখ।"

বটু চটে গেল, সে বল্‌ল "তা' আমি কি বেড়াল যে, অন্ধকারেও দেখ্‌তে পাব।"

মিস্ সারদা আর কিছু বল্‌ল না, কেবল তাচ্ছিল্যভরে নাক দিয়ে 'ফোঁৎ' করে একটা নিশ্বাস ফেল্‌ল। এখানে বলে রাখি, মিস্ সারদাও বটুর মতন। নিজের তো অল্প বিদ্যা—তবে চাল দেখায় খুব। এজন্য তাকেও কেউই পছন্দ করে না।

যা হোক্, অমলা দুই ডাক্তারের মতের মধ্যে পড়ে দুটোর মাঝামাঝি কাজ করল; অর্থাৎ, মোক্ষদাকে দিয়ে একটা জানালার পর্দ্দা অর্দ্ধেকটা খুলে দিল।

এইবার বটু মনে সাহস ও ভরসা সঞ্চার করে উঠে শিশুর খাটের পাশে গেল। সুন্দর ফুটফুটে একরত্তি

ছেলেটি। ভীষণ ঘামছে, মুখ ও সর্ব্বাঙ্গ লাল হয়ে উঠেছে। সে অনবরত খাটের এপাশ ওপাশ করছে এবং বিছানার চাদর, বালিশ প্রভৃতি নিজের ছোট মুঠোয় ধরছে—কখনও কখনও নিজের মুখও ধরছে—আর সব সময়েই তার নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বেশ সরু তীব্র গোছের একটা বাঁশীর আওয়াজ হচ্ছে।

বটু 'থার্মোমিটার' বার করে অনেক কষ্টে 'টেম্পারেচার' নিল একশত এক ডিগ্রি। 'ষ্টেথস্কোপ' দিয়ে অনেক চেষ্টার পর দু'-তিনবার বুক পরীক্ষা করতে পারল—শিশু একসেকেণ্ডও যেন স্থির থাকছে না। যা হোক্, নিশ্বাসের সঙ্গে ওই আওয়াজ—তা'তে সন্দেহ নেই—ঠিক 'নিউমোনিয়া' নয়—'প্লুরিটিক'ও নয়—তবে কি, বটুর জ্ঞানের বাইরে! – বটু জানে না!

বটুর মাথা খারাপ হবার জোগাড়। নিজের অজ্ঞানতার জন্য নিজের ওপর তার ভয়ানক রাগ হ'ল। সে রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠ্ল। কী অবস্থা—তবে কি 'নিউমোথোরাক্স।' সে রোগতো কখনও সে দেখে নি। আর তা' কদাচিৎ হয়—বইতে তা' পড়েছিল এবং কখনও পড়েছিল কি না তা' তার মনে হচ্ছে না—তা' হ'লে নিউমোথোরাক্সই, কিন্তু—আর যদি তা' না হয়, তা' হ'লে 'ওড়িমা অফ্ দি লাঙ্গস্' নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই?—কিন্তু আওয়াজটা যেন শুক্‌নো, একটু বেশী তীব্র।

কি বিপদেই পড়েছে বটু। প্রথম স্বাধীনভাবে রোগী দেখবে—রোগী হয় বুড়ো হ', না হয় জোয়ান হ', তা না একটা ছোট পুঁচ্‌কে অবোলা ছেলে—শয়তান, এটা পুঁচ্‌কে শয়তান। উকীলের কথা মনে পড়ল, ছোট ছেলেকে না দেখতে পারলে বৃথাই ডাক্তারী পাশ করা। তারা কি বুঝবে—তারা ছাই জানে -ডাক্তারীর তারা কচু বোঝে।

সে বারকতক পায়চালি করে আবার খাটের পাশে এসে শিশুটির বুকের ওপর নিজের একহাত রেখে অন্য হাতের আঙুল দিয়ে দেখবার মতলব করছে, মিস্ সারদা উঠ্‌ল—"ও চৌকা ফোকা মেরে কি হবে। খোকার 'কন্‌জেস্‌চন্ অফ লাঙ্গস' হয়েছে। এতো সাদা চোখেই বোঝা যায়।"

বটু হাত সরিয়ে নিয়ে কটমট করে তার দিকে চেয়ে বল্‌ল "না, কন্‌জেস্‌চন্ কিছুতেই নয়।" যদিও একথা সে না ভেবেই বলে ফেল্‌ল।

সারদা প্রশ্ন করল "তবে কি আপনি বলতে চান, তার চেয়েও খারাপ কিছু।"

তার কথা শুনে অমলা পুনরায় কান্না আরম্ভ করল। বটু ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণ মাথা চুল্‌কে হঠাৎ বলে ফেল্‌ল "হ্যাঁ, এই লাঙ্গসেই কিছু হয়েছে।"

মিস্ সারদা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বল্‌ল লাঙ্গস্! এতক্ষণে উনি বল্লেন। ওকথা আমি ঘরে ঢুকেই বলেছি—নারে মোক্ষদা? তা কি করতে হবে বলুন। ভগবান না করুন, আমি কি শেষ পর্য্যন্ত বসে বসে ওই বাঁশীর আওয়াজ শুন্‌ব। না, কি বলেন, 'লিনসিড' দিয়ে ওর বুক পিঠ মালিশ করব?

বটু আরও চটে গেছে। সে বল্‌ল "না, যতক্ষণ আমি না বলছি, ততক্ষণ কিছুই করতে হবে না।"

ওদিকে অমলা রীতিমত কাঁদছে। মোক্ষদাও বিচলিত হয়েছে, যদিও সে ভালমন্দ অনেক সয়েছে। বটু ওদের দিকে চেয়ে কি করবে ঠিক করতে না পেরে হঠাৎ বল্‌ল "দেখ ঝি, ওঁকে কাঁদতে বারণ কর। এমন কিছুই হয় নি খোকার, তবে আমি—হ্যাঁ, আমি বড় ডাক্তারবাবুকে এখনই আধঘণ্টার মধ্যে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌ছি। ওঁকে ভাবতে বারণ কর।"

যেন কড়িকাঠকে সম্বোধন করে মিস্ সারদা বল্‌ল "শুনছ, এই আধঘণ্টার মধ্যে এই একটা বিজ্ঞের মতন কথা শুনছি।"

একথা সম্পূর্ণ শোনা বা তার জবাব দেবার প্রবৃত্তি বা স্পৃহা বটুর ছিল না। সে তখন তার এই ব্যর্থতার নিদর্শনভূমি, এই অপ্রীতিকর বাড়ী যত শীঘ্র পারে ছাড়তে পারলেই বাঁচে। সে তরতর করে সিঁড়ি বয়ে চলে গেল।

এ বাড়ীতে আস্‌তে যত সময় লেগেছিল, তার

অর্দ্ধেকেরও কম সময়ে সে ডাক্তার দাশের বাড়ী পৌছল। ডাক্তার দাশ তখন রোগী দেখা শেষ করে সান্ধ্য-চা খাচ্ছেন। বটুকে দেখে 'টি পট', 'কেক্' প্রভৃতি এগিয়ে দিলেন।

বটু শুক্‌নো হাসি হেসে বল্‌ল "ধন্যবাদ, আমি এখন চা খাব না। বোস-বাড়ীর 'কেস'টা খারাপ।"

"কেন হে, কি হয়েছে? ওই খোকার 'ডেলিভারী'র সময় আমি ছিলাম। সেতো মোটে চোদ্দ-পনের মাস হবে। আহা, কি সুন্দর খোকা হয়েছে! তা নাও, 'কেক', 'টোষ্ট' না খাও, ডিম চা খাও। শীতের দিনে একটু গরম হয়ে নাও, একটু জিরোও। রীতিমত হাঁফাচ্ছ যে।"

"না, আমি 'কেসটা'র সম্বন্ধে ভাবছি।"

"আরে ধ্যেৎ! ডাক্তারের একটা কেসের পেছনে অত ভাব্‌তে গেলে চলে না। কেস এ্যাটেণ্ড করলুম, ফি পকেটস্থ হ'ল, ব্যাস্, ফুরিয়ে গেল, অন্য কেসে চল। রোগী মারা গেল—কী করব। খাব না দাব না? সে কি! অন্য রোগীরা 'সফার' করবে যে। আর অত 'নার্ভাস' হ'লে কি হয়। সে হ'ত কলেজে প্রথম মড়া ঘাঁটবার সময়—অপারেশন করবার সময়। খেতে পারি নি, বমি হ'ত, রাতে ভয় করত। তা' বলে এখনও কি তাই হবে। নাও, বোসো, খাও।"

"না, আচ্ছা, খাব অখন। তবে ও কেসটা আগে দেখে। আপনাকে নিয়ে ওখানে যাব তাদের কথা দিয়ে এসেছি। আমি—আমি কিছুই করতে পারি নি।"

ডাক্তার দাশের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে গেল। তিনি ছুরি দিয়ে অর্দ্ধেকটা ডিম কেটে মুখে পূরে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চিবিয়ে বল্লেন—"তা, খোকার কি হয়েছে?"

"লাঙ্গস্ থেকে বাঁশীর মত আওয়াজ হচ্ছে।"

অবাক্ হয়ে ডাক্তার দাশ তাঁর দিকে চাইলেন, "তাই না কি। এতো নতুন রোগ শুনছি!"

"শুন্‌লেন তো, এবার স্বচক্ষে দেখ্‌বেন চলুন। আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তবে বোধ হয়, নিউমোথোরাক্স হয়েছে—বাতাস যেন 'প্লুর‍্যাল ক্যাভিটি'তে গিয়ে আওয়াজ হচ্ছে।"

ডাক্তার দাশের খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি বল্লেন "আচ্ছা চল, যাওয়া যাক্। তবে ফিরে এসে এখানে চা এবং রাত্রের খাবার খেয়ে যেও। চল, দেখি তোমার নিউমোথোরাক্স।"

বোস-বাড়ীতে পৌছে বটু ডাক্তার এক এক লাফে দুটো তিনটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠতে লাগ্‌ল। ডাক্তার দাশ বৃদ্ধ এবং স্থূল কলেবর। তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠলেন। উপরে উঠে তিনি সাড়া দিলেন "কই, আমার অমলা মা কোথায় গেল।"

অমলা এসে প্রণাম করে ছলছল চোখে চেয়ে রইল। ডাক্তার তাকে অভয় দিলেন। তারপর বল্লেন "চল মা, বাচ্ছাকে দেখি।"

ডাক্তার দাশের উপস্থিতি যেন বাড়ীতে শান্তি ও ভরসা আন্‌ল। ঘরে ঢুকেই ডাক্তার দাশ জানালা খুলে দিতে বল্‌লেন। এই সময় মিস্ সারদা মাইতি এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল। ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। সারদা বল্‌ল "আমিই বলেছিলাম বন্ধ করতে, আর আমি খোকার বুকে পিঠে পুলটিশ দিয়েছি।"

ডাক্তার দাশ তার কথায় কর্ণপাত করলেন না, উপরন্তু মনে হ'ল তার উপস্থিতিই তিনি যেন গ্রাহ্য করলেন না। তিনি খানিকক্ষণ একদৃষ্টে শিশুকে দেখলেন, তারপর কোথায় বা থার্ম্মোমিটার, আর কোথায় বা ষ্টেথস্‌কোপ! তিনি দু' হাতে শিশুকে তুলে ধরলেন এবং তার বুকে নিজের কাণ রাখলেন, বারকতক নিজের মাথাটা দোলালেন এবং মনে হ'ল যেন তাঁর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি দেখা দিল। অবশ্য তা নাও হতে পারে, হয়ত ঘরের আলো-আঁধারিভাবেই তা মনে হয়েছিল। তিনি শিশুকে আবার শুইয়ে দিলেন এবং এবার শিশুর মুখটা আলোর দিকে তুলে ধরলেন এবং বেশ ভাল করে কি যেন লক্ষ্য করলেন। এবারে তাঁর মুখের হাসি বেশ স্পষ্টই দেখা গেল।

তারপর একবার বটু ডাক্তারের দিকে চেয়ে তিনি,

অমলাকে বল্‌লেন "মা, তোমার মাথার কাঁটা একটা দাও তো।"

সকলে অবাক্! অমলা তো চেঁচিয়েই বলে উঠল "কাঁটা ?"

জোরের সঙ্গে ডাক্তার দাশ বল্‌লেন "হ্যাঁ, মাথার কাঁটা, যা তোমরা চুল বেঁধে পর। দাও—হ্যাঁ, এবার তোমরা সবাই ঘর থেকে চলে যাও। আমরা দু'জনে নিরিবিলি পরামর্শ করব।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমলাকে চলে যেতে হ'ল। মোক্ষদাও গেল। কিন্তু সারদা ধাত্রী নড়ে না। ডাক্তার দাশ তার দিকে চাইতে, সে বল্‌ল "আমি থাকি। আপনাদের অনেক সাহায্য করতে পারব। আমিও তো ডাক্তার।"

ডাক্তার হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন "কথা শোন! এই দণ্ডেই যদি না ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, ভবিষ্যতে আমার কাছে কোন সাহায্য পাবে না। বেরিয়ে যাও বল্‌ছি।"

অগত্যা উপায় নেই দেখে সারদা চলে গেল এবং যাবার সময় বটুর উপর তীব্র কটাক্ষ করে গেল। ডাক্তার দাশ বটুর দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে দরজা বন্ধ করলেন এবং বল্‌লেন "ডাক্তারী করতে হ'লে শক্তও হতে হয়, বুঝলে। আচ্ছা—তারপর, তুমি বাঁশী দেখেছ? ওই যে ছোট ছেলেদের ইঁদুর বাঁশী, পায়রা বাঁশী সব।"

বটু হতবাক্।

"আরে সেই বাঁশীর মধ্যে ছোট বোতামের মত কল, যার মধ্যে একটা ফুটো আছে,যাতে বাতাস গিয়ে আওয়াজ হয়, সেই কলটা—দেখেছো তো?"

ভাল করে কিছু না বুঝ্‌তে পেরে বটু বল্‌ল "হ্যাঁ, তাতো দেখেছি। তাতে কি?"

"আরে তাতেই তো সব। বিয়ে তো কর নি, কিন্তু ছোট ছোট ছেলেরা কি রকম দুষ্টু হয় তাতো জানো—বিশেষতঃ, এর মতন বয়সের খোকারা। যা পায়, তা নাকে, কাণে, মুখে গোঁজে—কেমন?

ডাক্তার দাশ আর কিছু না বলে কাঁটা হাতে উঠে খোকার কাছে গেলেন এবং তার বাঁ নাকের মধ্যে কাঁটাটা ঢুকিয়ে একটু চেষ্টা করতেই বাঁশীর বোতামের মত কলটা বেরিয়ে এল এবং খোকাও বাঁশী বাজানো থামালো। ডাক্তার দাশ বল্লেন "এই হচ্ছে তোমার নিউমোথোরাক্স—মস্ত বড় অসুখ।"

খোকা যেন বটুকে আরও অপ্রস্তুত করবার জন্য ডান হাতে নাক চুলকাতে চুলকাতে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল মুখে দিয়ে নিঃশব্দে হাস্‌তে লাগল। বটু লজ্জায় লাল। বিড়বিড় করে বোধ হয় নিজের বোকামীর স্বপক্ষে কিছু বল্‌তে চাইল, কিন্তু কথা জড়িয়ে যাওয়াতে কিছুই বোঝা গেল না। সে হাত বাড়িয়ে বাঁশীর কলটা নিতে গেল। ডাক্তার দাশ তাকে বাধা দিয়ে সেটা নিজের পকেটে পুরতে পুরতে বল্‌লেন "না, তা হবে না। এটা আমার কাছেই থাক্‌বে। আর ভবিষ্যতে যদি তুমি কখনও কোন বেয়াদপী কাজ কর, তা' হ'লে আমার পকেট থেকে বেরোবে এই কল, আর মুখ থেকে বেরোবে তোমার নিউমোথোরাক্সের ইতিহাস।"

রতন বোসের ছেলের অসুখ আরামের কথা দেশময় ছড়িয়ে গেল। আসল কথা ওই ডাক্তার দু'জন ছাড়া কেউ জান্‌ল না। সকলে ডাক্তার দাশের প্রশংসা করল। কেবল মিস্ সারদা মাইতি বলে বেড়াতে লাগল, তার সময়মত পুলটিশ করাতেই খোকা ভাল হ'ল। আর অমলার মনে হ'ত—যদিও সে ডাক্তার দাশকে বিশ্বাস ও খাতির করত—বোধ হয় তার মাথার কাঁটার দৈব-গুণেই খোকা সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছে।

অসিতকুমার সেন

পুনর্মূষিক ভব

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিকে লইয়া আলোচনা করে না এমন লোক এ শহরে খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইবে। আলোচনা করিবেই বা না কেন? শান্তি কলেজে পড়ে, শান্তি আধুনিক ভঙ্গীতে হাঁটে, শান্তি যেখানে সেখানে একা যাইতে পারে, শান্তি অনেকরকমভাবে ছেলেদের দিকে তাকাইতে পারে, কবিতা লিখিতে পারে, হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে কাহারও কাহারও উপরে লুটাইয়া পড়িতে পারে, খোলা ছাদের উপর 'স্কিপ্' করিয়া শরীর চর্চ্চা করিতে তাহার একটুও বাধে না, পুরুষ ভর্ত্তি ট্রেণের কামরায় একা উঠিয়া 'মিস্ জেনা স্মিথ্' বা 'মিস্ ল্যলা'র মত সোজা হইয়া বসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কাগজ পড়িতে দ্বিধাবোধ করিবার কোন কারণ সে খুঁজিয়া পায় না। তাহার চেহারা তেমন সুন্দর নয় বটে, কিন্তু বেশভূষার ধরণধারণ বিংশ শতাব্দীর যে কোন সভ্য তরুণকে মুগ্ধ করিতে পারে। কিন্তু এসব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও সে তেমন নাম করিতে পারিত না, যদি না তাহার নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শিতা থাকিত। তাহার নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না যে ব্যক্তি, তাহাকে (আধুনিক তরুণদের মতে) সভ্যসমাজ হইতে বহিস্কার করিয়া দেওয়াই বিধেয়। তাসের আড্ডায়, কলেজের 'কমন রুমে' 'রেষ্টুরেণ্টে', 'পার্কে', ফৌজদারী কাচারীতে, ম্যাজিষ্ট্রেট্, জজ্ ও পুলিশ-সাহেবের খান্সামা সম্মেলনে, গাড়োয়ানদের আস্তাবলে, ডাল্পুরীওয়ালার দোকানে—সর্ব্বত্রই যে 'শান্তি' নাম্টি সুপরিচিত, সেই নামের মর্য্যাদা যাহারা করিতে জানে না, তাহারা ত বাস্তবিক সমাজে বাস করিবার উপযুক্ত নয়! নৃত্য করিলেই যদি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে উর্ব্বশী নৃত্য করিত কেন, 'ইসাডোরা ডান্কানে'র নামে লোক মুগ্ধ হইত কেন, সর্ব্বদেশ ও সবশ্রেণী লোকের প্রেমিকা 'আনা পাব লোভা'কে দেখিয়া সকলে তাহার 'প্রাইভেট্ চেম্বারে' প্রবেশ করিতে চাহিত কেন? অনেক লোকের ভালবাসা পাওয়া এবং তাহার প্রতিদান দেওয়া কি নারীর পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা? সে এক যুগ ছিল, যখন ঘোম্টাটি আধহাতের জায়গায় সওয়া হাত হইলে চারদিকে হৈচৈ পড়িয়া যাইত। সে অসভ্য যুগে একটি সুন্দরী নারী স্বামীনামধারী একটি জীবকে লইয়াই সারাজীবন সুখে কাটাইয়া দিতে পারিত—একবার ভাবিয়া দেখুন, তখনকার দিনে লোকের কি রক্ষণশীল মনই না ছিল। বর্ত্তমান সভ্যযুগে ওরকম ক্ষুদ্র আদর্শের স্থান একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে বসিয়াছে বলিয়াই ত লোকেরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করিতে পারে। বিংশ শতাব্দীর নারীর ভালবাসা উন্মুক্ত বায়ুর মত যেখানে সেখানে বিচরণ করিয়া থাকে—'পাব্লিক' বাগানের ঝোপ, বড় বড় অট্টালিকার ছাদে, 'হোষ্টেলে'র অন্ধকারময় গৃহসমূহে তাহার অবাধ গতি। শান্তি বিংশ শতাব্দীর নারী। তাহার প্রধান কর্ত্তব্য যুগধর্ম্ম পালন করিয়া চলা—তাই সে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নৃত্যের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে তাহার ঘুমন্ত দেহমন নাড়াচাড়া দিয়া উঠিয়াছে, কোন অজানা অদৃশ্য অতিথি যেন তাহাকে দোলায় তুলিয়া দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

শান্তির জনক জননীও অনেকটা আধুনিক। জনক শহরের একজন বিশিষ্ট উকীল, জননী 'নিকেতনের আই-এ পাশ করা নারী। নির্ম্মলবাবু ও বাসনা গুপ্ত (এখন যাঁহারা জনক জননী) একসঙ্গে পড়িতেন। প্রথমে তাঁহারা একজন অপরকে চিনিতেন না, কিন্তু একই কলেজের একই ক্লাসে কিছুদিন অনবরত দেখা হইবার পর তাহাদের উভয়েরই মন ভাল লাগিল না। অবশেষে মনকে সুস্থির করিবার জন্য তাঁহারা এক

দাড়িওয়ালা গুরুর নিকটে গেলেন। বহুবৃদ্ধ ও বহুদর্শী গুরু তাঁহাদের শান্তি দিতে সমর্থ হইলেন, তিনি নির্ম্মলবাবু ও বাসনা গুপ্তাকে হাতে হাতে মিলাইয়া দিয়া পরম ব্রহ্মের জয়গান গাহিলেন। ব্রহ্মের কৃপায় তাঁহাদের সুখের সংসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শান্তি তাঁহাদের তৃতীয় সন্তান। বাল্যকালেই শান্তির হাঁটা ও কথার ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া অনেকে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। সুযোগ্য পিতা নির্ম্মলবাবু, গান, নৃত্য ও লেখাপড়ার জন্য বিভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া 'মডার্ণ' পিতার একান্ত কর্ত্তব্য পালন করিতেছিলেন। নির্ম্মলবাবু 'বার্ণার্ড শ'র মত পছন্দ করেন, সেই জন্যই তিনি বালকবালিকাদিগকে উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ও হানিকর বলিয়া মনে করেন—তাঁহার শান্তিকেও তিনি কোন উপদেশ দেন নাই। অতএব শান্তি স্বীয় উপদেশ অনুসারে চলিতে একটুও বাধা পায় নাই।

শান্তির সঙ্গে অনেক যুবক দেখা করিতে আসে, কেহ তাহাকে কোন 'ফাংসন্ এ্যাটেণ্ড' করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে আসে, কেহ গান লিখিয়া লইতে আসে, কেহ অন্য কোন স্থানে বই পাওয়া অসম্ভব বলিয়া তাহার নিকট হইতে বই লইতে আসে। সময়ে অসময়ে যুবক যুবতীর আলাপে পিতামাতার আপত্তি নাই, বরং সম্মতিই আছে, কেন না, তাঁহারা নিজেরাও ঐরূপ করিয়াছেন। নির্ম্মলবাবুর পসার থাকিলেও সংসার খুব বড় ও 'এ্যারিষ্ট্রক্র্যাটিক্' বলিয়া সব সময় খরচে কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু তা বলিয়া শান্তির বিবাহের জন্য তিনি তেমন চিন্তা করেন না। হয় সুবোধ, নয় পরিমল, নয় ভবতোষ—এ তিনজনের একজনকে তিনি পাকড়াও করিবেনই। বলা বাহুল্য এ' তিনজনই বড়লোকের ছেলে এবং শান্তির সহিত তাহাদের সকলেরি পরিচয় আছে। মাঝে মাঝে তাহারা বাসায় আসিয়া দেখা করে। শান্তি যে যে ফাংসনে নৃত্য করিতে গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে এই তিনজনের দেখা পাইয়াছে। সুবোধ তাহাকে একগাদা বই উপহার দিয়াছে, পরিমল দিয়াছে একটা সোনার 'সেফ্‌টিপিন', ভবতোষ অবশেষে একটা 'পার্কার' কলম দিয়া মান রাখিয়াছে। নির্ম্মলবাবু 'শুভস্য শীঘ্রং' 'থিওরি'র পক্ষপাতী, কাজেই সুবোধকে লইয়া আলাপ করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন: দেখুন, শান্তির বিয়ের জন্যে আমি সম্প্রতি বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েচি। যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে বল্‌তে পারি, আপনাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েচে। আপনি অনুগ্রহ করে অভিভাবকের মতটা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।—এই একই কথা তিনি পরিমল ও ভবতোষকেও বলিলেন, অর্থাৎ, তিনি তিনজায়গায় 'টোপ্' ফেলিলেন, এখন যে কোন একটায় বাধিলেই হয়। তিনবন্ধু আহ্লাদে আটখানা হইয়া মনের কথা কেহ কাহাকেও বলিল না, সকলেই মেস্ ছাড়িয়া বাড়ী চলিল বিবাহের সম্মতি পাইবার জন্য। সুবোধ তাহার পিতাকে এত ভয় করিত যে, কথাটা সে নিজে বলিতে পারিল না, মা'কে দিয়া বলাইল। পুত্রের গুণকীর্ত্তি শুনিয়া তিনি এমন রাগিলেন যে, সুবোধকে শেষটায় পা ধরিয়া কাঁদিতে হইয়াছিল। পরিমলের পিতা ছিলেন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ জমিদার, সন্ধ্যা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তাঁহার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে গিয়া লাভ হইল এই যে, তিনি পরিমলের কলেজে পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন, গ্রামেরই একটা টোলে শাস্ত্র পড়িতে উপদেশ দিলেন। ভবতোষ পিতৃমাতৃহীন, তাহার মামা 'এষ্টেটের এক্‌সিকিউটর' এবং তিনিই অভিভাবক। তিনি আবার এমন লোক যে, প্রায়ই শহরে যাইয়া ভবতোষের চরিত্র ও পড়াশুনা সম্বন্ধে খোঁজখবর করিতেন। সেবার মেসে যাইয়া শান্তি-সম্পর্কিত ব্যাপারের কিছু কিছু তিনি শুনিয়া আসিয়াছিলেন। ভবতোষকে তখন কিছুই বলা হয় নাই, কিন্তু এবার বাড়ী আসিতেই তিনি এমন রাগারাগি সুরু করিলেন যে, ভবতোষের মনের কথা মনেই রহিয়া গেল।

মাসকয়েক চলিয়া গেল, অথচ তিনজনের একজনেরও দেখা নাই—নির্ম্মলবাবু একটু চিন্তায়ই পড়িলেন। আস্তে আস্তে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মেয়েকে নাচের আসরে পাঠান যত সহজ, কোন 'রেকগ্‌নাইস্‌ড্' শ্বশুরবাড়ীতে পাঠান তত সহজ নহে। এদিকে 'পাব্‌লিকে'র

মুখের উপর কোন ট্যাক্স নাই বলিয়া তাহারা শান্তি সম্বন্ধে এমন সব কথা বলে, যাহা পিতার পক্ষে শত 'মডার্ণ' হইলেও অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বিবাহের প্রতি এককালে তাঁহার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু এখন তিনি বন্ধনই মুক্তির সন্ধান আনিয়া দেয় বলিয়া মনে করেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, শান্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট স্থায়ী-ভাবে সমর্পণ করিবার জন্য ততই তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু লোক পাওয়াই মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইল। লোকগুলি এমন অদ্ভুত, শান্তির নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তাহার গান শুনিয়া তৃপ্ত হয়, তাহার সঙ্গ কামনা করে, কিন্তু বিবাহের কথা উঠিবামাত্র প্রায় সকলেই পিছনে সরিয়া পড়ে।

কোন এক শিক্ষালয়ের 'এ্যান্থয়েল গ্যাদারিঙ'এ পূর্ব্বের মত এবারও শান্তি নৃত্য করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইল। খোলা ময়দানের উপর ছোটখাটো একটি ষ্টেজ তৈরী করা হইয়াছিল। ষ্টেজের সম্পদের মধ্যে একখানি মখ-মলের 'স্ক্রীন্', কতগুলি 'পামে'র টব, তিনখানি সিন্ ও দু'খানি 'উইঙসে'র কথা উল্লেখযোগ্য। একটি নাটিকাও অভিনীত হইবার কথা ছিল। অভিনেত্রীদের মধ্যে সকলেই স্কুল কলেজে পড়া বালিকা, ষোড়শী বা তরুণী। শান্তির নৃত্যগীতদ্বারা মাঝে মাঝে আসর গরম করিবার ব্যবস্থা ছিল বলিয়া অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে বলিয়া সকলেই ধারণা করিয়াছিল। সমস্ত ময়দান লোকে লোকারণ্য। বিস্তৃত সামিয়ানার নীচে লোক বসিবার জন্য প্রথমে চেয়ার এবং পরে সারি সারি টুল্ সাজান ছিল। ছোট ছোট লাল নীল 'ডুমে'র বিজলীবাতি এদিকে ওদিকে সেদিকে তারার মত মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। ষ্টেজে যথেষ্ট আলো ছিল এবং রঙীন্ আলোর দ্বারা দৃশ্য বদলাইবার আয়োজন করা হইয়াছিল। সাজান 'অডিটরিয়ামে'র একপাশে বসিয়াছিলেন যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ আর একপাশে বসিয়াছিলেন যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা। দূর হইতে এ মনোরম দৃশ্য দেখিয়া স্বর্গের নন্দনকাননের শোভার কথা মনে হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

শান্তি সেদিন নৃত্য করিবার সময় লক্ষ্য করিল যে, এক ভদ্রলোক নির্লজ্জের মত একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে—একটি পলক পর্য্যন্ত পড়িতেছে না। ইহাতে সে এমন অস্বস্তি বোধ করিল যে, সেদিনকার নৃত্য তেমন হৃদয়গ্রাহী হইল না।

অভিনয় শেষ হইয়া যাইবার পর শিক্ষালয়ের সেক্রে-টারী আসিয়া শান্তিকে ধন্যবাদ দিবার ছলে, সেই ভদ্র-লোকটিকে দেখাইয়া বলিলেন, আমার ছেলে নৃপেন তোমার সাথে আলাপ করতে চাইছিল। ও এবার জার্ম্মেনী থেকে 'পি-এইচ-ডি' 'ডিগ্রী' নিয়ে এসেচে।

নৃপেনবাবুকে ছোট্ট একটি নমস্কার জানাইয়া শান্তি বলিল, আপনাকে ত আর দেখি নি। আপনি অল্পদিন বাদে দেশে এসেচেন বুঝি ?

নৃপেনবাবু আঙুল কচ্‌লাইয়া হাসি হাসি মুখে বলিলেন, হাঁ, মাত্র দু'মাস আগে বোম্বেতে 'ল্যাণ্ড' করেছিলাম। আপনার ডান্সিং কিন্তু আমার কাছে খুবই ভাল লেগেচে। আমি ওদেশের বড় বড় আর্টিষ্ট-দের ডান্সও দেখেচি, কিন্তু খুব 'ভাল্‌গার' বলে আমার কাছে ওসব নাচ তেমন ভাল লাগে নি। এমন সময় নির্ম্মলবাবু শান্তিকে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন। তিনি নৃপেনবাবুর পরিচয় পাওয়া মাত্র বলিয়া উঠিলেন, আপনি অনুগ্রহ করে কালই আমাদের বাসায় যাবেন। জার্ম্মেনীর খবরাখবর জানা যাবে। 'হিট্‌লার' সম্বন্ধে যে সব সমালোচনা বেরিয়েচে, সেগুলো সত্য কি না তা'ও জানা যাবে। আপনি যাবেন কিন্তু ?

নৃপেনবাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন, নিশ্চয় যাবো।

পরদিন সকালে চা-ভোজের আগেই নৃপেনবাবু শান্তিদের বাসায় হাজির। নির্ম্মলবাবু সসম্মানে তাঁহাকে একখানি 'কুশন' চেয়ারে বসাইয়া চা'র অর্ডার দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে চা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিও আসিয়া একখানি আসন দখল করিয়া বসিল। চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্পও চলিতে লাগিল।

নির্ম্মলবাবু বলিলেন, জার্ম্মেনীতে আজকাল হিট্‌লার বোধ হয় খুব কড়াকড়ি কর্চ্ছেন ?

নৃপেনবাবু একবার ভাল করিয়া শান্তির মুখের দিকে

তাকাইয়া চোখ ফিরাইয়া বলিলেন, তা' নইলে কি আর 'আইনষ্টাইনে'র মত লোককে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়? সমস্ত হিট্‌লারের দল সাত শ' বছর তপস্যা করে ও রকম একজন বৈজ্ঞানিককে নিজেদের দলে আনতে পারবে না।

—গো'টা দেশটাই কি হিটলারের পাগ্‌লামীতে মেতে উঠেচে না কি?

—তা' হবে কেন, অনেকেই এসব মতবাদের বিরুদ্ধে আছেন। কিন্তু যারা মেতে উঠ্‌চেন না, তাঁদের হয় 'ফোর্স' করে মাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে, নয়ত জেলে পাঠিয়ে পথ পরিষ্কার করা হচ্ছে।

—আর্থিক অবস্থা ত বোধ হয় আগের চাইতে কিছুটা ভাল হয়েচে? সেদিন কাগজে দেখ্‌ছিলাম আমেরিকাকে না কি কিছু টাকা দেবার ব্যবস্থা চল্‌চে।

—ওসব 'পলিটিক্যাল্' চালবাজি, জার্ম্মেনীকে অর্থের দিক দিয়ে খুব পোক্ত হ'তে ঢের সময় লাগবে। কাগজের মারফতে একটা জমকালো 'বাজেটে'র ফিরিস্তি দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাতে ভেতরের 'ডেষ্টিটিউসন্' একটুও কমে না।

নির্ম্মলবাবুর হঠাৎ কি একটা জরুরী কাজের কথা মনে হইল, ওঃ আমাকে ত এক্ষুনি একবার বাইরে যেতে হবে। আপনি যদি কিছু মনে না—

নৃপেনবাবু অমনি বলিয়া উঠিলেন, থাক্ থাক্, আমি আপনার ছেলের বয়সী, আমার কাছে অতটা বিনয়, দেখালে বড্ড অশোভন ঠেকে।

আচ্ছা, বেশ বেশ, তুমি তা' হ'লে শান্তির সাথে আলাপ কর, আমি একটু ঘুরে আস্‌চি। নির্ম্মলবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

শান্তি নিজের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিলেও একজন পি-এইচ-ডির সম্মুখে সে ধারণার পরিচয় দিতে পারিল না। খুব সহজ, অথচ দরদমাখান স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন কি করবেন?

কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা চাকরী পাওয়া গেচে। সাম্‌নের মাস থেকে ওখানে 'জয়েন' করব বলে ভেবেচি।

—আপনার সাথে মাত্র দু'দিনের পরিচয়, কিন্তু এখন থেকেই আপনাকে খুব আপনার লোক বলে মনে হয়। বিদেশী শিক্ষার গুণই এই যে, ওটা একটা 'কস্‌মোপলিটন' ভাব জাগিয়ে তোলে। আমরা তেমন লেখাপড়া শিখি নি বলেই বোধ হয় সকলকে আপনার করে নিতে পারি না।

—না না, শিক্ষার কথা এখানে আস্‌তে পারে না। সত্য বলতে কি, আপনাকে দেখা অবধি বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমার ধারণা বদ্‌লে গিয়েচে। আমি এখন বুঝ্‌তে পারচি, বাংলা আর এখন সেই গোড়া পণ্ডিত-মশায়ের আমলের বাংলা নেই। বাংলার মেয়েরা এখন এম-এ পাশ করে। বাঙালী ছেলেরা এখন প্রকাশ্যে মুর্গী খেতে শিখেচে। বিয়ে সম্বন্ধে কোন 'রিজিড্' প্রথা 'ফলো' করচে না, শুধু তাই নয়, বাংলার মেয়েরা আজ নাচ্‌তে জানে। ভদ্রঘরের মেয়েরা নাচের আর্ট সম্বন্ধে সচেতন হয়েচে—এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? একবার ভেবে দেখুন দেখি, ওসব দেশে যখন এ সব খবর যাবে, তখন কি আর তারা মুহূর্ত্তের জন্যও ভাব্‌তে পারবে যে, ভারতবাসী এখনও 'ব্যাক্‌ওয়ার্ড'? তবে এই 'প্রগ্রেসে'র একটু অসুবিধা এই যে, এটা 'মরালিটি'কে একটু 'এ্যাফেক্ট' করে।

—মরালিটির কথা বাদ দিন, এই মরালিটি-চর্চ্চা করেই ত আজ আমরা এত নীচে এসে পড়েচি, পশ্চিমের দিকে একবার চাইলে, লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। ওদের দেশের মেয়েরা 'ইংলিশ চ্যানেল' সাঁত্‌রে পার হয়। অ্যাট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ো জাহাজ চালায়, আর আমরা বারহাত কাপড় আর আধ হাত ঘোম্‌টার ঐশ্বর্য্য নিয়েই সারাজীবনটা কাটিয়ে দিই। আমাদের দেশের লোকের কি প্রাণ আছে, তারা কি আর্ট 'এ্যাপ্রিসিয়েট্' করতে জানে? শান্তি আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এমন সময়ই নির্ম্মলবাবু আসিয়া পড়ায়, আলোচনা ওখানেই স্থগিত রহিল।

নৃপেনবাবু বলিলেন, উনি ত বেশ লেখাপড়া শিখচেন, ওঁর 'মাইণ্ড'ও বেশ 'কাল্‌চারড্'। বাস্তবিক নির্ম্মলবাবু, একরকম একটি মেয়ে শুধু আপনারই নয়, বাংলাদেশেরও গৌরব।

নির্ম্মলবাবু কহিলেন, সে যাক্, তোমার কিন্তু আজ এখানে নিমন্ত্রণ—

—নিমন্ত্রণ ত রক্ষাই করলাম।

চা খেয়ে এবার শান্তি জবাব দিল, চা খাওয়াটাকে যে আমাদের দেশে নিমন্ত্রণ বলে না, বিদেশে থাক্‌তে থাক্‌তে সে কথা ভুলে গিয়েচেন বুঝি।

—না না, ভুলি নি, তবে কি দরকার আবার আর একটা ভিন্ন ঝঞ্ঝাটের?

নির্ম্মলবাবু কহিলেন, ছি ছি, কি বল্‌চ তুমি নৃপেন, তোমাকে নিয়ে আবার ঝঞ্ঝাট? আজ সকালেই তোমার সঙ্গে এমন সম্পর্ক হয়ে গেল যে, ঝঞ্ঝাট দূরের কথা, এর পরে তোমাকে সর্ব্বদা না পেলে আমাদের সব উৎসব মাটি হয়ে যাবে।

নৃপেন, শান্তির সঙ্গে ক্রমাগত পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত বাংলাদেশী 'কোর্টশিপ' চলিবার পর নির্ম্মলবাবু বিবাহের দিনস্থির করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। নৃপেনের আসা-যাওয়ার যতটা গরজ দেখা যায়, বিবাহের দিকে ততটা গরজ না দেখা যাওয়ায়, শেষে বিহঙ্গ খাঁচা ছাড়া হইয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি আগামী যে কোন তারিখে শুভকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ওদিকে নৃপেনবাবু সারা শহরে শান্তির ভাবী স্বামী বলিয়া পরিচিত হইলেও মনে মনে কেমন যেন একটা ভাব পোষণ করিতেছিলেন। বাপ মা'র অমতে অবশ্য তাঁহার কিছু আসে যায় না, প্রথম প্রথম দুই-চারিদিন রাগ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা পুত্রকে আর ছাড়িতে পারিবেন না—তারপর বর্ত্তমান বাংলার পিতার পক্ষে একজন পি-এইচ-ডি পুত্রের বিরুদ্ধাচরণ করা একেবারে অসম্ভব বলিয়াও মনে হয়, কিন্তু শান্তির ওড়নার পোষাক, ষ্টেজের ভঙ্গী, চোখের ভাষা যে তাঁহার 'মডার্ণাইজড্' মনেও আঘাত দিতেছিল, তাহার কি করা যায়? 'ট্র্যাডিসন্' তাঁহার না থাকিতে পারে, গোঁড়ামীর কথা শুনিলে তিনি হয়ত হাসিয়া উঠিতে পারেন, মুর্গী না খাওয়ার কথা হয়ত তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না, কিন্তু কলসী কাঁখে ব্রীড়াবনতা বধূর কথা যে তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না—তাঁহার বিদেশের শিক্ষা, কাল্‌চার, অভিজ্ঞতা তাঁহাকে শাসাইতেছে, তবুও তাঁহার মন মানিতেছে না। এখন এ' পথ ছাড়িয়া অন্যপথে যাওয়াও মুস্কিল, লোকেই বা বলিবে কি? আর শান্তির কাছেই বা কি কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইতে পারে। নাঃ, শান্তিকে তাঁহার মতের বিরুদ্ধে হইলেও বিবাহ করিতেই হইবে। তিনি জার্ম্মেনী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনি একজন 'কাল্‌চারড্ জেণ্টল্‌ম্যান', তিনি ব্রহ্মের সত্তায় বিশ্বাস করেন—অতএব নাচগান জানা, কলেজেপড়া নারী ছাড়া অন্য কোন নারীর কথা চিন্তা করাই তাঁহার পক্ষে মহাপাপ।

কাজেই কোন এক শুভ সন্ধ্যায় পরমপিতা ব্রহ্মের অনুগ্রহে নৃপেনবাবু ও শান্তি গুপ্তার শুভ সঙ্গলাভ অনুমোদিত হইল।

শান্তি গুপ্তা মিসেস্ নৃপেন সেন হইবার পর নির্ম্মলবাবুর বাড়ী ছাড়িয়া এক নূতন ভাড়াটে বাড়ীতে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। নৃপেনবাবু 'লোকাল্' কলেজের সামান্য একটা লেক্‌চারের চাকুরীতে বহাল হইয়া মনে মনে সুখী হইতে বাধ্য হইতেছেন ; কেন না, শান্তির এ শহর ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইবার মত নাই। শান্তি বড় বড় লোকের বাড়ী বেড়ানর অভ্যাস অনেকটা কমাইলেও বাদ্ দিতে পারে নাই, ভদ্রতার খাতিরে অথবা নামের মোহে তাহাকে ক্ষেত্রবিশেষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই হয়। বিদেশ-ভুলিয়া-যাওয়া নৃপেনবাবু দাঁত মুখ খিচাইয়া উর্দ্ধদিকে চক্ষু রাখিয়া এ' সব ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু মাঝে মাঝে কি ভাবিয়া যেন হাত পা গুটাইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ থামিয়া যান।

একদিন সকালবেলা 'ড্রইং রুমে' বসিয়া নৃপেনবাবু কি যেন একখানা বই পড়িতেছিলেন, এমন সময় মাটি পর্য্যন্ত কোঁচা ঝুলান, লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী গায়, 'ওয়ান ফিফ্‌থ্' ইঞ্চি পুরু চশ্‌মা চোখে, বাবরিওয়ালা এক সতের কি আঠার বৎসরের হ্যাংলা যুবক 'ডান্তে'র প্রকাণ্ড 'ভলিউম্'-খানি টেবিলের উপর সশব্দে রাখিয়া বলিয়া উঠিল, 'গুড্ মর্ণিং স্যার্।'

নৃপেনবাবু চমকিত হইয়া অল্প কিছুক্ষণ যুবকটির দিকে

তাকাইয়া রহিলেন, বুঝিলেন বাংলা দেশ এদিক্ দিয়াও অনেক অগ্রসর হইয়াছে। তিনি ত জার্ম্মেনী যাইবার পূর্ব্বে এতটা 'এ্যারিষ্ট্রক্যাট্' হইতে পারেন নাই; কহিলেন, 'মর্ণিং, বসুন, আপনার কি দরকার বলুন।

—এখানে মিসেস্ সেন থাকেন না? তাঁকে যদি একটু ডেকে পাঠিয়ে দেন, বড্ড জরুরী কাজ।

আধুনিক নৃপেনবাবু দেখিলেন, ভবিষ্যৎ বাঙলা কথা-বার্ত্তার দিক্ দিয়াও তাহার চাইতে অনেক 'ফরওয়ার্ড।' বলিলেন, তিনি উপরে আছেন, ডেকে পাঠাচ্ছি। কেন, তাঁকে দিয়ে কি দরকার?

—আপনি কি এ বাড়ীর...?

—তিনি আমার স্ত্রী।

—অঃ, তাই, বেশ ভালই হ'ল, আপনিও যাবেন কিন্তু। আমরা একটা 'ভ্যারাইটি পারফরম্যান্স' করব, তাতে উনি যদি 'পিকক্ ড্যান্সিং'টা করতে পারেন, তা' হ'লে বেশ হয়। আপনি অবশ্য যাবেন কিন্তু 'স্যার' দেখতে।

নৃপেনবাবু কি করিবেন ও বলিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই যদি দুই যুগ আগে ঘটিত, তাহা হইলে না হয় 'ষ্টিক্' বা 'কেনে'র ব্যবহার করা চলিত, কিন্তু কালচারড্ বাঙালীর পক্ষে এখন ওইরকম কিছুর কল্পনাও অসম্ভব। অনেক কষ্টে মনের ভাব দমন করিয়া কহিলেন, তোমাদের ফাংসনে যে মিসেস্ সেন যেয়ে নাচবেন, সে কথা কি করে জানলে? কোন ফাংসনে কারু স্ত্রীকে নাচিয়েছ আজ পর্য্যন্ত?

—আপনি চটে গিয়ে 'আপনি' থেকে একদম্ 'তুমি'তে নেমে আসলেন দেখ্‌চি—যাক্, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। ভদ্রলোকের স্ত্রী কোন ফাংসনে নেচেছেন কি না তাই জিজ্ঞেস্ করছিলেন ত? অনেকে নেচেছেন, মিসেস্ মানসী দত্ত, মিসেস্ উৎপলা চক্রবর্ত্তী, মিসেস্ কে, ডি ঘোষ—

—থাক্ থাক্, আর নাম বলতে হবে না; তুমি কদ্দুর অবধি পড়াশুনো করেছ?

যুবকটি পকেট হইতে একটি 'সিগ্রেট' বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'এক্সকিউজ্ মি স্যর', আমি বড্ড সিগ্রেটখোর। হ্যাঁ, পড়াশুনো সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, স্কুল কলেজে আমি কোনদিন পড়িও নি, পড়বও না। বাড়ীতে বসে 'সেক্সপীয়র', 'ডান্তে', 'মিল্', 'স্পেন্সার', 'ডারউইন', 'হাক্সলি', 'মোঁপাসা', 'ইবসেন', 'জন্‌বোয়ার'; অর্থাৎ, প্রায় সব আর্টিষ্টদের লেখাই পড়ে ফেলেচি।

—হুঁ, আচ্ছা, ডান্তের বাড়ী কোথায় জান?

—বাঃ, তা' আর জানি নে, আমার পড়ার 'প্রিন্সিপল্‌ই' হ'ল রবীন্দ্রনাথের মত সব খুঁটিনাটি করে পড়া। ডান্তের বাড়ী ছিল জাপানে, তাঁর দুই স্ত্রী ছিলেন, একজন মারা যাবার পর আর একজনকে বিয়ে করেন। ডান্তের মামার বাড়ী—

—থাক্, আর মামার বাড়ীর পরিচয়ের দরকার নেই।

মিসেস্ শান্তি সেন কি একটা কথা বলিবার জন্য যেন নৃপেনবাবুর ড্রইংরুমে দেখা করিতে আসিয়া ঘরের মধ্যে সেই যুবকটিকে পায়চারি করিতে দেখিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া রহিল। যুবকটি মুখ ফিরাইতেই তাহাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনিই মিসেস্ সেন ত? হুঁ, ঠিক চিনতে পেরেচি। সেবার আপনাকে ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলনে নাচতে দেখে-ছিলাম। আপনি একটা 'এন্‌গেজ্‌মেণ্ট' করতে পারবেন?

নৃপেনবাবু অনেক কষ্টে বিরক্তি দমন করিয়া স্ত্রীর উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শান্তি সেন জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্যে এন্‌গেজ্‌মেণ্ট?

—আমরা একটা ভ্যারাইটি পারফরম্যান্স করচি, তাতে—

—কিন্তু আমি যে এখনও বাইরে বাইরে নেচে বেড়াই, সে খবর আপনাকে কে দিয়েচে? এইরূপ উত্তর শুনিয়া যুবকটির চাইতেও অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন নৃপেনবাবু। এই রকম উত্তর তিনি শান্তির নিকট হইতে কিছুতেই আশা করেন নাই।

যুবকটি ঘাবড়াইয়া গেলেও যেন বিরক্তিকর কিছুই সে শুনে নাই, এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিল, খবর দেবে আবার কে? সেদিন ডাক্তার কে চাটুজ্যের 'ফ্যামিলি'

থিয়েটারে আপনার নাচ যে খুব ভাল হয়েছিল, সে কথা ত শহরের সবাই বল্‌চে—

—ডাক্তার কে চাটুজ্যের বাড়ীতে যাওয়া আর একটা 'ওপেন' ফাঙসনে যাওয়া সমান নয়, বুঝ্‌লেন? আপনি যে সাহস করে বাড়ীতে ঢুকে এতগুলি কথা বল্‌তে পারলেন, এজন্যে আপনাকে প্রশংসা না করে পারচি না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এও বল্‌তে হচ্ছে যে, অনুগ্রহ করে আপনি এখন বাইরে বেরিয়ে পড়ুন।

যুবকটি দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, আচ্ছা 'গুড্‌বাই স্যার', 'গুড্‌বাই ম্যাডাম', আপনার দ্বারা যখন কাজ হ'ল না, তখন বাধ্য হয়ে ইলা দত্তের কাছেই যেতে হবে।

যুবকটি বাহির হইয়া গেলে, শান্তি সেন টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া বলিল, তুমি চট্ করে তৈরী হয়ে নাও, আজই কাশী রওনা হ'তে হবে। যে করে হোক্ সেখানের চাকুরীটা তোমাকে জোটাতেই হবে।

—তার মানে?

—মানে আবার কি? আমি এখানে কিছুতেই থাক্‌ব না। এমন একটা সময় হয় ত ছিল, যখন আমাকে নিয়ে কোন আলোচনা হ'লে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙে গেচে। তারপর দিনের পর দিন আর কত তাড়না সহ্য করা যায়! এই দ্যাখ একখানা চিঠি।

শান্তির হাত হইতে নৃপেনবাবু চিঠিখানি লইয়া পড়িতে লাগিলেন—

প্রিয় মিসেস্ সেন,

অনেক খুঁজে আপনার ঠিকানা বার করতে পেরেচি। আপনি কি আর ক'টা দিন অপেক্ষা করতে পারলেন না? আমি এবার বাড়ী থেকে যে কোন উপায়েই হোক্ অনেক টাকা নিয়ে এসেছিলাম। আপনার বাবার কাছে গিয়েছিলাম, তিনি না কি আমাকে চিন্‌তেই পারলেন না। যাক্, এখন কথা হচ্ছে এই, আপনার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই, শেষবারের মত আমার মনের সব ক'টা কথা আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই। একটা আংটি, একটা শ্বেতপাথরের 'ডল্' ও একখানি জরীর কাজ করা রুমাল আপনার জন্যে পোষ্টে পাঠালাম। আমি শুধু একদিন কয়েক ঘণ্টা আপনাকে বিরক্ত করবো। আমি পরশু দিন আপনার বাসায় যাব। ইতি,

আপনার অনুগত
ভবতোষ দাস

চিঠিখানি পড়িয়া নৃপেনবাবু মৌন হইয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। শান্তি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, শুধু এই নয়, এরকম আরও অনেক চিঠি এসেচে, সে সব আমি গোপন করেচি। একজনকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসবার মধ্যে যে এত সুখ, একথা আমি আগে বুঝ্‌তে পারি নি। উঃ, কী ভুলই না করেচি!

নৃপেনবাবু তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া পড়িয়া শান্তির মাথাটি বুকের কাছে লইয়া কহিলেন, এই শুভদিনের অপেক্ষায়ই আমি ছিলাম। আমাদের জীবনে যদি আজকের মত একটা দিন না আস্‌ত, তা' হ'লে দু'জনেরই সমস্ত জীবনটা মাটি হয়ে যেত। জার্ম্মনী থেকে প্রথম এসে নারীকে যে ভাবে পেতে চেয়েছিলাম, ঠিক সেভাবেই পেয়েছিলাম; কিন্তু মোহ কেটে যাবার পর যদি নারীর আজ্‌কের মূর্ত্তি আমার কাছে না উপস্থিত হ'ত, তা' হ'লে খুব সম্ভব আমি আত্মহত্যা করতাম, কিম্বা দূর দেশে পালিয়ে যেতাম।

শান্তি কেবল কাঁদিতেই লাগিল, কোন কথা বলিতে পারিল না।

দক্ষিণ না বাম?

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী, এম্-এ

প্রাচীন যুগের কাহিনী। এ সেই যুগ, যে যুগে পুরুষ ছিল পৌরুষে ভরা। বক্ষে ছিল তার অসীম সাহস, বাহুতে তার বিপুল বল, অন্তরে তার অনন্ত প্রেম। আর নারী? মর্ত্তের মানবী, দেহমনের অতুল ঐশ্বর্য্যে দেবীত্বকে হেলায় অধিকার করেছিল। এমন নারীকে কামনা করে' স্বর্গের দেবতাকেও মর্ত্তের মলিন মাটিতে নেমে আসতে হ'ত। নারীকে জয় করবার একমাত্র অস্ত্র ছিল শৌর্য্য। পুরুষ নারীর জন্য বাঘের মুখে ছুটে যেত, পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়্‌ত, সাগরের অতলতল থেকে মাণিক খুঁজে আন্‌তেও পিছিয়ে পড়্‌ত না। পুরুষ তার বীর্য্য পরীক্ষায় জয়ী হ'লে, নারী তার গলায় ঝুলিয়ে দিত বিজয়মাল্য—সেই ছিল পুরুষের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

এমন যে যুগ, সে যুগে ছিলেন এক রাজা। রাজার নাম? নাম জানা নেই। সেই অনামী রাজার ছিল এক কন্যা। দুধে আল্‌তা তার রং, মেঘবরণ তার চুল—হাসিতে মাণিক ঝরে' পড়ত। কত দেশের রাজপুত্র আসত পানি-প্রার্থী হয়ে। রাজকন্যার কাউকে পছন্দ হোত না। রূপের ডালি সাজিয়ে বসেছিল সে তার মনের মানুষের অপেক্ষায়—সে মনের মানুষ আর আসে না। রাজা ছিলেন খেয়ালী। আধখানা মন তার সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত, আর আধখানা বর্ব্বর যুগের অন্ধসংস্কারের ঘনতমসায় আচ্ছন্ন। রাজ্যশাসন বিষয়ে এ রাজা কারও অনুশাসন মান্‌তেন না, কারও পরামর্শের অপেক্ষা করতেন না; যুগ যুগের সঞ্চিত সংস্কার ও জ্ঞানকে তিনি অবহেলার চক্ষেই দেখতেন; নিজের খুসির উপর কাউকে তিনি সম্মান দিতেন না। অপরাধের বিচারপ্রণালীও ছিল অদ্ভুত। তাঁর অর্দ্ধসভ্য মনের কল্পনার রূপ গ্রহণ করেই তারা প্রকাশ পেত। পাপ পুণ্য ও অপরাধের বিচারের জন্য একটা বিচার স্থল গঠিত হয়েছিল। প্রাসাদসংলগ্ন একটা প্রকাণ্ড সমতলভূমিকে কাঠের বেড়া দিয়ে বেষ্টন করা হয়েছিল। বেষ্টিত মণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ জন্য চারিদিকে চারিটী তোরণ। তোরণে অস্ত্রধারী দ্বাররক্ষী, মণ্ডলের মধ্যস্থলটা ফাঁকা—মল্লক্রীড়ার জন্য—চতুর্দ্দিকে 'রোমান্ ফোরামে'র অনুকরণে উচ্চ-নীচ আসন সন্নিবিষ্ট। সেখানে বসে' রাজ্যের প্রজাজন বিচার দেখ্‌ত। একপার্শ্বে রাজার জন্য বিচিত্র মঞ্চাসন, পার্শ্বে রাজকন্যার বস্‌বার স্থান। রাজাসনের দুই পার্শ্বে দক্ষিণে ও বামে দু'টী রুদ্ধদ্বার কক্ষ। অপরাধীকে ওই রুদ্ধদ্বার কক্ষের যে কোন একটীকে খুল্‌তে হ'ত। ওই কক্ষ দু'টীর একটিতে থাকৃত এক ভীষণ হিংস্র ব্যাঘ্র, অপরটীতে থাক্‌ত এক সুন্দরী তরুণী। ব্যাঘ্রের ঘর খুল্‌লে অপরাধীর অপরাধ সাব্যস্ত হ'ত, আর সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত হ'ত, হিংস্র পশুর নখ দন্তাঘাতে। দর্শকগণ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করতো। নারীর কক্ষ উন্মুক্ত করলে—তার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ হ'ত—রাজ্যের লোক জয়ধ্বনি করে' উঠত আর সেই জয়ধ্বনির মধ্যে লাজনম্রা তরুণী পরিয়ে দিত বন্দীর গলায় বিজয়মাল্য। পত্নীপুত্র থাকলেও সে তরুণীকে বন্দীর বিবাহ করতে হ'ত। রাজা স্বয়ং তাদের আশীর্ব্বাদ করে' যৌতুক দিতেন বহুমূল্য রত্নাভরণ। বিচারের পূর্ব্বে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কোনটীতে কি আছে তা' কারও জানবার অধিকার ছিল না—এক রাজা ছাড়া। এমনই ছিল এ রাজ্যের বিচার-প্রণালী।

* * *

রাজকুমারীর নাম অরুণা। বয়স কৈশোর যৌবনের মধ্যস্থলে। আলোর রূপে পতঙ্গ যেমন আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ রাজকন্যার রূপের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হ'য়ে কত দেশ-বিদেশের রাজপুত্র এল, শৌর্য্যবীর্য্যের পরীক্ষা দিলে—

নায়কের অপমৃত্যু

শ্রীমণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আজ রাতটাকে আমার পক্ষে অভিশাপ বল্‌তে হবে। হাতে কলম ধরে' চুপচাপ যে কতক্ষণ বসে' আছি,তার আর ঠিক্ নেই। অথচ, তখন থেকে একটা লাইনও লিখ্‌তে পার্‌লাম না। এর চেয়ে বড় অভিশাপ আর জীবনে কী ই বা হ'তে পারে। কোমব এসেছে ব্যথা করে'—চোখ ক্রমশঃ বুজে আস্‌ছে—সাম্‌নের সাদা নিভাঁজ বিছানা আমায় প্রলুব্ধ কর্‌ছে—অথচ, এই চেয়ার ছেড়ে ওঠবারও আশা নেই। কোনরকমে আজ একটা গল্পের পত্তন কর্‌তেই হবে। কিন্তু মগজ আজ যাকে বলে একদম খালি ছুটো কথা লিখে তার ওপর একটা ড্যাস টেনে সেই তখন থেকে বসে' আছি। কখন ধীরে ধীরে আমার মনের উৎস যাবে খুলে—আর কলমের মুখ থেকে বেরুবে কথার পর কথা—উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, প্রাণরসে পরিপূর্ণ কথার সারি।

কিন্তু হায়, বাইরের ওই সুন্দর নিস্তব্ধ রাত্রি, নীল আকাশ—ওরা শুধু চেয়েই আছে আমার দিকে। আকাশের বুকে আমার চোখ ছুটো বুলিয়ে নিই। শুধু নীল—কই, কোন গল্পের টুক্‌রো তো কোনখানে পড়ে নেই। সাম্‌নের ক্ষণ-সুপ্ত সহর—ওর ভেতরে খুঁজলে কবিতার মালমসলা বেরোতে পারে, কিন্তু গল্প ওখানে বিরল। অথচ, আমার গল্প চাই—যাকে বলে একেবারে রোমান্স—কারণ, আমি জানি আমার লেখা তারাই পড়বে—যারা এই সবে স্কুলের সীমানা পেরিয়ে কলেজের গণ্ডীতে পা রেখেছে। যাদের চোখে যৌবন এনেছে রঙীন নেশা—যারা পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড় করে' বোঝে একটীমাত্র কথা—'আমি।' তাদের জন্যে তাই আমায় এমন কিছু লিখ্‌তে হয়—যাতে তর্কসভায় আমার নাম একবার অন্ততঃ ওঠে। আমি জানি তারা কী চায়—বেশ সরস প্রেমের চিত্র, বিয়োগান্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আজও আমায় একটা সেই ধাঁজের গল্পই লিখ্‌তে হবে, কিন্তু—কোথায় বা পাই প্লট।

একটার পর একটা মুহূর্ত্ত সময়ের পাখায় ভর করে' উড়ে যাচ্ছে—কিন্তু আমার অবস্থার আর পরিবর্ত্তন নেই। সেই বসেই আছি। অথচ, আমার জীবনে এই সেদিনই তো এমন একটা রাত এসেছিলো, যখন আমি লিখে আর কুলিয়ে উঠ্‌তে পারি নি। কত কথাই যে সেদিন লিখেছিলাম, তার আর ইয়ত্তা নাই—কিন্তু আজ একেবারে ঠিক তার উল্‌টো। আজ আমার কথার ভাণ্ডার একেবারে শূন্য। তাই বসে' বসে' ভাবছি—কী এখন করা যায়? বিছানার লোভ ক্রমশঃ আমাকে টানছে—এবার দেখছি আলো নিভিয়ে শুতেই যেতে হবে। লেখা আর আজ হ'য়ে উঠলো না—অথচ, এই আমিই কিনা সেদিনকার সেই স্তব্ধ নিটোল রাতে বসে' একেবারে একটা লম্বা গল্প লিখে ফেল্‌লাম। কোথা থেকে যে জুটে গেল প্লট, আর কথা যে কোথা থেকে এল, তাই খালি ভাবছি। আর ভেবেই বা করবো কী—এমন মনমরা রাতে ভাবনার চেয়ে ঘুম ঢের ভালো।

হঠাৎ দরজায় একটা ছোটখাট আওয়াজ, হাওয়ার শব্দ হওয়াই স্বাভাবিক। এখন আর কে এসে আমার দরজায় ধাক্কা দেবে। বাড়ীর লোক বর্ত্তমানে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, আর রাত করে' জেগে বসে' লিখ্‌লে কেউ একটা কথাও বল্‌তে আসে না। আবার আওয়াজ—কী ব্যাপার—বাইরে কী তবে ঝড় উঠেছে—কিন্তু সাম্‌নের জানালা খোলা, অথচ টেবিলের কাগজ-পত্র সব ঠিক তেমনি রয়েছে। এখন আমার পক্ষে উঠে দরজা খুলে দেখা অসম্ভব। কিন্তু উঠে পড়্‌লেই তো হয়। আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়া যাক্। একবার দরজা খুলে দেখেও

নিতে হবে। চোর আর এ ঘরে কী-ই বা চুরি করতে আসবে—একগাদা বই আর কাগজ পত্র। তা' না হোক্, তবু অন্ততঃ সুনিদ্রার খাতিরে একবার দরজাটা খোলা উচিৎ। আঃ, এতজোরে আবার কে ধাক্কা লাগাতে আরম্ভ করলে! শেষ পর্য্যন্ত ওঠালে দেখ্‌ছি। তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা খুলে ফেল্‌লাম। তাইতো—স্বপ্ন দেখছি না তো, না, তেমন তো বোধ হচ্ছে না—সবই বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি—সাম্‌নে বেশ স্পষ্ট দেখ্‌ছি দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে ভদ্র-বেশ—বয়সও তো দেখছি বিশেষ বেশী নয়—হঠাৎ এখানে কী দরকার কে জানে!

কোনরকমে জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কে, কা'কে খুঁজ্‌ছেন?

আগন্তুক: কা'কে আবার, আপনাকে—এত রাতে এসে যে আপনার দেখা পাব আশা করি নি—এখনও শুতে যান নি—এত রাত জাগা ভাল নয়।

আমি: তাইতো—আপনি যে এসে বেশ উপদেশ আরম্ভ করলেন—কিন্তু ওগুলো বল্‌বার জন্যে আমার বাড়ীর লোক আছেন—এখন আপনার পরিচয়টা, আর কী দরকারে এসেছেন?

আগন্তুক: এঃ, আপনার কাছে এটা আশা করি নি—এত রোমান্স দিনের পর দিন সৃষ্টি করছেন, আর এইটুকু সহ্য করতে পার্‌ছেন না। ধরুন, আমি যদি একটি তরুণী হতাম—তা' হ'লে তো আপনার উচ্ছ্বাসের আর সীমা থাক্‌তো না। তা' যা' হোক্, আপনারা বিংশ শতাব্দীর যুবক, পরিচয় না পেয়ে আলাপ জমাতে পাবেন না? ধরুন না, আমি আপনার গল্পের নায়ক। আর দরকার বিশেষ আর কি, একটু গল্প করতে এলাম।

আমি (বেশ বিরক্তভাবে) রহস্য একটু রাখুন। হাসালেন দেখ্‌ছি। জানি না শুনি না কোথা থেকে আমার গল্পের নায়ক সেজে এলেন, অথচ এখনও একটা গল্প এত কসরৎ করে' লিখতে পারলাম না। দেখুন, আমি এখনও তত আধুনিক হই নি যে, রাত দুটোর সময় আগন্তুকের সঙ্গে গল্প জমাব। কী বলবার আছে বলে' ফেলুন তাড়াতাড়ি।"

আগন্তুক: (একটু হেসে) তা' চলুন, ওই চেয়ারটায় বসা যাক্। দাঁড়িয়ে কথা বলা চলে না। একটা সিগারেট খ'বেন না কি? আপনি হয়তো চটে যাচ্ছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার আনন্দই হওয়া উচিত, যেকালে আমি আপনাকে এখন একটা গল্পের প্লটের সহজেই সন্ধান দিতে পারি। তবে আগে যা' বলেছি, আমাকে আপনার নায়ক করতে হবে। আধুনিক গল্পের নায়ক হবার মতন অবস্থা আমার যদি নাই হয়, তবুও আপনার মতন শক্তিশালী লেখক অবশ্যই ঘসে মেজে নিতে পারবেন। আপনার কাছে আসার উদ্দেশ্যই তো তাই—এ কী, আপনার যে হাই উঠ্‌ছে?

আমি: দেখুন, উপহাস কর্‌বার এটা সময় নয়—এত রাতে হঠাৎ আপনার সেধে গল্প শোনাতে আসার কোন মানে হয় না। আর আমার নায়ক যে আপনাকে গড়ব, কিন্তু গল্প কোথায়? যাই হোক্, আপনার আর কিছু বল্‌বার আছে?

আগন্তুক: যথেষ্ট—আপনি খুব বড় সাহিত্যিক, কিন্তু এভাবে এই দৃশ্যটাকে যে কেন গ্রহণ করছেন তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। 'গলসওয়ার্দি' হ'লে তো শুধু আমার আবির্ভাব নিয়েই একটা ভাল গল্প বানাতে পারতো। আর আপনি তো যাকে বলে রেগে গেছেন। কিন্তু একটু শুন্‌লেই আমার গল্পটা আপনার ভাল লাগবে মনে হয়।

আমি: যা' বলবার বলে' যান, বেশী দেরী করবেন না।

আগন্তুক: না না, দেরী আর বিশেষ কী? ধরুন, এইভাবে আরম্ভ হলো একটা অতি সাধারণ গল্প। বন্ধু আমার কী বলে জানেন—বলে যা' লিখ্‌বে, কিছু বাস্তব হওয়া চাই, যেন নিছক কল্পনা না হয়। কিন্তু আমার গল্পটা একটু কাল্পনিক মনে হ'লেও আপনি চেষ্টা করবেন—এটাতে বাস্তবতার রূপ দিতে।

আমি: দেখুন, এত রাতে আর বাজে বক্‌বেন না। কী বলবার বলে' যান, তারপর রূপ সে দেওয়া যাবে তখন।

আগন্তুক: আচ্ছা, আপনার মতে মানুষের জীবনের চরম সুখ কী?

আমি : বাঙালীর কথা যদি ধরেন তো বলি, বিয়ে করে'; তার ওপর যদি বউ সুন্দরী আর নিজের 'ব্যাঙ্ক একাউন্ট' ভারী হয়তো কথাই নেই।

আগন্তুক : তার মানে, মানুষের জীবনে বল্‌তে চান নারীই শ্রেষ্ঠ সুখদায়িনী ?

আমি : তা' ছাড়া আর কী বলুন—অন্ততঃপক্ষে আমরা তো ওদের নামেই যা' হোক্ দু'পয়সা করে' খাচ্ছি।

আগন্তুক (রাগতভাবে) কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের কথা আপনি কি জানেন। সাহিত্যের ব্যবসা করে' তো গোটাকতক বাঁধাধরা পথ নিয়ে আপনাদের কারবার। বালিগঞ্জ লেক্‌রোড, আর লিলি, মিলিকে নিয়ে বসে' আছেন। টাকার সেখানে ছড়াছড়ি—জীবন সেখানে বৈচিত্র্যময়—প্রেমের নামে সেখানে ব্যভিচার। দুঃখ যে মানুষের জীবনে কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে, তাতো আপনাদের একটা চরিত্রের মধ্যেও দেখ্‌লাম না। খালি আনন্দ আর অবাধগতি—প্রাণের প্রাচুর্য্যে তারা ভেঙে পড়্‌ছে, ছড়িয়ে পড়্‌ছে। চারিদিকে তুলেছে রঙিন আবরণের নেশা—জীবনের গতিকে তা' করে' দিয়েছে হাল্কা। কিন্তু মানুষের সত্যি জীবনের কথা ভেবে দেখেছেন। ফার-পোয় চা খেয়ে আর মোটরে চড়ে' একদল তরুণী নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে পিক্‌নিক্ করেই তাদের দিনগুলো কাটে। না। তারা মোটরে চাপা পড়ে বটে, কিন্তু চড়্‌তে পায় না। কল্পনার বিলাস আপনাদের বেশীদিন নয়—সেখানে যা' কিছু সত্য, তা'কে আপনারা করছেন ঠাট্টা, যেখানে এই সভ্যতার চকমকি ক্ষণস্থায়ী। রহস্য করে' বলে' বল্‌লেন—বিয়ে করাই চরম সুখ—কিন্তু ভাবতেও পারেন না—এই বিয়েই আবার কারুর জীবনে আন্‌তে পারে বিষম দুঃখ আর অধঃপতন।

আমি : তাতো পারেই, কিন্তু এভাবে নিজের নিন্দে শুন্‌তে ত এত রাতে বসে' থাকা যায় না। এ কথাগুলো বলার জন্য অনেক সাপ্তাহিক আছে,তা'তে লিখতে পারেন—অনেক গত-যুগের সাহিত্যিক আছেন—তাঁদের কাছে বল্‌তে পারেন—সমর্থন পাবেন। এখন তা' হ'লে উঠি।

আগন্তুক : (বিকৃতভাবে হেসে) আহাহা, শুনে যান না। জীবনে বিয়ে করে' একটা মানুষ—কি ভীষণ সুখ পেয়েছিল। শুন্‌তেই ওইরকম। আপনার মুখ দিয়ে রহস্যটুকু যত সহজে বের হ'ল, ঠিক অত সহজে বিয়ে করে' যদি সুখ পাওয়া যেত, তা' হ'লে আর ভাবনা ছিল না। আমি একজনকে জান্‌তাম—যৌবনের সঙ্গে-সঙ্গেই সে বিয়ে কর্‌লে। পাত্রী আপনারা যাকে বলেন সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। তার ভেতরে প্রাণ যতটা না থাক্, তার আনুসঙ্গিক বস্তুগুলির অভাব বিশেষ ছিল না। যাই হোক্, পাত্রী যেমনই হোক্, আপনার কথা মান্‌লে বল্‌তে হবে সে বিয়ে করে' সুখী হয়েছিল। যদিও বিয়ের পর ক'দিনই বা আর সে এদেশে ছিল—তবুও জানেন তো, তার মুখ-চোখের পরিবর্ত্তন তার প্রাণের ভেতরকার কথা আমাদের জানিয়ে দিত। বিয়ে করার মতন সহজ আর কী থাক্‌তে পারে, কিন্তু প্রিয়ার মধুর হাসি—আর ফুলশয্যার স্মৃতির ওপরেও এসে চাপে টাকা উপায়ের ভাবনা। তাই সে বেরিয়ে পড়্‌ল চাকরীর সন্ধানে—নববিবাহিতা স্ত্রীকে গ্রামে এক পিসীর কাছে রেখে। চাকরী জুট্‌লো সেই গ্রাম থেকে হাজারখানেক মাইল দূরের এক সহরে। তখনও তার মুখে হাসি—শুধু ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন ভেবে। কিন্তু কাজের জায়গায় দেখা গেল—তার মতন কম বয়সের লোকের পক্ষে ভবিষ্যৎকে ভালভাবে গড়ে' তোলা শুধু কঠিন নয়, ভীষণভাবে কষ্টসাধ্য। তবুও তার সামান্য মাইনে থেকে মাসের পর মাস গ্রামে টাকা পাঠায়—কিছু জমিয়ে রাখে, কারণ, আর ক'মাস বাদে যে তার অনেক খরচ আছে, একটা ছোটখাট সংসার বিদেশে পাতা তো আর যা' তা' ব্যাপার নয়—পিসীকে আর বউকে গাড়ীভাড়া খরচ করে' এতটা আন্‌তে হবে।

আমার নায়কের জীবন আরম্ভ কর্‌তে হলো অতি বিশ্রীভাবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ সুখের আশা যেখানে বলবতী, সেখানে দুঃখ হয়তো গায়ে লাগে না। সে একটা অতি ছোট ঘরে বাস কর্‌তে আরম্ভ করলে—কারণ, যাকে ক'মাস পরে একটা বড় সংসার পাততে হবে, তার পক্ষে বিলাসিতা করা পোষায় না। গরমকালে

ঘরে না বা আছে একটা পাখা, না কিছু—এমন কী তাকে নিজেই সব কর্‌তে হয়, রান্না থেকে বিছানা পাতা অবধি। কিন্তু এ ছাড়া তার আর করবারই বা ছিল। তবুও যা' হোক্, অত কষ্টের মধ্যে সান্ত্বনা—গ্রাম থেকে আসা তার বউয়ের চিঠি। তার ভেতরে কত হাসি, কত কান্না। সেইগুলো নিয়েই তার দিন কেটে যেত।

বিয়ে করলে যা' হয়—ভাবনা আর ভাবনা। রাতে শুয়ে সে ভাবতো—তাইতো, কালই যদি সে মরে' যায় তো তারপরদিন তার স্ত্রী দাঁড়াবে কোথায়? তা' ছাড়া, দু'দিনবাদেও তো সে মর্‌তে পারে—তখন আবার কোন্ না তার দু'-একটা ছেলেমেয়ে হবে—কিন্তু তাদের জন্য তো তার কিছু রেখে যাওয়া চাই। ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার বুক কে যেন চেপে ধরে—তার মনে হয়, মৃত্যু বুঝি তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। বাইশ বছরের যুবকের মনে জেগেছে অন্ন-সমস্যা—তার পরিণামে সে লেগে গেল দু'জনের কাজ একা কর্‌তে। অফিসের বড়বাবুরা দেখেন—একা মানুষ, তার এমনই বা কী টাকার দরকার—কিন্তু তবুও এত খাটুনী সহজেই তাঁদের চোখে পড়ে' গেল। মাইনে তার যৎসামান্য বাড়্‌লো—কিন্তু তাও তার আশা পূরণের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তবুও তার কাজের বিরাম নেই।

এদিকে চিঠি আসে একখানার পর একখানা। ক্রমশঃ তার সুর বদলায়। প্রথমে আরম্ভ হয় নিয়ে যাবার জন্যে অনুনয় বিনয়—তারপর অভিমান, আর একটু যেন রাগও মেশানো থাকে। কিন্তু তার পক্ষে করবার আর ছিলই বা কী। খালি গাধার মতন খেটে যাওয়া। আর মাসের শেষে একবার দেখা—তার জমার অঙ্ক কতটা বাড়্‌লো। কিন্তু ওধারকার তাগিদ আর সে এড়াতে পারে না, কাজের মধ্যে ভীষণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে—ক্রমশঃ শরীর তার শুকিয়ে আসে—খাটুনীর প্রচণ্ড চাপে মনের সমস্ত আনন্দ কোথায় মিলিয়ে যায়। তবুও ঠিক পরের মাসে স্ত্রীকে আন্‌বার আশায় কাজ করে' চলে—চোখের সাম্‌নে ভাসে আগত একটা ছোটখাট সংসারের ছবি।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই তার দেশ থেকে পিসিমার একখানা চিঠি এল। চিঠিতে নানা কথার পর লেখা—কাল থেকে বউকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—পাড়ার নরেন পোদ্দারের ছেলেটাকেও আর গ্রামে দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক্, মেয়ের আর অভাব কী—দুঃখ যেন সে না করে, ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে তার ভাবা উচিত ছিল, যাক্, তবু জীবনে একটু মুক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু হয়তো বউকে সে সত্যিই ভালবেসেছিলো, তাই চিঠিটা পেয়েই তার চোখের সাম্‌নে দিয়ে ফিল্মের মতন ভেসে গেল—বিয়ের পর প্রথম ক'দিন—কী সুখের সেগুলো! তারপর তার এই প্রচণ্ড খাটুনী—শুধু স্ত্রীকে নিয়ে সংসার পাতবার আশায়। আর এই তার পরিণাম।

তারপর দিন থেকে সে আর কাজে গেল না। লোকে জিগ্‌গেস্ কর্‌লে বল্‌তো—যৌবনের সমস্ত রঙ আমার উপে গেছে। জীবনের সমস্ত দুঃখের স্বাদ আমি পেয়েছি। এবার আমার জীবনে নিজ্জনতা চাই। কিন্তু অফিস তা'কে ছাড়তে চায় না। একটা মোটা মাইনের চাকরী পর্য্যন্ত দিতে রাজী হ'য়ে যখন তার কাছে লোক পাঠালে, সে মাইনের মোটা অঙ্কটা শুনে জোরে বিকটভাবে হেসে উঠ্‌লো—মনে হলো, ও হাসি বুঝি আর থাম্‌বে না। তারপর সে শুধু বল্‌লে—আমার জীবনে আর কাজের দরকার নেই। আমি বুড়ো হ'য়ে গেছি, কাজ কর্‌বার শক্তিও নেই। তারপর আবার সেই হাসি। আর আপনিই বলুন না, এরপর আর সে কী কর্‌তে পার্‌তো।

আমি: বেপরোয়া হ'য়ে চাকরীটা নিয়ে আর একটা বিয়ে, আর 'সেন্টিমেন্ট্যাল' হ'লে—আত্মহত্যা।

আগন্তুক: (বিকটভাবে হেসে) হাহা, সে হয়তো আত্মহত্যাই করেছে।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি চোখটা মুছে একবার ঘরের চারদিক দেখে নিলুম—না, খাটি স্বপ্ন—কোথাও কেউ নেই।

তারপর কলমটা বাগিয়ে বস্‌লাম একটা গল্প লিখ্‌তে—একেবারে খাঁটি অভিজাতদের নিয়ে।

মণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ঘরছাড়া

শ্রীনীরেন্দ্রকুমার বসু

নিস্তব্ধ দিঘীর জলে পদ্ম কেঁপে ওঠে আলোর পরশ পেয়ে। পাপিয়া ডাকে কানন-শাখে—'পিউ!'…

নদীয়ায় ভোর হয়।

কলসী কাঁখে গীতা ঘাটে আসে। নিদ্রাহীন রজনীর কালো ছায়া সারা মুখে তা'র ছড়িয়ে আছে যেন। অলস দেহে কলসী নিয়ে জলে সে পা দেয়।

দিঘীর কালো জলে তখন ঢেউ ওঠে—থরথর হিয়া প্রথম প্রিয়ার পরশের মত। গীতা আন্‌মনে তাই দেখে চেয়ে।…

স্নান শেষ করে' ঘাটে উঠ্‌তে যেতে তা'র দৃষ্টি পড়ে—অচেনা কে একজন তা'র পানে চেয়ে আছে—তা'র ওপর। ব্যস্ত হ'য়ে ভরা কলসী নিয়ে গীতা তাড়াতাড়ি চল্‌তে থাকে।

আগন্তুক মুচ্‌কে হেসে অস্ফুট স্বরে বলে,

"ওগো, যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ—"

একটু দূরে পথের বাঁকে এসে গীতা দেখে ফিরে, আগন্তুক তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।—কে?—গীতা নিজের মনেই প্রশ্ন করে, কে? যেই হোক্—দেখ্‌তে ভারী সুন্দর ত!

অলক্ষ্যে বসে' অতনু বুঝি একটু তখন হাসে, তা'র ফুলের বাণের ধার পরীক্ষা করে—

গীতা চল্‌তে চল্‌তে ভাব্‌তে থাকে, তার কি পরিচয়?

আন্‌মনা গীতা চলে, পায়ে-চলা পথ দিয়ে কুঞ্জঘেরা ঘরের পথে। ন পাড়ার রাঙা দি' তা'ই দেখে মুচ্‌কে হেসে প্রশ্ন করে, "কি লো, রাত্রে কি ঘুম হয় না?"

রাঙা দি' বিধবা। অনেক বয়স। পূজো-আহ্নিক করেই সুখে দিন কাটায়। ছোট ছেলেমেয়ে দেখ্‌লে ঠাট্টা কর্‌তেও ছাড়ে না।

গীতা ওকথার উত্তর না দিয়ে বলে, "ঘাটে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।—নাইতে পারলেম না।"—

রাঙা দি' ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বলে, "আহা হা মানিনী! সে যে কালাচাঁদ গো। যাও, দেখা করে' এস।"

"না—সত্যি বল্‌ছি—"

গীতার কথা শেষ না হ'তেই অচেনা লোকটি এসে সোজা রাঙা দি'কে প্রশ্ন করে, "এখানে কি আজকের মত আশ্রয় পাব?"

রাঙা দি' বলে, "পাবে। তুমি কোথা থেকে আস্‌চ?"

আগন্তুক বলে, "বাড়ী আমার এলাহাবাদে। আমি দেশ দেখ্‌তে বেরিয়েছি।"

রাঙা দি' বলে, "তোমার নাম?"

"শশাঙ্ক ঘোষ।"

"আচ্ছা, এস" বলে' রাঙা দি' গীতার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে, গীতা নেই। শশাঙ্ক বুঝ্‌তে পেরে বল্‌লে, "উনি চলে' গেছেন খানিকক্ষণ হ'ল।"

রাঙা দি' মুচ্‌কে হেসে বলে, "ও!"

বেলা বেড়ে ওঠে। পাড়ায় পাড়ায় খবর যায়—এলাহাবাদ হ'তে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে কে একজন নদীয়ায় এসেছে। রাঙা দি'র বাড়ীতে ভীড় ধরে না - অচেনাকে একবার দেখ্‌বে বলে'।

রাঙা দি' খোঁজে গীতাকে। মাকে তা'র বলে, "একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

নিজের মনেই রাঙা দি' হাসে। মাঝে মাঝে খবর নেয় শশাঙ্কর কাছ হ'তে, "তোমাদের [illegible]কে কোথায় আছে? কি কর?"

শশাঙ্ক উত্তর দেয়। মনে মনে খোঁজে সেই মেয়েটীকে।

আরো বেলা বাড়ে। ভীড় কমে আসে। গীতা সদর হ'তে হেঁকে বলে, "রাঙা দি', ডেকেছ আমায় ?"

রাঙা দি' চাপাগলায় বলে, "পোড়ারমুখি, আস্তে ও ঘরে যে তোর কালাচাঁদ আছে।"

গীতা জিব্ কেটে দৌড়ে অন্দরে আসে। শশাঙ্ক সবই শোনে। আড়চোখে জান্‌লা হ'তে তা'কে দেখে মনে মনে হাসে।

রাঙা দি' প্রশ্ন করে গীতাকে, "পছন্দ হয় ?"

গীতা বলে, "অসভ্য !"

রাঙা দি' হাসে। বলে, "ডেকে আন্—ঠাঁই হয়েছে।"

গীতা বলে, "তুমি যাও।" মুখে রক্তের ছোপ্ লাগে।

রাঙা দি' দেখে। হেসে বলে, "মর্ ছুঁড়ি !

ছুঁড়ি মরে না। খালি লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে। খাবার আগ্‌লে রাখ্‌তে বলে' রাঙা দি' ডাক্‌তে যায় শশাঙ্ককে।

হঠাৎ চৌকাঠে শশাঙ্কর আবির্ভাব হয়। গীতা পালাতে পারে না, মাথা নীচু করে' বসে' থাকে। রাঙা দি' রান্নাঘরে বসে' খালি হাসে।

মিনিটের পর মিনিট কাটে। রাঙা দি'র প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। উঠে আসে গীতার রকম দেখ্‌তে। দেখে,—চৌকাঠে শশাঙ্ক—ঘরে গীতা—ভাতের ওপর মাছির মেলা।

রাঙা দি' বলে, "গীতা, এর নাম তুমি খাওয়াচ্ছ ?" শশাঙ্ককে বলে, "বসো ভাই, খেতে বসো।"

শশাঙ্ক চম্‌কে উঠে আসনে বসে। গীতা উঠে আসে।

রাঙা দি' চাপাগলায় বলে, "পছন্দ হ'ল ?"

গীতা হাতযোড় করে' বলে, "আস্তে রাঙা দি', আস্তে।"

রাঙা দি' ছাড়ে না। বলে, "বল্, পছন্দ হয়েছে কি না ?"

গীতা চোখ ঘুরিয়ে বলে, "অসভ্য !"

শশাঙ্ক ঘুমোয়। গীতা রাঙা দি'র সাথে বাড়ী ফেরে। মনে মনে ভগবানকে ডেকে সে বলে, আজ যেন ভীষণ বৃষ্টি হয়। নদীয়া যেন রসাতলে যায়।

রাঙা দি'র সাথে গীতার মা'র কি কথা হয়। গীতা যেন বুঝ্‌তে পারে।

নদীয়া কিন্তু রসাতলে যায় না। সূর্য্য ডুবে যায়। আবার রাঙা দি'র সাথে গীতা চলে রাঙা দি'র বাড়ীতে। এবার সঙ্গে থাকে—মা।

হঠাৎ শশাঙ্কর সাথে সদরে দেখা হয়। রাঙা দি' মুচ্‌কে হেসে বলে, "উঠেছ দাদা ; এস জল খাও।"

তা'রা অন্দরে চলে' যায়।

মা শুধু রয়ে যায় শশাঙ্কর পরিচয় নিতে। শশাঙ্ক ভাবে, এবার প্রবাসে কি স্ত্রী লাভ ! মনে মনে হাসে।

মা বলে, "বাবা, এবার বিয়ে কর না। কি হ'বে দেশ ঘুরে ?"

শশাঙ্ক চুপ করে' শোনে। কি ভেবে একটু পরে বলে, "পথে-পথেই অনেক বছর কেটে গেছে, কি হ'বে বিয়ে-থা করে' ।"

মা বলে, "পাগল ! তুমি মত কর।"

শশাঙ্ক ভেবে বলে, "আচ্ছা, জানাব।"

মা উঠে যায়।

সন্ধ্যা নামে।

তুলসীতলায় আলো দিয়ে রাঙা দি' এসে বলে, "কাল তোমার যাওয়া হ'বে না। যদি এসেছ, আর কিছুদিন থেকে যাও।"

শশাঙ্ক বলে, "বাড়ী ছেড়ে এসে কি আবার পরের বাড়ীতে বন্দী হ'তে ইচ্ছে করে ? আমাকে যেতে হ'বে।"

রাঙা দি' চলে' যায়। একটু পরে গীতা আসে। মাথা নীচু করে' কাঁপাগলায় বলে, "ওঁরা বল্‌লেন—কাল যাওয়া হ'বে না।"

তা'র সারামুখে রক্ত ছুটে আসে।

শশাঙ্ক হেসে বলে, "ওঁরা বল্‌লেন ?" একটু থেমে আবার বলে, "তুমি কিছু বলো না ?"

হঠাৎ মাথা তুলে গীতা তা'র পানে চায়। মুখ ফুটে কিছু বলে না, শুধু মাথা হেলিয়ে জানায়—সেও বলে।

শশাঙ্ক এগিয়ে এসে হাতটা ধরে' বলে, "রইলেম।"

গীতা কিছু বলে না। তার ডাগর চোখ যেন ছল্-ছল্ করে' আসে। শশাঙ্ক হাত ছাড়ে না। খানিক পরে বলে, "আমায় তোমার এত ভাল লাগ্ল কি করে'?"

গীতা উত্তর দেয় না। শুধু দাঁড়িয়ে থাকে শশাঙ্কর হাতে বন্দী হ'য়ে। কতক্ষণ কেটে যায়। শশাঙ্ক বলে, "মাকে বল যে, আমার মত আছে।"

গীতার সারাদেহ কেঁপে ওঠে। সে কথার অর্থ বোঝে।

কথাটা রটে, "এলাহাবাদ হ'তে গীতার বর এসেছে।"

কবে বিয়ে সবাই খোঁজ করে। রাঙা দি' তা'দের বলে, "দেখ্তে পাবে।"

এমনি করে' দিন চলে। শশাঙ্কর 'একদিন' আর কাটে না। মনে মনে ব্যস্ত হয়। প্রকাশ করবার উপায় থাকে না। এমন দেশতো সে কখন দেখে নি, যে, পরকে আপন করতে ব্যস্ত।

সহসা একদিন গীতাকে বলে, "এবার যাই? আবার আসব।"

গীতা কিছু বলে না। শুধু তা'র কাপড় ধরে' মুখের 'পরে চোখ রেখে চেয়ে থাকে। বিশ্বাস হয় না,—সে কি আবার আসবে?

শশাঙ্ক বোঝে। বলে, "সত্যি, না গেলে ক্ষতি হবে।"

গীতা না বুঝে বলে, "হোক্ গে ক্ষতি।"

একটা করুণ হাসি শশাঙ্কর ঠোঁটে খেলে যায়। একটু-খানি পরে বলে, "আমায় তুমি আগ্‌লে রাখ্তে পারবে?"

মাথা দুলিয়ে গীতা বলে, "পারব।"

রাঙা দি' আড়াল হ'তে দেখে পাগলদের কাণ্ড। খুসী হ'য়ে মালা ঘুরিয়ে ডাকে, "হে গোরাচাঁদ, গীতাকে আমার সুখী করো!"

—মা ব্যস্ত হ'য়ে পাঁজি-পুথি নিয়ে দিনস্থির করতে টোলে যায়।

সেদিন তখনো কোকিল জাগে নি, আলো ফোটে নি, আকাশে তখনো তারা জেগে। রাঙা দি'র বাড়ী থেকে শশাঙ্ককে রাজার শক্তি ধরে' নিয়ে যায়।

যা'বার বেলায় শশাঙ্ক রাঙা দি'কে বলে, "ছাড়া পেয়েই এখানে এসে গীতাকে নিয়ে যা'ব। বাড়ীতে লিখে দিও। এখন তবে আসি রাঙা দি'?"

পায়ের ধুলো নিয়ে সে চলে' যায়। রাঙা দি' গোরাচাঁদকে ডাক্তে গিয়ে গীতাকে ডেকে ওঠে। নদীয়া তখন নিস্তব্ধ।

সময় থাকে না, চলে' যায়। নদীয়ারও সময় কাটে। গীতা হাসিমুখে এসে খবর শুনে জলভরা চোখে চলে' যায়। মা মাটির ওপর আছ্ড়ে পড়ে।

অন্ধকারে পথিক নদীয়ায় এসে আবার অন্ধকারে বিদায় নিয়ে চলে' যায়। মাঝের ক'টা দিন থেকে কি বাঁধনই বেঁধে যায় নদীয়াকে! খালি বুকে এসে ভরা বুকে চলে' যায়।

গীতা ভাবে, আগ্‌লে রাখ্তে তো কই পারলেম না। রাঙা দি'কে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কি দোষ করেছে সে, যার জন্যে এমনি করে' তা'কে নিয়ে গেল?"

রাঙা দি' তা'র মাথাটা বুকের ওপর চেপে ধরে' বলে, "কি দোষ?—জানি না ত।

গীতার চোখ বেয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে। একমনে গীতা ডাকে, "ফিরে এস, ওগো, ফিরে এস!"

দিন কাটে।

নদীয়ার লোকে বলে, গীতার বর পালিয়েছে। সমাজ রক্ত আঁখি মেলে নিষ্পাপকে শাসন করতে এগিয়ে আসে। কঠিন স্বরে বলে, "বর? কি রকম বর সে জানি। ভাল চাওতো বিদায় কর কালামুখীকে।"

মা বুকভাঙা কান্না কেঁদে অনুনয় করে, কিন্তু ফল হয় না। রাঙা দি' মাকে বলে, "তোর অন্য মেয়ের বিয়ে বন্ধ হয়ে যা'বে। গীতাকে আমায় দে। আমি বৃন্দাবনে

শশাঙ্কর জন্যে অপেক্ষা করব। তুই অন্য মেয়েদের বিয়ে চুকিয়ে বৃন্দাবনে আয়।"

মা রাজী হয়, না হ'য়ে উপায়ই বা কি! সমাজ দেখে গীতাকে ত্যাগ করে তার মা। কিন্তু, ওই রাঙা দি', ওকে রাখে এমন স্পর্দ্ধা! তা'র ওপর কিন্তু আদেশজারী করতে হয় না। রাঙা দি' হেসে বলে, "মানুষের সঙ্গে জীবন ভোরই ত জমাখরচ মেলালুম, এইবার নিকাশ দিতে তার ওপরওয়ালার কাছে নিজেই যেতে প্রস্তুত হয়েছি। তাড়া দিতে হবে না তোমাদের, কালই, হাঁ, কালই যাবো আমি।"

সেদিন শেষরাতের জল-ঝড়ে গীতার হাত ধরে' রাঙা দি' বেরিয়ে পড়ে বৃন্দাবনের পথে। জনহীন পথের বাঁকে এসে রাঙা দি' ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে। গীতা ভেজাগলায় প্রশ্ন করে, "কার চিঠি রাঙা দি' ?"

"শশাঙ্ককে বৃন্দাবনের ঠিকানা জানিয়ে গেলেম। আয় দিদি,—একটু তাড়াতাড়ি আয়।" খানিক পরে বলে, "দু'বছর পরে যেন তোদের একঠাঁই রেখে যেতে পারি। দু'বছর পরে না তা'র খালাস হ'বে ?

"যদি না সে ফেরে ?—যদি আমাদের ভুলে যায় ?"

"কে—শশাঙ্ক ? পাগল! গলা যেন ভারী হ'য়ে আসে।

নদীয়ার শেষ সীমানায় এসে রাঙা দি' ভিজে মাটির ওপর মাথা রেখে বলে, "তোমার কোলে জন্মেছিলেম মা, আজ বিদায় নিচ্ছি এই বলে', যে আমাদের ঘর ছাড়িয়েছে--তা'কে যেন পাই।"

রাঙা দি'র অশ্রুধারা বৃষ্টিধারায় মিশে গীতার কাছে অপ্রকাশই রয়ে যায়।

গীতা মন্ত্রমুগ্ধার মত রাঙা দি'র কথা শোনে। তা'র সারা অন্তর যেন ওই কথাতে বেজে উঠে, "তাকে যেন পাই!

রাঙা দি' তা'র কান্নামাখা মুখ হাতের ওপর তুলে মচ্‌কে হেসে বলে, "ওরে, কালা কি রাই ছাড়া থাকতে পারে ?—আয়—আয়, আয় এগিয়ে আয়!"

নীরেন্দ্রকুমার বসু
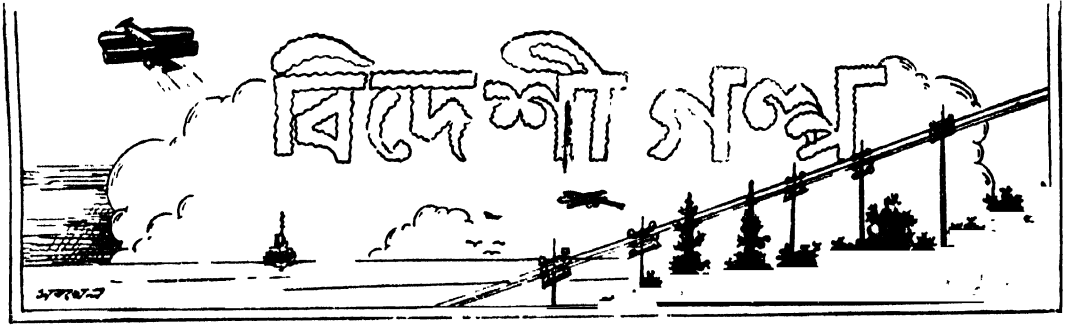
শনিবারের ছুটি

শ্রীমতী দুর্গা দেবী

শনিবারের ঝক্‌ঝকে অপরাহ্ণ। বসন্তের পড়ন্ত রৌদ্রে লণ্ডন সহর যেন কোন্ কল্পলোকের নগরীর মত অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছিল। রৌদ্রে যেন সোনামাখা, ছায়াতে বেগুনি রংয়ের আভা। পার্কের ধারে কালো কালো মরা গাছ থেকেও নূতন পাতা গজিয়েছে; কচি কচি পাতায় কাঁচা সবুজ রং এমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, মনে হয় যেন ইন্দ্রধনুর মাঝখানকার সবুজ রংটি কেটে এনে বসানো হয়েছে। সেদিন পার্কে যে কেউ গিয়েছে, প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য কুহক তাদের কারো চোখ এড়ায় নি। সকলেই সেদিন স্পষ্ট দেখ্‌লে কত মরা জিনিষ আজ প্রাণ পেয়েছে, ঝুলের মত কালো গাছের গুঁড়ির মধ্য থেকে কাঁচা সবুজ ফুটে বেরিয়েছে। শুধু তাই নয়, যারা একবার এই মৃত সঞ্জীবনীর লীলা প্রত্যক্ষ কর্‌লে, তাদের নিজেদের মধ্যেও কি যেন এক পরিবর্ত্তন এসে পড়লো। এই বাসন্তী মায়ার মধ্যে নিশ্চয় কোনো সংক্রামক শক্তি ছিল। প্রেমিক-যুগল গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে যেন আরো বেশী খুস', মনে মনে কেমন যেন আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। পুষ্টদেহ পথিক মাথার টুপি খুলে ফেল্লে,—খোলা টাকের উপর সূর্য্যকিরণ পড়ে' তাদের মন উদার হ'য়ে গেল, কারো বা হুইস্কি পান সম্বন্ধে, অফিসের সুন্দরী টাইপিষ্টের সম্বন্ধে, কারো বা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা সম্বন্ধে উঁচুদরের নানারূপ সংকল্প মনে উদয় হ'তে লাগলো। অপ্রাপ্তযৌবনা বালিকার দল এই সময় ছেলেদের ডাকে ভয় ভাবনার বিচার না করে' উৎফুল্ল হ'য়ে তাদের হাত ধরে' বেড়াতে বেরিয়ে গেল। মধ্যবয়সী ভদ্রলোকেরা পার্কের ভিতর দিয়ে গৃহাভিমুখে যেতে যেতে অনুভব করলে তাদের পাটোয়ারী মন হঠাৎ যেন মমতায় মুকুলিত হ'য়ে উঠলো ওই শুষ্ক গাছগুলির মত। ঘরের স্ত্রীর কথা তাদের মনে পড়ে' গেল, যদিও বিশ বছর আগে বিবাহ হ'য়ে গেছে, তবু আজ স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ স্নেহের প্লাবনে বুক ভরে' উঠলো। মনে মনে স্থির করলে,—আজ কিছু একটা উপহার কিনে নিয়ে যেতেই হবে। কি নেওয়া যায়? ফলের মোরব্বা এক বাক্স? মোরব্বা খেতে সে বড় ভালবসে। কিংবা 'রোডোডেণ্ড্রন্' ফুলের একটা ডালি? কিংবা—হঠাৎ মনে পড়ে' যায় আজ শনিবার—সব দোকান এখন বন্ধ। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে আবার মনে হয়, গৃহিণীর হৃদয়-কবাটও এখন বন্ধ; কারণ সে তো আজ এই পার্কের পল্লবোন্মেষিত গাছতলার পথে আসে নি! ঝিকিমিকি জলে নৌকাগুলি ভেসে যাচ্ছে, ছেলেরা চারিদিকে ছুটাছুটি করছে, যুবক-যুবতী জলের ধারে ঘাসের উপর বসে'ছ হাত ধরাধরি করে' এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের মন ম্রিয়মান হ'য়ে গেল, ভাবলে এমনিই মানুষের জীবন। একদিকে হৃদয় যখন খোলে, অন্যদিকে দোকান তখন থাকে বন্ধ, এই রকমই জীবন। মনে মনে আর একবার সংকল্প কর্‌লে এবার থেকে ভবিষ্যতে তারা নিজেদের মেজাজটা নরম করে' নেবে।

এই হাস্যোজ্জ্বল রৌদ্র ও নবোদ্ভিন্ন পল্লবরাজির কুহকের গণ্ডীর মধ্যে এসে যারা গভীরভাবে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছে, পিটার ব্রেট তার মধ্যে একজন। এখানে এসেই সে এমন মনমরা হ'য়ে গেল এবং নিজেকে যেমন একান্তভাবে একা বলে' বোধ করলে, এমন আর কখনো করে নি। চারিদিকে ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে তুলনায় তার অন্তস্তলের অন্ধকার গাঢ়তর হ'য়ে উঠলো। সে দেখ্‌লে মরা গাছেও পাতা ধরেছে, কিন্তু তার অন্তঃকরণ একেবারে মৃতপ্রায়, রিক্ত। সকলেই যোড়ে বেড়াচ্ছে, কেবল সে চলেছে একা। যদিও এই বসন্তকাল, যদিও এমন রৌদ্র-কিরণ, যদিও তা'তে আজ শনিবার, আবার কাল আসছে রবিবার—কে না এতে খুসী হয় এবং তারও খুসী হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু এমন দিনেও নিতান্ত উপায়হীন দুঃখীর মত সে ওই মোহময় 'হাইড্ পার্কে'র ভিতর অকারণ ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো।

মনকে আনন্দ দেবার জন্য সে কল্পনার আশ্রয় নিলে, যেমন বরাবর করে' থাকে। যথা, মনে করা যাক্, একটি চমৎকার মেয়ে তার ঠিক সাম্‌নে ওই পাথরের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে দৈবাৎ পা মুচকে পড়ে গেল, পিটার তখনি দৌড়ে গিয়ে তাকে তুলে ধরলে,—ক্ষতস্থানে জলপটি বেঁধে দিলে। ট্যাক্সি ভাড়া করে' তা'কে বাড়ী পৌছে দিলে (ভাড়ার পয়সাটা অবশ্য তার পকেটে থাকবে),—তখন দেখা গেল তার বাড়ী 'গ্রস্‌ভেনর স্কোয়ারে', আর সে একজন বড় লর্ডের দুহিতা। তারপর এদের দু'জনের খুব ভাব হয়ে গেল।…

কিংবা ছোট একটি ছেলে হঠাৎ ওই জলে ডুবে গেল, আর সে দৌড়ে গিয়ে তা'কে উদ্ধার করলে, ছেলেটির মা ধনী, এবং অল্পবয়সী, এবং বিধবা,—চিরদিনের জন্য ওর কাছে সে কৃতজ্ঞ হ'য়ে গেল, ক্রমে কৃতজ্ঞতা থেকে আরো কিছু দাঁড়িয়ে গেল। তবে মেয়েটি বিধবাই হওয়া চাই, পিটার যখনি এই কল্পনাটা করে, তখনি এ কথা বিশেষভাবে ধরে' নেওয়া থাকে। গর্হিত কোন কামনা কখনো সে করে না। তার বয়সটাও এখনো কাঁচা, আর ছেলেবেলা থেকে শিক্ষাদীক্ষা ভালই পেয়েছে।

কিংবা এমন কিছু চমৎকার দুর্ঘটনা নাই ঘটলো। হয়তো একটি মেয়ে বেঞ্চের একপাশে এমনিই বসে' আছে, মুখটি বড় শুক্‌নো, দেখেই মনে হয় যেন তার কেউ নেই। সাহসে ভর করে' ও তার কাছে গেল, মাথার টুপি খুলে অভিবাদন করলে, একটু হেসে বল্লে—"দেখ্‌ছি আপনি একা।" কথাগুলি খুব ভদ্রভাবেই বল্লে,—কোনো গ্রাম্য টান তা'তে রইলো না কিংবা কথা কইতে গেলেই তার যেমন তোৎলামি এসে পড়ে, তা' কিছু হোলো না। "দেখ্‌ছি আপনি তো একা। আমিও তাই। আপনার কাছে একটু বসি?" মেয়েটি শুধু একটু হাস্‌লে, ও সেখানে বসলো। তারপর কথায় কথায় অনেক কথা হোলো, ও জানিয়ে দিলে যে, ওর বাপ মা কেউ নেই, আছে একমাত্র এক বিবাহিতা ভগ্নী, সে থাকে 'রকডেলে।' আর মেয়েটি বল্লে—"আমারও কেউ নেই।" তাদের পরস্পরের একই অবস্থা, সুতরাং বন্ধন খুব দৃঢ় হোলো। আর কে যে কত দুঃখী, তা' পরস্পরকে জানালে। মেয়েটি কাঁদতে লাগ্‌লো। আর ও তাকে প্রবোধ দিয়ে বল্লে—আর কেঁদো না, এখন আমি তো রয়েছি।" আর তা'তে মেয়েটি একটু খুসী হোলো। আর তারপর তারা দু'জনে বায়স্কোপ দেখ্‌তে গেল। আর শেষকালে তাদের দু'জনের হয় ত বিয়েই হোলো। কিন্তু এই শেষের দিকটায় গল্পটা কিছু অস্পষ্ট হ'য়ে থাকে।

সত্যিকারের এমন দুর্ঘটনাও অবশ্য কোনোদিন হয় নি, আর সে যে সংসারে একা, এ কথাও কাউকে বল্‌তেও সা করে নি। একে তো সে ভয়ানক রকমের হ্যাংলা, আর দেখ্‌তেও সে খুব রোগা, চোখে চশমা পরে' থাকে, আর মুখে সর্ব্বদাই ব্রণ হয়, আর তার কোট-প্যাণ্টের কোনো ভাঁজ নেই, মাপেও অনেক খাটো হ'য়ে গেছে, আর তার পায়ের জুতাযোড়া সযত্নে বুরুশ করা থাক্‌লেও দেখ্‌তে অতি কদর্য্য।

সেদিন অপরাহ্ণে এই জুতাযোড়াই তার কল্পনা-স্রোতে একদম মাটি করে' দিলে। মাথা নীচু করে' একমনে চল্‌তে চল্‌তে সে যখন জল্পনা কর্‌ছিল সেই লর্ডের মেয়েটিকে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে কি সব কথা বল্‌বে, তখন

হঠাৎ নজর পড়লো তার পায়ের কদাকার কালো জুতো-যোড়ার দিকে, যেন তার মানসলোকের স্বচ্ছ ছবিগুলির ভিতর থেকে হঠাৎ এই দুটো কুৎসিত জিনিষ বেরিয়ে এলো। কি বিশ্রী দেখ্‌তে! বড়লোকের পায়ে কেমন সব সুগঠিত সুন্দর জুতা থাকে, তার তুলনায় এগুলো কি ঘৃণ্য! নতুন যখন কেনা হয়েছিল, তখ্‌নি দেখ্‌তে কদাকার ছিল, পুরানো হ'য়ে গিয়ে আরো একেবারে বিশ্রী দেখ্‌তে হয়েছে। পায়ে দিয়ে দিয়ে একেবারে দুম্‌ড়ে তুব্‌ড়ে বেজায় কুঁচকে গেছে। পালিশের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য ফাটা দাগ যেন জাল বুনে রেখেছে। বাঁ পায়ের জুতোটার মাঝখানকার সেলাই ফাঁক হ'য়ে গিয়েছিল, সেটা আবার মেরামত করানো হয়েছে, তার আকাবাঁকা সেলাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফিতাগুলো টাইট করে' বেঁধে বেঁধে গর্ত্তের চোখগুলোর কালো রং উঠে গিয়ে পিতল বেরিয়ে পড়েছে।

ছি ছি, পায়ের জুতোও এমন বিশ্রী! এ কি কম দুঃখের বিষয়! এখনও অনেকদিন এই জুতো নিয়েই চালাতে হবে। পিটার তার আয় ব্যয়ের হিসাব দিনের মধ্যে দুশো বার করে, মনে মনে আবার তাই করতে লেগে গেল। রোজ যদি সে জলখাবারের খরচ থেকে দেড় পেনী করে' বাঁচাতে পারে, দিন ভালো থাক্‌লে যদি সে সকালবেলাও 'বাসে' না গিয়ে হেঁটে অফিস যায়... কিন্তু যতরকম ধরাকাট করে যতবারই সে হিসাব করুক, হপ্তায় তার যে সাড়ে সাতাশ পেনী, সেই সাড়ে সাতাশ পেনীই সম্বল। জুতার দাম নেহাৎ কম নয়, যদিই বা খরচ বাঁচিয়ে শেষ পর্য্যন্ত না হয় একজোড়া নতুন জুতাই কিনে ফেলে, কিন্তু পোষাকটার কথাও তো ভাবতে হয়! এই সব নানা দুঃখের উপর আবার এই বসন্তকাল; চারিদিকে নব পল্লববাশি, তা'তে এমন রৌদ্র ফুটে উঠেছে, সকলেই যোড়ে যোড়ে বেড়াচ্ছে, এর মধ্যে সেই কেবল একা। বাস্তব আজ তার কাছে নিদারুণ হ'য়ে উঠলো, কিছুতেই কি এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই! যখনই সে একে অতিক্রম করে' পালাতে চায়, তখনই এই জুতাযোড়া তার পিছু নেয়, বারবার তা'কে আপন দুঃখ-দারিদ্র্যের চেতনার মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

দুই

দু'টি মেয়ে হ্রদের তটবর্ত্তী ভিড়ের রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে একটি সরু পথ ধরে' টিলার উপর যেদিকে 'ওয়াট্‌সে'র প্রতিমূর্ত্তি আছে, সেই দিকে উঠতে লাগ্‌লো। পিটার পিছু নিলে। এদের পিছনের পরিত্যক্ত বাতাসে উৎকৃষ্ট এসেন্সের সুগন্ধ পাওয়া গেল। সে গন্ধ পিটার প্রাণ ভরে' আঘ্রাণ করলে,—তার বুকের ভিতরটা নূতনতর আবেগে টিপ্‌ টিপ্‌ করে' উঠলো। তার মনে হোলো এরা বুঝি সাধারণ মানুষ নয়,—জগতের মধ্যে যা' কিছু রমণীয় ও যত কিছু দুর্ল্লভ তা' এদের মধ্যেই আছে।

জলের তটে বেড়াবার পথে হঠাৎ সে এদের লক্ষ্য করেছে, এদের উদ্ধত উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য পলকমাত্রেই তা'কে অভিভূত করেছে। তখনি পথ ছেড়ে তাদের পিছু পিছু চলেছে। কি উদ্দেশ্যে? তা' সে নিজেই জানে না। কেবল তাদের কাছে কাছে থাক্‌বে এইটুকু মাত্র বাসনা; মনে মনে বোধ হয় আশা করে যে, কোনো অভাবনীয় উপায়ে এমন একটা আশ্চর্য্য কিছু ঘটে যাবে, যাতে একেবারে ওদের মাঝখানে তা'কে এনে ফেল্‌বে।

বুভুক্ষের মত সে ওদের সৌরভটুকু ঘ্রাণ করতে লাগ্‌লো; নিতান্ত যেন মরিয়া হ'য়ে সে ওদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো,—ওদের প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগ্‌লো। দু'জনেই দীর্ঘাকৃতি। একজনের গায়ে ছাই রঙের পোষাক, তা'তে গাঢ়তর ছাই-রঙের পালকের পাড় দেওয়া। অপর জনের পোষাক সমস্তটাই পালকের; দু'-এক ডজন বিলাতী খ্যাকশিয়ালের সোনালি চামড়া দিয়ে তৈরী সেই পোষাক এই শীতল অপরাহ্নে তার দেহের উত্তাপ রক্ষা করছে। একজনের মোজা ছাই রঙের, অপর জনের মোজা বাদামী। একজনের পায়ের জুতা ধূসর চামড়ার, আর একজনের জুতা সাপের চামড়ার। সঙ্গে একটি কাল রঙের ছোট ফরাসী কুকুর কখনো বা পিছু পিছু কখনো বা আগু নিয়ে

চলেছে। কুকুরটির গলার কলার নেকড়ে বাঘের রোঁয়া দিয়ে চারিদিকে ঝালরের মত ঘেরা।

পিটার এতটা কাছ ঘেঁষে চলেছে, যাতে পথটা নির্জ্জন হ'লেই ওদের কথাবার্ত্তা স্পষ্ট শুন্‌তে পায়। এদের মধ্যে একটি মেয়ে কূজনকণ্ঠী, অপরটির গলা একটু ভাঙা ভাঙা।

শোনা গেল গলাভাঙা মেয়েটি বল্‌ছে—"কি চমৎকার মানুষ! বাস্তবিক কি সুন্দর লোকটি!"

কূজনকণ্ঠী জবাব দিল—"এলিজাবেথও তাই বলেছিল।"

ভাঙা গলা বল্‌তে লাগ্‌লো—"আর কি চমৎকার পার্টি!" সমস্তক্ষণ তিনি হাসিমুখেই রইলেন। সকলেই খুব আমোদপ্রমোদ করলে। যখন বিদায় নেবার সময় হোলো আমি বল্‌লাম—এখান থেকে আগে হেঁটেই বেরুনো যাক. বরাতে থাক্‌লে রাস্তায় নিশ্চয় একটা ট্যাক্সি জুটে যাবে। এই শুনে তিনি বল্‌লেন—রাস্তায় না খুঁজে ওঁর বুকের ভিতর খুঁজলে অনেক ট্যাক্সি মিলবে। সেখানে না কি কত ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। এপর্য্যন্ত তার কোনটাই ভাড়া হয় নি।"

দু'জনেই হেসে উঠ্‌লো। ছোট ছেলেদের একটা দল এ সময় পিছন থেকে দৌড়ে এসে ওদের পাশ দিয়ে চলে' গেল। তাদের গোলমালে এরপর কি কথা হোলো তা' আর শোনা গেল না। পিটার মনে মনে ছেলের দলকে অভিসম্পাত দিলে। হতভাগা ছেলেগুলো এমন একটা নূতন অভিজ্ঞতা একদম মাটি করে দিলে! আর সে কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা! কি আশ্চর্য্য বাহুল্য ও বৈচিত্র্যময় জীবন এদের! পিটারের কবিত্বময়ী কল্পনা এযাবৎ কেবল গ্রাম্যজীবনই এঁকেছে। এমন কি সেই লর্ডের মেয়ের সম্বন্ধেও সে ভাবতো তাকে নিয়ে কোনো নির্জ্জন পল্লীতে গিয়ে বাস করবে। যে জগতে এমন সব চমৎকার পার্টি দেওয়া হয়, যেখানে সকলেই আমোদ-প্রমোদে মাতে, আর চমৎকার পুরুষরা এমন সব রূপসী দেবকন্যাদের বলে তাঁদের হৃদয়-পথে ট্যাক্সির খোঁজ করতে, এমন জগৎ তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই প্রথম সে তার কিছু আভাষ পেলে। নূতনধরণের এমন উদার জগতের সন্ধান পেয়ে সে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। এখন তার জীবনের একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাতে সে ওই বিচিত্র জগতে প্রবেশ করতে পারে এবং যে কোনো উপায়েই হোক নিজেকে ওই দেবকন্যাদের সংশ্রবে জড়িত করে ফেলতে পারে। ধর, যদি এমন হয়, ওই গাছের উঁচু শিকড়ে হোঁচট খেয়ে ওরা দুজনেই এক সঙ্গে পা মচকে পড়ে যায়, কিংবা যদি··· কিন্তু ওরা দুজনেই অবলীলাক্রমে শিকড়গুলি ডিঙিয়ে চলে গেল। তারপর হঠাৎ সে দেখতে পেলে আর এক আশা আছে, ওই কুকুরটার দ্বারাই তার কামনা সফল হবে।

কুকুরটা সোজা পথ ছেড়ে ডান দিকে কিছু দূরে একটা 'এল্‌ম' গাছের তলায় গিয়ে মাটি শুঁকতে শুঁকতে একস্থানে তার আগমনের কিছু চিহ্ন রেখে দিলে। পরম অবজ্ঞাভরে তার রে গোঁ গোঁ শব্দে আস্ফালন করতে করতে মাটি আঁচড়ে সেখানকার খড়কুটো সরিয়ে ফেলছিল, এমন সময় আর একটি হলদে রঙের আইরিস্ টেরিয়ার এসে একবার সেই গাছের গোড়াটা শুঁকে নিয়ে ওদের কুকুরটির গা শুঁকতে লাগ্‌লো। এও তখন মাটি আঁচড়ানো বন্ধ করে তাকে একবার শুঁকে নিলে। তারপর অতি সাবধানে পরস্পরের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে দুজনেই দুজনের গা শুঁকতে লাগলো এবং গোঁ গোঁ করতে সুরু করলে। পিটার প্রথমে নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। মন তখন অন্যদিকে ব্যস্ত, কুকুর দেখবার তার সময় নয়। কিন্তু হঠাৎ যেন দিব্যদৃষ্টিতে তার বোধ হ'ল যে, এরা দুটোতে মারামারি বাধিয়ে দিতে পারে। তা যদি হয় তা হলেই তার কপাল খুলে যাবে। একদৌড়ে ছুটে গিয়ে প্রবল বিক্রমে সে এদের ছাড়িয়ে দেবে। হয় তো কুকুর তাকে কামড়েও দিতে পারে। তা হোক, সে তো আরো ভাল। কামড়ে দিলে এই দেবকন্যাদের কৃতজ্ঞতা বরং আরো বেশী করে পাওয়া যাবে। একমনে সে কামনা করতে লাগলো কুকুর দুটো যেন ঝগড়াই করে। এখন যদি মেয়ে দুটি কিংবা টেরিয়ার কুকুরটার মনিব এদের এই অবস্থায় দেখতে পায় তা হলেই মুস্কিল, তা

হলে সাবধান হয়ে এখনি ওদের সরিয়ে নেবে। সে কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো, "হে ভগবান, এ সময় যেন এদের কেউ ডাক দিয়ে না নেয়। হোক দুটোতে লড়াই, দোহাই যীশুখৃষ্টের। আমেন্।" ছেলেবেলা থেকে পিটার ধর্ম্মশিক্ষা পেয়ে এসেছে।

ইতিমধ্যে ছেলের দল দূরে চলে গেছে। মেয়ে দুটির কথাবার্ত্তা আবার বেশ শ্রুতিগোচর হ'ল।

কূজনকণ্ঠী বলছে—"লোকটা এমন নাছোড়বান্দা, আমি যেখানেই যাবো সেখানেই সে গিয়ে হাজির হবে, কোথাও এক পা যাবার উপায় নেই। কোনো অপমানই তার গায়ে বেঁধে না। আমি যতই বলি যে, জু'দের আমি ঘৃণা করি, অতি কদাকার বোকা মূর্খ বেহায়া অসভ্য বলে যতই তাকে গাল দিই, কিছুতেই তার চৈতন্য হয় না।

গলাভাঙা মেয়েটি বল্লে,—"যাই হোক, তাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নিতে তো পারিস!'

কূজনকণ্ঠী জবাব দিলে—"তা'তো নিই করিয়ে।"

"তা হলে ত ভাল কথাই।"

"কিছু ভাল বটে, কিন্তু তাইতো আর যথেষ্ট নয়!" এরপর দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পিটার একমনে প্রার্থনা করছে—"হে ভগবান, এরা যেন ওদিকে না যায়।"

কূজনকণ্ঠী চিন্তামগ্নভাবে বলছিল—"পুরুষরা যদি এই কথাটা বোঝে যে—"

এমনসময় একটা ভয়ানক ঘেউঘেউ ও গর্‌গর্ শব্দে তার কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। যেখান থেকে শব্দটা এসেছে, দু'জনেই সেদিকে ফিরে চাইলে। হঠাৎ ব্যগ্র হ'য়ে উঠে দু'জনেই একযোগে চেঁচিয়ে উঠলো,—"পঙ্গো!" তারপর আবো জোরে ডাক দিলে—'পঙ্গো!"

কিন্তু কে তাদেব ডাক শোনে! পঙ্গো আর সেই টেরিয়ারটা তখন খুব ঝটাপটি করছে, ডাক শোনাব কোনো সম্ভাবনাই নেই।

"পঙ্গো! পঙ্গো!"

ওদিক থেকে "বেন্নি!" ছোট একটি মেয়ে আর তার সঙ্গের একটি স্থুলাঙ্গিনী নার্স তাদের টেরিয়ারটাকে বৃথাই ডাকতে লাগলো—"বেন্নি,--আয় এদিকে!"

এইবার সেই শুভ মূহূর্ত্ত, একাগ্র মনে যা কামনা করছিল সেই চরম সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। পিটার আবেগভরে কুকুর দুটোর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

"দূর হ' পাজি" বলে' চেঁচিয়ে উঠে টেরিয়ার কুকুর-টাকে মারলে এক লাথি। টেরিয়ারটাই হোলো শত্রু, আর ফরাসী কুকুরটা, সেটা এদের কুকুর,—সে তো পরম মিত্র, তাকেই ও সাহায্য করতে গেছে। "দূর হ' দূর হ'।" উত্তেজনার মাথায় ও তখন তোৎলামি ভুলে গেছে। 'দ' অক্ষর উচ্চারণ করা তার পক্ষে কখনই সহজ নয়, কিন্তু এখন তার 'দূর হ' উচ্চারণ করতে একটুও বাধছে না। কুকুর দুটোর ল্যাজ ধরে ঘাড় ধরে তাদের ছাড়িয়ে দেবার বহু চেষ্টা করতে লাগলো। মধ্যে মধ্যে টেরিয়ার কুকুরটার উপর লাথি চালাতে লাগলো। কিন্তু তবু ফরাসী কুকুরটাই তাকে কামড়ে দিলে। বোকা কুকুরটা বুঝতেই পারে নি যে, ও তার তরফেই লড়তে এসেছে। কিন্তু পিটারের তাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। উত্তেজিত অবস্থায় কোনো যন্ত্রণাও টের পেলে না। ওর বাঁ-হাতে যেখানে দাঁত বসে সারি সারি সারি গর্ত্ত হয়ে গেছে সেখান থেকে রক্ত ফুটে বেরোতে লাগলো।

"উ—উ"—কূজনকণ্ঠী চীৎকার করে উঠলো, যেন তার নিজের হাতখানাই কামড়ে দিয়েছে।

"সাবধান"—উৎসুক আগ্রহে ভাঙাগলা তাকে সতর্ক কববার জন্য চেঁচিয়ে উঠলো—"সাবধান।"

এদের গলার আওয়াজ পেয়ে তার আরো যেন রোখ বেড়ে গেল। আরো জোরে সে কুকুর দুটোকে টানাটানি করতে লাগলো; শেষে একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য সে কুকুব দুটোকে এমনভাবে ছাড়িয়ে দিলে, যাতে কেউ কাউকে মুখের কাছে না পায়। এই সুযোগে পিটার ফরাসী কুকুরটার ঘাড়ের চামড়া উঁচু করে ধরে একেবারে শূন্যে তুলে ফেল্‌লে, কুকুরটা ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে প্রবলবেগে পা ছুঁড়তে লাগলো আর চেঁচাতে লাগলে। টেরিয়ার কুকুরটা তার সাম্‌নে এসে ঘেউঘেউ করতে করতে এক একবার দাঁড়িয়ে উঠে লাফ দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পা কামড়ে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু পিটার

অমিতবিক্রমের ভঙ্গীতে যতটা উঁচু পর্য্যন্ত তার হাত যায় ততটা উঁচুতে তুলে ধরে আস্ফালনরত পঙ্গোকে বিপদ থেকে প্রাণপণে রক্ষা করছে। টেরিয়ারটাকে এক একবার পা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে; সেই নার্স‌টি আর ছোট মেয়েটি বুদ্ধি করে এই সময় পিছনদিক থেকে এসে কুকুরটার কলারে শিকল আটকে দিয়ে টেনে ধরলে। খুব জোরে তারা তাকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টানতে লাগলো, সে চার পা দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করতে লাগলো এবং চেঁচাতে লাগলো, গলায় টান পড়ে তার আওয়াজ ক্ষীণ হ'য়ে এলো। এদিকে ছয়ফুট উঁচুতে ঝুলতে ঝুলতে পঙ্গো বৃথাই ছট্‌ফট্ করতে থাকলো।

পিটার তখন মুখ ঘুরিয়ে মেয়ে দুটির সম্মুখীন হ'য়েছে। গলাভাঙা মেয়েটির চোখ দুটি ছোট, মুখখানি যেন বিষণ্ণ। কূজনকণ্ঠি কিছু পুষ্টদেহা, শ্বেতবর্ণা, নীলাক্ষি। পিটার একবার এর দিকে একবার ওর দিকে চেয়ে চেয়ে স্থির করতে পারলে না কে বেশী সুন্দর।

এবার সে পঙ্গোকে নামিয়ে দিলে। "এই নিন আপনাদের কুকুর"—এই কথাটাই বল্‌তে গেল। কিন্তু এই জ্যোতির্ম্ময়ীদের সৌন্দর্য্য দেখে তার সমস্ত আত্মচৈতন্য একেবারে ফিরে এসেছে, সেই সঙ্গে তার তোৎলামিও ফিরে এসেছে। "এই নিন আপনাদের—" বলে আর কুকুর কথাটি বলতে পারলে না। 'ক' অক্ষরটা তার পক্ষে চিরকালই কঠিন।

যে সব কথা কঠিন অক্ষর দিয়ে আরম্ভ হয়, তার বদলের নানা রকম সহজ কথা পিটারের ঠিক করা আছে। যথা,—বেড়ালকে সে বরাবর 'পুসি' বলে। ছেলেমানুষী দেখাবার জন্যই যে একথা বলে তা নয়, 'ব' উচ্চারণ করার চেয়ে 'প' উচ্চারণ করা তার পক্ষে সহজ। ধূলোকে সে বলে 'মাটির গুঁড়ো।' সে কালের কবিরা যেমন অনুপ্রাসের খাতিরে আগের কথার সঙ্গে পরের কথার মিল রাখতে গিয়ে কবিতায় নানারকম অপ্রচলিত অদ্ভুত শব্দের ব্যবহার করতো, সেও শব্দ নির্ব্বাচনে তেমনি দক্ষ হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু যেখানে তাদের মত অতটা স্বাধীনতা খাটানো সম্ভব হয় না, অর্থাৎ, যেখানে শব্দটি খুব কঠিন কিন্তু তার বদলে গদ্যে ব্যবহারের উপযুক্ত কোনো কথাই আর খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে সে ওই কথার ইংরাজী অক্ষরগুলি পরে পরে বানান করে বলে দিত। যেমন,—চায়ের কাপ্‌কে সে 'মগ' বল্‌বে কি সি, ইউ, পি বলবে তার কোনো স্থিরতা ছিল না। আর ডিমকে কেবল এক 'আণ্ডা' বলা যেতে পারে, কিন্তু এ কথাটা ব্যবহারে চলে না, কাজেই এটা ইংরাজিতে বানান করে বলতো ই, জি, জি।

বর্ত্তমানে সামান্য 'কুকুর' কথাটাই তার আটকে গেছে। কুকুরের বদলে অন্য অনেক নাম পিটারের জানা আছে। 'ক'র চেয়ে 'প' অক্ষর অনেকটা সহজ, সুতরাং উত্তেজিত না হ'লে সে অনায়াসে 'পপি' বলতে পারতো। কিন্তু মেয়ে দুটির সামনে সে এমন বিচলিত হয়ে পড়েছে যে, এখন তার পক্ষে 'ক' বলাও যেমন অসম্ভব, 'প' বলাও তেমনি, 'হ' বলাও তেমনি। প্রথমে 'কুকুর', তারপর 'পপি', তারপর 'হাউণ্ড' বলার চেষ্টা করতে গিয়ে সে দারুণ অস্থির হয়ে উঠলো। তার মুখখানা লাল হয়ে উঠলো, বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হোলো।

"এই নিন আপনাদের ছানা"—শেষ পর্য্যন্ত এই কথাই বলা সম্ভব হোলো। সে বুঝতে পারলে যে, কথাটা স্বাভাবিক হোলো না। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন কথা বলার উপায় ছিল না।

"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ"—কূজনকণ্ঠী বল্লে।

গলাভাঙা মেয়েটি বল্লে—"আশ্চর্য্য—যা আপনি করলেন, তা অতি আশ্চর্য্য। কিন্তু আপনার হাতটা বোধ হয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।"

"ও কিছু নয়-নয়" বলেই তাড়াতাড়ি রুমালখানা হাতে জড়িয়ে হাতটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে।

কূজনকণ্ঠি এতক্ষণে পঙ্গোর গলায় চেন লাগিয়ে দিয়েছে। বল্লে—"এবারে ওকে ছেড়ে দিন।"

পিটার একেবারে তাকে ছেড়ে দিলে। ছাড়া পাওয়া মাত্র কুকুরটা আবার আস্ফালন করে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তেড়ে গেল। তখনি গলায় বাধা পেয়ে পিছনের

পায়ে ভর করে' দাঁড়িয়ে উঠলো এবং এই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগ্‌লো।

গলাভাঙা মেয়েটি বল্লে—"ঠিক বলছেন কিছু নয়? দেখি তো একবার?"

নিতান্ত অনুগতভাবে পিটার রুমাল খুলে নিয়ে, হাতটা বাড়িয়ে দিলে। মনে মনে জান্‌লে, যেমনটি সে আশা করেছিল, ঠিক্ তেমনিই সব ঘট্‌ছে। কিন্তু হঠাৎ নিজের হাতের দিকে সভয়ে চেয়ে দেখ্‌লে, যে নখগুলো অত্যন্ত অপরিষ্কার। হায় রে, বেরোবার সময় যদি হাত দু'টো ধুয়ে আসতো! এরা কি মনে করবে? মুখ লাল করে' সে হাতখানা টেনে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু গলাভাঙা মেয়েটি ছাড়লে না।

"দাড়ান, দাড়ান!" একটু দেখে নিয়ে বল্লে—"বিশ্রী কামড়ে দিয়েছে যে!"

কূজনকণ্ঠীও হাতের উপর ঝুঁকে দেখছিল,—সে বল্লে "কি ভীষণ! আমি বড়ই দুঃখিত যে, আমারই এই হতভাগা কুকুরটা আপনাকে ·····"

গলাভাঙা তাকে বাধা দিয়ে বল্লে—"এঁকে এখনই কোন ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে দাও।"

এই বলে' সে হাত ছেড়ে দিয়ে তার মুখের দিকে চাইলে।

"চলুন ডাক্তারখানায়"—বলে কূজনকণ্ঠীও তার মুখের দিকে চাইলে।

একজনের আয়ত নীল চক্ষু, আর একজনের সঙ্কীর্ণ চক্ষুতে সবুজ রংয়ের গোপন আভাস,—যার দিকেই চায় পিটারের ধাঁধা লেগে যায়। ওদের দিকে চেয়ে কেবল বোকার হাসি হাসে আর বোকার মত মাথা নাড়ে। সঙ্কোচের সঙ্গে আবার রুমালটা জড়িয়ে হাতটি ওদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখ্‌লে।

আবার সে বল্‌লে—"ও কিছু ন নয়।"

"না না, আপনাকে যেতেই হবে—"গলাভাঙা মেয়েটি বল্‌লে।

কূজনকণ্ঠীও জোর করে বল্‌লে—"হাঁ, যেতেই হবে।"

তা সত্ত্বেও সে বল্‌লে—"কিছুই তো ন-নয়।" সে ডাক্তারখানায় যেতে চায় না। সে ওদের সঙ্গে থাক্‌তেই চায়।

কূজনকণ্ঠী তখন গলাভাঙার দিকে চাইলে। তাড়াতাড়ি খুব চাপাগলায় ফরাসী ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"ছেলেটিকে কি দেওয়া যায় বল্ তো?"

গলাভাঙা মেয়েটি অনিশ্চিতের ভঙ্গীতে কাঁধ নেড়ে ফরাসীতেই বল্‌লে—"কিছু দিতে গেলে ও হয় তো অসন্তুষ্ট হবে।"

"তাই না কি?"

ভাঙাগলা একবার চকিতে পিটারের দিকে চেয়ে দেখলে,—অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টিতে তার সস্তা টুপি থেকে পায়ের সস্তা জুতা পর্য্যন্ত, ব্রণের দাগে মলিন মুখ থেকে মলিন হাত দু'খানা পর্য্যন্ত, লোহার ফ্রেমের চসমা থেকে চামড়ার ঘড়ি-চেনটা পর্য্যন্ত একবার দেখে নিলে। পিটার দেখলে সে তার দিকেই চেয়ে আছে,—স্মিত লজ্জিত হাসিতে তার মুখটা ভরে' গেল। আহা কি সুন্দর! ওরা দু'জনে কি কথা বলাবলি করলে? ওকে চায়ের নিমন্ত্রণ করবে কি না তাই বোধ হয় পরামর্শ করছে! এই ধারণা মনে হতেই সে ধরে' নিলে নিশ্চয়ই তাই হবে। স্বপ্নে সে যা দেখে, এখন মন্ত্রের মত তাই অবিকল ফলে' যাচ্ছে। মনে মনে ভাবতে লাগলো, তার বুকের পথে ট্যাক্সি খোঁজার কথাটা এইবার একবার সেও বলে দেখতে পারে কি না!

গলাভাঙা তার সঙ্গিনীর দিকে ফিরলো। আর একবার কাঁধ নেড়ে বল্লে—"ঠিক্ করে' কিছু বল্‌তে পার্‌ছি না।"

কূজনকণ্ঠি প্রস্তাব করলে—"যদি এক পাউণ্ড দেওয়া যায়?"

গলাভাঙা মেয়েটি ঘাড় নাড়লে—"যা' তোমার খুসী।" তারপর তার সঙ্গিনী যখন একপাশে ঘুরে তার মণিব্যাগ খুল্লে, তখন সে অন্যমনস্ক করবার উদ্দেশ্যে পিটারকে সম্বোধন করে' কথা কইতে লাগলো।

একটু হেসে বল্লে—"আপনার ভীষণ সাহস কিন্তু।"

পিটার তার উত্তরে কেবল মাথাই নাড়ে, মুখ লাল

করে, মাথা নীচু করে,—সেই স্থির অচঞ্চল আত্মচেতন দৃষ্টির সামনে চাইতে পারে না। তার দিকে চাইবার খুবই ইচ্ছা; কিন্তু যখনই চাইতে যায়, তার অকম্পিত দৃষ্টির উপর নিজের দৃষ্টি স্থির রাখ্‌তে পারে না।

মেয়েটি বল্‌লে—"কুকুর পোষা বোধ হয় আপনার অভ্যাস আছে। আপনার নিজের কুকুর আছে না কি?"

"ন না"—পিটার জবাব দিলে।

"ও, তা' হ'লে তো আপনার পক্ষে এটা ভীষণ সাহসের কাজ বলতে হবে।" ইতিমধ্যে কূজনকণ্ঠী ব্যাগ থেকে যা' দেবার তা' হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে।দেখে ওর হাতটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে খুব মিষ্ট হাসি হেসে—"আচ্ছা, তা' হ'লে আসি,—গুডবাই। আমরা আপনার কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ জান্‌বেন,—খুব ভীষণ কৃতজ্ঞ" দু'বার করে এই কথাটা বল্লে। বল্‌তে বল্‌তে সে ভাবলে একটু 'ভীষণ' কথাটা এতবার বল্লে কেন। সাধারণতঃ ওই কথা সে ব্যবহার করে না। হয়তো এই লোকটির সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌তে এই রকম কথাই উপযুক্ত। নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে কথা কইতে তার বেশ মন খুলে যায়, তখন স্কুলের ছেলেদের মত ঝোঁকের মাথায় যে সব চটুলশব্দ প্রয়োগ করে, তা' খুব মাৰ্জ্জিত নয়।

"গু-গু-গু..." পিটার সুরু কর্‌লে। বড় সুখের স্বপ্ন ভেঙে হঠাৎ যেন সে জেগে উঠলো। অত্যন্ত কাতর হয়ে ভাব্‌লে, এখনই বুঝি ওরা চ'লে যায়! এখনিই কি চ'লে যাবে, তাকে একবার চা খেতেও বলবে না কিংবা ওদের ঠিকানাটাও দিয়ে যাবে না? সে বল্‌তে চাইলে,—আর একটু থাকো, আর একটু তোমাদের দেখি। কিন্তু সে জানে, যা বলতে চাইবে তা' উচ্চারণ কর্‌তে পারবে না। ভয়ানক কোনো বিপদ চোখের সম্মুখে আসন্ন দেখেও যদি তার প্রতিরোধের কোনো উপায় করতে না পারে, তা' হ'লে মানুষের যে অবস্থা হয়, মেয়েটির গুডবাই বলাতে পিটারের এখন সেই অবস্থা। অস্ফুটস্বরে সে বলতে গেল "গু-গু" কিন্তু এই মারাত্মক গুডবাই শব্দ শেষ পর্য্যন্ত বল্‌তে পাবার আগেই সে দেখলে অপর মেয়েটি তার হাত চেপে ধরেছে।

কূজনকণ্ঠী তার করমর্দ্দন করে' বল্‌তে লাগলো—"অদ্ভুত আপনার সাহস, বাস্তবিকই অদ্ভুত! কিন্তু নিশ্চয় আপনি ডাক্তারখানায় গিয়ে এখনই ওষুধ লাগিয়ে নেবেন, দেরী করবেন না। আচ্ছা তা' হ'লে গুডবাই,—আপনাকে অনেক, অনেক ধন্যবাদ!" শেষ কথাগুলি বলতে বলতে একখানি ভাঁজ করা একপাউণ্ডের নোট তার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে তার আঙুলগুলো মুড়ে জোর করে' মুঠোটা বন্ধ করে' দিলে। তারপর আবার বলে—"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ!"

মুখচোখ লাল করে' পিটার মাথা নাড়লে। "না না" বলতে বলতে নোটখানা তা'কে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু মেয়েটি আবো মিষ্ট হাসি হেসে বল্লে—"হাঁ, হাঁ, অনুগ্রহ করুন।" এই কথা বলেই আর একটুও অপেক্ষা না করে' মুখ ফিরিয়ে গলাভাঙা মেয়েটির পিছু পিছু দৌড়ে চলে' গেল,—চেন ধরে অনিচ্ছুক পঙ্গোকে টানতে টানতে নিয়ে গেল, আর সেটা ক্রমাগত ঘেউ ঘেউ করতে করতে চল্লো।

খানিকটা পর্য্যন্ত গিয়ে একটু থেমে সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে বললে—"ঠিক দিয়ে এসেছি।"

গলাভাঙা মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে—"নিলে না কি?"

মাথা নেড়ে সে জবাব দিলে—"হাঁ, নিয়েছে।" তারপর গলার স্বর বদলে নিয়ে বল্‌লে—"তারপর, আমরা কি কথা বলছিলাম, আর এই হতভাগা কুকুরটা সব গোল বাধিয়ে দিলে?"

পিটার যতক্ষণে আবার বলতে পারলে—"ন-না", ততক্ষণে মেয়েটি অনেকটা দূরে চলে' গেছে। পিছু পিছু দু'পা এগিয়ে গিয়ে সে থেমে গেল। গিয়ে কোনো লাভ নেই। সে যদি কিছু বোঝাবার চেষ্টা করতে যায়, সেটা বরং আরো অপমানজনক হয়ে দাঁড়াবে। কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোতে দেরী হ'য়ে যাবে, আর ওরা তাতে আরো ভুল বুঝবে, মনে করবে হয়তো

আরো কিছু চায়। হয়তো আবার এক পাউণ্ড হাতে গুঁজে দিয়ে আবার দৌড়ে পালাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল, ততক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইলো, তারপর ধীরে ধীরে জলের ধারে ফিরে গেল।

কল্পনায় সে মনে মনে সমস্ত দৃশ্যটার পুনরভিনয় করতে লাগলো,—বাস্তবিক যেমন ঘটেছে তা' নয়, যা' ঘটা উচিত ছিল তাই। যথা,—কুজনকণ্ঠী যখন নোটটি তার হাতে গুঁজে দিলে, তখন সে একটু হেসে অতি বিনয়ের সহিত সেটা ফেরৎ দিয়ে বল্‌লে—"আপনি ভুল বুঝেছেন; এ-রকম ভুল বোঝাই অবশ্য স্বাভাবিক, তা' আমি মানি! আমায় দেখ্‌তেও দরিদ্র, আর বাস্তবিকই আমি দরিদ্র; কিন্তু তবু জানবেন যে, আমি ভদ্রলোক। আমার বাবা রক্‌ভেলের ডাক্তার ছিলেন। আমার মাও একজন ডাক্তারের মেয়ে ছিলেন। যতদিন তাঁরা বেঁচে ছিলেন, ততদিন আমি ভাল স্কুলে রীতিমত লেখাপড়া করেছি। আমি যখন ষোলো বছরের, তখন তাঁরা প্রায় একসঙ্গেই দু'জনে মারা যান। সুতরাং, পড়া শেষ না করেই আমায় কাজে লাগ্‌তে হয়। বুঝে দেখুন, আমি আপনাদের এ পয়সা নিতে পারি না।" তারপর আরো সাহস সঞ্চয় করে' একটু নিম্নস্বরে এই কথাটুকু বল্‌লে—"আপনাদের একটু উপকার করা হবে ভেবেই এমনিভাবে কুকুর-ছুটোকে ছাড়িয়েছি। আপনারা এমন সুন্দর, এত চমৎকার! আমি যদি ভদ্রলোক নাও হই, তবুও আপনাদের কাছে কিছু নেওয়া অসম্ভব।" "কুজন-কণ্ঠী তার কথাগুলি শুনে ভারী দুঃখিত হোলো, তার হাত ধরে জানালে, সে কত দুঃখিত। ও তখন তা'কে বুঝিয়ে দিলে যে, এরকম ভুল করা তার মোটেই অন্যায় হয় নি। মেয়েটি তখন ওকে জিজ্ঞাসা করলে তাদের সঙ্গে গিয়ে এক কাপ্ চা খেতে ওর কোনো আপত্তি হবে কি না। এরপর থেকে পিটারের কল্পনা অস্পষ্টতর ও মধুরতর হ'তে হ'তে শেষে সেই চিরপরিচিত পুরানো স্বপ্ন এসে উপস্থিত হোলো—সেই লর্ডের মেয়ে, সেই কৃতজ্ঞ বিধবা, আর সেই নিবান্ধব মেয়েটি; কিন্তু সব স্বপ্নের মধ্যেই এই দেবকন্যা দু'টি জড়িত। তাদের মুখগুলি আর আবছায়া নয়—এখন তা' সুস্পষ্ট এবং প্রকৃত।

এইসব স্বপ্ন দেখার মধ্যে সে অবশ্য জান্‌ছে যে, ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে এভাবে ঘটে নি। সে জানে যে, সে কোনো কথা কইতে পারবার আগেই মেয়েটি চলে' গেছে, আর যদি সে দৌড়ে গিয়ে তাদের ধরতো, তবু কোনো কথাই সে বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌তো না। যেমন তা'কে বল্‌তেই হোতো যে, তার বাবা চিকিৎসার কাজ কর্‌তেন, ডাক্তার কথাটা কিছুতেই সে উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌তো না। আর তিনি মারা গেছেন বলার বদলে তাকে বলতে হোতো "তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেছেন।" এতে মনে হোতো সে বুঝি এই কথা নিয়ে ঠাট্টা কর্‌ছে। না না, সত্য যা' তা' মেনে নেওয়াই ভাল। অর্থ সে গ্রহণ করেছে, আর তারা এই জেনেই গেছে যে, ও একজন সামান্য পথের ভিক্ষুক, অর্থের জন্যই কুকুরের কামড় সহ্য কর্‌লে। সমান ভেবে ওর সঙ্গে ব্যবহার করার কথা ঘুণাক্ষরেও তাদের মনে হয় নি। তাকে বন্ধুভাবে মনে করা কিংবা চা খেতে বলা···

কল্পনা আবার জাল বুন্‌তে থাকে। হঠাৎ তার মনে হোলো যে, তাদের বুঝিয়ে বল্‌তে কোনো কথারই দরকার ছিল না। বিনা বাক্যব্যয়ে নোটখানা শুধু ফিরিয়ে দিলেই চলতো। তাই কেন করলে না? এ ভুলটা করবার কি কৈফিয়ৎ আছে? মেয়েটি বড় তাড়াতাড়ি পালিয়ে চলে' গেল, সেইজন্যই কিছু সুযোগ পাওয়া গেল না।

আচ্ছা, যদি সে তখনই আগে চলে' গিয়ে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে কোনো একটা রাস্তার ভিখারীকে নোটটা দান করে' দিত, তা' হলে কেমন হোতো? এ মৎলব করলে খুবই ভাল হোতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটা সে সময় মনেই হয় নি।

সমস্ত বিকালটা পিটার ঘুরে ঘুরে বেড়ালে, আর মনে মনে সমস্ত ঘটনাটা বিশ্লেষণ করে' কোন্‌টার বদলে কি করলে ভাল হোতো কেবল তারই বিচার করতে লাগলো। অথচ, মনে মনে জানছে যাই সে ভাবুক, সবই তার নিছক

কল্পনামাত্র। এক-একবার তার অপমানের ব্যাপারটা এমন স্পষ্ট করে' মনে উদয় হচ্ছে যে, বাথায় তার সমস্ত দেহটা পর্য্যন্ত টন্‌টন্‌ করে' উঠছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। গোধূলির ম্লান ধূসর অন্ধকারে প্রেমিক-প্রেমিকার দল পরস্পর সংলগ্ন হয়ে বেড়াচ্ছে, গাছতলায় অসঙ্কোচে পরস্পর মিলিত হচ্ছে। ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে সারি সারি বাতির আলো ফুটে উঠলো। মাথার উপর স্বচ্ছ আকাশে সিকিখানা চাঁদ দেখা গেল। সে যে পৃথিবীতে কত অসুখী, কত একা, তাই আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলে।

হাতের ক্ষতস্থানটা এখন খুব ব্যথা করতে লাগলো। সেখান থেকে বেরিয়ে 'অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট' ধরে' যেতে যেতে একটা ডাক্তারখানায় গিয়ে উঠলো। হাতে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে ফরমাস করলে, তার একটা পোচকরা ই, জি, জি, একখানা পাউরুটি আর এক মগ্‌ মোচা চাই, ওয়েট্রেস্ (পরিবেশনকারিণী) মেয়েটি শেষ কথাটা বুঝ্‌তে না পারায় বানান করে' বলে' দিলে,—এক সি, ইউ, পি,—সি, ও, এফ্‌, এফ্‌, ই, ই।

"মনে করেছ আমি বুঝি একটা পথের কাঙাল!" খুব তেজগর্ব্বিতভাবে মেয়ে দু'টিকে এই কথা বল্‌লেই ঠিক হোতো। "তাই আমায় অপমান করলে! যদি তোমরা পুরুষ হ'তে তা' হ'লে আমার কাছে চড় খেতে। ফিরিয়ে নাও তোমাদের তুচ্ছ অর্থ।" কিন্তু কথা বলার পর তো আর তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা চলতো না। সে ভেবে দেখ্‌লে যে, এ রকম তেজ দেখালে কোনোই কাজ হোতো না।

"হাতে আঘাত লেগেছে বুঝি?" ওয়েট্রেস্ মেয়েটি তার ডিম আর কফি এনে টেবিলের উপর রেখে সহানুভূতি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

পিটার ঘাড় নাড়লে। "ক-কামড়ে দিয়েছে একটা কু-কু···একটা হা-আ-হাউণ্ড"—খুব ঝোঁক দিয়ে কথাটা বলে ফেল্‌লে।

বলতে বলতে আবার তার লজ্জার কথাটা মনে পড়ে' মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। তারা ওকে নিতান্ত একটা অপদার্থ বলেই মনে করেছে। এমন ব্যবহার করেছে, যেন সে কোনো মানুষের মধ্যেই নয়; যেন সে একটা ভাড়া করা কল—বিলের টাকাটা মিটিয়ে দিলেই সম্পর্ক চুকে গেল। অপমানটা তার কাছে এখন স্পষ্টভাবে জাজ্জ্বল্যমান হ'য়ে উঠলো যে, তার আঘাতে সমস্ত দেহটা পর্য্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলো। তার বুকের ভিতর তোলপাড় করতে লাগলো, শরীর কেমন করতে লাগলো। খাদ্য তার কাছে বিস্বাদ হ'য়ে গেল, অনেক কষ্টে সেই ডিম ও কফি কোনমতে গলাধঃকরণ করলে।

আবার সেই সব নির্ম্মম ঘটনা ভাবতে ভাবতে এবং কল্পনার আবেগে তার বিবিধরকম অবস্থান্তর ও ঘটনান্তর রচনা করতে করতে চায়ের দোকান ছেড়ে ক্লান্তদেহে উদাসীনভাবে সে পথে পথে ঘুরতে লাগলো। 'অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট' ধরে' বরাবর সার্কাস পর্য্যন্ত গেল, সেখান থেকে 'রিজেণ্ট ষ্ট্রীট' ধরে' 'পিকাডিলি' পর্য্যন্ত গেল। সেখানে আকাশের গায়ে বৈদ্যুতিক আলোর বিচিত্র বিন্যাসে বিজ্ঞাপনের যে সব চিহ্ন একবার দপ্‌ করে' জ্বলে উঠছে আবার নিভে যাচ্ছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখলে। তারপর 'শ্যাফ্‌ট্‌সবেরি এভিনিউ পার হয়ে দক্ষিণ-মুখে গলিপথ দিয়ে ষ্ট্র্যাণ্ডের দিকে যেতে লাগলো।

'কোভেণ্ট্‌ গার্ডেনে'র কাছে পথে একটি মেয়ে তার গা ঘেঁষে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাণে গেল—"ফুর্ত্তি কর ভাই, অমন গোম্‌ড়া মুখ কেন?"

আশ্চর্য্য হ'য়ে পিটার তার দিকে চাইলে। সে কি ওকেই সম্বোধন করলে? একজন স্ত্রীলোক হ'য়ে—এ কি সম্ভব? ও বুঝতে অবশ্য পারলে, লোকে যাদের মন্দ বলে, এও সেই ধরণের স্ত্রীলোক। কিন্তু তা' হ'লেও সে যে ওকে ডেকে কথা বলবে, এটাও পরম আশ্চর্য্য! কি জানি কেন, তার যে কোনো মন্দ উদ্দেশ্য হবে, এ কথা ও ভাবতেই পারলে না।

মেয়েটি ইসারা করে' বল্‌লে—"এসো আমার সঙ্গে।" পিটার মাথা নাড়লে। সত্য বলে' ওর বিশ্বাস হচ্ছিল

না। মেয়েটি হাত ধরলে। উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—"টাকা আছে তো?"

ও আবার মাথা নেড়ে সায় দিলে।

"দেখে মনে হয় যেন মড়া পুড়িয়ে আসছো"—মেয়েটি বল্লে।

"আমার কে-কেউ-নেই" ও জবাব দিলে। ওর কান্না পাচ্ছিল। কাঁদতে বড় ইচ্ছা—কাঁদতে পেলে যেন আশ্বস্ত হ'তে পারে। ওর গলার স্বর বড় কাঁপছিল।

"কেউ নেই? এতো বড় আশ্চর্য্য! তোমার মত সুন্দর ছেলের কেউ নেই, এমন কথা বোলো না।" মেয়েটি অর্থসূচক ভাবে হেসে উঠলো—কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ নেই।

মেয়েটির ঘরে গোলাপী রংয়ের ক্ষীণ আলো। ঘরে সস্তা এসেন্স আর বাসি কাপড়ের গন্ধ। "একবারটি দাঁড়াও" বলেই মেয়েটি পাশের ঘরে চলে' গেল।

পিটার বসে' রইল। একমিনিট পরে মেয়েটি ফিরে এলো, গায়ে কিমোনো, পায়ে চটি। তার কাছ ঘেঁসে বসে' কাঁধে হাত দিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলো। চাপাগলায় বল্লে—"কি গো বন্ধু?" তার চোখের দৃষ্টি বড় শীতল, বড় কঠিন। মুখে সুরার গন্ধ। কাছ থেকে দেখতে অতি বীভৎস,—অবর্ণনীয়।

পিটার চেয়ে দেখলে, যেন এই প্রথম তাকে দেখলে,—দেখলে এবং সম্পূর্ণরূপে তা'কে বুঝলে। দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার মনে পড়ে' গেল সেই লর্ডের মেয়ের কথা—যার পা মচ্‌কে গিয়েছিল, সেই নিঃসহায় মেয়েটির কথা, সেই বিধবার কথা—যার ছেলে জলে ডুবে গিয়েছিল; তারপর কুজনকণ্ঠী আর গলাভাঙার কথা মনে হতেই সে মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"য-যাই—আমাকে যে-যেতেই হবে।...একটা জিনিষ ভু-ভুলে-ভুলে এসেছি। আমি..."বলতে বলতে সে টুপিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরলে। অকথ্য ভাষায় চীৎকার করে' বল্লে "বটে, বটে, ফাজিল ছোক্‌রা। মেয়েমানুষের কাছে এসে টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাবে? না না,—ওসব ফাঁকিদারী চলবে না, চলবে না। তুমি..."তারপর অকথ্য গালি।

পিটার পকেটে হাত দিয়ে কুজনকণ্ঠীর দেওয়া ভাঁজ-করা নোটটি বের করলে। তাড়াতাড়ি তার হাতে সেটি দিয়ে বল্লে—"ছে-ছে-ছেড়ে দাও আমাকে।"

মেয়েটি তা'কে ছেড়ে দিয়ে যতক্ষণে নোটের ভাঁজ খুলে সন্দিগ্ধভাবে দেখতে লাগলো, ততক্ষণে সে বাইরে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো। *

---

* আলডুস হাক্সলির 'হাফ্‌ হলিডে' নামক গল্প হইতে।

বিস্ময়
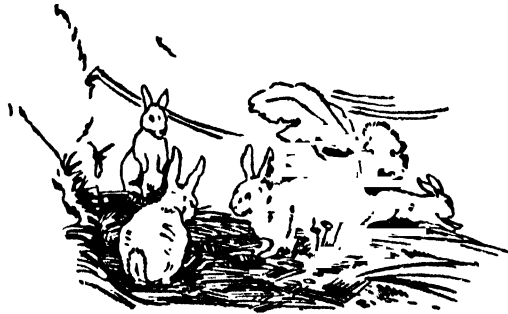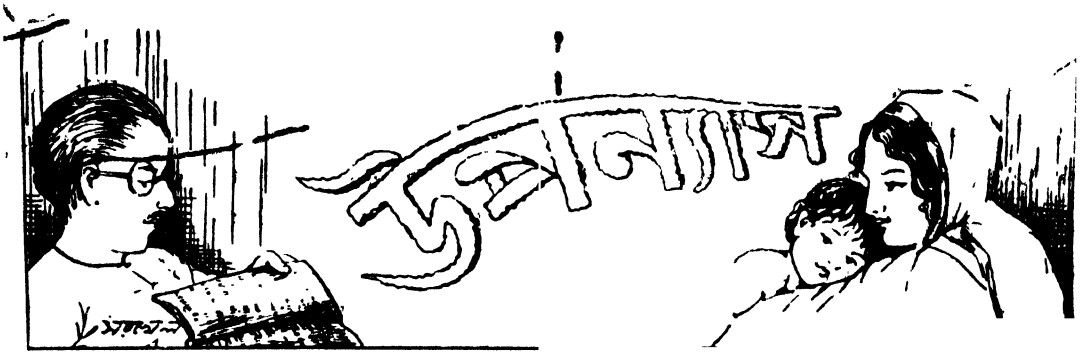
শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

শৈলেশের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব।

ভোরবেলা হইতেই লোকজনের যাতায়াত, অকারণ জটলা-হল্লায় বাড়ীময় একটা অদৈনন্দিন আলোড়ন সুরু হইয়া গিয়াছিল। বৃহৎ নিস্তব্ধ বাড়িটি সহসা যেন তাহার বহুদিনের তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটাইয়া উঠিয়া একটা উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনার ভিতর গা ভাসাইয়া দিয়াছে।

শৈলেশের পিতা অলোকনাথ সুসজ্জিত বৈঠকখানায় একখানি আরামকেদারায় চিত হইয়া পড়িয়া গড়গড়ার নলে অন্যমনস্কভাবে থাকিয়া থাকিয়া ইচ্ছাসুখ টান দিতেছিলেন। দেখিলে মনে হয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ আয়োজনটুকু তাঁহার। শুধু টানার সুখেই টানিয়া যাইতেছিলেন। শৈলেশ অন্দরের দিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া অলোকনাথের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু পিতার এই অলস উদার নীরবতা ভাঙিয়া দিতে তাহার কেমন যেন বাধিতেছিল। অলোকনাথ এমন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পুত্রের আগমন তিনি একেবারেই অনুভব করিতে পারেন নাই।

শৈলেশ পিতার আরামকেদারার হাতলে হাত রাখিয়া দাঁড়াইতেই অলোকনাথ স্বপ্নোত্থিতের মত উঠিয়া বসিলেন। গড়গড়ার নলে আচমকা একটা টান পড়িয়া যাওয়ায় গড়গড়াটি কাত হইয়া কলিকাটি সশব্দে মেঝে পড়িয়া ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল।

অলোকনাথ সেদিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। তারপরে শৈলেশের আনত দেহের উপর সস্নেহে একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, কিরে শৈল? পরক্ষণেই আবার হাসিয়া কহিলেন, ভারী বিমনা হ'য়ে পড়েছিলাম, না?

শৈলেশ পিতার আদ্র কণ্ঠের ত্রুটি স্বীকারের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন কারণ রহিয়া গিয়াছে তাহা যেন সহজেই বুঝিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের দেওয়ালে টাঙান মাতার তৈলচিত্রের পানে গর্বোজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইল। মাতার পবিত্র স্মৃতি ক্ষণিকের জন্য তাহাকে এমনই মুগ্ধ বিমনা করিয়া রাখিল যে, পিতার প্রশ্নোত্তরে কিছু বলাতো দূরের কথা, তাহার উপস্থিতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল।

উভয়েই নীরব হইয়াছিলেন। পিতা পুত্র একসঙ্গে যে অশরীরী নারীর উপস্থিতি অন্তরের গভীরতম স্থানে অনুভব করিয়া সাময়িক বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বঞ্চিত হইয়া

গিয়াছিল তাহা জগতে দুর্লভ না হইতে পারে, কিন্তু তাহার আর তুলনা হয় না।

একদিকে অলোকনাথের ঐকান্তিক ভালবাসা, আর একদিকে শৈলেশের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা—উভয়ে মিলিয়া তৈল-চিত্রে মুদ্রিত অতীতের গৃহের মূর্ত্তিমতী দেবীকে যেন সসম্মানে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হৃদয়ের একান্ত কামনা জানাইতেছিল।

সে আর হয় না।...মৃত্যু তাহার নিষ্ঠুর ক্রীড়া-কৌতুকে একদিন তাঁহাকে সাথী করিয়া লইয়াছে।

ঘড়িতে 'টুং' করিয়া একটা আওয়াজ হইল। উভয়ের কাণেই তাহা এমন বিশ্রী কর্কশ হইয়া বাজিল যে, তাঁহাদের নিগূঢ় মৌনতা সহসা ঘা খাইয়া যেন দাপাইয়া উঠিল।

শৈলেশ পিতার আরও নিকটে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রথম কথা কহিল, বাবা, এসব আয়োজনের কি দরকার ছিল বলুনতো? আমার ইচ্ছে করচে কোথাও পালিয়ে গিয়ে হাঁপ ফেলে বাঁচি।

অলোকনাথ সস্নেহে পুত্রের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু শৈল, একবার ভেবে দেখ্ দিকি, আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকতো তো এ আয়োজনে সে কি খুশীই না হ'তো। সে যা' করতো তা' আমি কর্‌তে পারব না জানি, কিন্তু জেনেশুনে কোন ত্রুটিতো আমি রাখ্‌তে পার্‌বো না। তোর জন্মোৎসব ছিল তার কাছে সব চেয়ে আদরের জিনিষ—আমি তা' কোনক্রমেই তুচ্ছ কর্‌তে পারি না। কিন্তু শৈল, তোকে যে একটি কাজ করতে হবে। এখনোতো সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয় নি, তাদের সব গিয়ে ব'লে আসা চাইতো? সন্তোষকে একটা খবর দিয়ে পাঠালে পারতিস্ না? তোরা দু'জনে তোদের বন্ধু-বান্ধবদের, আর গাঁয়ের যারা সব কোলকাতা আছে—বাকী সব আমি একরকম খবর দিয়ে এসেচি। ঠিক কথা, বৌমারও তো বন্ধু-বান্ধব দু'-চারজন আছে—'সফার'কে একটা খবর দে, মোটরখানা ঠিক ক'রে রাখুক, বৌমাকে নিয়ে আমিই বেরুবো 'খন না হয়।

শৈলেশ এ সব আয়োজনের প্রতিবাদ করিতেই আসিয়াছিল। কারণও তাহার যথেষ্ট ছিল। মার অনুপস্থিতিতে এসব আয়োজন তাহাকে ব্যথা দিতেছিল। কিন্তু পিতার সস্নেহ অভিযোগ তাহার প্রতিবাদ স্পৃহার মুখ ঘুরাইয়া তাহাকে কাজে ব্রতী করিয়া তুলিল। এতক্ষণে সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল, মার স্মৃতিপূজার এতবড় সুযোগ সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে দিতে পারে না। ত্রুটিহীন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে তাহাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেই হইবে।

শৈলেশ সহসা অনুপ্রাণিতকণ্ঠে বলিল, সন্তোষকে খবর দেওয়া হয়েছে, সে এসে পড়লো ব'লে। আর সফারকে আমি ব'লে দিচ্ছি।—বলিয়া শৈলেন চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় অলোকনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আর দেখ্ শৈল—কিন্তু কিছু বলিবার হয়তো তাঁহার ছিল না, বলিলেনও না।

শৈলেন ক্ষণিক অপেক্ষা করিয়া মনে মনে হাসিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

অলোকনাথ লজ্জিত হইয়া আর একবার তৈলচিত্রের পানে চাহিয়া যেমনি ফিরিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনি তাহার বিশুষ্ক চোখের পাতা বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

চৈতী অন্দরের দিকের দুয়ারে তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, বাবা, আজ যে আমার ঘরে ব'সে আপনার চা খাবার কথা—চলুন।

ওহো, সে তো আমি ভুলেই গিছলাম মা। আচ্ছা, চল' মা, চল'। কিন্তু আয়োজনের বাড়াবাড়ি দেখ্‌লে চ'লে আসবো—এ তোমাকে ব'লে দিচ্ছি। অলোকনাথ সহাস্যে বলিলেন—অথচ, চোখের জল তখনও তাঁহার মুছিয়া যায় নাই।

তা বেশ! চৈতী হাসিয়া ফেলিল।

জমিদার অলোকনাথের ভবানীপুরের বৃহৎ ভবন আলোকমালায় ঝলমল্ করিয়া উঠিল। নিমন্ত্রিত লোকগণের সমাবেশে প্রতি কক্ষ, এমন কি, সম্মুখের বাগানটিও

পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তখনও লোকজনের আসা-যাওয়ার বিরাম ছিল না। সম্মুখের রাস্তায় সারবন্দি মোটর দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। দেখিলে সর্ব্বাগ্রেই বিবাহ-ভবন বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। রাস্তার লোক জন্মতিথি উপলক্ষে এই আয়োজন শুনিয়াও বিশ্বাস করিতে চাহে না।

সন্তোষ গেটে দাঁড়াইয়া নবাগত ব্যক্তিদিগকে অভ্যর্থনা জানাইতেছিল, আর অলোকনাথ স্বয়ং গেটের পরেই বাগানের একধারে একখানি কেদারায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন ও লোকজন আসিলে সহাস্যে আপ্যায়ন করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া যাইতেছিলেন।

এমন সময় একখানি সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইল।

দরজা খুলিয়া সে গাড়ী হইতে প্রথম যে নামিল, সে ধ্রুবেশ।

সন্তোষ আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। ধ্রুবেশ অগ্রসর হইয়া বলিল, আরে সন্তোষ যে, কিন্তু এ সব কি?

সন্তোষের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, সে একেবারে আভূমি নত হইয়া ধ্রুবেশের পা স্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ধ্রুবেশ তাহাকে তেমনি নীরব দেখিয়া তাহার বাম স্কন্ধের উপরে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া কহিল, এ কি, কারুর বিয়ে-টিয়ে না কি?

না, শৈলেশের জন্মোৎসব আজ।—বলিয়া সন্তোষ আবার নীরব হইল।

গাড়োয়ান ভারি গোলমাল সুরু করিয়া দিল দেখিয়া ধ্রুবেশ গাড়ীর কাছে আসিয়া বীণা ও জগত্তারিণী দেবীকে নামিতে বলিল। পরমুহূর্ত্তেই সন্তোষকে সেখানে দাঁড়াইতে বলিয়া বরাবর গেটের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

অলোকনাথ ধ্রুবেশের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, তুই যে আস্‌বি, এ আমি স্বপ্নেও—

ধ্রুবেশ বাধা দিয়া কহিল, একলা আমিই আসি নি, মা ও আপনাদের—

বলিস্‌ কি ধ্রুবেশ, বৌদি', বৌমাও? বলিয়া অলোকনাথ ধ্রুবেশের হাত ধরিয়া গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বীণা অলোকনাথের পায়ে কিছু দূরে মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

অলোকনাথ জগত্তারিণী দেবীকে প্রণাম জানাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি বৌদি'। আজ আমার শৈলর জন্মোৎসব, আজকের দিনে আপনার আশীর্ব্বাদ যে ওর ললাটে লেখা আছে তা' কি আমি এই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও ভাবতে পেরেচি। আজ ওর মা নেই, আপনাকেই সব কর্‌তে হবে, আসুন।

জগত্তারিণী সংজকণ্ঠে বলিলেন, এ কি আমি কিছু আগে ভাবতে পেরেচি অলোক? তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতেই হবে।

সন্তোষ তখনও তদবস্থায় মুহ্যমান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বীণা কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিয়া আজ আর হাসিতে পারিল না।

রঘুনাথ ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, দাদাবাবু, রাস্তায় একটা পাগ্‌লী মেয়ে গাড়ী চাপা প'ড়েচে।

নিখিলেশ হাতের কাগজটা দূরে সরাইয়া রাখিয়া ত্রস্তে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারই দরজার ঠিক সম্মুখে বহুলোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নিখিলেশ জনতা দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একজন সামান্য ভিখারিণীর শীর্ণ পায়ের উপর দিয়া ধনীর মোটর মদগর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে।

ভিখারিণী মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া সবলে রাস্তার মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু রাস্তার খোয়ার উপর হইতে মাথাটি তুলিবার শক্তি তাহার একেবারেই ছিল না। ঈষৎ উন্মুক্ত দুই ঠোঁটের কোণ বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত কসের মত গড়াইয়া পড়িতেছিল।

মৃত্যু হয়তো অনিবার্য্য। তাহা ঠেকাইবার জন্য কোন আগ্রহ জনতার মধ্যে প্রকাশ পাইল না। সকলেই দেখিতে

ছিল—বলিলও, এমনিও মরবে—ওমনিও মরবে—না হয় দু'দণ্ড আ.গ—

নিখিলেশ জনতার নিষ্ঠুর অবহেলা ও নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিল, রঘুনাথ, ইদিকে এগিয়ে আয়তো।

রঘুনাথ তাহার হাতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে ভিখারিণীর পায়ের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, ধ'রে তোল!

নিখিলেশ মাথার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভিখারিণীর নিস্পন্দ দেহভার তুলিয়া ধরিল।

ঘরে আনিয়া একটা মাদুরের উপর শোয়াইয়া নিখিলেশ তাহার চোখে মুখে জল ছিটাইতে লাগিল। রাস্তার দুই-একজন মৌখিক সাহায্য করিতে কার্পণ্য করে নাই।

রঘুনাথ যখন ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখনই ঠিক ভিখারিণী ক্লান্ত চোখ দুইটি তুলিয়া বলিল, কে নিখিল?...

তারপরে আরও কি যে বলিল, তাহা আর শোনা গেল না।

নিখিলেশ ব্যগ্র দুই চোখের উৎসুক দৃষ্টি ভিখারিণীর বিকৃত মূর্ত্তির উপর রাখিয়া কিছুতেই স্মরণের গ্রন্থিতে তাহার অতীতের অবিকৃত মূর্ত্তির সন্ধান পাইল না।

ডাক্তার বলিল, হোপ্‌লেস! বড় জোর মিনিট দশেক—তাও সন্দেহ!

বাঁচিবার জন্য ভিখারিণীরও গরজ ছিল না। সে যে চিনুর মা তাহা জানাইবার জন্যই আবার দুই চোখ তুলিল।

নিখিলেশ সহসা একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, চিনুর মা? তোমারই খোঁজ এতদিন করেচি আমি। আমার কথার জবাব বোধ হয় একমাত্র তুমিই দিতে পার।

কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে চিনুর মা তাহার শেষ নিশ্বাস তখনই ঠিক নিঃশেষ করিয়া দেউলিয়া হইয়া বসিয়াছে।

নিমন্ত্রিতেরা সকলেই তখন বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

শৈলেশের জন্মোৎসব এত সহজে এমন সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে, তাহা অলোকনাথ দুইদিন পূর্ব্বেতো ভাবেনই নাই, আজ সায়াহ্নেও সে কথা তিনি ভাবিতে পারেন নাই।

নিজ শয়ন কক্ষে আসিয়া স্ত্রীর তৈলচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। চোখে মুখে তাঁহার সে যে কি তৃপ্তি, কি বিমল আনন্দ! দুই বিন্দু অশ্রুও তাঁহার দুই চোখের কোণে কক্ষের বিজলী বাতিতে ঝল্‌মল্ করিতেছিল।

চৈতী 'ঝপ্' করিয়া সে কক্ষে প্রবেশ করিতেই তাঁহার প্রগাঢ় স্তব্ধতার ভাবটি টুটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দুই বিন্দু অশ্রু কাল পাথরের মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িল।

আঃ, তোমাকে এত ক'রে ব'লে বলেতো আর আমি পারি না। এখনও তুমি ঘুমোও নি বাবা, রাত যে একটা বাজে।

অলোকনাথ নিজের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সলাজ হাসি হাসিয়া বলিলেন, মা, তোমার বুড়ো ছেলের চোখে যে ঘুম আসে না কিছুতেই।

চৈতী বলিল, সে তো জানি। ঘুম পাড়াতেই তো এলাম তাই। আমার বড় কড়া শাসন কিন্তু।

এমন তাহাকে প্রতি রাত্রেই আসিতে হয়,—কিন্তু অন্যদিন অলোকনাথ শয্যায় শুইয়া থাকেন, চৈতী মশারিটা ফেলিয়া দিয়া ঘরের আলোটি নিবাইয়া চলিয়া যায়।

অলোকনাথ শয্যায় দেহভার এলাইয়া দিতেই চৈতী নিত্যকার মত সব কিছু শেষ করিয়া ঘরের আলোটি নিবাইয়া দিয়া বৃহৎ তৈলচিত্রটির নিম্নে আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিয়া জানাইল, মা, তোমার সৌভাগ্য যেন তোমার সাধের চৈতীর হয়।

উৎসব-রজনীর শেষ অনাহুত অতিথি সে—মাতার্দ্দ।

মিঃ মজহর খান ও মিস্ আখ্তারী

'ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম' কোম্পানীর সবাক উর্দ্দু চিত্র
'মমতাজ বেগমে' অবতীর্ণ হইয়াছেন।

রাস্তা দিয়া টলিতে টলিতে চলিয়া যাইতেছিল। সহসা জমিদার-ভবনের উৎসবের শেষ সমারোহের চিহ্ন আলোকমালা ও বাড়ীর বাহিরে কুকুরের চীৎকার লক্ষ্য করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। গেটের কড়া ধরিয়া খুব কয়েকটা নাড়া দিয়া ঈর্ষা জড়িতকণ্ঠে বলিল, আমরা কি আর মানুষ না বাবা? খোল' না দরজাটা বাবা—আমরাও একটু ফূর্ত্তি লুটি। ইলেকটিক্ বাতি··· বাঃ, বাঃ,···কই···আরে ছ্যা ছ্যা···নহবৎ নেই তার আবার বিয়ের রোশ্‌নাই চলেছে। কে আছ বাবা, খোল না গেট্‌টা একবার।

গেটের পাশেই বাগানের একটা বেঞ্চে বসিয়া সন্তোষ গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

শৈলেশ-চৈতী, ধ্রুবেশ-বীণা এবং সর্ব্বোপরি অলোক-নাথের একান্ত অনুরোধে তাহার আর অত রাত্রে মেসে ফিরিয়া যাওয়া হয় নাই। সে তাই সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া উৎসবান্তে বাগানের একটা বেঞ্চে আসিয়া বসিয়া ছিল

একটা হৃদয়ের প্রচণ্ড প্রলয়ের সামান্য একটু ঝাপ্‌টা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে মাত্র, আর তাহাতে সে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নিজেকে সে এত দুর্ব্বলতো কোন দিনই ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু অপরাধ তাহার কোথা? বীণার একদিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল, অপরাধ না ক'রে অপরাধী সেজে ব'সে থাকা বিশ্রী পাপও।

এমন সময় মাতালের কড়া নাড়ার আওয়াজ তাহার কাণে যাইতেই সে চম্‌কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মাতালের কণ্ঠের অসংলগ্ন বাক্য তাহার কাণে পৌছায় নাই।

গেট খুলিয়া দিয়াই মাতালের মুখের দিকে সে সুবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। মাতালও সন্তোষের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া তাহার মুখের উপরেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই পিছন ফিরিয়া দৌড় দিল। কিন্তু বেশীদূরও সে যাইতে পারিল না, সামান্য কয়েক পা অগ্রসর হইয়াই সাম্‌নের দিকে 'টাল' সাম্‌লাইতে না না পারিয়া সশব্দে রাস্তার উপরেই পড়িয়া গেল।

অতুল চক্কোত্তি না?...কিন্তু সন্তোষ নিজের চিন্তা-দুর্ব্বল মস্তিষ্কের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না।

মনে হইল, সবই ভুল! তাহারই বিকৃত চিন্তার বীভৎস পরিণতি মাত্র।

সভয়ে গেট আবার বন্ধ করিয়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য ফিরিল।

সিঁড়ির কাছে আসিয়াই বীণা ও চৈতীকে দেখিয়া চম্‌কাইয়া গেল।

চৈতী 'ফিক্' করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কখন যে কোন্ ফাঁকে উঠে গেলে ঠাকুরপো, কিছুই জানতে পারি নি। বাগানে ঠিক পাওয়া যাবে ভেবেই আমরা খুঁজতে এলাম।

বৈঠকখানা ঘরের বড় দে'য়াল ঘড়িটায় তখন 'টুং' 'টুং' করিয়া দুইটা বাজিল।

সন্তোষ কিন্তু উত্তরে কিছুই বলিতে পারিল না।

কিন্তু চৈতীর হাসি ও বীণার মৌন চাওয়া তাহার সমস্ত দুর্ব্বলতার মূলে ভীষণভাবে আঘাত করিয়া আবার তাহাকে সহজ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল।

অনাহূত অতিথির স্মৃতিও হয়তো সেই সঙ্গে মুছিয়া গেল···দুঃস্বপ্নও যেমন করিয়া একদিন মুছিয়া যায়।

চৈতী সন্তোষের হাত ধরিয়া বলিল, এসো এখন। নিতান্তই একজনার হাতে তোমাকে তুলে দিতে না পারলে আমাদের আর স্বস্তি নাই।

চৈতী এমনভাবে তাহা বলিল যে, মনে হইল, সে জন্য দুভাবনার তাহার যেন আর অন্ত নাই।

শেষ

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাত্যহিকী

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

[একখানি ছোট ঘর। বাক্স-আলমারী খাট ও টেবিল চেয়ারে ঘরটি আকণ্ঠ বোঝাই। স্থানাভাবের জন্য ঘরটির শ্রীনষ্ট হইয়াছে। শৈবলিনী খাটের উপর বিছানা পাতিতেছিল। বয়স বছর পঁচিশ হইবে। দেখিতে এককালে খুব ভালই ছিল, কিন্তু এখন গোটা দুই-তিন সন্তানের জননী হইয়া রূপের প্রায় সবটাই ধ্বসিয়া গেছে। স্বামী কেরাণী—অল্প মাহিনায় কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। বিবাহ হইয়াছে আজ প্রায় দশ বছর। প্রথম ছেলেটি মারা গিয়াছে। দ্বিতীয়টীর বয়স বছর সাত—ডাক নাম পটলা।]

শৈবলিনী—(আগাইয়া আসিয়া) এনেছ ?

মাণিক—(বিস্ময়ের ভঙ্গীতে) কী ?

শৈবলিনী—সুতো !

মাণিক (জিভ কাটিয়া) ওই যাঃ! স্রেফ্ ভুলে গেছি। (শৈবলিনী পুনরায় বিছানার চাদর টান করিতে লাগিল)

মাণিক (আপন-মনে) রোজ মনে করি অপিস্-ফেরতা একটা সুতো কিনে নিয়ে আসবো আর রোজই ভুলে যাই। মনে না থাকার আর দোষ কী ? যা খাটুনি।

শৈবলিনী—থাক্, খাটুনির কথা তো আমি শুনতে চাই নি। আমি কিছু আনতে বললেই তোমার খাটুনি বাড়ে—আর নিজের বেলায়—দেব না বললেই তো চুকে যায়।—

মাণিক আবে কী মুস্কিল! দেব না কেন! মনে থাকে না যে।—

শৈবলিনী—তা তো থাকবেই না। ভাত খেতে মনে থাকে, বিড়ি কিন্‌তে মনে থাকে, থাকে না কেবল সুতো আনতে।—ন্যাকামির আর জায়গা পাও নি —না ?—

মাণিক—তুমি কি মনে কর রোজ আমি ইচ্ছে ক'রে ভুলে যাই ?

শৈবলিনী—হ্যাঁ—তাই—।

মাণিক—বেশ, তবে তাই। চা হ'য়েছে ?—

শৈবলিনী—এটাও তো বেশ মনে থাকে দেখতে পাচ্ছি।

(মাণিক স্তম্ভিতভাবে স্ত্রীর দিকে একবার চাহিল মাত্র। যেন তাহার বাক্‌রোধ হইয়াছে)

শৈবলিনী—নিজের বেলায় আঁটি সাঁটি—আর পরের বেলায় দাঁত কপাটি। আমি পর কি না আমার কথা মনে থাকবে কেন ! (মাণিক চুপ) পটলা।

নেপথ্যে পটলা—কী মা।

শৈবলিনী—কেটলিতে চা দিয়েছিস ?

নেপথ্যে পট্‌লা—না তো—

শৈবলিনী—আস্‌ছি হারামজাদা তোমার পিঠের ছাল তুলতে ! (দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল)—

[মাণিক হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া 'ধপ্' করিয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িল। জামাটা আগেই খুলিয়াছিল, গেঞ্জিটা খুলিবার আর তাহার উৎসাহ ছিল না]

(কিছুক্ষণ পরে—পটলা এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিল।)

মাণিক—যা নিয়ে যা—চা আমি আর খাবো না।—

পটলা—মা ব'ল্‌লে যে !

মাণিক—তর্ক করিসনে শূয়ার, মার খাবি। যা।

(পট্‌লা চা লইয়া চলিয়া গেল)

(একটু পরে শৈবলিনীর প্রবেশ)

শৈবলিনী—চা খাওয়া হ'ল না কেন ?—

মাণিক—(মৃদুস্বরে) চা আমি আর খাবো না।

শৈবলিনী—খাবে না তো শুধু শুধু আমাকে খাটালে কেন)—

(মাণিক চুপ)

শৈবলিনী—ওঃ, বীরত্ব কতো! আজ সাতদিন ধ'রে বুনুনিটা পড়ে রয়েছে, একটা সুতোর জন্যে শেষ করতে পারছি নে। তা বললেই আবার বাবুর 'আগ্' হবে।

মাণিক—তোমার আস্পর্দ্ধা দেখছি বেড়েই চলেছে।

শৈবলিনী—তার মানে?—

মাণিক—তার মানে যত কিছু বলি নে—ততই দেখছি তুমি মাথায় চড়ে বসছো। দিন দিন—

শৈবলিনী—থামো থামো, তুমি আর বক্তৃতা দিও না। বলে—ভাত কাপড়ের কেউ নন্ কিল মারবার গোঁসাই!

মাণিক—ওই শিখেছো। ছোটলোকদের মত শুধু একগাদা ছড়া কাটতে আর কথা কাটাকাটি করতে।—

শৈবলিনী—তা হ'লে আমি ছোটলোক?—দেখ, তুমি আমাকে গালাগালি দিও না বলছি, মুখ সামলে কথা কও।

মাণিক—কেন? কিসের জন্য আমি মুখ সামলাতে যাবো? আমার বাড়ী—আমার ঘর, চুপ ক'রে এখানে থাকতে পারো থাকো, নইলে চলে যাও। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

শৈবলিনী—যাবোইতো, নিশ্চয় যাবো। তোমার লাথি ঝাঁটা খেয়ে এখানে পড়ে থাকবো, এমন বান্দা তুমি আমাকে পাও নি।

মাণিক—তাই যেও।

শৈবলিনী—হ্যাঁ, যাবো। তোমার ভাত কাপড়ের খোঁটা খেয়ে এখানে পড়ে থাকবো না কি?—আমি এক্ষুনি যাবো। পট্‌লা! একটা রিক্সা ডাক্‌তো। আজও দাদার এমন ক্ষমতা আছে। (গলার আওয়াজ কাঁপিতেছে) তার কাছে গিয়ে পড়লে দুটো খেতে সে দেবেই। পট্‌লা!

(দ্রুতপদে চলিয়া গেল)

[মাণিক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর আলমারীর মাথার উপর হইতে সেদিনকার 'আনন্দবাজার'খানা টানিয়া লইয়া শুইয়া শুইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একটু পরে ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছে দেখিয়া উঠিয়া হ্যারিকেন ধরাইল—তারপর পুনরায় 'আনন্দবাজার' লইয়া শুইয়া পড়িল। একটু পরে "মাণিক আছ না কি?" বলিয়া মাণিকের শ্যালক নিবারণ প্রবেশ করিল। দ্বারের বাহিরে ঝন্‌ঝন্ করিয়া হাত হইতে বাসন পড়ার আওয়াজ উত্থিত হইল]

নিবারণ—ওকি!

মাণিক—আপনার সহোদরা গৃহকর্ম্মে নিমগ্না।

নিবারণ—তাতো বুঝছি—কিন্তু ব্যাপারটা কী?—

মাণিক—ব্যাপারটা বেশী কিছু নয়। স্বামীর অন্যমনস্কতা—দাম্পত্য কলহ—তারপরেই ক্রুদ্ধচিত্তে পত্নীর পিতৃগৃহ যাত্রা। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। পট্‌লা, অবিশ্যি রিক্সাই ডাকতে পারবে, কিন্তু ঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার দায়ীত্ব নিতে পারবে না।

নিবারণ—আচ্ছা সময়ে এসে পড়লাম দেখছি। কিন্তু ঝগড়াটা হ'ল কী নিয়ে?

মাণিক—সুতো নিয়ে।

নিবারণ—সুতো!

মাণিক—হ্যাঁ মশায় হ্যাঁ, সুতো! ঝালর বুনবার সুতো। একগুলি সুতোর কথা বলেছিলেন পরশু, আমার মনে ছিল না—ব্যাস্, আর যায় কোথায়! তুমুল কাণ্ড। জীবনে আমার ঘেন্না ধ'রে গেল মশায়, আপনার এই সহোদরার বচন সুধায়।

(নিবারণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল)

মাণিক—ঘটনাটা শুনে আপনার মনে হচ্ছে সামান্য। কিন্তু মোটেই তা' নয়। এই সুতো ধ'রে ধ'রে উনি যে কোথায় গিয়ে পৌছবেন সেই কথা ভেবেই আমি আকুল হচ্ছি। আর এমনি মশায় নাছোড়বান্দা, বল্‌লাম—ভুলে গেছি, কাল নিশ্চয় এনে দোবো। কিন্তু কার কথা কে শোনে!

নিবারণ—ও সংসার করতে গেলে ওরকম হয়েই থাকে। তোমাদের এ ব্যাপার তো কিছুই নয়। সেদিন আমার এক বন্ধু তার দুর্দ্দশার ইতিহাস ব'লছিল। রাত্তিরে হাত

থেকে পাখাখানা না কি খাটের নীচে পড়ে যায়। বৌ বল্‌লে—কুড়িয়ে আনো। সে বলে—পারবো না, তুমি আনো। বৌ বল্‌লে—তবে নীচেই শোওগে যাও, আমার কাছে শুতে হবে না। বলেই এক ধাক্কা। খাট থেকে আচম্‌কা নীচে পড়ে গিয়ে সে বেচারার মাথাটাথা ফেটে এ্যাক্‌সা।

মাণিক—বলেন কি মশায়! কী ভয়ানক! তারপর?

নিবারণ—সেই রাত্তিরে ডাক্তার আর ইন্‌জেক্‌সনে গোটা কুড়ি টাকা বেরিয়ে গেল।...পরশু দিন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আমার কাছে তার দুঃখের কাহিনী বলে গেল। এখন বুঝতে পারছো তোমাদের ব্যাপার কত সামান্য।

মাণিক—পারছি।

নিবারণ—আচ্ছা, আমি উঠলাম তা হ'লে।

মাণিক—সেকি! ওদের সঙ্গে দেখা কোরবেন না।

নিবারণ—আজ আর সময় নেই। বিশেষ দরকারে বাগবাজারে যাচ্ছি—ভাল আছে তো ওরা?

মাণিক—হ্যাঁ।

নিবারণ—তা হ'লেই হ'ল।

মাণিক—তা হ'লে কি ওদের এখন পাঠাব না বলছেন?—

নিবারণ—কোথায়?

মাণিক—আপনার ওখানে!

নিবারণ—বেশতো—ঘুরে আসুক না একবার। কিন্তু আমি তা বলি নি—আমি বলছিলাম যে—যদি পাঠাতেই হয় ঝগড়াঝাঁটী ক'রে পাঠিও না, মিট্‌মাট্‌ ক'রে পাঠিও।—

মাণিক—আচ্ছা।—

(নিবারণ চলিয়া গেল)—

[মাণিক খানিকক্ষণ পায়চারী করিয়া হঠাৎ ডাকিল—পটলা!—পটলা উত্তর দিল—"কি বলছো?" মাণিক কহিল—"থাক্—কিছু না।" বলিয়াই সে পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত 'আনন্দবাজারে' মন দিল।—

কিছুক্ষণ পরে দ্রুতপদে প্রবেশ করিল শৈবলিনী। সে বাক্স খুলিয়া একগাদা কাপড় ব্লাউস্‌ বাহির করিয়া স্যুটকেশে পুরিতে লাগিল। সমস্ত ঘরময় শুধু দ্রুত হস্তে 'আনন্দবাজারে'র পাতা উল্টাইবার খস্‌খস্‌ শব্দ।—

একটু পরে মাণিক চাহিয়া দেখিল শৈবলিনী জামা কাপড় গোছাইতে ব্যস্ত। সে ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া শৈবলিনীর পিছনে গিয়া দাঁড়াইল]

মাণিক—শুনছো! (শৈবলিনী একবার ক্রুদ্ধনেত্রে তার দিকে চাহিয়াই আবার বাক্সে মনঃসংযোগ করিল)—

মাণিক—ওগো!—(কোন উত্তর না পাইয়া)—

মাণিক—সই!—

শৈবলিনী—কি!—(স্বর গম্ভীর)

মাণিক—তুমি কি সত্যি যাবে না কি?—

শৈবলিনী—হ্যাঁ।—

মাণিক—কিন্তু আমি বলছিলাম—

(শৈবলিনী চুপ করিয়া রহিল)—

মাণিক—নাই বা গেলে!

শৈবলিনী—না—আমি যাবই। আমি যাব, এখানে থাকবো না। কেন আমি কি দাসী চাকর না কি!—

মাণিক—আমি কি তাই বলেছি?

শৈবলিনী—না বল নি! বলতে কী বাকী রেখেছো শুনি! থাক্, আমি আর ঝগড়া করতে চাই না।—(পুনরায় কাজে মন দিল)

মাণিক—সই!

শৈবলিনী—তুমি এখান থেকে যাবে কি না আমি জানতে চাই। অনেক হয়েছে, থাক্—সই সই ব'লে আর সোহাগ বাড়াতে হবে না।

মাণিক—তা নয় আমিই যাচ্ছি। কিন্তু ছাদে—মাইরি বলছি—চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে—চল না, যাই।—(শৈবলিনী নিরুত্তর)—

মাণিক—যাবে?

শৈবলিনী—না।

মাণিক—আচ্ছা, আমি আর কখনও এমন কাজ কোরব না। (শৈবলিনীর একখানি হাত ধরিয়া)—সত্যি, আর কখনও কোরব না। এবারকার মত আমাকে মাপ কর।—

শৈবলিনী (হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া)—কেন তুমি

আমাকে ভাতের খোঁটা দিলে—কেন তুমি দাসী চাকর বললে—কেন তুমি সুতো সামলে না—কেন তুমি—

মাণিক—ব'লেই তখন আমার এমনি কষ্ট হয়েছিল তা আর কী বলবো। ওই খাটে বসে' খবরের কাগজ পড়তে পড়তে—মা কালীর দিব্যি—আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। তুমি তো জান না তোমাকে একটা কটু কথা বলে' আমার নিজেরই বুকের মধ্যে কি রকম করে। (গলাটা কেমন যেন ধরিয়া আসিল)

শৈবলিনী (অশ্রুসিক্ত চোখে হাসিয়া ফেলিয়া)—বাঃ! সত্যি কাঁদছিলে তুমি?

মাণিক—সত্যি। এই বিদ্যা ছুঁয়ে বলছি। ('আনন্দবাজারে' হাত দিল)—তুমি যেও না সই, তুমি চলে' গেলে সত্যিই আমি বাঁচবো না। কাল থেকে যা সর্দ্দি হয়েছে—জবতো নির্ঘাৎ এল ব'লে।

শৈবলিনী—ছিঃ! ও কথা বলতে নেই। উঁকিঝুঁকি বসানো দিয়ে শুক্কবার একটু ওষুধ নিয়ে এসো তা হ'লেই সেরে যাবে।

মাণিক আচ্ছা। কিন্তু তুমি যাবে না বল?

শৈবলিনী তুমি আর বকবে না বল?

মাণিক—না।

শৈবলিনী—আচ্ছা, তবে যাব না।

মাণিক—চল না একটু ছাদে যাই। বড্ড ভাল জ্যোৎস্না উঠেছে।

শৈবলিনী—জ্যোৎস্না দেখে কি পেট ভরবে? রাত্তিরে রাঁধতে হবে না? সর্দ্দি হয়েছে বলছো—রুটী খাবে? ভাত খাওয়াটা ঠিক হবে না।

মাণিক—রুটী! বেশ! (হঠাৎ শৈবলিনীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া) তোমাকে যে আমি কত ভালবাসি সই, তা কী ক'রে বোঝাবো আমি? আচ্ছা, তুমি কি আমাকে আজও তেমনি ভালোবাস সই? (শৈবলিনী কি যেন একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় "বাবা" বলিয়া প্রবেশ করিল পটলা)

মাণিক—(বজ্রগর্জ্জনে) যা, হারামজাদা খেলগে যা!

শৈবলিনী—(মাণিকের বাহু পাশ ছাড়াইয়া) রাত্তির বেলায় খেলবে কী? তোমার কি ভীমরতি হয়েছে?

মাণিক—(মৃদুস্বরে) ও! রাত্তির হয়েছে বুঝি? (পুনরায় বজ্রগর্জ্জনে) যা তবে পড়গে যা।

(পটলা হতভম্ব হইয়া ছুটিয়া পলাইল, তাহার পিছনে পিছনে শৈবলিনীও। মাণিক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় খবরের কাগজ লইয়া পড়িল)

যবনিকা

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

রক্তধারা

শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গড়গড়ার নল্‌টা মুখ থেকে খুলে অচল বসু বল্‌লেন—আপনি যে এসেই এক আরব্য উপন্যাস আরম্ভ করলেন।

সামনের চেয়ারে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটি বল্‌লেন—দেখুন, এ ঘটনা এতই অসম্ভব যে, লোকে বিশ্বাসই করতে চাইবে না।

ডিটেক্‌টিভ্‌ অচল বসু বল্‌লেন—অন্ততঃ আমি তো এই গোয়েন্দাগিরি কাজ ক'রে অবধি এমন উদ্ভট ঘটনা কখনো শুনি নি।

—কিন্তু আমার জীবনে এই ঘটনাই এমনই অশান্তি এনে দিয়েছে; সরযূর দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র আপনিই আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারেন।

অচল বসু নল্‌টা আবার মুখ থেকে খুলে জিজ্ঞাসা করলেন--সরযূ! কই,তার কথা তো কিছু আগে বলেন নি।

থতমত খেয়ে আগন্তুক শরৎ বল্‌লে—আমার কথাগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে; ঠিক গুছিয়ে বলা হয় নি। আমায় ফের গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনাটি আপনাকে বলা উচিত, তা' হ'লে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন।

অচল বসু বল্‌লেন—মন্দ কথা বলেন নি; প্রথম থেকেই আরম্ভ করুন।

শরৎ বল্‌তে আরম্ভ করলে—মা বাবা মারা যান আমার যখন খুবই অল্পবয়স। বৃদ্ধ দাদা মশায়-ই আমাকে লালনপালন করেন, আমার এই মামা ছাড়া দাদামশায়ের ছেলেমেয়ে আর ছিল না, কিন্তু মামাবাবুর খুব অল্পবয়সেই চরিত্র-দোষ ঘটে। দাদামশায় তাঁর পুত্রের সেই জন্য বিবাহ দিলেন না এবং তাঁর সমস্ত অর্থ বাড়ীঘর সব অফিসিয়াল 'ট্রাষ্টি'র হাতে দিয়ে গেলেন। উইলে লেখা ছিল—মামাবাবু যতদিন বাঁচবেন বাড়ীঘর এবং বিষয়ের আয় সবই তিনি ভোগ করবেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আমার দখলে আসবে। মামাবাবুর এখন বয়স হয়েছে এবং অতিরিক্ত মদ্যপানে তাঁর শরীরে সামান্য পক্ষাঘাতও দেখা দিয়েছে। সেইজন্য তিনি ঘর থেকে বড়-একটা বেরোন না। কিছুদিন থেকে তাঁর ধারণা জন্মেছে—আমি তাঁকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছি, বিষয়টা তাড়াতাড়ি দখলে আনবার জন্য। মামাবাবুর একবন্ধু একটি মেয়ে রেখে মারা যান। সেই মেয়েটিকে মামাবাবু কিছুদিন থেকে বাড়ীতে এনে রেখেছেন। মেয়েটি বড়ই অনাথা, তাকে আশ্রয় দিয়ে মামাবাবু সত্যই জীবনে একটি মাত্র পুণ্যের কাজ করেছেন। এই মেয়েটির নাম সরযূ। সরযূ আমাকে বলেছে যে,—মামাবাবু ক'দিন ধরে তাকে বল্‌ছেন যে, আমি না কি তাঁকে খুন করবার জন্য সুযোগ খুঁজছি; এমন কি, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, দু'-একদিনের মধ্যেই তাঁকে মরতেই হ'বে এবং সে মৃত্যুর জন্য দায়ী হব আমি। মামাবাবু সরযূকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, একথা যেন ঘুনাক্ষরে আর কেউ না জানে, আর সেও যেন খুবই সতর্ক হ'য়ে থাকে।

অচল বসু বল্‌লেন—এত সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও সরযূ সব কথা আপনাকে জানালে কেন?

শরৎ একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো দেখে অচল বসু বল্‌লেন—আপনার সঙ্গে তার কিছু গোপন সম্পর্ক আছে বোধ হয়?

শরৎ ধীরে ধীরে জবাব দিলে—আজ্ঞে, আমি তাকে ভালবাসি, আর সেও...

অচল বসু বল্‌লেন—বুঝেছি, বলে যান।

শরৎ বল্‌লে -ঘটনাটি আরও ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌লো আজ সকালে। আজ সকালে মামাবাবু সরযূকে ডেকে বল্‌লেন—কাল রাতে আর একটু হ'লে আমার প্রাণ

আবার সেই রাত—নিঝুম, নিস্তব্ধ। এই দুর্ঘটনার পর বাড়ীটা যেন একটা থমথমে ভাব ধারণ করে' আছে।

অচল বসু শোবার ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তাঁর ফাঁকের মধ্যে চোখ রেখে চুপ্ করে' দাঁড়িয়ে ছিলেন।

বারান্দার ঘড়িতে দুটো বাজ্‌লো—ঘুমে চোখ ঢুলে এলেও অচল বসু তার স্থির দৃষ্টিকে একটুও বিচলিত হ'তে দিলেন না।

হঠাৎ একটু সামান্য পদশব্দ তাঁর কানে এসে পৌঁছল। তিনি দরজার ফাঁক থেকে দেখ্‌লেন, একটা ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে শরতের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ স্থিরভাবে থেকে অচল বসু খুব সন্তর্পণে দরজাটা খুলে শরতের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে শরতের ঘরের খোলা জান্‌লাটার কাছে গেল, এবং গবাদশূন্য জানলাটা অতি সাবধানে টপ্‌কে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

অচল বসু জানলার সাম্‌নে এগিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে টর্চের আলো ফেল্‌লেন। লোকটা চম্‌কে অচল বসুর দিকে ফিরে দাঁড়ালো। টর্চের আলো চোখে পড়তে শরতের ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ চেয়ে দেখে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ সরকার-মশায়। তার একহাতে একগাছা দড়ি, আর একহাতে একটা শিশি।

…　　　…　　　…

ব্যাপারটা কি অচলবাবু ?

অচল বসু বল্‌লেন—এই সরকার-মশায়ই তোমার মামাবাবুর কাণে বিষমন্ত্র ঢেলে দেন যে, তুমি তাঁকে খুন করবার চেষ্টা করচো; তোমার মাতামহ-বংশের রক্তধারা সম্বন্ধে তোমার মামাবাবুর জানা ছিল, সুতরাং তাঁর সে কথা 'চট্' করে' বিশ্বাস হ'য়ে যায়।

সরকার-মশায় ভেবেছিলেন, তোমার ওপর সন্দেহ বদ্ধমূল করিয়ে তিনি নিজেই তাঁকে হত্যা করবেন। পুলিশ মৃত্যুকালীন জবানবন্দী ও অন্যান্য প্রমাণে তোমাকেই গ্রেপ্তার করবে—তাঁরও এক ঢিলে দু'পাখী মারা হ'বে।

কিন্তু মোটের ওপর সেটা এখন একটু শক্ত হ'য়ে পড়ায় তিনি মতলব করলেন, তোমাকে 'ক্লোরাফরমে' অজ্ঞান করিয়ে দড়ি গলায় লাগিয়ে হত্যা করবেন। তা' হ'লে সাধারণে ভাব্‌বে, মামাকে হত্যা করার অনুশোচনায় তুমি আত্মহত্যা করেছ। আমি সজাগ না থাক্‌লে এ বাড়ীতে আর একটা হত্যাকাণ্ড ঘট্‌তো।

শরৎ বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু মামাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ?

অচল বসু বল্‌লেন—মনে আছে, তোমার মামাবাবু বলেছিলেন—তাঁর এক ভাই হত্যা-পাগল ছিলেন ?

শরৎ বল্‌লে—হাঁ, কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন ?

অচল বসু বল্‌লেন—না, তিনি তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। হাসপাতাল থেকে রোগমুক্ত হ'য়ে তিনি সাঁওতাল পরগণায় চ'লে' যান। এতদিন সেখানেই ছিলেন, সম্প্রতি তাঁর পূর্ব্বরোগ আবার দেখা দেয় এবং তখনই তাঁর খেয়াল হয়, পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করতে হ'বে। তারপর সহজ উপায়, তোমাদের দু'জনকে হত্যা করা। তোমাদের মৃত্যু হ'লে উনি সহজেই নিজের পরিচয় আদালতে প্রমাণ দিয়ে বিষয়টা ভোগ করবেন।

আমি সরকার-মশায়ের কথায় একটু সাঁওতালি টান পেয়ে সন্দিগ্ধ হই, তারপর তাঁর হাতে ছ'টা দাগ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, ইনিই তোমার নিরুদ্দিষ্ট মাতুল—চণ্ডীচরণ।

…　　　…　　　…

সরযূ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—আচ্ছা অচলবাবু, এই ব্যাধি মাতুল-বংশ থেকে কি এঁতেও সংক্রামিত হ'তে পারে ?

অচল বসু হো হো করে' হেসে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন—তোমার কোন ভয় নেই সরযূ দেবী, ডাক্তারদের নতুন মত হচ্ছে—

নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চোর

রায়বাহাদুর শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এ, ও-বি-ই

আজ অনেকদিন পরে নিতাই কলিকাতায় ফিরিয়াছে। তাহার পৈত্রিক বাটীখানি বড় ভাইয়ের উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে পাওনাদারেরা কিনিয়া লইয়াছে। কলিকাতায় অন্নহীন ও বাসহীন হইয়া এই দুই বৎসর রেঙ্গুনে এক জাহাজের অফিসে কেরাণীর কাজ করিয়া নিতাই কোনক্রমে জীবন-ধারণ করিয়াছে। ব্যবসা মন্দা হওয়ার দরুণ তাহার চাকুরী গেল। কোথায় যাইবে? দেশে ভিটামাটি নাই, বিদেশে চাকুরী পাওয়া শক্ত। অনেক ভাবিয়া নিতাই দেশেই ফিরিল।

দুই বৎসর কত কষ্ট সহ্য করিয়া আজ তার পকেটে একশত টাকা! একসঙ্গে এত টাকা তার পকেটে পিতৃ-বিয়োগের পর আর কখনও আসে নাই। জীর্ণ পোষাকে খিদিরপুরের 'ডক্' হইতে নিতাই পদব্রজে ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুধাও বেশ পাইয়াছে। একটি দোকানে টাট্‌কা খাবার তৈয়ার হইতেছে। কতদিন বাঙলার খাবার খায় নাই। ভিতরে যাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু জীর্ণবেশে কি করিয়া ভদ্রলোকের ভিতর যাইবে। খানিকক্ষণ রাস্তায় পায়চারি করিয়া শেষে পেটের দায়ে খাবারের দোকানে নিতাই ঢুকিয়া পড়িল। কতকগুলি ভদ্রলোক আহার করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদের নিকটে বসিতে নিতায়ের লজ্জা করিতে লাগিল। দোকানের এককোণে বসিয়া খাবার খাইতে লাগিল।

বৈকাল পাঁচটা বাজিতেই অফিস-মুক্ত ক্ষুধার্ত্ত কেরাণীর দল খাবারের দোকানে আসিয়া পড়িল। পাছে কেউ চিনিতে পারে এই ভয়ে নিতাই পিছন ফিরিয়া খাইতে লাগিল। খাওয়া শেষ হইলে হাত ধুইতে যাইবার সময় তাহার প্রতিবেশী ও বন্ধু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"কি নিতাই, কবে এলে?" নিতাই সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"আজ ফিরেছি।" কোথায় থাকিবে জিজ্ঞাসা করায় বলিল—কোন সস্তার হোটেলে আশ্রয় লইবে। অভয়বাবু বলিলেন—তাহা হইতেই পারে না, তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইবে। এই বলিয়া নিতাইকে জোর করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর পাড়ার পুরাতন বন্ধুরা অভয়বাবুর বাসায় নিত্য-নিয়মিত তাস খেলিতে আসিলেন। নিতাইকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত। তাহার মত সচ্চরিত্র ও পর-দুঃখে কাতর যুবা এ পাড়ায় ছিল না। রোগীর সেবা, মৃতের সৎকার, বিপন্নের সাহায্য এই সব কাজে সকলের আগে নিতাই ছুটিত।

বন্ধুদের ভিতর একজন নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কি করিবে? নিতাই বলিল—গত দুই বৎসর যেরূপ কষ্টে দিনপাত করিয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে রিক্স টানা কি মোটর ড্রাইভারি করা বিশেষ লজ্জার কথা হইবে না। যখন নিজেদের মোটর গাড়ী ছিল, তখন সখ করিয়া গাড়ী চালাইত। কে জানিত যে, একদিন সখের বিদ্যায় জীবনধারণ করিতে হইবে? রাত্রি আটটা বাজিতেই খবরের কাগজ দেখিতে দেখিতে এক বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—"চল, আজ চিত্রায় 'অপরাধী' দেখে আসা যাক্।" সকলেই যাইবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু নিতাই কষ্টার্জ্জিত পুঁজির টাকা বৃথা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইল। অভয়বাবু নিতাইকে বলিলেন—"তুমি আমার অতিথি, তুমি আমার সঙ্গে যাবে, তোমার টিকিট আমি কিনে দেব।"

অভয়বাবু কোন বড় মার্চ্চেণ্ট অফিসের বড়বাবু। মোটা মাহিনা পান, ছোট সংসার, খরচ-পত্রও কম। স্বভাব খুব মধুর, সেজন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসেন। সদলবলে 'সিনেমা'য় সকলে উপস্থিত হইলেন। সুসজ্জিত দর্শকবৃন্দ দেখিয়া নিতায়ের পূর্ব্বেকার স্বচ্ছল অবস্থার

ছবি মনের ভিতর উদয় হইতে লাগিল। সিনেমার ছবির অপেক্ষা নিজের জীবনের দারিদ্র্যের ছবিই চক্ষের উপর ভাসিতে লাগিল। সিনেমা ভাঙিলে পর নিতাই অভয়বাবুর সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। তিনদিন তাঁহার অতিথ্যগ্রহণ করিয়া নিতাই একটী গরীব হোটেলে স্থান লইয়া চাকুরীর সন্ধান করিতে লাগিল। পুঁজির টাকা ভাঙিয়া আর কতদিন চলে? শেষে একবেলা আহার করিয়া কোনমতে সে প্রাণধারণ করিতে লাগিল।

আজ নিতায়ের ভূতপূর্ব্ব প্রতিবেশী নবীনবাবুর কন্যার বিবাহ। গরীব হইলেও নবীনবাবু নিতাইকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন। নিতায়ের নিমন্ত্রণ হইল। নবীনবাবু খুব সম্ভ্রান্ত জমিদার। নিষ্ঠাবান ও সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মণ। আহারাদির পর অভয়বাবু তাঁহার দুইটী বন্ধুর সহিত তাস খেলিবার জন্য নিতাইকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নিতাই খুব ভাল 'ব্রিজ' খেলিতে পারে বলিয়া তাহার প্রতিপত্তি ছিল। চারিজনে একটি ঘরে বসিয়া তাস খেলিতে লাগিলেন।

খানিকক্ষণ পরে একটী খেলোয়াড় ধনী রসিকবাবু যখন 'ডামি' হইলেন, তখন একবার কিসের জন্য নীচে গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি একটার সময় খেলা শেষ হইলে রসিকবাবু সিগারেট খাইতে গিয়া তাঁহার সোনার সিগারেট কেস্‌টা পকেট হইতে বাহির করিতে গিয়া খুঁজিয়া পাইলেন না। রসিকবাবু বলিলেন—জামার পকেটে কেস্‌টা ছিল, তিনি ত জামা এইখানেই খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি পড়িয়া গিয়া থাকে, এইখানেই থাকিবে। সকলে ব্যস্ত হইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। এমন কি, কার্পেট ও পাপস্ ওলটাইয়া খোঁজা হইল, অথচ পাওয়া গেল না। রসিকবাবু বলিলেন—"কেসটার দাম পাঁচশো টাকা। তার ত আর হাত পা হয় নি, গেল কোথা?" অভয়বাবু বলিলেন, যে, নিশ্চয়ই অন্য কোথায় কেস্‌টা রসিকবাবু ফেলিয়াছেন। বৃথা রাগ করিয়া ফল কি? কিন্তু রসিকবাবু কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না যে, অন্যত্র জিনিষটা ফেলিয়া আসা সম্ভব। কেবলই বলিতে লাগিলেন যে, জামার পকেটেই সিগারেট্ কেস্ ছিল. জামাটা এইখানেই খুলিয়া রাখিয়া তিনি নীচে গিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই কেহ নিতান্তপক্ষে তামাসা করিয়া তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছেন। অনেক রাত্রি হইয়াছে এবং এত বহুমূল্য জিনিষ লইয়া ঠাট্টাও ভাল লাগে না। সুতরাং তিনি দৃঢ়স্বরে কেস্‌টা চাহিলেন। অভয়বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তুমি কি বল্‌তে চাও আমাদের মধ্যে একজন চোর।"

আর একজন খেলোয়াড় বলিলেন—"রসিকবাবু পুলিশে খবর দিতে পারেন।"

অভয়বাবু বলিলেন—সেটা ভাল দেখাবে না। বিশেষ বিবাহের বাড়ী, তাহাতে নবীনবাবুরও মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইবে। রসিকবাবু বলিলেন—কাহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে। খেলোয়াড়দের মধ্যে সকলেরই অবস্থা ত স্বচ্ছল নয়। বাকী তিনজনে বুঝিলেন যে, এই মন্তব্যটী নিতাইকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। অভয়বাবু চটিয়া আগুন। নিতাইও মলিন বদন হইল। অভয়বাবু বলিলেন—নিতায়েরও আপনার মত অবস্থা একদিন ছিল; আজ না হয় সে ভায়ের দোষে গরীব। কিন্তু সে এত নীচ হয় নি যে, চুরি করবে। রসিকবাবুর কিন্তু বিশ্বাস হইল না। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, সকলেই নিজের নিজের পকেট উল্‌টে ফেলুন। যদি কেউ তামাসা করে' অন্যের পকেটে কেসটা রেখে থাকেন, বেরিয়ে পড়বে।" নিতাই জবাব দিল না। অন্য দুইজন বন্ধু রাজী হইলেন। তাঁহারা পকেট ঝাড়িয়া দেখাইলেন। নিতাই কিছুতেই পকেট দেখাইতে রাজী হইল না। কাঁদিতে লাগিল। অভয়বাবু কত বুঝাইলেন, কিন্তু নিতাই কিছুতেই রাজী হইল না। তখন সকলেরই সন্দেহ নিতায়ের উপর দৃঢ় হইল। যখন মুখ চাপিয়া নিতাই কাঁদিতেছিল, অভয়বাবু তখন জোর করিয়া তাহার পকেট উল্‌টাইয়া ধরিবামাত্র সেখান হইতে কতকগুলি সন্দেশ কার্পেটের উপর পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে নিতাই বলিল যে, সে নিমন্ত্রণ খাইবার সময় অতিকষ্টে ওই সন্দেশগুলি পরদিনের আহারের জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে কল্যকার আট আনা পয়সা খরচ বাঁচিয়া যাইবে। ঠিক এই সময় নবীনবাবু আসিয়া উপস্থিত। দেখিলেন,

নিতাই কাঁদিতেছে এবং কার্পেটের উপর সন্দেশ গড়াগড়ি যাইতেছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে অভয়বাবু সবিস্তার ঘটনার বর্ণনা করিলেন। নবীনবাবু, বলিলেন—"বা, রসিকবাবু, আপনার আক্কেল ত খুব! নীচে যখন গিয়ে আমার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন, তখন যে আপনার সিগারেট্ কেস্ থেকে সিগারেট আপনি খেলেন ও আমায় দিয়ে কেস্‌টা সেখানেই টেবিলের ওপর রেখে এলেন। আমি আবার কেউ চুরি কর্‌বে ভেবে দিতে এলাম। এই নিন্ আপনার সিগারেট্ কেস্।" এই বলিয়া পকেট হইতে নবীনবাবু কেস্‌টা রসিকবাবুকে দিলেন। নিতাইকে বৃথা সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়া রসিকবাবু তাহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। নবীনবাবু কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"রসিকবাবু, আপনার পয়সা হয়েছে, কিন্তু মন নেই। আজ যদি নিতায়ের অবস্থা আপনার মত হ'ত, তা' হ'লে কি ওকে চোর বলে' সন্দেহ কর্‌তে পার্‌তেন। ও গরীব হ'লেও ওদের বংশ আপনার বংশের চেয়ে ঢের বড়। আপনি ত ভুঁইফোঁড়। শ্বশুরের টাকায় বড় মানুষ। এই যে শুভরাত্রে বেচারীকে আপনি কাঁদালেন, এর জন্যে কি শুধু মাপ চাওয়াই যথেষ্ট হ'ল? রসিকবাবু লজ্জায় সিগারেট কেস্‌টা নিতাইকে উপহার দিতে গেলেন। নিতাই কিন্তু তাহা লইতে স্বীকৃত না। নবীনবাবু নিতায়ের অসম্মতি সমর্থন করিয়া বলিলেন—"নিতাই, বেশ করেছ। আমার জমিদারী দেখার জন্য তোমারই মত লোক খুঁজ্‌ছিলুম এতদিন। আজ থেকে দুশো টাকা মাইনেয় তোমায় আমি ম্যানেজার নিযুক্ত কর্‌লাম। পরশু থেকে কাজে এসো।"

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

লিউ আয়াস

শ্রীরেবতী গঙ্গোপাধ্যায়

এমন কোন ছায়াছবির ভক্ত আছেন কি না জানি না—যিনি 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট' দেখেন নি।

কিন্তু শুধু যুদ্ধের বেশ চমকপ্রদ দৃশ্য আছে বলে'ই 'মাইলষ্টোনে'র অসামান্য প্রযোজনার গুণেই 'অল কোয়ায়েট' ছবি অত ভাল বলে' বাজারে নাম করতে পেরেছে এ কথা ভাবলে ভুল করা হবে। প্রতিটী অভিনেতা তা তারা অপ্রধান হোক না কেন—এর সফলতার জন্যে সমান দাবী করতে পারে। আবার এদের মধ্যে কারো চেয়ে বেশী দাবী যে পলের, সে বিষয়ে আর কারু সন্দেহ নেই।

লিউ আয়ার্স আর পল এদের দু'জনকে আলাদা করে' দেখা যায় না—লিউ আয়ার্সের এত সুন্দর অভিনয় হয়েছে এই ছবিতে যে, তা দেখে আমি অবাক হ'য়ে গেছি। শুধু তাই—তার ভালবাসায় পড়ে গেছি। ক্যাটের কথা সন্দেহ নেই—কিন্তু কে সেই পলকে ভুলতে পারে যে পল 'ক্যাটে'র মৃতদেহ কাঁধে ক'রে বকতে বকতে রণক্ষেত্রের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে।

১৯০৮ সালের ২৮-এ ডিসেম্বর 'মিন্নিয়াপলিসে'তে—আয়ার্সের জন্ম হয়। সেইখানকার 'লেক স্কুলে' পড়া সাঙ্গ না হ'তে হ'তেই তাদের সংসার চলে' আসে 'সেন ডিগো'তে। সেখানে লিউ ভর্ত্তি হলো স্কুলে। কিন্তু স্কুলের প্রথম দিনগুলো তার পক্ষে ছিল যাকে বলে দুর্ব্বহ। আপনারা ভাবতেই পারেন না—ছোটবেলায় লিউ ছিল ভীষণ মোটা। এর ফল বুঝতেই পারছেন—তাকে অবিরত ছেলেরা 'মোটা মোটা' বলে ক্ষেপিয়ে তুলতো।

স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে' লিউ 'আরিজনার বিশ্ববিদ্যালয়ে' এলো, আর এখানেই সে ঠিক করলে তার শরীরের ওজন তাকে যেমন করে' হোক কমাতেই হবে। নানা খেলাধূলা

লিউ আয়ার্স

করে' সে তো কোনরকমে সা' হোক মেদমাংস কমালে। কিন্তু এই সময়েই তার জীবনে এল নূতন অধ্যায়। লিউ-এর মা ছিলেন একজন বিখ্যাত পিয়ানোবাদিকা, আর বাবা 'অর্কেষ্ট্রা' দলের নেতা, সুতরাং বংশানুক্রমে তার ভেতরে গানবাজনার সখ ছিল। মাত্র ষোল বছর বয়সেই সে নানা বাজনা বাজাতে পারতো, আর ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে তার এইদিকে আরও বেশী মন পড়লো ঝুঁকে।

লিউ ইউনিভার্সিটী ছেড়ে দিয়ে আরম্ভ করলে নানা জায়গায়—'লস্ এঞ্জেলসে'র নানা হোটেলে আর 'কাফে'তে গান বাজনা। 'মেক্সিকো'তে এই সময় কয়েকদিন এক হোটেলে সে ব্যাঞ্জো বাজিয়ে খুব নাম করে। এই সময়ে এক বড় হোটেলে (এ্যামবাসাডার হোটেল) এক পার্টিতে লিউ বাজাতে যায়। সেই পার্টিতে ছিলেন যত বিখ্যাত 'হলিউডে'র অভিনেতা আর অভিনেত্রী। এইখানেই তার মনে প্রথম উদয় হলো—ছায়াছবিতে অভিনয় করবার বাসনা।

লিউ তার এই বাসনা নিয়ে এত বেশী মেতে উঠলো যে, অর্কেষ্ট্রা ছেড়ে দিয়ে ছায়াচবির কাজের সন্ধানে লেগে গেল। কিন্তু কে না জানে যে, আজকালকার দিনে একজন লোকের হলিউডে কাজ পাওয়া কত কঠিন। সেও চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার সুযোগ যত সহজে পাবে ভেবেছিলো, তা' পেলে না। শুধু ঘুরতে লাগলো 'কাষ্টিং আফিসে'র চারধারে। কিন্তু অন্যের অবস্থা দেখে তার আর ভেতরে ঢোক্‌বার সাহস হয় না। সকলেই আসে জিজ্ঞেস করে "কোন কাজ আছে স্যার—আমার করবার মত?" উত্তর হয় "না"—তারপর শুকনো মুখে বেরিয়ে যাওয়া। কোনরকমে প্রায় একমাস পরে সে পড়লো একদিন ঢুকে আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল নিরাশ হ'য়ে। তার বেলায়ও সেই উত্তর "না।"

দিনের পর দিন যে আশা তার মনে ছিল তীব্রভাবে, তা' আসতে লাগলো শুকিয়ে—এমন সময় একদিন বেড়াতে বেড়াতে সে ঢুকে পড়লো হলিউডের 'রুশ্‌ভেল্ট হোটেলে।' তখন নাচের সময়। কতকগুলি বাজনাদারের সঙ্গে ভাব থাকার দরুণ—তার বিশেষ কষ্ট হলো না সেখানে পরিচিত হ'তে। নাচবার জন্যে লিউএর মন তখন ছটফট করছে—দেখে, সামনেই একটী সুন্দরী মেয়ে একা বসে' আছে। তখুনি সে তার সঙ্গে নাচবার প্রস্তাব করলে—সম্মতিও পেয়ে গেল। অনেকদিন পরে লিউ জানতে পারে যে,—তার নাচের সঙ্গিনী আর কেউ নয়, বিখ্যাত অভিনেত্রী লিলি ডামিটা।

নিশ্চয় কেউ লিউকে দেখেছিলো—ডামিটার সঙ্গে নাচতে। ফলে কিছুদিন বাদে অপ্রত্যাশিতভাবে সে পেয়ে গেল—'প্যাথি' কোম্পানীতে পল বার্ণের অধীনে এক ছ'মাসের চুক্তি।

ছ'মাসের দু'খানা মাত্র দু' রীলের ছবিতে সে অভিনয় করে—'ফেয়ারওয়েজ এ্যাণ্ড ফাউল' আর 'কম্‌প্রোমাইজ।' কিন্তু এই ছ'মাসই—তারপর পল বার্ণ চলে' গেলেন 'মেট্রো'তে—কিন্তু তিনি ভোলেন নি লিউ আয়ার্সকে। তিনি জানতেন যুবকের শক্তির কথা, তাই গ্রেটা গার্বোর পরবর্ত্তী ছবি, 'কিস্'-এতে যুবক প্রেমিকের ভূমিকা লিউকে দিলেন। গ্রেটা গার্বোর মতন বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রীর বিপরীতে অভিনয় করতে নামলো লিউ আয়ার্সের মতন একজন অবিখ্যাত অভিনেতা কিন্তু এইখানেই তার ভবিষ্যৎ জীবনের সূত্রপাত।

কিন্তু তবুও লিউআয়ার্সের নাম কেউ জান্‌লে না, গার্বোর নামের তলায় সে পড়ে' গেল চাপা। এই সময়ে পল বার্ণ তাকে 'ইউনিভার্সেলে'র পরবর্ত্তী ছবি 'অল কোয়ায়েটে' 'পলে'র ভূমিকার জন্যে চেষ্টা করতে বলেন। আয়ার্স সেখানে গেল কিন্তু সম্পূর্ণ হতাশভাবে—কারণ, হলিউডের প্রায় প্রত্যেক উদীয়মান তরুণ অভিনেতার চেষ্টা পলের ভূমিকা পাবার। প্রায় বারোজনকে পরীক্ষা করা হলো। প্রণাম ঈশ্বর—লিউ আয়ার্সই পেয়ে গেল—পলের ভূমিকা।

অল কোয়ায়েট দেখানো হবার পর বাইরণের মতন লিউ আয়ার্স একদিন সকালে জেগে দেখে পৃথিবীতে বিখ্যাত হ'য়ে গেছে।

এরপর 'কমন্ ক্লে',—'ইষ্ট ইজ্ ওয়েষ্ট,' 'আপ ফর মার্ডার' 'হেভেন্ অন্ আর্থ' ইত্যাদি ছবিতে সে অভিনয় করেছে।

লিউ বিয়ে করলে অভিনেত্রী লোলা লেন্‌কে প্রেমময়ী স্ত্রী, জগৎজোড়া যশ, আর প্রাণভরা স্ফূর্ত্তি নিয়ে যুবক লিউ আয়ার্স যদি সুখী না হয়তো, সুখী কে?

কিন্তু তবু এরা সুখী হ'তে পারলে না, বিচ্ছেদ আইনের বলে পৃথক জীবনই এদের বাঞ্ছনীয় হ'য়ে দাঁড়াল।

রেবতী গঙ্গোপাধ্যায়

রবার্ট মণ্ট গোমারি

শ্রীমতী প্রতিভা শীল

এই বিখ্যাত শিল্পীটি জন্মেছিলেন বেশ বড় লোকের ঘরেই এবং সেই যাকে বলে 'উইথ এ গোল্ডেন স্পুন্',কিন্তু ভগবানের লীলা বোঝা ভার। যখন তাঁর বয়স প্রায় ষোল, স্কুলের পড়া তখনো শেষ হয় নি, হঠাৎ বাপ গেলেন মরে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আর্থিক অবস্থার এতদূর অধঃপতন হলো যে, কল্পনা করা যায় না।

তারা দু'ভায়ে চাকরীর চেষ্টা করলেন। কিন্তু বড়-লোকের ছেলের উপযুক্ত কি চাকরী আছে? হয় ত তাদের দিয়ে চাকরী করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁদের তখনকার সাংসারিক অবস্থার কথা শুনে ফোরম্যানের মন গেল গলে। তিনি দু'জনকেই ঢুকিয়ে নিলেন।

রবার্ট এরপর 'ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী'র অধীনে জাহাজের ডেকে চাকরী পেলেন। এইখান থেকেই উনি একদিন হলিউডের সন্ধান পান।

হলিউডে তাঁর মত স্বাস্থ্যবান সুপুরুষের অভ্যর্থনার ক্রটী হলো না। 'মাস্ক ইন্ দি ফেস্' পুস্তকে অভিনয় করেই

LIONEL BARRYMORE *and* ROBERT MONTGOMERY *in a scene from* "NIGHT FLIGHT"

"নাইট ফ্লাইটে"র একটি দৃশ্যে লায়নেল ব্যারিমুর ও মণ্ট গোমারী—

দু'-একটা ভাষায় কথা বলতে পারেন—হয় ত বেশ ভাল সাঁতার কাটতে বা পোলো খেলতে পারেন। কিন্তু তা'তে চাকরীর দিক্ থেকে কী সুরাহা হ'তে পারে?

দু'টী ভায়ে এক অদ্ভুত সাজে সেজে গিয়ে দেখা করলেন 'নিউ ইয়র্কে'র এক রেলওয়ে 'ফোরম্যানে'র সঙ্গে। ফোরম্যান তাদের সাজ দেখে হেসেই আকুল। বল্লেন: যাদের চাকরী করবার কি সাজ হওয়া উচিত তাই-ই জানা নেই, তিনি ডিরেক্টার এবং দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এ ছাড়া, তিনি নিজে বেশ ভাল গল্প লিখতে পারেন, কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই সকলের খুব বেশী প্রিয় হ'য়ে পড়লেন। তখন তাঁর মনে ডিরেক্টার হবার উচ্চ আশা উঁকি মারতে লাগল। অবশ্য এখানে একটা কথা বলা বোধ হয় অবান্তর হবে না যে, তাঁর এই 'এ্যামবিশান'টা

চিত্র-জগতের পঞ্চশস্য

গত সংখ্যায় আমাদের দেশের নট-নটীদের জীবনের বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করব বলে' কথা দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কথা-রক্ষা করা এবার আর হ'য়ে উঠ্‌ল না। আগামী আশ্বিন মাসে এ বিষয় আমরা জানাবার চেষ্টা করব। বিশেষতঃ, ভাদ্র মাস মলমাস, কোন শুভকাজ আরম্ভ না করাই ভাল।

* * *

'নিউ থিয়েটার্সে'র 'আরণ্য-চিত্র—মহুয়া' প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। হয় ত আমাদের কাগজ বেরুবার আগেই তা' 'চিত্রা'য় আত্ম-প্রকাশ করবে। যতদূর জান্‌তে পারা গেছে, তা'তে মনে হয়—সর্ব্বদিক্ দিয়েই এখানি চিত্র-প্রিয়দের আনন্দ দিতে পারবে। মহুয়ার নাম ভূমিকায় অভিনয় কর্‌ছেন শ্রীমতী মলিনা—এখনকার দিনে বাংলা চিত্র-জগতে এঁকে উজ্জল নক্ষত্র বলা যেতে পারে। সাবলীল নৃত্যের অধিকারিণী বলে' ইনি খুব অল্পদিনেই জনসাধারণের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

* * *

মহুয়ার পর নিউ থিয়েটার্সের তরফ থেকে শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে'ও ছায়ার মায়ায় বাঁধা পড়্‌বেন বলে' জানা গেছে। চিত্রামোদীমাত্রেই শুনে সুখী হবেন যে, অনেক দিন পরে 'প্রিয় ডাক্তারে'র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক অবতীর্ণ হবেন। অমরবাবু একজন কৃতী অভিনেতা। অদ্যাবধি যতগুলি ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন, কোনোটীতেই অকৃতকার্য্য হন নি, বরং দর্শকমহলে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার গুঞ্জন শোনা গেছে।

* * *

যে সুন্দর মেয়েটীর ছবি আমরা অন্যত্র ছাপলাম, সম্ভবতঃ তার জীবনী জানবার জন্যে অনেকেই উৎসুক হবেন। হবারই কথা। কেন না, এই মেয়েটীকে নিয়ে একদিন 'প্যারামাউন্ট' আর 'ইউনিভারস্যালে' 'ট্যাগ-অব-ওয়ার' লেগে গিয়েছিল। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, তখন তিনি ছায়াছবির পরদায় একবারও এসে দাঁড়ান নি।

বিবাদ শেষকালে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়া[illegible] যে, সন্ধিদূত মিঃ উইল হে'র শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য উপায় রইল না। তাঁর বিচারে ইউনিভারস্যালই জয়ী হ'ল। বলা বাহুল্য, ইউনিভারস্যালে তার চুক্তিও হ'য়ে গেল লম্বা দিনের [illegible]

তাই বলে' ইনি এর আগে একেবারে অখ্যাত ছিলেন না। ছেলেবেলায় স্কুল-কলেজে পড়ার আমল থেকেই ইনি ষ্টেজে অভিনয় করতেন। মাত্র তের বৎসর বয়সে ইনি 'দি ব্যাড ম্যান' নাটকে একটী বড় ভূমিকায় অভিনয় করেন।

'ক্যালিফোর্ণিয়া'য় 'সান্টা মোনিকা'য় ৪ঠা জুলাই ১৯১০ সালে এঁর জন্ম হয়।

কলেজে পড়বার সময়ই গ্লিয়ার গর্ডন নামে একজন শিল্পীর সঙ্গে গ্লোরিয়ার আলাপ হয় এবং সুখের কথা বিয়ে করে' আজও এরা ঘর-সংসার করছেন। আজও বল্‌লাম এই কারণে যে, হলিউডে বিয়ে করা যতটা সহজ, ঘর করা ততটা নয়।

* * *

চিত্রজগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধা অভিনেত্রী মেরী ড্রেস্‌লার আর ইহজগতে নেই।

১৯৩২ সালে তিনি ওয়ালেস বীয়ারীর সহিত 'মিন্ এণ্ড বিলে' অভিনয় করে' 'একাডেমি অফ আর্টস এণ্ড সায়েন্স' থেকে সে বৎসরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেন।

'এম্‌মা' পুস্তকে এঁর অভিনয় চিরদিন এঁকে অমর ক'রে রাখবে।

———
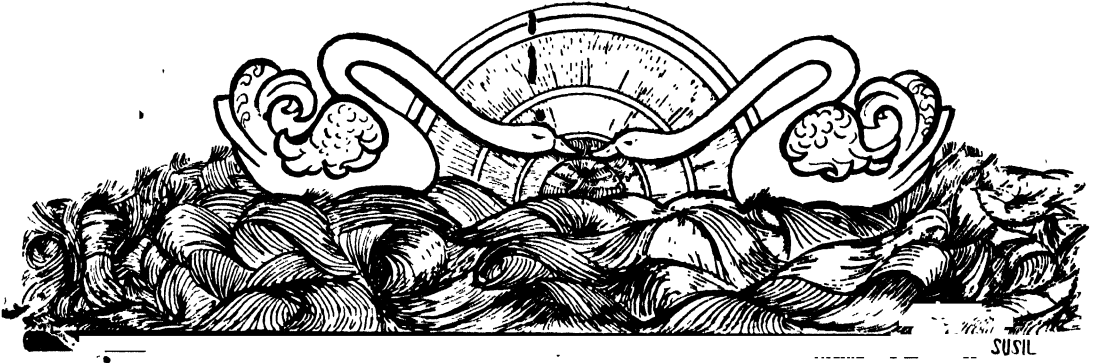
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪১ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ফাঁসীর পূর্ব্ব-রাত্রে

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে মর্ম্মন্তুদ স্বর প্রাণের নিভৃত প্রকোষ্ঠ আলোড়িত করিয়া যে উন্মাদনার সৃষ্টি করিতেছিল, তাহাতে নিদ্রা অসম্ভব! শুধুই কি নিদ্রা? শয্যার কোমল স্নেহপাশ-বন্ধন অতীব ভীষণ হইয়া পড়িল, কাজেই নব-নিয়োজিত জেলার অনুশাসন বসুকে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

তখনও সম্মুখে তার কাতর স্বর করুণাপ্লুত হইয়া বোধ হয় দূরের নিভৃত 'সেল' হইতেই ভাসিয়া আসিতেছিল, "জেলারবাবু, জেলারবাবু মৃত্যু অতিথির শেষ অনুরোধ—শুনে যান্, শুনে যান্।"

সাধারণ জেলারদের প্রস্তর কঠোরতা বুকের অনেকখানি জুড়িয়া থাকিলেও অনুশাসন এ অনুনয় আবেদন উপেক্ষায় ঠেলিয়া রাখিতে পারিলেন না, ধীরপদে বদ্ধ [illegible]রের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

হাতের হেরিকেনটা প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার বেগ সহ্য করিতে পারিল না। একবার খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া গেল। অনুশাসন চাহিয়া দেখিলেন—আকাশে স্থান নাই, কেবল কাজল কালির হুড়াহুড়ি, ছুটাছুটি। বর্ষণ, তখনও নামিয়া আসে নাই, তবে খুব বেশী বিলম্বও আছে বলিয়া মনে হয় না। ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছায় ফেলিয়া আসা পথের দিকে পা বাড়াইতে গিয়া অনুশাসন থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, পশ্চাতে অতি নিকটে সেই স্বর! কে যেন বলিতেছে—"দয়া ক'রে যখন এলেন—ফিরবেন না, আমার মেয়াদ ত এই আঁধার যবনিকার শেষ মুহূর্ত্ত ক'টি! এর পর আর যখন বল্‌তে আসব না—"

চীৎকার করিয়া অনুশাসন বসু বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু, কিন্তু তোমায় এভাবে বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে দিলে কে?"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণে পকেটে হাত দিলেন। লোকটা খানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "পাবেন না জেলারবাবু, সঙ্গেই আনেন নি তা' পাবেন কোথা থেকে? তবে এটা জানুন, রক্তে হাত

আর আমি রাঙাব না, বিশ্বাস হচ্ছে না, নয়? ঠিক কথা, কয় ঘণ্টার পর যাকে এ দেহের বোঝা বওয়ার ভার ছাড়তে হবে' এমন মুক্তি-আস্বাদ-লে'লুপতা সে কি কখন ছাড়তে পারে! কিন্তু আমি বলি পারে, আমার নিজের দিক দিয়ে অন্ততঃ এ কথাটা উচ্চারণ করতে—না, আমার একটুও বাধছে না। ভয় নেই চলুন, ওইখানটায়—ওই গাছের গুঁড়িটায় আপনি বসুন, আমি বসছি এই মাটীতে। এই জমাট বাঁধা কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মুক্তির আহ্বান আমি পাচ্ছি। হ্যাঁ, দয়ালু কোম্পানী-বাহাদুর আজ আমায় ছুটী দিচ্ছেন, সে ছুটী কত মিষ্টি, কত আগ্রহের তা' শুনুন।

লোকটার মাথাটা কি, সময় আর সুযোগ পেয়ে বদি-য়াতি সেধেছে! অনুশাসন পার্শ্বে, পশ্চাতে, সম্মুখে বেশ ভাল করিয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন, না সরিয়া পড়িবার পথ-রোধ করিয়া লোকটা তার বক্তব্য তাঁহাকে শুনাইতে প্রস্তুত হইয়াই যে দাঁড়াইয়াছে। উপায়হীন অবস্থায় তিনি লোকটীর নির্দ্দেশিত গাছের গুঁড়িটায় 'থপ' করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

জেলারবাবুর ভাব বৈলক্ষণের দিকে মোটেই দৃষ্টি না দিয়া লোকটী বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ, আজ আপনার কাছে আমি বুক খোলসা ক'রে সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যেতে চাই, এখানকার যা কিছু, এইখানেই শেষ ক'রে যাওয়াই ভাল, নয় কি? কে জানে, পারে পাড়ি দিয়েও যদি এমনি আবহাওয়ারই মধ্যে বাস ক'রতে হয়! তা' হ'লে—না, আমি পারব না, আপনি শুনুন, কেবল ধৈর্য্য ধ'রে শোনার বেশী ভিক্ষা আমি চাইব না, কারণ তার বেশী পাওয়া যে অসম্ভব তা আমি ও যেমন জানি, আপনিও ঠিক তেমনি জানেন আর এটা শুধু জানি না, মানি, সমর্থনও করি। আপনি হাজার হ'লেও সামান্য কর্ম্মচারী ছাড়া আর ত কিছু নয়, এ চাকরীর সুখ যা তাও আমি হাড়ে হাড়ে বুঝে নিয়েছি, আর বুঝেছি ব'লেই আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে এতটুকু দ্বিধা করছি না। শুনুন, মুক্তির হাওয়া আমায় ডাকছে, তার অমিয় শীতল স্পর্শ এখন থেকেই আমি যেন পাচ্ছি। জানি না পরে কি আছে। কিন্তু যাই থাক্, আমার পক্ষে তা' শুভই।"

"বাপ মারা গেলেন যখন, তখন আমি আট, মনসুর ষোলোর গণ্ডী উৎরে গিয়েছে। মা এক হ'লেও জন্মদাতার ভিন্নতায় আমি তাদের ঠিক স্নেহের পাত্র হ'তে পারি নি। শুনেছি, মাত্র এক বৎসরের ছেলেকে বনে নিয়ে গিয়ে মনসুর আমায় এক শিয়ালের গর্ত্তে রেখে আসতে দ্বিধা করে নি। দোষ আমারি, কেন না পিতৃসৌভাগ্যে আমি বাল্যেই যেটুকু আদর যত্নের অধিকারী হয়েছিলুম, পাওয়া দূরে থাক্, মনসুর পক্ষে আমার বয়সে তা স্বপ্নের কল্পনা-স্বর্গ ছাড়া আর কিছুই ছিল না! কাজেই ঈর্ষার ইন্ধন চাপা আগুনের মত তার বুকে সর্ব্বক্ষণই বিরাজ করত।

"কিন্তু মরণ, আমায় বরণ আলোয় অভ্যর্থনার গান শোনাবার জন্যে এগিয়ে এল না, কাজেই চাপা শিশুর কান্নায় আকৃষ্ট পথিকের ক্রোড়ে চ'ড়ে পিতৃ-ঐশ্বর্য্যের ভাবী অধিকার দখল করতেই আমি ফিরে এলুম। বাবা, মনসুর এ ছেলেমানুষী মার মত ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারলেন না, কাজেই শাসন-হস্তের কষাব আঘাত বেচারীর পিঠে যে অলঙ্কারের আল্পনা এঁকে দিলে, মায়ের দেওয়া দাওয়াই তার ওপরটা শুকিয়ে দিলেও চিরদিনের জন্যে যে দগদগে ঘা প্রাণের পরতে অঙ্কিত হ'য়ে রইল, তা আর মুছল না। কেন জানি না, গর্ভধারিণী হ'লেও। নির্য্যাতিত প্রথম সন্তানের মুখ চেয়ে সেদিন হ'তে মা আমাকে ঠিক বিষ নজরে না হোক স্নেহের চক্ষে দেখতে পারলেন না। এই সময় তাঁরই স্নেহের দাবী নিয়ে এগিয়ে এলেন—আমার ফুফু, মতিয়া জুম্মন্নেসা।

"বাবার মুখের ঘন চিন্তার রেখা কেটে গেল। নির্ব্বিচারে তিনি আমার শিশুদেহটাকে ভগ্নীর হাতে তুলে দিয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। জননীর স্নেহের কারায় প্রবেশ অধিকারী না হ'তে পারার হয় ত এও এক কারণ।"

দুই

লোকটির নিশ্চল দৃষ্টি আকাশের তখনকার তীব্র তাণ্ডবতায় হয় ত আকৃষ্ট হইল। সে নির্ব্বাক হইয়া খানিক উদ্দেশ্যহীনভাবে বীভৎস শূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল।

জেলার অনুশাসনবাবু বলিলেন, "তোমার নাম, কি বলে ড্যাকব ?"

লোকটী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, বলিল, "নাম ওসমান আলি নিজামত খাঁ, কিন্তু এখানে আমি একশ একাশী বলেই পরিচিত। জেলের গণ্ডী-বেড়ার মধ্যে যে ঢোকে তার পূর্ব্বের অনেক কিছুই পিছনে ফেলে আসতে হয়। বলতে পারেন বাবু, আপনাদের দেবতার মাতৃশক্তি-পূজায় কেন পতিতার দরজার মাটি লাগে ? কারণ না কি শুনেছি, পুণ্যবান তার সব পুণ্য সেইখানেই ফেলে ভেতরে এসে ঢোকেন। কিন্তু জেলখানার সিং-দরজার মাটি ত সে ক্ষেত্রে আরও পবিত্রই হওয়া উচিত, নয় কি ?

অনুশাসন বিকৃতমুখে এ আঘাত সহ্য করিলেন। বলিলেন, "জানি না, কিন্তু ওসমান—"

বাধা দিয়া কয়েদী বলিল, "না বাবু, একশ একাশী।"

"বেশ তাই, এখানে দৈবের হাতের ক্রীড়ার পুতুল হ'য়ে প্রকৃতির বাদল ধারায় স্নান ক'রে কি লাভ, তার চেয়ে আমার ঘরে চল।"

লোকটী সজোরে মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "সে হয় না বাবু, ভুলছেন কেন—আমি ফাঁসির আসামী !"

অনুশাসন হাসিয়া বলিলেন, "এখানেও ত তাই।"

"তাই সত্য, কিন্তু তবু তফাত আছে। আর সে তফাত আপনার মত বুদ্ধিমান লোককে না বোঝালেও চলবে। যাক, শুনুন তারপর।"

"বাপ মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম, আমাদের নাকি অসীম ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটেছে। বাবার হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ অচল হবার এও একটা কারণ। ব্যাঙ্কের জমান টাকা চিরদিনের জন্যে এক অজ্ঞাত ঘরে জমা হ'য়ে গেছে, যার নাগাল মাথা খুঁড়েও আর পাওয়া যাবে না।

"সেই শিশুবয়সেই বুঝলাম এর ভেতর একটা ঘোর ঘন-ঘটার হাত আছে, যাকে অতিক্রম করা বালক আমি বা ফুফু-মতিয়ার সাধ্য নয়।

"বয়স অল্প তাতে কি, দিন-মজুরীর অভাব হ'ল না। খিলাফৎ অফিসে ছোকরা চাকরের পদে বাহাল হ'লুম মনসুর তাড়নায় অস্বীকার করবার উপায় রইল না, ফুফু একহাতে চোখ মুছে আমায় উর্দ্দি এঁটে দিলেন।

"বাহারনি' আমার কচি হাতে যদিও কড়া ফেলে তার নিজের উপযুক্ত ক'রে তোলবার দেরী করলে না, তবু এ চাকরী আমার রইল না। শোন বাবু, বদরুদ্দিন নিয়ামৎ সেখানকার একপ্রকার কর্ত্তা, তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টির তলায় থেকেও আমি রক্ষা পেলুম না, অপমানিত হ'য়ে আমায় বেরিয়ে আসতে হ'ল।

"মনসুর এক বন্ধু হুজুরালি মহম্মদ অফিসের এক পদস্থ ব্যক্তি। সেদিন বর্ষার প্রাতে ভিজে ওভার-কোটটা হাতে তুলে দিয়ে হুকুম দিলেন, "এই চা নিয়ে আয় শীগ্‌গির।"

"গেলাসটা ধুয়ে নিয়ে আকাশের অবিশ্রান্ত বর্ষণ উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছিলুম। পিছনের গর্জ্জনে চম্‌কে ফিরে দাঁড়ালুম। হুজুরালি বেশ কঠোর স্বরে হুকুম শুনলুম, "চা চেয়েছি, শুনতে পাস না, মিচকে শয়তান, বেরুচ্ছিস কোথা ?"

"প্রশ্নের জবাব সাদা কথায় দিলুম, কিন্তু তাঁর এ ব্যবহারটা মোটেই ভাল লাগল না। কিন্তু চাকর মনিবের যেখানে সম্বন্ধ সেখানে অধঃস্তনের ভাল লাগা না লাগার যে কোন দামই নেই, তা বালক বয়সেও আমার বোধের বাইরে ছিল না। কাজেই মুখ ফিরিয়ে বললুম, "তাই আনতেই ত যাচ্ছি।"

"আনতে যাচ্ছি। কেন, নিজে এমন নবাবপুত্তুর হয়েছ যে, এক গ্লাস জল চাপাতে পার না ? হতচ্ছাড়া কোথাকার ! যত সব বেইমানকে নিয়ে—"

"পালিয়ে বাকী কথা শোনার হাত এড়াতে চাইলুম। কিন্তু পিছনের ডাক আমায় আবার ফিরিয়ে আনলে। জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর দিলুম, "দেখতে যাচ্ছি দরোয়ানের চুলিতে আগুন আছে কি না।"

"নিজের পাশের ছেঁড়া কাগজের ঝোড়াটা দেখিয়ে দিয়ে হুজরালি বললেন, "এগুলো রয়েছে কি করতে শুনি ?"

নিরুত্তরে ঝোড়াটা টেনে নিয়ে কোণের দিকে সরে' গেলুম। অভিমান আমায় রীতিমত অন্ধ করে' তুলেছিল

—হাতের দেশলাইটা হঠাৎ জেলেই চমকে উঠলুম—এ কি

"নোটখানা হাতে নিয়ে সরে' উঠে দাঁড়িয়েছি. হুজুরালি ছুটে এসে হাতখানা চেপে ধরে গর্জ্জে উঠলেন, 'চোর !'"

"চুরী না করেও বদনাম নিয়ে আমায় অফিস ছাড়তে হ'ল। বদরুদ্দিন-সাহেব কথাটা ঠিক্ ঠিক্ বিশ্বাস করতে না পারলেও আমায় ধ'রে রাখবার সংসাহস তাঁর জোগাল না। কাজেই শুষ্কমুখে বিনা দায়েব দায় মাথায় সোজা তুলে আমি ফিরে এলুম। ফুফু শুনলেন সব, কিন্তু করবার মত কি-ই বা ছিল তাঁর !"

কড়কড় শব্দে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। মাথার উপর আলোর ঝলক সর্পিল গতিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অনুশাসন কিন্তু উঠিতে পারিলেন না, স্তব্ধ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন।

ওসমানি আবার কথা আরম্ভ করিল।

"এ দুর্য্যোগ যতই বড় হোক্ বাবু, আমার প্রাণের দুর্য্যোগের কাছে তার তুলনাই হয় না। জানেন, ফফু নিজের কানে দুই বন্ধুর পরামর্শ শুনেছিলেন, এ চাকরী যাওয়া, আমার চোর অপবাদ, সবই, তাদের চক্রান্তের ফল।

তিন

"ফেরি করে' পথে পথে ফিরতুম। ছ'পয়সা, 'দুপয়সার বাটি, গেলাস, পিকদান এমনি আরও আরও কত কি। দু'বেলা দু'জনের পেটের ভাতের অভাব এতে হ'ত না, তার বেশী আমরা চাইতুমও না। কাজেই এততেও ফুফু আর আমি এক ভাঙা ভাড়া করা কুঁড়ের মধ্যে বেশ সুখেই ছিলুম।

"কতদিন দেখেছি মনসুর আমারি বাপের পয়সায় বাবুয়ানি ক'রে সহরের পথ মোটরে কাঁপিয়ে চলেছে। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য এক গলি পথ লক্ষ্য ক'রে আমি হাঁক্‌তুম, 'সবার দরকারী জিনিষ ছে ছে পয়সা, দো দো পয়সা, কাঁচি, ছুরি, এনামেল, এলুমিনিয়ম।'

"সেদিন সারাদিন ঘুরেছি। পা দু'খানা নেহাত অবাধ্য হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু দিনের খোরাক যোগ দু হ'লেও ভাঙ্গা-কুঁড়ের দেয় খাজনার যোগাড় তখনও করে' উঠতে পারি নি। কাজেই একটা খালি রকে নিজের দোকান সাজিয়ে বসেছিলুম। মুখে সেই প্রত্যেক ক্ষণের বাঁধা গান, 'আসুন বাবু, আসুন মা, ছে পয়সা, দো পয়সা, দরকারী ভাল ভাল জিনিষ।'

একটী দু'টী ক'রে অনেকগুলি লোক জমায়েৎ হ'ল। দু'-একজন নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লে। আমার গান আমার সুর লাভের আশায় উন্মুখ হ'য়ে একই গৎ বারবার আবৃত্তি করতে লাগ্‌ল। ফিরিওয়ালার ভাগ্যে তা' ছাড়া আর কি-ই বা হ'তে পারে ?

"কিছু কিছু বিক্রীও হ'তেও সুরু হ'ল। আরও কিছুক্ষণ ঠিক্ এইভাবেই যদি ভিড জমিয়ে রাখ্‌তে পারি আমায় ভাড়ার ভাবনা আর ভাবতে হবে না। কাজেই উৎসাহে কণ্ঠ প্রফুল্লমুখ হ'য়ে উঠলো।

"একজন মাতাল এক বেশ্যাকে নিয়ে এগিয়ে এল। সবার ঘৃণ্য এ জাত, কিন্তু আমাদের মত রাস্তার ফেরি-ওয়ালার কাছে—এরাই ধনকুবের। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কেবল মজা করবার জন্যেই এরা এমন অনেক কাজ যা' করে তাতে আমার মত সমপদস্থ উপায়হীনের উপায়ের পথে আলোক রেখা অতি সহজেই দেখা দেয়। কাজেই আশায় উৎফুল্ল হ'যে আমি ভিড় সরিয়ে তাদের আগমন পথ নিজে থেকেই তৈরী ক'রে দিলুম।

'জিনিষগুলো মন্দ নয় জানলে, দামও সস্তা। আহা, নাও কিছু কিছু ! বুঝলে ?'

"নারীকণ্ঠের এ আশ্বাসিত স্বর স্বর্গের দৈববাণীর চেয়ে কিছু কম বলে' মনে হ'ল না। সাগ্রহে তার সামনে প্রত্যেক জিনিষটী তুলে ধরতে লাগলুম।

'ওটা কি পিকদানি না, এলুমিনিয়মের ? বেশ হালকা ত, দাও একটা।'

"নেশার ঘোরে চোখ দু'টী বুজে আছে যেন। বিকৃতকণ্ঠে পুরুষ বল্‌ল, 'একটা কি ছ'টা নাও, ছ'টা নাও একটা কম নয়, একটা বেশীও নয়, বুঝেছ, ঠিক্ ঠিক্ হাফ্-এ ডজন।'

"কণ্ঠস্বর শুনে একবার চমকে উঠেছিলুম হয় ত। পরক্ষণে সামলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলুম। বেশ্যা মুখ টিপে হেসে বল্‌ল—'হাফ্-এ ডজন ত বুঝলুম, কিন্তু এতগুলো নিয়ে করবে কি?'

পুরুষ জেদ ধরে বল্‌ল, 'এর কমে আমার মান থাকবে না, নাও। হেঁা হেঁা, করবার ভাবনা, দেখিয়ে দেব'খন, নাও ত।'

"ত্বরিত হস্তে ছ'টা মাল নিজের হাতে বেছে মেয়েটীর সাম্‌নে এগিয়ে ধরলুম। বেশ্যা বল্‌লে, 'আর আর কি নেবে? বেশ গেলাস, বেলোয়ারী কাজ করা। ছুটো দাও ত।'

'না না, মোটে ছুটোয় কি হবে,—[illegible] মিনিটে ফরসা। দাও হে ছ'ডজন, বুঝ্‌লে। বাজিয়ে দাও বাবা, আমায় কাঁচা ছেলে পেয়েছ? ঘরে নিয়ে গিয়ে শেষে যে দেখ্‌ব ফুটোফাটা, না, সেটী হচ্ছে না। না না, তোমায় হাত দিতে হবে না, ওই দেবে। নাও ওয়ান, টু, বি রেডি!'

"ডজনকতক তুলে নিয়ে সে রাস্তার ওপরেই ছু'-চারটে আছড়ে ভেঙে ফেল্‌লে। সঙ্গিনী হাত ধরে বাধা দিয়ে বল্‌লে, 'আহা কি কর, বেচারী গরীব মানুষ!'

"মাতাল উত্তেজিত-কণ্ঠে বল্‌লে, 'বেশ কর্‌ছি। দাম দিয়ে জিনিষ নিচ্ছি, আমার খুসী আমি ভাঙব। কারুর বাবার কথা কইবার এক্‌তার এতে নেই।"

"তথাপি অসহায় জ্ঞানে আমারই পক্ষ নিয়ে মেয়েটী বল্‌লে, 'বেশ ত, দামটা আগে দাও, তারপর যা খুসী করো। লোকসান করে শেষে যদি টাকা না দিতে পার—'

'কি, আমি পারব না টাকা দিতে, আমার অভাব! কে বলে, কোন বাঁদীর ছেলে বলে?'

"উত্তেজিত মাতাল রুখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। মোলায়েম স্বরে স্ত্রীলোকটি বলিল, 'কে বলবে, বল্‌ছি আমি। জিনিষ যখন নেবে, টাকাটা দিয়েই নাও।'

"ব্যাগ খুলিয়া একখানা দশ টাকার নোট আমার মুখের ওপর তাল পাকিয়ে ফেলে দিতে দিতে সে বল্‌ল, 'এই নে, কতদাম হ'ল, ব্যস, হিসেব চাই না। জলদি বোলো, কেতনা দাম হুয়া।'

"নারীর কোমল হস্ত এবার কঠিনভাবে তাকে আকর্ষণ করল, বল্‌ল, যাক্ গে, কাজ নেই মিছে গণ্ড-গোলে—মোড়ে পুলিশ ঢুক্‌ছে, চল ই বেলা সরে' পড়ি।'

'এমনি সবুর, কে দিলে পুলিশে খবর, কোন্ শালা দিলে? আমায় পেঁচী মাতাল পেয়েছ? এই উল্লু, কমবখৎ কি বাচ্ছা, তুম নে খবর দিয়া?'

চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম, কিন্তু বিস্মিত হলাম না। কেন না, বক্তা যে আমারই রক্ত-সম্পর্কীয়, মাতৃকুল পবিত্রকারী মনস্থ, রাগ অপেক্ষা ক্ষোভই কিন্তু অধিক হ'ল। বল্‌লাম, 'ঝুট্ কাহে বাজ্‌তে হো, কমবখৎ হাম নেহি।'

'তব ক্যা, হাম?'

'হুজুরকা মেহেরবাণী, হাম কিসিকোকয়তে নেহি। আপ হি আপনা মু সে বাজতে হে।'

পরক্ষণে কি যে হ'ল ঠিক যদিও বুঝ্‌লাম না, তথাপি মাসখানেক হাসপাতাল বাসের পর হাজত-ঘরে দেয়ালের পশ্চাতে আত্মগোপন কর্‌তে হ'ল।

"যথাসময়ে আদালতে কেস্ উঠিল। অচিরে প্রমাণিত হ'তে বিলম্ব হ'ল না আমি চোর, আমি গুণ্ডা, আমি খুনে, আমি জালিয়াৎ।

"হ্যা, জালিয়াতির প্রমাণ নোটখানা আমারই কাছ থেকে পেয়ে পুলিশ তৎপরতার কসরৎ দেখিয়ে সেবার সুনাম অর্জ্জন করলে। আমার গরীব কুটীর তোলপাড় করে যদিও কিছু পাওয়া গেল না, তথাপি বামাল যখন আমারই দেহ-বস্ত্রে, তখন দ্বিতীয় প্রমাণের আবশ্যক ছিল না।

"অপরাধ স্বীকার না করে সকল প্রকারে মৌন থাকার অপরাধে সাজা কিছু গুরুতরই দিয়ে হাকিম বল্‌লেন, 'এ শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ—যাহারা দোষী, অথচ সে অপরাধের দণ্ড হাস্যমুখেই মাথা পাতিয়া লয়। উপেক্ষার সহিত জানাইতেই চাহে যে,—আইনের পবিত্রতাকে ইহারা নির্ম্মম উপহাস করে। ইহারা শুধুই যে নিজের শত্রু তাহা নয়—নিজের দেশের, সমাজের, ভীষণ আততায়ী! অতএব দণ্ড হ্রাস করিলে সমাজের, দেশের, মনুষ্য-কল্যাণের বিদ্রোহিতা আচরণ

করা হয় বলিয়াই এ ভাবের গুরুদণ্ড দিতে বাধ্য হইলাম।'

"ইহার বিরুদ্ধে কি যে, বল্‌বার আছে বা ছিল আজ পর্য্যন্ত আমি তা' ভেবে পাই না। জেলারবাবু, আপনি কিছু পারেন কি ?

চার

"মুহূর্ত্তের জন্যও কিন্তু মনসুর ওপর রাগ আন্‌তে পার্‌লুম না। বরং তার অধঃপতনের দুঃখে সারা অন্তর কাতর হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তাকে পতনের হাত থেকে রক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে যখন গারদের বাহিরে পা দিলুম, তখন আমার জীবন-সম্বলের অনেক কিছুই ওলোট পালোট হ'য়ে গিয়েছে। ফুফু নেই—মাটির নীচে কবরের তলায় ঘুমিয়ে জুড়িয়েছেন! আমার গর্ভধারিণীর বন্ধন-রজ্জু কোনদিনই হয় ত ছিল না, আজও নেই। শুন্‌লুম, তিনিও ফুফুরই অনুগমন করেছেন। তবে যাবার আগে তিনি নাকি মাথার দিব্য দিয়ে তার প্রথম-জাত সন্তানকে বলে গিয়েছিলেন, আমার ওপর ভবিষ্যতে একটু সদয় হ'তে।

ভিক্ষা আমি চাই না, তাই নিজের যথার্থ প্রাপ্যকেও ভিক্ষাজ্ঞানে অনায়াসেই উপেক্ষা ক'রে মনসুকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন বৃহৎ জগতের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ নিরালা, একা।

"মনসু, না আর মানুষ নেই, অধঃপাতের শেষ ধাপ পর্য্যন্ত সে নেমে দাঁড়িয়েছে। সে জুয়াড়ী, সে জালিয়াত, সে ডাকাত!

"দেখে-শুনে ঘৃণায় মন বিমুখ হ'য়ে ফিরে আসে। কিন্তু, না, আমি তাকে ত্যাগ করতে পারি না। কর্ত্তব্য বলে' হয় ত কিছু নেই, স্নেহ, দয়া না এ সব কিছুই নয়। এক ঝোঁকের মামলা—তবু জোর করে তাকে পতনোন্মুখ গভীর খাদের করাল গ্রাস থেকে টেনে আমাকেই বাঁচাতে হবে। এতে ধর্ম্ম নেই, দয়া-মায়া, প্রেম কিছুই হয় ত নেই, তবু আমাকে করতেই হবে, কেন, এ কেনর উত্তর আমি জানি না, জানতে চাই না হয়ত মার মুখ চেয়ে। শুধু এইটুকুই যথেষ্ট, আমাকে একাজ করতেই হবে, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নয়!

"বন-বাদাড় সব কটাই আমার এখন পরিচিত—মিত্র সংজ্ঞার অন্যতম। অপথই আমার চির আকাঙ্ক্ষিত পথ, নিরয়গামীর যাত্রা-পথই আমার প্রার্থনীয় বস্তু। মনসুকে দেখি পতিতালয়ে। আমি দূরে অপেক্ষা করি। পিতার এত কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থের গতি দেখে হতাশায় বুক ভেঙে পড়তে চায়—আমি কিন্তু পাষাণের দুর্ভেদ্য বাঁধনে তাকে বেঁধে রাখি।

"সেদিন মনসু আর তার সঙ্গী ক'টীতে কিসের গোপন পরামর্শ চলেছে। কথাগুলা কাণে যেতে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

"দেবেন বল্‌লে, 'মহম্মদ সফি, কাগজগুলোর কতদূর কি করে' এলে ?'

'মহম্মদ ছোকরা কথা কইলে না, নীরবে বুকের এক গোপন-স্থান থেকে একটা থলি বার করে' দিলে।

"দেবেন হাতের থলিটা আন্দাজে ওজন করার ভঙ্গীতে নাচাতে নাচাতে বল্‌লে, 'কত আছে রে ?'

ঠিক যতটা বলে' দিয়েছ তাই, কিছু কম বেশী নয়।'

'হাতিম, তোর খবর কি ?' গেছলি খিদিরপুরে ?'

'খাঁ-সির কাছে ত ? না গিয়েই কাজ উদ্ধার করেছি দেব। এই দেখো, দুটো বন্দুক, একটা রিভলভার, একটা অর্ডিনারী পিস্তল। চাঁদের চক্‌চকে আলোতে সে দুটো ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলে উঠ্‌ল ?"

"দেবেন ঠিক ঠিক সন্তুষ্ট হ'তে পারলে না। তাই বল্‌লে 'কেবল ওই, সে কিরে হতভাগা! শুধ ভাত কি মুখে ওঠে, তরকারী কই ?"

"হাতিম হাস্‌তে হাস্‌তে একটা টোটার বাক্স সাম্‌নে ধরে' দিলে।

'নবী, তোর খবর ?'

'সব ঠিক্। আজ রাত্রেই চল, দে-মশায়দের কাছারীতে হাজার কতক জমা হয়েছে।'

'আগে খবর দিতে হয় হতভাগা! এত তাড়াতাড়ি।'

"দেবেনের চিন্তায় বাধা দিয়ে মনসু লাফিয়ে উঠ্‌ল, 'ভয় কি কাজ আজই হাঁসিল হবে। আলিজানকে গাড়ী নিয়ে বারাকপুরের পথে আস্‌তে বলেছি।'

"চুপে চুপে সব ক'জনে তখন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নানা পথ ধরে' চলে' গেল। আমি ছায়ার মত মন্সুর সঙ্গের সাথী হ'য়ে অনির্দ্দেশের পথে চল্‌তে সুরু করলুম। কেমন করে তাকে নিবৃত্ত করব ভেবে পেলুম না।

"রাত দেড়টায় ডাকাতী সুরু হ'ল। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সব ফর্সা করে' এরা নিজেদের মোটর আশ্রয়ে ফিরে এলো। পিছনে গুলি ছুটে চল্‌ল। আমার নিজের প্রাণের ভয়ে হয় ত খুব বেশীই ছিল, কিন্তু আমি মরলুম না। মোটরের পিছন আঁকড়ে ঠিক শাখামৃগের মত ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে নিরাপদে এক নদীর পাড়ে কাশবনের পাশে এসে হাজির হলুম।

"মোটর থেকে নেমে এরা বাঁটোয়ারা করতে বসে গেল। তারপর অল্পই বাকী জেলারবাবু। গণ্ডগোল যখন থাম্‌ল, দেখ্‌লুম, সকলে রক্তাক্ত মন্সুরকে ফেলেই মোটরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

"একখানা সাইকেল রাস্তার ধারে তারাই ফেলে রেখে গেছ্‌ল। কুড়িয়ে এনে মন্সুর দেহটা ধরে তা'তে চড়ে' বস্‌লুম।

"ভোরবেলা মনসুরকে বাড়ী পৌঁছে দিতে গিয়ে কিন্তু আর ফির্‌তে হ'ল না। জ্ঞাতশত্রু না হ'লে এমন করে হত্যা করে কখন? খুনী বলে ধরা' পড়লুম। বিচারের রায়ে কি ছোট কি বড় আদালত ন্যায়ের অমান্য করলে না—আমার ফাঁসীর হুকুম হ'ল। কাল নাগরদোলায় চড়ে অপনাদের চোখের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি দিয়ে যাব। অভিসম্পাত, না না, আমি এ ময়লা পৃথিবী থেকে আমায় সরিয়ে দেবার জন্য বড় কৃতজ্ঞতাই জানাচ্ছি।"

ভোরের বাতাস গায়ে আসিয়া লাগিতেই অনুশাসন চমকিয়া উঠিলেন। চারদিকে ভাল করিয়া দেখিলেন, কই, কেহই ত নাই। তবে কি স্বপ্ন? কিন্তু এই কাঠের গুঁড়ি, ওই ভিজা মাটির উপর মানুষের উপবেশন-স্থান প্রত্যক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দেয় না কি—ইহা সত্য।

ছুটিয়া অফিস-ঘরের মধ্যে আসিয়া অনুশাসন রেকর্ড বহিখানা টানিয়া বাহির করিলেন। সতেরই আগষ্ট। কই না, আজ ত কই কাহারও ফাঁসির দিন নাই—তবে স্বপ্নই সত্য।

কিন্তু শীঘ্রই রেকর্ডের বছর দুই আগেকার সতেরই আগষ্ট বাহির করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল—তবে কি?

ঠিক তাই—ওসমান আলি নিজামত খাঁর ভ্রাতৃ-হত্যার অপরাধে ফাঁসী হইয়া গিয়াছে বটে! আশ্চর্য্য!

হয় ত আজও হতভাগার অতৃপ্ত আত্মা অন্যায় বিচারের প্রতিবাদ করিয়াই ফিরিতেছে! কতদিনে সে তৃপ্ত হইবে, কে জানে!

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
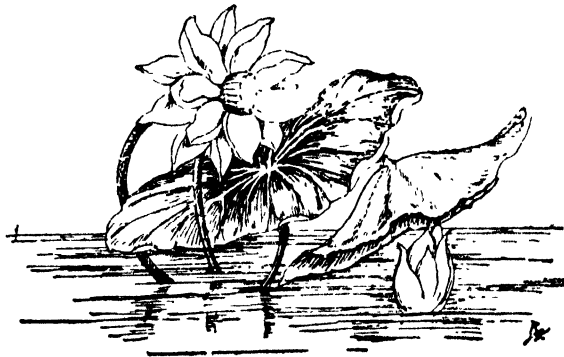
ভিন্নপথ

শ্রীআশুতোষ কাব্যতীর্থ, বি-এ

বৈকালের দিকে দোতালা বাসের মাথায় চড়িয়া কলিকাতার বড় বড় রাস্তাগুলা একবার ঘুরিয়া আসিতে পারিলে দেহের ও মনের স্বাস্থ্য নির্ম্মল ও সতেজ হয় এবং সেই সঙ্গে চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি যন্ত্রগুলার ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া জ্ঞান ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর উৎকর্ষলাভ করে, এমনই একটা ধারণা লইয়া যাহারা কলিকাতায় পথের ধূলি-মলিন বিশুদ্ধ বায়ু-সেবন এবং সংগৃহীত জ্ঞান-ভাণ্ডারে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় দিনের পর দিন করিয়া আসিতেছেন অমিয় তাদেরই একজন।

নিত্য বাসের মাথায় বসিয়া সহরের অজস্র বৈচিত্র্যে অভিনব জ্ঞান সঞ্চয় সে নিয়মিত করিয়া থাকে। অমিয় সেই অভিপ্রায়েই বাসের পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছে। দুই-তিনখানি বাস মহাবেগে বাহির হইয়া গেলে অমিয় গতিরোধ নির্দ্দেশক অঙ্গুলি সঙ্কেত করিল। শ্মশ্রুগহন মুখের ভাবব্যঞ্জনাহীন দৃষ্টি তুলিয়া পাঞ্জাবী বাসচালক হয়ত ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু বাসের গতিরোধ হইল না। অমিয় বিক্ষুব্ধচিত্তে পরবর্ত্তী বাসের পথে দৃষ্টিপাত করিল। গ্রীষ্ম-কাল। সন্ধ্যা না হইলে রৌদ্রের তেজ কমিবে না। আটঘণ্টা ব্যাপী সূর্য্যকিরণের সঙ্গসুখে পিতাঙ্গী সভ্যতার শ্যাম দেহের ছটার তীক্ষ্ণতা গায়ে লাগিলে, দেহের অনাবৃত অংশে আগুন ধরিয়া যায়। ইহার পর আবার কাল-বৈশাখীর পথ-প্রদর্শক চপল বাতাসের বেয়াদবী অমিয়র অসহ্য বোধ হইল। শ্যামবাজারের দিক্ হইতে একখানি বাস উদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। অমিয় দূর হইতেই তাহার গতিরোধের আশায় হাত তুলিল। বাসখানি যেমন থামিয়াছে, কোথা হইতে বাতাসের এক ঝাপ্টা আসিয়া ধুলায় ও কাঁকরে তাহার মুখচোখ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রুমালে মুখ চাপা দিয়া কাঁকরের আক্রমণ যদি বা কোনক্রমে রক্ষা হয়, অন্ধ সাজিয়া বাসে উঠা প্রাণান্তকর ব্যাপার। অমিয় মরিয়া হইয়া বাসে উঠিবার চেষ্টা করিল এবং কণ্ডাক্টরের আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া এক সময় উঠিয়াও পড়িল, কিন্তু চোখ খুলিয়া সাজ-সজ্জার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেই তাহার সমস্ত শরীর বিষাইয়া গেল।

পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টরের ঘর্ম্ম-মলিন খাকী পরিচ্ছদের ছাপ লাগিয়া পাটভাঙা জামাটা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। এখনই 'ডাইং ক্লিনিংয়ে'র স্মরণ না লইলে এই জামার কলঙ্কমোচন সম্ভব হইবে না। কিন্তু চক্ষু খুলিয়া কলিকাতার বুকের উপর ঘুরিয়া বেড়ান যে কি, অমিয় তাহা ভাবিতেই শিহরিয়া উঠিল। অথচ শিখবীরের আলিঙ্গন-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া এতগুলি সুবেশ সহযাত্রীর সহিত একত্র অবস্থান যে কত বড় লজ্জার বিষয় তাহা কি ওই অসভ্য শিখের মগজে প্রবেশ করিবে? সে একবার অগ্নি-বর্ষী দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, কণ্ডাক্টর নির্ব্বিকারে হাঁকিতেছে—ওয়েলিংটন, ধরমতলা, কালীঘাট। মিনিট কয়েক পূর্ব্বে সে কতবড় বিপর্য্যয় যে ঘটাইয়াছে তাহা যেন কিছুই নহে। অমিয় বাহিরের দিকে চোখ রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

কিন্তু ইহাতেও ব্যাঘাত। একযোড়া তরুণ উঠিয়া তাহাকে বাসছাড়া করিবার অবস্থা করিয়া তুলিল। ট্রামে এবং বাসে এই অসুবিধা প্রায় নিত্য ভোগ করিতে হয়। কোন মহিলার শুভ পদার্পণ ঘটিলে সমস্ত গাড়ীটা যেন কেমন হইয়া যায়। বিভিন্ন মনোভাবের ব্যঞ্জনা বিভিন্ন মুখে প্রকাশ পাইয়া সে এক অপরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে। কে অগ্রে নারীর অধিকার মানিয়া লইয়া সহযাত্রিণীকে আসন ছাড়িয়া দিবে ইহা লইয়া যেমন তরুণ যাত্রীদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়, তেমনি আসনে চাপিয়া বসিয়া থাকার দিকেও কোন কোন যাত্রীর আন্তরিক

অভিলাষ থাকে। অমিয় এতদিন পূর্ব্ব-সম্প্রদায়ের একজন হইয়া গর্ব্ববোধ করিত। আজ যেন সে সকল দিক্ দিয়া বিদ্রোহ করিতে উদ্যত। যথাযোগ্য স্থানের অভাবে তরুণ-যুগলের মন উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। অমিয় একাকী একখানি আসনে বসিয়া আছে। গাড়ীর সকল লোকের দৃষ্টি তার দিকে। অমিয় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

কণ্ডাক্টারের অনুরোধ আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই অমিয় আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মহিলাটী যাইয়া সেই আসনে বসিলে তাহার সহচর ধীরে আসনের অর্দ্ধাংশ অধিকারে উদ্যত হইল, কিন্তু অমিয় তাহাকে বাধা দিল।

—"একটু রাস্তা দেবেন।" কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

অমিয় নড়িল না, ফিরিয়া চাহিল মাত্র।

—"কি মশায়, সরুন।" কণ্ঠস্বরে উগ্রতা প্রকাশ পাইল।

অমিয় ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাবেন আপনি?"

মহিলা-সহচর আসন নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—"ওইখানে।"

অমিয় মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিল—"ও জায়গা আপনার বসবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয় নি।"

সহচর ধৈর্য্য হারাইয়া বলিল—"সে জানি, আপনি রাস্তা ছাড়ুন।"

অমিয় ধীর অথচ সতেজ কণ্ঠে উত্তর করিল "না, জানেন না; স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট পাবেন, তাই তাঁকে বসবার জায়গা দিয়েছি। আপনি তাঁর সঙ্গী বলে' আপনাকে ওখানে বস্‌তে দেব না। আপনি আমারই মত দাঁড়িয়ে যাবেন।"

বাসের আরোহীদল বিস্ময়ে এবং এক নূতন অবস্থার উদ্ভবে ঠিক্ কি করা বা বলা উচিত ভাবিয়া না পাইয়া একবার অমিয় ও একবার তরুণীর সহচরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

অমিয়র ক্রোধ তখন সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। সে কটু-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"লজ্জা করে না আপনার একজনের অনুগ্রহের সুবিধে নিয়ে অধিকারের দাবী করতে? আমি ওখানে বসেছিলাম দেখেছেন; মেয়েছেলে দেখে জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। আপনি তাঁর সঙ্গী সুবাদে ওখানে বস্‌বেন, আর আমি দাঁড়িয়ে যাব তা' হ'তে পারে না।"

যাত্রীদলের মধ্যে গুঞ্জন সুরু হইয়া গেল। একটী ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী 'হাঁ হাঁ' করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

স্বার্থত্যাগী আর একজন নিজ আসন ত্যাগ করিয়া অমিয়কে বলিল—"নিন্ মশায়, এখানে বসুন।"

অমিয় তাহার স্থান ত্যাগ না করিয়া প্রতিপক্ষ যুবককে বলিল—"যান, বসুন গিয়ে—এখানে আপনাকে বসতে দিচ্ছি নে।"

মহিলাটী এতকাল কি একটা অশুভ আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে উভয়ের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। এইবার ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় হাসিয়া লইল। অমিয় নাছোড়, পথ সে কিছুতেই ছাড়িবে না।

অপর তরুণের পক্ষে অন্য আসনের অংশ-গ্রহণের কল্পনা অসম্ভব। এদিকে বাসে আর দাঁড়াইয়া যাইবারও স্থান নাই। বোধ হয় এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের নূতনত্ব অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অকারণে আরোহীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।

গাড়ী আসিয়া ধর্ম্মতলার মোড়ে দাঁড়াইল। গোলোযোগ উত্তরোত্তর যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে শান্তি-স্থাপনে তৃতীয় পক্ষের সমাগম হয় ত অনিবার্য্য হইয়া পড়িতে পারে—আর তাহা হইলে কোন পক্ষেরই লজ্জা ও অপমানের শেষ থাকিবে না, এমনি একটা আশঙ্কা আরোহীদিগের মনে উপস্থিত হইয়াই বোধ হয় অবস্থার গতি পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং অমিয় একটু পথ করিয়া লইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া সেইখানে নামিয়া পড়িল। বাসের মধ্যে তখন মন্তব্যের নানা আকারের অভিব্যক্তি। কিন্তু অমিয়র সে সকল শুনিবার মত মনের অবস্থা নহে। সে কোনদিকে না চাহিয়া মাঠের দিকে অগ্রসর হইল। কিছু-কাল মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করিয়া অমিয়র ঘোর অনেকটা কাটিয়াছে। ক্রোধ নাই, তবে মুখে তাহার তখনও

কঠোরতার রূঢ় চিহ্ন। হঠাৎ তাহার কাণে আসিল—"ওই দেখুন, সেই লোকটা।"

অমিয় ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার বাসের সহযাত্রী-যুগল। কোমলাঙ্গী সহচরের চঞ্চল দৃষ্টি অমিয়র দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে।

* * *

অমিয়র শান্ত প্রায় মস্তিষ্কে আবার আগুন ধরিবার উপক্রম হইল। কিন্তু পথে-ঘাটে একটা লজ্জাজনক দৃশ্যের অবতারণা করা তাহার স্বভাব নয়; সে আপনাকে সংযত করিয়া যেন কিছুই হয় নাই এমনিভাবে চলিতে লাগিল।

কিন্তু দৈব সেদিন তাহার একান্ত প্রতিকূল। শুনিল—"আপনাকে জব্দ করেছে কিন্তু খুব। ভদ্রলোকের—"

—"ভদ্রলোক না আরও কিছু, অসভ্য জানোয়ার কোথাকার!"

অমিয়র মাথায় খুন চাপিয়া গেল। সে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া এবং প্রতিপক্ষ কাছে আসিতেই তাহার গতিরোধ করিয়া বলিল—"কথাটা আর একবার বল ত।"

লোকটা প্রথমে না বুঝিবার ভাণ করিল, কিন্তু অমিয় ছাড়িল না; কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—স্ত্রীলোক নিয়ে রাস্তায় চলা ভারি সুবিধে, না? তোমার লজ্জা করে না মেয়ে-ছেলের আঁচল চাপা হ'য়ে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে।

অমিয়র উগ্রতা এবং তাহার মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া তরুণীর মুখে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল। অমিয় তাহা দেখিয়া বলিল—"আপনি ভয় পাবেন না। ওর গায়ে হাত তুলে আপনার ও আমার অপমান করবার ইচ্ছে আমার নেই। মানুষের সংযম সীমাহীন নয় এই কথাটা আপনার এই সঙ্গীটিকে নিরিবিলি বুঝিয়ে দেবেন। আর মনে রাখবেন, আত্মীয়-পুরুষের ওপর নির্ভর করে' পথে বেরিয়ে অন্যের অসুবিধে ঘটান স্বাধীনতা নয়—ও একটা ফ্যাসান।"

তরুণী চোখে তখন জল আসিয়া পড়িয়াছে। সহচর সন্ত্রস্ত। তখনও অমিয়র মুখের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি।

অমিয় হয় ত আরও কিছু কঠোর মন্তব্য করিয়া সাময়িক উত্তেজনার অসহনীয় তাপের পরিচয় প্রদান করিত; কিন্তু সহসা তরুণীর মুখের প্রতি চোখ পড়িতেই তাহার কটূক্তির উদ্যম যেন 'ঘোর' খাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। মানুষের মুখাবয়বের পরিবর্ত্তনে যে দর্শকের মনের নিষ্ঠুরতা কোনকালে এমন কোমলতায় পরিণত হইতে পারে অমিয় এ ধারণা কেমন করিয়া করিবে। কিন্তু নিজের মনের যথার্থ রূপ মানুষ কোনদিনই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না; বিশেষতঃ, বিশিষ্ট বয়সের নারীর সমক্ষে কেন যে উঁচু মনের উচ্চ সুর অকারণেই নামিয়া খাদের প্রথম পরদায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা কোন তরুণের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। অমিয় কি করিবে?

কণ্ঠস্বর নিরতিশয় কোমল করিয়া সে বলিল—"উত্যক্ত হ'য়ে হঠাৎ আপনাকে বোধ হয় দুঃখ দিয়ে ফেলেছি। পরিচয় নেই, নইলে দেখ্‌তেন আমার স্বভাব ও নয়।" ইহার পর কি যে কতগুলা অমিয় বলিয়া গেল, তাহা বোধ করি তাহার নিজেরই কাণে যায় নাই।

অমিয় যে স্বেচ্ছায় বা প্রকৃতির তাড়নায় অপরিচিতা একজন তরুণীর সমক্ষে মনের তীক্ষ্ণতার দিকটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে এ ধারণা মেয়েটীর হয় নাই—তবে অনাত্মীয় কেন পরমাত্মীয়দের কাছ হইতেও তিরস্কারের কটুবাক্য কোনদিনও সে শুনে নাই। অপরিচিত ব্যক্তির মুখ হইতে বিনা দোষে তিরস্কৃত হইয়া মেয়েটীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছে এবং অনভ্যস্ত কটূক্তি তাহার কোমল হৃদয়ে কোথায় যেন নিতান্ত অকারণেই বেদনার সঞ্চার করিয়াছে।

নিজেকে সহজেই সংযত করিয়া লইয়া সে বলিল—"পথে চল্‌তে আজও আমরা শিখি নি—আপনারাও আমাদের শেখান নি। যে জন্যে আজ এত গোলমাল আমাদের মধ্যে হ'ল এটা আমাদের দোষের নয়, বোঝ্‌বার ভুল। সুধীরবাবুও বোধ হয় এই কথাই বল্‌বেন, কেমন?"

সুধীর তরুণীর সহচরের নাম। নামের পিছনে সম্বন্ধ বিশেষের সংযোগ না থাকায় এবং উভয়ের আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতায় উভয়ের যথার্থ সম্বন্ধ জানা না থাকিলেও অনুমান সহজেই করিয়া লওয়া চলে। সুধীর মেয়েটীর কথা শুনিয়া বলিল—"সুধীরবাবুর মতামতের কথা ছেড়ে দিন।

এদিকে আকাশের চেহারা দেখ্‌ছেন ; আজও মিথে ফিরে যেতে হবে দেখ্‌ছি।"

সুধীরের শেষ কথায় বিস্মৃত কোন বিষয় মনে পড়িয়া সুষমার মুখে যে রংয়ের ছোপ পড়িল, তাহা দেখিয়া অমিয়র মনে নানা সম্ভব অসম্ভব অনেক কল্পনার একত্র সমাবেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইল যে, তাহার অভিব্যক্তি গোপন করিয়া এই স্বল্প-পরিচিত তরুণ যুগলের সহিত বাক্যালাপ আর সম্ভবপর নহে।

সুষমা সুধীরের মুখে বিরক্তি ও হতাশার স্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাইয়া তাহার একটু কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া মিনতির স্বরে বলিল—"আজ এখন ফিরে চলুন সুধীরবাবু আজ আর আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।"

সুধীর নিতান্ত নির্লিপ্তের মত কহিল—"এখন আর ফেরা ছাড়া উপায় কি ? জল এসে পড়েছে।"

বাস্তবিক আর এক মিনিট অপেক্ষা করিলে হয় ত ট্রামের রাস্তায় পৌছিবার পূর্ব্বেই অভিষেকের শুচিতায় না হোক্ ভিজিয়া যে পাইতে হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুধীর সুষমার হাতে জোরে একটু আকর্ষণের পুলক জাগাইয়া একপ্রকার ছুটিয়া ট্রামের পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুষমা একবার অমিয়র দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল—কাছাকাছি কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

* * *

বৃষ্টি বাতাসের রথে চড়িয়া তখন বেশ বেগেই আসিয়া পড়িয়াছে। বায়ুসেবী এবং পথচারীর দল ঊর্দ্ধশ্বাসে বাস বা ট্রামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। অমিয়র কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। নির্ব্বান্ধব সহরে এতদিন পড়া ও তাহার আনুসঙ্গিক লইয়া তাহার বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গিয়াছে। আজ মুখামুখী সুষমার সহিত কথা বলিয়া মনের যে প্রকোষ্ঠ এতদিন প্রয়োজনের অভাবে বন্ধ ছিল, সেই মণিকোঠার কপাটে কাহার যেন মৃদু করস্পর্শ অনুভব করিয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিল। বেচারী অমিয় !

সুষমার চিন্তাটা থাকিয়া থাকিয়া অমিয়র মনের কোণে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। মাথার পরে আকাশের সঞ্চিত জলভাণ্ডার অজস্রধারে বারিবর্ষণ করিতেছে। বাতাসের প্রবল বেগে মাঝে মাঝে তাহাই আসিয়া অমিয়র সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে, কিন্তু অমিয় নির্ব্বিকার।

তাহার কেবলই মনে হইতেছে, আজিকার এই অসম্ভাবিত ঘটনার উপস্থিতি তাহার জীবনে যে অভিনবত্বের সূচনা করিয়া গেল ইহা কি আকস্মিক, ইহার নিয়ত সমাগম কি নিতান্তই দুরাশা ? দুরাশা কল্পনা করিলে মন শঙ্কিত হইয়া উঠে ; অথচ আজিকার এই লজ্জাকর অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি অথবা সুষমার সান্নিধ্য সে কোন্ শক্তিতে কামনা করিবে ?

বাতাসের বেগ তখন মন্দ হইয়া আসিয়াছে। অবিশ্রাম বারিপাতের মধ্যে পূর্ব্বে যে মাধুর্য্য ছিল তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জামা ও কাপড় ভিজিয়া শরীরের সহিত এমনি জড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে মৃদু বাতাসের কোমল স্পর্শও যেন আর সহ্য করা চলে না। অমিয়র শীত বোধ হইতেছে। এখনই ফিরিবার চেষ্টা না করিলে হয় ত ইহার ফলে রোগের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী।

অমিয় একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া লইল। বুঝিল, মাঠে তাহার সহচর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নাই। ঝড় ও বৃষ্টির বেগ উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া চলিয়াছে, সুতরাং ফিরিয়া যাওয়াই সদ্‌যুক্তি। ঘোড়দৌড়ের মাঠ বাঁয়ে রাখিয়া অমিয় বাস বা ট্রাম যাহাই হউক একটীতে আশ্রয় লইবার আশায় অগ্রসর হইল।

জামা-কাপড় ভিজিয়া বহুপূর্ব্বেই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে। পথের জল গড়াইয়া দুই পার্শ্বের খাদে খরবেগে নামিয়া আসিয়া অমিয়র একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। আর কিছুকাল এই জলস্রোতের আক্রমণ সহ্য করিতে হইলে জুতাজোড়াকে মাঠেই ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। অমিয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটী গাছের গুঁড়ির কাছাকাছি আসিয়া তাহার দুইটা শিকড়ের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতাসের বেগের গতির স্থিরতা নাই। মাতালের মত অস্থিরবেগে কখনও পর্য্যায়ক্রমে কখনও বা যুগপৎ সকল দিক্ হইতে আসিয়া সিক্ত দেহে শীতের অন্তর্ভেদী শিহরণ জাগাইয়া দিতেছে ;

কিন্তু বাস বা ট্রাম কোনটাই খিদিরপুরের দিক্ হইতে তাহার আগমনের সূচনা করিতেছে না। দূরে বৃক্ষমূলে সর্ব্বাঙ্গে ত্রিপলের বর্ম্ম আঁটিয়া ট্রামের পথ-নির্দ্দেশক কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া আছে। অমিয় বৃক্ষমূলের নিরাপদ আশ্রয়ে সুরক্ষিত পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তির এই দুর্য্যোগ রজনীর নির্জ্জনতায় জীবিকা-সংগ্রহের প্রাণান্ত চেষ্টার অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া দেখিল, ভাবুকতায় অনুকূল প্রকৃতির পুনরাবির্ভাব সুদূর ভবিষ্যতেও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। দূরে ট্রামের রক্তনেত্র দেখা দিল। অমিয় মাঝপথে তাহার সহিত মিলনের আশায় বৃক্ষাশ্রয় ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইল।

*　　*　　*　　*

—"আপনি এসেছেন দেখছি ?"

—"আমারও তাই মনে হচ্ছে—কিন্তু আপনি আজ একা যে।"

—"সঙ্গে লোক নিয়ে এসে সারা রাস্তা লোকের সঙ্গে ঝগড়া করি আর কি ?"

অমিয়র মুখের উপর যাহা প্রকাশ পাইল, তাহা যে মনের কোন অবস্থার অভিব্যক্তি তাহা স্থির করার চেষ্টা না করাই সুযুক্তি। অতীত দিনের অসঙ্গত আচরণ মনে পড়িয়া বেচারী লজ্জায় মুখ নামাইল এবং সেই অবস্থায় স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করিল—"নানা কারণে মন উত্যক্ত ছিল বলেই—কিন্তু তাতে, না, ক্ষতি আপনার কিছু হয় নি; আমারও তেমন কিছু হয়েছে তা' নয়—তবে একজনের কিন্তু আপনি যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন।"

অমিয় মুখ তুলিল। শঙ্কাকুল দৃষ্টি সুষমার কৌতুকোদ্দীপ্ত মুখের প্রতি তুলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল—"কার ক্ষতি করলাম ?"

—"কেন সুধীরবাবুর—তাঁর সন্ধ্যার সমস্ত সৌন্দর্য্য যে শেষ হ'য়ে গেল।"

অমিয়র মুখে সলজ্জকারুণ্য প্রকাশ পাইল—যেন এমনটা সে করিতে চাহে নাই, অথচ, তাহার বিসদৃশ আচরণের ফলে যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে প্রতিকারের চেষ্টায় স্নেহদুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কি করিতে পারে।

*　　*　　*

মাস দুয়েকের দৈনন্দিন সহ-ভ্রমণের ফলে কলহের সূত্র ধরিয়া যে পরিচয় সুরু হইয়াছিল, তাহা প্রায় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। অমিয়র প্রতি সন্ধ্যা এখন উৎসবের সমারোহে সমুজ্জ্বল। বেলা শেষ হইয়া আসিলে কে যেন তাহাকে টানিয়া পথে বাহির করে। কোনদিন সে, কোন-দিন বা সহচর-পরিবেষ্টিতা সুষমা আগে আসিয়া অনাগতের আগমনের অপেক্ষায় উৎসুক মুহূর্ত্তগুলি আশা-নিরাশার সন্দেহ-দ্বন্দ্বের মধ্যে যাপন করে। সুধীরের সহিত পূর্ব্বের বৈরভাব আর নাই; তবে সুষমার মনোজয়ের প্রতিযোগি-তায় একে অপরকে স্থানচ্যুত করিতে প্রায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। তাই আজ সুষমাকে একাকী আসিতে দেখিয়া অমিয়র অন্তর জগতে এক অপূর্ব্ব সমারোহ! ইহার প্রকাশ নাই, প্রকাশ সম্ভবও নহে। উত্তেজনার উল্লাস প্রকাশ করিলে ফল আর যাহাই হউক, লজ্জার আর অবধি থাকিবে না; অথচ, আজিকার এই শুভ মুহূর্ত্ত বিফলে অতিবাহিত হইবে অমিয় তাহা সহ্য করিবে কি করিয়া।

সুষমাকে দেখিয়া অমিয় বেঞ্চ হইতে উঠিয়াছিল। এখন সুষমার পাশে আসন গ্রহণের দুর্নিবার লোভ প্রাণপণ শক্তিতে দমন করিয়া সে বলিল—"সুধীরবাবু কি সত্যিই সেই জন্যে আসেন নি ?"

সুষমা মৃদু হাসিয়া বলিল—সুধীরবাবুর জন্য সত্যিই আপনার এত ব্যস্ত হওয়া কি ভাল ?"

—"না না, ব্যস্ত নয়, তবে—"

—"একলা আমার সঙ্গে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, না ? তা' না হয় আমি অন্যত্র যাচ্ছি।

সুষমা উঠিয়াই দাঁড়াইল। অকস্মাৎ কোথা হইতে কি হইল, অমিয় দুই হাতে সুষমাকে ধরিয়া তাহার গতিরোধ করিয়া বলিল—"না না, উঠবেন না। সত্যিই আমার কোন—আপনি ঠিক্ বুঝবেন না, আমি ঠিক্ আপনাকে—

এমন সৌভাগ্য আমার—কি বল্‌ব আপনার এই অনুগ্রহে—আমি সত্যিই ভারী খুসী হ'য়েছি।"

অমিয়র এই বিপর্য্যস্ত অবস্থা দেখিয়া সুষমা হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল। বলিল—"ছাড়ুন, লোকে দেখ্‌লে ভাল বল্‌বে না। কতক্ষণ এসেছেন আপনি?"

সশব্যস্তে অমিয় হাত ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

—"এই আপনার আসবার মিনিট কয়েক আগে, মিনিট দশ হবে বোধ হয়।"

অমিয় বেঞ্চিতে কিছু দূরে যাইয়া বসিল। সুষমা উঠিয়া বলিল—"বসে' থেকে কি হবে। চলুন, একটু বেড়ান যাক্। এখান থেকে 'ভিক্‌টোরিয়া' অবধি, কেমন?

অমিয়র যেন কি হইয়াছে। কি যে সে করিয়াছে, কি যে হইতেছে ইহার কোনটাই সে যথার্থ অনুভব করিতে পারিতেছে না।

সম্মুখে সুষমা। মনে ঝড়, দেহে অবসাদ। সুষমার সহিত বিকারগ্রস্ত রোগীর মত সে চলিতে আরম্ভ করিল।

পথে কত লোক যাইতেছে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কত লোক তাহাদিগের কাছ দিয়া চলিয়া গেল। পাশে সহাস্যমুখী সুষমা। অমিয় কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছে না।

—"আপনার অসুখ কচ্ছে অমিয়বাবু?"

—"না, অসুখ কেন করবে, চলুন। হ্যাঁ, একটা কথা আমি—"

—"আপনি কি?"

—"কিছু নয়; তবে আপনাকে সত্যি আমার এমন ভাল লাগে, কিন্তু।"

সুষমা একটু দূরে সরিয়া বলিল—"তা' লাগুক; কিন্তু আপনি যে ব্যস্ত হয়েছেন, তাতে একটু শক্ত না হ'লে আপনার সঙ্গে চলাই যে দায়।

অমিয় যেন 'মার' খাইয়া খাড়া হইল; বলিল—"সত্যি, আমার ভারী অন্যায় হ'য়ে গেছে। আমাকে মাপ করুন; আর কোনদিন ওসব কথা বল্‌ব না।"

সুষমা দূরে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিল—"কি রকম চানাচুর কি ভেজে নিয়ে এলেন সুধীরবাবু?"

অমিয় চাহিয়া দেখিল, হাতে চানাচুরের প্যাকেট লইয়া সুধীর আসিতেছে। তাহার মুখে প্রশান্ত হাস্য।

সুষমার মুখের দিকে চাহিতেই সে হাসিয়া বলিল—"আপনাকে না দেখে অমিয়বাবু ভারী নার্ভাস হ'য়ে পড়েছেন।"

সুধীর হাসিল। অমিয় সেখান হইতে পলাইতে পারিলেই যেন বাঁচে। অথচ, এই অবস্থায় সরিয়া পড়াও সম্ভব নয়। সে একটু দূরে থাকিয়া তাহাদের সহিত চলিতে লাগিল।

*　　*　　*

এমন করিয়া আর চলে না। প্রাণে দুর্ব্বিষহ আকুলতা, নিয়ত সান্নিধ্যে ও দৈনন্দিন একত্র ভ্রমণের ফলে সুষমার প্রতি আকর্ষণ তীব্রবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ, অমিয় মুখ ফুটিয়া মনের অভিপ্রায় তাহাকে বলি বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই। অসাক্ষাতে কল্পনার বিচিত্র রথে কত পথ কত উপায় কত বিভিন্ন ভাবপ্রবাহ মনের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়; সাক্ষাতে ও কথাটা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া প্রতিনিয়ত ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহে; কিন্তু কি যে শেষে হইয়া যায় অমিয় বুঝিতে পারে না—মনের কথা মুখ ফুটিয়া সে সুষমাকে বলিতে পারে না। শুধুই কি না বলা কথার ব্যর্থতা? একান্ত সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে যাহাকে জামা-কাপড়ের মত সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া রাখিতে পারিলে বোধহয় আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না—তাহারই একান্ত সন্নিহিত অবস্থায় মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হয় না। যাহাকে বুকের সবখানটা জুড়িয়া রাখিতে পারিলে আর কিছুরই আবশ্যক নাই বলিয়া মনে হয়—তাহারই কাছাকাছি আসিলে বুকের মধ্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, বিহিত ব্যবধান রাখিয়া চলার কথাই তখন যেন একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করার অতিরিক্ত কোন কিছুরই কথা আর মনে আসে না।

এমন করিয়া কোনক্রমেই আর চলিতে পারে না। মনোরথ বিপরীত পথ ধরিয়া ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছে;

অথচ, অমিয় সাহস করিয়া কিছুই করিতে পারে না। এক দিনের ব্যর্থতায় মনের বল ক্রমশঃ নামিয়া পড়িতেছে। অমিয় স্থির করিল, আজ একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিতেই হইবে। অমিয় এই সিদ্ধান্তের পর কতকটা সুস্থ হইল। কলেজ সেদিন পাঁচটা অবধি। ইহার পরে মেসে ফিরিয়া বাহির হইতে হইবে—সে যে অনেক দেরী হইয়া পড়িবে। আচ্ছা, আজ কলেজ না করিলে ক্ষতি অবশ্য হইবে—কিন্তু যদি সময়মত সুষমার কাছে উপস্থিত হওয়ায় ব্যাঘাত ঘটে, তাহাতে যে ক্ষতি হইবে—তাহা যে কোনদিন পূরণ হইবে না। থাক্, আজ আর কলেজে যাওয়ার হাঙ্গামা নাই। আগে হইতে যথাস্থানে যাইয়া অপেক্ষা করিলে একটু অধীরতা প্রকাশ পাইবে। তা' হউক, সুষমার ভালবাসা পাইবার সফলতার তুলনায় সেই অধীরতা বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর। আচ্ছা, আজ যদি সুধীর সুষমার সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে ?

অমিয় জোর করিয়া এই অনিষ্ট আশঙ্কা মন হইতে দূর করিয়া দিল।

* * *

বৈকালে পাঁচটা না বাজিতেই সে একটু বিশিষ্ট দেহ-সজ্জায় মনোহর হইয়া বাহির হইল। দোলায়মান চিত্ত লইয়া সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঘড়ির কাঁটাগুলা যেন আর চলিতে চাহে না। বন্ধ হইয়া যায় নাই ত ? ঘড়ি দেখিয়া এবং তাহার সকল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মনটা অসুস্থ হইয়া উঠিল। দুই-একটী পূর্ব্ব-পরিচিত মুখ চোখে পড়িল। কিন্তু যাহার আগমন প্রত্যাশায় এই উৎকণ্ঠা, এই বিপুল আগ্রহ তাহার দেখা নাই।

সাড়ে ছয়টা বাজিল। অমিয়র ধৈর্য্য আর মানে না। ইহার পরও আশঙ্কার অন্ত নাই। যদি অমিয়র মুখ না খুলে, যদি কথাটা গুছাইয়া না বলিতে পারে, যদি সুষমা প্রত্যাখ্যান করে, প্রত্যেকটী আশঙ্কার ক্ষেত্রের কথা মনে হইতেই হৃদয়ে নিরাশার তীব্র আঘাত অনুভূত হয়। কিন্তু যদি সুধীর অমিয়র সাথী হয়। সুধীরকে সে মনে মনে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল।

হ্যাঁ, ওই যে সুষমা। হ্যাঁ, একলাই আসিতেছে। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল। সে আসিয়া বলিল—"চলুন, আজ গঙ্গার ধারের দিকে।"

অমিয় উঠিল। তারপর মাথা নীচু করিয়া বলিল—"একটা কথা বল্‌ব ?"

সুষমার মুখও রাঙা হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—কি কথা, বলুন।"

—"আজ কেমন নিরিবিলি ভাল লাগ্‌ছে। চলুন, দু'জনে টালিগঞ্জের দিকে যাই।"

—"অনেক দূর, ফিরতে দেরী হবে না ?"

ইহার পরে আর সাহস হয় না; গঙ্গার ধারের দিকেই চলিতে হয়।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। মাঠের মাঝামাঝি একটু নির্জ্জনতা দেখিয়া অমিয়র অভিলাষ বাগ্‌বেগে কণ্ঠনালী বহিয়া ওষ্ঠাগ্র পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল, কিন্তু ওইখানেই ইতি।

সুষমা বুঝিল, অমিয়র মনে কি একটা যেন চাঞ্চল্য—যাহা প্রকাশ না করিতে পারিয়া সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। কথাটা যে কি, তাহা অনুমান করা সুষমার মত মেয়ের পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। এ ধরণের কথা ইতি-পূর্ব্বেই বহুবার সে শুনিতে প্রস্তুত হইয়াছে, শুনিয়াছে এবং আপন অভিমত ব্যক্ত করিয়া ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছে। পূর্ব্বে এই অবস্থায় তাহারও মন বিকল হইয়া যাইত। এখন আর তেমনটা হয় না; বুকটাকে একটু দোলা দিয়াই নিবৃত্ত হয়।

অমিয় কি যেন বলিল, ভাল বুঝা গেল না। তবে একটা কথা সুষমার কাণে আসিল—"ভালবাসি।"

সুষমার হাসি পাইল অমিয়র অবস্থা দেখিয়া। সযত্নে হাসির বেগ সংবরণ করিয়া বলিল—"কথাটা গুছিয়ে বল্‌তে হয় অমিয়বাবু, নইলে তা' বৃথা হয়। আর এই কথা বল্‌তেই নিরালায় যেতে চেয়েছিলেন, কেমন ?"

অমিয়র বুকের মধ্যে ঢেঁকীর পাড় পড়িতেছে। সে এবারেও ভাঙা ভাঙা ভাষায় বলিল—"গুছিয়ে বল্‌তে আমি পারি না—কিন্তু তোমাকে না হ'লে আমার চল্‌বে না; আমি বোধ হয় পাগল হ'য়ে যাব।"

হাসিয়া সুষমা বলিল—"পাগল ঠিক হবেন না আমি জানি—তবে দু' চারদিন মনটা একটু খারাপ থাকবে। কিন্তু কথা তা' নয়। আসল কথা এই, ভাল আমাকে লেগেছে, আর এই ভাল লাগার পরমায়ু ততদিন—যতদিন আর এক-জন আমার মত মেয়েকে দেখে ভাল না লাগ ছে। এই ধরণের ভালবাসাকে বিশ্বাস করবেন না অমিয়বাবু।"

অমিয়র নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। সে ঠিক এই কথা শুনিবে আশা করে নাই। এ আশঙ্কা না করাই প্রেমের সাধারণ ধর্ম্ম। পুরুষমাত্রেরই কোন মেয়েকে ভাল লাগিলে মনে হয় মেয়েটী তাহাকে পাইতে উন্মুখ—একবার মুখ ফুটিয়া বলার যা' দেরী। কিন্তু ভাল লাগা-না-লাগা যে উভয়তঃ প্রেম-ব্যাধিতে, সেই কথাটাই মনে থাকে না—তাই আঘাত হয় গুরুতর।

অমিয় কি বলিবে বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সুষমা কহিল—"বয়স আপনার কত জানি না, আমার চব্বিশ। চোদ্দ থেকে এই চব্বিশ অবধি এই ধরণের প্রেম-নিবেদন শুনে শুনে তাতে আর লোভ নেই। তা' ছাড়া, পথে দেখা, আমার কোন পরিচয় আপনার জানা নেই। আমিও আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

অমিয়র মুখ ফুটিল—"কি তুমি জান্‌তে চাও, বলো। তোমাকে গোপন করবার আমার কিছুই নেই।" অমিয়র কণ্ঠে আবেগ ও মিনতির মিলিত ঐকতান।

সুষমা হাসিয়া বলিল—"আপনার কথা জানাবার তাড়া খুব বেশী বুঝতে পারছি, কিন্তু জানবার তাড়া আমার মোটে নেই—কেন না, আবশ্যক নেই।"

অমিয়র দেহের বলও যেন ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। পা দুইটা যে রকম কাঁপিতেছে, তাহাতে পড়িয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। মাথাটার মধ্যে যেন কি রকম অবস্থা হইয়াছে! অমিয় যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। তবে এইটুকু স্পষ্ট যে, এখানে আর কোন আশাই নাই।

সুষমা বুঝিতে পারিয়া বলিল—"চলুন, ফেরা যাক্। আপনার মন ভাল নয়; হয় ত শরীরও খারাপ হ'য়ে পড়বে।"

শরীর বা মন ইহার কোনটার কি অবস্থা, অমিয় বুঝিবে কি করিয়া? প্রথম প্রণয়-নিবেদনের ফলে যে আঘাত সে পাইয়াছে, তাহাতে দেহ-মনের পার্থক্য যোড়া লাগিয়া দার্শনিক আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আছে তীব্র একটা অনুভূতি। সেই অনুভূতির দুঃসহ বেদনা যেমন প্রকাশ করা চলে না, তেমনি গোপন করাও যায় না।

বেচারী অমিয় ফিরিল। সুষমার মনটাও ভাল নাই। অনেক প্রণয়ীকে প্রত্যাখ্যানের আঘাতে আহত করিয়া তাহার আনন্দ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু অমিয়কে আঘাত দিয়া তাহার মনেও ব্যথা লাগিল। তাই ফিরিবার পথে নীরব ও নতমুখ অমিয়র পাশে চলিতে চলিতে বলিল—"দেখুন, পাওয়া এবং দেওয়া ব্যাপারে এমন কতগুলো জিনিষ আছে, যে গুলো চাইলেই দেওয়া যায় না। আপনি আমার কাছে যা' চেয়েছেন, তা' চাওয়া যায়, কিন্তু চাইলেই দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটুকু বোঝবার চেষ্টা করবেন যে, অনেক ক্ষেত্রে না পাওয়ার দুঃখের চাইতে দিতে না পারার ব্যথা অনেক বেশী।"

অমিয় সুষমার মুখের পানে চাহিয়া অত্যন্ত প্রণয়ীর মত বলিল—"কিন্তু সইতে যে পারব না সুষমা।"

সুষমা হাসিয়া বলিল—"ওটা একেবারে বাজে কথা। পনের দিন দেখা করবেন না, দেখবেন মন পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। এই রোখো।"

টুং করিয়া শব্দ হইয়া বাস থামিল।

* * *

মাস তিনেক ব্যবধানে অমিয়র প্রত্যাখ্যাত প্রথম প্রণয়ের আঘাত ক্ষত আরাম হইয়া গিয়াছে। পথে আজও সে চলে; তবে মহিলা দেখিলেই তাহাকে নিজের প্রণয়িনী এবং আপনাকে তাহার প্রণয়ী কল্পনা করার নির্বুদ্ধিতা সে অনেকটা জয় করিয়াছে। সুষমা সম্বন্ধে সে একপ্রকার নিশ্চিন্ত এবং তাহার সহিত পথে-ঘাটে

সাক্ষাতে পাছে লুপ্ত ক্ষত পুনরুজ্জীবিত হয় এই ভয়ে সে তাহার বৈকালিক বায়ু-সেবনের চির-পরিচিত স্থান ত্যাগ করিয়া চিত্র-জগতে প্রবেশ করিবার আশা পোষণ করে। তবে একটা কথা মনে হইয়া মাঝে মাঝে দুঃখে ও আক্রোশে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠাকে এখনও সে সংযত করিতে পারে নাই। সুষমার সহিত সুধীরকে যোগ করিয়া মনে হইলেই তাহার উত্তেজনা আসে এবং তাহাদের উভয়ের অজ্ঞাত সম্বন্ধ যে সুষ্ঠু এবং সঙ্গত এই সিদ্ধান্ত সে কোনমতেই করিতে পারে না। সুধীর যে সুষমার প্রণয়ী এ ধারণা না জানি কেমন করিয়া অমিয়র মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

তাই সেদিন চিত্র-জগতে বিশিষ্ট আকর্ষণ না থাকায় অমিয় বাসের মাথায় চাপিয়া বসিল। মনের সব কথা প্রকাশ না হইলেও, একদিনের বাসের ঘটনা মনে পড়িয়া তাহাকে আজ আবার চঞ্চল করিয়া তুলিল। বাসের মধ্যে বাহিরে পথের দুই পাশে এবং দক্ষিণ ও বামে যে সকল পথ বাঁকিয়া গিয়াছে তাহাদের সুদূর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া সুষমা বা সুধীরের ছায়াও চোখে পড়িল না। অমিয়র মনটা কেমন যেন নিরাশ হইয়া পড়িল। নিশ্বাসটা একটু জোরে আসিয়া পড়ায় তাহাকে টানিয়া লইতে হইল।

ইহার পরে পথের বৈচিত্র্যে এক সময় সব ঠিক হইয়া গেল। অমিয়র মনে আর কোন গ্লানি নাই। বাস আসিয়া মাঠের ধারে লাগিল। অমিয় নামিয়া পূর্ব্ব-পরিচিত বেঞ্চিতে বসিতে যাইয়া দূর হইতে দেখিল, একযোড়া ফিরিঙ্গী পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করিয়া বিশিষ্ট ভঙ্গীতে পরস্পরের দেহ-সংলগ্ন হইয়া বোধ হয় বহির্জগৎ ভুলিবার উপক্রম করিতেছে।

সেইদিকে ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিপাত করিয়া অমিয় তাহার গতি পরিবর্ত্তন করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। দূরে 'ভিক্টোরিয়া-স্মৃতিসৌধে'র গম্বুজের আড়ালে চাঁদের লুকোচুরী। সুবেশ সুন্দর নরনারীর সান্ধ্য-বিহার। মলয়ানীলের মৃদুস্পর্শ। সর্ব্বোপরি ফিরিঙ্গী-যুগলের লীলাস্মৃতি একত্র হইয়া অমিয়র মনটাকে লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

অমিয় বিভ্রান্তের মত চলিতে লাগিল। দূরে পরিণত সন্ধ্যার আবরণে আত্মগোপন করিয়া দুইটী ছায়া মন্থরগমনে বিশ্বের সমস্ত কর্ম্ম-চঞ্চলতাকে ব্যঙ্গ করিয়া চলিয়াছে। অমিয় কাছে আসিয়া পড়িল; কিন্তু এবার আর ভ্রূভঙ্গী সম্ভব হইল না। অপরিচিত একজনের বাহুবেষ্টনের মধ্যে এলাইয়া পড়িয়া সুষমা চলিয়াছে। দু'জনের মুখ এত কাছাকাছি যে, কল্পনা করিলে বাস্তব মরিয়া যায়।

অমিয়র বুকের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হইল, তাহা একমাত্র অনুভবে বুঝিতে হয়। একবার মনে হইল, সুষমাকে অপরিচিতের বাহুবন্ধন হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসে—কিন্তু সাহস হইল না। একটা বদ্‌ছোক্‌রা টর্চ্চ ফেলিয়া কি একটা রসিকতা করিয়া পাশ দিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু টর্চ্চের আলো আলিঙ্গন-বদ্ধ যুগলের মুখের কাছে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল।

অমিয় তখন তাহাদের একান্ত সন্নিকটে। আলোক স্পর্শে তাহাদের মোহ টুটিয়া গেল এবং ত্রস্তে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহারা লুকাইবার চেষ্টা করিতেই সুষমা ও অমিয়র চোখোচোখী হইয়া গেল।

কথা বলিতে পারিলে হয় ত অবস্থা সহজ হইত, কিন্তু সুষমা শত হইলে বাঙালীর মেয়ে। ফিরিঙ্গীয়ানার অনুকরণ করিতে অভ্যাস করা এবং আসল ফিরিঙ্গীত্ব এক বস্তু যে নয় সে কথাও সুষমা জানে। সে মিনিটখানেক হতবুদ্ধির মত থাকিয়া তাহার সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দেখো, লোকটা কিরকম বে-আক্কেল! হ্যাঁ ক'রে দেখছে, যেন গিলে খাবে।"

অমিয়র সারাদেহে আগুন ধরিয়া গেল। কি একটা শক্ত কথা বলিবার জন্য সে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া মুখ ঘুরাইয়া পথ চলিতে সুরু করিয়া দিল!

পুরাতনের পরিচয়

অন্তরাত্মার ছবি

(Francois de Nion-র ফরাসী হইতে)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মঃ ফ্রেমুজ চিত্রশালা হইতে বাহির হইতেছিল এমন সময় একটা চিত্র-পট তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পটখানা ছায়ার মধ্যে বেশ একটু প্রচ্ছন্ন ছিল; আসলে ছবিটা ভরা দিনের আলোয় দেখিবার মত জিনিস নহে। কি রং-এর কাজ, কি আঁকার কাজ—কোনটাই ওস্তাদের হাতের নহে। কিন্তু মাঝামাঝি গোছের চিত্রকর হইলেও, যে মুখ সে চিত্র করিয়াছে সেই মুখের অপূর্ব্ব ভাব ও দুর্ল্লভ চিত্তহারী সৌন্দর্য্য তাহার নৈপুণ্যের অভাবেও অপনীত হয় নাই। চিত্র-পটের নিকটে আসিয়া ফ্রেমুজ চিত্রের কত তারিফ করিতে লাগিল। ললাট কি নির্ম্মল; সূক্ষ্ম ভুরুর নীচে চোখ দুটি কি সুন্দর, ওষ্ঠাধরে কি একটা ভীতিপূর্ণ সরলতা; এক কথায়, সমস্ত মুখশ্রীতে একটি আত্মা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ফ্রেমুজ তাহার তালিকা-পুস্তিকাটি পড়িয়া দেখিল, "জোভীন, তসবীর; চিত্রকরের নাম ফার" ইত্যাদি। তাহার পর, এই স্বপ্নমুগ্ধ যুবক "শাঁজেলিজে" উপবনের নবোদিত বসন্তের নব আনন্দে মাতিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল; তাহার স্বপ্নের একটা নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহার স্বপ্ন-মূর্ত্তির নাম "জোভীন্"; উহার চক্ষু দুটি মৃদু নীল বর্ণের; রংটা জানা গিয়াছে, নামটা জানা গিয়াছে,—যাহা হোক্ ইহাও কতকটা আশ্বাসের বিষয়।

ফ্রেমুজ্ জীবনের সুখ ভাল করিয়া আস্বাদ করিয়াছিল; একটু নীরস হইলেও জীবনটা নিতান্ত মন্দ ছিল না। এতটা সঙ্গতি ছিল যে কোন কাজ কর্ম্ম করিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না। এই অলস জীবন সে বেশ উপভোগ করিত। তবু মাঝে মাঝে একটা অবসাদের ভাব আসিত;—মনে হইত সময় যেন কাটিতেছে না। আজ চিত্রশালাতে পটারণ্যের মধ্যে জোভিনোর চিত্রটি আবিষ্কার করিয়া তাহার অবসাদগ্রস্ত মন একটা কাজ পাইয়া বাঁচিল।

যাহাকে দেখিয়া তাহার মনে একটা সুখের ভাব আসিয়াছে সেই মেয়েটিকে দেখিতে তাহার ইচ্ছা হইল।

ফ্রেমুজ তাহার চিত্রতালিকা পুস্তিকার বর্ণনা অনুসারে একটা রাস্তা দিয়া নামিতে লাগিল; রাস্তাটা যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে চিত্রকর "ফারে"র কর্ম্মস্থান। সেইখানে আসিয়া ফ্রেমুজ চিত্রকরকে জোভিনের কথা জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু চিত্রকরকে উত্তর দিতে একটু নারাজ দেখিয়া এবং তাহার স্বভাবটাও খিট্‌খিটে রকমের দেখিয়া, সে আর বেশী জিজ্ঞাসাবার্ত্তা করিল না। মনে করিল হয়ত চিত্রকর নামটা গোপন করিতেছে—সকল পেসাদারদিগেরই এক একটা গুপ্তকথা থাকে—তাহারা তাহা প্রকাশ করিতে চাহে না। জোভিনের কথা জিজ্ঞাসা করাটাই তাহার অবিবেচনার কাজ হইয়াছে। এই ভাবিয়া সে ঐখান হইতে প্রস্থান করিল এবং তাহার পর আইজ্যাকের ছবির দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল। ফ্রেমুজ কখন কখন সময় কাটাইবার জন্য তাহার দোকানে যাইত। চিত্রকর ফারের সহিত আইজ্যাকের বেশ জানাশুনা ছিল। কিন্তু উহার অঙ্কিত চিত্র আইজ্যাক উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিত না। তাই বেচা কেনার সময়, চিত্রের নীচে ফারের স্বাক্ষরিত নাম খরিদ্দারকে দেখাইতে চাহিত না। সূক্ষ্ম খুঁৎদর্শী আইজ্যাক বলিল :—

—"ও ছোক্‌রাটার সঙ্গে কারবার করা চলে না—তবে, নিতান্ত খারাপও নয়।"

—"কিন্তু ঐ তসবীর-চিত্রকরের বেশ একটু নিপুণতা আছে ; চিত্রশালায় ওর আঁকা সেই মুখখানি..."

—"কিন্তু দেখুন মশায় ও জীবনে কখনও তসবীর আঁকে নি, আপনি সেই ছোট্ট বদখৎ জিনিস্‌টার কথা বল্‌ছেন ?...ওটা একটা জীবন্ত 'মডেলে'র নকল মাত্র।"

তাহার এই কথায় ফ্রেন্সুজের একটু রাগও হইল একটু কষ্টও হইল।

তবে কি, ঐ মধুর ললাটখানি, ঐ নির্ম্মল চোখ্ দুটী, ঐ ডিম্বাকৃত মুখের গঠনটী একজন ঘণ্টার হিসাবে ভাড়া-করা লোকের এবং আসল মুখটা নিতান্ত সাদামাটা ধরণের ? —না, এ কথা ত বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ;— এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া, ফ্রেন্সুজ আইজ্যাকের দোকানে হইতে চলিয়া গেল—তাহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশে ঐ দিন তাহার দোকান হইতে একটী জিনিসও কিনিল না। তাহার পর চিত্রশালায় গিয়া সেই ফারের চিত্রিত তস্‌বিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিল, এবং মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিল :—

—"বোধ হয় মেয়েটি কুল-ললনা ; শুধু উহার মুখের ছবিটাই আঁকাইয়া লইয়াছে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আইজ্যাকটা আমাকে বলে নি যে, মেয়েটি তার মায়ের সঙ্গে, ভগিনীর সঙ্গে একটা পরিবারের মধ্যে বাস করে। এই মুখশ্রী, এই মুখের অবয়ব কখনই একজন ইতর রমণীর হ'তে পারে না..... কিন্তু অন্তরাত্মাটা—অন্তরের ছবিটা যদি ওর নিজের না হয়—সে বিষয়ে যদি কিছু সন্দেহ থাকে—তা'হলে কিন্তু আমার ভাল লাগ্‌বে না।"

সে এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় তাহার কাঁধের উপর একটি হাত স্থাপিত হইল। "সুবেল্" বলিল :—

—"তবে তুমি ফারকে জান না কি ?"

—"তেমন ভাল জানি নে—কেন বল দিকি ?"

—"কেন না, আমি দেখ্‌ছি, প্রায় সওয়া-ঘণ্টা ধরে, নিতান্ত একটা মাঝারি গোছের চিত্র পটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুমি ধ্যানে নিমগ্ন আছ।"

—"মুখটি অতি সুন্দর।"

—"তুমি কি তার্তিনকে জান না ? তার্তিনই ত ফারের সচরাচর ব্যবহৃত "মডেল"। এটা তার্তিনের তস্‌বির। কিন্তু তার্তিনের সঙ্গে সাদৃশ্য নেই।"

—"যাই হোক্ খুব একটা মনমুগ্ধকর জিনিস হ'য়ে উঠেছে।"

—"এই মুখশ্রী ও মুখাবয়ব তারই বটে, কিন্তু তবু সে নয়।"

—"তার্তিন যে আজকাল একজন "নক্ষত্র" হ'য়ে উঠেছে—সে যে "দেবলোক"-অপেরায় নৃত্য করে।"

ফ্রেন্সুজ এই কথাটা তার নোট-বইয়ে টুকিয়া রাখিল কিন্তু একজন নাচ-ওয়ালীর কাছে গিয়ে সন্ধান লইতে গেলে একটি কুল-ললনার চিত্রকে অপমান করা হয় মনে করিয়া সেখানে যাইতে তাহার মন সরিল না। কিন্তু সেইদিনই সায়াহ্নে, ইচ্ছা না করিলেও, যেন যন্ত্রের মত চালিত হইয়া সে সঙ্গীত-শালার দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইল। এবং বাদ্যস্থানের প্রথম সারিতে গিয়া উপবেশন করিল।

ফ্রেন্সুজ একটু পরেই তার্তিনকে দেখিতে পাইল, দেখিল তার্তিন সিঁড়ির উপর খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি হাত-দুর্ব্বীনটা চোখের সামনে আনিয়া—যে মুখ কয়েকদিন ধরিয়া তাহার মনকে অধিকার করিয়াছে, সেই মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। অত আগ্রহ করিয়া যে দুর্ব্বীনটা চোখের কাছে আনিয়াছিল সেই দুর্ব্বীনটা তখনই কিন্তু আবার নামাইয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। কেন না, তাহার স্মৃতির সহিত বাস্তবের অমিল হইতেছে! ইহা নিশ্চয় রং মাখার বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও সেই ছবির মত একই রকম মুখাবয়ব, একই রকম মুখের রেখা, একই রকম রংএর আভা ; তবু সুবেল্ যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক্—ইহার মুখ ঠিক্ সেই ছবির মুখের মত নহে। তবু অনেকক্ষণ ধরিয়া, উহার মুখ ছবির মুখের সহিত মিলাইয়া দেখিতে লাগিল।

একদিন সেই ছবির ফ্রেমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ফ্রেন্সুজ ভাবিতেছিল, তার্তিন ছবির মত দেখিতে নহে, ঠিক সেই সময় একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি তাহার মনে আসিয়া উপস্থিত হইল, প্রকৃত জোভিন্ তাহার সম্মুখ দিয়া এইমাত্র চলিয়া

গিয়াছে; কিন্তু এই মূর্ত্তি সাগর-জলদের ন্যায় তখনই মিশাইয়া গেল। ফ্রেমুজ তাহাকে অনুসরণ করিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। একটি তরুণী এই জনমানব শূন্য সময়ে একটা দুঃখের ভাবে ভোর হইয়া, সুকুমার পদক্ষেপে চিত্রশালায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ফ্রেমুজ চট্ করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়া, সবিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল। যে ছবি তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহারই প্রতিবিম্ব, তাহারই আভা, তাহারই মুখের ভাব তাহার সম্মুখে উপস্থিত।—সেই মধুর ললাট, সেই নির্ম্মল ওষ্ঠাধর—সেই সমস্তই যেন ছবি অপেক্ষাও প্রকৃত···কিন্তু তবু, দেখিতে ত তেমন সুশ্রী নহে। তার্তিন ও এই মেয়েটির মধ্যে—আকাশ পাতাল প্রভেদ··· যাই হোক্, ছবিটা তার্তিনের—কিন্তু এই মেয়েটিই আসল লোক। ফ্রেমুজ নিকটে কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া আসিল।

এক বৃদ্ধার সহিত (বোধ হয় ঐ তরুণীর মা) একসঙ্গে আসিয়া, ফার মেয়েটিকে ডাকিল:—

—"জোভিন্! একবার এই দিকে এসো ত?" যখন মেয়েটি তাড়াতাড়ি সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তখন ফ্রেমুজের মনে হইল যেন সুখ-স্বপ্নের একটা মধুর উচ্ছ্বাস মৃদু-হিল্লোলে বহিয়া গেল।

যেদিন জোভিন ফ্রেমিজের বাগদত্তা হইল সেইদিন ফ্রেমুজ জানিতে পারিল,—ফার, মডেল-তার্তিনের সমস্ত মুখাবয়ব ঠিক গ্রহণ করিয়া, তার্তিনের ভগিনীর অন্তরাত্মাটা চিত্রপটে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। চিত্রকর একজনের সুন্দর মুখের উপর, আর একজনের অন্তরাত্মার মুখস্ বসাইয়া দিয়াছে। একদিন ফ্রেমুজ জোভিনের ছবিখানি দেখিতে দেখিতে বলিল, "এই ছবি হতেই আমি তোমাকে পেয়েছি—এই সেই ছবি যার সাদৃশ্য তোমার সঙ্গে খুবই কম, আবার খুবই বেশী!" *

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

* 'বঙ্গবাণী', দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ, প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩০

মায়ার দাবী

কবিশেখর শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[মরণেও যে মায়ার উচ্ছেদ হয় না—তার দাবী সে ষোলআনা পুরণ ক'রে নিতে চায়—সেই কথাটা এখন পরিষ্কার ক'রে বল্‌তে চাই!......লেখক।]

—'চুপ্, আস্তে! কথা বলো না, আমি দেখি আগে ব্যাপার কি।'

—'না গো, না, তোমার পায়ে পড়ি, একলা যেও না।'

—'ভয় নেই। তুমি বিছানার ওপর ব'সে থাকো—আমি ঘরের বাহিরে যাব না; দরজার ফাঁক দিয়ে দেখ্‌বো।'

—'না না, তুমি বুঝ্‌ছো না—তুমি আমার কাছে থাকো। ভগবান, এ কি কর্‌লে প্রভু! ভালয় ভালয় রাত্‌টা কাটিয়ে দাও ঠাকুর—'

—'বালা, কেঁদো না, ভয় কি? আমি ত কাছেই আছি। তুমিও না হয় পা টিপে টিপে খুব আস্তে আস্তে আমার পেছনে এসো।'

সহসা দরজা ঝন্‌ঝন্ শব্দে কেঁপে উঠ্‌লো।

*   *   *

ঘরের ভিতর যারা কথা বল্‌ছিল—প্রথম হরকুমার, দ্বিতীয়া তাহার রুগ্না স্ত্রী দেবীবালা। হরকুমার স্ত্রীকে বালা ব'লে ডাক্‌তো।

দেবীবালার রোগ শক্ত ব'লে হাওয়া-বদলের জন্যে ডাক্তারের পরামর্শে হরকুমার সস্ত্রীক পশ্চিমে এসে এই বাড়ীতে পাঁচ-সাতদিন দিন বাস কর্‌ছে। সঙ্গে এসেছেন তার মা, ছোট ভাই, ঝি আর অনেক দিনের পুরাণ চাকর অভিমন্যু।

হরকুমার তিরিশ বছরের সাহসী যুবক। অবস্থা মধ্যবিৎ, লেখাপড়া সামান্য জানে, চাক্‌রী করে না। বাপের তেজারতী কারবার আছে; মুনফা নেহাৎ মন্দ নয়—ছোটখাট একটা জমিদারীর আয় বল্‌লেও চলে। তার গায়ে জোরও খুব। পাঁচ-ছয় জনের মোয়াড়া একাই সে বিনা অস্ত্রে নিতে পারে।

বছর দুই আগে তার বাপ বেঁচে থাক্‌তে একবার একটা দাঙ্গা বাধে খাতকদের সঙ্গে।

গ্রামের ছোট-বড় সবাই লাঠি-সোঁটা নিয়ে হরকুমারের বাপকে ঘেরাও কর্‌লে। 'পাক'রা ভড়্‌কে গেল। হরকুমারের বাপ ত' কেঁপেই অস্থির।

হরকুমার হঠাৎ লাফিয়ে প'ড়ে একজনের হাত থেকে সে একগাছা লাঠি কেড়ে নিয়ে এমন সুকৌশলে ও জোরে ঘোরাতে লাগ্‌লো যে, বিনা রক্তপাতে দল্‌কে দল হটে যেতে পথ পেলে না।

সেই হ'তে শুধু ওই গ্রামের কেন, অনেক দূরের গ্রাম পর্যন্ত হরকুমারকে সবাই মান্‌তো, আর যমের মত ভয় কর্‌তো।

হরকুমারের স্ত্রী দেবীবালা বড় ঘরের মেয়ে। রঙটি তার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নাক মুখ চোখ বেশ তর্‌তরে, বেশ সুগোল।

হরকুমারের ছোট ভাই এই বছরে ম্যাট্রিক্ পাশ দিয়ে আই-এ পড়্ছে। ছোট ভাইটিকে একটা কেষ্ট-বিষ্ণুগোছের তৈরী কর্বার ইচ্ছেটা হরকুমারের মনে মনে আছে তা' দেবীবালা ছাড়া আর কেউ বড় একটা জান্‌ত না।

হরকুমারের ভায়ের নাম রাজকুমার। তার স্বভাব ছিল মধুর। দোষের মধ্যে বড় জেদী—যা' গো ধর্‌তো তা' না ক'রে আর ছাড়্‌ত না। শক্তিও ছিল দেহে তার অসীম; তবে দাদার মত অত সাহসী ছিল না।

মা মারা যাবার সময় দেবীবালা তার বাপের বাড়ীতে প্রায় মাসখানেক ছিল। সে দেশটা খুব পাড়াগাঁ না হ'লেও ম্যালেরিয়ার উৎপাতটা বেশই ছিল। মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি হ'য়ে যাবার পর, বাড়ী-ঘর, জমী-জমার সব বন্দোবস্ত ক'রে সে যখন ফিরে এল, তখন হ'তেই তার অসুখ।

প্রথম কবিরাজী চিকিৎসার পর উৎকট এ্যালোপ্যাথিকে দেবীবালার রোগটা হঠাৎ বেড়ে গেল। কোলকাতায় এসে অনেক টাকা খরচ ক'রে চিকিৎসা করাতে কতকটা সার্‌লো বটে, তবে হাওয়া-বদলের জন্য বাধ্য হ'য়ে পশ্চিমে আস্‌তে হলো।

প্রথমটা এসে পাঁচ-ছয়দিন বেশ শান্তিতে ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন রাত্রি বারটার পর দরজায় কে যেন ঘন ঘন ধাক্কা দিতে লাগ্‌ল প্রথমটা দু'-চারবার হরকুমার সাড়া দিয়েছিল; কিন্তু কোন উত্তর পায় নি—শব্দও বন্ধ হ'য়ে যায়।

খানিক পরে রাত্রি তখন একটা হবে, ধাক্কার মাত্রা বেশ জোর জোর হ'তে লাগ্‌লো; সঙ্গে সঙ্গে দরজার শিকল ও কড়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে বেজে উঠ্‌লো।

সাড়া দিয়েও উত্তর না পাওয়াতে হরকুমার একগাছা মোটা লাঠি নিয়ে দেবীবালাকে চুপ্ কর্‌তে ব'লে দরজার দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু দেবীবালার কাতর অনুরোধে ফির্‌তে হ'ল।

দেবীবালা শব্দ শুনে বল্‌লে—'হুড়কো খুব মজবুত আছে, দরজার পাল্লাও বেশ মোটা, ভাঙ্‌তে পার্‌বে না।'

হর—'আমার বোধ হয় কোন বদ্‌লোক, চোর ডাকাত নয়। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? একটু বসো, আমি ব্যাপারটা কি দেখি।'

দেবী। 'অভিমন্যু ও ঠাকুরপোকে জান্‌লা দিয়ে আগে ডাকো, আলোটা জোর ক'রে বাড়িয়ে তারপর দর্‌জা খুল্‌বে।

হরকুমার কথামত পাশের জান্‌লা খুলে ভাই ও চাকরকে বারকতক ডাক্‌তেই তারা সাড়া দিলে; কিন্তু আলো নিয়ে বাহিরে আস্‌তে পার্‌লে না; চেঁচিয়ে বল্‌লে—দরজা কে বন্ধ ক'রে দিয়েছে, বার হ'তে পার্‌ছি না।

দেবীবালার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। পা তার কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। হরকুমারের হাতটা দু'হাত দিয়ে ধ'রে মুখের কাছে বিবর্ণ মুখখানি এনে বল্‌লে—'দেখ্‌লে ত একা বেরুলেই বিপদ হ'ত। ওরা এখানে আস্‌বার আগে সব ঘরের দরজাগুলোতে শিকল টেনে দিয়েছে।'

হরকুমার একটু ভাব্‌লে। মিষ্ট কথায় আদর ক'রে দেবীবালাকে বল্‌লে—'বালা, তুমি ভয় পেও না; ওরা দশ-বারজন হ'লেও আমি ভয় করি না। তবে কি জানো, ব্যাটাদের কাছে যদি বন্দুক থাকে, তা—ই যা' ভাব্‌ছি।'

দেবী—'ওগো, ও সব হাঙ্গামা বাধিয়ে কাজ নেই, তুমি দরজার কাছেই লাঠি নিয়ে থাকো। যদি নেহাৎ দরজা ভাঙে, তখন ঘরে ঢুক্‌লেই তোমার লাঠিতে জখম হবে।'

হর—'ত' জানি বালা, বাধ্য হ'য়ে তাই কর্‌তে হবে। তুমি যদি কাছে না থাক্‌তে, তা' হ'লে আমি একবার দেখে নিতাম।'

দেবী—'এক কাজ করো না আশ্‌পাশেতে অনেক বাড়ী আছে, একবার চেঁচিয়ে ডাক্‌লে হয় না? গোলমাল শুন্‌লে নিশ্চয়ই সবাই ছুটে আস্‌বে—একবার ডাক্‌বে?'

হর—'না, তাতে দরকার নেই। আচ্ছা, আমি ফাঁক দিয়ে একবার দেখি।'

আবার ঝন্‌ঝন্ ক'রে দরজা নড়ে উঠলো। এবারকার ধাক্কাটা খুব জোরে। নাড়ার চোটে দরজার পাশ থেকে

খানিকটা বালির চাপড়া দেবীবালার পায়ের কাছে পড়্‌ল।

ধাক্কার পর ধাক্কা। ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে জানলা-দরজা সব কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। নীচে থেকে রামকুমার চেঁচিয়ে বল্‌লে—'দাদা, ওপরে কিসের শব্দ হচ্ছে? দাদা, দাদা।'

হরকুমার পাশের জান্‌লা খুলে বল্‌লে—আমার ঘরের দরজায় কারা ধাক্কা মারছে বুঝতে পারৃছি না।

সঙ্গে সঙ্গে একটা গোলমাল উঠলো, হরকুমারের মা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌লেন। হরকুমার আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লে না। কারও অনুরোধ-উপরোধ তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লে না, সে দেবীবালাকে ফেলে উন্মত্তের মত দরজা খুলে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লো।

দেবীবালাও আলোটা জোর ক'রে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল।

হরকুমার এসে দেখ্‌লে মায়ের ঘরের দরজা খোলা—মা অজ্ঞান হ'য়ে মেঝেতে পড়ে। হরকুমার মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগ্‌লো; দেবীবালা পাখা নিয়ে মাথায় বাতাস কর্‌তে বস্‌লো।

হরকুমারের মায়ের জ্ঞান হতেই তিনি বল্‌লেন—'বাবা রাত পোহালেই এ বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ী দেখো।'

হর—'কোন মা, ভয় পেয়েছ? ভয় কি? আমি যখন তোমার রয়েছি, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার।'

মা উঠে ব'সে গায়ের কাপড় গুছিয়ে নিতে নিতে বল্‌লেন—'তা' জানি বাবা, কিন্তু এরা মানুষ নয়, তুমি কার সঙ্গে লড়াই করবে?'

রামকুমার হ্যারিকেন নিয়ে এল। হরকুমার বল্‌লে—'হ্যাঁরে, কেমন ক'রে এলি, দরজা না বন্ধ ছিল?'

রাম—'একটু আগে কে ঝণাৎ ক'রে শিকলটা খুলে দিয়ে, কি রকম একটা বিকট হেসে সাঁ ক'রে চ'লে গেল। আমি বেরিয়ে দেখি, পাচিল টপ্‌কে একটা কালোমত লোক লাফিয়ে পড়্‌লো।'

হর—'বলিস্‌ কি! সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

রাম—'কই? না, সে একা। ভাবলাম পিছনে যাই; কিন্তু সে টপ্‌কে পড়লো। একে রাত্রি, তায় অন্ধকার, আর আশপাশ তেমন চেনা নাই, তাই ওপরেই চ'লে এলাম।'

মা—'বুঝ্‌লি বাবা—ওই কালো লোকটাই সে একলা, তার সঙ্গে কেউ নেই। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল। ভাব্‌লাম, বোধ হয় বউমা ডাকৃছে। তাই উঠে দরজা খুল্‌তেই দেখি—এক বিকটাকার চেহারা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হেসে উঠ্‌লো। ও বাবা, তার চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে! দেখেই ভয়ে আঁৎকে উঠে প'ড়ে যাই।'

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে আসছে। হরকুমার বল্‌লে—'তুমি কি বল্‌তে চাও মা, যে, সে ভূত? ভূত যদি হবে তা'হ'লে আমরা যেদিন এ বাড়ীতে প্রথম এসেছিলাম, সেই দিনই সে উৎপাত কর্‌তো। পাঁচ-সাতদিন কেটে গেল কোন গোলমাল নেই, আর আজ হঠাৎ ভূত এলো। তুমি মা ভয় পেও না। আমি সকালে উঠেই পাড়ায় খবর নেবো এটা কোন হানাবাড়ী কি না?'

রাম—'আমার বোধ হয় দাদা, কোন বদ্‌লোক ওই রকম ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে। ও সব কিছু নয়—আমরাও দলেও ভারী আছি।'

মা বল্‌লেন—'তা' হ'তে পারে। বেশ, সকালে উঠে তবু একবার খোঁজটা নাও। যদি সত্যি হানাবাড়ী হয়, তবে উঠে যাওয়া যাবে।

খোঁজ নেওয়া হ'ল। বাড়ীর কোন দোষ নেই। আবার পাঁচ-সাতদিন বেশ শান্তিতে কেটে গেল। দেবীবালার শরীরও অনেকটা ভাল; গায়ে বেশ একটু জোর পেয়েছে।

হরকুমারের মায়ের একদিন ইচ্ছে হলো, বাড়ীতে রামায়ণের গান দেবেন। বেশ নামজাদা দল; বিদেশে গাইতে এসেছিল। একটা ভাল দিন দেখে সেই দলের গান দেওয়া হলো। পাড়ার ছেলেমেয়ে অনেক দলে দলে আস্‌তে লাগ্‌লো। এই রকম ক'রে আরও সাতদিন বেশ সুখে কেটে গেল।

গান শেষ হবার দু'দিন পরে রাত্রি বারটার পর আবার

হরকুমারের দরজায় সেই রকম ধাক্কা। শব্দে হরকুমার ও দেবীবালার ঘুম ভেঙে গেল্। হরকুমার উঠে ব'স্লো। চোখ দুটো দু'হাতে বেশ ক'রে রগ্ড়ে বল্লে—'কে রে, ডাক্‌ছিস্ কেন?'

নাকিসুরে উত্তর হ'ল—'আমার ঘরে তোরা কেন? আমি ফি অষ্টমীতে আসি। এ ঘরের মায়া ছাড়্তে পারি নি। তোরা যদি ভাল চাস্ তো কাল থেকে এ ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে থাক্‌বি। আমি তোদের অনিষ্ট কর্‌তে চাই নি, বুঝ্‌লি।

হর—'আপনি কে? এ বাড়ী ত নবকুমারবাবুর।'

উত্তর—'হ্যাঁ, ঠিক। নব আমার ছেলে, আর এ ঘরটা আমারই। নব এ ঘরখানা বাদ দিয়েই থাক্‌তো। তোদের ভয় নেই। হয় কালকেই ঘর ছেড়ে দেবি, না হয় ফি অষ্টমীর দিন ঘর ছেড়ে দিবি—বুঝ্‌লি, ভয় নেই।'

হর—'বেশ, তাই হবে। আর আমরাও মাসখানেক আছি। এরপর এ বাড়ী আপনারই থাক্‌বে।'

উত্তর—'তা' জানি। আর তোরা যে খাঁটী মানুষ তা' আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—তোদের ওপর আমি খুব খুসী। দেখ্, এই ঘরের পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গীর ভেতর খুঁড়্‌লে টাকার তোড়া পাবি। সে তোড়া দুটো তোর বউকে দিস্—ও গেল জন্মে আমার আদুরে মেয়ে ছিল।'

হর—'আপনার কথাই মেনে চল্‌বো। আপনি এ রকম কষ্ট ক'রে কেন আছেন? নবকুমারবাবুকে বল্লে ত সদ্‌গতির ব্যবস্থা কর্‌তে পারেন।'

উত্তর—'তা' পারি; কিন্তু মায়ায় আমায় জড়িয়ে রেখেছে। আমার গায়িত্রী ব'লে যে মেয়েছিল, এখন যে তোমার বউ, ওকে অনেক কষ্টে চার বছরেরটি থেকে মানুষ করি। অবস্থা খুব খারাপ ছিল। অন্য কাজ না পেয়ে শেষে ঘরামীর কাজ ক'রে সংসার চালাতাম। পেট ত বোঝে না—কাজেই কাজের ছোট-বড় বাছি নি। গায়িত্রীর মাকে আমিই একরকম মেরে ফেলি। একটু-আধটু নেশা-ভাঙ আমি কর্‌তুম কি না, কাজেই মনটা সবদিন ভাল থাক্‌ত না।

'একদিন সন্ধ্যার সময় দাওয়াতে ব'সে আছি। হাতে একটিও পয়সা নেই, সংসারে সবই বাড়ন্ত, কেমন ক'রে রাত কাট্‌বে তাই ভাবছি। এমন সময় বউ এসে বল্লে—'সকালে ত ক্ষুদ সিদ্ধ ক'রে আধপেটা চলেছে—রাত্রিরটা কাট্‌বে কি ক'রে? খাবে কি আমার মাথা?'

'গায়িত্রীর মা বড় দুর্ম্মুখী ছিল; সংসারে হাড়ভাঙা খাট্‌তো। গুণও ছিল ঢের—দোষের মধ্যে সময়ে-অসময়ে এমন এক-একটা কথা বল্‌তো যে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যেত। সেদিনও ওইরকম একটা কথা বল্লে। আমি রাগ সামলাতে না পেরে দাওয়া থেকে ধাক্কা মারি। সেও 'টাল' সামলাতে না পেরে ঘুরে ছাঁচ-তলায় প'ড়ে যায়।

'প'ড়ে যেতেই আমার রাগ পালিয়ে গেল—তাড়াতাড়ি উঠিয়ে ঘরে এনে শুইয়ে দিলাম। পেটের যন্ত্রনা হ'তে লাগ্‌লো। রাতভোর জেগে সেঁক-তাপ করলাম। কিন্তু কমা চুলোয় যাক্, বেদনা খুব বেড়ে উঠতে লাগ্‌লো। সকাল হ'তেই গাঁয়ের বদ্দিকে খবর দিই। সে বল্লে- 'তার ঘর ছেয়ে দিতে হবে। তার জন্য সে পয়সা দেবে না। এতে যদি রাজী হই, তা'হ'লে সে রোজ দেখে যাবে; আর ওষুধ-পত্র যা' লাগ্‌বে অমনি দেবে।'

'হিসেব ক'রে দেখ্‌লাম, পাঁচ-ছয় টাকার কাজ। কি করি, ও অবস্থায় স্বীকার হ'য়ে তাকে বাড়ীতে আনি। সাত-আটদিন চিকিৎসা হ'ল; কিন্তু কিছুই হ'ল না—একদিন সাঁজের আলোয় আমার কোলে মাথা দিয়ে মুখের উপর তার জলভরা চোখ দু'টী রেখে গায়ত্রীর মা আস্তে আস্তে আমায় জন্মের মত ছেড়ে গেল। উঃ, কি যন্ত্রণা!'

হরকুমার উঠে দরজা খুলে দিলে। আলো-আঁধারে দেখা গেল—এক বিকট চেহারা দরজার কাছে ব'সে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছে।

হর—'থাক্, আপনার জীবনী আর ব'লতে হবে না। সংসার করতে গেলে ওরকম হ'লে, দুঃখ-কষ্টে মানুষের মেজাজ্ ঠিক্ থাকে না—ভুলচুক হয়েই থাকে।'

উত্তর—'না বাবা, আমি মস্ত পাপী! যাক্, তারপর থেকে অনেক কষ্টে নিজে না খেয়ে, নোংরা ঘেঁটে

বুকে ক'রে গায়িত্রীকে মানুষ করি। তার এতরূপ ছিল যে, বেশ বড়-ঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'ল ; একটি পয়সাও খরচ হয় নি। এজন্মে ওর যা' রূপ দেখছো ও ত কিছুই নয়। সে রূপ ছিল ঠিক গোলাপফুলের মত।

'রূপের জোরেই অতবড় ঘরের বউ হয়েছিল। ওর গুণে ওকে সবাই ভালবাস্‌তো। ওরই চেষ্টায় আমার কুঁড়ের বদলে কোঠা বাড়ী হ'ল—খেটে খাওয়ার দায় থেকে বেঁচে গেলুম।

'অত সুখ আমার সইবে কেন? গায়িত্রীর মার জন্য ভেবে ভেবে আমার শক্ত রোগ হ'ল। জামাই ভাল ভাল ডাক্তার-বদ্দি দেখিয়েছিল—কিন্তু বাঁচাতে পারলে না।

'আমি ও জন্মে দেবতা ও বামুনকে খুব ভক্তি করতাম, আমাদের ধর্ম্ম প্রায় সবি মেনে চল্‌তাম। জীবনে কোন-দিন মিথ্যা কথা জ্ঞানতঃ বলি নি। বোধ হয় সেই পুণ্যে এ জন্মে নবকুমারের বাবা হই। কিন্তু মারা গেলুম অভিমানে, নিজের গলায় নিজেই ফাঁস লাগিয়ে।'

হর—'আমরা কালকেই এ ঘর ছেড়ে দেব। আপনি থাক্‌তে পারেন, কোন অসুবিধা হবে না।'

দেবীবালা উঠে এসে আগন্তুকের পায়ের কাছে তার কোঁকড়ান একরাশ খোলা চুলশুদ্ধ মাথাটি হেঁট ক'রে নমস্কার করলে।

আগন্তুক কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তার কঙ্কালসার হাতটি দেবীবালার মাথার কাছে রেখে বল্‌লে—'মা, আমি কি করবো বুঝতে পারছি নি।'

এই ব'লে উঠ্‌লো। সাঁ ক'রে ঘরের ভেতর গিয়ে কুলুঙ্গীর কতকটা ভেঙে দু' তোড়া টাকা দেবীবালার পায়ের কাছে রেখে বল্‌লে—'মা, তোকে দেখে আমার কত কথা মনে হ'চ্ছে! কিন্তু কি করবো, আমি ত আর মানুষ নই মা! আমার চেহারা দেখ্‌লে সবাই আঁৎকে উঠ্‌বে; কাজেই আমায় লুকিয়ে থাক্‌তে হয়।

'রাত যে শেষ হ'য়ে আস্‌ছে। আমি ত মা আর থাক্‌তে পারবো না। ভয় যদি না পাস্, তবে তোরা এ ঘরেই থাকিস্—ঘর ছাড়তে হবে না। সময়মত এসে দেখা ক'রে যাব।'

দেবী—'আমার ও জন্মের মা এখন কোথায় কার ঘরে জন্মেছেন?'

উত্তর—'তার পাপের ফল সে ভোগ করছে পলাশ-পুরে হরি মোদকের মা হ'য়ে। তাদের অবস্থা খুব খারাপ। তাদের বাড়ীঘর তোর শ্বশুরের কাছে দু'হাজারে বাঁধা। সে আর ছাড়াতে পারবে না। এইবার তাদের গাছতলা সার হবে।'

হর—'বলেন কি! দেশে গিয়েই তাকে মুক্ত ক'রে দেবো। টাকা আর দিতে হবে না—অমনিই খৎ ফিরিয়ে দেব।'

উত্তর—'তা' জানি বাবা, তা' জানি। তোমার জান্ আছে, তুমি মরদ, তুমি দরদী। আজ আমি আসি। কত শান্তি নিয়ে যে যাচ্ছি, তা' আর কি ক'রে বল্‌বো।' এই কথা ব'লে আস্তে আস্তে নীচে নেমে রামকুমারের কথিত পাঁচিল টপকে সে চ'লে গেল।

পরদিন হরকুমার সকালে উঠেই নবকুমারবাবুকে ডেকে খরচ-পত্র দিয়ে গয়াতে পাঠিয়ে তাঁর বাপের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ক'রে দিলে।

তোড়া দু'টী গণে দেখ্‌লে—টাকা ও মোহরে পাঁচ হাজার ক'রে দশহাজার।

* * *

দেশে এসে হরি মোদকের মাকে ডেকে পাঠান হ'ল। হরি মোদক মাকে সঙ্গে ক'রে ভয়ে ভয়ে এলো। বেশ বুঝতে পারলে যে, এবার ভিটেমাটী সবই যাবে; বাপ-পিতামহের ভিটে আর থাক্‌বে না—গাছতলা সার হবে।

হরি মোদক কাঁপতে কাঁপতে সদরে এসে বসলো। তার মা অন্দরে গেল।

হরকুমার তার মা ও ভাইকে আগেই সব জানিয়েছিল। দেবীবালা বেশ যত্ন ক'রে হরির মাকে খাইয়ে কাপড়-চোপড় দিয়ে বল্‌লে—'মাঝে মাঝে এসো। আর তোমাদের টাকা দিতে হবে না। এই খৎ নাও জমীজমা সব ছেড়ে দেওয়া হলো।'

হরির মা চম্‌কে উঠ্‌লো! দু' হাজার টাকা! কৃতজ্ঞতায় চোখ দুটো তার জলে ভ'রে গেল। সে গলায় কাপড় দিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়লো।

সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘর

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

রমেন আর একবার 'ষ্টেথিস্‌কোপ'টা দিয়া ছেলেটাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ষ্টেথিস্‌কোপের নলটি ছেলেটার বুকে পিঠে দু'-একবার বসাইয়া সে অল্পক্ষণেই তাহার কান হইতে সেটা খুলিয়া ফেলিয়া ছেলেটিকে একবার ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পর মুখে অস্ফুট কি একটা উচ্চারণ করিয়া তাহার মুখ পর্য্যন্ত কম্বল টানিয়া দিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

নিভা আপনার খাটটীতে বসিয়াছিল। বুঝিল, ছেলেটা মারা গিয়াছে। আঁতুড়ের ছেলে, মাত্র তিনদিন তো বয়স? তাহার জন্য আর দুঃখ করিবার কি আছে? তথাপি. মাতৃ-হৃদয়ের একটা স্বভাবজাত বেদনা বোধ আছে,—কিন্তু নিভা তাহাতেও বিচলিত হইল না। তাঁহার মন তাহা হইতে আরও গভীরতর কোন বেদনায় তিক্ত হইয়াছিল।

রমেন পায়জামার পকেট হইতে রুমাল টানিয়া লইয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—আপনি তা' হ'লে আমার সঙ্গে চলুন। এখন আপনাকে হাসপাতাল থেকে 'ডিস্‌চার্জ্জ' করে' দেওয়া হবে। আর 'বেবি'র সংকারের বন্দোবস্ত আমি করে' দিচ্ছি।

নিভা তাহার কথামত পিছনে পিছনে চলিল।

ছোট্ট একটী তিনদিনের ছেলে! মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য একবার চোখ চাহিয়া পৃথিবীর আলো দেখিয়া চোখ বুঝিয়াছে।—একথা আর কাহার স্মরণ থাকিবে না। শুধু শিশুটির জননীর বুকে শৈশব-স্মৃতির মত একটা অস্পষ্ট, কুহেলী-ক্লিন্ন অনুভূতি থাকিয়া যাইবে, —আর হাসপাতাল-'রেকর্ডে' এই শিশুটীর অকাল মৃত্যু-কাহিনী কালীর দু'টা আঁচড়ে লিখিত থাকিবে মাত্র!—

রমেন অল্পদিন হইল সাহেবগঞ্জের হাসপাতালের ডাক্তার হইয়াছে। পরিবারের মধ্যে কাহাকেও এখানে আনে নাই। কলিকাতাতে তাহাদের বাড়ীতে বৃদ্ধা মা আর ছোট ভাই-ভগ্নীগুলিকে রাখিয়া আসিয়াছে। যদিও সে এখানে একা আছে, তথাপি সে নিজের ইচ্ছামত একটী বাংলো ভাড়া লইয়াছে। মেস হোষ্টেলের হট্টগোলের ভিতর তাহার থাকিতে ভাল লাগে না।—

কলিকাতা হইতে আসিতে আসিতে এক আকস্মিক ব্যাপারে তাহার নিভার সহিত পরিচয় ঘটিল। কি একটা ষ্টেশন,—রমেনের ঠিক মনে পড়ে না—সেখানে 'ষ্টপেজ' মাত্র দেড় মিনিট কি দু'মিনিট। হঠাৎ একটি তরুণী আসিয়া সেই কামরায় উঠিল এবং একটী যুবক প্লাটফরম হইতে তাড়াতাড়ি 'ব্যাগেজ'গুলি তুলিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু ব্যাগেজগুলি তুলিয়া দেওয়া হইতে-না-হইতেই গাড়িটা ছাড়িয়া দিল। যুবকটা 'ফুটবোর্ডে' পা দিয়া উঠিয়া পড়িল বটে, কিন্তু 'টাল' সামলাইতে না পারিয়া পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতেছিল। রমেন দরজার নিকট বসিয়াছিল। 'খপ্' করিয়া লোকটির হাত ধরিয়া ফেলাতে সে উঠিয়া পড়িল।

মেয়েটি আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ফেলিল!…

যাক্, সে বাঁচিয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা নাই! এতগুলি ট্রেনযাত্রীর ভিতরেই সে কলস্বিনী হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—উঃ, ভাগ্যে আপনি ছিলেন? তা' নইলে আজকে?..আপনি আমাদের ভয়ানক উপকার করলেন কিন্তু…

মেয়েটি তাহার বড় বড় চোখ দু'টী রমেনের দিকে ফিরাইয়া মিনতিপূর্ণকণ্ঠে এই কথাগুলি বলিল।

ওর চিকন-চোখ দু'টীতে নিদাঘ সন্ধ্যার স্তিমিত প্রশান্তি বিছান আছে যেন! রমেন ওইদিকে বেশীক্ষণ

তাকাইয়া থাকিতে পারে না ; ও যেন তাহার চাহনির নিঃসীমতার ভিতর আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার কথার উত্তরে কি বলিতে হইবে ঠিক করিতে না পারিয়া রক্তিম-লজ্জায় আপনিই মাথা নীচু করিয়া ফেলিল।

শেষ পর্য্যন্ত যুবকটিই তাহাকে বাঁচাইয়াছিল···

সে কোথা হইতে একটা 'টিফিন-ক্যারিয়ার' টানিয়া বাহির করিয়া মেয়েটীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—খিদেয় মুখ শুকিয়ে গেছে দেখচি, কিছু খাবে না ?—

মেয়েটী অনুযোগের স্বরে ঝাঁকাইয়া উঠিল—ও মা! এই না বাড়ী থেকে খেয়েদেয়ে আসচি ? তুমি একটা রাক্ষস! তোমার নিজের খিদে পেয়ে থাকে, তুমি নিজে খাও না!—

যুবকটী উত্তরে কিছু না বলিয়া টিফিন ক্যারিয়ারটী হইতে সন্দেশ লুচি প্রভৃতি বাহির করিল এবং রমেনের দিকে তাকাইয়া বলিল—আসুন তো মশাই! আমরাই খাই, উনি না হয় নাই খেলেন!

রমেন উপায়ন্তর না দেখিয়া তাহার সহিত খাওয়ায় যোগদান করিল।···

খাওয়া হইয়া গেলে যুবকটী অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সহিত বেশ জমাইয়া তুলিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটি জংসন-ষ্টেশনে গাড়ীটি আসিয়া থামিতেই যুবকটী বলিয়া উঠিল—ওঃ, আমরা এখানে নামবো যে!

তাহার পর আবার ব্যাগেজ-পত্রাদি লইয়া তাহারা সেখানে নামিয়া পড়িল। যাইবার সময় রমেনকে বলিয়া গেল, শীঘ্রই তাহাদের সাহেবগঞ্জে যাইবার কথা আছে। যাইলে তাহার সহিত দেখা করিবে।

তাহারা কথা রাখিয়াছিল।

সহসাই রমেন একদিন দেখিল নিভা এবং তাহার স্বামী তাহার বাড়ীর খুব নিকটেই একটী ছোট্ট বাড়ীভাড়া করিয়া রহিয়াছে। পরিবারের মধ্যে কেহ ছিল না। নিভা ও তাহার স্বামী।

রমেন একদিন নিমন্ত্রিত হইল।...

নিভা নানা সুখাদ্যের সহিত তাহার আপ্যায়ন করিল। নিভার স্বামী বীরেন নিভার সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে শতমুখ হইয়া উঠিল। বলিল—জানলেন, ও যা' ভীতু! শুনুন তবে। সেদিন করলুম কি, বদ্‌মাইসি করে' বিছানায় শুয়ে চোখ কপালে তুলে 'মট্‌কা' মেরে পড়ে' রইলুম। ও ঘরে ঢুকে আমার অবস্থা দেখে ভয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলো আর কি। ঝি-টাকে ডেকে আপনাকে ডাকৃতে পাঠাচ্ছিল। শেষে আমিই বেগতিক দেখে হো হো করে' হেসে উঠলুম। তারপর ওর যা' রাগ! শেষকালে কি হলো বোলবো না কি নিভা ?—

নিভা তাহার পূর্ব্বে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে।

বীরেন তাহাকে সেদিন তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের কত ছোটখাট ঘটনাই না শুনাইল। দু'টী তরুণ জীবনকে ঘিরিয়া কেমন করিয়া একটী মাধুর্য্যময় স্বপ্নের আবহাওয়া গড়িয়া উঠে সে ব্যাপার রমেনের নিকট একান্ত অনাস্বাদিত। তাহারও অন্তরের অজ্ঞাত একটা অন্তিম-আবেগ হঠাৎ সেদিন সাড়া দিয়া উঠিল।···

মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা যেমনই করুণ তেমনই মর্ম্মান্তিক!

রমেন সকালবেলা হাসপাতাল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, হঠাৎ নিভাদের বাড়ীর হিন্দুস্থানী ঝি-টী আসিয়া বলিল—বাবুজি! মাইজিকো বহুৎ দরদ লাগা, আপকো জল্‌দি জানে বোলা!

রমেন ভাবিল, নিশ্চয়ই মারাত্মক কিছু ঘটিয়াছে, তাই তাড়াতাড়ি সে নিভাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে আসিয়া রমেন দেখিল নিভা আসন্নপ্রসবা, তাহার বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু বীরেন কোথায় ?

নিভা প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল—তিনি দাই ডাক্‌বার নাম করে' যে বেরিয়েচেন, আর আসবার সম্ভাবনা দেখ্‌চি না! আপনি যদি দয়া করে' হাসপাতালে বন্দোবস্ত করে' দেন।··

রমেন তাহার কথামত কাজ করিয়াছিল এবং ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা গল্পের গোড়ায় বলা হইয়া গিয়াছে।

হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দিবার পর নিভা তাহাদের বাড়ী চলিয়া গেল।

রমেন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিল, কে এই মেয়েটী? তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের মাঝে হঠাৎ আজ কিসের রহস্য লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল? আর এই যুবকটাই বা কে? আপাতদর্শনে তো মনে হইয়াছিল উহারা স্বামী-স্ত্রী, কিন্তু এখন?

রমেন একবার তাহার মনের গহন কোণগুলি হাতড়াইয়া আসিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না!

* * *

সেদিন সকালে রমেন তাহার ডাক্তারী কেতাবগুলি খুলিয়া একটু পড়াশুনা করিতেছিল। হাসপাতালে একটা শক্ত 'কেস্' আসিয়াছে। তাহার চিকিৎসা-ব্যবস্থা লইয়া তাহার 'সিনিয়ারে'র সহিত পূর্ব্বদিন একটু তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। আজ সে পুস্তক হইতে নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিবে যে, তাহার 'ডায়াগোনিসিস্'-ই ঠিক। সে অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত তাহার কেতাবগুলি হইতে 'শ্লিপ্' 'নোট' করিতে লাগিল।

হঠাৎ 'খুট্' করিয়া শব্দ হইতেই রমেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, নিভা তাহার বাড়ীর ঝিটার মাথায় 'সুটকেশ' 'বেডিং' প্রভৃতি লইয়া তাহার বাঙলোর ভিতরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং সেগুলি একে একে নামাইয়া রাখিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—রমেনবাবু, আপাততঃ কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আপনার এখানেই এসে উঠলুম। আপনার কি কোন আপত্তি আছে?

নিভার সীমন্তে আর সিন্দূরের রেখা নাই! রমেন স্বর্গচ্যুতের ন্যায় বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল—সে কি বলিতেছে? ইহার উত্তর-ই বা কি করিবে সে?

একটু মৌন থাকিয়া কাতরকণ্ঠে নিভা আবার বলিতে লাগিল—জানেন তো সমস্তই! বীরেনবাবু আমায় এ অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে' গেছেন; এ অবস্থায় যে আর বাড়ী ফিরে যাওয়া যায় না সে আমি ভাল করে' জানি। অথচ আর একটি বাড়ীভাড়া করে' যে থাকবো, তার আর্থিক সঙ্গতিও নেই, তা' ছাড়া, পিছনে দুষ্টলোক লাগতেই বা কতক্ষণ! তাই এ ক্ষেত্রে আপনি যদি আশ্রয় না দেন—

নিভা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। আপনার কণ্ঠ সংযত করিতে করিতে সে অসহায়ভাবে বলিল—আপনি যদি আপাততঃ দু'-একদিনের জন্য আশ্রয় না দেন তো কোথায় যাব জানি না।

'কোথায় যাব জানি না' এই কথাগুলিই রমেনের মনকে গলাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। সত্য-ই এই মেয়েটি আপনার দুষ্কৃতির দাহনে তো চিরজীবন দগ্ধ হইবে, কিন্তু এমনিভাবে সহায়হীন প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া মানুষ কতদিন যুঝিতে পারে? পৃথিবীতে প্রলোভনের পথ তো আর রুদ্ধ নাই?...

রমেন বলিল—না, উপস্থিত আমার কোন আপত্তি নাই। এতে যদি আপনার উপকার হয়, এ সুপ্তাহটা থাক্‌তে পারেন। আমি এ ক'দিন না হয় 'নাইট-ডিউটী'ই নেব।

নিভা কূল পাইল। সে তাহার দিকে করুণ, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আস্তে আস্তে তাহার ব্যাগেজপত্রাদি লইয়া ঘরের ভিতর পুরিতে লাগিল।

রমেন আবার তাহার কাজে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু তাহার মাথার ভিতর যে সমস্তই ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে! সে কি ভাবিয়া রাখিয়াছিল, কই তাহা তো আর তাহার মনে পড়িতেছে না? চিন্তার সূত্র হারাইয়া সে যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। ঠোঁটের মাঝে কলমটা চাপিয়া ধরিয়া মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে সে চিন্তার 'খেই' ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে হঠাৎ তাহার কি-একটা মনে পড়িল বুঝি! তাড়াতাড়ি একটা বইয়ের নির্দ্দিষ্ট একটা পৃষ্ঠা খুলিয়া শ্লিপে কি খানিকটা টুকিয়া লইয়া হাসপাতালের দিকে রওনা হইল।

পথে যাইতে যাইতে তাহার একবার মনে হইল যে, যেভাবে তাহার যুক্তি গঠিত করিয়াছে তাহা ঠিক হয় নাই; অথচ ধরিতে পারিতেছিল না কোথায় তাহার ভুল

হইতেছে। যাই হোক্, সে সোজা হাসপাতালে চলিয়া গিয়া তাহার সিনিয়ারকে শিপ্পগুলি দিল। তিনি সেগুলি না দেখিয়াই বলিলেন—আপনার ডায়াগোনিসিস্-ই ঠিক! আমরা 'এক্স-রে' করে' দেখেছি রোগীটার 'ইন্‌টেস্‌টাইন্যাল টি বি' হয়েচে।

রমেন নিজের অপ্রত্যাশিত সাফল্যের কথা শুনিয়া মনে মনে বিশেষ প্রীত হইল। সিনিয়রকে অভিনন্দন জানাইয়া সে প্রফুল্ল-মনে বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ীতে ঢুকিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল! নিভা করিয়াছে কি? তাহার বিশৃঙ্খল, বিধ্বস্ত, বসিবার ঘর-খানির একদম 'ভোল' বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে! মেঝের উপর উবু হইয়া বসিয়া সে ঝাঁটা লইয়া ঝাঁটাইয়া কত-কি জড় করিয়াছে! ছেড়া মোজা, 'ফাউনণ্টেন পেনে'র ভাঙা 'ক্লিপ', ছেঁড়া 'রিষ্টওয়াচ-ব্যাণ্ড', কাগজের টুকরা, আধখানা মোমবাতি প্রভৃতি কত কি সে ঝাঁটাইয়া সংগ্রহ করিয়াছে।

ইহাদের আজ সে এই ঘর হইতে নির্ব্বাসন দিবে—!

রমেন বলিল—ইস্, করেচেন কি! এসব যে আমার বহুকালের সম্পত্তি!

নিভা বলিল—মা গো! আপনি কি নোংরা? আপনি না ডাক্তার? বাড়ীর ভিতর কত জঞ্জাল পূরে রেখে দিয়েচেন!—

রমেন একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

আজ কয়েকদিন হইল নিভা রমেনের গৃহে রহিয়া গিয়াছে। কে এই মেয়েটী? আজ তাহার অন্তরের অঙ্গনে অনাদিকালের চিরন্তন প্রশ্ন লইয়া আসিয়া দাড়াইয়াছে? তাহার চলা, তাহার কথাবলা, সমস্তই রমেন সলজ্জ দৃষ্টিতে দেখে কেন? অথচ মেয়েটির তো কোন সলাজ-সঙ্কোচ নাই! সে তো নির্ব্বিঘ্নে ঘরের মেঝেয় পা ছড়াইয়া বসিয়া আপন-মনে রমেনের সম্মুখে বই পড়িতে থাকে! আর রমেন তাহার মুখের উপর হাওয়া-হিল্লোলিত ঝাঁপান চুলগুলির ঝাঁপাঝাঁপির দিকে অকস্মাৎ চাহিয়া-ই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া আপনাকে অটুট রাখিতে চাহে কেন?—

নিভা আপনার কোলের উপর রমেনের 'এনসাই-ক্লোপিডিয়া'র একটা 'ভল্যুম' টানিয়া লইয়া ছবি দেখিতে দেখিতে কি-কারণে হঠাৎ খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে। কী তীক্ষ্ণ সে হাসি! রমেনের বুকে এ-হাসি যেন কোটী-কাঁটার কাঠিন্য লইয়া বিঁধিতে থাকে। কই, এ হাসি তো সে কোথাও শুনে নাই? একবার মনে হয় ছুটিয়া গিয়া মুখে কাপড় চাপিয়া ধরিয়া তাহার ওই হাসি বন্ধ করিয়া দিয়া আসে; কিন্তু তাহা তো আর সম্ভব নয়? সে উঠিয়া পড়িয়া গায়ে চাদরটা টানিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়।

রমেন এ-পথ ও-পথ ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার অন্ধ-আত্মা অন্তরের ভিতর উত্তরের আশায় রন্ধ্র খুঁজিতে থাকে।

স্নান করিতে গিয়া রমেন দেখে স্নানের জল শীত-কালের উপযোগী করিয়া গরম করা। তোয়ালেটা নিকটেই আছে—সাবানও। আজ আর তেলের বাটী খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হয় না।...

রমেন বুঝিতে পারে সমস্তই নিভা গুছাইয়া রাখিয়াছে। এমনিতর দু'খানি হাতের সস্নেহ সেবার আশায় মাঝে মাঝে তাহার অন্তর আতুর হইয়া উঠিত। কিন্তু তাহা তো আর তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল চাকরী করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে না পারিলে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। কিন্তু এই মেয়েটির তাহার জন্য অতখানি সেবার কি প্রয়োজন? এ কি তাহার দাক্ষিণ্যের প্রতিদান?

সে ভাবিতে থাকে তাহাই হইবে বোধ হয়।

রমেন স্নান করিয়া কাপড়-জামা পরিয়া 'স্মার্ট' হইয়া লইতে-না-লইতেই নিভা আসিয়া বলিল—এইবার খেয়ে নেবেন তো? রান্না সব বেশ গরম আছে। ঠাঁই করে' দিই?...

স্নানান্তে

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা।

রমেন একটু হাসিয়া বলিল—ইস্, আপনি তো ভারী ব্যস্ত হ'য়ে পড়েচেন দেখি? আমার যে কখনো সময়ে খাওয়া হ'য়ে উঠতো না। এমনি বদঅভ্যাস করে' দিলে, আপনি যখন চলে' যাবেন তখন কি হবে বলুন তো?

নিভা রমেনের জন্য ঠাঁই করিয়া দিয়া বলিল—কি করি! মেয়েদের স্বভাবই যে হচ্চে ব্যস্ত হওয়া। এটা আমাদের আত্মীয়ের প্রতি অন্তরঙ্গতা নয়—আমাদের অভ্যাস। তা' ছাড়া—

নিভা একটু কাশিয়া লইয়া কণ্ঠস্বরটা একটু নীচু করিয়া বলিতে থাকে—তা' ছাড়া, এমনি ভাবের ঘরোয়া কাজের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে না দিতে পারলে বাঁচবো কেমন করে'?

রমেন বলিল— তা' সত্যি!

নিভা হঠাৎ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া গেল। তাহার পর সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরের ছোট জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত একটি বন্ধুর প্রান্তর। মাঝে মাঝে কয়েকটা গাছপালা বেশ একটু ঘন হইয়া আপনাদের মধ্যে নিবিড়-নৈকট্য জমাইয়াছে। ঝাঁকে ঝাঁকে গাঙ শালিক গীময় গান গাহিয়া ফিরিতেছে। নিভা সেইদিকে তাকাইয়া তাহার অন্তর্লীন বেদনার ভার লঘু করিবার চেষ্টা করে।...

সপ্তাহ চলিয়া গেল।

সেদিন রমেনের 'নাইট ডিউটি' নাই। রাত্রি বেলা আহার সারিয়া সে বিছানায় শুইয়া 'মেডিক্যাল-ইয়ার-বুক' পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ পড়িবার পর তাহার চোখে তন্দ্রার আমেজ লাগিল বুঝি! মাথার কাছে 'টাইম-পিসটা'তে দেখিল—প্রায় বারটা বাজে। তাহার পর সে আলোটি নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

চোখ বুজিয়া ভাবিল এইবার ঘুমাইয়া পড়িবে। মাথার উপর টিক্ টিক্ করিয়া টাইম-পিসটা চলিতে লাগিল। দূরের কোন একটা পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া একটা বাজিল, দুইটা বাজিল। কিন্তু রমেনের চোখে তো ঘুম আসিল না! কি হইল আজ তাহার? এইরূপ তো কোনদিন তাহার হয় নাই!...

আরও কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

কিন্তু আশ্চর্য্য! পাশের ঘরখানিতেও 'খুট্‌খাট্' শব্দ হইতেছে,—আলো জ্বলিতেছে। তবে কি নিভাও জাগিয়া আছে? রমেনের ভিতর হইতে সহস্র প্রশ্ন গুমরিয়া উঠিল—নিভাও কি জাগিয়া আছে?

অত্যন্ত সন্তর্পণে রমেন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাহিরের অর্দ্ধমুদিত জানালাটা দিয়া ঘরের সমস্তই দেখা যায়। নিভা তাহার খাটের উপর বসিয়া আছে। তাহার মুখখানি তৃতীয়ার চাঁদের মত পাণ্ডুর—সেই মুখখানির দু'পাশ বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে ঘন, নীরব নিশীথের নিবিড় ছায়ার মত কাল এলাইত চুল। নিভা কি কাঁদিতেছে?

রমেন ভাবিতে থাকে এ কি তার বিগত মধু-বসন্তের স্বপ্ন সাধনা,—না এ তার কলুষ-ক্লিন্ন পরাভূত অন্তরের শব-শয্যা?

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পর সদর দরজা খুলিয়া সে বাটীর বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া তাহার ফুলের বাগানের ভিতর একটি পাষাণ-চৌকির উপর বসিয়া পড়িল।

নিস্তব্ধ রাত্রের নিঃসঙ্গ চাঁদ তাহার সহিত অনন্ত জিজ্ঞাসা লইয়া জাগিয়া আছে যেন! তাহার সম্মুখে সংশয়ের সমুদ্র নিরন্তর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। বহুক্ষণ নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ দূরে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজার শব্দে চমকভাঙ্গা হইয়া সে আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া কখন আপনার অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িল।

আর একটি রাত্রে—।

রমেনের ক্লান্ত চোখে নিদ্রা নাই। শুইয়া শুইয়া অতিষ্ঠ

হইয়া সে উঠিয়া পড়িয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া অবাক্ হইয়া গেল। নিভাও তাহার ন্যায় জাগিয়া জাগিয়া দালানে পায়চারী করিতেছে।

এবারে মুখোমুখী হইয়া পড়ায় রমেন বলিল—এ কি! আপনি ঘুমোন নি?

নিভা একটী ছোট্ট উত্তর দিল—না।

রমেন বলিল—কি জানি, আমার তো কখনোও এরকম হয় নি। রাত্রে ঘুম হয় না কেন কে জানে!

নিভা বোধ হয় মন দিয়া কথাটা শুনিল। তাহার পর অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিতে লাগিল—আপনার পক্ষে ঘুম না হওয়া অত্যন্ত অকারণ তা' জানি। কিন্তু আমার পক্ষে এটা একটু অন্যরকম। আমার চোখ থেকে ঘুম অনেকদিনই উবে গেছে। বেশ মনে পড়ে বছর দেড়েক আগেকার কথা—তখন আমি বাড়ীতে। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি। মাষ্টার-মশাই বীরেনবাবু রাত্রির সাতটার সময় পড়াতে আসতেন। সাতটা থেকে পড়াতেন ছ' ঘণ্টা,—ন'টা পর্য্যন্ত। কিন্তু এর-ই মধ্যে ঘুমে আমার চোখ ঢুলে পড়তো। কিছুতেই নিজেকে ঠিক্ রাখতে পারতাম না। পড়তে পড়তে কখন হাই তুলে ঘুমিয়ে পড়তুম টের পেতাম না। এক-একদিন ঘুম ভেঙে দেখি বীরেনবাবু আমাকে ডাকচেন—নিভা! নিভা!... এমনিভাবে হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু সেদিন দেখি বীরেনবাবু আর অন্যদিনের মত আমাকে ডাকচেন না তিনি আমার দিকে নিবিড়ভাবে চেয়ে আছেন। তার দিকে চেয়েই আমি মুখ নামিয়ে নিজেকে সংযত করে' নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে' দিলুম। কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখি বইয়ের অক্ষরগুলো সব চোখের সামনে থেকে সরে' গেছে এবং তার পরিবর্ত্তে ভেসে উঠছে—বীরেনবাবুর সেই মমতাময় সুন্দর মুখখানি এবং তাঁর টানা টানা চোখ ছ'টীর সেই একান্ত চাহনি · তারপর যখন আমরা পথে পা দিলুম, তখন আমি ভেবেছিলুম অনেকদিনের ঈপ্সিত একান্ত-করে-পাওয়া একখানি ঘর গড়ে' তুলবো। সেখানে থাক্‌বো শুধু বীরেন আর আমি,—আর আমাদের ঘিরে থাক্‌বে এক অক্ষয় প্রেমের স্বপ্নলোক। কিন্তু একদিন যখন সত্যসত্যই সে স্বপ্ন লাঞ্ছিত, পদ-পীড়িত হলো, সেদিন থেকে আমার চোখ থেকে ঘুম উবে গেল। যখুনি ঘুমুতে যাই, তখুনি আমার আপনার দুষ্কৃতির কথা মনে পড়ে' যায়—আমার—

নিভা হঠাৎ তাহার বক্তৃতার মাঝখানে ছেদ টানিয়া দিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহার চোখে মুখে অতৃপ্ত অন্তরের ব্যক্ত-বেদনা ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে যেন।

রমেন বলিল—যাক্, অতীতের তীব্র তিক্ততা দিয়ে মনকে নিরন্তর বিষিয়ে তুলে লাভ কি? রাত তো বেড়ে যাচ্ছে—এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন না?

কথাগুলি বলিয়া রমেন নিজেই কেমন যেন একটু বিস্মিত হইয়া গেল। নীরব নিশীথে নিজের কণ্ঠস্বরকেও যেন অপরিচিত, রহস্যময় বলিয়া মনে হইল।

সকাল হইতেই নিভার রূপান্তর!—

খুঁটিনাটি গৃহকর্ম্মে সে আপনাকে ভুলাইয়া রাখে। কুটনা কুটিয়া, ঘর ঝাঁট দিয়া, রান্নায় ঠাকুরকে সাহায্য করিয়া ক্ষিপ্রপদে সে আদর্শ একটী ঘরণীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না যে, এ সেই কাতরতাময়ী, অশ্রুমতী, নিশীথের নিভা!

নিভা রমেনকে জলখাবার দিয়া গল্প পাড়িয়া বসিল—আচ্ছা, শুনচি দেশে আপনার শুধু বুড়ো মা আর ছোট ভাই আছেন, সংসার দেখ্‌বার কেউ নেই! অথচ আপনি আজও বিয়ে করেন নি কেন?

রমেন বলিল—করি না কেন তার কারণ হচ্ছে, আমার ইচ্ছে আছে চাকরি করে' কিছু অর্থোপার্জ্জন করে' তারপর বিয়ে কোরবো। অবশ্য আমাকে আর বছর দেড়েক, বছর-দুয়েকের মধ্যেই করতে হবে। মার স্বাস্থ্য খারাপ, তাঁকে দেশ থেকে এখানে আনবার ইচ্ছে আছে। তখন আর এই ছোট্ট বাড়ীটায় চলবে না!—আর একটা এর থেকে বড় বাড়ীভাড়া করতে হবে। বিয়ে করে' সাড়ম্বরে সংসার বিছিয়ে বসতে হবে তো!—

নিভা বলিল—ও মা! তখন আমি কোথায় যাব?

রমেন অবাক্ হইয়া গেল। নিভা বলিতেছে কি ?...

'চট্' করিয়া নিভা কথার মোড় ঘুরাইয়া দিল—ওই যাঃ, আপনাকে সন্দেশ দিতে ভুলে গেছি তো ?—যাই, নিয়ে আসি, উঠে পড়বেন না যেন।

বলিয়াই তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল।

সংসারে নির্লিপ্ত রমেন অদূর ভবিষ্যতে একদিন ঘর বাঁধিয়া তুলিবার স্বপ্নে বিভোর। নিভা একদিন ঘর বাঁধিয়াছিল, কিন্তু সে ঘর অকস্মাৎ অনলে পুড়িয়া ভূমিস্মাৎ হইয়া গিয়াছে।

সেদিন রমেন তাহাদের হাসপাতালের 'আউট ডোরে' রোগী দেখিতেছিল। হঠাৎ একটা বেহারা আসিয়া তাহাকে একখানি স্লিপ দিল। স্লিপটীতে তাহার সিনিয়র এবং হাসপাতালের 'ইনচার্জ' ডাঃ রায় লিখিয়াছেন যে, তাহার 'ডিউটী ওভার' হইয়া গেলে সে যেন তাঁহার সহিত দেখা করে।

রমেনের ডিউটী শেষ হইয়া গেলে সে আসিয়া ডাঃ রায়ের নিকটে উপস্থিত হইল। ঘরের অপর সমস্ত লোক চলিয়া গেলে তিনি একটু রূঢ়ভাবে বলিলেন—আচ্ছা, আমাদের হাসপাতালের কোন একটী রোগিনীর সঙ্গে আপনার যে নূতন সম্বন্ধ পাতান হয়েচে, সে সম্বন্ধে আপনি কি বল্‌তে চান ?

রমেন বিস্মিতভাবে বলিল—সম্বন্ধ ?

ডাঃ রায় তাহাকে কয়েকটা ছোট ছোট চিঠি বাহির করিয়া দেখাইলেন। এই চিঠিগুলিতে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা রমেনের সহিত নিভার এক কাল্পনিক প্রেমের ব্যাপার উল্লেখ করিয়া শাসাইয়াছে যে, আর কেহ হাসপাতালে রোগিনী পাঠাইবেন না এবং যদি এ সম্বন্ধে কোন প্রতিবিধান না করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এই ব্যাপারটা লইয়া বিশেষ আন্দোলন চালাইবেন।

রমেন নিভার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই ডাঃ রায়কে খুলিয়া বলিল। তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন—আপনার দিক্ থেকে আপনি হয়তো ঠিক্ করচেন। কিন্তু আমাকে হাসপাতালের 'ডিসিপ্লিন' ঠিক্ রাখ্‌তে হবে তো ?

শেষ পর্য্যন্ত তিনি বলিলেন—যাক্, আমি এ ব্যাপারটা 'হাস আপ্' করে' দিতে পারি, আপনি যদি তিন-চারদিনের মধ্যে ওই মেয়েটীকে চলে' যেতে বলেন। আপনি আমার কথামত কাজ করুন—তা' না হ'লে আপনার 'কেরিয়ার' একদম মাটি।

রমেন ডাঃ রায়কে কথা দিল যদি অন্ততঃ তিন-চারদিনের মধ্যে না হয় তো যত শীঘ্র সম্ভব নিভাকে স্থানান্তরিত করিবেই।

পথে আসিতে আসিতে রমেন ভাবিতে লাগিল—নিভাকে কোথায় পাঠাইবে ? সে তো বলিয়াছে যে, বাড়ী ফিরিবে না। সুতরাং তাহার যাইবার স্থান কোথাও নাই। এক্ষেত্রে তাহাকে কোথায় ছাড়িয়া দিবে ? রমেনের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল এই স্থান হইতে দুই-তিনমাইল দূরে একটী 'আশ্রম' আছে না ? হাঁ, ঠিক্ হইয়াছে। সে নিভাকে ওই আশ্রমে পাঠাইয়া দিবে—রোজ গীতার একটী করিয়া অধ্যায় পড়িবে এবং চরকা কাটিয়া অতীত জীবনের হিসাব-নিকাশ খতাইয়া দেখিবে।

বাড়ী ফিরিয়া রমেনের নিভাকে কথাগুলি বলি বলি করিয়াও বলা হইল না। চিরকালই অপরের প্রাণে আঘাত দিয়া কথা বলিতে তাহার কেমন একটা সঙ্কোচ থাকিয়া গেছে।

নিভা আপন-মনে গৃহকর্ম্ম করিয়া যায়।

রমেন ভাবিতে থাকে—ওর সরলতাকে উপেক্ষা করা যায় না। ওর চোখে যে পথহারা বন-বিহগের মায়া!

এমনি করিয়াই সে দিনটী কাটিয়া গেল। আবার রাত্রি আসিল। রাত্রে প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও ঘুম হইল না। সমস্ত রাত বিছানার এপাশ-ওপাশ করিয়া কাটাইয়া দিয়া শেষে ভোরের দিকে কখন সে অল্পক্ষণের জন্য ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার পরদিন রমেনের 'নাইট ডিউটি'। ডাক্তারের ঘরে রোগীর আশায় বসিয়া বসিয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ সেই রাত্রে একটি সঙ্কট অবস্থার রোগী

আসিয়া গিয়াছিল। নার্শরা অনেক ডাকাডাকি করিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। ঘুম ভাঙিয়া সে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। ছিঃ ছিঃ, সে করিয়াছে কি! এমনিভাবে 'অন-ডিউটী'তে ডাক্তারের পক্ষে ঘুমাইয়া পড়া যে একেবারে আইনবিরুদ্ধকর! তাড়াতাড়ি সে কোনরকমে রোগীটীর ব্যবস্থা করিয়া দিল।

কাজ শেষ হইয়া গেলে সে বুঝিতে পারিল তাহার কতদূর অন্যায় হইয়া গিয়াছে। এমনিভাবের আর দুই-তিনটী রিপোর্ট তাহার নামে হইলে তাহার চাকরী যাওয়া অনিবার্য্য।

রমেন বেশ বুঝিতে পারিল তাহার কতদূর অধঃপতন হইয়াছে! এমনিভাবে দিনের পর দিন বিনিদ্র রজনী যাপন করিলে তো একদিন ঘুমাইয়া পড়া খুবই স্বাভাবিক!

কিন্তু কেন সে এইরূপে নিজের স্বাস্থ্যহানি করিতেছে? নিভা তো তাহার কেহ নয়! সংসার নদীর তটে এমন স্রোতের শৈবালতো বহু আসিয়া পায়ে জড়াইয়া ধরে; কিন্তু সকলেইতো তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়,—সে ইহাতে জড়াইয়া পড়িতেছে কেন?

* * *

সকাল হইলে রমেন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিভাকে বলিল—আজই সে তাহাকে আশ্রমে রাখিয়া আসিবে। আর সে তাহাকে গৃহে রাখিয়া বদনাম কুড়াইতে পারিবে না। দেশে তাহার বৃদ্ধা মা' বা ছোট ভাই শুনিলে কি মনে করিবে?

নিভা তাহার কথাগুলি শুনিয়া মিনতি-কাতরকণ্ঠে বলিল—দেখুন, সত্যই আপনি আমার জন্যে যথেষ্ট করেচেন, কিন্তু যদি আর দু'দিনমাত্র বেশী থাকৃতে দেন তো আমার বিশেষ উপকার হয়। কারণ আমার এক বন্ধু লিখেচে যে, এক মেয়ে স্কুলে সে আমার জন্য চাকরি জোগাড় করেচে, যদি সেখানে যেতে হয় দু'দিনের মধ্যেই চিঠি আস্‌বে। আর আশ্রমে থেকে গতজীবনের অনুশোচনা নিয়ে কখন আমি বেঁচে থাকৃতে পারব না। আমি অতীতকে ভুলে গিয়ে আবার নূতন জীবন গড়ে' তুল্‌তে চাই।

রমেন বলিল—কিন্তু আমি বিশেষ দুঃখিত। আমার চাকরী যাবে, যদি না আজ থেকে দয়া করে'আপনি আশ্রমে থাকেন। আমি হাসপাতাল ঘুরে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে গাড়ী নিয়ে আস্‌চি। আপনার ব্যাগেজ বেঁধে নিন্।

কথাটা বলিবার পর নিভা কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু রমেন তাহার কথায় আর কান না দিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া গিয়া সে আর হাসপাতালে ঢুকিল না—আপনার মনের তীব্র বেদনাকে হাল্কা করিবার জন্য এ-পথ ও-পথ ঘুরিতে লাগিল।

নিজের সম্বন্ধে রমেনের চিরকালই অনেকখানি সংশয়! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে নিভাকে যাহা বলিয়া আসিয়াছিল, পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল তাহা বলা ঠিক হয় নাই। নিভা নারী!—তাহাকে ওইরূপ রূঢ়ভাবে জবাব দিয়া আসা তাহার পৌরুষ নহে! সে শেষে কি বলিতেছিল,তাহা শুনিয়া আসা অন্ততঃ তাহার উচিত ছিল। আর মাত্র দুইদিন থাকিয়া যদি সে চাকরী লইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার আর কিসের আপত্তি থাকিতে পারে? রমেন ভাবিল, যাই হোক্, আর একবার বাড়ী গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবে, সে কি বলিতেছিল।

সে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া এঘর ওঘর চারিদিক ঘুরিল, কিন্তু নিভাকে তো দেখিতে পাইল না! সে গেল কোথায়?

রমেন ঘর হইতে বাহিরে আসিলে তাহার চাকর তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—ওঃ, আপনি এসেচেন! এইমাত্র যে নিভা দিদিমণি চলে' গেলেন। এখনও পিছনের রাস্তায় গাড়ীখানা যাচ্ছে বোধ হয়, দেখুন না।

রমেন বাহিরে আসিয়া দেখিল—সত্যই তখনও গাড়ীখানি তাহাদের পিছনের রাস্তাটী পার হইয়া চলিয়া যায় নাই। সে তাড়াতাড়ি একটু আগাইয়া গিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু তাহার কণ্ঠে আর বাক্যের স্ফুরণ হইল না। সে বিমূঢ়ের ন্যায় বিহ্বল-দৃষ্টিতে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

অক্ষয় দত্তের গল্প

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্

[কিছুকাল পূর্ব্বে পত্রান্তরে ('গল্পারতি'—১৩৩৭,) বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু ও হেমচন্দ্র সম্বন্ধে পঠিত বা শ্রুত কতকগুলি কাহিনী সঙ্কলিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের সাহিত্যিক বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে এইরূপ গল্প-সংগ্রহ করিবার জন্য কোন কোন বন্ধু বিশেষ অনুরোধ করেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় বাঙ্গালা গদ্যের অন্যতম জন্মদাতা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের কয়েকটি গল্প সঙ্কলিত হইল।]

এক

শৈশব হইতে অক্ষয়কুমারের পাঠানুরাগ অতি প্রবল ছিল। আড়াই বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্রগণের সহিত পাঠশালায় যাইবার জন্য আগ্রহ-প্রকাশ করিতেন এবং "আমি লিখ্‌বো আমি লিখ্‌বো" বলিয়া মাতার নিকট বায়না ধরিতেন। সাত বৎসর বয়সের সময় একদিন রৌদ্রের তেজের জন্য তাঁহার জননী পাঠশালায় যাইতে নিষেধ করিলে তিনি বলেন, "সকলের মা বলে, 'লিখ্‌তে যা', লিখ্‌তে যা', আমার মা বলেন, 'লিখ্‌তে যাস্ নে, যাস্ নে'।"

দুই

কৈশোর হইতে অক্ষয়কুমার পুস্তকের মূল্য বুঝিতেন। তিনি তাঁহার পিতৃস্বস্রেয় রামধন বসু মহাশয়ের কলিকাতার বাসায় অবস্থানকালে দেখিতেন যে, একজন ব্যক্তি প্রায়ই নানাপ্রকার পুস্তক বিক্রয় করিতে আসিত। তাঁহার সন্দেহ হইল পুস্তকগুলি নিশ্চয়ই কোনও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির পুস্তকাগার হইতে অপহৃত। ক্রমে ক্রমে তিনি জানিতে পারিলেন বিক্রেতা শোভাবাজার রাজ বংশের গৌরব রাজা রাধাকান্ত দেবের ভৃত্য। যাঁহার পুস্তক অপহৃত হইতেছে তাঁহার কিরূপ ক্ষতি, অসুবিধা ও মনঃকষ্ট হইতেছে ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। তিনি রাজবাটীর কাহারও সহিত তখন পরিচিত ছিলেন না। অতঃপর একদিন তিনি শুনিলেন যে, অনেকগুলি পুস্তক অপহৃত হওয়ায় এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে চোর বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে এবং তাহাকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। সৌভাগ্য-

অক্ষয়কুমার দত্ত

ক্রমে সেই সময়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়কে কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলে তিনি তাঁহার সতীর্থ (রাজা রাধাকান্তের দৌহিত্র) সদ্বিদ্বান আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়কে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করেন। আনন্দবাবু তৎক্ষণাৎ অক্ষয়কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অক্ষয়-কুমার তাঁহার হস্তে অপহৃত পুস্তকগুলি প্রত্যর্পণ করেন।

তখন আনন্দবাবু দেখিলেন যে, অপহৃত পুস্তকের যে তালিকা তাঁহারা করিয়াছিলেন, তদতিরিক্ত আরও অনেক পুস্তক ওই ভৃত্য তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে অপহরণ করিয়া বিক্রয় করিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, পুস্তকগুলি পাইয়া

আনন্দকৃষ্ণ বসু

তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না এবং তিনি অক্ষয়কুমারের ন্যায়পরতা ও লোভহীনতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত অকৃত্রিম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অপহরণকারীকে অক্ষয়কুমারের অনুরোধে সে যাত্রা ক্ষমা করা হইল।

তিন

অনেকে হয় ত অবগত নহেন যে, অক্ষয়কুমার প্রথমে পদ্যরচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। নরনারায়ণ দত্তের বাটীতে 'বাঙ্গলা ভাষানুশীলনী সভা'য় অক্ষয়কুমার 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হন এবং 'প্রভাকরে' মধ্যে মধ্যে কবিতা প্রকাশের জন্য উহার কার্য্যালয়ে যাতায়াত করিতেন। একদিন গুপ্তকবির সহকারী অনুপস্থিত থাকায় তিনি অক্ষয়কুমারকে একখানি ইংরাজী সংবাদ-পত্রের একটি সন্দর্ভ দেখাইয়া সেইটা অনুবাদ করিয়া দিতে বলিলেন। অক্ষয়কুমার প্রথমে অস্বীকার করিয়া বলেন, "আমি কখনও গদ্য লিখি নাই ; আমি কিরূপে অনুবাদ করিব ?" প্রত্যুত্তরে গুপ্তকবি বলিলেন, "তুমি লিখিলে অতি উত্তম হইবে, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াই বলিয়াছি।" তখন অক্ষয়কুমার প্রবন্ধটি অনুবাদ করিয়া দেন। অনুবাদ দেখিয়া গুপ্তকবি পুলকিত হইলেন এবং বলিলেন, "তুমি যেরূপ সুন্দর অনুবাদ করিয়াছ, যিনি এতদিন আমার সহকারিতা করিতেছেন তিনি এরূপ পারেন না।" কবিবরের এই উৎসাহ-বাণী অক্ষয়কুমারকে গদ্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি এই সময় হইতে 'প্রভাকরে' গদ্য-প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

চার

'প্রভাকরে' অক্ষয়কুমারের সুযুক্তিপূর্ণ মনোহর প্রবন্ধনিচয় পাঠ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা বলেন, "অক্ষয়বাবু দুর্ব্বাবনে মুক্তা ছড়াইতেছ কেন ?" অতঃপর অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রধান লেখক ও সম্পাদক

রামগোপাল ঘোষ

হন্। বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসে অক্ষয়কুমারের 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গালা গদ্যে যে এরূপ ওজস্বিনী রচনা সম্ভব, তাহা তিনিই দেখাইলেন। 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রথমকার

রামতনু লাহিড়ী

কোন সংখ্যা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের 'ডিমিস্থিনিস' রাম-গোপাল ঘোষ একবার রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে আনন্দোচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলেন, "রামতনু! রামতনু! বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ!"

পাঁচ

'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদনের দ্বারা মাতৃভাষা ও সাহিত্যের এবং তৎসঙ্গে দেশবাসীর মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের অপূর্ব্ব সুযোগ পাওয়া যায় বলিয়া তিনি উচ্চতর বেতনের কোন পদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শুনা যায় যে, শিক্ষা-বিভাগে পরিদর্শকের (ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর) পদ সৃষ্ট হইলে অক্ষয়কুমারকে দেড়শত টাকা বেতনে উক্ত পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। তখন তিনি 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক-রূপে মাসিক ষাট টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। কিন্তু তিনি সাহিত্য-সেবায় বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া উক্ত পদ প্রত্যাখ্যান করেন। পরে ঘটনাচক্রে তাঁহাকে কলিকাতা 'নর্ম্যাল স্কুলে'র প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর-মহাশয় তাঁহাকে কিছু না জানাইয়া শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ইয়ং সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া গেলেন। অক্ষয়কুমার তাঁহার নিয়োগের কথা শুনিয়া বিস্মিত হন এবং যদি সম্ভব হয় ত আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য বিদ্যাসাগর-মহাশয়কে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর-মহাশয় বলিলেন, তাঁহার অনুরোধে ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। অগত্যা অক্ষয়কুমারকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু তিনি 'তত্ত্ববোধিনী'র সংস্রব ত্যাগ করেন নাই।

ছয়

অক্ষয়কুমার মধ্যে মধ্যে দুই-একজন বন্ধু সমভিব্যাহারে অজ্ঞাতকুলশীলভাবে স্থানান্তরে বেড়াইতে যাইতেন এবং নৈসর্গিক দৃশ্যাদি দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। একবার দুই বন্ধুর সহিত তিনি এক গ্রামে বেড়াইতে যান। বৈশাখ মাস। মধ্যাহ্নকাল। প্রখর রৌদ্রে বৃক্ষতলে বসিয়াও গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ বড় কষ্ট হইল। তাঁহারা তখন এক সদ্‌গোপের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। সদ্‌গোপ তাঁহাদিগকে দেখিয়া কি ভাবিল, পরে বলিল, "তোমরা এমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? আমার এক ভাইপো এই রকম করিয়া অধঃপাতে গিয়াছে।" ইঁহারা সরলমতি আশ্রয়দাতার বাক্যে পরম কৌতুক অনুভব করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে নানাবিদ্যাবিষয়ক আলোচনা করিতে দেখিয়া সে বলিল, "তোমাদিগকে পণ্ডিত ব্যক্তির মত দেখিতেছি। অল্পবয়সে সংসারে তোমাদের বিরাগ হইল কেন? যাও বাবা, আপনার আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।" তখন অপরাহ্ণও হইয়াছে। তাঁহারা বলিলেন, "তোমার কথাই আমরা মানিয়া লইলাম। এই আমরা গৃহে চলিলাম।" এই বলিয়া তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য যাত্রা করিলেন।

সাত

অক্ষয়কুমারের নানা ভাষা ও নানা বিজ্ঞানশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল, ইহা সকলেই জানেন। তাঁহার গৃহ একটি 'যাদুঘর' বিশেষ ছিল। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, প্রবালপুঞ্জ, নানাসময়ের প্রস্তরপুঞ্জ, প্রাণীকঙ্কাল, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সর্পচর্ম্ম, উল্কাপিণ্ডের খণ্ড, প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক দ্রব্যাদি, দুষ্প্রাপ্য চিত্র প্রভৃতিতে তাঁহার গৃহ সজ্জিত থাকিত। একবার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (যৌবনে) তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বলেন, "আজ এখানে আসিয়া আমার শিক্ষালাভ হইল। ঝাড়, লণ্ঠন, ছবি প্রভৃতি অপেক্ষা এইরূপ গৃহসজ্জাই উৎকৃষ্ট।"

বিদ্যাসাগর

আট

অক্ষয়কুমার 'ফ্রেনলজি' বিদ্যা অনুশীলনকালে একবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও (স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা) ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বাঁশবেড়িয়াতে 'তত্ত্ববোধিনী'-সভার অধীনস্থ এক বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে গমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় একখানি নৌকায় তাঁহারা শান্তিপুর ও কালনা অঞ্চলে বেড়াইতে যান। অক্ষয়কুমার ও দুর্গাচরণ একদিন প্রাতে নৌকা হইতে নামিয়া গঙ্গাতীর দিয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন। গুপ্তিপাড়ার নিকটে একটি শ্মশানে দুইটি নরকপাল দেখিতে পাইয়া তাঁহারা তাহা তুলিয়া লইলেন। এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টি কিরূপ লোকের মস্তক সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা দেখিলেন গুপ্তিপাড়ার একটি ঘাটে অনেকগুলি লোক জমা হইয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে কি কথা কহিতেছে। পথের পার্শ্বে কয়েকটি বালক খেলা করিতেছিল। তাহাদিগের প্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিবামাত্র

তাহারা "ওই রে, ব্রহ্মদৈত্য" বলিয়া দৌড়াইতে লাগিল। তাঁহারা দুইজনে যতই তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন, তাহারা ততই দ্রুত পলায়ন করে। রাস্তার লোকেরাও সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল। বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা তখন যথাসম্ভব শীঘ্র নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নয়

অক্ষয়কুমার ভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন না। কর্ম্ম-মার্গের পথিক ছিলেন। বেদের অভ্রান্ততায় তিনি বিশ্বাস করিতেন না। প্রার্থনায় কোন ফল আছে ইহা তিনি মানিতেন না। একবার তর্কস্থলে তিনি প্রার্থনার নিষ্ফলতা এইরূপে প্রমাণ করিয়া দেন। তিনি প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞাসা করেন, "কৃষক যদি পরিশ্রম না করে ত কি হয় ?"

উত্তর—"শস্য হয় না।"

প্রশ্ন—"যদি পরিশ্রম করে ?"

উত্তর—"শস্য হয়।"

প্রশ্ন—"যদি প্রার্থনা ও পরিশ্রম করে ?"

উত্তর—"তাহা হইলেও শস্য হয়।"

প্রশ্ন—"তাহা হইলে এই যুক্তি ঠিক নহে কি ?

পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য

∴ প্রার্থনা = ০

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দশ

রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু ও জামাতা শ্রীনাথ ঘোষ অক্ষয়কুমারের বিশিষ্ট বন্ধু ও বিদ্যা-চর্চ্চায় সঙ্গী ছিলেন। সেই সূত্রে শ্রীনাথবাবুর জামাতা সুপণ্ডিত (কিছুকাল হাইকোর্টের বিচারপতি) সারদা-চরণ মিত্র তাঁহার পরম স্নেহভাজন ছিলেন। মৃত্যুর বৎসর দুই পূর্ব্বে অক্ষয়কুমার তাঁহার উইলের 'মুসবিদা' সারদা-চরণের নিকট সংশোধনের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি উইলের মুসবিদা স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া ও যতদূর সম্ভব আইনসঙ্গত করিয়া তাঁহার মুহুরীকে যথাযথ

নকল করিতে দেন। মুহুরি যথাযথ নকল করিল, কিন্তু একটি কথা অধিক লিখিল। সে হিন্দু, মুস্থবিদার শিরো-ভাগে "শ্রীশ্রীহরি" লিখিয়াছিল। মুস্থবিদা প্রতিপ্রেরণের তিন চারিদিন পরে অক্ষয়কুমার সারদাচরণকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন। প্রথমে আনন্দকৃষ্ণ, শ্রীনাথ

সারদাচরণ মিত্র

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি বন্ধুগণের কুশল-প্রশ্ন করিয়া তিনি উইলের কথা তুলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "উইলের উপবিভাগে ঈশ্বরের কিংবা কোন দেবতার নাম না লিখিলে কি চলে না?" সারদাচরণ বলিলেন, "কিছুই লিখিবার প্রয়োজন নাই; তবে বাঙলায় উইল হইলে প্রায়ই কোন না কোন দেবতার নাম লিখা হইয়া থাকে।" তিনি বলিলেন, "তবে বিশ্ববীজ লিখায় কি কোন আপত্তি আছে?" সারদাচরণ বলিলেন, "কোন আপত্তি নাই। কিছুই না লেখায়ও ক্ষতি নাই।"

তখন অক্ষয়কুমারের মনের গতি কোন্‌দিকে চলিতে-ছিল, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল তাহা এই কথায় বুঝিতে পারা যায়। তখন তিনি প্রকৃতিবাদী হইয়াছিলেন।

মন্মথনাথ ঘোষ

সুন্দরবনে দশদিন

শ্রীতারিণীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মিত্র

সুন্দরবন-ভ্রমণের ইচ্ছা বহুদিন হইতে আমরা পোষণ করিতেছিলাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুতেই সুযোগ ও সুবিধা হইয়া উঠিতেছিল না। অবশেষে নানারূপ প্রতিকূল ঘটনা সত্ত্বেও গত পূজার বন্ধে আমরা এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উনিশ-এ সেপ্টেম্বর এখান হইতে দশ-বারদিনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া শ্যামবাজার হইতে ট্রেণে করিয়া রওনা হইয়া দ্বিপ্রহরে 'হাসানাবাদ' পৌঁছিলাম। এখানে সুবিধামত বোট সংগ্রহ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারা গেল না। কাজেই ওই অঞ্চলের ছোট ছোট দুইখানি নৌকা (টাপুরে) লইয়া বেলা তিনটা আন্দাজ যাত্রা করা গেল। সন্ধ্যার সময় 'হিঙ্গুলগঞ্জ' পৌঁছিয়া বাকী বাজার সারিয়া লইলাম। রাত্রির কিয়দংশ সেখানেই যাপন করিয়া পুনরায় অগ্রসর হওয়া গেল। মাইল কতক অগ্রসর হইতে-না-হইতেই দারুণ দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। 'বাঁড়ালখালি' নামক স্থানটীতে নৌকা বাঁধিতে হইল। যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও এবং বিপদের সম্মুখীন হইয়াও নৌকা ঝড়-বৃষ্টির জন্য কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অগত্যা সমস্ত দিনমান ও রাত্রি এইস্থানে কাটাইয়া প্রাতে দুর্য্যোগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিয়া জোয়ারের প্রতিকূলে বাহিয়া অতিকষ্টে দ্বিপ্রহরের সময় 'কইখালি' নামক বনবিভাগের 'ফরেষ্ট রেঞ্জার' বাবু তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাসায় পৌঁছান গেল। তেজেনবাবু যেমন ভদ্র, তেমনি অমায়িক। তাঁহার সৌজন্যে আপ্যায়িত হইয়া ওইবেলা তাঁহার আতিথ্য-স্বীকারে বাধ্য হইলাম। চা, প্রচুর জলযোগ ও পরে আহারাদির 'যা ব্যবস্থা তা' অবর্ণনীয়।

বৃষ্টি ও ঝড় সমানেই হইতেছিল। আকাশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আরও খুব বেশী ঝড়ের সম্ভাবনা দেখিয়া তেজেন্দ্রবাবু আমাদের দু'-একদিন অপেক্ষা করিয়া রওনা হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমরা বনে প্রবেশ করিবার জন্য এতই উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাহাতে কিছুতেই রাজী হইতে পারিলাম না। নৌকার ছইয়ের উপর ঢাকা দিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে দুইখানি ত্রিপল চাহিয়া লইয়া সেই বৃষ্টি মাথায় বাহির হইয়া পড়িলাম। এই কইখালি ফরেষ্ট অফিসের পূর্ব্বে 'কালিন্দী' নদী ও পশ্চিমে 'মামুদো' নদী। এই দুইটী নদী একটী কাটাখাল দ্বারা সংযুক্ত। আমরা বেলা তিনটা আন্দাজ বাহির হইয়া মামুদো নদী দিয়া অগ্রসর হইয়া 'ধজিখালি' নামক একটী খালের ভিতর প্রবেশ করিতে গিয়া ভাঁটার অত্যধিক স্রোতের জন্য অকৃতকার্য্য হইলাম। এইখানে আমাদের নৌকাখানি একটী ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভাঁটার সময় স্রোতের বেগ

এত বেশী হয় যে, ছোট নৌকার অনেক প্রকার বিপদ হওয়া সম্ভব। যাহা হউক, আমরা খালের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মাম্‌দো নদীর তীরের কিছুদূরে 'বয়ের সিং' ও 'কৃষ্ণখালি' নামক দুইটী চরে শীকার অন্বেষণে খানিক ঘুরিয়া বেড়াইলাম। পরে জোয়ারের সাহায্য লইয়া ধজিখালি খালের ভিতর দিয়া 'ছোট মাথাভাঙা' খালে আসিলাম।

এই মাথাভাঙা খালের উভয়দিক দিয়া জোয়ারের জল প্রবেশ করে। তা' ছাড়া, খালটীতে বড় বড় কুমীরের বাসস্থান। তথাপি এই স্থানেই আমাদের রাত্রিযাপন করিতে হইল। পরদিন জোয়ারে উজান বাহিয়া 'বড় মাথাভাঙা' খালে আসিলাম। এই খাল হইতে দ্বিপ্রহরের সময়ে আমরা 'চুণকুড়ি' নামক নদীতে উপস্থিত হইলাম। এই নদীর উভয় পার্শ্বের জঙ্গলে যথেষ্ট শীকার পাওয়া যায় শোনা গেল। এইদিন আমরা প্রথম একঘণ্টার জন্য সূর্য্যের মুখ দেখিলাম। এই জোয়ারে আমরা 'চুণকুড়ি' নদী হইতে 'গুবদার'খাল নামক একটী খালে বিস্তর পাখীর সন্ধান পাইয়া খালটী দেখিতে যাইবার জন্য প্রবেশ করিলাম। কয়েকঘণ্টা বাহিয়া যাওয়ার পর আমরা নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। পূর্ণ জোয়ারের জলে সমস্ত জঙ্গল প্লাবিত হইয়া যাওয়ায় আমরা অগ্রসর হইবার আর পথ খুঁজিয়া পাইলাম না। এতদূর আসিয়া পাখীর কোন নিদর্শন না পাইয়া ভুল পথে আসিয়াছি বুঝিতে পারিলাম। এদিকে ভাঁটা আরম্ভ না হইলে সেখান হইতে বাহির হইবার কোন সুবিধা না থাকায় আমরা এই নিবিড় জঙ্গলে নৌকা রাখিয়া আহারাদি শেষ করিয়া লইলাম।

ভাঁটা আরম্ভ হইলে পুনরায় চুনকুড়ি নদীতে বাহির হইয়া আসিলাম। এই খাল দিয়া আসিতে আসিতে আমরা চকিতের জন্য দুই-একবার হরিণ দেখিতে পাইলাম। একটির উপর গুলিও করা গেল; কিন্তু জঙ্গল নিবিড় হওয়ায় গুলি তাহার গায়ে লাগিল না। চুণকুড়ি নদীতে একখানি জেলে-নৌকা ধরিয়া সংবাদ লইয়া জানা গেল যে, ঐ গুবদার খালের আন্দাজ দুইশত গজ দূরে ওই প্রকারের আর একটী খাল আছে, তাহার নাম 'সুবদার' খাল এবং এই সুবদার খালের ভিতর কথিত পাখীর আস্তানা। পুনরায় জোয়ার না পাইলে এই খালের ভিতর প্রবেশ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া আমরা চুণকুড়ি নদীর উপর একটী চরের নিকট নৌকা রাখিয়া রাত্রিযাপন করিলাম।

পরদিন প্রাতে আমরা 'গাছাল শীকার' সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করিবার জন্য একটী সুবৃহৎ কেওড়াগাছে আরোহণ করিলাম। একজন মাঝিও আমাদের সঙ্গে গাছে উঠিল। এই মাঝিটী 'কুই'(বাঁদরের ডাক ও ঝগড়া অনুকরণ করা) দিয়া হরিণ ডাকিতে পারে। কিছুক্ষণ কুই দেওয়ার পর কর্দ্দমে হরিণের পদশব্দ শোনা গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে কিছুদূরে কয়েকজন কাঠুরিয়া চুরি করিয়া কাঠ কাটিতে আরম্ভ করায় হরিণের দল পলাইল, কাজেই এক্ষেত্রে শীকারের সম্ভাবনা থাকিল না। আমরা বিরক্ত হইয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া কাঠুরিয়াদের ডাকাইয়া আনিলাম। কাঠ কাটিবার 'পাস' দেখিতে চাহিলে, তাহারা বন ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া জোয়ারের সাহায্য লইয়া এবার সুবদার খালে পাখীর আড্ডা দেখিবার জন্য প্রবেশ করিলাম। এখানে একটী জেলে-ডিঙি হইতে খাইবার জন্য কিছু মৎস্য সংগ্রহ করিয়া লইলাম। কিছুদূর আসিয়া আমরা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে বনে প্রবেশ করিলাম। ইহার পর ছোট ছোট খালগুলি অতি কষ্টে পার হইতে লাগিলাম। কিছুদূর এইরূপে অগ্রসর হইয়া পাছে রাস্তা ভুল হয় এই জন্য একটি বৃক্ষারোহণে দিঙনির্ণয় করিয়া পাখীর আস্তানায় উপস্থিত হইলাম। এ স্থানটিতে যে দৃশ্য আমরা দেখিলাম, তাহাতে পথের কষ্ট স্বীকার সার্থক বলিয়া মনে হইল। সহস্র সহস্র পক্ষী, যথা—সামখোল, কঙ্কণ, ধবলগিরি, গয়াল, বাকচো ইত্যাদি ছোট ছোট গাছের উপর বাসা বাঁধিয়া এক-একটী পাড়া সৃষ্টি করিয়া বাস করিতেছে। আমরা তাহাদের অতি নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম ও

হাত দিয়া তাহাদের শাবকদের স্পর্শ ও আদর করিলাম। এইরূপে কিছুক্ষণ এই সুন্দর দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া ভাঁটায় নৌকা ছাড়িয়া পুনরায় চুণকুড়ি নদীতে বাহির হইয়া আসিলাম।

নদী দিয়া আমরা অগ্রসর হইতে হইতে বহুবার হরিণ দেখিতে পাইলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী হরিণ শীকার করা গেল এবং সামান্য কিছু মাংস নিজেদের জন্য রাখিয়া বাকী মাঝিদের দিলাম। এই নদীতে রাত্রিবাস করিবার জন্য নৌকা নঙ্গর করা হইল। রাত্রে আহারাদি করিয়া শয়ন করিব, এই সময় একখানি বনবিভাগের পাহারার নৌকা (পেট্রোল বোট) আসিয়া আমাদের পাস দেখিয়া গেল। এই স্থানে গভীর রাত্রে 'টর্চ্চ লাইটে'র সাহায্যে একটী জানোয়ারের উপর গুলি করা গেল। জানোয়ারটী কি তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক, প্রাতে উঠিয়া সেটীকে সংগ্রহ করা হইবে স্থির করা হইল—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাত্রে নৌকার নঙ্গর জোয়ারের টানে উঠিয়া গিয়াছিল। নৌকা আমাদের অজ্ঞাতসারে বহুদূর ভাসিয়া যাওয়ায় পরে সে স্থানটী আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মাঝিমাল্লা ও আমরা সকলেই নিদ্রিত ছিলাম। এরূপ অবস্থায় নৌকা ভাসিয়া যাওয়ায় আমাদের বিপদের সম্ভাবনা খুবই ছিল—কিন্তু ভগবানের কৃপায় অঘটন কিছু ঘটিবার পূর্ব্বেই মাঝিদের মধ্যে একজন জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে অন্যান্যদের উঠাইয়া পুনরায় নঙ্গর ফেলিয়া নৌকা বাঁধিতে সক্ষম হইয়াছিল।

প্রাতে পুনরায় নৌকা হইতে একটী হরিণ শীকার করা হইল এবং মাঝিদের প্রচুর পরিমাণে মাংস খাওয়ান গেল, নিজেরাও অবশ্য বাদ পড়িলাম না। এই চুণকুড়ি নদীর উভয় পার্শ্বের জঙ্গলে আমরা যথেষ্ট হরিণ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছিলাম। আমাদের খাদ্যের অভাব না থাকায় অনাবশ্যক প্রাণীহত্যা আর করিতে ইচ্ছা হইল না। এই দিন আমরা 'তক্তাখালি'র 'মেদেয়' (ছোট দ্বীপ) উপস্থিত হইলাম এবং বড় সিঙ্গেল হরিণ মারিবার জন্য গাছাল শীকার করিবার উদ্দেশ্যে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। একটী কেওড়া গাছে উঠিয়া সঙ্গের মাঝি কিছুক্ষণ কুই দেওয়ার পর কয়েকটী হরিণশাবকসহ এবং দুই-একটী ছোট সিঙ্গেল হরিণ আসিল বটে, কিন্তু সিং বড় না হওয়ায় আমরা কাহাকেও গুলি করিলাম না। এই স্থানটীতে আমরা হরিণের কতকগুলি সিং পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম।

ইহার পর আমরা 'পরাণ বোসের ট্যাঁক' নামক একটী চরে নৌকা লাগাইলাম এবং এই স্থানেই রাত্রিযাপন করিলাম। শোনা যায়, এইখানে ব্যাঘ্রের বেশ উপদ্রব আছে, কিন্তু আমরা কোন নিদর্শন পাইলাম না। প্রাতে এখান হইতে ভাঁটায় নৌকা ছাড়িয়া নদীর উভয় পার্শ্বের জঙ্গলে হরিণ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইয়া মামদো নদীতে উপস্থিত হওয়া গেল। ডানদিকে 'আঠারবেঁকী' নদী রাখিয়া আমরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মামদো নদীর উপর 'ভোগের চরে' জাল ফেলাইয়া মৎস্য ধরাইলাম। এখানে আমরা মামদো নদী ও আঠারবেঁকী নদী বাহিয়া 'সুন্দরবন ডেস্‌প্যাচ সর্ভিসে'র কয়েকখানি মালবাহী ষ্টীমার যাইতে দেখিলাম।

এবার আমরা আঠারবেঁকী নদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া 'লাভাসান' খালে নৌকা রাখিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিলাম। দারুণ ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতের জন্য আমরা এইস্থানে বৈকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। দুর্য্যোগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে আমরা আঠারবেঁকী নদী হইতে 'ফরমুজা' ও 'কাছিকাটা' নামক খালে ঢুকিলাম। এই জায়গায় তিনটী 'কামটা'র প্রতি মাঝিরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জানা গেল যে, ব্যাঘ্রে মানুষ খাইলে তাহার সঙ্গের লোকেরা নিদর্শনস্বরূপ একটী গাছের ডাল পুঁতিয়া তাহাতে গোলপাতা বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। উদ্দেশ্য যাহাতে অপরে বুঝিতে পারে যে, ওইস্থানে মনুষ্যঘাতক ব্যাঘ্র আছে এবং সাবধান হইতে পারে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, এই স্থানে তিনটী মানুষ ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা এই কামটা কয়টী বামে রাখিয়া অল্প কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দূরে একটী কেওড়া গাছের তলায় দুইটী হরিণী ও একটী বড় সিঙ্গেল হরিণ চরিতে

দেখিলাম। সিঙ্গেল হরিণটী মারিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতেই তাহারা বনের ভিতর পলাইয়া গেল। দূরত্ব যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও গুলি করিবার লোভ সংবরণ করা গেল না, কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন গাছাল শীকার করিবার অভিপ্রায়ে সেখানে নামিয়া একজন মাঝিকে লইয়া গাছে উঠিলাম এবং নৌকা দুইখানি দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিলাম। আমাদের মাঝি কিছুক্ষণ কুই দেওয়ার পর একটী ভারী জানোয়ারের কাদার উপর চট্ চট্ পদশব্দ পাওয়া গেল এবং জানোয়ারটী আমাদের নিকট হইতে দশ-বার গজ দূরে আসিয়া আমাদের দৃষ্টির বাহিরে জঙ্গলের ভিতর অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাঝি পুনরায় কুই দিতেই ব্যাঘ্রের ভীষণ গর্জ্জন সেই স্থান হইতে শুনিতে পাইয়া বুঝিলাম, হরিণের পরিবর্ত্তে ব্যাঘ্র মহাশয় আসিয়াছেন। মাঝি বলিল—'বন্ধু' আসিয়াছেন। এই সকল লোক বনে আসিয়া ব্যাঘ্রকে 'বন্ধু' কিংবা 'শেয়াল' বলিয়া থাকে। এই মাঝির নিকট শুনিলাম যে, কিছু পূর্ব্বে হরিণের উপর্যুপরি গুলি করা হইয়াছে, সেই শব্দে মনুষ্যের সমাগম জানিতে পারিয়া বন্ধু শীকার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন।

শীকারী হরিণ মারিলে অনেক সময় মৃত হরিণটী কিংবা শীকারী যদি অসাবধানবশতঃ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করেন, তাহা হইলে ইহারা তাঁহাকেই লইয়া পলায়ন করেন। এইরূপে অনেক শীকারী প্রাণ হারাইয়াছেন। যাহা হউক, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা সেই বৃক্ষে বন্ধুর দর্শনলাভ আশায় বসিয়া থাকিলাম, কিন্তু আরও দুই-একবার তাঁহার মৃদু গর্জ্জন শ্রবণ করা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইল না। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত এবং নিকটে বন্ধুর উপস্থিতিতে হরিণ আসিবারও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বংশীধ্বনি করিয়া নৌকা ডাকিলাম এবং বন্দুক প্রস্তুত করিয়া লইয়া আমাদের প্রবীণ মাঝি কপিলুদ্দি গাজীর উপদেশমত গাছ হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া জঙ্গলের দিকে সম্মুখ করিয়া পিছাইয়া আসিয়া নৌকাতে উঠিলাম।

এইখানে আমরা রাত্রিবাস করিলাম। প্রায় সারারাত্রি বন্ধুর দর্শনলাভ করিবার জন্য টর্চ্চ ও বন্দুক লইয়া কাটাইয়া দিলাম। প্রাতে এখান হইতে নৌকা ছাড়িয়া পুনরায় আঠারবেঁকী নদী হইতে মামদো নদীতে আসিয়া খ্যাপলা জালে মৎস্য ধরিতে ধরিতে চুণকুড়ি নদীর মোহনাতে আসিয়া নৌকা বাঁধিয়া আহারাদির আয়োজন করা গেল।

এ কয়দিন ঝড়-জল আমাদের নিত্য সহচর ছিল। যাহা হউক, বুঝা গেল যে, এই অত্যধিক বর্ষায় হরিণ ভিন্ন অন্যান্য জানোয়ার স্বীকারের কোনই সুবিধা হয় না; কারণ, এই সময় প্রায় প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর জোয়ারের জল বনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে এবং ভাঁটায় জল নামিয়া যাওয়ার পর কাদায় চলিতে গেলে মানুষ বা জানোয়ার সকলেরই পা ফেলিতে চট্ চট্ শব্দ হয় এবং সেই শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত শোনা যায়—তাহাতে শীকারের জানোয়ার কোনক্রমেই নিকটে পাওয়া যায় না। এই কাদা ব্যতীত আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য অসুবিধা আছে। কেওড়া, সুন্দরী, বাইন, পশুর প্রভৃতি গাছের শত সহস্র ঊর্দ্ধমুখী শূবন মূল—ইহাদের 'শূলো' কহে। বোধ; হয় শূলের অপভ্রংশ); এই শূলো এত অধিক ও ঘন যে, বনে সমানভাবে পা ফেলিয়া গমন করা একেবারে অসম্ভব। চলিতে চলিতে অসাবধান বা অন্যমনস্ক হইলে ইহাদের আঘাত অবশ্যম্ভাবী এবং অনেক সময় পরে আঘাতের স্থান পাকিয়াও উঠে। এই রকল কারণে বনের ভিতর দ্রুত গমন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

যাহা হউক, এ কয়দিন ক্রমান্বয়ে প্রত্যহ জল বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাঝিদের মধ্যে দুই-একজন অসুস্থ হইয়া পড়িল। আমরাও এই নিরীহ হরিণ ব্যতীত অন্যান্য শীকারের অভাবে উৎসাহহীন হইয়া পড়িলাম। সুবিধামত বড় বোট সংগ্রহ করিতে না পারায় ওই অঞ্চলের ছোট নৌকা (টাপুরে) দুইখানি লইয়াও আমাদের স্থান সংকুলান হয় নাই এবং অতিকষ্টেই দিন কাটাইতেছিলাম। প্রথম হইতেই সকল প্রকার প্রতিবন্ধক ও প্রতিকূল ঘটনার বিরুদ্ধে আমরা অগ্রসর হইয়াছিলাম। ঝড়-তুফান ও স্রোতে ছোট নৌকা অনেকবার বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল

এবং এই সকল কারণে আমাদের অভিপ্রেত স্থানসমূহে মাঝি মাল্লারা আমাদের লইয়া যাইতে পারিল না, কাজেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই-এক দিন পূর্ব্বেই ফিরিতে বাধ্য হইলাম। এদিকে আমাদের পানীয় জলের চারটী জালাই নিঃশেষ হইয়া গেল। ফিরিবার পথে আমরা চুণকুড়ি নদীর ধারে জঙ্গলে উঠিয়া পুনরায় গাছাল দিলাম। কিছুক্ষণ কুই দেওয়ার পর দুইটী হরিণ শিশু আসিল। আমারা কর্দ্দমাক্ত পদে ভিজা বৃক্ষের অধিক উর্দ্ধে উঠিতে না পারায় তাহারা আসিয়াই আমাদের দেখিতে পাইল। আমরা নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকায় তাহারা কিছুক্ষণ পরে নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া বৃক্ষের তলে চরিতে লাগিল। এবারেও বড় সিঙ্গেল হরিণ আসিল না। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নামিয়া আসিলাম এবং নৌকা ছাড়িয়া দিয়া ছোট মাথাভাঙা খালে নৌকা বাঁধিয়া ভোজনাদি সারিয়া লইয়া সন্ধ্যার সাতটার সময় কইখালি আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে তেজেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক পুনরায় অতি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়া চা ও জলযোগান্তে রাত্রে প্রচুর পরিমানে আহার করা গেল। পরদিন বিজয়া-দশমী উপলক্ষে বিশেষ রকম ভোজের আয়োজনে যোগ দিবার জন্য তিনি আমাদের অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু 'ঘরমুখো বাঙালী' আমরা বিনীতভাবে তাহার এই ভদ্রতা অভদ্রের মত প্রত্যাখ্যান করিলাম এবং তাহার জন্য মনে মনে লজ্জিতও হইলাম। যাহা হউক, তাঁহার এই সৌজন্য আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না।

তারিণীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
ও
বীরেন্দ্রকুমার মিত্র

রেধো-বেদো

শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত, বি-এস্-সি, এম্ বি

রেধো বেদো পরীক্ষিত মোড়লের দুই ছেলে—পিঠো-পিঠি দুই ভাই। বেদোর বয়স আঠার, রেধোর বয়স সতের। তাদের বাড়ীর গাছে খুব আমড়া ফলেছে। দুই ভায়ে খানিকটা করে নুন নিয়ে গাছে চেপে বসেছে—ঠিক্ হনুমানের মত। তাদের মধ্যে ব্যবধান—এ ডাল আরও ডাল। একটা আমড়ার খানিকটা কামড়ে নুন দিয়ে মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে রেধো বল্‌লে, "বেদো, এই সেদিন তুই না জ্বর থেকে উঠেছিস?"

বেদোও আমড়া চিবোতে চিবোতে মুখ ভেঙচে বল্‌লে, "তোরও ত জ্বর হয়েছিল, তুই খাচ্ছিস কেন?"

রেধো রোখ করে' বল্‌লে, "খুব করছি, বেশ করছি তোর তাতে কি?"

বেদো ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "দাঁড়া, বাবাকে বলে' দোব। চড়াচ্চড় চড় কষিয়ে দেবে।"

রেধো আরও রোখ করে' বললে, "যাঃ যাঃ, তোর একার বাবা। তুইও বাদ যাবি না—পীর নোস্। তোকে দমাদ্দম কিল মারবে।"

রেধো বেদোকে লাথি দেখালে। বেদো মুখ ভ্যাঙালো।

বেদো বল্‌লে, "তবে রে বাঁদর, বড় ভাইকে লাথি দেখান।"

রেধো বল্‌লে, "তবে রে উল্লুক, ছোট ভাইকে মুখ ভেঙান।"

বেদো রেধোকে গোটাকতক আমড়া ছুঁড়ে মারলে। রেধোও তার প্রতিশোধ নিলে।

বেদো নিজেকে বাঁচাতে গেল। হাত থেকে নুন মাটিতে পড়ে' গেল। তখন সে রেধোকে বল্‌লে, "এই, খানিকটা নুন দে।"

রেধো বল্‌লে, "কেন, তোর নুন কি হ'ল?"

বেদো বল্‌লে, "তোর জন্যেই ত পড়ে' গেল।"

রেধো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বল্‌লে, "নুন দেবে না কলা দেবে।"

বেদো রেগে বল্‌লে, "হতভাগা, বড় ভাইকে কলা দেখান। কচু খাও।"

রেধো বল্‌লে, "লক্ষীছাড়া, ছোট ভাইকে কচু খাওয়ান, লাথি খাও।"

বেদো আবার মুখ ভেঙিয়ে বল্‌লে, "ফের লাথি দেখাচ্ছিস।"

রেধো বল্‌লে, "ফের মুখ ভেঙাচ্ছিস।"

বেদো বললে, "চোপ্ ছুচো, মেরে হাড় ভেঙে দোব!"

রেধো বললে, চোপ্ গাধা, মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দোব।"

নীচ থেকে গম্ভীর আওয়াজ এল, "মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দোব।"

রেধো বেদো নীচের দিকে তাকালে। বাঘ দেখ্‌লে লোকে যেমন ভয়ে জড়সড় হ'য়ে যায়—তাদের অবস্থাও ঠিক্ তেমনি হ'ল। নীচে দাড়িয়ে তাদের বাপ পরীক্ষিত—রেগে গেলে যার জ্ঞান থাকে না, তার হাতে চেলাকাঠ। ওপর দিকে তাকিয়ে সে গর্জ্জন করে' উঠল, "এই, নেমে আয়।"

তারা ধীরে ধীরে নেমে এল।

পরীক্ষিত বললে, "ফের আমড়া খাচ্ছিস?"

রেধোর মুখে তখনও আমড়া। সে স্বচ্ছন্দে বলে' বস্‌ল, "আমি খাই নি, বেদো।"

তাড়াতাড়ি চিবনো আমড়া গিলে ফেল্‌তে ফেল্‌তে বেদো বল্‌লে, "আমি খাই নি, রেধো।"

পরীক্ষিত তার গালটিপে 'হাঁ' করিয়ে মুখের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে বল্‌লে, "পাজী, আমড়া চিব্বোচ্ছিস আর বলছিস, তুই খাস নি—রেধো খেয়েছে।"

বেদো দেখ্‌লে ধরা পড়ে গেছে। এবার তার নিস্তার নেই। তখন কেঁদে ফেল্লে বল্‌লে, "রেধো বল্‌লে, আয় ভাই, আমড়া খাই। আমাকে টেনে গাছে তুল্‌লে।"

রেধো দেখ্‌লে বেগতিক, সেও সাফাই গাইলে,"বাঃ রে বাঃ, তুই ত নিজে গাছে উঠ্‌লি, আমাকে উঠ্‌তে বল্‌লি।"

পরীক্ষিত বল্‌লে, "সাধারণভাবে মারলে তোদের কিছু হবে না। বিছুটী দিয়ে সপাসপ দু'-চার ঘা না দিলে তোদের ঠিক্‌ মনে থাক্‌বে না।"

সে বিছুটী-বনে গেল। তারা দু'জনে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। রাগের চোটে পরীক্ষিত যেই বিছুটী ধরে' টেনেছে, অমনি মুখ গুঁজড়ে বিছুটী-বনে পড়ে' গেল। তার সারা অঙ্গে বিছুটীর বিষ ধরে' গেল। উঃ, কি সে জ্বালা! ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেউ তা' ধারণার মধ্যেই আন্‌তে পার্‌বে না। পরীক্ষিত 'তিড়িং বিড়িং' করে' লাফাতে লাগ্‌ল। বাপের এই অবস্থা দেখে দুষ্ট ছেলে দু'টি হেসে কুটোপাটি। রেধো বেদোকে বল্‌লে, "ওরে, এই পালাবার সুযোগ।"

আর কথাবার্ত্তা নয়, দু'জনেই সেখান থেকে চম্পট দিলে।

আসামী পালাল দেখে পরীক্ষিত তাদের ধর্‌তে ছুট্‌ল। এমন সময় ঘটনাস্থলে পদ্মরাণীর আবির্ভাব হ'ল। পদ্মরাণী রেধো বেদোর মা, পরীক্ষিতের গৃহলক্ষ্মী। মনে হ'ল, আট হাত কাপড়ের খাটো বেড়ে এক চাংড়া পাথুরে কয়লা এসে হাজির হ'ল। আঁটসাট তার গড়ন, যৌবন এখনও তার দেহ ছেড়ে চলে যায় নি। পরীক্ষিত তাকে দস্তুরমত ভয় করে। তার আঁচলের মধ্যে গিয়ে রেধো আশ্রয় নিলে। পরীক্ষিতের পুরুষমন বল্‌লে, "না, পদ্মকে ভয় কর্‌লে চল্‌বে না, আত্মসম্মানে ভয়ানক ঘা লাগ্‌বে।"

তাই সে এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে, "হতচ্ছাড়া ছোঁড়ারা, ভেবেছিস পদ্মার আঁচলে লুকোলে তোরা রক্ষে পাবি?"

পদ্মরাণী নথ নেড়ে তেড়ে উঠ্‌ল, "ছেলেদের অমন করে' গালাগাল দিও না।"

পরীক্ষিতের রাগ আরও বেড়ে গেল। সে বল্‌লে, "আলবৎ গালাগাল দোব। বেরিয়ে আয় আটকুঁড়ির পুতেরা।"

পদ্মরাণীর স্বর সপ্তমে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে, "আবার ছেলেদের ওই বিচ্ছিরী গালাগাল দিচ্ছ।"

পরীক্ষিত দমে না। তার গা যত জ্বলে, তার রাগও তত বেড়ে ওঠে, মুখ ততই যা' তা' বল্‌তে সুরু করে। সে বল্‌লে, "বেশ করব আঁটকুড়ীর পুত বল্‌ব—তোর বাবার কি!"

পদ্মরাণী পদ্ম-গোখরোর মত ফোঁস করে' উঠ্‌ল, "কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ছেলেদের যাচ্ছে তাই গালাগাল দিচ্ছ, আবার ছোটলোকের মত বাপ তুলছ। পাগল হ'য়ে গেছ, বটে! দাঁড়াও, মাথায় জল ঢেলে দিচ্ছি।"

সত্যি সত্যি পদ্ম পরীক্ষিতের গায়ে এক বালতী জল ঢেলে দিলে। আর যায় কোথা, পরীক্ষিতের গায়ে কে যেন একচাক ভীমরুল বসিয়ে দিলে। যন্ত্রনার চোটে পরীক্ষিত কেঁদে ফেলে বল্‌লে, "ওরে বাবারে, গেছিরে! একে গায়ে বিছুটী লেগেছে, তার ওপর জল ঢেলে দিয়েছেরে রাক্ষুসী!"

প্রবলপরাক্রান্ত পরীক্ষিতের এই দুর্দ্দশা দেখে রেধো বেদো হেসে লুটোপুটি। পদ্মরাণী হতভম্ব হ'য়ে গিয়ে বল্‌লে, "ও মা, গায়ে বিছুটী লাগ্‌ল কি করে?"

পরীক্ষিতের হ'য়ে বেদো জবাব দিলে, "আমাদের মারবার জন্যে বিছুটী আন্‌তে গিয়েছিল। বিছুটী-বনে পড়ে' গিয়ে ওই দশা হয়েছে। হাঃ হাঃ!"

তাড়াতাড়ি নারকোল তেল এনে তার গায়ে মাখাতে মাখাতে পদ্মরাণী বল্‌লে, "আমি কি করে' জানব যে, তোমার গায়ে বিছুটী লেগেছে।"

তার স্বর স্নেহে কোমল, প্রীতিতে গাঢ়। সে আবার বল্‌লে, "ছেলে দুটোকে ওই দিয়ে মার। দেখুক কি রকম জ্বালা করে।"

পরীক্ষিত তখন একটু সুস্থ হয়েছে। সে বল্‌লে, "এই জন্যেই ত পদ্মকে এত ভালবাসি। পদী, তুই ছেলে দুটোর মাথা খেলি।"

গরম তেলের কড়ায় সম্বরা পড়ল। পাশ থেকে এক-গাছা ঝাঁটা তুলে নিয়ে পদ্ম বল্লে, "ফের ওই সব ছাই-পাঁশ কথা ছেলেদের বল্লে খেংরে বিষ ঢেলে দোব।"

পদ্মরাণীর সে কি মূর্ত্তি! যেন শ্রীশ্রীশীতলা দেবী তাঁর দয়া ছড়িয়ে দিতে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। এই মূর্ত্তি দেখে পরীক্ষিত মনের রাগ মনে চেপে ভালভাবে বল্লে, "যা' বেদো রেধো, গরু দুটোকে চারটি খড় দি গে, আর 'মরায়ে' ধানগুলো তুলে ফেল্ গে।"

শান্তশিষ্ট দু'টি ভাই পিতৃআজ্ঞা পালন করতে চলে' গেল।

গোয়ালে ঢুকতেই বেদোর মাথায় বুদ্ধি যোগাল। এই সময় যদি গরু দুটোর ল্যাজে ঘুঁড়ি বেঁধে দিয়ে তাড়া দেওয়া যায়, কেমন হয়। যেমন মনে হওয়া, অমনি তা' কাজে লাগান।

খড়ের আঁটি উঠোনেই পড়ে' রইল। গরু ছুট্‌লো দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে এধার ওধার। বেদো রেধোর হাততালি দেওয়ার কি ধূম! এইবার তাদের মনে পড়ল, মরায়ে ধান তোলবার কথা। দু'জনে মিলে সমস্ত ধান 'বোরা'র মধ্যে পুরে ধীরে ধীরে বয়ে নিয়ে গিয়ে তরফদারের গোলায় তুলে দিয়ে এল।

তরফদার জিজ্ঞাসা করলে, "ধান আন্‌লি কেন?"

তারা উত্তর দিলে, "বাবা বল্লে।"

তরফদার বল্লে, "কত দাম দিতে বলেছে?"

তারা বল্লে, "তুমি যা' দেবে।"

তরফদার পচিশ টাকার ধানের বদলে তাদের হাতে পাঁচ টাকা দিয়ে বল্লে, এতেই তার লোকসান হ'য়ে গেল।

গাঁয়ের হাটে রথের মেলা বসেছে। দুই ভায়ে পাঁচ টাকা নিয়ে মেলায় গেল। কত রকমের জিনিষ এসেছে। এদিক-ওদিক ঘুরে তারা একটা করে' ভেঁপু বাঁশী আর একটা করে ঢোল কিনলে। একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে বেদো একবার বাঁশী বাজায় আর রেধো ঢোল বাজায় রেধো একবার বাঁশী বাজায় বেদো ঢোল বাজায়। দেখতে দেখতে তাদের পাশে ভীড় জমে' গেল। সেখানে এসে দাঁড়াল একটি বার-তের বছরের মেয়ে—দেখতে সুশ্রী, নাম-ময়না। সে ভিড় ঠেলে তাদের কাছে গিয়ে বল্লে, "এই, আমি বাঁশী বাজাব।"

দুই ভাই চোখ বুজে বাজনা বাজাচ্ছিল। তার কথায় চোখ খুলে দেখে সাম্‌নে অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী। তার কথায় তারা রাজী হ'ল। তরুণের কাছে কিশোরীর আবেদন কোথাও কি অগ্রাহ্য হয়? এইবার ময়না বাজাল বাঁশী, দুই ভায়ে বাজাল ঢোল। বেদোর হাতের চাঁটির তালি সহ্য করতে না পেরে ঢোল গেল ফেঁসে। রেধোও রাগ করে' ঢোল ভেঙে ফেল্লে। বেতালা সঙ্গত কেউ পছন্দ করে না। ময়না কুটিকুটি করে' ভেঁপু ছিঁড়ে ফেল্লে। তারপর তিনজনে মিলে নানারকম জিনিষ-পত্র কিনে বাকী টাকা ক'টার সদ্ব্যবহার করলে। রেধো বেদো বাড়ীর দিকে চল্‌ল। ময়নাও তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে চল্‌ল।

বাড়ীতে আসতেই পরীক্ষিত তাদের জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যারে, ধানগুলো সব তুলেছিস?"

বেদো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, "তরফদারকে জিজ্ঞাসা করে' এস, সব তুলেছি কি না?

পরীক্ষিত বল্লে, "তরফদারকে কোথায় পেলি?"

দু'জনে বল্লে, "তার গোলাতেই ত সব ধান তুলে দিয়ে এলাম।

পরীক্ষিত বল্লে, "কেন?"

দু'জনে বল্লে, "তুমিই ত বলে' দিলে। তরফদার ধান নিলে, আমাদের টাকা দিলে।"

পরীক্ষিত বল্লে, "তোদের জন্যে কি আমি খুন হবো? নিজের গোলায় কি জায়গা ছিল না। ধান তুলতে গেলি

তরফদারের গোলায়। দে টাকা দে, টাকা ফেলে দিয়ে ধান ফিরিয়ে আনি।"

তারা পরীক্ষিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরীক্ষিত বল্‌লে, 'হাঁ করে' মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস কি? টাকা কোথায়?"

বেদো বল্‌লে, "রেধো মেলায় গিয়ে খরচ করেছে।"

রেধো বল্‌লে, "এই, আমি? না, বেদো খরচ করেছে।"

পরীক্ষিত বল্‌লে, "হারামজাদারা, বীজধান বেচে মেলায় খরচ করে' এসেছ।"

সে চড় মেরে মেরে তাদের মুখ রাঙা করে' দিলে।

পেছন থেকে এগিয়ে এসে ময়না বললে, "না না, মেব না, ওদের দোষ নেই। আমি ওদের বলেছিলাম, তাই ওরা আমাকে জিনিষ কিনে দিয়েছে।"

সব জিনিষ দেখে পরীক্ষিত ময়নাকে বল্‌লে, "তুই কে?"

ময়না বল্‌লে, "আমি ময়না।

পরীক্ষিত বল্‌লে, "তুই কার মেয়ে?"

সঙ্গে সঙ্গে ময়না বল্‌লে, "আমি বাবার মেয়ে।"

"তোর বাবা কোথায়?"

"হারিয়ে গেছে।"

"তা' এখানে মরতে এসেছিস কেন?"

"এখানেই থাকব বলে'।"

"বেটারা সব বাচ্ছা। দাতা কর্ণ এসেছেন। পয়সা বিলোচ্ছেন, আবার একজনকে আশ্রয় দেবার তরে নিয়ে এসেচেন।"

দাঁত খিঁচিয়ে এই কথা বলে' পরীক্ষিত সেখান থেকে চলে' গেল।

দিন আসে, দিন যায়। ময়না আগে আগে রেধো বেদোর বাড়ীতে যাওয়া-আসা করত। তার বাপ মারা যেতে এখন বাসা বেঁধেছে। ময়না রেধো বেদোকে চালিয়ে নিয়ে চলে। তাই তাদের শাসন করতে পরীক্ষিতকে আর গালাগাল দিতে হয় না। পরীক্ষিতকে শাসন করতেও পদ্মরাণীকে আর ঝাঁটা ধরতে হয় না। সুন্দর মুখের প্রভাবই এমনি। সে পশুকে বশ করে, তাকে মানুষ করে' তোলে।

এমনি করে' দু'বছর কেটে গেল। ময়নার দেহ-গঙ্গায় যৌবনের ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকেছে। তাই রূপ দুকূল ছাপিয়ে উপ্‌ছে পড়েছে। একদিন উঠোনে বসে' ময়না পাখীর ঠোঁট থেকে বড়ি আগলাচ্ছিল। বেদো একটা বঁইচির মালা ময়নার গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "তুই আমাকে ভালবাস্‌বি ময়না?"

ময়না বঁইচি খেতে বড় ভালবাসে। তাই সে খুসী হ'য়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

বেদো হেসে বললে, "আমিও তোকে ভালবাসি— তোকে বিয়ে করব।" ময়না মুচকি হেসে আড়চোখে তার পানে চাইলে। একে নারীর নয়ন-বাণ, তায় তার ডগায় রাঙা ঠোঁটের হাসির বিষ মাখানো—এ যে কি অস্ত্র, এর উপমা দিতে পারলাম না। রসিকজন নিজের মনের মত দিয়ে নেবেন।

তার গলায় আর একছড়া বঁইচির মালা এসে পড়্‌ল। এ মালা রেধোর।

বেদো বল্‌লে, "তুই আমায় ভালবাসবি ময়না?"

ময়না হেসে বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

রেধো অধীরভাবে বল্‌লে, "আমি তোকে ভালবাসি —তোকে বিয়ে করব।"

ময়নার ঠোঁটে সেই হাসি—চোখে সেই বিদ্যুৎ।

বেদোও মলো। রেধোও মলো।

রেধোর কথা শুনে বেদো হুঙ্কার ছেড়ে বল্‌লে, "আমার বউকে তুই বিয়ে করবি কি হতভাগা?"

বেদো পাল্‌টা জবাব দিয়ে বল্‌লে, "আমার বউকে তুই বিয়ে করবি কি হতভাগা?

বেদো বললে, "ময়না আমাকে ভালবাসে।"

রেধো বললে, "ময়না আমাকে ভালবাসে।"

দুই ভায়ে মল্লযুদ্ধ বেঁধে গেল। তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ময়না হাসছে, আর একটা একটা করে বঁইচি মুখে ফেল্‌ছে। এ দৃশ্য দেখে সুন্দ-উপসুন্দের কথা মনে পড়ে' যায়।

শেষে ময়না তাদের বিবাদ মিটিয়ে দিলে।

ময়নার এক কাঁধে হাত রেখে বেদো বলে, "ময়না আমার।"

ময়নার আর এক কাঁধে হাত রেখে রেধো বলে, ময়না আমার।"

এ স্পর্শ অতনুর স্পর্শ। ময়নার শরীর অবশ হ'য়ে আসে। বসন্ত বাতাসের স্পর্শে ফুলভারে নুয়ে পড়া লতার মত তার দেহ শিরশির করে' কেঁপে ওঠে।

গাঁয়ের জমিদারের ছেলে মনোহর চৌধুরী গোটাকতক বদমাইস লোক নিয়ে একটা দল গড়ে' তুলেছে। তাদের কাজ হ'ল, 'তুলসী-বন' বলে' একটা পোড়ো বাগানবাড়ীতে বসে' নেশা করা আর গাঁয়ের বৌ-ঝি টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করা। গাঁয়ের জমিদার, অসীমপ্রতাপ— তার ছেলে। তার বিপক্ষে কেউ কথা কইতে সাহস করে না। গায়ের ঝাল গায়ে মেখে থাকে।

একদিন মনোহর ঘোড়ায় চেপে একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সেই রাস্তা দিয়ে ময়না স্নান সেরে ফিরছিল। তার পিঠে ভিজে চুল কালো রেশমের মত ছড়ান। অদ্বিতীয় শিল্পী ভাস্কর-যৌবন তার হাতে গড়া নিখুঁত তার দেহখানির ওপর ভিজে কাপড় নেপ্‌টে গেছে। তার দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাগুলি ফুটে বেরুচ্ছে। মনোহর অতৃপ্ত নয়নে মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখে একটু বাঁকা হাসি হাস্‌লে। এ হাসি ধারাল ভোজালির মত। ময়নার বুক ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেল।

দুই হাতে তার বুক ঢেকে মুখ নীচু করে' সে হন্‌হন্ করে' এগিয়ে গেল। পেছন ফিরে আর একবার দেখে মনের আনন্দে শিস্ দিতে দিতে মনোহর ঘোড়া চালাতে লাগ্‌ল।

দু'দিন পরে সন্ধ্যেবেলায় ময়না পুকুরের পাড়ে বসে' ধুচুনী করে' চাল ধুচ্‌ছে। চারদিকের কোলাহল থেমে গেছে। পথে লোক চলাচলও কমে গেছে। হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে পেছু ফিরে তাকাতে ময়না দেখ্‌লে তার পাশে জমিদারের ছেলে। তার মুখে সেই হাসি। কি কর্‌বে ঠিক্ কর্‌তে না পেরে সে ধুচুনী হাতে করে' 'কাঠ' হ'য়ে বসে' রইল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চকিতে আরও দু'জন তার পাশে এসে দাঁড়াল। কাপড় দিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেলে চ্যাঙদোলা করে' তাকে তারা তুলসী বনে নিয়ে গেল। মনোহর হাস্‌তে হাস্‌তে ঘোড়ার পিঠে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে।

রেধো বেদোর বাড়ীতে সোরগোল পড়ে' গেল, ময়না কোথা গেল—ময়না কোথা গেল— পুকুর পাড়ে গেল, এখনও ফির্‌ল না কেন? তার সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম মন্তব্য প্রকাশ কর্‌লে, কিন্তু আসল খবরটা সকলের কাছে অজানা রয়ে গেল। তার পরদিন অনেক খোঁজাখুজি করা হ'ল। অনেকের মনে সন্দেহ জেগে উঠ্‌ল—রেধো বেদোর মনেও। শেষে রেধো বেদো সন্ধ্যাবেলায় তুলসীবনে গিয়ে ঢুক্‌ল। কেউ কোথাও নেই। জনমানবশূন্য বাড়ী খাঁ খাঁ কর্‌ছে। তাদের গা ছম্‌ছম্ কর্‌তে লাগ্‌ল। সাহসে ভর করে' পাঁচিল ডিঙিয়ে তারা বাড়ীতে ঢুক্‌ল। দেখ্‌লে, একটা ঘরের মধ্যে মেঝের ওপর কে যেন শুয়ে রয়েছে। তাদের হাতের হারিকেনের আলোটা তার মুখের কাছে ধরে' দেখ্‌লে—ময়না। দুর্ব্বৃত্তেরা তার দেহের পবিত্রতা নষ্ট করে' তাকে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ফেলে রেখে গেছে। রেধো বেদো তার গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌লে সেটা বরফের মত ঠাণ্ডা। তারা তাকে জোরে জোরে নাড়া দিলে। সে নড়্‌ল না। ব্যাপার কি তা' বুঝ্‌তে তাদের বাকী রইল না। দুই ভায়ে ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে গেল! কিছুক্ষণের জন্যে তাদের মুখে কথা ফুট্‌ল না। শেষে ভাঙা ভাঙা গলায় রেধো বেদোকে বললে, "তোর ময়না মরেছে।"

বেদো রেধোকে বললে, "তোর ময়না মরেছে।"

তারপর তারা একেবারে ভেঙে পড়্‌ল। এ ওর গলা জড়িয়ে ধরে' কেঁদে বল্‌লে, "ওরে, আমাদের ময়না মরেছে!"

ফণিভূষণ গুপ্ত

'সহসা চলতি পথে যে কুসুম পড়ল ঝরে'

শ্রীপাপিয়া বসু

ভোরের আলো তখনও পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে নাই। পশ্চিমে ঢলে পড়া চাঁদ বেদন বিদায়ের পূর্ব্বে ম্লান জ্যোৎস্না ছড়াইয়া দিয়াছিল পৃথিবীর বুকে।

সারারাত মাতামাতি করিয়া কতক্ষণ আগে মাতালের দল চলিয়া গিয়াছে। বাসন্তীর বিনিদ্র চোখ দু'টিও শ্রান্তির অবসাদে ঢলিয়া পড়িয়াছে শয্যার উপর। পূবের খোলা জানালা দিয়া ভোরের বাতাস বাসন্তীর চূর্ণ কুন্তলগুলিকে এদিক ওদিক দোলাইতেছিল। বাসন্তী সুন্দরী। বয়স তাহার পঁচিশ-ছাব্বিশ; রং অনিন্দ্যসুন্দর না হইলেও, সুন্দরই বটে। অধিকন্তু, তাহার চোখের চোরা চাহনি ও পাতলা ঠোঁট দুইটির মৃদু মধুর হাসি দর্শকের মনে একটা মোহ জাগাইয়া দেয়, হইয়াও ছিল তাহাই। সে ছিল ভদ্রঘরের মেয়ে, উপযুক্ত বয়সে বিবাহও হইয়াছিল।

বাসন্তীর স্বামীর ছিল এক কবি-বন্ধু। সর্ব্বদাই তাহাদের বাসায় আসিয়া কবি-বন্ধুটি গরম গরম ফুল্‌কো লুচি আর তার সাথে গাল-গল্প করিত। কত কবিতার ছড়াছড়ি, গড়াগড়ি!

* * *

সেদিন দুপুরে টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। কোন কাজ না থাকায় নিঃসঙ্গ বাসন্তীর সময় যেন আর কাটিতেছিল না। এমন সময় হঠাৎ কবি আসিয়া উপস্থিত। স্বামী তখন ছিল অফিসে। তাঁহাকে দেখিয়া বাসন্তী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; যেন একান্তে সে তাহাকেই কামনা করিতেছিল এতক্ষণ। কবি হাসিল। বলিল,—নিতান্ত অসময়েই এসেছি, না? কিন্তু কি করি বলুন, না এলে হয় ত আবার অনুযোগ দিতেন; কারণ, আজই আমাকে বিশেষ কাজে অন্যত্র যেতে হচ্ছে। এখন না এলে, আর আসাই হোত না।

বাসন্তী উত্তর দিল,—না না, বাস্তবিক আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি নে, কিন্তু সত্যি বলছি, এ সঙ্গহীন বাদলা দুপুরে, আমি শুধু আপনার কথাই ভাবছিলাম। যাক্, বাঁচা গেল! সময়টা বেশ কেটে যাবে এখন।

কথা শুনিয়া কবির মনটা হঠাৎ 'খট্' করিয়া উঠিল। নির্নিমেষ নয়নে সে চাহিয়া রহিল বাসন্তীর পানে। বাসন্তীও কিন্তু চক্ষু সরাইয়া লইল না। উপরন্তু একটু মিষ্ট হাসিয়া বলিল,—বেশ যা' হোক্! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন এখানে। একটা কটাক্ষ হানিয়া বাসন্তী আগাইয়া আসিল।

অপূর্ব্ব সুখে কবি নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া সে ধীরে বাসন্তীর একখানা হাত টানিয়া লইয়া ডাকিল,—বাসন্তি! ··

চোখে চোখ রাখিয়া বাসন্তী উত্তর দিল,—কেন?

আবেগ উচ্ছ্বাসহীন শান্তস্বরে কবি বলিল,—এ সত্যি? এতদিন যা' ভেবেছি, তা' মিথ্যে নয়? তা' হ'লে এতদিন শুধু আমি স্বপ্ন দেখি নি?

উত্তর হইল,—না।

* * *

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে; কবিও সরিয়া পড়িয়াছে। পিপাসা মিটিয়া গেলে, কে আর কবে সরসীর তীরে অপেক্ষা করে? তৃষ্ণার্ত্তের তখন আর তটিনীর নির্ম্মল জল চোখে পড়ে না; দৃষ্টি চলিয়া যায় নীচের দিকে—পাঁকের উপর।

সম্বলহীনা, আশ্রয়হীনা নারী চারিদিকটা একবার চাহিয়া দেখিল। কিন্তু দৃষ্টিতে কিছুই পড়িল না—সমস্ত কুয়াসাচ্ছন্ন। সেই কুয়াসা ভেদ করিয়া যে অস্পষ্ট একটি পথের রেখা দেখিতে পাইল, হতভাগিনী সেই পথেই পা

বাড়াইয়া দিল। তাহার আরেকটি পথও রমণীয়, ছিল— সে মৃত্যু! কিন্তু হায়, সে যে ইহা কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই! করিলেও পারিত কি না কে জানে! সুতরাং সে অভিযান সুরু করিল সেই পথে, যাহা তাহার কাছে একমাত্র সরল এবং সহজ।

* * * *

আটবছর পরের কাহিনী।

সেদিনও সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়া ভোরের দিকে বাসন্তী ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীরটাকে বিছানার উপর নিক্ষেপ করিয়া নিদ্রার কোলে চেতনা হারাইল। আটটা বাজিয়া গেল, তবু তাহার ঘুম ভাঙিল না।

ঝি আসিয়া ডাকিল,—বেলা যে অনেক হ'য়ে গেল; উঠ্‌বে কখন দিদিমণি?

নিদ্রালস চোখ দুইটি ধীরে ধীরে উন্মীলিত করিয়া বাসন্তী বলিল,—উঠ্‌ছি; তুই স্নানের ঘরে জল দি' গে যা'।

—এখনো কি বাকী আছে, কখন দিয়ে রেখেছি যে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মিনিট পনের পর বাসন্তী শয্যাত্যাগ করিয়া কাপড়, সাবান, গামছা লইয়া স্নানের ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেই গোটা দুই শালিকের পাখা ঝাপ্‌টান ও চীৎকারে চক্ষু তুলিয়া সহসা আর তাহা নামাইয়া লইতে পারিল না।

ব্যাপারটা সামান্য—কিন্তু ক্ষুদ্র ঘটনার সূত্র ধরিয়া মানুষ যে কত বৃহৎ জিনিষের সন্ধান পায়, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! না হইলে বাসন্তীর মত মেয়েমানুষ দেহের বিনিময়ে যে অন্নের সংস্থান করে, সেও এতটা অভিভূত হইয়া পড়িল কি করিয়া।

বারান্দার ঠিক্ নীচেই একটি করমচা গাছের ঝোপ। তাহারই ভিতর একটি স্ত্রী শালিক বাসা বাঁধিয়া গুটি দুই-তিন ডিম প্রসব করিয়াছে। ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু তাহারা এখনো নিতান্ত অপোগণ্ড, চক্ষুও ফোটে নাই। ক্ষুধার সময় গাছটির অদূরে যেখানে বাসার ভুক্তাবশিষ্ট জঞ্জাল জড় করা হয়, সেখানে চঞ্চল পাখীটী তাহার খাদ্য-সংগ্রহ করে। একবারে খাওয়ার ধৈর্য্য থাকে না; একবার উড়িয়া আসে, আবার পরক্ষণেই নীচে চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ বাসাটীর তদারক করে, ছানাগুলিকে একটু আদরও করে, আবার বাহির হয় খাদ্য-সংগ্রহের জন্য। ইহার চঞ্চলতার সীমা নাই। এমনি যে পাখীটা কতবার আসে কতবার যায়, তাহারও ইয়ত্তা নাই। বস্তুতঃ, নির্জ্জন শাখায় ইহার ছোট্ট এই সংসার লইয়া শালিকটি বেশ দিন গুজরান করিতেছিল। কিন্তু দৈবাৎ সেদিন প্রভাতে কোথা হইতে একটি পুরুষ শালিক আসিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিল। পুরুষ, শালিকটীর বাসা ভাঙিয়া ছানাগুলিকে বিনষ্ট করিবার কি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা! আর তিনটি সন্তানের পক্ষী-মাতার ইহাদিগকে রক্ষা করিবার সে কি প্রাণান্ত চেষ্টা!

বাসন্তী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, নির্ব্বোধ সরল স্বামীকে আর সেই কবিকে। আরও অনেক কিছুই তাহার মনে হইতে লাগিল। সে স্বপ্নেও যে চিন্তা কখনও কল্পনায় স্থান দেয় নাই, তাহার মত স্ত্রীলোকের যাহা চিন্তা করিবার কোন সঙ্গত কারণই নাই, আজ ঠিক্ এই মুহূর্ত্তে সে জিনিষটাই তাহার সুপ্ত নারীচিত্তের এককোণে ধীরে ধীরে চোখ মেলিল।

শীতকালের শান্ত নদীর জলের মতই বাসন্তীর চোখ দুইটি টলটল করিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইল না; বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

* * * *

ইহার পর মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব ঘটনার সবটুকুই হয় ত তাহার বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকায় আড়াল পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার যে একটি ছাপ বাসন্তীর বুকে আঁকা পড়িয়াছে, তাহা সে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাই বাহিরে যদিও সে নারীত্বের কঙ্কালটুকুই শুধু বহন করিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু ভিতরের নারীত্ব জাগিয়া উঠিয়াছিল অনেকখানিই!

সেদিন ভোরের দিকে বাসন্তী স্নান সারিয়া আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ

রাস্তার উপর একটা হৈচৈ গণ্ডগোল শোনা গেল। এক মুহূর্ত্ত আর অপেক্ষা না করিয়া সে দ্রুতপাদবিক্ষেপে রাস্তার উপর আসিয়া দেখিল, নিকটেই কতকগুলি লোক জড় হইয়াছে। কে একজন ব্যস্ত হইয়া বলিতেছে,—জল আন, জল! বাতাস কর!

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, চোদ্দ-পনের বৎসরের একটি ছেলে রাস্তার উপরেই হতচেতন হইয়া পড়িয়া আছে—তাহার কপাল ফাটিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত পড়িতেছে। বাসন্তী আর এক পদ অগ্রসর হইয়া, যে লোকটি ছেলেটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ক্ষত পরীক্ষা করিতেছিল, তাঁহাকে বলিল,—দেখুন।

লোকটি তাহার পানে চাহিলে আবার বলিল,—ওই ত আমার ঘর, দয়া করে' ওকে নিয়ে চলুন না কেন। ওখানে কিছুরই অসুবিধে হবে না। তাহার স্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল।

লোকটি উৎসাহিত হইয়া বলিল,—বেশ ত, চলুন না আপনি পথ দেখিয়ে, নিয়ে যাই একে আপনার বাসায়। ধরাধরি করিয়া ছেলেটিকে আনিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইল খাটের উপর।

বেলা বারটা বাজিয়া গিয়াছে, ছেলেটির জ্ঞান তখনো ফিরিয়া আসে নাই। ডাক্তার আসিয়া 'বেণ্ডেজ' বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছে; ঔষধ শুধু 'আইস্‌ব্যাগ'।

বাসন্তী সেই যে বালকটির পাশে বসিয়া শুশ্রূষায় রত হইয়াছে, আর ওঠে নাই। ঝি বার-দুই খাওয়ার জন্য তাগাদা দিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে খায় নাই। অবশেষে ঝি ভাত ঢাকা দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ছেলেটির পানে চাহিয়া চাহিয়া বাসন্তীর নারী-হৃদয়ে সেই চিরন্তনী সন্তান-ক্ষুধা জাগিয়া উঠিল।

হায় নারী! তাহার ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা কথাই শুধু মনে হইতে লাগিল যে, এতবড়টি না হোক, একটি ছোট শিশু ত অন্ততঃ সে পাইতে পারিত! তার সেই স্ফুরিত অধরে 'মা মা' ডাক, খিল্‌খিল্ মধুর হাসি, ক্ষুধায় বুকের রক্ত নিংড়াইয়া খাওয়ান, বুকে জড়াইয়া দোল দিতে দিতে ক্রন্দন থামাইবার প্রয়াস, ঘুমাইয়া পড়া শিশুর কপালে কাজলের ছোট একটি টিপ আঁকিয়া সদ্যফোটা গোলাপের মত সুন্দর সেই মুখখানিতে আশীর্ব্বাদের নির্ম্মাল্যের মত একটি প্রাণঢালা চুম্বন...বাসন্তী শিহরিয়া উঠিল। মাথা ঘুরিয়া গেল, আর ভাবিতে পারিল না। ব্যথায় কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল ছেলেটির মাথায় আর কপালে।

ব্যবহৃত বরফ ফেলিয়া নূতন বরফ ব্যাগে পুরিয়া ছেলেটির মাথায় চাপিয়া ধরিয়াছে, হঠাৎ ছেলেটি ডাকিয়া উঠিল,—মা গো, মা!

বাসন্তী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,—কি চাই বল?

—বড় তেষ্টা!

এই যে দিচ্ছি। ধীরে ধীরে সাবধানে বাসন্তী তাহাকে জলপান করাইল।

জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইলে, সে আস্তে আস্তে চক্ষু মেলিয়া ঘরের চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। তারপর দৃষ্টি পড়িল বাসন্তীর উপর। তাহার আর বিস্ময়ের অন্ত নাই। সে কোথায়, কি হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। ক্লান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—আমি কোথায়? আমার কি হইয়াছে? আপনি কে?

স্নেহের স্বরে বাসন্তী বলিল,—ভয় নেই, এ আমারই বাসা। রাস্তায় পড়ে' গিয়ে কপালে একটু আঘাত পেয়েছিলে, তাই তোমাকে এখানে তুলে এনেছি। ক্ষণেক থামিয়া পুনরায় বলিল,—চুপ ক র' শুয়ে থাক; নড়াচড়া করো না। একটু দুধ গরম নিয়ে এখনি আবার আস্‌ছি। বলিয়া চলিয়া গেল।

গরম দুধপান করিয়া ছেলেটি আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

বৈকালের দিকে বাসন্তী ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ছেলেটি কখন উঠিয়া বালিশে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। বলিল,—বাঃ, এই যে সুন্দর উঠে বসেছ! ব্যথা এখন কেমন?

—অনেক কম, কালকে হয় ত আর থাক্‌বেই না। ক্ষণেক থামিয়া পুনরায় বলিল,—কিন্তু বিছানার ওপর

এভাবে আর থাকা যায় না যে! আমাকে ধরে' বারান্দার ওই ইজিচয়ারটায় শুইয়ে দিন না।

—বেশ ত, চল। বলিয়া বাসন্তী সাবধানে তাহাকে আনিয়া ইজিচেয়ারটার উপর শোয়াইয়া দিল এবং নিজেও একটি চৌকী টানিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া বলিল,—আচ্ছা, তোমাকে কি বলে' ডাকব খোকা?

—আমার নাম শ্রীমাণিকলাল সোম। মা আমায় মণি বলে' ডাক্‌ত।

—ডাক্‌ত! তার মানে? এখন বুঝি আর ডাকে না, দুষ্টু! হাসিয়া বাসন্তী মণির চিবুক নাড়িয়া দিল।

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার পানে চাহিয়া সে ব্যথিত হইয়া উঠিল। মণি ছলছল চোখ দুইটি তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—আমার কেউ নেই! শুনেছি, আমার এক বৎসর বয়সের সময় বাবা মারা গেছেন। তাঁকে আমার মনেও পড়ে না। বছর দুই হ'ল মাও চলে' গেছেন। সংসারে আপনার বল্‌তে আমার আর কেউ নেই!...এ কি আপনি কাঁদ্‌ছেন?

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া বাসন্তী ধরাগলায় বলিল,—না, কই কাঁদি নি ত!

মণি বলিল,—আপনি কাঁদ্‌লেন, আমিও অনেক কেঁদেছি, কিন্তু আর কান্না আসে না। চোদ্দ পেরিয়ে পনেরয় পড়েছি বটে, কিন্তু এরি মাঝে এত দুঃখ পেয়েছি যে, এতে করে' আর আমায় কাঁদাতে পারে না—বরং মাঝে মাঝে অভিসম্পাতের মত অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে!

শুনিতে শুনিতে বাসন্তীর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বাসন্তী ডাকিল,—মাণিক!...

কি? ...

তুমি কি করে' খেতে?

ভিক্ষে করে'। যেদিন জুট্‌ত, সেদিন খেতাম, যেদিন না জুট্‌ত, সেদিন উপোস! তা' ছাড়া, আর ত উপায় ছিল না।

মাণিক চুপ করিল। সমস্তটা গৃহ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বসন্তী বলিল,—আচ্ছা মাণিক, তোমার ত আর কেউ নেই, খেতে পর্‌তে পার, এমন অবস্থাও তোমার নয়। কেমন, না?

—হ্যাঁ!

—তা' হ'লে এক কাজ কর না কেন তুমি?

—কি কাজ?

—তুমি... ...

—কি আমি?

—তা' তুমি...তুমি...আচ্ছা মাণিক, এই যে তুমি রাস্তায় পড়ে' আঘাত পেলে, ধর, আমি না হ'য়ে যদি অন্য কেউ তোমাকে যত্ন-আত্তি করে', শুশ্রূষা করে' সুস্থ করে' তুল্‌ত, তা' হ'লে কি দু'-একটি কথা তার তুমি শুন্‌তে না?

—শুন্‌তুম বই কি।

—তবে আমার কথাই বা তুমি শুন্‌বে না কেন?

মাণিক হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—বেশ যা' হোক! আমি না কর্‌লুম কখন?

—তা' হ'লে শুন্‌বে?

—বলেই দেখুন না কেন?

—আচ্ছা, বেশ। তুমি আজ হ'তে তা' হ'লে আমার এখানেই থাক্‌বে। আমাকে তোমার মা বলে' জান্‌বে, কেমন?

অসহ্য দারিদ্র্যও যাহাকে অনেক সময় বিচলিত করিতে পারে নাই, সামান্য এই একটি কথাই আজ তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। বড় বড় কতগুলি জলের ফোঁটা তাহার গালের উপর আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। উভয়েই স্তব্ধ। সময় যে তাহাদের কোন্ চিন্তার ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল, সেদিকে তাহাদের খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ একসময় বাসন্তী সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল মাণিকের সাড়া পাইয়া। মাণিক ডাকিল,—মা!

মা! স্তব্ধ নির্ব্বাক্ বাসন্তী অপলক নয়নে চাহিয়া রহিল। পরক্ষণেই প্রাণের গভীর স্নেহে মাণিককে টানিয়া লইল বুকের উপর। উচ্ছ্বসিত হইয়া ডাকিয়া উঠিল,—মাণিক! মণি!...

আজ তাহার চোখের এতদিনের কঠিন বাঁধন একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে।

* * *

দুই-তিনদিন পরের কথা।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মাণিক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে অনেকক্ষণ। কিন্তু বাসন্তী এখনো জাগিয়া বসিয়া আছে তাহার পাশে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে যেন কাহারও প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। আরও মিনিট পনের এমনি নিঃশব্দেই কাটিয়া গেল।

বাহিরে কড়া নড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনের মিলিত কণ্ঠের স্খলিত, অর্থহীন, এবং অশ্রাব্য কোলাহল ভিতরে ভাসিয়া আসিল। বাসন্তী প্রস্তত হইয়াছিল, উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বলিল,—এস, আমি তোমাদের জন্যেই রাত জেগে বসে' আছি।

শ্যামবাবু বিকৃত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—কেন সখি, কালই ত পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি। আবার আজই?

ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে নিধুবাবু বলিলেন,—কি যে বল শ্যাম, তুমি ভারী বেরসিক! ও কি তাই চাইছে! আর টাকার যদি অতই দরদ, তবে···

সর্ব্বপিছনে যদুবাবু টলিতে টলিতে আসিতেছিলেন। বলিলেন,—মহাভারত, মহাভারত! তোমরা ত সখীর কথাই বুঝ্‌লে না। তারপর বিকৃত সুর করিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

পিয়ার লাগিয়া জানেলার ধারে,
বসে থাকে বঁধু আলো ও আঁধারে।

আমরা মদে মাতাল, আর এ সুরেই সখীর মন মাতাল। তিনজনেই হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বাসন্তী একটি কথায়ও যোগ দিল না। তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যে যাহার এক-একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বাসন্তী বসিতেছিল বিছনার উপর। যদুবাবু একবার এদিক, একবার ওদিক নড়িয়া-চড়িয়া বলিয়া উঠিল,—না, না সখী, এখানে নয়, একেবারে ওখানে গিয়েই বসো। বলিয়া হারমোনিয়ামটা দেখাইয়া দিলেন।

বাসন্তী বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিল। কিন্তু গান গাহিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

শ্যামবাবু বলিলেন,—কি গো বন্ধু, ব্যাপার কি? আজ কি হয়েছে বলো ত? এত গম্ভীর কেন?

যদুবাবু কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বাসন্তীকে কথা বলিতে শুনিয়া থামিয়া গেলেন। বাসন্তী বলিল,—ব্যাপার? না, তেমন বিশেষ কিছু নয়। একটু থামিয়া আবার বলিল,—দেখ, তোমাদের আগেও বলেছি অনেকবার, অবিশ্যি তেমন জোর দিয়ে কিছু বলি নি, তোমরাও তাই আমলে আন নি কিছু।

একরকম চীৎকার করিয়াই তিনজনে বলিয়া উঠিল,—কি, কি, কথা?

—রোস বল্‌ছি। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া বাসন্তী বাহির হইয়া গেল।

মাণিক তখন নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছিল। চিন্তা-লেশহীন সেই মুখে কি যে ছিল, তাহা বাসন্তীই বলিতে পারে। কিন্তু সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন স্পষ্টই বুঝা গেল, সে সেই মুখ হইতে অনেকখানি শক্তি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

ঘরে আসিয়া একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল,—দেখো, এসব আর আমার ভাল লাগে না। শুধু ভাল না লাগাই নয়, এ আমার এখন একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। তোমরা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছ, সে আমি অস্বীকার করি নে। কিন্তু আমিও, আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তার প্রতিদান দিতে ক্রটি করি নি। তোমরা যা' চেয়েছ, তাই দিয়েছি আমি। কিন্তু আর তোমরা আমার এখানে এস না।

শ্যামবাবু কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, বাসন্তী তাহাকে হাতের ইঙ্গিতে থামাইয়া দিয়া পুনরায় বলিল,—তোমরা সকলেই ভদ্রসন্তান। ফটকের বাহিরে থেকে বিদায় দিয়ে, তোমাদের মর্য্যাদার হানি করতে আমার বাধে, আর আমি সেটা চাইও নে। কিন্তু তোমরা আর এস না এই অনুরোধ। যদি আস, তা' হ'লে হয় ত

বাধ্য হ'য়ে আমাকে তাই কর্‌তে হবে। কিন্তু সে রকম অপ্রিয় কিছু ঘটে, সে আমি ইচ্ছে করি নে।

অন্তর্নিহিত সত্য অস্বাভাবিক একটা তেজ লইয়া যখন বাহির হয়, তখন তাহাকে অবহেলা করিয়া উপেক্ষা করিবার মত ক্ষমতা কাহারো থাকে না। হোক্ না কেন সে যত বড়ই শক্তিমান। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে নুইয়া পড়ে।

বাসন্তীর মুখে একথা তাঁহারা আরও অনেকবার শুনিয়াছেন কিন্তু এবারের মত রূঢ় সত্য বলিয়া একবারও মনে হয় নাই। তাহারা বিভ্রান্তের মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিধুবাবু বলিলেন,—কারণটাও কি আমরা জান্‌তে পারি নে ?

—না।

—কেন ?

নিষ্প্রয়োজন বলে'।

আবার সব নিঃস্তব্ধ! কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেলে পর একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—যাবে না কি হে তোমরা, নেবে চল।

—হ্যাঁ, চল। বলিয়া সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘাড় ফিরাইয়া শ্যামবাবু একটুখানি ম্লান হাসিয়া বলিলেন,—তবে আসি সখি বিদায়, বিদায়!

বাসন্তী চমকিয়া উঠিল। কথাগুলি তাহার অন্তরে সহসা কাতর আর্ত্তনাদের মতই আঘাত করিল। শ্যামবাবু বন্ধুদ্বয়সহ তখন কিছুদূর আগাইয়া গিয়াছেন। কতদিনের পুরাতন সাথী। একটা মায়াও জন্মিয়া গিয়াছে। মমতাময়ী নারী চিত্তের কঠিন সংযমের বাঁধ এতক্ষণে ভাঙিয়া পড়িল। না, না, এমন করিয়া...বাসন্তী তাঁহাদিগকে আবার ডাকিয়া ফিরাইল। বসাইয়া বলিল,—আজ বিদায়ের দিনে তোমাদের এত বিষণ্ণ-মনে আমি যেতে দিতে পারি নে। দুটো গান শুনে যাও।

তাহারা আপত্তি করিল না। গান চলিল।

একে একে কয়েকটি গানই হইয়া গেল। শ্রোতাদের মুখে পূর্ব্বের সেই বিষণ্ণ-ভাব কাটিয়া গিয়াছে, পরিবর্ত্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে আনন্দের রেখা! বাসন্তীরও কঠিন মুখের উপর কখন যে আবার স্নিগ্ধতা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা সে নিজেও টের পায় নাই। গানটি শেষ হইতেই যদুবাবু ঘাড় দোলাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—আর একটি।

বাসন্তীও হাসিয়া উত্তর দিল,—আচ্ছা।

গানের দ্বিতীয় চরণ শেষ করিয়া অন্তরায় উঠিয়াছে, এমন সময় একটা মানব ছায়া হারমোনিয়ামের কতকটা স্থান অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

চমকিয়া মুখ তুলিতেই বাসন্তীর চোখে পড়িল, দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া মাণিক!

মুহূর্ত্তে গান থামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, একটা অসহ্য গুমোট!

একটু পরে সাম্‌লাইয়া লইয়া বাসন্তী বলিল,—কিরে মাণিক, তুই যে এখানে? ঘুম ভেঙে গেল ?

উত্তরে মাণিক প্রশ্ন করিল,—এরা কারা, এদের ত দেখি নি, তোমার কে হয় মা ?

তাই ত! বাসন্তী কি উত্তর দিবে! ছেলের নিকট কি পরিচয় দিবে ইহাদের? কিছুতেই বলিতে পারিল না—শুধু হতবুদ্ধির মত মাণিকের পানে চাহিয়া রহিল!...

—কে হয় মা, বল না ?

কি উত্তর দিবে! একে একে চু'য়ে চু'য়ে মুক্তাধারা বাসন্তীর গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মাণিক কয়েক পদ পিছাইয়া গেল। সে নিতান্ত ছোটটি নয়। অদম্য একটা নিশ্বাস ভিতরের দিকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া অস্ফুটস্বরে মাণিক বলিল, তুমি এই! মুহূর্ত্তমাত্র মৌন থাকিয়া পুনরায় বলিল,—আচ্ছা, চল্‌লুম!

বাসন্তী কথা বলিতে পারিল না। মাণিক দৃঢ়পদক্ষেপে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাসন্তীও পাগলের মত ছুটিয়া পথে আসিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল,—মাণিক! কোথায় যাচ্ছ?

—ঠিক নেই।...

—মানে?...

গাঢ়স্বরে মাণিক বলিল,—মানে অতি সোজা। যাবার মত জায়গা যখন কোথাও নেই, তখন কোথায় যে যাব, তারও কোনও ঠিকানা নেই। বলিয়া সে চলিতে সুরু করিল।

—মাণিক! ..

মাণিক ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—আজকের রাতটাও কি থেকে যেতে পার না?

—না! দৃঢ়স্বরে মাণিক উত্তর দিল।

বাসন্তী বুঝিল, তাহাকে রাখা আর অসম্ভব। একটু থামিয়া অশ্রুবিকৃত-কণ্ঠে বলিল,—পাপ করলে কি তার প্রায়শ্চিত্ত নেই? তা' ছাড়া, এমন করে' যে তোমায় বাঁচিয়ে তুললে, তার প্রতি কি একটুও মমতা দেখাতে নেই?

—তোমার সেবার স্মৃতি আমি চিরদিন সশ্রদ্ধ হৃদয়ে পূজা করব। কিন্তু তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে আজ আমি অক্ষম। যদি কোনদিন এর উত্তর পাই, তবেই আবার ফিরে আসব—শুধু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে নয়, সন্তানের দাবী'তে। না হ'লে, এই শেষ! বলিয়া মাণিক পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাসন্তী ছিন্নমূল তরুর মত হতচেতন হইয়া ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িল।

হায়রে, তবুও ত সে পতিতা!

পাপিয়া বসু

বীমার ভূত

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

এক

চড় কিল চালাইল

"জীবন-বীমা করতেই হবে, অন্ততঃ হাজার পাঁচেকের। মেয়াদী বীমা—পঁচিশ বছর পরে একসঙ্গে অনেক টাকা পাওয়া যাবে।" এই বলিয়া ফটিকচাঁদ চুরুট ধরাইল।

"আমিও করব তা হ'লে, আমি পারি না নাকি? বাবা যে বাড়ীখানা আমায় দিয়েছেন, তার ভাড়াতেই করব।" স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী একখিলি পান খাইল।

"বেশ, বেশ, বুড়োবয়সে টাকা পাব এত—মজা করব কত। ধা, ধা, ধা,—ধিনিকিটি তিনিকিটি তা। মনের আনন্দে কর্ত্তা টেবিল ঠুকিতে লাগিল।

"পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার—তুমি পাঁচ, আমি পাঁচ! ডিয়ার, ডিয়ার—ফ্যাটিক। নি নি, ধা, ধা, পা, পা, মা, মা। স্ত্রী হারমোনিয়ম লইয়া বসিল।

চক্ষু লাল করিয়া কর্ত্তা বলিল, "ফের ওই কথা, আমি ফ্যাটিক—ফ্যাটি! মোটা হয়েছি বলে নজর দেওয়া—ড্যাম, ন্যাষ্টি।"

"কি আমায় ন্যাষ্টি বলা! আমি নিস্তারিণী দেবী, ম্যাডাম না বলে' ড্যাম বলা—ন্যাষ্টি বলা। তবে রে অনামুখো-গজাবতার।" স্ত্রী রাগিয়া হারমোনিয়মের উপরের কাঠ ছুঁড়িয়া স্বামীকে মারিল।

কর্ত্তা আসিয়া 'ধাঁই, ধাঁই ধিনিকিটি ধাঁই' করিয়া স্ত্রীর পিঠে চড় কিল চালাইল।

*　　*　　*

বীমা কোম্পানীর দুই জন এজেন্ট মরিয়া ভূত হইয়াছিল—মাসের শেষ শনিবারের বারবেলায়। তাহারাই স্বামী স্ত্রীর কাঁধে চাপিয়াছিল। পরস্পরের দিকে চাহিয়া তাহারা এখন দাঁত মেলিয়া হাসিল—জিব বাহির করিয়া ভেংচি কাটিল।

দুই

বিড়াল পলাইল।

সন্ধ্যার সময় কর্ত্তা গিন্নীর রাগ পড়িয়াছে। কর্ত্তা লুচি পটলভাজা খাইয়াছে—কারণ, গিন্নী একখানি বেনারসী শাড়ী পাইয়াছে। এইখানি সেদিনেরই কেনা।

বড়ই আনন্দে সময় কাটিয়া গেল এবং যাইতও নিশ্চয়, কিন্তু—

রাত্রে কর্ত্তা স্বপ্ন দেখিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রী বীমার টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। মোটর কিনিয়াছে, বাগান-বাড়ী করিয়াছে, বিধবার পুনর্বিবাহের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছে, সুন্দর সুন্দর যুবকদের লইয়া থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিতেছে।

স্ত্রী স্বপ্ন দেখিল, স্বামী বিষ খাওয়াইয়া তাহাকে মারিয়া বীমার টাকায় বাবুয়ানী করিতেছে, মোটর রাখিয়াছে, বাড়ী কিনিয়াছে, বিবাহ করিয়াছে—নবীনাকে লইয়া মোটরে চড়িয়া হাওয়া খাইতেছে।

কর্ত্তা হঠাৎ চীৎকার করিয়া জাগিয়া, "তবে রে 'ন্যাষ্টি', আমি মরেছি মনে করেছিস্, না?" বলিয়া বালিস লইয়া স্ত্রীর পিঠে 'ধপ্ ধপাং ধ্বাঁদ' বসাইয়া দিল।

ভড়বড় করিয়া উঠিয়া "তবে রে ফ্যাটা, আমায় বিষ খাওয়াবে!" বলিয়া স্ত্রী ঠাস্‌ঠাস্ করিয়া স্বামীর গাল দু'টি গরম করিয়া দিল।

ঘরে একটা বিড়াল আসিয়াছিল। প্রাণের ভয়ে সে বেচারা খাটের নীচে লুকাইয়া 'হরিনাম' করিতে লাগিল।

"ড্যাম, ফুল, ব্লডি, স্কাউণ্ড্রেল।"

"মুখপোড়া, অনামুখো, খুনী, বাউণ্ডেল।"

"হাঁড়িখাকী, মাঠ-কপালী, উঠোনচোকী।"

"গাধা, গরু, মোষ, শকুন পাখী।"

"রাখ কবিতা, মারব জুতা, দেখবি পাজি।"

"হাড়হাবাতে, পাস্ না খেতে, বদমেজাজী।"

"রে, রে, রে, রে" বীর স্বামী খাট্ হইতে নামিয়া জুতা খুঁজিতে গিয়া খাটের নীচে বিড়াল দেখিয়া "চো, চো" করিয়া অজ্ঞান হইল।

"রী, রী, রী, রী" করিয়া স্বাধ্বী স্ত্রী ঝাঁটা আনিতে গিয়া বিড়াল দেখিয়া "চো, চো" করিয়া অজ্ঞান হইল।

বীমার এজেণ্ট ভূতেরা আনন্দে ঘরময় ডিগবাজী খাইতে লাগিল। বিড়ালের লেজ ধরিয়া টানিল—বিড়াল পলাইল।

তিন

ক্যাওড়াতলার ডাক্তার

স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন হইয়াছিল। কিন্তু—

স্ত্রীর একদিন জ্বর হইল। স্বামী ভুলক্রমে সেইদিনই ডাক্তার ডাকিল।

স্ত্রী বলিল, "ডাক্তার কেন? আমি মরব আর তুমি বীমার টাকা নেবে মনে করেছ? ডাক্তারকে দিয়ে বিষ খাইয়ে পাঁচ হাজার লুটবে—আব্দার!

ডাক্তার বলিল, "আপনার স্ত্রী কি এই রকমই প্রলাপ বকেন ফটিকবাবু?"

"তবে রে অনামুখো মিন্সে, ক্যাওড়াতলার ডাক্তার! আমি বক্ছি প্রলাপ, আর উনি দেবেন জোলাপ। বেরো বাড়ী থেকে—বেরো, বেরো।"

গিন্নী তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া একটা ছড়ি লইয়া ডাক্তারের পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিল। ডাক্তার বেচারা বেগতিক দেখিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কর্ত্তা হাঁফাইতে হাঁফাইতে পলাতককে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম দেখ্লেন?"

ডাক্তার বলিল, "মাথায় রক্ত উঠেছে, অবস্থা সঙ্গীন! অন্য ডাক্তার দেখান।"

ঝাঁটা হাতে সঙ্গীন রোগী সেখানে তখন রঙ্গিন মূর্ত্তিতে হাজির। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া ডাক্তার পলাইয়া বাঁচিল—আবার ফি!

রোগী বলিল, "ভেবেছ কি বল ত—মুখপোড়াকে এনেছিলে কেন?"

কর্ত্তা আমতাআমতা করিয়া বলিল, "তোমার অসুখ কি না, তাই—তাই।"

"তাই, তাই, তাই—মামার বাড়ী যাই। বড় আস্পর্দ্ধা দেখ্ছি তোমার! আমার অসুখ আর ডাক্তার ডাক্বে তুমি? কেন, আমি কি মরেছি? খবরদার!"

চার

ভাতেভাত—কালিয়া-পোলাও

স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য হইয়াছে। কর্ত্তা 'ইক্‌মিক্' কিনিয়া স্বহস্তে ভাতেভাত রাঁধিয়া খায়, স্ত্রী উনান ধরাইয়া মাছভাজা, লুচি-তরকারী, কালিয়া-পোলাও রাঁধে ও মনের আনন্দে ভোগ লাগায়। কর্ত্তা ঘুমায় বৈঠকখানায়, গিন্নী শয়ন করে উপরে। কর্ত্তা রাত্রে কবিতা লেখে, গিন্নী নাটক রচনা করে। গুমরিয়া মরে দু'জনেই।

বৈঠকখানায় কর্ত্তা বন্ধুর সঙ্গে বীমা-সংক্রান্ত আলাপ করে, গিন্নী আড়ালে তা' শুনিয়া রাখে। গিন্নী লেডী ক্যান্‌ভাসার আনাইয়া বীমার কথা পাড়ে, কর্ত্তা গোপনে তাহা শুনিয়া লয়। কর্ত্তার নামে বীমা কোম্পানী হইতে চিঠি আসে, গিন্নি তাহা পুড়াইয়া দেয়। গিন্নীর নামে বীমা কোম্পানীর চিঠি-পত্রাদি কর্ত্তা ছিঁড়িয়া ফেলে।

ধরা পড়িয়া একদিন কর্ত্তা বলিল, "তুমি আমার চিঠি পড়ো কেন?"

গিন্নি বলিল, "বেশ করি—তুমি পড় না?"

"আমার অধিকার আছে পড়ি—তুমি পড়্‌বার কে?"

"বটে! যতবড় মুখ নয়, ততবড় কথা! কি বল্‌ব তুমি গুরুজন, নইলে ঝেঁটিয়ে—" রাগে গস্‌গস্ করিয়া সেইদিনই গিন্নী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কর্ত্তা মনের দুঃখে সেইদিনই কলেজ স্কোয়ারে বসিয়া কঠোর সাধনায় চানাচুর চিবাইতে লাগিল।

পাঁচ

লক্ষ্মী আসিল রিক্স চড়িয়া

বাপের বাড়ীতে নিস্তারিণী দেবী বৃদ্ধা মাতার নিকট শুইত। রাত্রে একদিন স্বপ্ন দেখিল, তাহার মৃত্যুর পর বীমার টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য স্বামী বড়ই ব্যস্ত। ক্রোধে কন্যা বৃদ্ধাকে বেদম প্রহার করিল—খাট হইতে ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। বৃদ্ধার চীৎকারে পিতা আসিয়া স্নেহময়ী কন্যার ঘুম ভাঙাইল।

অফিসে ফটিকচাঁদ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া নিস্তারিণী ভ্রমে টেবিলে পদাঘাত করিল। টেবিল উল্‌টাইয়া পড়িল—খাতা-পেন্সিল ছড়াইয়া গেল। ছোট সাহেব নভেল পড়া বন্ধ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হোয়াটস্ ছ্যাট্ মিষ্টার ফ্যাটি ?"

চমকিয়া ফটিকচাঁদ বলিল, "হুজুর স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম যে, আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী বীমার টাকা লইয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছে—বাড়ী কিনিয়াছে।"

হাসিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীমা করেছ ? হাউ মাচ্ ?"

"আজ্ঞে, করি নি—করব ভাব্‌ছি।"

"ইউ ফুল—শীঘ্‌ড়ো বীমা কড়ো। বীমা কড়া জরুড়ী আছে।"

"আজ্ঞে, তা' বটে—বটে।"

নিস্তারিণী লোকমুখে শুনিল, স্বামী দশহাজার টাকা বীমা করিয়াছে। একেবারে দশহাজার ! নাটকীয় ভাষায় সে স্বামীকে পত্র লিখিল।

ফটিকচাঁদ শুনিল, স্ত্রীও দশ হাজার টাকা বীমা করিয়াছে। একেবারে দশহাজার ! নরম সুরে সে স্ত্রীকে কবিতা লিখিল।

পরদিন গৃহলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিল 'রিক্স' চড়িয়া। ভাড়া দিল কর্ত্তা স্বয়ং—অর্থাৎ, লক্ষ্মীর হাত হইতে পয়সা লইয়া।

ছয়

পলাশী-যুদ্ধের শেষ অভিনয়

কর্ত্তা-গিন্নীর বড়ই মনের মিল। কর্ত্তা অফিসে যায়, স্ত্রী সেই অবসরে কাগজ-পত্র সন্ধান করে, বাক্স-প্যাঁটরা হাঁট্‌কায়, বীমার পলিসি খোঁজে।

গিন্নীকে থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া কর্ত্তা সেই সুযোগে বাক্স-প্যাটরা খোঁজে, বীমার পলিসির সন্ধান করে।

কর্ত্তা ভাল জামা-কাপড়, সেমিজ-ব্লাউস কিনিয়া স্ত্রীকে দেয় ; স্ত্রী ভাল ভাল রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়ায়।

বীমার ভূত আড়ালে দাঁত বাহির করিয়া হাসে, মুখ ভ্যাঙ্‌চায়। কর্ত্তা গিন্নীর পিঠে সুড়সুড়ি দেয়।

স্বামী-স্ত্রীর বড়ই মনের মিল—দু'জনে উপরে শুইতেছে। বৈঠকখানা খালি থাকে—রাত্রে খাঁখাঁ করে।

স্বামী-স্ত্রী মনের সুখে ঘুমাইতেছে। ঘরে চোর আসিয়া টাকা-পয়সা লইবার আয়োজন করিতেছিল, হঠাৎ কর্ত্তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। এবার "চো চো" না করিয়া একলাফে চোরকে ধরিয়া ফেলিল, "তবে রে বেটা, দশহাজার টাকা চুরী !"

গিন্নী জাগিয়া, "তবে রে মুখপোড়া, দশহাজার টাকা চুরী কর্‌তে আস !" বলিয়া চোরের পেটের উপরে এক কিল মারিল।

কর্ত্তা মারিতে লাগিল চোরের পিঠে, গিন্নী মারিতে লাগিল তাহার পেটে। পেটে পিঠে গুরুভোজনে চোর আপ্যায়িত হইয়া সুযোগক্রমে পলাইয়া বাঁচিল।

কর্ত্তা, "ভাগ্যে তোমার পলিসিটা নিয়ে যায় নি বেটা।"

গিন্নী, "তোমারটা খুঁজে দেখ, ঠিক্ আছে ত ?"

কর্ত্তা, "আমারটা নেয় কে ?"

গিন্নী, "আমারটাই বা নেয় কে ?"

"কি রকম ?"

"কি রকম ?"

"আমি মরে' গেলে তুমি দশহাজার পাবে ভাব্‌ছ না ?"

"তুমি আর মর্‌ছ কোথায় গো—আমাকেই ত মার্‌বার ফিকির কর্‌ছ।"

"তুমি ত খোদার খাসী—তুমি কি আর মর্‌ছ, না মর্‌তে জান।"

"তুমিও ত যমের ঘরে কাঁটা দিয়ে এসেছ গো—তুমিই বা কোন্ মর্‌ছ।"

"আমি মলে তুমি কচু পাবে, কাঁচকলা পাবে—জীবন-বীমা আমি নেহি কিয়া।"

আমি মলে তুমি ছাই পাবে, পাঁশ পাবে—বীমা ময়ভি নেহি কিয়া।"

"কি রকম?"

"কি রকম?"

কর্ত্তা, "বীমা তুমি কর নি? দশহাজার সব মিথ্যা! তবে, তবে—

গিন্নী, জীবন বীমা তুমি কর নি? দশহাজার সব মিথ্যা! তবে—তবে—"

কর্ত্তা, "তবে রে পাপিয়সী, মহিয়সী, গরিয়সী, মিথ্যাচারে পটিয়সী।"

গিন্নী, "তবে রে ক্রুর, খল, শঠ, জুয়াচোর, নট, চতুর লম্পট।"

কর্ত্তা, "হস্তিনী, ভিস্তিনী, মিস্ত্রীনি—চুপ রও, খবরদার!"

গিন্নী, "ধড়িবাজ, ফন্দীবাজ, খবরদার! তুম্ চুপ রও।"

"তবে রে ন্যাষ্টি।"

"তবে রে ফ্যাটি।"

"রে, রে, রে, রে—রণং দেহি, রণং দেহি।"

"রী, রী, রী, রী—রণং দেহি, রণং দেহি।"

কর্ত্তা লইল পাশবালিস—গিন্নী আনিল বেতের লাঠি। তারপর চলিল—পটাপট, ধপাধপ-ধপাধপ, পটাপট। পলাশীর-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল।

গোলমাল শুনিয়া খানসামা ঘরে আসিয়া সেলাম ঠুকিল। যুদ্ধটা মাঠে, অর্থাৎ ঘরেই মারা গেল। কর্ত্তা মুখগোঁজ করিয়া বসিল চেয়ারে—মুখভার করিয়া গিন্নী শুইল খাটে।

বীমার ভূতেরা ছেঁড়া রুমালে চোখের জল মুছিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

সাত

জল-ঝড় কাটিয়া রৌদ্র ফুটিল

সাঁইত্রিশ মিনিট পরে চেয়ার হইতে উঠিয়া কর্ত্তা বলিল, "প্রিয়তমে নিস্তারিণী, ত্যজমান গরবিনী।"

"প্রিয়তম ফটিকচাঁদ, ক্ষম মম অপরাধ।"

গিন্নী তড়াক্ করিয়া খাট্ হইতে নামিয়া কর্ত্তার পায়ের ওপর পড়িতে গেল।

কর্ত্তা আসিয়া গিন্নীর হাত ধরিল—গিন্নীও কর্ত্তার হাত ধরিল।

কর্ত্তা বলিল, "যেমন তুমি, তেমনি আমি।"

গিন্নী বলিল, "যেমন নারী, তেমনি স্বামী।

কর্ত্তা চুরুট ধরাইল—গিন্নী পান খাইল। গিন্নী গাহিতে বসিল—কর্ত্তা হারমোনিয়মে স্বর দিতে লাগিল।

ভূতেদের টিকিটিও আর সে ঘরে দেখা গেল না—অ ফিম খাইয়া তাহারা আত্মহত্যা করিয়াছে।

অনিলচন্দ্র দত্ত

নর্ম্মা শিয়ারার

শ্রীপ্রতিমা চক্রবর্ত্তী

নর্ম্মা শিয়ারার আজ ছায়াছবির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছেন, এবং সেখান থেকে তিনি যে সহজে স্থানচ্যুত হবেন না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাচ্ছি তাঁর নামা প্রত্যেক ছবিতে। কিন্তু এই সেদিনও নর্ম্মাকে রাস্তায় রাস্তায় কাজের চেষ্টায় অনাহারে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। এখন নর্ম্মা 'মেট্রো গোল্ডউইন মায়ার' কোম্পানীর বড় কর্ত্তা আর্ভিং অ্যালবার্গের স্ত্রী। অনেকেই মনে করেন, নর্ম্মার এত নামডাক সম্ভব

নর্ম্মা শিয়ারার

হয়েছে তিনি বড় কর্ত্তার স্ত্রী বলে'। কিন্তু তাঁরা যদি নর্ম্মার জীবনী পড়েন, তা' হ'লে তাদের এই ভুল ধারণা চলে' যাবে।

উনিশ শত চার সালের দশই আগষ্ট ক্যানাডার মনট্রিল সহরে নর্ম্মা শিয়ারের জন্ম হয়। নর্ম্মার বাবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। দু'টি মেয়ে আর একটি মাত্র ছেলে নিয়ে তিনি ওয়েষ্ট মাউন্টে যান। সেখানেই নর্ম্মার পড়াশোনা হয়—'ডোমিনিয়ন্ পাবলিক হাই স্কুলে'। নর্ম্মার একমাত্র

ডগলাস্ এখন মেট্রো কোম্পানীর বিখ্যাত শব্দ-যন্ত্রী।

ছেলেবেলায় নর্ম্মা বেশীর ভাগ সময় ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেন এবং লড়াই করে' অনেকসময় তাদের হারিয়েও দিতেন। জন্তু-জানোয়ারের উপর অত্যাচার নর্ম্মার মোটেই সহ্য হ'ত না। একদিন কয়েকটি ছেলে একটা কাঠবিড়ালীর ল্যাজ ধরে' টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে তাকে প্রহার করছিল। ছোট্ট নর্ম্মা খানিকক্ষণ চুপ করে' দেখ্‌লে, তারপর দৌড়ে গিয়ে দু'হাতে ছেলেদের ঘুসি মারতে লাগ্‌ল। ছেলেরা অবাক্ হ'য়ে ও ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ জন্তুটাকে ছেড়ে দিলে এবং সেইদিন থেকে তাদের সঙ্গে নর্ম্মার খুব ভাব হ'য়ে গেল—কারণ, নর্ম্মার সাহসে তারা মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে 'প্রাইভেট লাইভস্'-এর একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। এ জায়গাটায় নর্ম্মার সঙ্গে রবার্ট মণ্ট গোমারীর মারামারির সিন্ আছে। হঠাৎ একবার নর্ম্মা (সম্ভবতঃ পূর্ব্ব স্মৃতি ফিরে আসায়) রবার্টকে একটি দুষ্ট ছেলে মনে করে' এমন জোরে চড় বসালেন যে, রবার্ট পড়ে' গিয়ে 'হাঁ' করে' তাকিয়ে রইলেন নর্ম্মার দিকে।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় নর্ম্মাও কম বিস্মিত হন নি। কিন্তু এ দৃশ্যটা এত চমৎকার উৎরে গেল যে, বই থেকে বাদ দেওয়ার কথা কারও কল্পনায়ও এল না। রবার্টের গাল আর নর্ম্মার হাত অনেকক্ষণ ধরে' জ্বালা করে' সংস্কার অভিনয়ের সাক্ষ্য দিতে লাগ্‌ল মাত্র।

ছেলেবেলায় নর্ম্মার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি একজন নাম-করা সাঁতারু বা দৌড়বাজ হবেন। কিন্তু তাঁর বয়স যখন বছর চোদ্দ, তখন হঠাৎ অভিনেত্রী হবার দিকেই তাঁর চোখ গেল। তখন হলিউড ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে। নর্ম্মার ইচ্ছা হলো ছবির কাজে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর মা-বাবা একথা শোনামাত্রই মেয়েকে বকুনি দিতে সুরু করলেন। কিন্তু নর্ম্মা দমবার পাত্রী নন। অনেকদিন ধরে' তুমুল তর্কের পর মা-বাবার মত আদায় করে' ছাড়লেন। ঠিক হ'ল যে, নর্ম্মার বোন্ অ্যাথোল ও তাদের মা সঙ্গে যাবেন। নর্ম্মার বাবা কিছু টাকা ধরে' দিলেন নর্ম্মার হাতে, আর কথা হ'ল যে, এই টাকা ফুরিয়ে গেলে আর তিনি দেবেন না এবং এই সময়ের

NORMA SHEARER and ROBERT MONTGOMERY in "PRIVATE LIVES"

মধ্যে কোন কাজ না পেলে অভিনেত্রী হওয়ার সখটা ত্যাগ করে' নর্ম্মাকে বাড়ী ফিরতে হবে।

তাই হ'ল! একদিন মিসেস্ শিয়ারার অভিনেত্রী হওয়ার আনন্দে উৎফুল্ল দু'টি মেয়েকে নিয়ে নিউইয়র্কের ট্রেনে চড়ে' বসলেন। বাবা শেষ মুহূর্ত্তে আর একবার তাদের করারের কথা মেয়েকে মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না।

নিউইয়র্কে যখন গেলেন, তখন নর্ম্মার বয়স ষোল বৎসর। কিন্তু এই বয়সেই তিনি নিউইয়র্কে থাকার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। বেশ সুন্দর একটি

ছোট ফ্ল্যাট্ নিয়ে নর্ম্মা মাকে সংসারের সব জিনিষ গুছিয়ে দিয়ে চাকরীর চেষ্টায় বেরিয়ে পড়্লেন।

নর্ম্মা আগে কখনও ফিল্ম বা ষ্টেজে কাজ করেন নি। কাজেই যেখানেই যান, আগেকার অভিজ্ঞতা নেই বলে' বিদায় করে' দেয়। কিন্তু দম্‌বার কোন লক্ষণই নর্ম্মার দেখা গেল না। কোথাও ভাল ছবি থাক্‌লেই তিনি একটা কমদামী টিকিট কিনে সেখানে গিয়ে হাজির হতেন। তিনি মন দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় দেখে বাড়ী এসে একটা আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তার নকল কর্‌তেন।

এইভাবে কিছুদিন গেল। নর্ম্মার মা ও বোন্ সব আশা ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ফেরবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। নর্ম্মা কোনমতেই বাবার কাছে পরাজয় স্বীকার কর্‌তে রাজী নন্।

হঠাৎ নর্ম্মার বরাত খুলে গেল। একটা নতুন ফিল্ম কোম্পানী একখানি ছবির জন্য লোক সংগ্রহ কর্‌ছিল। বারোজন মেয়ে দরকার। নর্ম্মা ও অ্যাথোল গিয়ে ষ্টুডিওতে উপস্থিত হলেন এক অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টারের সাম্‌নে। সেখানে মেয়েদেয় ভীষণ ভীড়। এগুতে পারে কার সাধ্য। ক্রমে এগারোজন মেয়ে নেওয়া হ'য়ে গেল। তখন উপায়হীন হ'য়ে নর্ম্মা একবার জোরে কেশে উঠলেন। আসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার তাঁর দিকে তাকাতেই নর্ম্মা একটু মুচ্‌কে হাস্‌লেন। সে নর্ম্মার নামটা লিখে নিলে। তখন নর্ম্মা তাকে আধঘণ্টা ধরে' কথা বলে' বুঝিয়ে দিলেন যে, আর একটি মেয়ে নইলে ছবিটা মাটি হ'য়ে যাবে এবং সেই মেয়ের অংশটিতে অ্যাথোলকে চমৎকার মানাবে। সে বেচারা নর্ম্মার কথার তোড়ের সাম্‌নে দাঁড়াতে না পেরে অ্যাথোলের নাম লিখে নিলে। দু'জনে মিলে কাজটার জন্যে সাড়ে চার পাউণ্ড পেলেন।

এরপর থেকে নর্ম্মা ছোটখাটো কাজ পেতে লাগ্‌লেন। 'দি ষ্টিলারস্' ও 'চ্যানিং অফ দি নর্থওয়েষ্ট' ছবি দু'টিতে তাঁর বেশ নাম হ'ল। এই ছবি দু'টি তোলার ফলেই তাঁর হলিউডে যাওয়া হ'ল। আরভিং অ্যালবার্গ এই সময়ে 'ইউনিভার্সালে'র জেনারেল ম্যানেজার। ছবি দু'টিতে নর্ম্মাকে দেখে তাঁর সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট কর্‌বার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নর্ম্মা এই কণ্ট্রাক্টে রাজী না হ'য়ে চুক্তিপত্র ফেরৎ দিলেন।

কিন্তু অ্যালবার্গ ছাড়বার পাত্র নন্। এর কিছুদিন পরেই নর্ম্মার কাছে আবার নতুন চুক্তিপত্র এল। নর্ম্মা এটাতে রাজী হবেন কি না ভাব্‌ছেন, এমন সময় মায়ার কোম্পানী (পরে মেট্রো গোল্ডউইন মায়ার কোম্পানী) থেকে এক নতুন কণ্ট্রাক্ট এসে হাজির। নর্ম্মা শেষোক্ত কোম্পানীর সঙ্গে লেখাপড়া করে' ফেল্‌লেন।

নর্ম্মা হলিউডে এলেন মা ও বোনের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে অ্যালবার্গের প্রথম পরিচয় বাস্তবিকই ভারী মজার। মায়ার ষ্টুডিওতে উপস্থিত হ'লে নর্ম্মাকে একটা ঘরে বসান হ'ল। সেখানে তিনি দেখ্‌লেন, একটি সুশ্রী যুবক দাঁড়িয়ে। নর্ম্মা ঠিক করলেন, ছেলেটি হচ্ছে নিশ্চয়ই অফিসের চাকর এবং তাঁকে বল্‌লেন—জেনারেল ম্যানেজারকে খবর দিতে। নামটা নর্ম্মা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলেন। ছেলেটি গম্ভীরভাবে নর্ম্মাকে একটা প্রকাণ্ড ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজে টেবিলের বড় চেয়ারটি দখল করে' বসলেন। নর্ম্মা তখন বুঝ্‌লেন যে, চাকরটি আর কেউ নয়, ম্যানেজার-সাহেব স্বয়ং এবং তিনিই আরভিং অ্যালবার্গ! অ্যালবার্গের কাছে এখনও একটি ছোট্ট নোটবই আছে। তা'তে তিনি ভবিষ্যতে নাম করতে পার্‌বে এমন অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম লিখে রাখ্‌তেন। নর্ম্মা শিয়ারারের নাম তা'তে লেখা আছে দু'টি ফিল্মের নামের পাশে—দি ষ্টিলারস্ ও চ্যানিং অফ দি নর্থওয়েষ্ট। এর থেকেই বোঝা যায়, নর্ম্মা নিজের শক্তিতেই বড় হয়েছেন—বড় কর্ত্তার স্ত্রী বলে' নয়।

অ্যালবার্গের সাহায্যে নর্ম্মা ধীরে ধীরে উন্নতি কর্‌তে লাগ্‌লেন। মায়ার কোম্পানীর সঙ্গে পাঁচ বছরের একটা চুক্তি হ'য়ে গেল। এই পাঁচ বছর নর্ম্মা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন আর আরভিংও তাঁকে সাধ্যমত সাহায্য করেন। এই সময়েই তাঁদের ভালবাসার সূচনা হয়—যদিও এন্‌গেজমেণ্টের কয়েক সপ্তাহ আগেও নর্ম্মা এক বন্ধুকে বলেন যে, তাঁর বিবাহের কোনো সম্ভাবনা নেই।

নর্ম্মা হলিউডে আসার তিনবছর পরে একজন 'ষ্টার'

বলে' গণ্য হলেন। ইঁার হওয়ার পর থেকে নর্ম্মা ও আরভিং-এর ঘণিষ্ঠতা বড়ে গেল। তারপর উনিশ শত সাতাশ এর উনত্রিশ-এ সেপ্টেম্বর তারিখে নর্ম্মা শিয়ারার 'মিসেস্ আরভিং অ্যালবার্গ' হলেন। তাঁর স্বামীর প্রতি ভালবাসার গভীরতা এই থেকে বোঝা যায় যে, পাছে পরে কোন বিরোধ হয় এই ভয়ে নর্ম্মা বিবাহের সময় খৃষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করে' ইহুদী ধর্ম্ম (তাঁর স্বামীর ধর্ম্ম) গ্রহণ করেছিলেন।

কিছুদিন পরেই 'দি ডিভোরসি' ছবিতে অভিনয় করে' নর্ম্মা 'একাডেমি অফ মোশান পিক্‌চারস্'-এর প্রাইজ পেয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বলে' পরিচিত হলেন। উনিশ শত ত্রিশ সালের চব্বিশ-এ আগষ্ট 'ছোট্ট আরভিং' পৃথিবীতে এল। সবাই মনে করেছিল, নর্ম্মার যশের দিন ফুরিয়ে গেল বুঝি। কিন্তু পরের ছবিগুলিতে তাঁর অভিনয় আরো সুন্দর হয়েছে দেখে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। 'স্মাইলিং থ্রু' ও 'ষ্ট্রেঞ্জ ইণ্টারভ্যাল' ছবি দু'টি দেখলে বুঝ্‌তে একটুও কষ্ট হয় না নর্ম্মা শিয়ারার কতবড় শক্তিশালী অভিনেত্রী।

নর্ম্মা এখন খুব সুখী। মনের মত স্বামী ও সুন্দর ছেলেটিকে নিয়ে তিনি মহানন্দেই আছেন। তবে তাঁর ছবিতোলার কাজ বন্ধ হয় নি। বরং নতুন ছবি 'রিপ টাইড'-এ শোনা যাচ্ছে আগের অভিনয়কেও তিনি হার মানিয়ে দিয়েছেন। নর্ম্মার সঙ্গে এতে ছিলেন হারবার্ট মার্শাল, রবার্ট মণ্টগোমারী ও স্বর্গীয়া লিলিয়ান ট্যাশম্যান। নর্ম্মার পরের ছবি কবি ব্রাউনিং ও তাঁর পত্নী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর প্রণয়-কাহিনী নিয়ে। ছবির নাম হবে—'ব্যারেটস্ অফ উইমপোল ষ্ট্রীট'। আশা করি এ ছবি দু'টিও খুব ভাল হবে এবং নর্ম্মা শিয়ারার অ্যালবার্গের খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিমা চক্রবর্ত্তী

প্যাট্ প্যাটারসন্

শ্রীমতী প্রতিভা শীল

স্থানান্তরে যাঁর ছবি প্রকাশিত হ'ল, হেলেন হেজের মত ইনিও এত শীঘ্র চিত্রজগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেচেন, যে ভাবলে সত্যিই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যেতে হয়।

বিলেত থেকে ফিরে প্যাটারসন একখানা বই (বট্‌ম্‌স্ আপ্-এ) অবতীর্ণা হ'য়ে মাত্র পক্ষাধিক সময়ের মধ্যেই দর্শকদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, সাধারণ অভিনেত্রীদের গণ্ডীর অনেক উপরে তাঁর স্থান। এমন কি, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্ত থেকে অনেকে মনে মনে তাঁকে 'তারকা'-শ্রেণীভুক্তা পর্য্যন্ত করে' নিয়েছিলেন। তবে এঁর জীবনে সব কাজগুলোই যেন একটু বেশী তৎপরতার সঙ্গে ঘটে গেচে। এই যেমন তাঁর প্রথম পুস্তকেই যশ অর্জ্জন করে' তারকা-শ্রেণীভুক্ত হওয়া এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহের আলাপেই চার্লস বয়ারকে বিবাহ-বন্ধনে বেঁধে ফেলা। ধর্‌তে গেলে তাঁর 'মিটিয়রিক কেরিয়ার'-এর সূচনাই হয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা দিয়ে। মাত্র বছর দেড়েক আগে ইংলণ্ডের একটা বিখ্যাত থিয়েটারে 'দি মারমেড্' পুস্তকে অবতীর্ণ হ'য়ে তিনি নিজেকে এমন গভীরভাবে পরিচিত করে' ফেললেন যে, সকলেই তাঁকে খুব অল্পদিনের মধ্যে পর্দ্দায় দেখতে পাবার প্রত্যাশা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

ইয়র্কসায়ারের ব্রাডফোর্ড সহরে সাত-ই এপ্রিল তারিখে এঁর জন্ম হয়। এঁর বাল্যজীবনও বেশ চমৎকার। দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গভর্ণেস-এর তত্ত্বাবধানে রেখে এঁকে 'বেলিভিউ স্কুলে' পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দশ বছর বয়সেই বিখ্যাত 'বেব্‌স্ ইন্ দি উড্' শো-তে তিনি নাচতে এবং গান কর্‌তে সুরু করেন। এইভাবে আরো পাঁচ বছর কেটে যায়। এইবার ইনি থিয়েটারে অভিনয় কর্‌বার জন্যে বাপের কাছ থেকে অনুমতি চান। কিন্তু একজন সামান্য পশমের ব্যবসায়ী এবং নিজের দারিদ্র্য কল্পনা করে' তাঁর পিতা এতে ঘোরতর আপত্তি করেন। তখন প্যাটারসন্ নিজের পথ নিজেই বেছে নেন, অর্থাৎ,

ষোল বছর বয়সে কাউকে কিছু না জানিয়ে গা ঢাকা দিয়ে একটি প্রদর্শনীতে 'ষ্টপ্ ফ্লাটিং' পুস্তকে 'এ্যাডিল্ এ্যাস্টেয়ারে'র ভূমিকায় অবতীর্ণা হন্। তাঁর পিতা জান্‌তে পেরে চুপিচুপি প্রদর্শনীতে গিয়ে মেয়ের অভিনয় দেখে

Will Rogers
Fox Player

George O'Brien
Fox Player

আসেন এবং এই অভিনয়ই যে একদিন কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্য এনে দেবে এই চিন্তা করে' মনে মনে উল্লসিত হন্।

হাওয়াকে কেন্দ্র করে' তাঁর গান ভেসে এসে 'ফিল্ম'-রথীদের কানে আঘাত কর্‌ল এবং দু'-একজন তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে আকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন। পরিশেষে এর ফল হ'ল এই যে, তিনি পর্দ্দায় আবির্ভূতা

Dunn

Sally Eilers

হলেন। তিনি নাচ এবং তাঁর জোরাল অথচ মিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্যে বিখ্যাত।

ইনি কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি পুষ্‌তে বড্ড ভালবাসেন এবং দক্ষিণ কেনসিংটনের বাড়ীতে তাঁর এই রকম অনেকগুলি প্রহরী আজ-ও বর্ত্তমান আছে। কথা-চিত্রের অভিনয়ে তিনি হেলেন হেজ্ এবং ওয়ার্ণর বাক্সটার-এর অভিনয় সব চেয়ে পছন্দ করেন।

NORMA SHEARER and ROBERT MONTGOMERY in "PRIVATE LIVES"

Charles Farrell
Fox Artist

এবার তাঁর অধ্যবসায়ের দু'-একটা নমুনা দিই। 'গ্রসভেনর হাউস'-এ তাকে 'কুইন্‌স্ হাই', 'দি সোড্‌স্‌ম্যান' এবং 'দি চারলট্ খাওয়ার' এই তিনখানি পুস্তকে একসঙ্গে পার্ট দেওয়া হয় এবং তিনি সমান সাফল্যের সঙ্গে তিনটীতেই অভিনয় করেন। এরপর ইনি 'বোর্ড'-তে যোগ দেন।

প্রতিভা শীল

গনেশ জননী

শ্রীঅতুলানন্দ রায়ের সৌজন্যে।

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা।

নাই। চাকরী হবার আগেই তাঁর বাপ-মা মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁর বিবাহও হয়েছিল; কাজেই এ সব উপলক্ষে তাঁকে আফিস কামাই করতে হয় নাই। তারপর যেদিন তাঁর একমাত্র পুত্রের বিবাহ হয় এবং তার বছর দুই পরে পুত্রটী মারা যায়, এই দুই শুভ ও অশুভ উপলক্ষেও তিনি আফিস কামাই করেন নাই। এখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর। তিনি বলেন, এই পঁয়ষট্টি বৎসরের মধ্যে কোন্নগরের মত স্থানে বাস করেও তিনি একদিনও কোন-প্রকার অসুস্থতা বোধ করেন নাই।

প্রতিদিন ঠিক সাড়ে সাতটার সময় ছাতা হাতে নিয়ে বাড়ী থেকে বের হবেনই, তা জলই হোক, আর অশনি-পাতই হোক! বাড়ী থেকে প্রায় আধ মাইলের উপর হেঁটে এসে তিনি ষ্টেশনে গাড়ী ধরেন। কোনদিন তিনি সকালে সওয়া আটটার গাড়ী ফেল করেন নাই—এমনই তাঁর সময়ের হিসাব। তিনি হচ্চেন পাড়ার লোকের ঘড়ি। তিনি আফিস যাবার জন্য পথে বেরুলেই সবাই জান্‌তে পার্‌ত ঠিক সাড়ে সাতটা বেজেছে—একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা।

কয়েক বছর আগে রেলে ধর্ম্মঘট হয়েছিল, গাড়ীর যাতায়াত অনিয়মিত হয়েছিল, দুই একদিন বন্ধও ছিল। ভাদুড়ী মহাশয় সেই অনিশ্চিত গাড়ীর জন্য ষ্টেশনে কখনও বসে থাকেন নাই, এই সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করে সে কয়দিন আফিসে গিয়েছেন—অবশ্য একটু বিলম্ব হোত।

এই যে টাইম-বাঁধা আফিস ওয়ালাই আমাদের ভাদুড়ী মহাশয়, তিনিও মাস তিনেক পূর্ব্বে সাতদিন আফিসে যান নাই—তাঁর জীবনে এই প্রথম আফিস যাওয়া বন্ধ। সেই কাহিনী বলবার জন্যই এতক্ষণ মুখবন্ধ করলাম।

কিন্তু, সেই আসল কথাটা বলবার আগে ভাদুড়ী মহাশয়ের আরও একটু পরিচয় দিতে হচ্ছে।

এতক্ষণ যা বল্‌লাম, তার থেকে পাঠক পাঠিকাগণ হয় ত মনে করেছেন, ভাদুড়ী মহাশয় কৃপণ ব্যক্তি এবং অর্থলোভী। তা কিন্তু ঠিক নয়।

ভাদুড়ী মহাশয়ের কাছেই শুনেছি, এনট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করে তিনি পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে ডনলপের বাড়ী বাইশ টাকা বেতনে প্রবেশ করেন। এই সুদীর্ঘ কালে ক্রমে পদোন্নতি হয়ে তিনি দুই শত টাকায় উঠেছিলেন, সংসার বড় নয়। পূর্ব্বে ছিলেন তিনি, তাঁর গৃহিণী, আর এক মাত্র পুত্র ললিতমোহন। ছেলেটীকেও ডেলি প্যাসেঞ্জার করে কলিকাতার কলেজে পড়িয়ে বি-এ পাশ করিয়ে ছিলেন, বিয়েও দিয়েছিলেন। তার পরই ছেলেটী মারা গেল। এখন সংসারে তাঁরা দুইজন, আর বিধবা পুত্রবধূ, এ কথা আগেই বলেছি।

ভাদুড়ী মহাশয় তাঁর পিতৃ পিতামহের পুরাতন বাড়ী ভেঙ্গে ফেলে নূতন একটা ছোট একতলা বাড়ী করেছেন। তারপর ছেলেটী মারা গেলে তিনি দোতালায় একখানি বারান্দাওয়ালা বড় ঘর করেছেন। দোতালায় যখন ঘর করেন, তখন অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন সব ত শেষ হয়ে গেল, এখন আর কার জন্য দোতালায় ঘর তুলছেন ভাদুড়ী মশাই।

তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন ও ঘরে কি আমি থাকব। ওটা বৌমার ঘর। তার ত সাধ আহ্লাদ সবই শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন ধর্ম্মকর্ম্ম, শাস্ত্র পাঠ এই নিয়েই ত তাকে জীবন কাটাতে হবে। সেই জন্য দোতালায় এই ঘরটী করলাম। বৌমা নিরিবিলি তাঁর ইষ্ট দেবতার নাম করবে, পূজা পাঠ করবে।"

ভাদুড়ী মহাশয় যে কৃপণ নন, তার প্রমাণ এই যে, প্রতি রবিবার রাত্রিতে তাঁর বাড়ীতে পাড়ার দুই চার জনকে নিমন্ত্রণ খেতেই হোতো। তিনি বল্‌তেন, ওরে বাবা, 'ডেলিরা' হপ্তার ছয়দিন খায় না—গেলে। রবিবারে আয়েস করে খেতে হয়। তা একলা খেলে সুখ হয় না, তাই দুই চার জনকে ডেকে আনি। আর জান, রবিবার টায় আফিস থাকে না বলে আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করে, দিন আর কাট্‌তে চায় না। তাই সকালে বেরিয়ে কলকাতায় গিয়ে হাট বাজার করে আনি; দুপুর পরেই বৌমাকে নিয়ে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করি, দিনটা কেটে যায় বুঝলে।

এ হেন ব্যক্তিকে কে কৃপণ বলবে। আগে যখন ছেলে বেঁচেছিল, তখন কিছু কিছু জমিয়ে ছিলেন। ছেলে মারা যাবার পর আর টাকা জমাবার দিকে মন ছিল না। বল্‌তেন,

আর কার জন্য জমাবো' বাড়ীখানি আছে, প্রভিডেন্ট ফণ্ডে টাকা জমছে, আগের দরুণ ব্যাঙ্কেও কিছু আছে, আর সাহেবেরা কিছু পেন্সনও দেবে। গিন্নী আর বৌ-মার ভাবনা চলে যাবে এখন আর জমাবো কার জন্যে? বলেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। এইবার ভাদুড়ী মহাশয়ের সাতদিন আফিস কামাই করার ইতিহাসটা বলি।

মাসতিনেক আগে কি তাঁর খেয়াল হোলো, সকলকে বল্‌লেন, আর নয়, এখন বিশ্রাম। যে কথা, সেই কাজ। আফিসে দরখাস্ত করলেন। সাহেবেরা পঁয়তাল্লিশ বৎসরের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে বিদায় মঞ্জুর করলেন, তাঁর জন্য বিশেষ পেন্সনের ব্যবস্থা হোলো দেড়শ টাকা, এ ছাড়া প্রভিডেন্ট ফণ্ডের কয়েক হাজার টাকা ত' পাবেনই।

ভাদুড়ী মশায় সাহেবদের অভিবাদন করে কর্ম্মচারীদের শুভ কামনা করে, এক শনিবারে আফিস ত্যাগ করে এলেন। তারপর সাতদিন আর আফিসে যান নাই।

এ সাতদিন তিনি যে কি কষ্টে কাটিয়েছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অভ্যাস, এ কি সহজে ত্যাগ করা যায়! দিবানিদ্রা তার কোষ্ঠিতে লেখা নেই। তিনি একেবারে অধীর হয়ে উঠ্‌লেন—দিন আর কাটে না! সারা দুপুর গ্রামের পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়ান।

শেষে, সাতদিনের দিন রবিবার সন্ধ্যার পর বল্‌লেন, "বৌমা, কা'ল থেকে আবার আমার টাইমের ভাত চাই; আমি আফিসে বেরুব। এমন করে ব'সে থাক্‌লে আমি বাঁচ্‌ব না, আপাততঃ পাগলই হব। কাজ নেই আমার বিশ্রামে।

সোমবার ঠিক সাড়ে সাতটায় সেই আগের মত পোষাক প'রে, ছাতা হাতে ভাদুড়ী মহাশয় কোন্নগরের ষ্টেশনে হাজির। তারপর আফিসে উপস্থিত হয়ে বড় সাহেবকে বল্‌লেন "স্যার, আমি রিটায়ার করব না। বাড়ী ব'সে থাকলে আমি পাগল হয়ে মারা যাব। পঁয়তাল্লিশ বছরের এ অভ্যাস, এ আফিসে আমি গরহাজির হতে পার্‌ব না। আমি মাইনে চাইনে, এমনি প্রতিদিন এসে যেমন কাজ করতাম, তাই করব। পেন্সনের টাকা না দিতে চান, না দেবেন, আমার যা সঞ্চয় আছে, তাতেই চলে যাবে। যেদিন আমার চলবার শক্তি থাক্‌বে না, চোখে দেখতে পাব না, সেই দিন স্যার, ডানলপ্ কোম্পানীর 'লেজার' বইয়ের কাজ থেকে বিদায় নেব—তার আগে নয় স্যার।"

সেইদিন থেকে ভাদুড়ীমহাশয়ের আবার সেই জেল—আবার সেই সাড়ে সাতটায় রাস্তায় তাঁর আবির্ভাব!

জলধর সেন

কেলোর অদৃষ্ট

শ্রীবজ্রাচার্য্য বিরচিত

একটা কালো কুকুর পথের ধুলোয় শুয়ে আছে।

দেখলুম, গাড়ী গেলো উঠলো না; মোটর হর্ণ দিয়ে সামনে এসে পড়লো, তবু ভ্রুক্ষেপ নেই; একখানা রিক্‌শ তার ল্যাজটা মাড়াতে মাড়াতে পাশ কাটিয়ে গেল, তবুও কুকুরটা নড়লো না। মনে হলো কুকুরটা যেন বলছে, "যায় প্রাণ যাবে, তবুও সরবো না।"

এ কি অভিমান?

গলায় বগলোশ নেই, তাইতে বোধ হল তার মনিব নেই। রাস্তার ধারে ফেলা ভাত, হাড় রুটীর টুকরো খুঁটে খুঁটে খায়। তাই কি একলা খেতে পায়? কাক, মুরগী, অন্যান্য কুকুর সকলের সঙ্গে কম্‌পিটিশান্... কামড়াকাম্‌ড়ি...লড়াই ...।

কেলোর কিন্তু এমন দিন ছিল না।

ওই যে বড় বাড়ী, ওর মালিক ছিল সোনাপুরের জমীদার ভুবন বাবু। কর্ত্তা গিন্নি কেলোকে খুব যত্ন করতেন। কর্ত্তা, তার আমবাগানের এক কোণে কোলোর জন্য একটী ছোট্ট ঘর করে দিয়েছিলেন। দিনের বেলায় গিন্নিমার খাওয়া দাওয়া যখন শেস হত, তিনি যেতেন এটো থালা নিয়ে পুকুর ঘাটে জলে ভিজাতে। গেরস্থর পাতকুড়ান যত ভাত, মাছের কাঁটা, থাক্‌ত সেই থালাতে। পুকুর পাড়ে এসে তিনি ডাকতেন..."কেলো, কেলো, আয়, আয়, তু—তু...।" যেখানেই থাকুক, সেই আদরের ডাক শুনে, কেলো আসতো ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে,—পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা হাপাতে হাপাতে, লক্‌লকে জিব বার করে। গিন্নিমা, ভাত দিতে না দিতে, কেলো চক্‌চক্ করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলতো, মা লক্ষ্মীর মুখের পানে, কৃতজ্ঞ নয়নে, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে, অনবরত ল্যাজ নাড়তে থাকতো। আর এখন?

সেই কেলোকে বহুদিন কেউ ডাকেনি; কেলোও ছুটে ছুটে খেতে যায় নি। তার কারণ বড় বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নি এখন আর নেই। তাঁদের তিরোধানের পর কর্ত্তা হয়েছে তাঁর ছেলেরা। বড় ছেলে তিনটী কুকুর পুষেছেন—গর্ডন সেটার, ডালমেশিয়ান্ ও নরওয়ের এক হাউণ্ড। মধ্যম পুত্রের সখে আরো দুটী এসেছে—রুষিয়ার উল্‌ফ হাউণ্ড, ও স্কটিশ্ ডিয়ার হাউণ্ড। ইনি শিকারী,—তাই এই হাউণ্ডদ্বয় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। ছোট ছেলে পুষেছেন দুটী বিয়াগল্ ও দুটী বাসেট্। এক দিন এই ন'টী কুকুর বিকালে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে, এমন সময় কেলো একদল সঙ্গী নিয়ে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এসে করল তাদের আক্রমণ। ব্যাপারটী মুহূর্ত্তে ভীষণ আকার ধারণ করলে। কেলোর তিনটী সঙ্গী, ক্ষত বিক্ষত, টুঁটী কাটা হয়ে ছটফট করতে করতে,যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিলে। বাকি সকলে বেগতিক দেখে, কেঁউ কেঁউ রবে, ল্যাজ গুটিয়ে, ঊর্দ্ধ শ্বাসে ছুটে পৈত্রিক প্রাণ রক্ষা করলে। তারপর কেলো যখনই বড়বাড়ী ঢোকবার চেষ্টা করেছে, তখনই খেয়েছে, হয় ন-কুকুরের ভীষণ তাড়া, না হয় চাকরবাকরের লাঠি, আর ঢিল। বারংবার বিতাড়িত হয়ে শেসে স্থির করলে, আর কারুর বাড়ী ঢুকবে না, তার চেয়ে বরং পথের ধারে ফেলা জিনিয খুঁটে খাবে। এই হচ্ছে তার বড় বাড়ী হতে অন্ন উঠার ইতিহাস।

পাড়ায় এখনও লোক আছে বটে, কিন্তু কুকুরকে ডেকে ভাত কেউ দেয় না। মাছ ভাত সকলেই খায়, এঁটোও পড়ে থাকে, কিন্তু কুকুরের কথা কেউ ভাবে না। এঁটো কাঁটা যায় এখন, হয় পুকুরের জলে, না হয় রাস্তার ধারে। যারা পুকুরের জলে ফেলে দেয়, তারা বলে মাছে খেলে মাছ বাড়বে,—বড় মাছ পাব, কুকুরকে খাইয়ে কি হবে?

কেলো বোধ হয় মনে করে, আচ্ছা এই কুকুরের কথা

কেউ ভাবে না কেন? কুকুরের স্বজন ব্যবস্থা আছে, পেট ভরাবার ব্যবস্থা কায়েমী হয়নি কেন?

যে মানুষের কৃপার উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেই মানুষ এমন অবিবেচনা করে কেন? এঁটো পাতকুড়ান চাট্টি ভাত……তাও পাওয়া এত দুর্লভ হয়ে উঠলো কেন? মানুষ ত না খেয়ে নেই……দু'মুটো ত খাচ্ছেই…পাতের এঁটো কিছু না কিছু ত পড়ছেই, সেই এঁটোটুকু যে আমার জীবনী……আমি ত আর কিছু চাই না……মানুষ কি আমায় সেটুকু থেকেও বঞ্চিত করবে? মানুষ এমন হল কেন?

পাতের ফেলা জিনিষ, হাতে নিয়ে, আদর করে ডেকে দিলে যেমন মিষ্টি মিষ্টি লাগে, তেমন মিষ্টি আর কিছুই না। সেই জিনিষে কেলোর ভরপেট হত না বটে, কিন্তু আধ-পেটা খেয়ে কেলো ত ভালই ছিল। ছুটোছুটী, লাফালাফি দাপাদাপি করে চেঁচিয়ে মাৎ করতো, পাড়ার ত্রিসীমানায় শিয়াল, কুকুর, হনুমান, দুষ্টুলোক ঘেঁসতে দিত না। সারা রাত জেগে ছুটে ছুটে পাড়া পাহারা দিত। কেলো বোধ হয় ভাবতো, এমনি করেই দিনগুলো তার যাবে, অন্ততঃ আধপেটা এঁটো ভাত কোনদিন দুর্লভ হবে না।

হায় রে কেলো!

লোকজন সব ঠিক্‌ঠাক্, থানকে থান বজায় আছে বটে, সকলেরই বুকের ভেতর প্রাণটী পূর্ব্বেকার মত ধুক্‌ধুক্ করছে সত্যি, কিন্তু ঐ প্রাণের সঙ্গে জড়ান ছিল আর একটী প্রাণ—যার নাম দয়া,—সেটী গেছে কর্পূরের মত উবে:—বুঝ্‌লি কেলো? তাই আজ মানুষ থাকলেও ভাত দেনে-ওয়ালা প্রাণ তার ভেতর নেই।

রাস্তার ধারে ছাই, ছেঁড়া নেকড়া, কাগজ, মরা ইঁদুর, বেরাল, ঘর-ঝাঁটান ধুলো, দুনিয়ার নোংরা জঞ্জাল, আরও কত কি; সেই সকলের সঙ্গে মাখামাখি ভাব, রুটীর টুক্‌রো, মাছের কাঁটা, মাংসের হাড়……ইত্যাদি। তারই লোভে কুকুরে কুকুরে কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি, কাকে মুরগীতে কাড়াকাড়ি, আবার কোথাও দেখেছি শীর্ণ, রুক্ষকেশ, দীপ্তনয়ন, বুভুক্ষু মানুষ সেই কাক-মুরগী-কুকুরের ভীড় ঠেলে ওই ছাইমাখা ভাত খুঁটে খাচ্ছে।

যে-সব কুকুর কেলোর ভয়ে তার কাছে ঘেঁসতো না, দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াত, আজ তারাই এখন কেলোকে তাড়া করে দাঁত খিচিয়ে কামড়াতে যায়, কেলোর মুখের গ্রাস কেড়ে খায়; এই সেদিন এক শ্রাদ্ধবাড়ীর তরকারী আর দইমাখা এঁটোপাত চাটতে গিয়ে গোটাকতক দুষ্ট কুকুর এমন জোরে কেলোর ল্যাজ আর পা কাম্‌ড়ে দিয়েছে যে কেলো তিন চার দিন বেহুঁস হয়ে পড়েছিল।

অন্নের ওপর বিধাতার অভিশাপ আছে নাকি! নির্ব্বিঘ্নে অন্ন কেউ সংগ্রহ কর্ত্তে পারে না কেন? কেলো পেটের জ্বালায় তার চিরপরিচিত গ্রাম ত্যাগ করে, অন্য এক গ্রামে চলে গেল। সেখানে দু'চারদিন বেশ পেট ভরেই জুটলো, তার পর যেমনি স্থানীয় কুকুরদল টের পেলে যে তাদের এলাকায় ভাগ বসাতে আর এক কুকুর এসেছে, অমনি কেলোর জীবন অতিষ্ঠ করে তুল্‌লে। কেলো সে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হলো।

গ্রাম হতে গ্রামান্তরে আহারের চেষ্টায় কেলো ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। দারুণ গ্রীষ্মে একদিন, ঘুরতে ঘুরতে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে, কেলো আর চল্‌তে পারলে না। অবসন্ন হয়ে একটী গাছের তলায়, চার পা মেলে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লো। নিরন্নের প্রাণ এতই সস্তা, এমনি সহজে বিপন্ন হয়। কোথায় অন্ন তার ঠিক ঠিকানা নেই, তবু তারই খোঁজে রোদবৃষ্টি মাথায় করে, ছোট—আর ছোট। আহা মরি, হা হুতাশ কেউ করবে না,—মুখের দরদ কেউ দেখাবে না—প্রাণের দরদ তো দূরের কথা! এই হা অন্ন, যো-অন্ন চারিদিকে, এখন ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি সর্ব্বত্র।

কেলোর কঠিন প্রাণ, এত কষ্টেও বেরোলো না।—বিধাতার সঙ্গে সে অদৃশ্য যুদ্ধ করতে লাগলো। মুখ হতে শব্দ বার করতে বিশেষ চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না; কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে ঘড় ঘড় শব্দ করতে লাগলো; চোয়ালে দুপাশ দিয়ে ফেনা দেখা দিল, চোখ দুটো লাল হয়ে কপালে উঠে গেল; নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল—কেলো স্থির হয়ে শুয়ে রইলো,—বুঝি গেল…

বিধাতা বোধ হয় এই জীবন মরণ যুদ্ধের স্বাক্ষীস্বরূপ, ঐ প্রৌঢ় ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে, তাঁর ডিস্পেন্সারীর

জানালার কাছে বসিয়ে রেখেছিলেন। কেন না, তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে কেলোর ঐ মরণপথযাত্রা দেখছিলেন। যেই কেলোর দম বন্ধ হয়ে গেল—অমনি তিনি ছুটে এসে কেলোকে কোলে তুলে নিয়ে ডিস্পেন্সারীর একখানি সোফায় শুইয়ে দিলেন।

বেলা দুটো, তখনও তিনি মধ্যাহ্ন ভোজন করেন নি; গৃহিণী এসে অন্ন প্রস্তুত, এই সংবাদ দিয়েই চমকে উঠলেন। জীর্ণ শীর্ণ এক কুকুর টেবিলে শুয়ে আর তারই শুশ্রূষায় রত —ডাক্তার! "করছ কি? কুকুরের সেবা? কি বিপদ —এধারে ভাত বাড়া পড়ে রইল, শুকিয়ে চাল হয়ে গেল, কোত্থেকে এই আপদ জুটলো? মানুষের খাওয়া নেই, দাওয়া নেই—একি ব্যাপার?"

ধীর প্রশান্তমুখে ডাক্তার বললেন, "তুমি খেয়ে দেয়ে নাও, আমার যেতে দেরী হবে। দেখছো না এখনও অজ্ঞান···তবে নাড়ী চলছে, ভয় নেই, বাঁচবে।"

কথাগুলো বলে ফেলেই ডাক্তার আবার কুকুরের প্রতি মনোযোগ দিলেন। তাঁর স্ত্রী ঘরে আসা অবধি তিনি একবারও ফিরে চান নি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে কখন যে সাধ্বী চলে গেছেন, তাও তিনি জানেন না। ঘণ্টা খানেক পরে তাঁর স্ত্রী আবার এলেন; দেখেন ডাক্তার তন্ময়, কুকুরটীকে ধীরে ধীরে জল খাওয়াচ্ছেন, তাঁর একাগ্র দৃষ্টি, গম্ভীর ভাব দেখে তার মুখের কথা মুখেই রইল, ফিরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এক বাটী গরম দুধ এনে ডাক্তারের হাতের কাছে নীরবে রেখে দিলেন। ডাক্তার হেসে বললেন, "বাঃ, তুমি মনের কথা জান নাকি? কি করে জানলে আমি দুধের কথা ভাবছি?"

"আমিও ডাক্তারী শিখেছি। এখন এসো দুটো খেয়ে নাও।"

"রোগী ছেড়ে যাই কি করে?"

ডাক্তার দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করলেন। চকচক্ করে কেলো বাটীটা খালি করে ফেললে।

"চাকরটাকে ডেকে দি, না হয় একটু দেখুক—তুমি এস, খাবে চল, বেলা তিনটে বেজে গেছে।"

"আচ্ছা যাও, মধুকে পাঠিয়ে দাও।"

গৃহিনী চাকর মধুকে পাঠিয়ে দিলেন। যথাযোগ্য উপদেশের সঙ্গে কেলোর ভার মধুর উপর দিয়ে ডাক্তার বাড়ীর ভেতর গেলেন তাঁর অভুক্ত অন্ন খাবার জন্যে। খেতে বসে, একথা সেকথার পর গৃহিনী কৌতূহল বশে প্রশ্ন করলেন, "বলত তুমি আপন ভোলা হয়ে কুকুরের সেবায় কেমন করে লাগলে?"

ডাক্তার গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন,—

"আমি জানলার কাছে বসে থাকতে থাকতে দেখলাম, আমার বড় ছেলে সত্যেন, যেন ছুটে এসে গাছতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়লো। আকুল হয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে এলাম। ধস্তাধস্তি করে তার দেহে প্রাণ সঞ্চার করলুম। এখনও বাইরে দেখছি বটে কুকুর, কিন্তু প্রাণের ভেতর অনুভূতির রাজ্যে, সে আমার সত্যেন, নইলে এত আনন্দ...এত উৎসাহ··"

বলতে বলতে ডাক্তারের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল, দুই গণ্ড বেয়ে টপ্ টপ্ করে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল। গৃহিণীর চোখেও জল দেখা দিল। বললেন, "দেবতা, আজ যা শেখালে তা জগতে অতুলনীয়···আশীর্ব্বাদ কর' প্রভু, যেন এ আদর্শ হতে কখনও বিচ্যুতা না হই।"

—বজ্রাচার্য্য

সিনেমায়

শ্রীঅখিলচন্দ্র নিয়োগী

[সিনেমার চারদিকে কত কথা ওঠে—কত কথা মিলিয়ে যায়—যা' আমাদের কাণে আসে—তাই নিয়ে এইটি লেখা। অন্ধকার থেকে কথা ভেসে আস্‌ছে, তাই পাত্র-পাত্রিগণের নামকরণ করা হয় নি]

১। এই পট্‌লা ধর তো আমার র‍্যাপারটা—একবার 'ভাল' করে মালকোঁচা মেরে নি—

২। হাঁ—দে—দে এইদিকে—

৩। ওরে ছাড়—ছাড়—আমার পা গেল—

৪। ও মশয়—চাইর আনার টিহিট্ এইহ্যানে—পাওয়া যাইবো? এই স্কিডা লন—আমার লাগিল্ একখান্—

৫। আরে রাখো কর্ত্তা—আপনি খেতে ঠাঁই পায় না আবার শঙ্করাকে ডাকে—

৬। ও মশাই—এ কি চষা ক্ষেত পেয়েছেন? আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে' যাচ্ছেন যে?

[দূরে গুণ্ডা] আরে—চারআনা টিকেট্—ছ'-ছ' আনা—লে লেও বাবু—ছ'—ছ' আনা—!

৭। আরে—আরে—গেল—গেল—আমার জামার আদ্দেকটা যে বক্স আপিসের সঙ্গে রয়ে গেল!

৮। থাকে থাক্। এখন ছুটে আয় দেখি—যায়গা দখল কর্‌তে হবে না—? পঞ্চু, ভোলা সবাই এক্ষুনি এসে পড়্‌বে।

৯। হাঁরে বিরিঞ্চি,—আমার আর এক পাটি চটি গেল কোথায়?

১০। তাই ত' রে, দেখ্‌তে পাচ্ছি নে ত?

১১। (ভেঙ্গচাইয়া) দেখ্‌তে পাচ্ছি নে ত! আমি ব্যাটা ভাল বুঝে গেলাম টিকিট কিন্‌তে!

১২। আরে, ঝগড়া থামিয়ে এখন রোমাল বাঁধ নইলে—বাছাধনদের হিড়িকে আর বস্‌তে হবে না!

১৩। সল্টেড্ অ্যালমণ্ড্—সল্টেড্ অ্যালমণ্ড্! প্রোগ্রাম চাই বাবু—প্রোগ্রাম চার পয়সা করে'।

১৪। ওরে—একটা প্রোগ্রাম কিনে নে—নইলে গল্প বুঝ্‌তে পারবি নে—

১৫। নাঃ পার্‌বি নে—ওসব] আমার জানা আছে।

১৬। চুপ্ চুপ্—চুপ্ এইবার স্থুরু হ'ল—

১৭। দেখ্‌ছিস মাইরী—দুর্গাদাস কেমন একটা প্যাচ্ কস্‌লে! আমি তোকে বলে' দিলুম—এ ছবি আর দেখ্‌তে হবে না দশ উইক্ ঠিক্ চল্‌বে।

১৮। দূর ব্যাটা আহাম্মুক—ও বুঝি দুর্গাদাস? ও হ'ল গিয়ে আমাদের শিশির ভাদুড়ী। ছবি দেখ্‌তে এসেছিস্ কাউকে চিনিস্‌ও না?

১৯। কি আমার ছঙ্গে লাগ্‌তে আছা? জানিছ্ আমার মেছোমছায়ের ছোট ভাই চাড আনার টিকিট বিক্‌কিড়ি করে?

২০। তবে আড় কি? দুর্গাদাসের পিসেমশাই—

২১। দ্যাখ্, আমায় ড়াগাস্ নি বল্‌ছি—! চতে' গেলে আমি বড্ড ড়েগে যাই—আড় ডাগ হ'লে—আমাড় কাণ্ড-জ্ঞান থাকে না।

২২। হঃ—তোমরা দুইজনে—লাগাইচ কি? ছবি দ্যাখনের লিগা গাইটের কড়ি খরচ করছ—আর্ এহানে—আইসা স্থরু করছ—কাইজ্যা?

২৩। তুই থাম্ বাঙাল্—ছবির তুই কি বুঝিস্?

[স্থর করিয়া] বাঙাল—
রস খাইল—
ঘট ভাঙ্গিল—
পয়সা দিল না—

২৫। বাঙাল? বাঙাল কি ডাক টিকিট দিয়া আমার কপালে ল্যাখা আছে? ফের যদি বাঙাল বাঙাল কইরব্যা—ত' ঘাড় ধইর্যা বাইর্ কইর্যা দিমু—

২৬। আরে মশাই আপনাদের চ্যাঁচামেচিতে কিছু শুনতে পাচ্ছি নে—ঝগড়া কর্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে দু'জনে মিলে বাইরে যান—

২৭। [সকলে একসঙ্গে] আস্তে—আস্তে—

[ওপরে হঠাৎ ছোট ছেলের কান্না সুরু হ'ল]

আরে—থামাও—থামাও—

বাইরে নিয়ে যাও না গো—

২৮। সব থামুন—কি সুরু করেছে সব দেখ না—যেন মেছোহাটা—

২৯। [একান্তে] দেখুন মশাই, আপনাকে একটা কথা বল্‌ব—

৩০। কি বলুন না—

৩১। আজ্ঞে, আমি ঠিক্ গল্পটা বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে—আমায় একটু বুঝিয়ে দেবেন?

৩২। অ্যাঁ—বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না—কচি খোকা আর কি—বাড়ী গিয়ে দুধ খান্ গে—এখানে এসেছেন কেন?

৩৩। আস্তে—আস্তে—

৩৪। ও মশাই—উঠুন—উঠুন—এটা যে আমার সীট্—

৩৫। কি কইল্যা? চক্‌চকা সুকি, মু দ্যাহা যায়. তাই দিয়া কইরলাম টিহিড্—তুমি কও তোমার সিড্—এ কি মামাবাড়ীর দুধ ভাত পাইচ?

৩৬। আচ্ছা, আমি গার্ডকে ডেকে আন্‌ছি—

৩৭। আনো গিয়া তোমার কোন্ শ্বশুর পুত্‌কে আন্‌বা—শর্ম্মা আর এহান থনে নইড়ত্যাচে না—

৩৮। বাবা—বাবা—দ্যাহ—দ্যাহ—ওরা দুইজনে কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি করে ক্যান্?

৩৯। কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি না রে চাঁদু,—চুম্বা-চুম্বি করে—বড় হইলি বোঝ্‌বা—

৪০। উমাশশীর কি চমৎকার চোখ দেখেছিস?

৪১। উমাশশী? বল মলিনা—!

৪২। আলবৎ উমাশশী—

৪৩। বটে আমার সঙ্গে চালাকি? আমাদের পাড়ায় থাকে আর আমি জানি না—?

৪৪। যা'—যা'—তুই ত সব জানিস্—

৪৫। তবে রে মিথ্যেবাদী—

৪৬। আয় না দেখি—

৪৭। মার্—মার্—মার্—

৪৮। থামুন মশাই—থামুন—আস্তে—

৪৯। মার্ শালাকো—মার্ শালাকো—

[মারামারি সুরু হইল]

৫০। এই দোনোকো থানামে লে যাও—

৫১। [কাঁদিয়া] নেহি পাহারাওয়ালা বাবাজী, হাম্‌কো থানামে মৎ লেও! হামারা একঠো পাঞ্জাবী ছিঁড়া দিয়া—কাপ্‌ড়া ভি গিয়া—একপাটি চটি ভি গিয়া—হাত-ঘড়ি ভি চূর্ণ-বিচূর্ণ হুয়া। উ—আলবৎ উমাশশীই হ্যায়—হাম্‌কো—মাফ্ কি জিয়ে—হাম নাকে খৎ দেতা হ্যায়।

অখিল নিয়োগী

হতভম্ব দারোগা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

তখন রাত্রি প্রায় আট্‌টা। বরিশাল জেলার—থানার ছোট দারোগা বিমলবাবু সস্ত্রীক 'পেট্রোল' বোটে আসিয়া উঠিলেন। উপর হইতে জরুরি হুকুম আসিয়াছে, তাঁহাকে পনের দিন দিবারাত্র জলে জলে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে। এই অঞ্চলে সাতদিনের মধ্যে জলপথে তিনটী ডাকাতি ও দুইটী খুন হইয়া গিয়াছে। খুনী বা ডাকাত আজ পর্য্যন্ত একটীও ধরা পড়ে নাই। যাহাতে নিরীহ নৌকাযাত্রীদের জীবন বিপন্ন না হয়, তজ্জন্য এই কড়া পাহারার ব্যবস্থা। বিমলবাবুর কোমরে চামড়ার খাপে পাচনলা একটী রিভলবার, তাহা ছাড়া, একটী দামী দোনলা বন্দুকও তাঁহার সঙ্গে ছিল। তিনি রীতিমত সশস্ত্র ছিলেন। সঙ্গে দুইজন বন্দুকধারী এবং আরও দুইজন লাঠিধারী সিপাই ছিল। বোটে মাঝি-মাল্লার সংখ্যাও পাঁচজন। তাহারা সকলেই সশস্ত্র। মাঝিকে একটা বন্দুক দেওয়া হইয়াছিল, মাল্লাদের দেওয়া হইয়াছিল সড়কী ও টাঙ্গী।

নৌকা ছাড়িবার তখন অল্প বিলম্ব ছিল, এমন সময় বড় দারোগাবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র মলয়কুমার বোটে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাসিতে হাসিতে বিমলবাবুর পত্নী অমিতাকে কহিল, "আপনিও পাহারায় বেরুচ্ছেন শুনলুম। তাই ছুটে এলুম।"

হাসিয়া অমিতা কহিল, "উনি ডাকাতদের পাহারা দেবেন—ওঁরও ত একজন পাহারার দরকার, তাই আমায় আসতে হ'ল।"

মলয় কহিল, "কাজটা কিন্তু ভাল করছেন না বৌদি'। বাবাও সেই কথা বলছিলেন। আপনাকে নিয়ে ওঁকে হয় ত সব সময় বিব্রত হ'য়ে থাকতে হবে।"

অমিতা কহিল, "কেন বল ত? যদি ডাকাত এসে বোট চড়াও হয়—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া মলয় কহিল, "ধরুন, যদি তাই হয়—ওসবটাও ত কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। বাবা বলছিলেন, এখন যারা ডাকাতি করে' বেড়াচ্ছে, তারা পুলিশের বড় তোয়াক্কা করে না। নিজের প্রাণের মায়া যাদের নেই—"

তাহারও বক্তব্য শেষ হইল না, অমিতা কহিল, "সব জেনে শুনেই এসেছি ঠাকুরপো—ও কথা থাক্। আচ্ছা, তোমার ত সকালেই ফেরবার কথা, তুমি যে একবারে বেলা শেষ করে' এলে? আমি ত ভেবেছিলুম, এ যাত্রায় আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না।"

মলয় কহিল, "কে জানত, হঠাৎ বিমল দা'র ওপর এমন কাজের ভার পড়বে, আর আপনিও তাঁর সঙ্গী হবেন।

৫০—২৭

আগে থেকে জানা থাক্‌লে, আমি ভোরেই রওনা হ'য়ে পড়্‌তুম। আচ্ছা বৌদি', আপনি ভূত দেখেছেন?"

অমিতা হাসিয়া কহিল, "হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করবার মানে—তুমি বুঝি দেখে এসেছ?"

মলয় কহিল, "হ্যাঁ বৌদি,' কাল সারারাত বসে' বসে' ভূত দেখা হয়েছে—তাই ত ভোরবেলা বাড়ী ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।"

অমিতা তেমনই হাসিমুখে কহিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, ভূতের ঠ্যাঙ্‌টা কি পাঁচহাত লম্বা বা একেবারে ছোট্ট—এই ধরো বিঘতটাক—"

মলয় কহিল, "ঠাট্টা নয় বৌদি', ভূতের চেহারা অবশ্য আমি দেখি নি, কিন্তু তার কাণ্ড দেখেছি। যে মেয়েছেলেটীকে ভূতে পেয়েছিল, সারারাত উঠোনের ওপর পড়ে' কি কাণ্ডই না করেছিল!—তাই দেখবার জন্যে গ্রামশুদ্ধ সেখানে ভেঙ্গে পড়েছিল।"

অমিতা কহিল, "তারা ত ভেঙ্গে পড়বেই, কিন্তু তুমি সহুরে মানুষ, কলেজে পড়ছ—গ্রামের লোকের কথা শুনে তুমি অমনি বিশ্বাস করে' বস্‌লে ও সব ভূতের কাণ্ড?"

মলয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আপনি কি বল্‌ছেন বৌদি', আমি যে নিজের চোখে দেখ্‌লুম।"

অমিতা কহিল, "তা' কি আমি অস্বীকার কর্‌ছি—কিন্তু ঐ দেখার মধ্যেই তোমার গোল রয়ে গেছে। হিষ্টিরিয়া বলে' একটা ব্যয়রাম আছে, তা' জান ত?"

মলয় কহিল, "আপনি যে কি বল্‌ছেন বৌদি', তার ঠিক্ নেই—হিষ্টিরিয়া আর ভূতে পাওয়া কি এক জিনিষ? ভূত রোজার কথার উত্তর দিলে, রোজার সঙ্গে কত ঝগড়া কর্‌লে—"

অমিতা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। ম্যাজিক দেখ নি ঠাকুরপো। নতুন কাপড়ের খানিকটা পুড়িয়ে ছাই করে' আবার সেখানটা যেমন ছিল তেমনি করে' দিচ্ছে—এও ঠিক তাই। রোজা তোমাদের যা' দেখাচ্ছে, যা' শোনাচ্ছে, তোমরা তাই দেখ্‌ছ, শুন্‌ছ—তারপর হিষ্টিরিয়া রোগীরা কত রকম কাণ্ডই না করে! তাই রোজারা তা'দের ঘাড়ে ভূত চাপিয়ে দেয়।"

মলয় চুপ করিয়া রহিল। সে বুঝিল, অমিতার সহিত তর্ক করিয়া সে পারিবে না।

বিমল এতক্ষণ কি লিখিতেছিল, লেখা শেষ করিয়া মলয়ের দিকে ফিরিয়া হাসিয়া কহিল, "কার হার হ'ল মলয়?"

মলয় এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিতে সম্মত নহে; কহিল, "আপনিই বিচার করুন বিমল দা', কার হার কার জিত?"

বিমল কহিল, "ভূত বলে' যখন কিছু নেই, তখন তোমারই হার।"

মলয় গম্ভীর হইয়া কহিল, "ভূত নেই, কে বল্‌লে?"

অমিতা হাসিয়া কহিল, "ভূত আছে বৈকি ঠাকুরপো, ভয় পেয়ে আমরা যা' দেখি তাই ভূত,—আর যা' কিছু দেখে আমরা ভয় পাই, তাই ভূত।"

ঘড়ির দিকে চাহিয়া বিমল কহিল, "এইবার তুমি বাসায় যাও মলয়, বোট ছাড়্‌বার সময় হয়েছে। দেখো মলয়, পাঁচজনের যা' তা' কথা বিশ্বাস করো না,—তুমি ভেবে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে ভূত বলে' কিছু নেই। আমাদের মনের বিকার মাত্র।"

মলয় বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বিমল মাঝিকে ডাকিয়া বোট ছাড়িবার আদেশ দিল এবং সিপাইদের কহিল, তাহারা যেন খুব হুঁসিয়ার হইয়া পাহারা দেয়।

* * *

অল্পক্ষণ পরে বোট চলিতে আরম্ভ করিল। বেশ বড় নদী। বোটখানা নদীর একধার ঘেঁসিয়া চলিতেছিল। ওপারের গৃহস্থবাড়ীর আলোগুলি ক্ষুদ্র জোনাকীর মত মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। চারিদিকে গভীর অন্ধকার—তীরের উপর আলোর ক্ষীণরশ্মি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তবে বোটের ছাদের উপর একটি পেট্রোলের লণ্টন জ্বলিতেছিল। তাহার দীপ্তিতে বোটের চারিপাশ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ঘণ্টাখানিক পরে বিমল কহিল, "তা' হ'লে তুমি এইবার ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

অমিতা হাসিয়া কহিল, "আর তুমি ?"

বিমল কহিল, "আমি একবার বার একবার ভেতর এই করে' বেড়াই। আমার ঘুমোন ত চল্‌বে না।"

অমিতা তেমনই ভাবে হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমার না চল্‌লে আমার চল্‌বে কেন ?"

বিমল হাসিয়া কহিল, "তুমি ত পুলিশের দারোগাগিরি করো না, কাজেই ঘুমোলে তোমার দোষ হবে না। তুমি শুয়ে পড়ো, আমি বাইরে থেকে একবার ঘুরে আসি।"

অমিতা কহিল, "যাদের খবরদারি করতে বেরিয়েচ. তাদের খবরদারি কর গে—আমার খবরদারি তোমায় করতে হবে না। সে ভার ত পুলিশের বড়সাহেব তোমায় দেন্ নি।"

বিমল কহিল, "তা' হ'লে—

বাধা দিয়া অমিতা কহিল, "আর হ'লে-ট'লের দরকার নেই—বাইরে থেকে ঘুরে এস। আমি তোমার সঙ্গে এসেছি কি ঘুমোবার জন্যে।"

বিমল গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, "তোমার মনের কথা কি করে' জান্‌ব বলো,—এখন দেখ্‌ছি তোমায় পুলিশে ঢুকিয়ে দিলে হ'ত।"

এই কথা বলিয়াই সে হাসিতে হাসিতে কামরার বাহির হইয়া গেল। মিনিট দশেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অমিতা বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া কাঁধে হাত দিয়া কহিল, "হ্যাঁ, জেদ বটে !"

অমিতা বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার যে ঘুম আসে না, কি করব বল।"

বিমল আদরের স্বরে কহিল, "তা' কি জানি না আমি। এইবার দু'জনে ঘণ্টাখানিক ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্।"

অমিতা কহিল, "সেই ভাল—একটু ঘুমিয়ে না নিলে তোমার অসুখ করবে যে।"

তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িল।

* * *

হঠাৎ এক সময় সিপাইদের চীৎকারে উভয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দু'জনে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

বিমল হাঁকিয়া কহিল, "কি, কি হয়েছে ?"

একজন সিপাই উত্তর দিল, "ডাকু ডাকু।"

কামরার কোণ হইতে ক্ষিপ্রহস্তে বন্দুকটি তুলিয়া লইয়া বিমল অমিতার দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি দরজা বন্ধ করে' দাও, দেখি ব্যাপারখানা কি ?"

বাহিরে গিয়া পাটাতনের উপর দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া সে কহিল, "ব্যাপার কি হে ?"

একজন বন্দুকধারী সিপাই কহিল, "হুজুর, ডাকু।"

বিমল কহিল, "কোথায় ?"

সিপাই অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গলুয়ের সাম্‌নের দিকে দেখাইয়া কহিল, "ঐ, ঐ দারোগা-সাহেব।"

বিমল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই জলের উপর একটা মানুষের মাথা স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

সিপাই বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখুন ডুব্‌লো, বজ্জাতি দেখ্‌ছেন। একটু পরে ঠিক উল্টো দিকে ভেসে উঠ্‌বে—দশ মিনিট ধরে' এমনই করে' বেড়াচ্ছে হুজুর। হুকুম পেলেই গুলি করে' ওর মাথার খুলিটা উড়িয়ে দি।"

বিমল কহিল, "এখন না—দেখি আগে। কোনো নৌকো এদিক ওদিক দেখ্‌তে পেয়েচ ?"

সিপাই কহিল, "না হুজুর, ঐ দেখুন আবার ভেসেছে।"

বিমল দেখিল, সত্যই মাথাটা বিপরীত দিকে ভাসিয়া উঠিয়াছে। কি মতলবে সে এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ! পুলিশের সশস্ত্র বোট বলিয়া কি বুঝিতে পারে নাই ?

মাথাটা এইবার ভাসিতে ভাসিতে কামরার জানালার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

বিমল হাকিল, "খবরদার, ওদিকে এগুবে কি গুলি করে' খুলি উড়িয়ে দেব।" এই বলিয়া মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুকটি বাগাইয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা জলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সিপাই কহিল, "শয়তানি দেখ্‌লেন হুজুর। ওর খারাপ মতলব আছে, না হ'লে এতক্ষণ ও পালাত।"

বিমল কহিল, "এইবার পালাবে। বুঝেছে ফের চালাকি করলে খুলি উড়বে।"

মাঝি কহিল, "ও একা নয়, সঙ্গে নিশ্চয়ই আরও লোক আছে, তারা দূরে দূরে ভেসে বেড়াচ্ছে। এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের ওপর ভেসে বেড়াতে পারে—ডুবে থাকতেও ওস্তাদ! খুব সাবধান হ'য়ে থাকতে হবে হুজুর। অন্য কোন ভয় করি না, তবে বোটের তলাটা না ফাঁসিয়ে দেয়।"

বিমল বুঝিল—মাঝির অনুমান মিথ্যা নহে। এইরূপ কোন দূরভিসন্ধি লইয়াই লোকটা বোটের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাই ত। একবার এদিক ওদিক সে চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়া লইল। নিকটে বা দূরে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। চারিদিকে গভীর অন্ধকার। কোথাও আলোকের একটু ক্ষীণরশ্মিও দেখা যাইতেছে না। যদি বোটের তলাটা ফাঁসাইয়া দেয়, তাহা হইলে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। তাহাদের দুইজনের —অমিতা ও তাহার সলিল সমাধি অনিবার্য্য—এতগুলা বন্দুক পিস্তল কোন কাজেই আসিবে না। বিমলের বুকের ভিতরটা দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু ভয় পাইলে ত চলিবে না। শেষ অবধি বাঁচিবার চেষ্টা করিতে হইবে ত। মাঝি-মাল্লা এবং সিপাইরা কেবল হৈচৈই করিতেছে। একজন মাল্লার দিকে চাহিয়া বিমল রুক্ষকণ্ঠে কহিল, "চুপ করে' বসে' কি দেখ্‌ছ। যাও, বেটাদের বুঝিয়ে দাও, এ পুলিশের বোট। সরকারি নিশান হয় ত দেখ্‌তে পায় নি। ডঙ্কা পেটো।"

বোটের পিছনে বড় একটা ডঙ্কা বাঁধা ছিল। একজন মাল্লা ক্ষিপ্রপদে ছাদের উপর উঠিয়া সজোরে ডঙ্কায় ঘা দিল। চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জলের ভিতর প্রতিধ্বনি তুলিয়া ডঙ্কা গভীর শব্দে বাজিয়া উঠিল।

মাঝি কহিল, "ডঙ্কার কথা স্মরণ ছিল না হুজুর। এইবার ওরা গা ঢাকা দেবে।"

বিমলের অন্তরে সাহস চতুর্গুণ বৰ্দ্ধিত হইল। মাঝিরা ঠিক্ অনুমান করিয়াছে—ডঙ্কার নিনাদ শুনিয়া ডাকাতদের দল বুঝিতে পারিবে কাহার বোটে তাহারা হানা দিতে আসিয়াছে। পাঁচ বৎসর পুলিশে কাজ করিয়া বিমল এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল যে, দুর্ব্বৃত্তদের দল পুলিশকে এড়াইয়াই চলিয়া থাকে। তাহারা পুলিশকে ঘাটাইতে নারাজ। ডাকাতরা যে পলাইবে, সে তাহা নিঃসন্দেহই বুঝিয়াছিল। কিন্তু ডাকাতদের সদলবলে পলাইবার সুযোগ দেওয়া উচিত হইল না। অন্ততঃ, যে দুর্ব্বৃত্তটা কাছে আসিয়াছিল, তাহাকে বন্দুকের গুলিতে আহত করিয়া গ্রেপ্তার করাই উচিত ছিল। সে সুযোগ যখন সে নিজেই নষ্ট করিয়াছে, তখন আর আপশোষ করিয়া ফল কি। আর ত তাহাকে নিকটে পাওয়া যাইবে না।

এমন সময় একজন সিপাই চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঐ, ঐ আবার মাথাটা ভেসেছে, কামরার জান্‌লা ধর্‌বার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে হুজুর।"

বিমল চমকিয়া উঠিয়া সেইদিকে চাহিল! কি দুঃসাহস! জানালার চৌকাঠ যে ধরিয়া ফেলিল। বিমল আর বিলম্ব করিল না, তৎক্ষণাৎ সেই হাতখানা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িল গুড়ুম গুড়ুম!

অমিতা যে কখন কামরা হইতে বাহির হইয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিমল তাহা জানিতেও পারে নাই। ডাকাতদের চিন্তায় সে এমনই বিভোর হইয়াছিল।

এইবার অমিতার কণ্ঠস্বর তাহার উপস্থিতি জানাইয়া দিল।

অমিতা কহিল, "লোকটার সাহস ত কম নয়।"

বিমল তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, "এই যে তুমি এসেছ—বেশ করেছ। আমারও মনে হয়েছিল, তোমায় বাইরে এসে দাঁড়াতে বলি। বেটার হাতখানা ছাতু হ'য়ে গেছে—এইবার তাকে ধরে' বোটে তুল্‌তে হবে। পালাতে আর হচ্ছে না।"

ঠিক্ সেই মুহুর্ত্তে জলের মধ্য হইতে একটা চাপা হাসির শব্দ উত্থিত হইল, হা হা হা!

উভয়ের সারাদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

অমিতা বিচলিত-কণ্ঠে কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! গুলি তা' হ'লে লাগে নি ত!"

বিমল অস্থিরচিত্তে কহিল, "তাই ত দেখ্‌ছি—এত কাছ থেকে গুলি কর্‌লুম, গুলি লাগ্‌ল না!"

আবার সেই হাসি—হা হা হা!

ক্ষোভে ও অপমানে বিমলের মুখ চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। অব্যর্থলক্ষ্য বলিয়া বিমলের বিশেষ সুনাম ছিল। তজ্জন্য মনে মনে সে গর্ব্বও অনুভব করিত। সিপাই ও মাঝি-মাল্লাদের সম্মুখে আজ সে সুনাম এমনইভাবে নষ্ট হইয়া গেল!

যে সিপাই প্রথমে গুলি চালাইবার আদেশ চাহিয়াছিল, সে শ্লেষ করিবার এ সুযোগ ছাড়িল না; কহিল, "হুজুর, হুকুম দিলে আমি ওর মাথা উড়িয়ে দিতুম—ওকে আর হাস্‌তে হ'ত না।'

রোষকম্পিত-কণ্ঠে বিমল কহিল, "কারু কিছু করতে হবে না, শয়তানের মাথার খুলি আমিই ছাতু করে' ফেলব। বেটা ভেবেছে কি।"

এইবার চতুর্দ্দিকের জলরাশি প্রকম্পিত করিয়া বিকট রবে হাসি উত্থিত হইল, হা হা হা।

কিছুক্ষণের জন্য সকলে আড়ষ্ট ও স্তব্ধ হইয়া গেল!

বোটখানিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া সেই হাসির শব্দ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে শব্দের যেন বিরাম ছিল না। কিন্তু সে তীক্ষ্ণতা সে বিকটভাব ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া গিয়া শ্লেষের ভাব সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছিল।

বিমলের বিমূঢ়ভাবটা তখন অপসৃত হইয়া গেল। তাহার অন্তরে দারুণ ক্রোধের সঞ্চার হইল এবং এই মর্ম্মান্তিক অপমানের প্রতিশোধ লইবার প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে স্পষ্ট বুঝিল, জলদস্যুর দল চারিদিক হইতে বোটকে ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। পুলিশের ডঙ্কা ও বন্দুক তাহাদের দুঃসাহসিক অন্তরে বিভীষিকার কণামাত্র সঞ্চার করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাও কি সম্ভব? তাহা না হইলে এই হাসি, এই বিদ্রূপাত্মক হাসি—বিমল ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া হুকুম দিল, "গুলি চালাও, চারিদিকে গুলি চালাও। এক বেটাও না জ্যান্ত ফেরে।"

এই বলিয়াই হাসির শব্দ অনুসরণ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ বন্দুক ছুঁড়িল। হুকুম পাইয়া সিপাইরাও অনির্দ্দিষ্টভাবে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। সে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়া গেল। যত গুলি চলিতে লাগিল, হাসির জোর যেন ততই বাড়িতে লাগিল।

হঠাৎ বিমলের হুঁস হইল। তাই ত, পাগলের মত এ কি করিতেছে সে। টোটা যে এখনই শেষ হইয়া আসিবে। তখন বোটের উপর ডাকাতরা উঠিয়া পড়িলে তাহারা ত কিছুই করিতে পারিবে না। তৎক্ষণাৎ সে হুকুম দিল, "থামো।"

গুলিবর্ষণ ক্ষান্ত হইল। হাসির শব্দও সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না। তবে সকলের অন্তরে যে উদ্বেগ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও যেন ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর অমিতা বিমলের দেহ স্পর্শ করিয়া কহিল, "তারা ঠিক পালিয়েছে।"

বিমল কহিল, "তাই ত মনে হচ্ছে।"

অমিতা এইবার হাসিয়া কহিল, "তারা বেশ বুঝেছে, এখানে সুবিধে হবে না। বাবা, যে রকম গুলি চল্‌ছিল! যতবড় ডাকাতই হোক্, মানুষ ত।"

বিমলও হাসিয়া উত্তর দিল, "সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ হয়েছিল—এমন দুঃসাহস কি মানুষের হয়!"

অমিতা তেমনই ভাবে হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা' হ'লে ওরা মানুষ নয়, ভূত বল? তুমিও মলয় ঠাকুরপোর দলে—"

এমন সময় ছাদের উপর হইতে মাঝি ভয়ার্ত্ত ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দারোগাবাবু, গলুই গলুই"—আর কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

বিমলের বুকের ভিতরটা 'ছ্যাঁৎ' করিয়া উঠিল। তাহার দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে গলুয়ের উপর গিয়া নিবদ্ধ হইল। কি সর্ব্বনাশ! গলুয়ের উপর গেঞ্জি গায়ে একটা লোক বসিয়া আছে। তাহার মাথাটা দেহ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কি বীভৎস

লোমহর্ষক দৃশ্য! এই মাত্র কে যেন তাহার ঘাড়ের উপর দায়ের কোপ বসাইয়াছে। কাঁধের উপর পিঠের উপর রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। বিমল হতভম্বের মত পলকহীন দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল! অমিতা একবার দেখিয়াই গভীর ভয়ে চক্ষু মুদিয়া কম্পিত হস্তে বিমলের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল। কোথায় গেল, তাহার সেই মনের বল, কোথায় গেল, 'ভূত কিছু নয়' সেই ধারণা? মাঝি-মাল্লারা সমস্বরে রামনাম করিতে লাগিল এবং সিপাইদের মধ্যে কাহারও মুখ দিয়া রাম-নাম কাহারও মুখ দিয়া আল্লার নাম মুহুর্মুহু ধ্বনিত হইতে লাগিল। বোটখানাও যেন দিশাহারা হইয়া স্রোতের মুখে বেগে ভাসিয়া চলিল। চারিদিক নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, গভীর তমসাচ্ছন্ন।

বিমল অসমসাহসী ও বলিষ্ঠ যুবক। ভয়ে একেবারে অভিভূত বিমূঢ় হইয়া পড়িবার পাত্র সে নহে। অকস্মাৎ এই বীভৎস দৃশ্য তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় সে কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। সেই ভাবটা কাটাইয়া উঠিতে তাহার বেশী সময় লাগিল না। জোর করিয়া মনের বল পুনঃ সঞ্চয় করিয়া লইয়া সে একবার স্থির-দৃষ্টিতে এই প্রায়-দ্বিখণ্ডিত মস্তক নরদেহের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার দৃষ্টিভ্রম হয় নাই ত? না, প্রথমে যে অবস্থায় এই লোকটাকে সে দেখিয়াছিল, ঠিক্ সেই অবস্থায়ই ত সে বসিয়া আছে। ব্যাপারটা কি এইবার তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। মাথাটা দেহের উপর নাই বলিলেই হয়। এরূপ অবস্থায় কোন লোক বাঁচিয়া থাকিতে পারে না— প্রাণহীন দেহও এমন সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তবে? ইহা কি জলদস্যুদের কোনরূপ চাতুরী, ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার এক অভিনব কৌশল? বিমল একবার জলের দিকে চাহিয়া দেখিল। দুই পাশের জল কাটিয়া বোটখানা যেন তরতর করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। তবে ত তাহার অনুমানই ঠিক্ হইয়াছে। জল-দস্যুরাই বোটখানাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

বিমল চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাঝি, মাঝি, বোট সামলাও, বোটের মুখ ফেরাও।"

মাঝি ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "বাবু, রামনাম উচ্চারণ করুন। রাম রাম রাম!"

বিমল ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কি পাগলের মত বক্‌ছ। বোটের মুখ ঘোরাও। দেখ্‌তে পাচ্ছ না টেনে নিয়ে যাচ্ছে।"

মাঝি কোন উত্তর দিল না, আরও জোরে রামনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল।

ক্রোধে বিমলের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। মাঝির এতবড় স্পর্দ্ধা, হুকুম মানে না! বোটের মুখ ফিরান আগে দরকার। না হইলে টানিতে টানিতে তাহাদের আড্ডায় লইয়া তুলিবে, তখন আর কোন উপায় থাকিবে না। না, তাহা হইতে দিবে না, নিজে গিয়া হাল ঘুরাইয়া বোটের মুখ ফিরাইবে।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া ছাদের দিকে অগ্রসর হইতে গেলে, অমিতা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ভয়কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

ব্যগ্রভাবে বিমল কহিল, "ছাদে, ছাদে। এখনই বোট ঘোরাতে হবে, না হ'লে সর্ব্বনাশ! ছেড়ে দাও, হাত ছেড়ে দাও।"

অমিতা কাতরভাবে কহিল, "মর্‌তে হয় একসঙ্গে মর্‌ব, আমায় ফেলে কোথাও যেও না। গলাকাটা মানুষ কি অমন করে' বসে' থাক্‌তে পারে।"

অমিতাকে সে জানে। সহজে অমানুষিক কিছু বিশ্বাস করিবার পাত্রী ত সে নয়। বিমলের অন্তরে সংশয়ের উদয় হইল। তাই ত, তবে কি সত্যই অলৌকিক কোন কাণ্ড! সে আর একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। তখনও তাহার চোখের সম্মুখে গলুয়ের উপর সেই প্রায়-ছিন্নমস্তক নরদেহ তেমনই সোজা হইয়া বসিয়া আছে। চারিদিক হইতে রামনাম ও আল্লানাম উচ্চারণেরও বিরাম ছিল না। সেই হয় ত ভুল ধারণা করিয়াছিল। এ দেশের ডাকাতদের এতবড় বুকের পাটা নাই যে, তাহারা জ্ঞাতসারে সশস্ত্র পুলিশের বোট আক্রমণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে

হইবে? ভূত—দুর্ব্বল হৃদয় ব্যক্তির কাল্পনিক সৃষ্টি—সেই ভূতের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে হইবে? না না, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না! এত সহজে এতবড় একটা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে সে রাজি নহে।

অমিতার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "তুমিও আমায় একথা বিশ্বাস করতে বলছ।"

অমিতা কহিল, "নিজের চোখকে যে অবিশ্বাস করতে পারছি না। এ সব কাণ্ড কি মানুষে করতে পারে?"

তাহার এ কথায় বিমল সায় দিতে পারিল না। কহিল, "যাদুবিদ্যেও ত হ'তে পারে। ডাকাতদের ত অসাধ্য কিছুই নেই।"

অমিতা এ কথার কি উত্তর দিবে! সেই ত আজ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মলয়কে এই কথাই বলিয়া ভূতের অস্তিত্বকে উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এ ব্যাপারটা ত ভূতে পাওয়া এবং রোজার সেই ভূত ছাড়ানোর ব্যাপার নহে। এ যে স্পষ্ট চোখের সামনে বসিয়া আছে — কোন রোজা বা এমন কেহ নিকটে বা দূরে নাই যে, যাদুবিদ্যার দ্বারা তাহাদের অভিভূত করিয়া দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি লোপ করিয়া দিতে পারে। সেই বিকট হাসির শব্দ যে এখনও কাণের মধ্যে বাজিতেছে।

তাহার এই নীরবতায় বিমলের মনের খটকা আরও বাড়িয়া গেল। সে কহিল, "না, একবার পরখ করে' দেখ্‌তে হবে।"

অমিতা কহিল, "কাজ কি হাঙ্গামার ভেতর গিয়ে।"

এমন সময় আবার সেই হাসির শব্দ উত্থিত হইল, 'হা হা হা—হা হা হা!'

এবারকার সে হাসি বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী!

সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝুলিয়া-পড়া মাথাটা সোজা হইয়া লোকটার কাঁধের উপর বসিয়া গেল। সকলে গভীর বিস্ময়ে দেখিল, একটী সুশ্রী বলিষ্ঠ ভদ্রযুবক নির্ব্বিকারচিত্তে গলুয়ের উপর বসিয়া আছে। মুখখানি তাহার অত্যন্ত ম্লান। বুকের ব্যথা যেন স্পষ্ট মুখের উপর প্রতিফলিত। এই একটু আগে যে বীভৎস দৃশ্য সে দেখিয়াছিল, তাহার কথা বিমল ভুলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, যেন ভয়ানক বিপদে পড়িয়া একটী ভদ্রলোক তাহাদের নিকট সাহায্য চাহিতে আসিয়াছে।

বিমলের মুখ দিয়া আপনি প্রশ্ন বাহির হইয়া আসিল, "বিপদে পড়েছেন বুঝি?"

কে উত্তর দিবে!

বিমল আবার প্রশ্ন করিল, কোন উত্তর পাইল না। তাহার অন্তরে তখন ক্রোধের সঞ্চার হইল। সে তীব্রকণ্ঠে কহিল, "এখানে কি চাই? চলে' যাও এখান থেকে।"

কিন্তু তাহার নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

অমিতা চাপাগলায় কহিল, "ও কি মানুষ, যে, তোমার কথার উত্তর দেবে, না তুমি বল্‌লেই চলে' যাবে। দেখছ না, ও যে একটা ছায়া, ওর হাড়-মাংস কই? চলো, চলো, আমরা ওর সাম্‌নে থেকে সরে যাই। আমার শরীরের ভেতর কেমন করছে।"

মাঝি-মাল্লা ও সিপাইরা তখনও রাম ও আল্লার নাম করিতেছিল—কিন্তু অতি ধীরে। তাহাদের কণ্ঠস্বর যেন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। অমিতারও এই অবস্থা। কেবল বিমল তখনও নিজেকে কতকটা সংযত করিয়া রাখিয়াছিল। বুঝি বা আর সে পারে না। সেও দেহের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য অনুভব করিতেছিল। সে যে কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। অমিতা এতক্ষণ দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহার সে বন্ধনও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল।

এমন সময় মাঝি-মাল্লা ও সিপাইরা সমস্বরে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল—"ভগবান রক্ষা করেছে, আল্লা জান বাঁচিয়েছে!"

বিমলের মনে হইল, তাহার বুকের উপর হইতে যেন একটা গুরুভার নামিয়া গেল। অমিতাও স্বস্তি অনুভব করিল। সেই ভীতিপ্রদ নরদেহ তখন সকলের চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে যেন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে!

বোটখানা একেবারে তীর ঘেঁসিয়া চলিতেছিল। আর একটু হইলে তীরের উপর গিয়া সজোরে ধাক্কা খাইত। মাঝি হাল ঘুরাইয়া বোটখানাকে সোজা করিয়া রাখিল, মাল্লারা লগি মারিয়া তীর হইতে দূরে ঠেলিয়া দিল।

বিমল ও অমিতা তখনও সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল। বিমল বলিয়া উঠিল, "সাম্নে একখানা নৌকো বাঁধা রয়েছে না?"

একজন সিপাই কহিল, "হাঁ হুজুর।"

বিমল তীরের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "এখানে ত কোন গ্রাম দেখা যাচ্ছে না, এখানে নৌকো বাঁধা কেন—দেখো, নৌকোয় কোন লোক আছে কি না।"

নৌকাখানি বোট হইতে মাত্র চার-পাঁচহাত দূরে ছিল। বিমলের কণ্ঠস্বর সেই নৌকার ভিতর গিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন নারীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর বাহির হইয়া আসিল—"তোমরা যে হও, আমায় রক্ষা কর!"

বিমল হাঁকিয়া কহিল, "ভয় নেই, ভয় নেই—" এই বলিয়াই সে বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল এবং সিপাইদের অনুসরণ করিবার আদেশ দিয়া তখনই এক লাফে গিয়া তীরের উপর পড়িল। বোটের দিকে ফিরিয়া অমিতাকে কহিল, "তুমি কামরার ভেতর চলে' যাও। রিভলবার রইল, দরকার হয় ব্যবহার করো।"

নৌকার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইতেই বিমল দেখিল, দুই ব্যক্তি সেই নৌকা হইতে তীরের উপর লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিবার উপক্রম করিতেছে। বিমল চীৎকার করিয়া উঠিল, "ধর ধর, যেন পালাতে না পারে। যদি ধর্‌তে না পার, গুলি করে' পা ভেঙ্গে দাও।"

সিপাইরা ছুটিয়া গিয়া সেই লোক দুইজনকে ধরিয়া ফেলিল। সহসা এইভাবে আক্রান্ত হইয়া তাহারা অত্যন্ত ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, না হইলে এত সহজে হয় ত তাহারা ধরা দিত না।

নৌকার বাহিরে দাঁড়াইয়া বিমল কহিল, "আমি পুলিশের দারোগা, আপনার কোন ভয় নেই। যারা পালাচ্ছিল, সিপাইরা তাদের ধরেছে।"

ভিতর হইতে আর্ত্তকণ্ঠে উত্তর আসিল, "দারোগাবাবু, দারোগাবাবু, ঘণ্টাকতক আগে এলেন না কেন, তা' হ'লে আমার এতবড় সর্ব্বনাশ হ'ত না! খানিক আগে এই নদীতে, এই নৌকোর ঠিক গলুয়ের ওপর আমার চোখের সাম্নে আমার স্বামীকে ওদের মধ্যে ঐ বেঁটে লোকটা দায়ের এক কোপে কেটেছে। উনি তখন ওখানে বসে' মুখ ধুচ্ছিলেন। দা দিয়ে হঠাৎ এমন জোরে ঘাড়ের ওপর কোপ মারলে—মাথাটা একেবারে বুকের ওপর ঝুলে পড়্‌ল! তিনি ঝপ্ করে' জলের মধ্যে পড়ে' গেলেন। আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল—আমিও জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছিলুম দারোগাবাবু। ঐ লম্বা লোকটা আমায় জাপ্‌টে ধরে' আট্‌কে রাখ্‌লে—মর্‌তে দিলে না, মর্‌তে দিলে না, উঃ, মরতে দিলে না!" আর কোন কথা শোনা গেল না।

বিমল কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

ফণীন্দ্রনাথ পাল

ক্যাব্‌লার কলিকাতা ভ্রমণ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ় মাসে বিবাহ হইয়াছে, আশ্বিন মাসে পূজার ছুটিতে ক্যাব্‌লা কলিকাতা বেড়াইতে আসিল। মালদহ জেলার সুদূর পল্লীগ্রামে তাহার নিবাস। কিছুদিন দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ নামক গ্রন্থ লইয়া গ্রামস্থ প্রাথমিক নিম্নবিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতে করিতেই ক্যাবলার বয়স যখন সপ্তদশ হইল, তখন বিধবা মাতার পুত্রদায় উপস্থিত হইল। অনেক খোঁজ-খবরাদির পর পাশের গ্রামেই কন্যা পাওয়া গেল। শুভদিনে বর বধূ একসূত্রে আবদ্ধ হইল। কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান, পাত্রীর অভাব কি? সদ্য আইনকে রম্ভা প্রদর্শন করিয়া শ্রীমান্ কেবলরাম গঙ্গোপাধ্যায় অষ্টম-বর্ষীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণকলঙ্কিনীর স্বামী হইলেন। কৃষ্ণকলঙ্কিনীর গৃহে বৃদ্ধ পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নদেরচাঁদ ও তাহার সহধর্ম্মিনী মাতঙ্গিনী। নদেরচাঁদ কলিকাতায় থাকে, মাড়োয়ারীর খাতা লেখে, ভাড়া আদায় করে, এখানে ওখানে যায়, বাজার-টাজার করে, এজন্য সদুপায়ে পায় বাইশ টাকা বেতন এবং দু'হাতে উপার্জ্জন করে মাসিক আরও পঞ্চাশ-ষাট টাকা। উক্ত ধনীরই বড়বাজারে পায়রা-খোপী বাড়ী আছে, তাহাতে প্রায় তিনশত ঘর ভাড়াটিয়া মাড়োয়ারী বাস করে—নদেরচাঁদও সেইখানে একটি কুঠরীতে বিনা ভাড়ায় থাকে ও সুলতানপুরের হরবিলাস চোবের 'পবিত্র হিন্দু হোটেলে' দৈনিক এগার পয়সা খরচে দুইবেলা খায়।

গ্রামে নদেরচাঁদের খুব নামডাক, কারণ, সে কলিকাতায় থাকে, সেখানে চাকরী করে এবং বহু টাকা ঘরে আনে। নদেরচাঁদের বাপ ছিলো বাঁড়ুয্যে (লালগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়) কিন্তু নদেরচাঁদ, নদেরচাঁদবাবু। নদেরচাঁদের তিন জোড়া জুতা, চার জোড়া ধুতি, ছয়টা কোট, কামিজ, পাঞ্জাবী প্রভৃতি জামা, দুইটা গেঞ্জী, যাতায়াত করিতে চাম্‌ড়ার সুটকেস্, তাহার মধ্যে ছোট আয়না, চিরুণী, সেফটি ক্ষুর, সাবান, সুবাসিত 'কেশ বিনাশ' তৈল, সিগারেট, সিগারেট কেস্, এমনি কত কি। নদেরচাঁদ বাড়ী আসিলেই এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য দর্শন মানসে সারা গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ভাঙিয়া পড়ে; নদেরচাঁদ গম্ভীরভাবে সব দেখায়, বুঝাইয়া দেয় ও আত্মপ্রসাদের গর্ব্বে ফুলিয়া উঠে। কত আশ্চর্য্য গল্প বলে—লোকে রূপকথার মত নির্ব্বাক বিস্ময়ে শোনে এবং মনে মনে নদেরচাঁদের মতই বংশতিলক কামনা করে।

বিবাহের পর ক্যাব্‌লা নদেরচাঁদের কাছে কলিকাতার এইরূপ নয়নমনোহর কাহিনী শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, কলিকাতা দর্শন করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া পড়িল। নদেরচাঁদ প্রথমটা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিল, কলিকাতায় তাহার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলে গ্রামে ও কুটুম্ব স্থানে তাহার পশার-প্রতিপত্তি লাঘব হইবে ভাবিয়া। কিন্তু একটু চিন্তা করিতেই নদেরচাঁদ বুঝিল, শ্রীমান্ কেবলরামের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতি তো হইবেই না, বরং সে গ্রামে ফিরিয়া আসিলে আরও সুখ্যাতি রটাইবে। নদেরচাঁদ সকৃতজ্ঞভাবে জানাইল—"নিশ্চয় এবার পুজোর পর তোমায় কোলকাতা নিয়ে যাবো। সব দেখিয়ে শুনিয়ে দোব—কোন কষ্ট হবে না।" কত ভাগ্যের ভগিনীপতি! তাহার একটা আবদার কি অপূর্ণ থাকে?

নদেরচাঁদের সঙ্গে ক্যাব্‌লা কলিকাতায় যাইবে, ইহাতে ক্যাব্‌লার জননীরও কোনো আপত্তি হইল না; অর্থাৎ, কেবলরামের উত্তেজনায় ও উৎসাহে তাহা টিঁকিল না। গ্রামের সকলেই একবাক্যে বলিল—নদেরচাঁদের অপেক্ষা কলিকাতা বিষয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি জেলার জজ-সাহেবও নহেন।

ক্যাবলা 'দাদা'র সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিল। যে জীবনে রামগোপালপুর গ্রামের চৌহদ্দী কখনও পার হয় নাই, সে একেবারে কলিকাতা চলিল। ক্যাব্‌লা যেন রূপকথার রাজপুত্তুর! তেপান্তরের মাঠ পার হইয়া সে ষ্টেশনে আসিল। ষ্টেশন দেখিল, রেলগাড়ী দেখিল, রেলগাড়ীর বাঁশী শুনিল! তাহার আনন্দ দেখে কে? নদেরচাঁদ যতই তাহাকে সংযত হইতে বলে, ক্যাব্‌লা ততই বিস্ময়াবেগে যাহা নজরে পড়ে, তাহারই পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া থাকে এবং 'দাদা'টিকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে। নদেরচাঁদ আপনার জ্ঞানগর্ব্বে ভগিনীপতিকে বুঝায়।

ষ্টেশনে ষ্টেশন-মাষ্টারকে দেখিয়া ক্যাবলা হাসিয়াই আকুল। জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা, এ কী জাত? মোছড়-মানদের মত লুঙ্গি পরে, আবার খানিক মাথা কামানো, মস্ত টিকি, ফোঁটা—"

দাদা জানাইল—"এ মাদ্রাজী বামুন—"

কুলির সঙ্গে নদের চাঁদ হিন্দী ভাষাতে কথা কহিতেছে শুনিয়া ক্যাব্‌লা জিজ্ঞাসা করিল—"এ কী বল্‌চ এর সঙ্গে?"

নদেরচাঁদ কহিল—"এরা খোট্টা! খোট্টা ভাষায় এদের সঙ্গে কথা কইতে হয়।"

তাহারা গাড়ীতে উঠিল, গাড়ী চলিল। লাইনের নীচে ক্ষেতে পিঠে ছেলে বাঁধা বলিষ্ঠদেহা নারী ও পেশীবহুল কৃষকগণকে দেখিয়া ক্যাব্‌লা কহিল—"দাদা, দাদা, একটা মজা দেখ—ঐ—ঐ—"

দাদা জানাইল,—উহারা বাঙালী নহে, সাঁওতাল। ক্যাব্‌লা বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে নদেরচাঁদের মুখপানে চাহিল। নদেরচাঁদ কহিল—"বাঙালী চাষা দিয়ে ভালো কাজ পায় না ব'লে ধনীরা ওদিকে এখানে আনিয়েছেন।"

ক্যাব্‌লা কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ একজন আগন্তুককে দেখিয়া সে তাহার পানে নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল, মুখের কথা মুখেই মিলাইয়া গেল। আগন্তুক সাম্‌নের বেঞ্চে বসিয়াই পাণ সাজিতে আরম্ভ করিল। ক্যাব্‌লা একদৃষ্টে তাহা দেখিতেছিল; নদেরচাঁদ তাহার তন্ময়তা ভঙ্গ করিয়া দিয়া জানাইল—"ও হচ্ছে উড়ে! ষ্টেশনধারের গাঁয়ে গাঁয়ে প্যাঁজবড়া, পকৌড়ি বেচে বেড়ায়।"

ক্যাব্‌লা জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়েমানুষ?"

নদেরচাঁদ উত্তর দিল—"দূর—পুরুষ! ঝুঁটি থাক্‌লেই বুঝি মেয়েমানুষ হয়?"

—"না, না, শুধু ঝুঁটী কেন? দাড়ি গোঁফ নেই, পাণ সাজ্‌চে—"

নদেরচাঁদ মৃদু হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না। গাড়ী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটা বড় জংসনে পৌঁছিল। ক্যাব্‌লা অবাক্‌ হইয়া ষ্টেশনের ভীড়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

নদেরচাঁদ দেখাইয়া দিল, কয়েকজন শিখ অভদ্রভাবে একটা বাঙালী জনতার পশ্চাতে ধাক্কা দিতে দিতে নিজেদের পথ করিয়া লইতেছে। তাহাদের ধাক্কায় বাঙালীরা সন্ত্রস্তভাবে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। নদেরচাঁদ কহিল—"এরা শিখ্‌! এরা এখানে বাস চালায়, মনোহারী দোকান করে, মোটর-টায়ার সারানোর দোকানও কারো কারো আছে।"

ক্যাব্‌লা সব বুঝিল না, তবে এইটুকু মাত্র শিখিল যে, শিখ্‌ নামে একপ্রকার জীব আছে, যাহারা বাঙালীকে ধাক্কা মারে এবং নানা উপায়ে বেশ দু'পয়সা রোজগারও করে।

গাড়ী ছাড়িবার অনতিপূর্ব্বেই তিন-চারজন মাড়োয়ারী আসিয়া মহাকোলাহল করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিল। তাহারা পরস্পর আলাপ করিতেছিল কি বচসা করিতেছিল সঠিক বুঝিতে না পারিয়া ক্যাব্‌লা জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে দাদার মুখ পানে চাহিল।

নদেরচাঁদ আস্তে আস্তে কহিল—"এরা মাড়োয়ারী! পাটের দর নেমে গেছে কি না, তাই নিয়ে রঙ্গরস রসিকতা আর আলোচনা করচে।"

ক্যাবলা নিশ্চিন্ত হইল যে, ঝগড়া নয়। সে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ঝগড়া যদি মারামারিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে কোন্‌ না তাহারও গায়ে দুই-এক ঘা লাগিয়া যাইবে।

সে জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদের পাটের দাম কম্‌লো কি বাড়লো তা'তে ওদের কি এসে গেল ?"

নদেরচাঁদ জিভ কাটিয়া কহিল—"আরে, বাপরে ! ওরাই তো আমাদের দেশের মালিক ! শুধু পাট কেন, চাল, ধান, গুড়, গম, সর্ষে তিল, কার্পাস তুলো অর্থাৎ যা' কিছু আমাদের দেশে জন্মায়, সবই তো ওদেরি হাতে—হাতে কেন মুঠোর মধ্যে ! ওরা যদি ছাড়ে, তবে আমরা খেতে পাব ! কাপড়ও তাই। এক কথায়, বাঙলা দেশের অন্নবস্ত্রের মালিক মাড়োয়ারীরাই, বাঙালী নয়। এর বেশী তুমি বুঝবে না, শুধু এইটুকু জেনে রাখ।"

ক্যাব্‌লা জানিয়া রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। নদেরচাঁদ সগর্ব্বে কহিল—তাই তো মাড়োয়ারীর চাকরী করি। কম করেচি আমি এদের জন্যে ? তবে না মালিকরা আমায় এত ভালবাসেন।"

গাড়ী অবশেষে কলিকাতা পৌছিল।

নদেরচাঁদ অনেক কষ্টে ভগিনীপতিটিকে ভীড় হইতে বাহির করিয়া, তাহার হাতে নিজের বোঁচকাটি দিয়া, তাহাকে ধরিয়া চলিতে লাগিল।

ক্যাব্‌লা কেবলি হোঁচট খায় ও লোকের গায়ে পড়ে, কারণ, চক্ষু তাহার উপরে, দক্ষিণে, বামে, পথে নয়। নদেরচাঁদ যতই বলে—পথ পানে চেয়ে চলো, ক্যাবলা ততই এদিক ওদিক চায় ও ধাক্কা খায়।

অতিকষ্টে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া, 'রিকশ ষ্ট্যাণ্ডে' ক্যাব্‌লাকে দাঁড় করাইয়া নদেরচাঁদ গেল জনৈক মাড়োয়ারীর আহ্বানে তাহার সহিত কথা বলিতে। যাইবার আগে নদেরচাঁদ ভগিনীপতিকে দশবার বলিয়া গেল যে, সে যেন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া একপাও না নড়ে। শীঘ্রই সে ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু ক্যাব্‌লা সে আদেশ পালন করিতে পারিল না। একজন সার্জ্জেণ্ট ও জনৈক কনেষ্টবলকে রিক্সাওয়ালাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়াই সে সেখান হইতে একদৌড় দিয়া পুনরায় ষ্টেশনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কেবলরামের দেহসৌষ্ঠব, মুখশ্রী এবং কার্য্যকলাপ দেখিয়া দুই-চারি করিয়া বহু কৌতূহলী দর্শকের ভীড় জমিয়া গেল; ভীড়ের চাপে পুলিশও আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন পায়জামাপরা, গায়ে সার্ট, তদুপরি কোট, পায়ে স্যাণ্ডাল বলিল—তাহার পকেট-মারা গিয়াছে।

পুলিশের কনেষ্টবল ক্যাব্‌লাকে জিজ্ঞাসা করিল—সে উক্ত ব্যক্তির পকেট মারিয়াছে কি না ?

ক্যাব্‌লা ভাতমারা, ডালমারা, জুতামারা, লাথিমারা, এমন কি, মাবা যাওয়ার কথাও শুনিয়াছে, কিন্তু পকেটমারার কথা কখনও শোনে নাই, কাজেই সে ফ্যালফ্যাল্ করিয়া কনেষ্টবলের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কনেষ্টবল বৃথা সময় নষ্ট করিবার লোক নহে। দুই-চারিবার জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোনও জবাব পাইল না। লোকে কহিল—"জবাব দেবে কি, এই তো ছুটে পালাচ্ছিল।" প্রমাণ অকাট্য। কনেষ্টবল কহিল—"চল থানামে।"

দর্শকগণ বলাবলি করিল—"এখনও কাঁচা, পকেটমারে নতুন ব্রতী।"

কেবলরাম কলিকাতা বেড়াইতে আসিয়া, প্রথম ঢুকিল গারদে।

দারোগাবাবু পাকা লোক। বেশ লম্বা-চওড়া বপু, উচ্চতা প্রায় সাতফুট, পেটের ভুঁড়িটির পরিধি সাড়ে আটসট্টি ইঞ্চি, ওজন চার মণ, বত্রিশ সের, তিন ছটাক—দেহের বর্ণ নিকষ কালো, কৃষ্ণতর লোমাধিক্যে গায়ের চামড়া দেখা যায় না, মাথাটা ঢাকা দিয়া চিৎ করিয়া শোয়াইলে একটি ভালুক বলিয়া ভ্রম হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। অনেকবার ডিগ্রেড্ হইয়া সম্প্রতি কায়েমী সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্টাররূপে এই থানার ভার পাইয়াছেন।

থরথর কম্পিত ও সিক্তবস্ত্র কেবলরামকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"আরে হনুমান্ সিং, এ কি করেচ ? এ কি

কখনও পকেট-মার হয় ? এ একটা অজ পাড়াগেঁয়ে দেখ্‌চ না ?"

হনুমান্ সিং যাহা জানিত, বলিল। দারোগাবাবু শ্রীমান্‌কে জেরা করিতে লাগিলেন।

দা—"তোমার নাম কিহে ?"

ক্যা—(সরোদনে কাঁপিতে কাঁপিতে) "ক্যাব্‌লা।"

দা—"তা' তো চেহারা দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌চি—বাড়ী কোথা ?"

ক্যা—"আজ্ঞে, রামগোপালপুর।"

দা—"সে কোথা ?"

ক্যা—"আজ্ঞে, কাশীপুর, হরগোণা, বনকাপাসী, বৌকাটি, চিংড়িপোতা, রামগোপালপুর—সব নাগানাগি।"

দা—"আচ্ছা, আচ্ছা, এখানে কবে এসেচ ?"

ক্যা—"এই বিয়ানেই। আমার দাদা নদেরচাঁদবাবুর সঙ্গে। দাদা আমায় দাঁড়াতে বলে' কোথায় গেল, আর—"

দা—"তোমার কেমন দাদা ?"

ক্যা—"দাদা আমার ইস্তিরীর দাদা—আমিও তাকে দাদা বলি।"

দা—"ও তোমার শালা।"

কেবলরাম লজ্জায় লাল হইয়া জিভ্ কাটিল। দারোগা-বাবু হাসিলেন।

দা—"তা' তোমার দাদাটি থাকেন কোথা ?"

ক্যা—"কোলকাতায়।"

দা—"কোন্ ঠিকানায় ?"

ক্যাবলা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। ভাবিল, বলে কি ?

দা—"ঠিকানা কিহে ?"

কনেষ্টবল বলিল—"বোধ হয় জানে না।"

এমন সময় বৎসহারা গাভীর মত হাঁপাইতে হাঁপাইতে হন্তদন্ত হইয়া দাদা নদেরচাঁদ আসিয়া উপস্থিত। নদের-চাঁদকে দেখিয়া কেবলরাম—"দাদা—দাদা" বলিয়া দাদাকে জড়াইয়া ধরিল।

দারোগাবাবু বুঝিলেন, তিনিই দাদা।

নদেরচাঁদ কি বলিতেছিল, দারোগাবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"আর কিছু বল্‌তে হবে না, খুব হয়েচে! এমন গর্দ্দভটিকে একলা ছেড়ে দিয়ে কোথায় রসিকতা কর্‌তে গেছ্‌লে ?"

নদেরচাঁদ করযোড়ে নিবেদন করিল—"হুজুর, আমার মনিবের সঙ্গে দেখা হওয়ায়, তাঁর কাছে একটু গিয়েছিলাম মাত্র, মাত্র পাঁচ মিনিট। পই পই করে' মানা—"

দারোগাবাবু বাধা দিয়া কহিলেন—"আচ্ছা আচ্ছা, যাও—বোনাইটিকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় রুখে যাও।"

নদেরচাঁদ হারাণো মাণিক লইয়া থানার বাহিরে আসিতেই কনেষ্টবলটি সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। নদেরচাঁদ কি দিল, সিপাহী অপ্রসন্নমুখে চলিয়া গেল।

ক্যাবলা বুঝিল, নদেরচাঁদ আসিবামাত্রই তাহার মুক্তি। কনেষ্টবল আবার তাহাকে সেলামও করে। কেবলরাম কহিল—"দাদা, ভাগ্যে তুমি এসে পড়েছিলে, নইলে—"

—"দেখ্‌লে তো আমার মান—যাওয়ামাত্র দারোগা তোমায় ছেড়ে দিতে পথ পেলে না।"

কেবলরাম একথা বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। কহিল—"তা'তো দেখলাম।"

বাসায় আসিয়া নদেরচাঁদ নিরাপদ ভাবিয়া হাতমুখ ধুইতে গেল। ক্যাব্‌লা জানালার গরাদে দিয়া পথে গাড়ী-ঘোড়া লোকচলাচল দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গেল।

আহারাদি সারিয়া নদেরচাঁদ তাহার কর্ম্মস্থলে গেল। সকালবেলাকার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ক্যাবলাকে নীচে নামিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিয়া গেল।

কেবলরাম অতিকষ্টে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত কোনও রকমে ঘরে বসিয়া রহিল, আর পারিল না। চারিতলার উপর হইতে সব ভাল করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না বলিয়া সে নীচে আসিয়া দাঁড়াইল।

কখন সন্ধ্যা হইয়াছে, তাহার হুঁস্ নাই। অসংখ্য বিদ্যুদালোকে ক্যাবলার চারিপাশে এক অপূর্ব্ব মায়ালোক সৃষ্টি করিল।

সুমিত্রার মা কিন্তু হাসিলেন না। নিজ কন্যাকে তিনি ভাল করিয়াই চিনেন।

সুমিত্রার পিতা সুনীতিবাবু এতদিন আর কোন গোলমালই করেন নাই ; ম্যাট্রিক পরীক্ষা হইয়া যাইতেই তিনি কন্যার বিবাহ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। নিত্য নূতন ঘটক আসিয়া তাহাদের উঠান চষিয়া ফেলিতে লাগিল।

সুমিত্রা কাহাকেও আর কিছু বলিল না : নিজে একেবারে গম্ভীর হইয়া নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে লাগিল।

সেইদিন রবিবার।

কাঞ্চনপুরের জমিদার মহিমবাবু সুমিত্রার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য বহুদিন হইতেই সুনীতিবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আজ স্বয়ং পাত্রী দেখিতে আসিয়াছেন।

খবরটা কানে যাইতেই সুমিত্রা শয্যায় পড়িয়া কিছুক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল, অভিমানে তাহার সারা অন্তর ভরিয়া গেল। এই তাহার পিতামাতা! এত করিয়া অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁহারা তাহার সহিত এমন শত্রুতা আরম্ভ করিলেন! চিন্তার দারুণ বোঝা মাথায় লইয়া সে উদাসভাবে পড়িয়া রহিল।

একটু পরেই তাহার মাতা সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুমিত্রা একবার চাহিয়া দেখিয়াই চক্ষু বুজিয়া ফেলিল।

তাহার মা বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই, তিনি ধীরে ধীরে কন্যার শিয়রের কাছে বসিয়া তাহার মাথায় কোমল হস্ত বুলাইয়া স্নেহভরা-কণ্ঠে ডাকিলেন : সুমু, ওঠ মা। তাড়াতাড়ি গাটা ধুয়ে নে!

সুমিত্রা কটমট করিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া তাঁহার হাতখানি সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

মাতা কন্যার মনের ভাব বুঝিয়া রাগ করিলেন না। ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া মিষ্টস্বরে বলিলেন : ছি মা, পাগলামী করিস্ নি! এতবড় জমিদার, নিজে এসেছেন তোকে দেখবার জন্যে, অমত করিস্ নি। আর দেখলেই তো বিয়ে হয়ে গেল, না! অনেক সাধ্য-সাধনার পরে তবে সুমিত্রা একটু শান্ত হইল।

সে মাকে বলিল : তুমি অত করে' যখন বল্‌ছ, তখন যাবো ; শুধু বাবার অপমান হবে বলে—নইলে আমি কিছুতেই যেতুম না।

মাতা বলিলেন : আয়, চট্ করে' গাটা ধুয়ে নে।

সুমিত্রা আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। বলিল : না, আমি সেখানে সেজেগুজে যাব না—যেমন আছি, ঠিক তেমনিভাবেই যাবো। ভারি জমিদারী ফলাতে এসেছে এখানে!

মাতা কন্যার স্বভাব জানেন, তাই তিনি তাহাকে আর ঘাঁটাইলেন না। স্বামীর কাছে গিয়া সবিস্তারে সব কথা কহিলেন। সুনীতিবাবু একটু গম্ভীর হইয়া গিয়া বলিলেন : সে কি! আচ্ছা, যাও তুমি, আমি দেখছি।

সুমিত্রা তখনও শুইয়াছিল। তাহার হাতে একখানি মাসিক পত্রিকা। ধীরে ধীরে সে তাহার পাতা উল্টাইতেছিল।

ঠিক সেই সময় সুনীতিবাবু তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই সে খাটের উপর উঠিয়া বসিল।

সুনীতিবাবু সস্নেহ-দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন : এখনো তুই বসে' আছিস্ সুমু? শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নে। মহিমবাবু যে বসে' রয়েছেন।

সুমিত্রা পিতার মুখের উপর আর কিছুই বলিতে পারিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল : আচ্ছা, তুমি যাও।

সুনীতিবাবু হাসিভরা-মুখে স্ত্রীর নিকট গিয়া বলিলেন : দেখলে? আমায় তো কিছু বলতে পার্‌লে না। একটু পরে গিয়ে তুমি ওকে নিয়ে এসো।

যথাসময়ে সুমিত্রা নিজেই আসিল। সে খুব সাধারণভাবেই আসিয়াছে, বেশ-ভূষার মোটেই পারিপাট্য করে নাই। তাহার মা কিন্তু ইহাতে খুসী হন্ নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, মেয়ে খুব সাজগোজ করিয়া আসে। কিন্তু

সত্যকথা বলিতে কি, সুমিত্রাকে এই সাধারণভাবেই মানাইয়াছিল অতি চমৎকার !

সুমিত্রা ঘরে ঢুকিয়া হাত তুলিয়া একবার সকলকে নমস্কার করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সুমিত্রার মাতা একবুক আশঙ্কা লইয়া একটা জানালার ফাঁক্ দিয়া ঘরের ভিতরে চাহিয়াছিলেন। সুমিত্রা যে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে, তা' কে জানে !

মহিমবাবু তাঁহার চশমার ভিতর দিয়া অনেকক্ষণ সুমিত্রায় আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন : তোমার নাম কি মা ?

তাহার ডাগর ডাগর চোখ্ দু'টি তাঁহার মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া সুমিত্রা বলিল : সুমিত্রা সেন।

মহিমবাবু বলিলেন : তুমি যখন এবার ম্যাট্রিক দিয়েছ, তখন লেখা-পড়া সম্বন্ধে কিছুই আমার জিজ্ঞেস করবার নেই। গান-বাজ্না, শেলাইয়ের কাজ এ-ও আজকালকার প্রায় সব মেয়েরাই অল্প-বিস্তর জানে; সে সম্বন্ধেও আমার বিশেষ কিছু জান্বার প্রয়োজন নেই। তবে হাঁ, তোমরা হ'লে অন্নপূর্ণার জাত, রান্নাবান্নাটা একেবারে ভুলে যেও না। অবশ্য' আমার ওখানে ঠাকুরেই রান্না করে—তা' হলেও মা-লক্ষীর হাতের রান্না খেতে কি আর এক-আধদিন সাধ হয় না !

সুনীতিবাবু হাসিয়া জবাব দিলেন : সুমিত্রা রান্না করতে জানে; এবং সম্ভবতঃ তা' আপনাদের ভালই লাগবে।

মহিমবাবু খুসী হইয়া বলিলেন : বেশ, বেশ !

মহিমবাবুর সহিত যে গ্রহাচার্য্য আসিয়াছিলেন তিনি উঠিয়া গিয়া সহসা সুমিত্রার বামহস্তখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন : দেখি মা, তোমার হাতখানি একবার ?

সুমিত্রা তাঁহার দিকে তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া সজোরে হাতখানি টানিয়া আনিয়া বলিল : কিছু জান্তে হয়,বাবার কাছ থেকে কুষ্ঠি নিয়ে দেখুন গে।

বেচারা গ্রহাচার্য্য একেবারে 'থ' হইয়া গেলেন। সুনীতিবাবুও একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন : উনি যখন দেখতে চাচ্ছেন, একবার দেখতে দাও না।

সুমিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল : না, আমি খেলার পুতুল নই ! যে যা' বল্বে, আমি তাই কর্তে পার্ব না। তারপর সে আবার একটি ছোট্ট নমস্কার করিয়া গট্‌গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কন্যার এই ঔদ্ধত্যে সুনীতিবাবুর মুখখানা একেবারে মলিন হইয়া গেল। সমস্ত কক্ষটাই নীরব; সকলের মুখই গম্ভীর; শুধু মহিমবাবুর মুখখানি হাসি হাসি।

সুনীতিবাবু গ্রহাচার্য্যকে কহিলেন : কন্যার ব্যবহারের জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি, কিছু মনে করবেন না। 'ওর কুষ্ঠি আছে, দরকার হয় তো বলুন,' নিয়ে আসি।

মহিমবাবু বলিলেন : কিছু দরকার নেই, যা' দেখ্‌বার আমি দেখে নিয়েছি !

মহিমবাবু যাইবার সময় মেয়ে পছন্দ হইল কি না, কিছুই জানাইয়া গেলেন না। বলিয়া গেলেন, কাঞ্চনপুর হইতে পত্র লিখিয়া তাহার অভিমত প্রকাশ করিবেন।

ইহার অর্থ বুঝিতে কাহারো বাকী রহিল না। এমন চমৎকার সম্বন্ধটা হাতছাড়া হইয়া গেল বলিয়া সুমিত্রার পিতামাতা দুইজনেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।...

সুনীতিবাবুরা কিছুদিন মহিমবাবুর পত্রের আশায় আশায় রহিলেন। কিন্তু ক্রমে সে আশা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল; তাঁহার কাছ হইতে কোন চিঠিই আসিল না।

কন্যার দুর্ব্যবহারে সুনীতিবাবুর সারা অন্তর ভরিয়া গিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে তিনি ভাল করিয়া কন্যার সহিত কথা কহেন নাই, এবং অন্য পাত্র অনুসন্ধানে একেবারে উদাসীন ছিলেন।

অনেকদিন পরের কথা।

সুমিত্রার মায়ের শরীরটা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল; তাই তাঁহারা দেওঘরে বায়ুপরিবর্ত্তনে আসিয়াছিলেন।

সেইদিন সুনীতিবাবুর বাড়ী ফিরিতে একটু রাত হইয়া গিয়াছিল। তিনি গৃহে আসিয়াই পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন: ওগো, মহিমবাবুরা যে এখানে এসেছেন। আজ পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ছাড়লেন না; একেবারে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা হলো তাই এত রাত হলো! তাঁদের একটা জমিদারী নিয়ে খুব গোলমাল চলছিল, তাই তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। সেইটে মিটুল তো আবার তাঁর স্ত্রীর অসুখ হলো; এইসব কারণে তিনি আমাদের কাছে চিঠি দিতে পারেন নি। কিছুদিন হলো কলিকাতার ঠিকানায় তিনি চিঠি দিয়েছেন। সুমিত্রাকে নাকি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে, তিনি নাকি এই রকম তেজস্বিনী একটা মেয়েই খুঁজছিলেন। সেইদিনকার সুমিত্রার ব্যবহার নাকি তাঁর ভালই লেগেছিল। সাধারণ মেয়ের সঙ্গে ঐ টুকুনই তো তার প্রভেদ! অন্য মেয়ে হলে, হয় তো সেদিন কোন আপত্তিই করতো না। যে জমিদার গৃহিণী হবে, তার ওইটুকুন তেজ থাকা খুবই সঙ্গত।

খুসীতে সুমিত্রার মায়ের মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, এইবার একটা ভালদিন দেখে কথাবার্ত্তা ঠিক্ করে ফেলো। যাক্, আমার একটা বিষম ভাবনা কেটে গেল।

সুনীতিবাবু কহিলেন, মহিমবাবুর ছেলে মোহিতও এসেছে এখানে, তাকে কাল আমাদের এখানে আসতে বলে এসেছি।

সুমিত্রার মাতা বলিলেন, বেশ করেছ। আমার দেখাও হয়ে যাবে, আর চাইকি এলে গেলে সুমিত্রার সঙ্গে ভাব হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়!

সুনীতিবাবু হাসিলেন। বলিলেন: তোমার যুক্তিটা মন্দ নয়। দেখো একবার চেষ্টা করে, তোমার মেয়েকে বাগে আন্‌তে পার কিনা।

মোহিত কয়েকদিন সুনীতিবাবুদের বাড়ী আসিয়াছিল। সুমিত্রার মা'র তাহাকে খুব ভালই লাগিয়াছে। সে বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পড়িতেছে। এবং তাহার চেহারাও খুব সুন্দর। পছন্দ হইবারই কথা। কিন্তু সুমিত্রার সহিত মোহিতের কোন আলাপ হয় নাই। প্রথম দিন তো সুমিত্রা মোহিতের কাছেই বাহির হয় নাই, দ্বিতীয় দিনে মাতার বহু অনুরোধে একবার মোহিতের কাছে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার সহিত সে একটা কথাও বলে নাই। সারাক্ষণ গম্ভীর মুখে বসিয়াছিল।

মোহিত কিন্তু প্রথম দর্শনেই সুমিত্রাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া এবং পুরুষ সম্বন্ধে তাহার মনোভাব শুনিয়া সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে।—কি করিলে যে ইহাকে আপন করিয়া পাওয়া যায়, কিছুতেই কিন্তু সে তাহা ভাবিয়া পাইল না। অগত্যা তাহাকে তাহার বন্ধু বিকাশের স্মরণ লইতে হইল।

বিকাশ সব শুনিয়া বলিল: আচ্ছা দেখ্, তাঁকে আমি কেমন জব্দ করি। তার সকল গর্ব্ব আমি খর্ব্ব করে, তোর বাসনা পূর্ণ করব। তারপর দুইজনে বহুক্ষণ অনেক পরামর্শ হইল।

সুমিত্রা রোজই একা বেড়াইতে বাহির হয়, সেইদিনও সে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেইদিন পূর্ণিমা, একটু পরেই নীলনভে চন্দ্রমা হাসিয়া উঠিল, উজ্জ্বল কিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অদূরে গাছগুলির দিকে চাহিয়া সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে হইতেছিল যেন, একখানা ফ্রেমে বাঁধান ছবি কে টাঙাইয়া রাখিয়াছে। সে কিছুতেই আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছিল না। প্রকৃতির এমন সুন্দর মনোহর দৃশ্য তাহাকে একেবারে তন্ময় করিয়া দিয়াছিল। সে গৃহে ফিরিবার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল।

অদূরে মাঠের পর মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে, নিকটে কোন লোকালয়ও নাই। স্থানটা নীবিড় নীরবতা পূর্ণ। সুমিত্রা ধীরে ধীরে গৃহের দিকে ফিরিতে ছিল। সহসা একটা ঝোপের ভিতরে হইতে খস্ খস্ করিয়া একটা

শব্দ হইল; পরমুহূর্ত্তেই এক বিরাট মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল। তাহার মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ী, হাতে একখানি ছোরা, চন্দ্র কিরণে সেখানি চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল।

সুমিত্রার আত্মা শুকাইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল। এখন সে কি করিবে? এখান হইতে চীৎকার করিয়া বুক ফাটাইয়া দিলেও কেহ শুনিবে না। সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই লোকটা তাহার দিকে কট্‌মট করিয়া চাহিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল। সুমিত্রা একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। একটু পরেই শাল গাছগুলির মধ্য দিয়া এক যুবক ছুটিয়া আসিল, তাহার হাতে একটা বাঁশের লাঠি। তাহাকে দেখিয়াই সেই লোকটা সুমিত্রার হাত ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সমস্ত ঘটনাটা অতি অতর্কিত ভাবেই ঘটিয়া গেল।

সুমিত্রা যুবককে চিনিল। ছল ছল চোখে তাহার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া সুমিত্রা বলিল: আপনি না এসে পড়্‌লে, আজ আমার কি সর্ব্বনাশই না হতো মোহিতবাবু! সে আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মোহিত বলিল: আমি আর কি করেছি বলুন? ভগবানই আপনাকে রক্ষে করেছেন। রাত করে এতদূরে আপনার একা আসা উচিত হয় নি। চলুন আপনাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।

সুমিত্রা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। আজ তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—মোহিতের পায়ের তলায় সে লুটাইয়া পড়ে। কোথায় গেল তার সেই পূর্ব্বের দর্প অহঙ্কার!

মাঠের উপর দিয়া দুইজনে নীরবে পথ চলিয়াছে। অনেকটা আসিবার পর, দূর হইতে সুমিত্রাদের বাড়ী দেখা যাইতেছিল। সুমিত্রা বলিল: এইবার আপনি যান। এইটুকুন পথ আমি একা যেতে পার্‌ব। তারপর কি ভাবিয়া লইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল: আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে কাল একবার আমাদের ওখানে যাবেন।

আনন্দে মোহিতের লাফাইতে ইচ্ছা করিতে ছিল। সে হাসিয়া বলিল: আপনি যখন আদেশ কর্‌ছেন নিশ্চয় যাবো।

সুমিত্রা সসঙ্কোচে বলিল: আদেশ নয়, অনুরোধ বলুন!

মোহিতের চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

সুমিত্রা চলিয়া গেল।

যতদূর দৃষ্টি যায় মোহিত তাহার গমন ভঙ্গীর দিকে চাহিয়া রহিল তারপর ধীরে ধীরে পা দুটাকে বাড়ীর দিকে চালাইয়া দিল।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিতেই বিকাশের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। মোহিত তাহার পিঠ্ চাপড়াইয়া বলিল: সত্যি, তোকে কি চমৎকার মানিয়েছিল। আমি নিজেই তোকে ভাল করে চিন্‌তে পারছিলুম না।

বিকাশ হাসিয়া বলিল: যাক্ কাজ হাসিল হলো তো, এইবার একদিন ভাল করে আমায় খাইয়ে দে।

নিশ্চয়, বলিয়া মোহিত হাসিতে লাগিল।

পরদিন মোহিত সুনীতিবাবুদের বাড়ী যাইতেই সুমিত্রা নিজে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে বসাইল; নিজ হাতে চা করিয়া দিয়া খাওয়াইল।

সুমিত্রার মা বাবা তো অবাক্। মেয়ের আজ হলো কি! গত রজনীর ঘটনাটা অপ্রকাশ্যই রহিয়া গেল। সুনীতিবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন: কেমন, বলিনি তোমায় আমার কথা সত্যি হোল কি না? গৃহিণীও স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন।

মহিমবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা একপ্রকার পাকাপাকিই হইয়াছিল। চেঞ্জ হইতে ফিরিয়াই এক শুভদিনে সুমিত্রার সঙ্গে মোহিতের বিবাহ হইয়া গেল। সুমিত্রার দিক হইতে আর কোন আপত্তিই উঠিল না, একদিনেই সে স্পষ্ট বুঝিয়া লইয়াছে—নারী কত অসহায়। সকল গর্ব্ব টুটিয়া গিয়া পুরুষবিদ্বেষ ভাব তাহার একেবারে কাটিয়া গিয়াছে।

ফুলশয্যার রাত্রে মোহিত সুমিত্রাকে বলিল: আজো কি তুমি আমাকে শত্রু ভাব্‌ছ নাকি সুমু?

সুমিত্রা বলিল: যাও। তুমি ভারি দুষ্টু।

মোহিত ববিল: না, না তোমাকে আজ বল্‌তেই হবে। বলো তুমি।

সুমিত্রা হাসিয়া বলিল: না গো না, তুমি আমার শত্রু নও, তুমি আমার প্রিয়তম বন্ধু। নাও হলো তো এবার!

মোহিত তাহার রক্তিম অধরে একটি ভালবাসার চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিল।

হরিপদ গুহ

শব-শুদ্ধি

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আমি কোলকাতায় যাচ্ছি শুনে পঞ্চী এসে বললে দা'-ঠাকুর! যদি দয়া ক'রে আমার একটা উপগার করেন:·· কোলকাতায় অমুক ঠিকানায় আমার মা থাকে, মার সঙ্গে দেখা ক'রে আমার খবরটা মাকে দেবেন! কতদিন যে মার খবর পাই নি! কত যুগ কেটে গেছে!

বললুম—তোর ত আর নিজের মা নয়, ছেলেবেলায় তোকে চুরি ক'রে এনে পেলেছিল বৈত নয়, তবে আর তার খবরের জন্য এত উতলা হলি কেন? এই তো আজ দেখতে দেখতে পাঁচ বছর চ'লে গেল এখানে এসেছিস—কখনো ত তোর নামও করে নি সে।

পঞ্চী বললে—দা' ঠাকুর! আমি যে তাকে বড় দাগা দিয়ে এসেছি—আর আমার কথা যদি বলেন, বেড়ালটা কুকুরটাকেও যদি পালো, তবে সেও আপনার জন্যে কাঁদবে, আর আমি রক্তমাংসের শরীর নিয়ে মানুষ হ'য়ে কেমন ক'রে সে বুড়ীকে ভুলি বলুন! বয়স হ'তে আমাকে দিয়ে যত বড় অন্যায়ই সে করাক না কেন, এতটুকু বেলা থেকে মানুষ করেছিল ত!

*　　*　　*

কোলকাতায় এসে পাঁচ কাজে পঞ্চীর কথা ভুলেই গেছলুম। যেদিন মনে পড়লো সেদিন আর তার মায়ের খোঁজে যাওয়ার উপায় ছিল না। কেন না, তখন রাত্রি হয়েছে অনেক, পঞ্চীর মা যে পাড়ায় ও যে বাড়ীতে থাকে কোনো ভদ্রলোকের পক্ষেই সে সময় সাদা চোখে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। পরের দিন একটু বেলায় গিয়ে খোঁজ ক'রে সে বাড়ী বার করলুম।

একখানা সেকেলে নীচু বারান্দাওলা পুরানো বাড়ী! বাড়ীর নীচের একদিকে রং-বেরংয়ের শিশি-বোতল, সোডা-লেমনেড-সিরাপ, বিবিধ সিগারেট প্যাকেট ও টীন এবং দেশী ও ছাঁচি এবং মিঠে খিলির দোনা সাজানো এক পাণের দোকান। পাণের দোকানের প্রকাণ্ড আয়না খানায় নিজের ছায়া দেখে মনে হ'ল এই পাকা চুল নিয়ে দিনের আলোয় এ গলিতে ঢোকাটাই যেন ব্যভিচার! বাড়ীর আর একদিকে চপ্-কাটলেট, হাঁসের ডিম কাঁকড়া-ভরা কাঁচের প্লেট সাজানো। দেখে সেটা যে চাটের দোকান সে বিষয়ে আর কোন সংশয়ই রইল না। একটু কেমন সঙ্কুচিত হ'য়েই বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লুম।

উপর নীচেয় সারি সারি ছোটবড় অনেকগুলি কামরা। সব ঘরেই নানা বয়সের ও নানা মূর্ত্তির এক একটি স্ত্রীলোক ভাড়া নিয়ে রয়েছে বোঝা গেলো। তারা আমাকে পঞ্চীর মা'র মৃত্যু-সংবাদ ও কেদারের সন্ধান দিলে। পঞ্চীর মা এক বছর হ'ল মারা গেছে। যে মানুষটি এতকাল তার অভিভাবক হ'য়ে কাছে ছিল, সে এখনো সে-ঘর ছেড়ে যায় নি। তার সঙ্গে দেখা হ'ল। শুনলুম, তারই নাম কেদার। লোকটা আধাবয়সি। কালো পাথরের মত মজবুত শরীর।

সে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বললে—"পঞ্চীর মা মারা যাবার পর এই কেদার নাকি কোথা থেকে একটা কাঁচা বয়সের সোমত্ত ছুঁড়ীকে জুটিয়ে এনে ঘরে রেখেছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে সে মেয়েটা ঐ হোটেলের রাঁধুনী বামুনটার সঙ্গে পালিয়েছে। কেদার অনেক খোঁজ করেও তার কোনো পাত্তা পায় নি। সেই থেকে মিনসে শয্যা নিয়েছে আর ওঠে নি।"—

কথাটা ওদের মিথ্যে নয়। কেদার একখানা কম্বল মুড়ি দিয়ে পঞ্চীর মার পুরানো পালঙ্কের উপর গদীওয়ালা গিরদে-ঘেরা বিছানায় পড়েছিল। আমি যেতে একটা বিড়ি ধরিয়ে টেনে বিষম কাস্তে কাস্তে ভাঙাগলায় বললে—"দু-একদিন পরে এসো বাবা, এখন আর জ্বালিয়োনা—বড় অসুখ—মেজাজ ভাল নেই!—"

অগত্যা আর একদিন আসবো ব'লে চ'লে এলুম। আমি

বিদেশী এবং ব্রাহ্মণ শুনে বাড়ীর উপর নীচের এঘর থেকে ওঘর থেকে অতিথি সেবার জন্য বহু বিলাসিনীদের অযাচিত আবাহনও এসেছিল; কিন্তু সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়িয়েই চ'লে এলুম—আর একদিন হবে ব'লে! তাদের সে অনুরোধ-উপরোধের মধ্যে শুধুই যে কেবল মুখের মিষ্টি কথা অর্থাৎ রসনার রস নিবেদনই ছিল তাই নয়, আঁখির আবেদন ও অর্থপূর্ণ ইসারা এবং লীলায়িত অঙ্গ-ভঙ্গীর একটা অপ্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও ছিল। সেখানে আর অপেক্ষা করতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। আশ্চর্য্য! সাদা চুলকেও এরা সমীহ করে না!

*　　*　　*

কোলকাতার কাজ মিটিয়ে আমার কর্ম্মস্থলে ফিরে যাবার সময় সন্নিকট হ'য়ে এলো দেখে আমি আর একদিন পঞ্চীর মার বাড়ী গিয়ে উঠ্‌লুম। বেলা তখন দশটা সাড়ে দশটা হবে। দেখি সেখানে মহা হুলস্থূল ব্যাপার চলেছে! হৈ হৈ কাণ্ড! আমি যেতেই সবাই যেন অকূলে একটা কূল পেলে! হাঁফ ছেড়ে বল্‌লে—"যাক্ বাঁচা গেল! আপনি এসে পড়েছেন—নিন্—এখন এর একটা গতি করুন! সকাল থেকে বাড়ীতে বাসি মড়া প'ড়ে রয়েছে—আমরা কেউ রান্নাবান্না চড়াতে পারছি নি—"

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল—কেদার কাল রাত্রে মারা গেছে। মর্‌বার আগে সবাইকে ডেকে ব'লে গেছে—পঞ্চীর কাছ থেকে যে মানুষটি সেদিন আমার খোঁজে এসেছিল—তাকে সব বুঝিয়ে দিস—সেই এখন এ বাড়ীর মালিক। ঘরের ভাড়া তোরা তাকেই দিবি।

কী ফ্যাঁসাদ! কেদার যে এমন ক'রে 'উইদাউট্ নোটিশে' —আমাকে ফাঁসিয়ে হঠাৎ মারা যাবে এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নি! আধাবয়সি লোকটার চোখে-মুখে বদমায়েসি ও বদ্‌খেয়ালীর ছাপ পড়্‌লেও সেদিন দেখে বেশ জোয়ান্ ব'লেই মনে হ'য়েছিল! যাই হোক্, কাল রাত্রে যে লোক মারা গেছে—এখনও তাকে ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় নি কেন, জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল—কেদার নাকি জাতে বাগ্‌দী! বাগ্‌দীর মড়া কেউ ছুঁতে চাইছে না! কাজেই এতখানি বেলা পর্য্যন্ত তার গতি হয় নি! এখন আমাকেই এর ব্যবস্থা করতে হবে।

বল্‌লুম—"আমি বিদেশী লোক এখানে তো কাউকে চিনি নি জানিও নি—আমি এর কি ব্যবস্থা কর্‌তে পারি বলো। যে মরে গেল তার আবার জাত রইল কি? মড়ার কি আর জাত-বিচার আছে। যে মড়াই হোক্ না কেন, ছুঁলে সবাইকেই নাইতে হবে। আমি একলা যদি পার্‌তুম ওকে কাঁধে ক'রে তুলে ঘাটে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসতুম!—কিন্তু তা'ত আর এ বয়সে সম্ভব নয়—"

ওবাড়ীর মধ্যে বয়স্থা স্ত্রীলোক দু'-একজন বল্‌লে—"দেখো বাবাঠাকুর, কিছু যদি খরচ করতে পারো—একটা উপায় হ'তে পারে। ওকে যদি বোষ্টম ক'রে নেওয়া হয়—তা' হলে আর কেউ ছুঁতে আপত্তি করবে না।

বিস্মিত হ'য়ে জান্‌তে চাইলেম—মরা মানুষকে বৈষ্ণব ক'রে নেওয়া যাবে কি উপায়ে?"

ওরা বললে—"উপায় আছে। আমাদের গোঁসাই-জীকে খবর দিলে তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

*　　*　　*

ডেকে পাঠালুম গোঁসাইজীকে। চিতে বাঘের মত দেহের সর্ব্বাঙ্গে তিলকছাপ আঁকা—মাথায় মস্ত এক টিকি, পরণে হাঁটু পর্য্যন্ত এক গেরুয়া কপ্‌নী, দুই চক্ষু জবা ফুলের মত রাঙা! বুঝ্‌লুম, বাবাজী শুধু মাল্‌পোই খান না—শ্রীশ্রী হরিকৃপামৃত রসও দিবানিশি পান ক'রে থাকেন। কেদারকে বৈষ্ণব ক'রে দিতে দশটাকা খরচ লাগ্‌বে বল্‌লেন। মারা-মারি করে শেষ ছ'টাকায় রফা হ'ল! কিন্তু, মুস্কিল বাঁধলো মৃত বাগ্‌দীকে এখন ঘর থেকে বাইরে বার ক'রে আনবে কে—এই নিয়ে! কারণ, ঘরের ভিতর আচ্ছাদনের নিম্নে থাক্‌লে নাকি বৈষ্ণব হওয়া চলবে না! বেজায় বেগতিক দেখে অগত্যা আমিই একা অতিকষ্টে কেদারের মৃতদেহ বহন ক'রে ঘরের বাইরে নিয়ে এলুম। এই বাগ্‌দীর শব তখন বাসুদেবের বিশ্বম্ভর মূর্ত্তির মত বিপুল ভারি হ'য়ে উঠেছিল।

কেদারকে বৈষ্ণবে পরিণত করতে প্রায় একঘণ্টা লাগ্‌লো। সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন আভরণ খুলে ফেলে

সর্ব্ব বন্ধন মুক্ত ক'রে তাকে গঙ্গোদকে স্নান করানো হ'ল। তারপর ক্ষৌরকার্য্য। শ্মশ্রু গুম্ফ ও মস্তক মুণ্ডন ক'রে তার চূড়াকরণ করা হ'ল। তারপর হ'ল তার অভিষেক --কণ্ঠী ও কৌপীন ধারণ—অর্থাৎ, গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে দিয়ে, কোমরে একটা গেরুয়া রংয়ে ছোপানো নেংটি জড়িয়ে দেওয়া হ'ল। মৃতের সর্ব্বাঙ্গে তিলকছাপ ও হরিচন্দন লেপে গোঁসাইজী সেখানে সমবেত সকলের হরিধ্বনির মধ্যে বেশ উচ্চকণ্ঠেই মৃত কেদার বাগ্‌দীর কর্ণে কৃষ্ণমন্ত্র দান করলেন।

মৃত কেদার বাগ্দী অবিলম্বে পূর্ণ বৈষ্ণব হ'য়ে উঠ্‌লো! একখানি নূতন নামাবলী চাপা দিয়ে ফুল ও তুলসী পাতায় তার শবদেহ আচ্ছন্ন ক'রে পাঁচ পয়সার বাতাসা এনে হরির লুট্ দেওয়া হ'ল! 'হরি হরি' শব্দে সবাই তখন কীর্ত্তন করে তাকে শশ্মান-ঘাটে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হ'ল!

সংকারের ব্যয় ও বৈষ্ণব-ভোজন বাবদ আরও কিছু টাকা দণ্ড দিয়ে কেদারের গতি করলেম। পরে পঞ্চীর মা'র জিনিষ-পত্র সব বুঝে নিয়ে, বাড়ী দেখাশোনা ও ভাড়া আদায়ের একটা সুব্যবস্থা ক'রে ভাবলুম, নিশ্চিন্ত হয়েই এইবার বাড়ী ফিরবো। কিন্তু, দুষ্টগ্রহ যার পিছু নিয়েছে, নিশ্চিন্ত হবার কি তার উপায় আছে? পঞ্চীর মার পরিত্যক্ত জিনিষ-পত্র নিয়ে যে কী সাঙ্ঘাতিক বিপদে পড়েছিলেম—সে কথা অন্য কোনো সময় শোনাব।

নরেন্দ্র দেব

'দি গজানন্দ ফিল্ম কোম্পানী'

[নিছক নক্সা]

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

বাঙ্গলা দেশে তখন ছবি তুলিবার ভারী হিড়িক। বর্ষার জলছত্রকের মত দিকে দিকে ফিল্ম কোম্পানী গজাইয়া উঠিয়াছে। ছবির মুখে তখনও কথা ফুটে নাই। তাই একটা ভাঙ্গা ক্যামেরা, ছাদ সর্ব্বস্ব ষ্টুডিও বা বাগানবাড়ী আশ্রয় করিয়া, অনেকগুলি আড্ডা গড়িয়া উঠিল।

এই শ্রেণীর একটি আড্ডায় সবেমাত্র সন্ধ্যা-দ্বীপ জ্বালা হইয়াছে। আড্ডার মালিক অনুপস্থিত, ম্যানেজার গজানন্দ ঘনঘন কাহাকে যেন টেলিফোন করিতেছে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ দরজার বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মিহিস্বরে জবাব আসিল—"ভেতরে আস্‌তে পারি ?"

গজানন্দের পরিচিত কণ্ঠের এই স্বরটি শুনিয়া হন্তদন্ত হইয়া দরজার দিকে আগাইয়া গেল।

ভিতরে আসিল একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক—ফিল্মে আমরা যাহাকে যুবতী ও তন্বী বলিয়া ভুল করিয়া থাকি। যৌবনের জোয়ার জলে তাহার অনেক কালই ভাঁটা পড়িয়াছে। শুধু মেক্‌আপ্‌ ও পাব্‌লিশিটির জোরে বিগত প্রায় যৌবনের শেষ রেশটুকু টানিয়া রাখা হইয়াছে মাত্র।

মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়াই সারামুখে চাঞ্চল্যের ছাপ্‌ লইয়া গজানন্দকে শুধাইল "কিছু হোল ?"

গজানন্দ বিরক্তি মুখে জবাব দিল—"তোমায় আজ সকাল থেকে কেবলই ফোন করছি, তোমার কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। আমার টেলিগ্রাম পাবার পর আসতে এত দেরী কোরলে কেন ?

মেয়েটি কণ্ঠে খানিকটা দরদ ঢালিয়া জবাব দিল—"কী কোরব ভাই, সে এক বনগাঁয়ে শেয়ালরাজার দেশে গিয়েছিলুম মুজ্‌রো কোরতে। মুজ্‌রো শেষ হোল—কিন্তু সেই ভুঁড়ি-সর্ব্বস্ব রাজাব্যাটার খেয়াল মেটাতে আরও এক হপ্তা কাটাতে হোল...দেখনা, রাত জেগে জেগে চেহারার কী হাল হয়েচে···"

পরে ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া, চাপা গলায় আবার মেয়েটি শুধাইল—"বলি আছে কিছু ?...বের কর না, একটু চাঙ্গা হোয়ে নেওয়া যেত···

গজানন্দ দাঁতে জিভ্‌ কাটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও মুখে আঙ্গুল ঠেকাইয়া ভৎর্সনার স্বরে কহিল—"খবর্দ্দার, ও সব চেষ্টাও কোরো না এখানে, সুশীল শুনলে আর আমায় আস্ত রাখবে না, তোমার কনট্রাক্টের দফাও রফা···

সুশীলচন্দ্রের টু-সিটারখানি সবে মাত্র বাগান বাড়ীর ফটকে আসিয়া লাগিয়াছে। হ্যাট্‌কোটপরা একটি সুশ্রী যুবা—চোখে মুখে যৌবনের দীপ্তি। দি গজানন্দ ফিল্ম কোম্পানীর ইনিই স্বত্তাধিকারী। বাপের পয়সায় বিলাত গিয়াছিলেন Scientific agriculturing শিক্ষা করিতে। দেশে আসিয়া লাঙল ফেলিয়া ফিল্ম ধরিয়াছেন। হঠাৎ রাতারাতি ফিল্মএক্সপার্ট বলিয়াও ভ্যাগাবণ্ড মহলে খ্যাতি রটিয়াছে। ইতিমধ্যে বাপ মরিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন, সুশীলচন্দ্র তাঁহারই বিস্তৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়া, বৈজ্ঞানিক চাষের পরিবর্ত্তে সম্প্রতি ফিল্ম কোম্পানী খুলিয়া আর্টের চাষ সুরু করিয়াছেন।

বন্ধু হইলেও গজানন্দ এ পথের গুরু। উৎসাহ ও হাতে খড়ি সেই দিয়াছে। তাই কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে

গজানন্দের নামেই কোম্পানীর নাম করণ করা হইয়াছে এবং তাহাকে বেশ মোটা বেতনে ম্যানেজারের পদে বাহাল করা হইয়াছে।

দি গজানন্দ ফিল্ম কোম্পানীর প্রথম সামাজিক ছবি "উপোদ্‌ঘাত"—চিত্ত-চমক-প্রদ, বস্তী জীবনের বাস্তব চিত্র। সুশীলচন্দ্র নিজেই ইহার রচয়িতা ও চিত্র নাট্যকার।

ছবি তুলিবার সব মালমশলাই প্রস্তুত। কেবল উপযুক্ত হিরোইনের অভাবে সকল শ্রম পণ্ড হইতে বসিয়াছে।

ইতিমধ্যে গজানন্দের দৌলতে মুখ রক্ষা হইল। গজানন্দ বহুস্থানে খোঁজ খবর লইয়া, বহু পরিশ্রমে শ্রীমতী লীলাময়ীকে আবিষ্কার করিলেন। বছর দশেক পূর্ব্বে রঙ্গালয়ে মর্জ্জিনার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিয়া লীলাময়ী নাম করিয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল তাহার থিয়েটার মহলে পশার কমিয়াছে। রঙ্গালয় ছাড়িয়া, সম্প্রতি বড় লোকের দরবারে নাচ-গানের মজুরা করিয়া তাহার সংসার চলিতেছিল।

এককালে সত্যই রূপবতী বলিয়া লীলার খ্যাতি ছিল। সম্প্রতি সে রূপের দীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়া আসিলেও, চোখে-মুখে তখনও যে রেখাটুকু ছিল—সুশীলের মত একটি ছোট খাটো রাঘব-বোয়ালকে খেলাইয়া তুলিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

গজানন্দের মুষ্টিযোগ বিফলে গেল না। অভিনেত্রী লীলা শুধু এক লহমার দৃষ্টিতেই বেচারী সুশীলচন্দ্রকে করায়ত্ব করিয়া ফেলিল। গজানন্দ ফিল্ম কোম্পানীর হিরোইন সমস্যা সহজেই মিটিল।

তাহার পর দেখিতে দেখিতে ছয়মাস কাটিয়া গেল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফুট ফিল্ম, লেন্সের সামনে দিয়া ঘুরিয়া গেল কিন্তু ছবি শেষ হইল না। পরিচালক ও আলোক-চিত্র-কর—সুশীলেরই দুই বন্ধু, আপ্রাণ চেষ্টায় এ কয়মাস ধরিয়া ক্রমাগত Experiment করিয়া আসিতেছে। রাত্রির অন্ধকারে, ছবির পর্দ্দায় তাহারই অংশ বিশেষ প্রতিক্ষেপ করিয়া, পরীক্ষায় জানা গেল প্রায় চল্লিশ হাজার ফুট বেপরোয়া ভাবে কাঁচি কাটা করিতে হইবে। প্রথম 'এক্সপেরিমেণ্টে' এরকম নাকি হইয়াই থাকে!

হিরোইনের পক্ষেও তখন আর Re-take এর সুযোগ বা সুবিধা নাই। হঠাৎ শরীরের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ায় শ্রীমতীকে লইয়া শ্রীমান্ প্রডিউসার মহাশয় স্থানান্তরে হাওয়া বদলাইবার নামে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হইলেন।

তারপর আরও ছয়মাস কাটিয়াছে। সুশীলের কলিকাতার দুইখানি বাড়ী বন্ধক পড়িল। জুয়েলারীর বিল এবং শাড়ী-ব্লাউস ওয়ালাদের তাগাদা মিটাইতে ততদিনে ব্যাঙ্কের খাতায় জমার অঙ্ক হাল্কা হইয়া আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে একদিন উপোদ্‌ঘাতের 'রি-টেক্' সুরু হইল। কিন্তু হিরোইন্‌কে আর মিলিল না। সুশীল প্রশ্ন করিতে গজানন্দ জানাইল তাহার গত মাসের মাহিনার মধ্যে হাজার টাকার চেক্ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি উহা Bank হইতে Dishonoured হওয়ায় হিরোইন ফোন করিয়া জানাইয়াছেন. কোম্পানীর সঙ্গে নাকি তাহার সকল সম্বন্ধ মিটিয়াছে।

প্রডিউসার সুশীলচন্দ্রের টনক নড়িল। অক্ষমতার অপমানে তাহার চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিকার করিতে সে টু-সিটারে ষ্টার্ট দিয়া সেই দণ্ডেই রওনা হইল।

তৎকালে হিরোইন লীলাময়ী, কলিকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে, সুশীলেরই তত্বাবধানে, এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছিল।

মোটর আসিয়া পৌঁছিল কিন্তু হিরোইনের কোন সন্ধান মিলিল না। দরোয়ান জানাইল, সে নাকি তাহার মাতার নিকট হইতে জরুরী তার পাইয়া বৈকালের ট্রেণে বাক্স-প্যাঁটরা গুছাইয়া কাশী রওনা হইয়াছে!

তাহার পরদিন বাগান বাড়ীতে আসিয়া দেখা গেল গজানন্দও ফর্সা হইয়া গিয়াছে! ক্যাশে প্রায় শ'পাঁচেক টাকা ছিল। ডুপ্লিকেট্ চাবী দিয়া 'সেফ্' খুলিতেই নজরে পড়িল, গজানন্দ হিসাবে ভুল করে নাই। বন্ধুকে ঋণী না রাখিয়া নিজের পাওনার মধ্যে সবগুলি বেমালুম পরিশোধ করিয়া লইয়াছে—মায় সিকি, দুয়ানী এবং নিকেল ও তামার চাক্তিগুলি পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই।

পরিচালক ও ক্যামেরা ম্যান পূর্ব্বেই হাওয়া হইয়া ছিল। সুতরাং তাহাদের আর খোঁজ করিতে হইল না।

* * *

গজানন্দ ফিল্ম কোম্পানী সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছে। কেবল গজানন্দ এখনও সশরীরে, সুস্থ দেহে ও বাহাল তবিয়তে টিকিয়া আছে এবং পরম নিশ্চিন্তে বিশ্বনাথের চরণ প্রান্তে বসিয়া, লীলাময়ীর সাহচর্য্যে কাশীবাসের পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে।

শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্রেরও ফিল্মের মোহ কাটিয়াছে। আর্টের চাষ করিতে গিয়া, পিতৃদত্ত প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকা আক্কেল সেলামী গুণিয়া, সে এখন পরের দাসত্ব করিতেছে।

বেচারী এখন ব্যারী কোম্পানীর কেরাণী। দশটা পাঁচটা অফিস করে!

সুধীরেন্দ্র সান্যাল
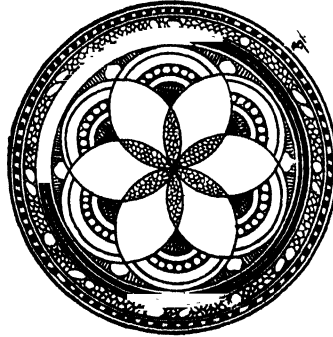
মহারাত্রি

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

এক

রাজাবাবুর কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠিল: "বটে, এতবড় আস্পর্দ্ধা! মায়ের পূজার অঙ্গহানি? আচ্ছা মজাটা টের পাওয়াচ্ছি!" রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি সদরে চলিয়া গেলেন। পূজার দালানের প্রাঙ্গণে সামিয়ানার নীচে একদল ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিল এবং আগেকার রাত্রিতে শোনা যাত্রাগানের দুইটি লাইন সকলে মিলিয়া গাহিতেছিল—

"একমণ দই আর মণ দুই মোণ্ডা,
পাই যদি খাই তবে হয় প্রাণ ঠাণ্ডা।"

রাজাবাবুর চীৎকারে তাহারা হঠাৎ জড়সড় হইয়া খেলা বন্ধ করিয়া দিল।

চণ্ডী-পাঠক ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের এক অধ্যায় বোধ হয় ততক্ষণে শেষ হইয়া গিয়াছিল। ঘণ্টাধ্বনি করিয়া তিনি পুঁথির ডোর টানিয়া দিলেন এবং চশমাটীকে কপালের উপর তুলিয়া পূজার সজ্জাকর পঞ্চু নাপিতকে বলিলেন: "এক ছিলিম তামাক সেজে আন্‌ত বাবা পঞ্চু। বকে' বকে' গলাটা যেন শুকিয়ে আস্‌ছে।

—"এজ্ঞে এই আন্‌ছি বাবা ঠাকুর। পঞ্চু তামাক সাজিতে চলিয়া গেল।"

পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক লোকের নিকট হইতে ভট্টাচার্য্য-মহাশয় রাজাবাবুর ক্রোধের কারণটী অবগত হইলেন।

সন্ধিপূজার মহারাত্রিতে মহামায়াকে অষ্টোত্তরশত পদ্ম দিয়া পূজা করা রঘুনাথপুরের রায়-বংশের কৌলিক নিয়ম। ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র অষ্টোত্তরশত নীলপদ্ম দিয়া দেবীর পূজা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। কলিতে নীল-পদ্ম পাওয়া যায় না বটে, তবুও একশত আটটী পদ্ম দিয়া পূজা করিলে ভগবতী নিশ্চয়ই অধিক তুষ্ট হইবেন—এই ভাবিয়া রায়বংশের আদি পুরুষ কালীপ্রসাদ রায় এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই হইতে বংশানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। সে কালের কর্ত্তারা হিসাবী লোক ছিলেন। সব কাজেই তাঁহাদের সুব্যবস্থা ছিল। মহাসন্ধি পূজায় এই অষ্টোত্তরশত পদ্মফুল যোগাইবার জন্য কালীপ্রসাদ একঘর জেলে প্রজাকে কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি দিয়া গিয়াছিলেন। রাঘব জেলের বর্ত্তমান বংশধর উদ্ধবও চিরদিন এই ফুল যোগাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ বৎসর উদ্ধব মাত্র তিন কুড়ির বেশী ফুল দেয় নাই। দেওয়ানজীর মুখে এই কথা শুনিয়া রাজাবাবু রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছেন্। হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটি নামাইয়া বক্তার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে দিতে ভট্টাচার্য্য-মহাশয় বলিলেন: রাজাবাবুর রাগ কিছুমাত্র অন্যায় নয়। মা মহামায়ার পূজা। এ ত খেলা নয়। ছোটলোক বেটাদের সে সব কাণ্ড জ্ঞান কি আছে!

প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তিনি পুথি খুলিয়া আবার পাঠ সুরু করিলেন: ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈঃ। ঋষিরুবাচ·········

দুই

—"থাক্ থাক্ দুর্গাপ্রসাদ, আর মেরো না। একে বুড়োমানুষ, তায় রোগা শরীর, শেষটায় হয় ত খুন হয়েই যাবে।"

রায়-বংশের গুরু বিরূপাক্ষ শিরোমণি আসিয়া রাজাবাবুর হাত ধরিলেন।

রাগে ফুলিতে ফুলিতে রাজাবাবু বলিলেন: "আপনি আমার হাত ছেড়ে দিন ঠাকুর-মশায়। ও হারামজাদাকে আমি আজ মেরেই ফেল্‌বো। ওর জন্যে আমাদের চির-কেলে নিয়ম ভাঙতে হবে। এ আমি কিছুতেই সইতে

পারবো না। যদি মন্দ কিছু হয়, ওকেই আমি হাড়ি-কাঠে ফেলে মায়ের সাম্‌নে বলি দোব।

ভূপতিত উদ্ধবের নাক দিয়া রক্তের ধারা বহিতেছিল। শীর্ণ হস্তে রক্ত মুছিতে মুছিতে সে বলিল: তাই দিও রাজাবাবু। আমি বেঁচে যাব, তোমাদেরও কোন অমঙ্গল হবে না। এর চেয়ে আমার মরাই ভাল।

অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উদ্ধব উঠিয়া বসিল: "একটা বছর ষোলআনা ফুল দিতে পারি নে বলে' এত অত্যাচার, এত অপমান? তোমার বাপের বয়সী আমি। নগদী দিয়ে ধরে' এনে এত লোকের সাম্‌নে এমনি ক'রে মার! আজ তিনমাস জ্বরে ভুগ ছি; বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি নে,—তবু, মায়ের পূজার ত্রুটি হবে বলে' ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে বিলে গিয়ে তন্নতন্ন করে' খুঁজেছি। ফুল না ফুট্‌লে আমি কি কর্‌বো। দেওয়ানজীকে ফুল দেওয়ার সময় কাল সে কথা বলে যাই নি আমি? বলুক্ না এসে সে—"

যেখানটায় দেওয়ানজী দাঁড়াইয়াছিলেন, সকলের দৃষ্টি সেইদিকে গিয়া পড়িল। ভিড়ের মাঝে দেওয়ানজীকে আর দেখা গেল না। ইতিমধ্যেই তিনি কখন সরিয়া পড়িয়াছেন।

রাজাবাবু তখনও রাগে ফুলিতেছিলেন। চোখ গরম করিয়া বলিলেন: "ফুল ফুটেছে কি না তা' আগে থেকে খবর নিস্ নি কেন? যেখান থেকে হোক্ পয়সা দিয়ে কিনে আনিস্ নি কেন? জমির এক পয়সা খাজনা দিস্ কখনো? বজ্জাতের ধাড়ি বুড়ো, এখন ন্যাকামী সুরু করেছিস্? মেরেছি, তাই বড় অপমান বোধ হয়েছে, না? ছোটলোকের আবার অপমান কিসের রে?"

শেষের কথা কয়টী তিনি দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিলেন। হঠাৎ অস্বাভাবিক কণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া উদ্ধব বলিল: ঠিক্ দিক্! আমরা ছোটলোক, আমাদের কি আর মান অপমান আছে! আমাদের যদি তোমরা মানুষ বলে' মনে কর্‌তে, তা' হ'লে কি আজ এই বছরকার দিনে তুমি আমায় জুতোপেটা করে' আধমরা করে' দিতে পারতে? আমরা ছোটলোক, আমাদের আবার মান অপমান কিসের! ঠিক্, ঠিক্ বলেছ তুমি রাজাবাবু। কিন্তু এই ছোটলোকদের না হ'লে তোমাদের একদিনও চলে না।"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে রাজাবাবুর অতি নিকটে আসিয়া উদ্ধব নিজের বুকের একটা গভীর ক্ষতরেখা দেখাইয়া পুনরায় বলিল: "ছোটলোক একদিন তোমাদের কী করেছিল, তার সাক্ষী এই এখানে রয়েছে। এ কিসের চিহ্ন তা' তুমি জান?"

উদ্ধবের চোখে-মুখে প্রখর দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। রাজাবাবু আর তাহার মুখের দিকে চাহিতে না পারিয়া মাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার মুখের উপর অজ্ঞাত আশঙ্কার কালো ছায়া ভাসিয়া উঠিল।

উপস্থিত জনতার ব্যগ্রদৃষ্টি তাঁহাদের দু'জনের উপর আসিয়া পড়িল।

উদ্ধব বলিয়া চলিল: "তোমার বাবা গঙ্গাপ্রসাদবাবুর অত্যাচারে বাগ্‌দীরা একবার ক্ষেপে উঠেছিল। সে অনেকদিন আগেকার কথা। তখনো তাঁর বিয়ে হয় নি। একদিন বাগ্‌দীরা সকলে মিলে পরামর্শ কর্‌লে যে, তোমার বাবাকে ফাঁকে পেলে তাঁকে তারা শড়কীতে ফুঁড়ে ফেল্‌বে। কর্‌তও তারা তাই—শুধু পারে নি এই উদ্ধবের জন্যে—।

"সন্ধ্যার পর বাঁশডাঙার বিল থেকে মাছ ধরে' ফির্‌ছিলাম। হঠাৎ চেনা গলার চীৎকার শুনে বাগ্‌দী-পাড়ায় ছুটে গিয়ে দেখি তোমার বাবাকে পাঁচ-ছ'জন লোক শড়কী নিয়ে ঘিরে ফেলেছে। আমার কাছে কোন 'হেতের' ছিল না। চালাঘরের দাওয়া থেকে একটা খুঁটি তুলে নিয়ে তাদের বেপরোয়া মার সুরু করে' দিলাম। বুকে যে একটা শড়কীর ফলা এসে আট্‌কে ছিল, তা' টের পেলাম তোমার বাবাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাওয়ার পর।...সেই গঙ্গাপ্রসাদবাবুর ছেলে তুমি রাজাবাবু, আজ মহাষ্টমীর দিন দেশশুদ্ধ লোকের সাম্‌নে, মা মহামায়ার সাম্‌নে,—আমার বুড়ো রোগা হাড় ক'খানাকে ভেঙে চুরমার করে' দিলে! তোমার বাপ-পিতেমোর ভিটেয় বুড়োমানুষের রক্তপাত কর্‌লে! আমি শাপ-মন্যি দেব না—মা যেন তোমার মঙ্গল করেন।"

উদ্ধবের চোখ দিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিরূপাক্ষ শিরোমণি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ; বলিলেন : "যা' হবার হ'য়ে গেছে উদ্ধব। রাজাবাবু তোমার ছেলের বয়সী—ওকে তুমি অভিশাপ দিও না। তুমি এখন বাড়ী যাও। আমি কব্‌রেজ-মশায়কে আজই তোমার ওখানে পাঠানর ব্যবস্থা করছি।

শিরোমণি-মহাশয়ের আদেশে দুই-তিনজন লোক উদ্ধবের হাত ধরাধরি করিয়া তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

তিন

বৎসরের এই বিশিষ্ট দিনটীর পূর্ব্বাহ্নে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহার জন্য সমস্ত দিন ধরিয়া রাজা-বাবুর মনের মধ্যে অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। এতটা বাড়াবাড়ি না করিলেই ভাল হইত। বুড়ামানুষ, তার উপর রোগা শরীর—প্রহারের মাত্রাটাও হইয়া গিয়াছে বড় বেশী। মন্দ কোন কিছু না ঘটিলেই মঙ্গল।

বিরূপাক্ষ শিরোমণি-মহাশয় রায়-বংশের চির-হিতৈষী গুরু। পাছে কোন কিছুতে ত্রুটী ঘটে, তাই মহা সন্ধি-পূজাটী প্রতিবৎসর তিনি নিজেই করেন।

রায়-বংশ তন্ত্রমতে দীক্ষিত। তাঁহাদের গৃহে মহা সন্ধি-পূজা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত তান্ত্রিকী ষোড়শোপচারে নিষ্পন্ন হয়। এইরাত্রে বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে রায়-বংশের সকলেই অভিষিক্ত 'কারণ' পান করিয়া থাকেন।

চিরাচরিত প্রথার অন্যথা ঘটা ভয়ানক অশুভ ; তাই রাজাবাবু বহু চেষ্টা করিয়া প্রায় দশ মাইল দূরবর্ত্তী সোণাখালির দহ হইতে বাকী পদ্ম সংগ্রহ করিয়া অষ্টোত্তর-শত সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন।

নিশীথ-রাত্রে সন্ধিপূজা। তাই আজ আর যাত্রাগান হইবে না। সন্ধ্যারতির পরই মণ্ডপ-প্রাঙ্গন জনশূন্য হইতে সুরু করিয়াছে। কাল যাহারা রাত্রি জাগিয়া যাত্রা শুনিয়াছে, আজ তাহাদের ঘুমাইবার অবসর।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতেছে।

বর্ষার বর্ষণ-শেষ মেঘগুলি সমস্ত দিন ধরিয়া ঈশান কোণে লুকাইয়াছিল। সন্ধ্যার পরই তাহারা আসিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত আকাশখানাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। শিউলি ফুলের মিষ্ট গন্ধটুকুকে এই আবহাওয়ার মধ্যে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে।

নিস্তব্ধতা ক্রমশঃ মন্থর হইয়া উঠিতেছে।

অদূরে একটা হুতোম পেঁচা মধ্যে মধ্যে বিকট আওয়াজ করিতেছে—ভুত্‌ ভুতুম্‌, ভুত ভুতুম্‌।

রক্তবস্ত্র-পরিহিত বিরূপাক্ষ শিরোমণি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বসিয়া মহিষমর্দ্দিনীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। 'কারণ' পানে তাঁহার চক্ষু দুইটী আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি যেন পূজারম্ভের জন্য দেবীর ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তন্ত্রধারক ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূজক বড় যে সে ব্যক্তি নয়, সিদ্ধ-সাধক সর্ব্বানন্দের বংশধরের তন্ত্রধারকতা করা বড় সহজ কাজ নহে। একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ হইলেই সব মাটী!

ভয় ও ভক্তি রাজাবাবুর মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। সুরার স্বাভাবিক ক্রিয়া সেখানে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। ভৈরব-কল্প গুরুদেবের ভাবভঙ্গীগুলি তিনি যেন নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছেন।

বিরূপাক্ষ ঘণ্টাধ্বনি করিলেন।

মহারাত্রির মহাসন্ধিক্ষণ সমাগত।

ঢাক-ঢোল-কাঁসর প্রভৃতি মহাশব্দে বাজিয়া উঠিল।

সন্ধিপূজা আরম্ভ হইয়া গেল।

সদাস্নাত ছাগশিশুর ললাটে সিন্দূরের রক্তটীকা আঁকিয়া দিয়া দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ধারণ করতঃ বিরূপাক্ষ মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন : "ওঁ হিলি হিলি কিলি কিলি, ছিন্ধি ছিন্ধি, মারয় মারয়, ঘাতয় ঘাতয়…"

অকস্মাৎ দীঘির ও-পার হইতে একটী প্রবল অথচ করুণ ক্রন্দনের শব্দ নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

মুহূর্ত্তের জন্য সচকিত বিরূপাক্ষের মন্ত্রপাঠে বিরতি ঘটিল।

"কি ও?" বলিয়া রাজাবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া একব্যক্তি সংবাদ দিল: "সর্ব্বনাশ হয়েছে রাজাবাবু, নাক দিয়ে রক্ত পড়্‌তে পড়্‌তে উদ্ধব বেটা এই এখন মারা গেল।"

রাজাবাবু মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। দেবী-প্রতিমার দিকে চাহিতে তাঁহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। তাঁহার শরীরের রক্ত যেন শুকাইয়া আসিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে আলোকোজ্জ্বল চণ্ডীমণ্ডপের দৃশ্য তাঁহার চক্ষের সম্মুখে লুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহার বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল ফাঁসিমঞ্চের প্রতিচ্ছায়া—ফাঁসির রশি যেন লক্‌লক্‌ করিতে করিতে তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিতে আসিতেছে। অস্ফুট চীৎকার করিয়া তিনি বিরূপাক্ষের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বিরূপাক্ষ বলিলেন: "মায়ের বলি মা নিজেই গ্রহণ করেছেন। তোমার কোন ভয় নাই দুর্গাপ্রসাদ। এই বেটা বাজাদার, বাজা না বেটারা, বলির সময় হ'য়ে এল যে।

বলির বাজনার প্রচণ্ড শব্দে মহারাত্রির মহাক্ষণ মহাকালের অট্টহাসিতে পূর্ণ হইয়া গেল।

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
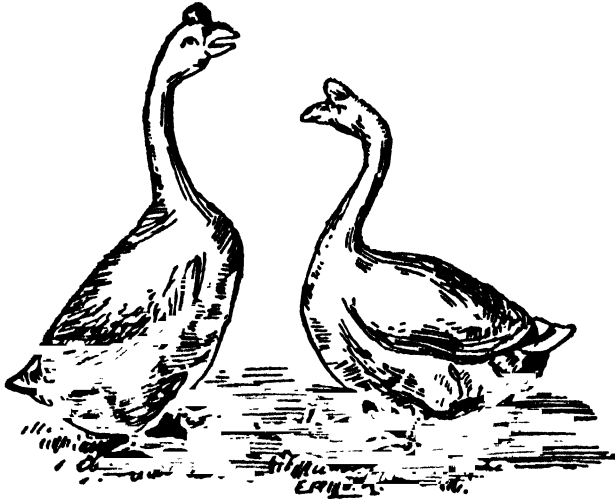
ব্রাহ্মণ অতিথি

শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী

রসিক বসু কলিকাতার ছেলে। বিবাহ করিয়াছে দত্তপুকুরে। বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। চাকুরে। বিবাহের পর বছর পার হইয়া গিয়াছে; শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া হয় নাই। এবার জামাই-ষষ্ঠীতে শাশুড়ী-ঠাকরুণ বিশেষ করিয়া পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—"যাওয়া চাই।"

বড় শ্যালক কলিকাতায় আসিয়া বলিলেন—"বল ত নতুন জামাই, আমরা কেউ এসে তোমায় সঙ্গে করে' নিয়ে যাব।"

রসিক বলিল—"না না, তার প্রয়োজন নেই। ষষ্ঠীর দিন অফিসের ফেরতা ট্রেণে নিশ্চয় যাব। আপনাদের কারও আস্‌বার দরকার নেই।"

শ্যালক বলিলেন—"দত্তপুকুর ষ্টেশনে নেবে গরুর গাড়ী চাপ্‌বে। বড়জোর একক্রোশ পথ। গাড়োয়ানকে বল্‌লেই অনন্ত মিস্ত্রীর বাড়ী পৌঁছে দেবে।"

রসিক দিন গণিতে লাগিল। সেই যা' বিবাহের কয়দিন দেখা। পত্নী-সম্ভাষণ মোটেই হয় নাই। এখন অনেকটা বড় হইয়াছে। না জানি—কতই ভাবে!

ষষ্ঠীর দিন বিকাল পাঁচটার ট্রেণটা ফেল করিয়া রসিক ছয়টার ট্রেণে চাপিয়া শ্বশুর-বাড়ী রওনা হইল। দত্তপুকুরে নামিতেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ষ্টেশনের বাহিরে মোটে একখানি গরুর গাড়ী ছিল; তাহাও একজন সেখানি দখল করিয়া বসিয়া আছে।

রসিক গাড়ীর কাছে আসিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—"ভাড়া যাবে?"

গাড়ো—"যাবেন কোথা?"

রসি—অনন্ত মিস্ত্রীর বাড়ী জান?"

গাড়ো—"জানি ত বাবু বটেক কি না। তবে আমি যে সোয়ারী বসাইচি, মুই ও পথে ত যাতি পার্‌ব না। আপনি, তুমি কি ওনাদের জামাইবাবু বটেক?"

রসি—"হ্যাঁ।"

গাড়ীর ছইয়ের ভিতর যে বাবুটি বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—"হ্যাঁরে, তোদের দেশের জামাই কি এই রাত্রিতে হেঁটে শ্বশুর-বাড়ী যাবে? নে বাপু, তুলে নে। গাড়ী না হয় একটু ঘুরিয়েই নে যাবি।"

গাড়ো—"তা' আপনারা বল্‌তি পার—তুমিও জামাই উনিও জামাই। আজ সকাল থ্যাহে ক্যাবোল জামাই বইছি—এত জামাই যে কোথায় যান! একটু নীচু গলায় বলিল—"দত্তপুকুর আজ চষি ফেল্‌বে দেখচি।" বড় গলায় বলিল—"তা' হ'লে উঠুন ওই ছইয়ের মদ্দি। ভাড়াটাও সমানই দেবেন।"

রসিক কালবিলম্ব না করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। গাড়ীও ছাড়িল।

হড়্‌হড়্‌ গড়্‌গড়্‌ করিয়া গাড়ী ছুটিল। রাস্তা কোথাও উঁচু কোথাও বা কোমরভোর নীচু। গরুর গাড়ী উঠিয়া পড়িয়া ছুট দিতেছে। আরোহী দু'জন ছইয়ের বাঁশ দুই হাতে চাপিয়াও সোজা হইয়া বসিতে পারিতেছিল না। পরস্পর ঘাড়ে পড়িয়া মাথা ঠোকাঠুকি হইতেছে দেখিয়া উভয়েই প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"একটু আস্তে চালাও বাপু, প্রাণ যে প্রায় যায়!"

গাড়োয়ান হাসিতে হাসিতে বলিল—"বাবুরা কোল্‌কেতার ঘোড়া গাড়ী চড়েছ, দত্তপুকুরের জমিরদ্দির দামড়া দুটোর একবার হেকমৎ দ্যাহো। ঘরমুখো দামড়া—তবু কি ল্যাজে হাত দিইছি।"

প্রথম নম্বরের জামাইবাবু বলিলেন—

"দোহাই বাবা জমিরদ্দি, আর ল্যাজে হাত দিয়ো না বাবা, প্রাণে মারা যাবো!"

জমির হেসেই খুন। 'হ্যাই' 'হ্যাই' করিয়া চেঁচাইয়া

গরুর দড়িটা একটু টানিতেই, গাড়ী আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। জামাইবাবুরাও হাসিতে লাগিলেন।

মাঠের রাস্তা। ষষ্ঠীর চাঁদ। অন্ধকারই বেশীর ভাগ। কিন্তু হাওয়াটা হুহু বহিতেছিল। জামাইবাবুদের প্রাণের ভিতরটাতেও হয় ত একটা কিছু হইতেছিল। লেখক বৃদ্ধ; সেটার সঠিক খবর দিতে পারিবে না। তবে কিছু পরেই প্রথম নম্বরের জামাইবাবু যে গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়াছিলেন, আর রসিক গাড়ীর চাঁচ চাপড়াইয়া তাল দিতেছিল, তাহা জানা গিয়াছে।

দুই

গরুর গাড়ী হটর হটর করিতে করিতে সুরকীর রাস্তা ছাড়িয়া গ্রামের মাটির রাস্তায় পড়িল। দুইদিকে গাছপালা, বাঁশঝাড়। অপ্রশস্ত পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে। অন্ধকার জমাট হইয়া আছে। জোনাকি জ্বলিতেছে, নিভিতেছে। নিরবছিন্ন ঝিঁঝিঁ ডাক ছাড়া কচিৎ কখনও দু'-একটা ভেকের আওয়াজ শুনা যাইতেছে। গাড়ীর আরোহী দু'জন পরস্পর আলাপ করিতে করিতে চলিয়াছেন। গাড়ীখানা খানিক চলিয়া একটা যায়গায় আসিয়া থামিল। গাড়োয়ান বলিল—"মিস্ত্রীদের জামাইবাবু, এইখানে নামুন।"

রসিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"সে কি! এ জঙ্গলে কোথায় নাব্‌ব?"

গাড়োয়ান বলিল—"হুই ত পথ। হুই পুকুর পাড় ধরে' বরাবর সাম্‌নে যাবা। পয়লা কোঠাটাই মিস্ত্রীদের।"

রসিক নামিয়া পড়িল। গাড়ীতে যিনি রহিলেন, তিনি বলিলেন—"তা' হ'লে আসুন। নমস্কার।"

রসিক—"নমস্কার। মনে রাখ্‌বেন।"

আরোহী—"নিশ্চয়! কি যে বলেন, সতীর্থ! কখনও কি ভোলা যায়।"

গাড়ী চলিয়া গেল। রসিক সম্মুখের পথে অগ্রসর হইতে হইতে ভাবিতে লাগিল—পথটা যেন স্মরণ হইতেছে, আবার হইতেছে না। এত বন-জঙ্গল ত সে দেখে নাই। পথে কি একটাও মানুষ চলে না? একলা আসা ভাল হয় নাই। রসিক অতিমাত্রায় ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, তবুও চলিতেছে। কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পা উঠিতেছে না। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে কি শেষে ডাকাতে মারিয়া কাড়িয়া-কুড়িয়া লইবে, না সাপে খাইবে? একটু আশ্রয় পাইলে যে সে বাঁচে! শ্বশুর-বাড়ী তাহার মাথায় থাক্! কি ঝকমারিই সে করিয়াছিল! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রসিক পায়ে পায়ে অগ্রসর হইতেছে, একটা বড় শূয়ার ঘোঁৎঘোঁৎ করিতে করিতে তাহার সম্মুখ দিয়া রাস্তা পার হইয়া গেল। রসিক ভয়ে আড়ষ্ট! পা আর তাহার উঠিতে চাহে না। সে আবাল্য কলিকাতায় বর্দ্ধিত; কালে-ভদ্রে পল্লীগ্রাম দেখিয়াছে। রাত্রিকালে অন্ধকারে জঙ্গলের ভিতর একাকী জনশূন্য পথ চলা এই বোধ হয় তাহার জীবনে প্রথম। সে মহাভীত, চিন্তিত ও ত্রস্ত। মনে মনে সংকল্প করিল—একটা আশ্রয় যদি পায়, রাত্রিটা সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে। নিশ্চয়ই ভুল পথে আসিয়া পড়িয়াছে—ওই হতভাগা গাড়োয়ান বেটাই গোলে ফেলিয়াছে। রাত্রিটা ষ্টেশনে থাকিলেও ক্ষতি ছিল না।

আরও একটু অগ্রসর হইলে রসিক সম্মুখে একটি আলোক দেখিতে পাইল। আলোক লক্ষ্য করিয়া আরও খানিক চলিয়া দেখিল—একখানি খোড়োঘর, মাটীর প্রাচীরে ঘেরা। প্রাচীরের মধ্যভাগে প্রবেশ-পথ। রসিক পথের নিকটে গিয়া ডাকিল—"বাড়ীতে কে আছেন? একবার বাইরে আস্‌বেন?"

কেরোসিনের ডিবা হাতে এক নগ্নগাত্র প্রৌঢ় আসিয়া রসিকের সম্মুখে দাঁড়াইল। রসিক বিনীতভাবে জানাইল—ভিন্নদেশী, ব্রাহ্মণ অতিথি। আজকের রাতটা যদি এখানে থাক্‌তে দেন।"

রসিকের বেশভূষা দেখিয়া লোকটির মনে একটু যেন সন্দেহ হইল। বলিল—"তা' বাবু, এ যে গোয়ালার বাড়ী। ব্রাহ্মণ অতিথি এই রাতে—কিবা খেতে দেব, আর কোথায়ই বা শুতে দেব।"

রসিক—"খাবো না কিছু, খালি একটু জায়গা দাও। আমি পথ ভুলেছি। বড়ই বিপন্ন।"

গোয়া—"আপনি যাবেন কোথা?"

রসিক পরিচয় গোপন করিল।

গোয়ালা তাহাকে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল—বোধ হয় গয়লা-বউয়ের মত কি তাহা জানিতে। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া রসিককে বলিল—"তা' হ'লে এস ঠাকুর। এ যে গরীবের কুঁড়ে—তোমারও কষ্ট হবে, আর আমিও পাপের ভাগী হবো। বড় ভয়—ব্রাহ্মণ!"

রসিক—"কিছু না, বরং পুণ্য হবে।"

গোড়োঘরের দাওয়ার উপর গয়লা-বউ চ্যাটাই পাতিয়া পা ধুইবার জল রাখিয়া অতিথি-সৎকারের আয়োজন করিতেছিল। গোয়ালা রসিককে সেইখানে আনিয়া বলিল—"পা ধোও। গামছা আছে ত? আমাদের গামছা ত দিতে পারব না।"

রসিক বলিল—"না, গামছা নাই। পকেটে রুমাল আছে, এতেই হবে।"

গোয়া—"বিনা গামছায় পথে বেরিয়েছ ঠাকুর?"

রসিক—"আমরা কোলকাতার বামুন, গামছার চলন নেই।"

রসিক পা ধুইয়া রুমালে হাত পা মুখ মুছিল ও চ্যাটাইয়ের উপর বসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

গয়লা বউ একঘটী গরম দুধ ও কিছু বাতাসা রসিকের সম্মুখে রাখিল। গোয়ালা বলিল—"বাবা ঠাকুর, তা' হ'লে গরীবের যা' আছে একটু সেবা করুন।"

গোয়ালার গোয়াল ঘরে রসিকের শয্যা প্রস্তুত হইল। সে রাত্রিযাপন করিতে সেখানে প্রবেশ করিল।

কোথায় শ্বশুরালয়ে পরম আদর-আপ্যায়নে শালী-শালাজ লইয়া আহ্লাদ-আমোদ, তাহার বদলে দুইখানা বাতাসা চিবাইয়া মশার কামড়ে গোয়ালের মধ্যে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রাত্রিযাপন! অদৃষ্টের ফের! এমন বিপদে মানুষেও পড়ে! রামের কি হইয়াছিল? রাজা না হইয়া কি না বনে গেল।

তিন

রাত্রিটা জাগরণেই কাটিল। কাক কোকিল ডাকিতেছে শুনিয়া রসিক গোয়াল-ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। যদিও তখনও অন্ধকার আছে; তবু একটু দূরে যে একখানি কোঠাবাড়ী রহিয়াছে রসিক তাহা দেখিতে পাইল।

গোয়ালার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিয়ৎদূর অগ্রসর হইতেই বুঝিতে পারিল, কোঠাটা তাহারই শ্বশুরালয়। তখন নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়া মনে মনে কতই না অনুতাপ ও অনুশোচনা করিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—এখন কর্ত্তব্য কি? এ অবস্থায় শ্বশুরালয়ে যাওয়া, না ষ্টেশনে ফিরিয়া যাওয়া? দুয়ারে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে পায়ে পায়ে অর্গলবদ্ধ দ্বারের নিকট পৌছাইল।

দ্বারের কড়া একটু নাড়িতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ভৃত্য চোখ মুছিতে মুছিতে তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে চেঁচাইয়া উঠিল—"ওগো, জামাই বাবু এসেছে!"

বাড়ীতে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। রসিক দ্রুত বাহিরের ঘরে আশ্রয় লইল। বিবাহ করিতে আসিয়া এই ঘরের সহিত সে পরিচিত ছিল।

কিছুক্ষণ পরেই শ্যালকেরা একে একে আসিতে লাগিল এবং প্রশ্নবাণে রসিককে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

শ্যাল—"এত ভোরে কোথা থেকে এলে?"

রসি—"সকালের ট্রেণেই এসেছি।"

শ্যা—"ভোরে ত ট্রেণ নেই।"

রসি—"নতুন হয়েছে, আপনারা জানেন না।"

শ্যালকদের বিশ্বাস হইল না। শ্লেষ বিদ্রূপ চাপাহাসি চলিতে লাগিল। রসিক বিব্রত হইয়া পড়িল। ক্রমে শাশুড়ী-ঠাকরুণ আসিয়া পড়িলেন। রসিক তাঁহার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল।

শাশুড়ী বলিলেন—"কাল এলে না কেন? এই আসে এই আসে করে' আমরা কত রাত পর্য্যন্ত না জেগে ছিলাম।"

রসি—অফিসের কাজে অনেক রাত হ'য়ে গেল, তাই আস্‌তে পারি নি।"

শাশুড়ী-ঠাকরুণ "বাড়ীর কে কেমন আছেন" প্রভৃতি

তিমিরবরণ—[বিনয়ের সহিত] রাস্কেলও নয়, ষ্টুপিডও নয়···আসলে মহাভুল। নইলে আজই বা বাড়ীতে রুমাল ফেলে আস্‌ব কেন, আর আপনিই বা মাঠ ফেলে এসে এই বেঞ্চে বস্‌বেন কেন ? দিদিমা বলেন···

ঝরণা—ষ্টুপিড্···

তিমিরবরণ—আপনি কেবল আমাকে গালই দিচ্ছেন —অথচ ভুলে যাচ্ছেন যে, দোষ এর মধ্যে কিছুই নেই—

ঝরণা—নন্‌সেন্স কোথাকার ! দোষ নেই, আ ম একজন মহিলা – ইতর কোথাকার বলা ! নেই,কওয়া নেই···(ঝরণা অত্যধিক ক্রোধে কথাটা শেষ করিতে পারিল না)

তিমিরবরণ—রুমালখানি নিয়েছি এই তো ! তা'তে আর দোষ কি বলুন ? চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—'পর দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ—আর আপনাদের আধুনিক প্রগতি 'সমাধিকার'—নরনারীর গণ্ডীর আগল ভেঙে দেওয়া। নারী পুরুষের সমান। আপনাদের চোখে নারী বলে কিছু নেই—সব নর—সব ব্রাদার, ভাই ভাই ! সেই সাহসেই তো ···মনে করলেম আপনিও যা, আমিও তাই··· বিশেষতঃ, আমার যখন দরকার, অথচ, আমার নাই, আপনার আছে ··

ঝরণা—ইডিয়ট !

তিমিরবরণ—[মৃদু হাসিয়া] যাই বলুন, আপনার গালগুলি ভারি মিষ্টি কিন্তু ! তার চেয়েও মিষ্টি আপনার চোখের দৃষ্টি ·

ঝরণা অগ্নিদৃষ্টিতে বোধ করি তিমিরবরণকে পোড়াইয়া দিয়া সরোষে স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

তিমিরবরণ—কিন্তু আপনার রুমালটা···

ঝরণা— ঐ নোংরা রুমালখানা নিতে হবে না কি ?

তিমিরবরণ—(অপ্রতিভভাবে) ঐ দেখুন, কেমন ভুল। এটা যে দেওয়া উচিৎ নয়·

ঝরণা—ফুল !

তিমিরবরণ (হাসিয়া)—যা' বলেছেন ! আমার দিদিমাও আমাকে ঐ কথা বলেন বটে। আর বলেন (হঠাৎ ঝরণার রক্তরাগ-মিশ্রিত চোখের দিকে দৃষ্টি পড়িয়া)··· কিন্তু আপনার ঠিকানাটা···

ঝরণা নিরুত্তরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

তিমিরবরণ—এটা ফিরে দিতে হ'বে তো ! উপকার করেছেন—সকালেই কাচিয়ে· নইলে পরস্ব গ্রহণ···দিদিমাই বা কি বল্‌বেন···

(ঝরণা নিরুত্তর, নির্ব্বাক। রাগরক্ত-দৃষ্টিতে আর একবার তিমিরবরণের দিকে চাহিয়া দ্রুত চলিয়া গেল)

তিমিরবরণ (অপ্রতিভভাবে) নাঃ, কাজটা মোটেই সুরুচিসঙ্গত নয়—নাঃ, অসময়ে হাঁচিটা ··কিন্তু রুমালটা দেখে দিদিমাই বা কি বল্‌বেন ? এই ভুলটাই দেখ্‌ছি···

(তারপর যেন কিছুই হয় নাই এমনিভাবে বসিয়া তিমিরবরণ আবার আপন-মনে গান গাহিতে লাগিল)

সজনি, আজ দূর দিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসারি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রাস্তার ছোট-বড় উঁচু-নীচু খাদে জল পরিপূর্ণ। আকাশ ঘন-মেঘাচ্ছন্ন।

তিমিরবরণ এই পথ ধরিয়া দ্রুত চলিতেছিল। অকস্মাৎ একখানি মোটর 'পচ্' করিয়া একরাশ জল কাদা তিমির-বরণের জামা কাপড়ে মাখাইয়া দিয়া বিদ্যুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

তিমিরবরণ—(থামিয়া) নাঃ, এই মোটরওয়ালাদের জন্যে আর রাস্তা চলার যো নেই। দিলে সকাল্‌বেলাই কাপড়-জামা মাটি ক'রে। ইস্, সিল্কের জামাটা ··কেন বাবু, একটু দেখে-শুনে চালালেই তো হয় ? বড়লোকই না হয় হয়েছো, তাই বলে গরীবেরা কি পথও চল্‌বে না ?

(গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল).

ছাতাটা না এনে বড্ড ঠকে' গেছি। কি বিপাকেই পড়া গেল ! দিদিমাটা দেখ্‌ছি, পাগল না হ'য়ে আর যাবে না। বিয়ে বিয়ে বিয়ে—কেন রে বাপু, বেটা

ছেলের আবার দেখ্‌বে কি ? আর যদি দেখেই তো বাজার-সরকারই তো বেশ বাজার করতে পারে ? তা' না—তিনি যাও, নিয়ে এসো ভালো ভালো জিনিষ ! আমার মুণ্ডু নিয়ে এসো···এখন গেল ত কাপড়-জামা···ওরা এসে যদি এই দেখে···

(হঠাৎ বৃষ্টি চাপিয়া আসিল)

কোথাও না উঠ্‌লে তো আর চলে না। ইস্—কি জোরেই বৃষ্টি নাম্‌লো ! নামুক, আজ সারাদিন বৃষ্টি হোক্‌—যেন ওরা না আসে। করবো না বিয়ে—বিয়ে কর্ত্তে বসেও যদি এমনি ফেটে মরি···

(বৃষ্টি আরও জোরে নামিল। সাম্‌নে প্রকাণ্ড একটা গেট্‌ওয়ালা বাড়ী দেখিয়া)

যাক্ গে, এইখানেই ঢুকে পড়ি। কাদায় জামা-কাপড় নষ্ট হয়েছে কাচিয়ে নিলেই না হয় আবার ফর্সা হ'বে. কিন্তু ভিজে যদি অসুখ হয়···বিয়ে হ'বে না· দিদিমা কি বল্‌বেন যাক্, গেটেও দেখ্‌ছি চৌবে মহারাজ নেই। ঐ বারান্দাটায় উঠে পড়ি।

(তিমিরবরণ গাড়ী-বারান্দায় উঠিয়া পড়িল)

অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে—তৎসঙ্গে বাতাসের মাতলামি আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। গাড়ী-বারান্দার কোথাও তিমিরবরণ দাড়াইতে পারিতেছে না—বৃষ্টিধারা বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে ভিজাইয়া দিতেছে।

তিমিরবরণ (পাশের একটা দরজা খোলা দেখিয়া) যাক্, এইখানেই ঢুকে পড়ি···অনধিকার প্রবেশ। আপনি বাঁচ্‌লে বাবার নাম্—পরে যা' হয় হ'বে।

তিমিরবরণ ঘরে প্রবেশ করিল। সুসজ্জিত ঘর। এক পার্শ্বে টেবিলের নিকট একখানি চেয়ারে বসিয়া ঝরণা এক-মনে কি একখানি বই পড়িতেছিল। তিমিরবরণ লক্ষ্য করে নাই। ঝরণা একাগ্র-মনে পাঠে নিযুক্ত থাকায় তিমিরবরণের নিঃশব্দ প্রবেশ উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

তিমিরবরণ—(অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়িয়া) নম—(নারী বলিয়া চিনিতে পারিয়া অপ্রস্তুতের ন্যায় থমকিয়া গেল)

ঝরণা—(চমকিয়া উঠিয়া চোখ ফিরাইয়া বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তিমিরবরণকে সে পলকে চিনিতে পারিল। কিন্তু তাহার আগমন কল্পনাতীত। তাই সীমাহীন বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল)

তিমিরবরণ—আপনিও রাগ কর্চ্ছেন না কি ? ওটা ভারি অন্যায় বিশেষতঃ, এই সম-অধিকারের যুগে। কিন্তু সত্যিই আমি বল্‌ছি—বাইরে বেয়াড়া বৃষ্টি না হ'লে··· (তিমিরবরণ ঝরণাকে চিনিতে পারে নাই)

ঝরণা—কে বল্‌লে আমি রাগ করেছি।

তিমিরবরণ—যাক্, বাঁচালেন ; আমি তো ভেবে-ছিলেম · এই দেখুন না, সেদিন সে এক ভারি মজা··· গড়ের মাঠে বসে' বসে' গান কর্চ্ছি, হঠাৎ হাঁচি। রুমাল ভুলে রেখে এসেছি বাড়ীতে, কি করি, পাশে এক মহিলা—এই রুমালখানা, অবশ্য তাঁর কোনই দরকার ছিল না—আমি নিয়েছিলেম বলে' তাঁর কি রাগ ! এ আমার স্বভাব—আমি কাউকে পর দেখ্‌তে পারি নে। কিন্তু তিনি যা' রেগে গেলেন···রুমালটা আর ফিরিয়ে দিতে পার্‌লেম না। দিদিমা তো শুনে রেগে অস্থির—রুমাল ফিরিয়েই দিতে হ'বে। কি করে' দিই বলুন না—তাঁর ঠিকানাটাও জানি নে···আচ্ছা, একটা কথা বল্‌লে আপনি রাগ করবেন না·· ভয় হয় কা'কে কি বলি, আবার তিনি যদি রাগ করেন ·

ঝরণা (অদম্য হাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিতে-ছিল না) না না, রাগ করবো কেন, বলুন না ?

তিমিরবরণ—(ইতস্ততঃ করিয়া) আপনার নামটা···

ঝরণা—আপনি তো বড্ড বদ্ দেখ্‌ছি। নাম ? নাম কি হ'বে।

তিমিরবরণ—রুমালখানা হয় তো তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারতেম।

ঝরণা—কা' নাম জেনে কি করবেন ?

তিমিরবরণ—রুমালটার কোণে নাম লেখা আছে কি না ?

ঝরণা—কৈ দেখি। (তিমিরবরণের হাত হইতে রুমালখানা লইয়া পড়িবার ভান করিয়া) ঝরণা ! তা' আমার নামই তো ঝরণা।

তিমিরবরণ (উল্লসিত হইয়া) আঃ, বাঁচালেন! আপনার নামই ঝরণা—ভগবান, তা' হ'লে···

ঝরণা (হাসিয়া) রুমালখানা আমারই বল্‌তে চান্? কিন্তু ঝরণা নাম আরও অনেকেরই তো আছে? তা' ছাড়া, আমি গড়ের মাঠও যাই নি, আপনাকেও চিনি নে। তখন—

তিমিরবরণ (চিন্তিতভাবে) তাই ত!

ঝরণা—(মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া লইয়া) তাই ত কি বস্থন না।

তিমিরবরণ (একবার গদিআঁটা সোফার দিকে ও একবার নিজের কাদামাখা অপরিষ্কৃত ভাল জামা-কাপড়ের দিকে চাহিয়া) কিন্তু—

ঝরণা—ইস্, বড্ড ভিজে গেছেন দেখ্‌ছি। জামাকাপড়···

তিমিরবরণ—আর বল্‌বেন না, এই মোটর-ওয়ালাদের...

ঝরণা অকস্মাৎ উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। তিমিরবরণ অপ্রস্তুতের ন্যায় ঝরণার চলা-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। না জানি আবার কি ভুল বা অপরাধ করিয়াছে ভাবিয়া সন্ত্রস্ত হইল। একবার ভাবিল, এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই ভাল। মহিলা। নির্জ্জন ঘর। এমনভাবে আসা ঠিক্ হয় নাই। তিমিরবরণ ফিরিতে উদ্যত, এমন সময় ঝরণা ভিতর হইতে জামা-কাপড় আনিয়া তিমিরবরণের হাতে দিয়া কহিল—

চট করে' কাপড়-জামাটা ছেড়ে নিন্। এই পাশের ঘরে যান—জল, সাবান, তোয়ালে সব আছে। যা ভিজে গেছেন।

তিমিরবরণ—(জামা-কাপড় হাতে লইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল)

ঝরণা—দাঁড়িয়ে রইলেন যে? যান্, আর দেরী করবেন না, অসুখ করতে পারে তো?

তিমিরবরণ—মাপ্ করবেন। ও সব দরকার হ'বে না— হয় তো বা রুমালের মতো আবার একটা অপ্রীতিকর কিছু ঘট্‌তে পারে। তা' ছাড়া, দিদিমা যদি আবার এই কাপড় জামা ফিরিয়ে দিতে বলেন তা' হ'লেই তো···এক রুমাল নিয়েই···

ঝরণা (মুখে রুমাল চাপিয়া হাসিতে হাসিতে) কিন্তু কাপড়-জামা তো আর আমি ফেরৎ চাচ্ছি নে। ও আর দিতে হ'বে না।

তিমিরবরণ—দিতে হ'বে না?

ঝরণা—না।

তিমিরবরণ—কিন্তু পরের জিনিস···

ঝরণা (গম্ভীরভাবে) পর? পর কে? এই তো আপনি একটু আগে বল্‌লেন—পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, সম-অধিকার, তখন আবার পর কি?

তিমিরবরণ—কিন্তু···

ঝরণা—না না, আর কিন্তু নয়, যান্, চট্ করে' কাপড় ছেড়ে আস্থন।

তিমিরবরণ অগত্যা উঠিয়া গেল। ইত্যবসরে ঝরণা বাড়ীর ভিতর হইতে এক কাপ্ চা ও জলখাবার লইয়া আসিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া নিজের চেয়ারে বসিল। কিয়ৎকাল পরে তিমিরবরণ কাপড়-জামা ছাড়িয়া এই ঘরে আসিল।

ঝরণা—এই যে, এখানে বসে' এগুলো খেয়ে নিন্ তো?

তিমিরবরণ—মাপ্ করবেন, এই কিছু আগে খেয়ে বেরিয়েছি, আর পার্‌বো না।

ঝরণা,—একটু গরম হওয়া তো চাই—ঐ চা-টা ভারি উপকার দেবে। আর খালি চা তো অতিথিকে দেওয়া যায় না, স্থতরাং···

তিমিরবরণ—(হাসিয়া) আপনার কথাগুলি ভারি মিষ্টি (বলিয়া ফেলিয়াই অপ্রতিভ হইল)

ঝরণার মুখের উপর এক ঝলক রক্ত ফুটিয়া আসিয়া সমস্ত মুখখানি গোলাপফুলের মত করিয়া তুলিল। কহিল,—কি লোক আপনি বলুন তো, একটা ভদ্রতা······

তিমিরবরণ—মাপ্ করবেন, আমার বড্ড······বলিয়া আলোচনার হাত এড়াইবার জন্যই যেন টেবিলের পাশে বসিয়া জলখাবারের থালাখানি টানিয়া লইল।

জল তখন ছাড়িয়া গিয়াছে। আকাশও অনেকটা

দুর্গাবাই খোটে

জ্যেল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা

পরিষ্কার। বাহিরের দিকে চাহিয়া তিমিরবরণ কহিল—এইবার উঠি—আপনার আতিথ্য, না···বলিয়া তিমিরবরণ উঠিল। এবং ক্ষুদ্র একটী নমস্কার করিয়া দুয়ারের দিকে পা বাড়াইয়া দিল।

ঝরণা—আপনি তো খাসা ভদ্রলোক! কৃতজ্ঞতা বলে' কি কিছু আপনার জানা নেই?

তিমিরবরণ থমকিয়া দাঁড়াইল।

ঝরণা—দিব্যি খেয়ে দেয়ে লম্বা পা ফেলছেন। কিন্তু কাপড়টা! রুমালটা না হয় আপনার ঝরণা দেবী ছেড়ে দিতে পারেন-- কিন্তু জামা-কাপড়টা তো আর আমি···

তিমিরবরণ—ওঃ, সত্যিই তো বড্ড ভুলে গেছি। সত্যিই আমার কিছু মনে থাকে না। তা' আপনার নামটা ·

ঝরণা (হাসিয়া)—ঝরণা···

তিমিরবরণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।—ওই দেখুন, ভুলে গিয়েছি। দিদিমা ঠিকই বলেন। ইয়ে...কিন্তু আপনার কথাগুলি ভারি মিষ্টি···আচ্ছা, আমি কালই পাঠিয়ে দেবো·· নমস্কার।

তিমিরবরণ দ্রুত পথে নামিয়া বাঁকের মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঝরণা—ভারি সুন্দর! দু'দিন দেখ্‌লেম—কি প্রাণ খোলা হাসিটি! আর গান যা' গায়···(ঝরণা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল) তখন নীল আকাশ সূর্য্য কিরণে হাসিয়া উঠিয়াছে।···দুইটী বলাকা শুভ্রপক্ষ বিস্তার করিয়া সেই নীল গগনতল বাহিয়া কোথায় উড়িয়া চলিয়াছে। ঝরণা সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখ দুইটী বেদনাতুর করিয়া তুলিল।

[ঝরণার পিতা কল্যাণবাবু প্রবেশ করিলেন]

কল্যাণ—মা!

ঝরণা—(চমকিয়া ফিরিয়া) বাবা।

কল্যাণ—তোর অসুখ করেছে কি মা?

ঝরণা—না বাবা।

কল্যাণ—কিন্তু তোর শুক্‌নো মুখ, ছল্‌ছল্‌ করুণ চোখ দু'টী, মুখের উপরকার গাঢ় ক্লান্তি—এ তবে কি মিথ্যে মা?

ঝরণা (ধরা পড়িয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য হাসিয়া) ও তোমার চোখের দোষ বাবা—তুমি আমায় বড্ড ভাল বাস কি না, তাই একটুতেই আমার অসুখ দেখো।

কল্যাণ (হাসিয়া)—সেটা কি বড্ড বেশী ঝরণা। তোর মা নেই, তিনি যাবার সময় তোকে আমার হাতে তুলে দিয়ে চোখের জলে ভেসে বলে' গেছেন—ঝরণাকে দেখো—ও যেন অভাব বোঝে না—তুমি··· তারপর তিনি আর কিছু বল্‌তে পারেন নি। তাঁর সেই করুণ ব্যাকুলতা আজও আমার কানে বাজ্‌ছে। তোকে যত্ন করি, তোর জন্য ব্যাকুল হই, তবুও ভাবি, হয় তো তোর কি অভাব আছে—হয় তো তোর মায়ের মতন পরতে পারছি না··

ঝরণা (মায়ের কথায় বেদনা অনুভব করিল)—কিন্তু তুমি যে বাবা মায়ের চেয়েও বেশী ভালবাস—বেশী যত্ন কর!

কল্যাণ—তা' কি আর করতে পারি ঝরণা। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন -মা।

ঝরণা—কি বাবা?

কল্যাণ—আজ তা' হ'লে আমাদের সম্মতি দিয়ে দিই, কেমন?

ঝরণা—(বিচলিত হইয়া) আর দু'-চারদিন থাক্ না বাবা। এত তাড়াতাড়ি ক'রে কি হবে?

কল্যাণ—কিন্তু ওরা যে এখনই একটা পাকা কথা চায় মা। অঘ্রাণেই কাজ কর্ত্তে চায়। মস্ত জমীদার—ছেলেটী এম-এ পাশ। আর দেখতে কি সুন্দর! অমন বর·· না। মা, লজ্জা করলে হ'বে না। তোর মা বেঁচে থাকলে তো তা'কে সব বল্‌তিস্। তিনি যখন নেই, তখন আমাকেই সব বল্‌তে হ'বে। তোর অমতে আমি কোন কিছু করতে চাই নে ঝরণা।

ঝরণা—কিন্তু জমীদার··ওদের ভারি দম্ভ বাবা—আমরা সাধারণ মানুষ··

কল্যাণ—না রে, ওরা মা'টীর মানুষ—অমন লোক হয় না। তোকে দেখে তারা যে কি পছন্দই করেছে··· আমি তো এখনি আবার সেখানে যাচ্ছি।· আমি কিন্তু কথা দিয়েই আসবো মা···

ঝরণার চোখের সামনে তিমিরবরণের প্রশান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। তাহার কানে বাজিতে লাগিল তিমিরের গানের মূর্চ্ছনা—তিমিরের হাসির মাদকতা যেন তাহার সমস্ত অঙ্গের উপর অনাস্বাদিত সুখে এলাইয়া পড়িল।

ঝরণা—না বাবা, ওরা জমীদার···তার চেয়ে...

কল্যাণ—তার চেয়ে কি মা?

ঝরণা- একটা গরীবের ঘরের—যে এসে তোমার পায়ের তলায় মাথা রেখে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতে পারবে।

কল্যাণ—(হাসিয়া) যাকে আন্‌ছি--সে যে এর আগেই পায়ের তলায় মাথা দিয়েছে মা। না মা, এবার আর তোর কোন কথা শুনবো না—আমি জানি সে তোকে সুখী করবেই। আমি আসি মা···

[প্রস্থান

ঝরণা—বাবা··নাঃ, ছিঃ, ছিঃ, আমার একটুও লজ্জা নেই। তিনি গুরুজন তাঁর সঙ্গে কি না···কিন্তু কেন ওর ঠিকানাটা রাখ্‌লেম না। হয় তো···নাঃ, এ আমি কি সত্য পাগল হচ্ছি না কি--ছিঃ, ছিঃ, ভগবান, আমায় শক্তি দাও! দেখো,'যেন বাবার কথার অবাধ্য না হই। নিজের সুখের জন্য বাবার স্নেহময় বুকে আঘাত না করি।

তৃতীয় দৃশ্য

- তিমিরবরণের বাড়ী। সন্ধ্যা। তিমিরবরণ ও তাহার দিদিমা কথোপকথন করিতেছিল।

দিদিমা—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বাড়ী তো?

তিমির—হাঁ।

দিদিমা—বড় ফটকওয়ালা, লাল দালান। গেটের উপর সিংহ আছে?

তিমির—সিংহ আছে কি না জানি নে দিদিমা—কিন্তু একটী মেয়ে আছে, যা' সুন্দর!

দিদিমা—আমার চেয়েও?—

তিমির—ইস্, উনি আবার সুন্দরী···কিন্তু যাই বলো দিদিমা, ও রুমালের মালিক খোঁজা আমার কর্ম্ম নয়।

দিদিমা—কিন্তু কাপড়-জামা তো ফিরিয়ে দিতে হ'বে?

তিমির—সে তুমি দিও, আমি পারবো না।

দিদিমা—কিন্তু খেতে পারলে ত?

তিমির—খাওয়ালে যে?

দিদিমা—খাওয়ালে না খেলে, ওর মাথাটা খেয়ে বসেচো তো? ছিঃ ছিঃ, কি ঘেন্নার কথা! বিয়ে না হতেই কনের রুমাল নেওয়া, ঠাট্টা করা, তার বাড়ী বয়ে গিয়ে খাওয়া—ও মা, ইচ্ছে হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি! এক··· বল্‌বো কা'কে···

তিমির—কেন আমাকে—আমিই যখন ঘরে-বাইরের আছি—তখন আর অন্যকে কেন?

দিদি—তা' নয় তো আর কি? বলি, আর উনি গড় গড় করে' সতীন মাগীর বাড়ী গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে' সব বলে' দিন, আর তিনি এসে আমার চুল ধরে' তাড়িয়ে দিন আর কি!

তিমিরবরণ কলহাস্যে হাসিয়া উঠিল। কহিল—ও। রুমাল ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বল্লে কেন? তখন বল্লে না কেন···

দিদিমা—বলবার আমার গরজ? সেদিন চিত্রায় তিনি ও তাঁর বাপ পাশেই বসেছিলেন। সাতবার করে' দেখালেম, মনে থাকে না? আমরা তো বাবু একবার দেখলেই মনে রাখ্‌তে পারি।

তিমির। তা' হ'লে সে দোষ তোমাদের তাবিজের। যেটুকু বা স্মৃতিশক্তি ছিল, তা' এ' তাবিজের গুণেই গেছে।

বাহিরে মোটরের 'হর্ণ' বাজিয়া উঠিল। দিদিমা সশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন—যা' তিমি, দেখ্ তো

ঝরণার বাবা বুঝি এলেন। এই ঘরের ভিতরে নিয়ে আয়। যা'।

তিমিরবরণ চলিয়া গেল। এবং একটু পরে কল্যাণবাবুকে সঙ্গে করিয়া ফিরিল। কল্যাণবাবু দিদিমার পায়ের ধূলি লইয়া হাসিয়া কহিলেন, ছেলেটীকে তো আমাকে দিচ্ছেন?

দিদিমা—তোমাকে দিয়ে আমি কি নিয়ে থাক্‌বো? রেতে ও আবার না থাক্‌লে আমার ঘুমই হয় না।

কল্যাণ—কেন, ঝরণা? ঝরণা এসে তার দিদিমার ভার নেবে?

দিদিমা—আর তিমির যাবে তোমার ওখানে? ভাল, তা' হ'লে তো সে একই কথা হলো? তার চেয়ে এই ভালো—যে যেখানে আছে সেইখানেই থাকুক। নতুন মানুষে আমার কাজ কি!

কল্যাণ—কিন্তু আমার যে একটী ছেলে না হ'লে চলে না। ছেলে না থাক্‌লে কি বাপের সুখ-দুখ বোঝে! সে বেটা মেয়ে এখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েই ··

দিদিমা—সবই মিলিটারী গোরা। এই দেখো না, তিমিরও কি এখন আমাকে আর আগের মতো ভালবাসে, না আমায় দেখ্‌তে পারে? কি যেন ওর হয়েছে—কি যেন ভাবে কোথায় যায়! আবার বিয়ে না হ'তেই কোন্ মেয়ের কাছ থেকে রুমাল আনে, তার বাড়ীতে যায়, কাপড় পরে—ছি ছি!

[তিমিরবরণ ছুটিয়া পলাইল]

দিদিমা ও কল্যাণবাবু এক সঙ্গে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

তিমিরবরণের গৃহ। প্রভাত আলো। তিমিরবরণ একখানা পত্র হাতে করিয়া উত্তেজিতভাবে ঘরময় পায়চারি করিতেছিল—মাঝে মাঝে পত্রখানিও পড়িতেছিল।

তিমির—মেয়েমানুষের এতো তেজ—এত দম্ভ! আমি জমীদার, আমি নিরেট বোকা—হোঁদলকুৎকুতের মতো আমার চেহারা? এত বড় স্পর্দ্ধা! ইস্, ভারি তো মেয়ে—পাকাটীর মতো শরীর···তারই আবার বড়াই? নিলর্জ্জ কোথাকার! আবার লিখেছে—আপনাকে জানিও নে, চিনিও নে—সুতরাং আপনার জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত কর্ত্তে চাই নে। তা ছাড়া, জমীদারদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে—ঘৃণা করি···ঘৃণা করো, তবে আবার তোমার বাপ্ এসে অত সাধাসাধি করে কেন? ঘৃণা কর? বাস্, তাই হোক্—আমিও তোমাকে চাই নে। দিদিমা—দিদিমা-–

[দিদিমার প্রবেশ

দিদি—কি হলো গো বর। আবার হলো কি?

তিমির—তোমার মাথা। বিয়ে আমি কর্‌বো না—এই নাও তোমার কনের চিঠি।

দিদি—কনের চিঠি! এ্যা! বিয়ে না হতেই কনের চিঠি—ও মাগো, আমি যাব কোথায়—কি ঘেন্না!

তিমির—আবে থামো না। আগে চিঠিটা পড়েই দেখো।

দিদি—তোমার চিঠি আমি পড়্‌বো কি? সে লিখেছে—প্রাণেশ্বর তোমার বিহনে যাতনা সহিতে না পারি আর তুমি লিখে দাও—প্রিয়তমে, দিন কাটে, যামিনী নাহি যায়। কি করিব তার। বাস্—তারপর জানলার ধারে গিয়ে আকাশের পানে চেয়ে চোখের জলে···

তিমির—আঃ, কি বাজে বকো। দেখো না—তোমার কনে লিখেছে, আমাকে বিয়ে কর্‌বে না।

দিদিমা ও মা! কনে লেখে বরকে—বিয়ে কর্‌বো না। এ মহা ব্যাপার বাবু, আমার সাধ্যি অসাধ্যি। কৈ দেখি।

[পড়িয়া হাসিয়া উঠিলেন]

বাঃ বাঃ, কনে আমার বেশ তো? যেমন ভূত তার তেমনি ওঝা! কিন্তু কনে হ'য়ে বরকে না করা—নাঃ, এ গোস্তাকি অমার্জ্জনীয়। এর দণ্ড, প্রাণদণ্ড এবং এই অঘ্রাণের সাতই তারিখ। বুঝ্‌লে বর?

[প্রস্থানোদ্যত]

তিমির—ও দিদিমা, ও কিন্তু আমি সহ্য করবো না—আমি বিয়ে করবো না। আমি কি হোঁদলকুৎকুতে...

দিদি—তা' তিনি আসুন, তারেই বলো...বোকা কোথাকার! সে তোমাকে চায় গো, চায় না জমিদার তিমিরবরণকে, বুঝলে। সে তো আর জানে না তুমিই সেই, সেই তুমি।

প্রস্থান

তিমির—অ্যাঁ, সত্যি!......

পঞ্চম দৃশ্য

তিমিরবরণের গৃহ। বিবাহ মিটিয়া গিয়াছে। ফুলশয্যার রাত্রি। পুষ্প-শয্যায় তিমিরবরণ ও ঝরণা। ঝরণা দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া একপাশে সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া আছে। তিমিরবরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। ও ধারের খোলা জানালা দিয়া একরাশ রূপালী জ্যোৎস্না আসিয়া সমস্ত ঘরখানিকে ভরাইয়া দিয়াছে।

তিমিরবরণ—ঘোমটা খুলবে না ঝরণা?

ঝরণা চমকিয়া উঠিল! এ স্বর তাহার পরিচিত। ঝরণা পিতার নিকট শুনিয়াছিল, কোন জমিদার-পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে। পিতার সমক্ষে অবাধ্য না হইলেও ঝরণা এ বিবাহ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং শুভ-দৃষ্টির সময় ঘৃণা করিয়াই স্বামীর দিকে চাহে নাই।

বাহিরে দিদিমা অট্টহাস্যে লুটাইয়া পড়িলেন—বাপ্‌রে বাবা, রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ......

তিমির—আঃ!

তিমিরবরণ একটু আগাইয়া গেল। ঝরণার পদ্মকুসুমতুল্য সুকোমল হাতখানি টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধস্বরে ডাকিল—ঝরণা!

ঝরণা চমকিয়া মুখের কাপড় হঠাৎ উন্মুক্ত করিয়া চাহিল—তু—তু—তুমি......

তিমিরবরণ বিপুল উল্লাসে ঝরণাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া ডানহাত দিয়া তাহার বিস্মিত সুখোজ্জ্বল মুখ উপরের দিকে তুলিয়া ধরিয়া কলকণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ গো মশায়, হ্যাঁ। আ—আ—আমি। বলিয়া গাহিয়া উঠিল—

শতেক বরষ পরে   বঁধুয়া মিলিল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি   লইল হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ॥

ঝরণা (মুখ রাঙা করিয়া)—যাও!

মাজুয়ার প্রেম

ডাঃ কার্ত্তিক শীল

মেয়েরা ঠাট্টা করেঃ দীপ্তি, শেষে মাজুয়াকে তোর মনে ধরল? একেবারে ভিন্ন জাত, ভিন্ন গোত্তর, অন্ধ প্রেম সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করল না? টেলিফোনের পোষ্টে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ছেলেটা ত মরচে-ধরা লোহা চকচকে রূপোর মতো করে' ফেল্‌ল—তার ওপর বুঝি করুণা হলো না?

দীপ্তি কখন হাসে, কখন মুখ গম্ভীর করিয়া অন্যদিকে ফিরাইয়া লয়। 'বাস্' ভর্ত্তি মেয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করে, আর মুখ টিপিয়া হাসে। কখন বা সেই টেলি-ফোন্ পোষ্টের কাছে গাড়ি আসিয়া পড়ে, আর ছেলেটাকে তদবস্থায় দণ্ডায়মান দেখিয়া মেয়েরা বলেঃ ঐ যে দীপ্তি, দেখ্, দেখ্, কী করুণ চাহনি, চুরী করে' চাইবার কী মিঠে ভঙ্গীটুকু!

মুখ ফিরাইয়া দীপ্তি বলেঃ বকিস্ নে, থাম্ দেখি। ভঙ্গীটা অতো যদি মিষ্টি লাগে, যা' না আলাপ করে' আয় না। এই মাজুয়া, গাড়ী রোখ' ত।

বিংশবর্ষীয় পাঞ্জাবী যুবক মাজুয়া, সশব্যস্তে হাঁকিয়া উঠেঃ এ ডেরাইভার, গাড়ী বাম্নো।

ড্রাইভার সশঙ্কিতে ব্রেক্ টিপিয়া বসে। মেয়ের দল খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে। ড্রাইভার ধমক দিয়া 'ক্লাচ্' ছাড়িয়া বলেঃ দিল্‌লাগি হোতা হায়?

দিন যায়। মাজুয়া এবং দীপ্তিকে ঘিরিয়া এইরূপ প্রত্যহ দু'টী বেলা মেয়েদের আসর গুলজার হইয়া উঠে। দীপ্তিদের বাড়ী আমহার্ষ্ট রো-তে। সকালে সেকেণ্ড ট্রিপ্-এর গোড়াতেই তার উঠিবার পালা এবং বিকালে প্রথম ট্রিপের শেষে তার নামিবার কথা। কাজেই সকালে-বিকালে দীর্ঘ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মেয়ের দল আমোদ অনুভব করে। কিশোর মাজুয়া বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মেয়ের দল যখন একবার তার এবং একবার দীপ্তির মুখের উপর সন্দিহান দৃষ্টি মেলিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে থাকে, তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দীর্ঘায়ত কটা চোখ দু'টা 'বাস' পূর্ণ প্রত্যেক মেয়ের মুখে কিসের উত্তর পাইবার আশায় ঘুরিয়া মরে। শুধু দীপ্তির চোখে চোখ পড়িলেই সে যে অসম্ভব লজ্জানত হইয়া পড়ে, কিছুতেই যেন তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারে না। তার এই লজ্জার উৎপত্তি বা পরিণতির কোন কারণই কিন্তু সে খুঁজিয়া পায় না।

অষ্টাদশী তরুণী দীপ্তিও বুঝিতে পারে না, অমন উগ্র-বর্ণ-বিশিষ্ট পাঞ্জাব বালকের চোখ দু'টায় কিসের সুরমা আঁকা আছে। লম্বাটে মুখের উপর টিকোলো নাক, পাতলা লাল ঠোঁট দু'খানা আর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা তার চোখের উপর এ কিসের প্রভাব বিস্তার করে, সে খুঁজিয়াই পায় না! যার ফলে তার মুখের উপর একবার দৃষ্টি পড়িলে কিছুতেই সে চোখ ফিরাইতে পারে না! চোখ দিয়া তার মনের কথা জানিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে!

সেদিন রবিবার। কলেজ বন্ধ। প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে দীপ্তি সবেমাত্র তুলি ও রং লইয়া বসিয়াছে। অর্দ্ধসমাপ্ত ছবিখানি আজ তাহাকে শেষ করিতেই হইবে। পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে সে চমকিয়া উঠিল, দিদিমুনি! ঘরে প্রবেশ করিল পাঞ্জাব কিশোর মাজুয়া। মুখ-চোখে তার স্নিগ্ধ হাসির ঝিলিক! হাতে ঠোঙায় মোড়া কতকগুলি কি যেন!

হাতের তুলি হাতে ধরিয়াই বিহ্বল বিস্ময়ে দীপ্তি কহিলঃ এ কি মাজুয়া, তুমি!

পাতলা টুকটুকে ঠোঁট দু'টায় মৃদু একটু হাসির রেখা

টানিয়া নতুন-শেখা ভাঙা ভাঙা বাঙ্‌লায় মাজুয়া বলিল : তোমা কাছে এয়েছে। হস্তস্থিত মোড়কটী টেবিলের উপর সশ্রদ্ধে রক্ষা করিয়া বলিল : কালীমায়ীর পরসাদী আছে, তোমি খাবে।

অদূরে বেঞ্চখানায় বসিতে বলিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত খবর লইয়া দীপ্তি বুঝিল, গত রাত্রে তার পিতা পুত্রকে দেখিতে আসিয়াছে এবং এমন একটী সুন্দর চাকুরী প্রাপ্তির সাফল্যে দেবীর প্রীতি এবং পুত্রের কল্যাণ কামনায় উষার আলোয় আজ তাহার এই বিজয় অভিযান!

প্রাণের আকর্ষণে অপূর্ব্ব প্রসন্নতায় দীপ্তির সারা অন্তর ভরিয়া উঠে। মোড়ক খুলিয়া সাদরে একটুকরা প্যাড়ার অংশ মুখে ফেলিয়া বলে : তুমি এয়েচ, বেশ ভালই হয়েচে মাজুয়া। ছবিখানা কিছুতেই শেষ হচ্ছিল না। তোমার যদি কোন কাজ না থাকে, একটু ওখানে ঐভাবে বসে' থাকো, আমি তাড়াতাড়ি শেষ করে' নি।

ছবি আঁকিতে তাহাকে কিসের প্রয়োজন মাজুয়া কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষ পরীক্ষায় অঙ্কনে দীপ্তিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার পায়। অথচ স্মৃতি হইতে একখানি ছবি আঁকিতে গিয়া অজ্ঞাতে কেমন করিয়াই বা সে মাজুয়ার মূর্ত্তির 'স্কেচ্' করিয়া বসিল এবং কেমন করিয়াই বা আজ দুইদিন সে এমনভাবে ঠেকিয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই সে-ও বুঝিয়া উঠিতে পারে না।।..

ছবি শেষ হইলে দীপ্তি বলে : এই নাও মাজুয়া।

হাত বাড়াইয়া ছবিখানি লইয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে মাজুয়া বলে : হামার তস্‌বির!

—হাঁ মাজুয়া, তোমার তস্‌বির। তুমি আমাকে 'পরসাদ্' দিয়েছ, আমি তোমাকে ওইটা দিলুম।

বাঁধভাঙা খুসীতে পাঞ্জাব কিশোরের হৃদয় ভরিয়া উঠে!

দীপ্তি বলে : মাজুয়া, দেশে তোমার আর কে আছে?

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া মাজুয়া বলে : নানী, চাচা। এখন খালি মাইয়া আর এক বহিন্।

কি ভাবিয়া দীপ্তি প্রশ্ন করিয়া বসে : আচ্ছা, কা'কে খুব ভালবাস তুমি?

মনে তাহার কি ভাবের সৃষ্টি হয় বলা যায় না, কিন্তু কি জানি কেন মাজুয়া ইহার উত্তর দিতে পারে না। ... নীল চোখ দু'টী একটা মোহমাখা ভঙ্গীতে তার মুখের উপর অপাঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া মাটীর দিকে নামাইয়া লয়। মুখে কিছু প্রকাশ করিয়া না বলিলেও চোখ দু'টা যেন ইঙ্গিত করে, একথাও বলিয়া দিতে হইবে?

দীপ্তি বুঝিয়াও যেন বুঝিতে চাহে না। পুনরায় প্রশ্ন করিয়া বসে : কই মাজুয়া, বল্‌লে না ত?

একটা হাসিভরা দৃষ্টি মেলিয়া তেমন-ই সে নীরব থাকে। দীপ্তির মনের মাঝে কিসের ঝড় উঠে, সে নিজেই তা' নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না। হঠাৎ কি ভাবিয়া টেবিল ছাড়িয়া তাহার একখানি হাত আকর্ষণ করিয়া নিজের কোলের কাছে টানিয়া বলে : মাজুয়া, তুমি আমাকে ভালবাস?

অন্তর সিঞ্চিত একটা প্রবল আবেগ পাঞ্জাব কিশোরের কিশোর হৃদয় মথিত করিয়া তুলে। সে অযথা ঘামিয়া উঠে। অপূর্ব্ব পুলকে আবেগ-কম্পিত-স্বরে দীপ্তির মুখের উপর মোহমাখা দৃষ্টি মেলিয়া সে বলিয়া উঠে : বহুৎ খু-উব!

দীপ্তির মনে কী ভাবের উদয় হয় কে বলিতে পারে? হঠাৎ অসম্ভবভাবে সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার মুখের উপর সে বলিয়া বসে : আচ্ছা মাজুয়া, তুমি আমাকে বিয়ে করবে? সাদি?

সাদি!...মাজুয়ার ধব্‌ধবে সাদা মুখখানা টক্‌টকে লাল হইয়া উঠে! এ-প্রশ্নের উত্তর দিবার ভাষা খুঁজিয়া পায় না। দীপ্তির লাবণ্যমাখা কমনীয় মুখখানার দিকে বারেকের তরে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া, সে তার দীর্ঘ কটা চোখ দু'টী ধীরে ধীরে নামাইয়া লয়।

দীপ্তি মুখ টিপিয়া হাসে।

কয়েক মাস পরে। আগামী গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব্বে মেয়ে-মহলে যুক্তি হইয়া স্থির হইল, কলেজ বন্ধ হইবার

অব্যবহিত পূর্ব্বদিনে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-সংলগ্ন মাঠে তাহারা কয়জনে মিলিয়া 'পিক্‌নিক্' করিবে।

দীপ্তি এবং মঞ্জুলা এই আয়োজনের শ্রেষ্ঠ উদ্যোগী। স্থির হইল, বাসের ড্রাইভারকে কিছু বকশিস্ করিয়া ঐ গাড়ীতেই কয়জনে যাওয়া হইবে এবং গতায়াতের যাবতীয় খরচ-পত্র সকলে মিলিয়া সমান অংশে বহন করিবে। সব ঠিক্‌ঠাক্। মেয়েরা কয়জন দীপ্তির দিকে ফিরিয়া ভ্রূকুটীর হাসি হাসিয়া মাজুয়াকে বলিল: সেদিন একটু সকাল সকাল এসো মাজুয়া —বেশ পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরে' এসো।

মঞ্জুলা হাসিয়া বলিল: সেদিন কিন্তু তোমার ওই পাগড়ীটা এনো না। চুলগুলোয় একটু সাবান ঘসে পরিষ্কার করে' নিও—খোলা চুলেই তোমায় বেশ ভাল দেখায়।

মাজুয়া বাঙলা ভাল বলিতে না পারিলেও বুঝিতে পারে বেশ। তার উন্মত্ত চিত্ত কী বোঝে, সে-ই জানে! ঠোঁটের ফাঁকে স্নিগ্ধতার প্রোজ্জ্বল হাসি টানিয়া বলে: বহুৎ আচ্ছা দিদিজী!...

'প্রোগ্রাম' সব বেফাঁস্ হইয়া গেল। ছুটী ঘোষিত হইবার দুইদিন পূর্ব্বেই ড্রাইভার জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যা-শায়ী হইল। 'বাস' কয়দিন 'গ্যারেজ' হইতে বাহির-ই করা হইল না। দীপ্তি, মঞ্জুলা প্রভৃতি রীতিমত প্রমাদ গণিল। সব স্থির করিয়া তাহারা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, ভোজের জন্য একটা বেশ মোটা অঙ্কের চাঁদা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য, তাহারা ভাবিয়া কিনারা করিতে পারিল না।

এই দুইদিন গাড়ী না চলার দরুণ মাজুয়ার ছুটী। তবে দেউড়িতে পাহারা দিবার জন্য তাহাকে দু'টী বেলাই উপস্থিত থাকিতে হয়। মঞ্জুলাকে সঙ্গে লইয়া দীপ্তি মাজুয়াকে ধরিয়া বসে: তোমার সন্ধানে কোন গাড়ী আছে? কিম্বা কোন বড় 'বাস'? তুমি শুধু ঠিক করে' দেবে, তারপর আমরাই সব ঠিক্ করে' নেব।

এসব কথার একবর্ণও মাজুয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না। দীপ্তির আগমনে রক্তিমমুখে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলিয়া সে বলে: নেহি দিদিজী। হামি—

বিরক্তির সুরে বাধা দিয়া মঞ্জুলা বলে: আচ্ছা থাক্, আমরাই চেষ্টা দেখচি!...

অবশেষে স্থির হইল, মাত্র ছয়জনকে লইয়া যাইতে করবীদের 'ন্যাশ' গাড়ীখানাই যথেষ্ট। করবী তাহার পিতাকে সম্মত করিয়া ফেলিয়াছে। স্থির হইয়াছে, টুকি-টাকি ফাইফরমাস তামিল্ করিবার জন্য মাজুয়াকে সঙ্গে লওয়া হইবে। অসীম উৎফুল্লচিত্তে মাজুয়া এ প্রস্তাবে রাজী হইয়াছে।...

পরিবেশনের ভার লইয়াছে দীপ্তি। সাতটা কাপে চিনি এবং 'কণ্ডেন্সড্ মিল্ক' দিয়া কেৎলি হইতে চা ঢালিবার সময় ধরাগলায় সে বলিয়া উঠিল: আমার হাতে তোদের এই-ই বোধ হয় শেষ খাওয়া মঞ্জু! ছুটীর পরে আর বোধ হয় আমার উৎপাত সহ্য করতে হবে না তোদের!

কথাটা লঘু করিয়া মঞ্জু বলিয়া উঠিল: শেষ খাওয়া হ'তে যাবে কোন দুঃখে রে রাক্কুসী! তখন বরং আর এক-যোড়া শ্রীবিলেতের গন্ধমাখা হাত্তুড়ি-পেটা কেটো হাতের সংযোজনায় আতিথেয়তা পাবার সুবিধে হবে ডবল!

অদূরে জলন্ত ষ্টোভে 'টোষ্ট' করিতে অভিনিবিষ্টচিত্তে পূর্ণ উদ্যমে মাজুয়া বিশেষভাবে ব্যস্ত। ঘন পল্লবিত বিল্বশাখের ফাঁক দিয়া প্রভাত সূর্য্যের সোনালী আলোটুকু পড়িয়া তার কমনীয় মুখখানা টক্‌টকে রাঙা করিয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তুলিয়াছে।

আড়চোখে তার দিকে চাহিয়া মঞ্জু বলে: তোর এ কাজটা কিন্তু ভাল হলো না দীপ্তি। বেচারাকে অমন করে' ফাঁকি—

মাজুয়া সেইদিকে তাকাইতেই সে থামিয়া যায়।

য়াছে! একেবারে তাহার পার্শ্বে যাইয়া উপবিষ্ট হইয়া গোলাপী রং-এর বেনারসী শাড়ী দিয়া তার ক্ষত-বিক্ষত মুখখানি মুছাইয়া দীপ্তি ডাকিল: মাজুয়া!...

আর একবার কাসির ধমকে দু'ঝলক্ টক্‌টকে রক্তে তার লুণ্ঠিত অঞ্চলের অনেকখানি সিক্ত হইয়া গেল।

ক্রন্দনের স্বরে রুদ্রনাথের উদ্দেশে দীপ্তি বলিল: বাবা, শীগ্‌গির একটু জল আনিয়ে দাও।

দীপ্তির কণ্ঠস্বরে উদ্দীপিত হইয়া রুদ্র-দৃষ্টিতে পাঞ্জাব-কিশোর দ্বিগুণ-বলে চোখ মেলিয়া চাহিল। দীপ্তির চোখে চোখ পড়িতেই কী এক বৈদ্যুতিক শক্তিতে তাহা যেন আশ্চর্যরূপে নমিত হইয়া আসিল। চোখ দু'টী রক্ত জবার ন্যায় লাল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। উন্মত্তের ন্যায় নিজের কোলের কাছে হাতড়াইয়া শতছিন্ন উষ্ণীষের মোড়কটীর জন্য চারিদিকে সে আকুল বাহু বিস্তার করিতে লাগিল। তারপর দীপ্তির পায়ের কাছে কোন মতে সেটীকে রক্ষা করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল: দি-দি-মু-নি, তু-ম্-হা-র সা-দি-তে এই-ঠো হা-মি দি-লে! হা-মার গ-লা-র চাঁ-দির হা-র আ-ছে!

এইটুকু বলিবার জন্যই যেন সে অপেক্ষা করিতেছিল। কথা ক'টী শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার বিষম জোরে কাসি আসিয়া ভল্ ভল্ করিয়া কয় ঝলক রক্ত উঠিয়া গেল! বারেকের জন্য সমস্ত শরীর সজোরে স্পন্দিত হইয়া দীপ্তির পায়ের কাছেই তাহা নিথর নিস্পন্দ হইয়া গেল।

নিঃশব্দ গৃহে পাগলিনীর মতো তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া দীপ্তি ডাকিল: মাজুয়া! ...মাজুয়া!

গৃহশুদ্ধ কাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিল না।

ডিটেকটিভ গল্প

প্রতিফল

রায়বাহাদুর শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এ, ও-বি-ই

সারাদিন অফিসের খাটুনীর পর বাড়ীতে ইজিচেয়ারে শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে দেখিলাম যে, সিনেমায় খুব ভাল একটী ফিল্ম্ দেখান হইবে। ডাক্তার-বন্ধু সুধীরকে সঙ্গে যাইবার জন্য টেলিফোন্ করিতে গেলাম। এক্স্‌চেঞ্জে বলিলাম—"ফাইভ্ ও নাইন্।" রিসিভার কাণে দিয়া যেমন বলিলাম—"হ্যালো" অমনি ভীষণ গোলমাল কাণে গেল। হিন্দুস্থানী ভাষায় কে বলিতেছে—"খুন কল্লেরে, ওরে বাবা, খুন কল্লে।" আর একজন আমায় জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হয়েছে? ডাক্তারবাবু আছেন?" অমনি টেলিফোন্ কাটিয়া দিল। সুধীরের বাড়ীতে হিন্দুস্থানী নাই। সেজন্য ঐ কথাগুলি আশ্চর্য্য মনে হইল। সিনেমা যাওয়ার কথাটা ভুলিয়া তাড়াতাড়ি মোটরে সুধীরের বাড়ী ছুটিলাম। আমাকে অসময়ে দেখিয়া সুধীর ত অবাক্! আমি টেলিফোনের কথা তাহাকে বলিলাম। সে ত হাসিয়াই আকুল। তখন বোঝা গেল টেলিফোনের ভুল 'কনেক্‌সন' হইয়াছিল। তবে কোন স্থানে খুন হইয়াছে নিশ্চিত। কি গোঙানি শব্দ! বন্ধুকে লইয়া এক্‌চেঞ্জে আসিয়া কোন নম্বরে কনেকসন্ করিয়াছিল জিজ্ঞাসায় অপারেটর বলিল—"কেন? ফাইভ্ ফোর নাইন্।" তখন বুঝিলাম—৫০৯এর বদলে ৫৪৯ কনেক্‌সন্ দিয়াছিল। যাহা হউক, ডিরেক্টারী দেখিয়া ৫৪৯ নম্বরের বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া শীঘ্রই সেখানে রওনা হইলাম।

বাড়ীটা দোতালা। সদর দরজা দিয়া আমরা ঢুকিয়া পড়িলাম। নীচে একজন হিন্দুস্থানী চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,- কি হইয়াছে? সে বলিল, যে,—সে রান্নাঘরে ছিল, কিছু জানে না। দেখিলাম সে কিছু বলিতে চাহে না। আমরা তিনজনে উপরে উঠিলাম। দেখি, একটি হিন্দুস্থানী সুন্দরী রমণী মূর্চ্ছিত অবস্থায় ভেলভেটের গালিচার উপর পড়িয়া আছেন। একজন ঝি তাঁহাকে বাতাস করিতেছে ও মুখে জল দিতেছে। খানিক ক্ষণ পরে রমণীর জ্ঞান ফিরিল। ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিলেন—"আমি আমার স্বামীর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে' গল্প করছিলাম, হঠাৎ কয়জন লোক এসে তাঁর মুখে কাপড় গুঁজে টেনে নিয়ে গেল।" আসামীরা কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। কেন তাঁহার স্বামীকে লইয়া গেল, কাহারও সহিত শত্রুতা ছিল কি না, এ বিষয়েও তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না।

উপরের তিনটী ঘর তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া কোন সন্দেহ-জনক জিনিষ পাইলাম না। বাড়ীর সম্মুখে দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল—একঘণ্টা পূর্ব্বে একটী

বদ্ধ মোটর গাড়ীতে তিনজন লোক আসিয়াছিল এবং তাহার অল্পক্ষণ পরে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার অল্প আলোয় ঠিক বুঝিতে পারে নাই যে, কোন লোককে তাহারা জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে কি না। বাড়ীর সম্মুখে মোটরের টাটকা দাগও ছিল। তবে অনেক গাড়ী গিয়াছে—সে দাগ অন্য দাগের সহিত খানিক দূরে গিয়া মিশিয়া গিয়াছে।

দুই

থানায় আসিয়া দারোগাবাবুকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। তিনি মোকর্দ্দমা রুজু করিলেন। দুইজন কর্ম্মচারী লইয়া আবার রাত্রি দশটার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। চাকর আমাদের নীচে বসিতে বলিল এবং উপরে সংবাদ দিতে চাহিল। তাহার উপর আমার গোড়া হইতেই কেমন সন্দেহ হইয়াছিল। আমরা তাহাকে লইয়াই উপরে গেলাম।

দেখি, রমণী এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সঙ্গে সোফায় বসিয়া আছেন। ভদ্রলোক আমাদের দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, যে,—তিনি ঐ রমণীর প্রতিবেশী এবং একই দেশে বাস। রমণীর স্বামী তাঁহার বিশেষ বন্ধু। তিনি ঘটনার সময় বাড়ী ছিলেন না। বাড়ীতে ফিরিয়া ঘটনার কথা শুনিয়া সেখানে আসিয়াছেন। বিশেষ কিছু তিনি সাহায্য করিতে পারিলেন না। আমার কিন্তু ভদ্রলোকটীর ভীত অবস্থা দেখিয়া তাঁহার উপর সন্দেহ হইল। রমণীর, তাঁহার চাকর-ঝিয়ের এবং ভদ্রলোকের জবানবন্দী লইয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। থানায় আসিয়া ঐ ভদ্রলোক ও রমণীর উপর কড়াপাহারা মোতায়েন করা হইল।

পরদিন দুপুরবেলা আমি ও ইন্সপেক্টরবাবু হঠাৎ ঘটনাস্থলে গেলাম। চাকর কিছুতেই উপরে উঠিতে দিতে চাহে না। এক কনেষ্টবল তাহাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল। আমরা নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া সিঁড়ি হইতে উঁকি দিয়া দেখিলাম—রমণী ও সেই হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক গালিচার উপর বসিয়া খুব হাসি-ঠাট্টা করিতেছেন। পাণ, জরদা এবং সিগারেটও চলিতেছে। এদৃশ্য দেখিয়া মনে বড়ই সন্দেহ হইল। যাঁহার স্বামী গতকল্য মারা গিয়াছেন তাঁহার এরূপ অস্বাভাবিক ভাব হইতেই পারে না। মনে হইল, সত্য খুন হয় নাই; কিংবা যদি হইয়া থাকে—ইঁহারা দুইজনেই খুনের দায়ী।

আমরা ইচ্ছা করিয়া জুতার শব্দ করিতেই রমণী গালিচার উপর শুইয়া পড়িলেন এবং ভদ্রলোক চেয়ারে উঠিয়া বসিলেন। আমরা ভদ্রলোকের হঠাৎ এ অসময়ে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, যে,—তাঁহার বন্ধুপত্নী বড়ই অস্থির হইয়া কান্নাকাটি করিতেছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেই তিনি আসিয়াছেন। আমরা ত রমণীর চোখে কান্নার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। যাহা হউক, রমণীকে তাঁহার স্বামী সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, যে,—সাত-আটদিন বাদে পুনরায় আসিব।

তিন

পরদিন আমাদের এক ছদ্মবেশী কনেষ্টবল আসিয়া সন্ধ্যার সময় খবর দিল, যে,—ভদ্রলোকটী প্রায় সারাদিন ও রাত রমণীর বাড়ীতেই থাকেন। শুধু স্নান ও আহারের সময় বাড়ীতে আসেন।

তৃতীয় দিনের সংবাদও ঐরূপ।

চতুর্থ দিনের সংবাদ—সন্ধ্যার পর একটা ট্যাক্সী করিয়া রমণী ও ভদ্রলোক বাহির হইয়াছিলেন। রাত্রি নয়টার পর ফিরিয়াছেন। আমাদের দূত ট্যাক্সীর নম্বর টুকিয়া লইয়াছিল। ড্রাইভারের কাছে গেলাম। সে বলিল, যে,—ঐ রমণী ও ভদ্রলোককে সহরের চারি মাইল দূরে একটা বাগান-বাড়ীতে সে লইয়া গিয়াছিল। সেখানে আরও দুইজন হিন্দুস্থানী ছিল। তাহারা বাড়ীর ভিতর ছিল। তাহারা কি করিতেছিল সে দেখে নাই। রাত্রি নয়টার সময় তাহারা ফিরিয়াছিল।

মিঠাইওয়ালার সাজে একজন কর্ম্মচারীকে সাজাইয়া বাগান-বাড়ীতে পাঠাইলাম। তিনি সন্ধ্যার সময় আসিয়া সংবাদ দিলেন, যে,—বাগান-বাড়ীতে কেহ থাকে না। পোড়োবাড়ী। একজন হিন্দুস্থানী মালী আছে। তাহার

মালিক এক মাড়োয়ারী, বিদেশে থাকেন। দু'-একবৎসর অন্তর আসেন। আমাদের সন্দেহ ঘনীভূত হইল। মাড়োয়ারীর পোড়ো বাগান-বাড়ীতে ইহারা কেন আসিয়াছিলেন? হইতে পারে রমণীর সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিতে। কিন্তু তাহা ত বিনা বাধায় তাঁহার নিজের বাড়ীতে চলিতেছে। তাহার জন্য চার মাইল দূরে পোড়োবাড়ীতে যাইবার দরকার কি?

পরদিন আবার কর্ম্মচারীকে কতগুলি সিদ্ধির বরফী ও অন্যান্য খাবার দিয়া বাগান-বাড়ীর মালীর নিকট সন্ধ্যাবেলা পাঠাইলাম। সস্তার খাবার; সুতরাং, মালী কতকগুলি সিদ্ধির বরফী খাইয়া নেশাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। সংবাদ পাইলাম, মালী বলিয়াছে যে,—এই কয়দিন হইল কতকগুলি লোক একজনকে ধরিয়া আনিয়া সেখানে মদ খাইতে চাওয়ায় সে আপত্তি করিয়াছিল—কিন্তু তাহারা তাহাকে দশ টাকা বক্‌শিস্ দেওয়ায় সে আর আপত্তি করে নাই। লোকগুলি প্রায় সারারাত্রিই বাগান-বাড়ীতে ছিল; কিন্তু ভোরের বেলায় কখন চলিয়া গিয়াছে সে ঘুমাইতেছিল বলিয়া জানিতে পাবে নাই। আমরা কালবিলম্ব না করিয়া পরদিন প্রাতে বাগান-বাড়ী তল্লাস করিব স্থির করিলাম।

চার

সকালবেলা অনেকগুলি পুলিশ লইয়া বাগান-বাড়ীতে গিয়া বাড়ীটা তল্লাস করিলাম। রক্তের দাগ কিংবা কোন সন্দেহজনক কিছুই পাইলাম না। বাগান ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম, জঙ্গলের গাছগুলি সবই সবুজ—কেবল এক জায়গার গাছগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। ছোট গাছগুলি টানিতেই উঠিয়া আসিল। দেখিলাম, গাছের শিকড় নাই—খালি ডাল পোঁতা ছিল। আমরা শুষ্ক ডালগুলি ফেলিয়া দেখিলাম—মাটিটা নরম এবং কয়দিন পূর্ব্বে যেন খোঁড়া হইয়াছে। মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটী মৃতদেহ পাওয়া গেল। লাশ পচিতে আরম্ভ হইলেও শীতকাল বলিয়া তত খারাপ হয় নাই। চেহারা হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের মত। আমাদের এখন জয় হইয়াছে ভাবিয়া রমণীকে স্বামীর মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য লোক পাঠাইলাম। রমণীর বন্ধুকেও আনিবার কথা বলিয়া দিলাম।

খানিকক্ষণ পরে দুইজনেই আসিলেন। দুইজনেই একেবারে অস্থির। মুখ বিবর্ণ। সুন্দরীকে বলিলাম—আপনাব স্বামীকে পাওয়া গিয়াছে। জ্বালাইবার পূর্ব্বে দেখিয়া লউন। তিনি নিকটে আসিয়া বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হিন্দুস্থানী ভদ্রলোককে স্বদেশীয় ভাষায় অজস্র গালি দিতে লাগিলেন ও বলিলেন—"পাজী, কি করেছিস্! আমার ভাইকে খুন করিয়েছিস্?" তিনি বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! ওরা যে এ ভুল কর্‌বে তা' আমি কি ক'রে' জান্‌বো।" দুইজনের অপূর্ব্ব বিবাদ ও গালি বর্ষণ। পরে রমণীর কান্না ও দুঃখ এই সব চলিতে লাগিল। আমরা সেইগুলি তাড়াতাড়ি নোট করিতে লাগিলাম।

পাঁচ

মনের দুঃখে রমণী ঘটনার প্রকৃত বিবরণ দিলেন। সংক্ষেপে তাহা এই—রমণী তাঁহার স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা। হিন্দুস্থানী যুবকটী তাঁহার স্বামীর বন্ধু। তিনিই রমণীর প্রণয়ী। স্বামী যখন দিনের বেলায় দোকানে থাকেন, সেই সময় প্রণয়ী-যুগল রমণীর বাড়ীতে আমোদ-আহ্লাদ করেন। ইদানীং স্ত্রীর উপর সন্দেহ হওয়ায় স্বামী স্ত্রীকে প্রহার ও প্রণয়ীকে বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়া দেন। সেইজন্য তাঁহারা স্বামীরূপ বাধাকে সরাইয়া দিবার জন্য হিন্দুস্থানী গুণ্ডা নিযুক্ত করিয়া ঘটনার দিন স্বামী যখন দোকান হইতে ফিরিবেন, সেই সময় তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া গিয়া খুন করিবার বন্দোবস্ত করেন। রাত্রি সাতটার সময় গুণ্ডারা বৈঠকখানায় ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়াছিল। রমণী নিজের শুইবার ঘরে ছিলেন। সাতটার পর পদশব্দে তাঁহার মনে হইল যে, স্বামী আসিলেন। তিনি ভয়ে ছাতে লুকাইয়া থাকেন। খানিকক্ষণ পরে ছাত হইতে যখন দেখিলেন যে, গুণ্ডাদের গাড়ী চলিয়া গেল, তখন নামিয়া আসেন ও ভয়ে মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়েন। এখন দেখিতেছেন যে, তাঁহার স্বামী আসেন নাই, তাঁহার ভাই আসিয়াছিলেন এবং ভুলক্রমে গুণ্ডারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছে। প্রণয়ী যুবকও রমণীর স্বামীকে মারিবার জন্য গুণ্ডা নিযুক্ত করার কথা স্বীকার করিলেন। আমরা তখন প্রণয়ী-যুগলের হাতে লোহার বালা পরাইয়া দিলাম।

শেষ

পরদিন খবরের কাগজে খুনের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। লাশ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার রিপোর্ট দিলেন—গলা টিপিয়া যুবককে হত্যা করা হইয়াছে। অফিসে বসিয়া কাজ করিতেছি, এমন সময় এক হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—তিনিই নায়িকার স্বামী। তাঁহাকেই হত্যা করিবার কথা হইয়াছিল। তিনি স্ত্রীর চরিত্রে অনেকদিন হইতেই সন্দিহান হইয়াছিলেন। অবৈধ প্রণয়ের জন্য তাঁহাকে তাড়নাও করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী সতী সাজিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নিজের ভাইকে চিঠি লিখেন। ভাই আসিয়া তাঁহার ভগ্নী নির্দ্দোষ এবং তাঁহাকে অযথা তাড়না করা হইয়াছে বলায় তিনি শ্যালককে সাত দিনের জন্য তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া প্রণয়ী-যুগলের লীলাখেলা দেখিতে অনুরোধ করেন। ঘটনার দিন তাঁহার শ্যালকের সহিত কথা হয়, তিনি তাঁহার ভগ্নীর নিকট গিয়া তাঁহার নাম করিয়া বলিবেন যে, হঠাৎ কোন কাজ পড়ায় তাঁহাকে সাত দিনের জন্য বিদেশ যাইতে হইতেছে এবং তাঁহাকে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এখন দেখিতেছেন যে, ভুলক্রমে ভগ্নী ভ্রাতৃহত্যার সহায়তা করিয়াছেন। ভগবান হাতে হাতে প্রতিফল দিয়াছেন।

আমরা রমণীকে সরকারী সাক্ষী করিলাম। প্রণয়ীর নিকট গুণ্ডাদের সন্ধান লইয়া তাহাদের সহিত তাঁহাকে বিচারার্থ পাঠাইয়া দিলাম। তাহাদের সকলেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইল। ঘটনার পরদিন রাত্রে রমণীকে যে মুহূর্ত্তে প্রণয়ীর সহিত বসিয়া হাসিতে দেখিয়াছিলাম, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমি তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলাম।

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
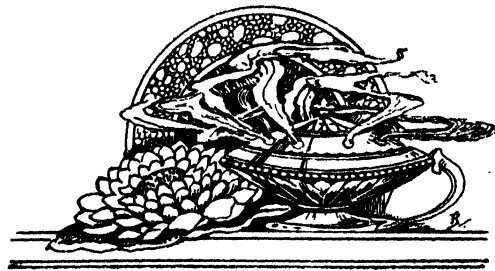
মা

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

—পিসীমা !

পিসীমা জানলায় ব'সে জপ করছিলেন। অশ্রুর ডাকে সাড়া না দিয়ে তিনি তার মুখপানে চাইলেন শুধু—সে কি চায় তাই জানবার জন্য।

অশ্রু আনতমুখে নরুণ পাড় ধুতির আঁচল খুঁটতে খুঁটতে অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত বল্‌লে—একবার যাই আজ ?

অশ্রু যে কোথায় যেতে চায়, তা' না বল্‌লেও পিসীমার বুঝতে দেরী হ'ল না। তাঁর মুখখানা গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ল। নীরবে জপের সংখ্যা পূর্ণ ক'রে মালাটা কপালে ঠেকিয়ে তিনি চাপাগলায় আস্তে আস্তে বল্‌লেন—দরকার কি মা ? কেলেঙ্কারী আর না-ই বা বাড়ালে ?

অশ্রু একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বল্‌লে—আমি তো সেই অবধি আর যাই নি পিসীমা—কতদিন হ'য়ে গেল। পারুল কত ডেকেছে—ওটা ক্রমাগত ভুগে চলেছে শুনছি, দেখ্‌ছিও, তবু···

অশ্রুর গলার স্বর গাঢ় হ'য়ে এলো।

—কি করবে মা ? ভগবানের বিড়ম্বনা—তোমাকে দিয়েও বঞ্চিত করেছেন যে !

অশ্রুর ব্যথাক্লিষ্ট মুখের পানে সকরুণ দৃষ্টিপাত ক'রে পিসীমা মালাছড়াটা খুঁটীতে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর আপ্‌না থেকে নামাবলীখানা টেনে নিয়ে বল্‌লেন—চল্‌, বিশ্বনাথের আরতি দেখে আসি গে—ব'সে ব'সে আরো মন খারাপ হয়, ওঠ্‌।

অশ্রু উঠ্‌ল না, কথাও বল্‌লে না। পিসীমা তার সাম্‌নে এসে আবার বল্‌লেন—চল্‌, কাপড় তো পরাই আছে, চাদরখানা গায়ে দিয়ে নে শুধু। দেরী করিস নি, আয়।

—তুমি যাও পিসীমা, আমি আজ পারব না। ভাল লাগ্‌ছে না কিছু।

পিসীমা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সপ্রসন্ন-কণ্ঠে বল্‌লেন—ভাল লাগ্‌ছে না বল্‌লে চল্‌বে না তো, ভাল লাগাতে হবে জোর ক'রে—নইলে ইহকাল তো গেছেই, আবার পরকালেও কি

অশ্রুর ম্লান মুখখানির আর্ত্তভাব লক্ষ্য ক'রে পিসীমা কথাটা শেষ করতে পারলেন না। এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে তার দিকে চেয়ে থেকে তিনি বল্‌লেন—তবে আমি একাই যাই। সন্ধ্যা আরতি দেখেই চ'লে আস্‌ব। তোর ভয় করে যদি—

—না, ভয় কিসের ?

পিসীমা দরজার দিকে খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এসে চুপিচুপি বল্‌লেন—দেখ্‌ অশ্রু, এর মধ্যে ওখানে যাস নে যেন।

—না গো, না। বিশ্বাস হচ্ছে না ? চলো, তা' হ'লে তোমার সঙ্গেই—

—থাক্‌ থাক্‌। রাগ করিস্‌ কেন রে বাপু। আমি তোর ভালর জন্যেই—নাঃ, এদের এত কাছাকাছি এসে থাকাটাই আমাদের অন্যায় হয়েছে দেখ্‌ছি।

পিসীমা চ'লে গেলে অশ্রু ঘরের আলোটা কম ক'রে আড়ালে রেখে তার পরিত্যক্ত স্থানটায় এসে বস্‌ল। সে ঘরের দক্ষিণ ঘেঁসে অল্প তফাতেই একখানা দোতলা বাড়ী। এ জানলা থেকে সে বাড়ীর সাম্‌নের লোহার রেলিংঘেরা ঝুল বারান্দা, আর বড় ঘরখানার কিয়দংশ অবাধে চোখে পড়ে। দরজার ফাঁক থেকে খানিকটা আলো এসে বারান্দায় পড়েছে। রেলিংয়ের ওপর কচিছেলের দু'টী জামা আর কাঁথা দেখা যায়। অশ্রুর দৃষ্টি অনড় হ'য়ে রইল সেইদিকে।

ঘরের মধ্যে সাড়াশব্দ নেই কারো। পারুল হয় তো

রান্নাঘরে। আর সে···? ঘুমিয়েছে বুঝি? আহা, ঘুমোক্— একটু আরাম পায় যদি! কান্না ধরেছে সেই কখন্ থেকে —কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। এতটুকু কচি প্রাণ, ফুলের মত কোমল, কত আর সইবে?

অশ্রুর চোখ দুটো এবার জ্বালা করতে লাগ্‌ল—বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল তীব্র বেদনায়!

ছেলেটার যা' অবস্থা—দিনের দিন রোগা হ'য়ে যাচ্ছে! ও বাড়ীর ভাড়াটে মোক্ষদা মাসী কাল তো স্পষ্টই ব'লে গেলেন—পারুল সাধ ক'রে ছেলে নিয়েছে বটে,কিন্তু বাঁচাতে পারবে না হয় তো। মা-মরা ছেলে মানুষ করা কি সহজ কথা? ডাক্তার বলেন—মায়ের দুধ ছাড়া হওয়াতেই ছেলেটার—

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনতে না পেরে অশ্রুকে উঠে যেতে হয়েছিল তখুনি, মিছে একটা বায়নায়। সেই থেকে ছট্‌ফট্ করছে সে—শুধু একবারটী তাকে দেখবার জন্য। ওই তো ঘরের পাশে ঘর। পারুল আগে তো প্রায়ই ছেলেকে নিয়ে ওই বারান্দায় আস্‌ত, এখন আর আসে না—বাতাসে রোগা ছেলের ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে হয় তো। তারা মনে করে, ঢাকা চাপা দিয়ে রাখ্‌লেই ছেলে ভাল থাক্‌বে। কী ভুল ধারণা!

এত কাছে থাকে যে, ডাক্‌লেই শোনা যায়—তবু সাহস হয় না পারুলকে ডেকে দুটো কথা বল্‌তে—কে কি ভাব্‌বে আবার? ওরকম খারাপ মেয়ের সঙ্গে কথা বলাও যে তার মত ভদ্র গৃহস্থকন্যার, বিশেষতঃ, বাল-বিধবার অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

তবু সেদিন থাক্‌তে না পেরে সে চুপিচুপি গিয়েছিল ওই রুগ্ন শিশুকে দেখ্‌তে। শুধু একবার চোখের দেখা— তা'তেই আবার মেয়ে-মহলে কি রকম বিশ্রী আন্দোলন আরম্ভ হলো! ধোনার মা তো মুখ ফুটেই ব'লে ফেল্‌লে— ও কি আর লুকোবার যো আছে? দেখ্ না, মুখখানা যেন হুবহু কেটে বসিয়ে দেছে!

এ সব কথা গায়ে না মাখ্‌লেও পিসীমার পক্ষে কত-দূর মর্ম্মান্তিক হয়েছিল তাতো সে জানে! তারপর অদম্য ব্যাকুলতায় মন তার মাথা খুঁড়ে মরছে অহরহ—তবু সে আর যায় নি।

ও বাড়ীর ভাড়াটেদের একটী মেয়ে এ বাসায় প্রায়ই আসে। এলেই অশ্রু ভয়ে ভয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে— পারুলের খোকাটী কেমন আছে?

এই পারুলের খোকা বল্‌তে বুকখানা তার বিদীর্ণ হ'য়ে যায় যেন—সে যে কি গভীর বেদনা!···তাও তো সহ্য করেছে এতদিন—কিন্তু আজ এমন অধৈর্য্য হ'য়ে পড়্‌ল কেন সে?

তার ধৈর্য্য ও সংযমের কঠোর আবরণ ভেদ ক'রে গিরি-বক্ষ-বিদারি নির্ঝরের মত উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে এ কিসের অধীর উচ্ছ্বাস! ওঃ, সে যে আর পারে না গো! এ ব্যথা, এ যন্ত্রনা যে সহনাতীত!

ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অশ্রু স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল—সাম্‌নে গায়ে গায়ে ঠেকা বাড়ীগুলোর ফাঁকে, গলির অন্তরালে দৃশ্যমান খণ্ড আকাশের দিকে তাকিয়ে। শুক্লাষ্টমীর চাঁদ উঠেছিল। স্নিগ্ধ মধুর জ্যোৎস্নার আলো তার ব্যথা-বিধুর উদাস চিত্তকে করুণ স্বপ্ন-মায়ায় আচ্ছন্ন ক'রে তুল্‌লে। অন্তরের অবরুদ্ধ স্মৃতির দ্বার অতর্কিতে খুলে গেল কখন।

বেশীদিন নয়, বছরখানেক আগে। তরুণ মনটা তার তখনও ওই চাঁদের আলোর মত মধুর না হোক্, অমনি নির্ম্মল শুভ্র ছিল। এতটুকু কালির রেখা তা'তে লাগে নি।

পিতার অনাদর, বিধাতার অবহেলা সহ্য করেও মাতৃ-সমা অপত্যহীনা পিসীমার নিরাপদ স্নেহনীড়ে আশ্রয় পেয়েছিল সে। সর্ব্বহারার আশা-আশ্বাসহীন রিক্ত জীবনে ব্যথা ছিল নিশ্চয়, কিন্তু অন্তর্দাহ ছিল না।

স্রোতহীন নদীর অচঞ্চল বারিধারার মত দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল তার একই ভাবে, মৃদু মন্থর গতিতে। তার মধ্যে উচ্ছ্বাস উঠ্‌ল যে কখন, কোন অসতর্ক ক্ষণে—সে উচ্ছ্বাসের মুখে বাল-বিধবা পরম নিষ্ঠাবতী পিসীমার পবিত্র আদর্শে নিজেকে গঠিত করার সংকল্পটা তার কেমন করেই যে ভেসে গেল, তা' মনে হ'লে দলিত, লাঞ্ছিত নারীত্ব তার আজও মরমে মরে যায় যেন!

বালিকা অশ্রু তার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর সংসারের কোলাহল হ'তে দূরে থেকে, সবার সাথেই একটা স্বাতন্ত্র্য রেখে চল্‌তে অভ্যস্ত হয়েছিল। সঙ্গী-সাথী কেউ ছিল না তার।

কিন্তু ভবানীপুরের নতুন বাসায় উঠে আসার পরই পাশের বাড়ীর শিবনাথবাবুর মেয়ে মীরা যেন গায়ে প'ড়ে এসে তার সাথে ভাব ক'রে ফেল্‌লে। মেয়েটী ভারি মিশুক্; সকলকে আপন ক'রে নেয় একমুহূর্ত্তে। অশ্রুরই সমবয়সী সে, কিন্তু তখনো অবিবাহিতা এবং স্কুলে পড়ে।

এই মীরার সখীত্ব অশ্রুর একঘেয়ে বিস্বাদ জীবনে যে একটা আনন্দ ও বৈচিত্র্য এনেছিল, তা' তুচ্ছ করবার নয়। কৈশোর সহসা অতিক্রম কর্‌লেও মীরার মন ছিল শিশুর মত আনন্দ চঞ্চল। তার কাছে অশ্রুর অকাল-গাম্ভীর্য্য টেঁক্‌ল না।

ছুটীর দিনে সে অশ্রুকে টানাটানি ক'রে নিয়ে যেত তার নিজের ঘরে। দু'জনে মিশে কত গল্প করত, বই পড়ত। অশ্রুর বিমাতা মনে মনে একটু ব্যাজার হলেও মুখ ফুটে বারণ করতে পার্‌তেন না, মীরার সানুনয় অনুরোধে প'ড়ে। পিতাও নিষেধ কর্‌তেন না। শিবনাথবাবু অতি ভদ্রলোক। অশ্রু তাঁর মেয়ের মত। সুতরাং—

গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশ। স্কুল-কলেজ সব বন্ধ।

দুপুরবেলা পিসীমা মহাভারত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন দেখে অশ্রু নিজের মনেই পড়্‌ছিল। মীরা এসে তাকে ধ'রে নিয়ে গেল নিজের ঘরে।

মীরার টেবিলে খানকতক সুন্দর সুন্দর ঝক্‌ঝকে বই দেখে অশ্রু সহর্ষে বল্‌লে—বা রে! এত সব নতুন নতুন বই আনিয়েছিস্, আর আমাকে পড়তে দিলি না একখানাও।

—আজ তো এল; দাদা এনেছেন। বই কেনা তার বাতিক আছে কি না।

মীরার দাদা অমলের কথা মীরার মুখেই সে শুনেছে। অনেকবার তাঁর স্নেহ-মমতা এবং বয়সের অনুপাতে জ্ঞান ও পণ্ডিত্যের অসাধারণত্ব শুনে শুনে লোকটার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণাও অশ্রুর মনে হয়েছিল।

অমল চুঁচুড়ার কোন্ স্কুলে মাষ্টারী করত। বিয়ে করে নি তখনো। মা বাবা কত পীড়াপীড়ি করেছেন, তবুও। তার মতে উপায় বেশী কর্‌তে না পার্‌লে বিয়ে করা মহা-মূর্খতা।

এ হেন দাদার আগমন-সংবাদ অশ্রুকে একটু কৌতূহলী ক'রে তুল্‌লেও ব্যস্ততার সহিত সে বল্‌লে—তা' হ'লে আমাকে আন্‌লি কেন? তিনি যদি হঠাৎ এ ঘরে আসেন।

এলেই বা? মাষ্টারী করেন বলেই তুই তাঁকে গুরু-মশায়ের মতো একটা হোমরাচোমরা গোছের মনে কর্‌ছিস্ বুঝি? কিন্তু তা' নয় মোটেই। দাদা এখনো ছেলেমানুষ।

মীরা হাস্‌তে লাগ্‌ল।

অশ্রু একখানা বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সলজ্জভাবে বল্‌লে—দূর! আমি কি সেই জন্যে—

—কিরে মীরা, কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিস্?

বল্‌তে বল্‌তে অমল এসে ঘরে ঢুকল। মীরার পার্শ্ব-বর্ত্তিনী অপরিচিতা তরুণীর প্রতি দৃষ্টি পড়্‌তেই সে অপ্রতিভ হ'য়ে ফিরে যাচ্ছিল, মীরা ছুটে গিয়ে হাত ধ'রে ঘরে নিয়ে এলো তা'কে। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—সঙ্কোচ কর্‌বার কিছু নেই দাদা। ও আমার কেবল বন্ধু নয়, বোনের মত। অশ্রু দি', আমার দাদাকে যদি লজ্জা করো, তা' হ'লে জান্‌ব, আমাকে তুমি পর মনে করো এখনো।

লজ্জিতা অশ্রু এর পরে যে কী কর্‌বে, কী বল্‌বে, তা' ভেবে না পেয়ে হাত দু'খানা তুলে নমস্কার কর্‌লে সসঙ্কোচে। তার লজ্জারুণ আনত মুখের পানে চকিতে চেয়ে অমল বল্‌লে—এঁকে আর কখনো দেখি নি তো?

—না, এরা এসেছে সম্প্রতি। ওই যে পাশের বাড়ীতে। কিন্তু এই অল্পদিনেই আমাদের এমন বন্ধুত্ব হ'য়ে গেছে যে, কি বল্‌ব?

অমল সহাস্যে বল্‌লে—তোর বন্ধু কে নয়? বোধ হয় স্কুলশুদ্ধই—

—ধ্যেৎ! স্কুলেও আমার সাথী অনেক আছে বটে, কিন্তু এই অশ্রু দি'কে আমার যেমন ভাল লেগেছে, এমন আর কাউকেই নয়। সত্যি বড় লক্ষ্মী মেয়ে! কিন্তু এমনভাবে রাখা হয়েছে যে, দেখ্‌লে কষ্ট হয়। লেখাপড়ায় এত সখ, কিন্তু তা' হবার যো নেই···

অশ্রুর আপাদমস্তক করুণ-দৃষ্টিতে দেখে অমল সমবেদনাভরে বল্‌লে—কেন? ওঁকে যে লেখাপড়ার সুযোগ আরো বেশী ক'রে দেওয়া দরকার।

—হ্যাঁ, কিন্তু দিলে তো? একখানা বই হাতে দেখ্‌লেই সৎমা ঠাকরুণ অনর্থ বাধিয়ে তোলেন। এখানে এসে তবু একটু পড়্‌তে পায় বেচারী! আশ্চর্য্য! আমাদের ঘরে বিধবাদের এমন—ও কি! অশ্রু দি', উঠ্‌লি যে?

—আজ যাই ভাই। না ব'লে চ'লে এসেছি, ছোট মা উঠে ডাকাডাকি করেন যদি—

—ইঃ, তবে তো আর রক্ষেই নেই! এমনি ক'রে ভয়ে ভয়েই তুই গেলি ভাই—আমার বড রাগ ধরে কিন্তু।

অশ্রু মলিন-মুখে একটু হাস্‌ল শুধু—সে হাসি, না কান্না?

—এ থেকে একখানা বই তুই নিয়ে যা' অশ্রু দি', যেটা তোর ইচ্ছে। দিনে না হোক্ রাত্তির বেলা পড়্‌তে পারবি তো?

অশ্রু যে বইখানা দেখ্‌ছিল, মীরার আগ্রহে সেটাই সে তুলে নিলে আঁচলের আড়াল ক'রে। মীরা বল্‌লে—রোস্, আমিও যাচ্ছি। আমি একে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি দাদা। কি জানি বকুনি খাবে হয় তো। সত্যি, ওর কষ্ট দেখে মনে এমন দুঃখ হয়!

সেই প্রথম দেখা। তা'তেই···

অমল একজন উচ্চশিক্ষিত চরিত্রবান যুবক। অশ্রুও মেয়েটী নিতান্ত নিরীহ। তার চরিত্রে সংযমের অভাব ছিল না। তবু যে অজেয় অলক্ষ্য আকর্ষণ চিরন্তন কাল ধ'রে, সেই আদম ও ইভের যুগ হ'তে নর-নারীকে পরস্পর আকৃষ্ট করেছে, সেই আকর্ষণই এদের প্রথম সাক্ষাতের পরিচয়টুকু ঘনিষ্ঠ ক'রে তুল্‌লে।

সেদিন সেই অতি সাধারণ মেয়েটিকে অমল তার তারুণ্যের মায়ায় রঙীন চোখ দিয়ে দেখ্‌লে অপরূপ!···

আর অশ্রু—বাড়ী ফিরে গিয়েও তার বুকের কাঁপন যেন থামে না! তার ব্যথাহত মূর্চ্ছিত নারীত্ব সেদিন সহসা সচেতন হ'য়ে সাড়া দিয়ে উঠেছিল বুঝি?

রাত্রে পিসীমা ঘুমিয়ে পড়্‌লে সখীর দেওয়া বইখানা পড়্‌তে পড়্‌তে একসময় সে হঠাৎ উঠে গিয়ে বাক্স থেকে বার কর্‌লে তার পরলোকগত স্বামীর ছোট্ট ফটোখানি। যাঁর ছায়াচিত্র শুধু কাগজেই নয়, অশ্রুর মনের মধ্যেও ক্রমশঃ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আস্‌ছে যেন। তাদের মিলন-কাল যে অতি সংক্ষিপ্ত। বিয়ের পর যতদিন তিনি ছিলেন, তার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই অশ্রুর কেটেছে পিত্রালয়ে। সে তখন তো জান্‌তো না, জীবনের সাথীটীকে এত শীঘ্র, এমন অকস্মাৎ হারাতে হবে!

এই হারানোর বেদনা যখন উদ্বেল হ'য়ে ওঠে, তখনি এ ছবিখানি বার ক'রে দেখে অশ্রু—তা'তে একটুকু সান্ত্বনাও পায় হয় তো। কিন্তু আজ—সেই ছায়ার মধ্যে কায়া হ'য়ে ফুটে ওঠে এ কে! এ যে ক্ষণিকের দেখা অমল! ছি ছি, কি লজ্জার কথা!

অন্যদিন আকুল আবেগে চেপে ধরে, কিন্তু আজ শুধু মাথায় ঠেকিয়ে অশ্রু ফটোখানা তুলে রাখ্‌ল। তারপর অশ্রুর ব্যর্থ-যৌবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের শিক্ষা, সংস্কার, সংযম ও সাধন ঠেলে তাকে কতদূর ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তা' না বল্‌লেও চলে।

ছুটীর শেষে অমল চ'লে গেল কার্য্যস্থলে। তার মাস কয়েক পরেই অশ্রুর অবসাদগ্রস্ত দেহে মাতৃত্বের সম্ভাবনা দেখে পিসীমা শিউরে উঠ্‌লেন! কী সর্ব্বনাশ! অভাগিনী অশ্রুর লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা রইল না। তার লাঞ্ছনার খবর মীরার চিঠিতে পেয়েই অমল বাল-বিধবা অশ্রুকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ কর্‌বার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ ক'রে

অশ্রুর বাবাকে চিঠি দিয়েছিল। তার এ দুঃসাহস ও উদারতা প্রশংসনীয়—কিন্তু অমলের আবেদন গ্রাহ্য হ'ল না।

এ কি সম্ভব ? হতভাগা মেয়েটার জন্যে সমাজে মাথা হেঁট করবেন, অন্য ছেলেমেয়েগুলির ভবিষ্যৎ মাটী করবেন, অশ্রুর বাবা এমন অবিবেচক ও দুর্ব্বলচিত্ত পিতা নহেন। কাজেই—

ব্যাপারটা জানাজানি হবার আগেই অশ্রুকে তার পিসীমার সাথে নির্ব্বাসিত করা হ'ল কাশীতে। তার মত হতভাগিনীর এর চাইতে ভাল ব্যবস্থা আর কি হ'তে পারে ?

প্রসবের পরক্ষণে প্রসূত সন্তানকে মাতৃক্রোড় হ'তে বিচ্ছিন্ন করা হবে চিরদিনের মত ; ব্যবস্থাটা এই রকমই হয়েছিল—কিন্তু দেরী হ'য়ে গেল প্রসূতির অসুস্থতাবশতঃ।

রোগশয্যায় প'ড়ে দুর্ভাগা শিশুকে বুকে ক'রে তার কচি মুখখানির পানে গাঢ় মমতায় তাকিয়ে অশ্রু কতই স্বপ্নই দেখ্‌ত !

এই একটুখানি খোকন্, তার বুকের মধ্যেই জেগে উঠ্‌বে শিশু-মনের প্রথম অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি—যা' দিয়ে সে কেবল মাকেই চিন্‌বে একমাত্র 'আপন জন' ব'লে। তার কচিমুখের আধ আধ মিষ্টি বুলিতে প্রথমে 'মা' শব্দই ফুটবে। বাবা বল্‌বে…

সর্ব্বহারা মায়ের স্বপ্ন-বিভোর চিত্ত এবার টন্‌টন্ ক'রে ওঠে অবরুদ্ধ বেদনায়।

বড় হ'য়ে এই 'বাব্‌লু' যখন তার বাপের কথা জিজ্ঞাসা করবে—তাঁর পরিচয় জান্‌বার জন্য, তখন…উদ্বেলিত মমতায়, নিবিড় স্নেহে তাকে এমনি ক'রে বুকে জড়িয়ে, মনের ব্যথা মনে রেখে, চোখের জল চোখে চেপে অশ্রু বল্‌বে—তাদের আর কেউ নেই, সংসারে অভাব-অভিযোগেরও কিছু নেই, তাদের পরিচয় শুধু মা ও ছেলে !

সংসারের গণ্ডগোল, সমাজের ভ্রূকুটী থেকে দূরে এই বিশাল বিশ্বের নিরালা এক কোণটীতে একখানি ছায়াস্নিগ্ধ শান্তিনীড় রচনা ক'রে, পরস্পরের অবিচ্ছিন্ন নিবিড় সঙ্গ ও স্নেহ-মমতা সম্বল ক'রে, বেঁচে থাকবে বিশ্বের অবহেলিত দু'টী প্রাণী—মা ও ছেলে !

দুর্ভাগিনী মা তার দেহের প্রতি রক্তকণিকা দিয়ে, মাতৃহৃদয়ের একাগ্র কল্যাণ কামনা দিয়ে, মনের মত ক'রে গ'ড়ে—এই অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত ক্ষুদ্র জীবন-কণাই সার্থক ক'রে তুল্‌বে একদিন।

এম্‌নি কত আশা, কত না জল্পনা-কল্পনা !

কিন্তু হায়, সে স্বপ্ন আর সফল হ'ল না তার !

লোকলজ্জাবশে, বংশের সুনাম ও সম্মান রক্ষার্থে, রোগ-শান্তির সঙ্গে-সঙ্গেই কাঙালিনী মায়ের দুঃখ-সাগর মন্থন-করা মাণিক, কলঙ্কের ফুলটীকে ছিনিয়ে নেওয়া হ'ল তার কোল থেকে। নাড়ীছেঁড়া ধনকে 'আপন' বল্‌বার অধিকারও রইল না আর—এমনি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা !

অশ্রু পিসীমার পায়ে ধ'রে তার সন্তানের পালয়িত্রী পারুলের পাশের বাড়ীতে এসে ঠিক্ তার শয়ন-কক্ষের কাছেই দ্বিতলের ঘরখানায় বাসা নিয়ে রয়েছে—তবু চোখের দেখাও দেখ্‌তে পাবে তো ?

পিসীমা অভাগী মেয়েটার এ দুর্ব্বলতাটুকু ক্ষমা না ক'রে পারেন নি—যাই হোক্, মায়ের প্রাণ তো !

সত্যকার ইতিহাস ওদের এক পারুল ভিন্ন আর কেউ জানে না। পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই জানে নিঃসন্তানা পারুল কোন অনাথ-আশ্রম থেকে এই মাতৃহীন শিশুকে নিয়ে এসেছে তার মাতৃত্বের ক্ষুধা তৃপ্ত করতে। তা' করুক। পরের হয়েও ও যদি বেঁচে থাকে…কিন্তু বাঁচবে কি ? যে রকম হ'য়ে গেছে, চেনাই যায় না যেন সে ছেলে ব'লে ! যদি না বাঁচে তা' হ'লে…উঃ !

পিসীমা ঠিক্‌ই বলেছেন—এত কাছে এসে থাকাটাই তার অন্যায় হয়েছে। এ যে বড় জ্বালা !

চোখের ওপর দেখ্‌ছে—ওর বাব্‌লু সোনার তুলোর মত তুলতুলে গোলগাল দেহটুকু শুকিয়ে নেতিয়ে পড়ছে দিনের দিন। টুক্‌টুকে টুলটুলে মুখখানি বিবর্ণ বিরস হ'য়ে উঠ্‌ছে ক্রমশঃ—আপ-তাপতপ্ত গোলাপ কুঁড়ির মত। কাণে শুনছে তার কান্না—কত ব্যাকুল আর্ত্ত সে ক্রন্দন ! যেন সে আর থামে না !

তার কান্নার জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে পারুলের বাবু রাত্রে

যখন—বাপ্‌রে বাপ্! খালি ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ—কি কান্নাই যে কাঁদতে পারে এ ছেলেটা! সুস্থির হ'য়ে যে ঘুমুব একটু—তারও যো নেই। একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। বেশ তো ছিলে, কোত্থেকে এক আপদ জোটালো এনে খামকা। ব'লে বক্‌তে আরম্ভ করেন। তখন বেচারী পারুল তার অসন্তুষ্টির ভয়ে ছেলেকে নিয়ে ওই বারান্দায় পায়চারী করতে থাকে। কান্না থামাবার যত চেষ্টা করে, সেই রোগক্লিষ্ট কাতর শিশুর অশান্ত রোদন ততই বেড়ে চলে। সে কান্নার যেন বিরাম নেই, বিরতি নেই! কেঁদে কেঁদে কচি গলা তার শুকিয়ে ওঠে, কণ্ঠস্বর ভেঙে যায়—তবুও কাঁদে। সে কান্নার করুণ-সুরে ধ্বনিত হয় যেন—মা! মা! মা!

শুনে অভাগী মায়ের বুকের দুধ টন্‌টনিয়ে ওঠে রোদন-শ্রান্ত শিশুর শুষ্ক তৃষিত অধরে ঝ'রে পড়বার জন্য। তার দেহের রক্ত হিম হ'য়ে যায়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে যায়, চোখের জল শুকিয়ে যায় স্তম্ভিত জমাট বেদনায়!

বাব্‌লু আমার! মাণিক আমার! এই যে রে পাষাণী মা তোর!

যাক্ ইহকাল, যাক পরকাল! ইচ্ছা করে সেই মুহূর্ত্তে ছুটে গিয়ে বাব্‌লুকে বুকে তুলে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তাকে বুকে নিলেই যে শান্ত হ'য়ে যেত, যত কান্নাই কাঁদুক্ না সে।

ও যে কিসে আরাম পায়, কিসে শান্তি অনুভব করে, তা' সে যেমন জানে, অমন আর কে জান্‌বে? কিন্তু জেনেও প্রতিকারের উপায় নেই তো! তাই চুপ ক'রে দেখে, চুপ ক'রে শোনে শুধু! মায়ের প্রাণের ব্যথা-ব্যাকুলতা অবরুদ্ধ হাহাকার গোপন মর্ম্মতলেই গুম্‌রে মরে কেবল অসহায় অক্ষম বেদনায়!

বাব্‌লুর কান্নার সুর ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে আসে দিনে দিনে। কাঁদবার ক্ষমতাও নেই আর। কান্না তার ফুরিয়ে আস্‌ছে ক্রমে ক্ষীয়মান জীবনী-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে।

ও বাড়ীর সেই মেয়েটা বলে—ডাক্তার না কি জবাব দিয়েছে এবার। কি কর্‌বে তার ডাক্তার—কচি বুক যার শুকিয়ে গেছে মায়ের মমতা অভাবে!

প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্ত্ত শঙ্কায় আতুর হ'য়ে ওঠে। গভীর রাতে সহসা ধড়ফড়িয়ে উঠে সেই জানালায় উৎকণ্ঠ হ'য়ে থাকে উৎকণ্ঠিতা মা। অতন্দ্র চোখের নির্ণিমেষ দৃষ্টি তার রুদ্ধ-দুয়ার ঘরের কঠিন ভিত্তিতে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসে কতবার।

নিশুতি রাত্রির গাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে কাণে আসে সেই কান্না। মৃদু, অতি মৃদু, তবু অস্ফুট করুণ-সুর স্পষ্ট শোনা যায় যেন—মা! মা! মা!

সে কান্নাও ক্রমে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে শেষে একেবারে থেমে গেল। আর শোনা যায় না কিছুই।

নিশীথের গভীর প্রশান্তি অটল, স্তব্ধ। স্পন্দহীন নিথর অন্ধকার শুধু শিউরে ওঠে থেকে থেকে ও কার মর্ম্ম-বিমথিত-করা আর্ত্ত উতল দীর্ঘশ্বাসে। আকুল নয়ন জলের তপ্তধারা অঝোরে ঝ'রে পড়ে নিঃশব্দে।

যে কান্না থেমে গেল চিরদিনের জন্য, সেই ক[illegible] এবার উদ্বেল হ'য়ে ফেটে পড়ে অপত্যহারার আহত স[illegible] হৃদয়ের তটে তটে—ওরে আমার বুকের মাণিক! অভা[illegible] মা তোকে বুকে রাখ্‌তে পার্‌লে না, সেই [illegible] কি চ'লে গেলি রে ধন!…

পিসীমা থম্‌কে হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নে[illegible] ব্যথা-বিধুরাকে—কি করিস্ অশ্রু! চুপ্ চুপ্ চুপ মা! বুকে পাথর চাপা দে মা!

কিন্তু চাপা কি থাকে? পাথর ঠেলে সবেগে উৎসারিত হয় তার আকুল আর্ত্ত-প্রাণের সান্ত্বনাহীন অফুরন্ত অদম্য ব্যথার উচ্ছ্বাস!

সে যে মা!

পূর্ণশশী দেবী

'দক্ষ-যজ্ঞ'-এর 'সতী'—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী

[বাংলা ফিল্মের সৌজন্যে

জর্নাল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা।

গ্রেটা গার্ব্বো
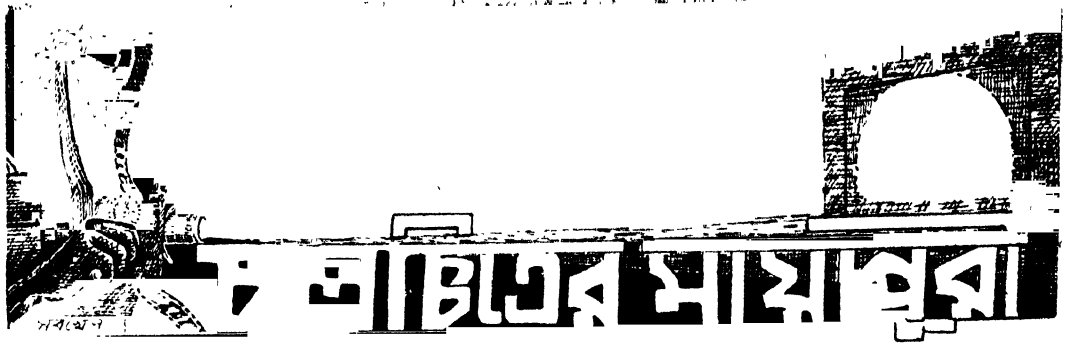
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চিত্র-জগতের পাতায় যে নামটি সবচেয়ে বড় হরফে লেখা রয়েছে, যে নামের আশেপাশে জনশ্রুতির আর অন্ত নেই, যে নামের চারিদিকে অনুক্ষণ দুর্ভেদ্য রহস্যের কুয়াসা, যে নামে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের চিত্রামোদীরা উচ্চকিত হ'য়ে ওঠে, সে নামটি হচ্ছে—গ্রেটা গার্ব্বো। ছোট্ট নামটির সম্মোহন-শক্তির অন্ত নেই।

চিত্র-জগতের এই রহস্যময়ী অভিনেত্রীর জীবন-সম্বন্ধে মাঝে মাঝে অনেক প্রকার খবর ভেসে আসে, কিন্তু তাদের কোনটাই প্রামাণিক নয়। সম্প্রতি তাঁর বাল্য-জীবনের একটি খাঁটি কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। 'গল্প-লহরী'র পাঠক-পাঠিকাদের সেই কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত-আকারে উপহার দেওয়া গেল।

*　　　*　　　*

গ্রেটা গার্ব্বোর মধ্যে যে সুন্দর একাকীত্ব আছে, তার মূলে আছে বাল্য-জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্যের ইতিহাস এবং 'হলিউডে' তাঁর প্রথম জীবনের তিক্ত-অভিজ্ঞতা।

উনিশ শত ছয় সালের আঠার-ই সেপ্টেম্বর সুইডেনের ষ্টকহম্ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। বাপ ছিলেন সামান্য-দরের ব্যবসাদার। তা' হলেও ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁর আদর-যত্নের ত্রুটি ছিল না। অবস্থার অতিরিক্তভাবে তিনি তাঁদের লালন-পালন করতেন।

গ্রেটার প্রতি পিতার স্নেহ ছিল সবথেকে বেশী। এই সদা-অন্যমনস্ক, স্বপ্ন-মগ্না মেয়েটি যখন তাঁর পাঠে অবহেলার জন্য মায়ের কাছে বকুনি খেতেন, তখন গোপনে পিতা তাঁকে আদর করতেন। গ্রেটা যে অবাধ্য মেয়ে ছিলেন তা' নয়। তাঁর স্বভাব ছিল কোমল; প্রকৃতি ছিল নম্র; কিন্তু তিনি স্কুলের বাঁধা-ধরা কঠিন নিয়ম-কানুনের ভিতরে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন না। গোল বাধতো সেইখানে।

এমনি ক'রে পাঠে অমনোযোগিতা এবং নিরালায় ব'সে সুদূরের স্বপ্ন দেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বালিকা-জীবন অতিবাহিত হ'ল।

বয়স যখন চোদ্দ পার হ'ল, তখন গ্রেটা যেন আগাছার মতো বেড়ে উঠলেন। দীর্ঘাঙ্গী তরুণী, দুই চোখে তাঁর ঘনায়মান যৌবনের ছায়া, মুখের ওপর সদ্য-প্রস্ফুটিত পুষ্পের লাবণ্য।

সেই সময় পিতা গষ্টাফ্‌সন গেলেন মারা। গ্রেটারা সপরিবারে দারুণ দারিদ্র্যের কবলে নিক্ষিপ্ত হ'ল। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় সংগ্রহের জন্য মা এবং অন্য ভাই-বোনেদের সঙ্গে গ্রেটাও চাকরী খুঁজতে বার হলেন।

চৌদ্দ বছরের কিশোরী, কিন্তু তাকে দেখতে যেন বিশ বছরের যুবতী, কথাবার্ত্তার মধ্যেও তেমনি স্থির গাম্ভীর্য্য। অনেক চেষ্টার পর গ্রেটা স্থানীয় বর্গষ্ট্রম্-এর দোকানে টুপীর বিভাগে একটি কাজ পেলেন। পিতামাতার স্নেহের ছায়ায় ব'সে যে-মেয়ে অনুক্ষণ দিবাস্বপ্নে সময় কাটাত, সংসারের কঠিন আবর্ত্তের মুখে প'ড়ে তার স্বপ্ন ম'রে গেল বটে, কিন্তু সে ভেঙে পড়ল না, সহজ

স্বাভাবিকভাবে খরিদ্দারদের পছন্দমতো টুপী নির্ব্বাচন ক'রে দিতে লাগ্‌লো।

প্রথমে কেউ তাঁর প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করে নি। কিছুদিন পরে এমন একটি ছোট ঘটনা ঘট্‌ল, যাতে ক'রে অনেকেরই দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়্‌ল। একদিন দোকানের বিজ্ঞাপন-বিভাগের ম্যানেজার টুপীর বিভাগে প্রবেশ ক'রে পরদিনের বিজ্ঞাপনের জন্য দু'-একটি টুপীর নমুনা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। গ্রেটার হাতে সে সময় কোন কাজ ছিল না, তিনি ম্যানেজারকে টুপী বাছাই করায় সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিছুক্ষণ পরে ম্যানেজার একটি টুপী তুলে নিয়ে সেটি গ্রেটাকে পর্‌তে অনুরোধ কর্‌লেন এবং গ্রেটা টুপীটি মাথায় দিলে তিনি তাঁকে বহুক্ষণ ধ'রে নিরীক্ষণ কর্‌লেন।

MELVYN DOUGLAS and GRETA GARBO in "AS YOU DESIRE ME"

একটি টুপীর পর আর একটি টুপী পরা হ'ল। অবশেষে ম্যানেজার বল্লেন—মিস গষ্টাফ্‌সন! দয়া ক'রে টুপীগুলি নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন।

পরদিন খবরের কাগজে বর্গ্‌ষ্ট্রম্-এর দোকানের প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন বার হ'ল। দেখা গেল, নানা ধরণের টুপী মাথায় দিয়ে যে তন্বী মেয়েটির ছবি বিজ্ঞাপনে ছাপা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন গ্রেটা।

দোকানে ঈষৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। অনেকেই গ্রেটাকে লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌লো! একটু ঢ্যাঙা হোক্, মেয়েটির গড়ন ভালো, চোখ দুটোর মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, বড় একটু ফ্যাকাসে, কিন্তু মুখখানা মন্দ নয়—চারিদিক থেকে এমনি ধরণের মন্তব্য শোনা যেতে লাগ্‌লো।

গ্রেটা জীবনে সেই প্রথম অনেকের দৃষ্টির সাম্‌নে উপস্থিত হলেন; কিন্তু তা'তে তিনি একটুও বিচলিত হন নি। আজও যেমন, সেদিনও তেমনি; তেমনি নির্ব্বিকার, তেমনি অবিচলিত।

*   *   *

সেই সময় ষ্টক্‌হমে একটি ছোট চলচ্চিত্র-সম্প্রদায় ছিল; তাদের কাজ ছিল শ্রমশিল্প-সম্বন্ধীয় ছোট ছোট ছবি তোলা। বড় বড় ব্যবসাদারদের কারখানা, দোকান প্রভৃতির ছবিও তারা তুল্‌তেন। অধ্যক্ষের নাম ছিল —কাপ্তেন রিং।

কাপ্তেন রিং বর্গ্‌ষ্ট্রমের দোকানের ছবিতোলার ব্যবস্থা কর্‌লেন। দোকানে যে-সব সহকারিণীরা ছিল, তাদের নামের তালিকা প্রস্তুত হ'ল—ক্যামেরার সাম্‌নে তাদের বিভিন্ন ধরণের 'পোজ্' দিতে হবে। সে তালিকার প্রথম নাম হ'ল—গ্রেটা গষ্টাফ্‌সন্।

যে-ছবি তোলা হ'ল, সেটি জনসাধারণ আদরের সঙ্গে গ্রহণ কর্‌লে। আমেরিকায় হাসির ছবি ইত্যাদি তোলার কাজে হল্‌রোচ যেমন প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছেন, সুইডেনে তেমনতরো নাম পেয়েছিলেন Eric Petschler নামে এক ভদ্রলোক। ছবিখানি এরিকের চোখে পড়্‌ল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রেটার চলচ্চিত্রে বড় হবার সম্ভাবনা উপলব্ধি কর্‌লেন।

তাঁর ছবি তোলার আয়োজন হয়েছিল—'এরিক দি ট্রাম্প।' সেই ছবিতে তিনি গ্রেটাকে একটি ভূমিকা দিতে স্বীকৃত হলেন। পরবর্ত্তীযুগের বিশ্ববিজয়িনী গ্রেটা সেই হাসির ছবিতে জীবনে সর্ব্বপ্রথম একটি সামান্য ভূমিকা নিয়ে চিত্রাবতরণ কর্‌লেন।

এই ছবিতে অভিনয় কর্‌বার সময় বর্গ্‌ষ্ট্রমের দোকানে গ্রেটার প্রায় অনুপস্থিতি ঘট্‌তে লাগ্‌লো। অভিযোগ আরম্ভ হ'ল। হয় তাঁকে ছবির কাজ ছাড়্‌তে হবে, না হয় দোকানের কাজ। দুটো একসঙ্গে চল্‌তে পারে না। গ্রেটা মহা ফাঁপরে পড়্‌লেন।

পনেরো বছর তখন তাঁর বয়স। সেই বয়সে এমনধারা গুরুতর সমস্যার সমাধান করা খুব সহজ নয়। বাঁধা

মাইনের চাকরি ছাড়া কতখানি যুক্তিসিদ্ধ—এই নিয়ে মা আর অন্য ভাই-বোনেদের সঙ্গে অনেক আলোচনা হ'ল। নবাগতা এক অভিনেত্রী আশ্চর্য্য অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তার নাম গ্রেটা গার্ব্বো।

পুরোপুরীভাবে অবশেষে অকুতোসাহসে ভর ক'রে গ্রেটা চাকরি ছেড়ে চলচ্চিত্রে যোগদান করলেন। ছায়া-ছবির ইতিহাসে সেদিন একটা নতুন পাতা আরম্ভ

Greta Garbo and Ian Keith in "Queen Christina"

* * *

ফ্রাঞ্জ এনভল্‌ ছিলেন তখনকার দিনের রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। গ্রেটাকে দেখে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে এবং তার দু'-একটি ছোটখাটো 'স্টেজ্' দেখে এনভল বুঝলেন, এ-মেয়ের মধ্যে যে প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে, তা নিতান্ত সামান্য নয়। কিন্তু হীরকখণ্ডকে যেমন ঘসে মেজে-কেটে তার আসল রূপ বার করতে হয়, এ-মেয়ের প্রতিভাও তেমনিতর অনুশীলন-সাপেক্ষ। এনভলের চেষ্টাতে গ্রেটা শহরের 'ড্রামাটিক স্কুল অফ্‌ দি রয়েল থিয়েটার' নামক অনুষ্ঠানে একটি বৃত্তি লাভ করলেন, একবছর ধ'রে সেই স্কুলে শিক্ষালাভ করতে হবে।

এই শিক্ষালয়ে গ্রেটা মরিজ ষ্টিলারের সঙ্গে পরিচিত হন। মরিজ ষ্টিলার তখন ইউরোপের সবচেয়ে বড় ডিরেক্টার—পৃথিবীজোড়া তার নাম। মরিজ ষ্টিলার এর মানুষ চেনবার ছিল অদ্ভুত ক্ষমতা। গ্রেটাকে তিনি তার নতুন ছবি 'দি সাগা অফ্‌ গষ্টা বারলিং' এ একটি ছোট ভূমিকা অভিনয় করতে দিলেন।

ষ্টিলারের পরামর্শে গ্রেটা তার নাম পরিবর্ত্তন করলেন। তার নতুন নামকরণ হ'ল—গ্রেটা গার্ব্বো। নামের সঙ্গে আরম্ভ হ'ল—নবজীবনের নতুন অধ্যায়।

'দি সাগা অফ্‌ গষ্টা বারলিং' দিকে দিকে অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলে—সারা ইউরোপে এতবড় ছবি এর আগে আর কখনো হয় নি। এবং আরও একটি কারণে এই ছবি উল্লেখযোগ্য—এর মধ্যে চিত্র-জগতে ডিরেক্টার হিসাবে মরিজ ষ্টিলার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে অভিনন্দিত হলেন।

সমুদ্র পারের 'হলিউডে' 'মেট্রোগোল্ডউইন মেয়ারে'র অফিসে ষ্টিলারের এই কীর্ত্তির সংবাদ পৌঁছলো এবং তারা ষ্টিলারকে তাদের একখানি ছবি পরিচালনা করবার জন্যে আহ্বান করলেন।

গ্রেটা গার্ব্বোকে আবিষ্কার ক'রে মরিজ ষ্টিলার তখন মনে মনে পরম আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন। এই স্বল্প ভাষিণী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না অভিনেত্রীটির ওপর তখন তার অগাধ আস্থা জন্মেছে, গ্রেটা গার্ব্বোকে একদিন তিনি চলচ্চিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিরূঢ়া দেখবার কল্পনায় বিভোর হয়েছেন। 'মেট্রো'দের আহ্বানে তিনি উত্তর পাঠালেন যে, তিনি আমেরিকা যেতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু তার সঙ্গে থাকবে গ্রেটা গার্ব্বো এবং তাকেও চাকরি দিতে হবে।

অনেক চিঠি লেখালেখির পর 'মেট্রো' কোম্পানী রাজী হলেন।

* * *

এতদিন গ্রেটার জীবন ছিল অত্যন্ত সরল এবং

সাধারণ, কিন্তু আমেরিকায় গিয়ে তাঁর সেই সহজ অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রায় বারবার ব্যাঘাত ঘট্‌তে লাগ্‌লো।

'হলিউড' তাঁর কাছে এক অত্যন্ত অদ্ভুত রাজ্য ব'লে মনে হ'ল। সেখানে এক ষ্টিলার ছাড়া কেউ তাঁর পরিচিত নেই। সেখানকার মেয়েরা একান্ত বিচিত্র; তাদের জীবন-যাত্রার প্রণালীও যারপরনাই দুর্ব্বোধ্য।

ষ্টিলার নিজের একশো-একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। গ্রেটা নিঃশব্দভাবে একাকী 'ষ্টুডিও'র মধ্যে ঘুরে বেড়ান। মাসের পর মাস কেটে গেল, কিন্তু কারুর সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'ল না। সম্প্রদায়ের কর্ত্তারা চারিদিকে ঘুরে বেড়ান বটে, কিন্তু কেউই তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন মনে করেন না। নির্দ্ধারিত মাহিনা তিনি পাচ্ছেন বটে, কিন্তু কোন ছবিতেই তাঁকে ভূমিকা দেওয়া হচ্ছে না। মাঝে মাঝে কোম্পানীর বিজ্ঞাপনী ছবিতে তাঁর 'পোজ্' নেওয়া হচ্ছে—কখনো বা জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে একত্রে, কখনো বা অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশে।

গ্রেটা গার্বো বিস্মিত হ'লেন, ক্ষুব্ধ হ'লেন। দেশ থেকে বৃত্তি পেয়ে অভিনয়-শিক্ষা ক'রে শেষে কি এমনি বিজ্ঞাপনী ছবিতেই তাঁর চেহারা ছাপা হ'তে থাক্‌বে চিরকাল। একদিন তিনি এ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন—"আমি যখন বড় হবো—লিলিয়ন গিশের মতো বড়ো হবো—তখন আর কিছুতেই এই ধরণের বিজ্ঞাপনে নিজের ছবি ছাপাতে রাজী হবো না।"

অবশেষে মেট্রোর কর্ত্তৃপক্ষ গ্রেটাকে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বার আয়োজন কর্‌লেন। 'দি টরেণ্ট' ছবিতে তাকে রিকার্ডো কর্টেজ-এর সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় নামানো হ'ল।

'টরেণ্ট' যখন ছবির পর্দ্দায় মুক্তিলাভ কর্‌ল, তখন তার নায়ক জনপ্রিয় নট রিকার্ডো কর্টেজ কোথায় গেলেন তলিয়ে। দর্শকবৃন্দ গ্রেটা গার্ব্বোর নামে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। 'টরেণ্ট' গ্রেটার ভবিষ্যৎ-খ্যাতির প্রথম ধাপ!

সমালোচকবৃন্দ দ্বিধাশূন্য ভাষায় গ্রেটা গার্ব্বোর জয় ঘোষণা কর্‌লেন, এতদিনে এমন একজন অভিনেত্রীর তাঁরা দেখা পেয়েছেন, যার মধ্যে আছে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসসৃষ্টির ক্ষমতা এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ছবিতে তাঁকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হ'ল। ছবির নাম—'টেম্পট্রেস্।' য়্যান্টনিয়ো মোরেনো নায়ক। পরিচালনা কর্‌বেন—মরিজ ষ্টিলার।

কিন্তু ষ্টিলার পরিচালনার কাজে তেমন সুবিধা কর্‌তে পার্‌লেন না। ইংরেজী না জানার দরুণ অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘট্‌তে লাগ্‌লো—দোভাষীর দ্বারা কাজ ভালো-ভাবে এগুচ্ছিল না। কাজে-কাজেই অবশেষে ষ্টিলার পরিচালনার কাজ থেকে অবসর নিলেন। ফ্রেড্ নিব্‌লোকে সে-ভার অর্পণ করা হ'ল।

এ-ব্যাপারে গ্রেটা অত্যন্ত বিমূঢ় ও মর্ম্মাহত হ'লেন। গুরু নিল বিদায়। শিষ্যা কিন্তু র'য়ে গেলেন। মরিজ ষ্টিলার স্বদেশে প্রত্যাগমন কর্‌লেন।

এই সময়ে আবার দুর্ঘটনার ওপর দুর্ঘটনা। সংবাদ এলো আদরের ছোট বোন আল্‌ভা হঠাৎ মারা গেছে। খবর শুনে গ্রেটা কয়েকদিন স্তব্ধ বজ্রাহত হ'য়ে রইলেন। তারপর যেন সব দুঃখকে ভোলবার জন্যই ভীষণ পরিশ্রম কর্‌তে সুরু কর্‌লেন, দিন রাত্রির সকল সময়েই চলচ্চিত্রের মধ্যে তিনি ডুবে রইলেন।

'টেম্পট্রেস' মুক্তিলাভ কর্‌বার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেটার নামে সারা 'হলিউড' মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো।

জনসাধারণ তাঁর পরিচয় জান্‌বার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে পড়্‌লো। তাঁর মৌনতার কুহেলিকায় তাদের সকল কৌতূ-হল প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লো। ফল হ'ল উল্টা। গ্রেটা দিন দিন অধিকতর আলোচনার বস্তু হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন।

বিখ্যাত পরিচালক ক্ল্যারেন্স ব্রাউন সেই সময় বহুল-আলোচিত ছবি 'ফ্লেস্ এণ্ড ডি ডেভিল' তোলবার তোড়জোড় কর্‌ছিলেন। নায়কের ভূমিকায় দেখা দেবেন, তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা জন্ গিলবার্ট। ঐ ছবিতে গ্রেটাকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হ'ল।

'ফ্লেস্ এণ্ড দি ডেভিল' ছবিখানি সারা চিত্র-জগতে অপরিসীম উত্তেজনার সৃষ্টি কর্‌ল। গ্রেটা গার্বো প্রথম শ্রেণীর তারকার পদে উন্নীত হ'লেন। তাঁর নাম পৃথিবী-ময় ছড়িয়ে পড়্‌ল।

গ্রেটা গার্বো

জুয়েল অব ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা।

* * *

ঐ ছবিতে অভিনয় কর্‌বার পর গিলবার্টের সঙ্গে গার্কোর একটী নিবিড় সখ্যতার বন্ধন স্থাপিত হ'ল। জন গিলবার্ট সর্ব্ববিষয়ে গ্রেটাকে সাহায্য কর্‌তেন। 'ষ্টুডিও'-রাজনীতি এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে জনই হলেন গ্রেটার উপদেষ্টা।

জন ছাড়া আর একটি অভিনেতা যিনি গ্রেটাকে নানা-বিধ উপদেশ দিতেন এবং তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হ'তেন না, তিনি হচ্ছেন, সর্ব্বজনপ্রিয় লন্ চ্যানী।

গেলো। গ্রেটা গার্কো নিশ্ছিদ্র মৌনতার অন্তরালে রহস্যময়ী হ'য়ে রইলেন। সে রহস্যের ঘোর আজও কাটে নি।

'লাভ', 'দি ডিভাইন উওম্যান্', 'ওয়াইল্ড অরকিড্‌স্', 'দি মিষ্টিরিয়াস্ লেডী', 'উওম্যান অফ্ অ্যাফেয়ার্স', 'দি সিঙ্গেল ষ্টাণ্ডার্ড', 'দি কিস্'—পর পর এই ক'খানি নির্ব্বাক ছবিতে অভিনয় কর্‌বার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেটা গার্কোর নাম জগতের চলচ্চিত্রাভিনেত্রীদের তালিকার একেবারে উপরে উঠ্‌লো। আশ্চর্য্য অভিনেত্রী গ্রেটা গার্কো, অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী গ্রেটা গার্কো।

জন গিলবার্টের সঙ্গে গ্রেটা গার্কোর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে এই কথাটি যেমন প্রকাশ পেলো, অমনি সঙ্গে সঙ্গে হাজার-এক-রকমের ভিত্তিহীন জনরব চারিদিকে শোনা গেল। খবরের কাগজওয়ালারা এই বন্ধুত্বকে প্রণয়ের রঙে রঙীন ক'রে পাঠকদের সাম্‌নে উপস্থিত কর্‌লেন। তার ফলে গ্রেটা অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

জন গিলবার্ট হয় ত এই সুইডিশ-তরুণীকে ভালো বেসেছিলেন, কিন্তু গ্রেটা তাঁকে দেখেছিলেন বন্ধুর মতো, উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতার মতো। তার বেশী কিছু নয়।

এই ব্যাপারের পর গ্রেটা জনসাধারণের কাছ থেকে আরও দূরে স'রে গেলেন। কারুর সঙ্গে দেখা করা নিষিদ্ধ হ'ল। সমালোচকেরা দরজা থেকে এসে ফিরে

* * *

তারপর টকির বন্যা এলো। অনেক অভিনেতা, অভিনেত্রী সে বন্যায় ভেসে গেলেন। প্রশ্ন উঠলো, গ্রেটা কি নিজের প্রতিভার বাঁধ অটুট রাখ্‌তে পার্‌বেন? তাঁর ইংরেজী বাচন ভঙ্গী কি টকির উপযোগী হবে?

ছবি নির্ব্বাচিত হ'ল-'অ্যানা ক্রিষ্টি।' গ্রেটার প্রথম সবাক ছবি। সে-ছবি অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত হ'ল।

সবাকযুগে গ্রেটা গার্কো চিত্র-জগতে যে কী দুর্লভ আসন লাভ করেছেন, তা' আমরা সকলেই জানি; আজ তার পাশে দাঁড়াতে পারে, জগতে এমন অভিনেত্রী একজনও নেই। চিত্র-জগতে গ্রেটা গার্কো আজ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্!'

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঙলাদেশের এধার ওধার

শ্রীমণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিদেশী চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যখন অনেক কিছু বলা হয়েছে, তখন দেশের দু'-চারটে কথা শোনবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। বিদেশ মানে বিশেষভাবে 'হলিউডে'র কথা এতবেশী শোনান হয়েছে যে, আজ আর তা' শোনবার ধৈর্য্য না থাকাই সম্ভব। প্রতি কাগজের পাতায় যেখানে ছায়া-ছবি নিয়ে কিছু লেখা হয়েছে, সেখানেই এসে পড়েছে — 'হলিউডে'র কথা আর তার পেছনে পেছনে গতানুগতিক ভাবে সেখানকার অভি-নেতা আর অভিনেত্রীর —তাদের বিচিত্র জীবন-যাত্রার নানা চমকপ্রদ ঘটনা না এসে থাকতেই পারে না। কিন্তু আজকাল হাওয়া একটু বদ্‌লেছে -মানে সাধারণ পাঠক আজ একটুখানি যেন বিরক্ত হয়েছেন এই সব কাহিনী শুনে শুনে। সামান্য অরুচির ভাব যেন এসেছে তাদের মধ্যে।

কিন্তু তাদের এই রোগের ঔষধ সত্যিই নেই। তারা যা' শুনতে চান, বাঙলাদেশের অভিনেতা আর অভিনেত্রী-দের জীবন কাহিনী—তা' বলতে যাওয়া মূর্খতা। মানে, তা' বলতে পারা যায় না; কারণ তাদের সম্বন্ধে কিছুই এখনও পর্য্যন্ত বিশেষভাবে বাইরে ছিটকে এসে পড়েনি যা' অবলম্বন করে' একটু কিছু লেখা যেতে পারে। এই মালমসলা না পাবার অনেক কিছু কারণ আছে, এমন কি, অনেকগুলোর সম্বন্ধে পাঠকদলও অল্প-বিস্তর পরিচিত। সত্যিই এমন কথা লিখ্‌তে দুঃখ হয়। কিন্তু না লিখ্‌লেও কোন গতি নেই।

বৈচিত্র্যহীন বাঙালীর জীবন। তার মধ্যে যদিও এমন কিছু নেই যা' আমাকে বা অন্যকে মুগ্ধ করতে পারে। কিন্তু যাও বা আছে, তাও পাওয়া যায় না—শুধু অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের জন্যে। একটু অবাক্ হবার মত কথা বটে। কিন্তু এতো সকলেই জানেন যে, জীবনী বা ওইরকম কিছু আকাশ থেকে পড়তে পারে না। তাদের খুঁজেপেতে সংগ্রহ করে' আনতে হয়—আর এই সংগ্রহ করা যেতে পারে একমাত্র—অভি-নেতা বা অভিনেত্রীদের কাছ থেকে। এমনও যদিও হয় যে, এঁদের কোন বিশেষ বন্ধু বা অতি পরিচিত আত্মীয় এই সব কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু যা' ওদেশে হয়, তা' আমাদের দেশে হয় না, হ'তে পারে না। আমাদের দেশে বিশেষভাবে বাঙলাদেশের অভিনেতা বা অভিনেত্রীদল আজ পর্য্যন্ত নিজে দু'কলম

নিয়তির একটি দৃশ্য

লিখে (যাঁরা লিখ্‌তে পড়্‌তে জানেন—তাঁদের সংখ্যা যদিও আঙলে গোনা যায়) সাধারণকে তো নিজেদের সম্বন্ধে কিছু জানালেনই না—অন্যভাবেও আজ পর্য্যন্ত এমন কিছু নতুন সংবাদ বাইরে এলো না, যা' সাধারণকে একটু আনন্দ দিতে পারে। এই ভারতবর্ষেরই অন্য বিখ্যাত সহর বম্বের নটনটীদের কত কথা আমরা জানি—কিন্তু দুর্ভাগা এই বাঙলাদেশ, এখানে সকলেই মূক। বড় লাজুক কি না আমরা, বড় লজ্জা পাই আমাদের কথা অন্যকে বল্‌তে—কিন্তু অন্যের কথা শুনে মাততে আজই প্রস্তুত আছি। রহস্যময়ী গার্ব্বোরই কত কথা জান্‌তে পার্‌লাম—আশ্চর্য্য হলাম—এমন কি, এই বিখ্যাত অভিনেত্রীকে শ্রদ্ধা পর্য্যন্ত কর্‌তে কুণ্ঠিত হলাম না। কিন্তু আমাদের বাঙলাদেশের নট আর নটীর দল পর্দ্দার গায়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করে' আনন্দ যা' দিচ্ছেন, তার তো তুলনাই নেই—অন্যদিক দিয়েও কিছু কর্‌তে নারাজ। কেন? তা' না শোনাই ভাল—কারণ, তা' ভয়ানক অপ্রিয়।

উমাশশী

যাই হোক্, লিখ্‌তে যে কালে কিছু হবেই, তখন একটু চেষ্টা করা যেতে পারে মাত্র।

অভিনেতা আর অভিনেত্রী একদল আমাদের আছেন যদিও—কিন্তু তা' এত অল্প যে, চোখ বুজে বলে' দেওয়া যায়। গোড়াকার দিকের কথা বল্‌তে গেলে—অন্য দেশেও যা' হয়, আমাদের দেশেও তাই হয়েছিলো। রঙ্গমঞ্চ থেকে যত সব নামকরা নট-নটীদের' ধরে আনা হলো ছবিতে অভিনয়ের জন্যে। আর বাইরে থেকে যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে অ-বাঙালী অভিনেত্রীর সংখ্যাই ছিল বেশী। ফিরিঙ্গী মেয়েরা মোটা মোটা মাইনের লোভে এল পর্দ্দায় অভিনয় কর্‌তে—আর দু'-চারজন সুদর্শন নট রঙ্গমঞ্চ বা অবৈতনিক নাট্য-সঙ্ঘ থেকে বেছে নেওয়া হলো। কিন্তু

দুর্গাদাস

পুরানো কথা না বলাই ভাল—যা' অতীত, তার মূল্য আর আমাদের কাছে এমন কি আছে? কিন্তু একজনের কথা উল্লেখ না কর্‌লে অবিচার করা হবে। চলচ্চিত্রের শিশু অবস্থায় 'আঁধারে আলো'র 'বিজলী'র ভূমিকায় শ্রীমতী দুর্গা যে সহজ সুন্দর অভিনয় করেছিলেন তা', কোনমতেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না।

কিন্তু আমি বলি ছায়া ছবির ইতিহাসের মধ্যযুগে যখন বাঙলার সুবিখ্যাত অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট দুর্গাদাসের অভিনয়ের তুলনা ছিল না, যখন তার প্রতিভা দিনের পর দিন একের পর এক নতুন জিনিস সৃষ্টি করেছে, যখন ছিলেন সীতাদেবী (রেণী স্মিথ) তার সেই অদ্ভুত মোহনীয়তা নিয়ে, আমি বলি তখনই বাংলা ছায়া-ছবির স্বর্ণযুগ—অভিনয়ের দিক্ দিয়ে। তখনকার কালের অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের নাম কর্‌তে গেলে উপর্য্যুক্ত দু'জন ছাড়া বল্‌তে হয় ইন্দিরা দেবী ('কপালকুণ্ডলা' খ্যাত), আর পেসেন্স কুপারের নাম। অভিনেতাদের মধ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য কিছু নাম করে-ছিলেন 'কাল পরিণয়ে' অভিনয় করে'।

তারপর ইতিহাসের পাতা উল্টালো। কোথায় ছিল ছবি নির্ব্বাক, হলো তা' সবাক। বিস্ময়—ভীষণ বিস্ময় আমাদের কাছে! প্রথম ক'দিন তো আমরা নিজেদের

খাপই খাওয়াতে পারলাম না। কিন্তু ক্রমশঃ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে পা রাখ্‌তে সবাক ছবি তুল্‌তেই হলো। আর ক্রমশঃ অনিবার্য্যভাবে সবাক ছবি অধিকার করলে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের পাতা।

সবাক ছবি এলো আর সঙ্গে সঙ্গে সরে' দাঁড়াতে হলো অনেক নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীকে। যতসব ফিরিঙ্গী অভিনেত্রীদল সরে' গেলেন, তলিয়ে গেলেন বিস্মরণের

অমর মল্লিক

অতল অন্ধকারে। সাম্‌নের দিকে এগিয়ে এলেন—আগেকার দিনে যাঁরা দু'-একখানা ছবিতে অভিনয় করে' নামই করতে পারেন নি—তাঁদের মোহন কণ্ঠস্বর নিয়ে। নানাদিক্‌ দিয়ে বিশেষ করে' যান্ত্রিক উন্নতি—যেমন আলোক-চিত্র গ্রহণ ইত্যাদির উন্নতি এই সময় হলো বিশেষভাবে। বিশাল বিশাল দেশী ষ্টুডিও তৈরী হলো। এই সময় আরম্ভ হলো নতুন এক যুগ—যখন সাধারণ সমাজ চলচ্চিত্র সম্বন্ধে হ'য়ে উঠ্‌লো বিশেষভাবে উৎসুক।

এই সময় যাঁরা নতুন অভিনেতা আর অভিনেত্রী এলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করা যেতে পারে—উমাশশী আর অমর মল্লিকের। কিন্তু ছায়া-ছবির রাজ্যে তখনও একছত্রাধিপতি হ'য়ে রইলেন দুর্গাদাস। পুরানো দলের অভিনেত্রী রইলেন মাত্র নিভাননী, আর শান্তি গুপ্তা—মানে, নামকরাদের মধ্যে। এখানে বলে' রাখি অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের মধ্যে কয়েকটী বিভাগ আছে। নায়ক বা নায়িকা—পার্শ্বচরিত্র, হাস্য-রসিকের, আর কূট চরিত্র। এইবার বল্‌বার আছে এই সব বিভাগের বিখ্যাত অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে দু'-চারটে কথা।

প্রথমেই এদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কোন সন্দেহ নেই যে, দুর্গাদাসই বাঙলা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন, আর এখনও আছেন। ওদের দেশে যেমন লোকে ক্লার্ক গ্যাবেল বা র‍্যামন নোভারোর ছবি দেখ্‌বার জন্যে পাগল হয়, আমাদের দেশে তেমনি হয় দুর্গাদাসের ছবিতে। দুর্গাদাসের ভেতর সত্যিই অভিনয়-প্রতিভা আছে; আর শুধু তাই নয়, তাঁর মত সুদর্শন অভিনেতা প্রায় বিরল। দুর্গাদাস প্রথমে ছিলেন রঙ্গমঞ্চের একজন সাধারণ অভিনেতা—হঠাৎ মানভঞ্জন (নির্ব্বাক) ছবিতে জনতার একজন হিসাবে পর্দ্দার গায়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু প্রতিভা কখনও চাপা থাকে না। তারপরই 'চন্দ্রনাথ' ছবিতে পেলেন প্রধান ভূমিকা। এরপর আরম্ভ হলো কি রঙ্গমঞ্চে আর কি ছবির রাজ্যে দুর্গাদাসের জয়যাত্রা। ছবির পর ছবিতে প্রধান বা

মলিনা

অপ্রধান যাতেই অভিনয় করেন, একটাও মন্দ হয় না—সুন্দর, তার থেকে আরও সুন্দর। নির্ব্বাকের যুগে আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' 'গোবিন্দলাল' আর 'দুর্গেশনন্দিনী'তে 'ওসমানে'র ভূমিকায় যে দুর্গাদাসকে দেখেছিলাম, তাকে আর আজও দেখ্‌তে পেলাম না—আর পাবও না হয়তো বা। আজ পর্য্যন্ত দুর্গাদাস প্রায় তেইশখানি ছবিতে অভিনয় করেছেন। শুধু নায়ক নয়—এমনি পার্শ্বচরিত্রে যাঁরা দুর্গাদাসকে 'রজনী'তে 'হীরালাল' আর 'বুকের বোঝায়

'নকুলে'র ভূমিকায় দেখেছেন, তাঁরা জানেন এই বিভাগেও তাঁর ক্ষমতা কি অসাধারণ! সবাক ছবিতেও এর জোড়া নেই বল্‌লেই চলে। কিন্তু নির্ব্বাকের দুর্গাদাস আর সবাকের যুগে ফিরে এলেন না। যদিও 'কপালকুণ্ডলা'য় (সবাক) 'নবকুমার'আর 'চিরকুমার-সভা'র'পূর্ণ' ভালই হয়েছে—খুবই ভাল হয়েছে। তবুও বল্‌তে হচ্ছে, আগেকার দুর্গাদাস আর নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে, দিনের পর দিন তাঁর প্রতিভা আস্‌ছে কমে—সৃষ্টির আর ক্ষমতা নেই, এখন তাঁকে বিদায় নিতে হবে ছায়া-ছবির রাজ্য থেকে। আর তা' যদি নাও হয়, নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করা আর চল্‌বে না। দুর্গাদাস কালিকাপুরের জমিদার-বংশের ছেলে। চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় এঁর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। দুর্গাদাসের মত অভিনেতা পেয়ে আমরা সত্যই গর্ব্বিত।

এরপরই অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেরই নাম করা যেতে পারে—কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে লেখ্‌বার এমন কিছুই নেই। সবাক যুগের একমাত্র আবিষ্কার বলা যেতে পারে অমর মল্লিককে। এঁর মত শক্তিশালী চরিত্র অভিনেতা খুব কমই আছে আমাদের বাঙলা ছবির রাজ্যে। 'চণ্ডীদাসে' এঁর জমিদারের ভূমিকা অনেকেরই এখনও মনে আছে।

শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়াও ছবির রাজ্যে নবাগত, তার ভেতরেও শক্তির অভাব নেই। 'অপরাধী'তে এঁর ভূমিকা সত্যই মনোমুগ্ধকর। এই সেদিন তিনি 'রূপলেখা'য় অভিনয় করেছেন—নায়কের ভূমিকায়। ইনিও গৌরীপুর রাজবংশের ছেলে—সুদর্শন, সুশিক্ষিত। ছবি-প্রযোজনায় এঁর যথেষ্ট দক্ষতা আছে।

এ ছাড়াও সবাক যুগে আমরা পর্দ্দার গায়ে পেয়েছি বাঙলা রঙ্গমঞ্চের দুই অতি-বিখ্যাত অভিনেতাকে। শিশির ভাদুড়ী ও অহীন্দ্র চৌধুরী। দু'জনেই নির্ব্বাক যুগে দু'-একখানা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু তখন আমরা সত্যিই এঁদের সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু যেদিন দেখ্‌লাম শিশিরকুমারকে সবাক 'পল্লী-সমাজে' 'রমেশে'র ভূমিকায়, আর 'সীতা' ছবিতে 'শম্বুকে'র ভূমিকায় অহীন্দ্রভূষণকে, সেইদিন বুঝলাম—এঁদের সম্বন্ধে বাঙলা ছায়া-ছবি অনেক কিছু আশা করতে পারে। শিশিরবাবুর নির্ব্বাক যুগের ছবি 'বিচারকে'র সঙ্গে এর তুলনাই হয় না।

এরপরও এই ক'জন অভিনেতার নাম বলা যেতে পারে বাঙলা চিত্র-জগতের বিখ্যাত অভিনেতা বলে':—

নায়ক—শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য ('চাঁদ সদাগর' ইত্যাদি), শ্রীজীবন গাঙ্গুলি ('চাষার মেয়ে'), শ্রীফণি বর্ম্মা ('দেবদাস', নির্ব্বাক), শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ('ঋণমুক্তি') শ্রীরতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ('বিল্বমঙ্গল')।

চরিত্র অভিনেতা:—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ('সাবিত্রী'), শ্রীনরেশ মিত্র ('নৌকাডুবি', নির্ব্বাক), শ্রীনির্ম্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ('অপরাধী', নির্ব্বাক), শ্রীরাধিকা মুখোপাধ্যায় ('অপরাধী') ইত্যাদি।

হাস্যরসাভিনেতা:—শ্রীধীরেন গাঙ্গুলি ('মাসতুতো ভাই'), শ্রীতুলসী লাহিড়ী ('মণিকাঞ্চন')। অভিনেতাদের সম্বন্ধে যা' কিছু বল্‌বার ছিল—এখানেই তার শেষ। এই থেকে বাঙলাদেশের অভিনেতা ও চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে আশা করা যায়। প্রত্যেকের সম্বন্ধে একটু করে' লেখাও এখন সম্ভব নয়, পরে জানাবার চেষ্টা কর্‌বো।

এইবার অভিনেত্রীদের কথা।

অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রথম যদি কারুর নাম কর্‌তে হয়তো আমি কর্‌বো শান্তি গুপ্তার। শান্তি গুপ্তা নটীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয়-শক্তির কথা ধর্‌তে গেলে হয়তো অনেকেই নানা আপত্তি তুল্‌বেন। কিন্তু যতদূর মনে হয়—একমাত্র নির্ব্বাক যুগের সীতাদেবী ছাড়া আর কেউই এই অভিনেত্রীকে অভিনয়ের দিক্ দিয়ে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন না। শান্তি গুপ্তা প্রথম ম্যাডানের 'কাল পরিণয়ে' 'ক্ষীরি ঝি'য়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তারপর নির্ব্বাক আর সবাক বহু ছবিতেই তিনি অভিনয় করেছেন এবং এখনও কর্‌ছেন। তবে একথা ঠিক যে, কোন ভূমিকাতেই তিনি এমন কিছু অভিনয় করেন নি, যাতে তাঁর মধ্যে বিশেষ অভিনয়-প্রতিভা আছে বলা যেতে পারে। তবুও 'নৌকাডুবি'তে (নির্ব্বাক) 'হেম', আর 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' (সবাক) 'ভ্রমর' বেশ সুন্দর হয়েছে। বয়স এঁর তেমন বেশী নয়—

চেহারা খুব সুন্দর। বাঙলা চলচ্চিত্র এঁর কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।

এরপরই আজকালকার সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়া অভিনেত্রী উমাশশী সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। উমাশশী খুব ছোট অবস্থা থেকে আজ যশের উচ্চতম শিখরে উঠেছেন। প্রথমে তিনি ছিলেন একজন থিয়েটারের সাধারণ নর্ত্তকী - কে-ই বা চেনে, আর কে-ই বা নাম জানে। অনেকদিন আগে 'বঙ্গবালা' নামে নির্ব্বাক ছবিতে ইনি প্রথম অভিনয় করেন। কিন্তু তখনকার মত কিছুদিনের মধ্যেই নাম চাপা পড়ে' যায়। হঠাৎ পেলেন সবাক 'চণ্ডীদাসে' 'রামী'র ভূমিকা, আর তা'তে অভিনয় করে' আজ হ'য়ে উঠেছেন বিখ্যাত—শুধু তাই নয়, এঁরই ছবির আজকাল বাজারে বেশী চাহিদা।

এঁরই পাশে দাঁড়াতে পারেন, এমন অভিনেত্রী আছেন মাত্র দু'জন—মলিনা আর চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী নির্ব্বাক যুগে একখানা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু মলিনার অভিনয় আরম্ভ সবাক যুগে। যতদূর মনে হয় 'চিরকুমার-সভা'ই মলিনার প্রথম ছবি, আর চন্দ্রাবতীর দ্বিতীয় কিন্তু শ্রেষ্ঠ ছবি হচ্ছে 'মীরাবাঈ।' সবাক যুগে এই তার প্রথম ছবি—কিন্তু একটা ছবিই প্রতিভাকে পরিচিত করতে যথেষ্ট। ইনি সুশিক্ষিতা এবং সুন্দরী। মলিনাও সুন্দরী এবং অভিনয়-প্রতিভাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু এই দু'জনের কথা বিশদভাবে বলবার দিন আজও আসে নি।

এরপর উল্লেখযোগ্য অভিনেত্রীদল :—

নায়িকা :—শ্রীমতী প্রভা ('পল্লী-সমাজ'), শ্রীমতী সুনীতি ('চিরকুমার-সভা'), শ্রীমতী মিভাননী ('দেনা-পাওনা'), শ্রীমতী উমারাণী ('অন্নপূর্ণা'), শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা ('তরুণী'), শ্রীমতী রাণীসুন্দরী ('বিল্বমঙ্গলে' 'চিন্তামণি'), শ্রীমতী কাননবালা ('শ্রীগৌরাঙ্গ')।

চরিত্র :—শ্রীমতী হরিসুন্দরী ('তরুণী'), শ্রীমতী দেববালা ('সন্দিগ্ধা'), শ্রীমতী ইন্দুবালা ('মীরাবাঈ'), শ্রীমতী শিশুবালা ('ঋণমুক্তি')।

বাঙলাদেশের অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে আলোচনা করবার অনেক কিছু আছে বটে, কিন্তু সাধারণকে একটু আনন্দ দিতে পারে এমন কোন গল্প বা ঘটনাও নেই। এইতেই বা এমন কি আছে? সত্যিই কিছু নেই। কিন্তু এর বেশী লেখবার যে কি আছে, তাও এখন ভেবে পাই না। এমন কি, এই প্রবন্ধে যেটুকু লেখা হলো, তার দামও হয় তো দু'দিন বাদে কিছুই থাকবে না—কারণ, আশা করতে বোধ হয় ক্ষতি নেই যে, ভবিষ্যতে আমাদের দেশের অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে হবে—তাঁরাও তা'তে সাহায্য করবেন।

জানি, তার এখনও অনেক দেরী আছে—কিন্তু আশা করতে দোষ কি?

মণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
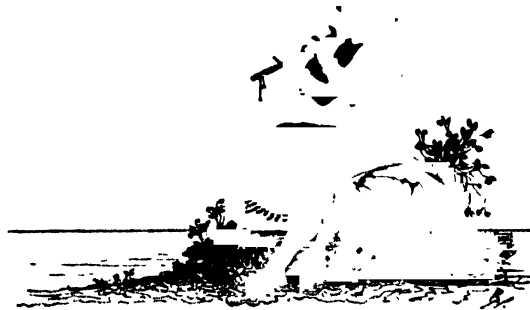
চিত্রজগতের পঞ্চশস্য

শ্রীমতী প্রতিভা শীল

আজকাল বায়স্কোপের যুগে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেতন কত জানবার আগ্রহ হওয়া বিচিত্র নয়, বরং স্বাভাবিক। কেন না, 'হলিউড' দিন দিন আমাদের দেশটাকে যে-ভাবে আচ্ছন্ন করে' তুলচে এবং আধুনিক বাঙালী মেয়েছেলেরা যে-ভাবে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তাতে অদূর ভবিষ্যতে এই কোলকাতা যে দ্বিতীয় হলিউড্ হবে না, একথা কে জোর করে' বল্‌তে পারেন? চিত্র-জগতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা উমাশশী, নলিনী, রাণীবালা, পূর্ণিমা প্রভৃতির এত অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কি কোন ইঙ্গিতই ঘোষণা করে না? আমাদের মনে হয়, করে।

রচেল হাডসন

* * *

থাক্, যে কথা বলছিলুম। হলিউড থেকে খোঁজ খবর এসে পৌঁচেছে—'ষ্টার'দের নাম প্রকাশ করে' তাদের বেতন জানিয়ে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্মান-হানিকর এবং তা' না হলে তাদের উৎসাহ নষ্ট করা হয়। তাই নাম না জানিয়ে তারা জানিয়েছেন, পুরুষ-ষ্টারদের মধ্যে সব চেয়ে যিনি বেশী পেয়েছেন বা পাচ্ছেন, তাঁর আয় হচ্ছে সাপ্তাহিক চল্লিশ হাজার টাকা।

ফার্ণ

* * *

যে লোকের সাপ্তাহিক আয় চল্লিশ হাজার টাকা, সে লোক মাসে জমায় কত, এ-ও জানবার কৌতূহল হওয়া আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মজার কথা এই, অতটাকা উপায় করেও, সম্পত্তি-রক্ষা, আয়কর, চাকরদের মাহিনা, বডি-গার্ডের মাহিনা এবং নিজের পকেট খরচ করে' তাঁর একটী পয়সা-ও বাঁচে না।

* * *

স্ত্রী 'ষ্টার'-দের সাপ্তাহিক আয়ের সংবাদ পাওয়া গেচে দশ হাজার টাকার কিছু কম। কিন্তু আমাদের ধারণা হ'তো অন্যরকম, অর্থাৎ, আমরা ভাবতুম, মেয়েরাই বুঝি বেশী পান। মিঃ বোজেনব্লান্ট বলেন: এ্যাক্টারদের চেয়ে এ্যাক্ট্রেসদের দাবী অনেক কম। হলিউডে সব চেয়ে উচ্চ বেতন ভোগী কুড়িজন অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে আটজন হলেন অভিনেতা, চারজন আর্টিষ্ট এবং মাত্র দু'জন অভিনেত্রী।

লিলিয়ান হার্ভে

* * *

এসব কথা বাদ দিলে-ও মোটামুটি হলিউডে এক শ' দু' জন অভিনেতা, অভিনেত্রী, আর্টিষ্ট, ডিরেক্টার প্রভৃতি

আছেন—যাঁদের বাৎসরিক আয় দু'লক্ষ টাকার ওপর এবং তিন হাজার এক শ' ছিয়াত্তর জন কর্ম্মচারী প্রভৃতি আছেন যাঁদের সাপ্তাহিক আয় চার শ' টাকার ওপর।

* * *

এতটুকু মেয়ে বটে, কিন্তু এরই মধ্যে সে ইংরাজী, স্পেনীয় এবং ফ্রেঞ্চভাষায় কথা বলতে পারে।

* * *

সবিতা দেবী এবং কুমারকে নিয়ে কে, পি, ঘোষের

ট্রেভার

এঞ্জেল
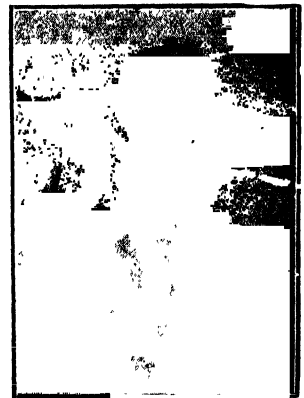
ক্লারাবো

ফক্সের শার্ল টেম্পল এবং বেবি লী-রয় এর মতো ইউনিভার্সাল-ও জ্যানিটা কুইগ্‌লি বলে' একটা আড়াই বছরের মেয়ে যোগাড় করেছেন। 'ইমিটেসন্ অফ্ লাইফ্'

বলে' পুস্তকে অভিনয় করবার জন্যে তাকে ডিরেক্টার জন্‌ষ্টন-এর হাতে এর মধ্যে সঁপে দেওয়া-ও না কি হ'য়ে গেচে।

'লিওর অফ্ দি সিটি' শেষ হয়ে এলো। মিস কাজ্জন না কি শীঘ্রই এই দলে যোগ দিচ্চেন।

* * *
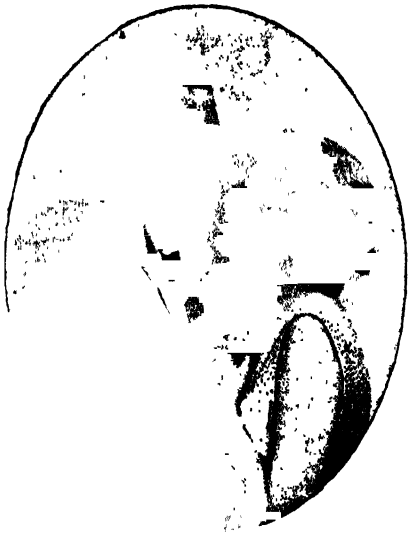
মিস্ গহরকে শীঘ্রই 'ব্যারিষ্টারের পত্নী'রূপে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। সাহা-মশায়ের 'তুফানী তরুণী' এই মাসের শেষেই দেখা দেবেন শোনা যাচ্চে। একদিকে 'পাঞ্জাব ফিলিম' 'হরিজন' নিয়ে মহাব্যস্ত, অন্যদিকে 'ন্যাশানাল মুভিটোন' 'স্বর্গের সিঁড়ি' তৈরী করতে উঠে-পড়ে'

লেগেচেন। বায়স্কোপে না গিয়ে লোক আর উদ্ধার হয় কি করে'?

প্রতিভা শীল

পর্ব্বত জয় করেছে কে?

শ্রীমতী দুর্গা দেবী

দুই পাহাড়ের মাঝখানে গভীর খাদ,—ভিতর দিয়ে এক পাহাড়ী নদী পাথরের গা ঘেঁসে ফাটলের ফাঁক দিয়ে এঁকে-বেঁকে ফেঁপে-ফুলে বেয়ে চলেছে। দু'পাশের পাড় খাড়া উঁচু; গাছপালা বিশেষ কোথাও নেই,—কেবল জলের কাছাকাছি কতকগুলি কচি গাছের ঝোপ, প্রতি শরৎ বসন্তে নদীর জল সিঞ্চনের ধারায় স্নান ক'রে তারা পুষ্ট, কিন্তু কোনদিকে তাদের বাড়্‌বার উপায় নেই,—যতট, পারে একপাশে হেলে উপরদিকে একটু উঁকি মেরে চেয়ে থাকে।

"আচ্ছা, পাহাড়ের গায়ে তো কোনো আবরণ নেই, আমরাই তাকে ছেয়ে দিই না কেন!"—একদিন 'জুনিপার' গাছটি তার প্রতিবেশী 'ওক্' গাছকে বল্লে। ওক্ চেয়ে ছিল উপরদিকে,—নীচের দিকে চেয়ে একবার দেখে নিলে কে এ কথা বলছে; দেখেই মুখটা ফিরিয়ে নিলে, কোনো জবাব দিলে না। নদীটি ফেনোচ্ছ্বাস তুলে বয়ে যেতে লাগ্‌লো, পাহাড়ের মাথায় মাথায় উত্তর বাতাস তীব্র চীৎকার ক'রে উঠলো, পাহাড়ের উলঙ্গ দেহ ঝুঁকে প'ড়ে শীতে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।

"আচ্ছা, পাহাড়ের গাটি আমরা ঢেকে দিই না কেন!" অপর পাশের প্রতিবেশী 'ফার্'ঝোপকে জুনিপার বল্লে।

"কেউ যদি তা' কর্‌তে পারে, সে কেবল আমরাই।" ব'লে দাড়ীর মধ্যে আঙ্গুল বুলিয়ে ফার্ চাইলে 'বার্চ্চে'র দিকে। "তুমি কি বল?" বার্চ্চ সন্দিগ্ধ চিত্তে একবার উপর দিকে চাইলে। পাহাড়ের দেওয়াল দুটো এমনই ঝুঁকে আছে যে, নিশ্বাস নেওয়াই কঠিন। "তাই করা যাক্—ঈশ্বরের নাম নিয়ে লেগে যাই এস"—বার্চ্চ বল্লে, যদিও তারা তিনজন মাত্র, তবু এই সঙ্কল্প নিয়ে তারা যাত্রা সুরু ক'রলে। জুনিপার চল্লো আগে আগে।

খানিকটা পথ যেতে যেতে দেখা হোলো 'হিদার' গাছের সঙ্গে। জুনিপার তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে। ফার্ বল্লে—"না না,—ওকেও সঙ্গে ডেকে নাও।" হিদার তাদের সঙ্গে যোগ দিলে।

কিছুদূর উঠ্‌তে উঠ্‌তেই জুনিপারের পা পিছ্‌লে যেতে লাগ্‌লো। হিদার বল্লে—"আমাকে ধ'রে ধ'রে ওঠো।" জুনিপার তাই করলে, যেখানেই দেখে সামান্য একটু ফাটল্, হিদার সেখানেই তার আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়; যেখানেই হিদারের আঙ্গুল ঢুকেছে, জুনিপার সেখানেই তার সমস্ত হাতখানা ঢুকিয়ে দেয়। এমনি ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ওরা উঠ্‌তে লাগ্‌লো, ফার্ চলেছে অতি ধীরে ধীরে,—বার্চ্চ চলেছে সকলের পিছু। "কাজটা হচ্ছে খুবই মহৎ"—বার্চ্চ একথা বল্লে।

কিন্তু পাহাড়ের তখন ভাবনা হলো,—এরা কারা আমার গা বেয়ে উঠে আস্‌ছে? দু'-এক শতাব্দী ধ'রে কথাটা ভেবে দেখ্‌লে, তারপর এক ঝর্ণাধারাকে নীচে পাঠিয়ে দিলে খবর নিতে। সে সময় ভরা বসন্তকাল; নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে ঝর্ণার সুমুখে পড়্‌লো হিদার। ঝর্ণা বল্লে মিনতি ক'রে—"ভাই, ভাই হিদার, আমায় একটু পথ ছাড় না! দেখো, আমি কতটুকু ছোট!" হিদার তখন ভারী ব্যস্ত,—একবার একটু উঁচু হ'য়ে উঠে আবার এগিয়ে চল্লো। ঝর্ণা তার তলা দিয়ে গলে পার হ'য়ে গেল। "ভাই, ভাই জুনিপার, আমায় একটু পথ ছাড় না! দেখো, আমি কতটুকু সামান্য।" জুনিপার কট্‌মট্ ক'রে চেয়ে দেখ্‌লে, কিন্তু হিদার তাকে ছেড়ে দিয়েছে দেখে আর কিছু বল্লে না। ঝর্ণা ছুটতে ছুট্‌তে এসে পড়্‌লো—ফার্ ঝোপের তলায়,—ঝালরে ঢাকা ফার্ তখন একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু হাঁফ নিচ্ছে। "ভাই, ভাই ফার্, আমায় একটু পথ ছাড় না! দেখো, আমি কতটুকু অল্প!" ফারের পায়ের তলায় একবার চুম্বন ক'রে একটু খোষামুদে

হাসি হেসে তার মুখের দিকে চাইলে। ফারের ভারী লজ্জা হোলো, তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দিলে। বার্চ্চকে কিছু বল্‌তেই হোলো না,--আগেই সে পথ ছেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

তখন ঝর্ণা বলে,--"হি, হি, হি!"—আর আয়তনে বেড়ে বেড়ে ওঠে। বলে--"হা, হা, হা!"—সঙ্গে সঙ্গে আরো বেড়ে ওঠে। বলে--"হো, হো, হো!"-আর হিদারকে, জুনিপারকে, ফারকে, বার্চ্চকে,-উপড়ে, ভাসিয়ে, উজাড় ক'রে, তছনছ ক'রে, পাহাড়ের গা থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

আবার কয়েক শতাব্দী কেটে যায়,--ব'সে ব'সে পাহাড়ের সেদিনের কথা মনে পড়ে, পাহাড় মনে মনে হাসে।

কথাটা স্পষ্ট, পাহাড় গায়ে ঢাকা দিতে চায় না।

বিষণ্ণ হ'য়ে হিদার কিছুদিন চুপ ক'রে ব'সে ভাবে। ক্রমে যখন নূতন পাতা গজিয়ে ওঠে, তখন সে সাহস সঞ্চয় ক'রে বলে--"আবার দেখা যাক্!" আবার সে অগ্রসর হয়।

জুনিপার চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে হিদার কি করে, ক্রমে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। মাথা চুল্‌কে সেও আবার উঠ্‌তে সুরু করলে,—এবার এমন ক'রে শিকড় গেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো যে, পাহাড় ভিতরে ভিতরে টের পেয়ে গেল। "তুমি আমায় চাও না, কিন্তু আমি তোমাকে চাই।" ফারও তার পায়ের আঙ্গুলগুলো আগে নেড়ে-চেড়ে দেখে নিলে, একটা পা এগিয়ে দিলে, তারপর আর একটা পা,—তারপর জোড়া পায়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। যেখানে ওঠে সেখানটা ভাল ক'রে দেখে নেয়, আগে যেখানে ছিল সেদিক্‌টা একবার দেখে নেয়, এরপর যেখানে উঠ্‌তে হবে সেখানটাও পরখ ক'রে দেখে। এমন আটঘাট বেঁধে চলে — তার যে কখনো পতন হ'তে পারে সে কথা আর বোঝ্‌বার উপায় নেই। বার্চ্চ একেবারে কাৎ হ'য়ে ডুবে গিয়েছিল, সেও এবার ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। সকলে মিলে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলো,—দু'পাশ দিয়ে আরও খাড়া উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে চল্লো, রোদ-বৃষ্টিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। একদিন যখন রৌদ্ররশ্মি প'ড়ে পাতায় পাতায় শিশির ঝল্‌মল্ ক'রে উঠলো,—যখন পাখীরা উঠ্‌লো গান গেয়ে, খরগোস লাফিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো, কাঠবিড়ালী গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে কিচির কিচির শব্দ ক'রে উঠ্‌লো—তখন পাহাড় শুধালে,—"এ সবের অর্থ কি?"

শেষে একদিন এলো, যেদিন হিদার পাহাড়ের মাথা পর্য্যন্ত পৌছে একচোখে উঁকি মেরে দেখ্‌তে পেলে পাহাড়ের অপর পিঠটা। "ও ভাই, কি মজা, কি মজা, কি মজা!" -বল্‌তে বল্‌তে হিদার নেমে চ'লে গেল অপর পিঠ পানে। "কি দেখ্‌লে হিদার, কি দেখ্‌লে"—ব'লে জুনিপারও ঠেলে উঠে ওপাশে উঁকি মেরে চাইলে। "ও ভাই, কি মজা, কি মজা!"—বল্‌তে বল্‌তে সেও নেমে চ'লে গেল। "জুনিপারটা আজ বলে কি?"—ভাব্‌তে ভাব্‌তে ফার্ তাড়াতাড়ি খানিকটা এগিয়ে গেল। পায়ে ভর দিয়ে সেও উঁকি মেরে ওদিকটা দেখ্‌তে পেলে। "ও ভাই, তাই তো!"—বিস্ময়ে তার সরু সরু ঝালরগুলো খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো। "সবাই কি যেন দেখ্‌লে আর আমিই কেবল দেখ্‌লাম না!"—বলে বার্চ্চ কাপড় গুটিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল,—কাছাকাছি এসে মাথাটা ওদিকে ঝুঁকিয়ে দেখে নিলে। "ও হো!—ওদিকেও যে এক মস্ত বন হ'য়ে গেছে,—ওদিকেও যে কত ফার্, আর হিদার, আর জুনিপার, আর বার্চ্চ এগিয়ে এসে গেছে,—আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে!"-বিস্ময় লেগে বার্চ্চের মাথা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো, শিশির ধারা তার পাতার উপর থেকে ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌লো।

"নিজেরা কৃতকার্য্য হয়েছি বলেই তাই পরেরটাও আজ দেখ্‌তে পেলাম"—জুনিপার বল্লে।*

দুর্গা দেবী

---

* Bjornstjerne Bjornson এর 'হাউ দি মাউনটেন ওয়াজ ক্লাড' নামক গল্প হইতে। নরওয়ে দেশে আধুনিক যুগের সাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন জোর্ণসন। তাঁদের নিজের ভাষায় নিজের দেশের গল্প লিখে ইনিই প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন, এবং এঁর প্রদর্শিত পথে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে বহু লেখক বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পেয়েছেন। জোর্ণসনের এই গল্পটি ক্লাসিক হিসাবে গণ্য। এঁর জন্ম আঠার শ' বত্রিশ, মৃত্যু উনিশ শ' দশ।

জলধর সংবর্দ্ধনা

গত উনিশ-এ আগষ্ট বঙ্গভারতীর অন্যতম একনিষ্ঠ পূজারী এবং 'ভারতবর্ষে'র সুযোগ্য প্রবীণ সম্পাদক আমাদের দাদা রায় জলধর সেন বাহাদুরকে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বিপুল ঘটা-সমারোহের আয়োজন হইয়াছিল। শালখিয়া 'গোবর্দ্ধন সাহিত্য ও সঙ্গীত সমাজে'র তরুণ-সম্প্রদায় এই সংবর্দ্ধনাকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দেশের লোক যে প্রকৃত গুণের আদর করিতে শিখিয়াছে এবং গুণীর মর্যাদা দিতে যে অকুণ্ঠ নহে, তাহা এই সংবর্দ্ধনা হইতে ভালরূপ প্রমাণ হইয়াছে। আমরা সংবর্দ্ধনা করিয়াই যেন এই প্রবীণ সাহিত্য-সেবীকে ভুলিয়া না যাই। বৎসর বৎসর যেন তাঁহাকে এমনই করিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারি। দেশবাসীর পক্ষ হইতে শরৎচন্দ্র দাদাকে যে সুন্দর অভিভাষণ দিয়াছেন, আমরা তাহা পর-পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—

স্যার শ্রীযুক্ত জলধর সেন

বাহাদুরের করকমলে—

বরেণ্য বন্ধু—

তোমার দীর্ঘ জীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় আমাদের মানস-লোকে তুমি পরমাত্মীয়ের আসন লাভ করিয়াছ।

তোমার অকলঙ্ক চরিত্র, নিষ্কলুষ অন্তর, শুভ্র সদাচার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তোমার স্নেহে, তোমার সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ, আমাদের অকপট মনের ভক্তি-অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর।

বাণীর মন্দির দ্বারে তুমি সকলকে দিয়াছ অবারিত পথ, কনিষ্ঠগণকে দিয়াছ আশা, দুর্ব্বলকে দিয়াছ শক্তি, অখ্যাতকে দিয়াছ খ্যাতি, আত্মপ্রত্যয়হীন, শঙ্কাকুল কত আগন্তুকজনই না সাহিত্য-পূজার বেদী-মূলে তোমার ভরসা ও বিশ্বাসের মন্ত্রে স্বকীয় সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে।

সাহিত্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে তুমি আনন্দ বিতরণ করিতে। সে ব্রত তোমার সফল হইয়াছে। তোমার সৃষ্টি কাহাকেও আহত করে না, তোমার অন্তঃপ্রকৃতির মতোই সে স্বচ্ছন্দ সুন্দর ও অনাড়ম্বর। তোমার দুঃখ বেদনাভরা হৃদয় একান্ত সহজেই জগতের সকল দুঃখকে আপন করিয়াছে, তাই, ব্যথিত যে জন সে তোমারই সৃষ্টির মাঝে আপনার শান্তি ও সান্ত্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে।

হে নিরহঙ্কার বাণীর পূজারী, তুমি আজ বঙ্গের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি—

তোমার স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মেরিয়ান ডেভিস্

জার্নাল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস কলিকাতা।
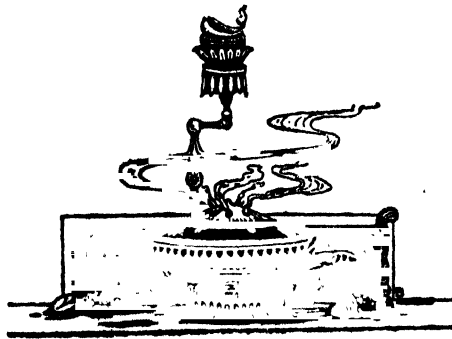
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ | অষ্টম সংখ্যা

ভাইফোঁটা

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নলগড়ার দত্ত-বংশের খ্যাতি বড় কি মিত্র-বংশের খ্যাতি বড় এ লইয়া ক্রমান্বয়ে সাত পুরুষ ধরিয়া এত বাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়া গিয়াছে যে, তাহার উল্লেখ করিয়া পুঁথি ভারী করা নিষ্প্রয়োজন এবং আমাদের আখ্যায়িকার সহিত তাহার সম্বন্ধও অল্প। তবে যাহাদের লইয়া এ গল্পের সুরু তাহাদের কথাই বলিয়া লই। আজও দত্ত বংশ এবং মিত্র-বংশ বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু অর্দ্ধমৃত অবস্থায়। উভয় দেউড়ীতে আর পাইক-বরকন্দাজের ভিড় নাই বরং তাহাদের বসিবার ঘরগুলা ধ্বসিয়া পড়িয়া যেন সে স্মৃতি-টাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

দত্ত-বাড়ীর মধ্যে বাঁচিয়া আছে—মুরারী দত্ত আর তাঁহার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা—পুত্র নবকিশোর। মিত্রদের মধ্যেও সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম'—নিবারণ মিত্র আর একটী মাত্র কন্যা—বনমল্লিকা। উভয়পক্ষেরই স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছে যেন সড় করিয়াই—একই মাসে, এমন কি —একই তারিখে।

পুরাতন বিবাদটা আবার এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া উভয় পরিবারই ঝালাইয়া লইতে এতটুকু ইতস্ততঃ করেন নাই। আজও কেমন করিয়া এবং কি পথে একপক্ষ অপর পক্ষকে অপদস্থ করিতে পারেন, তাহার জন্য চেষ্টার ত্রুটী দেখা যায় না।

কিন্তু তাঁহাদের এই সব সংকল্প-বিকল্পের বেড়াজালে যখন এ উঁহাকে আবদ্ধ করিতে ব্যস্ত, ঠিক্ তাহারই অপর পারে সকলের অন্তরালে বনমল্লিকা ও নবকিশোরের বন্ধুত্ব গভীরতম হইয়া উঠিতেছে। নির্জ্জন বনে করমচা গাছের তলায় বসিয়া বনমল্লিকা কাপড়ের ভিতরে করিয়া নুন আনিয়া এবং নবকিশোর একরাশ করমচা পাড়িয়া সে

নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে ও আপন-মনে বসিয়া দুইজনে দিনের পর দিন যে গল্প লইয়া মাথা ঘামাইতেছে, আর যাহাই হউক, দত্ত-বংশের পৌরুষ এবং মিত্র-বংশের মর্য্যাদা তাহাতে স্থান পায় নাই।

কয়দিন হইতে বনমল্লিকা কি জানি কেন আসে নাই। নবকিশোর বসিয়া বসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিনই চলিয়া যাইবার মুখে ভাবিয়াছে—আর আসিবে না। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়টাকে কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারে নাই—করমচা ঝোপের পাশে আসিয়া বসিয়া দু'-চারিটা করমচা পাড়িয়া নিজের পকেটের আনীত নুনের সহিত খুব জোরে জোরে চিবাইয়াছে। ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে—কেহ নাই বা আসিল—তাহার এমন কি ক্ষতি হইল? এই ত বেশ সে খাইতেছে। কিন্তু সে উৎসাহ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই—আপনাআপনি যেন সব বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছে—সে কোঁচড় হইতে সমস্ত করমচাগুলা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে।

সেদিন পল্লীর এখান ওখানের দু'-একটা বাড়ী হইতে শাঁখ বাজিতেছে। কি জানি কি ভাবিয়া নবকিশোর করমচা ঝোপের ধারে আসিয়া বসিয়াছিল। আজ আর হাতে করমচা নাই; কোথা হইতে একরাশ পেয়ারা আনিয়াছিল, তাহাই চিবাইতে সুরু করিয়াছে। হঠাৎ পিছন হইতে কাহার হাত তাহার চোখে পড়িতেই তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সে ধরা দিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। বলিল—ছাড়্ ভাই চণ্ডী, ভাল লাগে না। সেই কখন থেকে এসে তোর জন্যে বসে আছি।

রাগে বনমল্লিকার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। দুই-দিন সবুর সহে নাই, কোথা হইতে এক চণ্ডীকে যোগাড় করিয়া মিতালী পাতাইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু রাগ না করিয়া যদি সে ভাবিয়া দেখিত—সারাগ্রামখানির মধ্যে চণ্ডী নামধেয় এই অজানা লোকটীর কোন অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাইত না।

বনমল্লিকার শীর্ণ বিশুষ্ক মুখখানির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই কিন্তু নবকিশোরের সমস্ত সংকল্প ভাসিয়া গেল—সে 'খপ্' করিয়া তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তোর কি হয়েছে রে, একেবারে মুখখানা—

—জানি না, যাও। চণ্ডী কোথা, তারই খোঁজ কর গে। আমি—

—দূর পাগলী—চণ্ডী বলে' আছে না কি কেউ এ গ্রামে। তোকে ক্ষ্যাপাচ্ছিলুম, কিন্তু—

এক মুহূর্ত্তে হৃদয়ের সমস্ত গুরুভার নামিয়া গেল। বনমল্লিকা 'ধপ্' করিয়া পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল—সারা পাড়া খুঁজে তবে এখানে এসেছি। ক'দিন জ্বর হয়ে উঠতে পারি নি; আজও ভাত দেয় নি—

বাধা দিয়া নবকিশোর বলিল—তাই ত রে, তবে এলি কেন?—

পাকা গৃহিণীর মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া বনমল্লিকা বলিল—শোন কথা, এলি কেন? বুদ্ধি থাক্‌লে ত বুঝ্‌বে—আজ যে ভাইফোঁটা—তোমার কপালে আমি না দিলে কে ফোঁটা দেবে বলো ত। কাল সারারাত ঠাকুরকে বলেছি—আমার জ্বর যত খুসী দাও, শুধু কালকের সকালটা....এস, সরে এস, এখনও জল পর্য্যন্ত মুখে দিই নি—আগে ফোঁটা দিয়ে—বলিয়া বুকের ভিতর হইতে সযত্নরক্ষিত খানিকটা চুয়া মিশ্রিত চন্দন কড়ে' আঙ্গুলে করিয়া নবকিশোরের কপালে ছোঁয়াইয়া দিল।

ঠিক্ এই সময় দূরে কাহাদের বাড়ী হইতে শঙ্খধ্বনি যেন তাহাদের জন্যই মুহুর্মুহুঃ শোনা যাইতে লাগিল।

কি জানি কেন নবকিশোরের চোখে বাদলের ধারা নামিয়া আসিয়াছিল। বনমল্লিকা সবিস্ময়ে বলিল—এ কি, তুমি কাঁদ্‌ছ! কেন?

একান্ত বিজ্ঞের মত নবকিশোর বলিল—আজকের দিনটাকে তুমি যেমন করে গড়ে তুল্‌লে মল্লিকা, এ কি আমার ভাগ্যে চিরদিন থাক্‌বে?

—থাক্‌বে না? নিশ্চয় থাক্‌বে!

—না না, অত জোর দিয়ে কথাগুলো বলো না। কিন্তু ভেবে দেখো, যখন পরের ঘরে চলে যাবে—

—ইঃ! বড় যেন ভাবনার কথা হ'ল, না? সেটা যে আমার নিজেরই ঘর হবে তখন, তাই ভুলে গেলে।

যাও, সে কথা ভাবতে হবে না তোমায়। মল্লিকা মরলে তখন সে ভাবনা যত পার ভেবো, বুঝেছ? বলিয়া মাথা নোয়াইয়া অতি সহজভাবেই সে 'ঢিপ্' করিয়া একটা প্রণাম করিল।

দুই

দীর্ঘ দশবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বনমল্লিকা না মরিলেও নবকিশোরের কপালে ফোঁটা দেওয়া কিন্তু আর ঘটিয়া উঠে নাই। অবশ্য ইহার জন্য দায়ী নবকিশোর নিজেই। কলিকাতায় থাকিয়া সে কলেজের পড়া লইয়া এতটা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, গ্রামের কথা তাহার মনেই পড়ে নাই। বি-এ পাশ করিয়াও হয় ত মনে পড়িত না—হঠাৎ পিতার মৃত্যুতে বহুদিন পরে তাহাকে গ্রামে ফিরিতে হইল।

পল্লীর আপামরসাধারণ মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিল—বহুদিন পরে আবার একবার বিরাট উৎসবের সূচনা দেখিয়া অযাচিত সৎপরামর্শদানের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষীর দলেরও অভাব দেখা গেল না।

কিন্তু কলেজে-পড়া নবকিশোরের মুখ দেখিয়া কেহই কোন সঠিকভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

নবকিশোর সকলের নিষেধ উপেক্ষা করিয়াই একদিন নিবারণ মিত্রের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিবারণ বাহিরের ঘরে বসিয়া হুকায় টান দিতেছিলেন। বলিলেন—কে ও?

—আমি নবকিশোর, বলিয়া নবকিশোর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—তা' আমার কাছে কেন?

—আজ বাবা ত আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন —এ সময় আপনি না দাঁড়ালে আমার—

কথাগুলা ত দত্ত-বংশের মত নয়—বাঙ্গের মত নিবারণ মিত্রের প্রাণে গিয়া বাজিল। তিনি তিক্তকণ্ঠে বলিলেন—কিন্তু আমি গিয়ে কি করব? তা' ছাড়া, মিত্র-বংশের কোন পুরুষে কেউ কখন দত্ত-বাড়ীর দেউড়ীতে পা গলায় নি, আমিও গলাতে পারব না।

পল্লীগ্রামের তুচ্ছ সঙ্কীর্ণতা নবকিশোরের বুকে করুণারই উদ্রেক করিল। সে অনেক মিনতি করিল, কিন্তু নিবারণ তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। বরং এমন কতকগুলা কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত মুখের প্রসন্নতা বজায় রাখিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আসা নবকিশোরের পক্ষেও দুর্ঘট হইয়া উঠিল।

অন্যমনস্ক না হইলে নবকিশোর দোতলার জানালাটা যে 'ধপ্' করিয়া বন্ধ হইয়া আবার খুলিয়া গেল, সেদিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত—এমন একজনের উৎসুক-দৃষ্টি উন্মুখ হইয়া চাহিয়া আছে, যাহার কথা স্মরণ হইলে তাহার মুখের প্রসন্নতা কোন কিছুরই আঘাতে আর মুহূর্ত্তের জন্যও মলিন হইয়া যাইবে না।

তাহার এই দুরপনেয় লজ্জার কথাটা মিত্রপক্ষের মাথা হেঁট করিল। শত্রুপক্ষের হাসির খোরাক বৃদ্ধি করিল এবং বৃদ্ধ নিবারণ মিত্রের বহিঃপ্রাঙ্গণে ঘন ঘন লোক যাতায়াত এবং হাসি ঠাট্টারও প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতে লাগিল।

শ্রাদ্ধ কোনরকমে চুকিয়া গেল। কিন্তু নিজেকে এই গ্রামের মধ্যে আবদ্ধ রাখার কল্পনাও নবকিশোরের অসাধ্য হইয়া উঠিল। একদিন সে যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল, তেমনই আচম্বিতে আবার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মনের কোন গভীর তলে একখানি পরিচিত মুখ—যাহাকে একটা মাস ধরিয়া প্রতিনিয়ত শুধু ক্ষণেকের দেখার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল—কিন্তু তাহাকে দেখিতে না পাইয়া নিষ্ফল বেদনাতেই ফিরিতে হইল। শুধু এইটুকু সে শুনিল, মল্লিকা এখানেই আছে এবং খুব বড় কুলীনের ঘরে তাহার বিবাহ দিয়া জামাতার কুলমর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য নিবারণবাবু তাহাকে ঘরে আনিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইত্যাদি।

কলিকাতার কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে নবকিশোর গ্রামের কথা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। হঠাৎ কাহার নিকট হইতে আবার দেশের ডাকঘরের ছাপ লইয়া একখানি চিঠি আসিয়া নবকিশোরকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া লইতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। সে উত্তর লিখিতে বসিল—আপনি কে

আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমি জানি না। যেই হোন্, দূর হইতে আমার অন্তরের সহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। নিবারণ মিত্র-মহাশয় আমার সমস্ত বিষয় ফাঁকী দিয়া দখল করিয়া লইতেছেন এবং এখন না গেলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার গহ্বর হইতে কোন কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হইবে না বলিয়া যে আশঙ্কা করিয়া এতটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন, এজন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। কিন্তু আপনি যতটা আশঙ্কা করিতেছেন, ততটা বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; কারণ, সেখানে বনমল্লিকা আছে। আমি জানি—যাহা আমার পক্ষে ক্ষতিকর, কোনদিন, কোন কিছুরই বিনিময়ে সে তাহা গ্রহণ করিবে না। আর যদি করেই, তাহার বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি আমার নাই। ইত্যাদি।

নবকিশোরের বুকের মধ্য হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। সে তখনই নিজের হাতে গিয়া চিঠিখানি পোষ্ট করিয়া আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

তিন

আরও দীর্ঘ দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মানুষের জীবনে কত পরিবর্ত্তন আনিয়াছে কে জানে। নবকিশোর আর সে নবকিশোর নাই। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার নবকিশোরবাবু। আজ সে শুধু জমিদারীর মালিক নয়—কয়খানি বড় বড় কয়লার খনিরও মালিক।

প্রভাত হইতেই আজ তাহার কাছারী-বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। নিশ্চিন্তপুর মহালের তহশিলদার ভবকালী হাজার টাকার তহবিল তছরূপ করিয়াছে—তাহারই বিচার করিতে হইবে।

নবকিশোর সকালেই আজ কাছারীতে বসিয়াছিল। অপরাধীকে কাছে ডাকিয়া বলিল—এ টাকা তুমি নিয়েছ? ঠিক্ করে বলো, মিথ্যে বলো না।

অপরাধী ঘাড় নাড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিল।

নবকিশোর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—কেন নিলে?

অপরাধীর চোখে জল ভরিয়া উঠিল। সে গাঢ়কণ্ঠে বলিল—হুজুর মা-বাপ, মিথ্যা বল্ব না, অভাবে পড়েই—আট্‌টি মেয়ে—বহুকষ্টে দু'টির বিয়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু এবারকার দু'টির না দিতে পারলে যখন জাত যায়, তখন ...তাহার কণ্ঠ দিয়া আর ভাষা সরিল না।

নবকিশোরের গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল—তোমার দেশ কোথায়, সেখানে জায়গা-জমি—

—আজ্ঞে, কিছুই নেই—থাক্‌লে কি আর ঘর-জামাই হয়ে কেউ শ্বশুর-বাড়ী পড়ে থাকে। আমি আগে বুঝ্‌তে পারি নি—আমার বিয়ে করা উচিত হয় নি। ভাবলুম, নলগড়ার জমিজমা অনেক—

—কোথায় বল্‌লে?

—আজ্ঞে, নলগড়ার নিবারণ মিত্র-মশায় আমায় শ্বশুর ছিলেন। তিনিও গেলেন, বিষয়-আসয় কোথা দিয়ে কেমন করে উবে গেল বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। স্ত্রীকে কত বল্‌লুম, পাড়ার লোক নালিশ করতে পরামর্শ দিলে কিন্তু সে শুন্‌লে না। আর শুনতই বা কোথা থেকে, টাকা না থাক্‌লে ত আর আদালতে যাওয়া যায় না।

নবকিশোরের কাণে যেন এ সব কোন কথাই প্রবেশ করিতেছিল না। ভবকালীর মূর্ত্তিটা অস্পষ্ট হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে বনমল্লিকার মুখখানিই বারবার ভাসিয়া উঠিতেছিল। সেই বনমল্লিকা—যাহার শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র আনন আজও তাহার শয়নে স্বপনে সম্বল হইয়া আছে। নিজের বিপুল বিত্ত, অতুল বৈভবের দিকে নজর পড়িতেই যেন তাহাকে বৃশ্চিক দংশন করিল। তাহার মুখে অন্ন উঠিতেছে—আর তাহারই বনমল্লিকা আজ আটটি কন্যা লইয়া বিব্রত, বিত্রস্ত, ক্লান্ত। কণ্ঠে যতটা গাম্ভীর্য্য আনা যায় তাহার অধিক গাম্ভীর্য্য আনিয়া নবকিশোর বলিল—তোমার স্ত্রী এ কথা জানেন?

ভবকালী বলিল—আগে জানতেন না, কিন্তু এখন শুনেছেন।

—তিনি কি বল্‌লেন?

—বেশী কিছু নয়। বল্‌লেন—পাপের শাস্তি ভোগ না করার বাড়া অপরাধ নেই—এ দণ্ড আগে থেকে পেয়ে বরং ভালই হ'ল। দুঃখ করো না তুমি।

মনে মনে বনমল্লিকাকে অভিসম্পাত দিল, কি আশীর্ব্বাদ করিল, নবকিশোরের মুখ দেখিয়া তাহা বুঝা গেল না। সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—তোমাকে প্রথমবার বলে আমি ক্ষমা

কর্‌লাম—যতদিনে পার এ টাকা শোধ করে দেবে, বুঝেছ?

আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভবকালী কি বলিতে যাইতেছিল, নবকিশোর বাধা দিয়া কাছারী-গৃহ হইতে অকস্মাৎ উঠিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল সত্য, কিন্তু নবকিশোরের মনে হইতে লাগিল—নির্বান্ধব নিরুদ্ধ ঘরের ভিতর সে যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে—এ মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করা অসম্ভব। সহসা দূরে কাহাদের বাড়ী হইতে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। আজ না ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া!

যখন নবকিশোরের মোটর নিশ্চিন্তপুরে উপস্থিত হইল, তখন মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়। ভবকালীর বাড়ীর দ্বারে আসিয়া সে ডাকিল—বাড়ীতে কে আছেন?

দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরিয়া না শুনিলেও এ কণ্ঠস্বর মল্লিকাকে ঠকাইতে পারিল না। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া চির-পরিচিত-কণ্ঠে ডাকিল—এস। কমললতা তোর মামা এসেছেন, প্রণাম করে ঘরে আসন পেতে দে।

একটী দশ-এগার বৎসরের কিশোরী আসিয়া একবার নবকিশোরের মুখের পানে চাহিয়াই 'ঢিপ্‌' করিয়া মাথাটা তাহার পায়ে ঠুকিল, তারপর চক্ষের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই অদৃশ্য হইয়া গেল।

নবকিশোর হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। মনে পড়িল—করমচা তলার কথা। সেদিন ঠিক্ এমনই একটি মেয়ে তাহার পায়ের উপর মাথা ঠুকিয়া বিজয়িনীর মত দাঁড়াইয়াছিল। আজ যেন সেই পরাজিতার লজ্জায় ছুটিয়া পলাইয়া বাঁচিল। নবকিশোর হাসিতে চাহিয়া বলিল—হঠাৎ মনে হ'ল আজ ভাইফোঁটা। তাই তোমার কাছে ছুটে এলুম। সেদিনের কথা মনে আছে মল্লিকা, সেদিন তুমি উপোস করে এসেছিলে, আজ আমিও উপোস করে এসেছি···

বনমল্লিকা হাসিল, উত্তর দিল না। উত্তর দিল কমললতা। বলিল—মা এখনও খান নি মামাবাবু। এই আমাদের বল্‌ছিলেন—আপনি আস্‌বেন, ওঁর মন বলেছে—আজ নিশ্চয়ই আসবেন। নইলে অন্য বছর আপনার নাম করে দেওয়ালে ফোঁটা দিয়ে তবে জল খান।

বনমল্লিকা ধমক দিল—কমল!

কমল আর কথা কহিল না। নবকিশোরের চক্ষে আজও বাদলধারা। কণ্ঠে ভাষা সরিল না। সে ঘাড় হেঁট করিয়া ঘরে আসিয়া আসনে বসিয়া পড়িল।

বনমল্লিকা চুয়া-চন্দন লইয়া আসিয়া দাদার বিরাট কপালে ছোঁয়াইতেই ঘরের ভিতর হইতে দুষ্ট কমল জোরে জোরে শাঁখ বাজাইতে সুরু করিল।

বনমল্লিকা অত্যন্ত সঙ্কোচে নিজের আঁচল হইতে কি কতকগুলা বাহির করিতে করিতে বলিল—তুমি ঠিক্‌ই বলেছিলে নব-দা', বনমল্লিকাকে দিয়ে তোমার কোন অনিষ্ট হ'তে পারে না। তোমার সম্পত্তিগুলো ফিরিয়ে দিতে পারলুম না সত্য, কিন্তু যতটা পেরেছি ন্যায্যমূল্যে বেচে টাকাগুলো সংগ্রহ করেছিলুম। হয় ত এর অনেক আগেই এগুলো আমার ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এমনই একটা দিনের লোভ আমাকে এতটা পেয়ে বসেছিল যে—

বনমল্লিকা আর কথা কহিতে পারিল না। নবকিশোর অর্থহীন-দৃষ্টিতে বনমল্লিকার প্রসারিত হস্তের উপরকার হাজার হাজার টাকার নোটগুলির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর নিজেকে অমিতবলে সংযত করিয়া লইয়া ধীরকণ্ঠে বলিল—এগুলোকে ফিরিয়ে দেবার কথা মুখে এনে তোমাকে অপমান করব না। কেন না, সংসারের নিত্য অভাব-অভিযোগ, স্বামীর নির্দ্ধারিত জেল যে মনকে এতটুকু নড়াতে পারে নি—তোমার সে মনকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। কিন্তু আমার যার ওপর জোর আছে—আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবই। ভবকালীকে বলে দিয়েছি, গাড়ী নিয়ে সে এল বলে। নিজের বোন্ থাক্‌তে বুড়ো বয়সে আমি বামুন-চাকরের হাতে মরতে পারব না—না, কোন মতেই নয়। বলিতে বলিতে নবকিশোর বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল। বনমল্লিকা বাধা দিবে কি, তাহার চোখের জল কমললতাকে পর্য্যন্ত হতভম্ব করিয়া দিল।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
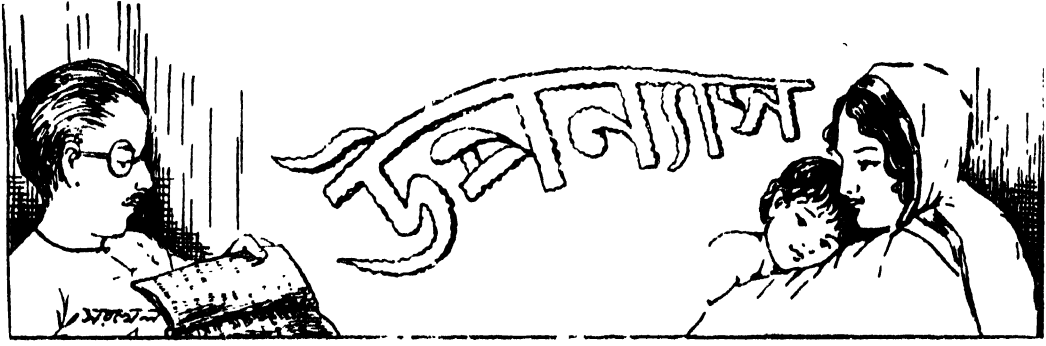
অভিশপ্তা

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

—তরী! ও তরী! ওরে তরী! শুনিস্ না কেন রে?

প্রবীণ গৃহস্বামীর সুগভীর উচ্চ কণ্ঠস্বর পুরাণো বাড়ীখানার ফাঁকা ঘরের মধ্যে গম্ গম্ করে উঠ্‌ল, কিন্তু সে আহ্বানে সাড়া দিল না কেউ।

দত্ত-মহাশয় মুখ বিকৃত করে বিরক্তিভরে বলে উঠ্‌লেন—কি আশ্চর্য্য! বাড়ীতে 'টুঁ' শব্দটী পর্য্যন্ত নেই—মরেছে নাকি সব? রেখা! ও রেখা!

—জ্যাঠা-মশায় ডাক্‌ছেন?

একটী মেয়ে ত্বরিত পদে এসে জিজ্ঞাসা করলে। মেয়েটীর বয়স সতেরো কি আঠারো হবে। রংটা খুব ফরসা। ঈষৎ পাণ্ডুবাভ দেখায় যেন। একহারা ছিপ্‌ছিপে গড়ন। একটু লম্বাটে। এবং মুখখানি ক্লিষ্ট ভাবাপন্ন হলেও বেশ একটু সুকুমার পেলব শ্রী আছে। তার শান্ত অচঞ্চল আয়ত চোখ দু'টীতে কেমন একটা ক্লান্ত উদাসভাব, তরুণীসুলভ চপলতা তা'তে নেই বল্‌লেই হয়।

চূণ বালিখসা মান্ধাতার আমলে তৈরী সে ঘরখানা; পশ্চিমের বড় জানালাটা বন্ধ থাকায় প্রায় অন্ধকার। বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত গৃহস্বামীর অবস্থাও তথৈবচ।

তরুণীর আগমনে সেখানকার আবহাওয়া যেন ফিরে গেল। কর্ত্তার সাম্‌নে এসে সে আবার বল্‌লে—আমাকে ডাক্‌ছেন নাকি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডেকে ডেকে তো গলা কাঠ হয়ে গেল? তরীটা গেল কোথায়? পাড়া বেড়াতে বুঝি?

—কি জানি, বাজারে গেছে হয় তো। কি করতে হবে বলুন।

—কি আর করবে? একটু তামাক সেজে দেবে বলে ডাকাডাকি কর্‌ছি সেই থেকে।

—শুন্‌তে পাই নি।

হুঁকো থেকে কলিকাটা তুলে নিয়ে রেখা সিঁড়ি বেয়ে তর্‌তর্ করে নীচে নেমে গেল—এবং ফিরে এলো মিনিট কতক বাদেই। দত্ত-মশায় সাজা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বাড়ীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—চারটে বাজে, চা-টা আজ হবে না নাকি?

—হ্যাঁ, নিয়ে আস্‌ছি এখনি। আমি মনে করেছিলুম, আপনি ঘুমুচ্ছেন, তাই—

—হুঁঃ! আমাকে খালি ঘুমুতেই তো দেখ তোমরা।

উনানে গরম জল ফুট্‌ছিল, চা তৈরী করতে দেরী হ'ল না। তাড়াতাড়ি এক কাপ্ চা আর খানিকটা গরম হালুয়া এনে কর্ত্তার সাম্‌নে রেখে দিয়ে রেখা পশ্চিমের জানালাটা খুলে দিলে। ঘরের অন্ধকার ভাবটা তা'তে কেটে গেল।

হালুয়ার ডিসের দিকে অপ্রসন্ন-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দত্ত-মশায় বল্‌লেন—এ আবার কি?

—আজ একটু হালুয়া করেছিলুম—তাই।

—কেন? চায়ের সঙ্গে দু'টী গরম মুড়ি হলেই তো যথেষ্ট, তা' বুঝি মুখে রোচে না সব?

চোখ দুটো নীচু করে রেখা কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লে—রোজ তো তাই হয়। আজ ওঁর ভাত খাওয়া হয় নি বলেই মনে করলুম—

—কে? মিহির আজ ভাত খায় নি বুঝি?

—না, কখন খাবেন? বেলা দশটা না হতেই সেই যে বেরিয়ে গেলেন, বল্লুম—ভাত হ'ল বলে। তা' কে শোনে!

—ওই তো ওর দোষ! সময়ে দু'টী খেয়ে নেবে—তা' নয়। খাওয়ার ফুরসৎ হয় না, এমন কি কাজ বে বাপু! সে ভাতগুলো ফেলে দিলে নাকি?

—না, ফেল্‌ব কেন? চাপা দেওয়া রয়েছে।

—বেশ, এ বেলা চাল দু'টী কম নিয়ো তা'হ'লে। মিছে কতকগুলো ফেলা-ছড়া করা আমি ভালবাসি না বাপু।

হালুয়াটুকু শেষ করে, চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই দত্ত মশায় মুখ বাঁকিয়ে বলে উঠ্‌লেন—এঃ! এ কি চা হয়েছে, না সরবৎ?

—চিনি বেশী হয়েছে বুঝি? তা' হ'লে দিন, ওতে আর একটু চা ঢেলে আনি।

রেখা অপ্রতিভ হ'য়ে চায়ের কাপ্‌টা নিতে এলো।

—থাক্ থাক্! এক তো গোচ্ছার চিনি নষ্ট করেছ, আবার চা! এত অপচয়ও করতে পারো তোমরা? বাস্তবিক—

দত্ত-মশায় চা-টুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে তামাক টান্‌তে লাগ্‌লেন।

শূন্য কাপ্ আর ডিস্‌খানা একপাশে সরিয়ে রেখে রেখাও ঘরের বাইরে গিয়ে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

এ রকম বকুনী, খিটিমিটি নিত্যই। এ সব এখন গা-সওয়া হ'য়ে গেছে তার—তবু সময় সময় মনের কোন গোপন ক্ষতে ঘা লেগে যায়—একটুতেই—কে জানে কেন?

নিঃশব্দে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে রেখা আস্তে আস্তে সিঁড়ির কাছের খোলা ছাদ্‌টায় দাঁড়াল এসে।

শরৎকাল। কিন্তু আকাশটা আজ পরিষ্কার নেই। খণ্ড খণ্ড মেঘ কালো, ধূসর, স্বর্ণাভ, নানাবর্ণের—পাল তোলা তরণীর মত আকাশময় ভেসে বেড়াচ্ছে ইচ্ছামত, মৃদু মন্থরগতিতে।

উতলা পূবের হাওয়ায় বাগানের দীর্ঘ উন্নতশীর্ষ নারিকেল ও সুপারী গাছের পাতাগুলো থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌ছিল শির শির করে। মাঠের পথে রাখাল বালকের বাঁশীতে বাজ্‌ছে পুরবীর উদাস সুর। সে সুরের রেশ রেখার বুকের তলেও গুম্‌রে ওঠে যেন!

ছাদের উঁচু আলসার পরে শ্রান্ত দেহখানা এলিয়ে দিয়ে মেঘ-মেদুর দিগন্তের পানে চেয়ে রইল সে উদাস দৃষ্টিতে। চেয়ে চেয়ে কত কথাই মনে পড়ছিল তার, দূর অতীতের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো—যা' এ জীবনে ফিরবে না আর, তারই ব্যথা-জাগানো স্মৃতি।

শৈশবে মাতৃহীনা রেখা ছিল তার পিতার একমাত্র আদরের সন্তান, স্নেহের দুলালী। আর্থিক অবস্থা তাঁর বেশ স্বচ্ছল না হলেও কন্যার সুখ-সুবিধা ও সুশিক্ষার দিক্ থেকে এতটুকু কার্পণ্য করেন নি তিনি—রেখার বিবাহের জন্যও বেগ পেতে হয় নি তাঁকে। কারণ, তাঁর প্রতিবেশী ও অন্তরঙ্গ বন্ধুপুত্র অসীমের সঙ্গে রেখার সম্বন্ধ পাকা-পাকি করাই ছিল, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হবার বহু পূর্ব্বে।

বর কন্যার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে সম্বন্ধ তাদের অকপট স্নেহ-প্রীতি ও অনুরাগের সংস্পর্শে আরো মধুরতর হ'য়ে উঠেছিল। অসীম বিলাত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরলেই শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন করা হবে—সমস্তই ঠিক্।

অসীমের বিলাত-যাত্রার পর, বছর না যেতেই তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু তা'তেও এ সম্বন্ধ ভেঙে যায় নি—অসীমের জননী বাগদত্তা পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে তুল্‌তে বিশেষ ব্যগ্র ও উৎসুক হ'য়ে দিন গণছিলেন।

কিন্তু সমস্তই ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল—মিহিরের আকস্মিক আবির্ভাবে। রেখার পিতা আশুবাবুর সঙ্গে দত্ত-মশায়ের পরিচয় ছিল অনেক দিনের, বন্ধুত্বও ছিল কিঞ্চিৎ। মিহিরের কনিষ্ঠ শিশির কোলকাতায় পড়ে। 'মেসে' থাকে, বাড়ী যায় প্রত্যেক শনিবারে—তথাপি সন্দিগ্ধ-প্রকৃতি দত্ত-মশায়ের উপরোধে পড়ে ছেলেটীর

হেফাজতের ভার নিতে হয়েছিল আশুবাবুকে। মিহিরের সঙ্গে আলাপ তাঁর সেই সূত্রে।

মিহির মিষ্টভাষী, সদালাপী যুবক। বিধাতা তাকে স্বাস্থ্য ও রূপ সম্পদ দিয়েছিলেন—মুক্ত হস্তে। অমন সুশ্রী সুপুরুষ বাঙালীর ঘরে কথনো ক্বচিৎ দেখা যায়। সুতরাং, কেবল আশুবাবুর সঙ্গেই নয়, রেখার সহিতও পরিচয় ঘনিষ্ট করে তুল্‌লে সে অনায়াসে।

তারপর কুমারী রেখার অনবদ্য তরুণ চিত্ত জয় করতে মিহিরের দেরী হ'ল না।

রেখার এ অভাবিত পরিবর্ত্তন তার পিতাকে মর্ম্মাহত করেছিল; যেহেতু অসীমকে তিনি যথার্থই স্নেহ করতেন। কিন্তু সন্তানকে অসুখী করা তাঁর মত অপত্যবৎসল পিতার পক্ষে সম্ভবপর নয়; কাযেই, আশুবাবুকেও মত পরিবর্ত্তন করতে হ'ল—নিতান্ত অনিচ্ছায়। প্রবাসী অসীমকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত রেখার মনোগত ইচ্ছা জানিয়ে যখন মিহিরের সঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা কর্‌ছিলেন, সেই সময় তাঁর শেষের ডাক্ এসে পড়্‌ল—এত শীঘ্র, এমন অকস্মাৎ যে, আর কিছু করবার বা ভাব্‌বার অবকাশও হ'য়ে উঠল না। আত্মীয়-স্বজনহীন আদরিণী দুহিতাকে মিহিরের হাতে হাতে সমর্পণ করে, তাকে দত্ত-মশায়ের অভিভাবকত্বে রেখে আশুবাবু চিরবিদায় গ্রহণ করলেন।

দত্ত-মশায় একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁর ক্ষেতের মাটীতে সোণা ফলে। তা' ছাড়া, চড়া সুদে মহাজনী করেও চঞ্চলা কমলাকে তিনি গৃহকোণে অছিদ্র লৌহ কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। গ্রামের মধ্যে ধনী বলে তাঁর যেমন একটা খ্যাতি ছিল, আবার কৃপণ বলে অখ্যাতিও ছিল তেমনি। এমন কি, সকালবেলা সহজে কেউ দত্ত-মশায়ের নাম করত না। দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলে দুষ্ট লোকে গোবিন্দ নাম স্মরণ করত।

মিহির ও শিশির তাঁর পরিণত বয়সের সন্তান। মিহিরের পড়াশোনায় তেমন মন ছিল না, সেজন্য বুদ্ধিমান দত্ত-মশায় তাঁর কষ্টার্জ্জিত অর্থের বৃথা অপব্যয় না করে ছেলেটীকে জমিদারীর কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ক্ষেত-খামার দেখা, খাজনা-পত্র আদায় করা, লেন-দেনের হিসাব-নিকাশ সমস্তই করে মিহির—এক কথায়, মিহির তার পিতার দক্ষিণ হস্ত।

রেখাকে পুত্রবধূ করতে দত্ত-মশায়ের প্রথমটা একটু আপত্তি ছিল। আপত্তির হেতু, রেখার শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রকৃতি অনুরূপ স্বাস্থ্যও বেশ ভাল নয়। তার ওপর পল্লী-গৃহস্থের ঘরে ওরকম বিবি বউ ঠিক মানায় না, পোষায়ও না। কিন্তু পুত্রের আগ্রহ এবং রেখার নামে ব্যাঙ্কের খাতায় সঞ্চ-পরিমাণ দেখে বৃদ্ধের সে আপত্তিটুকু খণ্ডন হয়ে গেল।

আশুবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর কোলকাতার বাসা তুলে দিয়ে দত্ত-মশায় রেখাকে সানন্দ চিত্তে নিয়ে এলেন তাঁর পল্লী-আবাসে। বিবাহ স্থগিত রাখ্‌তে হ'ল তখনকার মত; কারণ, একেতো মহাগুরু নিপাতের বছর শুভকর্ম্ম নিষিদ্ধ, তারপর রেখার স্বাস্থ্য যেন ভেঙে পড়ছিল দিন দিন। সেটা বিয়োগ-শোকে, কি পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর জল-বায়ুর দোষে, অথবা দত্ত-মশায়ের গৃহিণীশূন্য সংসারে যত্ন করবার লোকাভাবে, তা' ঠিক্ বলা যায় না। তবে রেখা ভাবী শ্বশুর-গৃহে অল্পদিন বাস করেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল—কিন্তু এ ভুল যে শোধরাবার নয় এ জীবনে!

রেখা যে হীরা ফেলে কাচের টুক্‌রো আঁচলে বেঁধেছে, সুধাভ্রমে গরল পান করেছে—নিতান্ত অজ্ঞ অবোধের মত!

রমণী-মনোহর সুন্দর কান্তি ও মধুর চাটুবাক্য মুগ্ধ হ'য়ে সে যাকে জীবনের চিরসাথীরূপে বরণ করেছে, তার হৃদয় বলে কোন জিনিস নেই।

পুষ্প-বিলাসী ভ্রমরের মত ফুলে ফুলে মধুপান করাই ছিল তার জীবনের আনন্দ—এর কাছে অসীম যে স্বর্গের দেবতা!

রেখাকে মিহির হয়তো বাস্তবিক ভালবাসে নি—শুধু মোহবশে…সেই মোহকেই ভালবাসা মনে করে নির্ব্বোধ রেখা…হায়, এমন সাংঘাতিক ভুলও হয় মানুষের! ভুলটা তার ভাঙল এমন অসময়ে—যখন প্রতিকারের আর কোন উপায়ই নেই।

এখন সেই ক্ষণিকের ভুলের জন্য তা'কে জীবনভোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—নীরবে, নির্ব্বিবাদে—যাতনায় বুক ফেটে গেলেও 'পারি না' বলতে পাবে না সে—এ কি দুর্ভোগ!

দুই

নীচে রান্নাঘরের দিকে শব্দ হ'ল, বাসনের ঝন্‌ঝনানি। সঙ্গে সঙ্গে তরলা বা তরী এবং মিহিরের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর।

মিহির তরীকে বকছে বুঝি? বকুনীটা রাগের না সোহাগের, তা' বোঝা যায় না। তরীও চাপাগলায় ফিস্‌-ফিস্‌ করে কি যেন বল্‌ছিল।

এই তরীকে রাখা হয়েছে রেখার জন্য। রেখা আস-বার আগে এ বাড়ীতে দিনরাত থাকার লোক ছিল না। পাড়ার একজন বয়স্থা ব্রাহ্মণ-কন্যা দু'টীবেলা রান্না করে যেত; তা' ছাড়া, বাসনমাজা, জলতোলা, গরু-বাছুরের কন্না, এ সব কাজ করিয়ে নেওয়া হ'ত ক্ষেত-খামারের লোকের দ্বারায়।

তরীর বয়স বেশী নয়। দেখ্‌তেও শ্যামবর্ণের, তার ওপর বেশ একটু শ্রীছাঁদ আছে। সে সধবা কি বিধবা, তা' হঠাৎ বোঝ্‌বার যো নেই। পেড়ে কাপড় পরে, মাছ খায়, চুলের গোছা গুছিয়ে বেঁধে পান-দোক্তা মুখে দিয়ে ফিট্‌ফাট্‌ থাকে ওরি মধ্যে যতখানি সম্ভব—কেবল সিঁদুরটা পরে না। যাই হোক্‌, মেয়েটার শরীরে আলস্য নেই এতটুকু। সে ভূতের মত খাটে। তারপর বিশ্বাসী; অর্থাৎ, চোর-ছ্যাচড়্‌ নয়।

তরী শান্ত নিরীহ প্রকৃতি রেখাকে বেশ যত্ন করে, ভালবাসে এবং সমীহ করে চলে। তবে মিহিরের প্রতি তার ব্যবহার······সেজন্য তরীকে দোষী করা যায় না - সে ছোট জাতের মেয়ে, নিরক্ষর, অতটা ধর্ম্মজ্ঞান বা চরিত্র-বল তার যদি না-ই থাকে। কিন্তু মিহির, শিক্ষিত ভদ্র সন্তান হ'য়ে তার এমন হীনপ্রবৃত্তি, ছিঃ!

মনের বিরাগ-ব্যথা মনে চেপে রেখা আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে লাগ্‌ল। মিহিরের বকুনী থেমে গেছে, সে তখন গান ধরেছে—"বাঁ—ধনা তরীখানি আ—মার এ নদীকূলে—"

রেখার আগমন জানতে পেরে তরী বল্‌লে—আঃ! কি করো? দিদিমণি আসছে যে! বলেই সে সশব্যস্তে দাওয়া থেকে রান্নাঘরে ঢুকে পড়্‌ল।

—আসুক না দিদিমণি! দিদিমণি তো খড়দার মা গোঁসাই নয় যে, তাকে এত—

রেখাকে দেখ্‌তে পেয়ে মিহির কথার সুর ফিরিয়ে ঝাঁজের সহিত বলে উঠ্‌ল—বাস্তবিক, তরীর আজকাল ভারি আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে রেখা, জানলে। সেই কোন্‌ সকালে বলেছিলুম আমার নতুন জুতো জোড়াটায় পালিশ দিয়ে রাখ্‌তে—তা' আর হ'ল না! এমন ঢিট্‌ হয়েছে যে, একটা কথা শোনে যদি!

রেখার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না। তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বালা কর্‌ছিল যেন।

তরী ধোওয়া বাসনগুলো জলচৌকীর ওপর গুছিয়ে রাখছিল। মিহিরের অনুযোগ শুনে ও রেখাকে নির্ব্বাক দেখে ভেতর থেকেই বল্‌লে—হ্যাঁ গা দিদিমণি, তুমিই বলো না, আমার কি একটা কাজ? বাসনমাজা, জলতোলা, ঘর ধোওয়া, কাপড় কাচা, বাজার করা—কত বল্‌ব? ছিষ্টি সংসারের কন্না, আবার কর্ত্তার তামাক সাজা দণ্ডে দণ্ডে—তার ওপর এ সব বাবুয়ানী ফরমাস্‌—কখন কি করি বল তো?

—ইস্‌! কি রকম চোপা করতে লেগেছে দেখলে রেখা? তুমিও তো কিছু বলবে না ওকে। কাজেই—আমি রাগি কি আর সাধে?

ওপর থেকে কর্ত্তার ডাক শোনা গেল—তরী! ও তরী!

—ওই দেখো! খালি তরী—আর তরী! আবাগী তরীর কি মরবার ফুরসৎ আছে গা?

তরী চলে গেলে পর এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে রেখা রান্নাঘরে গিয়ে নিবে-আসা উনুনে আঁচ ধরাতে বস্‌ল। মিহির তার গম্ভীর মুখপানে আড়ে আড়ে তাকিয়ে যেন নিজের মনেই বলে চল্‌ল এ বাড়ীতে

আর কোনো কিছুর গোছ আছে যদি—মাইরী! শান্তিপুরে ধুতিখানা আমার একটু 'গিলে' করে রাখ্‌তে বলছি ক'দিন ধরে তা' গ্রাহ্যই নেই! যেমন গিন্নি, তেমনি ঝি, সব সমান হয়েছে একধার থেকে!

গিন্নি!

কথাটা রেখার কাণে শোনালো একটা নির্ম্মম উপহাসের মত। হায়, এ সংসারে সে এসেছিল গৃহিণীর অধিকার নিয়েই কত সাধে!—

এতদিন অনভ্যস্ত জীবন-যাত্রার শত শত কষ্ট, শত অসুবিধা তুচ্ছ করে, অশান্ত অন্তরের ব্যথা-বেদনা অন্তরেই চেপে রেখে কর্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করে এসেছে সে সাধ্যমত তার—কিন্তু গৃহিণীর সম্মান তো দূরের কথা, অধিকারও-বাস্তবিক কি পেয়েছে সে?—না! এ শুধু পরিহাস, শুধু ফাঁকি! এ সংসারে রেখার স্থান তরীর এতটুকু উর্দ্ধে নয়।

—কি গো, অমন গোম্‌ড়া মুখ করে...বোবা হ'য়ে গেলে নাকি? সারাদিন পরে ঘরে এলুম তা' একটা মুখের কথাও কি বল্‌তে নেই ছাই? বাবা রে, বাবা! আমি বাইরে বাইরে ঘুরি কি আর সাধে? বাবার কাছে গেলেই—খালি তাঁর হিসেব-নিকেশের কথা, আর গিন্নি যিনি,—তিনি হয় গোম্‌ড়া মুখ নামিয়ে বসে থাকবেন, নয় তো দাড়ীওয়ালা পাদরী সাহেবের মত 'সার্‌মন্‌' ঝাড়তে আরম্ভ করবেন! মাইরী! বাড়ীতে এমন লোক পাই না—যার সঙ্গে মন খুলে দুটো কথা বলে বাঁচি।

রেখা জলন্ত উনুনে গরম জলের কেট্‌লীটা চাপিয়ে মিহিরের দিকে ফিরে বল্‌লে—কথা বল্‌বার লোক না থাকতে পারে, কিন্তু রসিকতা করবার লোকের অভাব হয় না তো?

—ও! তরীর কথা বলছ তুমি? তা' কি আর করি বলো? আমার স্বভাবটাই যে এম্‌নি! মেয়েমানুষের সঙ্গে ভারিক্কি চালে কথা বলা আমার কুষ্টিতেই লেখে নি! আর বুড়ী-সুড়ী হলেও বা—

—তাই বলে বাড়ীর ঝিয়ের সঙ্গে ও রকম করা—এটা কি ভদ্রলোকের কাজ?

—আরে, তা'তে আর হয়েছে কি? ঝিও তো একজন মেয়েমানুষ—এই তোমারি মত? রাগ করো না রেখা. আমি স্পষ্ট কথাই বলি। আচ্ছা, তোমাতে আর তরীতে তফাৎটা কি বল তো? ও না হয় একটু কালোকোলো, তুমি না হয় ফরসা আছ, ও মুখ্যু চাষার মেয়ে, আর তুমি লেখাপড়া শিখে একটুখানি 'ইয়ে' হয়েছ—মানে, 'রিফাইন্‌' করা আর কি? কিন্তু জিনিসটা তো একই? কি বলো গো? হা হা—হা হা!

রেখার উত্তেজনা-রক্ত উত্যক্ত মুখের পানে তাকিয়ে মিহির সকৌতুকে হাস্‌তে লাগ্‌ল নির্লজ্জের মত।

রেখা মুখখানা তার দিক্‌ থেকে সবেগে ফিরিয়ে নিয়ে দাঁতে ঠোঁট্‌ চেপে দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে। হায় রে, এত বিড়ম্বনা, এত লাঞ্ছনাও অদৃষ্টে ছিল তা'র!

—রাগ হ'য়ে গেল? আরে ছিঃ! একটু ঠাট্টাও বোঝো না ছাই? হাত বাড়িয়ে রেখার একখানা হাত 'খপ্‌' করে ধরে ফেলে মিহির হাসিমুখে মিষ্টিসুরে বল্‌লে—না, রাগ করো না লক্ষ্মী আমার! আমি কি আর সত্যি সতি—

ত্রস্তে হাতখানা টেনে নিয়ে রেখা কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে—থাক্‌! ঢের হয়েছে!

—বেশ! তা' হ'লে এক কাপ চা-ও আজ কপালে জুট্‌ল না দেখ্‌ছি—সারাদিনটাই তো এম্‌নি গেল।

—সে কি আমার দোষ? বাড়া ভাত এখনো চাপা দেওয়া রয়েছে, গরম করে নিলে—

—নাঃ, এই অবেলায় আর ভাত খায় না। তবে চা-টা যদি পার দিতে—

মিহির চৌকাঠের ওপর বসেছিল, রেখা পিঁড়িখানা এগিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চা করে দিলে। চায়ের সঙ্গে হালুয়া। চা পান করতে করতে রেখার দিকে মিটিমিটি তাকিয়ে মিহির মৃদু হেসে বল্‌লে—রাগটা পড়েছে তো? বাঁচলুম! রাগারাগি আমার মোটেই ভাল লাগে না—মাইরী! আমি চাই ফূর্ত্তি! যত দিন আছ, ফূর্ত্তি করো—মানুষের জীবন ক'দিনেরি বা? তুমি চা খাও নি?

রেখা ঘাড় নেড়ে জানালে—না।

—তা' হ'লে তোমার চা-ও ঢেলে নাও না, বেশ এক-সঙ্গে খাওয়া যাক্—যেমন সেই কোলকেতায় থাকতে—তখন তুমি বেশ ছিলে রেখা! সত্যি, এখন যেন দিনের দিন কেমনতর হ'য়ে যাচ্ছ!

—সে তো তোমারি দয়ায়!—

কথাটা বল্‌তে গিয়ে রেখা চেপে গেল। মিহির জিজ্ঞাসা করলে—কই, তোমার চা রাখো নি বুঝি?

—না, আমি তো এ বেলা চা খাই না।

—কেন?

—সহ্য হয় না।

—তবে হালুয়া খাও একটু।

মিহির চামচে করে হালুয়া তুল্‌লে। রেখা বাধা দিয়ে বল্‌লে—তুমি খাও। আমার এখন একটুও খিদে নেই, অনেক বেলায় ভাত খেয়েছি।

—কেন আমার জন্যে বসেছিলে বুঝি? আঃ, তবে তো ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে আমার! কি করি, দেরী হ'য়ে গেল একটা কাজে।

খাওয়া শেষ হ'লে মিহির বল্‌লে—আমার জন্যে এ বেলা আর খাবার করো না—বুঝ্‌লে? আগে থাক্‌তে বলে রাখলুম।

—কোথাও নেমন্তন্ন আছে নাকি?

—বা রে! কেমন করে জান্‌লে? নেমন্তন্নই তো!

—কোথায়, কা'দের বাড়ী?

মিহির মুখ টিপে হেসে বল্‌লে—হুঁ হুঁ! তা' বল্‌ব কেন?

—না বল্‌লেও আমি জানি—আমি বুঝে গেছি—

—মাইরী! আচ্ছা, কি বুঝেছ বলো দেখি? আমি এ বেলা কোথায় যাব?

—খিদিরপুরে, বীথির—

—এই যে! এদের কাছে কিছুই লুকোবার যো নেই—আশ্চর্য্য! হাস্‌তে হাস্‌তে রেখার কাছে এগিয়ে গিয়ে মিহির চুপিচুপি বল্‌লে—হিংসে হচ্ছে? কিন্তু সত্যি বলছি—আমি বীথির বাবার উপরোধে পড়েই যাচ্ছি, নইলে—

—যে জন্যেই যাও না, তা'তে আমার কি? আমার দায় পড়ে নি তো হিংসে করতে—

—তা' হ'লে তুমি নিজেই বলছ যেতে? অ্যাঁ?

—আমি বল্‌লেও যাবে, না বল্‌লেও যাবে—তা' জানি। তবে যাবার আগে জ্যাঠা-মশায়কে বলে যেও—নইলে উনি অস্থির হ'য়ে পড়েন।

—ওই তো মুস্কিল! আচ্ছা, বাবাকে তুমিই বলে দিয়ো না, লক্ষ্মীটী! বলো, কোনো বন্ধুর বাড়ীতে—

রেখার দিকে চোখের একটা ইসারা করে মিহির হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল।

—একটু আগুন দেও তো দিদিমণি।

তরী কলিকায় আগুন তুলে ফুঁ দিতে দিতে রেখার বিমর্ষ মুখের পানে তাকিয়ে বল্‌লে—দাদাবাবু কাপড় ছাড়তে গেলেন,—আবার কোথায় বেরোবেন বুঝি?

—হুঁ। রেখা সংক্ষেপে উত্তর দিলে।

—কোথায় যাবেন?

—যেখানে খুসী!

এরপর আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে তরীর সাহস হ'ল না। সে যেতে যেতে আত্মগতভাবেই বল্‌লে—মেঘ মেঘ করছে—এ বেলা না বেরোলেই হ'ত। কিন্তু মানা করলেও শুনবে না তো?

রেখা গালে হাত দিয়ে কতক্ষণ বসে রইল বিমূঢ়ের মত। তারপর রান্নাঘরের দোর দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে মিহিরের ঘরের জানলায় উঁকি মেরে দেখ্‌লে মিহির নেই; সদ্যছাড়া কাপড়খানা তার মেঝেয় পড়ে রয়েছে।

কাপড়খানা গুছিয়ে আল্‌নায় তুলে সে বেরিয়ে এলো খোলা ছাদটায়।

শরৎ সায়াহ্নের শেষ দীপ্তিটুকু নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আকাশে মেঘের স্তর জমাট বেঁধে উঠ্‌ছিল। অকাল সন্ধ্যার ধূমল ছায়া ঝাপসা হ'য়ে আসে ক্রমশঃ। বাতাসের জোরও বাড়ছে। রাত্রে একটা দুর্য্যোগ হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

মিহিরকে একবার বল্‌লে হ'ত—বেশী রাত না করে—কিন্তু কি হ'ত বলে? এ যে বীথির ডাক্!

একটা উচ্ছ্বসিত উষ্ণশ্বাস রেখার বুক কাঁপিয়ে বাদ্‌লার উতলা বাতাসে মিশে গেল।

—দিদিমণি, কর্ত্তাবাবু বল্‌লেন—রান্না-খাওয়া সকাল সকাল সেরে নিতে। রাত্তিরে ঝড়-বৃষ্টি হয় যদি। দাদাবাবু তো এ বেলাও খাবেন না শুন্‌লুম। তাঁর কোথায় নেমন্তন্ন আছে নাকি?

রেখা যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব থেকে জেগে বল্‌লে—চলো, যাচ্ছি। এ বেলা আর রান্নাই বা কি? জ্যাঠা-মশায়ের জন্যে খানকতক লুচি ভেজে নিলেই হয়ে যাবে। ভাত-তরকারী যা' আছে তা'তে তোমার হবে না?

—তা' যেন হ'ল, কিন্তু তুমি?

—আমার ক্ষিদে নেই মোটে।

—হ্যাঁঃ, তোমার ওই এক কথা বাপু! রোজই ক্ষিদে হয় না! এ দিকে শরীর যে দিন দিন পাত হ'য়ে যাচ্ছে—সে রং নেই, সে চেহারাও নেই আর!

বাড়ীর ঝি হলেও তরীর এই আন্তরিকতাটুকু রেখার অন্তর স্পর্শ করলে। এ তো একজন নিস্পর, কিন্তু আপন বল্‌তেই বা এখানে কে আছে তার? দরদের দরদী, মরমের মরমী কেউ নেই, কেউ নেই তার! নিতান্ত একা, একান্ত অসহায় সে!

চল্‌বে

পূর্ণশশী দেবী

আধুনিক জীবন-ধারা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক

আচ্ছা তবে শোনো। যার কথা বল্‌ছি সে ছিল চার ছেলের বাবা। বড় ছেলের বয়স ২৪; মেজ ছেলের বয়স ২৩; সেজ ছেলের বয়স ২২, আর চতুর্থ ছেলের বয়স ২১। বাপ গতপত্নীক, একজন কুঠিওয়ালা মহাজন, খুব ধনী।

তিন ছেলে বি-এ পাশ করেছে (আধুনিক জীবনে যা কোনো কাজে লাগে না)।

তিনি একদিন সকলকে ডেকে বল্‌লেন :—"এখন তোমরা কি কাজ পছন্দ ক'রে নেবে ঠিক করো। তোমরা কী হ'তে চাও ?"

জ্যেষ্ঠপুত্র "ম্যানুয়েল" উত্তর করলে—"বাবা আমি ওকালতি করব।"

বাবা বল্‌লেন—"বেশ কথা। তুমি উকীলই হবে।"

মেজ ছেলে "আন্তনিয়ো" উত্তর দিলে—"আমি ডাক্তার হতে চাই।"

আচ্ছা, তুমি ডাক্তারই হবে—আমার তা'তে কোন আপত্তি নেই।"

সেজ "জোসে" বল্‌লে—"আমি বাবা তোমার মতো সওদাগর ও কুঠিওয়ালা হ'তে চাই—আর্ শীঘ্র টাকা রোজগার করতে চাই।"

"আচ্ছা তুমি যা চাও, সে-বিষয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করব।"

কনিষ্ঠ ছেলে, "ডিমাস্" অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শেষে নম্রভাবে বল্‌লে—"বাবা, আমি দস্যু হতে চাই।"

এই কথায় একটা হুলস্থূল কাণ্ড হ'ল। বাবা চৌকী থেকে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠ্‌লেন, আর একটু হ'লেই তার মাথাটা ছাদে গিয়ে ঠেক্‌ত। তা'র ভাইরা তা'কে বল্‌লে, তুই ভবঘুরে ভিক্ষুক, আল্‌সে, ঠক্-জুয়াচ্চোর, বদ-ছেলে, বদ্‌ভাই, আর ভবিষ্যতের বদ্ নাগরিক। এমন-কি এই কথা শু'নে বাড়ীর ভৃত্যেরা, প্রতিবাসীরাও লজ্জিত হ'ল। কিন্তু ছেলেটা ক্রমাগত বলতে লাগ্‌ল—"আমি দস্যু হবো, আমি দস্যু হবোই, আর যদি তোমরা আমাকে দস্যু হ'তে না দ্যাও, তা হ'লে আমি বাড়ী থেকে চ'লে যাবো।"

তা'র বাপ বাড়ী থেকে তা'কে দূর ক'রে দিলেন, অভিসম্পাত করলেন; ব্যাপারটা একটা পারিবারিক নাটকে পরিণত হ'ল।

সেই রাত্রেই ডিমাস্ বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি বেঁধে, বাড়ীর সব চেয়ে পুরাতন ভৃত্যকে বল্‌লে :—(এ ভৃত্য এই বিষয়ে কিছুই জানত না—মনে করলে, তা'র মনিবের আত্মীয়-স্বজনকে দেখ্‌তে ক্যাষ্টিল বা অণ্ডালুসিয়ায় বুঝি যাচ্ছে)

—"ভাখ্ রামন, আমি বাবাকে বিরক্ত করতে চাই নে—আমি একটা মুস্কিলে পড়েছি। আমাকে ৪০০ টাকা ধার দিতে পারিস, আমি আগামী হপ্তায় শোধ ক'রে দোবো।"

রামন্ কিছু টাকা জমিয়েছিল; সে ৪০০ টাকা গু'নে ডিমাসের হাতে দিলে।

ঐ টাকা শোধ্‌বার মৎলব ডিমাসের মোটেই ছিল না। সে বল্‌লে—"বেশ ভালো! ধার ত সে ধারই; এখন আরম্ভ করবার মতন আমার একটা রেস্তো হ'ল।"

দুই

তা'র পর ২৫ বৎসর কেটে গেছে। সময়টা খুব দীর্ঘ; সেই বদ্ ছোক্‌রার কোনো খোঁজ-খবর নেই···

এখন বাপের বয়স ৭০এর উপর; ক্রমেই খুব বুড়িয়ে যাচ্ছেন, খুব দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছেন। ঐ সময়ের ভিতর, কতকগুলো কপাল-ঠোকা বাজির খেলায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে ..ব্যাঙ্ক ফেল্ হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর টাকা ও বাজার-সম্ভ্রমও লোপ পেয়েছে। যে তিনজন বন্ধুকে তিনি টাকা ধার দিয়েছিলেন, তা'রা গা-ঢাকা দিয়েছে...এক সময়ে যার নিজের গাড়ী-ঘোড়া, বাগান-বাড়ী ছিল, সেই ব্যক্তি কিনা এখন খাঁটি লোকের মতো অল্পে-অল্পে ধার শোধ করে, কষ্টানিলায় ১২ টাকায় ছুটো ছোটো কাম্‌রা ভাড়া ক'রে বাস করছে বেচারী।

ছেলেদের ভাগ্যেও শনির দশা।

উকীল ম্যানুয়েল সমস্ত ২৫ বৎসরের ভিতর ছুটো

ব্রীফ পেয়েছিল। দুটো মোকদ্দমাতেই হার হয়েছে, যদিও লোকে বল্‌ত, ওর মক্কেলদেরই ন্যায্য দাবী ছিল; কিন্তু এদিকে প্রতিপক্ষের মুরুব্বির জোর ছিল। প্রতি-পক্ষের উকীলের সহিত মন্ত্রী,ডেপুটি, সেনেটারদের আলাপ-পরিচয় থাকায় পলকের মধ্যে দুই মাম্‌লাই জিতে ফেল্‌লে।

ডাক্তার আন্তনিয়োর অবস্থাও তথৈবচ। ডাক্তারি আরম্ভ কর্‌বার পরেই, তার হাতের দুই-তিনটা রোগী মারা গেল; তারা এমনেও মরা, অমনেও মরা, কেন না তাদের কপালে মৃত্যুই লেখা ছিল। তা-ছাড়া এমন অসাধ্য রোগ আছে যে, কেহই আরাম কর্‌তে পারে না। যে ডাক্তাররা তা'র হিংসা কর্‌ত, তারা খুব খুসী হ'ল। তারা বল্‌তে লাগ্‌ল—"ও একজন খুনী—চিকিৎসার কিছুই জান্‌ত না, ওর বাপ ছিল জুয়াচোর, ধূর্ত্ত বণিক্—এমন লোককে কেউ কখনো চিকিৎসার জন্য ডাকে?" সে আর রোগী পেতো না। শেষে হতাশ হ'য়ে মাদ্রিদে ফিরে এল।

"জোসে" যে তার বাপের মতো সওদাগর হ'তে চেয়ে-ছিল, সে পঁচিশ বৎসর ধ'রে কেবল টাকার শ্রাদ্ধ, সময়ের শ্রাদ্ধ ও স্বাস্থ্যের শ্রাদ্ধ কর্‌লে। তা'র পর দেউলে হ'য়ে গেল।

"হবেই ত! 'বাপ কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া!' এর কাছ থেকে তুমি কি প্রত্যাশা কর্‌তে পারো?"

তিন ভাই, রোগশয্যাশায়ী বেচারী বাপকে ঘিরে ব'সে থাক্‌ত। ডাক্তার নেই—ঔষধ নেই—কেবল তা'র ছেলে আন্তনিয়ো তা'র চিকিৎসা কর্‌চে—এমন-সব ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লি'খে দিচ্চে—যা অতিশয় দুর্মূল্য। সেই ছোটো ঘরটিতে ব'সে তিন ভাই অনেক সময় বলাবলি কর্‌ত—"ডিমাসের না-জানি কি হয়েছে?"

বাপ বল্‌লেন—"নিশ্চয়ই জেলখানায় আছে।"

ম্যানুয়েল বল্‌লেন—"নিশ্চয়ই মারা গেছে।"

—"ভগবানই জানেন।"

"ভেবে দেখ, ২৫ বৎসরের মধ্যে একখানা পত্রও লিখ্‌লে না।"

"অতি ব্যাদ্‌ড়া ছেলে!"

"হতভাগা ছেলে!"

"বদ্ ভাই!"

বাপ বল্‌লেন—"তোমরা তা'র জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো—হতভাগ্য ছেলেটার উপর ঈশ্বর যেন একটু দয়া করেন।"

তিন

একদিন অপরাহ্ণে (সে-দিন রবিবার ছিল, সমস্ত পরিবার একত্র হয়েছে) একজন ভৃত্য একটা "কার্ড" নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল। বল্‌লেন—"মশায়, একজন সহিস্ এইটে এনেছে, আর দরজায় গাড়ী অপেক্ষা কর্‌ছে।"

ম্যানুয়েল কার্ড্‌টা নিয়ে পড়্‌লে;—

"সাহাগুনের মার্কিস্।"

খুব একটা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। একজন মার্কিস্! তারা সবাই চেয়ারগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌ল; রোগীর শয্যা গুছিয়ে রাখ্‌লে; গলার "টাই" ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে নিলে, বাপের শয্যার পাশে ব'সে তারা তাস খেল্‌ছিল সেই তাসগুলো লুকিয়ে ফেল্‌লেন।

গরীবের ঘরে একজন মার্কিস! না জানি কে তিনি? বৃদ্ধ বল্‌লেন—"সাহাগুনের মার্কিস"...সাহাগুন গ্রাম ত আমার জন্মস্থান—ও-রকম উপাধির লোক ত সেখানে কেউ নেই। ভৃত্য বল্‌লে:—"এই ভদ্র-লোকটি"......

ঘরের ভিতর একটি লোক প্রবেশ কর্‌লে, তা'র বয়স ৪৫।৪৬ হবে, ফিটফাট পরিচ্ছদ; তা'র বোতাম-ছিদ্রে বিশেষ সম্মানসূচক একটা লাল ফিতে আট্‌কানো রয়েছে। আর রুমালে খুব দামী পুষ্পনির্য্যাসের সুগন্ধ ভুরভুর কর্‌ছে। একবাক্যে সকলেই ব'লে উঠ্‌ল—"এ যে ডিমাস!"

হাঁ, এই সেই ডিমাস্ই বটে। তা'র সাদাটে দাড়ি ও তা'র পাক-ধরা চুল সত্ত্বেও তা'রা ওকে সহজেই চিন্‌তে পার্‌লে...ডিমাস্ আস্তে-আস্তে শয্যার দিকে এগিয়ে এল, তা'র পর নতজানু হ'য়ে বল্‌লে—বাবা বাইবেলের "উড়নচণ্ডী ছেলে" ছিন্ন বস্ত্রে, দরিদ্রের অবস্থায় বাড়ী ফিরেছিল। সে সেকালের কথা। আমি ফি'রে আস্‌ছি ধন-কুবের হ'য়ে, শক্তিমান্ হ'য়ে। আমাকে কি তুমি ক্ষমা করবে, ধন ও ধনীলোকের চারিদিকে এমন একটা হাওয়ার ঘের থাকে—যা নির্ব্বোধদিগকে আকর্ষণ করে, মন্ত্রমুগ্ধ করে। সমস্ত পরিবার মুহূর্ত্তের

মধ্যেই দেখ্‌তে পেলে ডিমাসের ফি'রে আসাটা সকলের পক্ষেই শুভজনক। তা'র আগেকার সমস্ত অপরাধ, তা'র সম্বন্ধে সমস্ত কুৎসা তা'রা ভু'লে গেল। বাবা বল্‌লেন—"বৎস! এখন ঘরের ছেলে, ঘরে এস!"

ম্যানুয়েল, আন্তনিয়ে, জোসে, তা'র গলা জড়িয়ে ধ'রে চুম্বন করলে, ডিমাস সেই ঘরটিতে যেন একটা দেবতা হ'য়ে পড়্‌ল।

কতই আনন্দ-উচ্ছ্বাস, কতই জিজ্ঞাসাবাদ, কতই উল্লাস,—কি শুভ মুহূর্ত্ত!

স্নেহ-বাৎসল্য প্রকাশ ক'রে তা'র পর বাপ বল্‌লেন :—

"এখন বল দিকি, বৎস, কি ক'রে তুমি এত উচ্চ পদে উঠ্‌লে?"

ডিমাস্ দরজার কাছে স'রে এসে, দরজাটা চাবি দিয়ে বন্ধ ক'রে দিলে – তা'র পর যখন দেখ্‌লে, নিজের পরিবার-ছাড়া আর কেউ নেই—তখন তার জীবন-কাহিনী বল্‌তে আরম্ভ করলে। প্রথমেই বল্‌লে,—

"চুরি-ডাকাতি, বাবা!"

চার

ভয়ত্রস্ত হ'য়ে বৃদ্ধ বিছানার উপর উ'ঠে বস্‌ল।

"ভীত হোয়ো না বাবা, আমি 'খারাপ-কিছু' করি নি।

"আমি মান ও ঐশ্বর্য্যের বোঝাই নিয়ে ফি'রে আস্‌ছি; এখন আমি সকলের সম্মানের পাত্র; যাকে বলে আধুনিক জীবনযাপন করা আমি সেই আধুনিক জীবনযাপন করেছি।

"এই শোনো—

"আমি রামনের কাছ থেকে ৪০০ টাকা ধার নিয়ে বেরিয়েছিলেম···ভালো কথা, রামন এখন কি করছে?···"

"সে এখন খুবই বুড়ো হ'য়ে পড়েছে; সে ছিল একজন পুরোনো সৈনিক তাই তা'কে একটা সৈনিক-আশ্রমে পাঠাতে পারা গেল।"

"আজই অপরাহ্নে তা'কে আমি হাজার-দুই টাকা দেবো।" এই টাকার সংখ্যা শু'নে সমস্ত পরিবারের মাথায় যেন একটা শিশির-বিন্দু ঝ'রে পড়্‌ল। "আর তোমার জন্য ম্যানুয়েল, আমি বিশ হাজার টাকা রেখেছি। আর আন্তনিয়ো, জোসে তোমাদের প্রত্যেকের জন্যও অত টাকা রেখেছি। আর বাবা তোমার জন্য কাস্তেলানায় একটা বাড়ী কিনেছি। সেইখানে আমরা সকলেই একত্র থাক্‌ব। তুমি সেখানে রাজার মতো রাজত্ব করবে।"

তা'রা এখন আর তা'র কথা শুন্‌ছিল না, কেবল একজন দেবতার মতো তা'র মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

"তা'র পর রামনের কাছ থেকে সেই ৪০০ টাকা নিয়ে আর-একজন বন্ধুর কাছ থেকে হাজার টাকা ধার ক'রে আমি অ্যামেরিকার যুক্তরাজ্যে যাত্রা করলেম—সেখানে টাকা যথেষ্ট, কিন্তু নীতির ঘরটা একেবারেই ফাঁকা।

"যতদিন না একটা নিজের কাজ ফেঁদে বস্‌তে পেরেছিলেম (এখনকার দিনে কাজ মানে, লোকের টাকা অপহরণ করা)—আমি একজন বড় জাহাজ-মালিকের ঘরে কাজ পেয়েছিলেম—লোকটা খুব ধনী। শেষে আমি তার স্ত্রীকে হরণ করলেম।" বাবা ব'লে উঠ্‌লেন—

"কি সর্ব্বনাশ!"

"একটা অনিবার্য্য মত্ততা বাবা! য়ুরোপ, আমেরিকা পৃথিবীর দুই অর্দ্ধমণ্ডলের সাহিত্যিকেরাই এই জিনিসটাকে প্রণয়-নাট্য বলে। সকলেই আমার পক্ষে ছিল। সে স্ত্রীলোকটি তরুণী ও জীবন-স্ফূর্ত্তিতে ভরা। তা'র স্বামী বুড়ো ও রুগ্ন; সে তা'র স্ত্রীর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করত। খবরের কাগজে আমার ফোটো ছাপা হ'ল; স্ত্রীলোকটিরও ফোটো বেরোলো—আর স্বামীর আত্ম-হত্যার একটা ছবি ছাপা হ'ল। আমি দেশের একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস-নায়ক হ'য়ে পড়্‌লেম,—আমার প্রণয়িনীর সঙ্গে ক্যালিফর্নিয়ায় যাত্রা করলেম। তা'র কাছ থেকে আমি এক লক্ষ টাকা পেয়েছিলেম—সে-দেশে টাকাতেই মান-সম্ভ্রম। আমি সেখানে একটা কাজ ফেঁদে বস্‌লেম। এমন-একটা সোনার খনি যাতে সোনা ছিল না—এমন কি কস্মিনকালেও সোনার অস্তিত্বমাত্র ছিল না।"

"কিন্তু এ তো ডাহা জুয়াচুরি!"

"কিন্তু ওরকম ত প্রতিদিনই করা হয়; সমস্ত পৃথিবীময় এমন-সব বিবিধ লোক আছে, যারা বাজারে "শেয়ার" বেরোবামাত্র কি'নে নেয়। তা'র পর সেই কাজটা 'দেউলে' হ'য়ে পড়ে······তা'র পর একজন নগণ্য লোককে কাজের মাথায় বসানো হয়—তা'রই উপর সমস্ত দায়িত্ব। আমি শুধু বেতনভোগী ম্যানেজার হ'য়ে থাকি। তা'র পর যখন সর্ব্বনাশের চূড়ান্ত উপস্থিত

হয় তখন সেই লোকটাই গেরেফ্‌তার হয়—আর আমি ব'লে উঠি—"ঐ চোর!" আঃ! ম্যানুয়েল তুমি হাস্‌ছ অ্যাঁ? তুমি যখন ওকালতি কর্‌তে, তখন এ-রকম ঘটনা নিশ্চয়ই অনেক দে'খে থাক্‌বে; দেখ নি কি? এমন-কি দশ হাজার টাকা দিলে তুমি নিশ্চয়ই আমার পক্ষসমর্থন কর্‌তে।

"সেই স্পেকুলেশানে আমি যে টাকা রেখেছিলেম (আজকাল এইসব জিনিসকে আমরা স্পেকুলেশান বলি, পুরাকালে এর অর্থ অন্য রকম ছিল।) সেই টাকা নিয়ে আমি প্যারিসে গেলাম। আমি তখন খুব ধনী লোক। সেখানে খুব জম্‌কিয়ে বস্‌লুম। আমি ফরাসী 'সিটিজেন' (নাগরিক) হ'য়ে পড়্‌লেম।"

বাবা বিছানার উপর উঠে ব'সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন—"ফরাসী!" "আমার ছেলে ফরাসী! কখনই না। অসম্ভব।" "কিন্তু বাবা, তুমি কি জান না, এই সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে-রকম সুবিধা জনক আইন আছে, এমন আর কোথাও নেই। যে-ব্যক্তি অন্য দেশের অধিবাসী-দল-ভুক্ত হ'য়ে, নিজের জাত হারিয়ে, দেশে আবার ফিরে আসে; আর ফিরে এসে জিলার সিবিল-রেজিষ্ট্রারের কাছে আবার জাতে উঠ্‌বার ইচ্ছে প্রকাশ করে;—সে তখনই আবার জাতে উঠতে পারে। আমি তাই করেছি, এখন আমি পূর্ব্বের মতনই স্পেনীয়; কিন্তু ইতিমধ্যে ফরাসীদের সঙ্গে কার্‌বার ক'রে অনেক অথ উপার্জ্জন করেছি।" ম্যানুয়েল বল্লে—"খুব চালাক!" আর সকলে বল্‌লে—"খুব আশ্চর্য্য!"

"প্যারিস-নগরটা ধন ও ধনীলোকদের দাস। একবার আমি সেই প্যারিসে গিয়ে অসংখ্য ব্যবসায়-কোম্পানী খুল্‌লেম—সবগুলোই অন্যের পক্ষে খারাপ, কিন্তু আমার পক্ষে ভালো; ফরাসীরা শিশুর মতো; তা'রা টোপ টা দিব্যি সহজে গিলে ফেল্‌লে। মনে ক'রে দ্যাখো 'পানামা'-সম্বন্ধে "ধাতব দ্রব্যের কোম্পানী"-সম্বন্ধে "ট্রান্‌স্‌ভাল স্বর্ণখানি"-সম্বন্ধে কি ঘটেছিল—সবগুলিই প্রকৃত "ঘোড়ার ডিম!"...প্যারিসে পসার কর্‌তে হ'লে অর্থবল ও মান-সম্ভ্রমের খুবই দরকার, প্রজাতন্ত্রী দেশ হ'লেও লোকেরা আভিজাত্যের জন্য উন্মত্ত। তাই প্রথম বৎসরেই রোমে গিয়ে একটা "সাহাগুনের মার্কিস" এই উপাধি খরিদ কর্‌লেম। বন্ধু ও স্তাবক সংগ্রহ কর্‌তে হ'লে লোকদের প্রচুর ডিনার খাওয়াতে হয়—এ হচ্চে আধুনিক পদ্ধতি। এইরকম ক'রে আমি বাজার দখল ক'রে বস্‌লেম। একজন নিঃস্ব উদ্ভাবককে পয়সা দিয়ে তার কাছ থেকে তার উদ্‌ভাবনার মৎলবটা শুনে নিলেম। সেই মৎলবটা চুরী ক'রে তার থেকে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন কর্‌লেম।"

"ছি ছি বৎস! এ কী কাণ্ড!"

"কিন্তু তুমি কি জানো না, বাবা, যে-ব্যক্তি কোনো একটা জিনিষ তৈরী করে, উদ্‌ভাবন করে বা সৃষ্টি করে সে তা'র থেকে কোনো লাভ পায় না, গ্রন্থ-প্রকাশক গ্রন্থ-কারকে, রঙ্গশালার পরিচালক অভিনেতাদের, ধনী মহাজন উদ্‌ভাবকদের শোষণ করে। আমি মহাজন, সমস্ত জগৎ আমার পদানত! সকল নারীরাই আমাকে পূজো কর্‌ত; যে খুব একগুঁয়ে, তাকেও আমি জয় করেছিলাম। অর্থ জলের মত আমার কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল...'সম্মান-ভূষণ', 'ক্রস', 'উপাধি' পৃথিবীর সব দেশ থেকেই আমি পেতে লাগ্‌লেম, তা-ছাড়া এসব কিন্‌তেও পারা যায়। এক-কথায়, এই দেখ আমি এখানে—আমার বয়স ৪৬ বৎসর মাত্র, আমাকে সবাই "ধনী মহাজন" ব'লে, 'অর্থ-সচিব' ব'লে 'বিশ্বপ্রেমিক' ব'লে সম্মান কর্‌ছে, কেন না আমি গরীবদের হাজার-হাজার টাকা দান কর্‌ছি, আর এখানে হাসপাতাল, ইস্কুল, লোকের যা-কিছু দরকার, সবই স্থাপন কর্‌তে যাচ্ছি...দেখ বাবা, কাল আমাদের বড় বাড়ীতে উঠে' যেতে হবে; সমস্ত নীচের তলাটা তোমার জন্যে থাক্‌ল, আর এদের জন্য, এদের পরিবারের জন্য প্রথম তলাটা থাকবে—প্রত্যেকেই ব্যাঙ্ক থেকে ৩০।৪০ হাজার টাকা পাবে; আর আমি এখন রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিনিধি হবার চেষ্টা কর্‌ব, সেনেটার হবার চেষ্টা কর্‌ব, মন্ত্রী হবার চেষ্টা কর্‌ব...আমিই আইন প্রস্তুত কর্‌ব!"

তা'র পর সকলের মধ্যে একটা হাসির হর্‌রা উঠ্‌ল। আকাশ থেকে যেন হঠাৎ তাদের মাথার উপর স্বর্ণ-বৃষ্টি হয়েছে, এই মনে ক'রে তারা সবাই মেতে উঠেছিল। পক্ষাঘাতে অর্দ্ধশরীর-পঙ্গু বাপ শয্যা থেকে লাফিয়ে পড়্‌ল। ম্যানুয়েল বাড়ীর সবাইকে খবর দিতে ছু'টে গেল, আন্তনিয়ো গান গায়িতে লাগ্‌ল, জোসে মনে-মনে মাদ্রিদে একটা ভাণ্ডার স্থাপনের মৎলব আঁট্‌তে লাগ্‌ল। ডিমাস সকলকে সুখী দে'খে আনন্দে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

যাবার সময় একটি গরীব ছেলে, বক্‌শিস্‌ পাবার আশায়, তাঁর গাড়ীর দরজা খু'লে দরজাটা ধ'রে ছিল। তিনি তাকে বল্‌লেন—"কাজ করো বাপু, কাজ করো। আমি শিশুকাল থেকে কাজ ক'রে আস্‌ছি।"

তখন সমস্ত পরিবারবর্গ ব'লে উঠ্‌ল "চালাক বটে! বরাবরই ক্ষমতা দেখিয়ে এসেছে।"

"ক্ষমতা ব'লে ক্ষমতা, অসাধারণ ক্ষমতা!"*

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—

'প্রবাসী', পঁচিশ-শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৩২

* (স্পেনীয় লেখক, Eusebio Blasco হইতে)

খেয়ালী

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

সেবার পূজার ছুটিতে চেঞ্জে গিয়ে দেওঘরে রেবাদের পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল। রেবার পিতা বৃদ্ধবয়সে বিপত্নীক হ'য়ে একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। রেবাদের অবস্থা বেশ ভালই। কিন্তু অবস্থা ভাল হ'লে কি হবে? ভগবান মানুষকে সব দিক্ দিয়ে সুখী করতে চান না; তাই এই ক্ষুদ্র পরিবারটীর সব থাকৃতেও কি যেন নেই। রেবার পিতা অতি অমায়িক ও উদার প্রকৃতির লোক। রেবার সঙ্গে আমার অবাধে মেলামেশা, গল্পগুজব, গান-বাজনা প্রভৃতি তিনি অপছন্দ করতেন না; বরং রেবা যাতে খুশী থাকে, সর্ব্বদাই সে চেষ্টা করতেন।

কোল্‌কাতায় ফিরে এসেও রেবাদের বাড়ী প্রত্যহ বিকেলে একবার করে আমাকে যেতেই হ'ত—খানিকটা রেবার পিতার অনুরোধে, আর বাকীটা রেবার সাহচর্য্যের লোভ সামলাতে না পেরে। কিন্তু মেয়েদের (বিশেষ করে বড়লোকের) স্বাভাবিক একটা বিশ্বাস থাকে যে, পুরুষ সঙ্গীদের সঙ্গে তারা যা' কিছু ভাল ব্যবহার করে, সেটা যেন তাদের একটা মস্তবড় অনুকম্পার নিদর্শন—পুরুষ-সঙ্গী যেন তাদের সামান্য অনুকম্পার নিঃস্ব ভিখারী। ইদানীং রেবার দু'-একদিনের ব্যবহারে যখন এই অতি সাধারণ মেয়ের ব্যবহারের পরশ পেলাম, তখন নিজের আত্মমর্য্যাদায় একটা আঘাত লাগ্‌ল। মনে হ'তে লাগ্‌ল, রেবাদের বাড়ী যাওয়া ও তার সঙ্গে চা খেয়ে বেড়াতে যেন আমার উপরে রেবার একটা দাবীর আদেশ—আর আমি যেন শত অসুবিধা সত্ত্বেও প্রত্যহ নিজেকে নিয়ে গিয়ে তার কাছে উপস্থিত করতে বাধ্য। রেবাকে ভাল লাগত, কিন্তু তাই বলে তার খেয়ালের পুতুল হওয়ায় ছিল আমার আপত্তি। অথচ, কি জানি কেন রেবার সাহচর্য্য আমাকে জীবনে একটা নতুন পথ-সন্ধানের ইসারা করত। কখনও হ'ত ভয়—কখনও পেতাম তৃপ্তি। রেবার কাছে বশ্যতা স্বীকার করার কথায় মনের মধ্যে খচ্‌খচ্ করে' বাধত। কিন্তু অনেক যুক্তি-তর্কের উদার আলো সত্ত্বেও আমার মনের এই খচ্‌খচানি দূর করতে পারতাম না। দিনগুলো হুহু শব্দে কেটে যাচ্ছিল। রেবা যেন আমাকে অনুকম্পাভরে আরও কাছে টেনে নিচ্ছিল—না পারতাম গ্রহণ করতে—না পারতাম প্রত্যাখ্যান করতে।

ঠিক্ এরূপ অবস্থায় ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত সুনীতির দেখা পেলাম বহুদিন পরে। সুনীতিকে পেয়ে যেন আমার সঙ্গীহারা প্রাণটা একেবারে নেচে উঠ্‌ল—যেন অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে তীরের পরশ পাওয়া গেল। উঃ সুনীতিকে তখন নতুন করে' নতুন রূপে আমার কি ভালই লেগেছিল! রেবাকে ভালবাসতাম প্রচুর—কিন্তু তা' বলে সুনীতিও আমার কম প্রিয় ছিল না। সুনীতির সাহচর্য্যের ভিতর দিয়ে রেবার আত্মম্ভরিতাকে কশাঘাত করবার কল্পনা মুহূর্ত্তমধ্যে আমার মনের মধ্যে প্রকট হ'য়ে উঠল। তারপর দু'দিন আর রেবাদের বাড়ী যাই নি। হ্যাঁ—ইচ্ছে করেই, নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করেই রেবার সঙ্গে দেখা করি নি। কারণ, আমার মনে হ'ত ব্যথা দিয়েই রেবার মনকে ভেঙে গড়তে হবে—ব্যথার বিষে যতদিন সে জর্জ্জরিত না হ'য়ে নিজের ভুল

বুঝতে পারে, ততদিন সাহচর্য্যে কোনই মাধুর্য্য নেই—আছে একটা বিরাট আত্মজ্বালা—একটা নৈরাশ্যের হাহাকার। প্রাণের পুঞ্জীভূত আশা-নৈরাশ্যের, সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার, সবার উপরে রেবার সকল কথাই সুনীতির কাছে নিঃস্ব হ'য়ে উজাড় করে' প্রাণটাকে হাল্কা করে ফেললাম।

তৃতীয় দিন যখন রেবাদের বাড়ী গেলাম এবং রেবা পূর্ব্বের মত দাবীর সুরে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"এ দু'দিন আসা হয় নি কেন?" আমি তখন নির্ভয়ে অতি সহজভাবেই তাকে জানিয়ে দিলাম যে, এখন হ'তে আর আমার প্রত্যহ এখানে আসা চল্‌বে না। আমি সুনীতি বলে আর একজনের সাহচর্য্য পেয়েছি, সেটার আকর্ষণ এখানে আসার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়। বলা বাহুল্য, একথা শুনে রেবার মুখ বিস্ময়ে ও বিরক্তিতে রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। সে খানিক চুপ করে' থেকে যেন নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে আবার কঠিন সুরে জিজ্ঞাসা করলে—"এই সুনীতিটী কে? কোথায় ছিলেন এতদিন?"

—"সুনীতি যে আমার কে, রেবা, তা' আজও আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না। সুনীতি আমার একধারে স্বর্গের নন্দন কানন, সুনীতির রেশমের মত নরম কোঁকড়া চুল—তার ভ্রূভঙ্গী, তার গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত দু'টী ঠোঁটের মিষ্ট হাসি, তার কোকিলের মত সুকণ্ঠ তার প্রতি অঙ্গভঙ্গী—এক কথায় সুনীতির যা' কিছু আমায় পাগল করে' রেখেছে রেবা। তাকে বহুদিন পরে না চাইতে আবার ফিরে পেয়েছি—সে নিজেই এসে আবার যখন আমাকে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে, তখন কি আর তাকে দূরে রাখা যায়? তার সঙ্গে বাল্যকাল হ'তে আমার প্রগাঢ় সখ্যতা—আমার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই এ কথা জান্‌তেন। মধ্যে কোন কারণবশতঃ আমাদের কিছুদিন ছাড়াছাড়ি হয়—কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাকে আবার কাছে পেয়েছি। সে যে কি রত্ন রেবা, তা না দেখলে, তারসঙ্গে না মিশলে বোঝান শক্ত। স্ত্রী-পুরুষ কেউই তাকে ভাল না বেসে থাকতে পারে না—কারণ, তা' থাকা অসম্ভব। তাইত তাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তাকে একদিন দেখবে রেবা?" আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি তুলে রেবার দিকে তাকালাম।

রেবা বিস্ময়ে, ক্ষোভে ও লজ্জায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে বহুকষ্টে উত্তর দিলে—'না।'

তারপর ঘরের ভিতর বেশ কিছুক্ষণ অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। আমার অসহ্য হ'য়ে ওঠায় আমি রেবাকে কিছু না বলেই সেদিনকার মত চলে এলাম। রেবাও কোনই আপত্তি বা অনুযোগ জানালে না।

কয়েকদিন এমনিভাবে কেটে যাওয়ার পর একদিন সন্ধ্যার সময় বেশভূষা করে সুনীতির ওখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ রেবা এসে আমার ঘরে ঢুক্‌ল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'লেও এতটা আশ্চর্য্য আমি হতাম না। প্রথমটা ঠিক বুঝেও উঠ্‌তে পারলাম না কি অভিপ্রায়ে এই ধনীকন্যা গর্ব্বিতা রেবা আজ দু'বৎসর পরে আমার কুটীরে পদার্পণ করলে। আমি নির্ব্বাক আতঙ্কে শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। যাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা যায়, তারও অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে সময়ে সময়ে মানুষ অভিভূত হ'য়ে পড়ে। রেবা নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আমায় বলতে সুরু করলে—"আজ সন্ধ্যায় তোমার আর কোথাও যাওয়া হবে না—তোমার সঙ্গে আমার গোটাকয়েক কথা আছে। জানি, আমার এ অনধিকার অনুরোধে তোমায় হয়ত ব্যথা পেতে হবে—কিন্তু ব্যথা তুমিও আমাকে কিছু কম দাও নি অতীন দা'। শোন, সত্যি আমি

তোমাকে আগে এত ভালবাসতাম না। জানতাম, তুমিই আমাকে একদিন ভালবাসবে ও আমার প্রাণ যদি সে ভালবাসায় সাড়া দেয় হয়ত আমিও তোমাকে ভালবাসব। কিন্তু মেয়েরা সহজভাবে যা' পায়, তার জন্য মোটেই ব্যগ্র হয় না। ব্যগ্র হয় তারই জন্য—যাকে সহজে পাওয়া যায় না। তুমি ছিলে আমার কাছে সহজপ্রাপ্য, তাই তোমার দর্শন-স্পর্শনের জন্য আমি ছিলাম উদাসীন। কিন্তু আজ যেন তুমি দূরে চলে যাচ্ছ—দূরে, বহুদূরে। তাই আজ নারীর লজ্জাসরম জলাঞ্জলি দিয়ে, আমার এই আশঙ্কাভরা মনপ্রাণ নিয়ে ছুটে এসেছি তোমার দুয়ারে। বল অতীন দা', তুমি আমাকে ভালবাস কি না?"

আমি বললাম—"হঠাৎ এ আশঙ্কার কারণ? আমি কি এমন কথা কোনও দিন বলেছি, যা'তে করে' মনে তোমার এ আশঙ্কার প্রশ্ন জেগে উঠতে পারে?"

রেবা ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লে—"তুমি কি ভাব অতীন দা', যে, শুধু মুখ ফুটে বলাতেই সব আসে যায়? অনেক ক্ষেত্রে মুখ বন্ধ করে' থেকে কিছু না বলায় যে ঢের বেশী আসে যায় অতীন দা'। আমি মেয়ে হ'য়ে জানি, অনেক সময় আমাদের বুক ফেটে যায়, তবু মুখ খোলে না।"

আমি একটু মৃদু হেসে বললাম—"তোমাদের মুখ বেশী না খোলাই ভাল; কারণ, তোমাদের মুখ খুললে সর্ব্বনাশ—অনেকের বুক ভেঙ্গে যায়।"

রেবা এবার একটু দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—"ঠাট্টা নয় অতীন দা', তোমার এ জবাবের উপর আমার অনেকটা নির্ভর করছে জেনে রেখো। তোমরা পুরুষ—তোমাদের কিছুতেই যায় আসে না—তোমরা নানা ফুলের মধু খেয়ে বেড়াতে পার—কিন্তু আমরা মেয়ে—আমাদের অনুরাগ, আমাদের প্রেম, ভালবাসা যতখানি মাধুর্য্য নিয়ে ফুটে ওঠে, ততখানিই গভীরভাবে মনের মধ্যে প্রথমেই শিকড় গেড়ে বসে—সে শিকড় উপড়ে ফেলা মানে—একটী কিশোরী হৃদয়ের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলা! কেন তুমি আমার মন নিয়ে এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলছিলে—কেন তুমি একটা নিটোল রবারের মত মনের বেলুনকে বহু উর্দ্ধে তুলে ফুটো করে দিয়ে তামাসা দেখছ?

"সুনীতিই যদি তোমার মনের এতখানি স্থান অধিকার করেছিল—কেন তুমি আমাকে আগে বল নি? তোমরা পুরুষ, তোমাদের অভিনয় করা সাজে, কিন্তু আমাদের কি অবস্থা হয় জান? তোমাদেরই হাতে-গড়া সমাজের বুকে এতটুকু পদস্খলন হ'লে আর আমাদের আশ্রয় মেলে না।

"সুনীতির জন্যই ত আজ আমি তোমাকে এতটা ভালবাসতে পেরেছি। তোমার জন্য হয় ত আমি তোমাকে এত শীঘ্র এমনভাবে পাবার জন্য লালায়িত হ'তাম না—শুদ্ধ সুনীতি, সেই সর্ব্বনাশীই আমাকে পাগল করে তুলেছে—শুদ্ধ, উঃ!" রেবা আর বলতে পারলে না, সত্যই উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

ব্যথা যে তার কোথায়, বুঝতে আর আমার এতটুকুও বিলম্ব হ'ল না। তবু তার দাম্ভিকতায় জোরে কশাঘাত করার লোভ আমায় পেয়ে বস'ল। তাই আমি নিষ্ঠুরভাবে তখনও তাকে আঘাত করে বল্‌লাম—"রেবা, সত্যিকথা বলতে কি, সুনীতিকে এখন আর আমি ছাড়তে পারব না। আমার ভাগ্যাকাশে সে হচ্ছে চন্দ্র, আর তুমি হচ্ছ উজ্জ্বল নক্ষত্র, দুইটীই আমার প্রিয়। কেন, একবৃন্তে দু'টী ফুলই যদি ফুটে থাকে, তাতে আপত্তি কি? আশা করি, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। অবশ্য দু'টীর একটীকেও একেবারে ছেড়ে আমার জীবন-যাত্রা হবে অসহনীয়। কিন্তু কথায় কথায় রাত হ'য়ে যাচ্ছে। চলো, সুনীতির বাড়ী যাবার পথে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই। পরে আর একদিন সব অন্যকথা হবে রেবা, কেমন?"

রেবা একটুখানি কি যেন চিন্তা করে' পরে অনুতপ্তস্বরে বল্‌লে—"ক্ষমা করো অতীন দা', তোমাকে অনর্থক অনেক ব্যথা দিলাম—কিন্তু আর না—আজ সন্ধ্যাই হয় ত আমাদের ইহজীবনের শেষ দেখা। শেষ কথাবার্ত্তা ও শেষ মিলন।"

এই কথা ক'টী বলেই রুমালে চোখ মুছে রেবা একেবারে তার মোটরে গিয়ে চড়ে বসল। আমিও আর ইচ্ছা করেই তাকে কোন কথা না বলে বিদায় দিলাম। সে সন্ধ্যায় অন্তরটা আমার বিজয়-গর্ব্বে নেচে উঠ্‌ল। প্রিয়জনকে ব্যথা দিয়ে আনন্দ? মন বল্‌লে—আনন্দ বহুরূপী! এ রহস্যের কি আর অন্ত আছে? জগতই রহস্যময়! আমরা ত কোন্ ছার?

রেবা চলে যাওয়ার পরই সুনীতির কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে আজকের সন্ধ্যার ব্যাপারটা তাকে সবই খুলে বললাম। সুনীতি তখন কোন একটা গানের মজলিস হ'তে গান গেয়ে ফিরে স্নান করে' চুল শুকাবার চেষ্টা কচ্ছিল। আদ্যোপান্ত সকল কথা শুনে সুনীতি একটু হেসে পরে বললে—"কাজটা ভাল কর নি অতীন দা'। রেবার সম্বন্ধে যা' শুন্‌ছি, তা'তে করে ওকে বিশ্বাস নেই—ও সব করতে পারে মনে হয়। ঈর্ষ্যায় মানুষ পলকে পাগল হ'য়ে এমন কোন কাজই নেই যে, করতে পারে না। সাময়িক উন্মত্ততার (Temporary Insanity) বহু কেস্ আমি স্বচক্ষেই দেখেছি। তুমি না হয় আজ এখন সেখানেই যাও অতীন দা'। তাকে বুঝিয়ে সকল কথা খুলেই বল: তা'তে আমি রাগ বা দুঃখ কিছুই করব না।"

আমি বললাম—"না সুনীতি, সে ভয় তোমার নেই। সে আর যাই হোক্ না কেন—একেবারে থার্ড ক্লাস (Third Class) অরডিন্যারী (ordinary) মেয়ে নয়। বাইরেটা তার যাই হোক্, অন্তরটা তার 'Above Ordinary level'—আর সত্যিও আমি তাকে একেবারে ছেড়ে দিচ্ছি না, তবে—"

ঠিক্ এমনি সময় রেবার অনেকদিনকার পুরাণ চাকর হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিলে—"দাদাবাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে, শীগ্‌গির চলুন—দিদিমণি বেড়িয়ে এসেই আফিং খেয়ে গোঁঙয়াচ্ছে—বাবুও বাড়ী নেই।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কি হয়েছে দিদিমণির?"

"দিদিমণি বললে—'আমি মরব বলে' আফিং খেয়েছি—বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, তুই শীগ্‌গির একবার অতীন দা'কে সুনীতির বাড়ী খবর দে।' চলুন দাদামণি, শীগ্‌গির চলুন।"

বলা বাহুল্য, আমার সমস্ত অন্তরটা তখন ক্ষোভে, ভয়ে ও ঘৃণায় ভরে' উঠ্‌ল। ছি ছি কি কর্‌লাম!

সুনীতি বল্‌লে—"দেখেছ অতীন দা', সব মেয়েই আমাদের দেশে অল্প-বিস্তর একই level এ বিচরণ করে—কেউই বড় বেশী above ordinary level এ নয়: যা' হোক্, চলো, আমি প্রস্তুত।"

সুনীতিকে নিয়ে রেবার ঘরে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, রেবা বালিশে মুখ রগড়াচ্ছে। আমাকে দেখেই সে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠ্‌ল—"অতীন দা', আমি চললাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো—আর সুনীতি দেবীকে নিয়ে সুখে থেকো। আমার স্মৃতি মনে থেকে মুছে ফেলো।"

আমি ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে বললাম—"রেবা! তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ—ক্ষমা কর। সুনীতি মেয়ে নয়, সুনীতি ছেলে। সুনীতি মুখার্জি ডাক্তার আমার বাল্যবন্ধু—এই তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে। আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও যে ভালবাসতাম রেবা!"

আমার গলা ধরে' এল—কথা বা'র হল না। আমি রেবাকে আবেগ-কম্পিত করে জড়িয়ে ধরলাম।

ক্ষণেকের মধ্যে রেবার সেই ম্লান রোগক্লিষ্ট মুখের উপর হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল—সে তার ননীর মত কোমল হাত দু'টী বাড়িয়ে আমার গলাটী জড়িয়ে ধরে' ঠোঁটে বক্র হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌লে—"অতীন দা'! তুমিও আমাকে ভুল বুঝেছ। তোমাকে ছেড়ে

যে আমি মরতেও পারি নে অতীন দা'—তুমি যে আমার প্রাণের মন্দিরে একনিষ্ঠ দেবতা—আমি তোমার চির-কালের পূজারিণী—আমায় ক্ষমা কর অতীন দা'। আমি আফিং খাই নি—আমি যা' খেয়েছি, তা' আফিং নয়, 'সেনসেনে'র বড়ি।"

সুনীতি এই পর্য্যন্ত শুনেই ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ব্যাগের মধ্যে ফেলে হোহো করে' হাসতে হাসতে 'above ordinary level'—'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' বলে ঘরের বিজলী-বাতির সুইচটা নিবিয়ে ও fan pointটা বাড়িয়ে দিয়ে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল।

সুনীতির মোটরের এর শব্দ থেমে যাওয়ার পরে রেবা আমার ওষ্ঠে একটি বিলম্বিত চুম্বনের রেখা এঁকে দিয়ে তবে দিল আমায় মুক্তি।

শচীন্দ্রলাল রায়

বরিস কার্লফ্

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ শীল

বরিস্ কার্লফ্ কে?............ইনি কি 'ফ্রাঙ্কান্ষ্টিন্'-এর সেই 'মনষ্টার'—যিনি নরহত্যা করেই আনন্দ পান—যাঁর দুর্দ্দান্ত মূর্ত্তি শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ প্রত্যেকেরই অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে তোলে; যাঁকে মনে পড়লে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—এবং তিনি কি সেই, যিনি নির্ব্বিকার চিত্তে শিশুরও কণ্ঠরোধ ক'রতে পিছিয়ে যান্ না বরং পরম আনন্দে তার গলা টিপে ধরেন? তবে কি কার্লফের স্বভাবই এ-রকম হিংস্র?......না, নিতান্ত নিরীহ প্রাণীদের মধ্যে তিনি একজন। এর প্রকৃত নাম চার্লস এডওয়ার্ড প্র্যাট্। রুশ এবং ইংরাজ পিতামাতার ঔরসে ইংলণ্ডের ডালউইচ সহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কার্লফ্ তাঁর পারিবারিক নাম।

শৈশবেই বরিস্ অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর মাতাপিতা ছিলেন থিয়েটারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-বাদী। তার মাতাপিতা জানতেন যে, অন্যান্য ভাইদের মতন বরিস্ও সরকারের চাকরী করবেন। কিন্তু পুত্রের অভিনয়-প্রীতি তাঁদের বিসদৃশ লাগ্ল। তাঁরা তাঁকে অভিনয়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে বল্লেন।

কল্পনার গোলাপী নেশায় তখন তাঁর মন মশ্গুল, তাই বাধ্য হয়েই ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর পিতৃ-প্রদর্শিত শিক্ষার পথ হ'তে নিজেকে ছিন্ন ক'রে তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হ'ল।

তাঁর বয়স তখন অল্প। দু'টি দেশ তাঁকে প্রলুব্ধ করলে—কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া। তিনি একটা শিলিং নিয়ে 'টস্' (Toss) করলেন। সেই শিলিংটাই তাঁর ভাগ্য নির্ণয় ক'রে দিলে। বরিস্ কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

বরিস্ সেখানে ছয় মাস একটা ফার্ম্মে চাকরী করলেন। তারপর একটী ছোট নাট্য-সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন। তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হ'ল। তিনি দশ বৎসর থিয়েটারের ও কুলির কার্য্য হ'তে অতি দীনতম কার্য্য পর্য্যন্ত করতেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কার্লফের ভাগ্য গেল ঘুরে। তিনি যে থিয়েটারে কাজ করতেন সেই থিয়েটার কোম্পানী ভ্রমণে বের হ'য়ে একদিন 'হলি-উডে' এসে উপস্থিত হ'ল। সেখানে একখানা ছবিতে তিনি 'বাড়তি'-হিসাবে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়ে গেলেন; যদিও তাঁর চিত্রাভিনেতা হবার আশা কোনদিনই ছিল না, তবুও কতকটা কৌতুকের বশবর্ত্তী হ'য়েই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। 'ইউনিভার্সাল কোম্পানী'র ঐ বইতে

'বাড়তি' অভিনয় করাই কার্লফের চিত্র-জগতে সর্ব্বপ্রথম আবির্ভাব। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ও বিস্ময়-উৎপাদক ভূমিকা অভিনয় ক'রে বরিস্ বিশেষ আনন্দ পান। তিনি আশা করেন, একদিন তিনি সেক্সপীয়রের 'ক্যালিবান্'-রূপে পর্দ্দার গায় আত্মপ্রকাশ করবেন।

লস্‌এঞ্জেলসে ষ্টেজে 'ক্রিমিনাল কোড' নামক নাটকে 'ঘাতকে'র ভূমিকায় অভিনয় ক'রে তিনি সামান্য সুখ্যাতি লাভ করেন। 'কলম্বিয়া ফিল্ম কোম্পানী' সেই বইখানির ছবি তোলা স্থির করেন এবং কার্লফ্‌কে 'ঘাতকে'র পার্ট দেন। 'গ্রাফ্ট' নামক ছবিতে অভিনয় ক'রে তিনি যশ অর্জ্জন করেন। তাঁহার অভিনয়-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে 'ইউনিভার্সাল কোম্পানী' বরিস্‌কে 'ফ্রাঙ্কান্‌ষ্টিন্'-এর দানবে'র ভূমিকায় অভিনয় ক'রতে আহ্বান করেন। অসীম জ্ঞানস্পৃহা ও ধৈর্য্যের বলে এবং রূপদক্ষ জ্যাক্ পিয়ার্সের সাহায্যে তিনি 'দানবে'র এমন নিখুঁত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, যাহা সত্যই অদ্ভুত। তাঁর সে কী নিখুঁত 'মেক্ আপ', কী নিখুঁত অভিনয়! যেন সত্য-সত্যই একটা মরা মানুষকে প্রাণ দেওয়া হয়েছে! 'ফ্রাঙ্কান্‌ষ্টিন্' না দেখলে, তাঁর অভিনয়ের ভাবধারা সাধারণের কল্পনার অতীত। ইহাতে 'দানবে'র রূপ দিয়াই কার্লফ্ বিশ্বে পরিচিত হন।

তারপর থেকে তিনি ভয়াবহ ও অস্বাভাবিক চরিত্রে রূপ দিতে আরম্ভ করেন। তিনি 'ওল্ড ডার্ক হাউসে' 'বাটলারে'র রূপ পরিগ্রহ ক'রে সাধারণের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। সেই মূর্ত্তি দেখলেই মনে হবে, যেন একটা ভীষণ কু-অভিসন্ধি মুখে-চোখে মাখান রয়েছে।

'ওল্ড ডার্ক হাউসে'র পর চার হাজার বৎসর পূর্ব্বের 'মমি'র রূপ দিতে গিয়ে তাঁকে পূরো দু'টি মাস দেশের বাড়ীতে নিজেকে এই বিশেষ ভূমিকার জন্য তৈরী হ'তে হয়েছিল এবং প্রাচীন মিসরের ইতিহাস ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় পঁচিশখানা বই প'ড়ে, ঐ দেশ সম্বন্ধে ভালরকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে তিনি কাইরো মিউজিয়মে রাজা দ্বিতীয় সেটির 'মমি'র অনুকরণে রূপসজ্জা গ্রহণ করতে কার্লফ্ একশত পঞ্চাশ গজ এসিডে ভিজান কাপড় দিয়ে নিজের দেহকে আবৃত করেছিলেন ও তুলা, স্পিরিট, আটা, রূপ-সজ্জার মাটি প্রভৃতি তাঁহার মুখে আর হাতে এমনভাবে লাগিয়ে-ছিলেন যে, তিনি মুখের ও হাতের মাংসপেশী একটুও নড়াতে পারতেন না। শুধু তাই নয়—চার হাজার বছর পূর্ব্বের 'মমি'র বর্ণসামঞ্জস্য করতে তাঁকে বাইশটি বিভিন্ন রং ব্যবহার করতে হয়েছিল। এতে অভিনয় করতে গিয়ে তিনি তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য চার ইঞ্চি বাড়িয়েছিলেন।

স্বর্গীয় লনচ্যানীকে পৃথিবীর সমস্ত লোকই 'মেক্-আপ্-' এর রাজা ব'লে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এখন তাঁরা এটা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, বরিস্ কার্লফ্‌ই লনচ্যানীর স্থানের একমাত্র অধিকারী। কার্লফ্ একটি 'মেক-আপে'র জন্য পাঁচ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন।

এঁর এই রকম হিংস্র-ধরণের অভিনয় দেখে সকলেরই মনে হয় বুঝি লোকটা এই রকম হিংস্র। বাস্তবিক, তাঁর মতন বিনয়ী ও শান্তিপ্রিয় লোক ছায়াচিত্র-জগতে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

লোক-চরিত্র-অধ্যয়নের পক্ষে যে অসীম ধৈর্য্য এবং অসীম জ্ঞানস্পৃহার প্রয়োজন কার্লফের ব্যক্তিগত জীবনে তার এতটুকুরও অভাব নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে জীবনের অনেকগুলি বছর কার্লফ্ নীরব সাধনায় কাটিয়েছেন—তারই পুরস্কারস্বরূপ আজ তাঁর এই জগৎ-যোড়া নাম।

ধীরেন্দ্রনাথ শীল

চিত্র-জগতের পঞ্চশস্য

শ্রীমতী প্রতিভা শীল

শোনা যায় কোন্ দেশে একটা পদ্ধতি প্রচলিত আছে—যে-বাড়ীতে গ্রামোফোন নেই, সে-বাড়ীর কেউ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে না। তেমনি আজকাল এখানে যে-রকম নিত্য-নতুন সিনেমার আবির্ভাব হচ্ছে এবং চারদিকে যে-রকম বায়স্কোপের হিড়িক্ আরম্ভ হয়েছে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এখানেও একটা আইন পাশ হ'য়ে যাবে যে, যে বাড়ীর লোক থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখে না, তাঁদের-ও কেউ নিমন্ত্রণ করবেন না বা নেবেন না।

* * *

এখন সমস্যা হচ্ছে এই যে, বায়স্কোপ থেকে লোকের শিক্ষা-বিষয়ে কোন উন্নতি হবার আশা আছে কিনা। চিত্রামোদীরা এর স্বপক্ষে যে একটা খুব বড়গোছের ঘাড় নাড়বেন তা আমরা জানি এবং অল্প-বিস্তর এর উপকারিতা-ও আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আজকাল দেশে যে-ভাবের হাওয়া বইচে এবং তারই প্রতিকূলে যে সমস্ত ছবি আত্ম-প্রকাশ করচে, তাদের উপকারিতা মানব জীবনে, বিশেষ করে' কিশোর জীবনে কতখানি তা' বেশ একটু ভেবে দেখবার বিষয়। সাধারণে এ-কথা মেনে নেবেন কিনা জানি না, তবু আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন আমাদের ভুল না বোঝেন।

* * *

দেশী সবাক্ ছবিতোলা নিয়ে বেশ একটা পৌরাণিক-এর ঢেউ লেগে গেছে। হিন্দুজাতটা বরাবরই ধর্ম্মপ্রাণ। কাজেই এদিক দিয়ে কর্ম্মকর্ত্তারা যে ভুল করেন নি তা' আমরা জোর করে' বলতে পারি। তবে আজকাল আর্টের যুগে তার মধ্যেও জায়গায় জায়গায় এমন সব আর্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যা' বুঝ্‌তে সাধারণ দর্শকদের কথা বাদ দিলেও অনেক বড় বড় বায়স্কোপের ঘুণ-ও 'ঘায়েল' হ'য়ে যান। কাজেই প্রযোজক-মশায়দের এদিকে একটু-আধটু কৃপাদৃষ্টি রাখা উচিত।

* * *

আবোল-তাবোল অনেক কিছুই বলা হ'লো, আশা করি পাঠক-পাঠিকারা ত্রুটী মাপ করবেন। অহীন্দ্র চৌধুরীকে অবলম্বন করে' 'ভারত লক্ষ্মী'র 'কারাগার' বাঙলা এবং হিন্দি দুই সংস্করণই তোলা হচ্ছে। 'শুভ ব্রাহ্মস্পর্শ'-ও খুব শীগ্‌গির পরদায় ফুটে উঠ্‌বে শোনা যাচ্ছে। 'চাঁদ-সদাগরে'র-ও 'সতী বেহুলা' নামকরণ হ'য়ে হিন্দি সংস্করণ করা হবে ঠিক হয়েছে। 'বলিদানে'র কাজ শেষ হ'য়ে গেচে। পরদার বুকে ফুটে উঠতে যা' বাকী।

* * *

'মা' বইখানির সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে 'পাওনিয়র কোম্পানী' মেতে উঠেচেন। তাঁরা শীঘ্রই আর একখানি সামাজিক উপন্যাস ধরবার জল্পনা-কল্পনা করচেন। আমরা বলি ঃ শুভস্য শীঘ্রম্।

* * *

'রাধা ফিল্ম কোম্পানী' বহুদিনের চুক্তিতে 'মা' পুস্তকের 'ব্রজরাণী'—কাননবালাকে বেঁধে ফেলেচেন। সুখের কথা নিঃসন্দেহ। এই কোম্পানীর হ'য়ে 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে' শীঘ্রই তাঁকে দেখা যাবে।

* * *

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মশায় 'নিউ থিয়েটার্স'-এর সংস্পর্শ ত্যাগ করে' বোম্বাইয়ের 'আর্ট প্রডাক্‌সন কোম্পানী'তে যোগ দিয়েছেন। প্রমথেশ বড়ুয়া শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেচেন। সুধী দর্শকদের শীঘ্রই তিনি অশান্বিত করবেন, এ ভরসা আমাদের আছে।

* * *

গত সংখ্যায় গ্রেটা-গার্ব্বোর যে ছবিখানি গল্প-লহরীতে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানি 'দীপালী'র সৌজন্যে আমরা পেয়েছিলেম। প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের ভুলে ও-কথা উল্লেখ করা হয় নি। এজন্য আমাদের ত্রুটী স্বীকার করচি।

প্রতিভা শীল

শাস্তি

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ

গম্ভীর কণ্ঠে রমাপতি বলিল, "আজ তোমাদের কেন এখানে ডেকেছি তা' এখনও বলা হয় নি। তোমাদের মধ্যে একজন এমন কাজ করেছে যা' আমি কোনদিন সম্ভব বলে মনে করি নি। সমিতির প্রধান নিয়ম সে লঙ্ঘন করেছে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রমাপতি সঙ্গীদের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। ঘরে তেলের আলো জ্বলিতেছিল,—তাহার ক্ষীণ আলোয় তাহাদের মুখ স্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ-সংবাদে তাহারা সকলেই অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। রমাপতি বলিতে লাগিল, "নলডাঙ্গার হীরার নেকলেস ছড়া সিন্দুকের মধ্যে ছিল, আজ সকালে দেখলাম নেই। আমরা পাঁচজন ছাড়া এ সিন্দুক খোলবার কৌশল আর কেউ জানে না। সুতরাং এ কাজ তোমাদের মধ্যে একজন করেছে। একসঙ্গে আমরা এতদিন আছি, কিন্তু এ রকম ঘটনা আজ পর্য্যন্ত ঘটে নি। আমি যে এতে কতদূর দুঃখিত হয়েছি তা' বলতে পারি না। কিন্তু জেনো—"

তাহার কণ্ঠস্বর হঠাৎ অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিল, সে বলিল, "কিন্তু জেনো, আমার সঙ্গে প্রতারণা করে কেউ কখনো কৃতকার্য্য হয় নি। অপরাধী কে আমি তা' জানতে পেরেছি।"

তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই টেবিলের চারিধারে যাহারা নিঃশব্দে বসিয়াছিল তাহারা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ সঙ্গীদের লক্ষ্য করিয়া রমাপতি বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "অপরাধী অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছে দেখছি—তা' আশ্চর্য্য হবার কথা বটে। কিন্তু আমি তার প্রতি নিষ্ঠুর হতে চাই না। তোমরা সকলেই জানো, সভ্যদের মধ্যে কেউ যদি অপর কোনো সভ্যকে প্রতারিত করবার চেষ্টা করে—তার শাস্তি মৃত্যু। কিন্তু যদি অপরাধী নিজের দোষ স্বীকার করে আমি প্রতিজ্ঞা করছি তার প্রতি লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করব। আমি তোমাদের পূর্ব্বেই বলেছি, অপরাধী কে তা' আমার জানতে বাকী নাই, আমি শুধু অপরাধীর মুখ থেকে শুনতে চাই তার দোষ স্বীকার। যদি সে দোষ স্বীকার না করে, স্থির জেনো আজ সে জীবিত অবস্থায় এস্থান ত্যাগ করতে পারবে না।"

রমাপতির কথা শেষ হইল। সঙ্গীরা একবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিল, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিল না।

খানিকক্ষণ নীরবে কাটিয়া যাইবার পর রমাপতি হঠাৎ ক্রুদ্ধভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "অপরাধী দোষ স্বীকার করবে না ঠিক করেছে!...আচ্ছা, আমি তোমাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করব।" গৌরীকান্ত ঠিক তাহার পাশেই বসিয়াছিল—রুক্ষকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গৌরীকান্ত, নেকলেস তুমি নিয়েছ?"

গৌরীকান্ত উষ্ণভাবে জবাব দিল, "না।"

"সঞ্জয়?"

সঞ্জয় অল্পদিন হইল দলে ভর্ত্তি হইয়াছে। দলপতিকে সে ভয় করিয়াই চলে। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "না, আমি নিই নি।"

"রতন?"

রতন আড়চোখে দলপতির পানে একবার চাহিল—তাহার পর শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "না।"

"পান্নালাল?"

পান্নালাল ক্রোধবিকৃতকণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমাকে সন্দেহ করছ কেন? সিন্দুকে তুলে রাখার পর আমি আর একদিনও ও নেকলেস দেখি নি।"

রমাপতি এবার একটু শান্তকণ্ঠে বলিল, "আমি অবশ্য

ভাবি নি যে, অপরাধী দোষ স্বীকার করবে। অপরাধী যে দোষ স্বীকার করে নি তাতে আমি খুসীই হয়েছি। অপ-রাধী হয়ত মনে করছে, ধাপ্পা দিয়ে আমি কথা বার করতে চাই—তা' যদি সে মনে করে তবে সে নিতান্ত বোকা। তোমাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করার বিশেষ একটা কারণ ছিল। অপরাধীকে আমি শাস্তি দিতে চাই, তোমরা সকলেই যে আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে তা' আমি বিশ্বাস করতে পারি না। সেই জন্যেই অপরাধীর নাম আমি প্রকাশ করি নি। কে অপরাধী তোমরা যদি না জানো তা' হ'লে তাকে সাহায্য করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না—আর অপরাধী এমন সন্ত্রস্ত যে, সেও দোষ স্বীকার করতে সাহস করবে না।"

রমাপতির মুখের পানে চোখ দু'টা তুলিয়া সঞ্জয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "অপরাধীকে তুমি কিভাবে দণ্ড দিতে চাও?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে রমাপতি উত্তর দিল, "বিষ দিয়ে।"

ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া সঞ্জয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বিষ কখন দেবে ঠিক করেছ?"

রমাপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বিষ আমার দেওয়া হ'য়ে গেছে। আধঘণ্টা কেটে গেলেই অপরাধীর জীবনের আর কোনো আশা থাকবে না।"

সঞ্জয়ের মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রমাপতি বলিল, "আমি লক্ষ্য করেছি, তোমরা প্রত্যেকেই মদের গ্লাস নিঃশেষ করেছ। তোমাদের একজন তার পানীয়ের সঙ্গে অপরাধের শাস্তি গ্রহণ করেছে। কিন্তু তার শাস্তি এখনও শেষ হয় নি,—তাকে আরো কিছু যন্ত্রণা দেবার ইচ্ছা আমার আছে।" পকেট হইতে একটা বোতল বাহির করিয়া সে টেবিলের উপর রাখিল। তারপর সঙ্গীদের পানে চাহিয়া বলিল, "এই বোতলে সবুজ রঙের যে তরল পদার্থ দেখতে পাচ্ছ, একমাত্র এই জিনিস আমার দেওয়া বিষের ক্রিয়া প্রতি-রোধ করতে পারে। সামনে এই জিনিস থাকা সত্ত্বেও তাকে যে মরতে হচ্ছে এই চিন্তা অপরাধীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দেবে। অপরাধীর নিষ্কৃতি নেই—মৃত্যু তার নিশ্চিত। তার প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় তারই সুমুখে এই টেবিলের উপর।"

পুনরায় সকলে নীরব। ঘরের কোণে পুরাণো ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিতেছে। তাহার প্রত্যেকটি শব্দ তাহাদের একজনকে জানাইয়া দিতেছে, আয়ু তার দ্রুত নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। রমাপতির দৃষ্টি সঙ্গীদের মুখের পানে নিবদ্ধ—কাহারও যেন কথা বলিবার শক্তি নাই।

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল। রমাপতি গম্ভীরস্বরে বলিল, "আর পনেরো মিনিট মাত্র বাকী। তারপরই অপরাধীর মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।"

গৌরীকান্ত হঠাৎ রমপতিকে লক্ষ্য করিয়া অসহিষ্ণু-ভাবে বলিয়া উঠিল, "এ তোমার ভারী অন্যায় সর্দ্দার। বিষ যখন দিলে, তখন এমন বিষ তোমার দেওয়া উচিত ছিল যার কাজ হয় খুব তাড়াতাড়ি। অনর্থক একজনকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?"

রমাপতি বলিল, "এক্ষেত্রে আমি যে-বিষ দিয়েছি তা'তে শারীরিক কষ্ট কিছুই হবে না। যা' কিছু কষ্ট হবে সব মানসিক।"

সঞ্জয় অস্পষ্টস্বরে বলিল, "এইটাই সব চেয়ে সাংঘাতিক।"

রমাপতি হাসিয়া বলিল, "সেই জন্যেই ও ব্যবস্থা করার দরকার হয়েছে।"

রতন বলিল, "সর্দ্দার ঠিক কাজই করেছে। নেকলেস আমাদের সকলকার—বন্ধুদের ফাঁকি দিয়ে একা ভোগ করা কোনমতেই উচিত নয়।"

তাহার কথা শেষ না হইতেই পান্নালাল বলিল, "কথাটা ঠিক। তবে কার গ্লাসে যে বিশ মেশানো হয়েছে তা' ঠিক বলা যায় না—ভুলও তো হ'তে পারে।"

রমাপতি বলিল, "ভুল আমার হয় নি। তোমরা কে কোথায় বসো তা' আমার জানা,—তোমরা আসবার আগেই একটা গ্লাসে আমি বিষ দিয়ে রাখি। বিষটার

কোনো আস্বাদ নেই। কিন্তু আমি দেখেছি যার জন্তে বিষ দেওয়া, সে-ই ও গ্লাসে চুমুক দিয়েছে।”

সঞ্জয় বিবর্ণমুখে বলিল, “এ রকম উৎকণ্ঠা নিয়ে আর বসে থাকা যায় না। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শেষ হ’য়ে গেলেই ভাল।”

রমাপতি বলিল, “শেষ হ’তে আর বেশী দেরী নেই, —মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। এই সময়টুকু উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপরাধী নিজের জীবন রক্ষা করতে পারে বোতলের এই তরল পদার্থ পান করে—”

সে চকিতে একবার চারিদিকে দৃষ্টিটা ঘুরাইয়া লইল। লক্ষ্য করিল, গৌরীকান্তর পকেট হইতে রিভলভারের কিয়দংশ উঁকি দিতেছে। কিন্তু কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া সে ধীরে ধীরে কথা শেষ করিল,—“কিন্তু এই বোতল সে কোনমতেই হস্তগত করতে পারবে না— মৃত্যু তার অনিবার্য্য।”

পুনরায় সকলে নিস্তব্ধ। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই। দূরে দেওয়ালের গায়ে ঘড়ি— অল্প আলোয় কাঁটা ভাল করিয়া দেখা যায় না—তবু সকলের দৃষ্টি সেইদিকে নিবদ্ধ।

মিনিট দুই পরে রমাপতি বলিল, “আমার মনে হয় দরজায় চাবি দেওয়া ভাল।”

সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিল, “চাবি দিয়ে কি হবে? মৃত্যু যখন অনিবার্য্য তখন পালিয়ে গিয়ে তার লাভ?”

রমাপতি বলিল, “লাভ নেই সত্য, কিন্তু পালাবার চেষ্টা করা তার পক্ষে খুব স্বাভাবিক।”

রমাপতি উঠিয়া দরজার নিকটে গেল, এবং দরজার ভিতরদিকের কড়ায় তালা লাগাইয়া, পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া বসিল।

নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ প্রায়। রমাপতি বোতলটা নিজের কাছে টানিয়া নিয়া বলিল, “অপরাধী যাতে শাস্তি এড়াতে না পারে তার জন্তে সাবধান হওয়া উচিত। বোতলটা তার চোখের সামনে রাখা নিরাপদ নয়। কে জানে যদি সে কোন সুযোগে হস্তগত করে! আমি নিজেই বোতলের তরল পদার্থটুকু পান করে অপরাধীর জীবনের আশা একেবারে নষ্ট করে দিতে চাই।

রমাপতি বোতলের ছিপি খুলিয়া বোতলটা ঠোঁটের কাছে তুলিয়া ধরিল।

অকস্মাৎ কে কঠোরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,— “সাবধান!”

রমাপতি মুখ তুলিল,—মুখ তুলিতেই দেখিল সম্মুখে রিভলভারের নল! গৌরীকান্ত? না, গৌরীকান্ত নয় —এ রতন; গৌরীকান্তর পকেট হইতে কখন যে সে রিভলভারটা তুলিয়া লইয়াছে, কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই।

রতন গর্জ্জন করিয়া বলিল, “বোতলটা দাও বলছি।”

রমাপতি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, “না।”

রতন ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, “দেবে না?... ভাল চাও তো এখনি দিয়ে ফেল।...দেরী কর যদি, গুলি করতে আমি দ্বিধা করব না।”

রমাপতি রুষ্টভাবে বোতলটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল।

“চাবি?”

“চাবি তুমি পাবে না।”

“পাব না? না পাই, আদায় করতে আমার বেশী সময় লাগবে না।” রিভলভারটা শক্ত করিয়া রমাপতির নাকের কাছে সে লইয়া আসিল।

রমাপতি ভ্রূকুটি করিয়া, চাবিটা পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

চাবিটা মুঠার মধ্যে লইয়া, রতন ত্বরিতপদে দরজার কাছে আসিয়া তালা খুলিল। তারপর চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া রমাপতির পানে চাহিয়া হাসিল।

“তুমি আমাকে শাস্তি দেবে মনে করেছিলে—কেমন, না? কিন্তু আমি তোমার চেষ্টা ব্যর্থ করেছি। কে যে নেকলেশ নিয়েছে তুমি তা’ জান না, শুধু ধাপ্পা দিচ্ছ,— আমার বিশ্বাস যে, এই এরকম মনে করার সুযোগ আমি ইচ্ছা করেই তোমাকে দিয়েছি। তুমি আমাকে বোকা

মনে করেছিলে,—বোকা আমি নই, বোকা তুমি।” বোতলটা দরজার পাশে একটা শেলফ্-এর উপর রাখিয়া, কোটের ভিতরকার পকেট হইতে সে নেকলেসটি বাহির করিল। তারপর রমাপতির পানে চাহিয়া গর্ব্বিত উল্লাসে বলিল, “এ নেকলেস দেখার সৌভাগ্য এ জীবনে আর তোমার হবে না,— একবার শেষবারের মত দেখে নাও।” রমাপতি ভ্রূকুটি করিল; রতন তাহা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, “আর আমাদের কখনো সাক্ষাৎ হবে কিনা কে জানে,—যাবার আগে তোমার স্বাস্থ্যপান করে যাই।”

নেকলেসটি যথাস্থানে রাখিয়া, সে বোতলটা তুলিয়া লইল। তারপর ‘হাঁ’ করিয়া গলার মধ্যে খানিকটা সেই সবুজ তরল পদার্থ ঢালিয়া দিল। পরক্ষণেই এক ভীষণ আর্ত্তনাদ ঘরের সকলকে ত্রস্ত, বিচলিত করিয়া তুলিল। বোতল ও রিভলভার সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। রতনের দেহ ধনুকের মত বাঁকিয়া চৌকাঠের উপর গড়াইয়া পড়িল।

রতনের প্রাণহীন দেহের পানে চাহিয়া রমাপতি ধীরভাবে বলিল, “অপরাধী কে—এখন তোমরা বুঝতে পাচ্ছ। আমার সঙ্গে প্রতারণা করে কেউ কখনো কৃতকার্য্য হয় নি—এ আমি তোমাদের আগেই বলেছি। যাই হোক্, ধাপ্পা দিয়ে অনেক সময় সহজেই কার্য্যসিদ্ধি করা যায়। বিষ আমি মদের সঙ্গে মেশাই নি, বিষ ছিল ঐ বোতলের মধ্যে।”

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

কবির প্রিয়া

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

সতীশের ঘরের আড্ডাটী বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য বিষয় পরস্পরের প্রিয়ার রূপ ও গুণ বর্ণনা।

নগেন বলিল,—"আমার প্রিয়ার মতন মানানসই চেহারা আমি বাঙালীর ঘরে দেখি নি বল্‌লেই হয়। কি সুন্দর চোখ! হাসির ভাষা ঠোঁটের আগে চোখের কোণে ওর ফুটে ওঠে। কালিদাস বর্ণিত তন্বীর মতই ওর দেহলতা।...আমার প্রিয়া আমাদের প্রেম নিয়ে কবিতা লিখে আমায় শোনায়। নদীর ধারে, জ্যোৎস্না রাত্রে, কোনও দিন মেঘ্‌লা প্রভাতে,—আমি ওকে দেখি, দেখে ভাবি—সত্যিই কি সুন্দর আমার প্রিয়া!"

নগেনের কথা শেষ হইতে বিশু হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কি এলোমেলো সব বকে গেলে, যাতে তোমার প্রিয়ার রূপ বা গুণ কোনটাই ভালভাবে বুঝ্‌তে পারলাম না!"

নগেন সোৎসাহে বলিয়া উঠিল,—"আরে, প্রিয়ার রূপ ও গুণ বর্ণনা একসঙ্গে করতে গেলে ও-রকম একটু গোলমাল হ'য়ে যায় বৈকি—বিশেষতঃ আমার প্রিয়ার।"

বীরেন বলিল,—"আমার প্রিয়ার টেনিস্ খেলা তোমাদের দেখাবো একদিন। অমন টেনিস্ খেলতে কে পারে শুনি! শুধু এ কোয়ার্টারে কেন, আমি অনেক জায়গায় বাঙালী মেয়ের টেনিস্ খেলা দেখে এসেছি..."

বীরেনের অসম্পূর্ণ কথা থামাইয়া দিয়া প্রেমেন বলিল—থ্যাঙ্ক, হয়েছে! বুঝলাম, তোমার প্রিয়া তা' হ'লে একজন বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়। আমার প্রিয়া রূপ, আর খেলাধূলার চেয়ে বড় গুণের অধিকারিণী। এবারে ম্যাট্রিক্ পরীক্ষায় স্কলারসিপ্ হোল্ড্ করে আই-এ পড়্‌ছে। শুধু কলেজের পড়া নয়, আরও নানান ভাল ভাল বই কিনে বা লাইব্রেরী হ'তে এনে পড়ে, আমাকেও পড়্‌তে দেয়। 'নূতন কথা'—কাগজে এবারে তার লেখা 'গলস্ওয়ার্দ্দীর নাটকের বিশেষত্ব'—প্রবন্ধটা তোমরা পড়ো নি! পড়ে দেখো। পড়লে বুঝতে পারবে যে, আমার প্রিয়ার কি ষ্টাডি।

সকলে শ্রদ্ধাসূচক চোখে প্রেমেনের দিকে তাকাইয়া থাকে

বিষ্ণু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। আর সে নীরব থাকিতে পারিল না। গুছাইয়া বসিয়া সেও বলিয়া চলিল,—"আমার প্রিয়া খেলোয়াড় নয়। দেখতে ভালো হ'লেও বর্ণনা করবার মত রূপ তার নেই। বিশেষ কিছু লেখাপড়াও সে জানে না..."

তাহার অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই নগেন বলিয়া ফেলিল,—"তা'হ'লে তুমি থামো।"

বিষ্ণু বলিল,—"আগে শেষ পর্য্যন্ত শোন, তারপর যা' ইচ্ছে বল্‌তে হয় বলো।...চাঁদনী রাতে চৌধুরীদের দীঘির ঘাটে সে আমায় টেনে নিয়ে যায়। আমার পাশে বসে, আমার হাতে হাত রেখে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ! দূরে লর্ড সাহেবের বাগানের শাদা ইউক্লিপ্টাস গাছগুলো কেমন আরও শাদা হ'য়ে উঠেছে! দীঘির কালো জলে কেমন চাঁদের আলোমাখা আকাশের ছায়া ফুটে উঠেছে! এই সব কথা কখনও আমার কাঁধে হাত রেখে, কখনও আমার বুকের মধ্যে মাথা ঠেকিয়ে সে বলে যায়। সে সময় আমি আনন্দে এমন আত্মহারা এমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে থাকি যে, তখন কিছু ভাববারই অবসর পাই না—আমার প্রিয়া রূপসী কিনা, বিদুষী কিনা।"

বিষ্ণুর কথা শেষ হইতে নগেন বলিল,—"ওরে বাবা, তুমি যে দেখ্‌ছি কবিতা না লিখেই কবি!"

সকলের আলোচনার মধ্যে সতীশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"আজ এই পর্য্যন্ত থ্যাঙ্ক। চলো এবার বেড়াতে যাওয়া যাক্।"

সতীশের কথায় সকলে পথের উপর নামিয়া পড়ে।...

আলোচনা-সভায় কবি সত্যসুন্দর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। একথা হঠাৎ মনে পড়িতে বিষ্ণু বলিল,—"হ্যা কবি, কই তোমার প্রিয়ার তো কিছু শুন্‌লাম না। তুমি কবিতা লেখো, তোমার প্রিয়া আছে নিশ্চয়।"

কবি বলে,—"আছে বৈকি।"

হঠাৎ এমন সময় একটা বাড়ী হইতে একটী পাঁচ-ছয় বছরের ফুট্‌ফুটে মেয়ে আসিয়া কবির হাঁটু দু'টী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"কই, তুমি কাল এলে না! আজ্‌কে তা' হ'লে আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবে চলো।"

কবি কোলে তুলিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া মেয়েটীকে আবেগভরে চুম্বন করিতে লাগিল!

সকলের দিকে চাহিয়া কবি বলিল,—"এই হচ্ছে আমার প্রিয়া! আমার প্রিয়া কি সুন্দর দেখ্‌ছো! দেখো, কেমন আবেগভরে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছে! তোমাদের প্রিয়ার সব কিছুই ত শুন্‌লাম—তোমাদের প্রিয়া কি আমার প্রিয়ার মত সুন্দর? তোমরা পারো,—তোমাদের প্রিয়াকে সকলের সাম্‌নে চুম্বন করতে, আদর কর্‌তে? আমি কিন্তু পারি। তোমাদের প্রিয়া এমনি দ্বিধাহীন হ'য়ে এই আমার প্রিয়ার মত কি তোমাদের মধ্যে নিজেদের সঁপে দিতে পারে, চুম্বন কর্‌তে পারে?"

সকলে মুগ্ধ নয়নে কবির প্রিয়ার পানে তাকাইয়া থাকে।

সারদারঞ্জন পণ্ডিত

অদৃষ্টের পরিহাস

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

আজও খোকার জামাটা আনো নি?

যোগেশের চিন্তাক্লিষ্ট মুখে কালোছায়া আরও ঘনাইয়া আসিল। শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আন্‌তে পারি নি।

শুভা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, আনতে পারো নি মানে?

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যোগেশ যেন শুভাকে এড়াইয়া যাইবার জন্যই বলিল, মাইনেটা আজ পাই নি কিনা।

মাইনে পাও নি? শুভা পরম বিস্ময়ে স্বামীর দিকে চাহিল। অবিশ্বাসের সহিত কহিল, মিথ্যা কথা! মাইনে ওরা আজ দু'বছরের মধ্যে দিতে ভুল করে নি। তুমি কি বল্‌তে চাও আজই ভুলটা তারা নূতন করলো?

যোগেশ জোর করিয়া হাসিল। কহিল, ভুল নয় শুভা, সময়টা কেমন মন্দা যাচ্ছে তা তো দেখছো। শুধু আমাদেরই নয়—ওদেরও। ওরাও আজ চোখে সর্ষের ফুল দেখ্‌ছে। জমীদারীতে এক পয়সা আদায় নাই; অথচ, রোজ খরচ, কৌলিক আচার রক্ষা, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ, ভূয়ো মানরক্ষার ব্যবস্থা,—সব্বার উপর লাট। জমিদারী যেন যম হয়েছে। আজ আর কাউকে মাইনে দিতে পারলো না।

শুভার বুক ঠেলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। ম্লানকণ্ঠে কহিল, নিধুর মাকে কি বলে ফিরিয়ে দিব, তাইতো ভেবে পাচ্ছি নে। কালই দুধ দেয় না—কত বলে-কয়ে তবে কাল দুধ নিয়েছি। আজ টাকা দেবোই। আজ যে কি হ'বে—রোগা ছেলে…

যোগেশ চমকিয়া উঠিল। অকারণ বুক-পকেটটার উপর বারকয়েক যেন অতি সন্তর্পণে হাত বুলাইল। তারপর একটী অনতি দীর্ঘশ্বাস গোপন করিয়া কুণ্ঠার সহিত কহিল, তিনটী টাকা এনেছি শুভা—বড়বাবুর হাত পা ধ'রে। তাঁর শরীর ভারি দয়ার—কাউকে না দিয়ে…

শুভা ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, এনেছো! উঃ, কি ভাবনাতেই না পড়েছিলাম! নিধুর মা টাকা না পেলে আজ দুধ কিছুতেই দিবে না—কিছুতেই না।

টাকা তিনটা শুভার হাতে দিয়া কহিল, খোকার জ্বরতো আর বাড়ে নি?

শুভা টাকা তিনটি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, বাড়ে নি বটে—কিন্তু এবেলা যাতনাটা যেন বড্ড বেশী বেড়েছে—কেবল আনচান্ কচ্ছে।

যোগেশ শূন্য-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাইল। ওধারের ঘরে রোগা ছেলেটী তারস্বরে কোঁকাইয়া উঠিল। শুভা স্বামীকে কাপড় ছাড়িতে বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

শুভা চলিয়া যাইতেই যোগেশ পাশের অর্দ্ধমলিন অর্দ্ধছিন্ন বিছানার উপর 'ঝুপ' করিয়া বসিয়া পড়িল। অকারণ অবিমৃষ্যকারিতার একটা গভীর অনুশোচনা গভীর যাতনায় তাহার বুকের উপর এলাইয়া পড়িল। অকস্মাৎ মনে হইল, অতটা আশা করিয়া টিকিটটা না কিনিলেই তো হইত? জীবন ধরিয়াই তো কিনিয়া আসিতেছে—কিন্তু টাকাগুলি জলেই গিয়াছে! অভাব-অনাটনের সংসারে একটা টাকায় কত না গুণ দেয়! শুভা কত রাগ করে, ভৎর্সনা করে, তিরস্কার করে! যোগেশ পারে না। অতীত সমৃদ্ধির সকল অভ্যাসই ভাগ্যচক্রের বিশ্রী আবর্ত্তনে সে ছাড়িয়াছে বটে—অভাবের সঙ্গে দৈন্যের সঙ্গে, বুকভরা ক্ষোভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আপনার অবস্থায় আপনি সন্তুষ্ট থাকিতেও সে অভ্যস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই খেয়ালটুকু ছাড়িতে পারে নাই। অতীতের সুখ-সম্পদের বেদনা তাহার বুকের গভীর তলে অতি নিভৃতে বহিয়া যায়—সে বেদনার ক্লেশ হয়তো শুভাও বুঝিতে পারে না; কিন্তু যোগেশ ভুলিতে পারে না। তাহার অন্তর আবার ফিরিয়া চায়। বুকের মধ্যে দিবা-

নিশি হাহাকার করিয়া মরে—কি করিয়া আবার অতীত সুখ-সম্পদ ফিরিয়া পাওয়া যায়। আবার তেমনি করিয়া ছেলেটীকে লইয়া আনন্দ করে, স্ত্রীর ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধমুখে আবার হাসি ফুটাইয়া দেয়! হায় আশা! কিন্তু কি দিয়া সে কি করবে? সম্বলমাত্র কুড়ি টাকার চাকরী—সংসারের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনগুলিই ইহাতে মিটে না, টানাটানি হয়—প্রায় এর ওর কাছে হাত পাতিতে হয়! যোগেশের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়—বেদনা আবার বাড়িয়া উঠে। রাতা-রাতি বড় লোক হইবার যদি কোন পথ থাকিত! তাই লটারীর টিকিট কিনিবার লোভ সে কোনবারই ছাড়িতে পারিত না। জানিত দুর্ভাগ্য চিরদিনই তাহাকে বিদ্রূপ করিবে—নিরাশার গভীর বেদনাই তাহার লাভ হইবে, স্ত্রী-পুত্রের মুখের গ্রাস বঞ্চিত করিয়া সঞ্চিত টাকা কয়টী মিছামিছি জলে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। তবুও—তবুও—যদি...একবার বাধিয়া যায়, যদি একবার...যোগেশের চোখের সামনে কল্পনার সমুদ্র দুলিয়া উঠে। আশার রঙীন আলো ধীরে ধীরে তাহার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত রাঙাইয়া তুলে। যোগেশ অস্থির হইয়া সারা ঘরময় ছুটা-ছুটি করিয়া বেড়ায়।

কিন্তু ওঘরে খোকার অসুখ আবার বাড়িয়া উঠে। ছোট ছেলে রোগের যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারে না। শুভার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়।

পাগলের মতো ছুটিয়া আসিয়া সে জলভরা চোখ দুইটীতে সীমাহীন ভয় ব্যক্ত করিয়া বলে, ওগো, খোকা বুঝি··· একটা ডাক্তার নিয়ে এসো—তোমার পায়ে পড়ি···

যোগেশ চমকিয়া উঠে। ডাক্তার! ···কি দিয়া আনিবে? পকেটে একটী পয়সা নাই, টাকা তিনটী গত কল্যই ফুরাইয়া গিয়াছে। নিধুর মা বকিয়া-ঝকিয়া আজও দুধ দিয়াছে বটে, কিন্তু দোকানী নুন তেল কিছু দেয় নাই—হয়তো দিবেও না। পাশের বাড়ীর বউটা দয়া করিয়া খোকার জন্য কতকটা বার্লি দিয়াছে!···ডাক্তার আনিবে কি করিয়া?

শুভা ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, ওগো, চুপ করে থাক্‌লে কেন—ওঠো, যাও, মাথা খাও একবার নিয়ে এসো—একবার দেখাও, বাছা আমার...শুভা হুহু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

যোগেশ অনুচ্চারিত কণ্ঠে একটা অস্পষ্ট দূরাগত শব্দের ন্যায় উচ্চারণ করিল, হাতে একটী পয়সাও নেই শুভা—খালি হাতে···

শুভা বুঝে না। তাহার মাতৃ-হৃদয় কেবল সন্তানের জন্যই কাঁদিয়া মরে, এত জানা যে বাহিরের সংসার, তাকেও আর যেন চিনিতে পাবে না। বলে, তাদেরও ত ছেলে-পুলে আছে, গরীব বলে কেঁদে ধর্‌লে আস্‌বে না?—আস্‌বে গো, নিশ্চয় আস্‌বে! একটা ছেলে মর্‌ছে, তবু তাদের দয়া হ'বে না? তর্ক করো না, দোহাই তোমার··

যোগেশ বুকফাটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অনিশ্চিত আশায় পথে নামিয়া পড়ে। চোখ দুইটী কেবল চক্‌চক্ করিয়া ওঠে—টিকিটখানা না কিনিলেও হইত! সাতটী টাকা···আর ভাবিতে পারে না, চোখ দুইটী ঝাপসা হইয়া পথ চলা ভারি করিয়া তুলে।

উঠন্ত বেলা পড়ন্ত হয়। যোগেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পা দু'টি ব্যথা করিয়া তুলে। যোগেশকে চিনে সবাই, তাই টাকার কথা বলে, নিরুত্তর দেখিয়া হাসে, বিদ্রূপ করে—দ্বিতীয় কোথাও দেখিবার জন্য যাচিয়া উপদেশ দেয়। যোগেশ চোখের জল ফেলে, মিনতি জানায়, বুকের ভিতরকার সুপ্ত আভিজাত্যের ব্যথা দূরে ঠেলিয়া দিয়া কাহারও পা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলে। মিথ্যাই তাহার কাঁদা—কাহারও পাষাণ হৃদয় গলে না। একটা ক্ষুদ্র জীবন লইয়া সকলে উপহাস করে। নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, প্রাণহীন পিশাচ—যোগেশের দুই চোখ জ্বলিয়া উঠে। মুখের উপরকার অসহায় দিশাহারা ভাবটা অকস্মাৎ কঠিন হইয়া উঠে, হাত দুইটা আপনা-আপনি গুটাইয়া আসে—জোর করিয়া কি বলিতে যায়—দারোয়ান ছুটিয়া আসে! হয়তো বা.. যোগেশ আবার অচল পা দুইখানি লইয়া চলে—কোথায়, কে জানে!...

পথে কৃপানাথের সঙ্গে দেখা হয়। একই অফিসে চাকুরী করে। বলে, দু'দিন অফিসে যাও নি যোগেশ?

যোগেশ চমকিয়া উঠে। আশাহত মুখখানি তুলিয়া ক্লান্তকণ্ঠে যোগেশ বলে, ছেলেটার অসুখ...

কি অসুখ...

জ্বর সর্দ্দি হয়তো বা নিউমোনিয়া। বাঁচবে না ভাই, বাঁচবে না। জান জান কৃপা, একটা ডাক্তারকে ডাক্‌বার ক্ষমতা নাই, এমনি অক্ষম বাবা—যোগেশের চোখের জল আর বাধা মানে না।

কৃপানাথ থমকিয়া দাঁড়ায়। আশ্চর্য্য হইয়া বলে, ডাক্তার ডাক্‌তে পার্‌লে না, বলো কি হে? ছেলে মরচে, আর তুমি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছো?

যোগেশ চোখের জল মুছিয়া কহে, ডাক্তারের খোঁজ। কেউ যাবে না। বলে টাকা দাও—পা পর্য্যন্ত ধরলেম, একটা ছেলে মরছে বলে কত কাঁদলেম, না, শালারা পাষাণ...

কৃপানাথ খানিক আসিয়া বলে, কারও কাছে হাত পাতলেও তো পারতে? হপ্তা পরেই যখন শোধ দিতে পারো?

কেউ বিশ্বাস করে না কৃপা—আর কেনই বা কর্‌বে। কাউকে তো আর বাদ রাখি নি? যোগেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার ভাবিল, একবার ইতঃস্তত করিল, তারপর ঢোক গিলিয়া কহিল, দাও না ভাই চারটে টাকা, হপ্তার দিনই নিয়ো—আজকেই না হয় ম্যানেজারকে বলে রেখো। দাও না ভাই...

কৃপানাথ চলিতে লাগিল। ত্রস্তে কহিল, ক্ষেপেছো, আমি টাকা পাবো কোথায়? বেশ...ভাল ত হে... বুদ্ধি দিলেম বলেই আমাকে টাকা দিতে হ'বে? বেশ... কৃপানাথ কয়েক পা আগাইয়া গেল। তারপর কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কালই চেষ্টা করে আফিসে যেও হে—ছেলে ত মরলে আর রাখ্‌তে পারবে না। কিন্তু গেলে হয়তো চাক্‌রীটে রাখতে পারবে। শেষটায় ছেলে চাকরী দুই হারিও না হে—বন্ধু মানুষ তাই বলে গেলেম।

কৃপানাথ চলিয়া গেল।

যোগেশ তাহার চলা পথের দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত পাষাণ প্রতিমার মতো স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বন্ধুর অতবড় সত্যভাষণের যে একটা ধন্যবাদ দেওয়া দরকার তাহাও মনে পড়িল না!

শুধু তাহার সমস্ত অন্তরটা কাঁপাইয়া দিয়া বন্ধুর কথাটা বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল - হয়তো বা শেষ সম্বল চাক্‌রীটীও কাল যাবে। হয়তো কেন? নিশ্চয়! খোকার অতবড় জ্বর একটা ডাক্তার নাই, এক ফোঁটা ঔষধ নাই। রাতটা যদিও বা কোনরকমে ধুকিয়া ধুকিয়া কাটে হয়তো, সকাল বেলাটা আর... শুভা সহ্য করিতে পারিবে না, হয়তো বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া চাই। গরীব বলিয়া কেহ নাও আসিতে পারে—বাপের বুক পাষাণ করিতে হইবে। তাহার কচি কোমল দেহখানি কত অজানা স্বপ্নের পুলকে যে বুকখানি ভরাইয়া দিয়াছে, সেই বুকের ওপর করিয়া তাহার মৃত্যু-শীতল, হিম, অসাড়, নিস্পন্দ দেহ শ্মশানে বহিয়া লইয়া যাইতে হইবে—কাঁদিতে পারিবে না। চোখে জল আসিলেও হয়তো ফিরাইয়া দিতে হইবে—বেদনায় বুকখানি ভাঙ্গিয়া গেলেও খোকার শীর্ণ শরীর অগ্নির সর্ব্বভুক উদরে নিক্ষেপ করিতে হইবে... যোগেশ দুইহাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বিকৃত মুখে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

একখানা মোটর কর্কশস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া পথের জল-কাদায় যোগেশকে একরকম স্নান করিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। একটা কুলি কাঠের বোঝার একটা ঠোকা দিয়া অশ্রাব্য কতগুলি গালিগালাজ দিল... যোগেশের যেন খেয়াল নাই। চলিয়াছে তো চলিয়াছেই...

সরু গলিটার অন্ধকারাচ্ছন্ন মোড়ে আসিয়া যোগেশ থমকিয়া দাঁড়াইল। নির্জ্জন পথ। একটী ছোট মেয়ে পথ বহিয়া চলিয়াছে। বোধ করি আশ-পাশের কোন এক বাড়ীরই হইবে। গলায় তাহার সোনার হার, হাত দু'খানি চুড়িতে ভরা। যোগেশের দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। খোকার মৃত্যুক্লিষ্ট মুখের কথা মনে পড়িল। তাহার হাত দুইটা নিস্‌পিস্ করিতে লাগিল। পাপ,

কিসের পাপ,একটা জীবন লইয়া যে কালে কথা...যোগেশের মাথা ঘুরিতে লাগিল। হাত দুইটী বাহির করিয়া একটু আগাইয়া গেল। কিন্তু পূরক্ষণেই সমস্ত অন্তর বহিয়া একটা ঘৃণ্য ধিক্কার উথিত হইল, ছিঃ! যোগেশ শিহরিয়া উঠিল, সভয়ে একরকম ছুটিয়া গলিটা পার হইয়া গেল।

কিন্তু টিকিটখানা রাখিয়াই বা কি লাভ? ছেলেটাই যদি মরে, তবে ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিবে? টিকিটখানা না কিনিলে তো ডাক্তার ডাকিতে পারিত, রোগা ছেলেটার গায়ের একটা জামা দিতে পারিত? টিকিটখানা বিক্রী করা যায় না—সাত টাকার টিকিট যদি পাঁচ টাকায় দেওয়া যায়? চার টাকায়—তিন টাকায়—দু'...

যোগেশ জোর করিয়া পাশের দোকানটায় উঠে। জোর করিয়া বুকপকেট হইতে টিকিটখানা বাহির করে। হাতটা বেজায় কাঁপিতে থাকে—স্বর ভাল ফুটে না। চোখের পাতাটাও ছাই কেমন ভারি হইয়া আসে। একবার ইতস্ততঃ করে, তবুও বলে, টিকিটখানা রাখ্‌বেন মশাই—খুব ভাল খেলা, আইরিশ সুইপ্‌, প্রথম পুরস্কার ত্রিশ হাজার পাউণ্ড, বেধে যাবে মশাই...

ভদ্রলোকটি কয়েক মিনিট অর্থহীন দৃষ্টিতে যোগেশের দিকে তাকাইয়া রহে। তাহার ঠোঁটের ফাঁকে অর্থপূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠে। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলে, ঠকানোর আর জায়গা পেলে না হে?

যোগেশ চঞ্চল হয়; মুখখানি আরও কালো হয়, আশাহত কণ্ঠে বলে, ঠকাই নি মশাই, আসল টিকিট। পড়্‌তে জানেন তো—দেখুন পড়ে; সাত সাতটী টাকা দাম নিয়েছে...

তা' নিয়েছে তো হয়েছে কি? কত সব জোচ্চরের দল, কি করে লোককে ঠকাবে সেই ফন্দী নিয়েই বেড়ায়। কোথা থেকে একখানা টিকিট ছিঁড়ে নিয়ে এসে—হুঁ, আমায় কাঁচা ছেলে পেয়েছো, না?

যোগেশের চোখ দু'টী জলিয়া উঠে। মাথার মধ্যে কি রকম করিয়া উঠে...ছেলের মৃত্যু-পাণ্ডুর কাতর মুখখানি মনে পড়ে, শুভার অসহায় সর্ব্বহারা মুখখানি তাহার বুকখানিকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। একটা দীর্ঘশ্বাস আপনা আপনি ফাটিয়া পড়ে। ছল্‌ছল নেত্রে বলে, বিশ্বাস করুন মশাই, ছেলেটার জ্বর—মরছে। কোথাও দুটো টাকা পেলেম না যে, একটা ডাক্তার ডাকি, তাই। ছেলেটী মরছে আর আপনাকে ঠকাবো?...দুটো টাকা না হয় আজ ধারই দিন—এইটি জিম্মা রাখুন। ওদের অফিসে খোঁজ নিয়ে তারপর না হয়...

ভদ্রলোকটী মুখখানি বিকৃত করিয়া কহিল, এর মধ্যে তুমি উধাও হও ত বেশ! ও সব চালাকি, হেঁ হেঁ, আমি ছেলেমানুষ না হে, বুঝ্‌লে? ও সব ধারটার চল্‌বে না বাপু, বুঝ্‌লে? মোদ্দা দুটো টাকা পাবে, তোমার বিপদ্‌, তাই, নইলে এই বাজে কাগজ নিয়ে আবার কোন মুখ্যুতে টাকা দেয়?...নাও তো চলো?

যোগেশ অশ্রু-করুণ দৃষ্টিতে টিকিটখানির দিকে তাকাইয়া রহিল। দুইটি টাকা! তবুও তো ডাক্তার ডাকিতে পারিবে। না বাঁচুক, সান্ত্বনা তো মিলিবে? অচিকিৎসায় মরিয়াছে বলিয়া অনুশোচনা করিতে হইবে না। তাই ভাল, সুখ না হয় তবুও মনের শান্তি তো মিলিবে?

যোগেশ হাত পাতিল, দিন...

ভদ্রলোকটী মৃদু হাসিয়া কহিল, আরে বাপু, থামো—দিন্‌ বল্‌লেই এখনি দিতে হবে? নাম সই করো—লিখো অমুককে বিক্রী করলেম—বুঝ্‌লে?

যোগেশ কলমটী হাতে তুলিয়া লইল। লিখিতে গেল, হাতখানি অকস্মাৎ কাঁপিয়া উঠিল। কে যেন তাহার কানের কাছে বলিল, দূর বোকা, দুই টাকায় বিক্রী করছিস্‌। যদি টাকাটা উঠেই...যোগেশ ধীরে ধীরে কলমটী রাখিল। হাতের মুঠোর মধ্যে টিকিটখানা গুঁজিয়া কহিল, নমস্কার মশাই, দুই টাকায় আর বেচ্‌বো না...

ভদ্রলোকটী দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, কি রকম চালাকি? বেচবে না কিহে? ওতো বেচেছই—দাও...

যোগেশ চট্‌ করিয়া পথে নামিয়া পড়িল। মুখ সে ফিরাইয়া কহিল, মাপ্‌ করবেন। ভারি কষ্ট দিলেম... তারপর আবার পথ বাহিয়া চলিল।

পথের ধারে সাজানো জামার দোকানখানি কি চমৎকার! যোগেশের পা দুইখানি যেন অচল হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। কি ভিড় করিয়াই না লোকে জামা কিনিতেছে। যোগেশের বুক ঠেলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঐ দু' আনা দামের একটা জামাও যদি সে কিনিতে পারিত!

দোকানী তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই মশাই?

যোগেশ নিরুত্তরে আবার পথে নামিল।

আকাশের গায়ে গায়ে তারা ফুটিয়া উঠিল। সহরের বুকে স্তিমিত আলোকগুলি পাণ্ডুর আলোকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আরও বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিল। যোগেশের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। হয়তো খোকার কথাও ভুলিয়া গিয়াছে, শুভার কাতর মুখখানিও আর মনে পড়ে না। সামনের পথ তাহার অফুরন্ত হইয়া উঠে।

কর্ণেল ব্যানার্জ্জির ডাক্তারখানার তীব্র আলোক তাহাকে পাগল করিয়া তুলে।...টাকা? টাকা কি হইবে? কর্ণেল ব্যানার্জ্জি তো আর তাহাকে চিনে না? রোগী দেখিয়া তবে তো টাকা চাহিবে? ক্ষতি কি? দেখাইয়া শুনাইয়া তখন না হয়...যোগেশ মাতালের মতো টলিতে টলিতে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া গিয়া হলের মধ্যে দাঁড়ায়। বুকটা তাহার দুরদুর কাঁপিয়া উঠে। টেকো মাথা ব্যানার্জ্জি তাহার গম্ভীর চোখ দুইটা তুলিয়া বলে, কি চাই...

যোগেশ প্রথমে কথা বলিতে পারে না। কণ্ঠতালু যেন শুকাইয়া আসে। তারপরে হু হু করিয়া এক সময় কাঁদিয়া ফেলে। অশ্রুবিবৃত-কণ্ঠে বলে, ছেলেটী বুঝি আর বাঁচে না ডাক্তারবাবু—একবার যদি দয়া ক'রে... বুকজোড়া নিউমোনিয়া... হয়তো বা এতক্ষণ...

ডাক্তার যোগেশের অশ্রু-কাতর মুখের দিকে পলকে চাহিয়া ডাকে, মহবুব...

বাহির হইতে খন্‌খনে গলায় মহবুব উত্তর দেয়, হুজুর।

গাড়ী।

কর্ণেল ব্যানার্জ্জির মোটর যোগেশকে লইয়া ছুটে।

যোগেশের বাড়ীর দরজায় আসিয়া মোটর থামে। যোগেশ নাচিয়া গিয়া ভিতর হইতে আধভাঙ্গা একখানা চেয়ার আনিয়া ডাক্তারকে বসিতে দিয়া ছুটিয়া ঘরের ভিতর যায়।

নিস্তব্ধ পুরী—একটী অতি মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দও কানে বাজে। যোগেশের বুকটা দুলিয়া উঠে। হয়তো খোকা এখন একটু ভাল, যাতনাটা কমিয়াই থাকিবে—হয়তো বা একটু ঘুমাইয়াই পড়িয়াছে। শুভাও বোধ হয় ছেলেকে ঘুম পাড়াইতে গিয়া তাহার পাশেই শুইয়া তাহার বিনিন্দ্র ক্লান্ত চক্ষু দুইটী বারেকের জন্য মুদিয়া থাকিবে। আহা বেচারী! কয়দিনের মধ্যে চোখে ঘুম নাই—দুশ্চিন্তায় তাহার সমস্ত মুখখানি কালী হইয়া গিয়াছে। কতদিন পরে আজ একটু ঘুমাইয়াছে—ঘুমাক। ভগবান...ডাক্তার হয়তো না আনিলেও চলিত? খোকা তো ভালই আছে। না, অল্পেতেই সে কেমন পাগল হইয়া যায়? বেটাছেলে কি অত পাগল হইলে চলে? কিন্তু শুভাটা যে ভারি কাঁদে—ওর চোখের জল যে কিছুতেই সহ্য করা যায় না। মায়ের প্রাণ! কিন্তু কি বলিয়া এখন ডাক্তারকে বিদায় করা যায়। একবার দেখানোই ভাল, যখন আনাই হইয়াছে। কিন্তু বিদায় করিবে কি দিয়া? শুভার কাছে কি দুইটা টাকাও নাই? সেদিনকার তিনটা টাকা—সবতো খরচ নাও হইতে পারে—

যোগেশ ঘরের ভিতর পা দিয়া চমকিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, শুভা—শুভা...পরমুহূর্ত্তেই পাগলের মতো ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া ডাক্তারবাবুর পায়ের উপর পড়িয়া যোগেশ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু...

কর্ণেল ব্যানার্জ্জি তাহাকে উঠাইয়া ভৎ'সনা করিয়া কহিল, ছিঃ, যোগেশবাবু—সঙ্কটের সময় মেয়েদের মতো অত অধৈর্য্য হ'লে হয়—চলুন।

কর্ণেল ব্যানার্জ্জি ছেলেটীর গায়ে হাত রাখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। গভীর দুঃখের সহিত বলিল, নিয়তি, একটু আগে যদি ডাক্‌তেন যোগেশবাবু!

যোগেশের মুখে কথা ফুটিল না—তাহার চোখ দুইটা যেন অকস্মাৎ শুকাইয়া গেল, তাহার সর্ব্বাবয়ব বিদ্যুৎ-স্পর্শের মতো অকস্মাৎ কঠিন, পাষাণের মতো নিথর হইয়া গেল।

ডাক্তারের শেষ কথাগুলি পর্য্যন্ত সে নির্ব্বিকার চিত্তে স্পষ্ট শুনিল—তাহার বুকের মধ্যে পলকের তরেও ক্ষুদ্র একটু চাঞ্চল্যও দেখা গেল না।

কর্ণেল ব্যানার্জ্জি যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিল, না—না, আপনি ব্যস্ত হ'বেন না, টাকা আপনাকে দিতে হ'বে না। কোন উপকারই তো করতে পারলেম না।...অতো বিচলিত হ'বেন না যোগেশবাবু, ওঁকে একটু দেখ্‌বেন···ডাক্তারের বুটের শব্দও বাহিরে মিলিয়া গেল।

যোগেশের দেহখানি সশব্দে মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল।

গরীবের সংসারে পুত্রশোক বলিয়া কিছু নাই। কাঁদিতে গেলে লোকে বিরক্ত হয়—কষ্টের কথা বলিতে গেলে সকলে উপহাস করে। গরীবের আবার দুঃখ কি? শুভার অন্তর তাহা বুঝে। কিন্তু মন মানে কই? শত দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনাটনের মধ্যে ছোট ঐ মুখখানিই যে ছিল তাহার গভীর সান্ত্বনা—তাহার বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র অবলম্বন। হা ভগবান, গরীবের এ সুখটুকুও তোমার সহ্য হইল না! সংসারে অনেককেই তো কত সুখ-সম্পদ, গৃহভরা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দিয়াছ—যে চায় না তাহাকে অযাচিতভাবে অফুরন্ত দান করিয়াছ, আর শুভার বেলাতেই কি এই ক্ষুদ্র দয়াটুকুও অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিলে ভগবান্‌! শুভার চোখের জল দিবারাত্র শুকায় না। খোকা যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল, সেই বিষাদ-স্মৃতিপূর্ণ মলিন ছিন্ন বিছানাটী আঁকাড়াইয়া ধরিয়া শুভা কেবল কাঁদে!

যোগেশ পাগলের মতো ঘুরিয়া বেড়ায়। চাকুরীটী তাহার গিয়াছে। সেদিক দিয়া তাহার আর কোন ভয় নাই। ঘরে টিঁকিতে পারে না। খোকার স্মৃতি তাহাকে পাগল করিয়া তুলে, শুভার কাতর মুখখানি তাহার বুক ভাঙ্গিয়া দেয়! শুভাকে একটা সান্ত্বনা দিবার কথাও মনে আসে না।

শুভা নির্জ্জীবের মতো পড়িয়া থাকে, যোগেশ বুকের অসহ্য বেদনা চাপিয়া পথে পথে বেড়ায়। কেহ কাহারও খোঁজ রাখে না। দুইটী হৃদয়ের সংযোগ-সূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়া খোকা কোথায় চলিয়া গিয়াছে! কতদিন তাহাদের খাওয়া হয় না। কে পাক করে—আর কেই বা খায়!

পাশের বাড়ীর বৌটা শুভাকে দু'-একদিন ডাকিয়া খাইতে বলে। মুখের গ্রাস তুলিয়া দেয়—কোথা হইতে দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া বন্যার জল নামিয়া আসে, শুভা ভাতের থালাটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়ে।

বৌটীর চক্ষুও শুষ্ক থাকে না! গভীর বেদনায় বলে, ক'দিন না খেয়ে থাক্‌বি ভাই!

শুভার পাতলা ঠোঁট দু'খানি কাঁপে! কতক্ষণ কথাই বলিতে পারে না। তারপর একসময় বলে, ওঁর যে এখনো খাওয়া হয় নি বৌ...

বৌটী নিজের ভুল বুঝিতে পারে। অনুতপ্ত হয়। বলে, ডাকাব?

শুভা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলে, কা'কে ডাক্‌বি ভাই—আমিই দেখা পাই নে—আজ দু'দিন···

বৌটী চিন্তিত হয়। বলে, এতো ভাল নয় ভাই, তোকে কঠিন হ'তে হ'বে—ওঁর সামনে কাঁদলে ওঁকেও হয়তো হারাবি—ওর আঘাত এখন সহ্য করতে পারলে হয়।

শুভা কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, আমিই হতভাগী রাক্ষুসী, ওঁদের সংসারে এসে ওঁদের সুখ-সম্পদ খেয়ে নিলেম ভাই! সবই তো ছিল—আজ কিছুই নেই। ভেবে ভেবে ওঁর

শরীরটা···খোকা গেল—কে জানে আমার কপালে...শুভা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শুভার মাথাটী নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া বৌটী হতবাক্ হইয়া সম্মুখের সীমাহীন নীল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চোখের কোল বহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িল।

শুভা স্বামীর হাত দুইখানি ধরিয়া মিনতির সহিত বলে, ছিঃ, লক্ষ্মিটী, ওঠো, অমন করে বসে থাকলে কি চলে? বেটাছেলে, তুমি যদি অমন করো তো আমি কি নিয়ে...শুভা চোখের অশ্রু আর চাপিতে পারে না।

যোগেশ শুভার মুখখানি অকস্মাৎ তুলিয়া ধরে। কয়েক মুহূর্ত্ত অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। দেখিয়া দেখিয়া কঠিনস্বরে ডাকে, শুভা...

শুভা ভয় পাইয়া স্বামীর বুকের কাছে আরও সরিয়া আসে। কাতরকণ্ঠে বলে, ওগো, অমন করছো কেন? ওগো ··

যোগেশ শুভার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে আরও জোরে চাপিয়া ধরে। জোরে—আরও জোরে। শুভা হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করে—গা কেমন ছম্‌ছম্ করে—ভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। ওগো...

যোগেশ পাগলের মতো বলে, খোকা নিজে মরে নি—রোগে মরে নি শুভা···মেরে ফেলেছে···মেরে ফেলেছে··· যোগেশ হাঁপাইতে লাগিল।

শুভা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

যোগেশ যন্ত্রণায় কাতরকণ্ঠে কহিল, অবিশ্বাস করো না শুভা—সত্যি—সত্যি ও মরে নি। মেরে ফেলেছে, হত্যা করেছে···আর আমি—আমি—বাপ হ'য়ে আমিই ওকে মেরে ফেলিছি...

শুভা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, কি বলছো? তুমি মারলে কিসে? সে তো......

মিথ্যা—মিথ্যা শুভা! তুমি তো জান না—দেখোও নি। ওষুধ না দিয়ে, ডাক্তার না ডেকে......

শুভা স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিল, তোমার দোষ কি—তুমি তো চেষ্টা করেছো—অভাব, গরীব আমরা—তুমি কি করবে?

যোগেশ বাধা দিয়া অস্বাভাবিক স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, মিথ্যে কথা, ওকে আমিই মেরে ফেলেছি······ আমিই ওকে জোর করে গলা টিপে মেরেছি······

শুভা শিহরিয়া উঠে—বোধ করি তাহার সহজ চেতনাটুকুও লুপ্ত হইয়া আসে। অর্থহীন ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে নির্নিমেষ-নয়নে শুভা স্বামীর দিকে চাহিয়া ভাবে—কি ভাবে হয়তো তা' সে নিজেও জানে না।

যোগেশ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। শুভার পাথরের মতো নিশ্চল দেহকে সবলে ঝাঁকি দিয়া বলে, বিশ্বাস হয় না শুভা—বিশ্বাস হয় না? কিন্তু আমিই যে ওর মরণকালে ওষুধের টাকা চুরি করে রেখে...কি করেছি···কি করেছি জানো······

শুভার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা অস্পষ্ট ধ্বনি বাহির হইয়া আসিল, কি করেছো? বলিয়া সভয়ে, বোধ করি অব্যবহিত কোন এক সর্ব্বনাশকর বিপত্তির করুণ ইতিহাস শুনিবার জন্য দুই চোখের আতঙ্কদৃষ্টি মেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম শুভা—মাইনে ওরা ঠিকই দিয়েছিল, কিন্তু আমি—আমি···ওঃ, কি করেছিলেম! এই দেখো···সাতটাকা দিয়ে টিকিট কিনেছিলেম। ভেবেছিলেম, বড় লোক হ'বো···খুব বড়লোক হয়েছি শুভা··· খুব বড়লোক.....

যোগেশ শুভার বুকের উপর মাথাটা লুটাইয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত-আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল।

শুভার দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। বিছানার উপর লটারীর টিকিটখানা স্বল্প বাতাসে নড়িতেছিল। শুভার ইচ্ছা হইল একটানে উহাকে ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দেয়—স্বামীর অবিমৃষ্য-কারিতার কঠোর শাস্তি দিয়া হয় তো বা আত্মহত্যা

করিয়াই এই অসহ যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়! উঃ, কি প্রাণহীন কঠোর নির্ম্মম মানুষ! পুত্র মৃত্যুশয্যায়, একফোঁটা ঔষধ নাই, একটা ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য নাই…পথ্য কিনিবার সংস্থান নাই…সে কিনা……

সীমাহীন ঘৃণায় স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিতেই শুভার উদ্ধত চোখের কঠোর দৃষ্টি আপনিই কোমল হইয়া আসিল। অনেকদিন—অনেকদিন সে স্বামীর মুখখানা এমন করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। পুত্রশোকটা তাহার এত বেশী হইয়াছিল যে, স্বামী কতটা আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা ভাবিবার অবসর পায় নাই। নিজের ক্ষতিটা নিজের সর্ব্বনাশটা, নিজের ব্যথাটাই বড় বলিয়া তাহার বুকে বাজিতেছিল। কিন্তু আজ স্বামীর সর্ব্বহারা মুখ দেখিয়া গভীর অনুশোচনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। শুভা নিজের দুঃখটা ভুলিয়া জোর করিয়া স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে গেল। কিন্তু কোথা হইতে অবরুদ্ধ অশ্রুধারা নামিয়া আসিয়া স্বামীর মাথা, বুক সমস্ত ভাসাইয়া দিয়া, অবিরল ধারায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

শুভার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না……

শুভা যে কি করিবে তাহা খুঁজিয়া পায় না। যোগেশের সাংঘাতিক জ্বর। গা পুড়িয়া যাইতেছে। অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ চোখ দু'টি যেন চক্ষু কোটর হইতে ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। সমস্ত মুখখানায় কি যে অব্যক্ত যন্ত্রণা সুপরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে যে, চাহিলে বুকখানা আপনি কাঁদিয়া উঠে। মাঝে মাঝে কি যেন বকে—বোঝা যায়, যায়ও না। হয়তো বা প্রলাপ—শুভার বুক আতঙ্কে ভরিয়া আসে। কয়দিন মত্ততা এত বাড়িয়াছিল যে, শুভা এক মুহূর্ত্ত চোখ বুজিবার অবসর পায় নাই। কাল হইতে একবারে চুপচাপ—অজ্ঞানের মতো পড়িয়া আছে। শুভা ব্যাকুল আগ্রহে স্বামীর মুখের একটী কথা শুনিবার জন্য—একবার তাহার রোগমুক্ত চোখের সরল দৃষ্টি দেখিবার প্রাণান্ত আশায় রোগশয্যার একপাশে বসিয়া কায়মনোবাক্যে কেবল ভগবানের নির্ব্বাক করুণার রুদ্ধ দুয়ারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছিল।

ভেরের দিকে বোধ করি দেবতা প্রসন্ন হইলেন। যোগেশ চোখ মেলিয়া কতকটা শান্তস্বরেই ডাকিল, শুভা—

শুভা ব্যাকুল আগ্রহে স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, কেমন আছো—এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে না?

যোগেশ শুভার কথা যেন শুনিতেই পাইল না। কয়েক মিনিট অর্থহীন দৃষ্টিতে শুভার দিকে চাহিয়া কহিল, আজ ইংরেজীর ষোলই আগষ্ট, না…শুভা আজ খেলা হ'বে। হয়তো কাল টেলি পাবো—হয়তো কেন, ঠিকই পাবো।… আমরা বড়লোক হ'ব, না শুভা?

শুভার দুই চোখ ছাপিয়া জল আসিল। মুখ ফিরাইয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, ভগবান দিলে হবে বই কি……

ভগবান দিলে? যোগেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিল। উত্তেজিতকণ্ঠেই কহিল, ভগবান দিলে কি? ছেলের মরণ দিয়ে টিকিট কিনেছি। পাষাণের দয়া হ'বে না?…দয়া হ'বে না? হাঃ হাঃ হাঃ খোকা মরেছে তায় কি, বড়লোক ত হ'ব। শুভা…

শুভা শিহরিয়া উঠিল। স্বামীর শান্তস্বর শুনিয়া ক্ষণপূর্ব্বে তাহার বুকে যে শান্তির বাতাস বহিয়াছিল, এখন দেখিল তাহা মিথ্যা। স্বামী পূর্ণপ্রলাপ বকিতেছেন! শুভা জলভরা চোখে স্বামীকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিয়া কহিল, মিছে কেন ভেবে কষ্ট পাও—তুমি তো খোকাকে মারো নি। ভগবান মেরেছেন…

ভগবান? ভগবান? ভগবানকে দেখেছো শুভা—সে কেমন? দিনরাত তার নাম কর? যাও, আমি ভগবান চিনি নে…

শুভা নিরুত্তরে স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, ধীরে ধীরে বাতাস করে—দুই চোখের অশ্রু আর থামে না।

যোগেশ কতকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। শুভা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে, হয়তো স্বামী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

হঠাৎ যোগেশ চমকিয়া উঠে। চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করে, বোকা যোগেশ রে, বোকা···

শুভা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না। উঠিয়া নামিতে চায়, খানিক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া আবার বিছানার উপর নির্জীবের মতো ঢলিয়া পড়ে। তাহার অশান্ত চোখ দুইটী বুজিয়া আসে।

শুভা উঠিয়া তুলসীতলায় গিয়া লুটাইয়া পড়ে। কাঁদে, সমস্ত হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক বেদনা উজাড় করিয়া দিয়া প্রার্থনা করে, দোহাই ভগবান, ওঁকে বাঁচাও, ওঁকে শান্তি দাও—বিস্মৃতি দাও—ওকে ফিরিয়ে দাও ভগবান...

কতক্ষণ সেইখানে সে পড়িয়া থাকে। চোখের জলে তুলসীতলার খানিকটা জায়গা ভিজিয়া যায়। তার-পর একসময় শুভা উঠে। ভক্তিভরে মাথা নোয়ায়—দুই হাত দিয়া তুলসীমঞ্চের ধুলি তুলিয়া লইয়া স্বামীর মাথায়, চোখে, মুখে, গায়ে সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দেয়। অজস্র চোখের জলের মধ্যে দেবতার পায়ে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করে। এই তাহার ঔষধ।

ভোরের দিক্‌টায় যোগেশের অবস্থাটা আরও খারাপ হইয়া পড়ে—বুঝি আর বাঁচান যায় না। শুভা ছুটিয়া গিয়া পাশের বাড়ীর বৌকে ডাকিয়া তুলে। বৌটী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া শঙ্কাব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, বট্‌ঠাকুর কেমন আছেন ভাই ?

শুভা উত্তর দিতে গিয়া বৌটীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কেবল মর্ম্মন্তুদ কান্নাই কাঁদে।

বৌটী চঞ্চল হয়। ঘরের ভিতর ছুটিয়া গিয়া স্বামীকে ডাকিয়া তুলে। বলে, যাও না গো। চট্ করে একটা ডাক্তার নিয়ে এসো—ও বাড়ীর বট্‌ঠাকুর বুঝি···

অমর বাহিরে আসিয়া শুভাকে লক্ষ্য করিয়া বলে, কিছু ভেবো না বৌদি'। এক্ষুনি আমি ডাক্তার নিয়ে আস্‌ছি... শুভাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সে ডাক্তারের উদ্দেশে চলিয়া যায়।

ডাক্তার আসে। মিনিট কয়েক পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলে, টু-লেট !

শুভার সামনে যেন আকাশের বজ্র ফাটিয়া পড়ে। মাগো! তারপর বৌটী সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই এত দিনের ধৈর্য্য হারাইয়া সেইখানে সে এলাইয়া পড়ে।

অমর লোকটী ভাল। তবুও ঔষধ আনে। চেষ্টা করে—যদি বাঁচে। বৌটী শুভাকে লইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে—শুভার জ্ঞান বুঝি ফিরে না।

মধ্যাহ্নের রোদ পড়িয়া আসে। যোগেশের অবস্থার উন্নতি বুঝা যায় না। শুভা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসে।

বৌটী বলে, এই গরম দুধটুকু খেয়ে ফেল তো দিদি।

শুভা চমকিয়া উঠে। চোখ দুইটি আবার জলে ভরিয়া আসে, অস্ফুট কাতর-কণ্ঠে বলে, দুধ !...ওঁর পেটে যে দু'দিন কিছুই পড়ে নি।

বৌটি সান্ত্বনা দিয়া বলে, তাঁকেও খাইয়েছি। লক্ষ্মী আমার...

শুভা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলে, সত্যিই আর জন্মে তুই আমার মায়ের পেটের বোন্ ছিলি, নইলে...

বৌটী মুখ রাঙা করিয়া বলে, আচ্ছা, থাক্ থাক্—একটুকেই কেবল···

ও বাড়ীর অমর আসিয়া একগাল হাসিয়া বলে, তোমাদের বরাত ফিরেছে বৌদি'—এই নাও টেলি, আইরিশ সুইপের ফার্ষ্ট প্রাইজটা যোগেশ দা'ই পেয়ে গেছে। ত্রিশ হাজার পাউণ্ড—তিন লাখ নব্বই হাজার টাকা...

শুভার হাত হইতে দুধের বাটীটা পড়িয়া গিয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিয়া উঠে। মাথাটা ঘুরিয়া যায়—চোখের সামনে কেবল আঁধারই যেন ঘুরিতে থাকে।

সামলাইয়া লইয়া বলে, দেখি।

অমর টেলিগ্রামখানা শুভার হাতে দেয়। শুভা কয়েক মুহূর্ত্ত টেলিগ্রামখানার দিকে চাহিয়া থাকে—তারপর পাগলের মতো ছুটিয়া ঘরের ভিতর যায়।

অমর পিছন হইতে বলে, এখন কিছু বলো না বৌদি', হঠাৎ 'সক্' লাগ্‌তে পারে। কে জানে...

শুভা বলে, না—না—তাঁকে বল্‌তেই হ'বে। যাবার সময় শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌বার পূর্ব্বে তিনি জেনে যান—তাঁর টাকা জলে পড়ে নি—তাঁর আশা সফল হ'য়েছে। হয়ত একটু শান্তি...

যোগেশের বোধ করি সেইমাত্র জ্ঞান ফিরিয়াছিল; দুই চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি মেলিয়া কাহাকে খুঁজিতেছিল। শুভা গিয়া সামনে দাঁড়াইতেই চুপিচুপি কহিল, টেলি এসেছে শুভা...

শুভা চমকিয়া উঠিল। টেলিগ্রামের খামখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, দৃঢ়মুষ্টিতে সেখানা চাপিয়া ধরিয়া স্বামীর দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, এসেছে—ফার্ষ্ট প্রাইজটা...

যোগেশ চীৎকার করিয়া উঠিল, পেয়েছি, পেয়েছি—পাবোই যে শুভা—পাবোই যে...ছেলের জীবন দিয়ে টিকিট কিনেছি, পাব না—পাব না। বড় সুখের দিন শুভা, বড়...খোকন, খোকনরে—খোক...

অকস্মাৎ ভীষণ একটা ঝাঁকি দিয়া তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু দুইটী উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়া স্থির নিশ্চল হইয়া গেল। নাসারন্ধ্র হইতে যেন নিঃশ্বাস পড়িল, সে আর তাহা ফিরিয়া গ্রহণ করিল না।

শুভা উন্মাদিনীর মতো তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, ওগো, অমন কচ্ছো কেন? ওগো...তারপর স্বামীর মৃত্যু-কঠিন অচঞ্চল চোখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই একটা মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ করিয়া বিগত জীবন স্বামীর বুকের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

অমর ও তাহার স্ত্রী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিল...

তখন মেঘ-ঘন শ্রাবণ সন্ধ্যার আঁধার বুক হইতে আসন্ন বরষার মর্ম্মান্তিক বিলাপের করুণ সুর যেন যোগেশের মৃত্যু-বার্ত্তাই বহন করিয়া সমস্ত পল্লীখানিকে বিষাদ-নিমগ্ন করিয়া দিতে লাগিল।

মণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

খাঁটী প্রেম

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

"পকু, আমি কাজ ছেড়ে এলুম বুঝলি?" কালু এসে বললে, ওর পত্নীকে। তখন সবেমাত্র পূব আকাশের বুকে উষারাণীর মধুর হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। পকু তখন শুয়েছিল চেটায়েব ওপর ছোট মেয়েটিকে কাছে নিয়ে। স্বামীর কথায় উঠে বসে, আধঘুমন্ত চোখ দুটো একবার রগড়ে নিয়ে শুধালে, "কাজ ছেড়ে দিলি?" অসীম তৃপ্তির সুর ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠস্বরে। কিন্তু বেদনা কি মেশানো ছিল না তার সাথে একটুও? তা ছিল বই কি—মাস গেলে তেরটী টাকা, এই ওদের পক্ষে যথেষ্ট। জাতিতে সাঁওতাল হলেও কালু চাকরী করে। ওদের গ্রাম থেকে কিছুদূরে এক বাঙ্গালী বাবুর বাড়ী। আঙিনায় দাঁড়িয়ে থাকা পেয়ারা গাছ থেকে একটী কঞ্চি ভেঙ্গে নিয়ে সেটীকে ছুরি দিয়ে চাঁচতে চাঁচতে কালু বললে, "হ্যাঁ।" তারপর ও অনেক দিনের পুরেণো অভ্যাসটাকে জাগিয়ে তুলে বেরিয়ে পড়ল গাঁয়ের পথে প্রিয় বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের আশায়। আপন-মনে ও পথ চলতে থাকে—চলার গতি দ্রুত। তার চোখে মুখে উছলে পড়ছে, প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দ ধারা। পথের মাঝে বন্ধুরা শুধায় আশ্চর্য্যের সুরে, "কালু কাজে যাস নি আজ?" কালু বলে, হাতে থাকা কঞ্চিটা দিয়ে পথের ধূলি উড়াতে উড়াতে,—"না রে, কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি।" তারা বলে ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে, "কেন রে, কি হয়েছিল?" কালু বলে, ভাল লাগে না নিয়ত অশান্তি; তার চেয়ে এ ঢের ভাল, সুখের চেয়ে শান্তি।" বন্ধুরা অনেকগুলি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে রাখে ওর মুখের 'পরে। ম্লানকণ্ঠে সে বলে, "বুঝলি নে ভাই, মানে ওরা হচ্ছে বাঙ্গালী, ওদের সব কথা আমি বুঝি না, এই নিয়েই হয় অশান্তির সৃষ্টি।" আবার একটু ঝাঁজের সাথে বলে, "যাক গে, ভারী তেরটা ত টাকা।" আবার ও পথ চল্‌তে সুরু করে দেয়, বন্ধুদের সঙ্গ এড়িয়ে। সূর্য্যদেবের প্রখর তেজের দীপ্তি এসে ছোঁওয়া দেয় ওর চোখে-মুখে, সারা সঙ্গে। ওর সামনের ওই মস্ত পাহাড়টাতে ওদের মত অনেক লোক কাজ করে। ওর চলন্ত পা দু'খানা সেই দিকে এগিয়ে যায় একটা নূতন কিছু কাজের সন্ধানে।

কালু চোখের অন্তরালে গেলে, পকু ত্রস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘুমন্ত মেয়েটীকে বুকে তুলে নিয়ে অজস্র স্নেহধারায় তাকে অভিসিক্ত করে দিল। বুকটা ওর থেকে থেকে দুলে উঠছিল, খুশীর জোয়ারে। এত আনন্দের বান ডাকছে আজ ওর মনে কেন? হয়ত ও আজ পেয়েছে প্রাণের কোনও ফাঁকা জায়গায় পরিপূর্ণতার আভাষ। তারপর মেয়ের হাতে দুটো কাঁচা আম দিয়ে দাওয়ার 'পরে বসিয়ে দিয়ে, কতদিনের তুলে রাখা ধানগুলো আড়ার ওপর থেকে নাবিয়ে ভিজিয়ে দেওয়ার জন্য কূয়োর পাড়ে গেল জল তুলতে। বিচিত্র নয় কি? যে কাজ কতদিন ওর স্বামী সাধ্য-সাধনা করেও ওকে করাতে পারে নি—আর আজ?

মস্ত সবুজ মাঠ। তার মাঝখানে হলদে ফুলেভরা একসারি বাবলা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সেই ছায়ায় ঘেরা পথ ধরে একদল সাঁওতাল মেয়ে ওদের কাজে পথে চলেছে। ওদের নিজেদের রচিত একটা গানের কলি গাইতে ওরা বিভোর।

"আল্‌গাভায় বসিয়ে, রাঙামাটী মাখিয়ে;
ভালরে চম্পার ফুল—পুকুর ঘাটে মাঙে তামাকুল।"

হঠাৎ ওদের সামনে,—জলতোলারতা, প্রতিবেশিনী পকুকে দেখে, ওরা গভীরভাবে বিস্মিত হয়ে, গান থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। ব্যাপার কি? যে পকুকে আজ

—"যে নদী মরুপথে হারালো ধারা"—

শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায়

এক

তরুণী গান গায়—এস্রাজ বাজায়।

তরুণ ছবি আঁকে—তুলি হাতে করে' আন্‌মনা হ'য়ে চেয়ে থাকে কোন সুদূরের পানে।

পাশাপাশি দুটো বাড়ী—একটা মেস্,—সেটায় তরুণ থাকে তার শিল্প-সাধনা নিয়ে—আপনভোলা হয়ে,—আর একটা বড়লোকের বাড়ী—যেখানে তরুণী রোজ সকাল সন্ধ্যায় সুমধুর ঝঙ্কার তোলে।

তরুণীর বাপ আছে—মা আছে—ভাই আছে—বোন্ আছে।—

তরুণের কেউ নেই। জগতের সঙ্গে ভাল করে' পরিচিত হবার আগেই তা'র সব বালাই চুকে গেছে।

তরুণ ছবি আঁকে—আর ভাবে।—

তরুণী গান গায় তন্ময় হ'য়ে—ভাববার ফুরসৎ পায় না।

তরুণ সুন্দর,—যৌবনের ছাপ ওর মুখে চোখে—।

তরুণী কালো—তবে আবেগভরা মোহময় দৃষ্টি তা'র, যৌবনের পরশও তা'র গায়ে লেগেছে।

কতদিন ধ'রে সাধনা চলে তা'দের,—পরস্পর পরস্পরের হিসাব রাখে না। চোখোচোখিও হয় না কোনদিন—অথচ পাশাপাশি দুটো বাড়ী।

দুই

দিন যায়। শীতের মেয়াদ ফুরিয়ে আসে। বসন্ত তা'র আগমনের বার্ত্তা প্রচার করে' দেয় দিকে দিকে—তরুণ তরুণীর মনে প্রাণেও।

পূব দিকে একটু একটু করে' রাঙা হ'য়ে ওঠে—নব বধূর সলাজ হাসিটির মত।

তরুণ তুলি হাতে করে'—সামনের জান্‌লার ধারে ব'সে মগ্ন থাকে তা'র শিল্পের ধ্যানে।

তরুণী জান্‌লার ধারে বসে' বিভোর হ'য়ে এস্রাজ বাজিয়ে চলে।

তরুণের ধ্যান ভেঙ্গে যায়—উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে থাকে—তরুণীর পানে।

তরুণীর নজর পড়ে না; এস্রাজের সুরে সে কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে। রাঙা আলো এসে পড়েছে তরুণীর মুখে চোখে। গায়ের কাপড় খসে গেছে। হাতের আঙ্গুল এস্রাজের বুকে ঘা দিয়ে দিয়ে চলেছে ঠিক যেন কলের মত।

তরুণের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। ছবি আঁকবার কাগজটার ওপর চলে তা'র তুলির টান—এক-একবার দেখে নেয় তরুণীর মুখ।

হঠাৎ এক সময়ে দু'জনে চোখাচোখি হ'য়ে যায়। তরুণের চোখে অপূর্ব্ব দীপ্তি—মুখ তার হাসিতে ভরা; তরুণীর বাজনা থেমে যায়। গায়ের কাপড় ভাল করে' জড়িয়ে নিয়ে খোলা জান্‌লাটা জোর করে' বন্ধ করে' দেয়। ওপর হতে নীচে নামার শব্দও তরুণের কাণে আসে।

তিন

তরুণীর বাড়ী ভীষণ সোরগোল!

তরুণীর বাপ বেতগাছটা মাটিতে ফেলে বলেন—আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছি সামনের মেসের ঐ ছোঁড়াটাকে। সকালবেলা জানলায় বসে প্রেম জানানো হচ্ছে—আমার মেয়েকে! বেশ সাজা দিয়েছি—বাছাধনকে আর শীগ্‌গির বিছানা ছাড়্‌তে হবে না।—নিজের বাহাদুরীতে নিজেই খুসী হ'য়ে যান।

পাশে দাঁড়িয়ে তরুণী—তাঁর মেয়ে। সে কি ভাবে।

একটু পরে বলে—বাবা ওতে ওর শিক্ষা হ'বে না—আমি নিজে গিয়ে তাঁকে শিক্ষা দিয়ে আসবো।

জোর করেই বাবাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তরুণী। বেত গাছাটাও সঙ্গে নেয়।

সামনের বাড়ীর মেস। তরুণের চীৎকারে সব ছেলেরাই উঠেছে। তরুণীর বাপের বেতের আঘাতে তরুণের সমস্ত শরীর কেটে গেছে। যন্ত্রণায় বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করছে।

মারের সময় কোনই প্রতিবাদ করেনি সে। মেসের ছেলেরাও বাধা দেয় নি। তা'রা বলে—ছোকরা বাঙ্গালী ছেলের মুখ ডোবালে।

তরুণ কারও সাহায্য চায় নি।

বেলা বেশ একটু একটু বেড়ে উঠেছে। আলোয় আলোয় সব দিক্ ভরে' গেছে।

চার

তরুণ চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে।—

তরুণী বেত হাতে এসে দাঁড়ায় বাপের সঙ্গে।

তরুণী তরুণকে বেতের আঘাত করতে গিয়েই চম্‌কে ওঠে—বুকের ওপর তা'রই একটা ছবি দেখে।

তরুণী ভুলে যায়—কি করতে সে এসেছে। আস্তে আস্তে বসে' পড়ে তরুণের পাশে।

তরুণের চোখ তখন পৃথিবীর পরপারের স্বপন দেখ্‌ছে। ধীরে ধীরে ছবিখানা উঠিয়ে নেয় তরুণী—তরুণের বুক হ'তে।

তরুণীর ভাবনার 'খেই' হারিয়ে যায়। ছবিটার মধ্যে তা'রই কুৎসিত চেহারা কি প্রাণময়ী করে' ফুটিয়ে তুলেছে তরুণ। তা'কে যে কেউ এমন ভাবে ভাব্‌তে পারে—আজই সে এই প্রথম জান্‌লো।

ছবিখানা সে রেখে দেয় তরুণের বুকে। আঁচলের কাপড়টা দিয়ে—চোখের কোণের রক্ত মুছিয়ে দেয় তরুণের।

তরুণীর বাপ চেয়ে থাকেন—নিশ্চল পাথরের মত। একটু পরে ঠেলা দেন তরুণীকে—চল্‌রে খুকী, বাড়ী চল্।

সব তখন হিম—স্তব্ধ।

হাহাকারে ভরে' ওঠে বৃদ্ধের প্রাণ।

পাশের বাড়ী হ'তে একটা গানের শেষ ক'টা লাইন—ভেসে আসে—

"আমি আপন হারায়ে দিশেহারা—
তুমি এতটুকু হারায়ো হারায়ো বঁধু হে—
আমার জীবন নদীর ওপারে।"—

সাঁঝের আঁধার কুন্তল তখন ছড়িয়ে পড়ে—দিগ্‌বিদিকে—সহরের বুকেও।

মণি গঙ্গোপাধ্যায়

হার-চোর

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য, বি-এ

বাকী খাজনার দায়ে জমীদারের পায়ে কুঁড়েখানা ও তৎসংলগ্ন ভদ্রাসনটুকু সমর্পণ করিয়া রহিম কলিকাতায় আসিল। যেদিন সে কলিকাতায় আসিল, সেদিন ট্রেণে সারাপথই তাহার চোখ দুইটী জলসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কুঁড়েখানাতে কত স্মৃতি মাখানো! ওইখানে করিম চাচা জন্মিয়াছে, ওইখানকারই মাটী লইয়াছে। ওই পাশের বড়ো তেঁতুল গাছটা চাচার কোন সুদূর প্রপিতামহের স্নেহস্পর্শে আজ এতবড় হইয়াছে। পাশের বাগানটায় করিম চাচা নিজহাতে মর্ত্ত্যমানের ঝাড় বসাইয়া গিয়াছে—তাহার বংশাবলীতে আজ বাগানখানি ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার বেশ মনে পড়ে, রাতে চাচার সহিত বাগানের মাচায় শুইয়া লিচুগাছে দড়ি দিয়া বাঁধা কানেস্তারা বারবার বাজাইয়া বাদুড় তাড়াইত। দিনের বেলায় কোমর বাঁধিয়া দেড়বিঘা বাগান কোপাইতে আরম্ভ করিত। তারপর চৌদ্দ বছর বয়সে যেদিন গহর বিবিকে লইয়া ঘরে আসিল, তাহার বেশ মনে পড়ে সেদিন জ্যোছনা রাত্রে স্নেহময় চাচা দাবায় বসিয়া নিজেই শানাই বাজাইয়াছিল। সে কতদিনের কথা।

এক বছর অজন্মা গেল। সেবার বৃষ্টি হয় নাই বলিলেও হয়। মাঠ পরের কথা, বর্ষায় পুকুর পর্য্যন্ত ফুটিফাটা। সারা বাংলায় চাষীর করুণ আবেদন বৃষ্টির মালিকের কানে পৌছায় নাই। সেবার বিশ্বসংসারের মালিক জব্দ করিলেন। কিন্তু তাহার সাড়ে দশ বিঘা জমী ও ভদ্রাসনের মালিক প্রতাপশালী জমিদারের দরোয়ান উঠানে লাঠি ঠুকিয়া বলিয়া গেল, আগামী বৎসরের প্রথম কিস্তিতে সুদসমেত খাজনা না দিলে পরিণাম যে কি হইবে তা সে যেন ভালরকম হৃদয়ঙ্গম করে।

সে-বছরের ত' কথা হইল এই। পরের বছর রহিমের ম্যালেরিয়া ধরিল। সে কি জ্বর! কি নিয়মিত আগমন ও প্রত্যাগমন—প্রায় প্রতিদিনই! অতবড় যে শরীরখানা, তা একান্তই অকেজো হইয়া সারা বছর ঘরের মাদুরে লুণ্ঠিত হইয়াছে। এ-বছরও অতিকষ্টে হাতে-পায়ে ধরিয়া, কান্নাকাটি করিয়া, কোনোমতে খাজনা রেহাই পাইল।

কিন্তু তার পরের বছরের জন্য বিধাতা যে আরও নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট সঞ্চিত রাখিয়াছেন, তা তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। সাতদিনের জ্বরে তাহার একটী মাত্র ছেলে—মাত্র তিন বছরের—তাহার ও গহরের অন্তরের ধন—রজবালি তাহাদের ফাঁকি দিয়া পলাইল। আর কত সয়! সামান্য·দরিদ্র চাষী সে, দিন আনে দিন খায়—ছেলের মুখে একটা ডাক্তারের আরক পড়ে নাই—মুখে দুটো ডালিমের দানা পড়ে নাই—তাহার ও গহরের এত স্নেহ-যত্ন, সেবা-শুশ্রূষা গ্রাহ্য না করিয়া—উঃ! তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে।

সে-বৎসর না হয় ছেলে মরিয়াছে, কিন্তু জমীদার ত মরে নাই। যথাসময়ে উঠানে আসিয়া মহাবিক্রমে দরোয়ান দাঁড়াইল।

রহিম বলিল, "দরোয়ানজী, যা' হবার তা' ত' হ'য়ে গেল—বাবুকে এ-বছরও মাপ করতে হচ্ছে।"

দরোয়ানজী বলিল, "ইয়ে বড়ো আন্দার হলো দেখতিছি।" সাশ্রুনেত্রে রহিম বলিল, "জানো ত' ছেলেটা—।" "আরে, লেড়কা ত' সবাইকো মরতিছে। ও ঝুটমুট বাৎ হামি শুনবো না। হামি বাবুজীকে বলতিছি। খাজনা নেই দেও ত' দোসরা জায়গায় ঘর বানাও। ইয়ে ছোড়কে যাও না।"

ইহার দিন পনেরো পরে একজন চৌকীদার তাহার

ভদ্রাসনের উপর ঢোল বাজাইয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া গেল। রহিম নিশ্চল জড়ের ন্যায় তা' দেখিল। তারপর ঘরের মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। শেষে কি তাহার এই ভদ্রাসনটুকু সত্যই নীলাম হইবে? পায়ে হাতে ধরিয়া এ-বছরটাও রেহাই হয় না? এতদিন যে তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনের অতীত স্মৃতিটুকু বর্ত্তমানের সহিত সূক্ষ্ম স্মৃতি সূত্রে জড়িত ছিল, তা' এইবার নিঃশেষে লোপ পাইল। তবু একবার শেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য জমীদারের করুণাভিক্ষা করিতে গিয়া অশেষ লাঞ্ছনা লইয়া নিঃশব্দে ঘরে ফিরিল।

রাত্রিতে রহিম ডাকিল 'গহর, কাছে আয়।'

গহর দুঃখী স্বামীর বুকের কাছে মাথা রাখিয়া বলিল, "কি বলছো?" "বামুন বাড়ীর মেজবাবু বলে, ক'লকেতায় চ', দেশলাই কলে চাকরী ক'রে দেবো। দু'পয়সা হবে।"

"তাই চলো।"

'এ ভিটে ছেড়ে যেতে তোর মন কেমন করবে না, গহর?"

গহর রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মন কেমন করিবে না? এই মাটীতে রজবালি ঘুমাইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইবে—মন কেমন করিবে না?

কলিকাতায় পৌছাইয়া রহিম যেন সত্য-সত্যই এইবার তাহার রজবালিকে হারাইল। এতদিন যেন তাহার রজবালি তাহার সেই পল্লীতে, সেই কুঁড়েখানায়, সেই বাগানে, পুকুরে এক হইয়া মিশিয়া তবু তাহাদের জীবনের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় ছিল—বাগান হইতে হাওয়া বহিলে সে-হাওয়ায় যেন তার স্পর্শ সুস্পষ্ট ছিল—শুধু ডাকিলে সাড়া দিত না, কাঁদিত না, হাসিত না—কিন্তু এই কলিকাতায় আসাতে যেন রজবালি তাহাদের জীবনের বাহিরে চিরকালের জন্য চলিয়া গেল। এই কলিকাতায় কেউ কারো মুখের দিকে চাহে না, সবাই দিশাহারার মত ট্রামে, বাসে, রাস্তায় ছুটিয়াছে—কে আর ওই নগণ্য পুত্রহারার অন্তরের সংবাদ লইবে?

কলিকাতায় আসিয়া রহিম একখানা খোলার ঘরভাড়া লইল। রাত্রে কিন্তু সে ঘরে ভাল ঘুম হইত না। দেশের সেই কুঁড়েখানা যেন মায়ের মত তাহার সহিত কথা কহিত, রাত্রে ঘুম পাড়াইত। তাহার সহিত তাহার নিজের সুখ-দুঃখের যেন আদান-প্রদান হইত। কিন্তু কলিকাতায় এই ভাড়াটে ঘরে সে শত চেষ্টা করিয়াও সেই প্রাণের সংযোগটুকু স্থাপন করিতে পারিল না। যেন সে এ-ঘরে পরবাসী, এমনি। প্রায় সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি শুনিত, আর রজবালির সেই রোগক্লিষ্ট মুখখানা বারংবার চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিয়া তাহার শয্যাকে কণ্টকশয্যা করিয়া তুলিত।

দেশলায়ের কলে সে কাজ করিতে লাগিল। সারাদিন নিদারুণ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম! ইহাই বরং তাহার ভাল। কারণ সে কাজে অনেকটা সময় অন্যমনস্ক থাকিতে পারিত।

সকাল সাতটা হইতে বৈকাল ছ'টা পর্য্যন্ত খাটিলে দৈনিক বারো আনা পয়সা। দুপুরবেলা ঘণ্টাখানেক ছুটী। সেই সময় সে যা'-হোক কিছু খাইত, এবং অবসরটুকুতে তাহার পাশের আমীরালির সহিত নানা কথাবার্ত্তা কহিত। আমীরালির সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল খুব। সে যে-দিন না আসিত, সে-দিনটা তাহার বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিত, কাজে কিছুতেই মন দিতে পারিত না।

দিন দুই আমীরালির কামাই হইল। তারপর সে দেখিল তাহার মুখখানা শুষ্ক এবং বড়ো বিষণ্ণ। বলিল, "কি হয়েছে আমীরালি?"

আমীরালি চিন্তাকুলভাবে জবাব দিল, "বড় মুস্কিল ভাই। ছেলেটার দু'দিন খুব জ্বর। সাহেবের কাছে কিছু অগ্রিম টাকা চাইলুম, তা'তে সাহেব মহা চ'টে 'ড্যাম, ফুল' এমনি কত কি বললে।"

হঠাৎ রহিম উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উচ্চকণ্ঠে বলিল, "এতো বড়ো আস্পর্দ্ধা 'ড্যাম ফুল' বলে? ছোটলোক কোথাকার!" আমীরালির চাকুরী অনেক দিনের। কাজেই, জগতে ছোট হইয়া বড়র বিচার করিতে

যাওয়ার পরিণাম সে ভালই বুঝিত। সে তাড়াতাড়ি রহিমের মুখে হাতচাপা দিয়া বলিল, "চুপ করো ভাই, ফোরম্যান সাহেব শুনতে পেলে এক্ষণি মুস্কিল হবে।"

রহিম ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কোমর হইতে দু'-তিন পাক খুলিয়া, চারটে টাকা বাহির করিয়া বলিল, "এই নাও, চারটে টাকা। এই থেকে এখন উপস্থিত খরচ ক'রো।"

মরুর পথিক যেন জলের সন্ধান পাইল। আমীরালি দৃষ্টি তেমন-ই আগ্রহান্বিত, তেমনি কৃতজ্ঞতাভরা, তেমন-ই করুণ। বলিল, "এ কোত্থেকে পেলে ভাই?" সে জানিত যে, এখনও ত্যাহাদের 'হপ্তা' হয় নাই।

রহিম বলিল, "এ চ'রটে টাকা, ঘরভাড়ার দরুণ। তা' না হয় একটু দেরী হবে।"

তাহার দুর্দ্দিনের এমন দোস্তও ছিল! সে আর কোনো আপত্তি না করিয়া টাকা কয়টী লইল।

সে-দিন রবিবার। কারখানা বন্ধ। আমীরালি ঘরে। তাহার ছেলে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ বাহিরে ডাক আসিল, "আমীরালি?"

আমীরালি দোর খুলিতেই দেখিল, রহিম। তার হাতে একটা ঠোঙ্গায় বেদানা ও আঙ্গুর। আমীরালি বলিল, "এ সব কি?"

রহিম বলিল, "খোকার জন্মে। কৈ সে?"

ঈষৎ সপ্রতিভ হইয়া আমীরালি বলিল, "এই সে-দিন চার টাকা দিয়েছো। সে দেনা এখনও শোধ করতে পারি নি। আবার আজ এই সব কিনে আনলে?"

হাসিয়া রহিম বলিল, "সে টাকা তোমার জন্মে খরচ করতে দিই নি, আর এ আঙ্গুর-বেদনাও তোমার জন্মে আনি নি। তুমি বলবার কে?"

আমীরালি সজল চক্ষে মনে মনে বলিল, "উপর-ওয়ালাই দেনেওয়ালা।"

রহিমের বাসার কাছে কারখানা যাইবার পথে এক এটর্ণীর বাড়ী। প্রকাণ্ড বাড়ী; পাশের গ্যারেজের প্রকাণ্ড দু'-তিনখানা মোটর এবং তদনুরূপ আসবাব-পত্র ও ঠাট-ঠমক সদর্পে বাড়ীর কর্ত্তার অসামান্য বৈভব ঘোষণা করিতেছিল। সামনের রোয়াকে প্রতিদিনই কতকগুলি উৎকলভৃত্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গল্প-গুজব করে। ফটকের সামনে এক পশ্চিমদেশীয় কুড়ি বৎসরের অক-র্ম্মণ্যতাজনিত ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও সঙ্গীন খাড়া করিয়া চাকুরী বজায় করে। সন্ধ্যাবেলা কারখানা হইতে ফিরি-বার সময় রহিম দেখিত, সম্মুখের বৈঠকখানা ঘরে বাড়ীর অনেকগুলি শিশু মহাকোলাহলে খেলাধূলা করিত। সে দূরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া শিশুদের খেলা দেখিত। তাহার বড় ভাল লাগিত। শিশুদের খেলা দেখিতে সব মানুষেরই ভাল লাগে। কারণ, সব মানুষই যে এক সময় শিশু ছিল।

রহিমেরও ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে। উঠানে সে তার ভাইদের সহিত খেলা করিত। করিম চাচা পর্য্যন্ত কতদিন তাহাদের সাথে কানামাছি খেলিয়াছে। জনাবালি ও পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সে মার্ব্বেল খেলিত। তাহার চক্ষে জল আসে।

বছর দুই বয়সের একটী শিশু ছিল। সেও অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলা করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু তখনও ভাল হাঁটিতে শেখে নাই বলিয়া সময় সময় পড়িয়া যাইত এবং সকৌতুকে অস্ফুট হাসিয়া দুর্বোধ ভাষায় কত কি বলিত।

রহিম প্রত্যহই কারখানা হইতে ফিরিবার সময় দেখিয়া যাইত। ওই শিশু যেন তাহার সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ক্লান্তি যাদুস্পর্শে মুছিয়া লইয়া তাহার মনস্তল নির্ম্মল শুভ্র করিয়া দিত। যতক্ষণ না দেখিতে পাইত, তত-ক্ষণ সে সতৃষ্ণ চক্ষে দাঁড়াইয়া থাকিত। আবার বড়লোকের বাড়ীর সম্মুখে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস হইত না। সে যে গরীব—লোকে সন্দেহ করিতে পারে, কনষ্টেবল হয়ত বলিতে পারে, "থানামে চলো।" সে যে গরীব—সৃষ্টির বাতিল। বিশ্বসংসারে স্থানের ত' অভাব নাই, কিন্তু বড়লোকের বাড়ীর ছায়ায় কেন? সময় সময় একটা খুব

বড় দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বভুক্ষা-ক্ষীণ হৃদয়টাকে আলোড়িত করিয়া বাহির হইয়া পড়িত।

একদিন কারখানা হইতে ফিরিবার পথে দেখিল, শিশুটী অতিকষ্টে জানালার গরাদ ধরিয়া মধ্যাকর্ষণের সহিত যুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রহিম তাহার দিকে চাহিতেই সে হঠাৎ অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিয়া মাড়ী দুইটী বাহির করিয়া হাসিয়া উঠিল। রহিম কোমরের কাপড় হইতে একটী লজেঞ্চুস বাহির করিয়া, চারিদিকে চাহিয়া, তাহার হাতে দিল।

পরে একেবারে দিন তিন-চার কই আর খোকাকে দেখিতে পায় না। তাহার হৃৎপিণ্ডটা ধ্বক করিয়া উঠিল —তাই ত, তাহার কোনো অসুখ-বিসুখ করিল না কি? কই, আর ত সে জানালার ধারে তেমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না? তাহার উদ্দেশে আনীত লজেঞ্চুষগুলি সে নিত্যই বিফল মনে ফিরাইয়া লইয়া যায়। দূরের ফুটপাথ হইতে জানালার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে—যদি সেই শিশুদেবতাটির দর্শন মিলে, কিন্তু কোথায় কে? নিষ্ফল বেদনা লইয়াই তাহাকে ফিরিতে হয়।

একদিন ফিরিবার সময় অভ্যাসমত চাহিয়া দেখিল। ওই না, তাহার সেই ক্ষুদ্র দেবতাটি? ওই ত, সেইভাবে জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তবে সে যাহা ভাবিয়াছিল ঠিক তাহা-ই? নিশ্চয় তার ভারী অসুখ করিয়াছিল! আহা!

সারা হৃদয়খানা চক্ষের ভিতর লইয়া সে ওই শিশুটীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। বড় ইচ্ছা হয়, একবার কোলে তুলিয়া, তার ওই পাণ্ডুর গণ্ডে একটা চুমা দেয়। নিজের এই দুরাকাঙ্ক্ষায় নিজেই হাসে। সে যে একজন দেশলাই কলের মজুর, আর ও লক্ষপতির শিশু-সন্তান।

ও পরের ছেলে। পরের ঘরে জন্মিয়াছে। তাই না তাহাদের উভয়ের মধ্যে দুরতিক্রম্য সিন্ধু রচিত হইয়া গিয়াছে? বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত সে শুধু আকুলনয়নে চাহিয়া থাকিবে—এ অধিকারও কি তাহার নাই?

রজবালির কথা মনে পড়ে। এতদিনের সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া শিশুর-ই মত সে হাউ হাউ করিয়া উঠিল।

সে-দিন কারখানার ছুটী। রহিম সে-দিন একটু সকাল সকাল আসিয়া ফুটপাথে দাঁড়াইল। শিশুটী ঘরের মধ্যে খেলা করিতেছে। আহা! প'ড়ে গেল। লাগিয়াছে বোধ হয় খুব। তাই ত, চোখের কোলটা দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া উঠিল যে!

রহিম চাহিয়া দেখিল কোথাও কেহ নাই। উৎকলবাসী ভৃত্যদের দিবানিদ্রা তখনও সমাপ্ত হয় নাই, তাহারা সামনের রোয়াকে অকাতরে ঘুমাইতেছে। দরোয়ানজী বোধ হয় তখনও অন্তঃপুর হইতে কর্ত্তব্যস্থানে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই। রহিম আত্মহারার মত দৌড়াইয়া গিয়া বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া শিশুটীকে বুকের উপর তুলিয়া লইল। শিশুটী বোধ হয় ভয়েই কাঁদিয়া উঠিল।

একজন ভৃত্য হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। অন্যান্য ভৃত্যেরাও উঠিয়া পড়িয়া কোলাহল করিয়া উঠিল, চোর! চোর!! বাড়ীর সম্মুখে রীতিমত ভীড় জমিয়া গেল।

বড়ীর খোদকর্ত্তা এটর্ণী বাবুও উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। তিনি লোক চরাইয়া খান,—পাকামাথা। রহিমের মুখের দিকে চাহিয়াই বলিয়া দিলেন, "সেটা খোকার গলার হারের লোভে এসেছিল। অ হা-হা, মেরে-ধরে কাজ নেই, পুলিশের হাতে দিচ্চি। ওরে, ডাকত একটা কনষ্টেবলকে?"

কাজেও হইল তাই। রহিম প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ নিশ্চল। দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ ও লাঞ্ছনার ভার খোদা তাহার একলার মাথার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। এত ভার সে বহন করিবে কি করিয়া?

কুমারেন্দ্র আচার্য্য

মোহ

রায়বাহাদুর শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এ, ও-বি-ই

—"সে কি কথা, আমি ত ভেবেছিলাম যে, তুমি খুব সুখী হয়েছ। নরেনবাবু অতি ভদ্রলোক, নিরীহ, সে বেচারি রাগতে জানেন না। সকলেই ত তাঁর সুখ্যাতি করে।"

—"লোক ভাল আর স্বামী ভাল অনেক তফাৎ। দেখো, সকালে তিনি মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত, সারাদিন কাটে কাছারিতে, সন্ধ্যার পর মোকর্দ্দমার নথি নিয়ে থাকেন। আমি ত সর্ব্বদাই একেলা। বলত এও কি আমার ভাল লাগে?"

—"তা ভাই, ব্যস্ত না হলে ত টাকা আসে না। যদি নথিহীন উকীল হতেন, তা হলে টাকা আস্তো কোথা থেকে। তোমার স্বামীর রূপ, গুণ, যৌবন, টাকা, সবই আছে। স্বভাবও খুব ভাল। এর চেয়ে আশা করাই অন্যায়।"

—"হ্যাঁ, সবই আছে, শুধু আসলটা ত দেখতে পাই নি। রুচিটাও বিভিন্ন। এই দেখো, আমি যদি নভেল লিখে শোনাতে চাই, বলেন—জীবন গদ্যময়, পদ্য আর ক'দিন থাকে? আমি যদি গান গাই, দুনিয়াব লোক জমে যায়, তার কিন্তু সাড়ও হয় না। বল দেখি, এতে কষ্ট হয় না।"

—"হ্যাঁ ভাই, মনে কষ্ট হয় বটে, তবে তোমারও ত বোঝা উচিত যে, এটা তাচ্ছল্য নয়, এটা সময়ের অভাব। তারপর এই ত এক বছর বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়ে হলে তখন আর একেলা বোধ হবে না।"

—"ওঁর জীবনে যেন রোমান্স নেই। নেহাৎ একেবারে মুটেগিরি।"

—"বা, সে কি? তোমাদের বিয়েটাই যে রোমান্টিক্। আমরা ত ভাবি নি যে, ভালমানুষ নরেনবাবু চেঞ্জে গিয়ে তোমায় দেখে ভুলে যাবেন। তবে তুমি বিদুষী, রোমান্স ভক্ত, উপন্যাস-লেখিকা, কবি, তুমি ত জান্তে যে, নরেনবাবু সাদাসিদে লোক। তুমিই বা বিয়েতে তখন রাজী হলে কেন?"

—"তা সে কথা ভেবে এখন কি হবে? যদি ভুলই হ'য়ে থাকে, চারা ত নেই। আগে যখন গল্প লিখতাম, কত বুঝদার যুবা শুনবার জন্যে আগ্রহ করে বসে থাক্‌তো, আমি লেখা পড়্‌তাম, তারা তন্ময় হ'য়ে শুন্‌তো, আর বাহবা দিত। এখন আর উপন্যাস লিখ্‌তে ইচ্ছে করে না।"

—"ওটা ভাই, তোমার ভুল। বিয়ের আগে অনেকেই মৌমাছির মত চাকে এসে জোটে। বিশেষ তোমার মত রূপবতী বিদুষীর কাছে। তাদের তখন ভালমন্দ বিচার কর্‌বার ক্ষমতা থাকে না। তা এখনও ত মাসিক-পত্রিকায় তোমার গল্প পড়্‌বার জন্যে অনেকেই ব্যস্ত হ'য়ে থাকেন। লিখ্‌লেই পার।"

—"তা'তে কি আনন্দ হয়? লিখ্‌বো আর পাঁচজনে সমালোচনা কর্‌বে! ঘরের লোকে যদি ধরে দেয় তাতে গল্পটা নিখুঁৎ হয়। ভাল কথা, রাজুদাদা কি এসেছেন?"

—"হাঁ, দাদার কলেজ বন্ধ হয়েছে। কদিন হ'ল এসেছেন।"

—"বেশ ত তাঁকেই সন্ধ্যার সময় পাঠিয়ে দিও। তিনি খুব ভাবুক, এলে আমার নতুন লেখাটা তাঁকে দেখিয়ে নোবো।"

রেখা আজ একবৎসর পরে মামার বাড়ী আসিয়াছেন। বাল্যবন্ধু বিদুষী রমার বিবাহের পর, এই প্রথম তাঁহার সঙ্গে দেখা। রেখার দাদা রাজীব, রেখা ও রমা একই কলেজে পড়িতেন। জানাশুনা বেশ ছিল। কলেজে এম-এ পড়িতে পড়িতে রাজীব যখন সহপাঠী এক যুবতীর সহিত রোমান্স্ করিতেছিলেন, তখন হইতে তাঁহার নভেল লেখার ক্ষমতা হঠাৎ আসিয়া পড়িল। মনের আবেগে কবিও হইয়া পড়িলেন। একধারে কবি ও নভেলিষ্ট্ হইয়া মাথায় বড় বড় চুল রাখিলেন, মাথায় তেল মাখা

অভ্যাস তুলিয়া দিলেন। পেড়ে ধুতি ত্যাগ করিলেন। কেবল ঢিলা পাঞ্জাবী আর মোটা থান ধুতি আশ্রয় করিলেন। সহপাঠিনীর পিতা রোমান্সের কথা জানিতে পারিয়া রাজীবকে যখন তাঁহার কন্যা বিবাহ করিতে বলিলেন, তখন রাজীব বেকার অবস্থায় বিবাহ করা দোষাবহ, এ সম্বন্ধে প্রকাণ্ড এক লেক্‌চার দিলেন। নায়িকার পিতা বলিলেন যে, বেকার অবস্থায়, বিশেষ পাঠ্যাবস্থায় রোমান্স প্রাক্‌টিস্ না করাই ভাল। তাড়াতাড়ি কন্যাকে কলেজ ছাড়াইয়া তিনি বিবাহ দিলেন। রাজীব উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম লইয়া হিন্দু ইউনিভার্সিটীতে পড়িতে গেলেন। তৎপর কয়েক বৎসরে এম-এ পাশ করিয়া কোন এক মফঃস্বল কলেজে প্রোফেসারি করিতে লাগিলেন।

দুই

সন্ধ্যার সময় রাজীব রমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া নরেনবাবু খুসী হইলেন। স্ত্রীর কাছে উপরে লইয়া গিয়া বলিলেন—এই নাও, তোমার রাজুদাদা। রোমান্সে ইনি এক্সপার্ট, তোমার নতুন গল্পটা ইনি দেখে দিতে পার্বেন।”

রমার ত আনন্দের সীমা নাই। নরেনবাবু অফিস-ঘরে নামিয়া আসিলেন।

এক বৎসরে রমার জীবন-প্রবাহ কিরূপে বহিয়াছে, সঙ্গী পাইয়াও অদৃষ্ট বিপর্য্যয়ে নিঃসঙ্গজীবন কাটাইতেছেন, আন্‌-রোমান্টিক স্বামীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক বৃত্তি সকল কি করিয়া লোপ পাইতে বসিয়াছে, এই সব বলিতে বলিতে রমার নেত্র আর্দ্র হইয়া আসিল। বুকের বোঝা অনেকটা রাজীবের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া রমা নিজের দুঃখ হাল্কা করিলেন। রাজীব এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করিতে ছাড়িলেন না। রমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইলেন; রমার শেষ প্রকাশিত পুস্তক 'মন্দার আত্ম-কাহিনী'র উল্লেখ করিয়া রাজীব বলিলেন—“বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক বেরোয় না। শরৎবাবু, নরেশবাবু, এমন কি রোমা রোঁলাকেও নারী চরিত্র বিশ্লেষণে তুমি হারাইয়া দিয়াছ রমা দেবী! রমা বলিলেন—হ্যাঁ, সংবাদ-পত্রে ও মাসিক-পত্রিকায় খুবই ত সুখ্যাতি করেচে, কিন্তু তোমার মত ঔপন্যাসিক যে বইখানির সুখ্যাতি কর্‌লে, এতেই আমার তৃপ্তি।”

রাজীব—“দেখো, গল্পের চরিত্রগুলি কি সুন্দর এঁকেছ। মনের ভাব এত স্বাভাবিক, এত করুণ, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে, ছত্রে ছত্রে, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, নায়িকার কি মর্ম্মভেদী তীব্র যাতনা! পড়লে মনে হয় সত্য ঘটনা। আচ্ছা, অনেকে কিন্তু বলেন যে, বইখানি তোমারই আত্মকথা। সত্যি নাকি?”

রমা—“কতকটা সত্যি বটে। নিজে ভুক্তভোগী না হ'লে অত করে রং ফোটাতে পারা যায় না। যে দরদী, সে না হলে দরদ বোঝাতে পারে না।”

রাজীব—“তা হলে তোমার জীবনটি কি ট্রাজিডি! আচ্ছা, সবটা বোধ হয় তোমার আত্মকাহিনী নয়। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, মাপ করো যদি।”

রমা—“কি বল না? আমার জীবনে কিছু লুকোচুরি নেই।”

রাজীব—“আচ্ছা, এই যে মন্দাকে অসতী দেখিয়েছ—”

রমা—“ওঃ, আর জেরা কোরো না। পাঠক-পাঠিকারা নিজের নিজের পছন্দমত উপসংহার করে নিতে পারেন।”

রাজীব—“এখন সব বুঝতে পেরেছি। আমরা ভাব্‌তাম তুমি খুব সুখী। সে ভুল আমার আজ ভাঙ্গল।”

রমার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। খানিকক্ষণ সহানুভূতি দেখাইয়া রাজীব কাল আসিবেন অঙ্গীকার করিয়া চলিয়া গেলেন।

তিন

রমার এইবার গল্প লিখিবার নূতন উদ্যম হইয়াছে। যেটুকু লেখেন, রাজীবকে পড়িয়া শুনান, দুইজনে নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ, প্লটের সমালোচনা করেন। একদিন সন্ধ্যার সময় রাজীব আসিয়া শুনিলেন যে, নরেনবাবু একটা মোকর্দ্দমার পরামর্শের জন্য ব্যারিষ্টারের বাড়ী গিয়াছেন। উপরে আসিয়া দেখিলেন, রমা একেলা

নরেন—"ঠিক বলেছ, রাজীব। আমিও বুঝি যে, রমাকে আমি কাজের জন্যে, তেমন দেখ্‌তে পারি নি। কিন্তু দেখো, কিসের জন্যে এ ব্যস্ততা। রমার জন্যেই ত টাকা। তুমি ত অনেকদিন থেকে আমায় জান। আমি মোটেই রোমাণ্টিক্ নই। আমি একেবারে সাদাসিদে মানুষ। স্ত্রীকে ভালবাসা, মুখে পঞ্চাশবার তোমায় ভাল বাসি, তোমায় ভালবাসি না বল্লে কি হয় না? আমি অত নভেলিয়ানা জানি না। স্ত্রীর ত কোনই অভাব আমি রাখি নি। আমার ভালবাসা আমিই জানি। রমা মনে করলেই ত গৃহস্থালী একটু দেখ্‌তে পারে, নেহাৎ চাকরদের ওপর ছেড়ে না দিয়ে। ওর বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের সন্ধ্যেবেলা নিমন্ত্রণ করে গান-বাজনা এ সব কর্ত্তে পারে। ওর কেবল নভেল লেখা, আর রোমান্স ভাবা, ঐ করে আরও মন খারাপ কর্‌ছে।"

রাজীব—"আপনি জানেন না। রমার যে রকম প্রকৃতি, তা'তে ও রোমান্স চায়, ভাল কাপড়, গয়না, মোটরকার, এসব চেয়ে ও ভালবাসাই চায়।"

নরেন—"দেখো, আর ঐ মৌখিক ভালবাসার কথা বোলো না। তোমরা উপন্যাস নিয়ে থাকো, আমায় একটা বড় মিটিং এ যেতে হবে।" এই বলিয়া নরেনবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

সাত

টাউন হলে আজ বিরাট সভা। 'হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ বিল' লইয়া আলোচনা হইবে। দেশের প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারকেরা হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিবেন। দেখিতে দেখিতে বিরাট হল জনতায় ভরিয়া গেল। সমাজ-সংস্কারকের দল, এমন কি কতকগুলি শিক্ষিতা স্ত্রী বক্তাও আইনের সার্থকতা বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহারা 'আর্টের বিকার', 'অবাধ প্রেম', 'স্বেচ্ছায় ও অল্পায়াসে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ', 'মেয়াদি বিবাহ' ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রথার সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে কেহই উঠিলেন না দেখিয়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক পার্শ্বস্থিত নরেনবাবুকে হিন্দু বিবাহের স্বপক্ষে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের জজ। তিনি বলিলেন যে, দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, শরীর অসুস্থ। যদি নরেনবাবু দয়া করিয়া বক্তৃতা করেন। নরেনবাবু বলিলেন—সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিবার তাঁহার অভ্যাস নাই, তাহা হইলেও এরূপ সমাজ-ধ্বংসকারী আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিবেন। যখন নরেনবাবুর মত সুপুরুষ যুবক বক্তৃতা করিবার জন্য দাঁড়াইলেন, সকলেই ভাবিলেন যে, আধুনিক অনেক যুবাদের মত তিনিও আইন সমর্থন করিবেন। তাঁহার সুললিত স্বরে বিরাট সভা মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ করিয়া রহিল। যুক্তির পর যুক্তি শাস্ত্র মহাসাগর মন্থন করিয়া নায়াগ্রা জল-প্রপাতের মত যুবার বক্তৃতা চলিতে লাগিল। হিন্দু বিবাহ স্বর্গীয় বন্ধন, প্রেম পবিত্র ও স্বর্গীয়, প্রেমের বন্ধন বাহিরে আড়ম্বর না দেখাইলেও প্রগাঢ় ও গভীর, স্ত্রী-স্বামীর সহধর্ম্মিনী, এই সকল কথা প্রাঞ্জল অথচ ওজঃস্বিনী ভাষায় এরূপ বক্তৃতা করিলেন, যে, সভাস্থিত সহস্র সহস্র চক্ষু এই নবীন বক্তার মুখের দিকে অনিমেষ চাহিয়া রহিল। বক্তৃতা শেষ হইলে করতালি আর থামে না। প্রকাণ্ড সভাগৃহে মেঘ গর্জ্জনের মত ধ্বনিত হইতে লাগিল। পবিত্র বিবাহ বন্ধনের জয় হইল। সভাস্থ সকলেই আইনের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিলেন, কেবল মুষ্টিমেয় লোক আইনের সমর্থন করিলেন। নবীন বক্তার নাম জানিবার জন্য সকলেই উদ্গ্রীব। যখন সভাস্থ সকলে শুনিলেন যে, তিনি উদীয়মান উকীল নরেনবাবু, তখন সকলে 'জয় নরেনবাবুর জয়' বলিয়া জয়ধ্বনি তুলিলেন। পরদিন সংবাদ-পত্রে নরেনবাবুর বক্তৃতার ভূরিভূরি প্রশংসাবাদ প্রকাশ হইল।

আট

যখন সভাস্থলে নরেনবাবু বিবাহ-বন্ধনের স্বর্গীয় পবিত্রতা ও সত্য প্রেমের গভীরতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে রাজীব ও রমা সেই বন্ধন শিথিল করিবার কৌশল আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত। রাজীব রমাকে অন্তরের প্রেম জানাইতেছেন, রমাও বিবাহের বিরুদ্ধে বলিতেছেন "বিয়ে কোরো না, রাজু দা'। বিয়ের

আগে প্রেমের স্বপন দেখা যায়, বিয়ে হ'লে সেগুলি স্বপনই থেকে যায়। বিয়ের আগে প্রেমিকের যে ভালবাসা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে বিয়ে হলে সে ভালবাসা কোথায় চলে যায়।"

রাজীব—"ঠিক বলেছ রমা। বিবাহকে 'বন্ধন' বলে। এ বন্ধনে না পড়াই ভাল। তোমাকে আমি অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভালবাসবো। তোমাকে সুখী কর্ব্বো। তোমার জন্যে জীবন দোবো। সমাজকে ঠেলে ফ্যালো, চলো আমরা দু'জনে কাশ্মীরে চলে যাই। কেউ খোঁজ পাবে না। যতদিন বাঁচবো, আমাদের ভালবাসা বন্ধনবিহীন, চিরমুক্ত, অবাধ থাকবে।"

রমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। রাজীবের আলিঙ্গনে রমা ভাবিবার শক্তি হারাইলেন। তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রাজীব বলিলেন—"কালই দুপুরবেলা চলো। কি বল রমা?"

রমা তখন বিচারের সূত্র হারাইয়াছে, মোহের মাদকতায় শুধু বলিল—"বেশ"।

নয়

পরদিন বেলা দুইটার সময় একখানি ট্যাক্সি আসিয়া রমার দরজায় থামিল। রমা একটী সুটকেস্ লইয়া জন্মের মত স্বামীগৃহ ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত। হঠাৎ এক বৎসরের বিবাহিত জীবনের স্মৃতি, পট-পরিবর্ত্তনের মত তাঁহার চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি নরেনবাবুকে ভালবাসিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন। এই যে তাঁহারই সজ্জা, তাঁহারই ঘর। ফুল-শয্যার দিনে এসেন্স পড়িয়া গিয়া আয়না, মেঝের উপর যে দাগ পড়িয়াছিল, সেটীও ত এখনও মুছিয়া যায় নাই। এই ত বিবাহের বস্ত্রখানি আলমারীতে সাজান রহিয়াছে। উঃ! এই সব ছাড়িয়া কি করিয়া যাইবেন? কি কষ্ট! বুকের হাড় যেন এক একখানা করিয়া খসিয়া যাইতেছে, কি করিয়া নিজের ঘর ছাড়িবেন? সারাদিন পরিশ্রমের পর যখন স্বামী ঘরে ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না, রাত্রেও যখন খুঁজিয়া পাইবেন না, তখন তিনি কত কাতর হইবেন। বাস্তবিক তিনি ত কোনই অন্যায়ই করেন নাই। তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়াছেন। কর্ত্তব্যের উপরে কিছু রমা আশা করিয়াছিলেন, তিনি দিতে পারেন নাই। তিনি ত রমা এবং ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্যই অর্থ উপার্জ্জনে ব্যস্ত। নিজের ত কিছুই বাবুগিরি নাই। রমা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দেরী দেখিয়া রাজীব ঘরে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"এই ত তোমার মনের দুর্ব্বলতা! এক বৎসরের উপেক্ষাতেও তোমার চৈতন্য হয় নি? আর দেরী কোরো না। ট্রেণ ফেল হতে হবে। শীঘ্র চলো।" এই বলিয়া হাত ধরিয়া রমাকে গাড়ীতে বসাইলেন। রমা পুত্তলিকার মত বসিয়া পড়িল।

ট্যাক্সী যখন পোষ্ট আফিসের নিকট আসিল, তখন রমা বলিলেন যে, 'মিনতি' পত্রিকার সম্পাদকের নিকট হইতে তাঁহার একটী আবশ্যকীয় চিঠি আসিবার কথা আছে, সন্ধান করা যাক আসিয়াছে কিনা। রমা জানালায় দাঁড়াইয়া কেরাণীবাবুর নিকট তাঁহার চিঠি চাওয়ায় তিনি দুইখানি চিঠি দিলেন। রমা প্রথম চিঠিটি খুলিয়া পড়িয়া পুনরায় খামখানির উপর ঠিকানা দেখিলেন, দেখিলেন যে ঠিকানা তাঁহারই। চিঠিখানি এই:—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাকে কয় বৎসর আমি মনে মনে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু কাল সভায় আপনার বক্তৃতা শুনিয়া আর মনোভাব চাপিতে পারিলাম না। আপনি যে কত মহৎ, বিবাহের কত উচ্চ আদর্শ যে আপনার, আপনার বিবাহিত-জীবনের প্রেম যে প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় শান্ত, স্নিগ্ধ ও গভীর তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সারারাত্রি আপনার সেই সৌম্য মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিয়াছি, আপনার সুললিত কণ্ঠস্বর এখনও শুনিতেছি। আপনি দেবতা, আপনার ভালবাসা অগাধ ও প্রগাঢ়; যে স্ত্রীলোক আপনার মত স্বামী পাইয়া সুখী হন্ নাই, তিনি সত্যই হতভাগিনী। আমার প্রাণভরা শ্রদ্ধা ও ভক্তি আপনার চরণে উৎসর্গ করিয়া দিতেছি। বোধ হয় এ জন্মে আপনাকে স্বামীভাবে পাইবার আশা নাই, কিন্তু যতদিন বাঁচিব আপনাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিব ও

ভক্তি-শ্রদ্ধা করিব। মরিবার সময় এই অন্তিম কামনা করিব, যেন পরজন্মে আপনাকে স্বামীভাবে পূজা করিতে পারি। ইতি,

প্রণতা—
আপনার গুণমুগ্ধা
অপরিচিতা

রমার হাত কাঁপিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তাঁহার স্বামীর নামের যে চিঠিখানি ছিল, সেইটী খুলিয়া পড়িলেন :—

ভাই রমা,

আমি আজ বাড়ী চলিলাম। যাবার আগে একটি অনুরোধ কর্‌ছি। যদি সত্যই আমাকে বাল্যবন্ধু ও বোনের মত দেখে থাক ও বিশ্বাস কর, আমার কথা রেখো। তোমার স্বামী দেবতা! তুমি চেন নাই। প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় তাঁর ভালবাসা শান্ত, স্নিগ্ধ ও গভীর ভালবাসার উত্তাল তরঙ্গ নাই, কিন্তু আদর্শ অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি স্বর্গীয়, অতি প্রগাঢ়। তাঁকে অবহেলা ক'র না। করলে চিরকাল অনুতপ্ত হতে হবে। দেবতাকে দেবতার প্রাপ্য দিও। ইতি,

স্নেহের—
রেখা

ছুইখানি চিঠির হাতের লেখা দেখিয়া রমা দেখিলেন যে, রেখার লেখা। ভুলক্রমে এক খামের চিঠি অন্য খামে সে ভরিয়া দিয়াছেন। রমার সর্ব্ব শরীর থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার সাজান ঘর তাঁহারই প্রেমিকের ভগ্নী দখল দখল করিবে। তাঁহারই স্থান সে অধিকার করিয়া সুখে ভোগ করিবে। রোষে হিংসায় ও মনস্তাপে রমার হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি তাড়াতাড়ি মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। রাজীব মাথায় জল দিয়া সুস্থ করিয়া বলিলেন—"কি চিঠি? কোন খারাপ খবর নাকি?"

রমা বলিলেন—"খবর ভালই। আমার যাওয়া হবে না, তুমি একেলা কাশ্মীর যাও রাজীব-দা। আমাকে এক্ষুণি বাড়ীতে দিয়ে এসো। না হ'লে অন্য ট্যাক্সী ডেকে আমিই যাবো।"

রমার অবস্থা দেখিয়া পোষ্ট অফিসের বাবুরা তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে রাজীব আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। রমা বাড়ীতে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজীব হতভম্ব হইয়া বন্ধ দরজার সম্মুখে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইয়া পুনরায় ট্যাক্সীতে চাপিয়া চলিয়া গেলেন। রমা যে অল্প সময় বাড়ীতে ছিলেন না, চাকরেরা তাহা জানিতে পারে নাই। তিনি অনুতাপে দগ্ধ হইয়া শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শুভ্রা

কবিশেখর—শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সে অনেকদিনের কথা—তখন ক'লকাতার স্বরূপ অস্পষ্ট প্রতিভাত হ'ত নিশীথ রাত্রে কেরাসিনের মিট্‌মিটে আলোয়। পথের পাশে বড় বড় পগার—বন জঙ্গল পুকুর; রাস্তার কথা বলতে গেলে চোখে জল আসে। এখনকার তুলনায় নরক আর স্বর্গ। চোরবাগানের তখনকার অবস্থা কল্পনারও অতীত—সে ঠিক্ বলবার নয়।

এখন যেখানে মুক্তারামবাবুর বুকের ওপর দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে 'চিত্তরঞ্জন এভিনিউ' ছুটেছে, ঠিক্ তার পূব্ দিকে ছোট ছোট জঙ্গলে শেয়ালের বড় বড় সভা বসত। তারই পাশে আমার এক বন্ধুর বাড়ী ছিল—তাঁর নাম নামজাদা বাড়ুয্যে।

একবার পূজার পর ক'লকাতায় এসে সেই বন্ধুর বাড়ীতে আস্তানা গাড়ি এইজন্য যে,—দক্ষিণ হস্তের বন্দোবস্তটা বেশ ভালভাবেই চ'লবে।

আনাহুত এই বন্ধুটির উপস্থিতিতে বন্ধুবর যে খুব খুসী হ'য়েছিলেন, সে প্রমাণ পাওয়া গেল—তাঁর আদর, যত্ন, আপ্যায়ন, দা-কাটা তামাক ও পান দেওয়ার ঘটা দেখে।

সেদিন দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর বন্ধুর সঙ্গে বার-মহলের ঘরে পুরাণো শীতল পাটিতে শুয়ে নানান কথা চলছিল। হঠাৎ বন্ধু ব'ল্লেন—"দেখো, মাকড়দা থেকে এইমাত্র খবর পেলাম যে, শুভ্রার কি যেন কি হয়েছে খবর এসেছে। যত সব পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে কিনা অপদেবতায় পেয়েছে। একবার সেখানে যাব ভাব্‌ছি, কিন্তু একলা সেই বুনোদেশে যেতে ইচ্ছে করে না, তুমি যখন এসেছ, যদি যাও তা' হ'লে কালই তার বন্দোবস্ত করি।"

আমি ত প্রত্যহ অবকাশের উপরেই নির্ভর করি, যদি সুযোগ ঘটে তবে অশিক্ষিতদের নিছক কল্পনার ভূতুড়ে কাণ্ডটা দেখ্‌তে কার না সাধ হয়। শুনেছি, শুভ্রা নাকি সত্যিই রূপে গুণে ও তল্লাটের মধ্যে একজন নামজাদা সুন্দরী।

যাক্, তারপরদিনই গরম দুধ আর খানিকটা হালুয়া খেয়ে দু'বন্ধুতে যাত্রা করলাম শুভ্রার দর্শন উদ্দেশে। কতকটা হেঁটে, কতক্‌টা পাল্কীতে এই রকমে বাড়ীতে গিয়ে যখন পৌঁছালাম, তখন বেলা প্রায় আড়াইটে হবে।

শুভ্রার শ্বশুর খুব খাতির করে' বসালেন, হাত মুখ ধোবার পর অবেলায় আর স্নান না করেই একটু ভারী রকমের জলযোগ হ'ল।

শুভ্রার স্বামী অমর বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সে কতকটা শক্তি-

সামর্থ্যের দাবীও করে। তদুপরি বিশেষ বিনয়ী, সুধীর, সুশান্ত প্রকৃতি। সংস্কৃতে দু'-একটা উপাধিও সে পেয়েছিল, ইংরাজী ভাষা তখন বাঙ্গালীর ধাতে সইত না। ইংরাজীতে ছিল সে বড় অজ্ঞ।

আমরা যখন পৌঁছুলুম, অমর তখন বাড়ীতে ছিল না, সে গেছ্‌লো ভাল রোজা আর দৈবজ্ঞ আন্‌তে। আমাদের দেখে নমস্কার ক'রলে, বন্ধু তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

যে রোজা এসেছিল তার নাম কখন শুনেছি বলে মনে হয় না, তবে তার চোখ্ দু'টো দিয়ে যে আগুনের মত একটা হল্‌কা ছুটছিল, সেটা বেশ ভাল করেই আমরা দেখেছিলাম। চেহারা দেখে বয়স বলা শক্ত, কেন না দেখ্‌তে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের জোয়ানের মত—কিন্তু শুন্‌লাম সে আজ পঞ্চাশ বছর এই কাজ ক'রছে।

দৈবজ্ঞেরও আস্‌বার কথা ছিল, কিন্তু তিনি রোজাকে দেখে আর এলেন না, বল্‌লেন যদি ভাল না হয়, তবে যেন খবর দেওয়া হয়।

সন্ধ্যার পরেই রোজাকে সঙ্গে করে' নিয়ে আমরা শুভ্রার ঘরে গেলাম। ঘরটী বেশ বড়। পালঙের উপর শুভ্রা বসে আছে—রূপ তার উথ্‌লে পড়্‌ছে—যেন একরাশ ঝরা শেফালির মত, গাল দু'টী থেকে গোলাপী আভা ফিন্‌কি দিয়ে পড়ছে, একমাথা কাল কোঁকড়ান রেশমের মত চুলে পিঠখানা ছেয়ে পড়েছে, মেঘের মাঝে শরতের চাঁদের মত ধব্‌ধবে তার মুখখানি।

আমাদের ঘরে ঢুক্‌তে দেখে, প্রথমটা সে চম্‌কে উঠ্‌লো, তারপর বেশ স্বাভাবিকভাবে মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে উঠে এসে আমার বন্ধুকে নমস্কার ক'রলে, সঙ্গে সঙ্গে স্বামী ও শ্বশুরকে, অবশ্য আমিও বাদ যাই নি।

আশীর্ব্বাদ করে' বন্ধু স্নেহসিক্ত-কণ্ঠে বস্‌তে ব'ল্‌লেন। শুভ্রা উঠে বালিসে হেলান দিয়ে বস্‌ল। রোজা তখনও ঘরের বাইরের দাঁড়িয়ে আশপাশ সব ভাল ক'রে দেখ্‌ছিল। একটু পরেই ঘরের ভিতর এসে বরাবর শুভ্রার পালঙের কাছে গিয়ে তিন বার তুড়ি দিয়ে দাঁড়াল।

শুভ্রা দেখেই চম্‌কে উঠ্‌লো, এতক্ষণের স্বাভাবিকতা হঠাৎ যেন লুপ্ত হ'য়ে গেল, কি রকম বিকট চীৎকার করে' আলুথালু বেশে উঠে রোজার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে সে খুব জোর জোর নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লো।

মিনিট পাঁচ পরেই কিন্তু হোহো ক'রে হেঁসে ব'ললে "ওরে পোদের বাচ্ছা—ভণ্ডামী করবার আর জায়গা পেলি নি, তাই এসেছিস এখানে ম'রতে ?"

রোজা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্ত্র-তন্ত্র আওড়াচ্ছিল—কিন্তু কাছে যেতে তার সাহস হয় নি। এমনি ভাবে দশ পনেরো মিনিট কেটে গেল, হঠাৎ গোটাকতক রাই সরষেতে মন্ত্র প'ড়ে সে শুভ্রার গায়ে ছুঁড়ে মারলে। সরষে গায়ে লাগ্‌বামাত্র যেন অসুরমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ধরে' শুভ্রা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো, চোখ দুটো দিয়ে আগুনের হল্‌কা ঠিক্‌রে প'ড়তে লাগ্‌লো। তখন তার সেই লাজ-নমিত কমনীয়তা আর নাই—সে পবিত্র ঢলঢল মহান সুষমা-বিমণ্ডিতা মাধুরিমা আর নাই—এ যেন এক রণরঙ্গিণী।

তার চোখের প্রখর দৃষ্টি ক্রমে রোজাকে অস্থির ক'রে তুল্‌লে—রোজা ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে অনেক রকম মন্ত্র বল্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

শুভ্রা খুব ভারি গলায় বল্‌লে "অস্পৃশ্য বলে এখনও বেঁচে আছিস—নইলে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে, তোর ঐ তাজা গরম রক্ত নেয়ে, তোর এ জন্মের ঘৃণিত কর্ম্মের উপযুক্ত ফল দিতাম—বেশীক্ষণ সুমুখে থাকিস্ নি, রাগ যদি চাপ্‌তে না পারি, তা' হ'লে—

রোজা কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লে—"যাচ্ছি! বুঝতে পারি নি দি'-ঠাকরুণ, এখন বুঝেছি—আমি তোমার দাসানুদাস, অধম সন্তান—সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা কর, আজ থেকে প্রায়শ্চিত্ত করবো, দুর্ব্বৃত্তের কবল থেকে মাতৃত্বের, নারীত্বের গৌরব অক্ষুন্ন রাখ্‌বার জন্য এ জীবন উৎসর্গ ক'রলাম তোমার পাদমূলে আজ।

শুভ্রার আর সে ভীষণ মূর্ত্তি নাই,—চিরহাস্য-লাস্যময়ী পবিত্রতায় তার সারা দেহ উছলিত—শান্ত ধীরকণ্ঠে সে ব'ল্‌লে—"শুনে সুখী হ'লাম, কিন্তু তোর এ শপথ ক্ষণিকের, খলের স্বভাব কখন যায় না—কয়লার কালিমা

কখনো ছোটে না, আমি সব জানি, সব বুঝতে পারছি, তুই তোর এ প্রতিজ্ঞা কতটুকু রাখবি, কিন্তু না, যা'— আমার সুমুখ থেকে এখনি চলে যা'—তোকে দেখ্‌লে পূর্ব্বস্মৃতি একে একে মনে জেগে উঠবে, শেষে হয়ত' রাগকে চাপতে পারবো না—যা' শীগির যা'।"

রোজা সেখানে লুটিয়ে পড়ে' নমস্কার ক'রে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুভ্রাও স্বাভাবিক রূপ পেলে— গায়ের কাপড় চোপড় সব গুছিয়ে বিছানায় শুয়ে ব'ল্‌লে— "শরীরটা ঝিম্‌ঝিম্‌ ক'রছে আমি একটু ঘুমুব।"

বন্ধু ব'ল্‌লেন—"হাঁ হাঁ মা, তুমি ঘুমোও, কাল সকালে দেখা হবে।"

সদরে এসে রোজাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ব'ললাম —"দেখ হে, তুমি যে কতবড় একজন নামজাদা মস্ত গুণীন্‌ আর ঝাড়-ফুঁকের ওস্তাদ তা' জান্‌তে পারলাম, এখন আসল কথা যদি সব বল, তা' হ'লে কোন গোলমাল নেই, তুমিও হাসিমুখে বাড়ী যাবে, আর, আমরাও ঘরের ছেলে ঘরমুখো হবো, বুঝলে।"

রোজা খানিকক্ষণ বসে'—জিরিয়ে নেবার পর ব'ললে —"যা' বল্‌ছেন, প্রায় সবি সত্যি, মোট কথা কিনা, আমার মত রোজাদের মধ্যে ওস্তাদ বড় কেউ একটা এ অঞ্চলে নেই—মোট কথা কিনা, ঐ যে দি'-ঠাকৃরুণ ব'ল্‌লেন মোট কথা কিনা, হ্যাঁ, তা' সত্যি, ওটা কি জানি কেমন ক'রে মোট কথা কিনা, পাকে-চক্রে ঘটেছিল। তা' যাক্‌, মানুষের ভুল-চুক মোট কথা কিনা, অমন দু'-একটা হয়েই থাকে —তবে হ্যাঁ, কাজটা যে খুব মোট কথা কিনা, ঘৃণিত, তা' একশোবার আমি কেন জগৎসংসার মোট কথা কিনা, মেনে নিতে বাধ্য।'

আশ্চর্য্য, যখন সে শুভ্রার সঙ্গে কথা কয়েছিল, তখন তার কোন মুদ্রাদোষ ছিল না, এখন প্রতিকথায় প্রায় 'মোট কথা কিনা' বলতে আশ্চর্য্য হ'লাম, আর ওর হেঁয়ালীর কথা ভাল বুঝতেও পারলাম না। একটু স্বান্তনার সুরে বল্‌লাম— "তা' ত' বটেই, ভুল-চুক সংসারে থাকতে গেলে অমন কত হ'য়ে থাকে। এই তোমার দি'-ঠাকৃরুণই কি দু'-একটা জীবনে ভুল করেন নি—কি বল?"

কথাটা শুনে রোজা চমকে উঠলো, ঘরের চারপাশ ভাল ক'রে দেখে আস্তে আস্তে চাপাগলায় ব'ল্‌লে— "চুপ! ওসব কথা মুখে মোট কথা কিনা, একেবারে আনবেন না—উনি দেবী! দি'-ঠাকৃরুণ মোট কথা কিনা, জগতের একটা আদর্শ—ওরকম দয়া মায়া, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্ম-পরায়ণা, মোট কথা কিনা, আমার এই সত্তর বছরের মধ্যে দেখি নি। ওঁর চরিত্রে বিন্দুমাত্র মোটকথা কিনা, খুঁৎ কেউ কখন দেখাতে পারবেনা। দি'-ঠাকৃরুণ যে স্নেহময়ী বলেই রোজা কেঁদে ফেল্‌লে। তার পূর্ব্বস্মৃতি একে একে মনে জেগে উঠতে লাগলো। শেষে অধৈর্য্য হ'য়ে উঠলো, ঘরে আর বস্‌তে চাইলে না, বল্‌লে—"আমি চল্লাম, এই রাত্রিরেই বাড়ী যাব, ঘরের সব বিলি-বন্দোবস্ত ক'রে, দি'-ঠাকৃরুণের কথামত প্রাশ্চিত্তির রাস্তা খুঁজে নেব।

আমরা বোঝালাম, কিন্তু সে শুন্‌লে না, উন্মাদের মত ছুটে চলে গেল। ফটকে চাবি দেওয়া ছিল, দেওয়ালটা উঁচুও কম বেশ আড়াই মানুষ ভোর, একটা লাফ দিয়ে পাঁচিলটা অনায়াসে টপকে সে অন্ধকারে কোথায় মিশিয়ে গেল।

দুই

সকালে আমরা হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ করবার পর শুভ্রার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অত সকালে সবার আগে উঠে স্নান ক'রে সে পূজায় বসেছে। সুমুখে তার নিজের হাতে গড়া মাটীর শিবটি দেখে শিল্প-নিপুণতার বাহবা না দিয়ে থাকা যায় না। শুভ্রা নিবিষ্টচিত্তে পূজা ক'রছে দেখে আমরা তখনকার মত সদরের ঘরে এসে বসলাম।

এবার গোড়ার ইতিহাস শুভ্রার শ্বশুর বল্‌লেন— "আজ পনেরো দিন আগে হঠাৎ একদিন বউমা পুকুর থেকে স্নান ক'রে এসে কেমন যেন থরথর করে কাঁপতে লাগলেন, আর কত কি সব ভুল বকে যেতে লাগলেন। বৈদ্য আনা হ'ল। রোগ যে কি, কেউ ধরতে পারলে না।

দু'-তিনদিন পর আবার ঐ রকম দিনের মধ্যে দু'-তিনবার হয়, তখন আমাদের ভয় হ'ল, পাড়াতেই একজন রোজা ছিল তাকে আনা হয়, সে দু'-একদিন চেষ্টাও করলে, কাজে কিন্তু কিছুই করতে পারলে না।

—"বউমা সমস্ত সময়ই সহজ মানুষের মত থাকেন, ঘর-সংসারের কাজকর্ম্ম; পূজা-অর্চ্চা সমস্তই ঠিক করেন, কিন্তু সময় সময় ঐ রকম অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে পড়েন, তবে অত্যাচার কি অনিষ্ট একদিনের জন্য কখনও করেন নি। ঐ রকম হবার পর বড় দুর্ব্বলতা বোধ করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়েন। যখন ঐ রকম ভুল বকেন, তখন চেহারাও কেমন হ'য়ে যায়—একটা জ্যোতির মত চোখ মুখ দিয়ে ঠিকরে বার হয়, সময় সময় খুব কাঁদেন, কখন বা হেসে বাড়ী মাতিয়ে তোলেন।

—"প্রথমটা বায়ুরোগ ভেবে চিকিৎসা করালাম, তা'তে কিছু হ'ল না। বউমা বল্লেন—'ওসব কেন করছেন, কেবল পয়সা নষ্ট, এ রোগ সারবার নয়, এতে কারো অনিষ্ট হবে না, যা' কিছু আমার উপর দিয়েই যাবে'।"

—"কথাটা ভাল বুঝতে পারলাম না, গিন্নীকে ও অমরকে দিয়ে কথাটা বেশ খুলে জানবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুই জানতে পারি নি, তবে কোন একটা নজর দোষ যে লেগেছে, তার আর সন্দেহ নেই।"

বন্ধু বল্লেন—"হ্যাঁ,—তার সাক্ষাৎ প্রমাণ ত' এই রোজা। ব্যাপারটা সব যেমন করেই হোক্ জানতে হবে, আর যে ক'রেই হোক্ আপনার বউমাকে বাঁচাতে হবে।"

আমি বল্লাম—"আমার মতে অমর যদি আমায় রোজার বাড়ীটা একবার দেখিয়ে দেয়, তা' হ'লে আমি ঠিক্ কথাটা আদায় করে নিতে পারি।"

দু'জনেরই মত পেলাম, অমরকে সংবাদ দেওয়া হ'ল, অমর আসতেই তাকে সব বল্লাম, সে ও রাজী হ'ল। আজকেই এগারটার মধ্যে স্নানাহার সেরে দু'জনে যাত্রা করবো সব ঠিক হ'ল।

ভিতরে যখন আমরা খেতে বসেছি, তখন শুভ্রা কপালের আধখানা পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে আমার বন্ধুকে বাড়ীর সব খবর নিয়ে বল্লে—"ওঁকে সেখানে যেতে দেবেন না, কেবল একটা ঝগড়া হবে, আর সে যে গোঁয়ার হয়ত' মাটীর ভেতর চাপা দিয়ে রাখবে—"

বন্ধু খেতে খেতে মুখ তুলে বল্লেন—"তা' ত' বুঝলাম মা, কিন্তু তোমায় ত' আমরা হারাতে পারবো না, সব রকম চেষ্টা ত' করতে হবে—তুমি যদি মা সাহায্য কর, তা' হ'লে আমরা নিষ্কৃতি পাই।"

শুভ্রা এমন একটি মধুর হাসি হাসলে যে, ও রকম হাসি মানুষ যে কখন হাসতে পারে, কেউ তা' কখনও কল্পনাতেও আনতে পারে না হেসেই বল্লে—"আমার কি সাধ যে, মায়া কাটিয়ে যাই। কি করবো, আমার ত' কোন হাত নেই। চেষ্টা করতে পারেন, তবে খুব সাবধান—দুশের পোকে একটুও বিশ্বাস করবেন না—যা' বল্বে, ঠিক্ তার উল্টো কাজ করবে। সঙ্গে জনকতক লাঠিয়াল রাখলে ভাল হয়, কিন্তু সে যেন না জানতে পারে।" বলে সে আস্তে আস্তে অন্দরের দিকে চলে গেল।

কোনরকমে আহারাদি সেরে সদরের ঘরে বসে নানা জল্পনা-কল্পনা ক'রে শেষটা তারই কথামত পাঁচ-ছয়জন লাঠিয়াল, তারা সবই প্রজা, তাদের সঙ্গে ক'রে অমরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তখন বেলা সাড়ে এগারটা।

তিন

লাঠিয়ালদের খানিকটা তফাতে রেখে আমরা দু'জনে রোজার বাড়ীতে যখন পৌঁছালাম, তখন চালাঘরের ভেতর মেয়ে মানুষের কান্না শুনে হাতছানি দিয়ে লাঠিয়ালদের ডেকে, ঘরের আগড় ভেঙ্গে ঢুকে পড়লাম। কি ভীষণ দৃশ্য! একটি আধাবয়সী মেয়েকে আধখানা পর্য্যন্ত মাটীর ভেতর পুঁতে, তার চারদিকে আগুন জ্বালবার সব বন্দোবস্ত ক'রে, রোজা খুব মদ খেয়ে উলঙ্গ হ'য়ে নাচছে।

আমরা একটু পাশে সরে দাঁড়ালাম, লাঠিয়ালরা সজাগ হ'য়ে রইল। কোন রকমে ইসারায় মেয়েটাকে অভয় দিয়ে চুপ করতে বল্লাম।

মেয়েটা চুপ করলে বটে, কিন্তু একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ক্ষণেকের মত ভেসে তার ঠোঁটের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

মেয়েটা চুপ করতেই, রোজা বল্‌লে—"ভাবছিস কি—তোর সর্ব্বনাশ কোরবো, মোট কথা কিনা, তোকে শেষ করে তোর ঐ ঝলসান মাংস পেট ভরে খেয়ে রাক্ষস হবো! হাঃ! হাঃ! মোট কথা কিনা, তোর মার, তোর বোনের, তোর পিসির, তোর ভাজের, তোর মাসির, মোট কথা কিনা, হাঃ! হাঃ! কারুকে বাকি রাখি নি, বুঝলি বাম্‌নী! হাঃ! হাঃ! বাকী ছিলি তুই। মোট কথা কিনা, এবার তোর শ্রাদ্ধে ভূত-ভোজন হবে, হাঃ! হাঃ!

পাশেই ভাঁড়ে করা মদ ছিল, ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা খেয়ে বল্‌লে—"এই জীবনে শেষ অত্যাচার বুঝলি বাম্‌নী! প্রাশ্চিত্তি করতে হবে হাঃ! হাঃ! তা দেখ, মোট কথা কিনা, একটু গঙ্গাজল খেয়ে নে—সারা রাত উপোসী আছিস্, মোট কথা কিনা, দি'-ঠাকরুণ বেজায় ধরে ফেলেছে, প্রাশ্চিত্তি, মোট কথা কিনা, হাঃ! হাঃ!"

কথাগুলি খুব জড়িয়ে গেল,—কেবল টলে টলে পড়তে লাগলো, শেষটা উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাও লোপ পেলে।

মেয়েটি বল্‌লে—"যা হবার হয়েছে, নারী হত্যা ক'রে নূতন পাপ ক'র না, আমায় ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি, তোমার ভাল হবে। আমার ছেলে দু' মাসের রোগী, বিছানায় পড়ে ছটফট করছে, তাকে—"

আর মুখ দিয়ে কথা বা'র হ'ল না, ডুকরে কেঁদে উঠলো। রোজা আরও খানিকটা মদ খেয়ে খুব জড়িয়ে জড়িয়ে বল্‌লে—"কি করবো বাম্‌নী উপায় নেই, দি'-ঠাকরুণের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, মোট কথা কিনা, প্রাশ্চিত্তি করবো, হাঃ! হাঃ! বড় ধরে ফেলেছে দি'-ঠাকরুণ, মোট কথা কিনা, আগে যদি জানতুম দি'-ঠাকরুণ ও বাড়ীতে, তবে কোন্ শালা মোট কথা কিনা, ত্রি-সীমানায় যেতো।"

তারপর দু'হাতে মাটী ধরে সে হুমড়ি খাবার মত হ'য়ে পড়ে দুলতে লাগলো। একটু পরেই ঘাড় তুলে মেয়েটার দিকে চেয়ে খুব জড়িয়ে অনেক কষ্টে বল্‌লে—দি'-ঠাকরুণ মোট কথা কিনা, আমায় বড় জব্দ করলে, এত কালের মোট কথা কিনা, ভিটে ছেড়ে দূরে পালাতে হবে—মোট কথা—"

বলেই কাঁপতে কাঁপতে সে দু'হাতে মদের ভাঁড় ধরে চোঁ চোঁ করে খানিকটা খেলে, তার দু' কস্ বয়ে গাল বুক দিয়ে ঝরঝর করে কতকটা পড়ে গেল। ভাঁড়টা রাখতে গিয়ে সে উল্‌টে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে কি একরকম অস্পষ্ট আওয়াজ করে উঠতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। দু'-একবার ওঠবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারলে না।

আমি তাড়াতাড়ি লাঠিয়াল দু'জনকে নিয়ে মাটী সরিয়ে মেয়েটিকে টেনে তুল্‌লাম।

মেয়েটি গায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—"আপনি আমার জীবনদাতা, কিন্তু এর জ্ঞান হবার আগেই আপনারা পালান, ওর ক্ষমতা অদ্ভুত, এখানে তীর ধনুক তলোয়ার চল্‌বে না।'

আমি ব'ল্‌লাম,—"সে কথা পরে হবে, এখন আমি জান্‌তে চাই তোমার বাড়ী কোথায়? দি'-ঠাকরুণকে ও অত ভয় করে কেন? আর ও তোমার আত্মীয়-স্বজনের সর্ব্বনাশই বা করেছে কেন?

মেয়েটি বল্‌লে—"সব কথা জানি না, তবে এ আগে আমার ওপর কখন ও কু-দৃষ্টিতে চায় নি, অসৎভাব থাক্‌লে আমায় অনেক সময় একাকী নির্জ্জন স্থানে অনেকবার পেয়েছিল—কি জানি কাল হঠাৎ রাত্রে ঘরের ভেতর ঢুকে, আমায় বুকে করে নিয়ে এল। আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হ'ল না, কেবল একবার করুণ চোখে রুগ্ন ছেলেটীর মুখের পানে চেয়ে দেখ্‌লাম—কিছু দেখতে পেলাম না, শুধু জোর জোর নিঃশ্বাস ফেলছে।"

মেয়েটি এই বলে কেঁদে ফেল্‌লে, কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে—"আজ আপনার দয়াতে আবার আমার ছেলের মুখ দেখতে পাব। আপনি আমার প্রাণরক্ষা করেছেন, আজ আপনাকে সাবধান করে দিই, ও একজন পিশাচ-

সিদ্ধ। চাবি দেওয়া ঘরের ভেতর থেকে ইচ্ছা ক'রলেই বা'র করে আন্‌তে পারে, ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কেউ কিছু ক'রতে পারে নি।"

আমি। তোমাদের বাড়ী ত আগে থেকে যাওয়া-আসা ক'রতো?

মেয়ে। আমি খুব ছোটটি থেকে ওকে দেখছি,—আত্মীয়-স্বজনরা ওকে খুব মান্যি ক'রতো।

আমি।—ওর বউ কি ছেলেমেয়ে কেউ আছে?

মেয়ে। ও বিয়ে করে নি, তবে অনেকবার এ বাড়ীত অপ্সরীর ন্যায় খুব সুন্দরী মেয়েদের দেখেচি—সে রকম আলো-করা রূপ কখন দেখি নি। এখন আমায় ছেড়ে দিন, ছেলেটার জন্য প্রাণটা অস্থির হয়েছে।

আমি তাকে যেতে বল্‌লাম। সে উঠে সরাসর দক্ষিণ দিকে চলে গেল।

* * *

আমরা উঠে নেমে এসে দেখলাম, রোজা তখনও সেই ভাবেই পড়ে আছে। লাঠিয়ালদের নিয়ে তার চোখ-মুখ, হাত পা রীতিমত শক্ত করে 'লাকলাইন' দিয়ে বেঁধে টেনে এনে তারই একটা ঘরের মধ্যে পূরে রাখলাম। ঘরটি বেশ বড়, তবে স্থানে স্থানে দেওয়ালে দড়ির মত বড় বড় গাঁট ঝোলান।

অমর কৌতূহলের বশে একটা গাঁট ধরে টান্‌তেই দেয়ালটা ঘরের ভিতরদিকে ঝুঁকে আস্‌তে লাগ্‌লো। আমার দেখে কেমন আশ্চর্য্য বোধ হ'ল, আমিও তাড়া-তাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি, দেয়ালটা ফাঁক হ'য়ে গেছে, তার মধ্যে মোটা একজন লোক বেশ যেতে পারে। আমি অমরকে ব'ললাম—তুমি দড়িটা টেনে ধরে থাক, আমি ব্যাপারটি কি একবার দেখে আসি।"

আমি ফাঁক দিয়ে ভেতরে গিয়ে দেখি, সেও একটা ছোট ঘর। তার মাঝখানে কাঠের গাদা। গাদার কাছে গিয়ে দেখি, সেটি বেশ সাজান আছে—ঠিক্ তাসের ঘরের মত একখানার পর একখানি করে, তলাটি সব ফাঁক। ঠিক্ তার মাঝখানে ঐ রকম আর একটি দড়ির গাঁট তাতে টক্‌টকে লাল সিন্দূর মাখান।

আমি অমরকে ঐ ব্যাপার জানিয়ে একজন লাঠিয়ালকে অমরের হাত থেকে দড়িটা টেনে ধরতে বলে, অমরকে নিয়ে কাঠের বোঝা ফেলে দড়ির গাঁট ধরে টান দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে এক জোড়া দরজা খুলে এল। ওপর থেকে দড়ির সিঁড়ি ঝোলান, নীচেটা খুব অন্ধকার না হ'লেও ওপর থেকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। আলোর সন্ধানে এদিক ওদিক্ দেখ্‌তেই একপাশে তুঁষের মালসা, ও চকমকি দেখতে পেলাম, তখনি চক্‌মকি ঠুকে আগুণ ক'রলাম, কুলুঙ্গীতে নারকেল মালায় ধুনো ছিল, তাই নিয়ে আমি আগে নামলাম, পেছনে অমর এল। ঘরটায় আলো সামান্য আছে বটে, কিন্তু কোথা থেকে যে আস্‌ছে, তা' ঠিক করতে পারলাম না। মালসার তুঁষে জোর জোর ফুঁ দিয়ে কতকটা ধুনো দিতেই 'দপ্' করে জ্বলে উঠলো—দেখলাম কি ভয়ানক! এককোণে ছোটখাটো মুণ্ডুর পাহাড়, তারি ওপর কালীঠাকুর—তাঁর চেহারাও ভীষণ! ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, ও রকম মূর্ত্তি কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। একপাশে বড় বড় কল্‌সীতে করা মদ। ঘরের মেঝেতে স্থানে স্থানে রক্তের চাপ। সেখানে আর দেরি না ক'রে দু'জনে উঠে এলাম, আগের মত দরজা বন্ধ করে কাঠগুলি সাজিয়ে দিলাম, আগুনটা নেভান হ'ল না।

ফিরে এসে দেখি রোজা সেই ভাবেই পড়ে আছে।

আমি তাকে অমরদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার ইচ্ছা করলাম। একটা গরুর গাড়ী পেলে ভাল হয়; নইলে বাঁশে বেধে লাঠিয়ালরা কাঁধে করেই নিয়ে যাবে। বাইরে যুক্তি-পরামর্শের পর ফিরে এসে দেখি, ঘর যেমন তেমনই আছে—কিন্তু রোজা নেই। চারদিক দেখলাম, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। তখন নিরাশ হয়ে সবাই ফির্‌লাম।

কতক দূর আসবার পর অমরকে জিজ্ঞাসা করলাম—"দৈবজ্ঞের বাড়ীটা কোথায়?"

অমর ব'ল্‌লে—"ঐ সুমুখের গ্রামেই থাকেন।"

দৈবজ্ঞের বাড়ীতে গিয়ে দৈবজ্ঞকে সমস্ত জানালাম।

দৈবজ্ঞ একটু হেসে বল্‌লেন—"ও ত' মানুষ নয়, ও একটা নররাক্ষস! ওকে সবাই ভয় করে। ও পালায় নি, ঐ ঘরের ভেতরই হাত-পা বাঁধা পড়ে আছে, তোমাদের চোখ ধাঁ-ধা লাগিয়ে দিয়েছে। তবে বাছাধন এবার জব্দ হ'য়েছেন—আজই আগুনে পুড়ে মরবে।

আমি। বলেন কি! আগুনে পুড়ে মরবে?

দৈবজ্ঞ। হ্যাঁ, যে তুঁষের আগুন রেখে এসেছেন, তাই ঝাঁপে ধরে ঘর পুড়ে যাবে,—আগুনের হলকায় দড়ির বাঁধন পুড়লেও পালাতে পারবে না—একটা চোখ কাণা, তার উপর আর একটা আজকে গেছে।

আমি। বলেন কি! ওকে বাঁচাতে হবে যে। বলে উঠে দাঁড়ালুম।

দৈবজ্ঞ। অসম্ভব! ওর কর্ম্মের ফল ভোগের সময় হয়েছে, নিমিত্তের ভাগী আপনি। ওতে পাপ আসে না। দুর্জ্জনের দণ্ডবিধান শাস্ত্রে আছে।

আমি। আপনার কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'লাম, যা' বল্‌লেন সবই সত্য, এখন দয়া করে, শুভ্রাকে বাঁচান, তার মুক্তির পথ বলে দিন।

দৈবজ্ঞ। দেখো, কিছু খরচ হবে—যদি করতে পারেন, তবে আমায় ঠিকানাটা দিয়ে যান্, আমি এই শনিবার চতুর্দ্দশীর দিন বাড়ীতে গিয়ে যা' করবার কোরবো।

আমি। কত আন্দাজ খরচ হ'তে পারে?

দৈবজ্ঞ। বেশী নয়—আমি এক কপর্দ্দও চাই না, দশ-বার টাকা মাত্র খরচ হবে। আগের দিন বাড়ী ঘর সব বেশ করে ধোয়াবেন, আর গব্যঘৃত আড়াই সের, লালজবা এক ঝুড়ি, রক্তবস্ত্র, রক্তচন্দন ও বিল্বপত্র সব বন্দোবস্ত করে রাখবেন।

আমি তাকে নগদ বারটা টাকা দিয়ে অমরদের বাড়ীর ঠিকানা বলে দিলাম। তিনি ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন—"ও বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী, বুঝতে পেরেছি, আমি চিনি। আচ্ছা, আজ হ'ল বৃহস্পতিবার, মাঝে শুক্রবার, শনিবার দিন ঠিক্ যাব।"

আমরা নমস্কার ক'রে চলে' এলাম। বাড়ী যখন এলাম, তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রামের পর সমস্ত ঘটনা ব'ল্‌লাম। বন্ধু ও অমরের বাপ ত শুনে একেবারে অবাক! আমার দুঃসাহসের জন্য বন্ধু দু'-একটা মিঠে-কড়া টিপ্পনি কাটতেও কসুর ক'রলেন না।

চার

শুক্রবার দিন দৈবজ্ঞের কথামত সমস্ত বন্দোবস্ত করে' রাখা গেল। শনিবার ভোরেই মালীরা ফুল ও বেলপাতা আন্‌বে, ঘি-টা আজকেই আনান হ'ল।

শনিবার দিন বেলা বারটার সময় দৈবজ্ঞ এলেন, তাঁকে দেখ্‌লে ভক্তি শ্রদ্ধা হয়, দিব্য সৌম্য শান্তমূর্ত্তি, সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন। দৈবজ্ঞকে শুভ্রার ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। শুভ্রা দৈবজ্ঞকে দেখে, তাড়াতাড়ি নেমে এসে গলায় আঁচল দিয়ে নমস্কার করে' পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে ব'ল্‌লে—"আপনাকে দেখে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। মা ভাল আছেন? সুকু, রমা, তাদের সব কি খবর?"

দৈবজ্ঞ চম্‌কে উঠ লেন! শুভ্রার দিকে বেশ ভাল করে' চেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর চোখ্ দুটো দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে সারা দেহটা ভিজিয়ে দিলে।

শুভ্রা আঁচল দিয়ে তাঁর চোখ মুখ মুছিয়ে আসন পেতে হাত ধরে' বসালে। বিছানার পাখা না নিয়ে দেওয়ালে সাজান তার নিজের হাতের পাখা এনে বাতাস করতে লাগ্‌লো।

শুভ্রার মুখে তখন দিব্য অপূর্ব্ব মাধুরী ফুটে পড়ছে, তার জীবনে সে আজ পরম আনন্দ, পরম পরিতৃপ্তি, পরমসুখ পেয়েছে।

এইভাবে কিছুক্ষণ যাবার পর দৈবজ্ঞ মুখ তুলে শুভ্রার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"মা, সব মনে পড়েছে, তুমি ভাগ্যবতী, তোমার দেখা জীবনে যে আবার পাব এ আশা ত মা ক'রতে পারি নি, যা' যায়, তা' ত' আর ফেরে না মা।"

শুভ্রা। বাবা, অত অস্থির হবেন না। আমি যা' জিজ্ঞাসা ক'রলাম তার উত্তর দিন।

দৈবজ্ঞ। হ্যাঁ মা, সবাই ভাল আছে। সুকু, রমা এখন নাতি-নাত্‌নী নিয়ে বেশ সুখেই আছে।

শুভ্রা। সবাইকে বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়। কিন্তু—

এতক্ষণ পরে দৈবজ্ঞ শুভ্রার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লেন —"মা, তোর এ দশা হ'ল কেন ?"

শুভ্রা। সে কথা তোমার না শোনাই উচিত বাবা - মার দোষ ছেলেকে শুন্‌তে নেই যে। আচ্ছা, তবু বল্‌ছি শোন, জান না ত বাবা আমি ছেলেবেলায় আরস্থলাকে বড় ভয় করতাম, আর ওরাও আমায় পেয়ে বসতো। একদিন একটা আরস্থলা আমায় এমন জ্বালাতন করে যে, তাকে ধরে গঙ্গাজলের ঘটীর ভেতর ডুবিয়ে মেরে তুলসীতলায় পুঁতে দিই ; সেই অবধি আর কখন আরস্থলা আমার কাছে আসতো না, আমায় দেখলেই সব উড়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু পাপটা কোথায় যাবে, সেই পাপে আমার গতি হ'ল না। তোমার বাড়ীতে দিনকতক গোয়ালে ছিলাম, বড় দুর্গন্ধ আর মশা, কাজেই সেখান থেকে যত তীর্থ আছে সব জায়গায় বেড়িয়ে আসি, ঘুরে যখন ফিরলাম, তখন কোথায় থাক্‌বো তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—ঘুরতে ঘুরতে দেখলুম আমার যোগ্য স্থান এইখানে, তাই এখানে এসে রয়েছি।

দৈবজ্ঞ। তা'ত সব বুঝলাম, কিন্তু এ রকম পরাশ্রয়ে আমার মায়ের থাকা ত উচিত নয়, এখান থেকে তুমি চলো মা, আমি তোমার গতির ব্যবস্থা করবো, কোন ভয় নেই। আজকেই আমার সঙ্গে চলো, ভাই-বোন্‌দের দেখে নাও, কাল অমাবস্যা, অতি উত্তম দিন।

শুভ্রা মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লে—পোদের পো বাবা আগুনে পুড়ে মরেছে, জান ? আমার পিতৃকুলের উচ্ছেদ করবার জন্যে শ্মশানে ধুনি জ্বালিয়েছিল, জান ?

দৈবজ্ঞ। পরে বড় হ'য়ে সব জেনেছিলাম মা, কর্ম্মের ফলদাতা যিনি, তিনি যোগ্য ফলই দিয়েছেন। তা' হ'লে মা, তুমি যাবার জন্য প্রস্তুত হও, এঁরা আমার শরণাগত, ব্রাহ্মণ।

শুভ্রা উঠে দাঁড়াল। তার সারাদেহ থরথর করে কাঁপতে লাগলো, জোর জোর নিশ্বাস আগুনের মত বার হ'তে লাগলো, সমস্ত দেহটা যেন ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো, হাত দুটো উপরের দিকে তুলে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করে' পড়ে গেল।

দৈবজ্ঞ তাকে মাটীতে পড়তে দিলেন না, তাঁর বুকের উপর শুভ্রা অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল। তিনি আস্তে আস্তে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, মন্ত্র পড়ে, মুখে চোখে জল দিয়ে, মাথায় হাত দিয়ে কি মন্ত্র জপ করলেন, তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"আর কোন ভয় নেই, দু' ঘণ্টা ঘুমোবার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হবে, ঠিক আগের মত—আর এ সব ঘটনা তার মনেও থাকবে না।"

অমরের বাবা পায়ের তাঁর ধুলো নিয়ে পাথেয়স্বরূপ দশটি টাকা তাঁকে দিলেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন। অমর পাল্‌কীর বন্দোবস্ত করে এনে দিলে। তিনি তাকেও আশীর্ব্বাদ করে' চলে' গেলেন।

আশ্চর্য্য! সত্যই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। শুভ্রার যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন সম্পূর্ণ নূতন। বন্ধুকে দেখে তাড়াতাড়ি এসে নমস্কার করে' বল্‌লে,—"আপনি কতক্ষণ এলেন কাকা ? অনেক দিনের পরে যে বুনোদেশে এসেছেন ?"

রাত্রে শুভ্রা নিজের হাতে অনেক রকম রান্না করে' আমাদের খাওয়ালে। সে রাত্রিটা সেখানে থেকে রবিবার দিন ভোরে ভোরে দু'জনে যাত্রা করলাম, ঠিক্ বারটায় চোরবাগানের বাড়ীতে এসে হাজির।

* * *

দিনকতক পরে খবর নিয়ে জানলাম যে, দি'-ঠাকরুণ সেই দৈবজ্ঞের গর্ভধারিণী। তিনি একজন পুণ্যময়ী সতী রমণী ছিলেন। তাঁর প্রতাপ যথেষ্ট ছিল ; দুরন্ত হিংস্র পশুও তাঁহার বশীভূত হ'ত। রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করবার পর শ্রাদ্ধশান্তি করে' দৈবজ্ঞ তাঁর মার গতি করেছিলেন।

সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
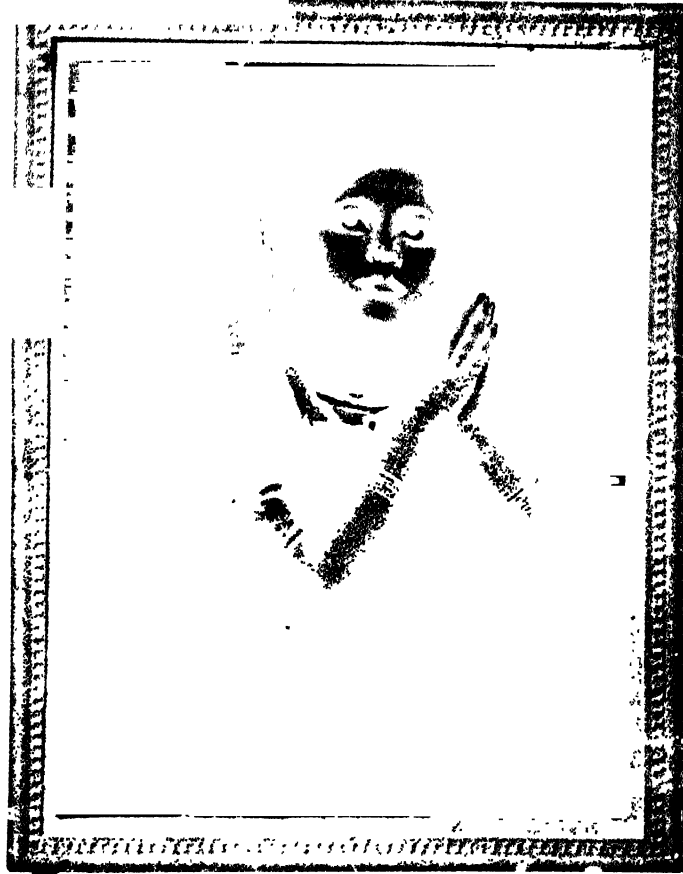
প্রার্থনা

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম বর্ষ | পৌষ, ১৩৪১ | নবম সংখ্যা

পরাশর

শ্রীবজ্রাচার্য্য

—জেলায় নিবিড় বনমধ্যে নদীতীরে একটী মন্দির। এক স্থবির পূজারী মন্দির-সংলগ্ন কুটীরে বাস করেন। লোকালয় হইতে বহুদূরে এই ক্ষুদ্র অথচ অতি সুন্দর মন্দির কেন নির্মিত হইল ইহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। পূজারীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার নয়নযুগল হইতে দরবিগলিত-ধারায় অশ্রু বিগলিত হইল। বুঝিলাম, কোন করুণ কাহিনী পশ্চাতে নিহিত আছে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া বৃদ্ধের মনে ব্যথা দেওয়া ভদ্রোচিত হইবে না ভাবিয়া নিবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কৌতূহল এতই উদ্দীপিত হইল যে, আমি নিত্যই সেই বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিতে যাইতে লাগিলাম। প্রায় একমাস পরে বৃদ্ধ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিলেন। কিন্তু আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, জেলার নাম বা মন্দিরের অবস্থান কাহাকেও যেন প্রকাশ না করি। পূজারীর নাম-ধাম ত গোপন করিতে বাধ্য। তিনি চান অজ্ঞাতবাস; স্বেচ্ছায় যিনি লোকালয় ত্যাগ করিয়াছেন, আবার তাহার সহিত তাঁহার সংস্রব কেন? তবে কেহ যদি আমার মত ঘটনা-চক্রে তাঁহার মন্দিরে যান, তবে নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, আগন্তুক পাইবেন তাঁহার বুকভরা ভালবাসা, অনন্ত সহানুভূতি এবং অসীম আত্মনির্ভরতা। আমার মত কাঙাল যাত্রীর পক্ষে সে সঞ্চয় অল্প কম নহে।

দুই

তিনি বলিলেন—এটী প্রাণের কথা। মনে করিয়াছিলাম, কাহাকেও বলিব না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞারক্ষা করিতে পারিলাম না। ভগবান আমায় মার্জ্জনা করুন।

আমার স্ত্রীর সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে এই সংবাদ পাইবামাত্র আমি কোনরূপ বিবেচনা না করিয়া গৃহাভি-

মুখে যাত্রা করিলাম। কর্ম্মস্থান হইতে আমার বাসাবাটী প্রায় ষাট মাইল পার্ব্বত্য বনপথ। যান, একখানি মোটর সাইকেল। সেদিন পূর্ণিমা। শুভ্র জ্যোৎস্নায় ধরণী প্লাবিত। আন্দাজ আট ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়াছিলাম। পথ-পার্শ্বস্থ বনশ্রেণী অতি ভয়াবহ, ব্যাঘ্র-ভল্লকাদি হিংস্রজন্তু সমাকুল। অন্য কোন সময় হইলে আমি কিছুতেই একাকী রাত্রিকালে বাটী আসিবার সংকল্প করিতে পারিতাম না। সেদিন কর্ত্তব্যের তাড়নায় আমি সম্পূর্ণরূপে ভয় বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম।

বলা বাহুল্য, আমি অতি দ্রুতবেগে সাইকেল চালাইতেছিলাম। প্রায় দুইঘণ্টা চলিয়া আসিয়া সহসা পথিপার্শ্বে দুইটী উজ্জ্বল আলোক দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। বহুবার ঐরূপ আলোক দেখিয়াছি, সুতরাং ভুল হইল না। দূরে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বসিয়া রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কি করিব? সাইকেল থামাইব, কি চালাইব? ভাবিবার সময় পাইলাম না। সহসা সাইকেলের 'ব্রেক্' টিপিয়া নামিয়া পড়িলাম। সম্মুখে বিশালকায় ভীষণ ব্যাঘ্র।

আমি অভিভূত। ব্যাঘ্রটী স্থিরনেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি ত তাহার চক্ষু হইতে অন্যদিকে আমার দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হইয়া গেল, পরে ব্যাঘ্র অতি মন্থর গতিতে বনাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। আমি যেন ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিলাম। কেন করিলাম তাহা জানি না।

তিন

অতি নিবিড় বন। কিন্তু ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ যাইতে আমার বিন্দুমাত্র ভয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কতক্ষণ অনুসরণ করিয়াছিলাম, স্মরণ হয় না; তবে অনুমান পনের হইতে বিশ মিনিট হইবে। চলিতে চলিতে ব্যাঘ্রটী স্থির হইয়া একটী বৃক্ষতলে বসিল এবং পুনরায় আমার দিকে তাকাইল। এবার আমি ব্যাঘ্রের দিকে না তাকাইয়া নিশ্চিন্তমনে চারিপার্শ্ব দেখিয়া লইলাম। যে বৃক্ষতলে আমরা অবস্থিত, তাহা হইতে একটী মধুর গন্ধ আসিতেছিল; অথচ ফুল কি ফল কিছুই দেখিতে পাইলাম না। স্থানটি বেশ পরিষ্কার। দেখিতে পাইলাম বৃক্ষতলে কি নড়িতেছে! অগ্রসর হইয়া দেখি, একটী নবজাত সুন্দর মানব শিশু। লাল সুতায় বাঁধা একটী ঝুলি বুকের উপর রহিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম। সেই মুহূর্ত্তে কি যেন স্বর্গীয় সুখ ও শান্তির বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আমার প্রতি শিরায় ছুটিয়া গেল—তাহা বর্ণনার অতীত। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় ব্যাঘ্রটী চলিতে আরম্ভ করিল। অগত্যা শিশুটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। যথাকালে ব্যাঘ্র আমার পরিত্যক্ত মোটর সাইকেলের নিকট আমাকে উপস্থিত করিল এবং নিমেষে বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

চার

রোমাঞ্চকর বিস্ময়ে আমি কিয়ৎকাল অভিভূত হইয়াছিলাম। শিশুর উষ্ণ ও কোমল স্পর্শে আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। পরিধেয় কামিজ উন্মোচন করিয়া শিশুকে আবৃত করিলাম। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া একহস্তে শিশুটীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম, ও অপর হস্তে মোটর সাইকেল চালাইলাম। দুই ঘণ্টার পথ ধীরে ধীরে অতিক্রম করিতে আধঘণ্টা সময় লাগিল। যখন গৃহে পৌছিলাম, তখন রৌদ্র উঠিয়াছে। সংবাদ শুভ, স্ত্রী ভাল আছে। গত রাত্রে বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল, ভগবানের কৃপায় তাহা অতিক্রম করিয়াছে। এখন সেবা ও চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া যথাসময়ে আরোগ্য হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার বিধবা ভগ্নীর নিকট শিশুকে অর্পণ করিলাম। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। বিশ্রামান্তে স্ত্রীকে শিশুর কথা বলিলাম ও শিশুকে দেখাইলাম। সে সুখী হইল না। যাহা হউক, সে এখন নিজের পীড়ার জ্বালায় অস্থির, শিশু সম্বন্ধে তাহার মতামত কি তাহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন বুঝিলাম না। ভাবিলাম স্ত্রীর অসন্তোষ আর কিছুই নহে—অসুস্থতার অভিব্যক্তি মাত্র। শিশুর বক্ষে যে ক্ষুদ্র ঝুলিটী ছিল। গৃহে কপাট বন্ধ করিয়া নিভৃতে তাহা পরীক্ষা করিলাম।

খুলিটী সাধারণ মোটা খদ্দরের। ভিতরে এক চতুষ্কোণ স্বর্ণফলক কাপাস তুলার ভিতর রক্ষিত। দেখিলাম, স্বর্ণ-ফলকের মধ্যভাগে উভয় পৃষ্ঠে একটী একটী ওঁকার খোদিত। যদৃচ্ছাক্রমে তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে ঐ ওঁকারে চাপ দিবামাত্র চতুষ্কোণ হইতে চারিখানি ক্ষুদ্র তালপত্র বাহির হইল। বুঝিলাম, ভিতরে স্প্রিং-এর সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রকায় চারিখানি তালপত্র ধৃত আছে। ওঁকারে চাপ অপসৃত করিবামাত্র ঐ পত্র চারিখানি আবার চতুষ্কোণ ফলকে লুক্কায়িত হইল। অতি সূক্ষ্ম সূচ দিয়া রক্তবর্ণ অক্ষরে তালপত্রে লিখিত শ্লোক চতুষ্টয়। আতসী কাচ সাহায্যে পাঠ করিলাম। মহা বিস্ময়ে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। শ্লোকগুলি দেবনাগরী হরফে লিখিত। বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

প্রথম পত্র।—

ওঁ। পরাশর হইতে পরাশর। বৈয়াঘ্রপাদ গোত্র। গৌতম, আয়াস্য আঙ্গিরস প্রবর। ইচ্ছামৃত্যু। দেব-দত্তাধীন জীবন। ওঁ॥

দ্বিতীয় পত্র।—

ওঁ। মহা ঐশ্বর্য্যময়, দেবদ্যুতি, দিব্যকান্তি। শয্যা নিম্নে রত্নরাজি। পালক তাহার ভোগাধিকারী। ওঁ॥

তৃতীয় পত্র।—

ওঁ। কলুষিত জীবন পালনে অনধিকারী। পবিত্র-মন্ত্রপূত স্বর্ণফলক আদর্শে তাহার পরীক্ষা। ওঁ॥

চতুর্থ পত্র।—

ওঁ। শিশু ক্ষমাশীল, কিন্তু অভিমানী। তাহার আহ্বানমাত্র দেবদূত আসিয়া লইয়া যাইবে। তন্মুহূর্ত্তে পালক ঐশ্বর্য্য ও শান্তির অনধিকারী। ওঁ॥

দিবারাত্রি আবৃত্তি করিয়া চারিটী শ্লোক কণ্ঠস্থ করিলাম। বাড়ীতে শালগ্রাম শিলার সিংহাসনে, শালগ্রামের শয্যাতলে লুক্কায়িত করিলাম।

পাঁচ

এই ঘটনার পর আমার দিনগুলি বেশ সুশৃঙ্খলে যাইতে লাগিল। স্ত্রী আরোগ্যলাভ করিলে আমি সপরিবারে কর্ম্মস্থানে চলিয়া আসিলাম। সংসারে আমার স্ত্রী, দুই বৎসরের এক পুত্র, বিধবা ভগ্নী ও নবাগত শিশু। শিশুটীর ভার দিদিই লইয়াছিলেন। আমার স্ত্রী প্রথম হইতেই শিশুটীকে স্নেহের চক্ষে দেখিত না। সে সর্ব্বদাই বলিত, "কোন হতভাগিনীর সন্তান আমার সোণার চাঁদ সন্তানের অকল্যাণ করিতে আমাদের সংসারে আসিয়াছে। আমি নিতান্ত আহাম্মক, তাই ও পথের পরিত্যক্ত শিশুকে নিজ গৃহে স্থান দিয়াছি। সুতরাং, তাহাকে যে স্থান হইতে আনা হইয়াছে, সেই স্থানেই রাখিয়া আসা হউক।" আমি প্রতিবাদে কলহ করিতাম না; নীরবে শুনিয়া যাইতাম। বুকটা সজোরে কম্পিত হইত; ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিতাম—"হে ঈশ্বর, যেন কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হই, যেন ত্রুটি না হয়, অভিমানী শিশু যেন আমাকে ছাড়িয়া না যায়!" অভিযোগসত্ত্বেও আমার স্ত্রী শিশুটীকে যথাসাধ্য সেবা করিত, সময়ে সময়ে কোলে লইয়া আদর করিত, বলিত, "আচ্ছা, যখন আসিয়াছে থাক, যদি আমার পেটেরই হইত। নটুকে (আমার পুত্রের নাম) দাদা বলিবে, নটুর খেলার সাথী হইবে।" ইত্যাদি। যেদিন এরূপ দেখিতাম, সেদিন আমি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিতাম। কিন্তু আদর অপেক্ষা অনাদরের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত। আমি ও দিদি কাতর হইয়া পড়িতাম। ইহার উপর যদি নটুর অসুখ হইত ও পরু (নবাগতের ডাকনাম—পরাশরের অপভ্রংশ) ভাল থাকিত, তাহা হইলে সংসার অগ্নিময় হইয়া উঠিত। নিত্য পূজা করিবার সময় আমি সেই স্বর্ণফলকখানি চন্দনচর্চ্চিত করিয়া বক্ষে ও মস্তকে ধারণ করিতাম। ইহাতে আশ্বস্ত হইতাম বটে, কিন্তু অমঙ্গল আশঙ্কাজনিত আমার বক্ষ স্পন্দন নিবারিত হইত না। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখিতাম। দিদি ও আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিত। একদিন সুযোগ বুঝিয়া (আমার স্ত্রী অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বভাবা, প্রায়ই ক্রোধবশতঃ মূর্চ্ছা যাইত) তাহাকে বুঝাইলাম যে, পরুকে অযত্ন করিলে আমরা সবংশে নষ্ট হইব, কেন না, পরু দেবশিশু। কতক সুফল ফলিল, আদর-যত্ন চলিতে লাগিল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল, পরুর প্রতি স্ত্রীর স্নেহ-ব্যবহার শুধু আমার ও নটুর মরণ ভয়ে,

প্রাণের টানে নহে। এমনি করিয়া মানসিক অশান্তিতে দিন যাইতেছিল। আমার কাঠের ব্যবসায়; তাহাতে বিস্তর লাভবান হইয়াছিলাম। অতি অসম্ভব উপায়ে পরুর আগমনের ছয়মাসের মধ্যে আমার উন্নতি হইয়াছিল। কি উপায়ে যে অত অল্প সময়ের মধ্যে আমার যশ, মান, ও অর্থ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া পাই না। আমার কৃপণ স্বভাব নহে; দুই হস্তে মনের সুখে অর্থব্যয় করিয়াও আমার যথেষ্ট উদ্বৃত্ত হইত। বোধ হয় একটু মাদকতা আসিয়াছিল; কেন না, আমি আমার উন্নত অবস্থা আরও উন্নত করিতে সচেষ্ট হইলাম। লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে ফেলিলে আশ্চর্য্য লাভ হইবে এই লোভে টাকা কি করিয়া সংগ্রহ করা যায়, তাহা ভাবিতে লাগিলাম। দুই-তিনদিন ক্রমাগত ভাবিয়া সহসা একদিন স্বর্ণফলকের দ্বিতীয় পত্রের কথা মনে হইল—"পালক রত্নরাজির অধিকারী।" কালবিলম্ব না করিয়া আমি রাত্রে সেই বনপথে যাত্রা করিলাম। যেখানে আমার ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেইস্থানে দূরত্ব-জ্ঞাপক একটী প্রস্তর ছিল। আমি নির্ভীকচিত্তে সেই রাত্রে একাকী বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। যথাকালে সেই পরিচিত সুগন্ধময় বৃক্ষের তলে উপনীত হইলাম এবং যেস্থানে পরু পড়িয়াছিল, সেই স্থান একটী বৈদ্যুতিক আলোক সাহায্যে স্থির করিয়া লইলাম। সামান্য খনন করিবার পর একটী লৌহময় বলয়যুক্ত প্রস্তরখণ্ড পাইলাম। বিনাক্লেশে তাহা অপসারিত করিয়া একটী তাম্রময় কলস প্রাপ্ত হইলাম। তাহার ভিতর অগণ্য মণিমাণিক্য। যত পারিলাম থলিতে ভরিয়া লইলাম। কলসটী যে কত গভীর তাহা স্থির করিতে পারিলাম না, কেন না, মণিমাণিক্য ভেদ করিয়া উপর হইতে তাহার তলে হস্ত পৌঁছিল না। কলসটীকে উপরে উঠাইতে পারি নাই। প্রস্তর ও মৃত্তিকায় স্থানটী পূর্ব্ববৎ করিয়া চলিয়া আসিলাম। সে রাত্রে যাহা আনিয়াছিলাম, তাহা বিক্রয় করিয়া সাতলক্ষ টাকা পাইলাম।

ছয়

পার্থিবসুখ কানায় কানায় পূর্ণ। এই সুখের উপর পরু কথা কহিতে ও হাঁটিতে শিখিয়াছে। কিন্তু নটুর শরীর কি জানি কেন রুগ্ন হইয়া পড়িল। সুতরাং, স্ত্রীর মতে অর্থের দিক্ ভিন্ন, অপরদিকে পরু 'কুলক্ষুণে ছেলে।' স্ত্রী তাহাকে বিষনয়নে দেখিতে এবং সময়ে মেয়ে প্রহার পর্য্যন্ত করিতে লাগিল। এই সময় আমি স্বর্ণফলকখানি বাহির করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিলাম। শুষ্কবস্ত্র দিয়া মর্জ্জিত করিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার মুখের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। কাচের আর্শিতে যেমন নিখুঁত দেখা যায়, ঠিক সেইরূপ নিখুঁত দেখা গেল। চকিতে দেখিলাম—আমার বদনমণ্ডল কালিমামাখা, চক্ষু কোটরাবিষ্ট, লোলচর্ম্ম, যেন বৃদ্ধের বদন। এ কি শরীর! শিহরিয়া উঠিলাম। তবে কি আমার কলুষ-জীবন? পরু কি চলিয়া যাইবে? আর আমি—অর্থাৎ, আমার অমন অর্থপ্রসূ ব্যবসায়, আমার স্ত্রী, নটু, দিদি ও আমি এই এতগুলির সমষ্টি কোথায় যাইব? চলতি ব্যবসা—আমার বক্ষের রক্ত, ইহা নষ্ট হইলে আমি বাঁচিব না। বনের ভিতর রত্নরাজি—অসামান্য ধনের অধিকারী! পরুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হারাইব। স্ত্রী, নটু ও দিদির জীবন—বিশ্বাস কি? আমি? সকল ভোগের ভোগী আমিই কি থাকিব? এ সকল অনর্থের মূলে কিনা একটী সন্তান পালনে অযত্ন-কলুষ! সন্তান পালন কি এতই কঠিন কার্য্য? সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরুকে বুকে লইয়া অন্য কোথাও যাই না কেন? নীরবে নিভৃত নিশীথে কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমি গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করি না কেন? একটী শিশুর সেবা করিতে আমি সক্ষম নই। সেই রাত্রে স্ত্রীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলাম যে, আমার গৃহে দেবশিশুর অপমান ঘটিলে, আমার কাঠের গোলা ভস্মসাৎ হইবে, আমি আত্মঘাতী হইব, হয় ত নটুর অকল্যাণ হইবে। বিস্তর বাদানুবাদ হইল; স্ত্রী বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, আপদ-বালাইকে গৃহে না আনিলে ত এ সব কথা হইত না। কি কাজ অর্থে? নটুকে লইয়া গরীব হইয়া থাকিলেও সুখী হইতাম। ইত্যাদি। শেষে মিটমাট হইল। স্ত্রী যথাসম্ভব যত্ন করিবে; গালাগালি দিবে না; প্রহার করিবে না; তবে সে লোক দেখান আদর-যত্ন করিতে পারিবে না; আমিও 'খুঁটিনাটি' দোষ ধরিব না। পরদিন স্বর্ণফলকে মুখ দেখি

নায়, পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম না। তারপর প্রতি দিন দেখিয়াছি, কখনও পরিষ্কার দেখিতে পাই নাই। সর্ব্বদাই বিকৃত, সর্ব্বদাই কালিমামাখা নিজের বদনমণ্ডল দেখিয়াছি। যাতনায় ছটফট করিয়াছি; অথচ, বাহ্যিক কোন কিছু প্রতিকারের চেষ্টা করি নাই। পরুকে বুকে লইয়াছি; তাহার হাসিমুখ দেখিয়া মনে করিয়াছি, সে আমার সব দোষ ক্ষমা করিয়াছে। পরু কাঁদিতেছে শুনিলে, আমি যথাসাধ্য তাহার প্রতিবিধান করিতাম। দিদি ত তাহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন।

সাত

পরু ষোড়শ মাসে পদার্পণ করিল। ষোলকলায় পরিপূর্ণ চাঁদ যেমন সুন্দর, বোধ হয় তাহা অপেক্ষা শতগুণ সুন্দর এই দেবশিশু। প্রতি অঙ্গবিক্ষেপে তা'র মাধুর্য্য ক্ষরিয়া পড়িত। গান ও ছন্দের যদি কোন আকৃতি থাকে, মনে হয় পরুর আমার প্রতি স্পন্দনে তাহা ছড়াইয়া পড়িত। কি সম্মোহিনী শক্তি এই ষোড়শ মাসের বালকের! এমন লোক নাই যে, পরুকে স্পর্শ করিয়া মুগ্ধ না হইত। শিশু শুধু কল্যাণ বিতরণ করিত; 'হরিবোল' বলিলে দুই হস্ত মস্তকে উত্তোলন করিত। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে করতালি দিয়া 'বাহবা' বলিত। কত অনিদ্র রজনী আমি এই দেবশিশুর অলৌকিক কথা ভাবিয়াছি; তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া কতক্ষণ তন্ময় অবস্থায় কাটাইয়াছি; নিজের স্বার্থের কত অসীম চরিতার্থতা-সাধন স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমার মান, যশ, অর্থ পরুর জীবনের সঙ্গে জড়িত, সেই পরুকে অবজ্ঞা—অসম্ভব! অথচ সত্য!! স্ত্রী যে একেবারে অবাধ্য তাহা নহে, তবুও কি যেন মোহজালে জড়িত—কোথা হইতে অনাদরের প্রবল বন্যা; আমার সুখ শান্তি ভাসাইয়া দিল।

আট

সেইদিন সংক্রান্তি; ৺সত্যনারায়ণ পূজা। নটু পূজার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। পরু কিন্তু দুষ্টামি করিয়া বেড়াইতেছে। দিদি ও আমার স্ত্রী পূজার আয়োজন করিতেছে। দিদি মাঝে মাঝে হাস্যমুখে পূজার ঘরে আসিতে বারণ করিতেছে; পরু কিন্তু শুনিতেছে না। হঠাৎ সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কতকটা সিন্নি মুখে দিল এবং পরক্ষণেই একটী কলা তুলিয়া লইয়া মুখমধ্যে প্রদান করিল। আমার স্ত্রী বোধ হয় মনে মনে বিরক্ত হইয়া এতক্ষণ স্তব্ধ ছিল, কিন্তু এইবার ধৈর্য্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়া পরুর গণ্ডে ভীষণ চপেটাঘাত করিল। পরু মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে অক্ষম হইয়া তৎক্ষণাৎ নীলবর্ণ হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দিদি কাঁদিয়া উঠিল। আমি উর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইতে ছুটিয়া আসিলাম এবং স্বর্ণফলক বাহির করিয়া নিজের মুখ দেখিলাম। উঃ, কি ভীষণ বিকৃত মূর্ত্তি! এ কি মানব না রাক্ষস? রাক্ষসই বটে;—এত রক্তধারা দুই ওষ্ঠে? এতবড় চক্ষু? এত বৃহৎ মুখমণ্ডল? এ কি আমি? উন্মত্তের মত ছুটিয়া পরুকে বক্ষে ধারণ করিলাম। তাহার পর বাহ্যিক সংজ্ঞা হারাইয়া ছিলাম। দেবদূত আসিয়া পরুকে দাবী করিয়াছিল; আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, আমি অধম, অকৃতী, সন্তান পালনে অযোগ্য। অর্থে ও সামর্থ্যে সর্ব্বাংশে বলীয়ান হইলেও, অবহেলার কলুষ সন্তানের অকল্যাণ সাধন করে। দেবদূত বলিল, "হতভাগা, তোর প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া আমি তোকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠরত্ন দিয়াছিলাম। বল, বুদ্ধি, বিদ্যা সবই তোর ছিল, কিন্তু অভ্যাসদোষে কার্য্য-কুশলতা হারাইয়াছিস। এত সতর্কতা সত্ত্বেও তুই তাহা প্রয়োগ করিতে অক্ষম হইলি! তোরই মত মন্দভাগ্য কোটী কোটী নরনারী সন্তান কামনা করিয়া সন্তান লাভ করে—কিন্তু কই, পালনে যত্ন কোথায়? তোরা অপ্রাণের উপাসনা করিস্—প্রাণের যত্ন শিখিস্ নাই। ঈশ্বর শিশুর অপমান সহ্য করেন না; আমরা তাই অপমানকারীর বুক হইতে লক্ষ শিশু দৈনিক কাড়িয়া আনি। সন্তান হারাইয়া হাহাকার সকলেই করে, কিন্তু এতটা বিসর্জ্জন দিয়াও প্রকৃত শিক্ষালাভ কাহারও হয় কি? বুঝে দেখ্, নারায়ণকে দূরে ফেলিয়া তোরা কি না আজ কলার পূজা করিলি! ধিক!!"

নয়

দিদি বলিল, আমি পরুকে বুকে লইয়া সংজ্ঞাহীন হইবার পর এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। কেহ বাধা দিতে সাহসী হয় নাই, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়াছিল। তাহার পর কতদিন বিগত হইয়াছে, সেই বনে কতবার গিয়াছি, কিন্তু সেই বৃক্ষ আর চিনিতে পারি নাই। সুগন্ধ এখন আর সেই একটী গাছ হইতে বাহির হয় না; সারা বনটী ভরা সুগন্ধ। কাজেই আর পথ চেনা যায় না; বনে আসিলেই কোথায় কোন্ পথে চলিয়া যাই, তাহা স্থির হয় না। এখন মনে হয়, প্রতি বৃক্ষতলেই পরু শুইয়াছিল, তাই প্রতিবৃক্ষতলে ধনরত্ন আছে। উঃ, সারা বনটাই ত রত্নরাজিতে পূর্ণ! এখন কিন্তু একটী কাণাকড়িও প্রাপ্তির উপায় নাই। যেখানেই খনন কর শুধু মৃত্তিকা; সে প্রস্তরও নাই, তাম্র কলসও নাই। আমার ব্যবসার কি হইল? স্ত্রী, নটু ও দিদি কোথায়?—আর থাক্—সে সব কথা নাই বা শুনিলে।

দশ

এই মন্দিরটী করিয়াছি। ভিতরের বিগ্রহ একটী ষোড়শমাসের শিশুমূর্ত্তি। বক্ষে স্বর্ণহার, হস্তে স্বর্ণবলয়, মস্তকে কুঞ্চিত কেশকলাপ। বিগ্রহ দোলায় স্থাপিত। পূজার উপকরণ জল ও কমলালেবু, যাহা পরু ভালবাসিত। যে একান্ত-মনে নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিগ্রহকে দোল দেয়, তাহার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়—

"আমার মত্ত মনের মধুপ সে যে,
চিত্ত দোলায় নিত্য দোলে ;—
দোল্—দোল্—দোল্—দোল্—দোলা।"—*

ওঁ

বজ্রাচার্য্য

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

স্পর্শমণি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

একমাত্র মেয়ে।

ছুধে-আলতা রং, টানা টানা চোখ, জোড়া ভুরু, ভোমরা কালোচুল, মুক্তোর মত শাদা দাঁত, রক্ত-রাঙা ঠোঁট, মৃণালের মত বাহু, চাঁপার কলির মত আঙ ল—যেন শিল্পীব প্রতিমা। কোথাও খুঁত নাই—এতটুকুও নাই। যে দেখে, সেই চেয়ে থাকে—চোখ ফেরাতে পারে না—চেষ্টা কর্‌লেও পারে না। চেয়ে চেয়ে চাইবার তৃষ্ণা যেন আর মেটে না—বেড়েই চলে।

মা নিভাননী সদাই মারমুখো। হাড়িপানা মুখখানা ভার করে' গম্ভীর গলায় বলেন—বাবা, মেয়ে ত নয় যেন ধিঙ্গি। —সংসারের কাজকর্ম্মে এতটুকু ইচ্ছে নেই—আছে কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে' 'টল' দিয়ে বেড়ান। কেন রে বাপু, তুই হলি মেয়ে, সংসারের সব কাজকর্ম্ম দেখ বি—আমি মা, অসুখ শরীর নিয়ে একা পেরে উঠি নে, আমার সুখ-সুবিধার দিকে তাকাবি, তা' না বেড়াবি কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে'—তার আবার না আছে সকাল, না আছে সন্ধ্যে।

বাবা মহিম—স্কুলের মাষ্টার। ছাত্রদের 'হোম্ টাস্‌কে'র খাতাব ভুল সংশোধন কর্‌তে কর্‌তে বলেন—কেন সকাল-সন্ধ্যোয় ইলাকে অমন করো? পাঁচটা নয়,সাতটা নয়, মোটে ঐ একটা মেয়ে—কোনদিন টুপ্ করে' সরে' যাবে, তখন বক্‌বার জন্যে কাউকেও পাবে না—মাথা কুট্‌লেও না।

মহিমের কথায় নিভাননীর চোখ জলে ছলছল করে' ওঠে। বলেন—ইলা কি শুধু তোমারই মেয়ে—আমার কি সে কেউই নয়—আমি কি তাকে এতটুকুও ভালবাসি নে—কেবলি বকি?

—আমি ত তাই দেখি—মহিম বলেন।

নিভাননী বলেন—তা' হ'লে, আজ থেকে আমি যদি আর ইলাব সম্বন্ধে কিছু বলি তবে—আবদার দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে যা' করে' গড়ে' তুলেছ—সারাদিন স্কুলে থাক, তোমার ত আর শুন্‌তে হয় না কিছু—দিনের মধ্যে পঞ্চাশ দফা নালিশ শুনতে হয় আমাকে। কেউ এসে বলে—গাছে উঠে পেয়ারা পেড়েছে, কেউ বলে—বাতাবী লেবু গাছে আর একটাও রাখে নি তোমার মেয়ে, কেউ বলে—তোমার মেয়ে ত দেখ্‌লাম সতীশ মালোর সঙ্গে সাঁতার দিচ্ছে 'পাগলা দহে'—এম্‌নি আরও—

—আরও আছে নাকি?—মহিম জিজ্ঞাসা করেন।

—হাঁ—কাল ত শুন্‌লাম মেয়ে আমার রোজ সকাল-সন্ধ্যোয় রায়েদের মদনের কাছে ছোরা, লাঠিখেলা শিখ্‌ছে—নিভাননী উত্তর করেন।

—সে ত বেশ ভালই—আজকাল যে রকম নারী-হরণের সংবাদ পাওয়া যায়, তা'তে শুধু মেয়েদের কেন, মেয়ের মায়েদেরও যদি সুযোগ সুবিধা হয় তবে ও সব কিছু কিছু শিখে রাখা ভাল—তুমিও একটু একটু শিখে নিয়ো না ইলার কাছে—বলা যায় না, বিপদ কখন কোনদিক দিয়ে আসে—মহিম হাস্‌তে হাস্‌তে বলেন।

—তোমার ওই অলক্ষুণে হাসিই মেয়ের ভবিষ্যৎটা ঝর-ঝরে করে' তুল্‌ছে—আরও তুল্‌বে। জান না ত, সেদিন 'দহে' যেতে দেখি, মদনদের বাগানে মদন আর ইলা ছু'জনে লাঠিখেলা অভ্যেস কর্‌ছে। কোনদিন শুন্‌ব—নিভাননীর কথা শেষ হয় না।

ধমক দিয়ে মহিম বলেন—যেদিন শুন্‌বে, সেদিন শুন্‌বে—এখন কাজ থাকে ত মুখ বুজে কাজ কর গে।

নিভাননী নিঃশব্দে সংসারের কাজে মন দেন।

ইলাকে নিয়ে নিভাননীর ও মহিমের এইরূপ বাক্-

বিতণ্ডা এই প্রথম ও নতুন নয়। রোজই হয়, কোন কোন দিনে আবার দু'বারও হয়।

ইলার সহিত দৌড়ঝাঁপে কেউ পারে না, গাছে ওঠায় কারও কাছে সে হারে না, সাঁতারে সে প্রমাণ করে' দিয়েছে যে, তারও সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে হ'লে মাণিক মালোকে পুনর্জন্ম নিয়ে আস্‌তে হবে। কুস্তীতে নাকি মদনও এক-একদিন তার কাছে হেরে যায়।

মেয়ের এই তথাকথিত দোষগুলি নিভাননী মুখ বুজে হজম কর্‌তে চান্ না—চাইলেও পারেন না।

মহিম কিন্তু পারেন বলেই মেয়েকে মধ্যে মধ্যে প্রশংসাও করেন।

ইলাকে নিয়ে মহিম ও নিভাননীর বাক্‌বিতণ্ডার প্রথম ও প্রধান কারণ এইটাই। সংসারের কাজকর্ম্মে মাকে সাহায্য করা না করাটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

মহিম বলেন—ইলাকে আজ দেখতে আস্‌বে।

—কোথা থেকে—নিভাননী জিজ্ঞাসা করেন।

—রতনপুর থেকে। হরিশ মুখুয্যের ছোট ছেলে—এইবার ডাক্তারী পাশ দিয়েছে—মহিম উত্তর করেন।

—বেশ ভালই—পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্য এ সম্বন্ধে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা না করে' নিভাননী বলেন।

সেই রাত্রে হরিশ মুখুয্যের ছোট ছেলে মেয়ে দেখে যায়।

নিভা জিজ্ঞাসা করেন—কি বল্‌ল, পছন্দ হয়েছে ত?

—বল্‌ল—চিঠি পাবেন—মহিম উত্তর করেন।

—তার মানেই পছন্দ হয় নি—নিভাননী বলেন।

—তাই বুঝি বল্‌ল যে—বেশ মেয়ে—আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে মহিম বলেন।

—ওই রকমই বলে। আমার বোনের বিয়ের সময় ওরকম কত জায়গা থেকে মেয়ে দেখ্‌তে এল, বলে' গেল—বেশ মেয়ে, গিয়ে চিঠি দেব—কিন্তু চিঠি আর কোন জায়গা হতেই আসে না—নিভাননী বলেন।

—তা' তোমার বোন্ আর ইলা?—আকাশ আর পাতাল তফাৎ। তোমার বোন্‌কে দেখে যারা বেশ বলেছে, ইলাকে দেখ্‌লে তারা খুব বেশ বল্‌ত—মহিম বলেন।

—ইলা ত তোমার খুব বেশ, কিন্তু গুণগুলো ত তার একটাও খুব বেশ নয়, তাই বোধ হয় তাদের পছন্দ হয় নি—নিভাননী বলেন।

—তা' না হোক্, দেশে কি আর ছেলের অভাব?—মহিম বলেন।

—দেশে মেয়েরও অভাব নেই—ছেলেরও নেই। কাজেই ইলার অভাবে হরিশ মুখুয্যের ছোট ছেলে অবিবাহিত নেই। আর তার অভাবে ইলাও 'আইবুড়ো' নেই।

ইলার বিবাহ হ'য়ে যায়।

স্বামী সামান্য চাক্‌রে—তার তথাকথিত দোষগুলির কথা জেনে-শুনেই তাকে বিবাহ করে—তার অপ-রূপরূপে মুগ্ধ হ'য়ে—নিজে পছন্দ করে'।

ইলা শ্বশুর-বাড়ী আসে।

এতদিনের অভ্যাস কাটিয়ে ওঠা তার কাছে হ'য়ে ওঠে দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য।

দেবর সোমনাথের সঙ্গে ছাদের ওপর সকাল সন্ধ্যায় সে ছোরা খেলে, লাঠি ঘোরায়।

সোমনাথ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাশের খবরের আশায় এবং অপেক্ষায় এতদিন বাড়ীতে বসেছিল। ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশের খবর পেয়ে সে কোল্‌কাতায় যায়—বোনের বাড়ী থেকে কলেজে পড়্‌বে বলে'।

মেয়ের বাড়ী বেড়াবার জন্য শাশুড়ীও যান্—সোমনাথেরই সঙ্গেই।

মহা মুস্কিলে পড়ে ইলা।

মুস্কিল আসান করে, দেবেন—পাশের বাড়ীর একটী ছেলে। ইলাকে সে বৌদি' বলে' ডাকে—ইলার শ্বশুর-বাড়ী তার গতি অবাধ, অপ্রতিহত।

সোমনাথের অভাবে দেবেনই হয় তার ছোরা, লাঠি-খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী, কুস্তি লড়ার গুরু, সাঁতারের সঙ্গী।

মাস যায়।

শাশুড়ী ফিরে আসেন। দেবেনের সঙ্গে বধূর অত ঘনিষ্টতা তাঁর চক্ষে বিসদৃশ ঠেকে। ছেলেকে ডেকে বলেন—হ্যাঁরে, বউ ত নিজে পছন্দ করে' আন্‌লি—বলি গেরস্ত ঘরের মেয়ে ত', না—

—কেন মা?—ছেলে জিজ্ঞাসা করে।

—বৌ-ঝিদের পাশের বাড়ীর ছেলের সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠত কিসের? হ'লই না হয় বৌদি' বলে—

—কার সঙ্গে? ছেলে জান্‌তে চায়।

—ওই দেবেনের সঙ্গে। সেদিন দেখি—

কথা অসমাপ্ত রেখে মা আবার বলেন—ওকে পাঠিয়ে দে ওর বাপের বাড়ী, আমি আবার তোর বিয়ে দেব।

—দেবেনের সঙ্গে অত মিশো না, মা রাগ করেন—অমল বলে।

—তা' জানি; কিন্তু রাগটা মিথ্যে ও অন্যায় তা'ত তুমি জান—ইলা বলে।

—আমি জানি, কিন্তু মা ত বোঝেন না। তুমি দেবেনের সঙ্গে ছোরা খেল, সাঁতার দাও, মা ভাবেন—

অমলের কথা বন্ধ করবার জন্য ইলা বলে—তা' ভাবুন, বয়ে গেল। আমার মা এতদিন ভেবে ভেবে যার প্রতিকার করতে পারেন নি, তোমার মা সামান্য এই ক'দিনে তা' কি করে করবেন—

—তা' এক কাজ করি চল—দিনকতকের জন্যে তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী রেখে আসি—মাও জীবনের বাকীটা কাশীতে কাটাব কাটাব করছেন অনেক দিন থেকেই—তোমাকে বাপের বাড়ী রেখে, মাকে কাশীতে থাকার একটা সুবিধে করে' দিয়ে আবার তোমায় নিয়ে আস্‌ব—অমল বলে।

—সত্যি কথাটা বলতে বুঝি মুখে বাধে, না? আমি কিছু শুনি নি ভেবেছ? তা' নয়, সব শুনেছি—আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করতে চাও—এই ত। তা' একটা কেন, তুমি যদি পাঁচ-পাঁচটা বিয়ে করে' ফেলো, তবুও আমি আমার অভ্যেস ছাড়্‌তে পারব না—একটাও না—কিছুতেই না—ইলা বলে।

—সত্যিই আমার উদ্দেশ্য তা' নয়—আমায় তুমি মিথ্যে বুঝো না ইলা—আমায় তুমি ভুল বুঝো না—অমল বলে।

—সত্যি মিথ্যেয় দরকার নেই—আমায় পাঠিয়ে দাও বাবার কাছে—দিনকতক আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি—ইলা বলে।

একবছর পরের কথা।

ইলা সন্তান-সম্ভবা। কিন্তু স্বভাব তার এখনও বদলায় নি—এতটুকুও না। এখনও সে পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি করে, গাছে চড়ে' তাদের পেয়ারা লেবু পেড়ে দেয়। তাদের সঙ্গে বাজী রেখে পাল্লা দিয়ে সাঁতার কাটে।

মা বলেন—ইলা, এখনও কি তোর দিস্যিপনা যাবে না—আজবাদে কাল যে ছেলের মা হবি।

—বলেছি মা, আমি না মলে কেউ আমায় ওসব ছাড়াতে পারবে না—তা' সে ছেলেই হোক্, আর যেই হোক্—মাতৃত্বের মহান দায়িত্বে অনভিজ্ঞা ইলা বলে।

—তুই মরবি মর, কিন্তু পেটেরটা ত বাঁচাবি, না সেটাকেও মেরে ফেল্‌বি—মা বলেন।

—মলে আর আমি কি কর্‌ব—ইলা উত্তর করে।

—কি আর করবে? করতে তোমায় কিছুই হবে না—কেবল থাক্‌তে হবে চুপ করে', স্থিরভাবে, শান্ত হ'য়ে—আর ছাড়্‌তে হবে তোমার গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, লাঠি খেলা, দৌড়ঝাঁপ দেওয়া—মা বলেন।

—তা' পারব না মা, তা' পারব না—মাথা দুলিয়ে ইলা বলে।

মা বলেন—মর্ মর্, সব তা'তেই মেয়ের যেন আদি-খ্যেতা!

মরণ কারও হুকুমের চাকর নয় যে, বল্‌লেই কাউকে নিয়ে যাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে, পরপারে।

কাজেই ইলার মা বল্‌লেও ইলা মরে না—তার যে ছেলে হয়, সেও নয়।

মাস পূরিয়া যায়।

অমল ইলাকে নিতে আসে। তার মা জীবনের বাকীটা তীর্থক্ষেত্রে কাটাবার জন্যে কাশীবাসী হয়েছেন।

স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী—আর তারই সঙ্গে ছোরা, লাঠিখেলা ও যুযুৎসু কৌশল অমলদের ওখানে হয়। সেবারও হবার সময় এগিয়ে আসে।

সভানেত্রী হবার জন্য সকলেই অনুরোধ করেন ইলাকে।

ইলার ওসব বিষয়ে পারদর্শিতার কথা সকলেই শুনেছেন দেবেনের মুখে এবং কিছু অতিরঞ্জিতই শুনেছেন।

ইলা প্রথমে প্রত্যাখ্যান করে। বলে—পারব না, সময় কম।

শেষে সকলের অনুরোধে বলে—অন্য কাউকে অনুরোধ করুন, আমার উপর ভরসা করবেন না—কিন্তু যদি সময় করে' উঠ্‌তে পারি, তবেই যাব, নইলে নয়।

অমল বলে—এবার প্রদর্শনী শুন্‌ছি তোমার সভানেত্রীত্বে হবে, যাবে ত?

—তাই ত ভাবছি—ভদ্রলোকের মেয়েরা সব অনুরোধ করে গেলেন—ইলা উত্তর করে।

—যাবে বই কি—অমল উত্তর করে।—নিশ্চয়ই যাবে—তোমার ত ছেলেবেলা থেকে পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান অভ্যেস—এখন দেখ্‌ছি সেটা একেবারে অনভ্যেস করে' ফেল্‌লে।

ইলা উত্তর করে—দেখা যাবে বিকালে।

বিকাল হয়।

ইলাদের বাড়ীর সাম্‌নে মোটর থামে। সহরের সব বড় ঘরের মেয়ে-বৌরা আসে। বলে—চলুন ইলা দি'।

—আমার যাওয়া হবে না ভাই—ইলা বলে।

—আপনি একটু অনুমতি দেন না—একজন মেয়ে ঘরের ভেতর গিয়ে অমলকে বলে।

—আমার ত অনুমতি দেওয়াই আছে—অমল বলে।

—তবে আর কি, চলুন ইলা দি'—আর একজন মেয়ে বলে।

—আমার যাওয়া হবে না দিদি, মিছে কেন আপনারা দেরী কর্‌ছেন—আর কাউকে দেখুন—ইলা বলে।

বিফল হ'য়ে সবাই ফিরে যায়।

অমল বলে—যাও না, অতগুলো বড়লোকের বৌ-ঝিরা অত করে' অনুরোধ কর্‌ছে।

ইলা তেড়ে ওঠে—কি যে বল, এখুনি খোকা ঘুম থেকে উঠ্‌বে—তা'কে খাওয়াতে হবে—বাছার আমার গা-টাও যেন একটু গরম গরম হয়েছে—তুমি বরং চট্ করে' একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে এস দিকি।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

অভিশপ্তা

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

তিন
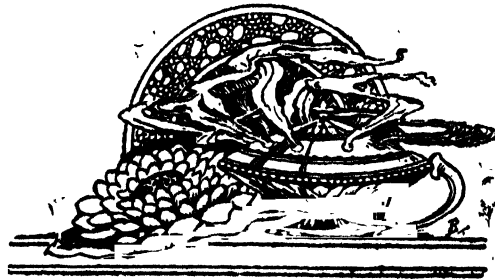
রেখা উনুনে তরকারী চড়িয়ে দিয়ে ময়দা মাখছিল। তরী ওপরে গেছে বিছানার পাট সারতে।

বাইরে অন্ধকার ঘোরালো হয়ে এসেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়ছে বুঝি।

এলোমেলো হাওয়াটা সহসা থম্‌কে গিয়ে যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে—একটা অনিবার্য্য, আসন্ন দুর্য্যোগের জন্য। রেখার অন্তরও আজ মেঘাচ্ছন্ন।

কলের পুতুলের মত হাত দু'খানা চালিয়ে নিয়ে গেলেও সে মন দিতে পারছিল না কোনো কাজেই। উদ্বেগ, অশান্তি, অনুশোচনা ভোগ করছে সে এখানে এসে পর্য্যন্ত, কিন্তু চির-সহিষ্ণু শান্ত প্রকৃতি তা'র আজ্‌কের মত এমন উত্যক্ত অধৈর্য্য হয় নি তো কোনোদিন। আজ কি হ'ল রেখার?

ঘরের মধ্যে একটা তীব্র আলোকছটা ঝক্‌মকিয়ে উঠ্‌তেই রেখা সচকিত হয়ে দেখ্‌লে—বাগানের দিকের খোলা জানলায় ছাতা মাথায় 'টর্চ্চ' হাতে মিহির—সে কি এখনো যায় নি?

রেখা ত্বরিতে জানলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কই?—তুমি গেলে না?

—হ্যাঁ, যাচ্ছি এইবার। বলছিলুম কি—আমার ফিরতে যদি দেরী হয়—

—দেরী না করলেই ভালো,—আকাশের গতিক যে রকম,—বৃষ্টিও তো পড়ছে—এর পর যদি বেশী—

—হোক্ না, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত যাই হোক্—আমাকে যেতেই হবে যে!—না গিয়ে কি পারা যায়?—হ্যাঁ গা?—

টর্চ্চটা উঁচু করে ধরে, রেখার মুখপানে তাকিয়ে মিহির মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল।

কী নিষ্ঠুর - অথচ কী মধুর সে হাসি! চটুল নয়নের আবেশময় চাহনীতে কী মাদকতা তার!

অমন রূপ, যা' দেখলে সহজে চোখ ফেরে না—প্রসাধনে আরো সুন্দর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যেন।

সিল্কের পাঞ্জাবী, সিল্কের চাদর, ভুরভুর করছে হাস্নুহানার মোহময় মিষ্ট সুগন্ধে। কালো কুচ্‌কুচে রেশমের মত সুবাসিত চুলগুলি স্তরে স্তরে নেমে গেছে শুভ্র ললাটের দুইধারে। রক্ত-রাঙা চুনী দেওয়া আংটীটা তার সুগৌর সুগঠিত আঙুলটীতে কী চমৎকার মানিয়েছে!

সুন্দর! অপরূপ!—

কিন্তু, এই নয়ন-মন-বিমোহন সৌন্দর্য্যের অধিকারী যে, তার হৃদয় কি বিধাতা গড়েছেন শুধু পাথর দিয়ে?

একটা উতল দীর্ঘশ্বাস চাপ্‌তে গিয়ে রেখার বুকখানা দুলে উঠ্‌ল।

—রাগ করলে? না রাগ করো না রাণী!—আমি যত শীগ্‌গির পারি ফিরব,—তবে যদির কথা বলা যায় না তো, তাই বল্‌ছি, দেরী হয়ে গেলে তোমরা আমার অপেক্ষায় জেগে বসে থেকো না যেন,—বুঝলে? তোমার শরীর এম্‌নই ভাল নয়, আচ্ছা, চললুম তা' হ'লে—

দু' পা গিয়ে আবার পেছিয়ে এসে আলোটা রেখার দিকে তুলে মিহির পুনরায় বল্‌লে—যাই তবে? হ্যাঁ গো?

—যাও না! আমি কি বারণ করছি? যাও!

—আহা! যাও বল্‌তে নেই লক্ষ্মী! বলো, এসো!

রেখার অপ্রসন্ন মুখের পানে মধুর দৃষ্টিপাত করে, একটুখানি মুচ্‌কে হেসে মিহির চলে গেল।

সেইদিকে চেয়ে চেয়ে রেখার বুকের তটে তটে ছাপিয়ে

পুড়া অবরুদ্ধ মর্ম্মবেদনা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল দু'টী নয়ন পথে।

তরী রান্নাঘরে ঢুকেই বললে—ও দিদিমণি, কি করো? তরকারীটা পুড়ে যায় যে।

রেখা ত্বরিতে বাহু দিয়ে মুখ চোখ যথাসম্ভব মুছে ফেলে তরকারী দেখ্‌তে এলো।

তরী আধ্‌মাখা ময়দাটা ঠিক্ করতে করতে রেখার আরক্ত ছলছল চোখ দু'টীর দিকে আড়ে আড়ে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—দাদাবাবু এখন গেলেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—একটু সকাল করে ফির্‌তে বলে দিলে তো?

—হ্যাঁ।

তরীর যেন ছট্‌ফটানি ধরেছিল—রেখাকে কি একটা বল্‌বার জন্যে এবং জান্‌বার জন্যেও।

কিন্তু এই মিতভাষিণী, ধীর প্রকৃতি মেয়েটী,—ধ্যানমগ্না তাপসীর মত নিজের চারিধারে এমন একটা গাম্ভীর্য্যের আবরণ রচনা করে রাখে যে, তার মনের সন্ধান পাওয়া সহজ কথা নয়।

তবু যতটা পারা যায়—মিহিরের প্রতি তরীর মনের ভাব যেমন হোক্ রেখার যথার্থই শুভকামনা করে সে। রেখার দুঃখ তাকে ব্যথা দেয়, তাই তখনকার মত চুপ করে গেলেও খানিক পরে লুচি বেল্‌তে বেল্‌তে সে আবার বললে—তুমি একটুকু শক্ত হও দিদিমণি! নইলে দাদাবাবু যেরকম বাড়াবাড়ি করছেন—তাতে···শেষকালে তোমাকে গেরাহ্যিই করবেন না হয় তো।

—না করুক্ গে! মানুষের ইচ্ছার ওপর কারুর জোর নেই তো! রেখা গম্ভীর-মুখে অনাগ্রহের ভাবে বললে।

তরী সাহস পেয়ে বল্‌লে—জোর কারুর না থাক্, তোমার তো আছে? এই আজ্‌কের কথাই বল্‌ছি, উনি কোথায় গেল তা' জেনেও মানা করলে না একটীবার, তুমি জোর করে বলতে যদি—

—কি দরকার জোর-জবরদস্তি করে? অবুঝ তো নয় যে, তাকে ধরে-বেঁধে...না, সে আমি পারব না।

—কিন্তু ভুগতে হবে যে তোমাকেই দিদিমণি!

—ভুগ্‌তে হয় ভুগ্‌ব, এসেইছি তো ভুগতে! 'নইলে এ রকম—রেখা মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে কড়ায় ঘি ঢালতে লাগল। তার কণ্ঠস্বর গাঢ়, কিন্তু অকম্পিত।

তরী অবাক্ হয়ে ভাবে—এ রাগ না অভিমান? যাই হোক্, মেয়েটী কি চাপা বাপু! বলে 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।' সে হ'লে মনের জ্বালায় খুনোখুনী কাণ্ড করে বস্‌ত হয়তো, মেয়েমানুষ সব সইতে পারে, কিন্তু এ কি সহ্য করা যায় গা? আর কর্ত্তার আক্কেলকেও বলিহারী বলি! কোথায় তাড়াতাড়ি দু'হাত এক করে দেবে—তা' নয়; বুড়োর যত সব ভিট্‌কেলমি! যাক্, এখন এই কার্ত্তিক মাসটা কোনোরকমে পেরিয়ে গেলেই, ব্যস্—

তরীর মনের কথা মুখে ব্যক্ত হয়ে পড়্‌ল—এই কার্ত্তিক মাসটা গেলে বাঁচা যায় বাপু!

—কেন?

তরী বিস্ময়ের সহিত বলে উঠ্‌ল—ও মা! কেন আবার? সাম্‌নের অঘ্রাণেই তো তোমাদের বিয়ে।

বিয়ে? হায়! এ তার উদ্বাহ না উদ্বন্ধন? ফাঁসীর ব্যবস্থা তো হয়েই রয়েছে, কেবল গলার ফাঁস দিতে বাকি—তা'ও হবে এবার?···কিন্তু এ ফাঁস যদি সে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয় জোর করে...এটুকু শক্তি কি নেই তার? কেন থাক্‌বে না?

মনের দুর্ব্বলতা নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে, এ মরীচিকা মায়া-মোহ সবলে কাটিয়ে রেখা যদি আজই এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে চলে যায়, তাকে ধরে রাখ্‌তে পারে কে? সে তো নাবালিকা নয় যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে...

—টাকাগুলো দত্ত-মশায় না ছাড়েন—যাক্ গে! নিজের জীবিকার্জ্জনের যোগ্যতা তার আছে তো? তবে নারীত্বের এ লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করে সে এখানে পড়ে থাকে আর কেন? কিসের আশায়?

না, এ বন্দীত্বের বন্ধনে আর নয়—ঢের হয়েছে! সে আর থাক্‌বে না, বেরিয়ে পড়বে। এ দিক্‌কার একটা হেস্তনেস্ত করে আজকালের মধ্যেই—

রেখার চোখের জল শুকিয়ে গেল। তার বেদনা-

রুক্ষ চিত্তে বেজে উঠ্‌ল একটা বিদ্রোহের রুদ্র সুর। তরী ঠিক্ বলেছে—একটু শক্ত হও—শক্তই সে হবে এবার।

* * *

—জ্যাঠামশায়!

কর্ত্তা আহারাদি সেরে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন না, ঝিমোচ্ছিলেন, আফিমের মাত্রাটা আজকে যেন একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল, অবশ্য সেটা ইচ্ছা করেই,—বাদলার দিন!

নেশার ঘোরে দত্ত-মশায় খেয়াল দেখ্‌ছিলেন—লোচন মণ্ডলের কাছে প্রাপ্য সুদে ও আসলে টাকাটা আদায় করতে না পেরে তার বন্ধকী বাড়ীখানা ও বিঘাটাক জমী তিনি নিলামে চড়িয়েছেন। লোচন কিছুতে ছাড়ে না, কর্ত্তার হাতে পায়ে ধরে সে কাকুতি-মিনতি করছে আর মাসখানেক সময় দেবার জন্য। লোচনের বড় ছেলে নবীন নিষ্ফল আক্রোশে রুখে এসে গাল-মন্দ করেছে—যাচ্ছেতাই ভাবে! ছোটলোকের ছেলের এত বড় আস্পর্দ্ধা! দত্ত-মশায় অসহ্য হয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে—ব্যাটাচ্ছেলে পাজি নচ্ছার কোথাকার!—যত বড় মুখ নয়, ততবড় কথা! বলে যেই তার গালে ঠাস্ করে একটা চড় মারতে গেছেন—অমনি রেখার ডাকে চমক-ভাঙ্গা হয়ে তিনি ত্রস্তে বলে উঠলেন—কে? কে?

—আমি। আপনার দুধ নিয়ে এলুম।

রেখার হাত থেকে দুধের বাটী নিয়ে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন—মিহির গেল নাকি?

—হ্যাঁ; অনেকক্ষণ।

—সকাল করে ফেরে, তবেই—নইলে মুস্কিল আর কি?—একে অন্ধকার রাত, তায় বাদল বৃষ্টি। কাছে-পিঠে এমন কেউ নেই যে, ডাক্ দিলে সাড়া দেবে। গ্রাম-সুদ্ধ জানে বুড়ো ব্যাটা টাকার কুমীর।—বুড়োর লোহার সিন্দুকের ওপর সব শালার নজর। হাবাতের ব্যাটারা জানে না তো—কত কষ্টে বুকের রক্ত জল করে তবে টাকার মুখ দেখা যায়। হিংসুটের দল সব--গেরস্থর ঘরে দু'বেলা দু'টি চড়তে দেখলেই বুক ফেটে মরে, যো পেলে এরাই গলা টিপ্‌তে ছাড়বে নাকি?

খালি বাটীটা নামিয়ে রেখে রেখা জিজ্ঞাসা করলে—মশারিটা ফেলে দেব?

—না না, এখনি কি! মিহির যতক্ষণ না ফেরে আমার তো ঘুম হবে না—ঘুমোনো উচিতও নয়।

—কিন্তু ওঁর তো কিছু ঠিক নেই,—দেরীও হ'তে পারে, বলে গেছেন—ওঁর অপেক্ষায় জেগে বসে থাক্‌বার দরকার নেই।

—হুঁ। দরকার নেই!—উনি তো বলে খালাস—তারপর? এদিক্‌কার ঠেলা সাম্‌লায় কে? কবে যে বুদ্ধি হবে! আরে বাপু, দিনে দিনে ঘুরে বেড়াও না যত ইচ্ছে, তা' বলে রাত বেড়ানো—এমন কি বন্ধুতা? আর তোমাকেও বলি বাছা, তুমি যদি একটু শাসন নিয়মে রাখতে ওকে—

—আমি! আমি করব শাসন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি! নয় তো কি পাড়ার লোকে আস্‌বে ওকে সাম্‌লাতে? কি বুদ্ধি দেখো! লেখাপড়া শিখেছ না—ছাই!

রেখা চুপ করে রইল। দত্ত-মশায়ের কথার পিঠে কথা সে কোনোদিনই বলে না। আজ যেটুকু বলেছে, নেহাত গায়ের জ্বালায়। যত দোষ তারই!

রেখার নির্ব্বাক্ ক্ষুব্ধ মুখের পানে তাকিয়ে কর্ত্তা গলার স্বর খাটো এবং সাধ্যমত মোলায়েম করে বল্‌লেন—বোকা মেয়ে! তোমার ভালোর জন্যেই বলি, এরপর ভুগ্‌তে হবে তো তোমাকেই? এই যে আজকাল খিদির-পুরে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করছে, দিন নেই রাত নেই—এর মানে কি? তুমি তো জানো না, ও সেখানে যায় কিসের লোভে—

—জানি!

বল্‌বে না মনে করেও কথাটা রেখার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল অসতর্কে।

—জানো? তা' হ'লে মানা করো না কেন? অ্যাঁ?

—বারণ যদি কেউ না শোনে—

—আলবৎ শুন্‌বে! শুন্‌তে যে হবেই তাকে! ঘরের বউ তুমি—আরে, আজ না হলেও দু'দিন বাদে হবে তো?

রেখার বুকের ভেতরটা টন্‌টন্ করে উঠ্‌ল, ইচ্ছা হ'ল বলে —না! এ বন্ধনে ধরা দিতে সে আর চায় না; চায় নিষ্কৃতি, মুক্তি!

কিন্তু উদ্যত রসনা তাড়াতাড়ি সংযত করে এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ আরও অগ্রসর হবার আশঙ্কায় সে চলে যাচ্ছিল, দত্ত-মশায় বললেন—তরী গেল কোথায়?

—রান্নাঘরে, খেতে বসেছে বোধ হয়। কেন? কিছু চাই না কি?

—কিছু না, ওকে বলে দিও, ওপরে আস্‌বার আগে একবার গোয়াল-ঘরটা ও আলো ধরে বেশ করে দেখে সদরে আর খিড়্‌কীর দোরে তালা দিয়ে আসে যেন। মিহির এসে ডাক্‌লে খুলে দিলেই হবে। বৃষ্টি এখনো পড়ছে, না?

—খুব অল্প, টিপ্ টিপ্ করে। তবে রাত্তিরে হয় তো বেশীরকম —

—এঃ! তবেই তো গোল দেখ্‌চি। মিহির কখন ফিরবে কি জানি। তরীকে ভালো করে বলে দিও, বুঝলে? আমি তো জেগেই আছি, তবু সাবধানের বিনাশ নেই।

রেখা চলে গেল কর্ত্তার আদেশ পালন করতে। কিন্তু তরী তো নীচেয় নেই, রান্নাঘরে খিল দেওয়া, সে গেল কোথায়? পুকুরে না কি? আলোটাও নিয়ে গেছে। কী ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! ওঃ! রেখার গা-টা ছম্‌ছম্ করে উঠল যেন।

সে তাড়াতাড়ি ফিরে চলল ওপরে। কিন্তু সিঁড়ির কয়েক ধাপ্ উঠেই দেখতে পেলে বাগানের দিকে একটা আলো। আলোটা আস্‌ছিল—বাগানে যে একখানা বড় চালাঘর আছে, তারই একটা ঘুলঘুলি দিয়ে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির গাঢ় আঁধারের মধ্যে আলোটা বড় উজ্জ্বল ও তীব্র দেখাচ্ছে। ও ঘরে কে? তরী নাকি?

চার

রাত ন'টা কি সাড়ে ন'টা হবে।

পল্লী এরই মধ্যে নিশুতি। দত্ত-মশায়ের আশে-পাশে কেবল দরিদ্র চাষী ও শ্রমিকদের বাস। দিবসব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত তারা, সকাল সকাল যা' হোক্ দুটো খেয়ে নিয়ে প্রদীপ নিবিয়ে শুয়ে'পড়েছে যে যার কুটীরে।

প্রকৃতি নিঝুম নিস্তব্ধ। শুধু বাতাসের সন্‌সনানি, আর এলোমেলো বায়ুবেগে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়া ছোট ছোট বৃষ্টি বিন্দুর টুপ্‌টাপ শব্দ শোনা যায়।

রেখা তার ঘরের সাম্‌নে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে, ঠিক্ স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। তার কেশ-বেশ বিপর্য্যস্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস অসম্ভব দ্রুত, সমস্ত দেহটা কেঁপে উঠ্‌ছে থেকে থেকে। ভয়ে, রাগে, কি উত্তেজনায়—কে জানে!

চারিদিক অন্ধকার কালো মিশ্‌মিশে। বাগানের সে আলোটাও আর দেখা যায় না তো! রেখা সেদিক্‌কার পাঁচিলে 'ভর' দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখ্‌লে—না, সে আলোটা আর নেই, কি জানি কখন—

যাক্ গে! সে চায় না—আর চায় না! না—না! এ 'না' যে কিসের বিরুদ্ধে তা' বোঝা যায় না, শুধু একটা আপত্তি, প্রবল আপত্তি রেখার আহত উত্তেজিত অন্তরে বিপ্লবের সূচনা করে বল্‌ছিল—না—না—না!

বাতাসেও সেই শব্দ—বাগানের উঁচু গাছগুলো আঁধারের কালি মেখে অশরীরী ছায়ামূর্ত্তির মত যেন মাথা নেড়ে বলে উঠ্‌ছে—না—না—না!

একটা উচ্ছ্বসিত তপ্ত দীর্ঘশ্বাস রেখার মর্ম্ম মথিত করে বেরিয়ে গেল। না, সে আর সইতে পারে না, আর থাক্‌তে পারে না, সে চলে যাবে, পালিয়ে যাবে—এই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি, কেউ জানবে না, কেউ দেখবে না!

কোথায় যাবে? যে দিকে দু' চক্ষু যায়! পালাবার এমন সুযোগ যদি আর নাই পাওয়া যায়! যদি—

কিন্তু কেন? এমন করে লুকিয়ে চোরের মত পালাতে যায় সে কেন? কিসের ভয়ে? কাল দিনের আলোয়, জিনিস-পত্র সব নিয়ে সকলের সামনে গেলে তাকে আটক করে রাখতে পারে কে?

মিহির...আঃ! সেই প্রিয়, অতি প্রিয় নাম!—আজ মনে আন্‌তেও রেখার দেহ মন শিউরে উঠল যেন! উৎকর্ণ, উন্মুখ হয়ে সে অন্ধকারেই চেয়ে রইল—সেই বাগানের ঘর-

থানার দিকে,—ও কি! ওখানে আবার আলো জ্বলে নাকি? নাঃ, ও একটা নক্ষত্র—কালো মেঘের ফাঁক থেকে উঁকি মেরে চুপি চুপি কি যেন দেখ্ছে। অমন করে শিউরে উঠছে ও কি দেখে? ওঃ! তারাটা কি মস্ত!—কী উজ্জ্বল অন্তর্ভেদী ওর দৃষ্টি!

সেদিকে চেয়ে রেখার বুকটা কেঁপে উঠল গুরগুর করে। আবার,—ওদিকে, কে যেন চীৎকার করে না?—নাঃ! কাছেই কোথায় একটা নিশাচর পাখী ডানা ঝট্‌পটিয়ে ডেকে ওঠে,—তীব্র কর্কশস্বর তার—কা'র বুক-ফাটা আর্ত্তনাদের মত।

কিসের একটা অজানিত শঙ্কায় আপাদ-মস্তক কণ্টকিত হয়ে রেখা ত্বরিতে চলে এলো ঘরে ভেতর।

তরীর দেখা নেই তখনো।

উত্তেজনার পর অবসাদ অনিবার্য্য। রেখা তা'র ক্লান্ত অবশপ্রায় দেহ বিছানায় এলিয়ে দিতেই চোখ দুটো জড়িয়ে এলো,—তন্দ্রা ঠিক নয়, কেমন আচ্ছন্নের মত ভাব।

সেই অবস্থাতেই তার কানে গেল—কান্নার শব্দ। এবার ভ্রম নয়, সত্যই,—নারীকণ্ঠের বড় আর্ত্ত ব্যাকুল সে রোদন,—ওঃ! অমন করে কে কাঁদে গো? এ যদি স্বপ্ন হয়? প্রথমটা মনে হ'ল তাই, কিন্তু আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে চোখ রগ্ড়ে চেয়ে দেখবার পরও যে...

শব্দটা আস্‌ছে যেন বাগানের দিক্ থেকে,—ক্রমশঃ কাছে,—আরো কাছে, নীচে থেকে ওপরে। কে ও? তরী নাকি? তরী কাঁদে কেন? রেখা ধড়মড়িয়ে উঠে দেখ্‌তে গেল। এমন সময় ছাদের ওপর ধড়াস্ করে জোরে একটা শব্দ হ'ল···খুব ভারী জিনিস পড়বার মত। সঙ্গে সঙ্গে গোঙানী। সজোরে গলাটা টিপে ধরলে মানুষ যেমন কথা বল্‌তে না পেরে গোঁ গোঁ করে—ঠিক তেমনি।

রেখা শশব্যস্তে হেরিকেন্‌টা হাতে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে সিঁড়ি থেকে উঠ্‌তেই ছাদের ওপর পড়ে'—তরীই বটে, উপুড় হয়ে মুখ থুব্‌ড়ে—প্রসারিত হাত দু'খানা মুষ্টিবদ্ধ করে···হাত দুটোতে ও কি! রক্ত নাকি? কাপড়েও তো—

উঃ! এ যে টক্‌টকে লাল তাজা রক্ত! কী সর্ব্বনাশ!

তরী! ও তরী! তরীর কি হ'ল? জ্যাঠা-মশায় ও জ্যাঠা-মশায়! দারুণ আতঙ্কে রেখার গলা থেকে শব্দ যেন বেরোয় না, তবু সে চীৎকার করে উঠল প্রাণপণ শক্তিতে।

—বাপুরে বাপু! কি হ'ল তোমাদের? অমন করে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছ কেন?

বল্‌তে বল্‌তে দত্ত-মশায় বেরিয়ে এলেন।

—ও কে, তরী আছাড় খেলে বুঝি?—আঃ! যা' হুড়মুড় করে চলে ঝড়ের মত। কোথায় লাগ্‌ল?

কাছে এসেই তিনি চমকে উঠ্‌লেন—এত রক্ত! বাপ রে! এ রক্ত বেরোয় কোত্থেকে? কপালটা কেটে গেল না কি? আলোটা রেখে দত্ত-মশায় রেখাকে বল্‌লেন—একটু ধর তো একে সোজা করে দেখি, চোটটা লেগেছে কোথায়—

রেখা ধরবে কি তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল থরথর করে। হাত পা সব ঠাণ্ডা অবশ হয়ে আসে যেন।

দত্ত-মশায় ধমক্ দিয়ে বললেন—তুমি যে ভয়েই 'কাঠ' হয়ে গেলে। ধরো না একটু।

রেখার সাহায্যে তরীকে কোনোমতে সোজা করে শোওয়ানো হ'ল। কিন্তু কই?—তার কপালে, মুখে, নাকে, মাথায়, জখম তো কোনোখানেই নেই! তবে এ রক্ত এলো কি করে? দত্ত-মশায় আলোটা তরীর মুখের কাছে ধরে ডাক্‌তে লাগলেন—তরী! ও তরী!—কথা কস্‌নে কেন রে? কি হ'ল তোর, কোথায় লাগ্‌ল, বল্ না?

তরী কথা বল্‌বে কি? সে মূর্চ্ছিতা। চোখ দুটো তার আধ-চাওয়া শিবনেত্রের মত—দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। গলার মধ্যে কেমন একটা বিশ্রী শব্দ হচ্ছে।

—আমার ঘরের ছোট বাল্‌তীটা নিয়ে এসো দেখি—মুখে-চোখে খানিক জলের ঝাপটা দিলেই জ্ঞান হবে 'খন।

তাই করা হ'ল, কিন্তু তরীর জ্ঞানোন্মেষের কোনো লক্ষণই নেই।

—একি হ'ল জ্যাঠা-মশায়? রেখা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে।

দত্ত-মশায় ভ্রূ দুটো কুঁচকে উদ্বিগ্নভাবে বল্‌লেন—কে জানে। ছুঁড়ীর মিরগী আছে নাকি? কিন্তু রক্তটা···আচ্ছা, ওর হাত দুটো ধুইয়ে দেখ তো, যদি বঁটীতে হঠাৎ কেটে ফেলে থাকে।

তরীর রক্তমাখা ঠাণ্ডা হাতখানা হাতে ঠেক্‌তেই রেখা ভয়ানক চম্‌কে উঠ্‌ল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত। সে শোণিত স্পর্শ তার শিরায় শিরায় একটা প্রবল শিহরণ জাগিয়ে তুল্‌লে নিমেষে।—উঃ! আমি পারব না জ্যাঠা-মশায়, আমার বড় ভয় করেছে। এ রক্ত, এত রক্ত কা'র?

বলতে বলতে তরীর হাতখানা ছেড়ে দিলে।

দত্ত-মশায় মহা বিরক্তিভরে বলে উঠ্‌লেন—সরো। আমি ধুয়ে দিচ্ছি, তুমি জল ঢেলে দিতে পারবে? না, তাতেও ভয় করবে? আচ্ছা ঝামেলায় পড়েছি যা' হোক্।

কম্পিত করে তরীর রক্তাক্ত হাতে জল ঢাল্‌তে গিয়ে রেখা বারবার শিউরে উঠে অস্ফুট স্বরে বল্‌লে—এত রক্ত! উঃ! এত রক্ত কেন?

বাস্তবিক এ রক্ত লাগ্‌ল কেমন করে? হাতে তো কাটাকুটি দূরের কথা—এতটুকু আঁচড়ের চিহ্নও দেখা যায় না, আশ্চর্য্য!

বৃষ্টিটা মাঝে থেমেছিল, আবার আরম্ভ হ'ল। এবার বেশ বড় বড় ফোঁটায়। বাইরে থাকা আর চলে না। বিদ্যুৎও চম্‌কাচ্ছে ঘন ঘন। দত্ত-মশায় ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—একে টেনেটুনে ঘরে নিয়ে গিয়ে ফেলি, নইলে ওর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ভিজে মরব যে। একটু পার্‌বে ধরতে? কেবল পা দুটো—

এবার রেখা আর না বল্‌তে পারলে না। দু'জনে ধরাধরি করে তরীর অবশ শিথিল দেহটা কষ্টে-সৃষ্টে এনে ফেলা হল দত্ত-মশায়ের ঘরে। তখনো সে অচৈতন্য, কেবল মুষ্টিবদ্ধ হাত দু'খানা ঢিলে হয়েছে মাত্র।

—এখনো হুঁস হ'ল না? কি হবে গো!

রেখা তরীর গায়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাক্‌লে—তরী! ও তরী! কি হ'ল তোমার, বলো না? —ও তরী!

তরীর ঠোঁট দু'খানা ঈষৎ নড়ে উঠ্‌ল, মুখ না খুলেই দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ গোঁ করে কি যেন বলতে চেষ্টা করলে,—বোঝা যায় না কিছু, কিন্তু রেখার মনে হ'ল সে যেন বল্‌ছে—দা—দা—বা—বু—

—কি বল্‌ছ তরী? অ্যাঁ!

তরী আর সাড়া দিলে না। গোঙানীও বন্ধ হয়ে গেল তার। একটা অনির্দ্দেশ অমঙ্গল আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত ব্যাকুল হয়ে রেখা দত্ত-মশায়ের দিকে তাকিয়ে কাতরভাবে বল্‌লে—কি হবে জ্যাঠা-মশায়? এর যে এখনো জ্ঞান হ'ল না।...একবার ডাক্তারকে ডেকে দেখালে—

—হ্যাঃ!—ডাক্তার ডাক্‌ব না আর কিছু।—টাকাগুলো আমার ফাল্‌তু এসেছে কি না? একটীবার নাড়ী টিপে চারটী টাকা অন্ততঃ···আর এই অন্ধকার দুর্য্যোগের রাতে বন-বাদাড় ভেঙে ডাক্তার ডাক্‌তে যাবেই বা কে, শুনি। আমার অত গরজ নেই। দত্ত-মশায় ভয়ানক বিরক্ত ও উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন। দুশ্চিন্তা তো ছিলই। তা' ছাড়া, তরীর সঙ্গে এতক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে—বুড়ো মানুষ তো! আফিসের নেশাও তাঁর ছুটে গিয়েছে তখন।

রেখা তাড়া খেয়ে চুপ করে গেল। কিন্তু সুস্থির হতে পারল না এক মিনিট। সে অতিমাত্র উদ্বেগের সহিত একবার মূর্চ্ছাহতা তরীর বুকের স্পন্দন, নাকের নিঃশ্বাস পরীক্ষা করে, আবার মুখে হাত দিয়ে দেখে দাঁতকপাটী খুলেছে কি না।

তার ব্যাকুলতা দেখে দত্ত-মশায় অপেক্ষাকৃত নরমভাবে বললেন—অত ঘাব্‌ড়াচ্ছ কেন বাছা। মিরগী রোগে এমন ধারা হয়ে থাকে, তুমি দেখো নি তাই, খানিক বাদে আপনিই জ্ঞান হবে।

—কিন্তু রক্ত, এ রক্ত কিসের। রেখা ত্রস্তে জিজ্ঞাসা করলে। বিবর্ণ পাংশুমুখে তার বিভীষিকার ছায়া সুস্পষ্ট। তার মুখের পানে এক মুহূর্ত্ত হতবুদ্ধির মত ফ্যালফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে দত্ত-মশায় হুস করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—কি জানি বাপু! আমি তো মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেলুম একে নিয়ে! কোথায় কি করে রক্ত

মেখে এলো। বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে...মিহিরও তো এলো না এখনো,—ক'টা বাজ্‌ল দেখ দেখি।

রেখা ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—সাড়ে এগারোটা।

—ওঃ! এত রাত হ'য়ে গেছে।—তা' হ'লে রাত্তিরে আর ফিরছে না সে। থাক্‌—যা' দুর্য্যোগ! আমি একবার নীচে গিয়ে দেখে আসি, দোরতাড়া সব 'হাট্‌' করাই রয়েছে বোধ হয়। কে কোথা থেকে ঢুকে...

তখন বৃষ্টি পড়ছে বেশ। দত্ত-মশায় গায়ে মাথায় একখানা মোটা চাদর জড়িয়ে, একহাতে মোটা একটা বাঁশের লাঠি, আর অন্য হাতে লণ্ঠন নিয়ে যাচ্ছিলেন। রেখা সহসা ছুটে এসে তাঁর হাত চেপে ধরল—আমিও যাব জ্যাঠা-মশায়! আমাকেও নিয়ে চলুন।

—কোথায় গো?

দত্ত-মশায় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

রেখা ব্যগ্রতার সহিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললে—নীচে। আপনার সঙ্গে আমিও একবার...আপনার পায়ে পড়ি জ্যাঠা-মশায়।

—বাবা রে বাবা! একি জ্বালায় পড়লুম গো? এরা আমাকে আজ পাগল না করে' আর ছাড়্‌বে না দেখ্‌ছি! নাঃ, থাক গে—আমার আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। রান্নাঘরে বাসনগুলো রয়েছে, তাই...তা' যাক্‌ গে সব চোরে নিয়ে, আমার কি? আমি তো আর বুকে করে' নিয়ে যাব না সব? থাক্‌লে তোমাদেরই···

দত্ত-মশায় ঘরের দোরগোড়ায় লাঠি চাদর সব রেখে দিয়ে ফিরে এলেন বকৃতে বকৃতে। রেখা একান্ত অসহায়-ভাবে তরীর শিয়রে এসে বসে' পড়ল 'ধপ্‌' করে'।

—ওখানে আর বস্‌তে হবে না, তুমি শুয়ে পড়ো এবার। খামকা রাত জেগে অসুখ বাঁধিয়ে বসো, তারপর ডাক্‌ ডাক্তার, আর আন্‌ ওষুধ!—একে এমনি তো রোজ অসুখ লেগেই আছে তোমার!

দত্ত-মশায়ের ঘরের পাশেই রেখার ঘর। মাঝখানে একটা দরজাও আছে। দত্ত-মশায় সেই দরজটা খুলে দিয়ে রেখার ঘরের বাইরের দিক্‌কার দোর-জানলা সব বন্ধ করে এসে বল্‌লেন—ওঠো, শোও গে যাও।

—না জ্যাঠা-মশায়, আমি এখন শুতে পারব না, তরীর জ্ঞান হ'লে—

—আরে, জ্ঞান ওর হবেই—এতক্ষণ হয়েও থাক্‌বে—হয়তো ঘুমুচ্ছে, নয়তো বজ্জাতি করে মট্‌কা-মেরে পড়ে আছে আবাগী! নাড়ীতো বেশ টন্‌টনে রয়েছে দেখ্‌লুম—কোনো ভয় নেই। তুমি শুয়ে পড়ো। অমন ভাবে 'কাঠ' হয়ে বসে থেকে—শেষে তুমিও 'ফিট্‌' হ'য়ে পড়ো যদি, তবেই তো চিত্তির! মরতে হবে আমাকেই তো? আজকাল্‌কার মেয়েদের যে কথায় কথায় 'ফিট্‌'! যাও, ওঠো বল্‌ছি।

রেখা উঠ্‌ল না। তার বিপন্ন আর্ত্তভাব দেখে দত্ত-মশায় বল্‌লেন—ভয় করবে? আচ্ছা, তা' হ'লে আমার বিছানাতেই গড়িয়ে পড়ো, আমি তো এখন শুতে পারব না, দোরটোর সব খোলা—তারপর মিহির যদি এসেই পড়ে—

ঘরের কোণে একখানা বেতের ইজিচেয়ার রাখা ছিল কবেকার—সেইটে তরীর কাছে টেনে নিয়ে লাঠিটা হাতের গোড়ায় রেখে দত্ত-মশায় বসলেন।

রেখা আর বসতে পারছিল না, সে আস্তে আস্তে উঠে বিছানার একধারে শুয়ে পড়ল—বিপর্য্যস্ত অবসন্ন দেহমন নিয়ে।

বৃষ্টি এবার মুষলধারে পড়ছে।

তীব্র তড়িৎ শিখা থেকে থেকে ঝিলিক্‌ মারছে—অন্ধকার আকাশের নিকষ কালো বিশাল বুকখানা দু'খান্‌ করে' চিরে দিয়ে। ঝোড়ো হাওয়া গোঁ গোঁ করে ছুটছে—দিক্‌বিদিকে। ওঃ; কী দুর্য্যোগ!

এই দুর্য্যোগের মধ্যে মিহির যদি আসে...আসবে কি? যদি...যদিই সে আর না আসে...এই বিভীষিকাময়ী করাল রাত্রি...

—কড় কড় কড়াৎ!

কি ভয়ানক !—এ বজ্রপাত কোথায় হ'ল কি জানি।

রেখার বুকের ভেতর ধড়াস্ করে' উঠ্‌ল সজোরে। কিতে মনে পড়ে গেল মিহিরের সেই হাসি আর কথা—

—যাও বলতে নেই লক্ষ্মী ! বলো এসো !

রেখা হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে উঠে বস্‌ল। দত্ত-মশায় জিজ্ঞাসা রলেন—কি হ'ল আবার ?

—বাইরে কে চেচিয়ে উঠ্‌ল না ?

খানিক উৎকর্ণ হয়ে দত্ত-মশায় বল্‌লেন—

—কই ? ও তো বাতাসের শব্দ ! তুমি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছ নাকি ?

—তরীকে আর একবার...

—আবার ! বলছি চুপ করে' শুয়ে থাকো একটু, তা' নয়। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে আমাকে আজ দুটোতে মিলে ! বাবারে বাবা ! এমন জানলে মিহিরকে আমি ছেড়ে দিতুম নাকি ! না হয় রাগই করত একটু।

তরী তখনো নিঃসাড়ে পড়ে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক। হাত-পায়ের সে আড়ষ্টভাব আর নেই—এইটুকু তফাৎ।

পাঁচ

—কর্ত্তাবাবু গো !

ভোর হয়েছে। রাতের দুর্য্যোগ কেটে গেছে নিঃশেষে। দারুণ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় ক্রমাগত ছটফট্ করতে করতে গভীর ক্লান্তিতে রেখা কোন্ সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। দত্ত মশায় চেয়ারে বসেই ঢুলেছেন সারারাত। শেষ রাত্রে তন্দ্রাটুকু বেশ জমে এসেছে, তন্দ্রা ঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন—ঘরে যেন চোর ঢুকেছে, একজন না দু'-দু'জন। ইয়া লম্বা চৌড়ো গোঁটাগোঁটা চেহারা, তাদের ইয়া দাড়ি গোঁফ্ ! একজন লোহার সিন্দুকের ভারি তালাটা ভাঙবার চেষ্টা করছে, অন্যজন দত্ত-মশায়ের লাঠি গাছটাই বন্দুকের মত উঁচিয়ে ধরে' ভয় দেখাচ্ছে তাঁ'কে—কী সর্ব্বনাশ !

ভীষণ আতঙ্কে তিনি যখন প্রাণপণ চেষ্টা করেও চেঁচাতে পার্‌ছিলেন না, সেই সময় স্বপ্নের ঘোর তাঁ'র কেটে গেল তরীর আর্ত্তনাদে।

রেখা আগেই জেগে উঠেছে, কিন্তু তার মুখে একটী শব্দ নেই, চোখেও পলক নেই !

—আঃ ! কি করিস্ বাপু ? চৌপর রাত চোখে-পাতায় এক করতে দিলি না—আবার এখনো...

দত্ত-মশায় চোখ মেলে সোজা হ'য়ে বস্‌তেই তরী—কর্ত্তাবাবু গো ! দাদাবাবুকে দেখো—

বল্‌তে বল্‌তে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল।

—কে ? কে ? মিহির ? কই, কি হয়েছে তার ? আ গেল যা ! কাঁদিস্ কেন আবাগী ? বল না ?

—কি আর বল্‌ব গো ! তোমরা শীগগির করে' চলো গো ! দাদাবাবু...

ক্রমশঃ

পূর্ণশশী দেবী

সমবেদনা

শ্রীমতিলাল দাশ

ছোট সহর। মানুষে মানুষে পরিচয়ে গভীর আত্মীয়তার স্পর্শ না মিলিলেও কুৎসা ও নিন্দার স্পর্শ সকলকে এক করে। যে জাতি বড়, সে অপরকে ঈর্ষা করে না—অপরের সহিত প্রতিযোগিতা করে। আমরা মৃতকল্প। অপরকে ধূলায় নামাইয়া দম্ভ করিতে পারিলে আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না।

জাতীয় চরিত্রের এই অন্ধকার যবনিকা আমাদের আখ্যাত সহরটীকেও সজ্জিত করিতে ভোলে নাই।

হরেনবাবুর বাড়ীতে আড্ডা বসে—তাস, দাবা ও পাশাখেলার হুল্লোড় চলে। নবাগত আমাকে ভবেশবাবু টানিয়া লইয়া গেলেন।

মজলিস বটে! আনন্দও উচ্ছল হইয়া সকলকে তৃপ্ত করে—কিন্তু কি সংকীর্ণতার পরিসর! আমাদের আশে-পাশে যে বৃহৎ জগৎ ভাবের দোলায় দুলিতেছে—তার কোনও দোলা যেন এখানে পৌছে না। আত্মতৃপ্তি—কিন্তু সে তৃপ্তির পিছনে ত প্রচণ্ড অবসাদ—সুবিপুল ক্লৈব্য।

বসিয়া খোস-গল্প শুনিতেছি, এমন সময় আসিলেন একটী অপরিচিত ভদ্রলোক—প্রৌঢ়, কিন্তু মুখ-কান্তি সৌম্য। মানুষটীকে দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। ভদ্রলোক বলিলেন —"হরেন দা'—আসাম-বন্যার জন্য কিছু করার দরকার।"

'ছ-তিন নয়' এবং 'কচে বারো'র দল মুখ তুলিয়া চাহিয়া খেলায় মনোনিবেশ করিল। 'ব্রিজে'র খেলোয়াড়েরাও বিরক্ত-দৃষ্টি হানিয়া খেলিতে লাগিল। হরেনবাবু বলিলেন—"দেখুন, অপ্রিয় কথা আমার মুখে নাই বা শুনলেন।"

আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ব্যাপার কি বুঝিলাম না। হরেনবাবু বিরক্তিটা কোনও মতে ঢাকিয়া বলিলেন—"আপনি জাতি-ধর্ম্ম ধ্বংস করেছেন—তবু আপনার লজ্জা নেই—আপনার সঙ্গে কেউ আর এখন কাজ করবে না।"

ভদ্রলোকের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, কোনও প্রকারে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"কিন্তু এত সামাজিকতা নয়, হরেনবাবু।"

—"সামাজিকতা হোক্ না হোক্—আপনার মত কালাপাহাড়ের সঙ্গে কেউ চলবে না—কোনও কাজেই নয়।"

পাশাড়ুরা চীৎকার করিয়া উঠিল—"কখনই নয়—চালো বারো পোয়া তেরো।"

'ব্রিজ' যাহারা খেলিতেছিল, তাহারাও বলিল—"যা' বলেছেন—কখনই নয়।"

ভদ্রলোক কথা কহিলেন না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। মজলিসে নিন্দার শতমুখী-ধারা বহিতে লাগিল।

ফিরিবার পথে ভবেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি জানেন নাকি?"

—"জনার্দ্দন চৌধুরীর কথা বলছ ত। লোকটা খুব কর্ম্মী—ওর ঘরোয়া জীবন নিয়েই শুধু নিন্দে। কতকটা জানি বটে—কিন্তু সে এক মহাভারত! আজ নয়, আর একদিন বলব।"

কৌতূহল উদগ্র হইলেও চুপ করিয়া রহিলাম। ভবেশবাবুকে বিরক্ত করা চলে না। গৃহের আনুগত্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র—সেখানে কোনও বিবর্ত্তন বাধাইতে সাহসী নই—আর রাত্রিও সত্যই অধিক হইয়াছিল।

কিন্তু রাত্রে ঘুমের ঘোরে সৌম্য ও তেজস্বী মুখখানি যেন বারেবারে চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল—নানা অসংলগ্ন স্বপ্ন-ঘটনা রচনা করিয়া আমার নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মাইল।

ভাদ্রের ভরানদী।

কূল ছাপাইয়া উদ্দাম জলরাশি নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছিল। বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, ছোট সহরটীর প্রাণ এই নদী।

ওপারে ধানের ক্ষেত জলে ডুবিয়া গিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি চলে জলে জলাকার। মাঝে মাঝে দু'-চারিটি বনস্পতি শ্যামল শাখা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদীকূলে দাঁড়াইয়া এই সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলাম।

কাল রাত্রির দেখা সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটী নমস্কার করিয়া বলিলেন—"আপনি এখানে নূতন এসেছেন?"

অমায়িক আচরণ। অন্তরে প্রশ্ন জাগে—যার চরিত্র এত মধুর, লোকে তাকে পাষণ্ড কেন বলে?

বলিলাম—"হ্যাঁ, দু'-চারদিন এসেছি।"

—"আসবেন, এই নদীতীরে বেড়াবেন—এটা খুব ভালো বেড়াবার যায়গা।"

—"বন্যার কতদূর কি করলেন?"

অপ্রতিভ হইয়া ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর প্রশ্ন করিলেন—কাল মজলিসে আপনি ছিলেন?"

—"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

—"তা' হ'লে ত সবই জানেন।"

—"কিন্তু সহরে ত আরও মানুষ আছে—"

আমার প্রশ্নের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"কিন্তু যাঁরা সহরের গণ্যমান্য, তাঁরাই যখন কিছু করবেন না—"

—"আমি অবাক হচ্ছি, ওঁরা কেন এমন করছেন?"

—"ওঁদের খুব দোষ নেই, ওঁরা রাগ করতে পারেন।"

—"কিন্তু কেন?"

—"শুনতে চান?"

—"অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন।"

—"বেশ চলুন, কাছেই আমার বাড়ী—সকালবেলায় একটু গল্প শুনবেন।"

আমি বলিলাম—"আপনাকে বিরক্ত করা হবে না ত?"

—"না, মোটেই নয়—তবে আমার মুখে আমার ইতিহাস শুনলে আপনিও জলগ্রহণ না করে আমার বাড়ী থেকে ফিরবেন।"

—আপনার ইতিহাস জানি নে, তবে মনে রাখবেন—সংসারে মানুষে মানুষে তফাৎ আছে। কিন্তু আপনার সাথে আগে পরিচিত হ'য়ে নেই। আমার নাম—"সরিৎকুমার সোম। আমি এখানে ডাক্তার হ'য়ে এসেছি।"

—"নমস্কার সরিৎবাবু। আমার নাম—জনার্দ্দন চৌধুরী।"

—"তা' জানি। শুনেছি—আপনি সত্যকার কর্ম্মী।"

—"সত্য মিথ্যা জানি নে, কায করেছি—কিন্তু আর বোধ হয় করতে পারব না।"

ভদ্রলোককে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহার সহিত চলিলাম।

সুন্দর সুদৃশ্য কুটীর।

ফুল ও পাতাবাহার গাছের কেয়ারিতে অঙ্গন একান্ত মনোহর দেখাইতেছিল। অনুমান, ষোল-সতের বৎসরের একটী তরুণী ফুলের বাগানে ফুল তুলিতেছিল—আমাদিগকে দেখিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ইজিচেয়ারে বসিলাম। জনার্দ্দনবাবু বলিতে লাগিলেন—"যাকে ফুলের বনে দেখলেন, তিনিই এই নাটকের নায়িকা। আমি তখন চাকরী করি—পোষ্ট অফিসের কেরাণী। কিন্তু কেরাণীর কাজ করলেও মনে তখন আশা ও উৎসাহ ছিল, তাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার খেয়াল ছিল।

—"সেবার এই সহরে কলেরার বেজায় হিড়িক—রাত্রিদিন লোক মরছিল—কে কা'কে দেখে, কে কার সেবা করে।

—"আমি একটা সেবা-সমিতি গড়লাম—উস্কার মা বাপ কলেরায় আক্রান্ত হ'ল। গরীব বামুন—পুরুতগিরি করে' কোনও রকমে কাল কাটান—বিপদে কেউ তাঁর

সহায় ছিল না। সমিতি থেকে তাঁদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা হ'ল —কিন্তু ফলে-মহামারী উল্কার মা বাপকে এক রাত্রেই নিয়ে গেল। উল্কা তখন দু'-তিন বছরের শিশু।

—"সহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলকে অনুরোধ করলাম। কেউ এই শিশুর ভার নিল না। তাই আমার ঘরেই তাকে আশ্রয় দিলাম।

—"আমার ঘরেই উল্কা মানুষ হ'ল—কিন্তু আমি ছোট জাত—আমার জলচল নয়—তাই আমার ভাত জল খেয়ে উল্কারও জাত গেল।

—"উল্কা দিনে দিনে বেড়ে উঠল—ওর বিয়ের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলাম—কোথায়ও ওর বিয়ে দিতে পারি নি। আমার স্ত্রী পাঁচ-ছ' বছর হ'ল নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছেন। উল্কাই সেই থেকে আমার সংসার চালাচ্ছিল।

—"নিরুপায় হয়ে উল্কাকে বললাম—বাংলাদেশের কেউ তোকে বিয়ে করবে না—চল্, কাশী যাই—সেখানে অন্য দেশের কারও হাতে তোকে সমর্পণ করে' আমি দায়মুক্ত হবো।

—"উল্কা দৃপ্তকণ্ঠে বল্‌ল—'আপনার ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।'

—"আমি বললাম—'বলিস কি—বিয়ে না হ'লে তোর উপায় কি হবে—হিঁদুর মেয়ের বিয়ে না হ'লে যে চলে না।'

—"উল্কা বলল—'তা' জানি নে, আমি কোথাও যাব না।'

—"আমি অনেক বুঝিয়ে ওকে কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না—তারপর একদিন আবিষ্কার করলাম—ও আমাকে ভালবেসেছে।

—"এ ভালবাসা শ্রদ্ধায় কি কৃতজ্ঞতায়—তা'বলতে পারি নে। প্রৌঢ় বয়সে এ ভালবাসাকে স্বীকার করতে কিছুতেই সম্মত হ'তে পারি কি—কিন্তু উপায়ন্তর না দেখে শেষে উল্কাকে আমি বিয়ে করেছি।

—"কিন্তু আপনাকে সত্য করে বলছি—এ বিয়ের পেছনে কোনও পীড়ন ছিল না, কোনও লোভ ছিল না।"

আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে বক্তার সত্যদীপ্ত মুখের দিকে চাহিলাম। পরে ভাবাবেগে বলিলাম—"আপনি আমার শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিন্—আপনি সত্যিই দেবতা।"

জনার্দ্দনবাবু বলিলেন—"বলেন কি! আমি অত্যন্ত অধম—অতিশয় দীন।"

—"না—না, আমি আপনার কথার প্রত্যেক বর্ণ বিশ্বাস করছি—আপনি পরিণয়ের বাঁধনে না বাঁধলে এই তরুণীর কি দশা হ'ত জানেন?"

—"জানি বলেই ত দুঃসাহস করতে সাহসী হয়েছি। ওর আশ্রয় ছিল বারবনিতার গৃহে কিংবা কারও গৌরবময় রক্ষিতার আসনে—"

—"খাঁটী কথা বলেছেন। সেদিনও কাগজে পড়ছিলাম—অসবর্ণ বিবাহের ধর্ম্মপত্নী সমাজে চলে না—কিন্তু রক্ষিতায় কোনও দোষ নেই—তার কারণ, সমাজ জীর্ণ ও গলিত।"

—"কিন্তু আপনার ন্যায় মহৎপ্রাণ ক'জন আছেন—" আমরা সমাজে নির্য্যাতিত—আমরা সমাজের কাছে বিতাড়িত।"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম—"আর কেউ না খান, আমি আপনার বাড়ী খাব। আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু। ভয় করবেন না জনার্দ্দনবাবু,—নির্য্যাতনই জীবনের পরিচয়। মৃত যারা, তারাই স্বস্তিকে বরণ করে—জীবন্ত প্রাণ আঘাত খায়, আর আঘাত জয় করে—সেইখানেই তার মহত্ব।"

—"তা' হ'লে চা করতে বলি।"

—"বলবেন বই কি, কিন্তু শুধু চা-য় চল্‌বে না বল্‌ছি।"

জনার্দ্দনবাবু হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতর গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"আপনার কথায় উল্কা খুব খুসী হয়েছে—ওর জীবন বড় একলা কাটছে।"

—"আপনার অনুমতি হয় ত আমার স্ত্রী আসবেন—বৌদি'কে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। বন্যার কথাটা ভুলবেন না—লেগে পড়ুন, পেছনে আমরা আছি।"

জনার্দ্দনবাবু অপরিসীম আনন্দে অভিভূত হইলেন। আমি মনে মনে অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম। সংসারে এমনই সহানুভূতি, এমনই সমবেদনার কাজে যে কি অপরিসীম তৃপ্তি, কি অনন্ত শান্তি লুকানো আছে, মানুষ তাহা জানিয়াও জানে না।

মতিলাল দাশ

চাঁদা

রায়বাহাদুর শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এ, ও-বি-ই

বৈশাখ মাস। দারুণ গ্রীষ্মে চারিটি যুবক কলিকাতার রাস্তার ধারে একটী বাড়ীর ঘরে বসিয়া বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে 'ব্রিজ্' খেলিতেছিল। সকলেই খেলায় তন্ময়; কারণ, নন্দ ও নরেশের 'গ্রাণ্ড্ শ্ল্যাম্' লাভ হইবার উপক্রম হইয়াছে। দু'জনেই বাল্যাবধি সহপাঠী ও বন্ধু এবং উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সম্পূর্ণভাবে বিরাজমান।

'গ্রাণ্ড্ শ্ল্যামে'র ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রাস্তার দিকের দরজার কড়া হঠাৎ কে নাড়িতে লাগিল। খেলোয়াড়েরা অত্যন্ত বিরক্ত হইল। খেলা শেষ করিয়া দরজা খুলিয়া দিবে স্থির করিল; কিন্তু 'ফায়ার ব্রিগেডে'র ঘণ্টার মত সজোরে অনর্গল কড়া নাড়ার শব্দে বাধ্য হইয়া নন্দ উঠিয়া দরজা খুলিতে গেল। দরজা খুলিয়া নন্দ পিছাইয়া আসিয়া বলিল—"ও, আপনি? কি চান?" প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই এক তরুণী ঘরের ভিতর উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরণে খদ্দরের সাড়ী ও ব্লাউস এবং পায়ে সাণ্ডাল। মস্তক হইতে গঙ্গা ও যমুনার মত দুইটী বেণী দুই স্কন্ধ দিয়া বহিয়া বক্ষদেশে পড়িয়া তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। বয়স প্রায় সতের-আঠার বৎসর। প্রকৃত সুন্দরী না হইলেও যৌবন-সুলভ গঠন ও মুখশ্রীতে রমণীকে সুন্দরী দেখাইতেছিল। ঘরের ভিতর আসিতেই বাকী তিনবন্ধু তাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের উষ্ণবায়ু হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নন্দ দরজা বন্ধ করিয়া তরুণীকে বসিতে বলিল। তরুণী বলিলেন—"উঃ, কি গরম! তারপর আপনারা তাসে এত ব্যস্ত যে, দরজা খুলতেই চান্ না।" নন্দ বলিল—"আমরা ত জানি না আপনি এসেছেন।" সকলেই হাসিয়া উঠিল, যেন পূর্ব্ব হইতেই রমণীর আগমনের সংবাদ জানিবার উপায় ছিল। তরুণী বলিলেন —"আপনারা বোধ হয় শুনে থাকবেন বেহারে ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছে।" নরেন বলিল—"সে বিকট সত্যটা আমরা ত অনেকদিনই মেনে নিয়েছি।" নন্দ জিজ্ঞাসা করিল— "আপনি কি ভূমিকম্পের ভুক্তভোগী?" তরুণী বলিলেন— "না, আমি ভুগি নি, তবে যাঁরা ভুগেছেন, তাঁদের সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য।" সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল —"নিশ্চয়ই!" তরুণী তখন ধীরে ধীর ব্লাউসের ভিতর হইতে একখানি রসিদ-বহি বাহির করিয়া বলিলেন— "আমরা চাঁদা তুল্‌ছি, আপনাদের কিছু দিতে হবে।" নন্দ বাড়ীর মালিক, সুতরাং সে বাক্স হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া দিল। তরুণী নন্দর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রসিদ দিলেন। অপর তিনজন বন্ধুর নিকট টাকা চাওয়াতে তাহারা বলিল যে, তাহারা তাস খেলিতে আসিয়াছে, কাজেই সঙ্গে কিছু আনে নাই। তরুণী তাসের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনারা ত 'ব্রীজ্' খেল্‌ছেন। যে রকম তন্ময় হয়ে খেল্‌ছিলেন, তা'তে মনে হয় টাকা বাজী রেখেই খেল্‌ছিলেন; সুতরাং, সঙ্গে নিশ্চয়ই কিছু থাক্‌বার কথা।" বন্ধুরা পরস্পরের মুখ চাহিয়া হাসিতে লাগিল। নন্দ বলিয়া উঠিল—"আপনি সি-আই-ডিতে কাজ করেন নাকি?" তরুণী হাসিয়া বলিলেন —"হয় ত ভবিষ্যতে করতে পারি। এখন থেকে একটু ও বিদ্যে শেখা ভাল।" তখন তিন বন্ধুই পকেট হইতে একটী করিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল। তরুণীও তাহাদের রসিদ দিলেন। পিপাসার জন্য এক গেলাস জল চাহিলেন। নন্দ বলিল—"শুধু জল খাবেন কেন? এত বেলা হয়েছে, রোদে এসেছেন, একটু মিষ্টি ও জল খান না?" তরুণী বলিলেন—"তা' দিন। সেই সকালে এককাপ চা খেয়ে বেরিয়েছি, এখনও পেটে কিছু পড়ে নি।" নন্দ ভিতর হইতে একথালা খাবার ও ঠাণ্ডা জল লইয়া আসিল। তরুণী ধন্যবাদ দিয়া তাহার সদ্গতি করিয়া উঠিলেন। বাহিরে যাইবার পরই নরেন বলিল—"ওরে, মেয়েটী আমা-

দের নাম ও ঠিকানা লিখে নিয়ে গেল, কি জানি কিছু মতলব আছে কি না। ওর নামটা রসিদেই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ঠিকানাটাও জেনে নিলে হয় না?" সকলেই বলিল—"ঠিক।" নন্দ তাড়াতাড়ি রাস্তায় ছুটিয়া গিয়া তরুণীকে বলিল—"আপনি ত আমাদের নাড়ী-নক্ষত্র জেনে নিলেন, নিজের ত কিছুই বল্লেন না। আপনার ঠিকানা?" তরুণী—"বিদ্যাসাগর কলেজ—আই—এ, সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস।" সমর—"সে ত হ'ল কলেজের ঠিকানা, আমাদের বাড়ীর ঠিকানার বদলে আপনার কলেজের ঠিকানা দিলে চলবে কেন? বাড়ীর ঠিকানা কি?" তরুণী—"সাত নম্বর মাথাভাঙ্গা রোড্।" নন্দ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া সকলকে ঠিকানা বলিয়া দিল। একজন বন্ধু বলিল—"আচ্ছা, ওসব টাকা যে ভূমিকম্পে অভাবগ্রস্থ লোকের কাছে ঠিক্ পৌছবে, তা' বিশ্বাস কি? আর একজন বলিল—"রসিদে ত 'অনাথ-সভা'র নাম আর ঠিকানা আছে, না হয় সেখানে খোঁজ করা যাবে।" নন্দ—"লোককে অত অবিশ্বাস কর কেন? যদি পেটের দায়ে মেয়েটী এই দুপুর রোদে ভিক্ষেই নিয়ে থাকে, তাতেই বা কি হয়েছে?" নরেন—"সেটা কিন্তু জুচ্চুরী হবে। ভিক্ষে চাইলে অমন যুবতীকে আমরা নিশ্চয় ভিক্ষে দিতাম; তবে মিথ্যে ভূমিকম্পের নাম নেওয়া ভাল নয়।" সকলেই আবার 'গ্রাণ্ড্ শ্ল্যামে' মন দিল।

দুই

পাঁচ-সাতদিন পরে নন্দ 'অনাথ-সভা'র অফিসে উপস্থিত। একটী ভদ্রলোক খাতাপত্র লইয়া হিসাবে ব্যস্ত ছিলেন। নন্দ তাঁহাকে নিজের রসিদ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মশায়, রেবা বোস যে ভূমিকম্পের চাঁদা আদায় করছেন, সে টাকা আপনি পেয়েছেন কি?" ভদ্রলোক নন্দর রসিদ দেখিয়া বলিল—"না, এখনও টাকা পাই নি। হয় ত চেকবই ফুরিয়ে গেলে একেবারে সব টাকা জমা দেবেন।" নন্দর মনে সন্দেহ হইল, হয় ত নরেনের কথাই সত্য। তরুণী টাকাটা নিজেই বোধ হয় লইয়াছে। সত্যতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য নন্দ সাত নম্বর মাথাভাঙ্গা রোডের দিকে চলিল।

তিন

রোড্ নামে অভিহিত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে মাথা-ভাঙ্গা একটা গলি। নম্বর দেখিতে দেখিতে সাত নম্বর বাড়ীর সম্মুখে নন্দ পৌছিল। বাড়িটি ছোট, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। উপরের জানালাগুলিতে বেশ 'হেম-করা' রঙ্গীন পরদা দেওয়া। সদর দরজা বন্ধ। তরুণী যেরূপ সজোরে নন্দর বাড়ীর দরজার কড়া নাড়া দিয়া-ছিলেন, নন্দ ততোধিক জোরে কড়া নাড়িতে লাগিল। উপর হইতে কোমল কণ্ঠের প্রশ্ন আসিল—"কেও?" নন্দ কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে পারিল না। যদি বলে—"আমি নন্দ।" রমণী তাহাকে কি করিয়া চিনিবেন? কত লোকে চাঁদা দিয়াছে, প্রত্যেকের নাম কি তাঁহার মনে আছে? কাজেই নন্দ প্রশ্নের উত্তরে—"এই আমি" বলিতেই রেবা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া নন্দকে দেখিলেন এবং নীচে আসিয়া দরজা খুলিয়া নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি খবর?"

নন্দ—"এই এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাব্‌লাম—একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে' যাই। আর খোঁজ করি ভূমিকম্পের জন্য কত টাকা আদায় কল্লেন।"

রেবা—"আপনার রসিদটা দেখি।" নন্দ পকেট হইতে রসিদ বাহির করিয়া দিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি ত খুব সাবধানী। এক টাকা চাঁদা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রসিদটা নিয়ে ঘোরেন। ভয় হয়েছে বুঝি, টাকাটা আমি খেয়েছি কিনা।" নন্দ—"না—না—সেজন্যে নয়। আপনি যদি আমায় চিন্তে না পারেন, সেজন্য রসিদটা এনেছিলাম।"

রেবা—"আর লুকোচ্ছেন কেন? এখানে আসবার আগে 'অনাথ-সভা'র অফিসে গিয়ে খোঁজ করেছেন—আমি যে টাকা নিয়েছি, সেটা জমা দিয়েছি কিনা।"

নন্দ আম্‌তাআম্‌তা করিতে লাগিল। রেবা বলিল—"দেখুন, এইমাত্র সভার সেক্রেটারী আমাকে ফোন্ করছিলেন যে, একশ' চুয়াত্তর নম্বর রসিদের মালিক এসে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, আমি যে চাঁদা তুলেছি, সেটা জমা দিয়েছি কিনা।"

নন্দ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল—"কি জানেন,

বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে সন্দেহ করছিল, সেইজন্যে আমি আপনার সততা সম্বন্ধে একটু খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। আমার মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না।"

নন্দর দুরবস্থা দেখিয়া তরুণী বলিলেন—"থাক, ঢের হয়েছে, আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। এখন দয়া করে' ওপরে চলুন। আমাকে পেটপূরে খাইয়েছেন, সেটা কি আমি ভুলতে পারি।"

চার

বাড়ীর ভিতর আসিয়া নন্দ দেখিল—একতালায় দু'টি ঘর। একটিতে এক ভদ্রলোক নিদ্রিত। উপরে তিনটী ঘর। বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

নন্দকে যে ঘরে রেবা বসিতে বলিলেন, সেটি বিলাতী 'ড্রইংরুমে'র মত সাজান। তরুণী এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে ডাকিয়া আনিয়া নন্দকে বলিলেন—"ইনি আমার মা।" আর নন্দকে দেখাইয়া মাকে বলিলেন—"ইনি নন্দবাবু। সেদিন চাঁদা তুলতে গিয়ে এঁরই বাড়ীতে খুব খেয়েছিলাম।" তারপর তিনজনে বসিয়া বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। রেবার মাতার উত্তরে নন্দ বলিল যে, সে এম-এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছে। কলিকাতায় বাড়ী। সংসারে একমাত্র বিধবা মা আছেন এবং তাহাদের সংসারের অবস্থাও সচ্ছল। নন্দও জানিল, রেবারা প্রবাসী, কলেজে পড়িবার জন্য তাহার কলিকাতায় আসা। নীচে যে ভদ্রলোক নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন, তিনি রেবার গৃহশিক্ষক। খানিকক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়া রেবা একথালা মিষ্টান্ন আনিয়া নন্দকে খাইতে অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, নন্দ হৃষ্টচিত্তে অনুরোধ রক্ষা করিল। কক্ষের একপাশে একটী আমেরিকান অর্গান্ দেখিয়া নন্দ রেবাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি গান করেন?" রেবা বলিলেন—"হ্যাঁ—আজকাল গান না জানলে যে মেয়েদের শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না।" নন্দর অনুরোধে রেবা গান গাহিলেন। নন্দ চক্ষু ও কর্ণ বিস্ফারিত করিয়া শুনিল—শুনিয়া মুগ্ধ হইল। ভাবিতে লাগিল—এবার বুঝি চিরকুমার-ব্রত ভঙ্গ হয়। বিদায়ের সময় রেবা বলিলেন—"মাঝে মাঝে আসবেন। তবে বিকেলবেলা আসবেন। আমি সন্ধ্যের পর বড় ব্যস্ত থাকি।" বলা বাহুল্য, নন্দ রেবার অনুরোধে পুলকিত হইয়া 'তথাস্তু' জানাইয়া বাড়ীতে ফিরিল।

পাঁচ

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। নন্দর 'কোর্টসিপ্'-বিদ্যা খুব ক্ষিপ্রগতিতে চলিতেছে। একদিন বৈকালে রেবার বাড়ী যাইবার সময় একটা গরুর গাড়ীর সহিত নন্দর বাইসিকেলে অকস্মাৎ ধাক্কা লাগায় তাহার গন্তব্যস্থানে পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া নন্দ ভাবিতে লাগিল—ভিতরে যাইবে কিনা। না যাওয়াই ভাল; কারণ, রেবার গৃহকার্য্যে বিঘ্ন হইতে পারে, আর সন্ধ্যার পর আসিতেও ত নিষেধ ছিল। আবার ভাবিল—এতদূর আসিয়াছে, আর যখন আজ আসিবার কথাই ছিল, তখন না হয় ক্ষমা চাহিয়া একবার দেখা করিয়াই যাইবে। এই ভাবিয়া কড়া নাড়িতে লাগিল। বৃদ্ধা ঝি বাসন মাজিতে মাজিতে উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। নন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার দিদিমণি কি করছেন?" ঝি বলিল—"একজন বাবু এসেছেন, তোমার সঙ্গে যা' করেন, তাঁর সঙ্গেও তাই করছেন।"

নন্দ, বাবুর নাম জিজ্ঞাসা করায় বুড়ী বলিল—"ঐ যে নরেনবাবু।" নরেনের নাম শুনিয়া নন্দ স্তম্ভিত হইল। ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—"কতদিন থেকে নরেনবাবু এখানে আসছেন?" ঝি বলিল—"তুমিও যতদিন ধরে আসছো, ও বাবুও ততদিন থেকে আসছেন। তুমি বিকালে আসো, আর উনি সন্ধ্যের পর আসেন।"

নন্দ দুঃখে ও রাগে ফুলিতে লাগিল। ভাবিল—উপরে গিয়া রেবার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করে ও নরেনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিল—পরের বাড়ীতে একটা কাণ্ড হইয়া গেলে পরে অত্যন্ত বদনাম হইবে। তখন সে রাগে ফুলিতে ফুলিতে রাস্তার মোড়ে নরেনের নিষ্ক্রমণের অপেক্ষায় পায়চারি করিতে লাগিল।

ছয়

নন্দ যখন পথে পদচারণা করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিল, তখন নরেনকে রেবার বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিল। একটু অন্ধকারে দাঁড়াইয়া নরেনের দিকে সে চাহিয়া রহিল। এই বন্ধুদ্বয়ের মিলন দুই ইঞ্জিনের 'কলিসনে'র মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। নরেন নিকটে আসিয়া নন্দকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি নন্দ, কোথায় যাচ্ছ?"

নন্দ—"আমি যেথানেই যাই, তুমি রেবার বাসায় কি করতে গিয়েছিলে? ছিঃ, তোমার ওপর অশ্রদ্ধা হ'য়ে গেল।"

নরেন—"এই যে চাঁদার টাকাটা দিয়েছি, সেটার কি হ'ল খোঁজ কর্‌তে গিয়েছিলাম।

নন্দ—"তা', দু'মাস ধরে' ঐ এক টাকার খোঁজ হচ্ছিল? তুমি ভয়ানক মিথ্যাবাদী আর নীচ।"

নরেন—"বেশ করেছি, যদি রেবার বাড়ী দু'মাস পরে' গিয়ে থাকি, তোমার কি ক্ষতি করেছি?"

নন্দ—"ওরে গাধা, আমি যে দু'মাস ধরে ওর সঙ্গে কোর্টসিপ্ কচ্ছি।"

নরেন—"তবে নীচ তুমিও। তুমি যখন কোর্টসিপ কর্‌তে গিয়েছিলে, সে কথা কি আমাকে বলেছিলে? আর মেয়েটা কি দাগাবাজ! সেও ত কিছু বলে নি।"

ক্রমেই বাদানুবাদ উচ্চৈঃস্বরে হইতে লাগিল। একজন পাহারাওয়ালা আসিয়া বলিল—"এ বাবু, তোমলোক ভদ্দর আদমী, সড়ক্‌পর কাঁহে তকরার্ করতা হায়, পাঁচ আইনমে চালান দেঙ্গে।" পাড়ার দুই-চারিজন লোকও বন্ধুদ্বয়ের বিবাদে তামাসা উপভোগ করিতেছিল। পাহারাওয়ালার আবির্ভাবে তাহারা ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল।

কারণ, সেখানে বন্ধুদ্বয়ের পুনরায় মিলন হইলে আইন-ভঙ্গ হইয়া যাইতে পারে। অনেক ভাবিয়া নরেন স্থির করিল—বাল্যবন্ধুর সহিত বিবাদের একটা আপোষ মীমাংসা করাই ভাল।

নন্দও তাসের আড্ডায় নরেনের অভাব বোধ করিতেছিল। হঠাৎ নরেন আজ আড্ডায় হাজির হওয়াতে নন্দ আশ্চর্য্য হইল! অন্যান্য আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিল—এতদিন নরেন অনুপস্থিত ছিল কেন? নন্দর ভয় হইল, হাটের মাঝে বুঝি নরেন হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি নরেন বলিল—"শরীর ভাল ছিল না।" এই বলিয়া নন্দকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—সে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে যে, একটা স্ত্রীলোকের জন্য বাল্যবন্ধুর সহিত মনোমালিন্য রাখা উচিত নয়; অথচ, রেবার মত রত্ন দুই বন্ধুর ভিতর একজনেরই লাভ হওয়া উচিত। দুই মাস পরিশ্রমের ফলে তাহাদের দুইজনেরই আইনের পড়া অনেক পড়িয়া গিয়াছে। কয়দিন ভাবিয়া সে এই জটিল ব্যাপারের এক সহজ সমাধানের পন্থা ঠিক করিয়াছে; অর্থাৎ, দুইবন্ধু একসঙ্গে গিয়া রেবাকে জিজ্ঞাসা করিবে—তিনি কাহাকে সত্যই ভালবাসেন। কারণ, এ ব্যাপারে বন্ধুদের অপেক্ষা রেবারই দোষ বেশী। যাহাকে বেশী ভাল কি সত্যই ভালবাসেন, তিনি তাহাকেই বাসায় প্রবেশাধিকার দিলে সকল দিক্ দিয়াই মঙ্গল হইবে, আর বন্ধুদ্বয়ের মনেও আক্ষেপের কোন কারণ থাকিবে না। নরেনের এই সমাধান নন্দের যুক্তিসঙ্গত মনে হইল। স্থির হইল যে, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা দুই বন্ধু এই মোকদ্দমার মীমাংসার জন্য রেবার বাড়ী যাইবে এবং তাহার চিত্ত-সাগর মন্থন করিয়া দেখিবে, কাহার ভাগ্যে গরল এবং কাহার ভাগ্যে সুধা উঠে।

সাত

আট-দশদিন তাসের আড্ডায় না যাইয়া নরেনের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ের ভিতর কোন বন্ধুই রেবার বাসায় যাইতে সাহস করে নাই;

আট

গোধূলি-লগ্নে দুই বন্ধু রেবার বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। পথে যাইতে যাইতে স্থির হইল যে, নন্দ যখন রেবার বাড়ী আগে গিয়াছে, তখন সে তাহার বক্তৃতা

আগেই করিবে। সে সময় নরেন কথা কহিতে পারিবে না। সেইরূপ নরেন যখন তাহার প্রার্থনা জানাইবে, তখন নন্দও বোবার মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। শেষে রেবা রায় প্রদান করিবেন। এই কার্য্য-তালিকা স্থির করিতে করিতে দুইজনে রেবার বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। কড়া নাড়িবার পর বুড়ী ঝি আসিয়া দরজা খুলিয়া বন্ধুদের দেখিয়া নাসিকা ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল—"ও মা, এতদিন পরে তোমরা কোত্থেকে!" নন্দ—"কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই আস্‌তে পারি নি। দিদিমণি কি করছেন?" ঝি—"ও মা, তাও বুঝি জান না? দিদিমণি ত পরশু শ্বশুর-বাড়ী গেছে।" নরেন—"সে কি! তোমার দিদিমণি ত বল্‌তেন তিনি কুমারী।" ঝি—"হাঁ, হাঁ, বিয়ের আগে সব মেয়েই ত কুমারী থাকে।"

নরেন—"তোমার দিদিমণির আবার বিয়ে কবে হ'ল?"

ঝি—"ও মা, কি হবে গা! এই আজ চারদিন হ'ল। তোমাদের বুঝি পত্তর দেয় নি?"

দুই বন্ধু একেবারে অবাক্! নরেন জিজ্ঞাসা করিল—"কার সঙ্গে বিয়েটা হ'ল?"

ঝি—"ঐ যে বাবুটী দিদিমণিকে পড়াতেন, আর এখানে থাকৃতেন—তাঁর সঙ্গে।"

নরেন—"দেখ নন্দ, আমাদের দু'মাসের পরিশ্রম কি রকম বৃথা হ'ল!"

বুড়ী ঝি দন্তবিহীন মুখমণ্ডল বিস্তারিত করিয়া হাসিয়া বলিল—"ও, তোমরা দু'মাস খোসামোদ করেই মেয়ের মন পাবে ঠিক করেছিলে—আর ওই মাষ্টারবাবু দু'বছর মাইনে না নিয়ে পড়িয়েছে আর খোসামোদ করেছে। তাঁর ত বক্‌শিস্ চাই।"

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে বুড়ী দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পথে আসিতে আসিতে নন্দ বলিল—"তা', আমাদের চাঁদার টাকার গতি কি হ'ল, সেটা না হয় একবার 'অনাথ-সভা'র অফিসে গিয়ে খোঁজ করা যাক্।"

নরেন রাজী হইল না। বলিল—"থাক্, আর দরকার নেই। ওই চাঁদা দিয়েই ত আমাদের এত লাঞ্ছনা।

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

এম্‌নিই হয়

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

খাসা এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গরম কেটে গেছে। আষাঢ়ের সকাল। না শীত, না গ্রীষ্ম—বেশ উপভোগের। সরোজ বসেছিল—তার ঘরের সামনে ছাদের উপর। নীচেই নিকটে একটা ফুলের বাগান। স্নিগ্ধ সজল হাওয়া তারই গন্ধ বহন করে' সরোজকে মাতাল করে' তুলেছিল। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আধশোওয়াভাবে সে আপনার মনে হাস্‌ছিল।

মল্লিকা এসে ডাকল—"বলি চা টা খাবে কি?"

চেয়ার থেকে না উঠেই ঘাড় ফিরিয়ে সরোজ বল্‌ল—"নিশ্চয়—নিশ্চয়!"

—"তবে ওঠ" বলে' এগিয়ে এসে মল্লিকা স্বামীর মুখের পানে চেয়ে বল্‌ল—"ও কি! তুমি আজ আপন-মনে অত হাস্‌চ কেন?"

—"হাস্‌ছি।" বলেই কথাটা সরোজ ঘুরিয়ে নিল—"তুমি রয়েছ সাম্‌নে। আমি কি আর না হেসে পারি?"

মল্লিকা একটু বিরক্তির ভান করে' বল্‌ল—"কেন, আমি কি সঙ—তাই আমাকে দেখে অত হাস্‌ছ?"

—"আহা! ঠোঁট ফুলোও কেন? তোমাকে যদি সঙ বলি, আমি কি হই?"

সরোজের কথায় মল্লিকা বেশ খুসিই হ'ল। মনে মনে হার স্বীকারও করে' নিল। হাসি চেপে বল্‌ল—"সত্যি বল না, কেন হাস্‌ছ?"

মুখের হাসিকে চোখে বদ্‌লি করে' সরোজ বল্‌ল—"নেহাতই শুন্‌তে হবে? আচ্ছা শোন—চামেলীকে নেমন্তন্ন কর্‌তে হবে।"

—"তা'তে আর হাসির কি আছে?" তারপর মল্লিকা একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল—"আহা! তাকে আর কেন?"

বাধা দিয়ে সরোজ বল্‌ল—"সেও হাস্‌বে।"

দুঃখের সুরেই মল্লিকা উত্তর দিল—"তার হাসি যে আট্‌কে গেছে।"

—"খুলে যাবে—খুলে যাবে!"

মল্লিকা বল্‌ল—"হাস্‌লেও সেটা প্রাণের হাসি হবে না।'

সরোজ বল্‌ল—"তা' না হোক্, তবু সেটা হাসি। তাকে নেমন্তন্ন করে' পাঠাও, সেও হাস্‌বে—হ্যাঁ, তাকেও হাস্‌তে হবে। না হেসে কি শেষকালে মারা যাবে?"

দুই

চামেলী আর মল্লিকা মায়ের পেটের দুই বোন্।—পিঠোপিঠি, কাজেই ভাবটা ঠিক সমবয়সী সখীর মত। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস রোধ কর্‌বে কি করে'? দুই জনেরই ভাল ঘরে ভাল বরে' বিয়ে হ'লেও ফল এক হ'ল না। মল্লিকা স্বামী-সৌভাগ্যবতী হ'ল। সামান্য একটু কারণে চামেলীর স্বামী তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ কর্‌ল।

চামেলীর স্বামী রমণীমোহন লোক মন্দ নয়। তবে কবি মানুষ—কিছু খেয়ালী। একটুতেই তার মন মুস্‌ড়ে পড়ে' বুক ভেঙে যায়। সহিষ্ণুতা বলে' কিছু তার ছিল না। তুচ্ছ কারণেই শ্বশুর-নন্দিনীর সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ীর সহিত সে অসহযোগ করে' বস্‌ল।

প্রায় বছর তিনেক আগে—তখন চামেলীর বয়স বারো কি তেরো, তার ভাই তাকে নিতে এসেছিল বাপের বাড়ী থেকে।

রমণী বালিকা চামেলীকে প্রশ্ন কর্‌ল—"আমাকে ফেলে চলে' যেতে তোমার মন কেমন কর্‌বে না।"

রমণী যা' শুনবে আশা করেছিল—সাধারণ নায়িকারা এ সব সময়ে যা' বলে' থাকে—চামেলী তার কিছুই বল্‌ল না। সে শুধু বল্‌ল—"না, একবার ঘুরে আসি।"

রমণী তবু আশায় বুক বেঁধে আবার প্রশ্ন করলে—"আমায় ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে না?"

এবার আশার ফল ফলল বটে, কিন্তু মন ভরল না। চামেলী বলল—"হ্যাঁ, মন একটু খারাপ হবে। কিন্তু দাদা যখন নিতে এসেছেন—তুমি আর অমত করো না। অনেকদিন বাপের বাড়ী যাই নি।"

রমণীর কবি-কোমল হৃদয় ব্যথিত হ'য়ে উঠল। তার জন্যে মন খারাপ—শুধু ভদ্রতা হিসাবে—কিন্তু আন্তরিক টান তার বাপের বাড়ীর উপর। সে একবার ভেবে দেখল না—সেইটেই যে স্বাভাবিক। যেখানে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান গেছে, যেখানে অনাবিল স্নেহ প্রথম জীবন হ'তে আজ পর্য্যন্ত সমানে পেয়ে আসছে, সেখানকার প্রতি যদি আন্তরিক টান না হয়, সেটা ত অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ।

কথা সেদিন এই পর্য্যন্ত হয়েছিল। তারপর যাওয়ার আগে কিশোরী চামেলী স্বামীকে প্রণাম করে' আর একবার বিদায় চাইল। এবারে রমণীর অভিমানে ব্যথিত চিত্ত আর বাধা দিল না। এই ঘটনায় যে কালো মেঘের সৃষ্টি হ'ল, আর একদিনের এই রকম আর একটি ছোট ঘটনায় তার থেকে বর্ষণ দেখা গেল। ফলে রমণীদের বাড়ী থেকে বেচারী চামেলী ভেসে চলে' যেতে বাধ্য হ'ল—বাপের বাড়ীতে।

তখনও পূর্ব্বের ঘটনার মাস কেটে যায় নি। রমণী চামেলীকে নিতে এসেছে। ছোট একটি মেয়ে, মাত্র কয়দিন বাপের বাড়ী এসেছে, এরই ভিতরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওযার তাড়া সকলের ভাল ঠেকল না। চামেলীর বাবা বলে' ফেললেন—"বাবা, তোমার বাবার কি দু'দিনও সবুর সইল না? মাত্র আজ ক'দিন এসেছে—এরই ভিতরে নিতে পাঠালেন?"

রমণী শ্বশুরের কথার কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু সে মনে মনে চটল। ব্যাপারটা হচ্ছে—তার বাবার হয় তো সবুর সইত, কিন্তু সবুর যে তারই সয় না।

এর উপর আবার রাতে চামেলী নিজেও আরো কিছুদিন তাকে বাপের বাড়ী রাখবার জন্য রমণীর নিকট জিদ্ ধরল। রমণী প্রশ্ন করল—"কই, তোমার দিদি তো বাপের বাড়ী থাকে না?"

অজ্ঞাতসারেই চামেলীর মুখ থেকে বার হ'ল—"আগে দিদির মত হই, আমিও বাপের বাড়ী থাকবো না।"

রমণী আর কিছুই বলল না। অভিমান-ভরে সে চলে' গেল। চামেলী ভাবল—দেখা হ'লে সাধলেই রাগ পড়ে' যাবে।

তিন

কিন্তু সেই দেখাটা আর হ'ল না। রমণীর বাবা আর চামেলীর বাবার মধ্যে একটু মনের অমিল পূর্ব্ব হ'তেই ছিল, এইবার সেটা রমণী ও চামেলীর ভিতরে প্রকাশ পেল। কাজেই ব্যাপারটা সরু মোটা দুটো তারে জড়িয়েই গেল।

এদিকে চামেলী তার দিদির মত বয়সও পেল, দিদির মত মনোভাবও তার গড়ে' উঠল; অথচ, তাকে বাপের বাড়ীই থাকতে হ'ল এবং সে তার জন্যে দিন দিন ব্যথিতও হ'য়ে উঠল।

সমবয়সী সখীদের ভিতরে দু'-একজন তাকে রমণীকে চিঠি লিখতে বলল। কিন্তু তা' সে পেরে উঠল না। খোসামোদ করে' নিজের স্থান সংগ্রহ করে' নেওয়া, আর যেচে অপমান স্বীকার করা, দুই-ই এক কথা। ছি ছি! তাও কি কখনো হয়? না—যে স্বামী তার মনের কথা না বুঝে মুখের বলাটাকেই বড় করে' নিলেন, তাঁর কাছে সে নত হ'তে পারে না।

রমণীর মা ছেলের পুনরায় বিয়ে দিতে চান। রমণী অবশ্য সে বিষয়ে কোন কথাই বলে না। তার মন আর নতুন বিয়ে করতে চায় না। বিয়ের কথা উঠলেই তার চামেলীর সেই ছোট্ট কচি সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে। ব্যথায় বুকটা টনটন্ করে' ওঠে। ছি ছি, সে করেছে কি! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছে! সে বাপ মার কাছে লজ্জার মাথা খেয়ে চামেলীকে নিয়ে আসার প্রস্তাব করতে পারে না, আবার বিয়েতেও অমত করে না। ভরসা—যদি তার বিয়ের কথা শুনে তার শ্বশুর চামেলীকে তাদের

বাড়ী রেখে যান। বিয়ের আলোচনায় তার ভরসা ছিল —কিন্তু তার বাপ বিয়ের কথায় রাজী হন্ না। তাঁর অবশ্য অন্য উদ্দেশ্য ছিল। এই জীবিকা-সমস্যার দিনে একজনের দুই বিয়ে কিছুতেই করা উচিত নয়। চিরদিন কখন কলহ থাকে না। তার ফলে দুই বৌয়ের ছেলেপুলে হ'তে আরম্ভ কর্‌লেই চক্ষুস্থির! তাদের মানুষ করে' তুল্‌তে আর বিয়ে দিতেই সর্ব্বস্বান্ত। যদি স্বীকার করেও নেওয়া যায়—বিবাদ চিরদিনের মতই রয়ে যাবে—তা' হলেও মাসোহারা টান্‌তে হবে। মাস-মাস মাসোহারা টানাটাও সহজ বা প্রীতিপ্রদ নয়। তার চেয়ে কিছুদিনের পর চামেলীর বাপ আপনিই দাঁতে কুটো করে' মেয়ে রেখে যাওয়ার পথ পাবেন না। তিনি সেই ভরসাতেই আছেন।

চার

চামেলী আর মল্লিকা গল্প কর্‌ছিল। অনেকদিন পরে দুই বোনের দেখা। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অনেক কিছুই গল্পে চল্‌ছিল। এমন সময় সরোজ সেখানে প্রবেশ কর্‌ল কণ্ঠে সুরের লহর তুলে—

"সন্ধ্যাবেলার চামেলী আর সকাল বেলার মল্লিকা,
আমায় চেন কি ?"

চামেলী পাদপূরণ করে' দিল—

"আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।"

সরোজ হেসে বল্‌ল—"এ কিন্তু 'পথভোলা পথিক' নয়। মাঝে মাঝে মল্লিকা-কুঞ্জে এর দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু—"

ভ্রূকুটি করে' মল্লিকা বল্‌ল—"থামো! কি যে বলো মাথামুণ্ডু কিছুরই যদি ঠিক থাকে।"

চামেলী জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"হাতে ওটা কি দাদাবাবু ?"

গম্ভীর-কণ্ঠে সরোজ বল্‌ল—"এটা একটা পর্‌দা।"

দুষ্টামির হাসি হাসিয়া মল্লিকা বল্‌ল—"তা'তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি। ওতে কি হবে ?"

—"হবে গো, হবে—অনেক কিছু হবে।" বলে' সরোজ হাস্‌তে লাগ্‌ল। বিরক্তি-পরিপূর্ণ-স্বরে চামেলী বল্‌ল—"দাদাবাবুর বয়স হচ্ছে, তবু এই বুড়োবয়সে এত ঢঙ্-ও আসে ?"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সরোজ বল্‌ল—"বুড়ো আমি হ'তে যাব কেন ? বুড়ো হোক্ তোমার সেই বেরসিক, অবলা অত্যাচারী—বিভ্রমবিলাসী রমণীমোহন। যার কুঞ্জে কোনদিন কোনও বসন্তের কাকের সাড়া—কোনও শ্রাবণের জোয়ার ধারা আসে নি।"

মল্লিকা একটা তীব্র কটাক্ষ কর্‌ল। যেন সে মহাদেবের কটাক্ষে কামদেবের মত সরোজকে ভস্ম কর্‌তে চায়। সরোজ তা' গ্রাহ্যও কর্‌ল না, মুখ টিপে-টিপে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

চামেলী আবার বল্‌ল—"বলুনই না, পর্দ্দার কি হবে ?"

সরোজ উত্তর দিল—"তোমরা মেয়েমানুষের জাতটা কি রাশ পাতলা বলো তো ? একটা কথা শুন্‌তে ইচ্ছা হয়েছে, আর একটুও তর সইছে না—ওটা এই দরজাটাতে দিতে হবে।"

একটা ইঙ্গিতের, হাসির আড়াল দিয়ে মল্লিকা বল্‌ল—"এতদিন পরে আবার ও খেয়াল হ'ল কেন ?"

—"শোন, কাল আমার জনকতক বন্ধু এখানে খাবেন, তাঁরা এলে গ্রামোফোনে গান দিতে হবে। পর্দ্দানশীন চামেলী বিবি পর্দ্দার অন্তরালে বসে' গান কর্‌বেন, আর আমি স-বন্ধু এই বারান্দায় বসে' সেই গানের রস উপভোগ কর্‌বো।"

—"ওঃ! এই জন্যে সাত তাড়াতাড়ি আনা হ'ল।" বলে' মল্লিকা হঠাৎ উঠে গেল।

সরোজ কাগজ কলম নিয়ে নিমন্ত্রিতের ফর্দ্দ কর্‌তে বসে' গেল। ফর্দ্দে রমণীর নামও বাদ পড়্‌ল না। এবং তাকে বিশেষ করে লিখল—"যদিও তুমি আমাদের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেছ, তবু লিখ্‌ছি—কাল সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ অনুগ্রহ করে' এখানে কবিতা 'রিসাইট্' কর্‌বেন—তোমার আসা চাই-ই।"

পাঁচ

সঙ্গীহীন জীবন আর রমণী বইতে পারচে না। সে ক্রমেই শ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌ছিল। কি যে তার হারিয়েছে—কি যে তার নেই—সে তো তা' জানে—তবু তাকে ফিরিয়ে

নিতে পারছিল না। বাধা দিচ্ছিল তা'তে সঙ্কোচ, অদম্য লজ্জা আর পুরুষত্বের অভিমান।

কিছুই তার ভাল লাগে না। আল্‌মারি থেকে বাঁধান খাতাখানা টেনে নিয়ে নিজেরই লেখা কবিতার দু'টি লাইন পড়্‌ল—

"এমনি মধুর রাতে সুখ-স্মৃতি যায় যায়,
বঁধু মোরে বলেছিল—কাল যাব কালনায়।"—

কিন্তু আর ভাল লাগ্‌ল না। দু'লাইন পড়েই খাতাখানা টান দিয়ে টেবিলের উপর ফেলে দিল। তারপর আপনার মনকে শুনিয়েই যেন অস্পষ্টস্বরে বলে' উঠ্‌ল—"না, আর পারা যায় না!"

তার মনও যেন বলে' উঠল—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? সরোজের কাছে যাও। তার হাত-পা ধরে' বলো গে—আর যে পারছি নে দাদা! তুমিই এর একটা বিহিত করো।

এমন সময় পিয়ন এসে বল্‌ল—"বাবু চিঠি?"

চিঠি পড়েই রমণীর বুকখানা আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। ঘড়ি দেখ্‌ল—পঁচিশ মিনিট্‌ পরেই একখানা ট্রেণ আছে। জামা গায়ে দিয়েই সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সেই সময় একখানা ট্যাক্‌সি মোড় ফিরছিল। সে তা'তে চেপে বসে' বল্‌ল—"চালাও—হাওড়া ষ্টেশন।"

সরোজের বাড়ী বালি। রবীন্দ্রনাথ যে কেমন করে' হঠাৎ বালিতে কবিতা আবৃত্তি করতে সম্মত হ'লেন, তা' ভেবে দেখ্‌বার অবসর তার ছিল না। টিকিট কেটে ট্রেণে চেপে বসে' সে মনে মনে তরজমা করতে সুরু করে' দিল—সে কি করে কথাটা সরোজের কাছে পাড়্‌বে।

ছয়

আকাশে মেঘে ভরা।

সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। আসর জম্‌জমাট। বন্ধুরা প্রায় সবাই এসেছেন। বাইরে খোস্‌-গল্প চল্‌ছে।

পর্দ্দার ভিতরে চামেলী গ্রামোফোনের তোড়্‌জোড়্‌ সব ঠিক করছিল।

বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে। চামেলী গ্রামোফোনে দম দিচ্ছিল। সেই শব্দে রমণী সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ল। তবে কি রবীন্দ্রনাথ কলে আবৃত্তি করবেন? তাই এই যবনিকা? এ ষড়যন্ত্র! সে আর থাকতে পারল না, সরোজকে প্রশ্ন করল—"আচ্ছা, ও-ঘরে যদি ঠাকুর-ম'শায় আছেন—তবে পর্দ্দা টাঙানো কেন?"

সরোজের হাসি ঠেকানোই অসম্ভব হ'য়ে উঠল। তবু সে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে' বল্‌ল—"লোকের সাম্‌নে তিনি আজকাল আবৃত্তি করেন না। তার উপরে সব চেয়ে বড় কথা—তিনি পত্নী-ত্যাগীকে দেখা দেন না।"

রমণী সরোজের কথা বিশ্বাস করতে পারল না। সে পর্দ্দা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল। ঠিক্‌ সেই সময় চামেলী রেকর্ডে পিন দিল। ঠাকুর কবির অনবদ্য কণ্ঠের আবৃত্তি শোনা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আষাঢ়ের আকাশের বাঁধ ভেঙ্গে জলের বান ভেসে এল—

"বহুদিন হ'ল কোন্‌ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়।
এলে তুমি ঘন বরষায়।"

এই অপ্রত্যাশিত মিলনের জন্য তারা কেউ প্রস্তুত ছিল না। ঘন বরষার আসা তাদের চিরন্তনী ভরসাকে সত্য করে' তুল্‌ল। তারা ভুলে গিয়েছিল, বাইরের অনেকগুলি লোক তাদের এই মিলন উপভোগ করছে।

আবৃত্তি থেমে গেছে। পিন তার অধিকারের বাইরে পড়ে' ঘ্যার্‌ঘ্যার্‌ করছিল। বাইরে থেকে ডেকে সরোজ বলে' উঠ্‌ল—"আবৃত্তি কিন্তু অনেকক্ষণ থেমে গেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরে ঢুকে সুর করে' বলে' উঠ্‌ল—

"সন্ধ্যাবেলার চামেলী গো, সকালবেলার চামেলী.
তোমার হ'ল কি?"

লাজ-সঙ্কুচিত কণ্ঠে রমণী বল্‌ল—

"আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।"

বাইরে হাসির হল্লা এবং পাশের ঘরে চাপা হাসির গুঞ্জন শোনা গেল।

বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

———

অনুভূতি

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

বীণা আমার উপর রাগ করিয়াছে…আর আমার উপর রাগ করিয়াই আমার জন্য বালিশের ঝাল্‌র দেওয়া ওয়াড় তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ওর রাগ দেখিয়া আমি মজা পাই, আমার হাসি লাগে।…

ও যখনই আমার উপর অভিমান করে, আমার যাহা প্রিয় সেই কাজগুলিই করিতে চায়।

একদিন যেমন—

কতদিন ধরিয়া বলিয়াছিলাম—আমার পড়ার ঘরটা গুছাইয়া দিতে।…গুছাইয়া রাখিতে আমি কোনদিন পারি না।…এলোমেলো, ওলট্‌-পালট্‌ হইয়া পড়িয়া থাকে, অথচ দরকারের সময় তচনচ করিয়া সমস্ত ঘর খুঁড়িয়া ফেলিবার জোগাড় করি; তবুও কাজের জিনিষ খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু সে স্বভাব আমার কোনদিনও শোধরাইল না।

যাই হোক্‌, আমার কথার উত্তরে ও সবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছিল, আমার দ্বারা হবে না। মাগো, এত নোংরা মানুষ থাকতে পারে! তোমার ও 'ডাষ্টবিন্‌' আমি ঘাঁটতে পারবো না।

ওর আলগা বাঁধা মাথার চুলগুলো ঘাঁটিয়া আলুথালু করিয়া দিয়া বলিয়াছিলাম, তুমি তো আমার ঘরের রাণী—আমার 'ডাষ্ট্‌বিন্‌'-টাই না হয় একদিন সাফ্‌সুফ্‌ ক'রে তোমার খাস্‌কামরা বানিয়ে দিয়ে এলে। বীণা উত্তর দিয়াছিল, আমার দায় প'ড়েছে। আজ গুছিয়ে দিই, আর কাল তুমি সব জঞ্জাল ক'রে এসো। দরকার কি বাপু আমার বাজে পরিশ্রম ক'রে।

অথচ ওর ঘরটায় দেখো—

সাজানো-গোছানো। চমৎকার ধবধবে পরিচ্ছন্ন বিছানাটী। ঘরের মেঝে, দেয়াল, ছাতের সিলিঙে পর্য্যন্ত একটু ধূলো ঝুল নাই। ড্রেসিং টেব্‌লে চুলের দড়ি থেকে চিরুণী, স্নো, পমেড, হেয়ার অয়েল, পাউডার, সেন্ট্‌ দিব্যি সাজানো। দেয়ালে ছবি, বারান্দায় ফুলের টব—সব তক্‌তকে পরিষ্কার।

আলমারীর বই, রাইটিং টেব্‌লের প্যাড্‌, কালী, লেটার পেপার, এনভেলাপ্‌ কোনটাই ওলট্‌ পালট্‌ নাই।

সত্য কথা বলিতে কি, দেখিলেই চোখ জুড়াইয়া যায়।

আমাকে তো কিছুতেই হাত দিতে দেয় না। যা' দরকার—চাহিয়া লইতে হয়।…

যাই হোক্‌, সেদিন বিকালবেলায় বেড়াইয়া আসিয়া আমার ঘর খুলিয়া দেখি, রাগের চোটে বীণা আমার ঘর পরিষ্কার করিয়া দিব্য সাজাইয়া গিয়াছে—এমনিই সুন্দর করিয়া যে, আমার মনে হইয়া গেল একটা কবিতা লিখিয়া ফেলি; কিম্বা বসিয়া বসিয়া গান গাহি—যদিও দুইটার কোনটাতেই আমার আদপেই দখল নাই।

বীণার আজিকার রাগের কারণ আমি ওর সঙ্গে সারাদিন মিশি নাই। দুপুরে আমার এক বন্ধু আসিয়াছিল, তাহাকে লইয়া মাতিয়াছিলাম। তারপর দু'জনে সিনেমায় গিয়া তাহাকে 'গুড্‌নাইট' করিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টার পরে বাড়ী ফিরিয়া দেখি প্রিয়া আমার ঠোঁট ফুলাইয়া বসিয়া আছেন।

খেয়াল হইয়া গেল—রাগের কথাই বটে। সারাদিন তো দূরের কথা, রোজ বিকালে ওর সাথে যে বেড়াইতে যাই, তাও আজ হয় নাই।

কৈফিয়ৎ কাটাইতে বলিলাম, অনেকদিনের দেখা—তারপর ওই-ই জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল—তাই আর এড়াতে পারলুম না। তারপর একটু হাসিয়া বলিলাম, আর তোমার সঙ্গে তো সমস্ত রাতটাই প'ড়ে আছে।

একটা ঠোঁটও নড়িল না, উপরন্তু ওর মাথাটী আরও

মনোযোগের সহিত নীচু হইয়া গেল বালিশের ওয়াড়ের ওপর—যেখানে ছুটো লতা বুনিয়া তাহারই ভিতর আমার নামের প্রথমার্দ্ধ ও বসাইতেছিল—মণি। বলিলাম, এত যত্ন ক'রে নামটা বসাচ্ছ, ট্রেণে কি কোথাও যদি ওই বালিশ নিয়ে আমি ঘুমোই—যারা আমায় চেনে না তারা ভাব্‌বে মণি বুঝি আমারই প্রিয়তমার নাম।

তবুও কোন উত্তর না পাইয়া অবশেষে মনে মনে হাসিয়া ওর ড্রেসিং টেব্‌লের কাছে গিয়া চিরুণীটা হাতে তুলিয়া লইয়াছি, ও ধড়মড় করিয়া আসিয়া আমাকে সরাইয়া দিয়া বলিল, ব'লেছি কোনদিন ওসবে হাত দিও না, তবু দেবে।

আমি একেবারে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। তারপর বলিলাম, ও তুমি আছো—আমি এত কথা ব'লছিলাম, কিন্তু কেউ উত্তর দেয় না দেখে ভাবছিলাম—ঘরে বুঝি লোক নেই।

ইহার উত্তরে শুনিলাম, ঠাকুর খেতে দাও।

বুঝিলাম আজিকার মানের পালা সহজে তো যাইবেই না, আর রাত্রিটাও সম্ভবতঃ চুপ্‌চাপ ঘুমাইয়া কাটিবে।

মনে মনে বন্ধুবরের উপরও রাগ হইয়া গেল। কেনই বা সে আমায় সিনেমায় টানিয়া লইয়া গেল।

ঠাকুর রোজকার মত দু'জনের খাবার একসঙ্গেই দিয়াছিল। আজ কিন্তু একজন কেবল পাশে থাকিয়া আমার খাওয়ার তদারকে রহিল, আর আমি চুপচাপ খাইয়া চলিলাম।...

একই বিছানায় দু'জনে শুইয়া—অথচ অভিমানিনী প্রিয়া আমার মাঝখানে একটা মস্ত পাশ বালিশ দিয়া আমাদের দু'জনার সংস্পর্শের অবরোধ গড়িয়া দিয়াছে, যেটা অন্য অন্যদিন অনাবশ্যক বোধে ও নিজেই দূরে সরাইয়া দেয়। মান-ভঞ্জনের পালা আমারই। বলিয়া চলিলাম, আমি জানি আমার বীণ্‌ আমায় সারাদিন না পেয়ে কত দুঃখ পেয়েচে। কিন্তু ভাই, আমি কি ইচ্ছে ক'রে তোমায় কষ্ট দিই! ঘটনা-চক্রে হ'য়ে যায়। এই দেখো, তুমিও তো মাঝে মাঝে এক-একদিন তোমার বন্ধুদের নিয়ে গল্প-গুজব কর, তাদের বাড়ী বেড়াতে যাও—

কোন উত্তর পাইলাম না। ও দেয়ালের ধারে কাত হইয়া শুইয়া রহিল।...

বলিলাম, যাক্‌ গে—কাল দু'জনে 'রূপবাণী'তে যাওয়া যাবে। নতুন ফিল্‌মটা দেখে আসা যাক্‌—কি বল?

তারপর ওর দিকে ফিরিয়া ওর গায়ে হাত দিলাম—ইচ্ছা, ওকে আমার দিকে টানিয়া ফিরাইব।

শুনিয়াছি, গোখ্‌রো কি কেউটে সাপের লেজে পা দিলে তাহারা সবেগে মাথা চাড়া দিয়া ফুলিয়া উঠে। দেখি নাই, কিন্তু দেখিলাম। (তাদেরই মত বোধ হয়) লাফাইয়া উঠিয়া বিছানায় বসিয়া বীণা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার মতলবখানা কি, আমায় ঘুমুতে দেবে না?

বলিলাম, কোনদিনই তো এত সকাল সকাল ঘুমোও না। বলিল, না চৌপোর রাত কেবল তোমার সঙ্গে মাতামাতি করি। হাসিয়া বলিলাম, সেটা তো আর আইন-বিরুদ্ধ নয়, আর তোমার আমার বয়েসের কারোর অবাঞ্ছনীয়ও নয়।

বলিল, তোমার সঙ্গে আমার বাজে বকবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি দুই-ই নেই। দোহাই তোমার, আমায় আর বিরক্ত করো না।...তারপর পুনরায় সেইভাবেই শুইয়া পড়িল, যেভাবে শুইয়াছিল।

হাল ছাড়িয়া দিলাম। বুঝিলাম, সহজে আজ আর রাগ কাটিবে না। মনকে প্রবোধ দিলাম, আমাকেও রাগ করিতে হইবে; দরকার নাই খোসামোদ করিয়া।...

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম—আমার শয্যা-সঙ্গিনী নিত্যকার মতই আগে আগে বিছানা ছাড়িয়া গিয়াছে। উঠিয়া মুখ ধুইয়া খবরের কাগজ হাতে লইতেই চাকর চায়ের টেবিলে চা আনিয়া দিল, কিন্তু চা ঢালিবার নিত্যকার সাথীটি আসিল না। মধুই চা ঢালিতেছিল। বলিলাম, তোদের মা কোথায় মধু? মধু বলিল, ও ঘরে চা খাচ্ছেন, আর কার্পেটে পশম বুনছেন। ইচ্ছা হইল, চায়ের ট্রে-শুদ্ধ ছুঁড়িয়া দিয়া আমিও খুব রাগ করিয়া বসি। কিন্তু চা আমি কিছুতেই না খাইয়া থাকিতে পারি না ও

নষ্ট করিতে চাহি না।...কাজেই পেয়ালা টানিয়া লইয়া মধুকে বলিলাম, দেখ্, তোকে আট আনা বকশিস্ করব, তুই তোর মাকে ব'ল্ গে যা' বাবু রাগ ক'রে চা ফেলে দিয়েছেন, খান্ নি। আর এখানে খানিকটা লিকার ঢেলে দিস্।

মধু একগাল হাসিয়া বলিল, সে আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি বাবু।

তাহাকে আট আনা দিয়া কাগজ লইয়া পড়ার ঘরে চলিয়া গেলাম। কিন্তু যাওয়াই আমার বৃথা হইল—কেহ সাধিতেও আসিল না, বা আমার জন্য নতুন তৈরী চা লইয়াও আসিয়া পৌছিল না। পরে শুনিয়াছিলাম, বুদ্ধিমতী গৃহিণী আমার নিজে আরও আট আনা দিয়া মধুর নিকট হইতে আসল কথা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন।... লাভে হইতে মধুর লাভ হইল নগদ এক টাকা। একেই বলে, 'কারো সর্ব্বনাশ, আর কারো পৌষ মাস।'

বেলা দশটা—

উঠিলাম। অন্যদিন এতক্ষণ বোধ হয় প্রায় পঞ্চাশবার বীণা আমার কাছে আসিত, আমার পাশে আমার গায়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া একসঙ্গে আমার সহিত কাগজ পড়িত, গুন্‌গুন্ করিয়া গান গাহিত ...আমি ওর সঙ্গে পড়িতে পড়িতে, গল্প ও গান করিতে করিতে ওর পায়ের উপর আমার পা তুলিয়া দিতাম, খুনসুটী করিতাম, তারপর ওর গালে 'ফস্' করিয়া চুমু খাইয়া লইতাম।

ও আমার গায়ে হেলিয়া পড়িয়া আমার গায়ে চিমটী কাটিয়া দিত। আমি হয় ত প্রত্যুত্তরে ওর খোঁপাটা খুলিয়া দিয়া চুল এলাইয়া দিতাম। সমস্ত চুলের রাশি আমার মুখ চোখ ঢাকিয়া নামিয়া পড়িত।...

ওর কেশের সুরভি এখনো আমার নিঃশ্বাসে ভাসিতেছে।...

স্মরণ করিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্বদিনের মতই আমি গল্প-মাতাল হইয়া উঠিতেছি।

ওকে তেমনি করিয়াই সন্নিকটে পাইবার কামনা-বিধুর মনকে লইয়া আমি উঠিলাম। ঘরে গিয়া পৌছিলাম।

দেখি, ও বাথরুম হইতে আসিয়া ভিজা চুল আঁচড়াইতেছে। আমাকে একবার আড়ে দেখিয়া লইল, তারপর আমার দিকে পিছন ফিরিয়া যেন আপন খেয়ালেই মত্ত হইয়া গেল। আমি পিছন হইতে ওর চোখ দু'টি টিপিয়া ধরিলাম, কিন্তু আজ আর ও অন্যদিনকার মত দু'টি হাত দিয়া আমার গলাটা ধরিয়া নীচে ওর কাঁধের কাছে টানিয়া নামাইল না। হাতের চিরুণী হাতে রাখিয়াই বিরক্তির ভঙ্গীতে দেহ দুলাইয়া বলিল, আঃ, চুলটাও বাঁধতে দেবে না ছাই! বলিলাম, লক্ষ্মী রাণী, আমায় আর কষ্ট দিও না ভাই। এমন ধারা বোবা মেরে আর আমি থাকতে পারি না।

তারপর ওর চোখ ছাড়িয়া দিলাম। ও কোন উত্তর দিল না—আপন-মনেই নিজের কাজ করিতে লাগিল। আমার অসহ্য হইয়া উঠিল, এমন কি কান্নাও আসিতে লাগিল। এরকম দীর্ঘ মৌনতা আমাদের মধ্যে কোনদিনও থাকে নাই, এমন কি ওর কোন রাগেও নয়। ইচ্ছা হইল, মাপই না হয় চাইয়া বসি।

তবু যদি কথাতেই হয়—

বলিলাম, পরশুদিন কি লজ্জাটাই পেয়েছিলুম রাস্তায় বের হ'য়ে। যে দেখে সেই ঠাট্টা ক'রে ব'লছিল—

"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু, ওইখানে থাকো,
মুকুর তুলিয়া চাঁদ মুখখানি দেখো।"

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে দেখি, কপালে, গালে সিঁদুরের দাগ।

ও ব'ল্লে, তা' তোমাদের সময় অসময়ের আবেগের ঠেলায় তো আর বাঙালীর মেয়ে হ'য়ে আমাদের লক্ষণ, আচার বন্ধ ক'রতে পারি নে।...আর তা'তেও যদি আমাদের দোষ হয়, শাস্তি দাও—আমরা তো তোমাদের পায়ে পড়া দাসী ছাড়া আর কিছুই নই। আমাদের অপরাধ তো পদে পদে।...

বলিলাম, বীণু, তুমি যে আমায় এমন ক'রে আঘাত দেবে, আমি কখনও ভাবতে পারি নি। তুমি বলো, আমি কোনদিন তোমার সঙ্গে এরকম কোন ব্যবহার ক'রেছি।...

না ক'রে থাকো, কর।...আমরা তো তোমাদের দয়ার প্রত্যাশী জীব।

আমার মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ওর এ রকম কথা আমি কোনদিন শুনিতে পারি না।

বউ—ও আমার সাথী, জীবনের প্রীতি, আনন্দ, সুখ, দুখ্, প্রমোদের সমভাগিনী।...ওকে আমি কোনদিন হেলা-ফেলা করিতে চাহি না। ওদের বিষণ্ণ মুখ দেখিতে কিংবা নিজেকে ওদের কাছে মস্ত করিয়া রাখিয়া কোন ভয়ের পূজা আমি পাইতে চাহি না।

বলিলাম, ছি বীনু, তুমি এত নিষ্ঠুর; আমায় এমন ক'রে পরের মত বেদনা দিয়ে কাঁদাতে চাও। বেশ... তা'তে যদি তুমি সুখী হও, আমার আপত্তি নেই।

সত্যিই আমার অন্তর বড় ব্যথাতেই আজ খান্ খান্ হইয়া গেল। একটা দিন না হয় বন্ধুর সঙ্গে গল্প করিয়াই বেড়াইয়াছি, তার জন্য এত কঠিন...

আমি কোন কথা আর না কহিয়া চুপ করিয়া বিছানায় বসিলাম। তারপর শুইয়া রহিলাম নীরবেই।

বীণা ওর কাজগুলো একে একে সব শেষ করিয়া ফেলিল। তারপর আমার জামাটী ঝাড়িয়া দিল, কাপড়-গুলো কোঁচাইয়া আল্‌নায় ঠিক্ করিয়া রাখিল। কৌটা খুলিয়া সিগারেট বাহির করিয়া আমার কেসে ভরিয়া দিল। তারপর বাহির হইয়া গেল—বোধ হয় রান্নাঘরেই।

খানিক বাদে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে দাঁড়াইল। তারপর বিছানায় আমার কাছে আসিয়া কহিল, যাও, চান ক'রে এসো।

আমার অভিমান হইল। আমি তো চান করিব না, খাইব না···আমার কি রাগ দুঃখ নাই! উত্তর করিলাম না।

ও পুনরায় বলিল, ওঠো, শুন্‌চো!

বলিলাম, খাবো না।

খাবে না।

না।

কেন?

ইচ্ছে নেই।

রাগ ক'রেছো।

রাগ আমি কার ওপর ক'রতে যাবো।

আমার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। ও বলিল, তবে?

এমনি।

ও আমার পাশটীতে বসিয়া বলিল, আচ্ছা, 'পিস্।' ওঠো এবার।

আমি চুপ করিয়াই রহিলাম। ও বলিল, দেখো, তুমি আমার কাছে না থাকলে ঠিক এমনিই আমার কষ্ট হয়। আমি চাই, তুমি সব সময়েই আমার পাশে পাশে থাকো। যাক্, আর বেলা ক'রো না। ঠাকুরের রান্না হ'য়ে গেছে, তোমার জন্য আমি নিজে আজ কালিয়া রেঁধেছি, ওঠো। তারপর ওর গালটী আমার গালের উপর রাখিল, ওর সোণার হাত দু'খানি দিয়া আমার চুল টানিয়া দিতে লাগিল। আমি আর পারিলাম না।...

গল্প, স্পর্শে আমার মিলন-বিরহী আত্মা পীড়িত হইয়া উঠিল।...ওকে আমি আমার বুকের উপর সজোরে টানিয়া লইলাম। আমারই মুখে ও মুখ মিলাইয়া পড়িয়া রহিল প্রায় পাঁচমিনিট। তারপর ফিক্ করিয়া হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, ছাড়ো সিঁদূর লাগ্‌বে।

বলিলাম, লাগুক্।...

পাঁচুগোপাল মিত্র

———

গোয়ালিয়রে একদিন

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

দুই বন্ধুতে সেবার উত্তর ভারত ভ্রমণ করতে করতে আগ্রায় এসে পৌঁছলাম। আগ্রার দ্রষ্টব্য স্থান সব দেখা প্রায় শেষ করে' সেদিন দুপুরে আহারাদির পর হোটেলে আমাদের ঘরে বসে' নব-পরিচিত আর একজন বোর্ডার সু—বাবুর সঙ্গে ভ্রমণ-সংক্রান্ত নানা বিষয় আলাপ-আলোচনা হ'তে হ'তে স্থির হ'য়ে গেল যে, পরদিন প্রাতে আমরা গোয়ালিয়র দেখতে যা'ব। তৎক্ষণাৎ 'টাইম টেব্‌ল' বের করে' ট্রেণের সময় দেখা ও যাত্রার আনুসঙ্গিক অন্যান্য আয়োজন করা সুরু হ'ল। গোয়ালিয়র যেতে হ'লে আমাদের খুব প্রত্যুষে উঠে আগ্রা ক্যান্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে গিয়ে দিল্লী থেকে বোম্বাইগামী জি-আই-পি রেলের মেন লাইনের ট্রেণ ধরতে হবে। ষ্টেশনের পথটিও নিতান্ত কম নয়। সেইজন্যে বিকেলে বেরিয়ে একটা টাঙ্গা ঠিক্ করে' আসা গেল। শীতকাল। রাত থাকতে সহজে বিছানা ছেড়ে ওঠা সম্ভব হবে না বুঝে ঘড়িটাতে 'এ্যালার্ম' দিয়ে সন্ধ্যার পরই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

পরদিন। তখনও রাত রয়েছে। তারকা-কণ্টকিত আকাশের নীচে দিয়ে 'মল্ রোড' ধরে' আমাদের টাঙ্গা যখন ছুটে চল্‌লো, শেষ রাত্রির আব্‌ছা অন্ধকারে মনে হ'ল সাজাহানের আগ্রা যেন 'মমতাজের বিরহে ধ্যানমগ্ন হ'য়ে আছে। যাই হোক্, ট্রেণ যথাসময়ে এলে আমরা তা'তে উঠে বসলাম। আগ্রা ক্যাণ্ট থেকে গোয়ালিয়র মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ; সুতরাং, সেখানে বেলা সাড়ে আটটার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া গেল।

পথে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু দেখি নি; তবে করদ-রাজ্য ঢোলপুরের ষ্টেশনটা পড়েছিল বটে। মোরার রোড আর গোয়ালিয়র ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী একস্থানে ট্রেণ থেকেই দেখ্‌লাম, 'গোয়ালিয়র পটারি ওয়ার্কস্'-এর কারখানা। তারপর চোখের সামনে সহসা ফুটে উঠ্‌লো সুনীল আকাশের পটভূমির উপর সহস্র কীর্ত্তি-স্মৃতি-বিজড়িত গোয়ালিয়র দুর্গ উচ্চ পর্ব্বতের ওপর সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে তা'র সেই বিরাট্ সুমহান্ সৌন্দর্য্য দেখে কত কথাই মনে পড়লো...এই দুর্গেই এক-দিন স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়েছিল... মারহাট্টা রাজারা একদিন এইখান থেকেই সমস্ত উত্তর ভারত জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই দুর্গ কখনও পড়েছে মোগলদের হাতে, কখনও রাজপুতদের হাতে। একবার একে অধিকার করেছে তোমর-বংশীয় রাজারা, একবার দাস-বংশীয়েরা। আবার কখনও এসেছে সুর-বংশীয় মুসলমান রাজা সেরশাহের অধিকারে, কখনও গোহাদের হিন্দু জাঠ রাণাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে। কিন্তু গোয়ালিয়র দুর্গের কথা স্মরণ হলেই যাঁর অপূর্ব্ব বীরত্বে গৌরব বোধ করি

তিনি ঝাঁসির অলোকসামান্যা বীর রাণী লক্ষ্মীবাই। অনেক প্রবল ঝঞ্ঝা সহ্য করার পর গত আটচল্লিশ বছর এই দুর্গ সিন্ধিয়ার হাতে আছে। অবিলম্বে আমরা এর ভেতরে গিয়ে ভালো করে' দেখতে পাব ভেবে কৌতূহলে অধীর হ'য়ে উঠলাম।

গোয়ালিয়র ষ্টেশনের অদূরে একটি ধর্ম্মশালার খোঁজ পাওয়া গেল। বাড়ীটি বেশ বড়, ঘরও অনেকগুলি; কিন্তু বন্দোবস্ত মোটেই সন্তোষজনক নয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক নগ্নগাত্র, নগ্নপদ, কৃষ্ণকায়, মলিন ও স্বল্পবসনতুষ্ট খণ্ডব্যক্তি এসে নিজেকে ধর্ম্মশালার 'মাণিজোড়' (অর্থাৎ ম্যানেজার—'মাণিজোড়' নয়) বলে' পরিচয় দিয়ে অতি রূঢ়ভাবে জানিয়ে দিলে, 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী।' অর্থাৎ, কিনা সোজা ভাষায়, স্থানাভাব। তবে আমরা যদি ইচ্ছা করি, তা' হ'লে সেই ধর্ম্মশালার একাধিক দেয়াল আলমারির একটিতে আমাদের জিনিষ-পত্তর, কাপড়-চোপড় তালা দিয়ে রেখে বিশ্রামাদি করতে পারি। 'পড়েছি মোগলের হাতে—' ইত্যাদি প্রবচন স্মরণ করে' আমরা অগত্যা একটি দেওয়াল আলমারিই অবশেষে দখল করলাম ও তাড়াতাড়ি সেই ধর্ম্মশালার কূপের জলে স্নান সেরে নিলাম। পরে অবশ্য ঘুরে ঘুরে আমরা সমস্ত ঘরগুলি দেখেছিলাম। অনেকগুলিই তালাবন্ধ। আর বাকীগুলির কোনটিতে স্থানীয় চানাচুরওয়ালা তাঁর ভাঁড়ার সাজিয়েছেন, কোনটিতে মিঠাইওয়ালা 'পারমেনেণ্ট সেটেলমেণ্ট' করেছেন বলেই বোধ হ'ল। অবশ্য এঁদের সঙ্গে আমাদের অতিথিবৎসল 'মাণিজোড়ে'র যে কোনরকম আর্থিক 'সেটেলমেণ্ট' হয়েছিল, এ রকম সিদ্ধান্ত করা সু—বাবুর অন্যায় বই কি।

যাই হোক্, স্নান সেরে বেরিয়ে পড়লাম অদূরবর্ত্তী 'পার্ক হোটেলে'র উদ্দেশে। একটি রমণীয় উদ্যানের মধ্যে এই প্রাসাদোপম হোটেলটি। এ দিকটাকে 'লস্কর' বা 'নিউ গোয়ালিয়র' বলে। হোটেলের ম্যানেজার যুক্তপ্রদেশীয় একটি শিক্ষিত অমায়িক ভদ্রলোক। তাঁর তদারকে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের আহার্য্য প্রস্তুত হ'ল ও আহারাদির পর একটি টাঙ্গা ভাড়া করে' আমরা ফোর্টের অভিমুখে চললাম।

ফোর্টের মধ্যে যেতে অনেকগুলি গেট অতিক্রম করতে হয়। আমরা প্রথমে 'আলমগিরি গেটে'র সম্মুখে গিয়ে টাঙ্গা থেকে নামলাম। পাশেই দুর্গের বাইরে দেখ্‌লাম 'জুম্মা মসজিদ।' এই মস্‌জিদ্ আর 'আলমগিরি গেট্' বাদশাহ আওরংজীবের সময়ে নির্ম্মিত হয়; আবার কা'রও মতে মস্‌জিদটি জাহাঙ্গীরের আমলে তৈরী।

দ্বারীকে যৎকিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করা হ'ল। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর দক্ষিণ দিকে পড়লো 'গুর্জ্জরীমহল'। বহুতোরণ বিশিষ্ট প্রস্তরনির্ম্মিত এই দ্বিতল প্রাসাদটি দুর্গের মধ্যে একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য জিনিষ। রাজা মানসিংহ তাঁ'র প্রিয়তমা গুর্জ্জরী রাণী মৃগনয়নার জন্যে এই সুন্দর প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। উপস্থিত এটি 'আরচিওলজিক্যাল মিউজিয়াম'-রূপে ব্যবহৃত হচ্চে। আমাদের বর্ত্তমান যুবরাজ ১৯২২ সালে যখন গোয়ালিয়রে যান, সেই সময় তিনি এই মিউজিয়মটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

'গুর্জ্জরী মহল' পেছনে রেখে আমরা ক্রমোচ্চ পথ ধরে' হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠ্‌তে লাগলাম। কিছুদূর এইভাবে গিয়ে সকলেই বিশেষ তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় একটি লোকের নির্দ্দেশে পাশেই একটি গুহার মতন অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে সঞ্চিত সুশীতল জলপান করে' বিশেষ তৃপ্তি বোধ হ'ল। শুন্‌লাম, উহা নাকি ঝরণার জল।

সমস্ত দুর্গটির মধ্যে আমরা যতগুলি বৃহৎ গেট্ অতিক্রম করেছিলাম তা'র মধ্যে 'হাতিয়া গেট্' দুইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুইটি গেট্ই সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের আমলে নির্ম্মিত হয়েছিল। 'হাতি গেটে'র সম্মুখে আগে পাথরের হাতি শোভা পেতো, সেই জন্যেই নাম হয়েছে 'হাতিগেট' বা 'হাতিপৌর।' প্রতি গেট্‌টি চমৎকার কারুকার্য্যমণ্ডিত।

ফোর্টের মধ্যে অন্যতম প্রধান সৌধ 'মানমন্দির।' কি স্থাপত্যকৌশলে, কি শিল্পসমৃদ্ধিতে অথবা পরিকল্পনার পারিপাট্যে এর অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই

কোন্ সুদূর অতীতে কোন্ অজ্ঞাতনামা অথচ সুনিপুণ শিল্পীর হাতে এর সৃষ্টি, কিন্তু দেখ্‌লে মনে হয় এসব কারুকার্য্য বোধ হয় খুব বেশীদিন হয় নি শেষ হয়েছে। পাথরের টালির ওপর নানারঙের এনামেল করা ফুল, লতাপাতা প্রভৃতির রঙীন প্রতিকৃতি দেখ্‌লে সহসা তা'দের কৃত্রিম বলে' বিশ্বাস করতে যেন বাধে। হাঁস, ময়ূর, হাতি প্রভৃতির ছবিগুলিই বা কী চমৎকার! অনেকগুলি বিরাট গেট্ পার হ'য়ে হঠাৎ এর সাম্‌নে এসে দাঁড়াতেই দর্শকের মনে হয় কোন এক সুগম্ভীর ব্যক্তির মুখ হঠাৎ যেন সুমধুর হাসির ছটায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। এই চারতলা বাড়ীটি দুই মহলে বিভক্ত। বাহির মহলে থাক্‌তো রাজভৃত্যেরা,আর ভেতর মহলে রাজা সপরিবারে। নীচের দু'টি তলা ভীষণ অন্ধকার; আমাদের টর্চ্চ ছিল, তাই সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। শুন্‌লাম, দুর্গ যখন মোগলদের অধিকারে ছিল, তখন এই সব অন্ধকার কুঠ্‌রি-গুলিতে অপরাধীরা বন্দী থাক্‌তো। 'মানমন্দিরে'র গাইড্ আমাদের একটি কক্ষ দেখিয়ে বল্‌লে—সেই কক্ষে সম্রাট্ আওরংজীব তাঁর সহোদর ভাই মোরাদকে বন্দী করে' রেখেছিলেন। মোরাদ খুব জনপ্রিয় ছিলেন। সেই জন্যে বাইরের লোকের সাহায্যে দড়ির একটি মই লাগিয়ে একরাত্রে তিনি যখন পালাবার যোগাড় করছিলেন, সেই সময়ে তাঁর সামান্য অসাবধানতায় অসতর্ক নিদ্রিত প্রহরীদের ঘুম ভেঙে যায় ও তাঁ'র চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর পর আওরংজীব শত্রুর শেষ রাখা ঠিক্ নয় বুঝে চক্রান্ত করে' তাঁর মস্তকটি দেহবিচ্যুত করেন ও তাঁর শবদেহ ঐ দুর্গের মধ্যেই একস্থানে প্রোথিত করা হয়। অকুস্থানে দাঁড়িয়ে অসহায় বন্দী রাজভ্রাতার সেই নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুন্‌লে যুগপৎ ভয় ও করুণার দুই বিরুদ্ধ হৃদয়ানুভূতিতে বিচলিত হ'য়ে পড়তে হয়।

'মানমন্দিরে'র ওপর তলায় 'শিস্‌মহল' নামে যে বিচিত্র কক্ষটি আছে, সেখানকার পাথরের ঝিলিমিলিগুলি শিল্প-সৌন্দর্য্যে অনুপম। এই ঝিলিমিলিগুলির মধ্য দিয়ে রাজ-পরিবারের পর্দ্দানশীন মহিলারা পথচারী পুরুষের দৃষ্টিপথে না পড়েও বাইরের সাধারণ দৃশ্য উপভোগ করতেন।

'মানমন্দিরে'র একজায়গায় প্রাচীরগাত্রের একাংশ দেখিয়ে গাইড্ বললে—সেইখান দিয়ে পূর্ব্বে তিনটী সুদীর্ঘ গুপ্তপথ ছিল; এখন সেই পথের প্রবেশমুখ বন্ধ করে' দেওয়া হয়েছে। পূর্ব্বকালে শত্রুপক্ষ দুর্গ অবরোধ করলে, যখন দুর্গরক্ষার আর কোন উপায় থাকৃত না, তখন দুর্গাধিপতি তাঁর বিশ্বস্ত পার্শ্বচরদের সঙ্গে এই সুড়ঙ্গ দিয়ে গুপ্তভাবে দুর্গত্যাগ করতেন। এই তিনটি পথের মধ্যে একটি নাকি ছিল আগ্রা পর্য্যন্ত ও আর একটি নারওয়ার পর্য্যন্ত। তৃতীয় পথটির বিষয় গাইড্ বিশেষ কিছু বলতে পারলো না।

রাজা মানসিংহের (আকবরের সেনাপতি নয়) নাম থেকেই 'মানমন্দিরে'র নামকরণ। ইনি রাজকার্য্যে নিপুণ, আমোদপ্রিয়, দয়ালু, গুণগ্রাহী ও কবি ছিলেন। এঁরই আমলে 'গুর্জ্জরী মহল', 'মানমন্দির' প্রভৃতি অনেক-গুলি বিখ্যাত কারুকার্য্য-সমন্বিত সৌধ নির্ম্মিত হয়েছিল। সেগুলি দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায়, কারুশিল্প তাঁ'র কত প্রিয় ছিল।

'মানমন্দির' শেষ করে' আমরা এগিয়ে চল্‌লাম। এক-স্থানে 'জহরকুণ্ড' নামে একটি বড় পুষ্করিণী দেখ্‌লাম। এই কুণ্ডটির নামের সঙ্গে একটি অতি করুণ ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি জড়িত আছে। পরিহার-বংশের শেষ রাণা সারঙ্গদেবের অধিকারে তখন এই দুর্গ ছিল। দাস-বংশের বিখ্যাত রাজা আল্‌তমাশ বহু সৈন্যসহ এই পথে দিল্লী যাচ্ছিলেন। গোয়ালিয়র দুর্গের সমৃদ্ধির কথা শুনে তিনি দুর্গ আক্রমণ করেন। রাণা সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যখন দেখা গেল দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হওয়া অবধারিত, তখন পুরনারীরা সকলে মিলে এইখানে 'জহরব্রতে'র অনুষ্ঠান করেন ও সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। বর্ত্তমান নারী-ধর্ষণের যুগের দুর্ব্বলাক্ষমা অত্যাচারিতা নারীদের সঙ্গে সে সময়কার তেজোদ্দীপ্তা মহীয়সী নারীদের তুলনা করে' বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে হয়। বলা বাহুল্য, সেইবারই আল্‌তমাশ দুর্গ জয় করেন।

'জহরকুণ্ডে'র নিকট সুদীর্ঘ প্রাচীর-বেষ্টিত যে স্থানটি

এখন 'বারুদখানা'-রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, ঐখানেই সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের প্রাসাদ ছিল। এখন সাধারণের ঐ প্রাসাদ দর্শনের উপায় নেই।

দুর্গের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য মন্দির দেখ্‌লাম। তা'র মধ্যে 'তেলীর মন্দির' উচ্চতম। মাদ্রাজের দিকে যে বিশেষ ধরণের মন্দির দেখা যায়, এটিও অনেকটা সেই রকম দেখ্‌তে। প্রস্তরনির্ম্মিত এই মন্দিরটিতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যও আছে। চতুর্ভুজ মন্দিরটি পাহাড়ের গা কুঁদে তৈরী। এটি 'বিষ্ণুমন্দির।' 'সূর্য্যমন্দির' আর 'চতুর্ভুজ মন্দির', এই দু'টি ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধীদের বিশেষ আদরের জিনিষ; কারণ, এই মন্দির দু'টিতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু কারুকলা আর স্থাপত্যবিদ্যার চরমোৎকর্ষ যেমন দেখা যায় 'শাস-বহু মন্দির' দু'টিতে, এমন আর কোন মন্দিরে নয়। দু'টি মন্দিরের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী নয়; একটি অপরটী হ'তে বৃহত্তর। শোনা যায়, শাশুড়ী-বউ থেকেই নাকি 'শাস-বহু' নামের উৎপত্তি;—যেটি বড় সেটী শাশুড়ী, যেটী ছোট সেটি বউ। মতান্তরে—'সহস্রবাহু' কথাটি কালক্রমে 'শাস-বহু'তে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু 'সহস্রবাহু' নামই বা কেন হ'ল তা'ও বুঝলাম না; কারণ, দু'টিই বিষ্ণুমন্দির। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, উদয়পুরেও এই রকম দু'টি মন্দির আছে, তা'দের নামও 'শাস-বহু মন্দির।' গোয়ালিয়র দুর্গের বৃহত্তর 'শাস-বহু মন্দির'টির চূড়া সম্ভবতঃ বাবরের আজ্ঞাতেই ভেঙে ফেলা হয়েছিলো; কারণ, এই পরধর্ম্মদ্বেষী, অরসিক সৌন্দর্য্যজ্ঞানরহিত বাদশাহটির শ্রী-অসহিষ্ণুতার পরিচয় অনেক জিনিষ থেকেই পাওয়া গেল। দুর্গে ওঠবার পথের ধারে জৈন তীর্থঙ্করদের বহু অনিন্দ্যসুন্দর বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি দেখেছি। তাঁ'দের কোনটির মুখ চেঁচে ফেলা, কা'রও নাক, কা'রও হাত-পা ভেঙে তাঁ'দের শ্রীহীন করে' রেখেছে। এইসব বর্ব্বরোচিত অত্যাচারের দৃষ্টান্ত দেখ্‌লে মন দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরে' ওঠে। 'শাস-বহু মন্দিরে'র ভেতরে উৎকীর্ণ বহু মূর্ত্তিও অসীম ধৈর্য্যসহকারে ঐভাবে নষ্ট করা হয়েছে। শেষে তা'তেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে ভেতরটা সমস্ত চূণের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পরে সেই প্রলেপ অনেক কষ্টে পরিষ্কার করে' বড় মন্দিরটিতে ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন যা' আছে, তা'রই ঐশ্বর্য্যে সৌন্দর্য্যরসলিপ্সুর মন পুলকিত হ'য়ে ওঠে। মন্দিরের ভিতর ঢুকতে যে বৃহৎ দরজাটি—কী সুন্দর তা'র পরিকল্পনা!…সকলের নীচে গরুড়ের মূর্ত্তি, তা'র ওপরে বিষ্ণু একক। সর্ব্বোচ্চে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিদেবের মূর্ত্তি। মন্দির অভ্যন্তরে গিয়ে ছাদের কারুকার্য্যের দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাক্‌তে হয়। কতবড় কুশলী শিল্পী ছিল তা'রা, যা'রা এই কঠিন পাথরের ওপর এইসব অপূর্ব্ব নক্সা এঁকে গেছে। কী অপরিসীম ধৈর্য্য ছিল তা'দের!

দুর্গের ওপর থেকে একবার বাইরের দিকে চেয়ে গোয়ালিয়রের 'প্যানোরমিক ভিউ' দেখ্‌লাম। সমস্ত সহরটি যেন ছবির মতন মনে হ'ল।

এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হ'য়ে গেল। আর মোটের ওপর দুর্গের প্রধান দ্রষ্টব্যগুলি প্রায় সব দেখাও হ'য়ে গেছে। সুতরাং আর বিলম্ব না করে' আমরা দুর্গ ত্যাগ করলাম।

টাঙ্গা বাইরে দাঁড়িয়েই ছিল। তা'তে করে' দুর্গ থেকে প্রায় সিকি মাইল পূর্ব্বে মহম্মদ ঘোষের সমাধিস্থল দেখতে গেলাম। এটিও এখানকার একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য জিনিষ। মহম্মদ ঘোষ ছিলেন সম্রাট্ বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের সমসাময়িক সুফী-সম্প্রদায়ভুক্ত একজন বিখ্যাত ফকির। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই ইনি বিশেষ প্রিয় ছিলেন। সম্রাট্‌রা পর্য্যন্ত এঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌তেন। একজন সুগায়ক বলে' এঁর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। এঁর বিষয়ে অনেক অলৌকিক জনশ্রুতির প্রচলন আছে। সম্রাট্ বাবর একবার কর্ণপীড়ায় খুব ভুগছিলেন। মহম্মদ ঘোষ তাঁর কাণে শুধু মন্ত্র পড়েই নাকি তাঁ'র অসুখ সারিয়ে দেন। এই সমাধি-মন্দিরটির চারিধারে চতুষ্কোণ অলিন্দ; মাঝখানে আসল সমাধি-কক্ষটি অবস্থিত। সূক্ষ্ম কাজ করা পাথরের একাধিক নিখুঁত জাফরির জন্যে এই সৌধটির খুব নাম আছে। এর বৃহৎ গম্বুজটি শুনলাম, এককালে নীলরঙে এনামেল করা ছিল, কিন্তু কালচক্রের নিষ্পেষণে এখন সে এনামেল আর নেই। এর পাশেই

দেখলাম সম্রাট্ আকবরের 'নবরত্ন-সভা'র উজ্জ্বলতম রত্ন, মহম্মদ ঘোষের প্রিয় শিষ্য, স্বনামধন্য গায়ক ও কবি তানসেনের সমাধি-ভূমি। তানসেন একজন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়েও পরে কোন অজ্ঞাত কারণে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলেন। অতি সাধারণ এই স্থানটি অন্য হিসেবে তেমন দ্রষ্টব্য না হ'লেও, সমগ্র ভারতবর্ষে খুব কম ভারতীয় গায়ক-গায়িকাই আছেন, যাঁরা এই স্থানটিকে বিশেষ ভক্তির চক্ষে না দেখেন। এটিকে গায়ক-যশঃপ্রার্থীদের তীর্থ বললেও খুব বেশী বলা হয় না। এর পাশেই একটি তেঁতুলগাছ আছে। তা'র পাতা গায়কেরা অতি ভক্তিভরে চর্ব্বণ করে' থাকেন—এই বিশ্বাসে যে, তাঁদের গলা বেশ ভাল হবে। অবশ্য এই সব শুনে আমরা তিনজনেও মুঠো মুঠো তেঁতুলপাতা চিবিয়ে ছিলাম, (যদিও গায়ক এ বদনাম কোন নিন্দুকই আমাদের দিতে পারবে না।) কিন্তু সম্ভবতঃ ভক্তির ঘাট্তি পড়াতেই, দাঁত টকে' যাওয়া ছাড়া আর কোন ফল হয় নি।

যাই হোক্, এবার আমরা এস্থান ত্যাগ করে' টাঙ্গায় চড়ে' 'মতিমহল' আর 'জয়বিলাস-প্রাসাদ' দেখ্তে চল্লাম। সুবিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে এই দু'টি প্রাসাদ আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন। প্রাসাদ দু'টি ভূতপূর্ব্ব মহারাজা জয়াজিরাও সিন্ধিয়া নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজা 'জয়বিলাস'-প্রাসাদে বাস করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে যাওয়ায় 'জয়বিলাস-প্রাসাদে' প্রবেশের ছাড়পত্র আমরা যোগাড় করতে পারলাম না; বাইরে থেকে দেখেই মনকে সান্ত্বনা দিতে হ'ল। তবে 'মতিমহলে'র ভেতর ঢুকেছিলাম—রাজপ্রাসাদ যেমন হওয়া উচিত, এক কথায় এটিও তেমনি। সম্মুখেই অতিথি-অভ্যাগতদের বিশ্রামের স্থান। তারপর একটি সুপ্রশস্ত বহিকক্ষ—বহু মূল্যবান, আধুনিক রুচি-সম্মত ফার্ণিচারে সাজানো। শুনলাম, এটিই নাকি 'কাউন্সিল-হাউস।' একটি রাজভৃত্য আমাদের সঙ্গে করে' ওপরে নিয়ে গেল। ওপরের একটি কক্ষে খুব বড় বড় আয়না আর ভূতপূর্ব্ব রাজা আর রাজন্যবর্গের প্রমাণ আকারের অয়েলপেন্টিং ছবি দেখ্লাম। হঠাৎ দেখ্লে মনে হয় রাজারা সশরীরে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এই ঘরটিতে রাজা একান্ত বিশ্বাসী পারিষদদের নিয়ে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত জটিল বিষয়ে গুপ্তমন্ত্রণা করে' থাকেন। ছাদে উঠে আর একবার দূর থেকে দুর্গের সাধারণ দৃশ্য উপভোগ করা গেল। 'মতিমহলে'র একপাশে সরকারী দপ্তরখানা—বিভিন্ন বিভাগের অফিসের সারি চলে' গেছে।

এখান থেকে পায়ে হেঁটে 'কিং জর্জ গার্ডেনে'র উদ্দেশে চল্লাম। পথে একস্থানে দেখলাম, রেলের লাইন পাতা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেটি 'গোয়ালিয়র লাইট রেলে'র একটি লাইন। এই রেলে করে' গোয়ালিয়র রাজ্যের গ্রীষ্মাবাস 'শিবপুরী' অনেকে দেখ্তে যান।

প্রাসাদের হাতা ও একটি প্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম করে' আমরা একটি অনতিবৃহৎ চিড়িয়াখানার সাম্নে এসে পড়লাম। এখানকার বাঘ আর সিংহ রাখবার একটু বিশেষত্ব দেখলাম। খোলা জায়গায় একটি পাকা ঘর—তা'র চারিধারে গড়ের মতন কাটা, জলে ভর্ত্তি, আর এই সমস্তটা লোহার উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। ব্যাঘ্র, সিংহ ইচ্ছামত কখনও ঘরের মধ্যে যাচ্ছে, কখনও বাইরে এসে জলের ধারে বিচরণ কচ্ছে।

'জর্জ্জ গার্ডেনে' যখন আমরা পৌছলাম, তখন সূর্য্য অস্ত গেছে। ছায়ায় সমস্ত উদ্যানটি পরিভ্রমণ করা গেল। কোলকাতার লোকের কাছে উদ্যানটি অন্য কোন হিসেবে খুব চিত্তাকর্ষক না ঠেক্‌লেও, একটি জিনিষ খুব ভাল লাগবে নিশ্চয়—অন্ততঃ, আমাদের ত লেগেছিল। উদ্যানটির মধ্যে হিন্দুদের একটি মন্দির, মুসলমানদের মস্‌জিদ, শিখেদের গুরুদ্বার, আর থিয়োজফিষ্টদের জন্য একটি উপাসনা-গৃহ আছে। গোয়ালিয়র রাজ্যের এবং বিশেষ করে' এই উদ্যানের নির্ম্মাতা স্বর্গীয় মহারাজা জয়াজিরাও সিন্ধিয়ার সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধার এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সন্ধ্যাসমাগমের সঙ্গেই গুরুদ্বারে আরম্ভ হ'ল তবলা এবং সারেঙ সহযোগে মধুর ভজন, হিন্দু মন্দিরে সারেঙ, তব্‌লা ও মন্দিরাযোগে মধুর গীত ও দেবারতি, আর মস্‌জিদ্ থেকে শোনা গেল নামাজের জন্যে

মুয়াজ্জীনের আজান। সমস্তদিন ঘোরাঘুরির পর শ্রান্ত দেহে সেদিন সেই উদ্যানের একটি বেঞ্চে বসে' অনন্ত আকাশের অপূর্ব্ব বর্ণস্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে, স্ব স্ব ধর্ম্মবিশ্বাস-মতে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের উদ্দেশে সকলের অন্তরের এই ভক্তি-নিবেদনটুকু বড় মধুর লেগেছিল।

শ্রান্ত চরণযুগল আর চলতে চাইছিল না। কিন্তু বন্ধুবরের আগ্রহাতিশয্যের কাছে আমার কোন আপত্তি খাট্‌লো না। ট্রেণের দেরী ছিল; সুতরাং, ততক্ষণ দেশটাকে একটু দেখ্‌তে বার হওয়া গেল। তখন দোকানে দোকানে ইলেকট্রিক্ আলো জলে' উঠেছে। দেখ্‌লাম, সদর রাস্তাগুলি প্রায়ই বেশ প্রশস্ত; কিন্তু সহরের একটু অভ্যন্তরে রাস্তাগুলি অনতিপরিসর ও জনবহুল। কিন্তু 'লস্করে'র দিক্‌টা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

শ্রান্তপদে আমরা আবার ধর্ম্মশালায় ফিরলাম। রাত্রি তখন আটটা বেজে গেছে। কোনরকমে বারান্দায় একটা সতরঞ্চি পেতে 'ফ্ল্যাট্' হ'য়ে পড়লাম। যখন গাত্রোত্থান করলাম, তখন ট্রেণের সময় খুব বেশী নেই; সুতরাং, দোকান থেকে পুরী-তরকারী ইত্যাদি কিনে জলযোগ করে' গোয়ালিয়রের স্মৃতিটুকু মনের মধ্যে ঝালিয়ে নিতে নিতে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হওয়া গেল।

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

রাত বারোটার রোমান্স

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

[যে সব বাড়ীতে দুইখানি ঘর লইয়া গৃহস্থালী সম্পূর্ণ, তাহারই যে কোন একটিতে এই গল্প ঘটিয়া উঠিতে পারে। রাত্রি প্রায় বারোটা। ঘর জুড়িয়া বিছানা পাতা—তাহারই উপর গুটি পাঁচেক সন্তান লইয়া মহামায়া শুইয়া আছে। চূণ-বালিখসা ঘরটির মতই তাহার যৌবনের চেহারা। বেশ বোঝা গেল—সে ঘুমায় নাই। মাঝের ছেলেটাকে বোধ হয় মশা কামড়াইতেছিল—সে ঘুমের ঘোরে বারকতক কা'কে যেন 'শালা' 'শালা' বলিয়া চুপ করিল।...কিছুক্ষণ পরে মহামায়া উঠিয়া গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। নাঃ, নির্জ্জন রাস্তার ও প্রান্ত অবধি সতীশের চিহ্নমাত্র নাই।...মহামায়া মূর্খ নয়, বিবাহের পূর্ব্বে সে বাপের বাড়ীতে দস্তুরমত লেখাপড়া শিখিয়াছিল—তাই এত রাত অবধি স্বামী বাড়ী না আসায় সে হাঁউ-মাঁউ না করিয়া—নীরবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।...দুই বৎসর বয়সের কোলের ছেলেটা হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। মহামায়া ফিরিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল।—অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি পরিপূর্ণ নীরবতা।...ঘরের বাহিরে দরজায় ধাক্কা পড়িল—মহামায়া ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই প্রবেশ করিল সতীশ।]

মহামায়া—(সতীশের পিছনে আসিতে আসিতে) ওরে ক্যাবলা, এই দেখ্ তোর পিতা স্বর্গঃ বাড়ী এয়েছেন। কেঁদে দিয়ে মরছিলি হারামজাদা, এইবার উঠে পেন্নাম কর্।

সতীশ—(মৃদুস্বরে) আঃ, কী কোরছ! জেগে উঠ্বে যে!—

মহামায়া—ও মা, সত্যিই তো।

[সতীশ জামা-কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিল—এবং ধীরে ধীরে ঘরের কোণে ঢাকা দেওয়া ভাতের ঢাকনী তুলিয়া খাইতে বসিল]

মহামায়া—আপিস থেকে হেঁটে আসতে হ'ল বুঝি?

সতীশ—(খাইতে খাইতে) না।

মহামায়া—আজও কি বন্ধুর অসুখ করেছিল?—(সতীশ নীরব)—আহা! আজকালকার দিনে এমন বন্ধু কি কেউ পায়? আপিস থেকে বাড়ী না ফিরে, খাওয়া নেই দাওয়া নেই—বন্ধুর বিছানায় কাঁদো-কাঁদোমুখে রাত বারোটা অবধি বসে' রইল।—এমন একটা বন্ধু আমাদের কপালে জোটে না গা?

সতীশ—কেন ব্যাজ্ব্যাজ্ কোরছ। বন্ধুর অসুখ করে নি।

মহামায়া—করে নি? কী করে' জানবো বল! মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—আর একদিন যেমন বুঝিয়েছিলে—আজও তাই মনে করে' বসে' আছি।—তা' কী হয়েছিল তবে আজকে?

সতীশ—(মরিয়া হইয়া)—বায়স্কোপে গিয়েছিলাম।

মহামায়া—কোথায়?

সতীশ—বায়স্কোপে।

মহামায়া—বায়স্কোপে? (স্থির দৃষ্টিতে সতীশের প্রতি চাহিয়া) আচ্ছা, আমার বয়স কত হ'ল?

সতীশ—কেন? বয়সের কি কথা আছে এতে?

মহামায়া—না না, শুনি। কত হ'ল বয়স আমার? পাঁচ ছেলের মা আমি তা' জান?

সতীশ—জানি বৈকি।—

মহামায়া—তবে? ও সব ধাপ্পা তুমি আর কারুর কাছে দিও—আমার কাছে নয়, বুঝলে? (একটু পরে) বায়স্কোপ তো সাড়ে ন'টায়। ছ'টা থেকে কোরছিলে কী? (সতীশ নীরব।) ন্যাকা চৈতন! বোকা বুঝোচ্ছেন আমাকে!

[সতীশের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। সে উঠিয়া

বাহিরে গিয়া মুখ ধুইয়া আসিল—এবং বাক্যব্যয় না করিয়া নিজের স্থানটিতে গিয়া শুইয়া পড়িল।]

মহামায়া—(নিজের মনে) চাল নেই, চুলো নেই, তিরিশ টাকার ক্যারানী, তার আবার ফূর্ত্তি কত?—বায়স্কোপরে—হ্যানোরে—ত্যানোরে—যেন বাপের দেওয়া জমিদারী আছে। (একটু পরে) কোথায় গিয়েছিলে বলো। (সতীশ নীরব) মিথ্যা কথা বলতে মুখে একটু বাধে না, না? (উঠিয়া সতীশের পাশে গিয়া বসিল) বলো—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

সতীশ—বললাম তো বায়স্কোপে।—

মহামায়া—ফের মিথ্যে কথা বলছো? ছ'টা থেকে কোরছিলে কী তবে?

সতীশ—প্রশান্তর বাড়ী গিয়েছিলাম।

মহামায়া—কার বাড়ী?

সতীশ—প্রশান্তর।

মহামায়া—সে আবার কে?

সতীশ—আমার স্কুলের বন্ধু।

মহামায়া—গায়ে এসেন্স দিলে কে?

সতীশ—তারই বউ।

মহামায়া—দেখ্‌তে ভাল বুঝি? বড়লোক, না?

সতীশ—হ্যাঁ।

মহামায়া—তাই তো বলি। তা' কি রকম জম্‌লো তার সঙ্গে?—

সতীশ—তার মানে?

মহামায়া—এম্‌নিই বলছি। বড়লোক বন্ধুর বউ—অল্পবয়েস—দেখতে ভাল—আর যায় কোথায়! অম্‌নি গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছ?

সতীশ—ছোটলোকের মত ইতরোমো করো না।

মহামায়া—(রাগিয়া) ইতরোমো আমি করছি—না তুমি কোরছ? বুড়োধেড়ে মিন্সে, পাঁচ ছেলের বাপ, লজ্জা করে না তোমার বন্ধুর বৌয়ের সঙ্গে পীরিত করতে?

সতীশ—(ধম্‌কাইয়া) চুপ কর।

মহামায়া—(চীৎকার করিয়া) কেন চুপ করবো? রাত বারোটা অবধি বাবু বাইরে প্রেম করবেন—আর ঘরে আছে বাঁদী—ভাত নিয়ে জেগে বসে থাক্‌বে, না?

সতীশ—থাম্‌বে?

মহামায়া—না। দেবে একদিন যখন জুতো পেটা করে'—তখন বুঝবে। ফর্সা মেয়ে দেখ্‌লে আর রক্ষে নেই।

সতীশ—(ঠাস্‌ করিয়া স্ত্রীর গালে একটা চড় বসাইয়া দিল) ষ্টুপিড্‌ কোথাকার—যা' মুখে আসে তাই। সেই তখন থেকে ঘ্যানোর ঘ্যানোর—যেন আমার গার্জ্জেন।

[ছোট ছেলেটা হঠাৎ প্রবলবেগে চেঁচাইয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে মহামায়া গিয়া নীরবে তাহার পাশে শুইল। ছেলেটার বোধ হয় ক্ষুধা পাইয়াছিল, খাদ্যবস্তু পাইতেই সে চুপ করিল]

সতীশ—গেছি একদিন বায়স্কোপে, তার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে গেল। তা'তেও রক্ষে নেই—মুচি-মুদ্দফরাসের মত মুখ খারাপ! যত কিছু বলি না—ততই যেন মাথায় চড়ে' বসে। ফের যদি শুনি কোনদিন এরকম কথা—লাথি মেরে মুখ ভেঙে দেবো।

[মহামায়া কোন উত্তর দিল না। সতীশও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই ঘরটির মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।...অনেকক্ষণ পরে। বোধ হয় দুই ঘণ্টা কি তাহারও বেশী সময় কাটিয়া গিয়াছে। আচম্‌কা ঘুম ভাঙিয়া সতীশ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল,যে, মহামায়া মরিয়া গিয়াছে। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিল—সমস্ত শরীরে একটি ক্লান্তভঙ্গী বিস্তার করিয়া সে ঘুমাইতেছে। হঠাৎ স্ত্রীর জন্য সতীশের বুকের মধ্যে কী রকম করিয়া উঠিল। আহা বেচারী! সারাদিন খাটিয়া খাটিয়া ছেলেপিলের ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট পোহাইয়া রাত্রিবেলায় স্বামীর সঙ্গে একটু ভাল কথা কহিবার জন্য কত আশা করিয়া থাকে—নাঃ, মারাটা তাহার উচিত হয় নাই। আর সে সিনেমায় যাইবে না।...সতীশ উঠিয়া ধীরে ধীরে গিয়া ঘুমন্ত মহামায়ার পাশটিতে বসিল। অত্যন্ত সন্তর্পণে তাহার কপালের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিল। তারপর ডাকিল]

সতীশ—মায়া!

মহামায়া—(অভ্যাসবশতঃ ঘুমের ঘোরে উত্তর দিল) উ।

সতীশ—এদিকে ফিরে শোও তো, লক্ষ্মীটি!

মহামায়া—(ঘুমের ঘোরে) কেন?

সতীশ—দরকার আছে। শোন। (মহামায়া চোখ মেলিয়া চাহিল) দেখ—ইয়ে—সেদিন যে তুমি সেফ্‌টি-পিনের কথা বলেছিলে—সেই যে রূপোর ওপর মিনে করা—আজকে দেখে এলাম। দু'রকম আছে, বুঝ্‌লে। একরকম হচ্ছে দু'দিকে দুটো ময়ূর আর মাঝখানে—(মহামায়া পাশ ফিরিয়া শুইল) শুন্‌ছো?

মহামায়া—না।

সতীশ—কী না? সেফ্‌টিপিন্‌ চাই না তোমার?

মহামায়া—না।

সতীশ—আচ্ছা, এত রাগ তোমার কিসের জন্যে। বৌকে কি কেউ মারে না, বকে না নাকি?—ঘর-সংসার করতে গেলে এ রকম হ'য়েই থাকে।

মহামায়া—সে আমি জানি। তোমাকে বক্তৃতা দিতে কেউ ডাকে নি। তুমি শোও গে।

সতীশ—তুমি যদি এই রকম ব্যবহার কর আমার সঙ্গে—তা' হ'লে আমি সহ্য কোরব না বলে' দিচ্ছি।

মহামায়া—কী কোরবে শুনি?

সতীশ—কী কোরব মানে? যা' হয়—রোজ এই রকম রাত বারোটায় বাড়ী ফিরবো—দেখি তুমি কী কোরতে পার।

মহামায়া—আগে থেকে সাফাই গেয়ে রাখবার কোনই দরকার নেই। আমি জানি, আজ থেকে ফিরুতে তোমার রোজই বারোটা হবে। এবার একবার তোমার প্রাণের বন্ধুর বৌয়ের নামটা বলো—শুনে ধন্য হই।

সতীশ—আবার?

মহামায়া—(চটিয়া) কী আবার? ভয় দেখাচ্ছো তুমি কা'কে? ও সব চোখ রাঙানী অন্য জায়গায় দেখিও।

সতীশ—ফের মার খেতে ইচ্ছে আছে নাকি?

মহামায়া—তা' তো মারবেই। পরের বৌয়ের পেছনে পেছনে কুকুরের মত হ্যাংলাপনা করে' বেড়াবে তুমি—আর তা' বল্‌তে গেলেই আমাকে মার খেতে হবে। বুড়ো শালিকের সাধ কত!

[হঠাৎ সতীশ ক্ষেপিয়া গিয়া বিপুলবলে মহামায়ার চুলের গোছা চাপিয়া ধরিল। মহামায়া পাগলের মত পাখার বাঁট দিয়া সতীশের হাতের উপর আঘাত করিল। সতীশ ঠাস্‌ ঠাস্‌ করিয়া মহামায়াকে চড় মারিতে লাগিল। মহামায়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কান্নার শব্দে ছোট ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া চেঁচাইতে লাগিল। এবং এই গণ্ডগোলে আর সব ক'টি ছেলেমেয়ে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সমস্বরে কান্না জুড়িয়া দিল। সতীশ উঠিয়া গিয়া জানালার ধারে বসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল। রাস্তার গ্যাসের আলো তাহার মুখে পড়িয়াছিল। দেখা গেল—সে মুখ অত্যন্ত নির্ব্বিকার।]

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

জীবিত ও মৃত

শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র সাহা

অজয় চিঠিখানি লইয়া আবার পড়িতে লাগিল—

...অনেকেই জানে, তুমিও হয় তো মনে কর দুরন্ত ক্ষয়রোগ আমাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে টেনে নিচ্ছে... জীবনের এই সুন্দর প্রভাতে, অফুরন্ত তৃষ্ণা নিয়ে আমি চলেছি কোন্ অজানা অন্ধকারময় জগতের ভয়াবহ স্থানে — এই দুরারোগ্য ব্যাধির জন্যই !...সত্যিই কি তুমি তাই বিশ্বাস করো? একবার স্বচ্ছন্দ চিত্তে, নিজের বুকের উপর হাত রেখে, নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করে' কি উত্তর দিতে পারবে ?...জানি কোন ফল নেই, জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্ত যেমন তোমার অবিমিশ্র ঘৃণা ও অবজ্ঞায় কেটে গেছে, এই মৃত্যুপথ-যাত্রীর বেদনাকাতর শেষ দীর্ঘনিশ্বাসটীও তেমনি তোমার নিষ্করুণ শীতল সমবেদনাও পাবে না জানি...তবুও আজ মনে কত কথাই উদয় হয়। এই দুরন্ত উন্মাদ অন্তরের প্রতিটী স্পন্দন আজ যেন বড়ই দুরন্ত হ'য়ে উঠেছে। এতদিন নিজেকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করে এসেছি, কিন্তু আজ বড় দুর্ব্বল... আজ আর নিজের উপরও আমার শাসন নেই।...নিষ্ফল... পরিবর্ত্তে একটা অসহ গাঢ় বেদনা...বুকভরা একটা আর্ত্তনাদেই হয় তো ফেটে পড়বে জানি, তবুও আজ জানতে ইচ্ছে হয়, অত ভালবেসে...অত স্নেহ, মায়া-মমতা দেখিয়ে এই তুচ্ছ বালিকার শান্ত মনে কতবড় যে মায়ার স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিলে—সে কি মিথ্যে, শুধু কি অভিনয়?...

স-পত্র অজয়ের হাতখানা থর্থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

বাহিরে হেমন্ত সন্ধ্যার অন্ধকারময় আকাশ-পটে অকাল মেঘের আড়ম্বরের অন্ত ছিল না। দুরন্ত বাতাসের দাপাদাপি মাতামাতি কাল-বৈশাখীকেও যেন হার মানাইয়া দিতেছিল। নিঃসাড় পল্লী আতঙ্ক-স্তব্ধ। বিদ্যুতের দীর্ঘশিখা বজ্রহুঙ্কারে সেই আতঙ্ক-কম্পিত পল্লীর বুকে কখন কখন কোন ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো চকিতে খেলিয়া যাইতেছিল। অজয় খোলা জানালা দিয়া বাহিরের এই উন্মত্ত প্রকৃতির দিকে চাহিতেই অকারণ সে আর একবার শিহরিয়া উঠিল। অকস্মাৎ তাহার বিস্মৃত-প্রায় কৈশোরের স্মৃতি দুলিয়া উঠিল। মনে পড়িল, এমনি এক সন্ধ্যা!... লেখাদের গ্রামেরই থানায় তখন অজয়ের পিতা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। থানার পাশেই বাড়ী—একবারে গায়ে গায়ে মেশামিশি। লেখার বয়স তখন কতই বা—এই তের কি চোদ্দ! অথচ ঐ একটু মেয়েই কেমন করিয়া অজয়ের যৌবন-সুধাকুল অন্তরকে উন্মাদ করিয়া দিল। ভবিষ্যতের কোন কথাই মনে পড়িল না—সংসারানভিজ্ঞ এই দুইটী তরুণ প্রাণ আপন ভুলিয়া পরস্পরের অন্তর লইয়া স্বর্গ সৃষ্টি করিল। সে কত আশা—কত আনন্দ! সুখের কি গভীর

উন্মাদনা! আকাঙ্ক্ষার কি সুনিবিড় অনুভূতি! ...একটা সুখ স্বপ্ন—আদিও নাই, অন্তও নাই। অবিচ্ছেদ্য আশার কি গাঢ় মোহ!

...সেই কাল-সন্ধ্যা!

সন্ধ্যার অন্ধকার জমিয়া জমিয়া দৃষ্টির অচল হইয়া উঠিল। সেই গাঢ় তমিস্রায় ঢাকা আকাশ ভরিয়া কখন যে আরও মেঘ জমিয়াছে, কে-ই বা তাহা জানে! অকস্মাৎ মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল—তিমির-ঘন আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের একটা তীব্রশিখা আপন-ভোলা দুইটী প্রাণীকে চমকিয়া দিয়া আবার কোন অতল কালোয় তলাইয়া গেল। পাগল বাতাস কোথা হইতে হায় হায় করিয়া উঠিল।...

অজয় লেখা শিহরিয়া উঠিল।

কে জানে কেন লেখার অন্তর দুলিয়া উঠিল। কালো চোখ দুইটী আপনা-আপনি জলে ভরিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। অজয়ের ডান হাতখানি মুঠার মধ্যে লইয়া গাঢ়স্বরে লেখা কহিল—সত্যি যাবে অজয়...হয় তো আর দেখা হবে না।

একফোঁটা জল তাহার বেদনা-কাতর চোখ দুইটী হইতে গড়াইয়া পড়িল। গাঢ় অন্ধকারে অজয়ের তাহা চোখে পড়িল না, কিন্তু স্বরের সেই করুণ আবেগটুকু অপূর্ব্ব মাধুর্য্য মাদকতায় অজয়ের অন্তর ভরিয়া দিল। অজয় লেখাকে উন্মাদের মতো বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহার তুলতুলে নরম ঠোঁট দুইটীর উপর নিজের কম্পিত ওষ্ঠ চাপিয়া উন্মত্ত-কণ্ঠে কহিল—পাগ্‌লি!...লেখা যে অজয়ের ঘরের লক্ষ্মী...লক্ষ্মীহীন হ'য়ে সে কি একদিনও থাক্‌তে পারে?

লেখার মুগ্ধকণ্ঠে ভাষার সঞ্চার হইল না। শুধু তাহার কম্পিত তনুখানি অজয়ের উষ্ণস্পর্শে যেন অনাস্বাদিত পুলকধারায় ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল...একটা মধুর স্বপ্ন, তাহার সেই সুখ-নিদ্রিত চক্ষু পল্লবে বারেবারে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।...

...সেই সুখ-সন্ধ্যা...সেই কাল-সন্ধ্যা...তাহাদের জীবনে দ্বিতীয়বার আর আসে নাই। কতদিন গিয়াছে...কত হেমন্তের মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশ বিগত দিনের সুখ-স্মৃতি-বেদনায় নীরবে নিষ্ফল অশ্রুবর্ষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কত বসন্ত প্রভাতের আনন্দ সমারোহ এমনি একটী দিনের কথা মনে করিয়া অকস্মাৎ বিষাদ-স্তব্ধ হইয়া একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উন্মনা হইয়া গ্রীষ্মের বুকফাটা হা হা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে চেতনা হারাইয়া ফেলিয়াছে...শোকাকুল বরষার মেঘ-গাঢ় সজল আকাশ অজস্র চোখের জল ফেলিয়াছে...কতদিন কতবার...

বাহিরে দীর্ঘশীর্ষ নারিকেল বৃক্ষটী দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বজ্র ফাটিয়া পড়িল।...

অজয় সচকিত হইয়া চোখের জল মুছিয়া কম্পিত হস্তে আর একবার পত্রখানি আলোর নিকট তুলিয়া ধরিল।...

...জীবনের অজস্র ক্ষণগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হ'য়ে এসেছে। ভয় হয়, যখন এই চিঠি তুমি পাবে—ওঃ! আজ মরণকে পেয়েও মর্‌তে কতো ভয় কর্‌ছে! অথচ এত দিন ধরে শুধু মনে মনে একেই ডেকে এসেছি···আজ শেষ দিনে পৃথিবী আমায় পাগল করে' তুলেছে···তোমার স্মৃতি আমাকে লোভাতুর করেছে···বুকজোড়া অনন্ত পিপাসা··· অথচ উপায় নাই—উপায় নাই! কোন এক সময়ে সব শেষ হ'য়ে যাবে!...কিন্তু···না, কি-ই বা হ'বে···সবই বুঝি, তবুও আজ আর পারছি নে.. এই শেষ সময়টায় এই ছেলে-মানষীই যেন আমাকে পাগল করেছে!...একবার কি আসতে পার না...তেমনি কাছে বসে', তেমনি মাথাটী বুকের উপর চেপে ধরে' ঠোঁটখানা এই মৃত্যুপথ-যাত্রীর শীতল ওষ্ঠের উপর রেখে, তেমনি গাঢ়স্বরে—সেই অতীত দিনের মতো একটীবার···শুধু একটীবার লেখা বলে' ডাকতে পারো না?···কিছু না, শুধু শুনবো—সেই মোহময় স্বরের সুর-সমারোহ···সব গিয়েছে—কেবল এইটুকু—একটীবার—শুধু একটীবার...

অজয়ের হাত হইতে পত্রখানি স্খলিত হইয়া পড়িল। একটা দমকা বাতাস সমস্ত ঘরখানিকে সবেগে নাড়িয়া দিয়া একটা বিদ্রূপের মতো অজয়ের কাণের কাছে ফাটিয়া পড়িল।

অজয় থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের দিগন্তবিস্তৃত তরুলতা ছায়াবিহীন রৌদ্রতপ্ত ধূসর প্রান্তরের দিকে চাহিয়া তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত পা দুইখানি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অথচ এই মাঠটা পার হইতে পারিলেই লেখাদের গ্রাম। অজয় অসহায় করুণ-নেত্রে দিগন্তের সেই অস্পষ্ট সারি সারি কালো অচিন গাছগুলির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—উহারই পর লেখাদের সাদা ধবধবে বাড়ী। ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শ্রান্তভাবে অজয় পাশের অশত্থ-ছায়ায় বসিয়া পড়িল।

কতক্ষণ। ঝির্‌ঝিরে বাতাস অজয়ের ক্লান্ত দেহের উপর গভীর আলস্যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—শ্রান্ত চোখ দুইটা গভীর ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল।

অজয়!

শিহরিয়া উঠিয়া অজয় চোখ মেলিয়া চাহিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার অসাড় কণ্ঠ হইতে একটা ভয়ার্ত্ত অস্পষ্ট স্বর বাহির হইয়া আসিল—লেখা!

লেখা মাথা দুলাইয়া হি হি হি হি করিয়া তীব্র হাসি হাসিয়া উঠিল। উঃ! সে কি হাসি! অজানিত ভয়ে অজয়ের সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহার অপলক চোখ দুইটাতে একটা ভীষণ আতঙ্ক যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। অজয় কথা কহিতে পারিল না।

ললিত ঝঙ্কার তুলিয়া লেখা কহিল—চিন্তে পারচো না …তা' পার্‌বে কেন? শেষের কথাগুলি যেন গাঢ় বেদনা-ভরা!

অজয় ভয়ে ভয়ে চোখ তুলিল। কথা কহিতে চাহিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠ যেন কে সবলে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে—শুধু ঠোঁট দুইখানি বারকয়েক নড়িয়া উঠিল মাত্র!

লেখা আবার হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি! অজয়ের দেহের প্রতিটী লোমকূপ দিয়া সেই তীব্র-করুণ ভীষণ হাস্যের সকম্প ভীতি সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া যেন গাঢ় হিমে জমিয়া উঠিল! সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া শব্দ-স্পর্শ-জ্ঞান-হীন ভয়াবহ নিঃসাড়তা…একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার একটু আর্ত্তনাদ করিবার ক্ষমতাও নাই!

লেখা সরিয়া বসিল। তাহার লীলায়িত কমনীয় তনুর প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে—নিঃসীম শীতলতা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। উঃ, সে কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা! অজয় যেন জমিয়া গেল!

করুণ হাসিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে লেখা কহিল—চিন্তে পারচো না?—আমি যে তোমারই লেখা! অকস্মাৎ লেখা আর্ত্তনাদ করিয়া ফাটিয়া পড়িল। উঃ, সে কি করুণ ক্রন্দন! অজস্র জলধারা বর্ষণ করিয়া বেদনা-ম্লান চোখ দুইটীর শীতল দৃষ্টি ফেলিয়া লেখা কহিল—ওগো, কেন আগে এলে না…এলেই যদি, তবে কেন দুটোদিনও আগে এলে না? তা' হ'লে…কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না। অসমাপ্ত কথার মাঝেই আবার সে আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অজয়ের ভয়ত্রস্ত মনে একটু একটু করিয়া সাহস সঞ্চার হইতেছিল। ভীত অস্পষ্ট কণ্ঠে সে ডাকিল—লেখা!…

—পেরেচো? পেরেচো…সত্যি আমায় চিন্তে পেরেছো? আমি তো ভেবেছিলুম…লেখা তাহার মৃণাল ভুজবল্লরী দিয়া অজয়ের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। সাপের চেয়েও হিম-শীতল সে স্পর্শ নিষ্করুণভাবে অজয়ের মাংসের ভিতর যেন কাটিয়া বসিল। অজানিত ভয়ে আবার তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু যৌবনের গর্ব্ব অকস্মাৎ ভ্রূকুটি করিয়া উঠিল। সে ক্ষেপিয়া গেল নাকি? লেখাকে ভয় কি? অসুস্থ শরীরে বাড়ী ছাড়িয়া এতদূর আসিবার সঙ্গত কারণ নাও থাকিতে পারে—কিন্তু জ্বর-বিকার অসম্ভবকে সম্ভব করে। কে জানে লেখার…কিন্তু যদি তাই হয়…যদি মরণের…একটা অবিশ্বাসের কঠিন হাসি তাহার ঠোঁটের উপর দিয়া মিশাইয়া গেল!

কতকটা পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল—তোমার চিঠি পেয়েই এসেছি।

লেখা তাহার চোখের গাঢ় দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল। অজয় একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই অভিমান-ক্ষুন্ন-স্বরে কহিল—অন্যায় না হয় আমারই হয়েছে—কিন্তু তুমিও তো দু'দিন আগে চিঠি দিতে পারতে? ভুল আমি যতই করতে পারি—কিন্তু এও তো

জান তোমার ডাক অবহেলা আমি করতে পারি না—পারি কি ?

লেখার চোখ দুইটী ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। অস্পষ্ট অশ্রু-গাঢ়-স্বরে কহিল, পার না···কিন্তু অভিমানই আজ আমায়...

বল হরি হরিবোল !...বল হরি হরিবোল...

অন্তহীন প্রান্তরের একদিক্ হইতে সেই ভয়াবহ চীৎকারের ভীষণতা সহসা উভয়কে সচকিত করিয়া দিয়া গেল।

লেখা চঞ্চল হইয়া উঠিল। করুণ চোখ দুইটীর মিনতি-ভরা দৃষ্টি নিথর হইয়া আসিল। ব্যাকুল-কণ্ঠে সে কহিল, অজয়, আমি যাই···আমি···

অজয় তাহার মৃত্যু-শীতল হাতখানি চাপিয়া ধরিল। সেই ভয়াবহ শীতলতায় তাহার শরীর আর একবার শিহরিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠের স্বর আবার রুদ্ধ হইয়া গেল।

বল হরি হরিবোল !...বল হরি হরিবোল !···

লেখা অজয়ের হাত ছাড়াইয়া তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিল, আর না—অজয়...অজয় আমায় যেতে হ'বে...যেতে হ'বে...অজয়...হি হি হি হি ! —ত্রস্তপদে লেখা সম্মুখের সন্ধ্যার গাঢ় তিমিরাবৃত প্রান্তরের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। শুধু তাহার কণ্ঠের তীব্র হাস্য অজয়কে ভীত স্তব্ধ করিয়া দিয়া গেল।

সেই নিঃস্তব্ধ প্রান্তরের বক্ষ ভেদ করিয়া কতকগুলি অস্পষ্ট কণ্ঠের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল এবং অনতি-বিলম্বে পাশের আতা ঝোপের পাশ হইতে কয়েকটী লণ্ঠনের বাতির তীব্র আলোকরশ্মি অজয়ের চোখ মুখের উপর আসিয়া পড়িতেই তাহার চেতনা যেন ফিরিয়া আসিল।

বল হরি হরিবোল ;···বল হরি হরিবোল !···

শ্মশান-যাত্রীর দল একবারে অজয়ের সম্মুখে আসিয়া পড়িল এবং লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই অজয় চীৎকার করিয়া উঠিল—ভবতোষবাবু !

একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া আসিয়া লণ্ঠনটী উঁচু করিয়া ধরিয়া পলকমাত্র অজয়ের দিকে চাহিলেন, পরক্ষণেই উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন—লেখা...

অজয় বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—লেখা...

ভবতোষবাবু চোখের জল মুছিতে মুছিতে অশ্রুভারা-ক্রান্ত-কণ্ঠে কহিলেন—নেই ! অজয়—নেই !...আমার লেখা নেই !···মৃত্যু-সময় মা আমার তোমার কথা কতবারই না বলেছে···তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে, উঃ, মায়ের আমার সে কি কাকুতি ! কান্নার ক'দিন বিরাম ছিল না···কেঁদে কেঁদে মা আজ অপরাহ্নে···

তারপর ভবতোষবাবু কি বলিলেন না বলিলেন, তাহা অজয়ের ভয়স্তব্ধ কর্ণে প্রবেশ করিল কিনা বোঝা গেল না। শুধু একটা ভয়াবহ আর্ত্তনাদ রাত্রির বক্ষ ভেদ করিয়া দূর-দূরান্তের ঘুমন্ত পক্ষীশিশুকে পর্য্যন্ত আতঙ্কে জাগাইয়া দিয়া কোথায় বিলীন হইয়া গেল। অজয়ের চেতনা-বিহীন দেহ সেইখানে লুটাইয়া পড়িল।

কয়েক মাসের দীর্ঘ ব্যবধানে অজয়ের মন হইতে হয় তো সেই দিনের সেই ভয়াবহ চিত্র—লেখার শেষ-যাত্রার একান্ত করুণ দৃশ্য মিশাইয়া গিয়াছে। তাহার দৈনন্দিন সহজ জীবন-যাত্রায় সে সব কথার আর যেন কিছু ধরাছোঁয়া যায় না। লেখা মরিয়া যেন প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল—অজয়ের নিকটেও সে মরিয়াছে।

অতীব বিচিত্র এই মানুষের মন। ইহার সুখ-দুঃখের ইহার অনুরাগ-বিরাগের, ইহার বিরহ-মিলনের, ইহার আকাঙ্ক্ষা-বিতৃষ্ণার ইতিহাস আরও বিচিত্র। মনোরাজ্যে এই যে দুইটী বিপরীত ভাব ধারার নিরন্তর বিপ্লব—ইহা লইয়াই মানুষের জীবন। তাই মানুষ যখন অত্যন্ত প্রিয়জনকেও অনায়াসে ভুলিয়া যায়, কেহ তাহাতে বিস্মিত হয় না। আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে যখন সে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে, কেহ তাহাতে কথা বলে না—ইহাই মানুষের মন। এক সময় যাহাকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়, তাহাকেই আর এক সময় ভুলিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতার আর অন্ত থাকে না।

অজয় লেখার মৃত্যু-সমাধির উপর যবনিকা টানিয়া

দিবার জন্যই বোধ করি অকস্মাৎ বিবাহের চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল—অথচ, এই কাজটাই আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে কেহ সম্ভবপর বলিয়া মনে করে নাই।

বিবাহ বাড়ী—আনন্দ-মুখর।

উৎফুল্ল অজয় নিরালা ঘরে একাকী বসিয়া থাকিয়া অধীর আগ্রহে বোধ হয় শুভ-মিলনের প্রিয় মুহূর্ত্তটীর অপেক্ষা করিতেছিল।

বাহিরে তখন ফাল্গুনের আকাশ জুড়িয়া রূপালী জ্যোৎস্নার হাসি আর ধরিতেছিল না। গাছে গাছে কচি পাতাগুলি আনন্দে চিক্‌চিক্ করিতেছিল। আম্রমুকুলের মৃদু মধুর গন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত। জ্যোৎস্না-বিলাসী কোন একটা পাপিয়া আকাশতলে মদির-কণ্ঠে গাহিয়া গেল—পিয়া—পিউ—পিউ—

অজয়!

অকস্মাৎ কাহার ক্ষীণকণ্ঠের আহ্বানে চমকিয়া মুখ তুলিতেই পলকে অজয়ের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। তাহার বিস্মিত অপলক চোখ দুইটীর দৃষ্টিতে গভীর ভীতি বিরাজ করিতে লাগিল।

হি—হি—হি—হি! লেখা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠের হাসিতে প্রেতলোকের ভয়াবহ আতঙ্ক অজয়ের প্রতি রক্তকণায় বিচ্ছুরিত হইয়া তাহার বক্ষের ক্ষীণ স্পন্দনটুকুও বুঝি বা চিরতরে স্তব্ধ করিয়া দিল।

দুইটী ভয়ত্রস্ত চোখের দৃষ্টি মেলিয়া অজয় পাথরের মূর্ত্তির মত লেখার অসাড় অনড় দেহ এবং বরফের ন্যায় সাদা মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

লেখা 'ঝুপ্' করিয়া অজয়ের পাশে বসিয়া পড়িল। একবার পলকহীন চোখের দৃষ্টি মেলিয়া অজয়কে দেখিয়া লইয়া লেখা কহিল—সুমতি আমার চেয়েও সুন্দরী, না?......তাকে ভালবাস, না? ভাল বুঝি খুব বাসো—খু-উ-ব?

লেখার কণ্ঠের সেই বিকৃত স্বর অজয়ের বরফের মত জমিয়া যাওয়া হৃৎপিণ্ডের উপর আর্ত্তনাদ করিয়া আছড়াইয়া পড়িল। অজয় কোনরূপে তাহার ভয়-চকিত দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া দেখিল—লেখার চোখ দুইটী অশ্রু-সজল—তাহার সাদা মুখখানির উপর বেদনা সুস্পষ্ট!

অজয় কি বলিতে গেল—কিন্তু অনেক চেষ্টাও করিয়া বলিতে পারিল না।

লেখা অকস্মাৎ সেই আগের দিনের মত আবদারের সুরে বলিতে লাগিল—আমাকে কি বিয়ে কর্‌তে পার্‌তে না...পার্‌তে না? কয়েক মুহূর্ত্ত অজয়ের চোখের দিকে সে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর সুগভীর একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিল—তবে আমায় ভুলিয়েছিলে কেন...কেন আমায় স্পর্শ করে' আমার অন্তরে কামনা জাগিয়েছিলে...কেন উন্মাদ বাসনার সৃষ্টি করে'—আকণ্ঠ পিপাসা দিয়ে—আমার বুকে আগুন জেলে দিয়েছিলে?...আমি তোমার কি করেছিলুম—কেন তুমি আমায় মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আমার জীবনটা নষ্ট করে' দিলে?—আমাকে...লেখা দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া হাউ-হাউ করিয়া বুকভাঙা কান্না কাঁদিতে লাগিল।

অবসন্ন ভয়-কম্পিত শ্লথ হস্ত লেখার মাথার উপর রাখিয়া অজয় অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল—লেখা!

—লেখা? কে লেখা—তোমার লেখা মরেছে – মরেছে ...হি-হি-হি-হি!...লেখা মরেছে! যাও, তার মরণের চিতায় সুমতির আবাহন কর গে!...তুমি সুখী হও—সুখী হও!...তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল।

অজয় চমকিয়া ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিল—কেহ নাই—আগের মতই সে একা বসিয়া আছে। শুধু একটা দমকা বাতাসে লেখার অট্টহাস্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

তবে কি লেখা আসে নাই?...এ তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত একটা ভয়ার্ত্ত দুঃস্বপ্ন!...

কিন্তু তাহার ভয়-চঞ্চল দৃষ্টির সম্মুখে লেখার রক্তহীন বরফের মতো সাদা মুখখানি যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

সুমতি ঠিক বুঝিতে পারে না তাহার স্বামীর কি অসুখ। জ্বর নাই—ব্যাহ্যিক কোন্ রোগ লক্ষণও তাহার সতর্ক দৃষ্টিতে পড়ে না; অথচ, অজয় দিন দিন শুকাইয়া উঠিতেছে। তাহার সমস্ত মুখ চোখে যেন একটা সুগভীর আতঙ্ক পরিস্ফুট। আহারে সুখ নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই—সমস্ত দিনব্যাপিয়া কি যেন সে দেখে তাহার ব্যাকুল-নেত্রের বিহ্বল-দৃষ্টি কি দেখিয়া শিহরিয়া উঠে! সুমতি মিনতি করে, কতকথা জিজ্ঞাসা করে অজয় শুধু ম্লান হাসে। কিছু বলে না।

সুমতির ভারি দুঃখ।

অপরাহ্ণের ম্লান সূর্য্যালোকটুকু নিভিয়া আসিতেছে।

অজয় বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে গা ঢালিয়া দিয়া পড়িয়াছিল। সুমতি চায়ের বাটী আনিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল—চা খেয়ে নাও।

অজয় সুমতির সাজসজ্জার দিকে বারেক স্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া পরিহাস করিয়া কহিল—অভিসারে না কি?

সুমতির সুগৌর মুখখানি ডালিম ফুলের মতো আরক্ত হইয়া উঠিল। দুই চোখের চঞ্চল হাসিভরা দৃষ্টিতে অজয়কে পাগল করিয়া দিল। সে কহিল—যাও!

অজয় হাসিয়া কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, অকস্মাৎ তাহার হাত দুইটা সবেগে কাঁপিয়া উঠিয়া চায়ের বাটিটা স্খলিত হইয়া সানের উপর পড়িয়া গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সমস্ত মুখখানা মড়ার মত সাদা হইয়া গেল—তাহার সমস্ত শরীর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।...

সুমতি স্বামীর আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আতঙ্ক-দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না—অথচ কেমন একটা বিহ্বলতা তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত যেন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল—কি যে করিবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

অকস্মাৎ ইঞ্জিনের তীব্র 'হুইশিলে'র মতো সুতীব্র অট্টহাস্যে সুমতির পদনখর হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন ভয়ে শিহরিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

হি-হি-হি-হি!—এই বুঝি নতুন বউ!...লেখার ছায়া-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সুমতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা বিকৃত স্বর ফুটিয়া উঠিল—বাঃ, বেশ্ সুন্দরী তো!...না, অজয় দা', ঠকো নি...কিন্তু ...কিন্তু ওকি অমন করে' বসে' রয়েছো কেন? এস দু'জনে পাশাপাশি একবার দাঁড়াও, আমি দেখি।..

অজয় গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই একটা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া ইজিচেয়ার হইতে গড়াইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সুমতি ভয়ে আতঙ্কে প্রাণপণ চীৎকার করিয়া উঠিল—কিন্তু মনে হইলে বুঝি সে চীৎকার সে নিজেই শুনিতে পাইতেছে না। আবার চীৎকার করিয়া উঠিল। আবার ...জোরে...আরও জোরে...হায়রে, কে যেন তাহার গলাটা আজ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছে।...শুধু তাহার কাণ দুইটীর পাশে একটা বিকট হাসি বারেবারে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

সমস্ত শুনিয়া সুমতি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লানকণ্ঠে কহিল—বেশ, লেখাকে বিয়ে করলে না কেন?

অজয়ের চোখ দুইটী সজল হইয়া উঠিল। কহিল—লজ্জায় বাবাকে বল্‌তে পারি নে। মা থাক্‌লে হয় তো... তারপর বাবা মারা যাবার পর আর কোন বাধাই ছিল না.....কিন্তু......

লেখা সংশয়-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল—কিন্তু কি?

অজয় উদাস-কণ্ঠে কহিল—ঐ কিন্তুটা আজও আমি ভাল করে' বুঝ্‌তে পারি নি। নিজের কপালের দোষ ...দুরদৃষ্ট...নইলে ... ..

বাধা দিয়া সুমতি কহিল—কিন্তু লেখাও তো এসব জানতো—তোমার মিলনের পথে কতো বাধা। না জান্‌লেও বিস্তারিত তোমার লেখা উচিত ছিল।

অজয় তেমনিভাবে কহিল, লিখেও ছিলুম সব—ও আমাকে কোনদিন অবিশ্বাস করে নি—আমার একটা কথার উপর নির্ভর করে' ও মরণ পর্য্যন্ত বরণ করতে পারত। এ শিক্ষা আমিই ওকে দিয়েছিলুম—সে শিক্ষা মিথ্যেও হয় নি......আমার কথার উপর বিশ্বাস করে'......

—কিন্তু অমন করে' ম'লো কেন? তুমি তো তাকে কখনও প্রত্যাখ্যান করো নি?

—তা' করি নি। কিন্তু এরই মধ্যে মামা এসে এক গোল বাধালেন। মামীমার কোন্ বোনের এক রূপসী মেয়ে—কথাটা আর গোপন রইলো না।

—অজয়ের দুই চোখ বহিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সুমতির চোখও শুষ্ক রহিল না।

বাহিরে তখন সুনীল আকাশ জুড়িয়া রৌদ্র চিক্‌চিক্ করিতেছে। সেইদিকে কিয়ৎকাল নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে মুখ ফিরাইয়া অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার কণ্ঠে অজয় কহিল—তোমার ভয় কর্‌ছে, না সুমু?

সুমতি চমকিয়া উঠিল। ম্লান হাসি টানিয়া কহিল—তুমি থাক্‌তে ভয় কি?

অজয় ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুমতির হাত ধরিয়া টানিয়া প্রায় বুকের কাছে আনিয়া তাহার ম্লান মুখ উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া পরিহাস-তরল-কণ্ঠে বলিল—এই মুখখানা......কিন্তু সবটা শেষ করিতে পারিল না। অজয়ের গায়ে গাত্র স্পর্শ হওয়ায়—সুমতি চমকিয়া উঠিয়া কহিল—এ কি! এ যে পুড়ে যাচ্ছে—জর হয়েছে নাকি? বলিয়া ভাল করিয়া তাহার কপালের উষ্ণতা পরীক্ষা করিতে গিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

অজয় সুমতির ভাব দেখিয়া হাসিল। কহিল—ও তো আমার রোজই হয়—একটুতেই তোমার যে ভয়......

কিন্তু স্বামীর কথায় সুমতির মনের ভয় গেল না। বুকের ভিতর যেন কেমন হা হা করিয়া উঠিল। স্বামীর তো পূর্ব্বেও জর হইয়াছে—কিন্তু অন্তরের মধ্যে এখন হাহাকার তো সে কোনদিন শুনিতে পাই নাই।

আতঙ্ক-কম্পিত-কণ্ঠে সে স্বামীকে কহিল কিসে যে তোমার হাসি আসে—রেধোকে পাঠিয়ে দি'—ডাক্তার আনুক।

অজয় আবার হাসিল। নানাভাবে সুমতিকে প্রবোধ দিল—সামান্য একটু জর—জরও ঠিক্ নহে,মাত্র গাটা একটু গরম হইয়াছে। এ তো সবারই হয়—এরই জন্য অতো উতলা কেন? তেমন কিছু হয়, না হয় ভোরে......

কিন্তু তাহার সমস্ত কথা ওলট-পালট করিয়া দিয়া রাত্রেই ভীষণ জর তাহাকে পাগল করিয়া দিল। ভোরে ডাক্তার আসিল—ঔষধের ব্যবস্থা হইল। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। দেব-দেবীর কাছে সুমতি মাথা কুটিতে লাগিল—কিন্তু অজয়ের অবস্থা ক্রমশঃ যেন খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। দিবারাত্রি জ্ঞান নাই—কি যে ভুল বকিতেছে...

সুমতি বুঝিল, তাহার কপাল পুড়িয়াছে। জোর করিয়া লেখার স্বামীকে সে দখল করিয়াছিল, আর কিছু নয়, লেখাই আজ সেই দখল উল্টাইতে বসিয়াছে। ঔষধ-পত্র ডাক্তার-কবিরাজে এ রোগের কিছু করিতে পারিবে না। যাহার জিনিষ সে লইতে আসিয়াছে—মানুষ কি করিয়া ঠেকাইবে।

দেবতার অঙ্গনে অসহায় সুমতি মাথা কুটিতে লাগিল।...

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গাঢ় তিমিরে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন! দূরে, নিকটে, লতাপাতার গাঢ় কালো ছায়ায় ছায়ায় অশরীরি আত্মার মতো জোনাকীগুলা জলিয়া জলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সুমতি দীর্ঘকাল তুলসী-মঞ্চে মাথা কুটিয়া গললগ্নীকৃত-বাসে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুইটী চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত—স্ফীত। কোমল বুকখানি অব্যক্ত ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে কখন কখন কাঁপিয়া উঠিতেছে।

সুমতি উঠিয়া অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া অলক্ষ্য দেবতার উদ্দেশে অন্তরের সমস্ত বেদনা ঢালিয়া দিয়া অশ্রুধারায় প্রার্থনা করিল—হে ভগবান, আমাকে নাও... ওঁকে নিরাময় করো—ওকে শান্তি দাও!......

—সুমতি, বোস্!

একটী চাপা ফিস্‌ফিস্ ডাকে সুমতি চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শিহরিয়া উঠিল। লেখার সমস্ত শরীর যেন গাঢ় অন্ধকারের সহিত লেপিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—

শুধু দুইটী চোখের সুতীব্র দৃষ্টি এই গাঢ় অন্ধকারে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া বিদ্যুতের মতো জ্বলিতেছে।

সুমতি 'কাঠ' হইয়া গেল। তাহার হাত পা সমস্ত যেন অবশ ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া গিয়া একেবারে মাটির সহিত আঁটিয়া গেল।

লেখা একটু সরিয়া আসিল। মিনতি করিয়া কহিল—সুমতি, বোন্, আমাকে ভয় কর কেন? যাক্, অজয় কেমন আছে?

সুমতির সাহস ফিরিয়া আসিল। কেমন একটা ক্রোধে, একটা অজানিত জিঘাংসায় তাহার অন্তর বিষাইয়া উঠিল। লেখা যে মানুষ নয়—তাহাকে যথেষ্ট ভয় করিবার আছে একথা সুমতি একেবারে ভুলিয়া গেল। শুধু তাহার মনে হইল, লেখা তাহারই মতো নারী, সে তাহার সুখের সংসার নষ্ট করিতে আসিয়াছে.. তাহার সোণার সংসারে আগুন লাগাইতে বসিয়াছে···তাহার স্বামীকে...

ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে সুমতি কহিল—দিন দিন তাকে চুষে খেয়েই ফেল্‌ছো, শুধু জীবনটুকু—সেও তো আজ...

লেখা যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠ দিয়া আজ সেই অট্টহাসি ফাটিয়া পড়িল না। যেন মানুষের ন্যায় কাতর-কণ্ঠে কহিল—কি করেছি আজ...নিতে এসেছি...

সুমতি দাঁতে দাঁত রাখিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল—তাই সর্ব্বনাশী—রাক্ষুসী...

লেখা হাসিয়া উঠিল—বড় ম্লান সে হাসি—বড় করুণ! কহিল—সর্ব্বনাশী—রাক্ষুসী...তাই—তাই বোন্, তাই। কি চোখেই ওঁকে দেখেছিলুম, মরেও ভুলতে পারলুম না! ওঁর সর্ব্বনাশ করলুম, তোমার করলুম, নিজের ...তারপর হঠাৎ ব্যাকুলভাবে কহিল—কিন্তু সত্যিই কি বাঁচ্‌বে না দিদি...

সুমতির চোখেও কি জানি কেন জল আসিয়া পড়িল। রাগ করিয়া যাহাকে বকিবে, দু'কথা শোনাইয়া দিবে মনে করিয়াছিল, তাহারই ব্যাকুল অশ্রু-কাতরস্বরে তাহার কোমল নারী-হৃদয় কেমন কাঁদিয়া উঠিল। সুমতি নিরুত্তরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

লেখা অধৈর্য্য হইল। কাঁদিয়া কহিল—সুমতি!

সুমতি আঁচল দিয় চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল—বাঁচ্‌বে···যদি তুমি আর না আস...আর না তাঁকে দেখা দাও···

লেখার সমস্ত মুখখানির ওপর অব্যক্ত যন্ত্রণা, অপরিসীম বেদনা ফুটিয়া উঠিল। সুমতি কাতর হইয়া উঠিল। গল্পে সে অনেক শুনিয়াছে, রূপ-কথায় অনেক পড়িয়াছে, কিন্তু অশরীরি আত্মার এই বিরহ-মলিন মুখের অবর্ণনীয় কাতরতা আজ সত্য-সত্যই চক্ষে দেখিল। সে অপরিসীম বেদনায় নির্ব্বাক বিস্ময়ে লেখার মুখের দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

লেখা কতকটা আত্মগতভাবেই যেন অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল—আর তাঁকে না দেখা দিই···সুমতি, বোন্, তাই হ'বে। আর আস্‌বো না—বুক ফেটে গেলেও আর দেখা দেবো না। ওকে দেখো দিদি...ও যে...কিন্তু এই ফুল দু'টি—ওর কপালে ছুঁইয়ে ওর বালিশের তলায় রেখে দিও···না-না-না, এ খারাপ কিছু নয়—দেবতার নির্ম্মাল্য—এতেই ও সেরে যাবে—মনের ভয় কেটে যাবে ...একবার দিদি···না...না...আর নয়...তুমি সুখী হও ভাই!···

সুমতি সভয়ে দেখিল—অকস্মাৎ যেমন অতল কালো অন্ধকার হইতে লেখা ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি সেই অতল অন্ধকারে চক্ষের পলকে মিশিয়া গেল—তাহার চিহ্ন মাত্র নাই...শুধু সেই ফুল দুইটী লেখার আগমনের সাক্ষীস্বরূপ তখনও তাহার হাতের মধ্যে তেমনিভাবে ধরা আছে।

অজয় সারিয়া উঠিল।

সেই হইতে আর লেখা আসে নাই। কতদিন গিয়াছে—কত রাত্রির অন্ধকার বুকের উপর দুরন্ত মেঘ ঝড়-বৃষ্টির সাথে মাতামাতি করিয়াছে, ঘরের ভিতর হইতে সুমতি কাণ পাতিয়া কি শুনিয়াছে, কখন কখন ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছে। অজয় হাসিয়া সুমতিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সোহাগভরা-কণ্ঠে বলিয়াছে—কি ভীতু! বাইরে ঝড় হচ্ছে, বৃষ্টি পড়্‌ছে তারই শব্দ। আর তুমি কি না—সুমতি তাহা বিশ্বাস করে নাই। তাহার কর্ণে কর্ণে লেখার বুকফাটা ক্রন্দোনচ্ছ্বাস ভাসিয়া উঠে—তাহার সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস সে যেন আজও স্পষ্ট শুনিতে পায়। বাহিরে বাতাসের গোঁঙানি—বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দে সুমতি শিহরিয়া উঠিয়া মনে করে—লেখাই বুঝি তাহার অতৃপ্ত হৃদয়ের মরু-তৃষ্ণা লইয়া এই বাড়ীটার চারিধারে অমন করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!...

ভীতা সুমতি তন্দ্রা-জড়িত চক্ষে আরও ভয়ে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া শিহরিয়া উঠে।...···

মণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

পুরাতনের পরিচয়

সে কালের দারোগার কাহিনী

চোর বড়, ন', দারোগা বড় ?

চোরের অনুসন্ধান শক্তি যে কত তীক্ষ্ণ এবং অব্যর্থ, তাহা যাঁহারা সে কর্ম্মের কর্ম্মী নহেন, তাঁহারা সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে পারেন না।

আমাকে একজন অতি বিশ্বস্ত ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার বাসস্থানের নিকট এক গ্রামে ইদাজোলা নামক একজন অতি বৃদ্ধ মনুষ্য ছিল; তাহার বয়স প্রায় আশী বৎসর হইয়াছিল। পূর্ব্বে সে এমন চোর ও ডাকাইত ছিল, যে তাহার জীবনের অধিকাংশ কাল জেলখানায় অতিবাহিত হইয়াছিল; ইদা যখন কারাগার হইতে মুক্ত হইত, তখন সে অন্যান্য কয়েদিদিগকে বলিয়া আসিত যে "ভাই দেখিস্, তোরা যেন আমার ভাতের হাঁড়িটা নষ্ট করিস্ না, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি"। বাস্তবিকও সে জেলখানা হইতে নির্গত হইয়া, কখন দশ পনের দিবস এবং অধিক হইলেও দুই তিন মাস বাহিরে থাকিয়া, পুনরায় দুষ্কর্ম্ম করিয়া কারাবদ্ধ হইত। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে শক্তিহীন হইয়া সে চুরি ডাকাইতি হইতে ক্ষান্ত হয়। এই সময় তাহার হাঁপানী কাশীর পীড়া হওয়াতে এবং কবিরাজে ভাল পুরাতন ঘৃত ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়াতে, ইদা ঐ পুরাতন ঘৃতের জন্য সেই ভদ্রলোকটীর নিকট আসিল; তিনি জানিতেন যে তাঁহার নিকট ঐ দ্রব্য নাই, তাহাতে ইদা বলিল যে "কি ঠাকুর? আপনি আমাকে কি জন্য প্রবঞ্চনা করিতেছেন? আমি নিশ্চয় জানি যে আপনার ঘরে যেমন পুরাতন ঘৃত আছে, এমন অন্য কোন স্থানে নাই"। তাহাতেও তিনি সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করাতে, ইদা জোলা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া বলিল যে "আপনি যদি সত্য সত্যই পুরাতন ঘৃতের বিষয় অনবগত থাকেন, তাহা হইলে আপনি যাইয়া আপনার অমুক ঘরে অমুকদিগের কোণের নিকট মাটি খুঁড়িয়া দেখুন, এক ভাঁড় বহুকালের ঘৃত পাইবেন"। গৃহস্বামী সেইস্থানে অনুসন্ধান করাতে যথার্থ ঘৃত আবিষ্কৃত হইল। ইদা কহিল, যে সে অবগত ছিল, যে সেই ভদ্রলোকের পিতামহ তাঁহার নিজের পীড়ার জন্য সেইস্থানে ঘৃত পুরাতন করিবার জন্য একটা ভাঁড়ে মাটির মধ্যে এক সের ভাল গাওয়া ঘৃত পুঁতিয়া রাখিয়া ছিলেন। দেখুন গৃহস্বামী নিজে যাহা জানিতেন না, তাহা ভিন্ন গ্রামের একজন চোরে জানিত। ইহা ত গেল আমার শুনা কথা, চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাও বড় সামান্য নহে। বিবৃত করিতেছি; কৃষ্ণনগরের পূর্ব্ব প্রান্তে এক বেটা কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত যুগী ছিল; দেখিতে দরিদ্র, দুই খানা পুরাতন জীর্ণ চালা ঘর মাত্র তাহার বিত্ত, এবং পরিবারের মধ্যে কেবল এক বিধবা ভগিনী। লোক দেখান দুই এক জোড়া নূতন কাপড় বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিত। প্রতিবাসীরাও সকলে তাহাকে বিত্তহীন এবং ধনহীন বলিয়া জানিত, কিন্তু একজন চোর জানিতে পারিয়াছিল, যে "ইহার ধুকড়ির ভিতর খাসা চাউল আছে"। একরাত্রে দশ পনের জন অস্ত্রধারী মনুষ্য তাহার গৃহ আক্রমণ করিয়া লইয়া যায়। প্রাতে আমার নিকট সংবাদ আসিলে আমি ঘটনার স্থানে যাইয়া যুগীর ঘর বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না যে নিকটে অনেক সঙ্গতিপন্ন লোকের বাড়ী থাকিলেও ডাকাইতেরা কি জন্য সেই সকল বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া এমন দরিদ্রের বাড়ী ডাকাইতি করিতে আসিল। যুগীও প্রথমে আমার নিকটে সকল

কথা ভাঙ্গিয়া বলিল না; কিন্তু তাহার ভগিনীর পরামর্শে সে অবশেষে প্রকাশ করিল, যে অন্যান্য স্থানে তাহার কাপড়ের ব্যবসা আছে এবং তদ্দ্বারা সে অনেক নগদ সম্পত্তি আহরণ করিয়া তাহার এই দুই ভাঙ্গা গৃহে মাটির ভিতর গোপন করিয়া রাখিয়াছিল এবং ডাকাইতেরা তাহা জানিতে পারিয়া প্রায় সহস্রাধিক টাকার মূল্যের বস্ত্র ও সোণা রূপার গহনা ও নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তির দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, তাহা সে বলিতে পারে না; ডাকাইতেরা মুখে কালী চূণ মাখিয়া আসিয়াছিল সুতরাং সে কাহাকেও চিনিতে পারে নাই।

যদিও এই ডাকাতি কৃষ্ণনগরের একপ্রান্তে হইয়াছিল তথাপি নগরের সীমানার মধ্যে হওয়াতে আমার ও অধিবাসীগণের অত্যন্ত আতঙ্ক হইল; ভাবিলাম যে এই কার্য্যের কর্ত্তাদিগকে ধৃত করিতে এবং শাস্তি দিতে না পারিলে, তাহারা যে পুনরায় অন্যদিকে এবং অন্যের বাড়ীতে হস্ত-প্রসারণ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব আমার চর অনুচরদিগকে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলাম। আমি প্রত্যহ দুই বেলা যুগীর বাড়ীতে যাইয়া তাহার প্রতিবাসীদিগের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিতাম কিন্তু দুই তিন দিবস নিষ্ফলরূপে কাটিয়া গেল, কিছুই করিতে পারিলাম না। এক দিন প্রাতে আমি যুগীর বাড়ী ঐরূপ যাইতেছিলাম, দেখিলাম যে নেঙটিয়া সেখ নামক একজন প্রতিবেশী পথের মধ্যে আমাকে দেখিয়া বিলক্ষণ সঙ্কুচিত চিত্তে অন্য দিকে যাইবার চেষ্টা করিল। যদিও আমি বেশ জানিতাম যে দারোগা দেখিলে ইতর লোক স্বভাবত সঙ্কুচিত হইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে, তথাপি সেই সময়ে নেঙটিয়ার ঐরূপ ভীরুভাব দেখিয়া আমার মনে হঠাৎ এক প্রকার সন্দেহ হইল। তাহাকে ডাকিয়া সে কি জন্য আমাকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে, জিজ্ঞাসা করাতে সে ভালরূপে আমার কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইল এবং আমার বোধ হইল, যেন তাহার কথাগুলি তাহার গলায় বাধিয়া থাকিতেছে, মুক্তকণ্ঠে কথা কহিতে পারিতেছে না। আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ রাগান্ধভাবে "কোথায় যাইতেছিস্" বলিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে মাটির দিকে তাকাইয়া বলিল "যে মহারাজ আমি চুরি করি নাই"। আমার সঙ্গে আমার প্রধান গোয়েন্দা বুদ্ধু বরকন্দাজ ছিল; সে নেঙটিয়ার কথা শুনিয়া "ঠাকুর ঘরে কে? না আমি কলা খাই নে; তুই চুরি করিস্ নাই, তবে কে করিয়াছে রে ব্যাটা? চল্ আমার সঙ্গে থানাতে চল্, এখনি দেখাইয়া দিব, কেমন তুই চুরি করিস নাই" বলিয়া সে নেঙটিয়ার হাত ধরাতে নেঙটিয়া আমার পা ধরিয়া বলিল যে "দোহাই দারোগা মহাশয়! আমাকে মারিবেন না, আমি যাহা জানি বলিতেছি"! ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিল এবং তাহার ঘর হইতে অপহৃত দ্রব্যের সে যে অংশ পাইয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া দিতে সম্মত হইল। আমরা যুগীকে সঙ্গে লইয়া নেঙটিয়ার গৃহে যাওয়াতে, তাহার ঘরের মধ্য হইতে একটা বড় হাঁড়ীতে চাউল দ্বারা আচ্ছাদিত কয়েক জোড়া নূতন বস্ত্র বাহির করিয়া দিল এবং যুগীও তাহা তাহার দ্রব্য বলিয়া চিহ্নিত করিল। নেঙটিয়া যে সকল ব্যক্তির নাম করে, তাহাদের সকলের নিকট অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গেল এবং সকলেই বলিল যে চিত্রশালী নিরাসী মুন্সী সেখ নামক এক ব্যক্তি তাহাদের সর্দ্দার ছিল এবং অপহৃত সোণা রূপার অধিকাংশ দ্রব্য তাহারই নিকট আছে।

মুন্সী সেখ থানায় ধৃত হইয়া আসিবামাত্রই তাহার অপরাধ স্বীকার করিল এবং বলিল যে তাহার নিকট কোন অপহৃত দ্রব্য নাই, তবে তাহার সঙ্গীগণ তাহাদের নিজ নিজ অপরাধ লাঘব করার উদ্দেশ্যে তাহার নাম করিয়াছে। ফলে মুন্সীর ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইল, যে সে যাহা বলিয়াছে, তাহাই যথার্থ, প্রবঞ্চনা নহে। আমি তাহার কথাগুলি যথাবিধি লিপিবদ্ধ করিয়া সেই লিপিসহ তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

তখন বি পামর নামে একজন যুবা সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি বহুকাল পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়া এইবার প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার ক অক্ষরও তিনি জানিতেন না, কিন্তু হিন্দিতে তাঁহার বিলক্ষণ দখল ছিল। চরিত্রও খুব তেজস্বী ছিল।

প্রজাদিগের যাহাতে শান্তি হয় এবং বদমায়েস এবং কুচরিত্রের লোকেরা যাহাতে দমন থাকে; তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি এক দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় অশ্ব পৃষ্ঠে সমস্ত কৃষ্ণনগর ভ্রমণ করিয়া থানায় উপস্থিত হইলেন এবং নগরের কোন স্থানে কোন গোলমাল দেখিতে না পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এক অশ্বের উপরে বসিয়া তিনি এক ঘণ্টা কাল আমাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন। তাহার মধ্যে একটি উপদেশ তিনি বারম্বার উল্লেখ করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে বলিয়াছিলেন এবং তাহা এই যে "Daroga, never show your teeth before you bite." অর্থাৎ "দারোগা কামড়াইবার পূর্ব্বে কখন দাঁত দেখাইও না"।

এই মাজিষ্ট্রেটের নিকট আমি মুন্সীকে তাহার একরার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলাম। আইনের নিয়ম ছিল এবং তাহা অন্যান্য সকল মাজিষ্ট্রেটকে অনুসরণ করিতে দেখিয়াছিলাম, যে থানা হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকৃত কিম্বা অস্বীকৃত জবাবের সহিত একবার মাজিষ্ট্রেটের নিকট থানা হইতে প্রেরিত হইলে, সে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া সেই জবাবের পোষকতা করুক, কিম্বা না করুক, সে আর থানায় পুনঃপ্রেরিত না হইয়া, হাজতে প্রেরিত হইত কিম্বা জামিন দিয়া শেষ বিচার পর্য্যন্ত মুক্ত থাকিতে পাইত। কিন্তু পামর সাহেবকে তাহার বিপরীত করিতে দেখিলাম। মুন্সী সেখকে কাছারি পাঠাইবার কিছুকাল পরেই দেখিলাম, যে বরকন্দাজ তাহাকে লইয়া পুনরায় থানায় আনিল এবং প্রকাশ করিল যে সাহেবের নিকট মুন্সী উপস্থিত হইয়া তাহার অপরাধ অস্বীকার করাতে, তিনি বিরক্ত হইয়া আমলাদিগকে বলিলেন, যে "দারোগা, আমার নিকট কি আসামি পাঠাইয়াছে? এ দেখিতেছি, একরার করে না; তবে ইহাকে আমার নিকট পাঠাইবার আবশ্যক কি ছিল? ইহাকে পুনরায় থানায় পাঠাইয়া দেও"। তখন আমি বুঝিলাম, যে মুন্সী সেখকে আমি যেরূপ সরল ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম, সে সেরূপ নহে; অতএব তাহাকে খুব করিয়া প্রহার করিতে বরকন্দাজদিগকে শিখাইয়া দিলাম। পর দিবস প্রাতে মুন্সী পুনরায় কাছারিতে যাইয়া যথার্থ কথা বলিতে চাহিবায়, আমি তাহাকে পুনরায় সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম, কিন্তু পুনরায় মুন্সী তঞ্চকতা ব্যবহার করাতে সাহেব তাহাকে আবার আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মুন্সীকে এইরূপ উপর্য্যুপরি দুইবার তঞ্চকতা ব্যবহার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে ব্যক্ত করিল যে "আমি জানিতাম, যে পুলিশ-আমলারা আসামিকে একরার করাইবার নিমিত্ত থানায় যন্ত্রণা দিয়া থাকে, কিন্তু একরার করুক কিম্বা না করুক, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে হাজতে প্রেরণ করেন এবং হাজতে গেলে আসামির কারারুদ্ধ থাকা ভিন্ন অন্য কোন কষ্ট কিম্বা জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না। আরও আমি জানিতাম যে শুদ্ধ একরার করাইবার এবং চোরা মাল পাওয়ার নিমিত্ত পুলিশ আমলারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দিয়া থাকেন, আসামী একরার করিলে কিম্বা মাল বাহির করিয়া দিলে, তাহাকে থানায় কোন কষ্ট পাইতে হয় না। অতএব আমি থানায় আসিবা মাত্রই একরার করিয়াছিলাম এবং আপনিও তজ্জন্য প্রথমে আমাকে কোন কষ্ট না দিয়া কাছারিতে চালান করিয়া দিয়াছিলেন। আমি মনে জানিতাম, সেইখানে যাইয়া অস্বীকার করিলে আমার থানার একরার বৃথা হইয়া যাইবে এবং আমি হাজতে প্রেরিত হইব; কিন্তু আমার কপালে তাহা ঘটিয়া উঠিল না, সাহেব দুইবার আমাকে থানায় পুনঃপ্রেরণ করিয়াছেন। নূতন রকমের আইন হইয়াছে না কি? নচেৎ কেন এইরূপ হইল! যাহা হউক, সাহেব আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনার যাহা করিতে হয় করিয়া দেখুন"। আমিও তাহাকে বরকন্দাজের গারদে এক দিন এক রাত্র সম্পূর্ণরূপে উপবাসী রাখিলাম, কত ছিদ্দৎ করিলাম এবং তাহার প্রতি আর যে সকল ব্যবহার করিলাম, তাহা এক্ষণে লিখিতে লজ্জা বোধ হয়। হা পরমেশ্বর! সেই সকল নিষ্ঠুরাচরণের নিমিত্ত বুঝি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার ফল ভোগ করিতেছি! **"বরমেব ভিক্ষা তরু তলে বাস" তথাপি যেন ভদ্রসন্তানেরা পুলিশের চাকরি না করেন!!!**

এইরূপ দুই তিন দিবস ধরিয়া ব্যবহার করিলাম, কিন্তু

মুন্সী সেখ অটল হইয়া রহিল। খাইতে না পাইলে, খাইতে চাহে না এবং প্রহার করিলে নিষেধ করে না। অবশেষে আমি বিরক্ত হইয়া এক নির্জ্জন সময়ে মুন্সীকে হিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া নানা প্রকার বুঝাইলাম এবং বলিলাম যে "দেখ্ মুন্সী, আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবহার করিতেছি, কি করিব, যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছাড়েন না, তখন তোর একরার করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই"। তাহাতে মুন্সী সেখ যে উত্তর করিল তাহা শুনিয়া পাঠকগণ অবশ্যই আশ্চর্য্য হইবেন এবং সে কত বড় দরের চোর তাহাও বুঝিতে পারিবেন। এত দীর্ঘকাল পরে, আমার তাহার বাক্যগুলি ঠিক স্মরণ নাই, মর্ম্ম প্রকটন করিতেছি শ্রবণ করুন। "আমি নূতন কিম্বা কাঁচা চোর নহি, আমার এক্ষণে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স হইল কিন্তু ইহার মধ্যে আমি চুরি ডাকাইতি ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম করি নাই, অতএব ভালরূপে আমি জানি, যে আমি নিজে অপরাধ স্বীকার না করিলে কিম্বা মাল বাহির করিয়া না দিলে, আমার সহস্র সঙ্গী তাহাদের স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিলে, জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার কিছু করিতে পারিবেন না, আমি সেই জন্য কখনও একরার করি নাই এবং তন্নিমিত্ত কখনও দণ্ডনীয় হই নাই। আমি অনেক জেলায় বড় বড় গুরুতর মোকদ্দমায় ধৃত হইয়া অনেক দারোগার হস্তে মার খাইয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দারোগা আমাকে একরার করাইতে পারেন নাই"। এই স্থানে সে তাহার জানুর কাপড় উঠাইয়া কএকটা কাল দাগ দেখাইয়া বলিল যে "এই দেখুন যশোর জেলার এক ব্যাটা পাপিষ্ঠ মুসলমান দারোগা তামাকের গুল পোড়াইয়া আমার জানুতে চাপিয়া ধরিয়াছিল। আমার জানুর মাংস চড়্‌চড়্ করিয়া পুড়িয়া দুর্গন্ধ বাহির হইল, আমি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলাম বটে কিন্তু একরার করি নাই। পাবনার বিখ্যাত মৌলবী ওয়াসফদ্দীন দারোগা এক্ষণে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন; তিনি আমার হস্তের নখের ভিতর কাঁটা ফুটাইয়া দিয়াছেন, তাহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; আর অন্যান্য কত দারোগার কাছে কত প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা আমি কত বলিব! কিন্তু কেহ আমাকে দিয়া একরার করিয়া লইতে পারেন নাই। এক্ষণে আপনার হস্তে পড়িয়াছি, দেখি আপনিই বা কি করিতে পারেন? আপনারও বড় নাম শুনিয়াছি, দেখিব যে চোর বড়, কি দারোগা বড়? কিন্তু আপনি ধ্রুব জানিবেন যে মারপিট করিয়া আমাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না, প্রহার আমার শরীরে বিলক্ষণ সহ্য হয়, তবে অন্য কোন মন্ত্র দ্বারা যদি আপনি চোর অপেক্ষা বড় হইতে পারেন, তাহা অনায়াসে চেষ্টা করিতে পারেন"। এই কথোপকথনের পরে মুন্সীকে যন্ত্রণা দেওয়া অনর্থক বিবেচনা করিয়া আমি বরকন্দাজদিগকে নিষেধ করিয়া দিলাম কিন্তু সমস্ত রাত্র আমার মনে ঐ চিন্তা জাগরুক রহিল। ভাবিলাম যে এই দস্যু ব্যাটা যদি আমাদের হস্তে নিষ্কৃতি পাইয়া যায়, তাহা হইলে বড় লজ্জা ও বিপদের বিষয়। লজ্জা আমার, বিপদ সমাজের।

পর দিবস বুধবার থানায় গ্রাম্য চৌকিদারেরা হাজিরা দিতে আসিয়াছিল; তাহার মধ্যে মুন্সীর নিজ গ্রামের চৌকিদারকে দেখিয়া হঠাৎ আমার মনে কি এক ভাব উদয় হওয়াতে, আমি তাহাকে মুন্সীর পরিবারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে সে কহিল যে মুন্সীর বিবাহিতা স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বহু কাল হইল স্থানান্তর চলিয়া গিয়াছে এবং মুন্সী তাহার পরিবর্ত্তে আর একটী স্ত্রী লোককে নিকা করিয়া চিত্রশালী গ্রামের প্রান্তে এক ঘর উঠাইয়া তাহাকে লইয়া বাস করে। মুন্সীর বাড়ীতে কেবল তাহার মাতা থাকে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমি সেই চৌকীদারের সঙ্গে একজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া মুন্সীর নিকার স্ত্রীকে থানায় আনিতে আদেশ করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেই স্ত্রী লোকটি থানায় উপস্থিত হওয়াতে দেখিলাম, যে সে ভদ্র লোকের মেয়ের ন্যায় দেখিতে সুশ্রী এবং বয়সও কুড়ি বাইশ বৎসরের অধিক নহে; ক্রোড়ে একটি ছয় মাসের শিশু কন্যা। মুন্সীর স্ত্রী আমাকে দেখিয়া আমার পায়ের উপরে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল যে "আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, মুন্সী বদমায়েস,

নিকার আগে জানিতে পারিলে আমি কখন তাহাকে বিবাহ করিতাম না, মুন্সীর মাতাই সকল অনর্থের মূল এবং সেই জন্য আমার শাশুড়ির সহিত আমার বনিবনাও না হওয়াতে মুন্সী আমাকে গ্রামের বাহিরে স্বতন্ত্র ঘর করিয়া দিয়াছে; আমি মুন্সীকে চুরী ডাকাইতি করিতে নিষেধ করিয়া থাকি বলিয়া সে আমার নিকট সকল কথা গোপন করে। আমার কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিতেছি যে আমি কিছুই জানি না, আমার শাশুড়ীকে আপনি ধরিয়া আনিয়া খুব শাস্তি দিলেই সকল কথা তাহার নিকট জানিতে পারিবেন"। এই স্ত্রী লোকের কথার উপরে আস্থা করিয়া তাহাকে ভাল স্থানে রাখাইয়া মুন্সীর মাতাকে আনিতে পাঠাইলাম। পর দিবস সকাল বেলায় মুন্সীর মাতা আমার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিলাম, যে তাহার ক্লিষ্টা শরীর, চক্ষু কোটরস্থ; সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল না। তাহার নিকট মুন্সীর স্ত্রীকে উপস্থিত করিলে উভয়ে ভারি বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল। শাশুড়িকে বৌ চোরণী এবং বৌকে শাশুড়ি বেশ্যা বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল। অবশেষে মুন্সীর স্ত্রীকে স্থানান্তর করিয়া তাহার শাশুড়িকে ধমকাইতে লাগিলাম এবং থানায় তুড়ুমের নিকট টানিয়া লইলাম। তুড়ুম জিনিসটা কি, তাহা বোধ হয় আমার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে জানেন না। তুড়ুম্ শব্দ ফরাসিস ভাষা, ইংরাজিতে ইহাতে stocks বলে। দুইখানা লম্বা ভারি কাষ্ঠ এক দিগে শক্ত লোহার কব্জা দ্বারা আবদ্ধ, অন্য দিক খোলা; কিন্তু ইচ্ছা করিলে শিকলের দ্বারা বন্ধ করা যায়। এই খোলাদিগের মাথা ধরিয়া উপরের কাষ্ঠকে উঠান নামান যাইতে পারে। প্রত্যেক কাষ্ঠেই কয়েকটি অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় এমন ভাবে ছিদ্র করা আছে যে একখানা কাষ্ঠের উপরে দ্বিতীয় খানা পাতিলে, দুই ছিদ্রে একটা গোলাকার ছিদ্র হয়। আসামিকে বসাইয়া কিম্বা শুয়াইয়া তাহার দুই পা একখানি কাষ্ঠের দুই ছিদ্রের ভিতরে রাখিয়া উপরের কাষ্ঠ দ্বারা তাহা চাপা দিলে পা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয় এবং আসামি আর নড়িতে পারে না। বিশেষ কষ্ট দেওয়ার মানস থাকিলে, পার্শ্ববর্ত্তী দুই ছিদ্রে পা না দিয়া এক ছিদ্র মধ্যে রাখিয়া অন্তরের দুই ছিদ্রে পা আটকাইলে মানুষের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। রাত্রিকালে দুরন্ত আসামিদিগকে নিশ্চিন্তরূপে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত সকল থানাতেই ইহার এক একটা তুড়ুম্ ছিল। মুন্সীর মাতাকে এই তুড়ুমের নিকট আনিয়া তাহার উপরিভাগের কাষ্ঠটা টানিয়া উঠাইয়া নিম্ন কাষ্ঠের উপরে ছাড়িয়া দিলাম; তাহাতে ঝন্ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে মুন্সীর মাতা কাঁপিয়া উঠিল এবং আমিও তাহাকে রাগান্ধভাবে বলিলাম যে "দেখ বেটী, তুই যদি এই যুগীর দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া না দিস্ তাহা হইলে, এই তুড়ুমের মধ্যে এক ফুকর অন্তরে তোর পা আটকাইয়া ফেলিয়া রাখিব এবং সমস্ত দিন তোকে প্রহার করিব"! মুন্সীর মাতা আমার রাগান্ধ ভাব দেখিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিল যে "বাবা, তাহা হইলেত আমার মুন্সী মারা যাইবে।" সন্তানের প্রতি মাতার যে কি গাঢ় স্নেহ, তাহার ইহাই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্মুখে যন্ত্রণার এক ভয়ানক যন্ত্র, পশ্চাতে যমদূতের ন্যায় দারোগা এবং বরকন্দাজেরা তাহাকে যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতে এবং যন্ত্রণা দিতে প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান, তথাপি মুন্সীর মাতার মনে মুন্সীর যাহাতে অমঙ্গল না হয়, তাহাই প্রবল চিন্তা। মুন্সীর মাতার মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি তাহাকে অনেক আশা ভরসা দিলাম। স্ত্রী লোকের এবং সাধারণ লোকের মনে ধারণা আছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ক্ষতিকারককে শাস্তি দিতে না চাহে, তবে আদালত তাহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য। আমি ইহা জানিয়া মুন্সীর মাতাকে বলিলাম যে "যুগী আমাকে বলিয়াছে যে সে তাহার সমুদয় দ্রব্যগুলি পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে কোন আসামিকে সে শাস্তি দেওয়াইতে চাহে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় আমি যুগীকে ডাকাইয়া আনিয়া মোকাবেলা করিয়া দিব"। ভাগ্যক্রমে যুগীও সেই সময়ে থানায় উপস্থিত ছিল। সে আমার ইঙ্গিত মতে মুন্সীর মাতাকে ঐরূপ আশ্বাস দিল; কিন্তু চোরের মা শুদ্ধ বাক্যের উপরে নির্ভর না করিয়া বলিল যে "তবে যুগী সেতাম্বর কাগজে একখানা দরখাস্ত দাখিল করুক।" অনভিজ্ঞ লোকে ষ্ট্যাম্প কাগজকে

সৈতাম্বর কাগজ বলে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাক্স হইতে এক তক্তা ফুলিস্কেপ কাগজ বাহির করিয়া মুন্সীর মাতাকে তাহার মধ্যে জলের মার্কা দেখাইয়া প্রতীত করিলাম, যে যথার্থ উহা ষ্ট্যাম্প কাগজ এবং তাহা আমার নায়েব দারোগার হস্তে অর্পণ করিয়া তাহার দ্বারা মুন্সীর মাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী দরখাস্ত লিখাইয়া, তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া, যুগীর দ্বারা দস্তখত করাইয়া লইলাম এবং আমরাও কয়েক জন তাহাতে সাক্ষী স্বরূপে স্বাক্ষর করিলাম। স্ত্রীলোকটির মনে তখন বিশ্বাস হইল, যে অপহৃত মাল বাহির করিয়া দিলে মুন্সীর কোন ক্ষতি হইবে না। এবং তখন সে মাল দিতে সম্মত হইয়া নায়েব দারোগার সঙ্গে চিত্রশালী যাত্রা করিল।

এই পর্য্যন্ত মুন্সী সেখ এই সকল ঘটনার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে পারে নাই। মুন্সীর মাতা থানা হইতে বাহির হওয়ার পরক্ষণেই আমি বরকন্দাজি গারদে যাইয়া মুন্সীকে বলিলাম যে "কেমন মুন্সী, এখন ত মাল পাইলাম, তুই দিলি না কিন্তু তোর মা দিতে চাহিয়াছে, এখন তোরা মায়ে পোয়ে ফাটক খাটিবি"। এই কথা শুনিয়া মুন্সী অবাক হইয়া তাহার মাতাকে দেখিতে চাহিল; আমি তাহাকে দ্বারে আনিলাম। কোতয়ালীর সম্মুখস্থিত রাজ-বর্ত্মটি অতি সরল, থানার দ্বারে দাঁড়াইয়া উত্তর দক্ষিণ উভয় দিকে অনেক দূর দৃষ্টি হয়। মুন্সীকে যখন দ্বারে আনিলাম, তখন তাহার মাতা প্রায় পাঁচশত হাত (যাহারা সেই স্থান দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে পুরাতন কলেজের হাতার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণের নিকট) গিয়াছে। মুন্সী তাহার মাতাকে চিনিয়া বলিল যে "এখন কি হইবে মহাশয়! আমার মাতাকে কি প্রকারে বাঁচাইব"! আমি বলিলাম "এক উপায় আছে, তুই যদি এখন নিজে মাল বাহির করিয়া দিয়া সাহেবের নিকট যাইয়া একরার করিস, তাহা হইলে তোর মা বাঁচিতে পারে, কেমন মুন্সী, তোর মাকে ফিরাইব না কি? মুন্সী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল যে "না ফিরাইবার দরকার নাই। ও ত চোরের মা, সে যে সহজে মাল বাহির করিয়া দিবে, এমন কথা আমার মনে লয় না, যাহা হউক আর কিছুকাল বিলম্বেই টের পাইব। এখন গাঙের মাঝে ঢেউ দেখিয়া কিনারায় নৌকা ডুবাইলে, কি পুরুষত্ব হইবে? বিশেষ আপনি সত্য কি মিথ্যা বলিতেছেন তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব, চলুন এখন থানায় ফিরিয়া যাই।" মুন্সী এমনই শক্ত চোর, যে সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, তাহার মাতা এমন কাঁচা কর্ম্ম করিবে। বেলা চারটার সময় নায়েব দারোগা মুন্সীর মাতাকে ও একটা বড় পুরাতন কালা হাঁড়ীর মধ্যে অপহৃত যাবতীয় সোণা রূপার দ্রব্য ও নগদ টাকা গুলি সম্মুখে আনিয়া,ব্যক্ত করিল, যে, যে কৌশলে সকল দ্রব্য গোপন করা হইয়াছিল, তাহাতে উহারা দুই জন ভিন্ন আর কাহারও তাহা আবিষ্কার করার ক্ষমতা ছিল না। গ্রামের বাহিরে একটা মাঠের মধ্যে এক শিমুল ও খর্জ্জুর গাছের তলে, মাটির একটা অদৃশ্য গহ্বর আছে তাহার মধ্যে হাঁড়িটা উপুড় করিয়া রাখিয়া সকলের উপরে পাতা ও ঘাসের চাপড়া আচ্ছাদন করিয়া রক্ষিত হইয়াছিল। মুন্সীকে ডাকিয়া দেখাইলাম, সে দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া আমার পা দুইখানা ধরিয়া তাহার মাতাকে রক্ষা করিতে বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং বলিল যে "এখন আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমি সমুদায় করিব"। আমি তাহার মাতাকে অব্যাহতি দিতে সম্মত হইয়া বিস্তারিত রূপে তাহার দ্বারা একরার লিখাইয়া লইলাম এবং মুন্সী দ্রব্য বাহির করিয়া দেওয়ার কথাও তাহাতে স্বীকার করিয়া লইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন আণ্ডা ঘরে আণ্ডা খেলিতে ছিলেন; মুন্সী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা স্বীকার করিল এবং তিনিও সন্তুষ্ট হইয়া মুন্সীর প্রার্থনা মতে সেই রাত্রিটা তাহাকে ফাটকে প্রেরণ না করিয়া, থানায় রাখিতে আদেশ করিলেন। সমস্ত রাত্রি মুন্সী তাহার মাতা ও স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অতিবাহিত করিল এবং পর দিবস প্রাতে কান্দিতে কান্দিতে তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া জেলখানায় গেল। যাইবার সময় তাহাতে আমাতে এইরূপ কথোপকথন হয়; —

মুন্সী। দারোগা মহাশয় আমার নিয়ম ভঙ্গ করিলেন। আমার পায়ে কখনও বেড়ী উঠে নাই এইবার

উঠিবে। আমি এখন দেখিতেছি, যে আপনি দারোগাই বড়।

দারোগা। দারোগা বড় নহে, ধর্ম্মই বড় মুন্সী সেখ!

মুন্সী। ঠিক বলিয়াছেন, এবার যদি খোদার মেহের-বাণীতে ফাটক্ খাটিয়া প্রাণ লইয়া বাড়ী আসিতে পারি, তাহা হইলে আর চুরি ডাকাইতি করিব না।

দারোগা। সব সে ওহি ভালা।

মুন্সীর সাত বৎসরের জন্য নির্ব্বাসনের সহিত কারাবাসের দণ্ড হয়।*

---

* 'নবজীবন" তৃতীয় ভাগ, সপ্তম সংখ্যা, মাঘ, ১২৯৩

নিবেদন—

গল্প-লহরীর শ্রাবণ সংখ্যা সব ফুরাইয়াছে। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া উহা আমাদের বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমরা ওই সংখ্যা চার আনা দিয়া কিনিতে পারি।

সম্পাদক—
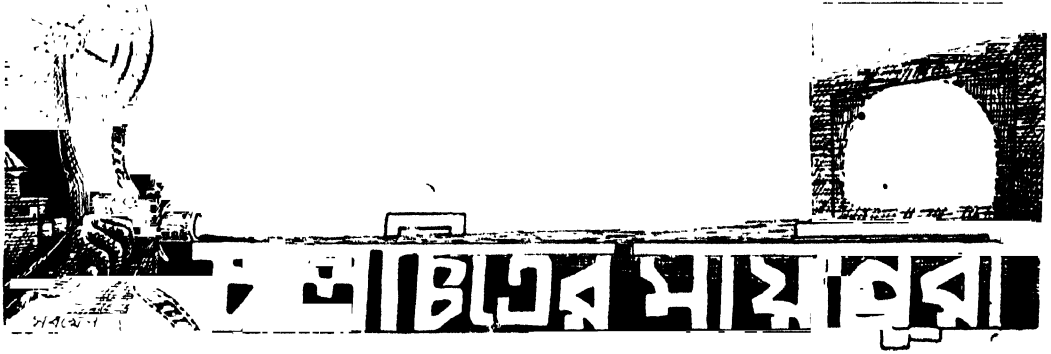
জন্ বোলস্

[গল্পের মত]

শ্রীমণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আজ একটা গল্প শুনুন।

১৯১৮ সালের জুলাই মাস। ফ্রান্সের সীমানায় আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগের তাঁবু পড়েছে। একদিন সকালবেলা তেতাল্লিশ নম্বর গুপ্তচর 'জন্ বোলস্' পায়চারি করতে করতে তারের বেড়ার ধারে পাহারা দিতে ব্যস্ত।

ঠিক তারের বেড়ার উল্টোদিকে একটা দোতলা বাড়ী —তার বাসিন্দা এক সুন্দরী যুবতী। গুপ্তচরেরা তার নাম দিয়েছে 'ম্যাডাম এক্স।' জন্ বোল্‌সের সঙ্গে মেয়েটীর প্রথম থেকেই ভয়ানক ভাব। যখনই দু'জনের চোখাচোখি হয়—মেয়েটী একটু হাসে। জন্ বেচারিও একটু না হেসে পারে না। কখনও কখনও দু'জনের ভেতর জার্ম্মাণ বা ফরাসী ভাষায় দু'-একটা যে কথাও হয় না এমন নয়।

কর্ত্তাদের কাছ থেকে বোল্‌সের ওপর হুকুম ছিল মেয়েটীর ওপর লক্ষ্য রাখা। কিন্তু অনেক সময়েই কাজে তা' হ'য়ে উঠতো না। মাঝে মাঝে মেয়েটী তার বাগানের টাটকা ফল ছুঁড়ে দিত—আর বোল্‌সও কুড়িয়ে নিয়ে তা'তে কামড় দিতে এক মিনিটও দেরী করতো না। মনে মনে তখন সে ভাবতো, মেয়েটী শত্রুর মত ভয়ঙ্কর গুপ্তচরই হোক্ না—বাগানে ফসল ফলাতে তার জোড়া নেই।

যতই কেন না মেয়েটীর সঙ্গে কথা বলুক আর তার ফলে কামড় বসাক—বোল্‌সের চোখ সব সময়েই সজাগ থাকতো। কেউ যেন না তাকে দেখতে পায়।

জন্ বোলস্ নিজেই পরে বলেছে—সত্যিই মেয়েটীকে সন্দেহ করবার কারণ ছিল। সে যেন আমাদের তাঁবুর ভেতরকার খবর জানতে চাইতো। প্রায় সব সময়েই মেয়েটীকে দেখতাম তার বাড়ীর জানালায় কিম্বা বাগানের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছে—একদৃষ্টে আমাদের তাঁবুর ভেতর চেয়ে। হয়তো বা সে জার্ম্মানদের, আমাদের গুপ্তচরের সংখ্যা বা ওই রকম কিছু জানাতে চাইতো। মেয়েটীর বাড়ীর চারপাশে অধিকাংশ সময়েই আমরা পরিচিত কোন না কোনও জার্ম্মান চরকে দেখ্‌তাম— আমরা তাদের ওপর লক্ষ্যও রাখতাম। এমন কী কখনও কখনও তার বাড়ীর জানালায় নানারঙের সাঙ্কেতিক কাপড়ের পতাকাও উড়তো। আর এসব না থাক্‌লেও আমাদের তাঁবুর ওপর তার বিশেষ মনোযোগই তো সন্দেহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আমি আশা করতাম যে, মেয়েটী আমার কাছ থেকে গুপ্তচর বিভাগের সব সংবাদ জানবার চেষ্টা করবে। তাই তখন প্রায় প্রত্যেকদিনই রক্ষী বদল হওয়া সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে থেকে গেলাম। আমার মনে কেন কে জানে মেয়েটীর রহস্য জানবার প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল। মেয়েটীর কাছে কৈফিয়ৎ দিলাম যে, আমার কোনও পূর্ব্বপুরুষ জার্ম্মান থাকার দরুণ—আমাকে সন্দেহ করে' এখানে নজরবন্দী রাখা হয়েছে। ওরা ভেবেছে আমি জার্ম্মানদের ওপর অনুরক্ত।

"কিন্তু ওরা তোমায় এখানে রাখ্‌লে কেন?" মেয়েটী জিগ্‌গেস করলে। "মানে—এটা একটা বাজে কোণঘেঁসা জায়গা—এখানে থাকতে জার্ম্মানদের কোনও সাহায্য বা ফরাসীদের কোনও ক্ষতি করতে পারবো না এই আর কী!"

কিন্তু আমার এইসব কথার সুযোগ নিয়ে মেয়েটী সে-রকম কোনও কথাই তুল্‌লে না। আমাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিগ্‌গেস্‌ও করলে না। কেবলমাত্র আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো—কী মোহময় তার চোখ দু'টি! মেয়েটী চোখ নামাতেই আমি তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একবার তীক্ষ্ণভাবে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি তখন জানতাম না, দূর থেকে কেউ এই ব্যাপার দূরবীণের ভেতর দিয়ে লক্ষ্য করছে।

কিন্তু খুব শীঘ্রই তা' জান্‌তে পারলাম। দু'টী ভদ্রলোক একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন—সাধারণ পোষাক পরা। তাঁরা যে সৈনিকদলের এতে কোনও সন্দেহ ছিল না—কিন্তু জার্ম্মান কি ইংরেজ তা' বুঝতে পারি নি। তারা আমায় জিগ্‌গেস্‌ করলেন—ওই মেয়েটীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের মানে কী?

একজন আমায় স্পষ্ট বল্‌লেন—"দেখো, আমাদের সঙ্গে চালাকী করো না—আমরা তোমায় ওই বদমায়েস গুপ্তচর মেয়েটার সঙ্গে কথা কইতে দেখেছি। সে তোমায় কি একটা ছুঁড়ে দিয়েছে পর্য্যন্ত। আমরা গুপ্তচর বিভাগের গোয়েন্দা—আমাদের কাছে কিছু লুকিয়ো না—সব খুলে বলো দেখি।"

কিন্তু আমি তাদের তখুনি সব বুঝিয়ে দিলাম—তারাও তা' বিশ্বাস করলে।

...এইভাবে দিন যায়—এমন সময় মেয়েটীর কাছ থেকে আমার নিমন্ত্রণ এল। বাড়ীর মধ্যে মেয়েটীর ব্যবহার, আদর-যত্ন দেখে আমার দৃঢ় ধারণা হলো—সে জার্ম্মানদের গুপ্তচর। তার বাড়ীটা এমন একটু বিশেষভাবে সাজান-গোছান ছিল যে, আমার ধারণা দৃঢ় হ'ল। তার ব্যবহার দেখে মনে হয়—এই মেয়েকে অন্য কিছু হওয়ার চেয়ে গুপ্তচর হওয়াই মানায় ভাল। কিন্তু আমি তাকে তখন সন্দেহ-ই করেছি—তার চরিত্রের অন্তর্দিক্—ব্যবহারের অন্য বিশিষ্টতার দিকে চোখ দিই নি। আমার সেই মেয়েটীর গুপ্তচর হওয়া সম্বন্ধে অতি বিশ্বাসই তখন আমার জীবনে একটা ভীষণ ভুলের কারণ হয়েছিল।

একটু চেষ্টাতেই জান্‌লাম মেয়েটীর বাবা ছিলেন জার্ম্মান, স্বামী ছিলেন এক ফরাসী ভদ্রলোক—তিনি যুদ্ধে মারা গেছেন। আমি একবার দোতলায় যেতে চাইলাম—সব কিছু ভাল করে' দেখ্‌বার জন্যে। আমাদের তাঁবুতেই বা মেয়েটী কি দেখে আর কা'কেই বা সে কাপড় উড়িয়ে সঙ্কেত করে।

খানিক বাদেই দোতালায় গেলাম...কিন্তু ঘরে ঢুকেই যা' ঘটলো—আমি তখন স্বপ্নেও তা' কল্পনা করতে পারতাম না। মেয়েটী অসঙ্কোচে আমায় প্রেম-নিবেদন করলে।

ক্রমশঃ সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল—সব কিছু সন্দেহ আর ফন্দী গেল হাওয়ায় মিলিয়ে। মেয়েটী যুদ্ধে বিধবা হয়েছে—একা থাকে—জীবনে কিছু উত্তেজনা চায়। আমাদের মত যুবকদের সম্বন্ধে হয়তো তার একটু মোহ ছিল—তাই সে জানালা থেকে আমাদের দেখতো—অনুসরণ করতো না—আমাদের হাত নেড়ে ডাকৃতো—আর প্রলুব্ধ করবে বলে' রঙীন কাপড়-জামা টাঙিয়ে দিত—সেগুলো সাঙ্কেতিক নিশান নয়। ঠিক্ এই খবরই পরে গোয়েন্দা অফিস জানতে পারে—তাকে ধরে' আনবার পর। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়—তার কাছে যে সব জার্ম্মান গুপ্তচর আসতো, তারা তাকে সন্দেহ করতো আমাদের দলভুক্ত বলে।

এরপর জন বোল্‌সের সঙ্গে আর মেয়েটীর দেখা হয় নি। কিন্তু দুঃখের কথা মেয়েটী জানলে না—বোল্‌সের মনের কথা—কেন সে তার প্রেম-নিবেদনে সাড়া দেয়নি। মেয়েটী আর জন্ বোল্‌স দু'জনে হয়তো এখন রয়েছে পৃথিবীর দু'প্রান্তে। মেয়েটীর কথা আমরা কি-ই আর জানি! কিন্তু জন্ বোলস্ এখন বিশ্ববিখ্যাত তারকা অভিনেতা—তার গান শুনে কে না মুগ্ধ হয়। কে জানে সেই দুর্ভাগ্য মেয়েটী তার ছবি দেখ্‌তে গিয়ে পুরানো দিনের কথা একবারও ভাবে কিনা!

মণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ফ্রেড্রিক্ মার্চ্চ

কুমারী অলকা দেবী

চিত্র-জগতের খাতায় এ নামটী খুব বেশী পরিচিত না হলেও, এ-লোকটীর অন্তর্নিহিত তীক্ষ্ণ প্রতিভা সম্বন্ধে কোন চিত্রামোদীরই জান্‌তে বাকী নেই এবং এ-কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে, তাঁর এই আত্ম-প্রতিষ্টা এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে আত্মপ্রকাশের জন্য দায়ী একমাত্র তিনি নিজেই। আর সেই জন্যই খুব বেশী পুস্তকে অভিনয় না করেই তিনি আজ এত শীঘ্র 'ষ্টার'-শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে গেচেন। ১৯৩২ অব্দে 'ডক্টর জেকিল এণ্ড

FREDRIC MARCH and NORMA SHEARER in "SMILIN' THROUGH"

ফ্রেড্রিক্ মার্চ্চ ও নর্ম্মা শিয়ারার 'স্মাইলিং থ্রু' নামক পুস্তকে

মিঃ হাইড' নামক পুস্তকখানিই তাঁকে সম্মানের এতখানি উচ্চশীর্ষে উন্নীত করেচে।

এঁর সর্ব্বশেষ পুস্তক, অর্থাৎ সব চেয়ে আধুনিক ছবি হচ্চে 'ব্যারেটস্ অফ্ উইমপোল ষ্ট্রীট্।' ছবিখানি 'গ্লোবে' উপস্থিত দেখান হচ্চে। এই বইখানিতে ইনি নর্ম্মা শিয়ারার সঙ্গে এত সুন্দর অভিনয় করেচেন যে, চোখে না দেখলে তা' সম্যক্ উপলব্ধি করা অসম্ভব। এঁর অভিনয়ে এইটুকু বিশেষত্ব যে, ইনি খুব সাংঘাতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষে এমন চমৎকার 'হিউমার' ঢুকিতে দিতে পারেন, যা' সত্যই প্রশংসনীয়। এমনও শোনা যায়, ডিরেক্টার-মহাশয় এঁকে হয় ত বল্‌লেন: 'কাট্'—অর্থাৎ, থামো, তোমার বক্তব্য শেষ হয়েচে। উনি তখন সময়োপ-যোগী এমন একটা কথা উচ্চারণ করে' 'সীন' থেকে বেরিয়ে যান, যা' দর্শকদের কাছে অত্যন্ত আমোদের বিষয় হ'য়ে

ওঠে—অথচ চিত্রের সৌন্দর্য্যের এতটুকু হানি হয় না। ঠিক এইটুকু বল্‌লেই চিত্র-জগতে মার্চ্চ কতবড় অভিনেতা এবং তাঁর ওজন কতখানি তা' অনায়াসেই বুঝ্‌তে পারা যায়।

মার্চ্চের আর একটী বিশেষ গুণ যে, ইনি খুব ভাল 'এ্যাক্ট' করতে পারেন। এই 'এ্যাক্টিং'-এর ওপর ঝোঁক তাঁর ছেলেবেলা থেকে। স্কুল এবং কলেজ-জীবনে তিনি কত যে আবৃত্তি করেচেন এবং কত পারিতোষিক পেয়েচেন তা' বলা যায় না, তবে এই থেকেই তাঁর বরাবরের অভিনয়-প্রীতির কথা বুঝ্‌তে পারা যায়। এই অভিনয় জিনিষটা ছেলেবেলা থেকে তাঁর হৃদয়ে এমন নিবিড়ভাবে গেঁথে গিয়েচে যে, প্রত্যেক দৃশ্যে ঢোকবার এবং বেরুবার মুহূর্ত্তটিকে পর্য্যন্ত তিনি মূর্ত্ত করে' তুলতে পারেন। এই কথাটা যে মোটে অত্যুক্তি নয়, তা' 'ব্যারেটস্ অফ্ উইমপোল ষ্ট্রীট' বইখানি-ই ভালরূপ প্রমাণ করে' দেবে।

এবার এর নামের রহস্যের কথা একটু বলবো। এঁর নাম যে কি করে' ফ্রেডিক্ মার্চ্চ হ'ল, তা' একটু ভেবে দেখবার বিষয়। এঁর নাম ছিল ফ্রেডেরিক বিকেল্ এবং এর মার নাম ছিল মার্চ্চার। ইনি যখন প্রথম ষ্টেজে পা দিলেন, তখন নামের প্রথম দিক্‌টা ছোট করে' কর্‌লেন ফ্রেডিক্ এবং বিকেল্ তুলে মা'র নামের প্রথমাংশ জুড়ে করে' নিলেন মার্চ্চ। সেই থেকে অর্থাৎ মাত্র ১৯৩২ সাল থেকে তিনি হচ্চেন: ফ্রেডিক মার্চ্চ এবং এই ছদ্মনামেই আজ তিনি অপর্য্যাপ্ত যশের অধিকারী।

যতদূর দেখা যায় ফ্রেডিক্ অভিনয় করবার প্রেরণা নিয়েই যেন জন্মেছেন। কেন না মাত্র আট বৎসর বয়স থেকে তিনি বেশ উচ্চাঙ্গের আবৃত্তি কর্‌তে পার্‌তেন। তাঁর বয়স যখন দশ কি এগারো, তখন একদিন ক্লাসের কতকগুলি ছেলে নিয়ে তিনি একখানি বই আবৃত্তি করেছিলেন। তা'তে অধিকাংশ প্রধান চরিত্র একা তাঁকেই অভিনয় কর্‌তে হয়েছিল। ষোল বৎসর বয়সে ইনি একজন 'গ্রাজুয়েট' হন্ এবং ব্যাঙ্কিং পড়তে সুরু করেন। এদিক দিয়েও যথেষ্ট প্রতিভা দেখিয়ে তিনি এক ব্যাঙ্কে একটী চাকরী নেন। কিন্তু চাকরী তাঁর মনঃপূত হ'ল না, তিনি অবসর সময়ে থিয়েটার প্রভৃতিতে অভিনয় করেও কিছু কিছু উপায় কর্‌তে লাগ্‌লেন। এই দুইদিকে আবদ্ধ থেকেও কিন্তু তিনি লেখাপড়ার নেশা ত্যাগ করতে না পেরে উইন্ কন্‌সিন্-এর বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশ বছর বয়সে প্রফেসারের পদ গ্রহণ করেন। তখন তাঁর কাজ হ'ল দিনে প্রফেসারি এবং রাত্রে থিয়েটার করা। তাঁর অভিনয় দেখে 'পেইং দি পাইপার' পুস্তকে বাড়তি হিসেবে অভিনয় করবার জন্যে 'হলিউড' থেকে তাঁকে আহ্বান করা হয়। ক্রমান্বয়ে কৃতিত্ব দেখিয়ে শেষে 'ডক্টর জেকিল' পুস্তকে তিনি তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন এবং 'ষ্টার'-শ্রেণীভুক্ত হন্। তাঁর শেষ এবং সম্পূর্ণ নূতনতম 'ব্যারেটস্ অফ্ উইমপোল ষ্ট্রীট' পুস্তকে অভিনয় সত্যই অসাধারণ। শুধু অভিনেতা নয়, তিনি একজন খুব ভাল খেলোয়াড়। সব রকম খেলাই তিনি বেশ ভাল খেল্‌তে পারেন। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ইনি কুমারী এল্‌রিজ্‌কে জীবনের অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে লাভ করেন। উপস্থিত তাঁর একটী মেয়ে হয়েচে—বয়স তার মাস ছয়েক এবং নাম হচ্চে পেনীলোপ্।

কুমারী অলকা দেবী

চিত্র-জগতের পঞ্চশস্য

শ্রীপ্রতিভা শীল

আমাদের দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে আমাদের ইচ্ছে করে, কিন্তু সেগুলি এতই মামুলি-ধরণের এবং সংক্ষিপ্ত যে, তা' দিয়ে সাধারণের মনে কোন বৈশিষ্ট্য আনতে পারে না। কাজেই বিলেতী অভিনেতাদের নিয়েই আলোচনা করতে হয়।

*　　*　　*

চেষ্টার মরিস্ প্রত্যহ তাঁর বাড়ীর পুকুরে কি শীত, কি গ্রীষ্ম দশবার করে' পারাপার হন।

*　　*　　*

লীও ক্যারিলো তাঁর প্রাতরাশ 'সাণ্টামণিকা' পোতাশ্রয়ে তাজা মাছ ধরেই সম্পন্ন করে' নেন।

*　　*　　*

ম্যারণা লয় 'ঈভলীন প্রেন্‌টিস্' নামক পুস্তকে অভিনয় করতে নেবে মন্তব্য করেচেন, চেহারা ফেরাবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় হচ্চে দু'বেলা খুব জোরে জোরে হাঁটা। এতে নাকি চিত্রে তোলবার উপযোগী চেহারা হয়। আমরা একথা ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি, তবে অভিনেতাদের দিক্ থেকে হয় ত এর কোন উপকারিতা আছে। নৈলে একজন নামকরা অভিনেতা এরকম মন্তব্য করেন কেন?

*　　*　　*

ডিরেক্টার উইলিয়ম হাওয়ার্ড কোনরকম ফ্যাসাদে পড়লে বা মনে দুঃখ হ'লে বেশ জোরে জোরে শিস্ দেন। তিনি নাকি বলেন: এই শিস্ হচ্চে 'কবরের বাঁশি!' (!!)

*　　*　　*

সবাক্-চিত্রে যোগ দেবার পূর্ব্বে রবার্ট ইয়ংকে পূরো সাড়ে চারবছর থিয়েটারে ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েচে।

*　　*　　*

রেমন্ নোভারো তাঁর এক ভগ্নীর সঙ্গে নাকি আঠারো বছর পরে দেখা করেছেন। তবে দেখাটা সামাজিক ধরণের নয়। তিনি 'দি নাইট ইজ্ ইয়ং' পুস্তকে অভিনয় করবার জন্যে মেক্সিকো যান। হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে তাঁর ভগ্নীকে দেখ্‌তে পান। নোভারো সাহেবের ভগ্নী-প্রীতি যে প্রশংসনীয় একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য।

*　　*　　*

ক্লার্ক গেবল্ একদিন তেলের কলে কাজ করেছেন। অথচ আজ তিনি একজন উচ্চদরের অভিনেতা। বায়োস্কোপের যুগ এসে কতজনের ভাগ্যচক্র যে কতদিকে ঘুরিয়ে দিয়েচে, তা' ভেবে দেখ্‌লে মাথা গরম হ'য়ে ওঠে।

*　　*　　*

আমাদের দেশের মেয়েরা (অবশ্য অতি আধুনিক নয়) স্বামীকে একখানা চিঠি লিখ্‌তে ঘরের আনাচে-কানাচে, ছাদের আল্‌সে প্রভৃতি নির্জ্জন স্থান খুঁজে বেড়ান এবং যদি-ও দয়া করে' লেখেন তাও ন'মাসে-ছ'মাসে একখানি। কিন্তু এালিজাবেথ এ্যালান্ তাঁর লণ্ডনস্থিত স্বামীর জন্য ডায়েরীর আকারে দৈনিক চিঠির একখানি বই করেচেন।

'নিউ থিয়েটারে'র 'ভূমিকম্পের পরে' বইখানি শীঘ্রই পরদার বুকে ফুটে উঠবে। বড়ুয়া-মশায় 'দেবদাস'কে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে বিশেষ ব্যস্ত।

*　　*　　*

ডিরেক্টার ধীরেন গাঙ্গলী 'বিরোধী' পুস্তক নিয়ে মেতে উঠেচেন। শোনা যাচ্চে, বইখানির উর্দ্দু এবং বাংলা দু'টী সংস্করণই হবে।

*　　*

'রাজনটী বসন্তসেনা' গত পনেরই ডিসেম্বর 'চিত্রা'র পাদ-প্রদীপের বুকে ফুটে ওঠবার কথা ছিল। কিন্তু তারিখ পাল্টে বাইশ-এ নাকি তিনি দেখা দেবেন শোনা যাচ্চে। আবার তারিখ পাল্টাপাল্টি না হলেই ভাল।

*　　*

'কালী ফিল্মে'র কর্ম্মকর্ত্তারা 'পাতালপুরী' দেখাবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত। এই 'পাতালপুরী' গল্পটী নাকি কয়লার খনি নিয়ে শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা!

*　　*

ডিরেক্টার প্রফুল্ল ঘোষ-মশায় 'পোষ্যপুত্র' বইখানি স্থগিত রেখে 'হরিশ্চন্দ্র' বই তুলচেন। শোনা যাচ্চে বইখানির তামিল এবং বাংলা দু'টী সংস্করণই নাকি হবে।

প্রতিভা শীল

পুস্তক সমালোচনা

১। মধুচ্ছন্দা (কবিতার বই) শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

এই সংগ্রহের অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানি পড়িয়া আমরা আনন্দ পাইয়াছি। এইখানি লেখকের প্রথম পুস্তক। সর্ব্বাপেক্ষা সুখের কথা বইখানির কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই, বেশ সুন্দর স্বচ্ছগতি। কোন কোন কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছাপ পড়িলেও কবির প্রতিভা অস্বীকার করা চলে না। লেখকের হাত মিষ্ট।

২। স্রোত (উপন্যাস) শ্রীভুবনমোহন মিত্র প্রণীত।

প্রকাশক—'নারায়ণ-সাহিত্য-মন্দির', ৮, রাধামাধব গোস্বামীর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই চিত্তাকর্ষক।

কয়েকটি গল্প লিখিয়াই লেখক উপন্যাস রচনায় হাত দিয়াছেন। প্রথম লেখা হিসাবে এখানি মন্দ হয় নাই। প্রথমটা অমনোযোগের সহিতই বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিছুদূর অগ্রসর হইতেই কিন্তু পাঠের আগ্রহ বেশ বাড়িয়া গেল। লেখকের প্রকাশভঙ্গী সুন্দর। ভাব ও ভাষা মন্দ নহে। উপন্যাস-প্রিয় পাঠকদের ইহা ভালই লাগিবে। প্লটের দিকে লেখকের আর একটু দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।

৩। নারীর রূপ (উপন্যাস) শ্রীহরিপদ গুহ প্রণীত।

প্রকাশক—'বরেন্দ্র লাইব্রেরী', ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই আধুনিক রুচিসঙ্গত।

বহুদিন হইতে লেখক বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প লিখিয়া হাত পাকাইয়াছেন। এই উপন্যাসখানি যখন ধারাবাহিক-রূপে 'পঞ্চপুষ্পে' বাহির হইতেছিল, তখনই আমরা মাসের পর মাস পরম আগ্রহে ইহা পড়িয়া গিয়াছি। লেখকের বলিবার ক্ষমতা অতি চমৎকার। ভাষা সহজ, সরল—কোথাও বড়-একটা অমসৃনতা লক্ষিত হইল না। ইহার সুন্দর গতি সহজেই পাঠকের চিত্ত মুগ্ধ করিয়া দেয়। সব চেয়ে বড় কথা—ইহার চরিত্রগুলি জলন্ত ও জীবন্ত। তাহারা সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। অতএব তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয়-লাভে এতটুকুও বাধা ঘটে না। এই তারুণ্যের যুগে লেখক যে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন নাই—সর্ব্বত্রই সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, ইহা কম বাহাদুরীর কথা নহে। বইখানি আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে—এক নিশ্বাসে পড়িয়া শেষ করিয়াছি।

৪। জামাই-ই-চোর—(শিশু-সাহিত্য) শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭৮, কাশীপুর রোড, বরাহনগর, দাম ছয় আনা।

ছেলেদের কয়েকটি গল্পের সমষ্টি।

যাহাদের জন্য লেখা, বইখানি তাহাদের বেশ ভালই লাগিবে। ভাষা অতি সহজ। যাহারা দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়াছে, তাহারা অনায়াসেই এখানি পড়িয়া যাইতে পারিবে। সবগুলি গল্প পড়িয়া অতিবড় গম্ভীর লোকও হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না। ছেলেদের তো ভাল লাগিবেই—এমন কি, তাহাদের দাদা-মহাশয়দেরও মন্দ লাগিবে না।

শ্রীবাণার বাহন

সি, কে, সেনের জবাকুসুম ডায়েরী—আমরা একখানি 'জবাকুসুম ডায়েরী' উপহার পাইয়াছি। ডায়েরীখানি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। একখানি প্রথম শ্রেণীর ডায়েরীতে যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, ইহাতে তাহার কিছুরই অভাব নাই। আমরা উত্তরোত্তর ইহার আরও উন্নতি কামনা করি।

ভ্রম-সংশোধন—প্রেসের ভৌতিক স্পর্শে 'স্পর্শমণি' গল্পের লেখক শ্রীজিতেন্দ্রভূষণ বিশ্বাসের স্থলে শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের নাম বসিয়াছে। আশা করি লেখক-মহাশয় আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

গল্প-লহরী সম্পাদক
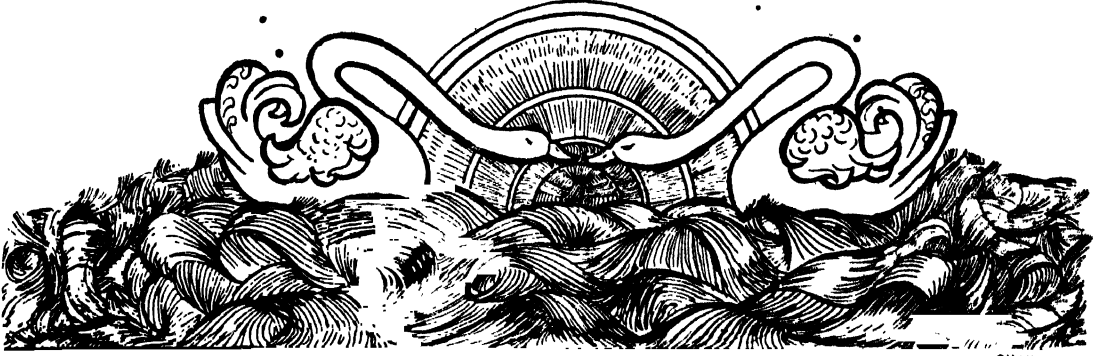
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম বর্ষ | মাঘ, ১৩৪১ | দশম সংখ্যা

সুপবিত্রা

শ্রীমতী জোৎস্না ঘোষ

সেবা-সমিতির কাজ সারিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে পা দিতেই অমিতের দৃষ্টি পড়িল পাশের বাড়ীর জানালায় অবস্থিতা সুন্দরী তরুণীটীর উপর। বাড়ীখানা কয় মাস হইতে খালি পড়িয়াছিল; সম্ভবতঃ ভাড়া লইয়া কাহারা আসিয়াছে। ব্যস্তভাবে অমিত সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেও মুহূর্ত্তের জন্য মেয়েটীর সুশ্রী মুখে যে নিবিড় ব্যথার ছায়া সে দেখিয়াছিল, তাহা তাহাকে বিস্মিত না করিয়া পারিল না।

বৈশাখ মাস। বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড রৌদ্র যেন পৃথিবীর বুকে অগ্নি বাণ হানিতেছে। ঘরের মধ্যেও উত্তাপ কম নয়। পর্য্যঙ্কস্থিত শয্যার উপর হইতে একটা বালিশ টানিয়া লইয়া অমিত গৃহতলে শুইয়া পড়িয়া ক্ষণপূর্ব্বের পরিত্যক্ত পাঞ্জাবীটা ভাঁজ করিয়া তাহাতে পাখার কাজ চালাইতে লাগিল। দ্বারসংলগ্ন রেশমী যবনিকা সরাইয়া ত্রস্তপদে অমলা ঘরে আসিলেন। পুত্রের সন্ধানে এদিক-ওদিক চাহিয়া গৃহতলে তাহাকে আবিষ্কার করিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন—তোর জন্যে আমি কি মাথা খুঁড়ে মরব অমি! মেঝের উপর পড়ে' জামা নেড়ে বাতাস কচ্ছিস—কেন, পাখার 'সুইচ'টাও কি খুলে দিতে নেই? পাখার হাওয়া গায়ে লাগ্‌লেও কি তোর মহাভারত অশুদ্ধ হবে? কি ছেলেই যে তুই হয়েছিস!

জননীর মুখের দিকে চাহিয়া অমিত মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। তেমনই স্মিতমুখে সে কহিল—কি হবে তা' জানি না মা। তবে দরকার নেই—বিলাসিতা যত কম হয়, ততই ভাল।

অপ্রসন্ন মুখে পাখার 'সুইচ'টা টানিয়া দিয়া মা ছেলের

কাছে আসিয়া বসিলেন। উঠিয়া বসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া অমিত জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা সবাই খেয়েছ তো মা, না আমার জন্যে বসে' আছ?

—সে কথায় তোমার আর কাজ কি বাবা? আমাদের কি হ'ল না হ'ল সে খোঁজ তো তুমি রাখ না। তুমি কেবল—

তাঁহার কথা শেষ হইবার আগেই ছোট ছেলেটীর মত জননীর অঙ্কে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া অমিত বলিল—মা, সত্যি কি আমার জন্যে তোমাদের কষ্ট হয়? আমি এভাবে বাইরে বাইরে থাকি, এ কি তুমি পছন্দ কর না? আমি কিন্তু জান্‌তুম মা, আমার একাজ তোমার ভাল লাগ্‌বেই। তাই তো—

আনন্দ-গর্ব্বে অমলার মুখখানা দীপ্ত হইয়া উঠিল। স্নেহভরে পুত্রের ললাটে একখানা হাত রাখিয়া কহিলেন—সব ছেড়ে তুই যে এই জনসেবার কাজ নিয়েছিস, মা হ'য়ে এতে কি আমি খুসী না হ'য়ে থাক্‌তে পারি রে! সকলের মুখে তোর প্রশংসা, সে যে আমার বড় আনন্দ! তবে রাগ হয় তোর এই সব বাড়াবাড়ি দেখে। পরের কাজে নিজেকে দিয়েছিস বলে', দেহটার দিকে কি একটী-বারও চাইতে নেই? শরীরটা বজায় রেখে কাজ কর্ না বাবা! কিসের অভাব তোর যে, এত কষ্ট সহ্য কচ্ছিস?

একটু হাসিয়া কহিল—অভাবের জন্যে নয় মা, ইচ্ছে হয় না, যে দেশে অর্দ্ধেকের উপর লোক দু'বেলা পেট ভরে' খেতে পায় না সেখানে—না মা, এই ভাবেই থাক্‌তে আমার বেশ লাগে।

—কিন্তু আমি যে সইতে পারি নে বাবা। তা' ছাড়া, যে যার ভাগ্য নিয়ে জগতে আসে; অন্যে কষ্ট পাচ্ছে বলে' তুই কেন কষ্ট সইবি? তোর কিসের দুঃখ?

অন্যদিকে চাহিয়া গাঢ়কণ্ঠে অমিত কহিল—সে তুমি বুঝ্‌বে না মা। কিন্তু, না, আমি পারি না। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা কিছু কর্‌তে গেলেই আমার মনে হয় সেই সব হতভাগাদের কথা—যাদের না হ'লে একটা ক্ষণও আমাদের চলে না। সমস্ত সময় ধরে' আপ্রাণ পরিশ্রমে যারা আমাদের সুখ-সুবিধার উপাদান যোগাচ্ছে, তার বদলে আমরা তাদের দিচ্ছি কি? তাদের পেটে ভাত নেই, ভাঙ্গাঘরের চালে খড় নেই, দেহের সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত আমাদের জন্যে খেটে খেটে শেষ হ'য়ে এসেছে, অসুখ হ'লে ওষুধ দূরে থাক্, পথ্য পর্য্যন্ত তাদের জোটে না, তাদের অস্থিচর্ম্মসার দেহগুলোকে পিষে সারবস্তুটুকু আমরা ভাগ করে' নিচ্ছি। কি তার বদলে দিই? কিছু না। আসল যা', তা' আস্‌ছে আমাদের কাছে, তারা পাচ্ছে খোসাটুকু—

—কিন্তু তুই একা তার কি প্রতিকার কর্‌বি তাই শুনি।

—তবু যতটা পারি। আমার সব সামর্থ্য, সব চেষ্টা, সব শক্তি আমি এদের জন্যেই নিযুক্ত করেছি, আরও হয় ত কিছু কর্‌তে পারি—যদি মা তুমি একটু সহায় হও।

পুত্রের কথার ভঙ্গীতে একটু হাসিয়া মা কহিলেন—তার মানে? আমি সহায় হবো, সে আবার কি?

—কি জান মা, আমার ইচ্ছে করে কি, জান?

—কি শুনি। জননীর মুখে শঙ্কার ছায়া পড়িল।

—দেখ মা, আমি কিছু লেখাপড়া শিখেছি, গায়ে শক্তিও আছে, খাট্‌তে পারি। আমি যদি একটা কিছু কাজ করি, বেশ আমাদের চলে' যায়।

—তা' তো যায়। কিন্তু কাজ তুই কর্‌বি কেন? তোর তো টাকার কিছু অভাব নেই যে, খাট্‌তে যাবি।

—তাই তো বল্‌ছি মা। বসে' খেতে আমার একটুও ভাল লাগে না। যদি তোমার সম্মতি পাই, তা'হ'লে আমার যা' কিছু আছে সবই দিই এদের জন্যে—অভাবের তুলনায় যদিও এ খুব বেশী নয়, তবু যেটুকু—

অমলার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। এমনই একটা কিছু শুনিবার অপেক্ষা তিনি করিতেছিলেন, কাজেই ততটা বিস্মিত হইলেন না।

আবদারের সুরে অমিত কহিল—বলো না মা এক-বার। আমি ব্যাঙ্ক থেকে টাকাগুলো তুলে নিয়ে কাজে লেগে যাই। কি হবে আমাদের এত টাকা নিয়ে? সংসারে তো দু'টী প্রাণী আমরা। মা আর ছেলে।

—এখন দু'টী আছি, কিন্তু যখন আমার বউমা আসবে?

—সে সম্ভাবনা যে খুব কম তা' তো তুমি জান মা। বিয়ে করা হয় তো আমার এ জন্মে আর ঘটে উঠ্‌বে না।

অমলা একটু রাগতভাবে বলিলেন—তা' যদি হয়, তবে আমায় কাশী পাঠিয়ে দে; দিয়ে তোর যা' ইচ্ছে, তাই কর।

—ওই দেখ মা, অম্‌নি রাগ কর্‌ছ।

—রাগ করা বড় অন্যায়, না? আমার যেন আর কোন ইচ্ছে, কোন আশা নেই। স্বামী হারিয়েও আমায় পৃথিবীতে থাক্‌তে হয়েছে শুধু তোর মুখ চেয়ে। সবহারা হয়েও তোকে নিয়ে আবার সংসারে কত সুখের স্বপ্ন দেখেছি, কত কল্পনা না করেছি—আমার সব আশাই কি ব্যর্থ হবে রে?

অমলার চোখ দুইটা সিক্ত হইয়া উঠিল।

ব্যস্ত হইয়া অমিত কহিল—না মা, তোমায় নিয়ে আর আমি পারি না। বিয়ে যে কর্ব্বই না এমন কথা তো আমি বলি নি; সম্ভাবনা কম, তাই শুধু বল্‌ছিলুম। আর তুমি দুঃখ করে' কেঁদে ফেল্‌লে। না মা, তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ।

অমলার ওষ্ঠ প্রান্ত মৃদু হাসির রেখায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। চেষ্টা করিয়া মুখখানায় কতকটা গাম্ভীর্য্য আনিয়া তিনি কহিলেন—হ্যাঁ, আমি খুব ছেলেমানুষ। এখন তুই ওঠ দেখি। খেতে কি হবে না? বেলা যে তিনটে বাজে।

—চলো, তবে যাওয়া যাক্। কিন্তু মা, তুমি আমার কথাটা চাপা দিয়ে দিলে—যা বল্লুম, তার জবাব দিলে না। বলো না মা।

—কি বল্‌ব? হরিশ্চন্দ্রের মত সর্ব্বস্ব দিয়ে দাও, সে কথা তো আমি তোমায় কিছুতেই বল্‌তে পার্‌ব না।

—আচ্ছা, অল্প কিছু থাক্ আমাদের। বাকীটা—

মাথা নাড়িয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে অমলা কহিলেন—ওরে না, না, সে কিছুতেই হবে না। এম্‌নিই তো দু'হাতে টাকা নষ্ট কচ্ছিস?

—নষ্ট কচ্ছি মা?

একটু অপ্রতিভভাবে মা বলিলেন—না হয় ভাল কাজেই খরচ কচ্ছিস। কিন্তু তাই বলে' যা' কিছু সব দিয়ে দিতে বল্‌তে আমি পার্‌ব না। যে ক'দিন আমি আছি, সে হবে না। আমি মরে' গেলে তারপর যা' ইচ্ছে হয় করিস তুই। এখন খাবি চল।

অমিত উঠিল। পাশের বাড়ীর মেয়েটী তখনও জানালায় দাঁড়াইয়া। সম্ভব ইহাদের কথাই সে শুনিতেছিল। তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া অমিত বলিল—এ বাড়ীতে ভাড়াটে এলো বুঝি।

—হ্যাঁ, আচ্ছা এক আপদ!

বিস্মিত দৃষ্টি জননীর মুখে ফেলিয়া অমিত বলিল—আপদ? আপদ হবে কেন? কে ওরা?

—কে তা' কি করে' বলি। শুনলুম, বাড়ীর ভাড়াটে যিনি—তিনি কোন্ থিয়েটারের এ্যাক্‌ট্রেস।

—তাই নাকি? তা' এরকম লোক এ ভদ্রলোকের পাড়ায় এলো কেন? পাড়ার লোক কিছু বল্লে না?

—কে কি বল্‌বে, এ পাড়ার লোক যেমন! দেখা যাক্, বেয়াড়া চাল কিছু দেখ্‌লে আমরাই ব্যবস্থা কর্ব্ব।

অমিত আর কিছু না বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। অমলাও ফিরিতেছিলেন, সহসা অদূরস্থা কিশোরীর উপর দৃষ্টি পড়াতে দাঁড়াইয়া গেলেন। বাড়ী দুইখানার মধ্যে ব্যবধান সামান্যই। অমলার শেষ কথাগুলা মেয়েটী সব শুনিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য, তাহার মুখে রেখান্তর মাত্র দেখা গেল না। অতি সহজ শান্তভাবে সে অমলার দিকেই চাহিয়াছিল। একটু আগাইয়া আসিয়া অমলা বলিলেন—থিয়েটারের কাজ করে যে, সেই কি তোমার মা?

মৃদুকণ্ঠে মেয়েটী কহিল—হ্যাঁ।

অমলা আবার প্রশ্ন করিলেন—বাড়ীতে তোমাদের আর কে আছে?

—আমি আর মা, আর কেউ নেই।

অমলার মুখে একটু হাসি ঝিক্‌ঝিক করিয়া উঠিল; মা ভিন্ন তাহাদের আর কেহ থাকে না এটা জানিয়াই

তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তরুণী হয় ত এ হাসির অর্থ বুঝিল। তাহার ম্লানদৃষ্টিটা সে অন্যদিকে ফিরাইল। কয় মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া অমলা কহিলেন—তা' বাছা, তোমরা এ পাড়ায় এলে কেন? সহরে তোমাদের যোগ্য জায়গার অভাব তো নেই। এটা ভদ্রলোকের পাড়া। এখানে থাকলে তোমাদেরও সুবিধা নেই, আমাদেরও অসুবিধে।

মেয়েটী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। বলিবার মত একটা কথাও হয় তো সে খুঁজিয়া পাইল না। অমলা আরও কি বলিতেন, তাহার পূর্ব্বেই অবলুপ্ত-যৌবনা আর একটী রমণী মেয়েটির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দু'জনের দিকে চাহিলেই উভয়ের চেহারার সাদৃশ্য তাহাদের ঘনিষ্ঠ একটা সম্বন্ধের কথা জানাইয়া দেয়। অমলার বুঝিতে দেরী হইল না—এই রমণীই ওই মেয়েটীর মা। অভিনেত্রী অমলার দিকে একবার চাহিয়া বলিল—এখানে এলুম কি ইচ্ছে করে'? ওই মেয়ের জ্বালায়। উনি যে আমার সতী সাবিত্রী। কিছুতেই সেখানে রইলেন না। সেখানকার লোকসব মন্দ। তাদের মধ্যে থাকলে উনি মরে' যাবেন। তাই তো এখানে এলুম। এত যে বলি, তা' তো শোনে না। ভদ্রলোকের কাছে এসে থাকলেই কি তুই ভদ্র হ'য়ে যাবি? না, তোকে বউ করে' কেউ ঘরে নিয়ে যাবে? তবে এ দুর্ভোগ কেন? গ্রহ আর কি!

একসঙ্গে কথাগুলা বলিয়া রমণী যেন কতকটা শ্রান্ত হইয়াই থামিল। তাহার আকস্মিক আবির্ভাব ও একটানা কথার ধারা অমলাকে বিস্মিত করিয়াছিল। কথাগুলা ঠিকমত তিনি বুঝিতেও পারিলেন না। রমণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তার মানে?

—মানে বুঝলেন না? মেয়ে চায় আমার সৎপথে থেকে জীবন কাটাতে। আমি যা' তা' তো জানেন, ও চায় না আমাদের এ পথে পা দিতে। বলা-কওয়া, খেতে না দেওয়া, গায়ে হাততোলা, অনেক কিছুই করে' দেখেছি, ওর সঙ্গে কিছুতেই পারলুম না—তাই তো বাধ্য হ'য়ে এতকালকার বাস তুলে এখানে এলুম। কিন্তু তা'তে লাভ কি? যে কালি ওর গায়ে আমি মাখিয়েছি, সে তো মুছবে না। ও যত নির্ম্মল, যত পবিত্র হোক, আমার কাজের জন্যে শাস্তির বোঝা ওকে যে জীবনভোর বইতেই হবে। মুহূর্ত্তের ভুলে আমি যা' করেছি, তার শাস্তি হ'তে ও তো রেহাই পাবে না।

কণ্ঠস্বরে তাহার কেমন একটা গভীর ব্যাথার সুর ধ্বনিয়া উঠিল। কলুষ-কালিমাঙ্কিত পাণ্ডুর বদনে গভীর অনুশোচনা তেমনই একটা সকরুণ মর্ম্মন্তুদ ছায়া ফুটাইল। অমলা বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। ক্ষণপূর্ব্বে তাহাদের উপর যে নিবিড় বিতৃষ্ণা তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহারও কতকটা যেন লুপ্ত হইয়া আসিল। ঘৃণায় এতক্ষণ ভাল করিয়া তাহার দিকে চাহিতেও পারেন নাই। চোখ দু'টা এবার তাহার দিকেই তুলিয়া ধরিলেন। অত্যাচার উচ্ছৃঙ্খলতার সহস্র ইতিহাস তাহার দেহ ভেদ করিয়া যেমন বিকীর্ণ হইতেছে, তেমনই সেই সঙ্গে কি একটা নিদারুণ ব্যথাও যেন তাহাকে বেড়িয়া রহিয়াছে। চোখ দুইটা তাহারই ভারে আনম্র, ক্লিষ্ট। ফেলিয়া-আসা অতীত দিনের জ্বালাময়ী স্মৃতির সঙ্গে অনাগত ভবিষ্যতের অজ্ঞাত বিভীষিকাই হয় তো তাহার দেহ মনে এমন বিষের জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। অমলার নারী-মন কোমল হইয়া আসিল। তাঁহার দিকে চাহিয়া নম্রকণ্ঠে রমণী বলিল—আমার মেয়েকে যা' বলছিলেন শুনলুম, কিন্তু আমাদের জন্যে ভয় পাবার কারণ আপনাদের একটুও নেই। মেয়ের কথা তো শুনলেন, আর আমি—

রমণী হাসিল। সে হাসিতে নিজেকেই সে যেন ব্যঙ্গ করিল।—না, আমার জন্যেও আপনাদের কোন রকম অসুবিধে সইতে হবে না। তবে কি জানেন, বিষ থাক আর না থাক, সাপ দেখলেই মানুষ ভয় পায়। আমরাও সেই সাপের জাত কিনা। কিন্তু না, সত্যিই আমাদের জন্যে আপনাদের কোন ভয় নেই। আজ আমি যাই হই, একদিন আমি ভদ্রঘরেরই মেয়ে, বউ ছিলুম। ভদ্রলোকের মর্য্যাদা রাখতে আমি জানি।

অমলা এতক্ষণ নীরবেই ছিলেন। এবার অত্যন্ত

চমকিয়া বলিলেন—তুমি ভদ্রঘরের বউ ছিলে? তবে তোমার এদশা হ'ল কেন?

ললাটে একটা করাঘাত করিয়া হতাশা-গাঢ়স্বরে সে বলিল—অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! কিন্তু তাই বা বলি কেন? নিজের দুর্ব্বুদ্ধি! মুহূর্ত্তের ভুল! আর কি।

রমণীর পূর্ব্ব-জীবনের ইতিহাস শুনিবার জন্য অমলার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছিল। অভুক্ত পুত্রের কথা ভুলিয়া ব্যগ্রস্বরে তিনি কহিলেন—কি হয়েছিল শুনি? কেন এ পথে এলে?

—কেন এলুম, সেই কথাই তো আজ কেবল ভাবি, কেন এলুম? আগে যদি জানতুম! অল্পবয়সে স্বামী গেলেন, মেয়ে তখন দু'বছরের। বাপের কুল, শ্বশুর কুলে কেউ ছিল না। দূর-সম্পর্কের এক দেওরের কাছে আশ্রয় নিলুম। অনাথা বিধবা, গলগ্রহ—দেওরেরও তাই অত্যাচারের ত্রুটি ছিল না। মেয়ের মুখ চেয়ে সব সয়েছিলুম, কিন্তু কাল হ'ল—এই রূপ। পাড়ার ছেলেরা উত্যক্ত করে' তুল্লে। দেখে শুনে দেওর বল্লে—নিশ্চয় তোমার দোষ আছে, নইলে ওরাই বা অমন করে কেন? যাও, এখানে তোমার জায়গা নেই। অনেক বল্লুম, কাঁদলুম, সে কিছু শুনলে না—একদিন এক কাপড়ে বাড়ীর বার করে' দিলে। ভাবলুম জলে—ডুবে মরব, কিন্তু পারলুম না শুধু মেয়ের জন্যে।

রমণীর রক্তহীন বিবর্ণ কপোল বাহিয়া অশ্রুর বিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মেয়েটী সজল চোখে জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। কোমল কণ্ঠে অমলা কহিলেন—নিজে তো খুবই অন্যায় করেছ, কিন্তু মেয়ে যখন ওপথে যেতে চায় না, তখন ওকে আর সে জন্যে পীড়ন কর কেন? ও যে ভাবে থাকতে চায়, তেমনই থাকতে দাও।

—তা' দেওয়া ছাড়া তো উপায়ও নেই। অনেক দেখেছি, ওকে পারলুম না। কিন্তু বলতে পারেন—এভাবে থাকলেই কি ওর সব কালি মুছে যাবে? তা' তো যায় না, তবে কেন? কি করে' ওর সারা জীবন কাটবে, তাও তো ভেবে পাই না। একটি পয়সা সংস্থান নেই, থিয়েটারে যা' পাই খরচাই কুলোয় না। আমি মর্লে কি হবে ওর? আমার তো সময় হ'য়ে এসেছে।

—কেন, তোমার তো বয়স বেশী নয়।

ম্লানমুখে নারী কহিল—বুকের অসুখ যে। ডাক্তার বলেছেন—যখন হোক্ শেষ হ'য়ে যেতে পারে। তাই তো ওর ভাবনায় আমি অস্থির হ'য়ে পড়েছি।

জননীর বিলম্বে অমিত তাহাকে ডাকিতে আসিয়া সম্মুখেই ইহাদের দেখিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে চলিয়া যাইতেছিল। সেদিকে চাহিয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিল—আপনার ছেলে বুঝি? ওটাই কি বড়?

অমলা উত্তর দিলেন—ওই একটাই সন্তান আমার।

—দীর্ঘজীবী হোক্। সুখে থাক।

যাহার মুখেই হউক, সন্তানের শুভ-কামনা শুনিলেই মাতৃচিত্ত পুলকিত হইয়া উঠে। প্রীত নয়নে অমলা রমণীর দিকে চাহিলেন। মেয়েটী আবার জানালার কাছে আসিয়াছিল। তাহার পিঠে হাত রাখিয়া রমণী বলিল—সুপবিত্রা, চল্ মা তোর চুল ক'টা বেঁধে দিই, এখনি আমায় আবার থিয়েটারে যেতে হবে।

অমলা চলিয়া যাইতেছিলেন, কথাটা কানে যাইতে ফিরিয়া বলিলেন—ওর নাম বুঝি সুপবিত্রা?

—হ্যাঁ। আমার স্বামী ওর ওই নাম রেখেছিলেন। অভাগী হ'লেও তাঁর দেওয়া নামের অমর্য্যাদা আমি জীবন থাকতে করব না।

—ভালই তো ও যখন ভালভাবে থাকতে চায়, তখন সেই ভাবেই ওকে রাখ।

আর কিছু না বলিয়া অমলা ত্রস্তে ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। বারান্দার উপর ভাতের থালা সম্মুখে লইয়া অমিত চুপ করিয়া আসনে বসিয়াছিল। ব্যস্তভাবে তাহার কাছে গিয়া অমলা কহিলেন—এখনও খেতে বসিস নি কেন অমু? কথা বলতে বলতে বড় দেরী হ'য়ে গেল আমার।

স্মিতমুখে অমিত বলিল—খানিকটা আগে ওদের আপদ-বালাই কত কি বলছিলে মা, অথচ এখন যেভাবে গল্প আরম্ভ করেছিলে, তা' দেখে ওদের সম্বন্ধে

দিদিকে বুঝিয়ে বল্। কেন কষ্ট পাচ্ছে, আমি হীরে-মুক্তো—

সুপবিত্রা উঠিয়া বসিল। দীপালোকে তাহার চোখ দু'টার দিকে চাহিয়া মোহিনী কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

স্থিরকণ্ঠে সুপবিত্রা কহিল—তোকে না বারণ করে' দিয়েছি। তবু ও কথা আমায় শোনাতে এসেছিস। যা', আমার সাম্‌নে থেকে চলে' যা'।

—তোমার ভালর জন্যেই বলি দিদি। ইচ্ছে করে' কেন এত কষ্ট পাও? বোসেদের ছোটবাবু, তারপর তোমার গিয়ে ওই মুখুয্যেদের বড় ছেলে দু'বেলা আমার বাড়ী যাচ্ছে। তুমি একটা মুখের কথা বল্‌লেই—

সুপবিত্রা চীৎকার করিয়া উঠিল—তুই যাবি কি না এখান থেকে?

—যাচ্ছি বাপু, যাচ্ছি। আমার মাইনের টাকা ক'টা ফেলে দিলে তো একেবারেই চলে' যাই। কলিকাল কি না—লোকের ভাল কর্ত্তে নেই। হিতকথা বলি আমি, তা' তো শুনবে না। মরছ তো এই কষ্টে। আজ তিনদিন দু'বেলা খাওয়া পর্য্যন্ত জোটে নি। বাড়ীওয়ালা বলে' গেছে দুটো দিন দেখে পরশু সকালে ঘাড় ধরে' পথে বার করে' দেবে—তখন? তোমার আবার এত ঢং কেন বাবু! যতই 'সতীলক্ষ্মী' সাজো, 'বেবুশ্যে'র মেয়ে তুমি—ভদ্দরলোকে তো তোমায় ঘরের বউ করবে না। তার চেয়ে ওসব ছেড়ে যা' তোমার জাত-ব্যবসা তাই কর—তোমারই ভাল, আমার আর কি? কি বলো বাছা, বল্‌ব ওদের ছোট-বাবুকে?

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই সুপবিত্রা ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। জনহীন বাড়ীটা রজনীর অন্ধকারে যেন এক ভীষণ রূপ ধরিয়াছে। জনশূন্য ঘর-গুলার দিকে চাহিতে যেন ভয় হয়। তাহারই একটার মধ্যে গিয়া সুপবিত্রা আবার ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

চার

সংজ্ঞাহীনা সুপবিত্রার মাথাটা উপাধান হইতে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া সজল চোখে পুত্রের দিকে চাহিয়া অমলা প্রশ্ন করিলেন—ডাক্তার কি বল্লেন অমিত? আর কোন ভয় নেই তো, বাঁচবে তো মেয়েটা?

অমিত নিকটেই দাঁড়াইয়া স্থির নিষ্পলক চোখে সুপবিত্রার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়াছিল। জননীর প্রশ্নে উত্তর দিল—অতটা আফিং খেয়ে খুব কম লোকেই বাঁচে মা। সে রকম দরকারী জীবন হ'লে নিশ্চয়ই বাঁচত না। কিন্তু এই সব অকেজো জীবন, অসার্থক প্রাণ তো এত সহজে যায় না। মর্‌তে পার্লে ওর পক্ষে লাভ বই ক্ষতি ছিল না মা।

—আহা, অমন কথা বলিস নি! যে রকমই হোক্, মানুষের জীবন তো। সে যে অমূল্য। ভাগ্যে ঝি-টা সময়মত জান্‌তে পেরে আমাদের খবর দিয়েছিল। না হ'লে কি হ'ত বল্ দেখি?

—কি আর হ'ত? ওর পক্ষে ভালই হ'ত। ও তো সে জন্যেই আফিং খেয়েছিল। এই যে লিখে রেখেছে—জীবন কাটাবার মত কোন সৎ উপায় না পেয়ে বাধ্য হ'য়ে আত্মহত্যা কর্‌লুম।

—আহা! অমলার কপোল বাহিয়া কয়বিন্দু অশ্রু সুপবিত্রার মুখের উপর ঝরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ তিনি যেন কি ভাবিলেন, তারপর পুত্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন—অমু, বল্‌তে পারিস, এর কোন উপায়, কোন গতি কি হ'তে পারে না?

—পারে, ওকে যদি কেউ স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করে।

—ওর মায়ের কথা ভুলে গিয়ে কেউ কি তা' পারে?

জননীর দিকে একবার চাহিয়া অমিত কহিল—মা, তোমার সম্মতি যদি পাই, তবে আমি পারি।

হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে অমলা বলিলেন—পার্‌বি অমু? সব কথা, ওর সব কিছু ভুলে গিয়ে স্ত্রীর যোগ্য সম্মান ওকে তুই দিতে পার্ব্বি?

—তুমি বল্লেই পারব মা। একটা নির্ম্মল জীবনকে যদি ব্যর্থতার হাত থেকে বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারি, সেইটাই আমার জীবনের চরম সার্থকতা। এর চেয়ে বড় কাজ জীবনে আর কি কর্ত্তে পার্ব্বো।

—তবে তাই হোক্! আমি অন্তরের সহিত বল্‌ছি অমু, সুপবিত্রাকে তুই গ্রহণ কর্। ওর মায়ের ইতিহাস যাই-ই হোক্—ও সুজাতা, ও পবিত্রা। শত আবর্জ্জনার মধ্যে থেকেও অমলিন নির্ম্মল রয়েছে। সব জেনে-বুঝেও এতকালের সংস্কারকে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি নি—ওকে কাছে টেনে নিতে সাহস হয় নি। কিন্তু আজ বুঝ্‌তে পাচ্ছি—পৃথিবীতে যত কিছু দামী জিনিষ আছে, মানুষের জীবনের মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী। একটা নিষ্পাপ জীবন এই এইভাবে নষ্ট হ'তে বসেছে, শক্তি থাক্‌তেও আমাদের প্রতিকার কর্‌বার সাধ্য হচ্ছে না—এ কি কম দুঃখের কথা! সমাজ যা' বলে বলুক, যে শাস্তি দেয় দিক্, আমি বল্‌ছি অমু, তুই ওকে আমার ঘরের লক্ষ্মী করে' নিয়ে চল্।

মৃদুকণ্ঠে অমিত কহিল—তাই হবে মা।

জ্যোৎস্না ঘোষ

অস্পষ্ট

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও টিপ্-টিপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। কলিকাতার রাস্তা প্রায় জনবিরল। একান্ত যাহাদের প্রয়োজন, তাহারাই কেবল পথ চলিতেছে—তাও শুধু সদর রাস্তায়। ছোটখাট পথগুলিতে ক্বচিৎ এক-আধজনকে দেখা যায়। খালের ধারের রাস্তাগুলিতে অল্প আলোয় এবং গাছপাতার ঝোপে অন্ধকার যেন আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বহুক্ষণ এদিকে কাহাকেও হাঁটিয়া যাইতে দেখা যায় নাই। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, কে একব্যক্তি সাদা জামা গায়ে এই দিকেই আসিতেছে। ফিট্ বিশেক দূরে একটা গ্যাসের নিকটে যখন লোকটী আসিল, তখন তাহাকে বেশ ভাল করিয়া দেখা গেল। বয়স বেশী হয় নাই, যুবক বোধ হয়। মুখখানি যেন একটু চিন্তানিবিষ্ট। সে দৃষ্টিতে যেন কোন অর্থ নাই—দুই চক্ষে নিশীথ রাত্রের নিঃসীম শূন্যতা। মাথার চুলগুলি লম্বা লম্বা। গায়ের রঙটা আগে গৌর ছিল বলিয়া মনে হয়। লোকটী কি গান গাহিতেছে? না, না, আপন-মনে কি বলিতে বলিতে পথ চলিতেছে। কিন্তু হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল, কেন? ঠিক্ বোঝা যাইতেছে না তো? ও কি কিছু খুঁজিতেছে? চোর অথবা নেশাখোর নয় তো? আবার পিছনে ফিরিয়া কিছুদূর যাইল। তারপর একটা সরু গলির সম্মুখে আসিয়া ওর চোখ দু'টী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লোকটী বোধ হয় ঐ গলিটা খুঁজিতেছিল।

সত্যই! লোকটী গলির ভিতর ঢুকিল।

গলির ভিতর ঢুকিয়া সে একটা বাড়ীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। গ্যাসের আলোয় বাড়ীটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

বাড়ী কি গুদাম, বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই। সম্মুখে কোন জানালা বা বারান্দা নাই। মাত্র একটি দরজা। উপরে ছাদের একটু আলিসা—সেইটাই বুঝি বাড়ীটার বাহিরের দিকে উঁকি দিবার একটীমাত্র আস্তানা।

যাই হোক্, লোকটী এইবার দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। একবার নাড়িল, দুইবার নাড়িল, তিনবার নাড়িল—কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। শেষে লোকটী আস্তে আস্তে ডাকিতে লাগিল—বিনু! বিনু!

এইবার যেন বাড়ীটার মধ্যে কিসের সাড়া পড়িয়া গেল। ছাদের আলিসা ফুঁড়িয়া যে অশ্বত্থগাছটা উঠিয়াছিল, তাহার পাতাগুলি সরসর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বাড়ীর ভিতর কাহার যেন চলচরণের ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। লোকটীর নাম বীরেন। এককালে সে এ বাড়ীর বিশেষ পরিচিত ছিল। বহুদিন পরে আবার তাহার আগমন—তাই বুঝি বাড়ীর অধিবাসীদের মধ্যে অত চাঞ্চল্য।

বীরেন কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল সিঁড়িতে কাহার পদধ্বনি হইতেছে। তাহার নিতান্ত পরিচিত সেই পদধ্বনি!

আনন্দে তাহার বুকের ভিতর দুরুদুরু কাঁপিতে লাগিল। 'খুট্' করিয়া দরজাটা খুলিয়া গেল। বীরেন দরজার আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিল। বাড়ীটার ভিতর আলো নাই—ঝড়ে নিবিয়া গিয়া থাকিবে বোধ হয়।

বীরেন বলিল—"কৈ বিনু, বড় অন্ধকার যে! কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

সে অন্ধকার হাতড়াইয়া সম্মুখের সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে লাগিল। সিঁড়ির উপরের আবছা স্ত্রী-মূর্ত্তিটীও একটু একটু করিয়া উঠিতে লাগিল।

বীরেন সিঁড়ি দিয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল—"হঠাৎ বহুদিন পরে, এমনি অসময়ে আমার আগমনটা তোমার কাছে বড় বিস্ময়ের মনে হচ্ছে, না বিনু? কিন্তু কি কর্‌বো বলো, পৃথিবীতে ঢের জিনিস আছে যা' বিস্ময়ের হলেও তা' সত্যি—যে জিনিস অত্যন্ত অকস্মাৎ বলে' মনে হচ্ছে, তা' হয় তো একান্ত অপরিহার্য্য! আঃ, এখনই পা পিছ্‌লে যাচ্ছিলুম আর কি! একটা আলোও জ্বাল না? আচ্ছা কৃপণ হ'য়ে পড়েচো যা' হোক্!"

বীরেন এইবার উপরে উঠিয়া পড়িল। সম্মুখেই ঘর। ঘরে টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। চারিদিকে কাগজ-পত্র ছড়ান—কেমন বিশৃঙ্খলার ভাব যেন ঘরখানার চারিদিকে নগ্নভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বীরেন বলিতে লাগিল—"কিন্তু বিনু, তোমাকে আর চেনা যায় না। বড্ড রোগা হ'য়ে পড়েছো। অসুখ করেছিল বোধ হয়। বিনয় কৈ? বাইরে গেছে? এত রাত্তির হ'য়ে গেল, এখনও তার বাড়ী ফের্‌বার নাম নেই, আচ্ছা তো?

—"সত্যি, তুমি আমাকে দেখে অবাক্ হয়ে গেছ, না? আচ্ছা, তোমার আজ আমার দিকে তাকাতে ঘৃণা হচ্ছে, না বিনু? হচ্ছে না কি? সত্যি করে' বলো দিকিনি, হচ্ছে নিশ্চয়ই! তুমি যদি না বলো, আমি বল্‌বো তোমার হওয়া উচিত। তোমাদের কি সেদিন অমনি অবস্থায় ফেলে যাওয়া ঠিক্ কাজ হয়েছিল আমার? সেদিন বুঝ্‌তে পারি নি, কিন্তু আজ পারি। বিনয়কে সন্দেহ করা সেদিন আমার পক্ষে শুধু অকারণ নয়, অন্যায়ও হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি বিনু, তখন আমি নারীর প্রেমকে বুঝ্‌তে শিখি নি। বুঝ্‌তে কেন, ও যে কি জিনিষ তা' আমি জান্‌তুম না। কিন্তু এখন জানি এই যে, ও শতধা নদীর মতো বহুমুখী। আমরা সেটা না বুঝ্‌তে পেরে যত গোল বাধাই। কিন্তু তোমার তখন বয়স কতই বা? অত্যন্ত ছোট তখন তুমি। তখন কি তুমি প্রেম করতে জান্‌তে? তখন ছিল তোমার স্নেহ—নিছক সরলতাভরা খানিকটা স্নেহ এবং সহানুভূতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেইটেকে ভেবেছিলুম প্রেম। এবং তাই নিয়ে শেষকালে—

—"আচ্ছা, সেদিন কি হয়েছিলো? ও, আমার মনে পড়েচে। সেদিন বিনয় বুঝি কোথায় গিয়েছিল। ফিরে পরিশ্রান্ত হ'য়ে ঘরের মেজেয় শুয়েছিলো। আর তুমি স্নেহপরবশ হ'য়ে তার মাথাটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলে—আর দিচ্ছিলে তার আঙ্গুলগুলো টিপে। এইটুকু তো ঘটনা! কিন্তু এর জন্য আমি তোমাদের কি করেছিলুম!

—"কিন্তু দেখো, বিনয়কে আমি কম ভালবাসতুম যে, তা' নয়! তোমার হয় তো মনে হবে যে, মেয়েরাই শুধু ছেলেদের ভালবাস্‌তে পারে, ছেলেরা ছেলেদের ভালবাস্‌তে পারে না। এটা কিন্তু ঠিক্ নয়। কিন্তু দুঃখ এইখানে যে, সে ভালবাসার মর্য্যাদা আমি রাখ্‌তে পারি নি। মুহূর্ত্তের উন্মত্ততায় আমি তোমাদের ছেড়ে গিয়েছিলুম—তোমাদের অর্থের উৎস যে আমি, সে কথা জেনেও চলে' গিয়েছিলুম। একটুও ভাবি নি, আমি চলে' গেলে তোমাদের কি হবে!...

—"ঐ যে কি শব্দ হচ্ছে কোথায়! কা'র পায়ের শব্দ, না? ও, বুঝ্‌তে পেরেছি, ওপরের সিঁড়ি দিয়ে বিনয় নাম্‌ছে, না? তুমি এতক্ষণ বল নি তো যে, বিনয় আছে। বেশ যা' হোক্!...বিনয়! বন্ধু এস! বহুদিন পরে আবার দেখো আমি ফিরে এসেছি।"

বীরেন হাত নাড়িতে নাড়িতে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"কৈ বিনয়, এসো!"

খট্ খট্ পায়ের শব্দ ক্রমশঃ আগাইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখের দেওয়ালটির ভিতর মিলাইয়া গেল যেন। অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না। চারিদিকে অপরিসীম স্তব্ধতা।...

বীরেন বলিল—"বেশ বন্ধু! বেশ যা' হোক্! আমার সঙ্গে দেখা কর্‌লে না তো।"

তাহার পর আবার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সে বলিতে আরম্ভ করিল—"জান্‌লে বিনু, এই রাত্তির জিনিষটা একটা আশ্চর্য্য জিনিষ। দিবসে আমরা যা' কিছু অন্যায় বা অসৎ কাজ করি না কেন, রাত্তির এলেই সেগুলো কেমন অনুশোচনার রূপ ধরে' আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়। দিনের বেলা যে কাজ নেশার ভরে করে' থাকি, রাত্তিরে তার নেশা যায় ছুটে—আসে নেশাবসানের তিক্তকর ক্লান্তি, দারুণ অন্তর্বেদনা।—

—"ঠিক্ এমনিতর একটা অবস্থার মধ্যে হঠাৎ বহুদিন পরে আজ আবার তোমাদের সম্মুখে এসে পড়েছি বিনু! তুমি বোধ হয় জান যেদিন তোমাদের ছেড়ে চলে' গিয়েছিলুম, তারপর থেকেই আমার নৈতিক মেরুদণ্ড বলে' আর কিছু ছিল না। নেশা করা, অসৎ সংসর্গে মেশা, বা তারই সব আনুসঙ্গিক আমার চরিত্রের সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে নিতে আর বাধ্‌ল না। ঠিক্ এমনিভাবে একদিন নয়, দু'দিন নয়, সাতটা বছর কাটিয়ে দিলুম বিনু! প্রায়-ই তোমাদের কথা মনে হ'ত। কিন্তু তখনই আপনাকে দাবিয়ে রাখ্‌বার জন্যে নেশার মাত্রা বাড়িয়ে দিতুম। এমনিভাবে প্রতিদিনের ন্যায় আজও আমি নেশা কর্‌তে বসেছিলুম। নেশার মাত্রা বেশ চড়ে' গিয়েছিল, সঙ্গীদের হল্লায় পাড়ার কারুর ঘুমাবার উপায় ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আজ সেই পুরাণ স্মৃতিগুলোকে নেশার চাপে চাপা দিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লুম না। তাই দিক্‌দারী হ'য়ে নেশার গ্লাসটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লুম। আমার সঙ্গীরা আমার এই আশ্চর্য্য ব্যবহারে বিস্মিত হয়েছিল—কিন্তু কি কর্‌বো, তাদের নিরাশ করে' আজ চলে' এসেছি। অল্প একটু নয় বিনু। কোথা থেকে আস্‌ছি জানো, সেই শালকিয়া থেকে—সমস্ত পথটা পায়ে হেঁটে।

—"আজ আমার কি মনে হচ্ছে জানো বিনু? আজ মনে

হচ্ছে, আবার যদি সেই পুরাণ দিনগুলো ফিরে আস্‌ত! সত্যি, তোমার এ দেহ দেখে তোমায় আর চেন্‌বার উপায় নেই! এ যেন তোমারি পুরাণ রূপের শবদেহ! তোমার দেহে নেই সেই পূর্ব্বের শুভ্রতা, তোমার দৃষ্টি এখন ঘোলাটে, তোমার কণ্ঠস্বর যেন তোমাকেই উপহাস কর্‌ছে! তাই আজকে বিবেকের দংশনে আমার মন জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠেছে। আমি করেছি কি! সেই কেমন আমরা তিনজনে ছিলুম। আর আমাদের ঘিরেছিল এক অক্ষয় প্রেমের স্বপ্নলোক। কিন্তু তারপর কি করে' এলো আমাদের মধ্যে ঈর্ষা, হীন সন্দেহ এবং প্রতারণা? সে স্নেহের বন্ধনই বা ছিঁড়ে গেল কি করে'?

—"আচ্ছা ও কি? কে কাঁদ্‌ছে নাকি? ও, বুঝ্‌তে পেরেছি। ছোটছেলের কান্না! তোমাদের খোকা কাঁদ্‌ছে, না? বিনয় তাকে নিয়ে ছাদে বসে' আছে বুঝি? নিয়ে এসো না একবার? দেখি, তোমাদের খোকা কেমন হয়েচে? লক্ষ্মী বিনু, একবারটী নিয়ে এস, তাকে দেখি।

—"বেশ! তাকে আন্‌লে না তো? আমার আর কথা শুন্‌বে কেন? তা' যাক্‌। এর জন্যে কিন্তু আজ আর অভিমান কর্‌বো না!

—"হ্যা, মানে, আজ যে কথা বল্‌তে এসেছিলুম। বিনু, আজ সত্যি করে' বলো যে, পুরাণ কথা সব ভুলে যাবে। এস, আবার আমরা নতুন করে' জীবন আরম্ভ করি। অতীতে যে কলুষ আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করেছিল, এস আজকে আমরা তাকে নবীন জীবনের প্লাবনে স্নাত করে' তুলি। বলো বিনু, বলো, একবার বল—"

বীরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্ত্রী-মূর্ত্তিটীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিতে লাগিল—"বিনু, বলো, একবার বলো! এই একঘণ্টা ধরে' তোমার সঙ্গে অনর্গল বকে' গেলুম, তুমি কিছু বল্‌লে না। কিন্তু শুধু একটীবার আমার কথার উত্তর দাও বিনু!"

বীরেন স্ত্রী-মূর্ত্তিটীর হাত ধরিয়া বলিতে গেল, কিন্তু সে ছোঁয়া দিল না। মূর্ত্তিটী ক্রমশঃ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার পর সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। বীরেনও তাহার পিছনে কাকুতি করিতে করিতে চলিল—"বিনু, আর কিছু বল্‌বার দরকার নেই, শুধু একটীবার আমার কথার উত্তর দাও—"

ঘরের ভিতরের ম্লান আলোটা মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখে মিলাইয়া গেল। বাড়ীটার সমস্ত আধার যেন তরল 'লাভা'র মত গলিয়া আসিয়া তাহার চারিপাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বীরেন 'বিনু! বিনু!' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া গেল। পড়িয়া গিয়া গড়াইতে গড়াইতে একেবারে মুক্ত সদর দরজা দিয়া গলিয়া রাস্তায় আসিয়া ঠেকিল। তখন তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে কাহার ঝাঁকুনিতে তাহার চমক ভাঙ্গিল। উঠিয়া দেখিল সে পুলিশের কবলে। পাহারাওয়ালা বলিতেছে—"এই বাবু, এ বাড়ীমে কোই নেহি হ্যায়, কাহে ভিতরমে গিয়া? চলো থানামে।"

* *

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিতে বীরেন দেখিল সে হাজতের মধ্যে।

হাজত-ঘরের গরাদওয়ালা দরজা দিয়া দেখা যাইতেছিল সম্মুখের ঘরটায় দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—"আর একবার রেকর্ড বইটা থেকে কেসটা পড়ুন তো।"

অপর লোকটী একটা মোটা বাঁধান খাতা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। আমরা এখানে তাহার বাঙলা অনুবাদ দিলাম :—

"গত ২৬-এ নভেম্বর রাত্রে কে বা কাহারা ধারালধারে শ্রীমতী বিনোদিনীর গৃহে প্রবেশ করিয়া নিদ্রাবস্থায় তাহাকে, তাহার স্বামী ও শিশু-পুত্রকে ছোরার দ্বারা হত্যা করিয়া গিয়াছে। স্বামী এবং শিশুটীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

"পুলিশে এজাহার দিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিনোদিনী জীবিত ছিল। সে তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে বলে যে—সে হত্যাকারীকে চিনিতে পারে নাই। তবে তাহার মুখ কোন পরিচিত যুবক-আত্মীয়ের বলিয়াই মনে হয়।

"বহু তদন্ত করিয়াও পুলিশ অদ্যাবধি হত্যাকারীকে ধরিতে পারে নাই। এখনও পর্য্যন্ত তাহার খোঁজ হইতেছে।"

এইটুকু শুনিবার পর বীরেন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"শুনচেন? ও মশায়, আর একবার ঐখানটা পড়ুন তো।"

লোক দুইটীর মধ্যে একজন সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল। তাহার পর বলিল—"আচ্ছা, আর একবার পড়্‌তে পারি, কিন্তু আপনি একটা কথা বলুন তো। আপনি ঐ বিনোদিনীকে জান্‌তেন, না?"

বীরেন বলিল—"জান্‌তুম না আর মশায়, শুধু জান্‌তুম—"

পুলিশ কর্ম্মচারীটী বলিল—"থাক্‌, আর বল্‌তে হবে না। কোর্টেই ওখানটা আর একবার পড়্‌তে শুন্‌বেন 'খন।"

অমিয়কুমার ঘোষ

অভাবনীয়

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

যাহাকে লইয়া এই গল্প, সে কংগ্রেসের নেতা নয়, বিপ্লবী দলের নায়কও নয় এবং সমাজ-সংস্কারক ত নয়ই। লিখিতে বসিয়া চিত্তপ্রিয়কে লইয়া গল্পলেখা মুস্কিল হইয়া পড়ে। মানে, ওর মধ্যে গল্প লিখিবার উপাদান তেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর আর পাঁচজনের মত সেও সাধারণ একটি মানুষ। হৃদয়ে মহৎ প্রবৃত্তির হয় ত কিছু আছে (যাহা লইয়া গল্পলেখা চলে) কিন্তু বাহিরে তা' প্রকাশ পায় না। তবুও তার মনের যে গোপন কথাটি আমরা গোপনেই জানিতে পারিয়াছি, আজ না হয় তাহা লইয়া একটি গল্প সুরু করা যাক্।

সে কথাটি এই—চিত্তপ্রিয় ভালবাসে সুনন্দাকে। তা' বাসুক। কিন্তু সুনন্দা?

সে খোঁজ চিত্তপ্রিয় লয় নাই—লইবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। সে ভালবাসিয়াছে সুনন্দাকে শুধু ভালবাসার নেশায় মাতিয়া, তাই প্রতিদানের কোন প্রশ্ন তাহার মনে জাগে নাই। ভালবাসার মাঝে যে আনন্দ, সে শুধু সেইটুকুই পাইতে চায়—অন্য কিছু নয়।

কিন্তু সত্য কি তাই? তবে কিসের আশা থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনের মাঝে নিরন্তর উঁকি মারিতে থাকে। কি যেন তাহার নাই, কি যেন সে নিতান্ত আপনার বলিয়া পাইতে চায়। কি সে? কি সে?...

হায়রে, সে যে কি তা' সে নিজেই ভাল করিয়া জানে না। তবু ভাবে।

ভাবে, সুনন্দার কথা, নিজের কথা, আর তারি সঙ্গে ভাবিয়া চলে তাহার অতীত জীবনের কথাগুলি—

সেনহাটীর এক অখ্যাত পরিবারে তাহার জন্ম। স্নেহ দিয়া, ভালবাসিয়া আপনার বলিয়া ডাকিয়া লইবার লোক ত দূরের কথা, নিতান্ত একটা 'আহা, উহু' বলে, এমন লোকও সংসারে তাহার কেহ ছিল না। অনাত্মীয়ের গৃহে অনাদর আর অবহেলার মধ্য দিয়া কোনপ্রকারে চলিয়া চলিয়া সে তাহার এই জীবনটাকে যৌবনের দুয়ারে টানিয়া আনিতে আনিতে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তারপর? তারপর?

ভবিষ্যতের অন্ধকারে সে উঁকি মারে, কিন্তু দৃষ্টি তাহার বারবার অন্ধকারের গায়েই প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

বৈশাখী রাত্রের আকাশ। মেঘের উপর মেঘ জমিয়া আকাশটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে। চাঁদ নাই, তারা নাই, সারা আকাশের গায়ে কোথাও সামান্য একটু আলোর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। চিত্তপ্রিয় ভাবে, ঐ আকাশ—সে যেন তাহারই জীবনের প্রতিচ্ছবি।

সত্যই ত তাই। জীবন ত তাহার ঐ আকাশের মতই অন্ধকার। কোনদিন অতি তুচ্ছ একটি প্রদীপ জ্বালিয়াও কেউ ত তাহার হৃদয়ের সেই অন্ধকার দূর করিতে চেষ্টা করে নাই। ভবিষ্যতে কবে কে জ্বালিবে—আর জ্বালিবে কি না তাই বা কে জানে!

সুনন্দাকে সে ভালবাসিয়াছে এই কথা কোনদিনই সুনন্দার কাছে গিয়া সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবে না। বলিবার অধিকারও তাহার ছিল না। সহায়-সম্পদহীন, নিরাশ্রয়, তাই এই গৃহের সামান্য এক গৃহশিক্ষক সে। তাহার ত কোন অধিকার থাকিতে পারে না সিভিলিয়ান মিঃ কে কে গুপ্তের একমাত্র আদরের কন্যা সুনন্দাকে লাভ করা। তবে?

কিন্তু অধিকারের গণ্ডী দিয়া মনকে বাঁধা যায় না, সে

চায় সেই গণ্ডী পার হইয়া ছুটিয়া যাইতে। তাই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি সে কেবল ভাবিয়াই চলে। ভাবে, তাহার এই ভাবনার জাল কবে ছিন্ন হইবে।

সন্ধ্যা হইতে আকাশ জুড়িয়া মেঘ করিয়াছিল, তাই বর্ষণ সুরু হইতেও বড় বেশী বিলম্ব হইল না। বাহিরের সেই অবিশ্রাম বারিপাত, তারি সঙ্গে ঝড়ের মাতামাতি। কালবৈশাখীর এই তাণ্ডব-লীলা চিত্তপ্রিয় চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ঝড় ত আজ তাহারও হৃদয়ে দেখা দিয়াছে। কিন্তু সে চায় ঝড়ের এই আন্দোলন একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিতে। রুদ্ধ করিতে গিয়া হয় ত তাহার অনেক কিছুই ক্ষতি হইবে ...হয় ত তাহার জীবনধারায় অনেক কিছুর পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। তবুও ঝড়ের এই আন্দোলন তাহাকে রুদ্ধ করিতেই হইবে।

সুনন্দার চিন্তা আর সে করিবে না, তাহাকে সে ভুলিবে। ভুলিতে গিয়া যদি তাহার চক্ষে অশ্রু আসে, তবে সে অশ্রু সে মুছিয়া ফেলিবে। সুনন্দা যে গাছের পাখী, তাহাকে সে ত খাঁচায় বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না।

একখানা মোটর 'লনে'র মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রী শব্দ করিতে করিতে থামিয়া গেল। তাহার সুতীব্র আলো খোলা দরজা দিয়া চিত্তপ্রিয়ের চোখে পড়িতে তাহার চিন্তার জাল ছিন্ন হইল।

বাহির হইতে ডাক আসিল—বয়।

ডাক শুনিয়া বয় বাহিরে ছুটিয়া গেল এবং যাহাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল সে মিঃ গুপ্তের বন্ধুপুত্র বিনায়ক।

বিনায়কের সুন্দর সুদীর্ঘ দেহ সাহেবী পরিচ্ছদে আবৃত। হ্যাট আর ওয়াটারপ্রুফ্‌টা খুলিতে খুলিতে বিনায়ক বয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—সাহেবকো খবর ভেজো।

হুকুম তামিল করিতে বয় ছুটিল।

সম্মুখের 'র‍্যাক্'টার উপর হ্যাট এবং ওয়াটারপ্রুফ্‌টা রাখিয়া চিত্তপ্রিয়ের দিকে চাহিয়া বিনায়ক বলিল—আপনাকে চিন্‌তে পাচ্ছি না যে?

চিত্তপ্রিয় এতক্ষণ বিনায়কের মুখের পানে চাহিয়াছিল। প্রশ্ন শুনিয়া বলিল—সুবিমল আমার ছাত্র। সুবিমল সুনন্দার ছোট ভাই।

বিনায়ক কহিল—ও। তারপর একটা সিগারেট্ ধরাইয়া নিজেই নিজের পরিচয় দিল। বলিল, আমার বাবা ছিলেন মিঃ গুপ্তের একজন 'পারসোনাল্ ফ্রেণ্ড।' ছেলেবেলা থেকে আমার জীবনের অনেকটা সময় প্রায় এই বাড়ীতেই কেটেছে।

তারপর সিগারেটের ছাইটুকু ঝাড়িয়া লইয়া সে আবার বলিল, 'টুরে' বেরিয়েছিলাম একবার ও দেশগুলোয়। সেখান থেকে বম্বে ফিরেছি দিন দশেক আগে। বম্বে আস্‌বার পর মিঃ গুপ্তকে খবর দিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে আজই এসে পৌছাব এ খবর এঁদের পাঠাই নাই। কারণ, মাথায় খেয়াল ঢুক্‌ল যে, হঠাৎ এসে সকলকে 'সারপ্রাইজ্' করে' দেওয়া যাবে।

এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

চিত্তপ্রিয় দুই হাত তুলিয়া বিনায়ককে নমস্কার করিল।

বিনায়কও প্রতি নমস্কার দিল।

দেওয়ালের গায়ে বড় ক্লকটা অবিরাম ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া চলিয়াছে। বাহিরের ঝড়-বাদলের মাতামাতির শব্দে তাহার সে ক্ষীণ শব্দটুকু মাঝে মাঝে ডুবিয়া যাইতেছে। বিনায়কের সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরের অনেকটা স্থান আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই ধোঁয়ার জাল ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে চিত্তপ্রিয়ের দৃষ্টি গিয়া পড়িতেছিল বিনায়কের মুখের উপর।

বয়ের কাছে খবর পাইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিলেন মিঃ গুপ্ত। বিনায়কের একখানা হাত তাঁহার হাতের মধ্যে লইয়া ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলিলেন—নটি বয়, নটি বয়, আজ যে আস্‌বে সে খবর পাঠাও নি কেন? সুনন্দাকে নিয়ে ষ্টেশনে থাক্‌তুম। এই ঝড়-বাদলে আস্‌তে নিশ্চয়ই তোমার অসুবিধা হয়েছে?

বিনায়ক মৃদু হাসিয়া বলিল—না, তেমন কিছু অসুবিধা আমার হয় নি। এখানে হঠাৎ এসে পড়ে' আপনাদের সকলকে 'সারপ্রাইজ্' করে' দেব বলে' আগে কোন খবর পাঠাই নি।

গুপ্ত সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন—দুষ্ট, দুষ্ট—

বয়ের কাছে খবর পাইয়া সেখানে শুধু মিঃ গুপ্তই আসিলেন না, একটু পরে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল সুনন্দাও।

সুনন্দার মুখের পানে চাহিয়া চিত্তপ্রিয় একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। ঘরের সেই উজ্জ্বল আলোকে সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে, সুনন্দার সারা মুখখানা একটা কিসের আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

দুই

চিত্তপ্রিয়ের চক্ষু ভুল দেখে নাই; সুনন্দা ভালবাসে বিনায়ককে। এবং হয় ত বিনায়কও। কিন্তু তাহাতে তাহার কি? সুনন্দা বিনায়ককে ভালবাসুক আর নাই বাসুক, তাহাতে তাহার কি আসে যায়? তবে সে কেন ব্যথিত হয় সুনন্দার চোখের দৃষ্টি এবং মুখের উজ্জ্বলতা দেখিয়া?

সে ত ঠিক্ই করিয়াছে—সুনন্দার চিন্তা সে তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিবে। তবে কেন তাহার এই চঞ্চলতা? না, সে আর ভাবিবে না। সুনন্দার চিন্তা সে আর কিছুতেই তাহার মনের মধ্যে স্থান দিবে না।

চিত্তপ্রিয় প্রতিজ্ঞাই করিল।

পরদিন প্রভাতে, নিশিভোরের সঙ্গে-সঙ্গেই চিত্তপ্রিয়ের মনে হইল যে, তাহার মধ্যে যে গ্লানি ছিল, গত রজনীর অন্ধকারে তাহা যেন মিলাইয়া গিয়াছে। আজ যেন তাহার মন এই শুভ্র প্রভাতের মতই নির্ম্মল।

সে ডাকিয়া পাঠাইল সুবিমলকে। এবং এই প্রভাত-কালে তাহাকে লইয়া মনের আনন্দে তাহার সঙ্গে বসিয়া বসিয়া গল্প সুরু করিয়া দিল।

একটির পর একটি করিয়া সুবিমলের কাছ হইতে চিত্তপ্রিয় সুনন্দা আর বিনায়কের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিয়া লইল। সে বুঝিল, সুনন্দা আর বিনায়ক পরস্পর পরস্পরকে বহুদিন হইতে ভালবাসিয়া আসিয়াছে।

চিত্তপ্রিয় ভাবিল, এ ভালই হইয়াছে। তাহাদের এই ভালবাসার কথা জানিতে পারিয়া সে খুসীই হইয়াছে। আর সে মনে কোন ক্ষোভ রাখিবে না, কোন দুঃখ রাখিবে না। ভগবানের কাছে সেও প্রার্থনা করিবে, ইহাদের মিলন যেন সার্থক হয়, ধন্য হয়।

দেবতার উদ্দেশ্যে সে বারবার প্রণাম করিয়া কহিল, তাহার চিত্তে আর যেন চাঞ্চল্য না আসে। সে যেন এই মিলন-পিয়াসীদের মিলনের অন্তরায় না হইয়া দাঁড়ায়।

চিত্তপ্রিয় তাহার মনে কোন ক্ষোভই আর রাখিতে চায় না; প্রাণের মাঝে আনিতে চায় এক নূতন উদ্দামতা। তাই সে বিমলকে কহিল, চলো বিমল, বাইরে থেকে একবার ঘুরে আসি।

এ যে বেড়াইবার সময় নয় তাহা ভাবিল না, এবং বাহিরের প্রচণ্ড রৌদ্রের পানে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

কিন্তু সুবিমলের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিবামাত্র তাহার পা দু'টা যেন একেবারে অচল হইয়া গেল। তাহার সমস্ত উৎসাহই নিভিয়া গেল। শুধু সে সুবিমলকে বলিল, আজ আর বেড়াতে যাব না বিমল, শরীরটা হঠাৎ বড় খারাপ লাগ্‌ছে।

বাহিরের 'লনে' সুনন্দা সেই রৌদ্রের মাঝে দাঁড়াইয়াই একটী তাজা লাল গোলাপ তুলিয়া বিনায়কের বুকে গুঁজিয়া দিতেছিল।

সেইদিকে চাহিয়া আবার চিত্তপ্রিয়ের চিত্তে চাঞ্চল্য আসিল। সে তাহার প্রতিজ্ঞা ভুলিল এবং তাহার সেই দেবতার উদ্দেশ্যে বারবার প্রণাম করা তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল।

তিন

কিন্তু ঐ উপরে যিনি একজন আছেন, তিনি যে কাহার ললাটে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, কাহার ভাগ্যের মাপকাটী কতটুকু নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, কেহ কি তাহা পূর্ব্বে বলিতে পারে। পারে না। আর পারে না বলিয়াই কতজন শুধু বর্ত্তমানকে ধ্রুব ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। মুহূর্ত্তের জন্য হয়ত একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, ইহাই সত্য নয়, এ ছবিও হয় ত মুছিয়া যাইতে পারে। দুঃখের বোঝায় যাহারা কাঁদিয়া মরে, তাহারও হয় ত একবার ভাবিতে পারে না, দুঃখের স্থানে সুখও একদিন তাহাদের আসিতে পারে।

নহিলে কে কবে ভাবিয়াছিল, না ভাবিতে পারিয়াছিল যে, এই অতি সাধারণ প্রাইভেট্ মাষ্টারকে সম্বল করিয়াই সুনন্দাকে একদিন তাহার জীবনতরী ভাসাইতে হইবে। তখন কোথায় রহিবে বিনায়ক, আর কোথায় রহিবে তাহার ভালবাসা।

কিন্তু সে কথা পরে। উপস্থিত কি করিয়া এই অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল, সেই কথাই এখন বলিতেছি।

বৈশাখের এক সন্ধ্যা। চিত্তপ্রিয় আজ বেড়াইতে বাহির হয় নাই। উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরিয়াই বা কি ফল? সংসারে বোধ হয় সেই একটীমাত্র মানুষ, যাহার কোন বন্ধু-বান্ধব নাই, আত্মীয়-স্বজন নাই, এতবড় পৃথিবীতে সেই কেবল একা। সারাটা জীবন তাহার শুধু দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে একটু আশ্রয়ের জন্য—কিন্তু সত্যকারের আশ্রয় তাহার ভাগ্যে আজও মিলিল না।

এখানেও তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। প্রাণ চাহিতেছে, এখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইতে, কিন্তু তাহাও ত সে পারিতেছে না। এ কি মোহ! এ কি অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা তাহার! ভাবিয়া মরে, তথাপি সে ইহার কূল-কিনারা দেখিতে পায় না।

সুনন্দা তাহার সম্মুখে আসিয়া কোনদিনই কোন কথা কহে নাই, দূর হইতে সে শুধু সুনন্দার গানের সুর শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। সুবিমলকে লইয়া 'লনে'র মাঝে কারণে অকারণে যখন সুনন্দা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, সে দূর হইতে শুধু সেইদিকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছে। তৃপ্তি হয় ত তাহাতেই সে এতদিন পাইয়াছে।

কিন্তু এখন? বিনায়কের আসিবার পর সুনন্দা গান গাহিয়াছে হয় ত পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী, কিন্তু তাহার গানের সেই সুরে ত চিত্তপ্রিয়ের চিত্ত আর দুলিয়া উঠে না। সুনন্দাকে লইয়া বনের মাঝে বিনায়ক যখন ঘুরিয়া বেড়ায়, কথা কহিতে কহিতে সুনন্দা যখন উচ্চ-শব্দে হাসিয়া উঠে, তখন তাহার সেই হাসি শুনিয়া তাহার অন্তর জ্বালা করিয়া উঠে কেন? ভিক্ষুকের এ কি বাসনা! ভাবে, কেন তাহার এমন হইল? ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়ে।

সুনন্দাদের কেহ তখন বাড়ীতে ছিল না। মিঃ গুপ্ত সকলকে লইয়া 'চিত্রা'য় 'মীরাবাঈ' দেখিতে গিয়াছেন। বিনায়কও সঙ্গে গিয়াছে। ফিরিতে তাহাদের হয় ত রাত্রিই হইবে।

চিত্তপ্রিয় বাহিরের বারান্দায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে-ছিল। বায়স্কোপে সুনন্দা কোথায় বসিয়াছে। মিঃ গুপ্তের পার্শ্বে, না বিনায়কের পার্শ্বে। সুবিমল নিশ্চয় তাহার পিতার পার্শ্বে বসিয়াছে। আর সুনন্দা—বিনায়কের পাশের আসনখানায় বসাই ত তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। বেশ আছে ওরা—যৌবন, স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য্য কোনটারই অভাব ভগবান উহাদের রাখেন নাই। এই ত জীবন! কিন্তু তাহার?...

একখানা ট্যাক্সি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। চিত্তপ্রিয় উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, মিঃ গুপ্তেরা ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ভাল করিয়া চাহিতেই সে দেখিতে পাইল সুশ্রী, সুবেশা এবং সম্পূর্ণ আধুনিক একটী মেয়ে মোটর হইতে নামিয়া বারান্দা পার হইয়া সোজা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। সঙ্গের বেয়ারাটি মোটর হইতে গোটা দুই মাল নামাইয়া লইল। ট্যাক্সি চলিয়া গেল, আর চিত্তপ্রিয় সেখানে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এ আবার আসিল কে?

কিন্তু ভাবিতে তাহাকে বেশীক্ষণ হইল না, কিছু পরে মেয়েটী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহারই মধ্যে পূর্ব্বের পোষাক সে ছাড়িয়া আসিয়াছে, এবং আসিয়া কিছুমাত্র দ্বিধা বা ইতস্ততঃ না করিয়া চিত্তপ্রিয়ের সম্মুখের আসন-খানা টানিয়া লইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—এরা সব 'সিনেমা'য় গেছেন শুনলাম। বন্ধ ঘরে একা কাটাতে মন চাইল না, তাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

চিত্তপ্রিয়ের পরিচয় হয় ত সে ভিতর হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

কিন্তু এই প্রস্তাবে চিত্তপ্রিয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমনি

ধরণের কোন মেয়ের সম্মুখে তাহাকে কোনদিন উপস্থিত হইতে হয় নাই এবং এমনিভাবে আলাপ করিতেও সে কোনদিন অভ্যস্ত ছিল না। এমন করিয়া কোন মেয়ে যে যাচিয়া আসিয়া আলাপ করিতে পারে, তাহা হয় ত ইহাকে দেখিবার পূর্ব্বে সে ভাবিতেও পারিত না। তাই মেয়েটী যখন তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য নিতান্ত অসঙ্কোচে সম্মুখের আসনখানার জম্‌কাইয়া বসিল, তখন তাহাকে সত্য সত্য অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে হইল।

মেয়েটি কিন্তু চিত্তপ্রিয়ের এই অবস্থা তেমন লক্ষ্য করিল না। কহিল, সুনন্দার বোন্ আমি, নাম তাই সুগন্ধা। সুনন্দার বাবা আমার জ্যেঠামশায়। আমরা থাকি এলাহাবাদে।

চিত্তপ্রিয় সুগন্ধাকে নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আপনার আস্‌বার কথা এঁরা কি জান্‌তেন না ?

সুগন্ধা কহিল, না, জ্যেঠামশায়কে দেখ্‌বার হঠাৎ ইচ্ছা হ'ল। বাবার মত করে' আমাদের ঐ বুড়ো বেয়ারা-টাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে রওনা হ'য়ে পড়্‌লুম।

সুগন্ধার দিকে চাহিয়া চিত্তপ্রিয় ভাবিতেছিল, কি আশ্চর্য্য এই মেয়েটী! একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে যাচিয়া আলাপ করিতে ইহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। সেই সুদূর এলাহাবাদ হইতে একটীমাত্র চাকরের সঙ্গে চলিয়া আসিতে ইহার একটুও বাধে না।

মিঃ গুপ্তের বেয়ারা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল—আপনার চা কর্‌ব দিদিমণি?

সুগন্ধা কহিল—হাঁ্যা, দু' কাপ্ চা এখানেই নিয়ে এস।

বেয়ারা চলিয়া গেল। চিত্তপ্রিয় একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল—সুনন্দা আর সুগন্ধা, আপনাদের নামের বেশ মিল রয়েছে। আচ্ছা, আগে সুনন্দা না আগে সুগন্ধা ?

চিত্তপ্রিয়ের এই প্রশ্ন এখনই করা হয় ত চারিদিক ভাবিয়া দেখিলে চলে না। এই প্রশ্ন কতখানি আলাপ হইবার পর করা চলে, তাহার মাপকাটি তাহার জানা ছিল না। সাধারণ, সরল মানুষ সে। মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে, অসঙ্কোচে সে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

সুগন্ধারও ইহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তাই সেও হাসিয়া জবাব দিল—আগে সুগন্ধা, তারপর সুনন্দা। আমাদের এ নাম জ্যেঠামশায়ই রেখেছিলেন, তাই এই মিল।

বেয়ারা চা আনিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া গেল।

চিত্তপ্রিয়ের দিকে এক কাপ্ আগাইয়া দিয়া সুগন্ধা তাহার কাপ্‌টী হাতে তুলিয়া লইবে, ঠিক্ এমনি সময় গৃহ দ্বারে মিঃ গুপ্তের মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। সুগন্ধাকে দেখিয়া সুনন্দা ও সুবিমল হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। সুনন্দা ছুটিয়া আসিয়া সুগন্ধার হাত ধরিয়া কহিল, সু' দিদি, তুমি?...

তাহার সারামুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সুগন্ধার সাম্‌নাসাম্‌নি সুবিমলের মাষ্টারকে নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মুখের সেই আনন্দ দীপ্তি যেন অনেকটা কমিয়া আসিল। মনে হইল, ইহা যেন মাষ্টারের এক অশোভন ও অন্যায় ব্যবহার।

সুগন্ধা আসিয়া তাহার জ্যেঠামশায়ের পার্শ্বে দাঁড়াইল। মিঃ গুপ্ত বিনায়কের সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

বিনায়কের কথা সুগন্ধা পূর্ব্বেই জানিত। চোখে দেখিল এই প্রথম।

বিনায়কের সঙ্গে পরিচিত হইবার পর সে চাহিল আর একবার চিত্তপ্রিয়ের দিকে।

মিঃ গুপ্ত সকলকে লইয়া সেখান হইতে ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

আর চিত্তপ্রিয়? চায়ের কাপ্‌টা সম্মুখে রাখিয়া তেমনি করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সম্মুখ হইতে তখন রাত্রির জ্যোৎস্না সরিয়া অন্ধকারে পৃথিবীর সব কিছুই মিলিয়া মিশিয়া যেন একাকার হইয়া গিয়াছে।

চার

সুগন্ধা আসিবার পর কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে।

সুবিমলের কাছ হইতে চিত্তপ্রিয় সুগন্ধার অনেক কথাই জানিয়া লইয়াছে। সুগন্ধার বাবা এলাহাবাদের একজন খ্যাতনামা ডাক্তার। সেখানে তাঁহার অগাধ

সম্পত্তি ও অসাধারণ প্রতিপত্তি। সুগন্ধাও লেখাপড়া করিয়াছে যথেষ্ট। অথচ, সকল দিক্ দিয়া সে কি শান্ত, কি ভদ্র।

চিত্তপ্রিয়ের সঙ্গে তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে। সে শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হইয়া যায় এই মেয়েটির কথা ভাবিয়া। কয় দিনই বা আসিয়াছে, অথচ ইহারই মধ্যে কত সাবধানে চিত্তপ্রিয়ের হৃদয়ের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া সে তাহার ব্যথার স্থানগুলা সব দেখিয়া লইয়াছে। তাই চিত্তপ্রিয়ের মনের গোপন কামনার কথা আজ সুগন্ধার নিকট অবিদিত নাই। তাহা জানিয়া চিত্তপ্রিয়ের মত সেও শুধু নীরবে দীর্ঘ-শ্বাসই ফেলিয়াছে। সুনন্দাকে সে চিনে – সাধারণ মেয়েদের মত সেও যে বাহিরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়, ভিতরের আবরণ খুলিয়া দেখিতে চায় না, হয় ত অবসরও পায় না, তাহা সে জানে।

সুগন্ধার ভাল লাগিয়াছে চিত্তপ্রিয়কে। কিন্তু তাহার ভাল লাগে নাই বিনায়ককে। ইহার কারণ হয় ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিবে না। তবু বিনায়কের অনেক কিছুই তাহার পছন্দ হয় না। বিনায়ক সময় অসময়ে যাচিয়া আসিয়া সুগন্ধার সঙ্গে আলাপ করিতে বসে এবং কথার উপর কথার জাল বুনিয়া দীর্ঘ হইতে দীর্ঘ সময় কাটাইতে চাহে। সে কথা কহে মার্জ্জিতভাবে, কিন্তু তাহার চোখের চাহনির মাঝে যে কামনার ইঙ্গিত উঁকি মারিতে থাকে, তাহা দেখিয়া সুগন্ধা অস্বস্তি অনুভব করে।...তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুগন্ধা বেশ বুঝিয়াছে যে, এই যুবকটী তাহার ভিতরের অনেক কিছুই বাহিরের একটা সুমার্জ্জিত আবরণ দিয়া সাবধানে এবং সযত্নে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সেই আবরণখানি তুলিয়া লইলে, কোন্ নগ্নরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে।

দুঃখ হয় সুনন্দার কথা ভাবিয়া। বিনায়কের সঙ্গে এতদিন মিশিয়া সে যাহা বুঝিতে পারে নাই, দুইদিন মিশিয়াই সুগন্ধা তাহা বুঝিয়া লইয়াছে।

সুনন্দা বুঝিবেই বা কি করিয়া? যৌবনের প্রথম দিনে, কোন কিছু ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই বিনায়ক তাহার রূপ, যৌবন ও কথার অভিনয়ে তাহার তরুণ চোখের অন্য কিছু দেখিবার দৃষ্টিটাকে সেই যে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, সে দৃষ্টি তাহার আজও খুলিল না।

দৃষ্টি হয় ত খুলে নাই, কিন্তু সেই দৃষ্টি আজ যেন একটু একটু করিয়া স্বচ্ছ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুনন্দা লক্ষ্য করিয়াছে বিনায়ক যেন সুগন্ধার সঙ্গ পাইতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। সুনন্দার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সুগন্ধার আগমন প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া থাকে। তাহার 'সিনেমা'য় যাইবার আগ্রহ আজকাল যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কোন কারণে যদি সুনন্দা নাও যাইতে পারে, তবুও সুগন্ধাকে লইয়া 'সিনেমা'য় যাইবার তাহার বাধা হয় না। কিন্তু কেন, কেন?...সুনন্দার অন্তর জ্বালা করে, অভিমানে বুক ফুলিয়া উঠে। একথা বিনায়ককে তাহার বলাও চলে না, বলিবার ইচ্ছাও হয় না।

সুনন্দার সবখানি রাগ গিয়া পড়ে সুগন্ধার উপর। সু' দিদির ত জানিতে কিছু বাকী নাই—তবুও জানিয়া শুনিয়া বোনের ভাবী স্বামীকে লইয়া এই ভাগ-বাটোয়ারা করিবার প্রবৃত্তিতে তাহার কি একটুও লজ্জা হয় না? ও কি করিয়া একা বিনায়কের সঙ্গে 'সিনেমা'য় যায়!... কেন যায়?...

ঈর্ষা হয় সুগন্ধার রূপের দিকে চাহিয়া। সে নিজে যে কতখানি সুন্দরী তাহা ত তাহার অবিদিত নাই। তবুও সুগন্ধার সৌন্দর্য্যের কাছে তাহার সৌন্দর্য্য যেন ম্লান হইয়া আসে। ঐ রূপ দিয়াই কি সে জয় করিয়া লইতে চায় বিনায়ককে?......

হায়রে, ঈর্ষার বিষে সে নিজেই শুধু জ্বলিয়া মরে, সুগন্ধার অন্তর ত সে দেখিতে পায় না।

যে কাহিনী লিখিতে হইলে পূর্ব্বেই তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লইতে হয়, এবং লিখিলেও যাহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তাহার সত্যতায় হয়ত সন্দেহ জন্মে—তাহাই যে কতখানি সত্য ও স্বাভাবিক তাহা শুধু যে লিখিতে চায়, সেই জানে।

আমার এই কাহিনী হয় ত অনেকের অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহারা হয় ত ভাবিবেন, মিথ্যাকে বিনাইয়া বিনাইয়া সত্য বলিবার এ কি প্রচেষ্টা! তবুও

যখন বলিতে বসিয়াছি, তখন কাহিনী যাহা তাহা আমাকে বলিতেই হইবে।

ইহার দিনকয়েক পরের এক সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-রূপেই যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা তুচ্ছ ও নয়, সামান্যও নয় এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই সুনন্দা, বিনায়ক ও চিত্তপ্রিয়ের জীবন-যাত্রার চাকা নিমেষের মধ্যে অন্যদিকে ঘুরিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় সুবিমলকে লইয়া সুগন্ধা 'লনে'র মধ্যে হাস্নাহেনার ঝাড়ের কাছে বসিয়া তাহার নিকট এলাহাবাদের গল্প করিতেছিল।

সন্ধ্যার পর সুবিমল উঠিয়া চিত্তপ্রিয়ের কাছে পড়িতে গেল। সুগন্ধা একাই বসিয়া রহিল। বেশ লাগিতেছিল তাহার হাস্নাহেনার মৃদু গন্ধভরা সুন্দর সন্ধ্যাটী। সুনন্দা তাহার ঘরে। মাথা ধরিয়াছে বলিয়া সে আজ বাহির হয় নাই। বিনায়কও কোথায় গিয়াছে। মিঃ গুপ্তও বাড়ীতে ছিলেন না।

পড়িবার ঘরে বসিয়া চিত্তপ্রিয় পড়াইতেছিল সুবিমলকে। সুবিমলকে বাহির হইতে দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু চিত্তপ্রিয়কে সেখান হইতে স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছিল। ঘরের উজ্জ্বল আলোকে তাহার মুখখানি উদ্ভাসিত। দু'-একটা চুল কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। গায়ে তাহার শুধু হাতে কাটা একটা গেঞ্জী—তাহার পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও সুগোল দেহের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া রহিয়াছে। সুগন্ধা চাহিয়াছিল চিত্তপ্রিয়ের দিকে এবং তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতেছিল, তাহা সেই জানে।......

পার্শ্বে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া ফিরিতেই দেখিতে পাইল, বিনায়ক কখন যেন একেবারে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুগন্ধার সামনের আসনটায় বসিয়া বিনায়ক কহিল—একা যে, সুনন্দা কই ?

সুগন্ধা কহিল—তার ঘরে। মাথা ধরেছে বলে' শুয়ে আছে।

বিনায়ক বলিল—ও।

শুধু একটু মাত্র 'ও' করিয়া সে ক্ষান্ত হইল। সুগন্ধা তাহার ব্যবহারের কথা ভাবিতে লাগিল।

বিনায়ক আর কোন কথা কহিল না। কিন্তু এ নীরবতা সুগন্ধার সহ্য হইতেছিল না, তাই সে বলিল—চলুন, এবার ওঠা যাক।

বিনায়কের উঠিবার কোন ইচ্ছাই দেখা গেল না। সে বলিল—বেশ লাগ্‌ছে হাওয়াটা, উঠ্‌তে আর ইচ্ছা হচ্ছে না।

সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও সুগন্ধার আর উঠা হইল না।

একটু পরে হাস্নাহেনার ঝাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিনায়ক কহিল—'লেডী অফ্ দি নাইট্' নাকি ওর নাম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আজকার 'লেডী অফ্ দি নাইট্' কে—ও, না আপনি ?

সুগন্ধা কোন উত্তর দিল না। ইহার উত্তর দিবার কিই বা আছে!

বিনায়ক কহিল—সত্যি, আজকার এই সন্ধ্যাটুকু আমার ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না আমার ভাল লাগে না, এমনি ফিকে জ্যোৎস্নাই আমায় মুগ্ধ করে। এই জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলো, হাস্নাহেনার মৃদু গন্ধ, এই শির্‌শিরে হাওয়া—এরই মধ্যে আপনি—আপনাকে দেখে আজ আমার মনে হচ্ছে, 'লেডী অফ্ দি নাইট্' ত নন্, আপনি হচ্ছেন 'কুইন্ অফ্ দি নাইট্!'

বলিতে বলিতে তাহার শেষের কথাগুলি যেন একটু ভারি হইয়া আসিল। চক্ষে তাহার সেই দৃষ্টি আবার ফুটিয়া উঠিল।...

কথার প্রসঙ্গ ঘুরাইবার জন্য সুগন্ধা হাসিতে হাসিতে কহিল—দেখ্‌বেন, এ কুইন্‌কে দেখে আবার যেন নিজের কুইন্‌কে না ভুলে যান।

কথার প্রসঙ্গ সুগন্ধা ঘুরাইতে চাহিলেও বিনায়ক তাহা চাহে না। আর তাহা চাহে না বলিয়াই হঠাৎ সে সুগন্ধার একখানা হাত ধরিয়া বলিল—না ভোল্‌বার জন্য ত বহু চেষ্টা করিছি, কিন্তু না ভুলেও ত কিছুতে থাকতে পার্‌লুম না সুগন্ধা।

হাত টানিয়া লইয়া সুগন্ধা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে

যেন এখান হইতে ছুটিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়। বিনায়কের দিকে চাহিতেও তাহার ভয় করে। ও যেন একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে—ওর চোখে-মুখে যেন আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সুগন্ধা উঠিতে উঠিতেই জোর করিয়া মুখে একটু হাসি আনিয়া কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা, ভুলেছেন ত, বেশ করেছেন। এইবার চলুন, ঘরে যাওয়া যাক্।

বিনায়ক উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। তাই নিমেষের মধ্যে সুগন্ধার দেহটাকে দু' হাত বাড়াইয়া নিজের বুকের উপর টানিয়া আনিয়া কহিল—এই রাণীকে পেলে সে ভোলার দুঃখ আমার একটুও থাকবে না। এই বলিয়া সে তাহার ব্যগ্র ওষ্ঠ সুগন্ধার চোখে মুখে বারবার চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

ঠিক্ এমনি সময় সুনন্দা আসিয়া দাঁড়াইল তাহার ঘরের জানালার ধারে। সেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকেও বিনায়কের আলিঙ্গনবদ্ধ সুগন্ধাকে চিনিয়া লইতে তাহার একটুও বিলম্ব হইল না। সেখান হইতে সে দুই হাতে মাথা চাপিয়া ফিরিয়া আসিয়া বিছানার উপর একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

পাঁচ

ইহার পরে সুগন্ধার চলিয়া যাইবার দিন পর্য্যন্তও সুনন্দা তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে নাই। বিনায়ককেও সে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিয়াছে। সুগন্ধা আর বিনায়ককে দেখিলেই তাহার অন্তর জ্বলিয়া উঠে। তাহার নিজের বাড়ীতে ইহাদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তাহাকে আজ চোরের মত পলাইয়া বেড়াইতে হইতেছে। বিনায়কের সুশ্রী দেহটা আজ তাহার চক্ষে কতবড় যে কুশ্রী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ভাবিয়া সে অবাক্ হইয়া যায়। সে আরও অবাক্ হইয়া যায়, এই লোকটাকে সে একদিন কি করিয়া ভালবাসিয়াছিল। বিনায়কের ভালবাসা শুধু অভিনয় হইলেও সে ত কোনদিন ভালবাসার অভিনয় করে নাই। সে ভাবে, এই সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া এই লোকটা তাহাকে বোকা পাইয়া কত না প্রতারণা করিয়াছে। ভাবে, হয় ত ইহা লইয়া বিনায়ক আর সুগন্ধার মধ্যে কতই না হাসাহাসি হইয়াছে। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসে।

যাহাদিগকে সে একদিন সারা হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়াছিল, আজ তাহারাই অবিশ্বাসের বাণ হানিয়া হানিয়া এই অবেলাতেই তাহার বুকখানাকে ভাঙ্গিয়া একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল।

আজ চিত্তপ্রিয়ের কথা তাহার মনে হয়। মনে হয়, বিনায়ককে ভাল না বাসিয়া সে যদি এমনি এক সাধাসিধা লোককে ভালবাসিত, তবে হয় ত তাহাকে আজ এমন করিয়া কাঁদিতে হইত না।

ইহার পর সুগন্ধা যেদিন চলিয়া গেল, সেদিন সুনন্দা ভাবিল, এইবার বিনায়কও যাইবে। কাকাবাবুর মত লইয়া হয় ত উহাদের এলাহাবাদে বসিয়াই বিবাহ হইবে। কিন্তু সে সমাজে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? সুনন্দা তাহার চোখের জল কিছুতেই রোধ করিতে পারে না।

কিন্তু যে মিথ্যাকে সত্য ভাবিয়া সুনন্দা জ্বলিয়া মরিতেছিল, সেই মিথ্যা প্রকাশ হইতেও বড় বেশী বিলম্ব হইল না। আর তাহা প্রকাশ করিয়া দিল সুগন্ধা নিজেই। এলাহাবাদ পৌছানর দুই-চারদিন পরে সুনন্দা সুগন্ধার নিকট হইতে এক সুদীর্ঘ পত্র পাইল।

ইহাতে হইল এই, একদিন সুনন্দা বিনায়ক আর সুগন্ধাকে সমান দোষে দোষী ভাবিয়া উহাদের উপর যতখানি বিমুখ হইয়াছিল, সুগন্ধার পত্র পাইবার পর তাহার সমস্ত বিরক্তি গিয়া পড়িল একা বিনায়কের উপর। সুতরাং যে লোকটী একদিন সকলের চাহিতে তাহার কাছে প্রিয় ছিল, সেই হইয়া পড়িল আজ তাহার চোখে সকলের চাহিতে অপ্রিয়।

সুগন্ধা লিখিয়াছে—

এলাহাবাদ
বুধবার

সুনন্দা,

আজ দু'দিন হয় এলাহাবাদ এসেছি। এই দু'দিন ধরে' কেবল তোদের কথাই মনে হচ্ছে—বিশেষ করে' তোর কথা।...আজ ভাবি, কি অশুভক্ষণেই না এবার কোলকাতা যাত্রা করেছিলাম। অশুভক্ষণ বই আর কি—নইলে আমাকেই কেন আজ তোর কাছে কতগুলো অপ্রিয় কাহিনী বল্‌তে হচ্ছে! তবে এই আমার সান্ত্বনা যে, সে কাহিনী অপ্রিয় হলেও—সত্য।

ভগবান মানুষ সৃষ্টি করলেন, কিন্তু তাদের চরিত্র করে' দিলেন এমন এক বৈচিত্র্যময়, যে বাহির দেখে ভেতর বুঝে নেবার সাধ্য কারও আর রইল না। তাই ত মানুষে যা' আশা করে না, ভাব্‌তে পারে না, হ'য়ে যায় তাই। তাই ত সুন্দরের মাঝে লুকিয়ে থাকে কুৎসিত। যে কুৎসিতকে দেখে আমরা মুখ ফিরিয়ে নি, হয় ত তারই অন্তর হয় কত সুন্দর!...

ধর্ বিনায়কের কথা। বাহির দেখে তার অন্তর যদি বিচার করতে হয়, হয় ত বল্‌তে হবে সুন্দরের অন্তর সুন্দরই। কিন্তু আশ্চর্য্য বোন্, যা' আমরা কোনদিনই ধারণা করতে পারি নাই, হ'ল তাই-ই। বিনায়কের

ভিতরটা যে কতখানি কুৎসিত, সে পরিচয় যদি না পেতাম, তবে হয় ত কোনদিন তা' ধারণাই করতে পারতুম না।

তুই হয় ত কিছুই বুঝতে পারছিস না, তাই তোকে আজ আমি সব খুলেই লিখছি। তোর হয় ত ধারণা সুনন্দা, যে বিনায়ক তোকে ভালবাসে। কিন্তু সে ধারণা যে তোর কতবড় মিথ্যা, তা' হয় ত এই চিঠির শেষ পড়েই বুঝতে পারবি।

তোর ওপর বিনায়কের যা' ছিল, তাকে ভালবাসা বললে ভালবাসার শুধু অপমানই করা হয়। যা' ছিল, সে হচ্ছে লোভ—তোর দেহটার উপরই ওর ছিল লোভ—তোর ওপর নয়। ও যদি সত্যই তোকে ভালবেসে থাকবে, তবে ও কি আসতে পারে আমারই কাছে কখনও প্রেম-নিবেদন করতে ?

তুই লক্ষ্য করেছিস কি না জানি না। কিন্তু করাই ত স্বাভাবিক। আমি আসার পর থেকে ও তোর সঙ্গ ধীরে ধীরে ছাড়বার চেষ্টা করছিল কেন, তোকে হয় ত তা' বুঝিয়ে দিতে হবে না।...

তারপর বলি সেদিনের কথা। যেদিন মাথা ধরেছিল বলে' তুই তোর ঘরে শুয়েছিলি, আর আমি সুবিমলকে নিয়ে 'লনে'র মাঝে বসে' গল্প করছিলাম। সন্ধ্যা হতেই সুবিমল উঠে গেল, আর আমি সেইখানে একা বসে' বসে' তার কথা ভাবছিলাম—সে তোদের বাড়ীরই একজন। তার দিকে তোরা কোনদিন চেয়েও দেখিস নি—সেই চিত্তপ্রিয়বাবুর কথাই।

এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়াল বিনায়ক। দু'-একটা মামুলী কথায় সে আরম্ভ করল কবিত্ব—কি সুন্দর রাত্রি! কি সুন্দর হাওয়া! কি সুন্দর হাস্‌নাহেনার মিষ্টি গন্ধটুকু! আর সবচেয়ে কি সুন্দর না কি আমি—

ওর কবিত্ব দেখে ওর মনের কথা জানতে আমার এতটুকুও বিলম্ব হ'ল না। তাই উঠলাম, সেখান থেকে পালিয়ে আসতে। কিন্তু সেই নীচ, ভদ্রতার আবরণ দিয়ে ঘেরা সেই পশু জোর করে' নিমেষের মধ্যে আমায় তার বুকের ওপর টেনে নিয়ে তার বিষাক্ত চুম্বন এঁকে দিল আমার মুখের ওপর—যার জ্বালায় এখনও আমি পুড়ে পুড়ে মরছি···

সুনন্দা, বোন! হয় ত তুই আঘাত পাবি, হয় ত জ্যেঠামশায় দুঃখ পাবেন, কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস? মনে হয়, দুঃখটা বরণ করে' নেওয়ার চেয়ে দুঃখটা দেওয়াই ভাল—যেখানে বোঝা যায় দুঃখ দেওয়াটা চিরস্থায়ী হবে না, নেওয়াটাই হবে চিরস্থায়ী।

সুতরাং ঐ পশুকে তোর ভুলতেই হবে। ভুলতে হবে এই জন্য যে, ও তোর ভালবাসা পাবার উপযুক্ত নয় বলে'।

দেখ্ সুনন্দা, এখানে আর একজনের কথা না বললে চিঠিখানা একেবারে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমি চিত্তপ্রিয়বাবুর কথা বলছি। তুই হয় ত জানিস না, জানতে চেষ্টাও করিস নি, হয় ত ভাবতেও পারিস্ নি—সেটা কি জানিস? দেখ্, তোকে যদি এই সংসারে সত্যিকার ভাল কেউ বেসে থাকে, তবে সে আমাদের ঐ চিত্তপ্রিয়বাবু। হয় ত, তুই অবাক্ হয়ে ভাবছিস্, সে আবার কি! কিন্তু বোন্, তুই যদি অন্ধ না হতিস্—ভুলেও যদি একবার ওঁর মুখের পানে চাইতিস্, তবে বুঝতে পারতিস্ আমি কি বলছি। তোর ওপর ওঁর ভালবাসা যে কত গভীর, তা' জেনেছেন ভগবান, আর জেনেছি আমি।···তোকে বলতে আজ আমার বাধা নাই, ও যদি তোকেই শুধু এমন করে' না চাইত, তবে আমিই ওঁকে মাথায় তুলে নিতাম!···

ওঁর হয় ত ঐশ্বর্য্য নাই, আভিজাত্যের গৌরব নাই, কিন্তু ওঁর যা' আছে, সংসারে কম লোকেরই তা' থাকে। সে হচ্ছে ওঁর মহৎ প্রাণ—যার দাম কোন কিছুর চাইতেই কম নয়।

তোকে বেশী বলা বাহুল্য। সমস্তই খুলে লিখলাম। লেখা কর্ত্তব্য মনে হ'ল বলে। তুই আমার ছোট বোন্—বোনের মতই তোকে ভালবাসি বলে'।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুই একদিন যেন সত্যিকারের সুখী হোস্।

জ্যেঠামশায়কে আমার প্রণাম দিস্।

তোর সু' দিদি

একবার দুইবার করিয়া বহুবার সুনন্দা চিঠিখানা পড়িল। পড়িতে পড়িতে মন তাহার নানা চিন্তায় দুলিয়া উঠিতে লাগিল। চিত্তপ্রিয়ের কাছে বিনায়ককে দাঁড় করাইতে গিয়া আজ যেন তাহার সত্যই বিনায়ককে অত্যন্ত খাটো বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সু' দিদি মিথ্যা লেখে নাই। সত্যই সে ডুবিতে বসিয়াছিল। না, পঙ্কের মধ্যে ডুবিতে সে চায় না—পারিবেও না।

কাহাকেও অবলম্বন করিয়া আজ তাহাকে আবার বাঁচিয়া উঠিতে হইবেই—অবলম্বন তাহার চাই!...সুগন্ধার পত্র সে আবার পড়িল। তাহাই হইবে—চিত্তপ্রিয়কে অবলম্বন করিয়াই সে আবার বাঁচিয়া উঠিবে!···

আজ এই দুঃখের মধ্যেও সে আনন্দ পাইল এই কথা ভাবিয়া—যে, একজন তাহাদের বাড়ীতে বসিয়া এতদিন নীরবে তাহারই পূজা করিয়া আসিতেছে। সে পূজার প্রচার সে হয় ত ঢাক ঢোল বাজাইয়া করিতে চাহে নাই,

তবুও সেই পূজার দান আজ সুনন্দার কাছে বহু মূল্যের বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু কি করিয়া, কেমন করিয়া সে বিনায়কের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবে? পিতাকে সব কথা বলিবেই বা কি করিয়া?

সুনন্দা ভাবিতে লাগিল। হাঁ, তাহাই করিবে। সে আর বিলম্ব করিতে চাহে না, করিতে পারিবেও না। চিঠিখানা পিতার হাতে ফেলিয়া দিয়া সে আজ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

কিন্তু পিতার অফিস্-ঘরে আসিতে গিয়া বিনায়কের মুখে তাহারই নাম শুনিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল। বিনায়ক তখন তাহারই কথা কহিতেছিল। বলিতেছিল, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা—সুনন্দারও।

মিঃ গুপ্ত কহিলেন—আমার ইচ্ছা, সুনন্দার পরীক্ষা যখন শেষ হয়েছে, তোমার দিক্ দিয়েও কোন বাধা নাই, তখন আমি বলি, এই আষাঢ়েই শুভ কাজটা শেষ হ'য়ে যাক্। কি বল?

বিনায়ক মুখে একটু সলাজ হাসি আনিয়া বলিল—বেশ, তাই হবে।

সুনন্দা বুঝিল, এ তাহার বিবাহের কথা হইতেছে। কিন্তু তাহার বিবাহের কথা লইয়া বিনায়ককে হাসিয়া কথা কহিতে দেখিয়া তাহার অন্তর একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতেছিল, যদি একটা চড় মারিয়া বিনায়কের মুখের ঐ হাসি সে একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারিত।

সুনন্দা ঘরে ঢুকিল। মিঃ গুপ্ত হাসিয়া কহিলেন—এস মা! কিন্তু তাহার পানে চাহিয়া তিনি একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন। কহিলেন, তোর কি কোন অসুখ করেছে মা?

মাথা নাড়িয়া সুনন্দা জানাইল, না।

পাশের ঘরে চিত্তপ্রিয় সুবিমলকে পড়াইতেছিল। সুনন্দা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখান হইতে তাহাকে স্পষ্টই দেখা যায়। তাহার দিকে চাহিতে গিয়া সুনন্দার সঙ্গে চিত্তপ্রিয়ের চোখোচোখি হইয়া গেল।

মিঃ গুপ্ত বলিলেন, বসো মা! তারপর কহিলেন, সু, আমার ইচ্ছা, এই আষাঢ়েই বিয়ের দিনটা ঠিক্ করে' ফেলি, তোমরা কি বলো?

সুনন্দা সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল। চিত্তপ্রিয়ের দিকে আর একবার চাহিয়া লইয়া বেশ একটু সুস্পষ্ট কণ্ঠেই বলিল, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা বাবা। বিয়ের দিন আষাঢ়েই ঠিক্ করুন। তবে, বিনায়ককে দেখাইয়া বলিল, এর সঙ্গে নয়, ওঁর সঙ্গে—এই বলিয়া সে চিত্তপ্রিয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

একটুখানি কথা। কিন্তু ইহাতেই এ ঘরের দুইজন এবং পার্শ্বের ঘরের একজন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল!

মিঃ গুপ্ত বিস্ফারিত চক্ষে কহিলেন—তুমি বল্‌ছ কি সুনন্দা?

সুনন্দা তেমনি অবিচলিত থাকিয়া কহিল—সু' দিদির এই চিঠিখানা পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন, আমি কি বল্‌ছি। আজ শুধু এইটুকুই আপনাকে জানিয়ে দিয়ে গেলাম বাবা, আপনার জামাই যিনি হবেন, নাম তাঁর চিত্তপ্রিয়।

এই বলিয়া সুগন্ধার চিঠিখানা মিঃ গুপ্তের হাতে দিয়া সুনন্দা আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই অভাবনীয় ব্যাপারে মিঃ গুপ্তের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি সুগন্ধার চিঠি ও বিনায়কের মুখের পানে কেবলই চাহিতে লাগিলেন।

সুনন্দার মুখে সুগন্ধার চিঠির কথা শুনিয়াই বিনায়কের মুখখানা একেবারে পাংশু হইয়া গিয়াছিল। তাই মিঃ গুপ্ত যখন তাহারই সম্মুখে চিঠিখানি পড়িতে বসিলেন, তখন সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

চিঠিখানা শেষ করিয়া যখন মিঃ গুপ্ত দারুণ বিরক্তিতে বিনায়কের পানে চাহিতে গেলেন, তখন তিনি দেখিলেন—তাহার আসনখানা শূন্য। বিনায়ক পূর্ব্বেই কখন নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে।

চিঠিখানা তিনি মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। মুখখানা তাহার ঘৃণায় বারবার কুঞ্চিত হইতে লাগিল।

আর চিত্তপ্রিয়?

সে তখন পাশের ঘরে বসিয়া বসিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছিল। দেখিতেছিল, সে যেন আকাশ দিয়া কোন সুদূরের পানে উড়িয়া চলিয়াছে!…

নির্ম্মলকুমার রায়

ওয়ালেস্ বীর

কুমারী অলকা দেবী

পরিচিতদের কাছে অভিনেতা-হিসাবে এই লোকটী যতখানি সম্মানই আদায় করে' থাকুন না কেন, প্রকৃত মানুষ হিসাবে তিনি তাঁদের কাছে আরও ঢের বেশী শ্রদ্ধার পাত্র—আদর্শ স্থানীয়। কারণ, তাঁকে তাঁর জীবনের অধিকাংশ দিনগুলি এমনই উৎকট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়েচে, যাতে খুব কঠিন সহিষ্ণু লোক ছাড়া টেঁকে থাকা অসম্ভব হ'ত। জীবনে বহু বিপদের তিনি সম্মুখীন হয়েছেন এবং প্রায় প্রত্যেকটাই হাসিমুখে অতিক্রম করে' গেছেন। আজ তিনি 'হলিউডে'র একজন 'ষ্টার।' আজ উন্নতির উচ্চসীমায় দাঁড়িয়েও তিনি বলেন: আজই যদি আমার জীবনের কার্য্য-তালিকা ভাগ্যগুণে উল্টে যায়, (যেটা এঁর জীবনে একপ্রকার স্বাভাবিক বল্‌লেই চলে) তা' হ'লে আমি এতটুকু ব্যথিত বা বিস্মিত হই না। কর্ম্ম-পথ দুর্গম?—নিশ্চয়ই, জীবনের কর্ম্মপথ খুবই দুর্গম। কিন্তু বিপদের সম্মুখীন না হ'লে ভাল জিনিষের কদর বোঝ্‌বার ত সুবিধে হ'য়ে ওঠে না জীবনে! তবে একথা সত্যি, বিপদ যত বড়ই হোক্ না কেন, জীবন-পথে তার পিছনে এমন একটা মাপকাঠি লুকানো থাকে, যাকে নির্ভর করে' অগ্রসর হ'লে আমরা অনায়াসেই তা' অতিক্রম কর্‌তে পারি। প্রকৃত মানুষ ছাড়া এসব উক্তি যার তার মুখ দিয়ে কখনই বেরোতে পারে না। কাজেই এ লোকটীর চরিত্রকে আমরা একটী অদ্ভুত চরিত্র-ই বল্‌ব।

১৮৮৬ অব্দের 'এপ্রিল ফুল' দিনে মিশৌরিতে যখন তিনি প্রথম পৃথিবীর আলো দেখ্‌লেন, তখন তাঁর পিতা পুলিশের কাজে বাইরে ছিলেন। বাড়ী এসে পৌছতে এ সুখবর তাঁর কাণে গেল বটে, কিন্তু তিনি নিজের কাজ নিয়ে তখন কয়েক দিন এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, একটা নাম দিয়ে এঁকে অভিষেক কর্‌বার পর্য্যন্ত তাঁর সময় হ'য়ে উঠ্‌ল না। পরিশেষে ওঁর মা, মার্‌গারেট নামকরণ কর্‌লেন ওয়ালেস্,—ডাক নাম ওয়ালী। এঁর আরো দু'টী ভাই আছেন; উইলিয়ম, আর নোয়া।

যখন ওয়ালী মাত্র একটু-আধটু হাঁটতে শিখ্‌লেন, তখন থেকেই ইনি ভায়েদের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ কর্‌তেন। দিনরাত একটানা একটা কিছু নিয়ে ঝগড়া করা চাই-ই চাই'। ওয়ালেসের বাপ-মা কিন্তু এটাকে কুচক্ষে দেখ্‌তেন না। সঞ্চয়ের দিকে তাঁরা ততদূর লক্ষ্য না রেখে ছেলেদের স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দিতেন। ছেলেদের নানারকম জিনিষ খাওয়াতেন এবং এই ঝগড়া মারামারি করার জন্য উৎসাহ দেওয়া ছাড়া কোনদিন নিষেধ কর্‌তেন না। ওয়ালেস্‌দের বাড়ীখানি একটা পাগলা বাড়ী (ম্যাড্ হাউস) হ'য়ে উঠেছিল।

ওয়ালীর হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারা দেখে ছেলের দল তার নামকরণ করেছিল 'জাম্বো।' পালোয়ানী কর্‌তে পেলে 'জাম্বো' আর কিছু চাইতেন না। তাঁর মা বেগতিক দেখে ছেলেদের সঙ্গীত শিক্ষা দিতে চাইলেন। ওয়ালী ঘাড় বেঁকিয়ে বল্লেন: ও ত মেয়েদের কাজ। এমনি ধারা, স্কুলে যাওয়াও তিনি পছন্দ কর্‌তেন না। বলতেন: ও হ'ল বাজে সময় নষ্ট করা। পিতার অতিরিক্ত সতর্কতায় তাঁকে বছর তিনেক স্কুলের মুখ দেখ্‌তে হয়েছিল। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে তাঁর বুদ্ধি এমন পেকে উঠল যে, পুলিশের সতর্ক চক্ষুকেও তিনি বেমালুম ফাঁকি দিতে আরম্ভ কর্‌লেন। অন্য ভায়েদের সঙ্গে তিনি একসঙ্গেই স্কুলে যাবার জন্যে বেরোতেন এবং ফিরে আস্‌তেন বটে, কিন্তু স্কুলে পৌছে বই খাতা প্রভৃতি একজনার জিম্মায় রেখে তাঁদের গ্রাম প্রদক্ষিণ করে' যে রেলওয়ে লাইনটী শেফিল্ড পর্য্যন্ত গেছে, তার ইঞ্জিনের চালকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ট্রেণ চালানো শিখ্‌তে লাগ্‌লেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে সাহস বাড়্‌তে বাড়্‌তে একদিন শেফিল্ড থেকে বাড়ীতেই ফির্‌লেন না।

তখন তাঁর কার্য্যকলাপ বাপ-মায়ের দৃষ্টিগোচর হ'ল। তাঁর পিতা এতে-ও কিছু বল্লেন না, বরং তিনি ফিরে আস্তে তাঁকে পূর্ব্বের মতই সাদরে বুকে টেনে নিলেন।

ওয়ালীর নেশা গেল বেড়ে! এইবার তিনি ছ' মাসের জন্যে শেফিল্ডে চলে গেলেন এবং একটা চালকের চাকরী নিলেন। এই থেকে তাঁর কর্ম্মজীবন সুরু হ'ল। কিন্তু এ সব লোকের সাধারণতঃ যা' হয়, ছ' মাসের কাজেই হাঁফিয়ে উঠে হঠাৎ একদিন বাড়ীতে ফিরে এলেন এবং এবারও মাতা-পিতার স্নেহ-আলিঙ্গনে বঞ্চিত হলেন না।

এরপর তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর দাদা উইলিয়ম একটা সার্কাসে ম্যানেজারী করচেন। শুনে ওয়ালীও লাফিয়ে উঠলেন সার্কাসে কাজ করতে হবে বলে'। তারপর অতি অল্প মাহিনায় সার্কাসে একটা চাকরী নিলেন। ইনি বলেন—সার্কাসে হাতি খেলিয়েই আমি যথার্থ যুদ্ধ করা জিনিষটা বুঝতে পেরেচি। কিন্তু একাজও বেশীদিন তাঁর ভাল লাগ্‌ল না। হঠাৎ তিনি খবর পেলেন তাঁর মেজ-ভাই নোয়া 'ব্রডওয়ে ষ্টেজে' কাজ করে' মাসে বহু টাকা উপায় করেন। ইনি মনে মনে ঠিক্ করলেন, নোয়া যদি টাকা উপায় করতে পারে, তবে আমিই বা পারব না কেন? এই ভেবে একদিন সত্যি-সত্যিই নিউইয়র্কের

জীর্ণ হার্লো এবং ওয়ালেস্ বীরি

টিকিট কেটে তিনি ব্রডওয়েতে হাজির হলেন এবং মেজ-ভায়ের চেষ্টায় ভর্ত্তি হ'য়ে গেলেন।

এই ভাবে ১৯০৪ সালে ইনি প্রথম থিয়েটারি লাইনে ঢুক্‌লেন এবং 'বেব্‌স্ অফ্ টয়ল্যাণ্ড', 'প্রিন্স অফ্ পিলসেন্', 'ষ্টুডেণ্ট কিং' প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তকে অভিনয় কর্‌লেন।

হঠাৎ ১৯১২ অব্দে তাঁর ভাগ্যচক্র এমন বিসদৃশভাবে ঘুরে গেল যে, তিনি সমস্ত চাকরী খুইয়ে একেবারে নিঃসম্বল হ'য়ে পড়্‌লেন। তখন এত কষ্টে তাঁর দিন কেটেছে, যা' বর্ণনাতীত। এমন সময়ে চিকাগো থেকে 'বলকান্ প্রিন্সেস্' পুস্তক অভিনয় কর্‌বার জন্যে তাঁর ডাক এলো এবং

JEAN HARLOW and WALLACE BEERY in "DINNER AT EIGHT"

জীন হার্লো এবং ওয়ালেস্ বীরি

সেই সঙ্গে একটা ভাল 'অফার'ও পাওয়া গেল। তিনি লটারী করে' নিজের ভাগ্য নির্ণয় করে' নিলেন। দেখ্‌লেন 'মুভি'ই তাঁকে আহ্বান করচে। 'ষ্টুডিও'তে গিয়ে গ্লোরিয়া বলে' একটী মেয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় এবং শেষে তাঁর সঙ্গে বিয়েও হয়। কিন্তু বেশীদিন এ বিবাহ-বন্ধন স্থায়ী হয় নি। হঠাৎ একদিন অতি তুচ্ছ কারণে ওয়ালেস্ গ্লোরিয়াকে 'ডাইভোর্স' করেন।

১৯১৫ অব্দে ব্রঙ্কোবিলি ওয়ালীকে নিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়ায় যাত্রা করেন এবং তাঁকে 'ডিরেক্টার' করে' দেন। কিন্তু তিনমাস যেতে-না-যেতেই তাঁদের কোম্পানী উঠে যায় এবং আর একবার ওয়ালেস্ অত্যন্ত অসচ্ছল অবস্থায় পড়েন। গ্লোরিয়ার বিরহ একেই তাঁকে আকুল করে' রেখেছিল, তার ওপর হঠাৎ চাকুরী চলে' যাওয়ায় তাঁর মনের অবস্থা কল্পনীয়। কিন্তু তাকেও উপেক্ষা করে' ডবল জোর দিয়ে তিনি পুনরায় চাকরীর সন্ধানে বেরুলেন এবং 'আন্‌পার্ডনেবল সিন্' পুস্তকে একটী চরিত্র অভিনয় কর্‌বেন ঠিক্ কর্‌লেন। এই পুস্তকখানিই এর ভাগ্যচক্র ঘুরিয়ে দিলে।

এই পুস্তকখানিতে অভিনয় করার পর তাঁর নাম চারদিকে প্রচার হ'য়ে পড়্‌ল। ১৯১৮ অব্দে 'বিহাইণ্ড দি ডোর' এবং 'ফোর হর্স মেন' পুস্তকে তাঁর সম্মান আরো দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু এই সম্মান অর্জ্জন কর্‌তে তাঁকে রীতিমত যুদ্ধ কর্‌তে হয়েছিল। এইবার অবশ্য তিনি একটু শীকার এবং মাছ ধর্‌বার অবসর পেলেন।

১৯২৪ অব্দে রিটা গিল্‌ম্যানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি তাঁকে বিবাহ করেন। এবং এক বৎসরের মধ্যেই রিটা তাঁকে ক্যারল্ এ্যান্ বলে' একটী ফুটফুটে শিশুকন্যা উপহার দেন। এইভাবে সম্মান এবং উপার্জ্জনের উচ্চ-শীর্ষে অধিরোহণ করেও নিয়তির ক্রূর হস্ত থেকে তিনি মুক্তি পেলেন না। তাঁর কষ্টোপার্জ্জিত যা' কিছু সঞ্চয় যে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল, হঠাৎ সেটা ফেল্ হ'য়ে গেল। ওয়ালেস্ বারেকের জন্য মুসড়ে গেলেন ; কিন্তু একটু পরেই দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ কর্‌বার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে' নিলেন।

এরপর একদিন নিউইয়র্কের বাড়ীতে তাঁর আগুণ লেগে যায়। ওয়ালেস্ হাস্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি বল্‌লেন : যদি ভাগ্য প্রসন্ন থাকে, কোন ক্ষতিই আমাকে বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না। এই বলে' আর একখানি নতুন বাড়ী তৈরী কর্‌লেন।

অভিনয় করা ছাড়া, তাঁর বাল্য বয়সের সখ এরোপ্লেন চালনার কথা আজো তিনি ভুল্‌তে পারেন নি। তাঁর এখন একখানি উড়ো জাহাজ আছে। সেখানা করে' পত্নী রিটাকে নিয়ে প্রায় তিনি উড়ে বেড়ান। সিল্‌ভার পাহাড়ের ওপর নিরিবিলিতে বাস কর্‌বার জন্যে তিনি একখানি ঘরও তৈরী করেচেন।

তাঁর তিনটী সুন্দর কুকুর আছে। তাদের নিজের হাতে বাচ্চা বয়স থেকে মানুষ করেচেন। তিনি 'হলিউড পার্টি'তে কদাচিৎ যোগ দেন। ইনি বলেন : 'পার্টি'তে যাওয়া ত বৃথা সময় নষ্ট করা। তাঁর মতে সেই সময়টুকু কন্যা ক্যারলকে নিয়ে উত্তম সাজে সজ্জিত হ'য়ে পাহাড়ের ওপরের বাড়ীতে সময় কাটানো ঢের ভালো।

অলকা দেবী

অভিশপ্তা

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
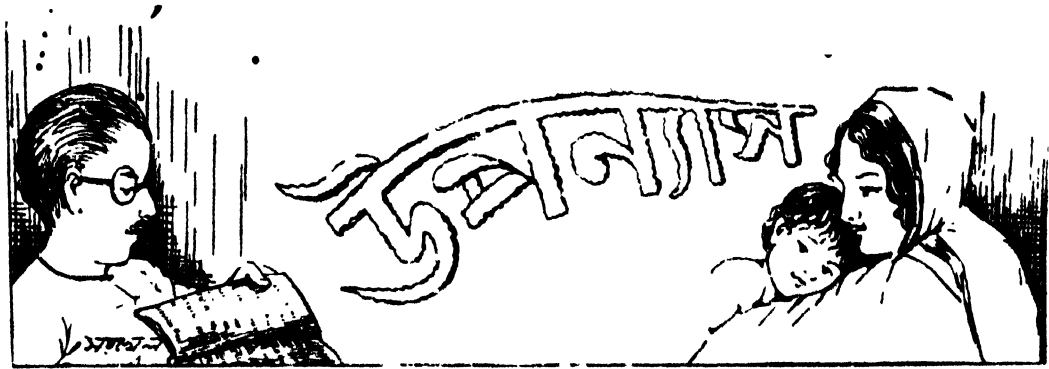
ছয়

হায়! হায়! এতক্ষণ না জানি...ওঠো না গো!

রেখার নিস্পন্দ নিশ্চল মূর্ত্তির পানে তাকিয়ে তরী জোরে কাঁদতে লাগ্‌ল।

—ওগো দিদিমণি, চলো গো! আর যে সময় পাবে না গো! দেখো যদি এখনো—

তরী বিমূঢ় রেখার হাত ধরে' টেনে নিয়ে চল্‌ল। হত-বুদ্ধি দত্ত-মশায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লেন।

তখন নিমেঘ নির্ম্মল আকাশ ভরে' উষার শুভ্র আলোক-ধারা ছড়িয়ে পড়েছে দুর্য্যোগ বিধ্বস্তা ক্ষুব্ধা ধরণীর বুকে। বাগানের পথে ভিজে ঘাসের ওপর থেকে দু'ধারি নুয়ে-পড়া বৃক্ষশাখার পাতায় পাতায় সঞ্চিত বৃষ্টির জল ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে' পড়ছিল তাদের গায়ে মাথায়, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কারো।

তিনটী প্রাণীই স্তম্ভিত ত্রাস্ত ও বিহ্বল।

বাগানের ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। ঘরের মধ্যে সকলের আগে ঢুকলেন. দত্ত-মশায়। ঢুকেই থম্‌কে গিয়ে তিনি একটা বিকট শব্দ করে উঠ্‌লেন—এ কি কাণ্ড! উঃ!

সৌখীন প্রকৃতি মিহির ঘরখানা খানকতক চেয়ার-টেবিল আর ছবি দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল—ড্রয়িং-রুমের ধরণে। সেই ঘরেই আজ তার—

ওঃ! এও কি সম্ভব? এ কি স্বপ্ন নয়?...

সেখানে বড় টেবিলটার সাম্‌নে চেয়ারে বসে' মিহির—হাত দু'খানা টেবিলের ওপর জড়ো করে, সেই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায়। মাথার চুলগুলো তার একেবারে রক্তে ভিজে গেছে। সিল্কের জামা ও চাদরে কে যেন হোলির পিচ্‌কারী দিয়েছে। টেবিল থেকে শোনিত ধারা গড়িয়ে পড়েছে মাটীতে—টক্‌টকে তাজা রক্ত!

তার পাশে একখানা গোলাপী রংয়ের বাহারে চিঠির কাগজ আর ফাউন্টেন্ পেন্—তাতেও রক্ত। ছাতিটা চেয়ারের পিঠে ঝোলানো। টেবিলের ওধারে মেঝের 'পরে মিহিরের টর্চ্চটা আর একখানা 'দা' রক্ত মাখানো—এই দায়ের আঘাতেই বুঝি...

—হায়! হায়! হায়! একি হ'ল রে! এ সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে রে! মিহির, মিহির! বাবা আমার!

এক মুহূর্ত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে থেকে বৃদ্ধ ছুটে গেলেন মিহিরকে তুলতে—কিন্তু কা'কে তুল্‌বেন?

মিহির একেবারে আড়ষ্ট—নাকে নিশ্বাস নেই—তুষার-শীতল দেহখানায় জীবনের কোনো চিহ্নই নেই তার !

—আহা—হা ! বাছা আমার ! এ দশা তোর কে করলে রে বাপ্ !...

বৃদ্ধ আর্ত্তস্বরে হাহাকার ক'রে' দু'হাতে মাথা ধরে' বসে' পড়্‌লেন বজ্রাহতের মত।

—ও কি গো ! নেই ? আর কি বেঁচে নেই ? হ'য়ে গেছে ? ও মা গো ! কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো ! তখনো যে বেঁচেছিল—তাই তো আমি ছুটে গেলুম—কিন্তু পার্‌লুম না যে সাম্‌লাতে। তখন দেখ্‌লে...হায় ! হায় ! প্রাণটা যে তখনো ধড়্‌ফড়্ কর্‌ছিল গো !—ওরে কি পোড়াকপালী আমি—

তরী ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে' আকুল হ'য়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

রেখা কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পড়্‌তে পড়্‌তে টেবিলটা দু'হাতে চেপে ধরে' স্তম্ভিত স্তব্ধ হ'য়ে চেয়েছিল মিহিরের শোনিতাপ্লুত নিষ্প্রাণ মূর্ত্তির পানে। তার বিহ্বল বিস্ফারিত চোখে পলক আর পড়ে না—বুকের স্পন্দনও থেমে গেছে বুঝি। হায় ! এ সেই মিহির—প্রিয়দর্শন স্বাস্থ্যবান যুবক, যার বিমোহন সৌন্দর্য্য-শ্রী দর্শকমাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট করত। হাসিতে যার মধু ঝর্‌ত, বাক্যে সুধা ক্ষর্‌ত, নয়নের দৃষ্টি যার স্বতঃই মনে মোহের সৃষ্টি কর্‌ত—তার এই দশা !

এই তো কাল সন্ধ্যাবেলায়ই সে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল হাসি মুখে। সেই কাপড়, সেই জামা-চাদর, তাতে হাস্না-হানার মিষ্ট মদির গন্ধ তখনো ভুরভুর্ করছে। পরিপাটী করে' আঁচড়ানো কালো কুচ্‌কুচে চুলগুলি রক্তে ভিজে বিবর্ণ হ'য়ে গেলেও একগাছি স্থান ভ্রষ্ট হয় নি।

হাতের রিষ্ট্‌ওয়াচটার চলার গতি তখনো থামে নি, শুধু জীবনের স্পন্দনই থেমে গেছে—থামিয়ে দিয়েছে কে জোর করে' !...

ওই যে রক্তমাখা দাখানা পড়ে' রয়েছে—ওরি এক ঘায়েতেই বুঝি...

হা ভগবান ! এ কি করলে ! কি করলে প্রভু ! এ কামনা, এই ভীষণ কামনা রেখা যে কোনোদিন, কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে ভুলেও মনে করে নি ! অন্তর্য্যামী তুমি তা' তো জানো ? তবে তার দুরাদৃষ্টে এ বিড়ম্বনা কেন ? কেন গো ?...

মুহ্যমানা রেখার বিস্ফারিত বিভ্রান্ত নয়নের দৃষ্টি একেবারে নিশ্চল স্থির হ'য়ে এলো সেই দিকে চেয়ে চেয়ে। মনে হ'ল টেবিলের ওপরকার গড়িয়ে আসা রক্তধারা যেন আগুনে পুড়িয়ে লাল করা তীক্ষ্ণধার তলোয়ারের মত তার বুকের মাঝখান্‌টায় চিরে দিয়ে ভেতরে...উঃ হু হু ! কী ভীষণ যন্ত্রণা ! বুক যে পুড়ে গেল !

অস্ফুট একটা আর্ত্তধ্বনি করে' রেখা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ল।

* * *

কুসংবাদ প্রচার হ'তে দেরী লাগে না। বিশেষ এমন একটা অভাবনীয় লোমহর্ষণকর কাণ্ড। গ্রামে একেবারে হুলস্থুল পড়ে' গিয়েছে। গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে দত্ত-মশায়ের গৃহে। সকলেই চকিত ও সন্ত্রস্ত। মিহিরের মত ভদ্রযুবকের এই শোচনীয় বীভৎস পরিণাম সকলের মনে শুধু দুঃখই নয়, একটা ভয়ানক আতঙ্কের ছায়াও ফেলেছে। উৎসুক উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তারা বাইরে থেকেই উঁকিঝুঁকি মেরে দেখ্‌ছিলেন—ভেতরে আসার উপায় নেই, সাহসও নেই। পুলিশ ইনস্পেক্টার, দারোগা, কনেষ্টবল্ সব গিস্‌গিস্ কর্‌ছে সেখানে।

হত্যাস্থল ও হতব্যক্তিকে পরীক্ষা করে' এটা বেশ বোঝা গেল যে, হতব্যক্তি যখন এইখানে একলাটী বসে' টর্চ্চের আলোয় নিবিষ্টমনে লিখ্‌ছিল, সেই সুযোগে আততায়ী ওই দাখানা ওকে লক্ষ্য করেই ছুঁড়ে মারে—সেটা লাগে তার মাথার ডান্‌দিকে রগের কাছে। আঘাতটা এমন সাংঘাতিক যে, বেচারা আর মাথা তুল্‌তে পারে নি—সেই এক আঘাতেই একেবারে শেষ !

ঘরের মেঝেয় হোগ্‌লাপাতার পুরু চাটাই পাতা, দরজায় পাপোস, ঘরের বাইরেকার জমীতে বড় বড় ঘাস, সেখানে আক্রমণকারীর পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। দুয়ার থেকে যে পথটুকু বাগানে চলে' গিয়েছে, যে পথে

সকালে তরী দত্ত-মশায় ও রেখাকে নিয়ে এসেছিল, সেখানকার ঘাসশুদ্ধ অল্প ভিজে মাটীতে। ওদের তিনজনের এবং মিহিরের জুতোপরা পায়ের দাগ দেখা গেল। তাও সুস্পষ্ট নয়। তা' থেকে কিছু অনুমান করা কঠিন। মৃত মিহিরের জামার পকেটে এমন কোনো কাগজ-পত্রও ছিল না, যা' দিয়ে কোনো একটা সূত্র ধরা যায়।

সেই ফিকে গোলাপী রংয়ের চিঠির কাগজখানা সেটা ঠিক্ চিঠি নয়—কয়েক ছত্র কবিতা। আমার হৃদয়-বাণী বীথি বলে' কবিতাটা আরম্ভ করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ করা আর হয় নি। তার আগেই লেখকের জীবনের শেষ হ'য়ে গেছে।

সাত

দুর্ঘটনার রাত্রে বাড়ীতে ছিল মাত্র তিনটী প্রাণী. কর্ত্তা, রেখা, আর তরলা বা তরী। তারপর সকালবেলা এই মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ পাবার পর মিহিরের কনিষ্ঠ. শিশির ও বীথির পিতা অবিনাশবাবু ছুটে এসেছিলেন। পুলিশ তাঁদের এজাহার নিলেন—পর পর।

দত্ত-মশায়ের জবানবন্দী :—

প্রথম প্রশ্ন—পুত্রের সহিত তাঁ'র শেষ সাক্ষাৎ হয় কাল কোন্ সময়? তখন মিহিরের সঙ্গে কথাবার্ত্তাই বা কি হয়েছিল?

উত্তর—কাল বৈকালে, পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটায়। আমি ঘরের ভেতর থেকেই ওর পায়ের শব্দ পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, সে আজ ভাত খেলে না কেন? শরীরটা—

উত্তরে সে বলে—শরীর ওর বেশ আছে, বিশেষ একটা কাজে আট্‌কা পড়ায় দুপুরে আস্‌তে পারে নি। এবেলাও সে বাড়ীতে খাবে না হয়তো; কারণ, এক জায়গায় ওর নিমন্ত্রণ আছে।

—নিমন্ত্রণটা কোথায়?

—খিদিরপুরে অবিনাশবাবুর বাড়ী। সংক্ষেপে এইটুকু বলেই মিহির তাড়াতাড়ি করে' সম্ভবতঃ নিজের ঘরের দিকেই চলে' গেল, আমার সঙ্গে ওর সেই শেষ সাক্ষাৎ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—

মিহির ও শিশির দুই ভায়ে সদ্ভাব ছিল কি না?

উত্তর—যথেষ্ট। সচরাচর ভায়ে ভায়ে যতটা স্নেহ মমতা ও সম্প্রীতি দেখা যায়, ওদের মধ্যে তার চেয়ে বেশীই ছিল তো কম নয়। শিশির তো দাদা বল্‌তে অজ্ঞান, দাদার মত না নিয়ে সে কোনো কাজই কর্‌ত না।

তৃতীয় প্রশ্ন—

তরলা এ বাড়ীতে আছে কতদিন? তার স্বভাব-চরিত্র কি রূপ?

উত্তর—তরলাকে রাখা হয়েছে রেখা আসার পর। এখনো এক বছর পূর্ণ হয় নি। আমার একজন রাইয়ত্ ওকে এনে দেয়। মেয়েটী অনাথা বালবিধবা, ওর চরিত্র নির্দ্দোষ বলেই আমার বিশ্বাস ছিল এতদিন, কিন্তু এখন সন্দেহ হয়।

চতুর্থ প্রশ্ন—

এই রেখা মেয়েটী কে? মিহিরের সাথে ওর কি সম্বন্ধ? ওর প্রকৃতি কেমন?

উত্তর—রেখা আমার বন্ধুকন্যা এবং মিহিরের ভাবী-বধূ। ওদের বিবাহ এতদিন কবেই হ'য়ে যেত, যদি রেখার বাবা না হঠাৎ মারা যেতেন। মেয়েটীর কোনো অভিভাবক না থাকায় ও সেই পর্য্যন্ত আমার কাছেই আছে। এই অগ্রহায়ণের প্রথমেই শুভকর্ম্ম সেরে ফেল্‌ব স্থির করেছিলুম, এর মধ্যে এই কাণ্ড। মেয়েটী খুব শিষ্ট, শান্তপ্রকৃতি, যাকে বলে নিরীহ।

পঞ্চম প্রশ্ন—

ওদের মধ্যে ভালবাসা ছিল, না শুধু বাধ্যবাধকতা?

উত্তর—বাধ্যবাধকতা নয়, মিহিরকে রেখা ভাল বেসেছিল প্রাণ দিয়ে, মিহিরও ওকে ভালবাস্‌ত খুব, তবে ইদানীং যেন শৈথিল্য দেখা গিয়েছিল।

রেখার জবানবন্দী :—

প্রথম প্রশ্ন—

মিহিরবাবু কাল যখন খিদিরপুরে যান, আপনি ওঁকে দেখেছিলেন?

উত্তর—হ্যাঁ, উনি আমার সঙ্গে দেখা করে' গেছলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—

কোন্ সময়? কোথায়?

উত্তর—এই সন্ধ্যাবেলা আর কি। ক'টা বেজেছিল বল্‌তে পারি না। আকাশে খুব মেঘ করেছিল, টিপিটিপি বৃষ্টিও পড়্‌ছিল। আমি রান্নাঘরে বসে' ময়দা মাখ্‌ছিলুম একলাটী, সেই সময় বাগানের দিক্‌কার জানলায় এসে উনি ডাক্‌লেন। বল্‌লেন—খিদিরপুর থেকে ফির্‌তে যদি দেরী হ'য়ে যায়, তা' হ'লে আমরা ওঁর অপেক্ষায় অনর্থক জেগে যেন বসে' না থাকি।

প্রশ্ন—আপনি কি বল্‌লেন ?

উত্তর—বল্‌লুম, দেরী না কর্‌লেই ভাল। বৃষ্টি-বাদ্‌লার দিন রাত হ'য়ে গেলে জ্যাঠামশায় বড় ব্যস্ত হবেন। তা'তে উনি বল্‌লেন—চেষ্টা করবেন খুব শীগ্‌গির ফিরতে, তবু দেরী হ'য়ে গেলেও ভাবনার কোনো কারণ নেই।

প্রশ্ন—তখন ওঁর পোষাক কি এই ছিল ?

উত্তর—হ্যাঁ, এই পোষাকেই ওঁকে আমি দেখি। মাথায় ছাতি, হাতে টর্চ্চ—

প্রশ্ন—ওঁর মুখের ভাব কেমন দেখেছিলেন ? রাগ না বিরক্তি।

উত্তর—না, বেশ প্রফুল্লভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে উনি গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন—আপনার সাথে মিহিরবাবু কি রকম ব্যবহার কর্‌তেন ?

উত্তর—ভালই।

প্রশ্ন—তরলা যখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ওপরে উঠে ছাদে আছাড় খেয়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল, তখন আপনি কি কর্‌ছিলেন ? কোথায় ছিলেন ?

উত্তর—আমি তরীর অপেক্ষায় কতক্ষণ বসে' থেকে শেষে শুয়ে পড়েছিলুম। একটু তন্দ্রাও যেন এসেছিল—সে তন্দ্রাটুকু ছাঁৎ করে' ভেঙে গেল ওর কান্নার শব্দে।

প্রশ্ন—তারপর ?

তারপরের ঘটনা যেমন ঘটেছিল রেখা অবিকল তাই বলে' গেল।

তরলার জবানবন্দী :—

প্রশ্ন—তুমি তোমার মনিব-পুত্র মিহিরবাবুকে শেষবার কোথায় দেখেছিলে ? কেমন অবস্থায় ?

উত্তর—এই বাগানের ঘরে, এমনি করে' বসে' উনি গোঙাচ্ছিলেন, প্রাণটা তখনো বেরোয় নি।

প্রশ্ন—ঘরে আলো ছিল ?

উত্তর—না আলো আমি এনেছিলুম।

প্রশ্ন—তুমি কি জান্‌তে মিহিরবাবু এ ঘরে আছেন ?

উত্তর—না, আমি জান্‌তুম উনি খিদিরপুরে চলে' গেছেন।

প্রশ্ন—তখন রাত কত বল্‌তে পারো ?

উত্তর—তা' কেমন করে' বলি ? ঘড়ী-ঘণ্টা তো দেখি নি ? তবে রাত বেশী হয় নি তখন, আন্দাজ সাড়ে আটটা কি ন'টা হ'তে পারে। কিন্তু ভয়ানক অন্ধকার—বৃষ্টিও পড়্‌ছিল মধ্যে মধ্যে। মনে হচ্ছিল—যেন কত রাত হ'য়ে গেছে।

প্রশ্ন—ও ঘরে কেউ নেই জেনেও তুমি কিসের জন্যে গেলে এমন অন্ধকার বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে, কোনো কাজ ছিল কি ?

উত্তর—কাজ ? হ্যাঁ, কাজ না থাক্‌লে সাধে-সুখে যাব কেন ? কর্ত্তাবাবুর যে হুকুম—রাত্তির বেলা কাজকর্ম্ম সারা হ'লে আলো ধরে' ঘরদোর সব দেখে নিতে।

প্রশ্ন—বাগানের ঘরও ?

উত্তর—না, হ্যাঁ, বাগানের ঘর রোজ দেখ্‌তে হয় না, কিন্তু কাল দাদাবাবু বাড়ী নেই, দুর্য্যোগের রাত। ভাব্‌লুম—ও ঘরটাও একবার দেখে যাই, দাদাবাবু যদি বন্ধ কর্‌তে ভুলে গিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন—ও, কি দেখলে গিয়ে ?

উত্তর—দেখ্‌লুম, দুয়ারের কপাট 'হাট' করা, আর ওই যে বল্‌লুম, দাদাবাবু টেবিলের ওপর মুখ গুঁজ্‌ড়ে গোঁ গোঁ কর্‌ছেন—সে এক বিশ্রী শব্দ! দেহখানাও যেন ধড়্‌ফড়্‌ করে' উঠ্‌ছে থেকে থেকে—আর মাথায় ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে—উঃ মাগো! সে কি রক্তের ছিরি! এখন তো শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন—তারপর? তুমি পালিয়ে এলে বুঝি?

উত্তর—না, আমি আলোটা টেবিলে রেখে—দাদাবাবু, ও দাদাবাবু!—এ কি হ'ল গো?—কেমন করে' লাগ্‌ল? বলে' ওঁর দু' হাত ধরে' সোজা করে' বসাতে গেলুম—কিন্তু পারলুম না। গলার ঘড়ঘড়ানি ওঁর আরো বেড়ে গেল—আমার আর সাহস হ'ল না। আমি আলোটা তুলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলুম কর্ত্তাকে খবর দিতে—কিন্তু পারলুম না, আমার হাত-পা সব ঠক্‌ঠক্‌ করে' কাঁপ্‌ছিল! কোনোমতে সিঁড়িটা পেরিয়েই আমি ধড়াস্‌ করে' পড়ে' গেলুম। তারপর কি হ'ল জানি না। ভোরের দিকে একটু হুঁস্‌ হতেই কর্ত্তাবাবু আর দিদিমণিকে সঙ্গে করে' নিয়ে এলুম—কিন্তু তখন আর কর্‌বার-কর্ম্মাবার কিছু নেই—সব ফুরিয়ে গেছে!

প্রশ্ন—আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়—এমন কাজ কে কর্‌তে পারে?

উত্তর—কে আর করবে? এ চোর-ছ্যাঁচড়ের কাজ নিশ্চয়!

প্রশ্ন—রাত ন'টায় চোর আস্‌বে? বেশ, তাই যেন হ'ল, কিন্তু চোর-ছ্যাঁচড় এগুলো ছেড়ে গেল কেন?

প্রশ্নকারীর আদেশে মৃতব্যক্তির হাতের রিষ্টওয়াচ, আংটী, আর মণিব্যাগটা—যাতে পাঁচ টাকার একখানা নোট, খুচরো টাকা-পয়সাও কিছু ছিল, সেগুলো বার করে' দেখানো হ'ল।

প্রশ্ন—শুধু শুধু মানুষটাকে খুন করে' চলে যায়, এ কেমন চোর?

উত্তর—ও মা, তাও তো বটে! তা' হ'লে এ সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে গো? কার এতবড় বুকের পাটা? জ্যান্ত-জোয়ান মানুষটাকে একেবারে খুন করে' রেখে গেল সন্ধ্যে রাত্তিরে—আমরা বাড়ীশুদ্ধ জেগে থাক্‌তে। হায়! হায়! হায়!

প্রশ্ন—তোমার দাদাবাবুর এমন কেউ শত্রু আছে জানো? যার দ্বারা এরকম হওয়া সম্ভব?

উত্তর—তা' আমি কেমন করে' জান্‌ব? তবে অমন লোকের শত্তুর থাকা কিছু আশ্চয্যি নয়।

প্রশ্ন—কেন? মিহিরবাবু খুব রাগী কি ঝগ্‌ড়াটে ছিলেন বুঝি?

উত্তর—না না, ওঁর স্বভাব তো ছিল খুব মিশুক, অমায়িক, ঝগড়াঝাঁটি কারুর সঙ্গেই ছিল না বোধ হয়।

প্রশ্ন—তা' হ'লে শত্রু থাক্‌বে কেন?

উত্তর—আহা, তা' কি করে' বলি বাপু? ও সব কথা কি বলা যায়? এই—পুরুষ মানুষের কারো করো একটা বদ্‌অভ্যেস থাকে না? এ তাই আর কি। আজ এখানে—কাল ওখানে—ও রকম হ'লে কার মনে কি আছে কেউ বল্‌তে পারে? বলে—মানুষের মন না মতি!

প্রশ্ন—ঠিক্‌ কথা। আচ্ছা, মিহিরবাবু যে খিদিরপুরে যাওয়া-আসা কর্‌তেন, কেন, তা' তুমি জান্‌তে?

উত্তর—না তো—হ্যাঁ, প্রথমটা জানতুম না অবিশ্যি, কিন্তু এদানী জেনেছিলুম বই কি। মানাও করেছি কতবার।

প্রশ্ন—কেন? তোমার এত মাথাব্যথা কেন? বাড়ীর ঝি হ'য়ে মনিবকে ওসব কথা বলা—

উত্তর—আহা, বল্‌তুম কি সাধে গো? ওই যে একটা পরের মেয়ে ঘরে রেখেছে, সাত চড়ে কথা কয় না বেচারী, মনে-মনেই গুম্‌রে মরে, ওরি জন্যে বল্‌তে হয়। নইলে আমার কিসের গরজ? অমন লক্ষ্মী পিরতিমেকে হেনস্তা করে' কেন যে...ও নিতান্ত চাপা মেয়ে তাই, আর কেউ হ'লে মাথামুড় খুঁড়ে একসা করে' দিত।

তারপর শিশিরেরর জবানবন্দীতে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। দু' দিন আগে রবিবার সন্ধ্যায় সে যখন কোল্‌কাতায় যায়, তখন মিহিরকে স্বাভাবিক অবস্থায় বেশ স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেখে গিয়েছিল, তারপর কি ঘটেছে না ঘটেছে তা' সে কিছুই জানে না।

বীথির পিতা অবিনাশবাবু বল্‌লেন—মিহির ছেলেটী তাঁর বাড়ী আসা-যাওয়া করছে অল্পদিন, মাস তিনেক হবে। পূর্ব্বেও মিহিরের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ছিল, কিন্তু ঘনিষ্টতা ছিল না।

এ ঘনিষ্টতা মিহির আপনা হতেই করেছিল। কারণ

প্রথমে বোঝা যায় নি—পরে তিনি জেনেছিলেন মিহির তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী, এবং বীথিও তার অনুরাগিণী।

এ প্রস্তাবে তাঁর দিক্ থেকে আপত্তি কর্‌বার কিছু ছিল না বিশেষ। যে হেতু উচ্চশিক্ষিত না হলেও মিহির অশিক্ষিত নয়। সে রূপবান, স্বাস্থ্যবান্ এবং তার প্রকৃতি মধুর। তা' ছাড়া, ওর বাড়ীর অবস্থা ভাল। দত্ত-মশায়ের লোহার সিন্ধুকের খবর তাঁরও অবিদিত ছিল না। দত্ত-মশায়ের এক বন্ধু-কন্যা ওঁর বাড়ীতে আছে, তার বিবাহের উদ্যোগ করা হচ্ছে, তিনি এইটাই জান্‌তেন—কিন্তু সেই মেয়েটী যে মিহিরের বাগ্‌দত্তা তা' জান্‌লে তিনি তা'কে প্রশ্রয় দিতেন না কখনই।

গতরাত্রে তিনি মিহিরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন বাস্তবিক। কিন্তু এই আসে, এই আসে করে' যখন রাত দশটা বেজে গেল, বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, তখন মিহির দুর্যোগে বাড়ী থেকে বেরোতে পারে নি মনে করে' তাঁরা আহারাদি সেরে শুয়ে পড়্‌লেন।

সকালে মেয়ের অনুরোধে পড়েই তাঁকে এখানে আস্‌তে হ'ল। মিহির কেন যায় নি তাই জান্‌তে এসে দেখেন না এই কাণ্ড।

ক্রমশঃ

পূর্ণশশী দেবী
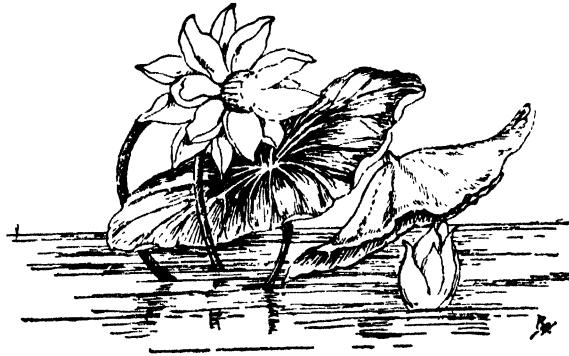
অভিসার

শ্রীতারাপদ মজুমদার

ঝড়ের বেগে অলকা শান্তিলতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই খানিকটা হাসিয়া আছাড়িপিছাড়ি খাইল, তারপর বলিল—মাগো, শুনলে হাসি পায়! বলে কি জানিস ভাই, বলে—মেম সাজিয়ে আমায় 'সিনেমা'য় নিয়ে যাবে। আমি মত দিই নি বলে' মুখখানা যা' হাঁড়ি করে' রয়েছে. দেখ্‌বার মত।

যাহার উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলা হইল, সে শান্তিলতা। শয্যায় শায়িত স্বামী-মহাশয়ের সহিত কি একটা ব্যাপারে ভীষণ তর্ক করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরাজিত হইয়াছে এবং তর্কের উপসংহারে কাঁদিবে, না রাগ করিয়া পলাইবে, না ধমক দিয়া স্বীয় অভিমত বজায় রাখিবে, বসিয়া বসিয়া তাহাই স্থির করিতেছিল—এমন সময় অলকার প্রবেশ।

অলকা দেখেও নাই যে, কক্ষমধ্যে সুবোধ বালকটীর মতই সুবোধ শুইয়া আছে। শান্তিলতার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সে 'হক্‌চকাইয়া' গেল। মাথার কাপড় টানিতে টানিতে সে আবার ঝড়ের বেগেই বাহির হইয়া পড়িল। মুখে ফুটিল মাত্র কয়েকটি অস্ফুট বাক্য—শান্তি, তুই বোবা হয়েছিস্ না কি? বল্‌তে নেই আমায়?

সুবোধ হাঁকিল—এই ছ' মাস এক বাড়িতে থেকেও যদি তোমার লজ্জা না ভেঙে থাকে বৌদি', তা' হ'লে আমি নাচার। পালিও না। উপিন দা'র আবার কি খেয়াল চাপ্‌ল, বেড়ে তো আছ তোমরা। তারপর শান্তিলতার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি যাবে 'সিনেমা'য়?

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর আসিল—না।

—চলো না একটু ঘুরে আসা যাক্।

—থাক্, আর আধিখ্যেতায় কাজ নেই। বলেছ, এই যথেষ্ট।

—কেন, কখনও কি নিয়ে যাই নি?

একটু নড়িয়া বসিয়া শান্তিলতা উত্তর দিল—দেখো, কথা বাড়িয়ো না বল্‌ছি। আমি তোমার ঘেরাটোপের বিবি হ'য়ে যেতে পারব না কোথাও।

—না হয় নাচউলি হয়েই যাবে! সুবোধের কণ্ঠস্বরে শ্লেষ।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ঝাঁজ তখনো শান্তিলতার অন্তর হইতে নিঃশেষ হয় নাই, সে চোখ মুখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিল—বসে' বসে' কেবল ইয়ারকি কর্‌তেই শিখেছ, মুরোদ যদি থাকৃত একটুও।

অঞ্চল উড়াইয়া দৃপ্তভঙ্গীতে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার ভয়ানক রাগ হইতেছিল ওই অলকার উপর। কোন্ প্রাণে স্বামীর অত আদরে সে আঘাত করে! কত সাধ-আহ্লাদ করিয়া বেচারী উপেনবাবু অলকার কাছে উপস্থিত হয়, আর লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা এক ফুৎকারে সমস্ত উড়াইয়া দেয়। স্বামীর সাধ-আহ্লাদেরই যে সঙ্গিনী হইতে পারিল না, সে আবার কিসের মেয়েছেলে!

কক্ষান্তর হইতে সংযত কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—শান্তি, আয় না ভাই একবার খোকাকে ধরবি একটু। উঃ, শয়তানটা কি দুষ্টই না হচ্ছে দিন দিন!

—কেন, তুই আবার কি রাজ্যি শাসন কর্‌ছিস্ এখন?

অলকার কথায় শান্তিলতা উত্তর দিল—কাপড়-চোপড় বার কর্‌তে হবে। ট্রাঙ্ক খুল্‌লেই তো হতভাগার চার পো, তেল গন্ধ ছড়িয়ে একশা কর্‌বে।

—ও, তা' হ'লে বরের সঙ্গে বায়স্কোপে যাওয়া হচ্ছে, তবে আবার নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমার ঘরে এসে ন্যাকামি করা কেন? আমাকে জানিয়ে যাওয়া, না? বেশ!

তারপর একটু থামিয়া বলিল—তুই কোনরকমে সাম্‌লা ভাই। আমাকে আবার চা করতে হবে এখন।

সুবোধ ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—যাও না একবার, খোকাকে ধর গে না। চা না হয় একটু পরেই খাবো আমি।

অলকা লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে জবাব দিল—থাক্ থাক্, উনিই ধরবেন একটু। বরং দু'কাপ চা পাই যেন আমরা।

অগত্যা শান্তিলতা চা চাপাইয়া দিল।

চা পানান্তে উপেন সস্ত্রীক বাহির হইয়া গেল। তাহাদের খোকাটী রহিল শান্তিলতার জিম্মায়। কেন বলা যায় না, এই খোকাটী যেন শান্তিলতার প্রাণ।

সুবোধ অনেক সাধিল, কিন্তু শান্তিলতা কিছুতেই বায়স্কোপে যাইতে রাজী হইল না। ঘরে বসিয়া শান্তিলতার সহিত বাক্‌যুদ্ধ করা সমীচীন নহে; সুতরাং, সুবোধও বাহির হইয়া পড়িল। তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে বায়স্কোপের দরজায়। অগত্যা টিকিটও একখানা কেনা হইল।

—উপেনবাবু, আইসক্রিম্ খাবেন?

চকিতে উপেন ফিরিয়া দেখে, সুবোধ।

—আরে, আপনিও এসেছেন দেখ্‌ছি, কিন্তু কই গিন্নীটীকে দেখ্‌ছি নে তো?

—মানে বসেছেন। আর পারি নে মশায়, জ্বালাতন করে' মারলে। অথচ, কি যে ওর রাগের কারণ, তা'ও বুঝ্‌তে পারি নে।

আধ ঘোমটার মধ্যে অলকা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মৃদু হাসিয়া উপেন বলিল—আর তাঁর উপর আপনিই বা কেন খালি খালি রাগ করেন, তা' তিনিও বুঝ্‌তে পারেন না। কিছু মনে করবেন না—আমরা কিন্তু ভাই আপনাদের এই খুনসুটি বেশ উপভোগ করি।

হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে সুবোধ কহিল—আর উপভোগ! আমার কাছে ওটা দুর্ভোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিয়েও তো অনেকে করে, কিন্তু আমার মত সুখী কেউ হ'তে পারে নি।

—আমাদের হিংসে করছেন বুঝি? কিন্তু পাল্টা-পাল্টির রীতি নেই যে আমাদের দেশে।

সঙ্গে সঙ্গে অলকার একটা জোর চিম্‌টি খাইয়া উপেন-বাবু বলিয়া উঠিল—উঃ! দেখ্‌লেন, কেমন সুখে আছি আমি? আপনার গিন্নীটী যা' করেন প্রকাশ্যে, লুকোছাপা নেই। আর ইনি দেন অন্তর টিপুনি। উঃ! দেখ্‌চেন, কেমন অন্তরালে আজ উৎপীড়ন চল্‌চে? চিম্‌টির চোটে কোমরে আমার ঘা হ'য়ে গেল মশায়।

লজ্জিত হাস্যে সুবোধ বলিল—না না, আমি সত্যিই বল্‌ছি—ওটা আমাকে একেবারে নাকাল করে' তুলেছে। বৌদি'র কথা বল্‌ছেন কি আপনি, ওঁর গলার উঁচু কথা কোনদিন শুনতে পাই নি আমি।

অলকার দিকে বারেক চাহিয়া উপেন বলিল—হয়েছে। আপনি যে রকম ওঁর স্তুতি আরম্ভ করেছেন, উনি তো দেখ্‌ছি আজ আমার মাথায় চেপে বসবেন। তা' নয় ভাই, তা' নয়। কাটারি আর কাস্তে—দুই-ই সমান, দুয়েতেই কাটে, তবে একটা মোলায়েম করে', আর একটা একটু পেঁচিয়ে।

ইণ্টারভ্যাল্ শেষ হইল, উভয়ের বাক্যালাপও বন্ধ হইল।

সুবোধ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, অলকা ফিস্-ফিস্ করিয়া উপেনকে বলিতেছে—কি ফাজলামিই শিখেছ আজকাল! যা' তা' কতকগুলো বকতে লজ্জা করে না?

গম্ভীরকণ্ঠে উপেন বলিল—ছবি দেখ, ছবি দেখ, শাসনটা না হয় বাড়ির জন্যেই রেখে দাও।

মস্তক দোলাইয়া অলকা বলিয়া উঠিল—না, আমি ছবি দেখ্‌ব না। চলো, বাসায় যাই। না যাও তো ঠাকুরপোর সঙ্গে যাচ্ছি আমি।

স্বচ্ছন্দে বলিয়া উপেন আরও কি বলিতে যাইতেছিল। সুবোধ আহাম্মুকি করিয়া বসিল। বলিল—আসুন বৌদি', বাসায় যান তো আসুন আমার সঙ্গে—আমারও ভালো লাগ্‌ছে না ছবি।

উপেন হাসিয়া ফেলিল। অলকা জিভ কাটিল। দাম্পত্য-আলাপে অনধিকার মনোযোগ দানের লজ্জায় সুবোধ একেবারে নির্বাক্!

উভয় কক্ষেই গুঞ্জন চলিতেছে।

টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া সুবোধ সিগার টানিতেছিল। শয্যায় শায়িত। শান্তিলতার দিকে চাহিয়া সে বলিল—রোজ রোজ এই ঝগড়া-ঝাঁটি আর ভাল লাগে না শান্তি।

শান্তিলতা পাশ ফিরিয়া বলিল—ঝগড়া-ঝাঁটি, তার মানে? ও, আমি কুঁদুলে, না? দিন-রাত্রির তোমার সঙ্গে লাগি? দাও না আমায় বিদেয় করে', দিয়ে শান্ত দেখে সুন্দরী দেখে বউ নিয়ে এস না আর একটা। আমি কালো বলেই তো আমার উপর তোমার এত আক্রোশ—তা' কি আর আমি বুঝি নে? হতাম যদি ওই অলির মতন—

সুবোধ বাধা দিল—আস্তে। ভদ্রতার সীমা তুমি ছাড়িয়ে যাচ্ছ দিনকে দিন।...রূপের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু কথাবার্ত্তা, চালচলন, এ সবের দিক্ দিয়েও তুমি তার পায়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নও, শুন্‌লে এখন?

—কী! উত্তেজনায় শান্তিলতা বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। বলিল—বলি, অলির নামে জিভে অত জল আসে কেন?

—যা' সত্যি তাই বল্‌লাম।

শান্তিলতা ভেঙাইয়া উঠিল—যা' সত্যি তাই বল্‌লাম। আর উনি বড় উপিনবাবুর সমকক্ষ। মনে করি, বল্‌ব না কিছু, কিন্তু শুন্‌তেই তো চাও তুমি এসব।

—শান্তি!

অস্বাভাবিক কণ্ঠ গাম্ভীর্য্যে শান্তিলতা ঈষৎ চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া বলিল—কেন, মারবে না কি?

—সেটাও যথেষ্ট নয়।...স্বামীর মুখের উপর অন্য পুরুষের ইঙ্গিত করে' স্বামীর নিন্দে করাটা বুঝি তোমাদের বংশগত রীতি?

বেফাঁস কথাটা বলিয়া ফেলিয়া শান্তিলতা মনে মনে যেন আঙুল কামড়াইতেছিল, কিন্তু বংশোল্লেখে আবার সে জ্বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই আমাদের বংশের রীতি, আমার মা বাপ্ এই আমায় শিখিয়েছেন, আর তোমার মা-বাপ্ বুঝি...

—খবরদার! সুবোধ গর্জ্জিয়া উঠিল। মা-বাপের নাম তুলেছ কি মুখ থেঁতো করে' দেব এক্ষুনি।

ঘাড় নাড়িয়া মুখ বিকৃত করিয়া শান্তিলতা বলিল—ইস্, বিষ নেই কুলোপানা চক্কর! মুখ থেঁতো কর্‌বেন উনি। এসো না, দেখি একবার।

অসহ্য! সুবোধের দক্ষিণ হস্তটা পট্ করিয়া পড়িয়া গেল শান্তিলতার গণ্ডদেশে। তারপর মুহূর্ত্তকাল উভয়েই নিরুত্তর। ক্ষণপরে শান্তিলতার চোখে জল, সুবোধের মুখে অপ্রতিভ ভাব।

স্বামীর কোলের কাছে বসিয়া অলকা এতক্ষণ বিস্ময়াগ্রহে এই দম্পতীর কলহ শুনিতেছিল। চমকাইয়া উঠিয়া বলিল—য়্যাঁ, মার্‌লে যে গো!

—বোধ হচ্ছে তাই।

—বোধ হচ্ছে কি, সত্যিই। শুন্‌তে পেলে না?

উপেন যেন কি ভাবিতেছিল। অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিল—শুন্‌লাম তো।

অলকা আরও একটু ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল—কিন্তু এ তো ভারি অন্যায়। মারধোরও সুরু কর্‌লে শেষটায়।

—তুমি বড় একচোখো অলি, শুধু সুবোধের দোষই দেখ্‌ছ, শান্তিই কি খুব ভালো?

—না, তা' নয়, তবে সুবোধবাবু যেন বাড়াবাড়ি করে!

মুচ্‌কি হাসিয়া উপেন বলিল—ইচ্ছে কর্‌লে তুমি এর একটা যবনিকা ফেল্‌তে পারো।

—আমি?…ও, যাও, কি ঠাট্টা কর।

উপেন কহিল—সত্যি, তুমিই এদের একটা—

—আবার!

উপেন তাহার আদরিণী স্ত্রীটীকে রাগাইতে ভালবাসে! বলিল—পাষাণী, কুক্ষণে রূপের ডালি নিয়ে—

অলকা উঠিয়া পড়িল—চল্‌লাম আমি, তোমার ন্যাকরা তুমি একাই কর।

—কোথায় চল্‌লে, শান্তির ঘরে?

অলকা নিরুপায়!—মা গো, আর পারি নে তোমার জ্বালায়! বলি, একটু ভদ্রলোকের মত কথা কইবে, না—

—অর্থাৎ, আমায় বল্‌তে চাও যে, আমি ছোটলোক? দেখ অলি, তোমার সঙ্গেও আমার ভীষণ ঝগড়া হবে তা' বলে' দিচ্ছি—আমিও লাগাব এক চড়।

—কই লাগাও না।

—গাল সরিয়ে আনো।

অলকা উপেনের সমীপস্থা হইয়াছে—আহা রে, এর নাম বুঝি চড়? ফাজিল কোথাকার!

—প্রায় একই। দাগ ফুটোতেই পড়ে।…না, শোন, এর একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়। বেচারা দুটোর কেউই শান্তিতে নেই। তবে তোমায় একটু অভিনয় কর্‌তে হবে কিন্তু।

ঘাড় নাড়িয়া অলকা কহিল—সে আমি পারব না বাবু।

—নইলে তোমার সখী মার থাক্‌।

কয়েক মাস একত্রে থাকার ফলে অলকা শান্তিলতাকে নিজের ভগিনীর মতই ভালবাসে। একটুখানি চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা, রাজি। তবে বেশি বেহায়াপনা আমার দ্বারা হবে না, তা' বলে' দিচ্ছি।

পত্নীর মুখের উপরকার চুলগুলি সরাইতে সরাইতে উপেন কহিল—বহুৎ আচ্ছা! এ অভিনয়ে আমাকেও অবশ্য একটু অংশ নিতে হবে।

প্রাতঃকালে শান্তিলতা বারান্দায় ষ্টোভ্‌ ধরাইয়া চা তৈরী করিতেছিল। ওদিক্‌কার ঘর হইতে যে উপেন তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহা সে প্রথমে দেখে নাই। চোখোচোখি হইতেই মুখ নামাইল। পুনরায় ধীরে ধীরে মুখ তুলিতেই দেখিল উপেনের সেই সতৃষ্ণ চাহনি। বক্র-দৃষ্টে একবার চাহিয়া শান্তিলতা নিজের ঘরে ঢুকিল। সুবোধকে বলিল—অলিদের চায়ের দেরী আছে বোধ হচ্ছে; ওঁকে এখানেই চা খেয়ে যেতে বল না হয়?

সুবোধ হাঁকিল—উপেনবাবু, আপনাদের চা এখানেই হচ্ছে। বৌদি' নিয়ে যাও এসে।

—বৌদি'! শান্তিলতা একবার সুবোধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

অলকা আসিতেই সুবোধ বলিল—কালকের মত লজ্জায় পড়্‌বে না তো বৌদি', আমি ঘরে রয়েছি কিন্তু।

—আপনি তো বাঘ ভালুক নন যে, ভয় পেতে হবে। বলিয়া অলকা তাহার প্রতি বারেক অর্থপূর্ণভাবে চাহিল।

দৃষ্টিটার মধ্যে সুবোধ কি পাইল, সেই জানে! অলকার কথার উত্তর দিতেই সে ভুলিয়া গেল। অন্তরে তাহার তখন কিসের হিল্লোল!

অলকার কণ্ঠস্বরে সুবোধ চমক ভাঙ্গিল। অলকা শান্তিলতাকে বলিতেছে—আকাশের দিকে চেয়ে চা করিস্‌ না কি? দেখ্‌ দিকি, গরম চা পড়ে' হাতটা কেমন পুড়ে গেল।

আকাশের দিকে চাহিয়াই বটে। শান্তি ভিতরে ভিতরে হাসিয়া আপন-মনেই বলিল—অলি, তুই এতখানি বোকা!

অলকার মামাতো বোনের বিবাহ উপলক্ষে সুবোধ ও শান্তিলতা উভয়েই সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। উপেন ও অলকা তো গিয়াছিলই।

আহারাদি মিটিয়া গেলে বাসায় ফিরিবার জন্য সুবোধ শান্তির সন্ধান করিতেছে, এমন সময় অলকার সহিত

সাক্ষাৎ।—তোমার সখীটী কি আজ বাসায় যাবে না বৌদি', পাঠিয়ে দাও না তাকে ?

অলকা তখন সবে বরের কাণ মলিয়া দিয়া বাসর হইতে ফিরিতেছে। নারীসুলভ চাপল্যে তাহার অন্তর তখন ভরপুর। হাসিয়া বলিল—আজকে না হয় নাই যাবে, আপত্তি আছে কি কিছু ?

—মোটেই না।

পুনরায় হাসিয়া অলকা বলিল—এখানে ছেড়ে যাবেন তাকে ? এতটা সাহস তো ভালো নয় !

কাষ্ঠহাসি হাসিয়া সুবোধ কহিল—উপেনবাবুর হয় তো সে সাহস না থাকতে পারে, কিন্তু আমার ওই রক্ষ-কত্রীর দোরে কেউ হত্যে দেবে না।

—তাই না কি ? বেশ ! তবে কিনা...বলিয়া অলকা টিপিয়া টিপিয়া খানিক হাসিল। উঁহু, আপনারও যাওয়া-টাওয়া হবে না। যান, উপরে যান, এক্কেবারে তেতলার ঘরখানায়। শুয়ে একটু জিরোন গে সেখানে। তারপর একসঙ্গেই যাওয়া যাবে 'খন। বলিয়া হাসিয়া খানিক গড়াইল। তারপর আবার বলিল—আর ও-ঘরের আলোটা জ্বাল্‌তে যাবেন না, সুইচ্‌টা খারাপ আছে, 'সর্ট' দিতে পারে, বুঝ্‌লেন ? বলিয়াই এক ঝলক হাসিয়া অলকা পলাইল।

সুবোধ বোধ হয় আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। স্বপ্ন না কি ? কি এ ইঙ্গিত ? য়্যাঁ ! মুগ্ধনেত্রে অলকার গমন-পথের দিকে চাহিয়া সে বিভোর। অলকা কখন চলিয়া গেছে, কিন্তু তাহার গতিভঙ্গী তখনও সুবোধের অন্তরের মধ্যে তাপ দিতেছে—'নিঙাড়ি নিঙাড়ি।'

—আচ্ছা দেখাই যাক্। সুবোধ তেতলার সিঁড়ি ভাঙ্গিতে লাগিল।

কার্য্যাভাবে শান্তিলতা একটী ছোট মেয়ের সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতেছিল। অলকা খুব ব্যস্ত-ভাবেই আসিয়া কহিল—শান্তি, একটু আয় তো ভাই।

—কেন ?

—দরকার আছে, আয় না শীগ্‌গির।

চলিতে চলিতে অলকা বলিল—ভাঁড়ার-ঘরে তোকে একটু দাঁড়াতে হবে।

—তুই কোথায় যাবি ?

—শুনিস্ নি নাকি ? রান্নাঘরের বারান্দায় পড়ে' গিয়ে ওঁর পায়ে একটা চোট লেগেছে—শুয়ে রয়েছেন তেতলায়। সেখানে গিয়ে একটু না বস্‌লে—

শান্তিলতা তাহাকে কথাটা শেষ করিতে দিল না। বলিল—একেবারে ভাঁড়ারে গিয়ে দাঁড়ানো কি আমার ঠিক হবে ? তুই-ই বল না ? হাজার হলেও আমি নতুন মানুষ বই তো নয়।

আঙ্গুল কাম্‌ড়াইতে কাম্‌ড়াইতে অলকা বলিল—তাও তো বটে ! তা' হ'লে কি করা যায় ?...যদি কিছু মনে না করিস্ ভাই। তুই একটু যাবি তেতলায় ?

—আমার কিন্তু লজ্জা কর্‌বে ভাই।

—নে, আর ন্যাকামি করিস্ নে। একযুগ একবাসায় থেকে আজ উনি লজ্জায় সুয়ে পড়্‌ছেন। এটা বাবু বন্ধুত্বের অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং দ্বিরুক্তির প্রয়োজন হইল না। শান্তিলতা তেতলার পথ খুঁজিয়া লইল।

কয়েকটি শব্দ। ঠুক্-ঠাক্, রিণ্-ঝিন্। সুবোধের শিরা-উপশিরায় যেন আগুন লাগিয়া গিয়াছে। কাণ দুইটি অসম্ভব গরম। কণ্ঠ শুষ্ক।...শিয়রে কে বসিল। সুবোধ একটু নড়িয়া-চড়িয়া ইচ্ছা করিয়াই ডান হাতখানি তাহার কোলের উদ্দেশে ফেলিয়া দিল।

শান্তিলতার বুক ঢুকুঢুকু করিতেছে। সর্ব্ব শরীর যেন স্পন্দন রহিত। সসঙ্কোচে সুবোধের হাতখানি লইয়া সে ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

না, আর না—সুবোধ রক্তমাংসেরই মানুষ, আর যে আত্মসংবরণ করিতে পারে না সে। উপবিষ্টার হাত-খানিতে একটু টান পড়িল, ঘাড়খানি তাঁহার ঝুঁকিল, ভীরু মস্তকটি নুইয়া আসিল।

আর এক নিমেষ—মাত্র এক নিমেষে কত অপ্রত্যাশিত ঘটিয়া যায়।

দু'টি মুখ একত্র হইল—তৃপ্তি, ভীতি, কত কি!...

অকস্মাৎ 'দপ্' করিয়া আলো জলিয়া উঠিতেই উভয়েই সশব্যস্তে লাফাইয়া উঠিল। রুদ্ধশ্বাসে সুবোধ চোখ দুইটা অসম্ভব রকম বড় করিয়া দেখিল—শান্তি!

শান্তিও রক্তশূন্য মুখে চাহিয়া দেখিল—স্বামী।

সস্ত্রীক উপেন 'সুইচ্-বোর্ডে'র পাশে দাঁড়াইয়া বলি-তেছে—আরে সুবোধবাবু যে! ও বাবা, একেবারে স-গিন্নী! আমরা কোথায় একটু অভিসারে এলাম, আর এদিকে ঘরখানা বেদখল! বরাত, বরাত!

মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজিয়া দিয়া অলকা তখন হাসি চাপিবার ব্যর্থ প্রয়াসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

তারাপদ মজুমদার

শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণের গল্প-লহরী সমস্ত নিঃশেষ। যদি কেহ ওই দুই সংখ্যা বিক্রয় করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক সংখ্যা আমরা চার আনা দিয়া কিনিয়া লইব।

সম্পাদক—

গীতলহরী

শ্রীমতী ফে রে

পুরাতনের পরিচয়

সেকালের দারোগার কাহিনী

চোরের আবদার

বঙ্গদেশের অতি অল্প লোকের নিকট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের নাম অপরিচিত আছে। নিজ কলিকাতায়, হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমায় এবং কৃষ্ণনগরের শান্তিপুর অঞ্চলে, তাহার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে ঈশ্বরবাবু এক জন বিলক্ষণ বলবান পুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যা এবং কার্য্য-দক্ষতার জন্য সকলে তাঁহাকে প্রশংসা করিত। পেনসন লইয়া চাকরি হইতে অবসর হওয়ার পরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। শান্তিপুরেতেই তাঁহার নাম বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ হয়। এই স্থানে তিনি প্রথমে মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত করিয়া নগরে অনেক উন্নতিসাধন, সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন, এবং শান্তি সংস্থাপন করেন, এবং সেই কার্য্য করিতে গিয়া তিনি অনেকের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন, এবং অনেক অধিবাসীরা তাঁহার শত্রুতাও করিয়াছিল। তিনি যে সর্ব্ব বিষয়ে ঐকান্তিক ঋষি-পুরুষ ছিলেন, এমন কথা আমি বলি না, কিন্তু তাঁহার দোষ হইতে গুণের ভাগ অধিক ছিল। এই সময়ে শান্তিপুরে আর এক জন বিখ্যাত মনুষ্য ছিলেন—শান্তিপুরের জমিদার বাবু উমেশচন্দ্র রায়, তাঁহাকে লোকে সাধারণত মতিবাবু বলিয়া জানিত। বৈষয়িক বুদ্ধিতে মতিবাবুর তুল্য তখন বঙ্গদেশে অতি অল্প লোক ছিল। জগৎ বিখ্যাত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই মতিবাবুকে তাঁহার অধীনে এক চাকরিতে নিযুক্ত করিয়া তাহার কূট বুদ্ধির প্রখরতা দৃষ্টে বলিয়াছিলেন যে "এই মতির যোড়া মেলা ভার।" সকলেই অবগত আছেন যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্যান্য গুণের মধ্যে মনুষ্যের চরিত্র নির্ব্বাচনের ক্ষমতা অধিক পরিমাণে ছিল, অতএব তিনিই যখন মতিবাবুর বুদ্ধির জটিলতার প্রশংসা করিয়াছিলেন তখন সে বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। মতিবাবু শান্তিপুরের কিয়দংশের জমিদার ছিলেন, কিন্তু কিয়দংশ হইলে কি হয়, তাঁহার এমনই বুদ্ধি কৌশল এবং প্রতাপ ছিল যে শান্তিপুরের বড় ছোট সকল অধিবাসীগণের উপরে তাঁহার ষোলআনা প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার অমতে কাহারও কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না এবং যাহাকে যে দণ্ড করিতেন কিম্বা শাস্তি দিতেন তাহা দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণের নত শির করিয়া মানিয়া লইতে হইত। মতিবাবুর দণ্ডের মধ্যে অর্থ দণ্ডই অধিক পরিমাণে ছিল এবং তাহা না দিলে শান্তিপুরে তাহার বাস করা কঠিন হইত। ফলে শান্তিপুরে মতিবাবুর একাধিপত্য ছিল।

ঈশ্বরবাবু শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হওয়ার পূর্ব্বে লো সাহেব নামক এক জন গোরা শান্তিপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন। এই সাহেব পরে কলিকাতার পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া খুব যশ লাভ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে বুঝি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতার পুলিশের মাজিষ্ট্রেটও হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক ইনি শান্তিপুরে আসিয়া মতিবাবুর কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালির কূটবুদ্ধির সম্মুখে তিনি এমন পরাস্ত হইয়াছিলেন, যে অবশেষে নিজের চেষ্টায় তাহাকে শান্তিপুর হইতে বদলী হইতে হইয়াছিল। মতিবাবুর চরম উন্নতি সময়ে বাবু

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল আসিয়া শান্তিপুরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলেন। দুঃখের বিষয় এই যে দ্বারকানাথ ঠাকুর তখন জীবিত ছিলেন না, থাকিলে তিনি তাঁহার অতুল্য মতির যোড়া দেখিতে পাইতেন। ঈশ্বরবাবু দেখিলেন যে শান্তিপুরে মতিবাবু অদম্য এবং মতিবাবুকে দমন করিতে না পারিলেও শান্তিপুরের অধিবাসীগণের শান্তি হইবে না। তিনি আরও দেখিলেন যে কেবল প্রচলিত আইন পরিচালনের দ্বারা মতিবাবুর প্রতাপের খর্ব্বতা করা দুঃসাধ্য, অতএব তিনি তৎকালের নূতন প্রকটিত মিউনিসিপাল আইন পরিচালনের দ্বারা মতিবাবুকে দমন করার কল্পনা করিলেন। কিন্তু সেই আইনও অধিবাসীগণের সম্মতি ব্যতিরেকে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, এবং মতিবাবুকে সম্মত করিতে না পারিলে অধিবাসীরা সম্মত হইবে না। অতএব ঈশ্বরবাবু মতিবাবুর সহিত এমন সৌহৃদ্যতা ও বন্ধুতা সংস্থাপন করিলেন এবং এই আইনের দ্বারা মতিবাবুর এত অধিক উপকার এবং লভ্য হওয়ার প্রলোভন দেখাইলেন, যে অল্প কালের মধ্যেই তিনি মতিবাবুকে ভুলাইয়া আইনটি শান্তিপুরে চালাইতে পারিলেন। স্বকার্য্য সাধন করার পরেই ঈশ্বরবাবু তাঁহার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং পদে পদে মতিবাবুকে অপদস্থ করিতে লাগিলেন। মতিবাবু তখন নিজের ভ্রম দেখিতে পাইয়া এই আইন শান্তিপুর হইতে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন এবং ঈশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে তাঁহার নিন্দাসূচক অনেক দরখাস্ত দেওয়াইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমশঃ ঈশ্বরবাবু এমন বুদ্ধি কৌশল পরিচালন করিলেন যে শান্তিপুরে মতিবাবুর স্থলে ঈশ্বরবাবুরই প্রভুত্ব প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার পরে আমি কিছুকালের নিমিত্ত হাঁসখালির থানায় ছিলাম, সেই স্থানে মতিবাবুর সহিত আমার এক দিবস সাক্ষাৎ হয়, অন্যান্য কথার মধ্যে আমি তাঁহার শান্তিপুরের প্রভুত্বের কথা উল্লেখ করাতে তিনি কিঞ্চিৎ ম্লান বদনে আমাকে বলিলেন যে "দারোগা বাবু! আমাকে আর ও কথা বলিবেন না, আমি এখন শান্তিপুরের কুকুরটাকেও ছেই করি না।" মতিবাবুর নিজের মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে তিনি কতদূর অপদস্থ হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে মতিবাবু দীন দয়াল পরমাণিক নামক শান্তিপুরের একজন বিত্তশালী ব্যক্তির নামে কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্টে এক মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে, বিখ্যাত বিচারপতি সর মর্ডান্ট ও এলস তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য কলিকাতার বড় ফাটকে প্রেরণ করেন এবং সেই খানে দণ্ডের কাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মতিবাবু লোকান্তর গমন করেন। মতিবাবুর মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু ঈশ্বরবাবুর প্রতি মতিবাবুর দলের লোকের শক্রতা গেল না। তাহারা পুনরায় কি এক কারণে ঈশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করাতে বঙ্গের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ঈশ্বরবাবুকে ছয় মাসের নির্ব্বাসনের ন্যায় কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমায় থাকিতে আদেশ করেন এবং ঈশ্বরবাবু তদনুসারে শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরের গোয়াড়ির বড় সড়কের পূর্ব্বধারে রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বাবুদিগের দুই খানা দোতালা বাসা বাড়ী আছে। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনই তাহা খুব পুরাতন হইয়াছিল, এক্ষণে কি অবস্থায় আছে তাহা বলিতে পারি না। বাড়ী দুইখানা পাশাপাশি এবং প্রত্যেকের চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত হাতা এবং হাতা ইটের প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ইহার দক্ষিণদিকের বাড়ীতে ঈশ্বরবাবু বাসা করিলেন এবং উত্তরের বাড়ীতে সরবে বিভাগের ডেপুটী কলেক্টর বাবু অভয়চরণ মল্লিক বাস করিতেন। ঈশ্বরবাবুই আমাকে নবদ্বীপ থানার দারোগা পদে নিযুক্ত করেন এবং তদবধি আমাকে যেমন অনুগ্রহ করিতেন, তেমন আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন। কৃষ্ণনগর আসিলে পরে আমি তাঁহার নিকট প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে যাইয়া রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতাম এবং মধ্যে মধ্যে উক্ত অভয়বাবুও আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিতেন। এইরূপ দুই তিন মাসের পরে এক দিবস প্রত্যূষে ঈশ্বরবাবুর খানসামা আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে "গত রাত্রে চোরে বাবুর শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া অনেক দ্রব্যাদি

লইয়া গিয়াছে। বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন চলুন।" আমি যাইয়া দেখি যে ঈশ্বরবাবু এবং অভয়বাবু একত্র বসিয়া আছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্রই অভয়বাবু আরক্ত লোচনে ইংরাজীতে আমাকে বলিলেন যে "আমি মাজিষ্ট্রেট হইলে তোমাকে এইক্ষণে বরতরফ করিতাম। তোমাকে কি জন্য এত মোটা বেতন দেওয়া যাইতেছে, যদি তুমি চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিতে না পারিবে।" কিন্তু ঈশ্বরবাবু তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন যে "দারোগা তুমি এই পাগলের কথায় ব্যাজার হইও না, ও এই সকল বিষয়ের কি জানে?" আমি অভয়বাবুর কথায় কোন উত্তর না দিয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইলাম। এইস্থানে ঈশ্বরবাবুর শয়নকক্ষের দৃশ্যটা বর্ণনা না করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন না যে চোরে কি অসমসাহসরূপে এই ঘরে চুরি করিয়া গিয়াছিল। ঘরের দুই কোণে দুইটি দুনলী বিলাতী বন্দুক; চারি প্রাচীরের গায় চারিখানা তরবার ও চারিটা ঢাল ঝুলিতেছিল। ঈশ্বরবাবু এক নেয়ারের অর্থাৎ ফিতার খাটে শয়ন করিতেন, শিয়রে একটা সেই সময়ের নূতন আবিষ্কৃত রিবল্‌বার পিস্তল ও দুই পার্শ্বে দুই খানা ভুটিয়া ভোজালী, পদতলে একখানা বিলাতী হেঙ্গার তরবার। তদ্ভিন্ন ঘরের মধ্যে দুইটা মুদ্গর, একটা লেজাম ও কতকগুলি শূকর শীকারের বল্লমও ছিল। বন্দুক ও পিস্তল প্রত্যহ শয়ন করার পূর্ব্বে তৈয়ার করিয়া রাখিতেন। ঘর দেখিয়া বাঙ্গালার ঘর বলিয়া বোধ হইত না, কোন যোদ্ধার ঘর বোধ হইত। ঈশ্বরবাবু সখ করিয়া কেবল শোভার নিমিত্ত এই সকল অস্ত্র রাখিতেন এমন নহে, নিজে অস্ত্র চালাইবারও তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল এবং শীকার করিতে বড় ভাল বাসিতেন। এই সকল অস্ত্র চতুপার্শ্বে করিয়া এই বীর-পুরুষ শুইয়াছিলেন, চোর আসিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলে চোরের যে কি অবস্থা হইত, তাহা অনায়াসেই অনুধাবন করা যাইতে পারে এবং চোরেরও ধন্য সাহস ও চতুরতা যে এইরূপ বিপদ এড়াইয়া সে তাহার কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দেখিলাম যে বাঁশের একটা বড় মই সিঁড়ি দোতালার জানালায় লাগাইয়া জানালার গরাদিয়া কাটিয়া চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরবাবুর কোট, পেণ্টলুন, কামিজ প্রভৃতি অনেক পরিধেয় বস্ত্র ও পোষাক, ফুলেল তেলের ও শেরির চারটা বোতল ও নানাবিধ কাঁচের গ্লাশ, কাঁটা চামচা কপ, সোনার ঘড়ি ও চেন, রূপার গেলাস, বাটী, রেকাব, হুঁকা, গুড়গুড়ী, পানের ডিপা, সোনার নস্যদানী ও একটা পেনসিল কেস্‌, নগদ কয়েক খানা গিনি মোহর ও প্রায় একশত টাকা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। আমি দেখিয়া স্তম্ভিত, কি করিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরবাবু আমাকে সকলের নিকট প্রচার করিতে অনুমতি করিলেন, যে যদি কেহ চোর ধরিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তিনি একশত টাকা পুরস্কার দিবেন। এই ঘটনার চারি দিবস পূর্ব্বে গোয়াড়ীর বাজারে এক বাড়ীতে ঠিক এইরূপ দোতালার জানালা ভাঙ্গিয়া একটা চুরি হইয়াছিল। অতএব উপর্য্যুপরি অল্প সময়ের মধ্যে একই প্রণালীর দুইটি চুরি হওয়াতে গোয়াড়ীর অধিবাসীগণের মনে অত্যন্ত আতঙ্ক জন্মিল, এবং তাহা জন্মিবারও কথা। সকলে আমাকে বলিল যে এই চোর ধরিতে না পারিলে গোয়াড়ীর কখন কাহার সর্ব্বনাশ হয়, তাহার ঠিকানা নাই। আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এই চোর আবিষ্কার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বুদ্ধু নামে আমার অধীনে এক জন বরকন্দাজ ছিল, সে পূর্ব্বে বিখ্যাত বদমাএস ও চোর ছিল—আমি তাহাকে প্রথমে চৌকীদারী ও পরে বরকন্দাজী দিয়া আমার নিকটে রাখিয়া ছিলাম। সে ব্যাটা চোর ধরার কার্য্যে এমন পণ্ডিত ছিল যে সিঁধ দেখিয়া বলিতে পারিত যে ইহা অমুক চোরের, কিম্বা ইহা দেশী কি বিদেশী চোরের কার্য্য। ফলে তাহার সন্ধান অব্যর্থ ছিল এবং তাহাকে আমি রাখিবার পরে কৃষ্ণনগরে চুরি এককালে তিরোহিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বুদ্ধু এই দুই চুরি দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া পড়িল। সে বলিল যে ইহা কোন নূতন ব্যক্তির কার্য্য, দেশী চোর কর্ত্তৃক হয় নাই। তথাপি আমি কৃষ্ণনগরের সকল বদমাএসকে ধরিয়া আনিয়া কত প্রহার করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না। ইংরাজীতে বলে যে জলমগ্ন ব্যক্তি তৃণ

অবলম্বন করিয়াও বাঁচিতে চেষ্টা করে। আমার ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিল। আমার চিত্ত এমন ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে আমাকে যে যাহা পরামর্শ দিত, তাহাই আমি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে শুনিলাম যে নবদ্বীপ হইতে একজন জ্যোতিষী ঠাকুর আসিয়াছেন, তাঁহার গণনা অতি চমৎকার। গেলাম, সেই জ্যোতিষীর নিকটে। তিনি তাঁহার পাজি পুথি বাহির করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন যে "পূব, পূব, দক্ষিণ, দক্ষিণ।" "খর্ব্বাকার, লম্বা চুল, খড় ঢাকা" ইত্যাদি বাতুলের ন্যায় নানা অসংলগ্ন বাক্য ব্যয় ও পুথি নাড়া চাড়া করিয়া দুই ঘণ্টা সময় অপচয় করিলেন। ফল, কোনরূপে চেষ্টা করিতে আমি ক্রটি করিলাম না।

থানার এক রীতি ছিল যে সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস থানার অধীনস্থ সকল গ্রামের চৌকীদারেরা ও ফাঁড়ির বরকন্দাজেরা দারোগার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় মহল্লার সংবাদ ব্যক্ত করিত। এই চুরির পরে আমি সকল চৌকীদার এবং ফাঁড়িদার বরকন্দাজকে এই ঘটনার ও চোর ধরিয়া দিতে পারিলে একশত টাকা পুরস্কারের সংবাদ জানাইয়া তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে ঈশ্বরবাবুর বাসায় যাই এবং প্রত্যহই অভয়বাবুর অনুযোগ তিরস্কার শ্রবণ করি। এমন করিয়া কয়েক দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। চুরির নবম দিবসে আমি ঈশ্বরবাবুর নিকট হইতে রাত্রি প্রায় নয়টার সময় গৃহে যাইতে ছিলাম, এমন সময় থানার নাএব দারোগা আমাকে থানার মধ্যে ডাকিয়া বেলপুকুরের ফাঁড়িদার রামহিত ওঝা বরকন্দাজের প্রেরিত এক খানা পত্র দেখাইল, তাহাতে কেবল এই মাত্র লেখা ছিল যে "পত্রপাঠ চলিয়া আসিবেন, এক ব্যক্তির উপরে আমার শোভে হইতেছে।" আমি তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরবাবুর নিকট পুনরাগমন করিয়া তাঁহার দ্রব্য সকল চিনিতে পারে এমন এক জন চাকর সঙ্গে লইয়া বেলপুকুর যাত্রা করিয়া শেষ রাত্রিতে সেই খানে পৌছিলাম। ফাঁড়িদার বলিল যে তন্নিকটস্থ সুজনপুর গ্রামে ছিরা কায়েত নামে একজন প্রসিদ্ধ বদমাএস আছে, তাহাকে লোকে ছিরা চোর বলিয়া ও ডাকিয়া থাকে! সে অদ্য চার পাঁচ দিবস অবধি বেলপুকুরের বাজারের এক বেশ্যার বাটীতে প্রত্যহ রাত্রিতে খুব সরাপ খাইতে ও ধুমধাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং লোকে তাহাকে নূতন নূতন রকমের বস্ত্রাদি পরিধান করিতে দেখিয়াছে, ইহাতে ফাঁড়িদার সন্দেহ করিয়া আমাকে সংবাদ পাঠাইয়াছে। আমি সেই বেশ্যার বাড়ী যাইয়া দেখি যে তখনও তাহারা বসিয়া সুরাপান ও আমোদ প্রমোদ করিতেছে। ছিরাকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটা বাঁশের আলনার উপরে একটা কামিজ ও পেণ্টেলুন ঝুলিতেছে দেখিয়া ঈশ্বরবাবুর খানসামা বলিয়া উঠিল, যে উহা তাহার বাবুর পোষাক। ছিরা তখন সরাপের নেশাতে বিভোর, ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না। আমি তাহাকে ফাঁড়ি ঘরে প্রেরণ করিয়া ঐ বেশ্যার সহিত কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম যে সে আমার পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তি। আমি যখন নবদ্বীপ থানাতে ছিলাম তখন এই বেশ্যাও সেই থানার নিকট বাস করিত। সে আমাকে মুক্তকণ্ঠে বলিল যে ছিরা অদ্য কয়েক দিবস ধরিয়া তাহার নিকট আসিয়া প্রত্যহ অনেক টাকা ব্যয় করিতেছে এবং এক বাক্স পোষাক ও অন্যান্য দ্রব্য আনিয়া তাহার ঘরে রাখিয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে কিম্বা কোন স্থান হইতে আনিয়াছে তাহা সে জানে না। প্রাতে বেলপুকুরের বাজারে কএক জন লোক আনিয়া তাহাদের সমক্ষে বেশ্যার ঘর হইতে এই বাক্স বাহির করিয়া দেখিলাম যে তাহার মধ্যে সোণা রূপার দ্রব্য সকল ভিন্ন আর সমুদায় অপহৃত দ্রব্য এবং বস্ত্র আছে। সুজনপুরের নীলকুঠির মালিক মেঃ ডুরেপ ডি ডম্বাল সাহেব আমাকে বলিলেন যে ছিরা ধৃত হওয়াতে তাঁহার অত্যন্ত উপকার হইল, কারণ ছিরা প্রায় সর্ব্বদায়ই তাঁহার কুঠির দ্রব্যজাত চুরি করিত। সুজনপুর গ্রামে যাইয়া ছিরার বাড়ী তল্লাস করিলাম কিন্তু সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না। অবশেষে অনেক প্রহার খাইয়া ছিরা কহিল যে সে, গোয়াড়ীর খেয়াঘাটের ইজারদার এক জন বৈরাগীর সঙ্গে একত্রে এই চুরি করিয়াছিল, এবং সোনা রূপার দ্রব্য

সকল সেই বৈরাগীর নিকট আছে। কিঞ্চিৎ বেলা থাকিতে আমরা কৃষ্ণনগর প্রত্যাগমন করিয়াই প্রথমে সেই বৈরাগীর খানাতল্লাসী করিলাম, কিন্তু সেই স্থানে কিছুই পাইলাম না। ইতিমধ্যে ঈশ্বরবাবুর বাড়ীর চুরির চোরা মাল ও চোর ধৃত হওয়ার কথা শুনিয়া তাহা দেখিতে গোয়াড়ীর রাস্তায় এত লোকের সমাগম হইল যে ঈশ্বর-বাবুর বাসাতে পৌছিয়া দেখিলাম, যে তাঁহার বাড়ীর ভিতর লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমি ধৃত দ্রব্য সকল লইয়া ঈশ্বরবাবুর বাড়ীর উত্তর ধারের রোয়াকের উপরে বসিলাম, ঈশ্বরবাবু ও তাঁহার সঙ্গে অভয়বাবু দোতালার জানালায় গলা বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমি এক একটি দ্রব্য বাহির করিয়া "এই কামিজটি কার" বলিয়া জিজ্ঞাসা করি,ঈশ্বরবাবু উপর হইতে বলেন "আমার।" এইরূপে সমুদায় দ্রব্যগুলি ঈশ্বরবাবু তাঁহার দ্রব্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ার পরে আমি ছিরাকে রীতিমত ধৃত দ্রব্য সমস্ত সমভিব্যাহারে মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিলাম। সেই জ্যোতিষী ঠাকুর সকলের নিকট বলিতে লাগিলেন যে তাঁহার গণনার বলেই আমি এই চোর ধরিয়াছিলাম, এবং তাঁহার শ্রোতাগণের মধ্যে এমন অনেক বুদ্ধিমান লোক ছিলেন যে, তাহাই তাঁহারা বিলক্ষণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন, নচেৎ, তাহার এক ব্যক্তি আমাকে বলিবেন কেন যে "দৈববল ভিন্ন এমন চোর ধরা মনুষ্যের সাধারণ বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে।" যাহা হউক, অন্য মোকদ্দমা হইলে তাহা এই স্থানেই শেষ হইয়া যাইত কিন্তু ইহা সেরূপ হইল না, ইহার রহস্যের ভাগ রহিয়া গেল, বিবৃত করিতেছি।

চোর ধরিলাম, মাল ধরিলাম, গোয়াড়ীর অধিবাসীরা বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইল কিন্তু ঈশ্বরবাবুর সন্তোষ হইল না। তিনি আমাকে সেই রাত্রিতেই আহারের সময় বলিলেন যে "দারোগা তোমার কার্য্য তুমি একরূপ সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিলে কিন্তু আমার কিছুই উপকার হইল না, আসল টাকার মাল চোরের হস্তে রহিয়া গেল, বিশেষ সোনার ঘড়িটা যাহা আমি বিলাত হইতে ফরমাইস দিয়া আনিয়াছি, তাহা না পাইলে আমার কিছুতেই সন্তোষ হইবে না।" আমি কি করিব? চোরকে যত প্রকার করিতে হয়, তাহা আমি করিয়া দেখিয়াছি, তথাপি সে অবশিষ্ট দ্রবগুলি দিল না; বিশেষ সে এক্ষণে আমার হস্তে নাই, হাজতে গিয়াছে এবং মোকদ্দমাও এক প্রকার শেষ হইয়াছে। তথাপি ঈশ্বরবাবু আমাকে উত্তেজনা করিতে ছাড়িতেন না। সর্ব্বদা বলিতেন যে "তুমি চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই, চেষ্টা করিলে অবশ্যই আমার ঘড়িটি আবিষ্কার করিতে পারিবে।" আমি অগত্যা জেলখানায় যাইয়া ছিরাকে ডাকিয়া অনেক মিথ্যা আশা ভরসা দেখাইলাম কিন্তু তাহাতে সে কর্ণপাত না করিয়া আমাকে নিশ্চয় বলিল যে তাহার নিকট ঐ সকল দ্রব্য নাই। যাইয়া এই সংবাদ ঈশ্বরবাবুকে বলিলাম কিন্তু তিনি ছাড়িবার ব্যক্তি ছিলেন না। আমাকে হতাশ হইতে নিষেধ করিয়া পুনরায় চেষ্টা করিতে বলিলেন। ফলিতার্থে আমার এই বিষয়ে তাঁহার ন্যায় আর উৎসাহ ছিল না। কারণ, আমার নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি আর পাওয়া যাইবে না।

শুখা কালে কৃষ্ণনগরের স্থানে স্থানে বড় জল কষ্ট হইত, থানায় এক ছোট পুষ্করিণী ছিল, তাহাতে কায়কষ্টে স্নান করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য চলিত না। আমীন বাজারের পুষ্করিণী বড় বটে; কিন্তু তাহাতে জল থাকিত না। কেবল জেলখানার দক্ষিণে লালদিঘীর জল উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী ছিল, কিন্তু তাহাতে কেহ স্নান করিতে পাইত না, কেবল আমি জেল-দারোগার অনুমতি লইয়া তাহাতে মধ্যে মধ্যে স্নান করিতাম এবং স্নান করিতে যাইয়া জেলদারোগার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতাম। সেই সময়ে নৈহাটী নিবাসী বাবু রাজীবচন্দ্র মিত্র ঐ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁহার সহিত আমার বন্ধুতা থাকাতে আমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইতাম। উপরোক্ত ঘটনা সমস্তের প্রায় দশ বার দিবস পরে আমি এক দিন প্রাতে জেলদারোগার নিকট বসিয়া ছিলাম; এমন সময় দেখিলাম যে হাজতের আসামীরা পেতনীপুকুর নামক জেলখানার সম্মুখস্থিত একটা পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া জেলখানার ভিতরে

প্রত্যাগমন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে আমার শ্রীধরও ছিলেন। ছিরা আমাকে দেখিয়া তাহার প্রহরী বরকন্দাজকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে সে আমার সঙ্গে কথা কহিতে চাহে। ছিরা আসিয়া আমাকে বলিল যে "দারোগা মহাশয়! হাজতে থাকিয়া আমার সুবুদ্ধি উদয় হইয়াছে, আমি অবশিষ্ট মাল সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়া আসিয়াছি, ফলে বৈরাগী আমার সঙ্গেও ছিল না এবং মালও তাহার হস্তে নাই। মাল আমার নিজ গ্রামে আমার এক জন জ্ঞাতির নিকট আছে, আপনি আমাকে একবার সুজনপুর লইয়া যাইতে পারিলে, সেই মাল দেখাইয়া দিতে পারিব।"

দারোগা—তুমি এক্ষণে হাজতের আসামী; তোমাকে জেলখানা হইতে বাহির করিয়া স্থানান্তর লইয়া যাইতে আমার ক্ষমতা নাই। আমি তাহা করিতে পারিব না, তোমার যদি যথার্থই সন্তাপ হইয়া থাকে এবং মালগুলি দেওয়ার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নাম এবং কোন স্থানে সে মাল গোপন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিলেই আমি সেই স্থানে যাইয়া তাহা উদ্ধার করিতে পারিব।

চোর—না আপনি তাহা পারিবেন না, আমি সেখানে নিজে গমন না করিলে অন্যের কাহারও সাধ্য হইবে না।

দারোগা—তবে ইহাতে তোমার আরও কিছু অভিসন্ধি আছে।

চোর—থাকিতে পারে, কিন্তু আমি ইহা উপলক্ষ করিয়া আপনার হস্ত হইতে পলাইবার চেষ্টা করিব, এমন যেন আপনি মনে না করেন।

দারোগা—তাহা যে তুমি করিবে না, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব।

চোর—আপনি যদি তাহা মনে করেন, তাহা হইলে আপনি পাগল। আমি যদিও দুরদৃষ্ট বশত চোর হইয়াছি তথাপি আমি ভাল মানুষের ছেলে, লেখা পড়াও কিঞ্চিৎ জানি, এতএব আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি যে সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান নাই, যেখানে যাইয়া ইংরাজের হস্ত হইতে লুকাইয়া থাকিতে পারিব। অতএব আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন, আমি পলাইব না। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে যেমন করিয়া হউক, আপনি আমাকে সুজনপুরে না লইয়া গেলে, আপনি সেই অবশিষ্ট দ্রব্য গুলিন পাইবেন না।

ছিরার এই সকল কথা শুনিয়া আমি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলাম যে, আমি কল্য প্রাতে যাহা হয় তাহাকে জানাইব। ঈশ্বরবাবুকে জানাইলাম। তাঁহার ইচ্ছা যে যেন তেন প্রকারেণ মাল গুলি পাইলেই হয়; অতএব তিনি ছিরার কথায় কোন দোষ দেখিলেন না এবং আমাকে ছিরার কথানুযায়ী কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। ছিরাকে জেলখানা হইতে বাহির করিয়া আনিতে হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের আবশ্যক কিন্তু সেই সময়ে মাজিষ্ট্রেট মেঃ এফ, আর ককরেল্ সাহেব তখন মফঃস্বল ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন, কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমার সমুদায় কার্য্যের ভার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী ইএতজাদ হোসেনের হস্তে অর্পিত ছিল। মৌলবী সাহেবের ন্যায় ধর্ম্মভীত এবং নিরীহ ভাল মানুষ আমি চক্ষে দেখি নাই। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া সকল কথা ব্যক্ত করাতে তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন যে "বাবু আমি আর কিছু জানি না, তুমি যদি আসামীর জেম্বা হইয়া বাহির করিয়া লইতে সাহস কর, তাহা হইলে আমি হুকুম দিতে পারি।" আমি অগত্যা তাহা স্বীকার করাতে তিনি জেল-দারোগাকে সেই হুকুম প্রদান করিলেন।

পর দিবস প্রাতে আমি ছিরাকে জেল খানা হইতে বাহির করিয়া থানায় লইয়া যাইতে চাহিলাম কিন্তু সে থানায় যাইতে অস্বীকার করিল। বলিল যে "আমি এখন থানায় যাইব না, আমাকে আপনার বাসায় লইয়া চলুন, আমি অনেক দিন ভাল দ্রব্য খাইতে পাই নাই, একটা রুই মাছের মুড়া ও দধি দুগ্ধ সন্দেশ খাইতে বড় সাধ হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা দিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ান।" আমি তাহাই করিলাম। বাসায় লইয়া যাইয়া সেইরূপ আহারের উদ্যোগ করিলাম ও চৌকীদার দ্বারা তাহার স্নানের জল আনাইয়া দিলাম। অন্য ভদ্রলোকের ন্যায় সে আমার বিছানায় বসিল, আমার হুঁকায়

তামাকু খাইল, আমার গামছা ব্যবহার করিয়া স্নান করিল এবং অবশেষে একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মত বসিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করিল, এবং ভোজন করিয়া খুব তৃপ্তি প্রকাশ করিল। ভোজনান্তে থানায় যাইয়া শয়ন করিল। এবং নিদ্রাভঙ্গের পরে আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল যে "দারোগা * মহাশয়, আপনি জানেন যে আমার শরাব খাওয়ার অভ্যাস আছে,—আমাকে ঈশ্বরবাবুর নিকট হইতে সেইরূপ এক বোতল শেরী আনাইয়া দিলে বড় ভাল হয়, কিন্তু তাহা থানায় বসিয়া খাইব না, আমীন বাজারে রমণী নাম্নী আমার এক প্রণয়িণী আছে, আমি তাহার ঘরে তাহার সঙ্গে বসিয়া অদ্য সমস্ত রাত্রি আমোদ করিতে চাহি। আপনি বেশ বুঝিতেছেন যে আমার নিস্তার নাই, পাঁচ সাত বৎসরের জন্য আমাকে কয়েদ থাকিতে হইবে এবং তাহা হইতে বাঁচিয়া পুনর্ব্বার বাড়ী যাইব কি না সন্দেহ, অতএব মনের সাধ মিটাইয়া আজকার একটা রাত্রি যদি আমাকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া কাটাইতে দেন, তাহা হইলে চিরকাল আপনার এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখিব। আমি পলাইবার চেষ্টা করিব বলিয়া আপনি যেন কিছু মাত্র আশঙ্কা করেন না, আর এক কথা এই যে আমি যখন রমণীর ঘরে থাকিব তখন সেখানে যেন কোন চৌকীদার কিম্বা বরকন্দাজ আমাদের উপরে প্রহরী স্বরূপে বসিয়া আমাদের আমোদের বিঘ্ন না করে।" ছিরার কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। হাসিব কি রাগ করিব, স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে "ইহাও একটি কম মজার তামাসা নহে" বলিয়া আমার মনে উদয় হওয়াতে আমি ছিরার সমুদায় অনুরোধ প্রতিপালন করিতে সম্মত হইলাম। অভয়বাবু শুনিয়া "ছি ছি" করিয়া উঠিলেন, কিন্তু ঈশ্বরবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন যে "যাও ব্যাটার আবদার প্রতিপালন করা উচিত, পুলিশ আমলার এই সকল কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" তাঁহার নিকট হইতে দুই বোতল শেরী লইয়া আমীন বাজারে রমণী বেশ্যার বাড়ীতে গমন করিলাম। আমীন বাজার নিজ কৃষ্ণনগর ও গোয়াড়ির মধ্যস্থল এবং এইস্থানে একটি ভাল বাজার ও নীচ বেশ্যাদিগের উপনিবেশ আছে। রমণীকে সকল কথা অবগত করিয়া ছিরা তাহার ঘর হইতে পলায়ন করিতে না পারে তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলাম এবং অধিক শরাবের আবশ্যক হইলে আবগারীর দোকান হইতে যত ইচ্ছা শরাব আনিয়া লইতে বলিলাম এবং আরও কহিলাম, যে ছিরা যাহাতে শীঘ্র মাতাল হইয়া অজ্ঞান হয়, তাহা যেন রমণী চেষ্টা করে। তদুত্তরে রমণী মাথা নাড়িয়া কহিল যে "দুই কলসী মদ খাইলেও ছিরার কিছু হইবে না।" পরে রমণীর বাড়ীর পার্শ্বস্থ বেশ্যাদিগকে সতর্ক করিয়া কৃষ্ণনগরের অনেক পাড়া খালি করিয়া চৌকীদার আনিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে এক এক জন প্রহরী বসাইয়া দিলাম। থানার সমস্ত বরকন্দাজ গুলিকেও স্থানে স্থানে রাখিলাম এবং তাহাদের উপরে থানার ও বালা-গস্তির জমাদার দ্বয়কে মোতায়েন করিলাম এবং সকলের উপরে আমি স্বয়ং রমণীর বাড়ীর নিকটে—এক দোকান-দারের দোতালা ঘরে শয়নের উদ্যোগ করিলাম। সেই ঘর হইতে রমণীর বাড়ী দেখা যায়। এইরূপে সাবধান হইয়া ছিরার আবদার পালনে ব্রতী হইলাম। সন্ধ্যার পরে ছিরা পুনরায় আমার বাসাতে আহার করিয়া আমীন-বাজার যাইবার পূর্ব্বে—আমার চাকরের নিকট হইতে আমার একখানা পরিধেয় কোঁচান ধুতি ও চাদর চাহিয়া লইয়া পরিধান করিল, এবং কিঞ্চিৎ আতরও চাহিয়া লইয়া আমার জুতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য বশত আমার জুতা তাহার পায়ে ছোট হইল। পরে

* (ভগিনী সুরুচি এই স্থানে আপনি আমাকে কৃপা পূর্ব্বক মার্জ্জনা না করিলে, আমি মারা যাই। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন বঙ্গদেশে আপনার আবির্ভাব হয় নাই সুতরাং তখন আপনার নিয়মের বিরুদ্ধে এমন অনেক কার্য্য করিয়াছি, যাহার জন্য আমরা এইক্ষণে অত্যন্ত লজ্জিত আছি। কিন্তু যে স্থলে প্রকৃত বৃত্তান্ত বর্ণনা করাই আমার সংকল্প হইয়াছে, তখন সত্যের অপলাপ করিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিতেও পারিতেছি না—ক্ষমা প্রার্থনা করি।)

আমার বাসা হইতে নির্গত হইয়া আমাকে তাহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল, চৌকীদার কিম্বা বরকন্দাজের সহিত যাইতে অসম্মত হইল। আমরা যাইতে আরম্ভ করিলাম, কোন বরকন্দাজ কিম্বা চৌকীদার না দেখিয়া সে বড় সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু আমাদের পশ্চাতে এক ব্যাটা দাড়ীওয়ালা মুস্কিল-আসান একটা মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া আসিতেছিল। সেই মুস্কিল-আসান আমার বৃদ্ধ বরকন্দাজ। ছিরাকে রমণীর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া আমি নিজ স্থানে গমন করিলাম এবং সেই দ্বিতল কক্ষ হইতে সমস্ত রাত্রি রমণীর ঘরে হাসি তামাসার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমাদের কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, অবশেষে ভোর হওয়ার পূর্ব্বে ছিরা টলিতে টলিতে থানায় প্রত্যাগমন করিল এবং আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। সেই দিবস ছিরা সুজনপুর যাইতে পারিল না। পর দিবস নায়েব দারোগার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম। নায়েব দারোগা প্রত্যাগতে মোহর ও টাকা ব্যতীত অপহৃত সমুদায় সোণা রূপার দ্রব্য ও চেন সমেত ঘড়িটা আনিয়া উপস্থিত করিয়া ব্যক্ত করিল যে ছিরার জ্ঞাতির কথা মিথ্যা, সে নিজেই এক গোপনীয় স্থান হইতে ঐ দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া দিল। দায়রার বিচারে ছিরার ছয় বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইল এবং ঈশ্বরবাবু তাঁহার ঘড়িটি পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে আমার সহিত সেক-হাণ্ড করিলেন। চোরের আবদারের কথাও আমার এইস্থানে সমাপ্ত হইল। *

---

* 'নবজীবন', তৃতীয় ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ, ১২৯৩

প্রতিশোধ

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র, বাণী-বিনোদিনী

মা সরস্বতীর সহিত অনিলের চির বিবাদই রহিয়া গেল। লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ তাহার কোন° দিনই জন্মিল না। এজন্য দাদা মতিলালের নিকট উপদেশ তিরস্কার প্রহার কত যে লাভ করিত তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশক্তি ও ভাবধারা বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্কুলের মাহিনা দিতে গিয়া একদিন টাকা দুইটা বৃক্ষতলে উপবিষ্ট অনাথ রুগ্ন বুভুক্ষিত এক ভিক্ষুককে দান করিয়া বসিল। মতিলাল যখন মাহিনার রসিদ দেখিতে চাহিলেন, তখন সত্য কথা বলাতে তিনি সন্তুষ্ট ত হইলেনই না, অধিকন্তু ভ্রাতার কাণ দুইটি আচ্ছা করিয়া মলিয়া দিয়া কহিলেন—"স্কুলের মাইনের টাকা তুই ভিখিরিকে দান করে' এলি, তোর ফাইনের টাকা গুণ্‌বে কেরে পাজি হতভাগা!"

বাস্তবিকই এ সংসারে অনিল বড় হতভাগা! তাহার জন্মের এক বৎসর পরেই তাহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। তারপর তিন বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যখন সে নয় বৎসরের বালক, তখন তাহার মাতৃসমা স্নেহময়ী বৌদিদি, মতিলালের প্রথম পক্ষের স্ত্রী আনন্দময়ীরও কাল হয়। ইঁহারই স্নেহ-যত্নে অনিল কোনদিন মাতার অভাব অনুভব করিতে পারে নাই। ইঁহার তিরোধানে অনিলেরও সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তির অবসান হইয়া গেল। পত্নীশোক তাড়াতাড়ি বিস্মৃত হইবার জন্য অশৌচান্তেই মতিলাল একটি বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন, এবং একটি সরকারী অফিসে চাকুরী গ্রহণ পূর্ব্বক পত্নী ও ভ্রাতাকে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বৎসর পূর্ণ হইতেই একটি পুত্রসন্তানও লাভ করিলেন। কিন্তু কি জানি কেন এই দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম দিন হইতেই এই পিতৃমাতৃহীন নিতান্ত অসহায় বালক দেবরটাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না।

দুই

বেলা তখন প্রায় দুইটা বাজে। কোনও প্রতিবেশীর সৎকার করিয়া স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া অনিল বলিল—"ভাত দাও বৌদি'।"

বৌদি' প্রতিভা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা অনিমার ফ্রকে এম্‌ব্রয়ডারির কাজ করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া উত্তর দিলেন—"ভাত নেই।"

—"বাঃ! ভাত নেই কি রকম? রাঁধ নি বুঝি?"

—"রাঁধব না কেন, আমরা খেয়ে নিয়েছি। বেলা দুটো পর্য্যন্ত ত আর হাঁড়ী-হেঁসেল নিয়ে তোমার জন্যে বসে' থাকৃতে পারি না।"

—"তা' কেন, আমার ভাত যেমন ঢাকা দিয়ে রাখ, তেমনি রাখ্‌লেই ত পারতে।"

—"কেন, যাদের মড়া পুড়িয়ে এলে তারা ভাত দিলে না?"

—"বাঃ! তাদের বাড়ী ভাত খাব কি, তারা কি আমাদের জাত?"

—"অজাতের মড়া বয়ে নিয়ে গিয়ে পোড়াতে পার, তার বেলায় দোষ হয় না, আর ভাতের বেলাতেই যত দোষ?"

—"এ সৎকার। বাস্তবিকই দোষ নেই। মানুষের বিপদ-আপদে মানুষ যদি না দেখে, মানুষ যদি না করে, তবে তা'তে আর পশুতে প্রভেদ কি? বিশেষতঃ, প্রতিবেশী। দাও, এখন ভাত দাও—তামাসা রাখ। না হয় কোথায় আছে বলো, আমিই নিয়ে খাচ্চি।"

—"বললুম ত রাখি নি। বিশ্বাস হচ্ছে না?

—"কেন রাখ নি?"

—"তোমার দাদা বারণ করে' দিয়েছেন।"

—"দাদা! কেন?"

—"কেন আবার কি? এবার থেকে তোমায় নিজের ভার নিজে নিতে হবে—আর তিনি তোমায় খাওয়াতে পরাতে পারবেন না। নিজের ত পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চা হচ্ছে, আর তুমিও কচি খোকাটি নেই।"

এরূপ উপদেশ অনিলকে প্রতিদিনই শুনিতে হয়। তাই সে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল—"খিদেয় পেটে জ্বলে গেল, আগে ভাত ক'টা দিয়ে তারপর যত পার উপদেশ দিও।"

রুক্ষকণ্ঠে এবার প্রতিভা বলিয়া উঠিলেন—"তোমার সঙ্গে তামাসা কর্‌বার আমার দায় পড়েছে। সত্যি কি মিথ্যে তোমার দাদা অফিস থেকে এলেই জিজ্ঞেস করো। আমাকে আর জ্বালিও না বাপু।"

এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া অনিল বলিল—"তবে চিঁড়ে মুড়ি কিছু থাকে তাই না হয় দুটো দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে বৌদি'।"

—"তোমাকে একগ্লাস জল পর্য্যন্ত দিতে বারণ করে' গেছেন। শুধু বারণ নয়, অতিবড় দিব্যি দিয়েছেন। আমি কিছু দিতে পার্‌ব না। আসুন তোমার দাদা।"

বুভুক্ষিত অনিলের চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তাহার সেই স্বর্গগতা স্নেহময়ী বৌদি'র বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতিটা বেদনার আঘাতে সহসা উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"হায়, আজ যদি সে বৌদি' থাকৃত!"

ঝঙ্কার দিয়া প্রতিভা বলিয়া উঠিলেন—"যাও না, তাকে নিয়ে এস গে না। কে বারণ কর্‌ছে।"

—"যদি সে উপায় থাকৃত তা' হ'লে আর তোমায় বল্‌তে হ'ত না বৌদি'।" বলিতে বলিতে অনিল সশব্দ পদক্ষেপে সোপান অতিবাহিত করিয়া নীচেয় নামিয়া গেল এবং রাজপথের ধারে বাহিরের সরু বারান্দাটির উপর গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

যথাকালে মতিবাবু অফিস হইতে প্রত্যাগত হইলেন। শুষ্ক ম্লানমুখে উপবিষ্ট ভাইটির দিকে একবার বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু, কিছু বলিলেন না, বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। ক্ষুধাতুর অনিল আশা করিতে লাগিল দাদা যখন আসিয়াছেন, তখন নিশ্চয় এইবার আমায় খাইতে ডাকিবেন। বহুক্ষণ অতীত হইয়া ক্রমে রাত্রি আসিল, কিন্তু ভিতর হইতে অনিলের কোনরূপ আহ্বান আসিল না। তখন রাগ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অনিল ধীরে ধীরে উঠিয়া পুনর্ব্বার অন্দর মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, দাদা আহারে বসিয়াছেন; বৌদি' পরিবেশন করিতেছেন। ক্ষুধায় অনিলের পেট জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। কহিল—"দাদা, আপনি আমায় ভাত দিতে বারণ করে' দিয়েছেন বৌদি'কে?"

তখন মতিবাবু মুখে ভাতের গ্রাস তুলিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই উত্তর করিলেন—"হুঁ।"

নূতন গৃহিণী প্রতিভাসুন্দরী বহুদিন যাবৎ স্বামীর হৃদয়-ক্ষেত্রটী অবিরত বর্ষণ ও জলসেচন দ্বারা উর্ব্বর করিয়া তুলিয়া যে বিষের বীজটি বপন করিয়াছিলেন, আজ তাহা শাখাপল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং, ভ্রাতার অশ্রুবিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর মতিবাবুর হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও আঘাত করিতে সক্ষম হইল না।

অনিল গলা ঝাড়িয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিল—"কেন দাদা, আমার অপরাধ?"

ততক্ষণে মুখের ভাত গলাধঃকরণ করিয়া মতিবাবু উত্তর করিলেন—"অপরাধ তোমার কেন হবে, অপরাধ আমারই। আমি এই সব অন্যায় সইতে পারি না। তোমার চরিত্র শোধরাবার জন্যে ত অনেক চেষ্টা কর্‌লুম; কিছুতেই যখন পার্‌লুম না, তখন তোমাকে পৃথক করে' দেওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ছেলেপুলে ক'টাও ত বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে—তোমার দৃষ্টান্ত দেখে দেখে তারা তোমার মতন হ'য়ে দাঁড়ায় যদি, তা' হলেই তো সর্ব্বনাশ! তখন কি কর্‌ব বলো?"

কথাটা প্রণিধান করিবার যোগ্য। যতই হউক না,

অনিল স্বার্থপর নয়। স্তব্ধভাবে সে ক্ষণেক চিন্তা করিল। বাস্তবিক, সে ত' দাদাকে কোনও দিন সুখী করিতে পারে নাই; তাহার জন্য কি আবার দাদার সন্তান সন্ততিগণও তাঁহার অসুখের কারণ হইয়া উঠিবে? সে বলিল—"তবে আমি কোথায় থাক্‌ব দাদা?"

দাদা উত্তর করিলেন,—"যেখানে খুসি। ইচ্ছে হয় দেশে গিয়ে থাক্‌তে পার। বাগান-বাগিচা রয়েছে—চালিয়ে নিতে পার্‌লে চলে' যাবে।"

ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া অনিল বলিল—সেই ভাল, দেশেই যাব। কিন্তু আপনাকে গিয়ে আমার অংশ ভাগ করে' দিয়ে আস্‌তে হবে।"

মতিবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন—"বেশ! তা' দোব।"

প্রতিভা এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিলেন। এখন বলিয়া উঠিলেন—"ও বাবা, এত! আমি মনে কর্‌তুম বুঝি হাবা ন্যাকা, পেটে পেটে এত কুবুদ্ধি! ডুবে ডুবে জল খান। হবে নাই বা কেন? যেমন সঙ্গে বাস। উনি দেশে সোণা ফলাবেন, আর পাছে দাদা গিয়ে তাঁর খবরা চান, তাই আগে থাক্‌তে সাবধান হচ্ছেন। খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে' তার ফল দেখ একবার।"

তিন

অধ্যবসায়ের বলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে। অনিল চেষ্টা এবং পরিশ্রম করিয়া সারা গ্রামখানিরই শ্রী পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। সে নিজের জমি ছাড়া অন্যান্য অনেক লোকের জমিও 'জমা' করিয়া লইয়াছিল। কৃষি-সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকটে নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া সে নিবিড়ভাবে কৃষিকর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে এতটা উন্নতি লাভ করিল যে, লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে কোন ভদ্রলোকেরই এদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। অনিলের দৃষ্টান্তানুযায়ী কয়েকজন বেকার ভদ্র-যুবকও কৃষিকার্য্যে লাগিয়া গেলেন। অনিল তাহার কতকটা জমীতে 'শটী' আবাদ করিয়াছিল; এজন্য তাহাকে একটি ছোটখাট কারখানাও প্রতিষ্ঠা করিতে হইল। অনেক দীন-দরিদ্র তাহার নিকট দিন-মজুরী করিয়া নিজেদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে লাগিল। অনিলের জমীতে এত শটী জন্মিল যে, সেই শটী প্রস্তুত করাইয়া দেশে দেশে রপ্তানী করিয়া সে প্রচুর লাভবান হইল। কয়েক-জন গ্রামের ভদ্রযুবকও তাহার এই কারখানাতে কর্ম্মচারী-রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনিল এখন গ্রামের সর্ব্বেসর্ব্বা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চতুর্দ্দিকে তাহার চাষ-আবাদ। মোটকথা, সে গ্রামখানিকে এমন সুজলা সুফলা করিয়া তুলিল যে, বাস্তবিকই দেখিলে নয়ন মন চরিতার্থ হয়।

একদিন অনিল তাহার কারখানায় শটী প্রস্তুত পরিদর্শন করিতেছিল, এমন সময় তাহার এক কর্ম্মচারী ব্যস্তভাবে আসিয়া কহিলেন—"আপনার দাদার কি হয়েছে শুনেছেন?"

—"না, কি হয়েছে?"

—"দেনার দায়ে জেল হয়েছে।"

—"জেল!" সহসা অনিলের মাথাটা টলমল করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—তাহার পায়ের তলা হইতে পৃথিবীটা যেন সরিয়া যাইতেছে। সে আর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থিত চেয়ারখানায় 'ধপ্' করিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল—"কে বল্‌লে আপনাকে? আপনি জান্‌লেন কেমন করে'?"

—"এই যে আসুন না—ব্যাপারটা দেখে জান না। আপনার দাদার পৈত্রিক সম্পত্তি ক্রোক কর্‌তে এসেছে।"

অনিল একবার কল্পনা-নেত্রে দাদার অংশের ভগ্নগৃহ এবং কণ্টকপূর্ণ জমীর দিকে লক্ষ্য করিয়া ভাবিল—ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, তখন সম্পত্তি বখরা করে' নেবার বুদ্ধি আমায় হয়েছিল।

চার

—"অনিল, ভাই আমার!"

মুখে আর কথা সরিল না। জ্যেষ্ঠ ব্যথাহত বাষ্পাকুল দৃষ্টিতে শুধু কনিষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনিল বলিল—"ভুল কর্‌বেন না দাদা, আপনি যে আমার বড় ভাই! এই দলিলটা রাখুন; বৌদিকে দেবেন—এতে আপনার ক্রোকী সকল সম্পত্তিই তাঁর নামে করে' দিয়েছি।"

—"তার নামে! না অনিল, তা' হ'তে পারে না। হাস্‌ছিস্, কিন্তু, কিন্তু—"

—"এর মধ্যে দ্বিধা-সঙ্কোচের কি আছে দাদা?"

—"ওঃ! তুই কি আমারই ভাই?"

—"আশীর্ব্বাদ করুন দাদা, এ গৌরব কোনদিন সামান্য ক্ষণের জন্যেও যেন বিস্মৃত না হই!"

—"তুই ভাই, কিন্তু আমি কি?"

—"আপনি আমার দাদা।"

চারুশীলা মিত্র

শিমুলতলার কথা

কুমারী আভাময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

বায়ু-পরিবর্ত্তন করতে যাওয়া বর্ত্তমানে বাঙালী জাতির একটা নেশা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ছুটি হলেই অল্পবিস্তর সংসার বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য দূরদেশে চল্‌লেন। কেউ দার্জ্জিলিং, পুরীধাম, ওয়ালটিয়ার; কেউ ঋষিকেশ, হরিদ্বার; কেউ বা নিদেনপক্ষে জামতাড়া, মধুপুর, বৈদ্যনাথ একবার বেড়িয়ে আস্‌বেন। কাশী হ'ল বাঙ্গালী জাতির 'হণ্টিং ষ্টেশন'; অর্থাৎ, পশ্চিমে যিনি যেখানেই বেড়াতে যান্ না কেন, নাববার সময় একবার বাবা বিশ্বনাথের চরণ ছুঁয়ে আস্‌বেনই।

আমিও এবার পূজার ছুটিতে শিমুলতলায় বেড়াতে গেছলাম। বায়ু-পরিবর্ত্তন করতে যাই নি—কারণ, অসুস্থ বা রোগীব্যক্তিই বায়ু-পরিবর্ত্তন করতে যায়। শিমুলতলা একটি পার্ব্বত্য গ্রাম; সহর নহে। যেমন মধুপুর, বৈদ্যনাথ। তবে এ স্থানটি সেরূপ প্রকৃতির নয়; এমন কি গিরিডি, জামতাড়ার মতও নয়। সামান্য ক'খানি বাঙালীর বাড়ী নিয়ে এর ঐশ্বর্য্য। তাও বেশী নয়; বড় জোর দু'শ' খানা হবে। গ্রামবাসীদের বাড়ী সব মাটীর। ঘরেতে একটি মাত্র প্রবেশ-পথ—দরজা। এই দরজা ব্যতিরেকে মানুষ, রোদ ও বাতাস যাতায়াতের অন্য পথ নাই।

এখানে বাণী-দেবীর অর্চ্চনার কোন ব্যবস্থাই নাই—বর্ত্তমান ভারতের ভাবধারার কথা তো স্বতন্ত্র। এখানকার দেশবাসীরা বড়ই অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। ববং দেখ্‌তে পাই হিন্দুর চেয়ে মুসলমানেরা পরিষ্কাব থাকে। সেজন্য যখন কোন একটা মড়ক লাগে, তখন মুসলমানের চাইতে হিন্দুর সংখ্যা বেশী মরে। তার একমাত্র কারণ—স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা। দারিদ্র্য তো উভয়েরই সমান। এদের সব অনেক পুরাতন সংস্কার আছে—তন্মধ্যে একটার উল্লেখ করছি। বসন্ত রোগে কেউ মারা গেলে এরা দাহ করে না। এদের বিশ্বাস—শবকে দাহ করলে দেবী অসন্তুষ্ট হ'য়ে লেলিহান অগ্নিশিখার ন্যায় ব্যাধি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করে' দেবেন। এরূপ বহু সংস্কার আছে। ভূতের ভয় এদের অস্থিমজ্জাগত। সর্ব্বত্রই রাত্রে এরা ভূত দেখে। এই ভূতের ভয়ে লোকগুলোও ভূতুড়ে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

কোন একটা মড়ক হ'লে এরা কালীপূজা করে। এই কালী-মন্দির প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে' আছে। কালী-দেবীর কোন মূর্ত্তি নাই—মাত্র একটি বেদী। একটি ছোট ঘরের ভিতর বেদীটি রক্ষিত আছে। একটি বিশেষ দিন স্থির করে' সকলে মিলে ওই দিন কালী-পূজা করে। এ একটি দেখ্‌বার জিনিষ। গ্রামস্থ নরনারী উপবাস করে' ওই দিনে কালীর পূজা দেয়। পূজাতে আবার সকলেরই কিছু-না-কিছু মানৎ থাকে। কাহার

কেড়া,. অর্থাৎ ছোট মহিষ, কাহার ছাগল ভেড়া, কাহার ছাগলি, কাহার পায়রা, কাহার বা মুরগী। পূজার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা হয়। তারপর ব্রাহ্মণ ও নাপিত একস্থানে আহার করে। আহার মাঝে দই, চিঁড়ে, গুড় প্রভৃতি। আহার সমাপ্ত হ'লে বলিদান আরম্ভ হয়। প্রথম ছাগল, তারপর ছাগলি, তারপর ভেড়া, তারপর পায়রা, তারপর কেড়া। দেবীর সুমুখে স্ত্রী-জাতীয় পশু বলিদানের কথা আগে কখনও শুনি নি। সেদিন রাত্রে প্রত্যেক গৃহে ভোজনোৎসব।

জাতি হিসাবে এখানে প্রায় পনের-কুড়ি রকম জাত বাস করে। প্রথমে মুসলমান ও সাঁওতালের বাস ছিল। বর্ত্তমানে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা বহু জাতির বাস হয়েছে। পূর্ব্বে এখানে ব্যাধি বলে' বিশেষ কিছু ছিল না—যথা, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড। বর্ত্তমানে কিন্তু সব ব্যাধির আমদানী হয়েছে। তবে এখানে একরকম পার্ব্বত্য জর হয়—সেটা অনেকটা ম্যালেরিয়া জরের মত। বড় কষ্টকর জর। এখানকার লোকের অল্পবয়সে বিবাহ হয়। যদি কারও বেশী বয়সে স্ত্রী মারা যায় বা অল্প বয়সে কেউ বিধবা হয়, তা' হ'লে তাদের বিবাহ চলিত আছে। এরূপ বিবাহকে সাঙ্গা বলে। স্ত্রীর, অর্থাৎ যে বিধবার সঙ্গে বিবাহ হ'ল, দেবতার কার্য্যে তার কোন অধিকার রইল না। এখানকার লোকগুলা যেমন গরীব, তেমনি অলস প্রকৃতির। বেশীর ভাগ সময়ই এরা অভুক্ত থাকে।

সত্যই এখনও পর্য্যন্ত এখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। দিনকতক নিয়মের উপর বসবাস করলে স্বাস্থ্য ভাল হবেই কিছু-না-কিছু। প্রাকৃতিক পার্ব্বত্য-শোভা অতি সুন্দর! সামান্য দূরে গেলেই পাহাড়ে বেড়ান যায়। সচরাচর দু'টি ছোট পাহাড়ে লোকে বেড়াতে যায়—লাট্টু পাহাড় ও ছাতি পাহাড়। প্রথমটি নেড়া পাহাড়, লাট্টুর মতো দেখতে, তাই লাট্টু পাহাড় এবং দ্বিতীয়টির মাথায় দু'টি গাছ ছিল, তা' দূর থেকে দেখতে ঠিক ছাতির মত দেখাত, সেজন্য ছাতি পাহাড় বলে। এ ছাড়া, দু'টি ঝরণা আছে—হল্‌দি ঝরণা ও নীলাভরণ। হল্‌দি ঝরণার স্থানটী বাস্তবিকই মনোরম এবং এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার! তবে একটু দূরে এই যা'। এখানে যেতে হ'লে গো-যানই হ'ল শ্রেষ্ঠ যান। সামান্য একটু হাঁটতে হবে পরে। যেখানে গিয়ে সকলে বিশ্রাম করে, তারই সুমুখে একটী দীর্ঘকায় পাহাড় আছে। আমরা তার ওপর উঠে দেখি সেখানে পাটের চাষ হচ্ছে; সাঁওতালদের সব গ্রাম আছে। আবার তার ওপরেও পর্ব্বত আছে। এখানে দাঁড়ালে মনে হয় স্থানটী জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত। ভাবি কেমন করে' এখানকার অধিবাসীরা এই নির্জ্জন স্থানে বাস করে।

হল্‌দি ঝরণা যেমন পর্ব্বত-বেষ্টিত, নীলাবরণ কিন্তু সে রকম নয়। দু'ধারে ক্ষেত আর তারি মধ্যে স্রোতস্বিনী। এই স্রোতস্বিনীর দু'ধারে কতগুলি বড় বড় পাথর আছে এবং সেখানে বসে' বেশ একটু আরাম পাওয়া যায়। লোকজন প্রায়ই এখানে বেড়াতে আসে। সাধারণতঃ, লোকে কাঠরিয়া ব্রিজ, লাট্টু পাহাড়, নীলাবরণ, নয় ষ্টেসনে বেড়াতে যায়। ষ্টেসনে বেড়াতে যাবার একটা হেতু আছে। ষ্টেশনের নিকটেই সব দোকান-পশার—মায় পোষ্ট-অফিস পর্য্যন্ত। বাজার বলতে যা' বুঝায় তা' শিমুলতলায় নাই। বৎসরে চার-পাঁচমাস ষ্টেশনের নিকট কিছু কিছু তরকারী পাওয়া যায়। তেমন কোন জিনিষের প্রয়োজন হলেই বৈদ্যনাথ আসতে হবে। শিমুলতলা গরীবের বায়ু-পরিবর্ত্তনের স্থান নয়। দূরে তেলুয়ার হাট বলে' একটি জায়গা আছে। সেখানে সপ্তাহে দু'দিন হাট হয় বটে, কিন্তু তা'তে বাঙালীর বড় কিছু সুবিধা হয় না। এইস্থানে শিমুলতলার রাণী-মা বাস করেন। গিধোড়-রাজেরও এখানে কাছারী-বাড়ী আছে।

বাঙালী জাতি বৃক্ষলতা ভালবাসে, অর্থাৎ এত গাছ-পালার ভিতর থাকে যে, নেড়া স্থান তাদের পছন্দই হয় না। সেইজন্য নেড়া পাহাড়ে গিয়েও প্রত্যেক বাড়ীটির চতুর্দ্দিক গাছে ভর্ত্তি করে' তুলেছে। বাগান-বিহীন বাড়ী বড় একটা চোখেই পড়ে না। তারপর ফুলগাছের তো কথাই নাই। এখানে গোলাপের চাষ খুব ভাল হয়। সে জন্য প্রত্যেকের বাড়ীতে কিছু না কিছু গোলাপ

গাছ আছেই। তা' ছাড়া, আম কাঁঠালের বাগানের জন্য অনেক বাড়ী অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে উঠেছে।

এখানে যদি সত্য সত্য কিছু দেখ্‌বার থাকে ত 'রামকৃষ্ণ মঠ।' মঠের অধিবাসীরা ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের শিষ্য। ষ্টেশন থেকে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে—চলার পথ একটু কষ্টকর। গাড়ী যাবার উপায় নাই। লাট্টু পাহাড় হ'তে নিকটে। একটি মাত্র বাঙালীর ছেলে তপস্যার দ্বারা কেমন করে' মরুভূমিকে নন্দনকাননে পরিণত কর্‌তে পারা যায় তাই দেখিয়ে দিয়েছেন। আশ্রম তো যথার্থ আশ্রমই। একটি মন্দির আছে—তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য পূজা-আরতি হয়। আর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে নানাজাতীয় ফল ও ফুলের গাছ। স্থানটি অতি মনোরম। এখানে এলে মনটী সত্য-সত্যই পবিত্র ভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠে। অন্ততঃ, ক্ষণিকের জন্য মনটী সংসার হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। একটি সন্ন্যাসী ও একজন মাতাঠাকুরাণী আছেন। তাঁদের আদর-যত্নের কথা ভোলবা'র নয়। লোকালয় থেকে দূরে বলে' সময় সময় ডাকাতের আক্রমণ হয়। শিমুলতলায় কোন মন্দির নাই, তাই এই মঠটি বাঙ্গালী জাতির সান্ত্বনা ও শান্তির স্থান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মোটামুটি বলে' আমি শিমুলতলা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ কর্‌লুম।

আভাময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

ষ্টেসন-মাষ্টার

শ্রীতারাকুমার সান্যাল

ছোট রেল ষ্টেসন। টিনের করগেট-ঘেরা ষ্টেসন-মাষ্টারের ঘর। লাল সুরকী ছড়ান পথটা কিছুদূর এগিয়ে গ্রামের ভেতর প্রবেশ করেছে। পাশে গোটাকতক ফার্ণ-গাছ আর ফণীমনসা দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেণ আসে মন্থর গতিতে। কোনক্রমে সুবিশাল দেহটাকে ঢুকিয়ে দেয় ষ্টেসনের ভিতরে। ষ্টেসন-মাষ্টার একতাড়া কাগজ হাতে করে' দাঁড়ায়। মংলু ঘণ্টা বাজায় আর চেঁচায়—জালুইপুর, জালুইপুর ইষ্টিসন। তারপর ট্রেণটা আবার চলে' যায় ষ্টেসনের গা ঘেঁসে।

ফিরে এসে মাষ্টার মংলুকে বলে—আজ ভাঙটা মিহি করে' বাটিস আর দুটো গোলমরিচ ছড়িয়ে দিস্ মংলু। ঘাড় নেড়ে মংলু জানায়—তাই হবে। সন্ধ্যে হবার কিছু আগে গাঁয়ের লোকেরা আসে, মংলুর হাতে বাটা সিদ্ধি খাবার জন্যে। অবিনাশ আসে, ছোট বোন্ রাধুকে নিয়ে। সিদ্ধি সকলেই পায়। অবিনাশ গেলাসটা মুখে তুল্‌তেই রাধু বলে ওঠে—কী খাও দাদামণি?

অবিনাশ বলে —সরবৎ।

ফোক্কড় মেয়েটা সরবৎ খেতে চায়। অবিনাশ ধম্‌কে ওঠে। মংলু মুখ খিচোয়। ভয়ে জড়সড় হ'য়ে বেঞ্চের কোণ ঘেঁসে বসে' থাকে নির্ব্বাক রাধু। পাশের ঘর থেকে ষ্টেসন-মাষ্টার বেরিয়ে আসে—বহুদিনের পুরানো মোয়া থেকে পিঁপড়ে ঝাড়তে ঝাড়তে। রাধুকে সেটা দেয়। আনন্দে তার মুখখানা উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

ষ্টেসন-মাষ্টারের বয়স বেশী নয়—সাতাশের কাছা-কাছি। মুখের উপর ভাগ্য-বিধাতা চিরন্তন দুঃখের রেখা এঁকে দিয়েছেন তাঁর নির্দ্দয় অকম্পিত হাত দিয়ে। চোখের জ্যোতি নিষ্প্রভ। এখনও অবিবাহিত। লোকে কানা-ঘুসা করে। বন্ধু-বান্ধবেরাও বাদ দেয় না।

মোড়ল বলে—ও রকম নাকি হয়েই থাকে যৌবন বয়সে। দু'দিনের জন্যে ওরা রঙিন্ কাঁচ পরিয়ে দেয় চোখের ওপর। তারপর যে আঁধার, সেই আঁধারই থেকে যায়। তা'বলে' বিয়ে না করা কি উচিত হয়েছে মাষ্টার। যদি রাজী হও ত আমার ভাইঝির সঙ্গে শুভ কাজটা—

মাষ্টার প্রবল আপত্তি করে।

ইতিহাসটা না কি একটু করুণ রকমের।

মাষ্টার থাক্‌তো কোলকাতার উপকণ্ঠে দূর-সম্পর্কের এক খুড়োর বাসায়। তলার ঘরে একদিন এক প্রৌঢ় দম্পতী ভাড়া এলেন তাঁদের অনূঢ়া মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। লীলার লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী, চটুল চাহনি, আর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর মাষ্টারকে মুগ্ধ করে। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয়। দু'-চারখানা চিঠির আদান-প্রদানও চলে। এমন সময় হঠাৎ একদিন লীলার বিয়ে হ'য়ে যায়। বিয়ের দিন সিঁড়ির ওপর মাষ্টারের সঙ্গে লীলার কতবার দেখা-শোনা হয়, কিন্তু লীলা মুখ ফুটে একটা কথাও বল্‌তে পারে না। মাষ্টারও নির্ব্বাক। মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রৌঢ় দম্পতী কাশীবাসী হন্। ঘরে আর ভাড়া আসে না। খুড়োর অবস্থা পড়ে' আসে। অগত্যা মাষ্টারকে কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হয়। অনেক কষ্টে চাকরী মেলে। তারপর কতদিন কাটে। ষ্টেসন-মাষ্টারীর কাজ নিয়ে মাষ্টারকে নানাস্থানে বেড়াতে হয়। কিছুদিন হ'ল অনেক দেশের জল-হাওয়া খেয়ে মাষ্টার এখন জালুইপুরে বদলী হ'য়ে এসেছে। সঙ্গে আছে ভৃত্য মংলু।

রাধুর সঙ্গে মাষ্টারের ভাব জমে' ওঠে গভীরভাবে।

মংলু কিন্তু রাধুকে দেখ্‌তে পারে না। বলে—তু লেড়কীকো নিকাল্ দে বাবু।

মাষ্টার সে কথায় কান দেয় না।

কোন কোনও দিন মাষ্টারের কাছে রাধু ছুটে আসে মজ্‌লিস বস্‌বার আগেই। আবার কোনও দিন নিঃসঙ্গ দুপুরে এসে হাজির হয়। মাষ্টারের গায়ে সাহেবী-পোষাক দেখে সে খিলখিল করে' হেসে ওঠে। ট্রেণ 'পাস' করে' যাবার পর বেঞ্চের একটা কোণে মাষ্টার বসে' পড়ে—পাশে রাধুও বসে। তার মুখের উপর কালো চুলগুলো বাতাসে দুলে দুলে খেলা করে। মাষ্টার সস্নেহে সেগুলোকে সরিয়ে দেয়। এই আট-নয় বছরের মেয়েটা তার জীবনে কেমন একটা নিবিড় বাঁধন এনে ফেলেছিলো।

অবিনাশ বলে—আস্কারা দেবেন না, দু'বেলা বিরক্ত করবে।

মাষ্টার শুধু মৃদু মৃদু হাসে। দু'জনের বন্ধুত্ব গভীর হ'তে গভীরতর হয়। রাধু বলে—রেল চালাতে জান?

মাষ্টার ঘাড় নেড়ে বলে—জানি।

—আমিও। বলে' মাষ্টারের দেওয়া রেলগাড়ীটা বাক্স থেকে রাধু বার করে। কলহাস্যে ও অসংলগ্ন কথাবার্ত্তায় দু'জনের দিনগুলি মুখর হ'য়ে ওঠে।

নিঃশব্দে দুটো মাস কেটে যায় কোনও চিহ্ন না রেখে।

গ্রীষ্মের এক সায়াহ্ন। পশ্চিমাকাশে কে যেন কতকগুলো আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। কোথা থেকে রজনীগন্ধার তীব্র গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। ঝাউগাছের মাথাটা মন্দ মন্দ বাতাসে দুলে ওঠে। আজকাল ষ্টেসন-মাষ্টারের করোগেট-ঘেরা কোয়ার্টারের সাম্‌নে একটা দেশী কুকুর বাচ্ছা বাঁধা থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত। গলায় মোটা দড়ি ঝুল্‌তে থাকে। রাধু পুষেছে। তাকে খেতেও দেয়।

ঘরের ভেতর সিদ্ধির নেশায় সবাই হাসে। ঠাট্টা-তামাসা করে। মাষ্টার কিন্তু 'গুম্' হ'য়ে বসে' থাকে রাধুর পাশে—চৌকীর একটা কোণে। মোড়ল ফিক্‌ফিক্ করে' হাসে। তার সাম্‌নের দাঁত ক'টা বেরিয়ে পড়ে।

খানিক পরে মাষ্টার বলে' ওঠে—শুনছো হে মণ্ডল, আমি ত পরশু বদলী হ'য়ে যাচ্ছি এখান থেকে। ক'টা দিন তোমাদের নিয়ে বেশ আমোদেই কাটালাম, এখন হয় ত কোথায় আবার কোন্ অচেনাদের মাঝে—

কথা শেষ হবার আগেই মণ্ডল বলে—সে কি হে, এমন আড্ডাটা শেষে তুলে দিতে হবে। হায়রে কপাল!

—রাধুর কিন্তু কষ্ট হবে। অবিনাশ বলে' ওঠে।

রাধু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। একটা পুরানো খবরের কাগজ দিয়ে বইয়ের মলাট দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। মাষ্টার সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলোয়। আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথা উঁকি দিতে চায় তার মনে, কিন্তু সে তাকে চেপে রাখে সঙ্গোপনে—সবার অলক্ষ্যে।

নিঃশব্দে দুটো দিন গড়িয়ে যায়। মাষ্টারের বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে আসে। নতুন ষ্টেসন-মাষ্টার কিছু আগেই হাজির হয়েছেন কাজ বুঝে নেবার জন্যে। গোটা-কতক ছেঁড়া নেকড়া আর কাগজ পড়ে' আছে কোয়ার্টারের সাম্‌নে। একটু দূরে একটা কালো হাঁড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছিলো। কুকুরটা ছাড়া পেয়ে কেঁউ কেঁউ করে—এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়।

আড়াইটের গাড়ীতে মাষ্টার আজ জালুইপুর ছেড়ে যাবে। রাধু, অবিনাশ, মণ্ডল ও মোড়ল ষ্টেসনে এসেছে দেখা কর্‌বার জন্যে। রাধুর হাতে সেই ছোট রেলগাড়ীটা, তার সঙ্গে একটা সরু পাড় বাঁধা। তার চোখ দুটো আজ অকারণ জলে ছলছল করে' ওঠে।

গাড়ী এসে পৌছায় ষ্টেসনে।

রাধুকে শেষবার আদর করে' মাষ্টার গাড়ীতে ওঠে মংলুকে নিয়ে। গাড়ী চল্‌তে সুরু করে। যতক্ষণ দেখা যায় মুখ বাড়িয়ে মাষ্টার রাধুকে দেখে নির্নিমেষ নেত্রে। তরু-শ্রেণী বারবার তার দৃষ্টিকে প্রতিহত কর্‌তে থাকে। মুখখানা ক্রমে অস্পষ্ট হ'য়ে আসে। কিছু আর দেখা যায় না। কেবল মাঠের বিসর্পিল পথগুলো এঁকে-বেঁকে মিশে

গেছে কোন্ অজানা দেশে। রেলপোষ্টের তারে তারে ছোট-বড় নানারকম প্রাণী চেঁচিয়ে ওঠে।. মাষ্টার তাই দেখে। মংলু তামাক সেজে দেয়। মাষ্টার হুঁকোর ছিদ্রে অধরোষ্ঠ সংলগ্ন করে' থাকে। রাধুর মুখটা বারবার মনে পড়ে। মন বিষণ্ণ হ'য়ে ওঠে। রাধুর মত একটা ছোট বোন্‌ও তার ছিল। অস্পষ্ট স্মৃতিপুঞ্জ অন্তরটাকে ভারী করে' দেয়। হতভাগী কিছুদিনের জন্যে তাদের দুঃখের সংসারে এসে সব ওলোট-পালোট করে' দিয়ে পালিয়ে যায় সেখানে—যেখানে জীবন্ত মানুষের অভিযান আজও গিয়ে পৌছোয় নি। তারপর বাপ আর মা সেই হত-ভাগীর অনুগমন করেন। মাষ্টারের চক্ষু সজল হ'য়ে আসে। অস্তরবির ক্ষীণালোকে অশ্রুকণা চিক্‌মিক্ করে' ওঠে নিশির শিশির বিন্দুর মত।

তারপর সুদীর্ঘ সাতটা বৎসর কেটে গেছে। এই সাত বছরে মাষ্টার কত দেশ, কত ষ্টেসনে ষ্টেসনে ঘুরে বেড়িয়েছে নিত্য-সহচর মংলুকে নিয়ে। মাষ্টারের চেহারা একেবারে বদ্‌লে গেছে। দেহ কঙ্কালসার। চক্ষু কোটরাগত। মুখে গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে উঠেছে। চুলগুলো এলোমেলো। এখন মাষ্টার কি একটা দুরারোগ্য রোগে ভুগ্‌ছে। মোটেই চেনা যায় না।

মংলুকে নিয়ে সেদিন মাষ্টার ট্রেণে ওঠে জাঙ্গিপুর থেকে।

ট্রেণ চল্‌তে সুরু করে মাঠ ঘাট পেছনে ফেলে। হঠাৎ পাশের বেঞ্চ থেকে কে চেঁচিয়ে বলে—মাষ্টার যে!

মাষ্টার মুখ ফেরায়—চিন্‌তে পারে না।

লোকটা ধীরে ধীরে উঠে আসে। পাশে দাঁড়িয়ে বলে—চেনাই দায় হ'য়ে উঠেছে...।

মাষ্টার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাকে দেখে—কিন্তু ঠিক বুঝ্‌তে পারে না।

লোকটা পরিচয় দেয় জালুইপুরের মণ্ডল বলে'।

চকিতে জালুইপুরের স্নিগ্ধছবি মাষ্টারের চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে। রাধুর মুখখানিও। বিহ্বলের মত সে তাকিয়ে থাকে। পরক্ষণেই চোখ দুটো উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। শেষে সেখানকার খবর জিজ্ঞেস করে।

মণ্ডল বলে—খবর আর তেমন কি, তবে তুমি চলে' আস্‌বার পরের মাস থেকেই সুরু হ'ল বিসূচিকা। দীনু ঘোষ, অবিনাশ মোড়ল কেউ ত আর নিস্তার পেলে না। তা' তোমার চেহারা এত শুকিয়ে উঠ্‌লো কেমন করে'? কিছু অসুখ-বিসুখ করে নি ত?

ধীরে ধীরে মাষ্টার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে' মণ্ডল আবার বলে—রাধুর বিয়ে হ'য়ে গেছে বেশ বড় ঘরে—তা' বেটারা বড়লোক হ'লে কি হবে, চামার! চামার! অবিনাশের রোগের সময় একটিবারও মেয়েটাকে আস্‌তে দিলে না। তা' তুমি কতদূর যাবে মাষ্টার?

ট্রেণের গতি তখন মন্দীভূত হ'য়ে আসে।

—বহরপুর। এখান থেকে বদলী হ'য়ে চলেছি। মাষ্টার বলে' ওঠে।

গাড়ী একটা ষ্টেসনে থামে।

—নামি এইবার। একবার মেয়ের বাড়ী যাব। বলে' মণ্ডল নেমে পড়ে তার পোঁটলাপুঁটলি ঘাড়ে করে'।

ট্রেণ আবার চলে। এক বিরাট শূন্যতা চারিধারে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদে। ট্রেণের চাকার শব্দগুলো কানের চারপাশে বাজতে থাকে বিশ্রী হ'য়ে। ষ্টেসনের পর ষ্টেসন পার হ'য়ে যায়।

তারপর মাষ্টার নেমে পড়ে বহরপুর ষ্টেসনে।

শীতটা বেশ চেপে পড়েছিল। কুকুরগুলো হাত-পা পেটের ভিতর ঢুকিয়ে কুঁকড়ে বেঁকে শুয়ে রয়েছে পথের ধারে ধারে। হাসনুহানার স্নিগ্ধ গন্ধ ভেসে আস্‌ছিল বহুদূর থেকে।

মাষ্টার বলে—মংলু, চা হ'য়ে থাকে ত দে। গাড়ী

আস্‌বার দেরী আছে—গাঁয়ের ভেতরটা একটু ঘুরে আসি।

মংলু চা আনে।

মাষ্টার ধীরে ধীরে গাঁয়ের ভেতর প্রবেশ করে। ছেলের দল ছুটে পালায় ভয় পেয়ে।

মাষ্টার এগিয়ে চলে। সরু পথ। পাশে ঝোপ। খেজুর আর নারকেল গাছে স্থানটা ভরে' উঠেছে। অস্তমান সূর্য্যের নিষ্প্রভ লোহিত রশ্মি ঝিক্‌মিক্ করে পাতায় পাতায়। মাষ্টার মোড় ফেরে। একটা পুকুর। কচুরীপানায় ভরে' উঠেছে। মাষ্টারের মুখটা চকিতে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

রাধু—রাধুই ত! পাশে লীলা।

রাধুর এখানেই বিয়ে হয়েছে—কিন্তু লীলা কেন? মাষ্টার ভাবে।

লীলা ঘাট থেকে রাধুকে বলে' ওঠে—আয় ছোট বউ, বেলা করিস্ নে—তোর ভাসুর এতক্ষণ ফিরে এসেছে হয় ত। হাট থেকে সকাল সকাল ফের্‌বার কথা ও আমায় বলেছিলো। নে বাপু, চট্‌পট্ উঠে আয়। এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে' সে হাঁপাতে থাকে।

মাষ্টারের বুঝ্‌তে আর কিছুই বাকী থাকে না। লীলার দেবরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে রাধুর—এই বহরপুরে।

সিক্তবসনে কম্পমানা রাধু মাঠ ছেড়ে রাস্তায় ওঠে। পিছনে চলে লীলা। মাষ্টারের ধমনীতে রক্তস্রোত বইতে থাকে। সে এগিয়ে আসে অবগুণ্ঠনবতী রাধুর সাম্‌নে—সর্ব্বাঙ্গে তার যৌবনের শিহরণ।

মাষ্টার কিছুক্ষণ তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে—চিন্‌তে পারো?

বিদ্যুৎবেগে রাধু পিছনে হটে আসে। কাঁকালের মাটীর ঘড়াটা নিমিষে টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে পড়ে পথের ওপর। চিন্‌তে সে পারে না।

মাষ্টারের মুখ সাদা হ'য়ে যায়।

হঠাৎ পিছন থেকে তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে লীলা। প্রতিবাসীরা জড় হয়। লীলার স্বামী সেই পথ দিয়ে ফির্‌ছিলো হাট থেকে। মাষ্টারকে সে ধরে' ফেলে। মেয়েরা পেছনে সরে দাঁড়ায়। পুরুষেরা ব্যাপারটা জান্‌তে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠে। মেয়েদের দল থেকে কে একজন বলে' ওঠে—বেগানা লোক। ও অনেকক্ষণ ধরে' লুকিয়েছিলো ঝোপের আড়ালে। রাধুকে যেতে দেখেই হাত দুটো চেপে ধরে।

লীলা কিন্তু মাষ্টারকে চিন্‌তে পারে। বলে—লোকটা ক'দিন থেকেই তাদের বাড়ীর কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে নাকি নিজের চোখে দেখেছে।

ব্যাপারটা সকলের কাছেই পরিষ্কার হ'য়ে যায়। সবাই মিলে মাষ্টারকে থানায় নিয়ে চলে। সেখানে গিয়ে দারোগার কাছে রিপোর্ট লেখায়।

সাম্‌নে দেওয়াল-ঘেরা অফিস। বাঁ-পাশে গারোদ-ঘর। অপ্রশস্ত নোংরা স্থান। চারিদিকে ভিজে সেঁৎসেঁতে দেওয়াল। ভিতরে কখনও বোধ হয় সূর্য্যালোক প্রবেশ করে নি। সাম্‌নের দরজাটা পিঞ্জরের মত। মেঝেয় জঞ্জাল স্তূপীকৃত হ'য়ে পড়ে রয়েছে। মাষ্টারকে বন্ধ করে' রাখে সেইখানে।

নিরুপায় হ'য়ে মাষ্টার কত কি ভাবে—ট্রেণ হয় ত ষ্টেসন 'পাস' করে' চলে' গেছে—দূরে, দূরে, বহুদূরে। তার ফের্‌বার জন্যে প্রতীক্ষাও করে নি। কর্ম্মচারীরা ভয় পেয়ে উঠেছে। মংলু হয় ত তাকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে। হঠাৎ মংলুর একটা কথা তার কানে বাজতে থাকে—তু লেড়কীকো নিকাল দে বাবু।

পুলিসের লোকগুলো তখন রুটি তৈরী করে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের ওপর। থরে থরে কালো কুয়াসা জমে আছে। লেলিহান অগ্নির চারপাশে বসে' তারা চেঁচায়। ক্ষীণ কম্প্রস্বরে কে যেন গেয়ে ওঠে—

"দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী পলক পলক লোহ চোষে;
দুনিয়া সব বাউরা ব্যন্‌কে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।"

গান শুনে মাষ্টার শিউরে ওঠে—তার আগাগোড়া সমস্ত গোলমাল হ'য়ে যায়। সে আবার ভাব্‌তে থাকে—সেই রাধু—যাকে অন্তরের সব স্নেহ, সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে'

দিয়েও তার সাধ মেটে নি, যার বাল্যের সেই কচিমুখখানি এখনও বুকের সবখানি স্থান জুড়ে আছে, যার কণ্ঠস্বর প্রতিদিন তার মনের কানে কানে নিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে, সে আজ তাকে চিনতে পারলে না।...আর সেই লীলা—যাকে সে প্রাণাপেক্ষা আপন ভাবত, যার ওপর তার কী অপরিমেয়, কী অগাধ বিশ্বাসই না ছিল, যার স্মৃতি পাথেয় করে' ধরণীর চলার পথে সে অবলীলাক্রমে দিনের পর দিন অগ্রসর হ'য়ে গিয়েছে, সেও অবশেষে তার সঙ্গে...!

হায়, নারী-চরিত্র কী জটিল! কী দুর্জ্ঞেয়! কী ভীষণ রহস্যময়!...মুহূর্ত্তে তার হৃদয়ের তারগুলা ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়। জীবনটা একান্তই নিরর্থক, সার্থকতাহীন বলে' মনে হয়। শূন্য, শূন্য, জগৎ জুড়ে বিরাট শূন্যতা! অন্তর ভরে' কেবলই হাহাকার! শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসময়ী প্রকৃতির পরিদৃশ্যমান যা' কিছু সমস্তই তার চোখের জলে অস্পষ্ট, ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে। ভেতর থেকে একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস উঠে বাইরের বাতাসে মিশিয়ে যায়। সে তখন দু'হাতে নিজের কপালটা চেপে ধরে' মেঝের ওপর বসে' পড়ে।

আবার তার কাশীটা বেড়ে যায়। পাটভাঙ্গা সাদা রুমালটা রক্তে লাল টকটকে হ'য়ে ওঠে। সজোরে বুকটা চেপে ধরে সে আবার কাশ্‌তে থাকে। দারোগা চম্‌কে ওঠে। মাষ্টারের চোখ দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল হয়—সে কা'কে যেন খুঁজে বেড়ায়। কাশ্‌তে কাশ্‌তে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। হৃদয়ের স্পন্দন প্রায় থেমে আসে। চক্ষু নিমীলিত হ'য়ে পড়ে। কস্‌ বেয়ে গাঢ় লাল রক্তধারা গড়াতে থাকে। দেহটা লুটিয়ে পড়ে' ধূলি-ধূসর মেঝের ওপর। ক্রমে চক্ষু তারকা স্থির হ'য়ে যায়। সে পলায় পুলিশের আয়ত্তের বাইরে।

থানার লোকজন তার মৃতদেহ বাইরে আনে ধরাধরি করে'।

চারিদিকে একটা অসহ্য নীরবতা গুম্‌রে ওঠে। অন্ধকার আর অন্ধকার—কোথাও আলো নাই—পৃথিবীর সব আলো সেদিন যেন নিভে গেছে। কেবল আকাশের গায়ে গোটাকতক তারা মিট্‌মিট্‌ করে' চাইছিলো বিস্ময়ভরা চোখে।

আবার ভোর হয়। মেয়েদের লীলা-চঞ্চল চলার ছন্দে নূপুরগুলো এক সাথে বেজে ওঠে নানা ঝঙ্কারে। ঘাট সজীব হ'য়ে ওঠে। সকলেই আলোচনা করে গতদিনের ব্যাপার নিয়ে। লীলাও যোগ দেয় তা'তে। ভাবে—আপদটা এতদূর ধাওয়া করেছিলো। বলে—আপদ গেল!

তারাকুমার সান্যাল
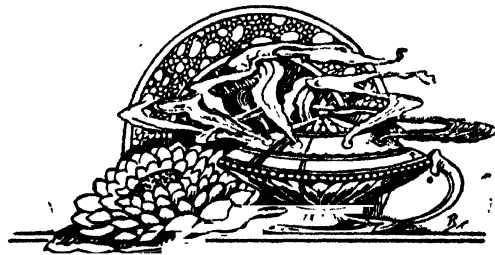
মধু-যামিনী

শ্রীসরলা দেবী

শেফালির চাইতে ছয়মাসের ছোট মামাত বোন্ বেলার আজ বিয়ে। বেলা একটা নাগাৎ বেলা সঙ্গিনীদের লইয়া জল খাইতে বসিল। রঙ্গরসে ভরপূর হৃদয়ে সকলে মিষ্টান্নের ভাগ লইতে লাগিল। আধখানা সন্দেশে কামড় দিয়া বেলা তাহা শেফালির মুখে গুঁজিয়া দিতে গেলে টানা চোখ টানিয়া, বাঁকা ভ্রূ বাঁকাইয়া কৃত্রিম কুটিল হাস্যে শেফালি বলিল—"মনে থাকে যেন বেলি, সন্দেশের ভাগ যেমন দিচ্ছিস, বরের ভাগও তেমনি দিতে হবে।"

তাহার গোলাপী গাল টিপিয়া দিয়া স্মিতহাস্যে বেলা কহিল—"তোর আপ্‌শোষ হচ্ছে, না-শিউলি? কিন্তু ভাই, আমার উচ্ছিষ্ট সন্দেশ মিষ্টি বলে' বরও কি মিষ্টি লাগ্‌বে? বরং এই বেলা বল্, গার্জ্জেনদের বলি—আমার নায়কের সঙ্গে সঙ্গে তোরও একটি কর্ণধার ঠিক করে' দিতে আজকের গোধূলি-লগ্নেই।"

চোখ নাচাইয়া শেফালি বলিল—"বটে, ভয় হচ্ছে বুঝি? পাছে 'ডার্লিং'টিকে কেড়ে নিই। কিন্তু জানিস্ আমি আধুনিকা, নিজের পতি নিজেই বেছে নেব। তবে পুরাতন কিছু যদি মান্‌তে হয় ত সাবিত্রীর আদর্শটাই মান্‌ব।"

—"বেশ ত ভাই, তাই নাও না—আর আমার মনে হয় সে কাজটির আজকেই সুবিধা হবে। 'কাজিন' ভাইদের কল্যাণে তাদের পুরুষ ফ্রেণ্ডও অনেকগুলিই উপস্থিত হয়েছে বা হবে। আমি বরং রাঙাদা'কে বলি—আরও দু'গাছা গোড়ে বেশী আন্‌তে।" বলিয়া বেলা বাঁকা হাসি হাসিল।

—"তা' যদি হ'ত ভাই, মন্দ হ'ত না—জীবনে একটা রোমান্স হ'ত। কিন্তু উপস্থিত যখন সবই কল্পনা, তখন ঠাকুরের কাছ থেকে দু'খানা গরম চপ চেয়ে খাই গে।" বলিয়া শেফালি হেলিয়া-দুলিয়া রন্ধনশালার উদ্দেশে চলিয়া গেল।

দুই

—"বর এসেছে, উলু দাও, শাঁখ বাজাও।" "ওহে শঙ্কর, দেখ ত বরাসন ঠিক হয়েছে কি না।" "বরযাত্রীদের রায়েদের বৈঠকখানায় বসাও গে।" "রাম ঠাকুর, লুচির খোলা চড়িয়ে দাও—বরযাত্রীরা ন'টার ট্রেণে চলে' যাবেন।" "কনে সাজাতে তোদের কত দেরী হয়? নে বাপু, শীগ্‌গির করে' নে।" "দেব-দ্বিজ গুরুজনদের প্রণাম করিয়ে তবে যেন কনেকে পিঁড়িতে বসান হয়।" "এ কি, ছাদনাতলায় এখনও নাপিত আসে নি কেন? ডাক্ ডাক্, তাকে।" "বৌমারা শীগ্‌গির সব কাপড় ছেড়ে বরণ-ডালা নিয়ে এস বরণ কর্‌তে।" ইত্যাদি সোরগোল পড়িয়া গেল।

শুভদৃষ্টিকালে বর কনে যখন বিমুগ্ধভাবে পরস্পর পরস্পরকে চিনিতেছিল, তখন দুষ্টামিভরা মৃদুহাস্যে শেফালি বলিল—"শচীনবাবু, শুধু একজনকেই বেশী করে' পছন্দ করে' ফেল্‌ছেন যে দেখ্‌ছি, আমাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন।"

শচীন নব্য-যুবক। সপ্রতিভভাবে সেও কহিল—"আসুন না, মালাছড়াটা আপনার গলাতেই দিই।"

মেয়েরা হাসিতে হাসিতে এলাইয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। শেফালি হাসিয়া কহিল—"আর থাক্, যেচে মান্ কেঁদে সোহাগে আমার দরকার নেই।"

বর কনেকে বাসরে রাখিয়া শেফালি কাপড় ছাড়িবার জন্য দোতলার সিঁড়িতে পা দিতেই শুনিতে পাইল—"নমস্কার।"

এই আকস্মিক অভিনন্দনে বিস্মিত হইয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল—সম্মুখের দুই-চারিটা সিঁড়ির উপরেই এক তরুণ যুবক মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

—"চিনতে পারেন নি বুঝি?"

ঘাড় নাড়িয়া শেফালি কহিল—"পেরেছি। আপনিই সেদিন হাওড়া ষ্টেশনে আমার হাত থেকে 'ব্যাগ পড়ে' যেতে কুড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

—"হ্যাঁ, তা' হ'লে মনে রেখেছেন দেখ্‌ছি।'

—"কিন্তু আপনি যে এখানে?"

—"আশ্চর্য্য হয়েছেন একটু, না—অচেনা পথিককে মামার বাড়ীতে দেখে? আমার নাম অধীর, আপনার ছোট মামার শালা। আমার কিন্তু একটি অনুরোধ আপনাকে রাখ্‌তেই হবে—অচেনা বলে' ঠেল্‌তে পার্‌বেন না।"

—"বলুন, কি?"

—"মেজদি'র কাছে আপনার সুকণ্ঠের সুখ্যাতি শুনেছি অনেক। আজকে আপনার গান শুন্‌তে পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না। আমি কিন্তু সেই আশাতেই এখানে এসেছি।"

—"ও, এই কথা। আচ্ছা, আসি এখন।" বলিয়া পাশ কাটাইয়া একেবারে তিনতলার ছাতে আসিয়া শেফালি হাঁফ ছাড়িল।

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না রাত্রি। আলিসায় মাথা রাখিয়া উর্দ্ধে শূন্যপথে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া শেফালি ভাবিতে লাগিল অনেক কথা। এই অধীরবাবু—ছোট মাসীমা বলেন বটে অনেক কথা এঁর বিষয়ে। পিতার মনোনীত জমিদার-দুহিতাকে ইনি নাকি বিবাহ করেন নাই। নিজে স্বর্গের অপ্সরা স্বয়ং খুঁজিয়া লইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এদিকে আবার ইঁহার ব্যারিষ্টার ও কবি-সাহিত্যিক বলিয়া খ্যাতিও আছে।

তিন

ছাত হইতে দোতালায় বেলাদের শয়ন-কক্ষে আসিয়া শেফালি বেশভূষায় মন দিল। জরদা রংয়ের ব্লাউজের সহিত আগুন রংয়ের শাড়ী পরিল। গলায় মিনার কাজ-করা মফ্‌চেন, কানে মুক্তার দুল ও হাতে দুইগাছি চুনি-বসান সরু ব্রেসলেট পরিল। এলো খোঁপা বাঁধিয়া কানের উপর দুই পাশের ফাঁপান চুলে দুইটি রক্ত গোলাপ পরিল। গৌরবর্ণ নিটোল মুখের উপর টানা টানা কাল চোখ দু'টিতে অধিকতর সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য সুরমা পরিল। গোলাপী গণ্ডে পাউডার ঘসিতে গিয়া লাল করিয়া তুলিল।

বাসরে ছোট মেয়েদের গান আরম্ভ হইয়াছে। বেলার কনে ঠাকুরমা কহিলেন—"ছোট মেয়েদের গান ত অষ্টপ্রহর শুনছি বাপু, রেণু, টুনি, বেলা তোরা নাচগান কর্ যে, চোখ-কাণ সার্থক হোক্।"

টুনি কহিল—"কনে ঠাকু'মা যে দেখছি আমাদের এক কাটি ওপরে যাচ্ছেন। আমরা এত 'আপ টু ডেট্'; কিন্তু বিয়ের কনেকে গাইতেই শুনেছি, নাচ্‌তে দেখি নি।"

সকলের অনুরোধে রেণু নাচিয়া গান ধরিল—

"এস হে এস নব বসন্ত, মধুর নয়নে চাহি,
সুরে সুরে তরী বাহি—"

মৃদু পদক্ষেপে শেফালি বাসরে ঢুকিয়া বেলার পাশে বসিল। বেলা কহিল—"কোথায় ছিলি ভাই? আমার প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে তোকে না দেখে।"

—"কেন, তুমি ত নতুন মানুষ পেয়েছ ভাই, আর আমায় দরকার কি?"

বেলা শেফালির গলা জড়াইয়া বলিল—"নতুনকে মিষ্টি করবার জন্যে পুরাণকে যে সর্ব্বদা পাশে দরকার হয় ভাই।"

পরম স্নেহভরে বেলার মাথাটি বুকে চাপিয়া শেফালি কহিল - "তা' সত্যি।"

রেণুর গান শেষ হইল। শেফালির পাশে বসিয়া সে কহিল —শিউলি, এবার তোর পালা। মাইরি, তোকে কি সুন্দর দেখতে হয়েছে ভাই! একেই ত তুই রূপসী, তায় আজ যা' সেজেছিস—মুনির মন টলিয়ে দিবি দেখ্‌ছি।"

রেণুর গালে টোকা মারিয়া শেফালি বলিল—"দেখিস্, সাবধান, মুনির গলায় মালা না পরিয়ে দিই।"

রেণু ও শেফালির কথোপকথন শচীনের কানে গিয়াছিল। সে কহিল—"আপনার মিষ্টি কথা ত অনেক শুনিয়েছেন, কিন্তু তা'তে সুর যা' ছিল বড় চড়া—এখন একটা মিষ্টি গান শুনিয়ে দিন।"

একটা হারমোনিয়ম লইয়া ছোট বড় একদল ছেলে তখন বাসর-ঘরে ঢুকিল। সে দলে অধীরও ছিল। বেলার রাঙা দা' আই-এ ক্লাসের ছাত্র। বাজনায় স্বর তুলিয়া কহিল—"এসো, কে গাইবে। এতক্ষণ রেণি গাইছিলি বুঝি? এবার কার পালা?"

সকলে একযোগে শেফালিকে অনুরোধ করিতে লাগিল। শেফালি চকিতে অধীরের দিকে চাহিয়া দেখিল—সে চোখে কাতর মিনতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেফালি উঠিল। আগুন রংয়ের শাড়ীতে ঢেউ খেলাইয়া, দেহের লীলায়িত ভঙ্গীতে স্বচ্ছন্দে সকলের মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিজেকে বিচিত্র বিস্ময়রূপে ধরিয়া স্বরের ঝঙ্কার তুলিল—

"আমার নয়ন ভুলান এলে,
আমি কি হেরিলাম নয়ন মেলে।
শিউলিতলার আসে পাশে,
ঝরাফুলের রাশে রাশে,
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে—"

গান শেষ হইলে শিউলি দেখিল অধীর চলিয়া গিয়াছে। বেলার নিকট বসিতে সে তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া চুপিচুপি বলিল—"ও আগন্তুকটি কে ভাই?"

—"পরে বল্‌ব। এখন মাথাটা ভাই বড় ধরেছে, একটু ছাত থেকে আস্‌ছি।"

ছাতে নির্জ্জন ভ্রমণ শেফালি বরাবর ভালবাসে; বিশেষতঃ, আজিকার মত মধুর জ্যোৎস্না রাত্রে।

"শুনুন।"

বিপুল বিস্ময়ে শেফালি ফিরিয়া দেখিল—অধীর। তাহার হাতে একটা কি রহিয়াছে।

—"এইটে আপনাকে দিতে পারি কি?"

স্থির ধীরস্বরে শেফালি কহিল—"কি?"

—"সামান্য একটা কবিতার খাতা।"

—"দিন।" বলিয়া শেফালি হাত পাতিল।

ছোট বাঁধান খাতাখানির মলাটে সোণার জলে লেখা রহিয়াছে—"শিউলি।" খাতাখানিকে একগাছি শেফালি ফুলের মালা বেড়িয়া রহিয়াছে।

মালার বেষ্টন খুলিয়া সেই জ্যোৎস্নালোকে শেফালি কবিতা পড়িল। সেই ষ্টেশনে ব্যাগ কুড়ান হইতে আরম্ভ করিয়া তাহারই বন্দনা-গীতি।

ক্ষণেকের জন্য অধীরের আশাপূর্ণ সপ্রেম দৃষ্টির দিকে চাহিয়া শেফালি মালাগাছি নিজের খোঁপায় জড়াইয়া অগ্রসর হইবার জন্য পা বাড়াইল।

কম্পিত স্বরে অধীর কহিল—"তা' হ'লে পায়ে ঠেলেন নি ত? মেজদি'কে বলি গিয়ে?"

মৃদু, অতি মৃদু অস্পষ্ট স্বরে উত্তর হইল—"জানি না—আপনার যা' খুসি করুন গে।"

সরলা দেবী

শ্মশানপুরী

শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা দেবী

মীরা বারান্দায় বসে' সকালবেলা তার খুকীকে রঙ-বেরঙের ফ্রক পরিয়ে 'রিবন' বেঁধে মনের মত করে' সাজাচ্ছিল। এমন সময় বাইরে পিওনের গলা শোনা গেল—"বাবু, টেলিগ্রাম হ্যায়।"

মনীষ চায়ের কাপ্‌টা টিপয়ের উপর রেখে সংবাদ-পত্রখানা হাতে নিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কম্পিত হস্তে হল্‌দে খামখানা ছিঁড়ে ফেলে এক নিশ্বাসে কথা ক'টা পড়ে' ফেলে একান্ত অসহায়ভাবে মীরার পানে চাইল।

মীরা শুধালে—"কি খবর এসেছে? দেখি, দেখি?"

বলে' সে ঝুঁকে পড়ে' মনীষের হাত থেকে টেলিগ্রামখানা দেখে নিয়ে বল্‌লে—"তা' এত ভাবনা কর্‌ছ কেন? মাসীমার অসুখ করেছে, আবার সেরে যাবে। তবে আমাদের একবার দেখ্‌তে চেয়েছেন। চলো, আজই যাওয়া যাক্‌।"

চিন্তিত স্বরে মনীষ বললে—"সে ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু যাওয়ার পথে যে অনেক বিঘ্ন মীরা।"

মীরা বললে—"কেন, কিসের বিঘ্ন?"

মনীষ বললে—"প্রথমতঃ, তাঁর বাড়ী যে কোন্ গ্রামে আমার ঠিক্ মনে পড়্‌ছে না। ষ্টেশনে যে কেউ আস্‌বে, এমন আশাও করা যায় না; কারণ, বুঝ্‌ছ ত তাঁদের বাড়ীর এখন কি রকম অবস্থা—কে রোগী ছেড়ে বেরোয় বলো? তারপর বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় আমার 'এনগেজমেণ্ট'—না গেলে চল্‌বে না। ব্যবসা করে' আমাদের খেতে হয়। তুমিই বলো মীরা, এখন কি করা যায়?"

মীরা বল্‌লে বেশ ঝাঁজালো স্বরে—"তোমায় দেখ্‌তে চান্, বলা যায় না—যদি এ যাত্রা থেকে তিনি রক্ষা নাই পান্? পয়সা তোমার কত আস্‌বে যাবে—কিন্তু তিনি ত আর ফির্‌বেন না।"

মীরার কথাগুলি মনীষের প্রাণে গভীর রেখাপাত কর্‌ল। ক্ষণকাল নীরব থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে বল্‌লে—"আচ্ছা, আমি টাইম টেবলটা দেখি গিয়ে। তুমি সব গোছগাছ করে' ফেল।"

ধু ধু কর্‌ছে সীমাহারা সবুজ মাঠ—তার যেন আর শেষ নেই। পাহাড়ের গা ঘেঁসে তাদের গরুর গাড়ী চলেছে—অলস মন্থর গতিতে। সন্ধ্যা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ পাহাড়ের বুকে যেন তার সমস্ত জ্যোৎস্না ঢেলে দিয়েছে নিঃশেষে। মুগ্ধ চোখে সেইদিকে চেয়ে চেয়ে মীরা বললে—"বাঃ, ভারী চমৎকার দৃশ্য ত!"

মনীষ বললে—"ঠিক্ বলেছ মীরা, এ সৌন্দর্য্য জগতে অতুলনীয়। সহরের হট্টগোলের ভেতর বাস কর্‌তে আমার যখন মাঝে মাঝে ভয়ানক বিরক্ত ধরে, তখন মনে হয়, সেখান থেকে পালিয়ে এসে আমরা নীড় বাঁধি এই রকম কোনও সুন্দর নির্জ্জন স্থানে।"

মীরা বললে—"আমারও সহরে থাকৃতে মোটে ভাল

লাগে না। কিন্তু আমাদের সেখানে থাক্‌তেই যে হবে।”

নানারকম গল্পে তারা এত মেতে উঠেছিল যে, কখন সারা আকাশময় কালো মেঘের ভীষণ আনাগোনা পড়ে গেছ্‌ল তা' তারা মোটেই টের পায় নি। হঠাৎ তাদের খেয়াল হ'ল বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ ঝম্‌ঝম্‌ অবিশ্রান্ত বর্ষণ শুনে।

ভীতিপূর্ণ স্বরে মীরা বল্‌লে—“ও মা, তাই ত, এ যে ভীষণ দুর্য্যোগ সুরু হ'ল পথের মাঝে।”

মনীষ বললে—“গাড়োয়ান জল্‌দিসে গাড়ী হাঁকাও।”

কিন্তু আর তখন জল্‌দিসে। কী অবিশ্রান্ত বর্ষণ! মনে হচ্ছিল, আকাশ বুঝি ভেঙে পড়্‌বে এইবার। ঝড়ের দোলায় তাদের গাড়ী দুল্‌তে লাগ্‌ল ভীষণভাবে। পথের কিনারায় একটা অনেক কালের পুরাণ অশ্বথ গাছ দেখে গাড়োয়ান তার ছায়ায় গাড়ী ভিড়াল। মনীষ ঝাঁপের আড়াল থেকে চেয়েছিল পথের পানে। সহসা সে বলে' উঠ্‌ল—“মীরা, শোনো শোনো, মনে হচ্ছে যেন এই কাছেই কেউ গান গাইছে।”

মন দিয়ে শুনে মীরা সোল্লাসে বল্‌লে—“হ্যাঁ, সত্যিই ত। এ গান শুনে মনে হচ্ছে, কোনও মেয়েছেলে বীণা বাজিয়ে গাইছে। আঃ, এতক্ষণে ভগবান আমাদের পানে মুখ তুলে চাইলেন! চলো, আজ রাত্রের মত ওই বাড়ীতেই আশ্রয় নিই।”

মনীষ বল্‌লে—“সে ত ভাল কথা। কিন্তু জঙ্গল আর মাঠের মধ্যে যে মানুষের বাস আছে বলে' ত আমার বিশ্বাস হয় না।”

ঘন মেঘের আড়ালে চাঁদ তখন লুপ্ত। মনীষ পকেট থেকে টর্চ্চ বার করে' দেখ্‌ল—তাদের খুব নিকটেই একটা ভাঙাবাড়ী। আর সেই বাড়ীটার বুক চিরে সেই অশ্বথ গাছটা বেরিয়েছে। তাদের অপেক্ষা করতে দেখে, গাড়োয়ান বল্‌লে—“বাবু, আর দেরী করবেন না; বেশীক্ষণ পথে থাক্‌লে বিপদ হ'তে পারে। এখুনি ও গাঁয়ে বাজ পড়ল।”

মীরা তাড়াতাড়ি ঘুমন্ত খুকীকে বুকে চেপে ধরে' বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল। মনীষ আগে আগে যেতে লাগ্‌ল টর্চ্চ নিয়ে। সমস্ত ঘরগুলি তন্ন তন্ন করে' খুঁজে যখন কোথাও জন-মানবের সাড়া পাওয়া গেল না, তখন মনীষ বললে—“আমাদের শুন্‌তে ভুল হয়েছিল। অন্য বাড়ীতে গান হচ্ছিল।”

মীরা একটা ঘরে ঢুকে, মেঝেতে বিছানা পেতে খুকীকে শুইয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে তারা ঘরের সমস্ত দরজা-জান্‌লা বন্ধ করে' নিশ্চিন্ত মনে যেই এসে বসেছে, ঠিক্‌ সেই সময় হঠাৎ সমস্ত বন্ধ দরজা জান্‌লা-গুলো একসঙ্গে খুলে গেল। মনীষ চোর বলে' চীৎকার করে' টর্চ্চ নিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

কিন্তু কোথায় কে? বাড়ী জনশূন্য। নীরব, নিস্তব্ধ। মনীষ ছেলেবেলা থেকে ভয় কা'কে বলে জান্‌ত না। কিন্তু এই ঘটনা দেখে তার সেই পাথরের মত শক্ত প্রাণেও ভয়ের কাঁপন লাগ্‌ল। সে ঘরে ফিরে এসে দেখ্‌ল, মীরা মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে' ঠক্‌ঠক্‌ করে' কাঁপ্‌ছে। তার অবস্থা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে,সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। মনীষ সমস্ত দরজা জান্‌লাগুলো আবার ভাল করে' বন্ধ করে' দিয়ে এসে বস্‌ল মীরার পাশে। অনেক কষ্টে তার ভয় ভাঙিয়ে বললে—“মীরা, আমার মনে হয়, ঝড়ে ওরকম কাণ্ডটা হ'ল। শুনছ ত, বাইরে ঝড় আর বৃষ্টির ভীষণ দাপাদাপি!”

একে ট্রেণের ঝাঁকুনীতে তাদের শরীর ক্লান্ত হয়েছিল, তার উপর আবার এই বিপদ দেখে শরীর ও মন তাদের দুই-ই ভয়ানক খারাপ হ'য়ে গেল। তারা শুতে-শুতেই শ্রান্তিহরা নিদ্রাদেবী এসে তাদের চোখে তাঁর কোমল হাতখানা বুলিয়ে দিলেন।

গভীর রাত্রে মীরার ঘুম ভেঙে গেল। বাইরের দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতি তখন শান্তরূপ ধারণ করেছে। টুকরো টুকরো মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের সুন্দর মুখখানি দেখা যাচ্ছে। সে শুনতে পেল, ভারী মিষ্টি সুরে কে যেন বীণা বাজাচ্ছে। মীরার প্রাণ পাগল করে' তুলল সে সুরের মূর্চ্ছনা। সে ধড়মড় করে' উঠে বসে চারদিকে তাকাতেই দেখ্‌ল—খোলা জান্‌লার ধারে একটা সিন্দুকের

উপর একটা বছর আঠারো বয়সের মেয়ে বসে' বীণা বাজাচ্ছে। মেয়েটাকে দেখে মীরার মনে হ'ল, তার জীবন যেন কি এক নিদারুণ বেদনায় ভরা। তার ভারে সে যেন মাটিতে নুয়ে পড়তে চায়। হঠাৎ মীরা দেখ্‌ল—একটী বেশ শ্যামবর্ণের ছিপছিপে ছেলে এসে বস্‌ল মেয়েটীর পাশে। ছেলেটী যে কোথা দিয়ে এলো, মীরা আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। সত্য, আশ্চর্য্য হবারই কথা—কারণ, ঘরের সমস্ত দরজায় খিলআঁটা রয়েছে। সে ভাল করে' ছেলেটার চলার গতি লক্ষ্য করে' বুঝ্‌ল যে, সে হাঁটছে যেন শূন্য দিয়ে। মাটীতে পা মোটে ঠেক্‌ছে না। তার চোখগুলো যেন ভেতর থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়্‌ছে। দৃষ্টি অসম্ভব রকমের ঘোলাটে। তারপর দেখ্‌ল—মুখে যেন তার রক্ত-মাংসর মোটে চিহ্ন নেই। এমনি করে' মীরা অনেক কিছু লক্ষ্য কর্‌ল তাদের। হঠাৎ তার মনে হ'ল তারা মানুষ কখনই নয়—এই গভীর রাত্রে মানুষ হ'লে কেমন করে' পরের ঘরে ঢুক্‌বে চোরের মত? কিন্তু বিদেহীর অবাধ গতিবিধি সর্ব্বত্র। কথাটা মনে হতেই মীরার বুক দ্রুত স্পন্দিত হ'তে লাগল। হঠাৎ সেই সময় শুন্‌তে পেল বাইরের বারান্দায় ভীষণ দাপাদাপি হচ্ছে। ঠিক মনে হচ্ছে, যেন একদল ছেলে ফুটবল খেল্‌ছে। থেকে থেকে হাওয়ায় ভেসে আস্‌ছে এক ঝলক হাসি—হাঃ হাঃ হাঃ! উঃ, সে কি ভয়ানক হাসি! মীরার সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে ভয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়্‌ল।

তার কিছুক্ষণ পর মনীষের ঘুম ভেঙে গেল—কি একটা বিকট শব্দ শুনে। ঘরের মধ্যে তখন রীতিমত তাণ্ডবনৃত্য সুরু হ'য়ে গেছে। দেখে ত তার চক্ষুস্থির! সে দেখল একটী তাদেরই বয়সী ছেলে ভীতিব্যাকুল চিত্তে ঘরময় ছুটোছুটি করে' বেড়াচ্ছে। ঠিক্ তার পাছে পাছে এক বৃদ্ধ তাকে ধর্‌বার ব্যর্থ প্রয়াসে ছুটে বেড়াচ্ছে। হাতে তার একখানা খোলা চক্‌চকে ভোজালী। আর সেই মেয়েটী বৃদ্ধের পায়ের তলায় পড়ে' আকুল হ'য়ে কাঁদ্‌ছে! সেই ঘটনা দেখে মনীষের বুকের তরুণ রক্তে আগুন ধরে' উঠল। সে ভুলে গেল অতীত ও ভবিষ্যৎ। উন্মত্তের মত বর্ত্তমানের স্রোতে সে গা ভাসিয়ে দিল। গুড়ুম গুড়ুম! পর পর তিন-তিনটে গুলি গিয়ে দেয়ালে বিঁধে গেল। বৃদ্ধের গায়ে লাগা ত দূরের কথা, তার পায়ের নখও স্পর্শ কর্‌ল না। তার পরিবর্ত্তে একটা বিকট অট্টহাসিতে সমস্ত ঘরখানা কেঁপে উঠ্‌ল। মনীষের মনে হ'ল, সে বুঝি আর বাঁচবে না তাদের হাত থেকে। ঠিক্ সেই সময় সেই ছেলেটী অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে মেঝের বুকে ধড়াস করে' পড়ে' গেল। মেয়েটী ভূমিশয্যা ছেড়ে ছুটে এসে ছেলেটীর মাথা কোলে তুলে নিয়ে আঁচল দিয়ে বাতাস কর্‌তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে উঠে এসে দ্রুতপদে বীণাটী নিয়ে গিয়ে রাখ্‌ল ছেলেটীর অবশ শিথিল হাতের 'পরে। মনীষ স্পষ্ট দেখতে পেল ছেলেটী ঠোঁটে ফুটে উঠল একটা তৃপ্তির হাসি। বড় করুণ সে হাসি! ঠিক সেই সময় বৃদ্ধের মুক্ত অসি হিংস্র জন্তুর মত গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রথমে ছেলেটীর, তারপর মেয়েটীর বুকে। তারপর আবার সেই বিকট অট্টহাসি! সে হাসি থামতে-না-থামতেই তাদের সেই তরুণ বুকের তাজা রক্তমাখা ভোজালীখানা বৃদ্ধ বসিয়ে দিল নিজের বুকে। মুহূর্ত্তের মধ্যে যে কি ঘটে গেল, মনীষের বোঝবার অবসর রইল না।

পরের দিন মনীষ যখন চোখ মেলে চাইল, তখন বেলা প্রায় বারটা। তার মাথার কাছে পাখা নিয়ে বসে' আছে মীরা। আর সাম্‌নে চেয়ারে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। তাকে জাগতে দেখে ভদ্রলোক বললেন—"এখন কেমন বোধ হচ্ছে শরীরটা?"

কিছুক্ষণ তাঁর পানে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থেকে মনীষ বললে—"আমার কি হয়েছে? শরীর ত বেশ ভালই বোধ হচ্ছে। কিন্তু গায়ে হাতে বড় বেদনা। মীরা কোথায়?"

মীরা তার পাশে এসে বসে' বল্‌লে—"উঃ, কাল রাত্রি কি করে' যে কেটেছে! ভাগ্যে ইনি এসেছিলেন, তাই আমরা আবার পৃথিবীর আলোর মুখ দেখতে পেলুম। এঁর মত পরোপকারী লোক জগতে অতি বিরল।"

মনীষের তখন মনের পাতে একটী একটী করে' ভেসে উঠল রাত্রের সেই সব বিভীৎস ঘটনাগুলো। সে উঠে ভদ্রলোকের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বিনীত

কণ্ঠে শুধালে—"কি হয়েছিল আপনি আমায় সব খুলে বলুন। কাল রাত্রে যে সমস্ত দৃশ্য দেখেছি, এখনও মনে হচ্ছে তা' সত্য। খুলে বলুন, সে সব কি ভৌতিক ?"

ভদ্রলোক বললেন—ভৌতিক ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। তবে তোমাদের খুব জোর বরাত, তাই এ যাত্রা খুব বেঁচে গেছ।" তারপর মনীষের আগ্রহভরা মুখের পানে চেয়ে বল্‌তে সুরু করলেন—"ভোরবেলা আমি এই পথ দিয়ে বাড়ী যাচ্ছিলুম, হঠাৎ শুন্‌লুম, ভেতর থেকে ভেসে আস্‌ছে একটী শিশুর কান্না। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাব্‌লুম, এ বাড়ীতে আবার কে এলো ? কিন্তু তখন কেঁদে কেঁদে শিশুটীর দম বন্ধ হ'য়ে আসছে বুঝ্‌তে পেরে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ে' দেখি তোমাদের এই অবস্থা। অল্প চেষ্টাতেই খুকীর মায়ের জ্ঞান ফির্‌ল, কিন্তু তোমার অবস্থা দেখে আমার ভয় হ'য়ে গেছ্‌ল। তাই এখানকার ডাক্তারকে 'কল' দিয়েছি।"

মনীষ বল্‌লে,—আপনার ঋণ জন্মে কখনও শুধ্‌তে পার্‌ব না।"

মীরা তখন বল্‌লে—"আপনি যে বল্‌ছিলেন, এ বাড়ীর কি একটা গুপ্ত ইতিহাস আছে সেটা বল্‌বেন। কই, তা' বল্‌লেন না ত।"

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বল্‌লেন—"এইবার বল্‌ছি মা।"

তিনি সুরু কর্‌লেন বল্‌তে—"সে অনেককাল আগের কথা। এ বাড়ীতে এক বৃদ্ধ বাস কর্‌ত তার এক ভাইঝিকে নিয়ে। সে মেয়েটী জন্মাবার কিছুদিন পরেই তার পিতামাতা একসঙ্গেই মারা যায়। যাবার আগে তার বাপ মেয়ের নামে অগাধ বিষয়-সম্পত্তি লেখা পড়া করে' দিয়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধের প্রথম থেকে ভীষণ লোভ ছিল সেই সম্পত্তির উপর। মেয়েটীর ছেলেবেলা থেকে ভীষণ ঝোঁক ছিল বীণা বাজানোর দিকে। পাড়ার একটী ছেলে ছিল, সে এসে মেয়েটীকে রোজ বীণা বাজানো শেখাতো। বুড়ো কিন্তু মোটে সেটা পছন্দ কর্‌ত না। তার কেবল ভয় হ'ত, তাদের মেলামেশার ফলে যদি শেষে ছেলেটী তার ভাইঝিকে বিয়ে কর্‌তে চায়—তা' হ'লে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির ওপর তা'র আর কিছু অধিকার থাকবে না—তার এতদিনের আশা এক নিমেষে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। এই ভেবে বীণাকে শিখ্‌তে দেওয়া ত দূরের কথা, একটা বীণা পর্য্যন্ত কিনে দেয় নি। কিন্তু বুঝ্‌ছ ত, নদী যখন ছুট্‌তে সুরু করে, তখন সে কি কারও বাধা মানে ? সেই রকম মেয়েটীর মনে প্রবল নেশা জেগেছিল বীণা শেখার দিকে। ছেলেটী গোপনে একটী বীণা মেয়েটীকে উপহার দিয়েছিল। গভীর রাত্রে সকলে যখন নিদ্রায় মগ্ন থাক্‌ত, সেই সময় তারা দু'জনে মিলে সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে সুর-সাধনা কর্‌ত। একদিন বুড়ো তাদের সে গোপন সাধনার কথা কি করে' জান্‌তে পেরে, রাগে ও হিংসায় উন্মত্ত হ'য়ে সেই নিশীথকালে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা কর্‌ল। এবং তার কিছুক্ষণ পরেই তীব্র অনুশোচনায় অস্থির হ'য়ে সে আত্মঘাতী হ'ল। তারপর ক্রমে এখানকার লোকের মুখে মুখে এ কাহিনী প্রচার হ'য়ে পড়্‌ল।"

ভদ্রলোক নীরব হ'লে মীরা বল্‌লে—"উঃ, কী নৃশংস হত্যাকাণ্ড! ভাব্‌তে গেলে গায়ে কাঁটা দেয়, চোখে জল ফেটে বেরোয়।"

মনীষ বল্‌লে—"আচ্ছা, সেই বীণাটী তারপর কি হ'ল ?"

ভদ্রলোক বল্‌লেন—"ওই যে একটী কাঠের সিন্দুক দেখ্‌ছ, ওর ভেতর সেটী আছে। একটী ছেলে তোমাদের মত স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখে যাবার সময় বীণাটী সঙ্গে করে' নিয়ে গেছ্‌ল। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! পরদিন দেখা গেল, সে ছেলেটী তার বিছানায় একেবারে ঘাড় গুঁজে শেষ হ'য়ে রয়েছে। সেই থেকে আর ও জিনিষ কেউ চোখেও দেখতে চায় না।"

গভীর আগ্রহভরে মীরা বল্‌লে—আমার একবার দেখ্‌তে ভারী ইচ্ছে হচ্ছে।"

—"বেশ ত মা, আমার সঙ্গে এসো।"

ভদ্রলোক তখন নিজে গিয়ে সিন্দুকের ডালা খুলে একটী দামী অথচ পুরাণো বীণা বার করে' মীরার হাতে দিলেন। সেটীর মাথায় সোনার জলে খোদাই করে' লেখা রয়েছে—"শ্রীমতী বীণাকে। শ্রীনব সেন।"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বল্‌লেন—"আহা, ভোরের অরুণ আলোয় দু'টী মুকুল ফুট্‌তে-না-ফুট্‌তেই প্রখর রৌদ্রের তাপে শুকিয়ে গেল!"

মীরা ও মনীষের চোখে তখন অশ্রুর বন্যা নেমে এসেছে।

ক্ষণপ্রভা দেবী

পুস্তক পরিচয়

স্পর্শের প্রভাব—(উপন্যাস) লেখক শ্রীধীরেন্দ্র-নারায়ণ রায়।

প্রকাশক—শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৫নং কার্ত্তিক বসুর লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

'স্পর্শের প্রভাব' উপন্যাসখানি আমি একাধিকবার পড়িয়াছি। যখন 'বসুমতী'-পত্রে এই উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল, তখন আমি প্রতি-মাসেই পড়িতাম। মাসিক-পত্রাদিতে যে সকল উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, আমি সাধারণতঃ তাহা পাঠ করিবার চেষ্টা করি না; কারণ, বার্দ্ধক্যবশতঃ আমার স্মৃতিশক্তি এমন দুর্ব্বল হইয়াছে যে, একমাস পরে পূর্ব্ব মাসে লিখিত উপন্যাসের সূত্র ধরিতে পারি না। কিন্তু এই 'স্পর্শের প্রভাবে'র ঘটনাসকল এমনভাবে মাসের পর মাস উপস্থাপিত হইতে লাগিল যে, মূল উপন্যাসের সূত্র খুঁজিবার জন্য আমাকে আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই; সমস্ত ঘটনাই আমার মনে থাকিত।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত। তিনি এই 'স্পর্শের প্রভাবে'র মত সামাজিক উপন্যাস কেমন করিয়া লিখিলেন, তাঁহার লেখনীমুখে 'রণেন্দ্র', 'কালীনাথ, 'তরলা,' 'সোনা দা', 'গুপে গুণ্ডা', 'জ্যোৎস্না' প্রভৃতি বিভিন্নভাবের চরিত্র কেমন করিয়া এমন সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইল, ইহা সাধারণ পাঠকের কাছে বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ধীরেন্দ্রনারায়ণকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তাঁহারা বলিবেন, ইহার মধ্যে বিস্ময়ের কোন কথা নাই; গ্রন্থকার ধীরেন্দ্রনারায়ণের চরিত্রে আভিজাত্যের গন্ধমাত্রও নাই, ধনের গরিমা তাঁহার নাই; দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহিতই তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে, তাই তিনি এমন বিভিন্ন 'টাইপে'র নরনারী চরিত্র অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন।

এই উপন্যাসখানিতে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভ করিয়াছেন, বিলাতী ভাবের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে, অথচ, তাঁহার এই উপন্যাসে পাশ্চাত্ত্য ভাব-বিমূঢ়তা বিন্দুমাত্রও নাই। এখনকার দিনে ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। তাঁহার সৃষ্ট 'রণেন্দ্রে'র কথা মনে হইলে চক্ষু সজল হয়, তাঁহার সৃষ্ট 'জ্যোৎস্না'র জীবনব্যাপী ব্যথায় হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠে। ইহাই লেখকের কৃতিত্ব।

রায়বাহাদুর শ্রীজলধর সেন

স্রক-চন্দন—(গল্পের বই)—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

প্রকাশক—বুক এজেন্সী, ৩৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

'স্রক-চন্দন' লেখকের প্রথম বই। গল্পগুলা আমরা নানা সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হ'তে দেখেছি। লেখক আজকার দিনে উপন্যাস লিখ্‌লেই যেন ভাল কর্‌তেন; কারণ, গল্পের আদর মাসিক বা সাপ্তাহিকের পাতায় যতই থাকুক না কেন, বই কিনে পড়্‌বার মত লোকের আমাদের দেশে এখনও যথেষ্ট অভাব আছে।

শুধু গল্পের বই প্রকাশ করেই নয়, অন্যান্য অনেক দিক্ দিয়েই লেখক সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সারা বাঙলা-সাহিত্য যখন আধুনিকতার স্রোতে আচ্ছন্ন, তখন পুরাণো ধরণের গল্প লিখে কেন যে তিনি সাহিত্যের আসরে প্রবেশ কর্‌লেন, বুঝে উঠা কঠিন। গল্পগুলো পড়-

লেই বেশ বোঝা যায়, লেখক আধুনিকতার বিশেষ ভক্ত নন্।

তা' না হলেও, লেখকের যে একটী নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। নিজস্ব ধারায় লিখ্‌তে গিয়ে তিনি নিজেকে কোথাও গতানুগতিকতার মোহে হারিয়ে ফেলেন নি; আবার আধুনিকতাকে ঠেলে রাখ্‌তে গিয়ে প্রবহমান সুরকেও কোথাও কেটে ফেলেন নি। লেখক গল্প বেশ ভালভাবেই বল্‌তে জানেন; আর জানেন কোথা থেকে আরম্ভ করে' কোথা তাকে শেষ কর্‌তে হয়।

তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের গতিভঙ্গী আর তাদের কথাবার্ত্তা সম্বন্ধেও লেখক যথেষ্ট সচেতন। ভাষা বেশ সাবলীল, পড়্‌তে পড়্‌তে কোথাও ঠোকর খেতে হয় না। কিন্তু প্রত্যেক গল্পটা যেন একটা অতি পরিচিত সমাপ্তিতে এসে পড়েছে; সেইজন্যে শেষের গল্পগুলো পাঠকের মনে খুব গভীর ছাপ না ফেল্‌তেও পারে। প্রথমদিকের গল্পের মধ্যে 'মামুলী'ই আমাদের সকলের চেয়ে ভাল লেগেচে—তার পরে 'বাহাদুর।' শেষ গল্প 'উন্মাদে'র মধ্যেও নূতনত্বের আভাষ পাওয়া যায়।

মাঝের গোটাকতক গল্প যেন কেমন একটু একঘেয়ে হ'য়ে পড়েছে। সেইজন্যে মনে হয়, লেখক সবগুলো পুরাণো লেখা না দিয়ে গোটাকতক নূতন গল্প এ ব'য়ে জুড়ে দিতে পার্‌লে ভাল কর্‌তেন।

যাই হোক্, 'স্রক-চন্দন আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। গল্পলেখা আজকাল শুধু ফাঁকির খেলা। লেখক কিন্তু প্রাণপণে গল্পই বলেছেন এবং তাঁ'তে বহু পরিমাণে সফলও হয়েছেন।

বইখানি তো আমাদের ভাল লেগেছে-ই, কিন্তু সকলের চেয়ে ভাল লেগেছে—'স্রক্-চন্দন' নামটী।

শ্রীমণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মৃত্যুর পশ্চাতে—(রোমাঞ্চকর শিশু উপন্যাস) শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর—প্রকাশক—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম—দশ আনা।

সরোজ, ডেভিড্, সনি ও বিনয়বাবুর অদ্ভুত রোমাঞ্চকর 'এ্যাড্‌ভেঞ্চার' কাহিনী। আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে সেখানকার বন্যলোকের দ্বারা কেমন করে' তাঁরা আক্রান্ত হন্, পরে অসীম সাহসের ওপর নির্ভর করে' কত বিপদের মধ্যে দিয়ে তাঁরা উদ্ধার পান্,তারই লোমহর্ষণকর কাহিনী। স্থানে স্থানে একটু বেখাপ্পা লাগ্‌লেও, যাদের জন্য বইখানা লেখা হয়েছে, তাদের খুবই ভাল লাগ্‌বে। পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লে এক নিশ্বাসে শেষ না করে' উঠ্‌তে পার্‌বে না। লেখকের ভাষা বেশ ঝরঝরে, হাত মিষ্ট।

লেখকের অনাগত ভবিষ্যৎ জয়-শ্রী মণ্ডিত হোক্ এই আমাদের প্রার্থনা।

ছাপা ও কাগজ প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীমতী সরযূবালা গুহ

রহস্য-চক্র-ডিটেক্‌টিভ গল্পের পাক্ষিক পত্র। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং ৯।১, মহেন্দ্র বসুর লেন হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক আনা।

রহস্য-চক্রের গল্পগুলি পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ডিটেক্‌টিভ গল্প বলিতে যাহা বুঝায়, এই সিরিজের গল্পগুলি তাহা অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর। আশা করি, পত্রিকাখানি সুপরিচালিত হইয়া পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।

মিস্ দুলারী
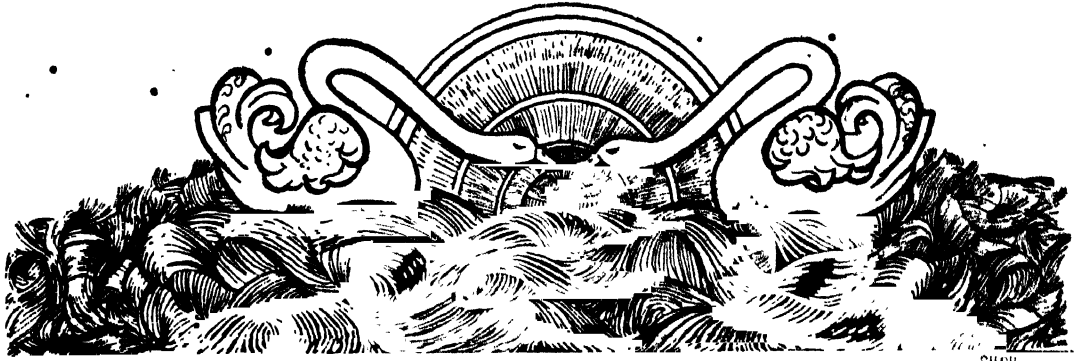
সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৪১ { একাদশ সংখ্যা

শত্রু

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"আমাদের নেহাৎ পোড়া কপাল মা, কি করব, তাই কাঁটা দেখেও তোমায় এই ঘরেই দিতে হ'ল।"

আশীর্ব্বচনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গুরুজনের মুখে কথাটা বিষের বাণের মতই বুকে আসিয়া বিঁধিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি প্রতিবাদের একটা ভাষাও খুঁজিয়া পাইলাম না; তা' ছাড়া, নবোঢ়া হিন্দু বালিকার প্রতিবাদের মত কিই বা থাকিতে পারে।

কিন্তু তথাপি বিদ্রোহী অন্তর অন্তর মাঝেই কান্নার সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদের মত হাসিয়া উঠিতে চাহিল, কাজেই সাময়িক কোন সমবেদনাই সহানুভূতির বলিয়া মনে হইল না। বুকের ভিতর হইতে একই কথা বারবার ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল, "ও গো, কি দরকার ছিল এমন করিয়া তোমাদের বারবার ক্ষতের মুখে নুনের ছিটার প্রক্ষেপ দিবার!"

বিদ্রোহের কান্না বুকে চাপিয়া পাল্কীতে আসিয়া উঠিলাম।

যার সম্বন্ধে এত কথা, আসিয়া দেখিলাম বেচারী অজ্ঞান বালক মাত্র। তথাপি কাঁটাকে কাঁটা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে! স্বামী আসিয়া পুস্তকের বাঁধা গতের ভাষায় দু'চার কথা বলিয়া গেলেন। জানিলাম এটাও রীতি, কাজেই আমার ভাগ্যেই বা তার অনাটন থাকিবে কেন?

কিন্তু সেই দশ বৎসরের বালক সুধন্যকে প্রীতি, স্নেহ, বৈরতা, না, কোন চক্ষেই লইতে পারিলাম না। সবার

সব উপদেশই বানের জলে বানচাল হইয়া গেল। গর্ভে না ধরিয়াও জানিলাম, সে আমার ছেলে, সেও তেমনই জানিল, আমি তার মা!

তার মামারা ভাগিনেয়কে সৎমার হাতে ছাড়িয়া যাইতে পারিল না, সঙ্গে লইয়া গেল।

যাইবার সময় বালক হাসিল না, অভিমানভরে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিলও না। কেবল ধীর স্থির উজ্জ্বল চক্ষু তুলিয়া কিয়ৎকাল আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বক্ষবাস হইতে একটী স্বর্ণ কৌটা বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিয়া গেল, "আমার মায়ের শেষদান তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেলুম মা!"

কিন্তু আমার কাছে কেন! জিজ্ঞাসার ভাষা খুঁজিয়া পাইবার পূর্ব্বেই সে চলিয়া গেল।

সাত বৎসরে অন্ততঃ সত্তরবার তাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে গিয়া স্বামী অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। হঠাৎ একদিন শুনিলাম, সে না কি চোর! তার দিদিমার বাক্স হইতে টাকা চুরী করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। ভাঙ্গা বাক্সটাই নাকি তার সে দুষ্কর্ম্মের প্রধান সাক্ষী! আর সাক্ষী মামাত ভাই বিপুল। ছেলেটাকে হাতে-নাতে ধরিয়াও সে না কি রাখিতে পারে নাই, তবু আহত অবস্থায়ও সুদুর সহর পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়া বিফল মনোরথ ও অসহায় অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কথাটাকে যতবড় সত্যের আলোকে লোকে ঢাক বাজাইল, আমি ঠিক ততটাই মিথ্যা বলিয়া লইলাম, ওঁর মনের ভাব ঠিক ঠিক কিন্তু বুঝিলাম না।

দুই

সাতদিনের দিন বোম্বাই হইতে তার পাইয়া স্বামী গম্ভীর হইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসাবাদেও বিশেষ কোন উত্তর দিলেন না। বৈকালের দিকে হঠাৎ আমার হাত বাক্সের চাবী চাহিয়া লইয়া সহরের দিকে বাহির হইলেন। একা আমি আমাদের প্রথম প্রণয়ের ফল অময়কে বুকে চাপিয়া উৎকণ্ঠায় রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

পরের দিন, তার পরের দিনও একই অবস্থায় কাটিল। চতুর্থ দিনে স্বামী গৃহে ফিরিয়া একখানা রেজেষ্টারী করা কাগজ হাতে দিলেন। মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, শ্রাবণের ঘন কালো মেঘের উন্মাদ নৃত্য, বিজলীর লেশ মাত্রও নাই। বলিলেন, "রেখে দাও, আর হ্যাঁ, আজ থেকে আমার বাড়ীতে সে হতভাগার নাম ভুলেও যেন কেউ মুখে না নেয়, আমি জেনেছি সে মরেছে।"

বোম্বায়ের টেলিগ্রামের সহিত ইহার কি যে সামঞ্জস্য বুঝিলাম না। অন্ধ পল্লীকুমারী, শিক্ষার সোপান আরোহণ মাতৃভাষায় দু'-একখানা পুস্তক পর্য্যন্ত। কাজেই এ দুইখানি ইংরাজীর তরজমায় সে বিদ্যা কুলাইল না। কাজেই শুধু চাহিয়া থাকা ছাড়া আমার উপায় কোথায়?

ও বাড়ীর নন্দ ঠাকুরপো কি সব কথা বলিয়া গেল বুঝিলাম না। বিষয়, কার বিষয়, কে কা'কে বঞ্চিত করিতে চায়? আমি ত স্বপ্নেও একদিনও—কিন্তু সে কথা কেই বা বুঝিবে! দশের চক্ষে আমিই অপরাধিনী সাজিলাম—সৎ মা যে!

হয় ত, ছোঁড়াটার উপর রাগ অভিমান বিরক্তি সব কিছুই হইল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত করিবার ত কিছুই ছিল না, কাজেই মনে মনেই নিজেই সাজা ভোগ করিতে লাগিলাম।

চাঁদ উঠিয়াছিল। তার দুষ্ট-কিরণে স্বর্ণ কৌটাটী উজ্জ্বলতর হইয়া হাসিয়া উঠিল; আমি রাগ করিব কি, চোখ ছাপাইয়া জল আপনি বাহির হইয়া আসিল।

উনি হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কাঁদ কেন! শত্রু গেছে যাক্!"

বুকের ভিতর হইতে সে কথায় সায় দিতে পারিলাম না। চোখের ধারার দুষ্টামীও কমিল না, বলিলাম, "কেন, তুমি ওর ওপর এত রেগেছ, কি দোষ ওর?"

স্বামী পরুষকণ্ঠে বলিলেন, "দোষ কি নয় তাই জিজ্ঞাসা কর, দোষ ও চোর, ও খুনে, ও বিধর্ম্মী, এক খৃষ্টান মিশনারীর ফাঁদে পা দিয়ে আমার—শুধু আমার কেন, বংশের মুখে চুণকালী দিয়েছে। এখন তাদেরই পয়সায় বিলেত চলেছে পড়তে। তবু, তবু বলবে কিছু দোষ নেই?"

উত্তর দিবার মত কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না, উপায়হীনা নারীর শেষ উপায় বালিশে মুখ ঢাকিলাম।

তিন

খ্যাতি, বিদ্যা, সুনামে দেশময় একটা কোলাহল পড়িয়া গেল।

আগের ভাগ নন্দ ঠাকুর পো আসিয়া শাসাইয়া গেল,—এখন তার ন্যায্য দাবীর বাদী হওয়াই যদি আমার অভিপ্রেত হয়, আইন তাকে সে বঞ্চনার হাত হইতে রক্ষা করিবে। আর তারা প্রতিবেশী পাঁচজনে সে দাবীর সমর্থন করিতে আপ্রাণ প্রস্তুতও। বিষয় পৈত্রিক, তা'তে দাঁত ফুটাইবার অধিকার বাপেরও নাই!

সুধন্ন কিন্তু কাহার পরামর্শ যুক্তির অপেক্ষা করিল না, সটান রেল হইতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিল। উনি বাড়ী ছিলেন না, হাটে গিয়াছিলেন। কাজেই ছেলের অভ্যর্থনারই বলো আর আর ন্যায্য দাবীর অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াই বলো আমাকেই করিতে হইল।

পড়শীদের বাঁকামুখ কিন্তু আরও বাঁকিয়া গেল। সবাই একবাক্যে বলিল, "কোরবে না, এখন যে মোটা আয়! রূপচাঁদের ফাঁদ এড়াবে কি ক'রে, মাগী কম চালাক!"

কথাটা আমি কানে শুনিলাম এবং হাসিমুখেই গ্রহণ করিলাম। সুধন্নর কানেও বোধ হয় কথাটা পৌছিয়া থাকিবে। কিন্তু সে ঠিক ঠিক উপেক্ষার মধ্য দিয়া ঠেলিয়া ফেলিতে পারিল না। বেশ জোর দিয়াই পরের কথাগুলা উচ্চারণ করিল, "মার বাড়া যারা আদর-যত্ন দেখাতে চায়, তাদের কি না কি বলে, না মা?—হ্যাঁ, ওদের স্পষ্ট বলে দাও,যদি ভাল চান তবে অমন কথা যেন মুখ দিয়ে দ্বিতীয়-বার বের না করেন।"

হিতৈষীর দল হঠাৎ এ আঁচকা আক্রমণ প্রত্যাশা করেন নাই, তাই থতমত খাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

মানিয়া রাখিয়াছিলাম, হঠাৎ স্মরণ হওয়ায় ছেলের হাত হইতে ঘটিটা কাড়িয়া লইয়া বলিলাম, "একটু দাঁড়া বাবা! আমার একটু কাজ আছে সেরে নেই, তারপর পা ধুস্।"

সুধন্ন বিস্ময়-চকিত-দৃষ্টিতে চাহিল। আমি তাড়াতাড়ি উৎযোগ-পর্ব্ব সমাধান করিতে ভিতরে গিয়া ঢুকিলাম, পাঁচ সাতটী এয়োস্ত্রী মেয়ের হাতে পান সুপারী দিয়া দাঁড়-পানের ব্রতটা যখন একপ্রকার শেস করিয়া আসিয়াছি, তখন সুধন্ন হাসিয়া বলিল, "এ কি খেয়াল মা!"

আমি হাসিমুখে জবাব দিলাম, "করব না, মা যে! আগে তোর কাচ্ছা-বাচ্ছা হোক্, তখন বুঝবি!"

সুধন্ন হাসিতে হাসিতে সকলকে শুনাইয়া বলিল, "কিন্তু এ ত পেটের কাঁটা নয়, এ যে শক্র! এঁদের বরং জিজ্ঞাসা কর, বলবেন, ডাইনির মায়া!"

দেখিলাম, অনেকের মুখেই বিষণ্নতা ও অপ্রসন্নতার কালো ছাপ বেশ স্পষ্টাক্ষরেই ফুটিয়া উঠিল। বলিলাম, "তা' সবার দোষ দাও কেন বাবা, সম্বন্ধটা দেবতা এই ভাবেই যে গড়েছেন। রটে যা' বটেও তা'!"

জবাবটা শুনিতে প্রতিবেশীরা আর কেহই দাঁড়াইল না।

উনি যে কখন চুপে চুপে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিলেন, দেখি নাই। সহসা ঘরে ঢুকিয়াই শয্যাশায়ী অবস্থায় দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম; বলিলাম, "হ্যাঁ গা, হাটের ফেরত এসেই এমন ক'রে শুলে যে।"

উত্তর দিলেন, 'না, এমনি, মোয়া আর কি কি ভাল-বাস ত না? হাটের মোটটা খুলে দেখো ত, কলাইশুঁটী এনেছি। ভাল পাটালিও বুঝি রোঘো সের আড়াই বেঁধে দিয়েছে!"

ছেলে যাওয়া পর্য্যন্ত এ সব জিনিস কোনদিনই এ বাসায় ঢোকে নাই, তাই জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া বলিলাম, "তুমি কার কাছে খপর পেলে?"

স্বামী বলিলেন, 'না খপর আমি পাই নি, আজ এমনি বিদ্রোহী মনটাকে ভোলাতে ওগুলো কিনে এনেছিলুম। ভেবেছিলুম, কারুর জন্যে দুনিয়ার সব জিনিযে আমিই বা

এমন বঞ্চিত হ'য়ে থাকি কেন? তা' যার ভাগ্যে যা' সেই আনিয়েছে—এখন বুঝছি।

বাহিরে সুধন্ম সেই আগেরই মত মোট খুলিতে খুলিতে চেঁচাইতেছিল, "বা বা, সুন্দর পাকা কলা ত, এই যে মা মা, আমি উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি ঘুগ্‌নি আর কলাইশুঁটির কচুরী তৈরী করবে এস। আজ গোণা পঞ্চাশখানা কচুরীর কম কিন্তু জমি ছাড়ছি নি, এ আমি আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি?"

মামার বাড়ী কথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "বিশ্বাস হয় মা, তোমার ছেলে এ কাজ পারে?"

হাসিয়া বলিলাম, "পারে না জেনেই জিজ্ঞেস কচ্ছি বাবা, নইলে পারতুম না!"

তার গম্ভীর মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "তবে জেনো মা, শাক দিয়ে সে মাছ ঢেকেছে, তার নিজের দোষ আমার কাঁধে চাপিয়ে।"

উনি হয় ত শুনিয়া থাকিবেন। আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "ও যে বিধর্ম্মী খৃষ্টান, এ কথা ভুলে যাচ্ছ সবিতা, বিশেষ তোমার পেটের ছেলে অময় এ নির্দ্দোষের সাজা কতটা ভুগ্‌বে, তা' জান?"

আমি নিজের দুই বাহু বিস্তার করিয়া ধরিলাম, "এর কোনটা কাটতে পারি বল ত?"

চার

বাপ ও ছেলের পরামর্শমতে একটা বড়রকম যজ্ঞের ঘটা বহিয়া গেল। এর নাম না কি প্রায়শ্চিত্ত। আমি কিন্তু দেখিলাম, হাড়ে হাড়ে বুঝিলাম, আমাকে দশের চক্ষে আশু বাড়াইয়া ধরিতেই দুষ্ট ছেলেটার এ প্রেত যজ্ঞের আয়োজন।

ছেলেটার রোজগারেব বহর দেখিয়া পাড়ার হিতৈষীর অনেকেই আসিয়া ধরিল, "হ্যাঁ গা, ধন্মুর মা, এতবড় রোজগারী ছেলে এখন আইবুড় রাখ্‌বে? তোমার আক্কেলখানা কি!"

দুষ্ট ছেলেটা মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে ঠিক সেই সময় কোথা হইতে আসিয়া জুটিল, বলিল, "বলুন ত, বলুন ত, শত্তুর না হ'লে এমন আর কেউ পারে? লোকে বলে মার স্নেহ, মা-ছেলের মাঝে চিরদিনের জন্যে কপাট তুলে দিয়ে ছেলেকে পরের হাতে পর ক'রে দেওয়া এ কি কম বুকের পাটার কাজ!"

এর জবাব আমি আর কি দিব, মুখ মচ্‌কাইয়া শুধু হাসিলাম। অন্য সবার মুখ কিন্তু চুণ হইয়া গেল।

একটী পরমা সুন্দরী পাত্রী হাতের গোড়ায় পাইয়া ছেলেকে ডাকিয়া দেখাইলাম। সেদিন অভিমানের পালা ভাঙ্গিতে কিন্তু আমায় বেজায় বেগ পাইতে হইল। ছেলে কর্ক্কশ কণ্ঠে—বুঝি জীবনে এমন করিয়া আর কোনদিন অনুযোগ করে নাই—বলিল, "পরের কথায় পেটের ছেলেকে যে পর করে দিতে চায়, সে রাক্ষসী, সে শত্রু, সে—"

কথাটা আটকাইয়া গেল। আমি তার মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "পাগল! বিয়ে হ'লেই যদি সব ভেসে যায়? তবে ত বিয়ের ব্যাপারটাই সংসার হ'তে মুছে ফেলতে হয়। কিন্তু তা' কোনদিন হয়েছে কি? আবহমান কাল থেকে সমানভাবেই চলে আস্‌ছে। সমাজে নূতন কিছু চালাতে চাস যদি—"

সুধন্ম কথাটা শেস করিতে দিল না, আমার মুখ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "যদি তোমার ইচ্ছে হ'য়ে থাকে মা, আমি সাধ ক'রেও গলায় পাথর বাঁধব, তুমি আর কিছু ব'ল না।"

পাকা দেখার দিন কে একজন না কি একটা বেফাঁস কথায় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "শুনেছি বেয়াই, আপনার ঘর না কি দ্বিতীয় পক্ষের, তা'তে মেয়ের যত্ন-আত্তির—পরের ঘরে এলে যতটুকু পায় অবশ্য তার বেশী আমরাও চাই না, তবু বিমাতা—কি বলেন?"

ওর হইয়া ছেলেই জবাব দিল, বলিল, "সেটা বড় ঠিক কথা, আপনাদের মেয়ের অন্যত্র বিয়ের ঠিক করুন গে, আমার মার উপর—"

কথাটা শেষ না করিয়াই সে চলিয়া আসিল। অনেক সাধা-পাড়া করিয়া, অনেক বুঝাইয়া আমিই আবার তাকে আশীর্ব্বাদী লইতে পাঠাইলাম। ছেলে রাগিয়া বলিল, "দেখো

মু,·এ·ঘরের মেয়ে কখন ভাল হবে না, হবে না, হবে না। আমার মার চেয়ে যারা নিজেদের মেয়েকে বড়র আসনে বসাতে চায়, তারা আর যাই হোক্, মানুষ নয়।—"

বহুকষ্টে সেদিন তাকে শান্ত করিয়া আবার অপ্রস্তুত ভদ্রলোকদের সম্মুখে পাঠাইলাম। সে গিয়াই কিন্তু আরম্ভ করিল, "দেখুন, বাড়ীতে বসে আপনারা যাঁকে এতবড় অপমান ক'রে গেলেন, কেবল তাঁরই অনুরোধে মান রাখ্‌তে আবার আমায় অনিচ্ছায় আশীর্ব্বাদ নিতে আস্‌তে হয়েছে। আপনাদের ধন-দৌলত বা রূপসী মেয়ের খাতিরে নয়?"

মা গো, কটুকটে ছেলেটা এতও পারে! আমার এমনই লজ্জা করতে লাগল! ঝিকে দিয়ে বলে পাঠালুম, "আমার অনুরোধ আপনারা ওকে ক্ষমা করুন। ছেলে আমার, মুখে যত যা' বলুক ওর মনের মত মন ভূ-ভারতে নেই!"

পাঁচ

জীবনের উপর দিয়া কয়টা ঝড়-ঝাপটার ঢেউ কাটিয়া গেল। সবার প্রধান আমার বৈধব্য। হাতের নোয়া মাথায় সিঁদূর বুকের আনন্দ নিবাইয়া দিয়া উনি জানি না কোন্ ধামে চলিয়া গেলেন। ছেলেরা বড় হইয়াছিল। মাথায় তাদের বিবাহের ফুল-জল পড়িতেও বাকি ছিল না। মোটের ওপর এ সংসারে আমার কর্ত্তব্য বলিতে যা' কিছু সবই শেষ হইয়া গিয়াছিল।

কি একটা কাজে মাঝের ঘর অতিক্রম করিয়া যাইতে ছিলাম। হঠাৎ একটা কথায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। নিশ্চল পা দু'টি বুঝি তার গতিশক্তি হারাইয়া ফেলিল। ভাবিলাম—এই কি সংসার!

সেজ বৌমা বলিতেছিলেন, "ঠিক বলেছ দিদি, ওঁর স্বভাবই ওই; সেই কোণঘেঁসা হ'য়ে পড়ে থাকা। কেন, এত রোজগার, এত ঐশ্বর্য্য এ কি এই টিমটিমে সহরতলীর মধ্যে ঢেকে রাখ্‌তে? এরা আমাদের কদর কিছু বোঝে? উনি নিজে যেমন পাড়াগেঁয়ে ভূত, আমাদেরও তাই ক'রে রাখ্‌তে চান!"

বড় বৌমার প্রস্তাবিত কথাটা যে কি তা' বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু পরের কথাটা নিজের কানে যেমন শুনিলাম, তা'তে পূর্ব্বেরটা অনুমান করিয়া লইতে আট-কাইল না। শুভা আবার বলিল, "বায়স্কোপের সিট্ তা' হ'লে রিজার্ভ হ'ল না দিদি, কি বলো?"

চন্দ্রা বেশ একটু ঝাঁঝাল স্বরে বলিল, "কি ক'রে হবে, ওঁর ত কথা জান, প্রত্যেক কথায় বলেন, 'মাকে জিজ্ঞেসা কর গে।' সিজন রিজার্ভ করা থাকলে, যখন ইচ্ছে গেলুম, এটা আজকালকার এটিকেট বা ফ্যাসান্। তা' উনি কি তা' বোঝেন, না বুঝবেন? সব কথাতেই রাউ তুলবেন, কেবল অপব্যয় আর অপব্যয়! সংশাশুড়ীর এত কেন?"

এই মেয়েকে প্রথম দিন বধূরূপে আনিয়া স্বয়ম্ বলিয়া-ছিল, "তোমার পায়ের সেবাদাসী নিয়ে এলুম মা, যেদিন তার কোন বেচাল দেখবে, এ সংসার হ'তে বিদেয় ক'রে দিও। পায়ের জুতো চিরকাল পায়েই থাকবে, কোনদিন যেন মাথায় ওঠবার সুযোগ না পায়!"

মন্দা, ছোট বৌ, তার কণ্ঠও নীরব রহিল না, বলিল, "আমি ভাই অত সৎ-অসৎ বুঝি না, তোমার দিন যখন ফুরিয়েছে আমাদের সুখের পথে কাঁটা হ'য়ে কেন থাকা, সরে পড়ো! আজ তিন পুরুষ শুনেছি দেশছাড়া, সে ভিটেয় তেল সল্‌তে দেওয়া'ত দরকার!"

আমার আর দাঁড়াইয়া শুনিবার মত ধৈর্য্য আমার ছিল না, ধীরপদে সরিয়া আসিলাম।

ছয়

মন্দার কথাটাই মানিয়া লইলাম। কাহাকেও কিছু জানাইলাম না, আমাদের অতি পুরাতন ভৃত্য বেচারামকে সঙ্গে লইয়া স্বামীর পৈত্রিক ভিটার আবিষ্কারে বাহির হইয়া পড়িলাম। জীবনের পরবর্ত্তী অধ্যায় ঠিক কি ভাবে চলিয়া শেষ যবনিকা পাত হইবে, তা' অন্ধ তিমিরাবৃত। হউক, তার অপেক্ষাও এ সুখের মুখ আরও ভয়ঙ্কর!

ট্রেণের কামরায় বেচারাম আমার চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এক কাপড়ে চলে এলেন মা, নিজের বলতে যা' কিছু তাও সঙ্গে নিলেন না?"

মৃদু হাসিলাম। নিরুত্তরের ভিতর দিয়া সে যে কি উত্তর পাইল, বুঝিলাম না। বেচারী কেবল একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল মাত্র। খানিক চুপ করিয়া থাকিবার পর সে আবার আরম্ভ করিল, "হাসখামারে গিয়ে পড়তে পারলে ভাবি না, বাবুদের যা' কিছু আছে তার দেখা-শোনা ক'রে গুছিয়ে নিতে পারলে আমাদের দুটো-পেট বই ত নয়। ভয় পথের খরচা নিয়ে। দু'রাত তিনদিন কি খাইয়ে আপনাকে নিয়ে যাব। একটু অঙ্কুশেও যদি জান্‌তে দিতেন—"

ঠিক সেই সময়ে চলন্ত কামরার ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া সুধন্ম্ বলিয়া উঠিল, "এই যে বেচু দা', তোমরা এ কামরায়, যাক্, বাঁচা গেল, সারা ট্রেনটা খুঁজে না পেয়ে এমনই ভয় হ'য়েছিল?"

গাড়ীর দরজা খুলিয়া সে ভিতরে আসিয়া বসিল। তার শ্রম-কাতর মুখখানায় স্বেদজল টলটল করিতেছিল। তাহার উপর উদ্বেগ উৎকণ্ঠার রক্তের-ছটা তাকে এক নূতন-তর করিয়া গড়িয়াছিল। প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। হাত ধরিয়া টানিয়া পার্শ্বে আনিয়া বসাইতে বসাইতে বলিলাম, "আয় বাবা, ছিঃ, এমন পাগলামী করে কি? মাকে কি চিরদিন এমনি ক'রেই ধরে রাখবি রে! মর্‌তেও দিবি না। যম এলে কি বলবি?"

ছেলে তার হাতের ঘুসি শূন্যে ছুঁড়িয়া বলিল, "এসে দেখুক না সে একবার। কি ভাবে, কেমন ক'রে তার কাজের পুরস্কার দিয়ে তাড়াই! তাও বলি মা, পরের মেয়েদের ওপর রাগ ক'রে নিজের ছেলেদের ফেলে চলে চ'লে এলে কি ব'লে। একবারও কি মনে জাগল না, তারা দাঁড়াবে কার কাছে?"

বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। আমি কথা বলিতে পারিলাম না। নীরবে তার মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইলাম। দীঘির পাড়ে আসিয়া দেখিলাম—গরুর গাড়ী ঠিক করাই রহিয়াছে। আমাদের বাড়ীর অন্য একজন চাকর দুখুয়া দুধ ফল আর ক্ষীরেলা লইয়া হাজির। কিছুই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম না। কারণ, সকল কাজের নিয়ামক যে আমার সঙ্গেই রহিয়াছে।

গরুর গাড়ীর পর নৌকা, নৌকার পর আবার গোযান। এমনি করিয়া স্বামীর পৈতৃক ভিটায় আসিয়া পৌছিলাম। বেচারাম নিশ্চিহ্ন আবাস ভূমির সন্ধান করিয়া দিল। দেখিলাম—রাগ-অভিমানে যা' করিয়া বসিয়াছি, তার ফল একা আমি নয়, ছেলেটাকেও ভোগাইয়া মারিলাম। ব্যথার অশ্রু রোধ করিতে পারিলাম না, বলিলাম, "চল্ সুধন্ম্, ফিরেই যাই।"

ছেলে কিন্তু উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিল। তার আনীত দ্রব্যাদির ভিতর হইতে খান-কতক মোটা-চাদর টানিয়া লইয়া ভাঙ্গা দেওয়ালে তাঁবু খাটাইতে খাটাইতে সে বলিয়া উঠিল, "আর সে মুখো, ক্ষেপেছে মা? এই কাপড়ের তাঁবুর মধ্যে আমাদের ক'টা গোণা দিন বই ত নয়, বেশ কেটে যাবে। বাপ, প্যান-পেনানি, ঘ্যান-ঘেনানির হাত এড়িয়েছি না বেঁচেছি।"

উপায়হীনভাবে বলিলাম, "এইবার তুই সত্যি-সত্যিই শত্রুতা সাধলি সুধন্ম্, আরও দুটো পেটের কাঁটা ত রয়েছে, তারা কি করলে?"

ছেলে আবার বিকট রোলে হাসিয়া উঠিল। ঠিক ঠিক বুঝিলাম না পাগল সে, না আমি!

সাত

পনের দিন গড়াইয়া গেলে মনটা বড় অস্থির হইয়া উঠিল, বলিলাম, "হ্যারে, এঁদের কোন চিঠি-পত্র পেলি?"

সুধন্ম্ উৎসক-ভরা চক্ষু নাচাইয়া বলিল, "সে কি মা, স্বামীর ভিটে কৈলাসবাস, এর মধ্যেই সে স্বর্গবাস মিটল?"

হাসিয়া বলিলাম, "পেটের পোড়া থাকতে কি দেবতার ঐশ্বর্য্য কাম্য হ'তে পারে বাবা! তোরা যে আমার পায়ের বেড়ী!"

সুধন্ম্ গম্ভীরমুখে বলিল "সে বাড়ী আপনি যখন ঘুচে গেছে মা, যেচে আর জড়াতে যাওয়া কেন?"

সুরের মাঝে একটা পরুষ কঠোরতা বিরাজ করিতে-ছিল; সঙ্গে সঙ্গে তেমনি তাচ্ছিল্য-উপেক্ষার ভঙ্গী। কথটা শেষ করিয়াই সে আর দাঁড়াইল না, "অধর খুড়ো আমায় ডাক্‌ছেন বুঝি, কেন, শুনে আসি।" বলিয়া হন্-হন্ করিয়া বাহিরের পথে চলিয়া গেল। বলা-বাহুল্য, এই

কয়দিনেই সদর-অন্দরের পৃথকত্ব এরা তিন মনিব-ভৃত্যে বাঁশ-বাঁখারীর সাহায্যে নিজেরাই গড়িয়া তুলিয়াছিল।

সুধন্যর এভাব আমার কিছু নূতন বলিয়া মনে হইল, তাই উন্মনা হইয়া উঠিলাম। সন্ধ্যার মা এই সময় বাগানের কয়টা বড় বড় বাতাপী লেবু লইয়া আসিল। সন্ধ্যার নিত্য নিয়মিত জর সুধন্য দেওয়া একদাগ ঔষধে বাগে আসিয়াছে, বুঝি তাহারই এই প্রতিদান। লইতে মাথা কাটা যায়, না লইলে বেচারী প্রাণে বিষম আঘাত পায়। কাজেই উপায়ান্তর না দেখিয়া ধমক দিয়া বলিলাম, "দেখো, এমন যদি তোমরা করবে, তবে রোগের ঔষধ ত পাবেই না বরং—"

বাধা দিয়া সন্ধ্যার মা মিনতিভরা কণ্ঠে বলিল "গাছে নষ্ট হচ্ছে মা। সন্ধ্যার জর, তাকেও দেওয়া চলে না। আমার হাঁপানি, খাব কি দেখেই ভয়ে মরি। তা' ছাড়া, এ অজ-পাড়া-গাঁয়ে এর দামই বা কি?"

এক ঘটি দুধ সবে গয়লা দিয়া গিয়াছিল, তার অর্দ্ধেকটা একটা পাত্রে ঢালিয়া বলিলাম, "সন্ধ্যাকে সাবু ক'রে দিও!"

কপালে করাঘাত করিয়া সন্ধ্যার মা বলিল, "পোড়া কপাল মা, আমাদের ঘরের মেয়ের কি দুধ ঘেঁটে! নবীন আদকের ঘরের ছাগল বিইয়েছিল। দাদাবাবুর কথায় তারই খানিক মেগে এনে মেয়েকে খাইয়েছিলুম, তা' বলব কি, মুখ ভাতের ভাত পর্য্যন্ত তুলে তবে ছাড়লে। ওর চেয়ে মিছরী যদি থাকে এক টুকরো দাও!"

মিছরী ছিল। বায়ে ধাত বলিয়া ছেলের লক্ষ্য এসব দিকে খুব বেশী। একতাল দিলাম, বলিলাম, "আচ্ছা, দুধ থাক্, আমি সাবু ক'রে দেব 'খন, খাওয়ালে বমি হবে না।"

সন্ধ্যার মা মিছরী লইতে আঁচল পাতিল, বলিলাম, "থাক্, কাগজ মুড়েই দিচ্ছি?"

ধন্যর ঘরে কাগজ আছে জানিতাম; তাড়াতাড়ি তারই একখানা টানিতে গিয়া দেখিলাম—চিঠি, মেয়েলি ছাঁচে সাজান। আগ্রহ বাড়িল, শেষের দিক্‌টায় চোখ বুলাইয়া দেখিলাম—বিনীতা চন্দ্রা!

তবে? বড়বৌমার পত্র আসিয়াছে, কিন্তু সুধন্য মানিল না কেন?

অন্য একখানা কাগজে মিছরী মুড়িয়া সন্ধ্যার মায়ের হাতে দিলাম, বলিলাম, "জানা-শোনা একজন লোক দিতে পারবে মা? একবার বৌমার খোঁজ-খবর নিয়ে আস্‌বে!"

রমণী বলিল, "আমিই যাব মা, অন্য লোকের দরকার নেই। সন্ধ্যাকে নয় দিন তুই তার মাসীর বাড়ী রেখে যাব 'খন, কবে যেতে হবে?"

বলিলাম, "বলব 'খন, সন্ধ্যাকে আমার কাছেই দিয়ে যাস্, আমি দেখ্‌ব, অযত্ন হবে না!"

রমণী হাতখানেক জিভ্ বাহির করিয়া বলিল, "ও মা, ও কি কথা! আপনার পায়ের ধুলো সে পাবে কোথায়? তবে সকৃড়ি-আবড়ি, আমরা ছোটজাত!"

ভূমিকায়ই তার বক্তব্য বন্ধ করিয়া দিলাম। তখন বৌমার লেখার কয়েক ছত্র জানার যে আমার বড় প্রয়োজন। তাই তাহাকে বিদায় দিয়া ভাঁজ খুলিয়া লেখার হরফের উপর চক্ষু বুলাইয়া চলিলাম। কিন্তু এ কি! আমার পেটের ছেলে অময়, এতবড় অধর্ম্মের কার্য্য তার। পত্রে লেখা—

"ভূমিকার দরকার নেই, সত্যই মার অভিশাপ ফলেছে। আমার বলিতে আমার এখানে কেউ নেই, এ কয়দিনেই ঠাকুরপোরা পৃথকান্ন হ'য়েছেন। বাপের বাড়ীর কেউ ছিল না, তুমি জান, কারণ মা-বাপ খেকো মেয়েকে নিজে বেছেই মা কোলে তুলে নিয়েছিলেন। আমি অন্ধ, তাঁকে তাই চিন্‌তে পারি নি, সে কেবল তোমার রোজগারের পয়সার গুমরে। এখন কিন্তু অন্ধকার দেখছি। এবারের মত ক্ষমা পাব কি? তখন জিজ্ঞাসার উত্তর তোমার ভয়ে দিই নি, এখন পষ্টই জানাচ্ছি—হাঁ, আমারই মুখের দোষে তিনি আমায় ত্যাগ ক'রে গেছেন—আড়াল থেকে আমাদের তিন-জায়ের কথা শুনেই! ভানু দাসী তার সাক্ষী। ভরসা হয় না তাঁর পায়ে ক্ষমা চাইতে। কিন্তু তুমি, এ স্বীকারোক্তি পেয়ে তুমিও কি নির্দ্দয় হয়েই থাকবে? একবার এসো, পার ত মাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তিনি এবার এলে, না, এ ব্যবহার আর কোনদিনই পাবেন না।

বিনীতা—
চন্দ্রা"

মনে মনে বলিলাম, "দুষ্টু মেয়ে ক্ষমা করব কি? আমি যে মা, মার দাঁতে কি বিষ থাকে রে!"

কিন্তু এই কথাটা কিছুতেই বুঝিলাম না, কার রোজগারের পয়সায় ভিন্ন করে কে? তাই একবার সঠিক খবর আনিতে সন্ধ্যার মাকেই পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলাম।

আট

ঘরের ভিতর কি যেন কি করিতেছিলাম। হঠাৎ বাহিরের চেঁচামেচিতে আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে আসিলাম। সুধন্ন কাহাকে যেন জোর করিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিতে চায়। অনবরত বলিতেছে, "বেরোও, বেরিয়ে যাও বলছি। না, এ বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না!"

কা'কে কেন সে এমন করে দেখিতে দ্রুত বাহিরে আসিলাম। এটা যে তার স্বভাবের বিরুদ্ধ! আছাড় খাইয়া মেয়েটা আসিয়া পায়ে পড়িল। আমি তাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিলাম, "আমার ঘরের লক্ষ্মীকে কোথায় তাড়াবি রে হতভাগা! আহা, একদিনে একি চেহারা ক'রে তুলেছিস চন্দ্রা, মুখ দেখ্‌তে একখানা আর্‌সীও কি জোটে নি মা?"

সুধন্নর উত্তেজনা কিন্তু তখনও ফুরায় নাই। ক্রোধ-চঞ্চল কণ্ঠে বলিল, "কা'কে বুকে টানছ মা, ও যে সেই কালসাপ, যার ছোবলে এতদূর পালিয়ে এসেও শান্তি পেতে পার নি!"

বলিলাম, "ভুল করিস নি ধন্ন, ও আমার মেয়ে! আমার মা। যার মনের গুণে স্বামীর পৈত্রিক ভিটে আমার ইহ-জীবনের শ্রীক্ষেত্র চিনে নিতে পেরেছি। আয় মা। হ্যাঁ গা, তা' বাড়ীর ভাঁড়ার-ঘরেও কি চাবী দিয়ে এসেছি যে, মাথায় মাখ্‌তে একরত্তি তেলও জোটে নি?"

চন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "তা' হ'লে তুমি কি এ অপরাধিনীকে ক্ষমা..."

তার শেষ কথাটা আর শেষ করিতে দিলাম না, মুখ চাপিয়া ধরিলাম। মনের কথা এবার মুখে ফুটিয়া বলিলাম, "দুষ্ট মেয়ে, ক্ষমা করব কি, আমি যে তোদের মা! মার দাঁতে কি বিষ থাকে রে!"

সুধন্ন এতক্ষণ হতভম্বের মত একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল চন্দ্রা এবার তার দিকে চাহিয়া বলিল, "আর তুমি··· ?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সে বলিল, "আমি, আমি আবার এর মধ্যে মাথা ঢোকাব কি ক'রে। মা যা' করবেন, তার ওপর কি আর আমার ব্যবস্থা করা চলে?"

চন্দ্রার মুখে একটী একটী করিয়া সব কথাই জানিয়া লইলাম। আমার পেটের ছেলেরা কি ভাবে ছুতা-নাতায় সংসারের যা' কিছু নিজেদের নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। সরল সুধন্নাকে বুঝাইয়াছে, "বাবা যাবার সময়ও অন্তর দিয়ে তোমায় ক্ষমা করতে পারেন নি বড় দা'! বলে গেছেন, তাঁর তোমার দেওয়া জলে মোটেই তৃপ্তি হবে না। মার অনুরোধ, তাই কি আর করেন প্রায়শ্চিত্তের ফাঁকিতে তোমায় ঘরে নিয়েছেন। বিশেষ ক'রে তাই আমাদের জানিয়ে গেছেন, আমাদের ব'লে আমাদের হাত দিয়ে দিলে, তিনি 'কিন্তু' হবেন না। উইল কিছু না থাকলেও এইটেই তার আন্তরিক চরম ইচ্ছাপত্র।"

কথাটা ধন্ন মেনে নিতে দ্বিধা করে নি। তাই আমায় গোপন ক'রে রোজগারের যা' কিছু সব ওদের নিজস্ব ক'রে স'পে এসেছে। আর তার প্রতিফল আমার নিজের পেটের কাঁটারা যে ভাবে দিয়েছে তা' পূর্ব্বেই বলেছি।

সুধন্নাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি করেছিস্ বাবা?"

ছেলে হাসিয়া বলিল, "জীবনভোর দিনগুলো ত ফুরিয়ে যায় নি মা, কতটুকু আর ওরা নিয়েছে। আহা! ছেলে মানুষ। আমি না দেখ্‌লে কেই বা ওদের দেখ্‌বে?"

বলিলাম,—"এরপর আবার যদি চায়?"

সুধন্ন প্রশান্তমুখেই বলিল, "আবার দেব, দেব না, তারা যে আমার মার পেটের ভাই!"

ধমক দিব কি, স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"শুধুই কথা—"

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি-এ

মায়ের কাছে কথাটা শুনিয়া অমল ক্ষুণ্ণ হইল।

তা' ক্ষুণ্ণ হইবারই কথা। এক বছর বাদে সে আজ বাড়ী ফিরিল, আর এই একটা দিন বোন্‌টী বাড়ী থাকিতে পারিল না। অজিতের সঙ্গে বায়োস্কোপ যাওয়াটাই আজ তাহার কাছে বড় হইল!

অভিমান-ক্ষুব্ধ মনে মায়ের কাছে অমল সহসা বলিয়া ফেলিল—আমারি ভুল হয়েছে মা ওকে কলেজে পড়ানো, তার চেয়ে......

ছেলের বুকে কোথায় আঘাত লাগিয়াছে, মা বুঝিলেন, বুঝিয়া ছেলের মনে একটু সহানুভূতি জাগাইবার জন্যই বলিলেন—ছেলে-মানুষ! যে ক'দিন পড়েশুনে আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারে বাঙালী মেয়ের জীবনে সেই ক'দিনই তো লাভ, তারপর সংসারে ঢুক্‌লে তখন তো আর বেরোতে পার্‌বে না, আমি তাই কিছু আর বলি নে,—বলিয়া নিজের অতীত জীবনের লোকসানের কথা মনে পড়িতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

মা'র কথা অমল ঠিক শুনিল কি না কে জানে। আপন-মনেই সে বলিয়া উঠিল—অজিত ওকে নিয়ে আজকাল বায়োস্কোপ থিয়েটারে যাতায়াত সুরু করেছে, আচ্ছা, আজ এলে পরেই আমি বলে' দিচ্ছি!

মা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—না, না, তা'কে কিছু বলার দরকার নেই, সে তো আমাদের উপকার ছাড়া অপকার করে নি কোনদিন।

অমল বাধা দিল, বলিল—তা' বলে' সে এম্‌নি ভাবে......

মা বলিলেন—বেশ, যদি কিছু বল্‌তেই হয় অজিত পরের ছেলে তাকে কিছু না বলে, ঘর সাবধান কর্‌ না।

এইবার অমল বুঝিল, বলিল—বেশ তাই!

তারপর মাতাপুত্রে চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল। একটা বিমর্ষতার আভাস দু'টী চিত্তকে ধীরে ধীরে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল। সেই আচ্ছন্নতাকে অতিক্রম করিবার জন্যই বুঝি মায়ের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কতক্ষণ পরে অমল কথা কহিল, বলিল—তুমি শরীরের আজকাল ভয়ানক অযত্ন করছো মা!

মা'র ঠোঁটের কোণে হাসির আভাষ ভাসিয়া উঠিল, চোখে জাগিল স্নেহের দীপ্তি, তিনি বলিলেন—আর বাবা, তোদের দুটোকে যেন রেখে যেতে পারি, ভগবানের চরণে এই প্রার্থনাই করি।

পুত্রশোকাতুরা মায়ের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। যে দু'টী ভাই যৌবনের প্রথমেই অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহাদের কথা মনে পড়িয়া অমলের দু'চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, মা'র শীর্ণ হাতখানি লইয়া খেলা করিতে করিতে অনুযোগের স্বরে সে বলিল—তুমি কি যে বল মা, তার ঠিক নেই।

মা সজল চোখে ছেলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর কোন একসময়ে চোখ দু'টী মুছিয়া লইয়া কথার মোড় ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁরে, সুর্মাভেলি জায়গা কেমন?

সুর্মাভেলিতে অমল চাকরী লইয়াছে আজ একবছর। এই একটা বছর ওখানকার চা-বাগানে কুলি-কামিনদের মধ্যে দিনের পর দিন তাহার কেমন করিয়া কাটিয়াছে তাহারই ইতিহাস সে সুরু করিল। প্রথমে একা একা তাহার কি রকম কষ্ট হইত, তারপর কেমন করিয়া সব সহিয়া গেল। পাহাড়ের মাথায় মাথায় বনানীর শীর্ষে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের বর্ণসুষমা কেমন করিয়া তাহার দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিল, কেমন করিয়া শিখাইল তাহার সোনার জন্মভূমিকে ভালবাসিতে তাহারই কাহিনী অমল বলিয়া

অমল আর পড়িতে পারিল না। তাহার মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা আগুনের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। দু' চোখের দৃষ্টি নিষ্ঠুর কঠিন হইয়া উঠিল। হাতের কাগজখানা সে মুঠোর মধ্যে দলিয়া পিষিয়া দেয়ালের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল, তারপর তরতর করিয়া নীচে নামিয়া গেল। পথে তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু বৃষ্টির সিক্ততা অনুভব করার মত সহজ অনুভূতি তখন অমলের ছিল না। তাহার সারা দেহে তখন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা ধরিয়াছে।

বাদ্‌লা রাত। পথ অনেকক্ষণ জনবিরল হইয়া গিয়াছে। শুধু ল্যাম্প পোষ্টগুলি সজল চোখে পিচ্ ঢালা পথের পানে তাকাইয়া আছে। মাঝে মাঝে সপ্ সপে এক-একটা জলো বাতাসের ঝাপ্‌টা সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। গুম্‌গুম্ করিয়া আসন্ন দুর্য্যোগের 'সিগ্‌ন্যাল্' জানাইয়া মেঘগুলা দু'-একবার ডাকিয়াও উঠিতেছে। কিন্তু সে-সব কিছু উপেক্ষা করিয়াই অমল একরকম প্রায় ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল অজিতের বাড়ীর সাম্‌নে। এক সেকেণ্ড কি ভাবিয়া লইয়া সে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা খোলাই ছিল, সে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। এ বাড়ীতে তাহার অচেনা অজানা কিছুই নাই। চাকরটাকে পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি সে দোতলায় উঠিয়া অজিতের ঘরে গিয়া ঢুকিল: অজিত তো নাই। তাহার মা কি একখানা বই লইয়া শুইয়াছিলেন, অমলকে অমন অবস্থায় দেখিয়া তিনি ভয় পাইয়া গেলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে বাবা? অমনভাবে কেন? বাড়ীর সকলে ভাল আছে তো?

কিন্তু সে সব কথা অমল শুনিতে পাইল কি না কে জানে, সে শুধু ব্যস্তভাবে পাল্‌টা প্রশ্ন করিল—অজিত? অজিত আছে?

—না, সে যে কি একটা বিশেষ দরকারে আজ সন্ধ্যার ট্রেণে আসানসোল গেল।

—আসানসোল গেল!

অমলের মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল। কতক্ষণ বিহ্বলের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের রক্ত বোধ হয় হিম হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু সে শুধু কয়েক লহমার জন্যই। সহসা তাহার রক্তে বুঝি বন্য দানবীয় উন্মত্ততা জাগিয়া উঠিল। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার অবসর তাহার কোথা! শোভনা ও অজিতকে সে আজ খুঁজিয়া বাহির করিবেই, অনিবার্য্য নরকের মধ্য হইতে শোভনাকে টানিয়া তুলিতে হইবে যে! অমল বুঝি নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না, উদ্‌ভ্রান্তের মত আবার পথে নামিয়া আসিল। বিদ্যুতের ঝিলিকে তাহার চোখ ঝলসিয়া গেল, বজ্রের গর্জ্জনে কান ঝিম্‌ঝিম করিয়া উঠিল, কিন্তু সে সবে তাহার লক্ষ্যই নাই, সাম্‌নে পিছনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে চলিল, দ্রুত পদক্ষেপে প্রায় ছুটিয়াই চলিল। প্রতি পদক্ষেপে রাজপথের পিচ্ছিল সজলতায় তাহার পা পিছ্‌লাইতেছিল, সজল ঝড়ের ঝাপ্‌টা আসিয়া লাগিতেছিল তাহার মুখে, বিদ্যুৎদীপ্তি প্রতিফলিত হইতেছিল তাহার চোখের উপর। আর তাহার বুক দুর্দ্দম স্নেহে জ্বলিয়া যাইতেছিল, ব্যথার স্পর্দ্ধায় কাঁপিয়া উঠিতেছিল, বুকের মধ্যে জমা হইতেছিল রিক্তের নির্ম্মম অসন্তোষ, আর ঘৃণার নিষ্ঠুরতম মূক অভিশাপ!...

উন্মাদের মত সে কতক্ষণ পথে পথে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিল।

অনেকক্ষণ অবিরাম ভিজিয়া ভিজিয়া ঠাণ্ডা বাতাসে তাহার মাথাটা যখন একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন সে বুঝিল, দু'পাশের বাড়ীর কঠিন দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া বেড়াইলেও কোন লাভ নাই। তাহারা গিয়াছে—সহর ছাড়িয়া যদি নাও গিয়া থাকে, তথাপি এই দু'সারি ইষ্টক প্রাচীরের আড়াল হইতে এত রাত্রে সে তাহাদের বাহিরে আনিতে পারিবে না! এই রাত্রি কেন, এই জনারণ্যের মধ্যে সারা জীবন ধরিয়া প্রতীক্ষা করিলেও হয়তো তাহাদের সে আবিষ্কার করিতে পারিবে না!

অমল স্তব্ধ হইয়া কয়েক মিনিট সেই বৃষ্টির মাঝেই দাঁড়াইয়া রহিল। চারিদিক কাঁপাইয়া প্রচণ্ড শব্দে দূরে কোথায় যেন একটা বাজ পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সে গুম্‌রাইয়া উঠিল—এই বাজ তাদের মাথায় পড়ে না ভগবান, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয় না!...

আবার কড়কড় করিয়া কাছে কোথায় বাজ পড়িল।

আর একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, আর একটা সজল ঝড়ের ঝাপ্‌টা আসিয়া লাগিল তাহার চোখে মুখে ভিজা কাপড় জামার উপর। তাহার কেমন শীত করিয়া উঠিল। মনে হইল, মাথাটা যেন ভীষণ টিপ্‌টিপ্‌ করিতেছে। পাগলের মত মাথাটায় সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া দু'হাতে সে মাথাটা চাপিয়া ধরিল, বলিয়া উঠিল—ওঃ, শোভা যদি আমার বোন্ না হোত!

কতক্ষণ সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের অজ্ঞাতেই অমল বাড়ীর পানে ফিরিয়া চলিল।

সেই রাত হইতেই অমল জ্বরে পড়িল। তবে সে বৃষ্টিতে ভেজার জন্য সামান্য জ্বর, তেমন মারাত্মক কিছুই নয়, সুস্থ হইতে তাহার দিন তিনেকের বেশী লাগিল না।

কিন্তু মা অত সহজে এ আঘাত সহিতে পারিলেন না। চারিটী সন্তানের মধ্যে দু'টীকে বিসর্জ্জন দিয়া একটী ছেলে ও একটী মেয়েকে লইয়া জীবনের পথে ধীর মন্থরগতিতে আগাইয়া চলিয়াছিলেন, শেষে কি না তাহাদেরই একজন তাঁহাকে অমনভাবে আঘাত দিয়া গেল। ব্যক্তিগত সুখের জন্য মা ভায়ের মুখের পানে চাহিল না। মেয়ে হইয়াও মায়ের দুঃখ বুঝিল না। যাহাদের স্নেহে এতদিন ধরিয়া সে মানুষ হইল, তাহাদেরই মুখে চুণকালি মাখাইয়া দিতে তাহার এতটুকু বাধিল না! মা একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। তাঁহার বুকের ব্যথাটা আরও বাড়িয়া উঠিল। ঘন-ঘন তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবিরাম ডাক্তারের বাড়ী ছুটাছুটি করিয়া অমলের নিশ্বাস ফেলিবার অবসর রহিল না। মন তাহার মুষড়িয়া পড়িল—এই আঘাতে মাকেও বুঝি বা হারাইতে হয়! তবে ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন—দুর্ব্বলতার জন্যই অমন হইয়াছে. ভয় পাইবার কোন কারণ নাই—এইটুকুই যা' ভরসা! তবে মা আবার ওষুধ খাওয়াও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অমন উপযুক্তা শিক্ষিতা মেয়ে যে মুখে চুণকালি মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে, আত্মীয়-স্বজনদের সে মুখ তিনি আর দেখাইবেন না, তাঁহার মৃত্যুই ভাল। অমল কোনরকমেই মাকে টলাইতে পারিল না, এদিকে বুকের দুর্ব্বলতা বাড়িয়াই চলিল দিনের পর দিন।

কিন্তু দুর্ব্বল দেহে কতদিনই বা আর তাহা সহ্য হইবে, হঠাৎ একদিন শেষ রাত্রে প্রভাতী আলো ফুটিয়া উঠিবার অনেক আগেই মা'র হৃদস্পন্দন থামিয়া গেল, ঘুমন্ত বাড়ীর দ্বিতীয় প্রাণীটীও তাহা জানিতে পারিল না।

জানিল তখন, যখন ঘুম হইতে উঠিয়াই ঝি গিন্নীমার মুখের চেহারা দেখিয়াই কেমন যেন সন্দেহ করিল, গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে গিয়া দেখিল ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

খবর শুনিয়াই অমল বিছানা ছাড়িয়া ধড়মড় করিয়া ছুটিল মার কাছে। ঘরে ঢুকিয়া প্রথম দৃষ্টিতেই সে সব বুঝিতে পারিল। নিজের হাতে দু'টী সহোদরকে যে অগ্নিতে তুলিয়া দিয়াছে, মৃতদেহ চিনিয়া লইতে তাহার এতটুকু কষ্ট হইল না। মায়ের বুকের উপর সে আছড়াইয়া পড়িল।

আঘাতের উপর আঘাত পাইয়া অমল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোন রকমে মা'র কাজটা শেষ করিয়াই সে কলিকাতা ত্যাগ করিবার জন্য তৈরী হইল। কর্ম্মস্থলে তবু কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকা যাইবে, এইসব বিসদৃশ ঘটনা তবু দিনের অধিকাংশ সময় তাহার মনেই থাকিবে না। তা' ছাড়া, এখানে থাকা একেবারেই চলে না, পরিচিতদের কাছে মুখ দেখাইতে, পথে বাহির হইতে তাহার লজ্জা করে। মা তো কাহারও চিরদিন থাকে না, কিন্তু অমনভাবে কাহার শিক্ষিতা উপযুক্তা বোন্ বাহির হইয়া যায়? পিতা ও দু'টী ভাই মারা যাইবার পর ওই বোন্‌টার জন্য সে কি না করিয়াছে। তাহাকে কোলে পীঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। কলেজে পড়াইবার জন্য, সুপাত্রে বিবাহ দিবার পণ সংগ্রহের জন্য সুদূর আসামের চা বাগানে চাকরী পর্য্যন্ত লইল, না হইলে এক মানুষ বায়োস্কোপ থিয়েটার বন্ধুবান্ধবপূর্ণ এমন কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার তাহার কোন দরকারই ছিল না। বাড়ীর নীচের তলায় কয়েকখানা ঘর ভাড়া দিয়া স্বচ্ছন্দে সে আরাম করিয়া বসিয়া খাইতে পারিত। কিন্তু যাহার জন্য

এতটা ত্যাগ স্বীকারে সে করিল, সে শেষে আত্মীয়-পরিজনদের কাছে তাহার মুখ দেখাইবার পথ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল, আর অজিত ছেলেটাই বা কেমন! আশৈশবের বন্ধু হইয়া শেষে কি না সে শোভনাকে লইয়াই সরিয়া পড়িল! চমৎকার বন্ধুত্ব!—বন্ধুত্বের মুখোসে ইহারা শয়তান। একবার সাম্‌নে পাইলে সে তাহাদের দেখিয়া লইবে। দেখিবে এই কলম-পেষা হাতে আগের মত সাতশো পাউণ্ড 'ব্লো-ওয়েটের' ঘুসী চলে কি না। একবার দেখা পাইলে হয়!—

কিন্তু দেখা একদিন সত্যই পাওয়া গেল, এবং সেই দেখা পাইবার পর কি হইল, সেই কথাই বলি:

অমল সেদিন চলিয়াছিল কর্ম্মস্থলে।

ট্রেণে উঠিয়া অবধি তাহার মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, শোভনা যদি সত্যই একদিন ফিরিয়া আসে। সমস্ত বাড়ীটা তো নূতন ভাড়াটিয়াদের অধিকারে ছাড়িয়া দিয়া আসিলাম, শোভনার কথাটা একবার তাহাদের বলিয়া আসিলে হইত, ফিরিয়া আসিয়া সে একটা আশ্রয় তো পাইত। এইখানে তাহার একটা মস্ত ভুল হইয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া এখন তো আর ফিরিয়া যাওয়াও চলে না। আর ফিরিয়া গিয়াই বা ভাড়াটীয়াদের কাছে নিজের বোনের সম্পর্কে অমন কথাটা সে বলিবে কেমন করিয়া! আর কি সত্যই সে নিজের বোন্‌কে সমাজের সাম্‌নে আবার ঘরে তুলিয়া লইতে পারিবে? শোভনার তাহা হইলে কি হইবে? এই কয়টা দিনের মধ্যেই অজিতের কাছে সে হয়তো ফুরাইয়া গিয়াছে। সহসা যেদিন অজিত কাটিয়া পড়িবে, বাহিরের আলোয় শোভনার স্বপ্ন টুটিয়া যাইবে, তখন সে হয়তো ফিরিয়া আসিতে চাহিবে, কিন্তু তাহার মত অবিবাহিতা পলাতকা মেয়ে স্নেহময় গৃহের শান্ত ছায়ায় আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। তাহাকে নামিয়া যাইতে হইবে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পথের আলো ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইতে হইবে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য। জীবনের বিলাস ও আনন্দের শেষ হইয়া যাইবে। সমাজের বুকে স্বাচ্ছন্দে নিশ্বাস লইবার মত এতটুকু বাতাস সে পাইবে না। মনুর বিধান মানবেরা মানিয়া চলিবে, পক্ষপাতদর্শী মনুর বর্ব্বর বিধানকে স্বীকার করিয়া তাহারাও অর্ব্বাচীনতার চরম পরিচয় দিতে ভুলিবে না।

জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া অমল বসিয়াছিল। ঝাঁকানির পর ঝাঁকানি দিয়া নীচে লোহার চাকাগুলি অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে লোহার লাইন দু'টীর উপর দিয়া —দিগন্তেরও পিছনে। দূরে দূরে দিগ্বলয়ের কোলে মেঘগুলিকে পর্ব্বত-রেখার মত দেখাইতেছে। উহাদের বুক হইতে ঘূর্ণ্যমান বায়ু ছুটিয়া আসিয়া খেলার ছলে এই যাত্রীবহুল চলমান দৈত্যের মত ট্রেণখানিকে কক্ষচ্যুত তারার মত বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে। ওই যে সারি সারি গাছের ফাঁকে বাড়ীর পাশে মন্দিরটী মাথা উঁচু করিয়া আছে, ওইখানে বসিয়া কোন্ অজানা দেবতা এই যাত্রী-বহুল গাড়ীখানির প্রতি যাত্রীর বিধিলিপি নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন হয়তো, কে জানে! ওই দেবতারই হয়তো একটা চোখের ইসারায় তাহার জীবনের উপর দিয়া এমন একটা ঝড় বহিয়া গেল—এতো তাহাকে সহিতে হইল। জন্মজন্মান্তরে কি পাপই সে করিয়াছিল, যাহার জন্য ভগবান তাহাকে মানুষ করিয়া সৃষ্টি করিলেন। পশুপক্ষী হইয়া জন্মাইলে আজ তো তাহাকে এমন করিয়া আঘাত পাইতে হইত না!

অমলের আর ভাবিতে ভাল লাগে না, এই সব বাজে কথা ভাবিয়া মাথা গরম করিয়া তাহার কি লাভ হইবে? যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গেল!

মাথা পর্য্যন্ত রাগ্‌টা মুড়ি দিয়া সটান সে বেঞ্চের উপর হইয়া পড়িল।

শুইতে-না শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্ন দেখিল শোভনা ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সমাজ তাহাকে ক্ষমা করিবার সুযোগ দিল না। বাঙালী প্রতিবেশী ন্যায়-দর্শন-বেদান্ত ভুলিয়া যায়, কিন্তু প্রতিবেশিনীর অগৌরবের কাহিনী মনে রাখিয়া তাহারা জাতিস্মর হইতে পারে। দ্বার হইতে তাই বোন্‌টীকে ফিরিয়া যাইতে হইল। অশ্রুসজল দৃষ্টিতে বোন্‌টী আবার পথেই নামিল......

অমলের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

কোন একসময় বৃষ্টি নাবিয়াছে। জানালা দিয়া অবিরাম ছাট্ আসিয়া তাহার গায়ের রাগ্‌খানাকে ভিজাইয়া তুলিয়াছে, তাই শীত শীত করিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া সে জানালার সার্শাটা তুলিয়া দিল। চোখে পড়িল ওপাশে দু'জন যাত্রী উঠিয়াছে। এতক্ষণ কামরা মধ্যে সে একাই ছিল। যাক, ভালই হইয়াছে। উহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে মনটা একটু ভাল হইবে। অমল তাহাদের পানে ফিরিয়া বসিল।

তাহারা দু'জন। এদিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে। তরুণ তরুণী। স্বামী-স্ত্রী না হইলে ভাই-বোন্ হইবে। কিন্তু কি করিয়া আলাপ সুরু করিবে? ডাকিয়া আলাপ করিতে গেলে মেয়েটাই বা কি ভাবিবে! তার চেয়ে এদিকে উহারা মুখ না ফেরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল!

অমল ইতস্ততঃ করিতেছে, সহসা ছেলেটা এদিকে মুখ ফিরাইল। অমল চমকিয়া উঠিল। এক সেকেণ্ডে তাহার মাথার মধ্যে কি যেন একটা ঘটিয়া গেল। চীৎকার করিয়া সে গর্জ্জাইয়া উঠিল—অজিত!

খুনীর পিছন হইতে উদ্যত ছোরাশুদ্ধ হাতখানা ধরিয়া ফেলিলে সে যেমন চমকিয়া উঠে, অজিত তাহার চেয়েও বেশী চমকিয়া উঠিল। ডাক শুনিয়া শোভনাও চমকিয়া পিছন পানে তাকাইল। দু'জনেই অমলকে দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, তাহাদের পায়ের নীচে কাঠের তক্তাগুলি যেন সরিয়া যাইতেছে। কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। তখন যদি একটা খণ্ড প্রলয় হইয়া সারা পৃথিবী তাহাদের চোখের সাম্‌নে মিলাইয়া যাইত, কি সেই কামরাখানির উপর একটা বাজ পড়িয়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দিত, তাহা হইলে বুঝি তাহারা একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিত, কিন্তু তাহা তো হইবার নয়, কাজেই কয়েক সেকেণ্ডের পর অজিতকে কথা বলিতেই হইল। কিন্তু সহজে গলা দিয়া স্বর তো বাহির হইতে চায় না, অনেক চেষ্টা করিয়া কোনরকমে অজিত বলিল—যাক্, ভালই হ'ল, পথেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তোমায় কয়েকটা কথা বলবো বলে মনে করেছিলুম, কিন্তু অবসর তো পেলুম না।

অমল শুধু বাঘের মত তাহার পানে তাকাইয়া রহিল কতক্ষণ। খুন করার মত কোন উপকরণ হাতের কাছে পাইলে অজিতের বুকে স্বচ্ছন্দে সে তাহা বসাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু তাহা তো ছিল না, কাজেই শেষে সে খিচাইয়া উঠিল—চুপ্ করলে যে? আর কিছু বল্‌বে না, আর কোন কৈফিয়ৎ?

অজিত ততক্ষণে নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিয়াছে, শান্তস্বরে সে বলিল—না, কৈফিয়ৎ দেবার মত কোন অন্যায় তো আমি করি নি।

—কোন অন্যায় কর নি? এর চেয়ে বেশী অন্যায় আর কি করা যেতে পারে তাতো বুঝি না। বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা অন্যায় নয়? পুত্রশোকাতুরা মা'কে আঘাত দিয়ে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দেওয়া অন্যায় নয়? তা' হ'লে অন্যায় কা'কে বলে?

অজিত মাথা নীচু করিয়া রহিল কতক্ষণ। তারপর কথা কহিল, ধরাগলায় বলিল—দেখো, তোমার দিক্ থেকে তোমার কথাগুলো হয়তো খুবই সত্যি, কিন্তু এজন্য তুমি আমাদের দোষ দিতে পার না। একজনের কাজ পরোক্ষে আর একজনকে আঘাত করবেই। গান্ধীর কথাই ধরো—তাঁর প্রত্যেকটা কাজই তো বিদেশীকে আঘাত করার জন্য, কিন্তু সেজন্য তাঁকে তো অমহাত্মা বলা চলে না।

—গান্ধিজীর কাজের সঙ্গে তোমাদের এই হীনতার তুলনা করতে চাও! ছি—ছি—ছি!

অমলের চোখ মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। যে লোকটা নিজের ত্যাগ ও দৃঢ়তার মধ্য দিয়া একটা মুমূর্ষু জাতির বুকে সবলতা আনিয়া দিল, তাঁহার কাজের এই নূতন ভাষ্য শুনিয়া অমলের ইচ্ছা করিল অজিতের গলাটা টিপিয়া ধরে, কিন্তু যে লোকটা এই ক'দিন আগেও বুকের উপর দু' টন রোলার রাখিয়াছিল তাহার সঙ্গে এমন করিয়া হাতাহাতি করিবার সাহস তাহার হইল না। রুদ্ধ আক্রোশে সে অজিতের পানে শুধু চাহিয়াই রহিল।

অজিত কিন্তু সে দৃষ্টি ও ধিক্কারে এতটুকু দমিল না, বলিল—'এলোপ্' করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায়ই ছিল না। জাতিহিসাবে আমরা ভিন্ন, বিবাহের বিধান তো পাওয়া যেত না।

—কেন বিবাহের বিধান পাওয়া যাবে না, আর্য্য-সমাজ নেই? তা' ছাড়া, আমায় তুমি জানিয়েছিলে একবারও?

—কি করে জানাবো? জানালেই তো সব জানা-জানি হয়ে যেতো। তার উপর যে আর্য্য-সমাজের বিধান তুমি এখন বড় বলে মনে করছো, সেই আর্য্য-সমাজের কথা তখন তোমার মনেই থাকতো না। তা' ছাড়া, কোন বিধানকেই আমি বড় বলে মনে করি নে, মনের মিলটাই আমার কাছে বড় বিধান।

অমলের মাথায় আবার রক্ত চড়িয়া গেল। থরথর করিয়া সে কাঁপিতে লাগিল, কাঁপিতে কাঁপিতেই বলিল—'এলোপ্মেণ্টে' মনের মিল কি, তা' আমি বেশ জানি! বড় বড় কথা বলে ক'দিন ফর্ত্তি করে মেয়েটাকে ফেলে পালিয়ে আসতে যা' দেরী!

—আমার দিক্ থেকে তা' ঘটবে না, কেন না…

অমল বাধা দিল, বলিল—কেন না আমি তা' ঘটতে দোব না। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লেই আমি পুলিশ ডাকবো, তোমাদের এ উচ্ছৃঙ্খলতা আমি সহ্য করবো না, আমার মাকে যে আঘাত দিয়ে তোমরা মরণের মুখে এগিয়ে দিয়েছ, যে ভাবে আমার পরিচয় কলঙ্কিত করেছ, তার প্রতিশোধ আমি নোব না?

—আমায় তুমি পুলিশে দিতে চাও?

—নিশ্চয়ই! না হ'লে তুমি কি ভেবেছ, তোমার অন্যায় আমি সহ্য করবো? আমি তো আর এযুগের বুদ্ধ হয়ে জন্মাই নি!

—কিন্তু তোমার বোন্ যদি বলে যে, সে স্বেচ্ছায়…

—সে তখন দেখা যাবে—বলিয়া অমল দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী তখন ষ্টেশনে 'ইন্' করিতেছে। রাগে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। অজিত শুধু মুখের কথায় তাহার বোন্‌টীকে ভুলাইয়াছে, তা' বলিয়া ভবিষ্যতে যে তাহার বোন্ রূপোপজীবিনীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে তাহা সে সহ্য করিবে কেমন করিয়া! এখন যখন হাতের মধ্যে পাইয়াছে, এইবার ভাল করিয়া একবার শিক্ষা দিতে হইবে, না হইলে অজিতের মত বন্ধুর সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাইবে।

আর অমলের ভাবা হইল না। কামরার দরজাটা ভিতর দিকে ঠেলিয়া দিয়া বাহিরের দিকে আগাইয়া গিয়া সে ট্রেণ থামিবার অপেক্ষা করিতেছিল। সহসা একটা দম্কা হাওয়ায় দরজাটা আগাইয়া আসিয়া অতর্কিতে তাহাকে আঘাত করিল। অতর্কিত আঘাতে সাবধান হইবার পূর্ব্বেই সদ্যসিক্ত কাঠের তক্তার উপর হইতে তাহার ক্রেপ্‌সোলের জুতা পিছ্‌লাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্লাটফর্ম আর গাড়ীর ফাঁকটুকুর মধ্যে অমলের দেহ অদৃশ্য হইয়া গেল।

গাড়ী তখনও চলিতেছে—

প্লাটফর্মের লোকগুলি 'হই হই' করিয়া ছুটিয়া আসিল। গাড়ীও থামিল।

কুলিরা তখনই লাশ টানিয়া বাহির করিল। পূরা দেহটা আর নাই। বুকের উপর দিয়া একখানা চাকা চলিয়া গিয়া অমলের দেহটা দু'টুকরা করিয়া ফেলিয়াছে। সে রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডের পানে তাকাইয়া থাকিতেও পারা যায় না।

অজিত ও শোভনা গাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া সবেমাত্র দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় গার্ড আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের কামরা থেকেই ভদ্রলোক নাব্‌তে গেল না?

অজিত বলিল—হ্যাঁ।

—উনি কি একা যাচ্ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—চেনেন্ না কি? আপনাদের জানাশোনা?

শোভনা কি বলিতে যাইতেছিল, অজিত হাত দিয়া তাহাকে পিছনে ঠেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে না, ট্রেণেই একটু আলাপ হয়েছিল, নাম ঠিকানা তো কিছুই জিগেস্ করি নি!

অজিতের কথা শুনিয়া শোভনা চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় ভীড়ের ফাঁকে ভায়ের রক্তাক্ত দেহের খানিকটা তাহার চোখে পড়িল। চোখে পড়িতেই থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পাশের বেঞ্চিটার উপর তাহার মূর্চ্ছিত দেহটা লুটাইয়া পড়িল।

গার্ড তখন অমলের নাম ঠিকানার সন্ধান লইবার জন্য কামরার ভিতরে আসিয়া ঢুকিয়াছে।

ধীরেন্দ্রলাল ধর
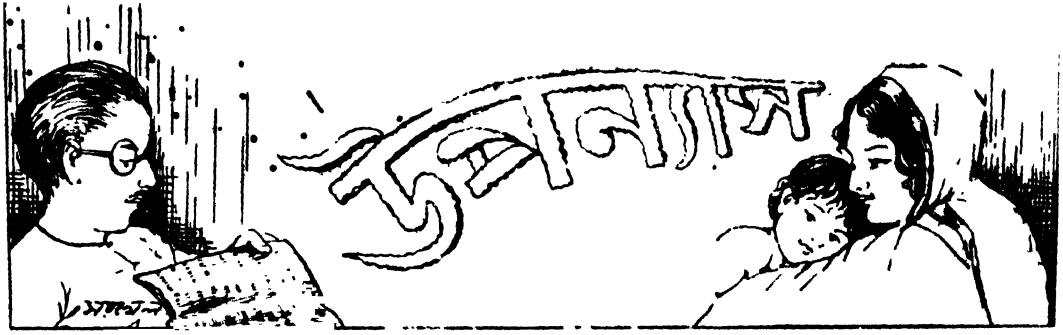
অভিশপ্তা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

সাত

পুলিশের 'ইন্‌কোয়ারী' শেষ হতেই বেলা কাবার হ'য়ে গেল।

দিনের আলো ও কোলাহল নিঃশেষিত হ'বার সঙ্গে সঙ্গে নিরানন্দ দত্ত-গৃহে ঘনিয়ে এলো বিভীষিকার করাল কালো ছায়া।

এইবার লাস চালান করা হবে। গভীর শোকে, উদ্বেগ আতঙ্কে সমস্ত বাড়ীখানা যেন থম্‌থম্ করছিল।

শিশির ভয়ানক ব্যস্ত। শোকার্ত্ত মুহ্যমান বৃদ্ধ পিতাকে সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার ওপর ঘরে বাইরের সব হাঙ্গামা পোহাতে হচ্ছে তাকেই।

তরী একবার করে কাজ করে আর কাঁদে। রেখা এজাহার দিয়ে এসে সেই যে ঘরে দোর দিয়ে শুয়েছে, আর ওঠে নি। এক ফোঁটা জলও সে মুখে দেয় নি। নির্জ্জন ঘরে একা বিছানায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রেখা ভাব্‌বার চেষ্টা করছিল—বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এই অতি আকস্মিক অভাবিত দুর্ঘটনার কথা—কিন্তু ভাব্‌তেও আর পারে না যে সে। সমস্ত চিন্তাশক্তি, সমস্ত অনুভূতি তার পক্ষাঘাত-গ্রস্থের মত অসাড় হয়ে গিয়েছে যেন।

এ কী হ'ল? কেমন করে হ'ল?

এই প্রশ্নই রেখার মূর্চ্ছাহত মনের তলে তোলপাড় করছিল কেবল। এক-একবার মনে হয়, না, কিছুই হয় নি তো। এ শুধু স্বপ্ন, ঘোরতর একটা বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন, আর কিছুই নয়! কিন্তু......ঐ যে তরী এখনো বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে না?

আবার ও কি! বলো হরি—হরিবোল!

কে বলে উঠ্‌ল—অমন করে' কে গো? কী বিকট, কী ভয়াবহ ওই চীৎকার! উঃ! শব্দটা রেখার কাণের ভেতর দিয়ে গিয়ে বুকের মধ্যে যেন আগুণ ঢেলে দিলে। অনেক চেষ্টা করেও উঠ্‌তে পার্‌লে না সে। নিঃসাড়ে পড়ে রইল মূর্চ্ছিতের মত কাণে হাত চাপা দিয়ে।

স্বপ্ন নয়, ভ্রান্তি নয়,—এ যে সত্য! জলন্ত সত্য!

কতক্ষণ পরে রুদ্ধ কপাটে করাঘাত করে শিশির ডাকলে—রেখা দি'! ও রেখা দি'!

চমক ভাঙা হয়ে রেখা টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। তার মুখের পানে তাকিয়ে শিশির শিউরে উঠ্‌ল—এ তুমি কি করচ রেখা দি'? সারাটা দিন জলস্পর্শ করলে না,—একে তো এই বিপদ, এর ওপর আবার তুমি পড়ো যদি, একলা আমি কোন্‌দিক্ সাম্‌লাব বলো তো? এক বাবাকে নিয়েই মুস্কিলে পড়েছি—

রেখার কাণে সে কথাগুলো গেল কি না সন্দেহ। সে খানিক শূন্যদৃষ্টিতে লক্ষ্যহীনভাবে চেয়ে থেকে গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলে—বাইরে ও কা'রা গেল শিশির?

শিশির একমুহূর্ত্ত অধোমুখে নির্ব্বাক্ থেকে ক্লিষ্টস্বরে বল্‌লে—ও লাস নিয়ে গেল।

—নিয়ে গেল? কোথায়?

—'পোষ্টমর্টম' করতে।

—'পোষ্টমর্টম!'

সেই সুন্দর সুকোমল অঙ্গ তীক্ষ্ণ ছুরিকায় নির্ম্মম ক্ষত-বিক্ষত দীর্ণ করে'—ওঃ! কী ভয়ানক! কী ভয়ানক! রেখার আপাদমস্তক শিউরে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে—শিশির, এ কি হ'ল ভাই!

বলে দু' হাতে মুখ ঢেকে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। এতক্ষণ এমন করে কাঁদে নি, কাঁদতে পারে নি, তার অশ্রুজলের উৎস শুকিয়ে গিয়েছিল অন্তরের তীব্রদাহে।

শিশির সরে এসে রেখার হাত ধরে সজল চোখে সমবেদনাভরে বল্‌লে—কি আর হবে দিদি?—আমাদের অদৃষ্টে যা' ছিল, তাই হ'ল! সত্যি—এমন আশ্চর্য্য যা' কোনোদিন স্বপ্নে কেউ ভাবে নি—উঃ! একেই বলে নিয়তি!

কিন্তু.........তাই কি?—মিহিরের এই শোচনীয় অপঘাত মৃত্যুর জন্য নিয়তিই কি দায়ী?

রেখা চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বাষ্প-গাঢ়কণ্ঠে বল্‌লে—শিশির!

—কি বল্‌ছ রেখা দি'?

—আচ্ছা,—এও কি সম্ভব? অতবড় জোয়ানটা ঐ এক আঘাতেই...

—নিশ্চয়! আঘাতটা তো কম লাগে নি! তারপর এমন জায়গায়—যেখানে সামান্য চোট লাগ্‌লেই মানুষের জীবন সংশয়। তবু দাখানা কবেকার মরচে-প্রড়া ভোঁতা ছিল, একেবারে আচমকা ছুঁড়ে মেরেছে বলেই দাদা বেচারা আত্মরক্ষে করবার সময়ই পান নি রেখা দি'? নইলে—সেই সময় মাথাটা একটুখানি সরিয়ে নিলেই বেঁচে যেতেন ঠিক্।

—উঃ! মাগো!

রেখা আপনাআপনি শিউরে উঠ্‌ল। তা'র বিবর্ণ শুষ্ক মুখের পানে সকরুণভাবে তাকিয়ে থেকে শিশির আস্তে আস্তে বল্‌লে—আবার জানো রেখা দি', —বিপদের ওপর বিপদ, তরীকে ওরা নিয়ে যাবে গ্রেপ্তার করে—

—অ্যাঁ!—কেন?—কেন?

রেখা চকিত ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—এই খুনের দায়ে, ওরি ওপরে সকলের সন্দেহ কি না? ইন্‌স্পেক্টার বাবাকে যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আপনার কা'কে সন্দেহ হয়? তখন বাবা স্পষ্ট তরীর কথাই বল্‌লেন, কাজেই...তরীর আর ছাড়ান-ছোড়ন নেই রেখা দি'। কাল সকালেই হয় তো ওর নামে ওয়ারেণ্ট নিয়ে—

—ওঃ—না না, সে যে বড় অন্যায় হবে শিশির! তরীর এতে কোন দোষ নেই—

—সে তুমি আমি বল্‌লে তো হবে না, প্রমাণ চাই। ঘটনা যে ওর সম্পূর্ণ বিপক্ষে। আচ্ছা, তুমিই বলো না, তরী রোজ তো ও ঘরে যায় না, যাবার দরকারও হয় না। ঘরের চাবি থাকে দাদার কাছে। দাদা খিদিরপুরে গেছেন জেনেও সেখানে গেল কি করতে? কোনো একটা মতলব ছিল নিশ্চয়ই! নইলে শুধু শুধু, অন্ধকারে জল-বৃষ্টির মধ্যে...এতে সন্দেহ হয় নাকি?

রেখা নির্ব্বাক্ হতভম্ব!

এক মুহূর্ত্ত 'গুম্' হ'য়ে থেকে সে হঠাৎ ব্যাকুল হ'য়ে বলে উঠ্‌ল—না, না, তা' হবে না? এর একটা উপায় করতে হবে ভাই।

—কিসের উপায় রেখা দি'?

—তরীকে বাঁচাবার,—ওকে বাঁচাতেই হবে চেষ্টা-চরিত্র করে।

—কে করবে চেষ্টা? বাবা তো একেবারে খড়্গহস্ত! ওঁর স্থির বিশ্বাস দাদাকে খুন করেছে তরীই—খুন করে তারপর ন্যাকা সেজে এসেছিল নিজের সাফাই গাইতে।

—ওঃ!—না না! জ্যাঠামশায় ভুল বুঝেছেন শিশির! তরী নির্দ্দোষ।

—তা' হতে পারে, কিন্তু তরীর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ

করবে 'কে বলো ?—কে ওর দিকে দাঁড়াবে ?—ওর না আছে লোকবল—না আছে অর্থ।

—কেউ-না থাক্—আমি তো আছি।

রেখার কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

বিস্মিত চমকিত হ'য়ে শিশির বলে উঠ্ল—তুমি ?—বলো কি রেখা দি' ?

—হ্যাঁ, কেউ যদি না করে—তা' হ'লে আমাকেই করতে হবে যে। জানি আমি অশক্ত, অক্ষম, তবু চেষ্টা করে যতদূর পারি—

—কিন্তু তরী যদি বাস্তবিক অপরাধী হয়—তা' হ'লে দাদার হত্যাকারীকে তুমি কি করে—

—না, কক্ষনো না ! তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করো শিশির।

শিশির চুপ্ করে রইল। মুখ দেখে মনে হয় কথাটা সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পার্ছে না।—বিশ্বাস কেমন করেই বা করে ? তরী ছোটজাতের মেয়ে, চরিত্রও নিষ্কলুষ নয়। মিহিরের সাথে তার আসক্তি শিশিরের অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং গায়ের জ্বালায় ঝোঁকের মাথায় সে যদি হঠাৎ ও রকম···

—শিশির !

শিশিরের হাত দু'খানা ধরে রেখা মিনতি-কাতরস্বরে বল্‌লে——তুমি আমার একটা কথা রাখ্‌বে ভাই ?

—কি কথা রেখা দি' ?

রেখা একটু থেমে বাধবাধভাবে বল্‌লে—সুনীত দা' এখন কোলকাতায় না ?

—হ্যাঁ, বিলেত থেকে এসে পর্যান্ত কোলকাতাতেই তো রয়েছেন তিনি।—এরি মধ্যে তাঁ'র নাম হয়ে গেছে খুব। বড় বড় মোকর্দ্দমায়—কেন রেখা দি' ? সুনীত দা'র কথা যে জিজ্ঞাসা করছ আজ ?

—আমাকে তাঁ'র কাছে একবারটী নিয়ে যেতে পারো ? শিশিরের মলিন মুখ আরো মলিন হয়ে গেল।—তার শোকার্ত্ত আহত অন্তর ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠ্ল আবার নতুন করে একটা আঘাত লেগে।

মিহিরের মত সুন্দর না হ'লেও শিশির ছেলেটী ছিল বড় সরল ও কোমল প্রকৃতি। রেখাকে সে স্নেহ করত, ভালবাস্‌ত বোন্‌টির মত। তার মনে বড় আশা ছিল, এই রেখা তাদের শূন্য ঘরের লক্ষ্মী হয়ে নিরানন্দ শ্রীহীন সংসারকে স্নেহ-মমতায় ভরিয়ে আনন্দময় করে রাখ্‌বে চিরদিন। সে আশার তো সমাপ্তি হয়ে গেল—কিন্তু রেখা যে এত শীঘ্র তাদের মায়া কাটাতে পারবে—

—রেখা দি', দাদা আজ নেই, তোমাকে ধরে রাখ্‌বার অধিকার আমরা হারিয়েছি,—তাই বলে তুমি যে এখনি চলে যাবে—আমাদের এই বিপদের সময় অসহায় অবস্থায় ছেড়ে...

শিশিরের এতক্ষণকার চেপে রাখা চোখের জল এবার ঝরে পড়ল—টপ্ টপ্ করে।

—ও কি শিশির !—তুমি আমায় ভুল বুঝো না ভাই !

রেখা মর্ম্মাহত হয়ে আর্ত্তস্বরে বলে উঠ্ল—আমি নিষ্ঠুর—মহা নিষ্ঠুর ! কিন্তু একেবারে পাষাণী তো নয় ! যতদিন তোমরা আমাকে না তাড়িয়ে দেবে···

—কি বলো রেখা দি' ? তোমাকে আমরা তাড়িয়ে দেব !

—হ্যাঁ, দেওয়াই তো উচিত। আমি তোমাদের ঘরে এসেছিলুম একটা অভিশাপ হয়ে,—আমি না এলে... না ভাই, আমাকে তোমরা তাড়িয়ে দাও, দূর করে দাও—আমি রাক্ষসী—আমি পিশাচী !

—তোমার দোষ কি রেখা দি' ? এ আমাদের অদৃষ্টে ছিল, তাই—

—তাই কি এমন হ'ল ? হ্যাঁ শিশির ? এ কি শুধু অদৃষ্টের খেলা, নিয়তির বিধান,—আর কিছু নয় ?—এ্যাঁ ?

রেখা ব্যাকুল আগ্রহে শিশিরের হাতখানা চেপে তার মুখের পানে চেয়ে রইল। পাগলের মত উদভ্রান্ত তার দৃষ্টি।

—রেখা দি' ! তুমি কি পাগল হ'লে ?

—আঃ, পাগল হ'লে তো বাঁচতুম ভাই ! তা' হ'লে এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ত না বোধ হয়।

—না রেখা দি' ! তুমি শান্ত হও, ঠাণ্ডা হও।—সারা-

দিন তো এম্‌নি গেল, এখন উঠে স্নান করে আর কিছু না হোক্ একটু সরবৎ—

—সেজন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না ভাই! বাঁচতে গেলে সবই করতে হবে। এখন আমি যা' বল্‌লুম তার কি করবে বলো—সুনীত দা'র কাছে নিয়ে যাবার? নিতান্ত দরকার বলেই বল্‌ছি। একবারটী তাঁ'র সঙ্গে দেখা করে দুটো কথা বলেই চলে আস্‌ব। পারবে নিয়ে যেতে?

শিশির একটু চিন্তা করে বল্‌লে—কেন পারব না?—তবে কোনো একটা ছুতো করে যেতে হবে রেখা দি'। বাবা জান্‌লে কিছু মনে করেন যদি।

* * * *

শিশিরের আশঙ্কাই সত্য হ'ল।

পরদিন সকালে তরী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছুটে এসে রেখার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ল—ও গো দিদিমণি, আমায় বাঁচাও গো! আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ওরা—আমাকে ছাড়বে না! এ যে আমার বিনি পাপের শাস্তি গো!

রেখার বুকের রক্ত যেন বরফের মত জমে গেল। সে অতিকষ্টে বল্‌লে—জ্যাঠামশায়কে ভাল করে বল্‌লে—

—ওনাকে আর কি বল্‌ব গো! উনিই আমাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন। বলেন—এ নচ্ছার মাগী মিটমিটে ডাইন্, পেটে পেটে বজ্জাতি এর। কিন্তু দোহাই ধর্ম্মের, দোহাই ভগবানের—আমি এ খুনের কিছুই জানি না! তবু কেউ শোনে না, আমাকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে ফাঁসী-কাঠে ঝোলাবে গো! ও গো দিদিমণি, আমার কি হ'ল গো!

তরী মাথা খুঁড়ে চুল ছিঁড়ে হাহাকার করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। বাইরে থেকে দত্ত-মশায়ের তর্জ্জন শোনা গেল—তরী, বেরিয়ে আয় বল্‌ছি।

রেখা তরীর হাত ধরে তুলে, ধীরে, অথচ দৃঢ়তার সহিত বল্‌লে—তুমি যাও তরী, কোনো ভয় নেই। আমি তোমাকে বাঁচাব।

আট

—এ কি রেখা? তুমি!

—হ্যাঁ, সুনীত দা', আমি।

রেখা সুনীতকে প্রণাম করে উঠ্‌তেই তার রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখপানে তাকিয়ে সুনীত শিউরে উঠ্‌ল।

—এ তোমার কি হয়েছে রেখা? একেবারে চেনাই যায় না...উঃ! বসে পড়ো,—হাঁপাচ্ছ যে! বাস্তবিক কি হ'ল বলো দেখি?

রেখা আর দাঁড়াতে পারছিল না—অবসন্ন শ্লথ দেহ-খানা পার্শ্বস্থ সোফায় এলিয়ে দিয়ে বেপথু ক্লান্তকণ্ঠে সে বল্‌লে—হ'তে আর কিছু বাকী নেই—তুমি শোনো নি কি?

সুনীত একটা ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলে দুঃখিতভাবে বল্‌লে—হুঁ, 'পেপারে' দেখ্‌লুম বটে। বড় দুঃখের বিষয়। খুনীও ধরা পড়েছে না কি? অল্পবয়সী একটা স্ত্রীলোক, বাড়ীর ঝি—তার এত বড় দুঃসাহস...আশ্চর্য্য!

—না সুনীত দা', ওরা ভুল করেছেন। যাকে ধরা হয়েছে, বাস্তবিক সে খুনী নয়। খামকাই সন্দেহ করে...

—তা' তো করবেই, সন্দেহের কারণ যে রয়েছে যথেষ্ট। আমি তো ব্যাপারটা জানি না সব। তবে কাগজে যে রকম লিখেছে—

—না, না, ও তুমি বিশ্বাস করো না সুনীত দা'! আমি জানি,—আমি বল্‌ছি—ও মেয়েটী নির্দ্দোষ!

রেখা উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে' পুনরায় বল্‌ল—ওকে বাঁচাতে হবে সুনীত দা'! সেই জন্যেই তো আমি আজ লজ্জা-সঙ্কোচ সব ত্যাগ করে ছুটে এসেছি তোমার কাছে। নইলে এ পোড়ামুখ নিয়ে...

সুনীত মর্ম্মাহত হয়ে বল্‌লে—ওকথা বলো না রেখা! ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও যে, তোমাকে এমন একটা অনিবার্য্য নিশ্চিত বিপদ হতে রক্ষা করেছেন তিনি। মনে করো এই দুর্ঘটনা যদি আর দুটো মাস পরে ঘট্‌ত, তা' হ'লে...

—তা' হ'লে এর চেয়ে বেশী আর কি হ'ত সুনীত দা'? যা' হবার তা' তো হয়েই গেছে! আমি তো বিধবা! আমার জীবনে যে আর...

রেখা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল অবোধ বালিকার মত।

সুনীত কি যে করবে, কেমন করে যে সান্ত্বনা দেবে তা' ভেবে না পেয়ে চুপ করে রেখার দিকে চেয়ে রইল। বছর কয়েক আগে, অভিমানিনী রেখার চোখে এতটুকু জলের আভাষ দেখলেই সুনীত তাকে আদর করে বুকে টেনে নিত অসঙ্কোচে। এই ছিল তার পরম সান্ত্বনা। কিন্তু আর সেদিন তো নেই! রেখা আর বালিকা নয়, এবং সে এখন পরের…আঃ, কথাটা মনে আনতেও যেন বুকখানা ফেটে পড়ে আজ! ও!

সুনীতের আবাল্যের স্নেহের পাত্রী, যৌবনের প্রিয়তমা, যা'র চিন্তা, যা'র স্মৃতি সুদূর সাগর পারে কত কাজ, কত প্রলোভনের মধ্যে থেকেও ভুলতে পারে নি সে মুহূর্ত্তের জন্য। যার দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা নিবিড়তর হ'য়ে তাকে শয়নে স্বপনে অহরহ ব্যথিত পীড়িত করেছে—সেই রেখা আজ সুনীতের সম্মুখে! কিন্তু কী বিপর্য্যস্ত, কী বিড়ম্বিত অবস্থায়! হায়রে নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

সুনীতের চোখের পাতা ভিজে উঠ্‌ল। ক্ষণিকের এসে-পড়া দুর্ব্বলতাটুকু সবলে ঝেড়ে ফেলে সে গাঢ়কণ্ঠে বল্‌লে—রেখা, যা' হয়ে গেছে, তার জন্যে আর আপশোষ করা বৃথা। এখন তোমার ভবিষ্যৎ যাতে ভাল হয়, জীবনটা যাতে নিরাপদে ও শান্তিতে কাটে, সেই চেষ্টাই করা উচিত মনে করি। বর্ত্তমানে তোমার অভিভাবক যারা, তাঁদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তবে আমার সাহায্যের যদি দরকার হয়—

—হ্যাঁ সুনীত দা', তোমার সাহায্য নিতেই আমি এসেছি। কিন্তু নিজের জন্যে নয়—

রেখা চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায় বল্‌লে—আমার ভাগ্যে যা' আছে তাই হবে, এখন তরীকে বাঁচাবার একটা উপায় করো তুমি। সে বেচারী বাস্তবিক নির্দ্দোষ।

সুনীত ভ্রুকুঞ্চিত করে নীরবে খানিক ভেবে বল্‌লে—কিন্তু আইনের চোখে সে দোষী, ঘটনা যে সমস্তই তা'র প্রতিকূলে। শুধু তোমার সাক্ষীতে—

রেখা চকিত হয়ে বলে উঠ্‌ল—না, তা' হয় না,—আমি ওর হ'য়ে সাক্ষী দিতে পারব না। কী বলব? কেমন করে বলব? বলতে গেলেই যে আমার…উঃ! না না,—সে আমি পারব না সুনীত দা'!

রেখা অত্যন্ত অস্থিরভাবে হাতে হাত ঘসতে লাগ্‌ল। তার চোখে মুখে শুধু ব্যথাই নয়, আতঙ্কের সুনিবিড় ছায়া।

সুনীত বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে রেখা নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে—সাক্ষী-সাবুদ ওর কেউ নেই, নিতান্ত নিরুপায় অসহায় সে,—কিন্তু ভগবান্ জানেন তরী নিরপরাধ। ওকে বাঁচাতে হবে যেমন করেই হোক্,—সেজন্য আমি তোমার সাহায্য চাই সুনীত দা'!

—আচ্ছা, চেষ্টা আমি করব, কিন্তু বেআইনী কিছু করতে তো পারব না। মিথ্যার সাহায্যে ন্যাকে নয় করা—

—তুমি যদি না পারো, তা' হ'লে আমাকেই করতে হবে, বাধ্য হয়ে। আমার জমা পুঁজি আছে—আমার সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি ওকে বাঁচাতে পারি—

কথাগুলো রেখা দৃপ্তভঙ্গীতে বল্‌লে। কিন্তু তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে অভিমানও ছিল যেন।

ছোটবেলা থেকে কোনো আবদারই তার নিষ্ফল হয় নি সুনীতের কাছে। সেই সাহসেই রেখা আজ এসেছিল সুনীত দা'র সাহায্যপ্রার্থিনী হ'য়ে।

সুনীত ক্ষুব্ধ হয়ে বল্‌লে—ভুল বুঝো না রেখা! বল্‌ছি তো চেষ্টা আমি করব আমার যতদূর সাধ্য,—কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত, এত অধৈর্য্য হ'লে তো চল্‌বে না। ওর জন্যে তোমার এত মাথা ঘামানোই বা কেন?—বাড়ীর ঝি…

—হ্যাঁ, বাড়ীর ঝি-ই তো!—কিন্তু তার প্রাণের বুঝি কোনো দাম নেই? একটা গরীব অসহায় স্ত্রীলোক বিনাদোষে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে চলেছে জেনেও আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি কেমন করে, বলো?

হায় নারী! এত দয়া তোমার মনে একজন নিষ্পর নিরাত্মীয়ের জন্য,—কিন্তু যাকে একদিন আত্মার আত্মীয় বলে স্বীকার করেছিলে, যে তোমার মুখের একটা কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তার বেলায়—শুধু তারই বেলায় তোমার স্বতঃ উচ্ছ্বসিত করুণায় উৎস শুষ্ক হয়ে যায়—

নিশেষে? তা'কে বাজের অধিক আঘাত দিতে একটুও প্রাণে বাজে নি তোমার?

সুনীতের ভাব-স্তব্ধ বাক্যহারা মুখের পানে তাকিয়ে রেখা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করলে—কি ভাব্‌ছ সুনীত দা'? তোমার কি মনে হয়? সে রকম চেষ্টা-চরিত্র করলেও তরীকে বাঁচানো যায় না কি?

সুনীত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাসস্বরে বল্‌লে—তা' এখন কি করে বলি রেখা। যেটা অনিশ্চিত, মোকর্দ্দমা কি রকম দাঁড়ায় তা' না জেনে—'কেস্'টা সহজ তো নয়, এতবড় একটা খুনের ব্যাপার যা'র মূলে—

—তাই তো!—কি হ'বে তা' হ'লে? ও হতভাগী যে বিনাদোষে···না সুনীত দা', ওকে তুমি বাঁচাও যে করেই হোক্! তোমার দু'টী পায়ে পড়ি···

রেখা নত হয়ে সুনীতের পায়ের দিকে হাত বাড়াতেই সুনীত তার উদ্যত হাত দু'খানি ধরে ফেলে বল্‌লে—কি করো রেখা! তুমি আমাকে পর করে দিয়েছ বলেই কি··· কিন্তু আমি তো তা' পারি নি আজও। তুমি আমার কাছে সেই রেখাই আছ এখনো! তোমার জন্যে আমি আমার জীবন তুচ্ছ করে···

সুনীতের গাঢ় কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো প্রবল আবেগের উচ্ছ্বাসে। রেখার হাত দু'খানি ধরে সে নীরবে নির্নিমেষে চেয়ে রইল তার সজল করুণ মুখখানির পানে। সেই পুলক মধুর স্পর্শ তাকে বিহ্বল করে তুলেছিল যেন।

রেখাও কেমন আত্মবিস্মৃতের মত। বর্ত্তমান তার মন থেকে মুছে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল আজ অতীতের একটী স্মরণীয় দিন,—যেদিন সুনীত বিদায়-প্রার্থী হয়ে তার হাত দু'টী এমনি করেই ধরে, এমনি আবেগ-কম্পিত মধুর স্বরে বলেছিল—চল্‌লুম তবে রেখা! আমাকে তুমি ভুলে যাবে না তো?

হায়, সে ভুলেই তো সে গিয়েছিল!—সেই 'ভুলেরই' না এই প্রায়শ্চিত্ত!

—রেখা!

রেখা চমকভাঙা হয়ে পলকে হাত দু'টী সরিয়ে নিলে। —তা' হ'লে আমি এখন যাই সুনীত দা'! লুকিয়ে এসেছি, জ্যাঠামশায় টের পেলে রাগ করবেন। শিশির বেচারা নিয়ে এলো তাই, নইলে আমার আসা—

—তুমি বলে পাঠালে আমি নিজেই গিয়ে দেখা করতুম।

—না, সেখানে তুমি যাবে কেন? দরকার হয়, আমিই আস্‌ব। হ্যাঁ, ভাল কথা, তরীকে জামিনে ছাড়ে না কি?

—সে চেষ্টাও আমি দেখ্‌ব রেখা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমায় কিছু করতে হবে না আর। শুধু নিজের প্রতি একটু যত্ন করো, শরীরটাকে এমনভাবে অবহেলা করো না, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

রেখা চলে গেল,—তার অশ্রু-সজল চোখ দু'টীর মিনতি-করুণ দৃষ্টি দিয়ে সুনীতের স্বপ্নাচ্ছন্ন বুকে একটা তুফানের সৃষ্টি করে।

তার ব্যথা ব্যাকুলতা, অহেতুক উত্তেজনা, উন্মনা সন্ত্রস্তভাব সুনীতকে নিরতিশয় ব্যথিত, উদ্বিগ্ন ও বিমূঢ় করে তুল্‌লে।

একদিন রেখার প্রত্যাখ্যান তার প্রাণে বড় গভীর বড় নির্ম্মমভাবে বেজেছিল, কিন্তু আজ তার চেয়েও বেশী করে বাজ্‌ল সেই ভাগ্যহতার ব্যর্থতার বেদনা।

সুনীত তখন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগ্‌ল—রেখার জড়িয়ে-পড়া জটিল জীবনটাকে মুক্ত করা যায় কি উপায়ে?

পূর্ণশশী দেবী

পাহাড়ী

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়াও যখন গৃহিণীর সঙ্কল্প টলাইতে পারা গেল না, তখন অগত্যা নটুর সহিত তাঁহাকে পাঠাইতে হইল 'রূপবাণী'তে।

গৃহিণীর একটু হাঁপানীর ধাত (অবশ্য এটা তাঁর নিজের কথা, এজন্য আমাকে কোনদিন কিন্তু ডাক্তার ডাকিতে হয় নাই)—বেশী লোকের ঘেঁসাঘেঁসি তিনি সহ্য করিতে পারেন না, সুতরাং বাধ্য হইয়াই সেকেণ্ড্ ক্লাস টিকিট কিনিতে হইল।

পাছে ছেলেমেয়েরা আবার তাঁহার সহিত যাওয়ার আবদার ধরে, এই ভয়ে তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে আমি তাহাদিগকে যাদুঘর দেখাইতে লইয়া গেলাম।

বিকালের দিকে রোদের তেজ কমিয়া আসিলে ছেলে-মেয়েদের লইয়া 'কার্জ্জন পার্কে'র কাছাকাছি বসিয়া কয়েক প্যাকেট চানাচুরের সদ্ব্যবহার করিতেছি, এমন সময় দেখি, একজন পাহাড়ী লোক (ভুটিয়া কি গাড়োয়ালী ঠিক্ বলিতে পারি না) একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর লইয়া সেই দিকে আসিতেছে। কুকুরটার সর্ব্বাঙ্গ বড় বড় কালো লোমে ঢাকা, চোখ দু'টা অতি উজ্জ্বল—হঠাৎ দেখিলে একটা ভল্লুক বলিয়াই মনে হয়। লোকটা আমাদের সামনে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল,—তাহার ও কুকুরটার জমকালো চেহারা দেখিয়া আমার ছেলেমেয়েরা বেশ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। কয়েকটা চানাচুরের দানা মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল,—কুকুরটা সাগ্রহে সেইগুলা খাইতে লাগিল এবং ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চাহিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। আরও কতকগুলি চানাচুর মাটীতে ফেলিয়া দিলাম।

লোকটা আমাকে উদ্দেশ করিয়া ভাঙা হিন্দিতে বলিল: কুত্তা লেগা বাবুসাব।

পণ্টু অমনি পাইয়া বসিল: বাবা, আমি কুকুর পুষবো, এই কুকুরটা আমায় কিনে দাও। কিরে মণ্টু, ইলা, রেখা! এই কুকুরটা কেমন, ভাল না?

বলা বাহুল্য, কুকুর কেনা সম্বন্ধে সকলের সম্মিলিত মন্তব্য প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

কুকুরওয়ালা বলিল: এ বহুৎ সুবিস্তাভি হ্যায়। শেরকা সাৎ লড়নে সেকে গা।

হাসিয়া উত্তর দিলাম: আরে বাবা, হাম কোলকাত্তা সহরমে বাস করতা হ্যায়, শেরকা সাৎ লড়বার আমার কুত্তার কোন দরকারই হবে না। তুমি বাবা তোমার কুত্তা নিয়ে ভেগে পড়। হাম নেই লেগা।

লোকটা তাহার কুকুরকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল।

পণ্টু বলিল: আমি যে সোণালী রঙের জুতো চেয়ে-ছিলাম, তা' চাই না বাবা। কুকুরটাকে তুমি কিনে দাও।

ইলা ও রেখা বলিল: এ মাসে আমরা স্কুলে টিফিন করবো না, লক্ষ্মীটি, ওই কুকুরটাকে তুমি কেনো।

সবার ছোট মণ্টু বলিল: বাবা, কুকু, বাবা, কুকু।

অর্থনীতির সমাধানে ছেলেমেয়েদের বিচক্ষণতা দেখিয়া হাসি সংবরণ করা দায় হইয়া উঠিল। কুকুরওয়ালাকে ডাকিয়া ফিরাইলাম। বলিলাম: কেৎনা লেগা, সাচ বাত বোলো।

"দশ রূপেয়া হুজুর। ইসকো মাফিক্ ঔর তিনটো পন্দেরো রূপেয়া করকে এক সাহেব লোক লিয়া। হাম ঘর চলা যায়েগা, ইসিকো ওয়াস্তে সুবিস্তামে ছোড় দেতা হ্যায়।"

ছেলেবেলায় আমিও অনেক কুকুর পুষেছি। কুকুরটাকে দেখিয়া কেমন পছন্দ হইয়া গেল। দামেও যে খুব সস্তা তা'তে সন্দেহ নেই। সুতরাং একখানা চক্চকে দশ টাকার নোট লোকটার হাতে গুঁজিয়া দিলাম। সে কুকুরটার

মাথা কয়েকবার চাপড়াইল এবং আদর করিয়া তাহার গালে চুমা দিল, তারপর ধীরে ধীরে ট্রাম লাইনের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা যায়, কুকুরটা সেই দিকে চাহিয়া রহিল—তারপর হঠাৎ কোঁ কোঁ করিয়া কাতরাইতে লাগিল। কয়েক দিন ধরিয়া কুকুরটা যে পেট পূরিয়া খাইতে পায় নাই, তাহা তাহার চেহারা দেখিয়াই বুঝিলাম। ময়দান হইতে বৌবাজারের বাসা পর্য্যন্ত তাহাকে পাঁউরুটি ও বিস্কুট খাওয়াইতে খাওয়াইতে আনিলাম। পথে ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের পার্শ্ববর্ত্তী একটা দোকান হইতে একটা বগ্‌লশ্ কিনিয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিলাম।

পথে দুই-একজন পরিচিত লোক কুকুরটার দাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমি যে সস্তায় কিস্তিমাৎ করিয়াছি তাহাও বলিলেন। আবার কেউ কেউ মন্তব্য করিলেন: ঠকেছেন মশায়, ও পাহাড়ী কুকুর, আমাদের দেশে বাঁচে না। গরমীকাল এলেই গায়ে ঘা হ'য়ে মারা যাবে।

কুকুরের মারা যাওয়ার সম্ভাবনায় ছেলেমেয়েদের এবং আমার নিজেরও মন বিমর্ষ হইয়া উঠিল। পন্টু ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল: ওরা সব ভারী জানে কি না। ওই ত বাগ্‌চীদের বাড়ী আজ দু'বছর হ'ল ওরা কতবড় পাহাড়ী কুকুর কিনে এনেছে। মরেছে বুঝি?

ইরা বলিল: বাবা, কুকুরের নাম কি রাখা হবে?

আমি বলিলাম: তুমিই বল।

"ও পাহাড়ী কুকুর, ওর নাম থাক্ 'পাহাড়ী'।"

ছেলেমেয়েরা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল: পাহাড়ী, পাহাড়ী, আয় আয়, তু তু পাহাড়ী।

পাহাড়ী লেজ নাড়িয়া এই নব নামকরণের সমর্থন করিল।

* * * *

বায়োস্কোপ হইতে গৃহে ফিরিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া গৃহিণী ত চটিয়াই আগুণ। বলিলেন: এতটুকু বুদ্ধিও যদি থাকে তোমার। কি বুদ্ধি নিয়ে যে আদালতে ঘোরো তা' বলতে পারি না। চারটে ছেলেমেয়েকে বায়োস্কোপ দেখাতে বড় জোর না হয় চারটে টাকাই খরচা হতো। তুমি তাই বাঁচাতে গিয়ে দশ টাকা খরচ করে নিয়ে এলে কি না এক কুকুর কিনে! এখন এনো রোজ তোমার সখের কুকুরের জন্যে রুটী, মাংস, বিস্কুট। ঘরদোর নোংরা করলে কিন্তু তোমাকেই সাফ্ করতে হবে তা' স্পষ্ট বলে রাখ্‌ছি। আমার ঘরের ধারে যদি ওই হতভাগা কুকুর আসে, তা' হ'লে কিন্তু লাঠিপেটা করেই আমি ওকে মেরে ফেলবো। কথায় বলে, 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে'।

গৃহিণীর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ছেলেমেয়ের দল ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলাম: ওগো, তোমাকে অত করে বলতে হবে না, ও থাক্‌বে আমার বৈঠকখানা ঘরের একপাশে—ওর যা' হেফাজত তা' আমিই পোহাবো। আমি কি না বুঝে-সুজেই একটা কুকুর এনে জুটিয়েছি। জান ত, আজকাল দিন দুপুরে কোলকাতার বাড়ী বাড়ী কী রকম চুরি ডাকাতি হচ্ছে! দুপুরবেলায় আমি থাকি আদালতে, নটু যায় কলেজে, ছেলেমেয়েরা যায় স্কুলে,—পচার মা আর মণ্টুকে নিয়ে তুমি থাকো বাড়ীতে। ও রকম একটা বাঘের মত কুকুর বাড়ীতে থাক্‌লে কত সুবিধে বল দিকিন্। ওর সাম্‌নে দিয়ে চোর বদমায়েসের সাধ্য কি যে আসে?

বুঝিলাম উকিলী চাল নেহাৎ ব্যর্থ হয় নাই। গৃহিণী কতকটা নরম হইয়া আড়নয়নে একবার পাহাড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন: বাবা! কুকুরটার যা' চেহারা, ছেলেমেয়েদেরই শেষে কোন্ দিন না কামড়ে দ্যায়।

আমি বলিলাম: ছেলেমেয়েদের সাথে এরই মধ্যে ওর ভাব হয়ে গেছে! ওদের ও কিছু বল্‌বে না। নেহাৎ যদি ওর কিছু বেচাল দেখা যায়, হগ্‌সাহেবের বাজারে নিয়ে ওকে বেচে দিলেই হবে। তা' হ'লেও দেখ্‌বে তোমার টাকা সুদ সমেত উঠে আস্‌বে।

অতঃপর আমার গৃহে পাহাড়ীর আশ্রয় মঞ্জুর হইল।

* * *

পাহাড়ী প্রায় তিনমাস কাল আমার গৃহে আছে। কয়েকখানা পুরাণো ব্যাপারের টুকরা সেলাই করিয়া ইলা

তাহার বিচিত্র শীতের জামা তৈরী করিয়া দিয়াছে। সকালে আমার ছেলেমেয়েদের সাথে সে খায় রুটী এবং গুড় আর দুপুরে তাহাদেরই পাতের পরিত্যক্ত ভাত, মাছের কাঁটা ইত্যাদি। বর্ত্তমানে ছেলেদের পড়ার ঘরের একপাশে একটা প্রকাণ্ড প্যাকিং বাক্সের মধ্যে তাহার থাকিবার জায়গা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথমটা সে আমার বসিবার ঘরের একপাশেই শুইয়া থাকিত। কিন্তু একদিন আমার এক মাড়োয়ারী মক্কেলের প্রকাণ্ড রঙিন পাগড়ী দেখিয়া সে এমনই হাঁকডাক সুরু করিয়া দিল যে, মক্কেল হাতছাড়া হইবার ভয়ে শেষটায় তাহাকেই আমার ঘরছাড়া করিতে হইল। সেদিনও গৃহিণী কথা শুনাইতে বড় কম করিলেন না: ওই হতচ্ছাড়া কুকুরের জন্য কী দুর্গতি হয় দেখো। গয়লা, ডালওয়ালা, ঘুঁটে-ওয়ালী, কয়লাওয়ালা কেউই তোমার বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে চায় না—পচার মা বুড়োমানুষ একা আর কত টানাটানি করতে পারে? এখনও সময় থাকতে ও আপদ বিদেয় কর। কাউকে যদি কোনদিন কামড়ে দ্যায়, তখন মজাটা টের পাবে।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম: তোমার যখন ওর ওপর অত বিষদৃষ্টি, তখন ওকে বিদেয় হতেই হবে। কাল একটা কমিশনের তদন্ত করতে বসিরহাট যেতে হবে। সেখান থেকে ফিরেই সামনের সোমবারে ওকে বিদেয় করবো। ফ্রেজার সাহেবের কাছেই ওকে বেচে দোব। তিনি অনেক-দিন থেকেই একটা পাহাড়ী কুকুরের সন্ধান করছেন।

* * *

দুইদিন পরে মফঃস্বল হইতে যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা। দোতলায় উঠিতে গিয়া দেখি, সিঁড়ির পাশে কলতলায় বসিয়া গৃহিণী সাবান ও ব্রাস্ লইয়া পাহাড়ীর গাত্রমার্জ্জনা করিয়া দিতেছেন। জল দিয়া ধোঁয়া উঠিতেছে, পরম আরামে পাহাড়ী তাঁহার কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া স্নানসুখ উপভোগ করিতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া প্রথমতঃ একটু হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলাম: বেশ, বেশ, একটু ভাল করেই ওকে নাইয়ে দাও। ফিটফাট না দেখালে ফ্রেজার সাহেবের হয় ত ওকে পছন্দই হবে না। গোটা পঁচিশেক টাকা যদি পাওয়া যায়, মনে করছি তোমার জন্যে একটা ভাল 'হেয়ার পিন'-ই না হয় কেনা যাবে।

গৃহিণী ঝাঁজালো সুরে উত্তর দিলেন: কে চেয়েছে তোমার কাছে 'হেয়ার পিন?' কথার ছিরি দেখো, দু' দিন পরে বাড়ী এসে এলেন কি না এখন আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে। তোমার ফ্রেজার সাহেবের পছন্দ হ'ল আর না হ'ল আমার তা'তে কি। আছে ত কত কুকুর বাজারে, পয়সা থাকে কিনুক্ গে দশ বিশটা। আমাদের পাহাড়ীকে বেচার কথা আর কখনও তুমি মুখে এনো না।

বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল। উপরের ঘরে আসিয়া জামা-কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে স্মরণ করিলাম সেই পুরাতন কথা—নারী চরিত্র দেবতারাও জানেন না, মানুষ কোন্ ছার!

স্নান সমাপন করিয়া গৃহিণী অবিলম্বে উপরে আসিলেন। মুখের প্রসন্নভাব দেখিয়া সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: পাহাড়ীর ওপর হঠাৎ তোমার অত টান হ'ল যে বড়?

মুখ ঘুরাইয়া গৃহিণী বলিলেন: যত টান সবই তোমার, কাজকর্ম্ম করে' সময় পাই না, তাই কিছু দেখতে পারি না। শুধু সখ করে' একটা জানোয়ারকে পুষলে হয় না, তার রীতিমত যত্ন করতে হয়, তা' জানো?

পাহাড়ীকে আমি কখনও অযত্ন করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। সুতরাং গৃহিণীর আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ ধরিতে পারিলাম না। কিন্তু রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন তিনি নিজে, বলিলেন: তোমার পাহাড়ী কিন্তু একটা ভারী উপকার করেছে।

ব্যস্ত হইয়া বলিলাম: বাড়ীতে চোরটোর ঢুকেছিল না কি?

—"না গো, না। ওই ডাকাতে কুকুর থাকতে চোরের সাহস কি যে বাড়ীতে ঢোকে? এসেছিলেন তোমার ক্ষারিপিসী আর তার ভাগনে। বুড়ীর পরণে ছিল লালরঙের কাপড় আর গায়ে রঙিন নামাবলী, আর তাঁর সেই গুণধর ভাগনেটী পরে এসেছিল প্রকাণ্ড এক

অলষ্টার। যাঁহাতক পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা, পাহাড়ী ছিল বুঝি পড়ার পরে বসে'—ও মা! কোত্থেকে এসে এক লাফে একেবারে বুড়ীর গা বেয়ে উঠেছে। বুড়ীর সে চিক্কির যদি শুনতে! ভাগ্‌নে ত সটান বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে' দিলে। পল্টু এসে শেষে টান্‌তে টান্‌তে পাহাড়ীকে শেকল দিয়ে বাঁধে। বাবা! বুড়ী আর তার ভাগ্‌নের ওপর ওর কী আক্রোশ! যখনই দেখে, তখনই গা বেয়ে বেয়ে উঠ্‌তে যায়। দিনের ভেতর দশবার করে' কাপড় ছেড়েও বুড়ীর নিস্তার নেই। শেষে বিরক্ত হয়ে ভাগ্‌নেকে নিয়ে তিনি ভবানীপুরে না কোথায় তার কে এক বোন্‌পো থাকে তারই বাসায় চলে গেছেন। ও ডাকাতে কুকুর বাড়ীতে থাক্‌তে তিনি আর এখানে আস্‌বেন না বলে' গেছেন।

হাসিয়া বলিলাম: সেই জন্যেই বুঝি পাহাড়ীর এত আদর বেড়ে গেছে।

"বাঃ! বাড়বে না। বুড়ী এসে কী কম জ্বালাতন করে নাকি! কোথাকার কি সম্পর্ক তার খোঁজ নেই, পিসীর দাবী নিয়ে আসেন হাড় জ্বালাতে। আজ গঙ্গাস্নান, কাল কালীঘাট, পরশু বায়োস্কোপ, তার পরদিন দক্ষিণেশ্বর, পিসীর ফর্দ্দ আর শেষ হয় না। বছরের ভেতর এমন কোন্ না পাঁচবার আছে? তাও কি একা না কি? ভাগ্‌নেটী ঠিক্ জমীদার হয়ে এসে রেপ্‌টে বসে' থাকেন। দিনের মধ্যে দশবার চা না হ'লে বাবুর চলে না। কে অত ঝক্কি সামলায় বাবু? আর না আসেন, না-ই বা এলেন। কে আর তাঁকে মাথার দিব্যি দিয়ে ডাকৃতে যাচ্ছে।"

গৃহিণী হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিলেন: মরণ আমার! শুধু বকেই চলেছি। তুমি যে ক্লান্ত হয়ে এলে, সে খেয়ালই নেই। নাও, চট্ করে' নেয়ে নাও। যাই আমি, তোমার ভাত বাড়ি গে।

কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাঁহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম: আমার গৃহিণীর মত বুদ্ধিমতী আর কার ঘরে আছে?

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
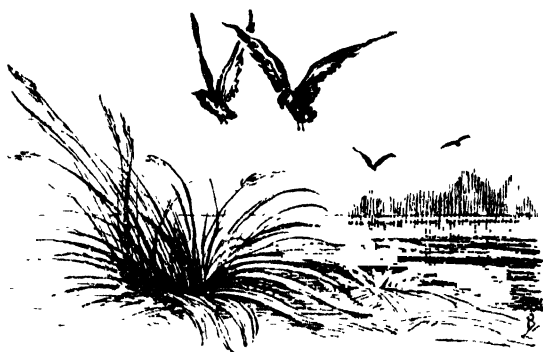
'ছায়ানট'

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

পুরীতে গেছিলাম পূজার অবকাশটা কাটিয়ে আসবার জন্য। 'স্বর্গদ্বার' ছাড়িয়ে সমুদ্রের কোল ঘেঁসে বন্ধুর এক বাড়ী ছিল, তাইতেই গিয়ে উঠা গেল। সন্ধ্যাটা যখন বেশ ঘনিয়ে আসত, সমুদ্রের তীরে নরনারীর চলাচলটা কমে যেত, তখন গিয়ে জলের ধারে বসে কোনদিন বা অনির্দ্দিষ্ট ভাবনায়, কোনদিন বা সমুদ্রের জলকল্লোল শুনে, আবার কোনদিন বা গান গেয়ে রাত প্রায় ন'টা দশটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে তারপর বাড়ী ফিরতাম। চাকর রামধানিয়া ষ্টোভে খাবার করে রাখত, তাই খেয়ে বারান্দায় পাতা ক্যাম্প খাটটায় শুয়ে পড়ে সমুদ্রের অস্ফুটবাণী শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

এই কিছুক্ষণ হলো আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছে। সমুদ্রের নীলজল চাঁদের আলোয় স্বপ্নময় হয়ে উঠেছিল। সমুদ্রের ধারে বসে আনমনে গাইছিলাম,

'বেলা গেল, গেল বেলা, গেল তোমার পথ চেয়ে—'

সহসা পিছন হতে কে যেন মধুর কণ্ঠে বলে উঠলো, বাঃ, তোমার গলাটী ত বেশ, গাও বাবা, গাও।

চেয়ে দেখি এক বৃদ্ধ। গায়ে খদ্দরের চাদর, চুলগুলি একটু এলোমেলো, আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি তাঁর দিকে চেয়ে বললাম, বসুন না।

আমি তখন একটার পর একটা অনেক গানই গাইলাম। সব শেষে ধরলাম একটা ছায়ানট। যেমন আমি গানের প্রথম লাইন শেষ করে দ্বিতীয় লাইন ধরতে যাবো, ভদ্রলোক ব্যাকুলভাবে আমার ডান হাতখানি চেপে ধরে বললেন, না বাবা, ছায়ানট নয়...অন্য কিছু!

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে থেমে গিয়ে বল্লাম, কেন? এ সুর গাইতে বারণ করছেন কেন?

ভদ্রলোক বললেন, আমি গান অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু ওই ছায়ানট শুনলেই যেন তার কথা মনে পড়ে···উঃ, কতদিন!···

ভদ্রলোক সশব্দে একটা দীর্ঘনিশ্বাস রোধ করলেন।

আমি ব্যথিত কণ্ঠে বল্লাম, আপনার বোধ হয় কোন ব্যথার স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে?

'হাঁ, ব্যথা, বুকভাঙা ব্যথাই বটে! বলে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ উদাসভাবে জলের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আনমনে চল্‌তে আরম্ভ করলেন।

ক

আমি তখন ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে পড়ি। বড়লোকের ছেলে। বাবা ছিলেন পলাশগাঁর জমিদার। আমি তাঁর একমাত্র পুত্র। গ্রামের স্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশ করে কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে এলাম। কলেজের ছেলেদের মধ্যে আমার সবার চাইতে ভাল লাগত অতুলকে। সে ছিল গরীবের ছেলে। নিজের বিদ্যার জোরে বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সীতে পড়তে এসেছিল। তার বিষণ্ণ চোখ দু'টি প্রথমদিনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ক্রমে তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। ছোটবেলা হতেই আমি খুব ভাল গান গাইতে পারতাম। কলেজে গিয়েও আমি সে চর্চ্চা ছাড়ি নি। অতুল প্রায়ই হোষ্টেলে আমার গান শুনতে আসত। আর সেই ফাঁকে আমি তার কাছ হতে পড়া বুঝে নিতাম।

কি উপলক্ষে আজ তা' মনে নেই, আমাদের কলেজ তিনদিনের জন্য বন্ধ ছিল। অতুল প্রায়ই বলত, সে গরীব, সেইজন্য তাদের বাড়ীতে আমি যাই না। ছুটী

হতেই আমি তাকে গিয়ে বল্‌লাম, চলো অতুল, তোমাদের দেশে বেড়িয়ে আসি।

সেইদিনই বিকালের গাড়ীতে অতুলদের বাড়ী মাধবপুরের পথে রওনা হওয়া গেল।

খ

আমরা যখন গিয়ে ট্রেন হতে নামলাম, তখন রাত বোধ হয় সাতটা কিংবা আটটা হবে। মেঠো পথ দিয়ে এগুতে লাগ্‌লাম। আকাশে মেটে মেটে জ্যোৎস্না ফুটেছিল। পথে যেতে যেতে তাল, খেজুর, নারিকেল প্রভৃতি অনেক প্রকারের গাছই চোখে পড়লো। ক্রমে আমরা ভাল পথ ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে এসে ঢুক্‌লাম। দু' পাশে কেবল আস্‌শেওড়ার বন; অসংখ্য জোনাকী যেন সেই ঘন গাছ গুলির উপর জরির বুটী বুনে দিয়েছে। কোথায় বোধ হয় বনযূঁই ফুটেছে, তারই উগ্রগন্ধে বাতাস যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। এত অন্ধকার যে ভাল করে পথ দেখা যায় না; কোনমতে এসেই একটা খড়োবাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়ান গেল।

দরজাটা ঠেলতেই ভেতর হতে কে যেন বল্‌লে, যাই।

দরজা খুলতেই চোখে পড়লো,একটী বছর বার-তেরোর মেয়ে আলো হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ঘন অবিন্যস্ত কেশরাশি এঁকেবেঁকে এসে তার বুক ও কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়ছে। অতুল হেসে এগিয়ে গিয়ে বললে, ওরে অনু, তোর সেই গল্পের রাজপুত্র আজ হঠাৎ পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছে, দেখ এসে।

কই দাদা, কই? বলতে বলতে মেয়েটী বালিকা-সুলভ চপলতায় যেমন এগিয়ে এসেছে, অমনি আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই সে আলোটা ফেলে ছুটে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেল।

এসো ভাই। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আমি ভেতরে গিয়ে ঢুক্‌লাম। ছোট বৈঠকখানা ঘরখানি, উপরে টিনের চাল। এককোণে একটা ছোট তক্তাপোষপাতা। তা'তে বিছান একটা কোণছেঁড়া মাদুর। তক্তাপোষটার উপর একধারে কাঠের ছোট একটা হাতে তৈরী আল্‌মারী, তার উপর দোয়াত ও কলম। ঘরের এককোণে একটা সাবল দাঁড় করান আছে।

আমি এগিয়ে গিয়ে তক্তাপোষের উপর বসে পড়লাম। অতুল আমার হাত ধরে ব্যস্তভাবে বল্‌লে, বাঃ, এখানে বসে পড়লে যে। চলো, বাড়ীর মধ্যে চলো। বলে আমায় আর কোন কিছু বলার অবকাশমাত্র না দিয়ে এক প্রকার টানতে টানতেই ভেতরে নিয়ে চল্‌ল।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখি ছোট একটা উঠান। একধারে মাচায় কুমড়া কিংবা লাউ ফলে রয়েছে। আর কোথাও কিছু নেই। চারিদিক পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। অতুল ডাকার আগেই তার মা বেরিয়ে এলেন। অল্প জোৎস্নায় তাঁর মুখের দিকে বারেক চাইতেই আমার মাথটা আপনা হতেই নুয়ে এলো। হ্যাঁ, মাতৃমূর্ত্তি বটে! একখানা সাদা থান পরিধানে। মাথায় অল্প ঘোমটা। কৃশ দেহ ও প্রশান্ত বদন তাঁর অন্তরের তপস্যার পরিচয় দিচ্ছিল। মাথার দু'-একগোছা চুল ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছিল। চোখ দু'টি তাঁর সেই রাতের জ্যোৎস্নার মতই একটা উদাস ম্লানিমায় ম্রিয়মান। যেন পূর্ণ বৈরাগ্যের একখানি সচল প্রতিমা! আমি প্রণাম করতেই তিনি তাঁর ডান হাত-খানি দিয়ে আমার চিবুক স্পর্শ করে চুম্বন করলেন। মনে হলো, আশীর্ব্বাদের সমগ্র অকথিত বাণীই যেন তাঁর মনের মধ্যে উচ্চারিত হচ্ছে।

তিনি বললেন গরীবের ঘর বাবা, খাবার তেমন সুবিধা হবে না, শুধু দুটো মোটা চালের ভাত আর ডাল।

আমি লজ্জিতভাবে বললাম, ও কথা বলছেন কেন? আমি ত আর আপনাদের এখানে ভাল খেতে আসি নি. এসেছি আমার বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে।

তবুও তোমার কষ্ট ত হবে বাবা।

তাই যদি আপনি মনে করেন, আর ঐ সামান্য কথাটাই যদি আপনার মনে অতবড় হয়ে দেখা দেয়, তবে না হয় কালই ফেরে চলে যাবো।

মিস্ এলিস্ কে

ভোরের আলো চোখে এসে লাগ্‌তেই ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি, অতুল কখন নিঃশব্দে ঘর হতে চলে গেছে। কে যেন ঘাড় নীচু হয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। মাথা তুলে দেখ্‌লাম, অতুলের বোন্ অনু। আমি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আবার চোখ বুজ্‌লাম; কেন না পাছে ও আমার সাড়া পেয়ে কাজ অসমাপ্ত রেখেই চলে যায়। ইচ্ছা হচ্ছিল একবার চোখ খুলে দেখি, কিন্তু সাহস হ'লো না।

নীরেন, ওঠ ওঠ, তুমি এখনও ঘুমুচ্ছ। বেলা যে অনেক হয়েছে।

অতুলের ডাকে চোখ মেলতেই দেখতে পেলাম ঘর ঝাঁট দেওয়া বোধ হয় সমাপ্ত হয়ে গেছে। অনু আস্তে আস্তে ঘর হতে চলে গেল। আমি বিছানায় উঠে বস্‌লাম।

সমস্ত দিনটা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা' টেরও পেলাম না। সেদিন রাত্রে যখন বেড়িয়ে এসে দাওয়ায় বসলাম, অতুল বললে, একটা গান গাও না ভাই!

আমি বললাম, না না, এখন গান থাক, তার চেয়ে সকলে মিলে গল্প করি এস, সেই ভাল লাগবে।

অতুলের মা মৃদুকণ্ঠে বললেন, না বাবা, তুমি গানই কর, তাই শোনা যাক্।

তখন আর কি করি, অগত্যা আমায় গানই গাইতে হলো। একটার পর একটা অনেক গানই গাইলাম। গান গেয়ে যখন থেমেছি, তখন হঠাৎ পাশ হতে কে যেন মধুর কণ্ঠে বল্‌লে, দাদা ওঁকে 'বাঁধ না তরীখানি' আবার গাইতে বলো না।

অতুলের মা আপত্তি করে উঠ্‌লেন, না না, থাক্, বাছা অনেক গান গেয়েছ, এখন জিরোক।

আমি মৃদু হেসে বল্‌লাম, তা'তে কি, গাচ্ছি। বলে আবার সেই গাওয়া গানটী গাইলাম।

পরের দিন বিকালে অতুলদের বাড়ী হতে চলে এলাম। আস্‌বার সময় তার মা বারবার করে বল্‌তে লাগলেন, মাঝে মাঝে অতুলের সঙ্গে এখানে এসো বাবা।

আমি ঘাড় নেড়ে বল্‌লাম, নিশ্চয়ই আসব।

পথের বাঁকে এসে দৃষ্টি ফেরাতেই চোখে পড়লো, বাইরের ঘরের থাম ধরে দাঁড়িয়ে অনু। চোখ দু'টি তার জলে ছলছল করছে। বিদায়কালীন পল্লীবালার সেই মৌন ব্যথার সাক্ষী আমি ছাড়া বোধ হয় আর একজন ছিলেন, যাঁর চোখে কিছুই গোপন থাকে না।

গ

কোলকাতায় আমার মনটা পাঁচ-ছ'দিন বড়ই উতলা রইল। একজোড়া জলভারে নত চক্ষু অহরহই আমায় উদাস ব্যাকুল করে তুল্‌ত। সেদিন কলেজের ছুটির পর হোষ্টেলে ফিরে এসে 'পইট্রি সিলেক্‌সন্'খানা খুলে বসেছি, এমন সময় অতুল এসে ঘরে প্রবেশ করল। অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা কওয়ার পর সে বল্‌লে, অনু কি লিখেছে জান?

আমি বল্‌লাম, কি?

সে লিখেছে, দাদা, তোমার রাজপুত্রটি বড় অহঙ্কারী। আমাদের এখানে রইলো, কিন্তু কই একদিনও ত আমার সঙ্গে কথা বল্‌লে না। আমার সঙ্গে একটা কথা বল্‌লে কি সে গরীব হয়ে যেত। এই রকম আরো কত কি।

একবার ইচ্ছা হলো, অতুলের কাছ হতে পত্রখানা চেয়ে নিই, কিন্তু একটা লজ্জার প্রবাহ এসে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিল। চিঠি আমার চাওয়া হলো না।

গ্রীষ্মের ছুটি হতে তখনও আর দিন পাঁচেক বাকী আছে, এমন সময় বাবার অসুখের এক 'টেলি' পেয়ে আমি পলাশপুর চলে গেলাম। দরদালানে প্রবেশ করতেই ছোট বোন্ রাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

তাকে শুধালাম, বাবা কেমন আছে রে?

সে বল্‌লে, একটু ভাল। ডাক্তার বলে গেছেন, আর কোন ভয় নেই।

দিনকতক বাবার সেবা-শুশ্রূষা করার পর তিনি অনেকটা ভাল হলেন। বাবা সম্পূর্ণ আরোগ্য হতেই আমরা সকলে দেওঘর চলে গেলাম। আমাদের সংসারে বাবা, মা, আমি ও একমাত্র বোন্ রাণী ভিন্ন আর

কেউ না থাকলেও দূর-সম্পর্কের মাসী পিসী অনেক গুলিই ছিলেন। তাঁরাই রয়ে গেলেন ঘরদোর আগ্‌লাতে। দেওঘর আর মধুপুর কাছাকাছি। শেষের দিনগুলি মধুপুরে বেশ আনন্দেই কেটে গেল। মা বাবার ইচ্ছা ছিল সমস্ত গ্রীষ্মের বন্ধটাই মধুপুরে কাটাবেন। তখনও বোধ হয় ছুটীর দিন পাঁচেক বাকী আছে, আমি মাকে গিয়ে বল্‌লাম, আমি কোল্‌কাতায় যাব, এখানে আর আমার মন টিঁক্‌ছে না, আর কলেজও ত খুলে এলো।

মা প্রথমে খুবই আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু আমার জেদ দেখে শেষটায় মত দিলেন। পরের দিন আমি কোলকাতার দিকে রওনা হলাম। জিনিস-পত্রগুলো হোষ্টেলে রেখে সেইদিনই বিকালের ট্রেনে অতুলদের গাঁয়ের দিকে রওনা হ'লাম।

অতুলদের বাড়ীতে গিয়ে যখন হাজির হ'লাম, আকাশে তখন অল্প অল্প জ্যোৎস্না ফুটেছে। বাইরে দরজায় বার দুই ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। চেয়ে দেখ্‌লাম অনু।

অতুল কই ?

দাদা বেড়াতে গেছে, এখনও ফেরে নি। আসুন, ভেতরে আসুন।

আমি তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কর্‌লাম। উঠানে নেমে সে অনুচ্চকণ্ঠে ডাক্‌লে, মা।

অতুলের মা বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে প্রণাম কর্‌তে, তিনি আমায় আশীর্ব্বাদ করে' বল্‌লেন, ভাল আছ ত বাবা ?

খানিক পরেই অতুল এলো। আমায় দেখে সোল্লাসে চীৎকার করে' বলে' উঠ্‌লো, আরে তুমি......কি সৌভাগ্য আমার! কি সৌভাগ্য আমার!

আমি হেসে বল্‌লাম, থাক্‌, থাক্‌, আর বড়াই কর্‌তে হবে না। চিঠি লিখে একটা সংবাদ পর্য্যন্ত ত নাও নি। এখন যেচে এসেছি দেখে, এত আদর!

পরের দিন দুপুরে কাঁচামিঠে আম খাওয়ার ঝোঁক হওয়ায় অতুল পাশের বাগানে তা' সংগ্রহ কর্‌তে গেছ্‌ল। আমি বাইরের ঘরে তক্তাপোষের উপর শুয়ে খোলা জানালা দিয়ে রৌদ্রদগ্ধ ধরণীর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ঘন আমগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দ্বিপ্রহরের রোদ পিছ্‌লিয়ে এসে নীচের পথটাকে আলো ছায়ায় স্নিগ্ধ করে' রেখেছিল। কোথায় কোন্ দূরের বাঁশবন হ'তে বোধ হয় একজোড়া ঘুঘু অবিশ্রান্ত ডেকে চলেছিল। পথের পাশে বাঁশের বেড়ায় একটা অপরাজিতার গাছ আপনাকে বেষ্টন করে রেখেছিল। ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে দু'-একটী বেগুণী ফুল মধ্যাহ্নের তাপদগ্ধ বায়ু হিল্লোলে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল। দূরে একটা আম গাছে বসে একটা কাক নিয়তই ডাক্‌ছিল, কা কা!

দাদা।

ফিরে চাইতেই একজোড়া চোখের সঙ্গে চোখোচোখি হ'য়ে গেল। আমি লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে বল্‌লাম, অতুল আম আন্‌তে গেছে।

চোখ ফেরাতেই আমার নজরে পড়্‌ল অনুর আঙ্গুলের ফাঁকে একখানা বই। আমি বল্‌লাম, পড়ার বিষয় বোধ হয় কিছু তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছিলে? এস না, আমিও ত বলে দিতে পারি।

প্রথমে সে একটু ইতস্ততঃ কর্‌লে, তারপর কুণ্ঠিত চরণে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। দেখ্‌লাম—শেলির একটা কবিতা।

সে আঙ্গুল দিয়ে কবিতার একটা 'ষ্টেন্‌জা' দেখিয়ে বল্‌লে, এই জায়গাটা।

আমি খুব যত্ন করেই তাকে বুঝিয়ে দিলাম। এমন সময় অতুল দশ-বারটা কাঁচা আম বোঁটাশুদ্ধ ঝুলিয়ে নিয়ে এসে ঘরে ঢুক্‌লো।

আমাকে বোঝাতে দেখে সে হেসে বল্‌লে, কিরে অনু, রাজপুত্র কথা কয়েছে?

সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসে গল্প কর্‌ছি, অনু বল্‌লে, আপনি সেই গানটা গান না?

কোন্ গান্‌টা?

সেই হারানো সুর। 'বাঁধ না তরীখানি', সেইটা।

সে রাতে গানে গানে আমাদের অনেক রাত হ'য়ে গেল।

ঘ

আই-এস্-সি পাশ করে' আমি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হ'লাম। অতুল বি-এ পড়তে লাগ্‌লো। আমি পূর্ব্বের হোষ্টেল ছেড়ে অন্য হোষ্টেলে গিয়ে উঠ্‌লাম। তখন হ'তে তার সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা হতো। একদিন সন্ধ্যাবেলা কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় হ'তে খানকতক বই কিনে ফির্‌ছি, হঠাৎ অতুলের সঙ্গে দেখা।

আরে অতুল যে, অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি, কেমন আছ ভাই ?

সে বিষণ্ণ হাসি হেসে বল্‌লে, আমাদের আর ভালমন্দ কি ভাই ? একরকম করে দিন চলে যাচ্ছে।

এ কথা সে কথার পর অতুল বল্‌লে, অনুর বিয়ে নিয়ে বড়ই চিন্তায় পড়েছি ভাই !

আমি নেহাৎ বোকার মত বল্‌লাম, কেন ?

কেন আর ! একে অনু কালো, তার রূপ নেই ! তায় আবার আমরা গরীব, আমাদের টাকাও নেই। এ যুগে বিয়ের বাজারে ও দুটোর একটাও না থাকা যে কতবড় অপরাধ, তা' ত তুমি জানই।

সে রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অতুলের কথাগুলি ভাবলাম। আহা, বেচারা বড় দুঃখী ! আচ্ছা, আমি কেন ওদের কিছু টাকা দিই না ? কিন্তু অতুল তা' নেবে কেন ? যে আত্মসম্মান জ্ঞান ওর, ও আমার টাকা কিছুতেই ছোঁবে না। কেমন করে ওদের এই বিপদে সাহায্য করা যায় ? হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা, আমি যদি অনুকে বিয়ে করি ? না না, সে অসম্ভব ! আবার মনে হলো, কেনই বা অসম্ভব ? আমার ইচ্ছা হয়েছে তাদের সাহায্য করতে, অন্য যখন কোন উপায় নেই, তখন [illegible] করে তাদের উপকার করি ? আর অনুকে বিয়ে করলে যে, তাদের উপকারই করা হবে, আর আমি শুধু উপকার করার আনন্দটুকুই উপভোগ করবো এমন ত নয়। অনু—সেই তন্বী শ্যামা, আমার প্রভাতের স্বপ্ন, সে আমার হবে, অতি আপনার হবে। অনু···অনু...অনু...অতি ধীরে ধীরে সেই রাত্রির গভীর আঁধারে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে তার নাম উচ্চারণ করতে লাগ্‌লাম। একটা গভীর আবেগের মৃদু পরশের মত নামের শব্দ দু'টি আমার নিশীথ রাতের একাকীত্বটুকু অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়ে দিলে। বহুদূরে আকাশের এককোণে শুকতারা যেন আমার দিকে চেয়ে অনুচ্চারিত স্বরে বল্‌লে, এই ঠিক, এই ঠিক্ ! রাত্রির মুখচোরা হাওয়া খোলা জানালা দিয়ে এলোমেলোভাবে যেন আমার কানে কানে এসে বলে গেল, এই ঠিক, এই ঠিক্ !···

পরের দিন কলেজের ছুটীর পরই অতুলের মেসে গিয়ে হাজির হলাম। সে আমায় দেখে বল্‌লে, এ কি নীরেন যে, কি মনে করে ?

তারপর দু'জনে পথে বেড়াতে বেড়াতে অতুলকে সব কথা খুলে বল্‌লাম। প্রথমটা সে আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইলে না। বল্‌লে, ঘুমিয়ে মানুষ স্বপ্ন দেখে এ কথা সত্য ভাই, কিন্তু জাগ্‌লে যে তার সবটুকু ফাঁকিই ধরা পড়ে যায় নীরু !

আমি বল্‌লাম, কিন্তু ভাই এ জিনিষটাকে স্বপ্নই বা ভাব্‌ছ কেন ?

সে বল্‌লে, না ভাই, এ যেন গরীবের ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখটাকা পাওয়ার স্বপ্ন।

অনেক কষ্টে তাকে বোঝালাম, আমি সত্যিই বল্‌ছি, এর মধ্যে এতটুকুও মিথ্যে নেই। সত্যিই যখন সে বুঝ্‌লে আমি মিথ্যে বল্‌ছি না, তখন তার কি আনন্দ ! অধীর আবেগে আমায় দু' হাতে আঁকড়ে ধরে সে গদগদস্বরে বল্‌লে, ভাই আজ যদি আমায় কেউ রাজসিংহাসনেও বসিয়ে দিত, তবু বোধ হয় এত আনন্দ আমার হ'ত না—যে আনন্দ আজ তুমি আমায় দিলে !···

ঙ

একদিন যখন সাঁঝের আঁধার প্রকৃতির ললাটে

দিয়েছিল কাজলের রেখা টেনে, আকাশ ভরে ছুটেছিল দখিণা বাতাস, আমি অতুলের সঙ্গে আবার বহুদিন পরে তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। তার মাকে প্রণাম করতেই, তিনি তাঁর হাত দু'টি আমার মাথায় রেখে স্নেহমাখা-স্বরে বল্লেন, বাবা, তোমায় কি বলে যে আশীর্ব্বাদ করব, তা' জানি না! কিন্তু যার বাড়া আর আশীর্ব্বাদ নেই, আমি তোমায় আজ সেই আশীর্ব্বাদই করছি, তুমি মানুষ হও! বল্‌তে বল্‌তে তাঁর কণ্ঠ যেন ভাবাবেশে বুজে এলো।

পরের দিন দুপুরবেলা অতুল আমায় বল্‌লে, তার কয়েকটা কাজ আছে, তাই সার্‌তে সে বাইরে যাচ্ছে। আমি আর কি করি, একটা বই নিয়ে বহুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর উঠে দাঁড়ালাম। যার দর্শন প্রতীক্ষায় অন্তর আমার আকুলি-বিকুলি করছিল, এখনও যে তার দেখাই পেলাম না। ভিতরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দেখ্‌লাম সে একখানা বই নিয়ে সেই দিকেই আস্‌চে। দরজার আড়ালে সরে দাঁড়ালাম। ভাব্‌লাম, একটু মজা করা যাক্।

দাদা বলে ঘরে ঢুকে কাউকে না দেখে সে চলে যাচ্ছিল, আমি পিছন হতে আঁচলটা টেনে ধর্‌লাম। চম্‌কে চাইতে চোখোচোখি হয়ে গেল। বল্‌লাম, ওগো রাজকুমারী, রাজপুত্র যে তোমার দুয়ারে।

সে আমার কথায় মাথা নীচু করলে। আমি তার হাত দু'টি ধরে মৃদু দোলা দিতে দিতে ধীরে ধীরে বল্‌লাম, কি গো, লজ্জা করছে না কি ?

সে তেমনিভাবেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, একটা কথাও বল্‌লে না। কত সাধ্যসাধনা করলাম, কিন্তু কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। এমন সময় অতুলের পায়ের সাড়া পেয়ে, মাথার যে চুলগুলি এঁকেবেঁকে তার বুকের উপর এসে পড়েছিল, তারই একটা গুচ্ছে মৃদু টান দিয়ে বল্‌লাম, আচ্ছা, আস্‌ছে দিন, দেখি মুখ ফোটে কি না ?

কোথায় বোধ হয় একটা দুষ্টু পাখী এতক্ষণ চুপ করে-ছিল, হঠাৎ আকুলভাবে ডেকে উঠ্‌লো, বৌ কথা কও!... বৌ কথা কও!...

মেডিকেল কলেজের থার্ড ইয়ারটা যেন আমার প্রমোসনের দরজায় কালো পাথরের মত দাগ কেটে বসে রইল। বারবার দুইবার অকৃতকার্য্য হয়ে বাবাকে গিয়ে বল্‌লাম, আমি বিলাত যাবো। বাবা ত রেগে 'টং' হয়ে গেলেন। তখন মাকে অহর্নিশি উদ্‌ব্যস্ত করে তুল্‌লাম। অবশেষে বাবা রাজী হলেন। 'পাসপোর্ট'ও যোগাড় হলো। দিন পনের বাদে আমার জাহাজ ছাড়বে।

এই ঘটনার মাসখানেক আগে অতুলের বোন্‌কে বিয়ে করেছিলাম। সব ঠিক্‌ঠাক্ হতে একদিন তাদের গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম। সেদিনই অতুল ও তার মার কাছে আমার বিলাত যাবার কথা সব বল্‌লাম। আমার শাশুড়ী শুনে বল্‌লেন, কেন বাবা, এখানেও ত হতে পারত ?

আমি হেসে বললাম, তা' হয় ত পারত, কিন্তু হওয়ার ত আপাততঃ কোন লক্ষণই চোখে পড়ছে না। অগত্যা—

বিবাহের পরে আমার অনুর সঙ্গে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। কেন না, এতদিন বিলাত যাওয়ার ব্যাপারে আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে, ওখানে যাবার মোটেই সময় করে উঠ্‌তে পারি নি। অনু ঘরে আসতেই আমি হেসে বল্‌লাম, ও গো রাজকুমারী, কথা ত আজ পর্য্যন্ত একটাও বল্‌লে না। আমিই চলে যাচ্ছি, কবে ফিরি তার ত ঠিক নেই— আর মোটেই ফিরি কি না তাই বা কে জানে!

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, তুমি কবে যাচ্ছ ?

আর দশদিন পরে।

এর মধ্যে তুমি আর এখানে আসবে না ?

কি করে আর আসি বলো, এ ত আর কোলকাতা নয়। সাত সমুদ্র তের নদীর পার।

কবে ফিরবে ?

চার বছর পরে।

উঃ, এতদিন !

কেন, তোমার কি আমার জন্য খুব কষ্ট হবে অনু ?

সে সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্লে, আচ্ছা, আরো শীগ্‌গির ফেরা যায় না।

কোথায় কোন্ বাঙলাদেশের একটি মেয়ে তার স্বামীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে বলেই ত আর সেখানকার প্রফেসাররা ডিগ্রীগুলো আমার পকেটে দিয়ে বল্‌বেন না, ও হে, তুমি তোমার অনুর কাছে যাও।

এতদিন কি আমি এখনেই থাক্‌ব ?

সেই ব্যবস্থা করতেই ত আমার আসা। আমার বাবা, যদিও তাঁর সিন্ধুকভরা টাকা, তবুও তোমায় বিয়ে করেছি বলে আমায় তিনি কখনই ক্ষমা করবেন না। আজ যদি আমি তোমায় নিয়ে গিয়ে সেখানে উঠি, তা' হ'লে বাবা আমায় বাড়ী থেকে বের করে দেবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বিলাত যাওয়ারও ইতি। তাই যাওয়ার আগে আমি তাঁর ও মার নামে ছু'খানা পত্র দেব। আর তোমার দাদার হাতেও একখানা চিঠি দিয়ে যাবো। আমার যাওয়ার পর তোমার দাদা তোমায় নিয়ে আমাদের বাড়ীতে রেখে আস্‌বেন। আমার ছোট বোন্ রাণী সে সবই জানে। সে তোমার সঙ্গী হবে।

চ

অনুর সম্বন্ধে সব ঠিক্‌ঠাক্ করে আমি একদিন জাহাজে চেপে বসলাম। রাণীর চিঠিতে জেনেছিলাম, বাবা অনুকে আমাদের গৃহে স্থান দিয়েছেন। ব্যাস্, ওই পর্য্যন্ত, আর কিছুই জানি না। আমি প্রথমে অনুকে ছু'-একখানা চিঠি লিখেছিলাম, সেও তার উত্তর দিয়েছিল। কিন্তু তারপর দশ-বারখানা পর পর লিখ্‌লে হয় ত একখানার জবাব দিত। শেষকালে আমি ত অভিমান করে চিঠি লেখা একদম বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

প্রায় সাত বছর পরে যখন দেশে ফিরলাম, তখন সবার আগে যার কথা আমার মনে পড়েছিল, সে অনু। বাঙলার শ্যামলিমার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত যেন আমার অনু। গ্রামের পথে নেমে অপরাজিতার ফুলগুলিকে বাতাসে দুলতে দেখে মনে হলো, এর মাঝে যেন আমার অনুর আদল আছে। আচ্ছা, এতদিনে সে কতবড়টী হয়েছে ? হয় ত আরো কৃশ, আরো সুন্দর হয়েছে। হয় ত আমার অদর্শনে তার সারা অবয়বে ফুটে উঠেছে এক পূর্ণ বৈরাগ্যের অমিয়ধারা। পথে যেতে যেতে বারবার তার নামটী উচ্চারণ কর্‌তে লাগ্‌লাম। আমি সংবাদ না দিয়েই বাড়ী এসেছিলাম। বাইরের ঘরে ঢুক্‌তেই বাবার সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করলেন। বহুদিবসের পর প্রবাস-প্রত্যাগত পুত্রের আগমনীতে সারা বাড়ীখানায় যেন একটা বিমল আনন্দ-স্রোত বইতে লাগলো। কিন্তু কই, যার দর্শনের জন্য আমার মন প্রাণ এত ব্যাকুল হয়েছিল, সে কই ?...

দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরখানিতে গিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, আসুক সে একবার, তাকে এমন সাজা দেব...এখনও যেমন লুকিয়ে আছে, তার মজাটী টের পাবে।...

পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখি ছোট বোন্ রাণী ঘরে ঢুক্‌ছে।

এখনও তোদের খাওয়া-দাওয়া হয় নি রে ?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তার স্বর কেমন গম্ভীর, চোখ ছু'টি যেন অকারণেই ছল্‌ছলিয়ে এল। পরিষ্কারই বুঝা গেল, সে এমন কিছু বল্‌তে চায় যা' মোটেই শুভ নয়। বল্‌লাম, কি রে রাণী, বল্‌বি কিছু ?

দাদা বলেই তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগ্‌লো। আমি ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লাম, কি, কি হয়েছে ?

দাদা, বৌদি' নেই !...সে গত আশ্বিন মাসে... !

মনে হলো যেন পৃথিবী দুল্‌ছে। আমার মাথার ভেতর যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো।..নিঃশ্বাস যেন আর নিতে পারছি না, কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে। ...বহুক্ষণ পরে সে যা' বল্‌লে তার মর্ম্ম এই—

তুমি চলে গেলে, একদিন বিকালে বৌ তার

দাদার হাত ধরে এসে আমাদের বাড়ীতে উঠ্‌লো। বাবা তোমার চিঠি পাওয়া অবধিই রেগে ছিলেন, তিনি বৌয়ের আসার সংবাদ পেয়ে বাড়ীতে এসে মাকে বল্‌লেন, কোথাকার এক মুচীর মেয়ে, এখুনি ঘাড় ধরে বের করে দাও। খবরদার আমার বাড়ীতে যেন ওদের স্থান না হয়। মা বাবাকে ধীরকণ্ঠে বল্‌লেন, ছেলে যখন বিয়ে করে এনেছে, তখন তাকে দূর করে দিতে পারবে না, তা'তে তোমাকেই লোকে নিন্দা করবে। চিত হয়ে থুতু ফেল্‌লে যে তোমার মুখেই এসে পড়বে। বাবা সেখান থেকে গোঁ গোঁ করতে করতে চলে গেলেন, আমি গিয়ে পাল্কী হ'তে বৌকে নামালাম। কিন্তু বৌয়ের রং দেখে মার মুখটাও ভারী হয়ে গেল। বাবা বল্‌লেন, সে মূর্খ যখন না জেনে এই আপদ এনেছে, তখন একটা বৌভাত করতে হবে বৈকি। বৌভাত হয়ে গেল, কিন্তু বাড়ী শুদ্ধ সকলেই বৌয়ের উপর চটে রইল।

বৌদি' বড় লক্ষ্মী ছিল। এত অবহেলা, এত অযত্ন, কিন্তু কোনদিন মুখ ফুটে একটী কথাও বল্‌তে শুনি নি। সে চুপ করে তোমার এই ঘরেই সারাদিন কাটিয়ে দিতো। কিন্তু মুখে পাতলা একটুক্‌রো হাসি সব সময় লেগেই থাক্‌ত। কিন্তু আমার ত এখানে চিরকাল থাক্‌লে চল্‌বে না, তাই যাওয়ার দিন তার হাত ধরে বল্‌লাম, বৌদি', যাই ভাই, দাদা ফিরে এলে...

সে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, জানি ভাই ঠাকুরঝি, তোমায় তা' বল্‌তে হবে না।...

প্রায় বছরখানেক বাদে যখন এখানে আবার ফিরে এলাম, তখন যেন তাকে দেখে আর চেনাই যায় না। আমি তার হাত ধরে বল্‌লাম, একি হয়েছিস্ ভাই বৌদি'! তুই ভাল করে' খাস্ না না কি?

সত্যই তার চেহারা এত বেশী পরিবর্ত্তন হয়েছিল যে, প্রথমটা তাকে দেখে চেনাই যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, এ যেন সেই উমা, মহাদেবের জন্য কোন্ পর্ব্বতগুহায় এতদিন তপস্যায় মগ্ন ছিল, আর আজও যেন তার চেতনা হয় নি। মাথায় যে কতদিন তেল দেয় নি তার ঠিক নেই; রুক্ষ মলিন চুলগুলি সারাটা পিঠ ব্যেপে এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। মুখখানি আরো রুগ্ন আরো লম্বা হয়ে গেছ্‌ল। হাতে মাত্র দু'গাছি শাঁখা। মার দেওয়া সব গহনা সে খুলে ফেলেছিল। বল্‌লাম, গয়নাগুলো খুলে ফেলেছিস্, বেশ ভাই।

মলিন হেসে সে বল্‌লে, মিথ্যে আড়ম্বরে কি হবে দিদি? এই আমার ভাল। বলে সে শাঁখাপরা হাত দু'টি ঘুরিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

চাঁদের আলোয় ছাতে শুয়েছিলাম তার কোলে মাথা রেখে। কথায় কথায় বল্‌লাম, দাদা কি তোকে আর চিঠি দেয় না বৌদি'?

সে হেসে বল্‌লে, হ্যাঁ দেয়। কিন্তু—

কিন্তু কি ভাই?

বাবার উত্তর দেওয়া বারণ। তিনি বলেছেন, অযথা পয়সা নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই।

একদিন আমায় বল্‌লে, দেখ্ ঠাকুরঝি, তুই গান গাইতে পারিস?

আমি বল্‌লাম, পারি একটু একটু।

একটা 'ছায়ানট' সুর গা না ভাই।

তার কাছ হতে আমি 'বাঁধ না তরীখানি' গানটা শিখেছিলাম। সেইটাই গাইলাম। দেখ্‌লাম, সে গান শুন্‌তে বড় ভালবাসে।

যাওয়ার দিন মাকে বল্‌লাম, মা, বৌদি'কে একটু দেখো, ও বড় দুঃখী! তোমরা না দেখ্‌লে কে আর দেখ্‌বে?

মা বল্‌লেন, ও কারও কথা শোনে না—আমি কি করব!...

যাবার সময় বৌদি'র হাত দু'টি ধরে বল্‌লাম, শরীরের প্রতি একটু নজর দিস্ ভাই। দাদা ফিরে এলে তোকে যদি না পায়, তবে তাঁর আর দুঃখের অন্ত থাক্‌বে না!...

সে আমার কথায় শুধু একটু হাস্‌লে। তার চোখের কোণ দুটি ছল্‌ছলিয়ে এল।

ছ

তারপর অনেকদিন পরে হঠাৎ মায়ের একটা চিঠিতে সংবাদ পেলাম, বৌয়ের খুব অসুখ,সে আমায় দেখ্‌তে চায়।

সেইদিনই ঠাকুরপোকে নিয়ে এখানে চলে এলাম। এসে দেখি এই খাটে সে শুয়ে আছে। শরীরে আর কিছু নেই, শুধু ক'খানি হাড়! কেঁদে ফেলে বল্লাম, ওরে পোড়ামুখী, এ কি করেছিস্! এমনি করে নিজেকে মেরেছিস্!...

মলিন হেসে সে বল্লে, এবার বিলাত হতে পাশ-করা দাদার বিয়ে দিয়ে অনেক টাকা আন্‌বি। দেখিস্, বেশ সুন্দর দেখে বৌ আনিস্।...বল্‌তে বল্‌তে চোখের কোণ ছু'টি তার ভিজে এলো।

মা বল্লেন, কি করব, ওষুধ ও কিছুতেই খেতে চায় না।

বিকালে বল্লাম, ওষুধ খাস্ না কেন?

ও খেয়ে আর কি হবে ভাই! আমার যাবার দিন এগিয়ে এসেছে। এখন আর পিছন হতে আমায় দড়ি দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করিস্ নে। আমার চোখে জল দেখে, সে আমার হাতের উপর তার রোগতপ্ত একখানি হাত রেখে মৃদুস্বরে বল্লে, জীবনে সুখের মুখ দেখেছিলাম ভাই, কিন্তু মরীচিকার মত তা' আমার জীবনের প্রাতঃ-কালেই মিলিয়ে গেছে। আজ যাবার বেলায় তাঁর... বল্‌তে বল্‌তে সে থেমে গেল।

আমি বল্লাম, কি ভাই!

সে মাথা নেড়ে বল্লে, কিছু না।

আমি উঠে জানালাটা খুলে দিলাম। শুক্লা দশমীর চাঁদের আলো তার গায়ে মাথায় এসে লুটিয়ে পড়লো। দূরে কোথায় বিসর্জ্জনের বাজনা বাজছিল। বাগানের চামেলী ঝাড়টায় অনেক ফুল ফুটেছিল; তারই গন্ধ বাতাসে ভেসে এসে তার মৃত্যু-শয্যার আশেপাশে ঘুরতে লাগ্‌লো। সে ক্ষীণকণ্ঠে বল্লে, সেই গানটা গা না ভাই।

আমি ধীরে ধীরে সেই 'ছায়ানট' সুরের গানটা গাইলাম।

অনেকক্ষণ পরে সে বল্লে, সে আমায় এসে না দেখ্‌লে বড় কষ্ট পাবে তা' জানি। কিন্তু তাকে বলিস্ ভাই, সে যেন আবার বিয়ে করে। অভাগিনী অমুর কথা যেন সে ভুলে যায়। আজ কয়েকমাস সে আমায় একখানা চিঠিও দেয় নি, বোধ হয় অভিমান করেছে!...আর দেখ, আমার মৃত্যু-সংবাদ তাকে দিস্ না...বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো।

কথাগুলো বলে' বৃদ্ধ একটু থাম্‌লেন। তারপর আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন, সেইদিন রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল যেন কার করুণ কান্নার শব্দে। চেয়ে দেখি, আমারই অদূরে মেঝের উপর কে যেন ফুলে ফুলে কাঁদছে। এক মাথা চুল তার মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মনে হলো, করুণ কান্নার বিলাপধ্বনিতে যেন ঘরখানি ভরে উঠেছে। ও গো, ফিরে এস, ফিরে এস!...আমি যে আর পারি না গো!...

মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, অমু, অমু, এই যে এসেছি আমি।

কিন্তু, কোথায় কে! এক ঝলক ঠাণ্ডা এলোমেলো হাওয়া ঘরের ভিতর এসে আবার বাইরে বেরিয়ে গেল। দূরে একটা নিশাচর পাখী ডাক্‌তে ডাক্‌তে উড়ে চলে' গেল। সেই রাত্রেই আমি বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু আজও বোধ হয় তার কাছে যাবার সময় আমার হয় নি—নইলে এত ডাক্‌ছি, কই, সে ত তার কাছে আমায় ডেকে নিচ্ছে না!...জানি না, কতদিনে তার এ অভিমান ভাঙবে?...

যখন জ্ঞান হলো, চেয়ে দেখি, সেখানে কেউ নেই। শুধু কয়েকটী পায়ের চিহ্ন বালুবেলার উপর পড়ে আছে। আর আকাশের চাঁদ ঢুলতে ঢুলতে অনেকটা ঢলে পড়েছে। সমুদ্র আপন-মনে বয়ে চলেছে। ঢেউগুলি চাঁদের আলোয় এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠ্‌ছে।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ঘরোয়া কথা

শ্রীমতী দুর্গা দেবী

"দেখো, তোমার সেই বন্ধুর বাড়ী থেকে একজন এসেছিল কি একখানা বই চাইতে। আমি তাকে ভাগিয়ে দিয়েছি। বলে দিয়েছি, তুমি বাড়ী নেই। যাক্, এখন তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। দেখ পিট্রোভিচ্, তোমার সিরোজাকে একটু শাসন করা দরকার হয়েছে। কেবল একদিন নয়,—পরশু দেখেছি, আবার আজও দেখলাম, সে চুরুট খেতে ধরেছে; আমি একটু ধমকাতে গেলাম, তা' সে গ্রাহ্যই করলে না। দুই কাণে আঙুল দিয়ে এমন চীৎকার সুরু করে দিলে যে, আমার কথা কোথায় তলিয়ে গেল।"

পিট্রোভিচ্ বিকোভস্কি সহরের নামজাদা সরকারী উকিল। এইমাত্র আদালত থেকে ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকে হাতের দস্তানা খুল্‌ছেন। বৃদ্ধা ধাত্রীর কথা শুনে তার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। "সিরোজা চুরুট খেয়েছে!" ···ব'লেই ঘাড় বাঁকিয়ে একটা কৌতুকের ভঙ্গী করলেন।

"ঐ টুকুন্ ছেলের মুখে আবার চুরুট! ক'বছর বয়স হোলো তার?"

"সাত বছর। তুমি হয়তো এতে কিছু দোষের না মনে করতে পারো, কিন্তু এই বয়স থেকে চুরুট খেতে শেখা ভয়ানক খারাপ। গোড়া থেকেই এ অভ্যাস ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত তা' ব'লে দিচ্ছি।"

"নিশ্চয়। কিন্তু ও চুরুট পায় কোথা?"

"তোমার টেবিল থেকে।"

"তাই নাকি? আচ্ছা, আমার কাছে তাকে একবার পাঠিয়ে দাও তো।"

ধাত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বিকোভস্কি তাঁর টেবিলের পাশে আরামকেদারায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজে চিন্তা করতে লাগ্‌লেন। কল্পনার চোখে দেখতে পেলেন যেন একগজ লম্বা এক মস্ত চুরুট মুখে দিয়ে সিরোজা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই ছবিটা মনে হতেই তাঁর মুখ হাসিতে ভরে গেল। সেই সঙ্গে ধাত্রীর চিন্তান্বিত গম্ভীর মুখখানার কথা ভেবে তাঁর বহুদিন আগেকার অর্দ্ধবিস্মৃত অনেক কথা মনে পড়ে গেল; তখনকার দিনে স্কুলের ছেলে চুরুট খেয়েছে শুন্‌লে তার বাপ মা আর তার মাষ্টাররা যেন একেবারে আতঙ্কে শিউরে উঠতো। যে রকম ভাবটা দেখা যেতো তা'কে আতঙ্ক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সেই সব ছেলেদের ধ'রে বেত মারা হোতো কিংবা স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোতো; বেচারীদের জীবন একেবারে দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠতো; অথচ এতে কি যে এমন গুরুতর অপরাধ হয় আর কেন যে তা এত মহাপাপ ব'লে মনে করা হয় সে কথা জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌লে সেই অভিভাবকদের দলের মধ্যে কেউ বোধ হয় তার কোনো পরিষ্কার জবাব দিতে পারতো না।

অনেক বুদ্ধিমান বিবেচক লোকও তখন ধূমপানের ভীষণ বিরোধী ছিল,—অথচ কেন যে, তা' নিজেই তারা জানতো না।

প্রিটোভিচের মনে পড়ে গেল তাঁদের স্কুলের বৃদ্ধ হেড-মাষ্টারের কথা। তিনি খুব জ্ঞানী লোক আর সেই সঙ্গে নিতান্ত ভাল মানুষ ছিলেন, কিন্তু কোনো ছেলে যদি চুরুট খেয়েছে দেখতে পেতেন তো আতঙ্কে তাঁর মুখখানা শাদা হয়ে যেতো। তখনই সব মাষ্টারদের তলব করে এনে এক সভা বসে যেতো, বিচার করে আসামীটিকে তখনই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোতো।

সংসার এমনি নিয়মেই চলে! অন্যায়টা যতই দুর্ব্বোধ্য বলে মনে হয়, প্রতিকারটা তার বিরুদ্ধে যেন ততই প্রবল হয়ে ওঠে!

ছেলেবেলার দু'-তিনটি ধরাপড়া অপরাধীর ঘটনা মনে করে প্রিটোভিচ্ এইটুকু বুঝে দেখলেন যে, ধূমপানে তাদের

য়ত না অনিষ্ট হোতো, তার চেয়ে ঢের বেশী অনিষ্ট করা হয়েছিল তাদের শান্তি দেওয়াতে। জীবের স্বভাবই এমনি যে, সে যখন যে অবস্থায় এসে পড়ে তখনই তার সঙ্গে মানিয়ে নিজেকে খাপ্ খাইয়ে নিতে পারে;— তা যদি না হোতো তা হ'লে প্রতি পদে পদে মানুষ ঠেকে খেতো আর জানতে পারতো যে, ভাল মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে যে পথ ধরে সে চলেছে সেইটাই যে প্রকৃষ্ট ও ন্যায়পথ এমন কোনো স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ তার নেই। আসল সত্য যে কি, তার কতটুকু সন্ধানই বা পাওয়া যায় বিজ্ঞান বা আইন-জ্ঞান বা সাহিত্য-চর্চ্চায়···

সারাদিনের খাটুনির পর বিশ্রাম নিতে বসলে পরিশ্রান্ত মস্তিষ্কের মধ্যে এলোমেলো ভাবনা যেমন ক'রে ভেসে বেড়ায়, তেমনি ক'রে এই সকল কথা তাঁর মাথার মধ্যে একে একে উদয় হতে লাগলো। অসংলগ্নভাবে একটার পর একটা চিন্তা এসে কেবল ভিড় জমাতে লাগলো, কিন্তু তার সবগুলোই ভাসা ভাসা, কোনোটাই জড় নিয়ে প্রবেশ করে না।

সমস্ত দিনটা আইনের কথা নিয়ে যাঁকে মাথা ঘামাতে হয়, আর একই রকমের কাজে যাঁর মন সর্ব্বদা নিযুক্ত হয়ে থাকে, তাঁর মনে এক একবার ঘরোয়া সুখদুঃখের এমনি সব তুচ্ছ অবসররঙ্গিনী চিন্তা জেগে উঠলে কিছুক্ষণের জন্য তিনি একটা নূতন রকমের তৃপ্তি অনুভব করেন।

তখন সন্ধ্যা ন'টা। তিনতলার ফ্ল্যাটে মাথার উপরকার ঘরে কে একজন দ্রুত পায়চারী করে বেড়াচ্ছে এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক,—আর তারও উপরের চারতলার ঘর থেকে পিয়োনোর সঙ্গে গলা মিলিয়ে দু'জন লোক একত্রে গান করছে শোনা যাচ্ছে। যে লোকটি পায়চারী করে বেড়াচ্ছে তার পায়ের শব্দ শুনে অনুমান হয় লোকটি দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ, কিংবা হয়তো দাঁত কন্‌কনানির যন্ত্রনায় কাতর হয়ে ঘরের মধ্যে টহল্ দিচ্ছে। আর চারতলা থেকে একটানা সুর সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার মধ্যে এমন এক তন্দ্রার আবেশ এনে দিচ্ছে যাতে অলস চিন্তাগুলি ছাড়া পেয়ে আপনিই ভেসে ওঠে।

পাশের ঘরে সিরোজা ও ধাত্রীতে আলাপ হচ্ছিল। ছেলেটি সুর করে চেঁচিয়ে উঠলো—"বাবা এসেছে নাকি? বাবা এসেছে! বাবা! বাবা!"

"বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন,—যাও এখনি।" আর কথাটা গ্রাহ্য হচ্ছে না দেখে ধাত্রী সরু গলায় ভয় দেখিয়ে বল্‌লে—"শুনছো না?"

এদিকে পিট্রোভিচ্ মনে মনে ভাবছিলেন—"কি ওকে বলা যায়?" কিন্তু কিছু স্থির করার আগেই তাঁর সাত বছরের ছেলে সিরোজা এসে হাজির। কেবল তার পোষাক থেকেই ধরতে পারা যায় এটি মেয়ে নয়, ছেলে। অতি কোমল, গৌরবর্ণ, ক্ষীণ, ভঙ্গুর চেহারা। যেন সযত্ন-রক্ষিত একটি দুষ্প্রাপ্য বিদেশী ফুল, অতিশয় নরম, সাবধানে স্পর্শযোগ্য; তার চোখের দৃষ্টি, হাবভাব, কোঁক্‌ড়া চুলগুলি, এমন কি, ভেলভেটের কোটটি পর্য্যন্ত দেখে এই কথাই মনে হয়। বাবার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে আদরের সুরে ছেলেটি বল্‌লে—"কি বাবা, আমায় ডাকছিলে কেন?"

"রোসো রোসো সিরোজা"—গলা থেকে ছেলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিট্রোভিচ্ বল্‌লেন—"আদর করবার আগে তোমার সঙ্গে আমার একটা ভয়ানক জরুরী কথা আছে। দেখো, আমি তোমার ওপর ভারী রাগ করেছি, আর তোমাকে একটুও ভালবাসি না। জেনে রাখ যে, আমি তোমাকে আর কিছুতে ভালবাসবো না,—তুমি আর আমার ছেলে নও—বুঝলে......"

সিরোজা বাপের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে তারপর টেবিলের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। বিস্ময়ে হতভম্বের মত হয়ে ভ্রূ কুঁচ্‌কে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন, আমি তোমার কি করেছি? আমি তো আজ একবারও তোমার ঘরে ঢুকি নি, তোমার কোনো জিনিষে হাতও দিই নি!"

"নাটালি ধাত্রী এইমাত্র আমাকে বলে গেল যে, তুমি নাকি চুরুট খাও! সে কি সত্য কথা? তুমি চুরুট খেয়েছ?"

—"হাঁ, সত্যি বটে। আমি তো একবার মাত্র খেয়েছি।"

—"না না, মিথ্যা কথা।" সরকারী উকিল পিট্রোভিচ্ হাসি গোপন করবার জন্য চোখটা কুঁচ্‌কে নিলেন। "নাটালিয়ার কাছে তুমি দু'বার ধরা পড়েছ। তুমি একসঙ্গে এখন তিনটি খারাপ কাজ করেছ—একে তো চুরুট খেয়েছ, তাও পরের চুরুট চুরী করেছ, আবার তার ওপর মিথ্যা কথা বল্‌ছ। তিনটা অন্যায় একসঙ্গে করেছ।"

—"হাঁ হাঁ ঠিক কথা"—মনে পড়ে যাওয়াতে সিরোজার চোখের তারা যেন নাচতে লাগ্‌লো। "দু'দিন চুরুট খেয়েছি বটে, একবার আজ আর একবার তার আগে।"

—"তবে? তুমি নিজেই এখন স্বীকার করছ একবার নয় দু'বার খেয়েছ।···আমি তোমার ওপর খুব রাগ করেছি। আগে তুমি বেশ ভাল ছেলে ছিলে; এখন ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছ।"

পিট্রোভিচ্ ছেলের গলার কলারটা সোজা করে দিয়ে ভাবতে লাগলেন—"আর কি বলা যায়?"

একটু ভেবে নিয়ে বল্‌লেন—"এ-সব ভাল কথা হচ্ছে না। তুমি যে এমন হবে তা' আমি আশা করি নি। প্রথমতঃ চুরুটটা তোমার নিজের জিনিষ নয়,—পরেব জিনিযে হাত দেবার তোমার কোনো অধিকার নেই। প্রত্যেক লোকেরই নিজের জিনিযটি যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকার আছে, নিজের জিনিষ ছাড়া অপরের জিনিয যে নয় তাকে বলে বদলোক। যেমন মনে কর নাটালিয়ার একটা পোষাকের বাক্স আছে। সেটী তার নিজের জিনিষ; সুতরাং তোমার বা আমার কারুরই সেটা ছোঁবার অধিকার নেই, সেটা আমাদের নয় বলে। বুঝ্‌তে পারলে? এই দেখো না, তোমার কত খেলনার ঘোড়া আছে, ছবি আছে,—তা' কি আমি কখনো নিতে গেছি? হয়তো আমার সেগুলো নেবার লোভ থাক্‌তে পারে... কিন্তু আমি জানি সেগুলো আমার নয়—তোমার।"

"তা' তুমি নাও না যদি ইচ্ছা হয়!" সিরোজা মুখ তুলে চেয়ে বল্‌লে—"হোক্ গে আমার জিনিষ বাবা, তুমি নিয়ে নাও! ঐ যে ছোট কুকুরটা তোমার টেবিলে রয়েছে, ওটা তো আমার, কিন্তু আমি আর ওটা চাই না ...ওটা তোমারই থাক!"

পিট্রোভিচ্ বল্‌লেন—"আমার কথাটা ঠিক তুমি বুঝ্‌তে পারলে না। ঐ কুকুরটা তুমি আমাকে দিয়েছিলে, অতএব ওটা এখন আমার, আমি ওটা নিয়ে এখন যা খুসী তাই করতে পারি। কিন্তু চুরুট তো আমি তোমাকে দিই নি, সুতরাং সে জিনিষ আমারই আছে।" (এমনি উপায়ে এ কথা তো ওকে বোঝানো যাবে না। অসম্ভব! বৃথা চেষ্টা!) "আমি যদি এমন কোনো চুরুট খেতে চাই যেটা আমার আপন নয়, তা' হ'লে প্রথমে আমাকে চুরুটওয়ালার অনুমতি নিতে হবে।" এরপর ছেলে-মানুষের উপযোগী ভাষায় পিট্রোভিচ্ ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন—নিজের সম্পত্তি আর পরের সম্পত্তিতে কি তফাৎ।

বাপের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সিরোজা একমনে শুনতে লাগলো। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় বাবার কাছে বসে গল্প শুনতে সে ভালবাসে। শুন্‌তে শুন্‌তে সে টেবিলের ওপর কনুই দু'টি রাখলে, চোখ দু'টি অর্দ্ধনিমীলিত হয়ে এলো, তারপর ক্রমে ক্রমে অন্যমনস্ক হয়ে দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। টেবিলের উপরকার দোয়াত কলমের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল—তারপর ঘরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে শেষে গঁদের শিশির উপর নজর পড়ল।

"বাবা, গঁদ কি দিয়ে তৈরী হয়?"—বলেই হঠাৎ শিশিটা হাতে তুলে ধরে দেখ্‌তে লাগলো।

পিট্রোভিচ্ তার হাত থেকে শিশিটা কেড়ে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিলেন। না থেমেই বলে যেতে লাগলেন—"আর দ্বিতীয় কথা, চুরুট খাওয়াটাই তোমার পক্ষে অন্যায়। আমি খাই বলে তোমাকেও খেতে হবে এর কোনো মানে নাই। আমি খাই বটে, কিন্তু জানি যে, সেটা খারাপ। নিজেকে এর জন্য তিরস্কারও করি..." (মনে মনে ভাবছেন, এইবার ছেলে বোধ হয় অন্যায়টা বুঝ্‌তে পেরেছে!) "ধূমপান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভারী খারাপ, চুরুট না খেলে মানুষ যতদিন বাঁচতে পারে, খেলে তার চেয়ে কম দিন বাঁচে। বিশেষ করে তোমার মত ছোট

ছেলের পক্ষে এ অভ্যাস অত্যন্ত খারাপ। তোমার বুক ভারী দুর্ব্বল, এখনো শরীরে বল হয় নি, এই কচি বয়সে চুরুট খেলে 'থাইসিসে'র ব্যায়রাম হতে পারে বা আরো কত রকমের ব্যায়রাম হতে পারে। তোমার কাকা ইগ্‌নাটিকে মনে আছে? সে 'থাইসিস' রোগে মারা গেছে। সে যদি চুরুট না খেতো তা' হ'লে হয়তো আজও বেঁচে থাকতো।"

সিরোজা চিন্তান্বিতভাবে চেয়েছিল আলোটার দিকে, আলোটার শেডের উপর একটা আঙুল ঠেকিয়ে রেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

একটু পরে মন্তব্য প্রকাশ করলে—"ইগ্‌নাটি কাকা চমৎকার বেহালা বাজাতেন! তাঁর বেহালাটা এখন গ্রোগোরেভ্‌রা কিনে নিয়েছে।"

টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে সে কি যেন ভাবতে লাগ্‌লো। মুখ দেখ্‌লে বোঝা যায় সে আপন চিন্তাতেই বিভোর। তার বড় বড় চোখে কতকটা বেদনার কতকটা ভয়ের চিহ্ন ফুটে রয়েছে। সে ভাবছিল মৃত্যুর কথা, যাতে সম্প্রতি তার মাকে আর তার কাকা ইগ্‌নাটিকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে; মৃত্যু কেবল মায়েদের আর কাকাদেরই যেন অন্য জগতে নিয়ে চলে যায়, কিন্তু তাদের ছেলেপুলেরা আর বেহালাগুলো এইখানেই থেকে যায়। মরে গিয়ে তাঁরা স্বর্গে গিয়ে বাস করেন, সেটা বোধ হয় আকাশের তারাগুলোর কাছাকাছি কোথাও হবে,—সেখান থেকে তাঁরা পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকেন। আমাদের জন্য কি তাঁদের মন কেমন করে?

পিট্রোভিচ্ ভাবছিলেন—"আর কি কথা বলা যায়? ও তো আমার কথা শুনছেই না। হয় তো ও নিজের কাজ-টাকে দোষ বলেই মনে করছে না কিংবা আমার কথাগুলো ওর মাথায় ঢুকছেই না। কি করে ওকে বুঝিয়ে দেওয়া যায়?" চেয়ার থেকে উঠে তিনি পায়চারি সুরু করে দিলেন।

"আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন এ-সব সমস্যার খুব সোজা মীমাংসা হয়ে যেতো। কোনো ছেলে চুরুট খেলেই তাকে চাবুক লাগানো হোতো। ভীরুই হোক্ কি সাহসীই হোক্ সকলের বদ অভ্যাসই এতে সেরে যেতো। কিন্তু যারা খুব চালাক, তারা জুতোর ভিতর চুরুট লুকিয়ে রাখতো, সুবিধা পেলে আনাচে কানাচে গিয়ে খেয়ে নিতো। দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে নদীর ধারে গিয়ে খেয়ে আসতো, এমনি করেই তারা বড় হয়ে উঠতো। চুরুট খেলে বেদম প্রহার খেতে হবে, তাই আমি যাতে ও-সব না খাই এই জন্য ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার মা আমাকে কত খেলনা পয়সা ঘুষ দিতেন। এখন সে সব ব্যবস্থা উঠে গেছে, ও রকম শাস্তি দেওয়া এখন পাশবিক অত্যাচার বলে বিবেচিত হয়।

"এখনকার দিনে যারা ছেলেদের শিক্ষা দেয়, তারা গোড়া থেকেই যুক্তি ধরে কাজ করে, ছেলের মনে 'ভাল' কা'কে বলে সে সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবার চেষ্টা করে—তার সঙ্গে ভয় বা গর্ব্বের কোনো সম্পর্ক নেই। গোড়া থেকে ভাল হওয়াটাই একমাত্র নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যরূপে দাঁড় করানো হয়।"

ভাবতে ভাবতে পিট্রোভিচ্ যতক্ষণ পায়চারি করছিলেন, সিরোজা ততক্ষণে চেয়ারের উপর হাঁটুগেড়ে বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ছবি আঁকতে লাগলো। খানিকটা কাগজ আর একটা নীল পেন্সিল তার জন্য সর্ব্বদাই টেবিলে রাখা থাকতো, যাতে সে তার বাবার কাগজ কলমে হাত না দেয়।

একটা বাড়ী আঁকতে আঁকতে সে বল্‌লে—"আমাদের রাঁধুনিটা যখন আজ কপি কুটছিল, তখন তার আঙুলটা একেবারে কেটে দু'খান করে ফেলেছে। এত জোরে সে চেঁচিয়ে উঠেছিল যে, আমরা সকলে ভয় পেয়ে রান্নাঘরে দৌড়ে গেলাম। কি রকম বোকা! নাটালিয়া বল্‌লে ঠাণ্ডাজলে আঙুলটা ডুবিয়ে রাখ্‌তে, তা' না করে সে কেবল আঙুলটা চুষতে লাগলো…ঐ ময়লা আঙুলটা কেমন করে সোজা মুখের মধ্যে পূরে দিলে! ভারী নোংরা, নয় বাবা?"

এরপরই সে বর্ণনা ক'রে বলতে আরম্ভ করলে—সেদিন দুপুরবেলা খাবার সময় কে একজন ভিখারী এসে বাজনা

বাজিয়ে গান করছিল, একটি ছোট মেয়ে তার বাজনার সঙ্গে কেমন করে তালে তালে নাচ্ছিল।

সরকারী উকিল ভাবতে লাগলেন—"এতো দেখি নিজের খেয়ালেই আছে। নিজের জগতেই ও বাস করে, কোন্ কথাটা দরকারী আর কোন্টা অদরকারী তা' নিজের মাপ দিয়েই বিচার করে। ওর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে কিংবা ওর চৈতন্য জাগাতে হ'লে কেবল ওর মত ভাষাতে কথা বললেই চলবে না, ওর চিন্তাধারা কি রকম তাও বুঝে দেখ্তে হবে। চুরুট খাওয়ার জন্য যদি বাস্তবিকই আমি দুঃখিত হতাম, যদি আমার কষ্ট হয়েছে বা কান্না পাচ্ছে এমন ভাবটা প্রকাশ হোতো, তা' হ'লে হয় তো সহজেই ও বুঝ্তে পারতো।···ছেলেপুলের মায়েদের এ সব বিষয়ে কেমন অশিক্ষিতপটুত্ব থাকে, তারা ওদের মতন করে বুঝ্তে পারে, ওদের সঙ্গে সঙ্গে কেমন হাসতে পারে, কাঁদতে পারে···যুক্তি উপদেশ দিয়ে কিছুই করা যায় না। তাই তো, এবার কি বলা উচিত? কোন্ রকমের কথা?"

পিট্রোভিচের এই বড় আশ্চর্য্য বোধ হোলো যে, তিনি এতবড় একটা উকিল, জীবনের অর্দ্ধেক কাল লোককে জেরা করে আর শাস্তি দিয়ে কাটিয়ে আজ কি না একটা ছেলেকে বল্বার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না!

"শোনো, আমার কাছে প্রতিশ্রুত হও যে, আব কখনো চুরুট খাবে না।"

সিরোজা ছবি আঁকতে আঁকতে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে পেন্সিলের ওপর জোর চাপ দিয়ে গানের স্বরে বলে উঠলো—"প্রতিশ্রুত! প্র—তি—শ্রু—ত—প্র..."

"প্রতিশ্রুত কথার তো মানেই ও জানে না! নাঃ, শিক্ষা দেওয়া দেখ্ছি আমার কর্ম্ম নয়। কোনো বুদ্ধিমান উকিল কিংবা শিক্ষক যদি এখন আমার মনের ভিতরটা দেখতে পায় তা' হ'লে আমাকে কত বোকা ঠাওরাবে!··· আদালতে বা স্কুলে এ সব সমস্যার মীমাংসা করা যেমন সহজ, বাড়ীতে বসে তেমন হয় না। এখানে যাদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসা যায়, সেই সব নিজের লোক নিয়ে কারবার করতে হয়; তাই সমস্যাটা একেবারে আলাদা রকম হয়ে পড়ে। এই ছেলে যদি আমার ছেলে না হয়ে একজন ছাত্র কি একজন আসামী হোতো, তা' হ'লে কি এত মুস্কিল হোতো? তা' হ'লে এত কথা ভাববারই দরকার হোতো না।"

পিট্রোভিচ্ টেবিলের কাছে বসে ছেলের আঁকা ছবিটা নিজের কাছে টেনে নিলেন। তাতে আঁকা হয়েছে একটা বাড়ী, তার আঁকাবাঁকা ছাদ, ছাদের উপর থেকে ধোঁয়া উঠ্ছে—সেটা বিদ্যুৎচমকের মত তির্য্যক রেখায় কাগজের মাথা পর্য্যন্ত উঠে গেছে। বাড়ীটার পাশে একটা সেপাই দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখ দুটো মুখের ঠিক মাঝখানে পুঁটুলির মত পাকানো, হাতে আছে একটা বন্দুক সেটা দেখতে ৭এর মত।

সরকারী উকিল ছবি দেখে মন্তব্য করলেন—"বাড়ীটার চেয়ে মানুষটা তো লম্বা হ'তে পারে না! এই দেখো, সেপাইয়ের কাঁধটাই বাড়ীর ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু হয়েছে।"

সিরোজা বাবার কোলে গিয়ে বেশ জুৎ করে বসলো। "কিন্তু বাবা, সেপাইটাকে ছোট করে দিলে যে, ওর চোখ দেখা যাবে না।"

ছবিটা কি সংশোধন করে দেওয়া উচিত? প্রত্যহ নিজের ছেলেকে দেখে দেখে পিট্রোভিচ্ জেনেছেন যে, ছেলেদের শিল্প-সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা আদিম যুগের বর্ব্বরদের মত, বয়স্ক লোকদের ধারণার সঙ্গে তার মোটে মিল হয় না। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে গেলে সিরোজার শিল্পকল্পনাকে খুব অস্বাভাবিক বোধ হবে। বাড়ীর চেয়ে মানুষটাকে বড় করে আঁকা সে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে। আর কেবল বস্তু নয়—মনের ভাব বা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেও সে পেন্সিল দিয়ে এঁকে দেয়। বাজনার শব্দকে সে গোল গোল কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়ার মত আঁকে; হুইসিলের সিটি বাজানোকে আঁকে পাক দেওয়া দেওয়া সুতার মত। তার মনের মধ্যে শব্দের সঙ্গে রূপ ও রংয়ের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; বর্ণ পরিচয়ের অক্ষরগুলো যখন রং বেরং-এর পেন্সিল দিয়ে লেখে, তখন দেখা যায় সে বরাবর 'ল' অক্ষরকে হল্দে করে, 'ম'কে করে লাল, 'অ'কে করে কালো, ইত্যাদি।

ছবি আঁকা ফেলে দিয়ে সিরোজা বাপের কোলের মধ্যে আরো ভাল করে ঢুকে বসে বাপের দাড়ী নিয়ে খেলা করতে লাগলো। একবার আঙুল দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে সমান করে দেয়, আবার চিরে দু' ফাঁক করে দু'পাশে বিন্যাস করতে থাকে।

—"একবার তোমায় দেখাচ্ছে ঠিক আইভানের মত, আবার এখন দেখাচ্ছে ঠিক যেন আমাদের সুইস্ দরোয়ানটার মত। আচ্ছা বাবা, সুইস্‌রা কেন সব সময় কেবল ফটকের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে? চোরেদের ভয় দেখাবার জন্য বুঝি?"

সরকারী উকিলের মুখে এসে লাগলো সিরোজার মুখের নিঃশ্বাস, দাড়ীটা ছুঁয়ে গেল তার কচি গালে। একটা তপ্ত কোমল স্নেহের আবেগ সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর জেগে উঠলো;—কেবল হাত দু'টি দিয়ে নয়, তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা যেন সিরোজার ভেলভেটের কোটের উপর হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। ছেলের আয়ত কালো চোখের দিকে তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। আর তাঁর মনে হতে লাগ্‌লো, ঐ চোখের গভীরতর অন্তরাল থেকে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে তার মা, তাঁর স্ত্রী—যা' কিছু তাঁর ভালবাসার বস্তু সমস্তই যেন ওর মধ্যে উঁকি মারছে।

মনে মনে তিনি ভাবতে লাগলেন—"এর গায়ে বেত তুলবো কি করে? আর কি শাস্তি ওকে দেওয়া যায় তাই বা ভেবে কি হবে? উচিত শিক্ষা দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। একসময় ছিল যখন মানুষ ছিল স্থূল ও সহজ বুদ্ধি, তারা ভাবনা চিন্তা কম করতো আর যেখানে যেটি করতে হবে তা' একেবারে দ্বিধাশূন্যভাবেই করে ফেলতো। কিন্তু এখন আমরা বেশী ভাবি—ন্যায়বুদ্ধি আমাদের মাটি করে দিয়েছে।...যতই মানুষ উন্নত হচ্ছে, ততই সে সূক্ষ্ম চিন্তা ক'রে ক'রে জটিলতার মধ্যে গিয়ে পড়ছে, আর ততই সে অব্যবস্থিত চিত্ত ও সংশয়ী হয়ে উঠছে, ততই তার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কোনো কিছুর মীমাংসা করতে হলেই এখন সে ভয় পায়। বাস্তবিক কতটা মনের সাহস থাকা চাই তবে মানুষ শিক্ষা দিতে পারে বা বিচার করতে পারে বা বড় বড় গ্রন্থ লিখতে পারে.."

রাত্রি দশটা বাজলো। ছেলেকে তিনি বল্‌লেন—"যাও, এখন অনেক রাত্রি হোলো; এবার শোও গে।"

সিরোজা একটু নড়ে চড়ে বল্‌লে—"না বাবা, আর একটু থাকি। আমাকে একটা গল্প বলো না।"

—"আচ্ছা বেশ, কিন্তু যেই গল্প বলা শেষ হবে তখনি শুতে যাওয়া চাই।"

প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা পিট্রোভিচ্ ছেলেকে গল্প শোনান। সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত মানুষ কোনো বইয়ের কবিতা কি গল্প তাঁর মনে থাকে না, কাজেই নিজে যতটা পারেন বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেন। প্রথমেই বাঁধাগৎ দিয়ে সুরু করেন—"এক দেশে এক যে রাজা ছিল তার রাজত্বে—"তার পরেই বল্‌তে থাকেন নানারকম আজগুবি কথা যখন যা' মনে আসে। সে গল্পের ঘটনা ও চরিত্র মুখে মুখেই এসে পড়ে, তার কোথাও কোনো মিল থাকে না, কিন্তু শেষকালে একটা কিছু পরিণতি ঘটে এবং একটা ভাবার্থও তা'তে পাওয়া যায়। সিরোজা এই বানানো গল্প শুনতে ভালবাসতো; তার বাপ এটা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, গল্পের ঘটনা যত সহজ হোতো, ততই সেটা ছেলের মনে গভীর রেখাপাত করতো।

কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বাপ গল্প সুরু করলেন—"তবে শোনো। এক দেশে এক ছিল রাজা। তার মস্ত বড় পাকা দাড়ী...আর ইয়া লম্বা গোঁফ। তার যে প্রকাণ্ড বড় মার্ব্বেলের প্রাসাদ ছিল সেটা সূর্য্যকিরণে এমন ঝকঝক্ করতো যেন মস্ত একটা বরফের পাহাড়। বাড়ীর চারিদিকে মস্ত বাগান। সেখানে কত কমলালেবুর গাছ। কত চেরীর গাছ...কত গোলাপফল, চাঁপা, স্থলপদ্মের গাছ—আর রং-বেরংয়ের কত পাখী সেখানে সমস্ত দিন ধরে ডাকত। গাছে গাছে ঝুলতো কত বেলোয়ারি কাঁচের ঝালর, বাতাসে দুলে দুলে সেগুলো টুংটাং করে বাজতো, শুনতে বড় মধুর লাগতো। ধাতুর জিনিষের বাজনার চেয়ে কাঁচের বাজনা মিষ্টি লাগে তা' জান তো? আচ্ছা, আর সেখানে কি ছিল? হাঁ, অনেক ফোয়ারা ছিল... তোমার মনে আছে তোমার সোনিয়া মাসীর বাগানবাড়ীতে একটা ফোয়ারা ছিল? রাজার বাগানের

ফোয়ারাগুলো অনেকটা সেই রকমই দেখতে। তবে তার চেয়ে অনেক বড়, আর তার থেকে যে জলের ফোয়ারা উঠ্‌তো তা' বড বড় দেবদারু গাছের মাথায় গিয়ে ঠেকতো।"

পিট্রোভিচ্ ভেবে নিয়ে আবার বল্‌তে সুরু করলেন—"রাজার একটি মাত্র ছেলে ছিল। সিংহাসনের একমাত্র ভাবী অধিকারী—ছেলেটি ছোট, ঠিক তোমার মত। খুব ভাল ছেলে। কখনো ঝগড়া করতো না, সকাল সকাল শুতে যেতো, টেবিলের কোনো জিনিষে কখনো হাত দিত না, আর···মোটের উপর খুব বুদ্ধিমান ছিল। তার কেবল একটি দোষ ছিল...সে চুরুট খেতো।"

সিরোজা খুব নিবিষ্ট হয়ে শুনছে, বাপের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, মধ্যে মধ্যে এক-একবার চোখের পলক ফেলছে। এরপর কি বলা যায়? নানা রকম ভেবে চিন্তে পিট্রোভিচ্ শেষকালে এইভাবে গল্পের শেষ করলেন—"চুরুট খেয়ে খেয়ে ছেলেটির বুকের দোষ হোলো, শেষকালে কুড়ি বৎসর বয়সে বেচারা মারা গেল। বৃদ্ধ রাজা শেষ বয়সে নিঃসন্তান হয়ে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল। তখন কেই বা রাজত্ব দেখে, কেই বা বাড়ীর তদারক করে! শত্রু এসে আক্রমণ ক'রে বুড়ো রাজাকে মেরে ফেল্‌লে, তার সুন্দর বাড়ীটা ছারখার ক'রে দিলে, এখন আর সে বাগানে ফুলও ফোটে না, পাখীও গান করে না, কাঁচের ঝালরও বাজে না...বুঝতে পারছো..."

গল্পের শেষটা পিট্রোভিচের নিতান্তই কাঁচা এবং অস্বাভাবিক হয়ে গেল ব'লে বোধ হচ্ছিল, কিন্তু সিরোজার মনে সেটা গভীরভাবে রেখাপাত করল। তার চোখে মুখে আবার যেন একটা ভয়-মিশ্রিত কাতরতার ছায়া পড়ল। কিছুক্ষণ যাবৎ সে জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে তারপর একটু শিউরে উঠে চাপাগলায় বল্‌লে—"আর আমি চুরুট খাব না..."

ছেলে শুতে চলে যাবার পর বাপ ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগলেন, মুখে একটু হাসির আভাস।

"লোকে বল্‌বে ছেলেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভোলানো কথা দিয়ে চালাকি করে বলাতেই সে আকৃষ্ট হয়েছে। তাই যদি হয়, তা' হ'লে আমার যে জিৎ হয়েছে একথা বলা যায় না। এটা তো খুব ন্যায়পথ নয়...সত্য কিংবা নীতিকথা কেন সোজাসুজি পরিষ্কার করে বলা হবে না,—কেন সেটা কৃত্রিম মিষ্টতা দিয়ে চিনিমাখানো বড়ির মত গিলিয়ে দিতে হবে? এ উচিত কাজ নয়। এটা হচ্ছে মিথ্যা প্রতারণা, জুয়াচুরী..."

তাঁর মনে পড়ল জুরীর কাছে বক্তৃতা করবার সময় তিনি কোনো ঘটনাকে যথাযথ বিশ্লেষণ করে দেখান না, কিন্তু ঘটনাগুলিকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে সাজিয়ে তার উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করে যান; আরো মনে হ'ল, মানুষ ন্যায়বুদ্ধি দিয়ে বা আত্মবিশ্লেষণ ক'রে জীবন-সম্বন্ধে কোনো সত্য বিচার করে না, কিন্তু গল্প, কাহিনী বা ইতিহাস পড়ে বেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে।

ওষুধ হবে মিষ্টি, সত্য হবে সুন্দর···মানুষ আদমের যুগ থেকে এই অভ্যাস ক'রে এসেছে···যাই হোক্...হয়তো এই রকমটাই মানুষের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক...প্রকৃতির মধ্যেও এমনি অনেক ভুলিয়ে রাখার প্রচেষ্টা, অনেক মায়া আছে।...

ভাবনা ছেড়ে দিয়ে তিনি কাজে মন দিতে গেলেন, কিন্তু এই সব অলস চিন্তা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর মনকে অভিভূত করে রাখলে। উপরে পিয়ানোর বাজনা থেমে গেছে, কিন্তু তিনতলার ঘরের লোকটি তখনো পায়চারি করে ফিরছে এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক।*

দুর্গা দেবী

(চেকভের 'য়্যাট হোম্' হইতে)

নারী-চরিত্র

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

'সংসারে কোনও ভাবনাই নেই তার।' পাড়াপড়শী সমবয়সী সঙ্গী-সাথীরা সবাই একগলায় বলে, "নীরোর দিনগুলো যায় বেশ নিঃঝঞ্ঝাটে। না আছে ছেলেপিলের উৎপাত-দৌরাত্ম্য,দারিদ্র্যের বিষম জ্বালা—না আছে স্বামীর অত্যাচার-উপদ্রব, সংসারে নিয়ত খিটিমিটি।" বাস্তবিক সত্যি কথাই বলে তারা—নীরো সুখী। দিনগুলি তার কেটে যায় নির্ভাবনায়, স্বচ্ছন্দগতিতে, হাসি-তামাসার ভেতর দিয়ে আনন্দের ফোয়ারা তুলে। ওপাড়ার বেনো বোষ্টমী ভিক্ষে নিতে আসে এ গাঁয়ে। নীরোর বাড়ীতে যে সে একবার না আসে, এমন নয়; তবে সে ভিক্ষে নেয় না সেখানে। উপরন্তু, বেশ বিনিয়ে বিনিয়ে মিষ্টি করে' শোনায়, "হ্যাঁলো বৌ, বে হয়েছে তোর বুঝি আজ বছর ছয়েক, নারে? তা' সোনার চাঁদ একটিও ত কোলে পেলি নে?"

নীরো এ কথায় দুঃখ পায় না মোটেই—মুষ্‌ড়েও পড়ে না নৈরাশ্যের বেদনায়; বরং তার ঠোঁটের কোণে ফুটেই থাকে চিরদিনের মিষ্টি সুন্দর হাসিটি। ঘাড়টি ঈষৎ বেঁকিয়ে, সমুজ্জ্বল চোখে বেনো বোষ্টমীর দিকে তাকিয়ে সে বলে, "নারে, হ'ল আর কই?"

কিন্তু মনে মনে সে আশা রাখে অনেক। মাদুলী-টাকে বিশ্বাস করে যথেষ্ট। ভাবে, কোন গুণ তার নিশ্চয়ই আছে।

স্বামীর কথা? সেদিকে সে নিশ্চিন্ত। অন্য সব সমজুটীদের মত স্বামীর কাছে নিত্য মারধোরের পরিবর্ত্তে পায় সে কত ভালবাসা। ক—তো—অনেকই। মন তার গর্ব্বে আনন্দে ভরে' ওঠে, যখন স্বামী কাজ থেকে ফিরে সন্ধ্যাবেলা এক গাল হেসে, তার দিকে উৎসুক নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে বলে, "জানিস্ বৌ, মেধো বলে, আমি না কি তাদের ভুলেই গেছি।" বলে' সে নীরোর বাঁ হাতখানা খপ্ করে' ধরে' ফেলে। তারপর কাছে সরে এসে নীচু গলায় খুব মিষ্টি করে' বলে, "জানিস বৌ, আরও কত কি বলে ওরা, শুন্‌বি?"

নীরো কৌতূহলে মেতে উঠে বলে, "বল্ না।"

স্বামী তখন ফিস্‌ফিস্ করে' বলে। "তারা বলে, 'বৌয়ের আঁচলখানি বুঝি এতই মিষ্টি; তাই বুঝি সন্ধ্যাবেলা একবার ছেড়ে আস্‌তেও মন সরে না? এদিকে তোর মত খেলোয়াড় না এলে খেলায় কি মন যায়। খেলাই জমে না আমাদের—হাপিত্যেশ করে তোরই আশাপথ চেয়ে বসে থাকি। আস্‌বি, সন্ধ্যের পর আসবি, বুঝ্‌লিরে'।" এই বলে স্বামী ব্যাকুল প্রশ্নভরা চোখে বৌয়ের দিকে চেয়ে থাকে।

নীরোর মুখে ফুটে ওঠে গৌরবের হাসি। স্ফীতবক্ষে ভাবে, নিজের সৌভাগ্যের কথা। তারপর স্মিতমুখে, অথচ শাসনের ভঙ্গীতে বলে, "যাবি—কিন্তু রাত যেন বেশী করিস্ নি। যাবি—একদান খেলবি, চলে' আস্‌বি, বুঝ্‌লি?"

"আচ্ছা" বলে স্বামী চঞ্চল পায়ে পিঞ্জরমুক্ত পাখীর মত আত্মহারা হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে।

বৌ দরজা বন্ধ কর্‌তে কর্‌তে আর একবার একটু চেঁচিয়ে বলে' দেয়, "রাত বেশী কর্‌লে দোর কিন্তু খুল্‌তে পার্‌বো না, বুঝ্‌লি?"

পরদিন সকালবেলা নীরো ঘুমচোখে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, "তুই কাল ফির্‌লি কখন রে? বেশী রাত করিস নি ত? আমি কিন্তু বড্ডই ঘুমিয়ে পড়েছিনু। ঘুমের ঘোরে তোর ডাক শুনে কখন যে তোকে দুয়ার খুলে দিনু—মনেও নেই তা' একটুকুও।"

স্বামী বলে বেশ সহজভাবেই, "হ্যাঁরে, আইছিলাম খুব সকালেই। তুই ত ঘুমে একেবারে অচেতন হয়েছিলি। ডাক্‌তে ডাক্‌তে গলা ভেঙে গেল, তবুও তোর সাড়া নেই। তারপর দুয়ার যদি খুল্‌লি, তা' একটা কথাও বল্‌লি না; সোজা বিছানায় শুয়ে নাক ডাকৃতে সুরু করে' দিলি। কাজেই নিজের হাতে ভাত বেড়ে নিয়ে খাওয়া শেষ কর্‌লাম। তোর বুঝি কাল রাতে খাওয়া হয় নি? যে ঘুম তোর!"

স্বামীকে রাতে খেতে দিতে না পারায় নীরোর মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করে বেঁধে। অস্বস্তিতে মনটা ভরে' যায়। কিন্তু স্বামীর মুখে নিজের না খাওয়ার কথা শুনে, অভিমানে সে স্বামীকে বলে তার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে, "তুই কাল আমাকে ডেকে দিলি না বলেই ত আমার খাওয়া হোলো না।"

স্বামী কি একটা জবাব দিতে যায়, কিন্তু বৌ আর দাঁড়ায় না, সে হেলে দুলে সংসারের কাজে চলে যায়।

স্বামী তার ছুতোর। এখনই তাকে কাজে যেতে হবে। নীরোর কি আর এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফষ্টিনাষ্টি করা চলে? কিছুক্ষণ পরেই নীরো স্বামীকে থালা সাজিয়ে পরিপাটী করে' গরম ভাত, শুক্‌তুনি, ছোলার ডাল, মাছ চচ্চড়ি দিয়ে খেতে দেয়। তাদের ঘরে কোন্ মেয়েটা স্বামীকে এত সকালে খেতে দিতে পারে টাটকা ভাত এত উপকরণ দিয়ে। সবাই ত সারে ওই বাসি পান্তা, পেঁয়াজ, আর শুধু কাঁচালঙ্কা দিয়েই—তবে? মনের আনন্দে নীরোর বুকখানা ভরে' ওঠে। স্বামী পরম তৃপ্তির সাথে আহার শেষ করে' মুখ ধুয়ে, দাওয়ায় দাঁড়িয়ে সমুজ্জ্বল চোখে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে সে বলে, "কৈরে বৌ, পান দে একটা—বড্ড যে বেলা হয়ে গেল।"

নীরো তখন রান্নাঘরে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার কর্‌ছিল। স্বামীর ডাকে সে ছুটে এসে ডাবর থেকে সাজা পান ক'টা তার হাতে দিতে দিতে ক্রোধের ভান দেখিয়ে বলে, "এই নে, ধর্, আর পারি নে বাপু তোর সঙ্গে! পান ক'টাও নিজে নিতে পারিস নে?"

"পার্‌তেই হবে তোকে" বলে স্বামী পান মুখে দিতে দিতে মৃদু মৃদু হাসে।

বৌও সে হাসিতে যোগ দেয়। তারপর স্বামী কাজে চলে যায়। বৌ হয় একা। একাই সে প্রাণভরা আনন্দে সারাদিন বিভোর হয়ে থাকে। এমনিভাবেই তার দিনের পর দিন কেটে যায়।

মাস ছয়েক চলে' গেছে। বৈচিত্র্যময় জগৎ, মানুষের জীবনও বিচিত্রতায় ভরা। সবার জীবনেই সুখ, দুঃখ আসে যায় নিয়মিত। কেউ বা দুঃখকে উপলব্ধি করে ভয়ানক ভাবে কেউ বা বুঝতে পেরেও প্রকাশ করে না, আর কারও বা বোধশক্তির ক্ষমতাটুকুই নাই। নীরোর মনেও আজকাল দুঃখ-বেদনার ঘা লাগে, কিন্তু সে সেটা ভালরকম বুঝ্‌তে পারে না—হয় ত বোধশক্তির অভাবেই। তবে তার বর্ষায় ভেজা সেই শ্যামল স্নিগ্ধরূপ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয়েছে। মুখে পড়েছে ভাবনার ছায়া। ঠোঁটের ফাঁকে আর সে খুসীর রং-মাখা হাসি ফুটে ওঠে না। তার এ ভাবনা কিসের? পাড়ার মেয়েরা সবাই আলোচনা করে বলে, "নীরো আজকাল ত আর আমাদের বাড়ী আসে না, হাসে না ত আর তেমনি প্রাণ খুলে, কিসের ওর এত দুঃখ?"

সত্যই সে কিসের ব্যথায় ব্যথিত? একটী ক্ষুদ্র শিশুর মুখে বিশ্বের সুধাঢালা 'মা' ডাক সোনার ব্যাকুলতায় কি? না তা' নয়—মায়াবিনী আশা সে বিষয়ে তার মনে দাগ কাটতে পারে নি—সে জানে, এখনও ছেলে হবার দিন যায় নি, বয়স তার মোটে আঠার। তবে এখন স্পষ্টই সে দেখতে পায় স্বামী তার কথা মোটেই শোনে না, শাসন মানে না, যা' ইচ্ছে তাই করে, বাড়ী ফেরে রাত করে। কৃষ্ণা একাদশী চাঁদ আকাশে দেখা দেয়। তার ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ে নীরোর ছোট্ট উঠোনটুকুতে। সে তবুও ঘুমে জড়িয়ে আসা চোখ দুটো জলে ভিজিয়ে স্বামীর অপেক্ষায় বসে' থাকে। স্বামী ফিরে এলে রাগ

করে, অভিমান করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার স্বামীর মিষ্টিকথায় ভুলে গিয়ে একান্ত অধীরভাবে প্রশ্ন করে, "হ্যাঁরে, তোর বাড়ী ফির্‌তে এত রাত হয় কেন?"

স্বামী সংক্ষেপে বলে, "বন্ধুরা ছাড়ে না।"

নীরো সেই কথাই মেনে নেয় পরম বিশ্বাসে, গভীর আনন্দের সঙ্গেই। কিন্তু এখন আর সে তা' পারে না; কারণ, স্বামীর সম্বন্ধে দু'-চারটে কুকথা হাওয়ার মত ছুটে বেড়ায় পাড়াপড়শীদের মুখে মুখে। নীরো লক্ষ্য করে বাস্তবিকই স্বামীর অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। নিয়তই সে যেন কি ভাবে। পূর্ব্বের মত হাসে না, তার হাসিতেও যোগ দেয় না। নীরো আজকাল তার স্বামীকে কিছু বলে না। তার প্রতি সর্ব্বদাই বিরক্ত হয়ে থাকে। মনে মনে জ্বলে রাগে দুঃখে অভিমানে। মুখেও ফুটে ওঠে তার ছায়া সুস্পষ্টভাবেই। স্বামী কি তার এ মুখভাব লক্ষ্য করে না? করে বৈকি। বলে মাঝে মাঝে, "বৌ, তুই দিনকার দিন এত শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন? না হয় দিনকতকের জন্য তোর মায়ের কাছ থেকে ঘুরে আয় না, মনটাও ভাল হবে 'খন। ছেলে না হয় নাই হ'ল, ভাবিস নে তার জন্য। যা', ঘুরে আয় মায়ের কাচ থেকে। যাবি? কবে যাবি বল্? পৌঁছে না হয় দিয়ে আসবো আমি।" বলে সে আগ্রহের সহিত বৌয়ের দিকে চেয়ে থাকে।

এই কথা শুনে নীরো খুব চটে ওঠে। চোখ দিয়ে ছোটে তার আগুনের ফিন্‌কি। উচ্চকণ্ঠে সে বলে' ওঠে, "সে আমি যা' ভাল মনে কর্‌ব, তাই কর্‌ব; তোর কথা শুন্‌বো না কি?"

কুণ্ঠিত হ'য়ে স্বামী বলে, "না রাগ করিস নে নীরো, তুই আজকাল বড্ড রাগিস্।"

"না, রাগ কোরবো না। বলে নীরো হন্‌হন্ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বাইরে গিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। চোখ থেকে তার দু'ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে না কি? হাঁ, তাও পড়ে বৈকি। এমনিভাবে নীরবে দিনগুলো কাটে। তবু সে পারে না অশান্তিভরা সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে, পারে না স্নেহময়ী মায়ের স্নেহনীড়ে ফিরে যেতে। মায়ার বাঁধন এমনিই কঠিন।

মন চিরদিন চলে না একতালে একসুরে। পরিবর্ত্তন হয় একদিন হয় ত সুখের আধিক্যে—না হয় তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতে। বোধ হয় তাই আমাদের নীরোর মনেও এল পরিবর্ত্তন। ভেঙে যায় তার অসীম ধৈর্য্যের বাঁধ। মন কঠিন থেকে কঠিনতর হ'য়ে ওঠে। সে নীরবে মুখ বুজে এতদিন সয়েছে সমস্তই। সয়েছে তার প্রতি স্বামীর উদাসীনতা। তবুও সে নিজেকে শিথিল কর্‌তে পারে নি একটুও সংসারের দৃঢ় বন্ধন থেকে।

সেবার তার স্বামী অন্যবারের মত মাইনেটা এনে দেয় না তার হাতে। উপরন্তু, কিছু না খেয়ে "শরীর ভাল না" বলে' বিছানায় গিয়ে শুয়ে ভীষণ ভাবে নাক ডাক্‌তে সুরু করে' দেয়। সেদিন কেন যে সে অত ক্লান্ত হয়েছিল তা' সেই জানে। কিন্তু সেদিন নীরোর মনের তারগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যায় চারিদিকে। সেও কিছু খায় না—বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। মন যা' সামান্য নরম ছিল মায়ার প্রাবল্যে, তাও ক্রমে কঠিন হয়। মনে মনে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, "আর অমন স্বামীর দাসী বাঁদী হয়ে থাক্‌বে না। কিসের এত খোসামোদ? কাল সে যাবেই বাপের বাড়ী—নিশ্চয়ই যাবে! যাবেই বা না সে কিসের জন্য? সে ত আর ভদ্র গেরস্ত-ঘরের বৌ নয় যে, স্বামীর সমস্ত অত্যাচার, অবিচার মাথা পেতে নেবে, চুপ করে' সহ্য কর্‌বে। দেখ্‌বে চোখের ওপর স্বামীর পরিবর্ত্তন, তবুও মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পার্‌বে না! পার্‌বে না কর্‌তে তার কোনও প্রতিকার—শুধু গতজন্মের কর্ম্মফলের দোহাই দেবে, আর নিরস্ত হবে ভগবানের ওপর বিচারের ভার অর্পণ করে'।

পরের দিন ভোরবেলা সে সত্যি-সত্যিই স্বামীকে কিছু না জানিয়ে মাইল পাঁচেক একখানা মাঠ ভেঙে চলে আসে তার বাপের বাড়ী নিজ হাতেগড়া সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে। কষ্ট কি তার হয় না? হয় খুবই। কিন্তু

প্রতিহিংসার আগুনই তার মায়া-মমতাপূর্ণ হৃদয়খানাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

দিন যায়, মাস আসে; দেখ্‌তে দেখ্‌তে বছরও পূর্ণ হয়ে যায়। নীরো এখন বেশ সুখে আছে বাপ-মায়ের স্নেহাদরে, ভাজেদের সাথে গল্প-গুজবে। তার প্রফুল্ল মুখখানা, চলার চপল ভঙ্গী দেখে মনে হয়, সে যেন আবার ফিরে পেয়েছে তার পূর্ব্বের সেই আনন্দ। বাপের বাড়ী আসার প্রথম কয়দিন মন তার খুঁতখুঁত করতো স্বামীর জন্য। ভাবতো, স্বামী খেতে পায় কি না পায়। প্রাণ ব্যাকুল হ'ত আবার নিজের ঘরে যাবার জন্যে। আশাও রাখ্‌তো স্বামী এসে আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন তার মনের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হ'ল। তাদের গাঁয়ের একটী মেয়ে দুধ বেচ্‌তে এসে নীরোকে জানিয়ে গেল, তার স্বামীর না কি আবার বিয়ে, সেই গাঁয়েরই মেধো ঘোষের বোনের সঙ্গে। তার স্বামী নাকি পাড়ায় গেয়ে গেয়ে বেড়ায়, বিয়ে সে আবার কর্‌বেই। না কর্‌লে চল্‌বেই বা কেমন করে? ছেলে না হ'লে তাকে খাওয়াবে কে বুড়ো বয়সে?

সেই কথা শুনে নীরো দুঃখ পায় কি না জানি না। তবে এইটুকু জানি, সে সেইদিনই তার জীবনের চলার গতি ফিরিয়ে দেয় অন্যদিকে। বড় ভাজের সেই কথাটী আজকাল তার বড় ভাল লাগে, "পুরুষেরা যখন তাদের বৌকে হেলা করতে পারে, কর্‌তে পারে যা' খুসী তাই, বৌয়েরাই বা কর্‌তে পার্‌বে না কেন? পার্‌বে—নিশ্চয়ই পার্‌বে।"

সে এক ভদ্র গেরস্থর বাড়ী জুটিয়ে নেয় চাকরাণীর কাজ। থাকে নিজের ইচ্ছামত, স্বাধীনভাবে। যা' কিছু মনটা খারাপ হয়েছিল, সব পরিষ্কার হয়ে যায় মনিব বাড়ীর খোলা হাওয়া পেয়ে। তার কাজকর্ম্ম বাড়ীর গিন্নীর বেশ পছন্দ হয়। সেও হাসিমুখে সকলের ফাই-ফরমাস খাটে।

সেদিন সকালবেলা নীরো মনিব বাড়ীর বাইরের রোয়াক ধুতে থাকে। গালে তার পান ভর্ত্তি। ঠোঁট দু'খানাতে পানের ছোপ আর প্রাণের খুসীর রং মেখে অপূর্ব্ব একটা সুন্দর দীপ্তি তার মুখে ফুটে ওঠে। রোয়াকটা পরিষ্কার করে' ধুয়ে ফিরে যাচ্ছে, এমন সময় তার স্বামীর গাঁয়ের একটী মেয়ে একডালা চাল রকের ওপর নাবিয়ে বলে, "কিন্‌বি কিছু?" বলে' সে এমনভাবে নীরোর দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন সে কত কি বল্‌তে চায় তাকে।

নীরো তার এ ভাব লক্ষ্য করে' বলে, "বল্‌বি নাকি আমায় কিছু?

মেয়েটীর ঠোঁট দু'টী এবার একটু কেঁপে ওঠে। সে ম্লানমুখে করুণ সুরে নীরোর দিকে তাকিয়ে বলে, "জানিস, তোর সতীনের ছেলে হবে।"

আরও কি যেন বল্‌তে যায়, কিন্তু নীরো তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, "ও তাই না কি! তোর কি চাল বল্‌ত এখন? আতপ হ'লে বড় বৌদি' কিছু নেবেন। আছে না কিরে?"

মেয়েটী বলে, "নারে, আতপ নয়, সেদ্ধ চাল।"

এমন সময় দোতলায় গিন্নীর ছোট ছেলের ঘর থেকে ডাক আসে, "নীরো, চায়ের কাপ্ নিয়ে যাও।"

নীরো স্মিতমুখে ছুট্‌লো দোতলায়। মেয়েটী অবাক্ চোখে তার দিকে তাকাতে তাকাতে অন্য বাড়ী চলে যায়।

আরও একবছর কাটে। নীরোরও দিন যায় সহজ সুন্দরভাবেই। লোকে তার নামে কুৎসা রটায়। তার চাক্‌রীটা ছাড়াতে চেষ্টা করে। তার মনিব-গিন্নীর কাছে বলে তার নামে বিশ্রী বিশ্রী কত কথা। কিন্তু তাদের এত চেষ্টা সব বিফল হয়। গিন্নী বলেন তাদের বেশ

মিষ্টি করে বুঝিয়ে, "আরে বাপু, ঝিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ কাজের; তার অন্যদিক দেখার আমার দরকার কি? সেই যে কি একটা কথা আছে না, 'তোর পায়ে পড়ি, না তোর কাজের পায়ে পড়ি'—আমার হ'ল তাই।"

যারা লাগাতে গেছ্‌ল তাদের এ কথায় মন শান্ত হয় না। তারা বলে চাপাসুরে গিন্নীকে, "তোমার ঘরে সোমত্ত ছেলে, ওকে ছাড়িয়ে দেওয়াই ভাল।"

মা কখনও সন্তানের দোষ দেখ্‌তে পান্ না এটা স্বাভাবিক। মাতৃস্নেহ এমনই প্রবল। গিন্নীও দেখ্‌তে পান না ছেলের দোষ। তিনি একটু রুখে উঠে জোর দিয়ে বলেন—"বাপু, আমার ছেলে অমন নয়—তোমরা মাথা ঘামাতে এস না আমার সংসার নিয়ে।" বলে' তিনি সেখান থেকে উঠে চলে' যান।

নীরোর কানে সমস্ত কথাই পৌঁছায়—কিন্তু সে গায়ে মাখে না। প্রতিবাদ কর্‌তেও যায় না, বরং এক ঝলক হাসির লহর তার মুখে-চোখে খেলে যায়।

নীরো খবর পেয়েছে, তার সতীনের একটা কালো মোটাসোটা সুন্দর ছেলে হয়েছে। শুনে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখ আবার হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যাক্, ভালই হয়েছে—তা' হ'লে তার স্বামীর বংশ আর লোপ পাবে না।

একদিন দুপুর বেলা উঠোনে বসে' সে তেঁতুল কাট্‌ছে, এমন সময় কে তাকে ডাকে, "দিদি!"

এই ডাক কানে এসে বাজ্‌তেই, সে চম্‌কে মুখ তুলে দেখে তার সুমুখে একটী অবগুণ্ঠিতা বালিকা নতমুখে দাঁড়িয়ে। অবাক্ হ'য়ে সে কিছুক্ষণ মেয়েটির ম্লান মুখখানির পানে চেয়ে চেয়েও যখন তাকে চিন্‌তে পারে না, তখন সে শুধায়, "আমাকে ডাক্‌ছ না কি?"

মেয়েটির কণ্ঠস্বর তখন বুজে এসেছে। অস্পষ্ট কণ্ঠে সে বলে, "হাঁ দিদি।" বল্‌তে বল্‌তে সে কেঁদে ফেলে। তারপর আবার ধরাগলায় বলে, "দিদি, মিস্ত্রীর বড্ড অসুখ। মাসখানেক হোলো ভুগ্‌ছে। হাতে একটিও পয়সা নেই যে, ডাক্তার ডাক্‌বো।"

তারপর আর সে কিছুই বল্‌তে পারে না, ভিখারিণীর মত করুণ চোখে সতীনের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

নীরো এতক্ষণে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিয়ে সতীনের আপাদমস্তক একবার বেশ করে' চেয়ে দেখে সে দ্রুতপদে দোতলায় চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই দশটি টাকা এনে মেয়েটীর হাতে গুঁজে দেয়। সে ব্যথাভরা চোখ দু'টী তুলে একবার তার সতীনের দিকে তাকিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। তখন তার ম্লান মুখখানার 'পরে ঝরে' পড়ে কৃতজ্ঞতার দু' ফোঁটা অশ্রু।

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

পুরাতনের পরিচয়

সে কালের দারোগার কাহিনী

মনোহর ঘোষ

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে স্থান এবং সময়ের প্রভেদে বস্তু মাত্রেরই ফলাফলের বিভিন্নতা হয়। উদ্ভিদ জগতে দেখা যায় যে, উপযুক্ত স্থানে এবং উচিত কালে বৃক্ষরোপিত না হইলে নিকৃষ্ট ফলোৎপাদিত হয়। শ্রীহট্ট হইতে কমলা লেবুর বৃক্ষ আনিয়া অন্য স্থানে রোপণ করিলে সহস্র যত্নেও সেইরূপ মিষ্ট এবং সুরস ফল হয় না; অধিক হইলেও অম্লময় নারেঙ্গা হইয়া যায়। মানব মণ্ডলীর মধ্যেও সম-প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্য দেশ কালের বৈষম্য নিবন্ধন নরোত্তম কিংবা নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। বঙ্গ দেশের ইতি-হাসাভিজ্ঞ মহাশয়েরা জানেন যে লর্ড ক্লাইব্ যদি খৃষ্টীয় আঠার শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম গ্রহণ না করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দশা অতি শোচনীয় হইত। বাল্য কালে চৌর্য্যবৃত্তিতে ক্লাইবের দৃঢ় অনুরাগ দেখিয়া উপায়ান্তর অভাবে তাঁহার বান্ধবেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক বণিকসমিতির অধীনে এক কেরাণীগিরী উপলক্ষ করিয়া কিন্তু বাস্তবিক ওলাউঠা রোগে কিংবা হিংস্রক পশ্বাদির মুখে মরিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে ঐ পাপ বিদায় করিয়া দেয়। সেই পাপ ভারতভূমে পদার্পণ করিয়া কিয়ৎকালের মধ্যে ফরাসীসদিগকে পরাজয় করিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়া, কৃত্রিম লিপি দ্বার উমিচাঁদকে প্রতারণা করিল এবং অবশেষে কয়েক জন রাজদ্রোহীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, পলাশীতে এক ছায় যুদ্ধ দেখাইয়া, বালক সেরাজদ্দৌলার হস্ত হইতে বঙ্গাদি প্রদেশ ইংরাজ বণিকদিগের করে চিরকালের জন্য প্রদান করিল। সেই যে ব্যক্তিকে পাপ বিবেচনায় তাহার পিতা মাতা মারিবার জন্য গ্রীষ্ম প্রধান দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিল,

মনোহর ঘোষ জাতিতে গোয়ালা; একডালা পরাণপুর গ্রামে তাহার বাসস্থান ছিল। নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একডালা পরাণপুর, পূর্ব্বস্থলী,—যাহার অন্যতম নাম পূবধুল,—চুপি, কাঁকশিয়ালী, গুপিপুর, মেড়তলা প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম মালার দানার ন্যায় পাশাপাশি এক ছত্রে ভাগীরথীর কূলে স্থিত। সকল গ্রামেই ভদ্র বিশিষ্ট লোকের বাস। পূবধুল গ্রামে পূবধুল থানা সংস্থাপিত ছিল; এবং এই গ্রাম বঙ্গ ভাষার প্রসিদ্ধ লেখক মৃত অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মস্থান। গঙ্গাপারে বঙ্গজ কায়স্থ-দিগের বাস অতি বিরল কিন্তু পূর্ব্বস্থলীতে এক ঘর বঙ্গজ কায়স্থ স্থাপিত ছিল এবং অক্ষয়বাবু সেই কায়স্থ কুলোদ্ভব ছিলেন। চুপি গ্রামে খ্যাতনামা দেওয়ান মহাশয়দিগের বাস এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনের ভক্তিরসের গীত এখনও আমাদিগের মধ্যে আদরণীয়। গুপিপুর মেড়তলাও এক বিগ্রহের স্থান বলিয়া ঐ অঞ্চলের লোকের নিকট পবিত্র স্বরূপে পরিগণিত। কাঁকশিয়ালীতে এক নীলকুটী ছিল। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক গ্রামেই ব্যবসায়ী এবং শিল্প-জীবী লোক বাস করিত এবং ইষ্টাকালয়েরও অভাব ছিল না। আমি যখন দেখিয়াছি, তখন ভাগীরথী নদীর প্রধান স্রোত বহুদূরে বেলপুকুর গ্রামের নীচে বহমান ছিল এবং পূর্ব্বস্থলী গ্রামের নিকট কেবল একটি ক্ষুদ্র খালের ন্যায় গঙ্গায় জল প্রবাহিত হইত এবং তাহা দিয়া শুষ্ককালে নৌকায় গমনাগমন করা কঠিন হইত। কিন্তু শুনিয়াছি যে, এক্ষণে সেই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

মনোহরের পিতার নাম আমি অবগত নহি। তাহার শরীরের অবয়ব কিঞ্চিৎ পরে বিবৃত করিব।

সে কয়েক বৎসর পরে গৌরবের মুকুট শিরে ধারণ করিয়া জন্মভূমি প্রত্যাগমন করিল, স্বদেশের রাজার নিকট আদৃত হইল, উপাধি পাইল এবং সর্ব্বলোকের নিকট সম্মানিত হইল। ধনের কথা বলিবার আবশ্যক নাই, উপরন্তু সেই ক্লাইব চিরস্মরণীয় ভাবে ইংরাজের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। যে কলুষিত প্রকৃতি দোষে ক্লাইব বাল্যকালে সহধ্যায়িদিগের পুস্তক ও খাদ্য দ্রব্য, ও প্রতিবাসীর বাগিচার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তন্মধ্যস্থিত বৃক্ষের মূল্যবান ফল, অপহরণ করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা জ্ঞান করিতে পারে নাই, অধিক বয়সে সেই প্রকৃতি প্রভাবে, অনুকূল অবস্থা সহকারে নির্ব্বোধ এবং দুর্ব্বল বালকের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে পাপ কিম্বা অধর্ম্মাচরণ বলিয়া বিবেচনা করিবে কেন?

কিন্তু এই পাপক্ষেত্রে ক্লাইব একাকী নহে; সেকেন্দর সা, *—যাঁহাকে ইংরাজি ভাষায় বীরপ্রবর আলেকজণ্ডর বলে,—তৈমুর লং, জঙ্গিশ-খাঁ, মহম্মদ গজনী, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদয় খ্যাত্যাপন্ন দিগ্‌বিজয়ী যোদ্ধাগণের একই মনোবৃত্তি এবং একই কার্য্যপ্রণালী। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, সিবিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগবেদের বঙ্গানুবাদ করিয়া যে কার্য্য করিতেছেন, তাহা সত্য যুগে হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া পূজা করিতেন। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে, আমার গরিব মনোহর দ্বাপরে আবির্ভূত হইলে, দ্বিতীয় জরাসন্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত।

মনোহরকে পরমেশ্বর বল, বীর্য্য এবং সাহস দান করিতে কৃপণতা করেন নাই এবং জটিল বুদ্ধিও তাহার কম ছিল না। তাহার বল ও কুস্তি বিদ্যা সম্বন্ধে আমি শুনিয়াছি, যে সে চিত হইয়া শুইয়া থাকিত এবং তাহার গলার উপরে এক খণ্ড বাঁশ দিয়া বাঁশের দুই প্রান্তে দুই জন বলিষ্ঠ মনুষ্য চাপিয়া বসিলেও মনোহর মৃত্তিকার উপরে হস্ত পদের ভর করিয়া বাঁশ সমেত সেই দুই জন মনুষ্যকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিত। মনোহর লাঠির ভর করিয়া সাধারণ উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিতে ক্লেশ বোধ করিত না। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার মধ্যে কুড়ি ক্রোশ গ্রাম্য রাস্তা হাঁটিতে পারিত। লাঠিয়ালি, সিন্ধু চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, নৌকায় ডাকাইতি—ইহার সকল কার্য্যেই সে পরিপক্ক ছিল। অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সে এমন প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি প্রকাশ করিত, যে তাহা দেখিয়া তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে তাহাদের নেতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিত না। কথিত আছে যে তেহট্ট গ্রামে এক ধনাঢ্য কলুর বাড়িতে নয়না মানিকা নামক দুই জন প্রসিদ্ধ ডাকাইতের দলের সহিত মনোহর ডাকাইতি করিতে গিয়া অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়। কলুর ইষ্টকালয় বাড়ী ছিল এবং পুরজন ছাতের উপর উঠিয়া এমন ভাবে সেই স্থান হইতে ইট ও ঝামা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, যে দস্যুদিগের বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়ান অতি কঠিন হইয়া

* সেকেন্দর সার নিকট একজন দস্যুদলের নেতা ধৃত হইয়া আসিলে তিনি তাহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে দস্যু উত্তর করিল যে "আমি এমন কোন্ কার্য্য করিয়াছি যাহা আপনি করেন নাই। আমার ন্যায় আপনারও পর দ্রব্য অপহরণ করা ব্যবসা। আমি অল্প বিস্তর ধন চুরি করি, আপনি রাজার ভাণ্ডার লুঠিয়া থাকেন। আমি একটি গৃহস্থের বাড়ী আক্রমণ করি, আপনি রাজ্য দেশ ছারখার করেন। আমি শতাবধি লোক সমভিব্যাহারে দস্যুবৃত্তি পরিচালন করি কিন্তু আপনি লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সেনা লইয়া দেশ অধিকার করেন। আমি আমার অভীষ্টসাধনার্থ কখনও কখনও দুই এক জন মানুষকে আঘাত কিম্বা বধ করিয়াছি, আপনার প্রত্যেক যুদ্ধে সহস্রাধিক মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী, প্রভৃতিকে আপনি যমালয়ে প্রেরণ করেন। আমার কার্য্যে কদাচিৎ কখনও একখানা গৃহ দগ্ধ হয়, আপনি শত শত নগর এবং জনপদ উচ্ছন্নে দিয়াছেন! আমি কেবল আমার পেটের দায়ে এই দুর্বৃত্তি করিতে বাধিত হইয়াছি কিন্তু আপনার সে ওজর নাই, কারণ আপনি রাজার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমার যেমন জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের অভাব আপনার তেমনই সকল সম্পূর্ণ ছিল। রাজ্য ধন সকলই প্রচুর। তথাপি আপনি পরদ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারেন নাই। অতএব আমাতে আর আপনাতে কেবল লঘু গুরু প্রভেদ। আমার শিরশ্ছেদ করিলে যদি আমার পাপের উচিত দণ্ড হয়, তবে আপনাকে সহস্র খণ্ডে ছেদন না করিলে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না"। কথিত আছে যে এই উচিত বক্তা দস্যুকে সেকেন্দর সা মার্জ্জনা করিয়াছিলেন।

উঠিল। নয়না প্রভৃতি প্রস্থানের পরামর্শ স্থির করিল, কিন্তু মনোহর তাহা অতি লজ্জাকর কার্য্য বিবেচনা করিয়া বাহির বাড়ীর একটা ঘরের কাষ্ঠের কবাট ও ঝাঁপ খুলিয়া, রোমীয় সেনারা পূর্ব্ব কালে দুর্গ আক্রমণ করার সময় যেমন স্বীয় স্বীয় ঢাল দ্বারা তাহাদের মস্তক এবং শরীর আচ্ছাদন করিয়া যাইত, মনোহরও সেই রূপ এই কবাট এবং ঝাঁপ দ্বারা শরীর এবং মস্তকাবৃত করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিল। মনোহরের সঙ্গীগণ তাহার কথামত কার্য্য করিয়া অনায়াসে স্বকার্য্য সাধন করিল। মনোহর কখনও রোমীয় ইতিহাস পাঠ করে নাই কিন্তু যুদ্ধ বিষয়ে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেই স্বভাবত তাহার মনে নিক্ষিপ্ত ইট প্রস্তরাদির আঘাত রক্ষার জন্য এইরূপ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। দক্ষিণে কালনার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে মৃজাপুরের খাল হইতে উত্তর গোটপাড়া এবং অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত গঙ্গার তট মনোহরের কার্য্য ক্ষেত্র ছিল; এই স্থানের মধ্যে সুবিধা মতে নৌকা আসিলে নৌকাওয়ালাদের রক্ষা ছিল না। কয়েকবার কৃষ্ণনগরের সাহেব দিগের মেস কোর্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বোঝাই নৌকা ও জজ ব্রাউন সাহেবেরও দ্রব্যাদি বোঝাই নৌকা মনোহর ভাগীরথীর ধারে আক্রমণ করিয়া অনেক টাকার মাল অপহরণ করে। কিন্তু মনোহর তাহার নিজ থানায় অর্থাৎ পূব্ধুল থানার এলাকাস্থিত গ্রাম সকলে কদাচিৎ চুরি ডাকাইতি করিত, কৃষ্ণনগর জেলার অধীন স্থানেই তাহার কার্য্যস্থল ছিল। কারণ থানা তাহার বাস স্থানের অতি নিকট থাকাতে, পূব্ধুলের পুলিস আমলার অধিকারের মধ্যে চৌর্য্য-বৃত্তি পরিচালন করিলে সর্ব্বদা তাহারা বিরক্ত করিবে বলিয়া, সে তাহাতে ক্ষান্ত থাকিত, এবং ইহাও শুনা হইয়াছে যে উক্ত পুলিস কর্ম্মচারীগণের সহিত মনোহরের এরূপ গোপনীয় বন্দোবস্ত ছিল, যে পূব্ধুলের থানার মধ্যে শান্তি ভঙ্গ না হইলে, তাহারা মনোহরের অন্য কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিবে না। পূব্ধুলের নিকটবর্ত্তী কয়েক খানা গ্রামে মনোহরের অসীম আধিপত্য ছিল এবং অধিবাসীগণের মধ্যে অল্প ব্যক্তি ছিল, যে মনোহরকে ভয় না করিয়া কার্য্য করিতে পারিত। কাঁকেশিয়ালীর বাজারে অন্যান্য গোয়ালিনীর সঙ্গে মনোহরের ভগিনী ও স্ত্রী দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইত, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে মনোহরের পসরা বিক্রীত না হইলে, ক্রেতারা অন্যের দধি দুগ্ধের প্রতি হস্তার্পণ করিতে পারিত না। গ্রামের মধ্যেও মনোহর যখন যাহার নিকট কিছু চাহিত, কিম্বা যাহাকে কোন কার্য্য করিতে অনুরোধ করিত, সে তাহা না দিলে কিম্বা করিলে অচিরাৎ তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইত। মনোহরের পিতামহীর মৃত্যু হইলে পরে সে সমারোহ পূর্ব্বক তাহার শ্রাদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া পূর্ব্বস্থলী, চুপি প্রভৃতির কাঁসারীর নিকট প্রচুর পরিমাণে তৈজস, বস্ত্র-বিক্রেতার নিকট বস্ত্রাদি, ময়রার নিকট চিঁড়া, এইরূপ সমুদয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ভিক্ষা চাহিল। এই ভিক্ষা বলি রাজার নিকট বামন দেবের ভিক্ষার ন্যায়। না দিলেও নয় এবং দিতে হইলেও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিতে হয়। মনোহর পিতামহীর শ্রাদ্ধের ভিক্ষা চাহিয়াছে লোকে তাহা না দিয়া কেমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? তুমি আজি দশ টাকার দ্রব্য দিলে না, কল্য তোমার সে একশত টাকার ক্ষতি করিবে। বিশেষ মনোহরের বিরুদ্ধে রাজ দরবারেও প্রতিকার পাওয়া দুঃসাধ্য, কারণ সহসা কোনও ব্যক্তি মনোহরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহস করিবে না। এমতাবস্থায় কেহই মনোহরকে তাহার ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করিতে পারিল না এবং এই রূপে সে তাহার পিতামহীর শ্রাদ্ধ কার্য্য অনায়াসে তাহার ইচ্ছানুযায়ীরূপে সম্পন্ন করিল। চৌর্য্য বৃত্তি পরিচালনে মনোহরের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র মায়াদয়ার উদ্ভব হইত না এবং যে সকল ঘটনায় প্রাণ বধ করার আবশ্যক না থাকিত, তাহাতেও প্রাণ নষ্ট করা তাহার নিকট আনন্দ জনক কার্য্য বলিয়া বোধ হইত। তাহার এক দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন।

মনোহর ধৃত হইলে পরে নবদ্বীপের একজন অতি প্রধান অধ্যাপক মনোহরের দুর্ব্বৃত্ততার দৃষ্টান্ত আমার নিকট ব্যক্ত করেন; ইহা তাঁহার চক্ষের উপরে ঘটিয়াছিল। তিনি যে প্রণালীতে বর্ণনা করিয়াছিলেন আমিও পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে সেই প্রণালীতে তাহা বিবৃত করিব। "আমি প্রতি বৎসর ৺শারদীয় পূজার কয়েক দিবস পূর্ব্বে

বার্ষিক বৃত্তি আহরণের নিমিত্ত শিষ্য সেবকের নিকট যাইয়া থাকি। আমি যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসরও দুই মাল্লার একখানা ছোট নৌকায় একজন শিষ্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন ভাণ্ডারী লইয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রার নিমিত্ত প্রাতঃকালে নবদ্বীপের ঘাট হইতে যাত্রা করি। মধ্যাহ্ন সময়ে কাঁকশিয়ালীর বাজারে উঠিয়া রন্ধনাদি করিয়া সেই দিবসের জন্য এক প্রকার আহারের কার্য্য শেষ করিলাম; রাত্রিতে পাক না করিয়া জলযোগের অভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া মাঝিকে যতদূর সাধ্য অগ্রসর হইতে আদেশ করিলাম। অল্পকালের মধ্যেই রোকনপুরের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, কিন্তু তখন আমার পাচক ব্রাহ্মণ বলিল যে, "আমি একটা কথা মহাশয়কে জ্ঞাত করিতে এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, শুনিয়া এখান হইতে অধিকদূর যাওয়া না যাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। কাঁকশিয়ালীর বাজারে আমার সহিত মনোহর ঘোষের দেখা হয় এবং আমাকে নূতন লোক দেখিয়া আমরা কে কোথায় যাইতেছি, তাহার তথ্য জানিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মনোহর আমাকে চিনে না, কিন্তু আমি তাহাকে চিনি এবং সেই নিমিত্ত আমি তাহাকে আমাদের পরিচয় দিলাম না। লক্ষণ বড় ভাল নয়, বিশেষ পূজার সময় নির্জ্জন স্থানে এই বেটার হস্তে পড়িলে আমাদের মঙ্গল নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ কোন গ্রামের মধ্যে যাইয়া কোনও ব্যক্তির আশ্রয় লইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। ভাবিলাম, যে অনতি দূরে বহিরগাছীর গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাড়িতে যাইয়া আমি ও আমার সমভিব্যাহারী সকলে অতিথি হইয়া রাত্রি কালটা অতিবাহিত করিব। বহিরগাছীর গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা কৃষ্ণনগরের রাজার গুরু বংশ; বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী। বাড়িতে ইষ্টকালয় আছে এবং রোকনপুরের বাজারও তাঁহাদের অধিকারের মধ্যে। বাজারে উঠিয়া এক দোকানে শুনিলাম যে, গুরু ভট্টাচার্য্যদিগের এক জন যাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল এবং যাঁহার বাড়িতে যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তিনি কিছু কাল পূর্ব্বে এই বাজার হইয়া নিকটস্থ এক গ্রামে গিয়াছেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এবং বাজারে অপেক্ষা করিলে আমরা তাঁহার সঙ্গে বাহিরগাছী যাইতে পারিব। আমি বাজারে অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম যে আমাদের পশ্চাতে এক খানা যাত্রা ওয়ালার নৌকা আসিয়া সেই বাজার ধরিল। তাহারাও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পূজার সময় এক জনের বাড়িতে যাত্রা করিতে যাইতেছে। এবং তাহাদের মধ্যে কয়েক জন কিছু দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সেই দোকানে উপস্থিত হওয়াতে, কথায় কথায় আমি যে বিভীষিকা দেখিয়াছি, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিয়া অদ্য আর অধিক দূরে যাইতে নিষেধ করিয়া, কল্য প্রাতে দুই নৌকা একত্রে যাওনের প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু হতভাগারা আমার কথা গ্রহণ করিল না; বলিল যে তাহারা অনেকগুলি লোক নৌকায় আছে, দশ পাঁচ জন ডাকাইতে তাহাদের কিছু করিতে পারিবে না। ক্ষণেক পরে দেখিলাম, যে যাত্রাওয়ালারা নৌকা খুলিয়া বেহালা নামক চর বহিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু সেই সময় গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত প্রখর থাকায় বিশেষ বড় নৌকা এবং প্রচুর সংখ্যক মাল্লার অভাবে ধীর গতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। এদিকে প্রদোষ সময় উপস্থিত হইল এবং আমি যে ব্যক্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম, তিনি আসিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে আশ্বাস প্রদান করত বাজারে তদীয় যে কিছু আবশ্যকীয় কার্য্য ছিল, তাহা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কেবল মাত্র অন্ধকার হইয়াছে এমন সময় আমাদের কর্ণে বহুদূরে চরের দিক হইতে একটা ভয়ানক শোর গোলের শব্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার পাচক ব্রাহ্মণ অমনি বলিয়া উঠিল যে "ঐ গো শুনুন মহাশয় পাপিষ্ঠ বেটা বুঝি কি না কি করিল"। আমি স্তম্ভিত হইলাম। বাজারে যে দুই চারি খানা দোকান ছিল, তাহার দোকানিরা শশব্যস্তে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, স্ব স্ব গ্রামে প্রস্থান করিল এবং আমার গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে "এক্ষণে শীঘ্র চলুন, ইহা ভাবিয়া আপনি কি করিবেন, মধ্যে মধ্যে এইরূপ কারখানা হইয়াই থাকে"। পর দিবস

প্রাতে সেই বেহালার চর বহিয়া যাইতে রোকনপুর হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ ব্যবধান একস্থানে আসিয়া দেখিলাম, যে, একখানা চড়ন্দার পান্সিনৌকা একটা ঝোপের ধারে জলের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে; আমার মাঝি কহিল যে ইহা সেই যাত্রাওয়ালাদিগের নৌকা, কোন সন্দেহ নাই। চড়ার উপরেও একটা ভগ্ন পেটারা ও কয়েক খণ্ড ছিন্ন বস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। নৌকার যাত্রিদিগের কাহারও কোন চিহ্ন কিম্বা অনুসন্ধান পাইলাম না। তাহাদের মধ্যে কেহ পলায়ন করিতে পারিয়াছিল, কি সকলেই সেই দুরাত্মার হস্তে যমভবনে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। আমার পাচক বলিল, যে নৌকার কেহই বাঁচে নাই। তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, যে অসম্ভব; কারণ নৌকার মধ্যে কয়েকটি বালক ছিল, তাহাদিগকেও কি মারিয়াছে? পাচক মাথা নাড়িয়া কহিল যে, "আপনি ও বেটার চরিত্রের কথা জানেন না, তাহার নিকট কাহারও অব্যাহতি নাই"।

মনোহরের আর এক গুরুতর দোষ ছিল; তাহার রিরংসা অতি প্রবল ছিল। এই অধম প্রবৃত্তির সন্তোষের নিমিত্ত তাহার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না। অধিক কি বলিব, বাঞ্ছিত পাত্রী সহজে সম্মত না হইলে, মনোহর তাহার গৃহ প্রবেশ করিয়া বলাৎকার করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। লাঞ্ছিত ব্যক্তিরা ভীরু স্বভাব বশত বিশেষ জাতি যাওয়ার এবং লজ্জার ভয়ে ও পর্য্যাপ্ত সাক্ষী সাবুদ না পাওয়ার সম্ভাবনায়, গায়ের ঝাল গায়ে মরিতে দিত। প্রতিকারের অন্য কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া, কেবল পরমেশ্বরকে তাহাদিগকে এই পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে ডাকিত।

মনোহরের বিলক্ষণ ভাগ্যবল ছিল; কারণ তাহার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি এমন দুই পুলিশ থানার নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া যদৃচ্ছারূপে দুষ্কার্য্য করিতে কৃতকার্য্য হইত? কৃষ্ণনগরের হাকিমেরাও মনোহরের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন এবং মণ্টে্সর সাহেব একজন অতি তেজস্বী ও তীক্ষ্ণ মাজিষ্ট্রেট ছিলেন,—তিনিও এই দুরাত্মাকে ফাঁদে ফেলিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও মনোরথ সিদ্ধি করিতে পারেন নাই। জজ ব্রাউন সাহেবের দ্রব্যাদির নৌকা লুঠ করার পর হইতে তাঁহারও মনোহরের উপর কোপ ছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে দণ্ডনীয় করার উপায়াভাবে কেবল উপলক্ষের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এইরূপে কি অধিবাসী, কি পুলিস আমলা, কি হাকিম, মনোহর সকলেরই বিরক্তি-ভাজন হইয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ন্যায় সে সকলকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া গাত্রে ফুঁ দিয়া বেড়াইত। প্রথমে আমি মনোহর সম্বন্ধে এই সকল কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, ইহার মধ্যে অনেক রঞ্জিত বৃত্তান্ত বলিয়া সন্দেহ করিতাম, কিন্তু পশ্চাতে আমার এই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল, প্রত্যুত তখন ভাবিলাম, যে আমি মনোহরের সমুদয় দুশ্চরিত্রের কথা শুনিতে পাই নাই।

পূজার সময় আমার থানায় যে দুই নৌকার ডাকাইতি হইল, তাহাও মনোহরের কার্য্য বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল এবং রামকুমার প্রভৃতি অনেকে মনোহরকে কোন কৌশলে এবং এই দুই ঘটনার উপলক্ষে ধরিয়া আনিয়া প্রচুররূপে প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিতে বারম্বার পরামর্শ দিল, যে তাহা হইলে মনোহর কিছু কালের নিমিত্ত ক্ষান্ত থাকিবে; কিন্তু আমি নূতন কর্ম্মচারী এমন যথেচ্ছাচারী অন্যায় কার্য্য করিতে আমার সাহস হইল না। তাহা দেখিয়া আমার পরামর্শদাতারা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিল, যে এমন ভীত হইয়া কার্য্য করিলে আমি কখনই ভালরূপে দারোগাগিরী করিতে পারিব না।

যাহা হউক এইরূপে রাস পূর্ণিমার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাসপর্ব্বে শান্তিপুরে যেমন রঙ্গ তামাসা এবং বহু লোকের সমাগম হয়, নবদ্বীপেও এই পূর্ণিমায় পটপূজা উপলক্ষে সেইরূপ সমারোহ হইয়া থাকে। নবদ্বীপের পট-পূজা অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার। নামে পট-পূজা কিন্তু বাস্তবিক ইহা নানাবিধ প্রতিমার পূজা। দশভুজা, বিন্ধ্যবাসিনী, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠিত হয়। নদীয়া, বুইচপাড়া ও তেঘরির প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই এক এক খানি করিয়া প্রতিমা হয়। পটপূজা কোন ব্যক্তি কিম্বা গৃহস্থ বিশেষের খাস পূজা নহে, প্রত্যেক পল্লীতে বারোইয়ারি-স্বরূপ এই পূজা হয়, এবং

ইহাতে বড় ছোট সকল অধিবাসিগণেরই উৎসাহ থাকে। আমার পাড়ার প্রতিমা শ্রেষ্ঠ হইবে বলিয়া সকলেরই ইচ্ছা এবং যত্ন থাকে, এবং বস্তুত সকল প্রতিমাই সুগঠিত এবং সুসজ্জিত হয়। কৃষ্ণনগর অঞ্চলের কুমার কারিকরেরা অতি প্রসিদ্ধ এবং স্ত্রীপুরুষ অনেকে ডাকের সাজ প্রস্তুত করার কার্য্যে অতিশয় নিপুণ। আমি শুনিয়াছি যে টোলের অধ্যাপক অনেক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাও সখ্ করিয়া প্রতিমার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন। সুতরাং অন্য স্থানে লোকে যাহা বহুব্যয়ে সমাধা করিতে পারে না, তাহা নবদ্বীপ অধিবাসীগণ স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা অনায়াসে অতি সুন্দররূপে সম্পাদন করে। পট-পূজার প্রতিমাগুলি অন্যস্থানের প্রতিমা অপেক্ষা অধিক উচ্চ এবং অনেক পুত্তলি সমবেত; কিন্তু তথাপি ঐ গুলির এক বিশিষ্ট গুণ আছে যে, প্রতিমাগুলি অত্যন্ত হালকা এমন কি, পাঁচ ছয় জন মজুরে তাহা স্কন্ধে করিয়া নাচাইতে পারে।

নবদ্বীপের পট-পূজা দেখিতে বিশেষ প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন অনেক দূর হইতে লোক আইসে। কেবল তামাসা দেখিবার নিমিত্ত নহে, এই উপলক্ষে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় পবিত্র নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করার মানসেও বহু লোকের সমাগম হয়। অনেকে আবার নৌকায় আসিত এবং এই পুণ্যস্থানে ত্রিরাত্র বাস করিয়া বিসর্জ্জনান্তে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইত। এই পর্ব্ব দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগরের বারাঙ্গনারা অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত হইয়া নৌকাযোগে আসিত এবং তাহাদের অলঙ্কারের প্রতি দস্যুদিগের বিশেষ প্রলোভন জন্মিত। ইতিপূর্ব্বে বেশ্যারা নবদ্বীপের ঘাটে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে চলিয়া যাইত কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ মনোহর ইহাদিগের নৌকা আক্রমণ করাতে, তাহারা বিসর্জ্জনের পরক্ষণেই নৌকা খুলিয়া কৃষ্ণনগর গমন করিত, এবং থাকিবার আবশ্যক হইলে রাত্রিকালে নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের মধ্যে আসিয়া বাস করিত। দারোগারা সেই কারণে ঘাটের চৌকিদার দ্বারা যাত্রি-দিগকে সময়শিরে নৌকা লইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেন।

এতাদৃশ সময়ে, পটপূজার বিসর্জ্জনের দিন উপস্থিত হইল। যে সকল স্থানে বহু প্রতিমা হয়, তাহার সর্ব্বত্রই বিসর্জ্জনের দিবস কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং সময়ে দর্শকদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সমুদয় প্রতিমা আনিয়া একত্রিত করা হয় এবং ইহাকে কৃষ্ণনগর অঞ্চলে প্রতিমার আড়ঙ্গ কহে। পট-পূজার প্রতিমার আড়ঙ্গ নবদ্বীপের পোড়া-মা তলা, কাঁসারী শড়ক প্রভৃতি স্থানের রাস্তায় বেলা আড়াই প্রহরের সময় আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই শেষ হইয়া যায়। বলিবার আবশ্যক নাই, যে এই আড়ঙ্গ দেখিতে অধিক ভীড় হয় এবং শান্তি রক্ষার নিমিত্ত পুলিশ কর্ম্মচারিরা তথায় উপস্থিত থাকেন। আমি সেই চিরপ্রথা অনুসারে আমার চারিজন বরকন্দাজ ও কতকগুলি চৌকিদার লইয়া আড়ঙ্গে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে কখনও এই তামাসা দেখি নাই। শান্তি-রক্ষার প্রতি আমার যত না দৃষ্টি ছিল, তদপেক্ষা প্রতিমার গঠন ও কারুকার্য্য দেখিতে আমার অধিক মনোযোগ হইল।

এমন সময় আমার সঙ্গী একজন চৌকিদার বলিয়া উঠিল যে "এই দেখুন মনোহর যাইতেছে" এবং পথের যে ধারে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম, তাহার বিপরীত দিকে কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সে একজনকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ একজন বরকন্দাজ দ্বারা তাহাকে ডাকিয়া আনাইলাম। মনোহর আসিয়া আমাকে নতশিরে দণ্ডবৎ করিল। দেখিলাম, তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; বোধ হয়, আরও সুখ সচ্ছন্দের অবস্থায় তাহা গৌরবর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারিত। দেহ মধ্যম ছন্দ, কিন্তু গঠনে প্রচুর বলের আকর দৃষ্ট হইল। অতি প্রশস্ত বক্ষ-স্থল, পুষ্ট বাহু যুগল, কোমর চিকন; উরু ও তন্নিম্নস্থ অঙ্গদ্বয়ও বলের লক্ষণ বিশিষ্ট; গলদেশ মোটা ও খাটো যাহাকে পারসী ভাষায় "কোতা গর্দ্দান" বলে। চক্ষু ছোট, পিট্ পিট্ করিয়া তাকায় এবং আমার বোধ হইল তাহা কিঞ্চিৎ ধূসরবর্ণ কিন্তু চক্ষু ভিন্ন মুখের অন্য কোন অঙ্গ নিন্দনীয় নহে। হঠাৎ দেখিলে মনোহরকে শ্রীযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাহার কলুষিত অন্তরের প্রতিভা মুখে বিলক্ষণ ব্যক্ত হইত। কথা কহিতে দেখিলাম, যে তাহার দন্তে মিশির

কালিমা আছে এবং উপর পাটির মধ্যস্থিত দন্ত দুইটির প্রত্যেক দন্তে পাশা খেলার পাষ্টিতে যেরূপ গোল ছক্ কাটা থাকে, সেইরূপ এক একটী ছক্ কাটা রহিয়াছে। পরিধানে একখানা ঢাকাই ধুতি, গায়ে চাদর এবং পায়ে নাগোরা জুতা। তখন ইংরাজী জুতার অধিক চলন ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মনোহরের পায়ে স্প্রিংওয়ালা জুতা দেখিতাম। মনোহরের পরণ পরিচ্ছদে এবং ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইল যে ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত হওয়া তাহার সম্পূর্ণ অভিলাষ ছিল এবং প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়াও অনেকের ভ্রম হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ব্যাটা চুলে ধরা পড়িত; কারণ গোয়ালাদিগের সাধারণ প্রথানুযায়ী তাহার চুল গুচ্ছাকার ছিল।

যে পর্য্যন্ত আমি মনোহরকে চক্ষে দেখি নাই, সে পর্য্যন্ত আমি মনে মনে একটা কিম্ভূত কিমাকার ব্যক্তি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম এবং আরও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, যে তাহার সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎ হইলে, আমি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিব। কিন্তু তাহাকে দেখিবা মাত্র আমার মনের সেই ভাব দৃঢ় রহিল না; মনে হইল, যে এমন সুপরিচ্ছদ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হঠাৎ বিনা কারণে গালিগালাজ করা কিম্বা অপ্রিয় বাক্য বলা, আমার পক্ষে ভদ্র ব্যবহার হইবে না. অতএব আমি তাহাকে মিষ্ট কথায় সম্ভাষণ করিয়া আমার থানার এলাকার মধ্যে দৌরাত্ম্য না করিতে অনুরোধ করিলাম; তাহাতে সে মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উত্তর করিল, যে তাহার শত্রুরা আমার নিকট তাহার নিন্দা করিয়াছে, সে কোন্ কালে ঘি খাইয়াছিল, তাহার গন্ধ এখনও তাহার হাতে আছে, ফলে সে এখন কোন কুকর্ম্ম করে না। এইরূপ অল্প কয়েকটি কথা কহিয়া সে পুনরায় আমাকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। মনোহরকে আমি সহজে ছাড়িয়া দিলাম দেখিয়া, আমার পারিষদগণ আমার প্রতি যারপর নাই বিরক্ত হইল। তাহারা কহিল, যে মনোহর ভাল মানুষের যম এবং তাহার প্রতি আমার এইরূপ শান্ত ব্যবহার দেখিয়া নিশ্চয়ই সে অদ্য রাত্রে, না হয় শীঘ্র, পুনরায় আমাকে কষ্টে ফেলিতে ত্রুটি করিবে না। আমি তাহাদের কথার কোনও উত্তর না দিয়া নবদ্বীপের পুরাতন গঞ্জের ঘাটে যাত্রীদিগের নৌকা সকলের রক্ষার জন্য ঘাটের চৌকীদারকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক থানায় প্রত্যাগমন করিলাম। পথে ভাবিলাম যে অদ্য এবং আর কয়েক রাত্রিতে পূর্ব্ববৎ রোঁদ পাহারা দিতে আরম্ভ করিব। কিন্তু থানায় সন্ধ্যার পরে পদার্পণ করিবা মাত্রই শুনিলাম, যে বাজারের একটি বেশ্যা গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সুতরাং সেই ঘটনার তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সমাধা করিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে, আমার বাঞ্ছিত চৌকী পাহারা দেওয়া আর সে রাত্রিতে ঘটিয়া উঠিল না। অধিক রাত্রিতে শয়ন করাতে শীঘ্রই অঘোর নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু অধিকক্ষণ অবিচ্ছিন্নরূপে নিদ্রা যাইতে পারিলাম না, কারণ শেস রাত্রিতে আন্দাজ তিনটার সময় আমার শয়ন কক্ষের বাতায়নে কয়েকটি লাঠির আঘাতের শব্দ শুনিয়া আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। জিজ্ঞাসা করায় আঘাতকারী কহিল যে সে পুরাতন গঞ্জের চৌকীদার, ঘাটে একটা গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে আমাকে অবগত করিতে আসিযাছে। "গোলমাল" ভিন্ন সে আর কোন কথা খুলিয়া না বলাতে, আমার অনুভব হইল যে পুরাতন গঞ্জ পল্লীতেই অনেক যাত্রী আসিয়া বাস করে এবং বোধ হয় তাহাদের আপনাদের মধ্যে কোন বিবাদ হেতু গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া, বিশেষ আমার নিদ্রার তরুণ অবস্থা কাজেই আমি আর তথা না লইয়া, থানা হইতে এক জন বরকন্দাজ লইয়া যাইতে চৌকীদারকে আদেশ করিয়া, পুনরায় নিদ্রায় বিহ্বল হইলাম। প্রাতে থানায় যাইয়া যে সংবাদ শুনিলাম, তাহাতে আমি এককালে বুদ্ধি হারা হইলাম। শুনিলাম, যে ঘাট হইতে সন্ধ্যার পরে সকল যাত্রীর নৌকা খুলিয়া গিয়াছিল, কেবল তিন চারি খানা মাল বোঝাই নৌকা ঘাটে ছিল, এবং তাহার সকল নৌকার চড়ন্দার ও অধিকাংশ মাঝি মাল্লা গ্রামের মধ্যে পরিচিত বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে যাইয়া শয়ন করিয়াছিল। এইরূপে কোনও নৌকা জনশূন্য এবং কোনও নৌকায় দুই একজন মাত্র মনুষ্য ছিল। ইহার মধ্যে এক নৌকা জাহাজের তলার

পুরাতন তামার চাদরের চালান লইয়া কলিকাতা হইতে ডাঁইহাট মেটিয়ারি গ্রামে যাইতে ছিল। নৌকায় কেবল তিন জন মাল্লা শয়ন করিয়াছিল। দস্যুরা তাহাতে আরোহণ করিয়া রশি কাটিয়া গঙ্গার মধ্যভাগে যাইবার পরে, মাল্লারা বুঝিতে পারিয়া গোলযোগ উপস্থিত করাতে, ডাকাইতেরা তাহাদের সকলকে খুব প্রহার করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া গঙ্গার উত্তর পারে নৌকা লাগাইয়া, চৌদ্দটা তামার চাদরের বস্তা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। মাল্লা তিন জন সন্তরণ করিয়া পুরাতন গঞ্জের ঘাটে উপস্থিত হয় এবং প্রাতে ওপার হইতে নোকা থানা আনয়ন করে। আমি এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত দিবস মনোদুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রহিলাম, এবং লজ্জায় কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিলাম না, এবং রামকুমার ও অন্যান্য চৌকীদারের ধিক্কারের আশঙ্কায় আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, আপন কক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম। কিন্তু এমন অবস্থায় পুলিশ আমলা কতক্ষণ লুক্কায়িত থাকিতে পারে? ঝটিতি ইহার কিছু বিহিত বিধান করা আবশ্যক দেখিয়া বৈকালে পরামর্শের জন্য তাহাদের সকলকে আহ্বান করিলাম। মন্ত্রণার উপসংহারে স্থিরীকৃত হইল, যে ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে আমার মনে যে কণ্টক ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমার পরম শত্রু নিপাতের জন্য পুলিস আমলার প্রচলিত ব্যবহারানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমিও দেখিলাম, যে মনোহর যে চরিত্রের মনুষ্য, তাহাতে তাহার প্রতি তদ্রূপ কঠিন ব্যবহার না করিলে, আমাদের নিস্তার নাই; তথাপি আমি আমার পরামর্শদাতাদিগের একটি প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। তাহা এই যে, অপহৃত তামার পাতের ন্যায় আরও অনেক তামার চাদর নৌকায় আছে; তাহার কয়েক খানা তামা লইয়া মনোহরের বাড়ীর কোন স্থানে রাত্রিকালে গোপনে রাখিয়া দিবাভাগে তাহা বাহির করিতে পারিলে, তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে আমাদের কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না। এই প্রস্তাব ভিন্ন আমি রামকুমার চৌকীদারের অন্যান্য সকল কথা গ্রহণ করিলাম। যদিও মনোহরকে এই ডাকাইতি করিতে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী চক্ষে দেখে নাই এবং নৌকায় যে তিনজন নাবিককে মনোহর প্রহার করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহারাও কোন্ ব্যক্তি মনোহর চেনে না, তথাপি থানার প্রথম রিপোর্টে তাহার নাম ব্যক্ত থাকা আবশ্যক বিবেচনায়, আমি ঘটনা স্থলের চৌকীদারের নিকট, এই মর্ম্মে এক এজাহার লইলাম, যে সে মনোহরকে নৌকা আক্রমণ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। চৌকীদারের এই এজাহার ভিত্তি করিয়া আমি শান্তিপুরের ডিপুটীবাবুর ও কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া মনোহরকে ধৃত করিবার উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম, যে চরমে মনোহরকে সম্পূর্ণরূপে অপরাধী করিতে না পারিলেও, যদি তাহাকে আমি থানায় আনিয়া কিঞ্চিৎ প্রহার দিয়া শান্তিপুর কিম্বা কৃষ্ণনগর প্রেরণ করিতে পারি, তাহা হইলেও আমার মনস্কামনা অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইবে; কারণ আমি জানিতাম যে ঈশ্বরবাবু এবং মণ্ট্রেসর সাহেব উভয়েই এমন কৌশলী এবং দুষ্ট দমন পক্ষে এমন উদ্যমশীল, যে মনোহর একবার এই উপলক্ষে তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইলে, শীঘ্র অব্যাহতি পাইবে না এবং আর কিছু না হইলেও দীর্ঘকাল হাজতে ক্লেশ পাইবে এবং তাহা হইলে আমরা অন্তত সেই কাল পর্য্যন্ত শান্তিভোগ করিতে পারিব এবং মনোহরও কিছু শিক্ষা পাইয়া আসিবে।

এই রূপ অবধারণ করিয়া অন্যূন পঞ্চাশ জন উৎকৃষ্ট চৌকিদার লইয়া ঘটনার তৃতীয় রাত্রিতে, রাত্রি অনুমান তিন প্রহরের সময়, মনোহরকে ধৃত করিতে থানা হইতে যাত্রা করিলাম। নৈশ গগনের তিমিরাচ্ছাদন দূরীভূত হওয়ায় প্রভাতের চিহ্ন কেবল মাত্র দেখা যায়, এমন সময় আমরা মনোহরের গ্রামের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রহরীস্বরূপে আমার পালকির পার্শ্বে যে এক জন বরকন্দাজ যাইতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, যে "দেখুন মহাশয় সম্মুখস্থিত পথের বাম হইতে দক্ষিণ দিকে একটা শৃগাল যাইতেছে, দেখিয়া প্রণাম করুন নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে"। ইংরাজি পড়িয়া যাত্রার শুভাশুভ চিহ্ন সকল অগ্রাহ্য করিতে শিখিয়াছিলাম, তথাপি মনুষ্যের মনে

স্বকাম সিদ্ধির জন্য স্বভাবত এমনই আকিঞ্চন এবং আগ্রহ, যে "মঙ্গল হইবে" বাক্য কর্ণ কুহরে প্রবেশ করা মাত্রই আমি উঠিয়া বসিলাম এবং পালকির সাশির মধ্য দিয়া দৃষ্টি করাতে, যথার্থই একটা শৃগাল আমাদের বাম হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। "বামে শব শিবা নারী" ইত্যাদি বচনটা মনে পড়িল, কিন্তু শৃগালকে প্রণাম করিলাম না, কেবল বরকন্দাজকে বলিলাম, "দেখা যাইবে কেমন মঙ্গল হয়"। ক্ষণেক পরেই বেহারা আমাকে একটা বাড়ীতে নামাইয়া দিল। যে কিঞ্চিৎ আলোক বিকশিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা দেখিতে পাইলাম, যে বাড়ীতে তিন চারি খানা অনুচ্চ ছোট চালা ঘর এবং চতুর্দ্দিক জঙ্গলে আবৃত; উঠানের মধ্য খানে একটা ঢেঁকি স্থাপিত রহিয়াছে। ইতিমধ্যে রামকুমার চৌকিদার আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, যে এই মনোহরের বাড়ী কিন্তু সে কোন্ ঘরে শয়ন করে, তাহা আমি জানি না। সেই সংবাদ আমরা একজন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট অবগত হইলাম। অমনি সকলে লম্ফ দিয়া সেই ঘরের দিকে ধাবমান হইয়া উচ্চস্বরে "খোল্ খোল্" বলিয়া দ্বারের কবাটে লাথি ও ধাক্কা মারিতে আরম্ভ করিল। মনোহর নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইতে ছিল এবং তাহার মস্তকে যে এই বিপদ পড়িবে তাহা সে মনেও ভাবে নাই, ভাবিলে বোধ হয়, আমরা বাড়ীতে তাহার দেখা পাইতাম না। মনোহর শশব্যস্তে দ্বার খুলিবামাত্র কতকগুলি চৌকিদার একত্রে, ঝড়ের বেগে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মনোহরকে কেহ চুলে, কেহ হস্তে, কেহ পদ দেশে ধরিয়া প্রহার করিতে করিতে শূন্য ভাবে তাহাকে উঠানে আনিয়া ফেলিল, কিন্তু প্রহার থামিল না। তাহার লম্বা চুলে ধরিয়া মাটির মধ্যে তাহাকে কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরাইতে লাগিল এবং যাহার যে ইচ্ছা সে সেইরূপ তাহার শরীরে আঘাত করিল। আমি বোধ করি যে আমরা মনোহরকে নিদ্রিত অবস্থায় এবং অপ্রস্তুত ভাবে পাইয়াছিলাম বলিয়াই চৌকিদারেরা তাহাকে এই রূপ লাঞ্ছনা করিতে ক্ষমবান হইয়াছিল, নচেৎ তাহার হস্তে লাঠি থাকিলে এবং অনাবৃত স্থান পাইলে মনোহর আমাদিগকে তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। যাহা হউক, আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত শঙ্কাযুক্ত হইলাম। আমার বোধ হইল, যে আর কিছুক্ষণ তাহার উপরে এই রূপ নির্দ্দয় আঘাত করিলে, তাহার প্রাণে বাঁচা কঠিন হইবে সুতরাং হিতে বিপরীত হইয়া উঠিবে। এই বিবেচনায় আমি আমার সঙ্গীগণকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলাম কিন্তু তাহারা সকলে এক মুখে বলিয়া উঠিল যে "আমরা আপনার কথা শুনিব না। মনোহরকে মারিয়া আমরা ফাঁসী যাইব। ও ব্যাটা আমাদের প্রতি যে দৌরাত্ম্য করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ না পাইয়া আমরা ক্ষান্ত হইব না। উহাকে আমরা কখনও পাই নাই, আজ ভাগ্য বলে পাইয়াছি, কখনও ছাড়িব না"। আমি অনেক কষ্টে তাহাদিগকে অবশেষে ক্ষান্ত করিতে পারিলাম।

এই সময় মনোহরের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল তাহার মস্তকের সুন্দর লম্বা কেশ ও পরিধানের নূতন বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, সমস্ত শরীর ধূলি লুণ্ঠিত, প্রহারের আঘাতে অনেক স্থানের চর্ম্ম স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, রক্তও পড়িতেছে এবং ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত এক গণ্ডূষ জল অতি কষ্টে চাহিতে পারিল। এই দুরবস্থায়ও তাহাকে অবশেষে উঠানের মধ্যস্থিত ঢেঁকির সঙ্গে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়া অপহৃত দ্রব্য সমস্তের অনুসন্ধানে তাহার ঘর বাড়ী বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং পূর্ব্বস্থলীর থানায় রীতিমত সংবাদ দিয়া সহায়তার নিমিত্ত যাচঞা করিয়া পাঠাইলাম। আমরা মনোহরের গৃহ এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে অন্বেষণ করিয়া মালের কোনও ঠিকানা পাইলাম না। কেনই বা পাইব? মনোহর এমন অপরিপক্ক চোর নহে, যে সে তাহার অপহৃত দ্রব্য সমস্ত ঘটনার অল্পকাল মধ্যে তাহার নিজ গৃহে কিম্বা গৃহের নিকট কোনও স্থানে রাখিবে। আমি অনভিজ্ঞ দারোগা, মনোহরের খানাতল্লাসী করিয়াছিলাম, অন্য এক জন কর্ম্মক্ষম পুলিস আমলা হইলে সে কখনই এই রূপ বৃথা খানাতল্লাসী করা আবশ্যক বিবেচনা করিত না। বিফল খানাতল্লাসী করিয়া কত ক্ষণ পরে আমি পুনরায় যে স্থানে মনোহর বন্দী

ছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং দেখিলাম যে পূর্ব্বস্থলী থানার জমাদার আমার প্রেরিত সংবাদ মতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এই জমাদার এক জন আদর্শ পূর্ব্ব পুলিস আমলা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দীর্ঘ কায়, স্থূলাকায় খোট্টা। গৌর বর্ণ, আকর্ণ ব্যাপ্ত গুম্ফ, এবং তদুপযুক্ত গালপাট্টা। পায়ে নাগরা জুতা, পরিধানে আঁটা কাছা বিশিষ্ট নব ধৌত পাইড়দার ধুতি, গায়ে খোট্টাই আঙ্গরাখা এবং মস্তকে একটি কাপড়ের শাদা টুপি। দীর্ঘ কাল যাবৎ বঙ্গ দেশে আসিয়া প্রথমে দ্বারবান্ পরে থানার বরকন্দাজ এবং অবশেষে জমাদার হইয়া আধো আধো বাঙ্গালা ভাষা কহিতে শিখিয়াছে, কিন্তু দন্ত্য সয়ের উচিত উচ্চারণ রহিয়া গিয়াছে। গরীব দুঃখীর, বিশেষ ভদ্র লোকের যম, কিন্তু মনোহরের ন্যায় দুগ্ধ-প্রদ চোর ডাকাইত তাহার স্নেহের পাত্র। পুলিসের কার্য্যে মূর্খ হইলেও ধনোপার্জ্জন বিদ্যায় সুপণ্ডিত। দুই চারি কথায় আমাকে সম্বোধন করিয়া জমাদার মনোহরের নিকট গমন করিল এবং মনোহর যে ঢেঁকিতে বাঁধা ছিল, তাহার ধূলা একজন চৌকিদারের বস্ত্র দ্বারা পরিষ্কার করত, মনোহরের পার্শ্বে ঢেঁকির উপরে উপবিষ্ট হইল। মনোহরের অবস্থা দেখিয়া মনোহরকে শুনাইয়া অনেক আক্ষেপ করিবার পরে, মনোহর সম্বন্ধে সে যাহা বলিল, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, মনোহর মন্দ চরিত্রের মানুষ নহে এবং পূব্ধুলের থানায় তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন অভিযোগ করে নাই। জমাদারের বিশ্বাস এই যে, মনোহর ডাকাইতি করিয়া থাকিলে সে তাহা গোপন করিবে না, অতএব তাহার বন্ধন মোচন করিতে জমাদার অনুরোধ করিল। কিন্তু আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করাতে, সে বিরক্ত হইয়া, আমি ছোকরা দারোগা, পুলিসের কার্য্য জানি না, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিদায় হইয়া গেল।

জমাদার চলিয়া যাওয়ার পর ক্ষণেই রামকুমার চৌকিদার আমাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া অনতিদূরে এক নির্জ্জন স্থানে এক অর্দ্ধ বয়স্ক মনুষ্যের নিকট উপস্থিত করিল এবং বলিল যে "এই ব্যক্তির নাম হলধর ঘোস, মনোহরের মাতুল, আপনি যদি অভয় প্রদান করেন এবং বলেন, যে ইহাকে রক্ষা করিবেন, তাহা হইলে সে এই ডাকাইতির বৃত্তান্ত আপনার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিবে"। অমৃতে কাহার অরুচি? আমি তৎক্ষণাৎ হলধরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলাম; যদি সে অপহৃত মালের সন্ধান করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে অব্যাহতি দিব। হলধর আমার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া ব্যক্ত করিল যে;—

"পট পূজার বিসর্জ্জন দেখিতে যাইয়া মনোহর নবদ্বীপের ঘাটে কৃষ্ণনগরের বেশ্যাদিগের দুই তিন খানা নৌকা দেখিয়াছিল এবং তাহা লুট করিবার অভিলাষে নিজগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমি (হলধর) এবং অন্য আট ব্যক্তিকে সংগ্রহ করিয়া অর্দ্ধ রাত্রের পরে, সকলে গঙ্গার কাছাড়ের ছায়া অবলম্বন করিয়া, লোকে দেখিতে না পায় এমন ভাবে, পুরাতন গঞ্জের ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, যে সকল নৌকা আক্রমণ করার নিমিত্ত তাহারা আশা করিয়া আসিয়াছিল, তাহার এক খানাও সেইস্থানে নাই; তাহাতে মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সম্মুখস্থ প্রথম বোঝাই নৌকায় প্রবেশ করিল এবং নাবিকদিগকে মধ্যগঙ্গায় ফেলিয়া ওপারে যাইয়া, তামার বস্তা সকল নৌকা হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু বস্তাগুলি অতিশয় ভারী দুইজন বলবান মনুষ্য না হইলে একটি বস্তা নাড়িতে পারিবে না দেখিয়া মনোহর নৌকা হইতে চরে নামিল এবং তথায় ইতস্তত করিয়া অল্পদূরে এক খানা ধীবরের খালি নৌকা দেখিয়া, তাহা বোঝাই নৌকার সন্নিধানে আনয়ন করত, তাহাতে চৌদ্দখানা বস্তা ও একটা বৈটা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্বস্থলী গ্রামাভিমুখে চালাইতে লাগিল। কিন্তু বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে রাত্রিশেষ হওয়ার লক্ষণ দেখিয়া, নদীর ধারে চরের উপরে এক জঙ্গলাবৃত নিভৃত স্থানে আমরা অনেক কষ্টে অপহৃত বস্তাগুলি উঠাইয়া গোপন করিয়া রাখিলাম এবং খালি নৌকায় আমাদের গ্রামের নিকট উত্তরণ করিয়া নৌকা খানা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলাম। পর দিবস সন্ধ্যার পর, মনোহর তাহার একজন পরিচিত ব্যক্তির নৌকা

সংগ্রহ করিয়া, পুনরায় আমাদের সকলকে লইয়া সেই গোপনীয় স্থান হইতে অপহৃত বস্তাগুলি নৌকায় উঠাইয়া পূর্ব্বস্থলীর এক ঘাটে উপস্থিত হইল এবং তথা হইতে আমরা দুই দুই জনে এক একটা বস্তা মাথায় করিয়া, গোপাল পোদ্দার নামক একজন স্বুবর্ণবণিকের বাটীতে পৌছাইয়া দিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলাম। গোপাল পোদ্দার মনোহরের "থাঙ্গিদার"। মনোহর যখন যে খানে যাহা অপহরণ করে তাহা গোপাল পোদ্দারের নিকট লইয়া যায় এবং গোপাল তাহার বিনিময়ে মনোহরকে নির্দ্ধারিত হারে টাকা দেয়। আমরা গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে মাল উঠাইয়া দিয়াছি কিন্তু কে তাহা লইয়া কি করিয়াছে, কিম্বা কোন্ স্থানে রাখিয়াছে, তাহা আমি এক্ষণে নিশ্চয় বলিতে পারি না, আপনি সেই বাড়ীতে তল্লাস করিলেই পাইতে পারিবেন। ভিন্ন গ্রাম হইতে পটপূজার তামাসা দেখিতে আমাদের তিনজন কুটুম্ব আসিয়াছিল তাহারাও আমাদের সঙ্গে ডাকাইতি করিতে গিয়াছিল এবং মনোহরের নিকট অপহৃত মালের অংশ পাওয়ার লোভে তাহারা এখনও মনোহরেব বাড়ীতে আছে, তাহাদিগকে আমার সম্মুখে আনিলে, তাহাদের দ্বারা আমি একরর করাইয়া দিতে পারিব কিন্তু আমার নিজের কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতে দিব না"।

মনোহরের বাড়ীর অন্য এক ঘরে প্রথমেই চৌকীদারেরা দুই ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদিগকে হলধরের নিকট উপস্থিত করিবামাত্র তাহারা স্বচ্ছন্দে হলধরের বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্ত দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে লিখাইয়া দিল, কিন্তু বলিল যে, তাহারা গোপাল পোদ্দারের বাড়ী দেখাইয়া দিতে পারিবে না, কারণ তাহারা পূর্ব্বে কখনও পূর্ব্বস্থলীতে আসে নাই, স্বুতরাং পথ ঘাট চিনে না। এমতাবস্থায় হলধর নিজেই গোপাল পোদ্দারের বাড়ী দেখাইয়া দিতে আমাদের সঙ্গে চলিল।

মনোহর যে স্থানে আবদ্ধ ছিল, সেইস্থানে তাহাকে ও তাহার কুটুম্বদ্বয়কে উচিত প্রহরীর জেম্মায় রাখিয়া আমরা সকলে গোপাল পোদ্দারের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। মনোহরের বাড়ী হইতে গোপাল পোদ্দারের বাড়ী যাইতে পূর্ব্বস্থলীর থানার সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়; সেইখানে দেখিলাম, যে পথের ধারে থানার দারোগা একটি রূপা বান্ধান হুঁকা হাতে করিয়া কয়েক জন লোক সঙ্গে (বোধ হয়, আমাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া) আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। থানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবার নিমিত্ত তিনি অনেক আকিঞ্চন করিলেন কিন্তু আমি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আমার লক্ষিত স্থানাভিমুখে ধাবমান হইলাম।

থানা হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে হলধর একটি বাড়ীর সম্মুখে আমাদিগকে আনিয়া তাহা গোপাল পোদ্দারের বাড়ী বলিয়া দেখাইয়া দিল। দেখিলাম, ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী; বাহিরে একটি একতালা ঘরে বস্ত্রের একখানি দোকান আছে। অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। চতুর্দ্দিকে দ্বিতল চক মিলান কোঠা, নিম্ন তালার সম্মুখে এক উচ্চ প্রশস্ত দৌড়দার রোয়াক এবং সমস্ত উঠান টালীদ্বারা আচ্ছাদিত। উচ্চ শ্রেণীর একজন গৃহস্থের বাড়ী বোধ হইল। এমন বিত্তশালী ব্যক্তি চোরা মালের কারবারে লিপ্ত থাকিবে, তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; প্রত্যুত ইহাও ভাবিলাম, যে হয়ত এই ঘৃণিত ব্যবসাই গোপালের ধনের মূল। যাহা হউক মনে বড়ই সন্দেহ হইল। কিন্তু যে স্থলে একজন চোর তাহাব নাম উচ্চারণ করিয়াছে এবং সেই কথায় আমি তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছি, তখন দেখিলাম যে আইন অনুসারে তাহার খানাতল্লাসী না করিলে আর উপায় নাই।

আমি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে কয়েকবার গোপাল পোদ্দারের নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকিলাম। কিন্তু কাহারও কোন উত্তর পাইলাম না। বাড়ী জনশূন্য বোধ হইল। অতএব অল্পক্ষণ বিলম্ব করিয়া গ্রামের তিন জন প্রজা আনাইয়া আমি গোপাল পোদ্দারের খানাতল্লাসী করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিবেচনা করিলাম, যে এই কার্য্যে আমার সঙ্গী সকলকে অনুমতি করিলে গৃহস্থিত অনেক মূল্যবান দ্রব্যের অপচয় হইবে, অতএব সকলকেই উঠান পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া কেবল জমাদার ও

ছিরু চৌকিদারকে সঙ্গে লইয়া আমি প্রথমে নিম্ন তালার কুঠরী সমস্ত পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে যে ঘরে প্রবেশ করিলাম, তাহাতে দেখিলাম যে ঘরের অর্দ্ধ-অংশ ব্যাপিয়া প্রায় ছাঁদ পর্য্যন্ত খড়ের পোয়াল স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং অপর পার্শ্বের এক কোণে কয়েকটি স্ত্রীলোক একত্রে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা দৃষ্টে স্ত্রীলোককে সম্মান করিতে শিখিয়াছিলাম। স্ত্রীলোক, বিশেষ এমন শঙ্কাযুক্ত অবস্থায় স্ত্রীলোক গুলিকে দেখিয়া আমি এককালে দ্রব হইয়া পড়িলাম এবং তাহাদের শঙ্কা দূর করিবার মানসে আমি তাহাদিগকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া করুণ বাক্যে বলিলাম, যে আমি কেবল চোরা দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি স্ত্রীলোক কিম্বা নির্দ্দোষ মনুষ্যের প্রতি অত্যাচার করিতে আসি নাই, অতএব তাঁহারা নিশ্চিন্ত হউন, তাঁহাদিগের প্রতি কাহাকেও কোন কুব্যবহার করিতে, এমন কি এই ঘরের মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিব না। এইরূপ বক্তৃতা ঝাড়িয়া, আমি ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং কবাট বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া সকলকে তাহার মধ্যে যাইতে নিষেধ করিয়া দিলাম। আমি যেমন বর্ব্বর, তেমনই নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিলাম। বেণের মেয়েরা যে সেই স্থানে চোরা মালের প্রহরী স্বরূপে বসিয়া আছে, তাহা আমার "শিক্ষা বিভ্রাটের" ফলে, মনে উদয় হইল না। অবলা নারী দেখিয়া কেবল তাহাদের মঙ্গল কামনাতেই আমার চিত্ত ব্যাপৃত রহিল, প্রতিকূল চিন্তা কিম্বা সন্দেহ আসিয়া প্রবেশ করিতে তাহাতে স্থান পাইল না। এক্ষণে তাই ভাবি, যে যদি তখন রামকুমার কিম্বা ছিরু চৌকিদার সঙ্গে না থাকিত, তাহা হইলে গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে সেই দিবস আমার নাক কাণ রাখিয়া আসিতে হইত।

এইরূপে আমি নীচের সকল ঘর অন্বেষণ করিয়া কোন স্থানে আমার বাঞ্ছিত দ্রব্য পাইলাম না। হতাশ চিত্তে ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে পাকের ঘরে প্রবেশ করিয়া আলোক-শূন্য একটা প্রাচীরের গায়ে একটা ছোট দ্বার দেখিলাম। আমার সঙ্গী ছিরু চৌকিদার তাহা হস্ত দ্বারা ঠেলিয়া খোলাতে তন্মধ্যে একটা অন্ধকার চোরকুঠারী আবিষ্কৃত হইল। ছিরু এই কুঠারীর মধ্যে তাহার হস্তস্থিত একটা শড়কী চালাইয়া দেওয়াতে "মারিও না আমি বাহিরে যাইতেছি" বলিয়া এক ক্ষুদ্রকায় মনুষ্য বাহির হইয়া লম্ফ দিয়া ভূমিতে নামিল। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে গোপাল পোদ্দার বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, আমি তাহার দক্ষিণ হস্তখানা ধরিলাম, ধরিয়া বোধ হইল যে তাহার শোণিত জ্বর বিকার গ্রস্ত রোগীর শিরার রক্তের ন্যায় দ্রুত বেগে বহিতেছে এবং গাত্রের চর্ম্মও সেই রূপ উত্তপ্ত এবং আতঙ্কে শরীর কম্পিত হইতেছে। আমি তাহাকে প্রহার করিব না বলিয়া অভয় প্রদান করত বাহিরে আসিলাম। গোপাল পোদ্দার হ্রস্বচ্ছন্দ মনুষ্য, ফুট গৌর বর্ণ, তাহার হস্ত পদের গঠন সুন্দর এবং মুখশ্রীও উত্তম। যদিও কৃশ তথাপি তাহার অস্থি ও শিরা সকল অদৃশ্য। বয়স চল্লিশের উর্দ্ধ নহে। সহাস্য বদন। এমন ঘোর বিপদের সময়ও সে হাস্য বদনে আমার প্রশ্ন সমস্তের উত্তর দিয়াছিল। জিজ্ঞাসা মতে কহিল, যে সে আমাদের আগমনে ভয়ে চোর কুঠরীর মধ্যে পলাইয়া রহিয়াছিল। কিন্তু অপহৃত মাল সম্বন্ধে সে এমন কথা মুক্ত কণ্ঠে অস্বীকার করিল না, যে তাহার গৃহে নাই। সে যে কয়েকটি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। তাহা এই যে "আমার ঘরে ত অনেক প্রকার দ্রব্য আছে। তল্লাস করিয়া দেখুন, যদি তাহার মধ্যে আপনার কোন জিনিস হয়, তবে আর আমার বলিবার কি আছে"? চোরা মাল নাই বলিয়া সে মুখ তুলিয়া আমাকে বলিতে পারিল না। পোদ্দারের কথার ভাবে আমার কিঞ্চিৎ আশার উদয় হইল এবং দ্বিতলের কক্ষ গুলি দৃষ্টি করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। সেখানেও যাহা দেখিলাম, তাহাতে গোপাল পোদ্দার ও তাহার পরিজনের উপর আমার শ্রদ্ধার আধিক্য হইল। সকল ঘরের দ্রব্য জাত সুন্দর রূপে সজ্জিত। কাষ্ঠের এবং ধাতুর তৈজস সমস্ত মার্জ্জিত এবং ঝক্ ঝক্ করিতেছে। যেখানে যে দ্রব্য রাখা উচিত, তাহা সেই স্থানে রাখা হইয়াছে এবং কোনও ঘরে কোনও অপবিত্র জিনিস নাই। এক ঘরেও এক জোড়া বিনামা দেখিতে পাইলাম না; বোধ করি, তাহা অপবিত্র বলিয়া ঘরে স্থান পায় নাই।

গোপালের শয়ন কক্ষের প্রবেশ দ্বারের উপরে প্রভু নিতাই চৈতন্যের এক পট এবং তাহার নিম্নে হরিনামের মালায় কারু কার্য্য শোভিত সাটিনের একটি কুথলী ঝুলিতেছে। এই সকল দেখিয়া বোধ করিলাম যে পোদ্দারেরা পরম বৈষ্ণব। সকল ঘর বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোন ঘরেই আমার বাঞ্ছিত দ্রব্য পাইলাম না। তাহাতে মনোভঙ্গ হইয়া নীচে আসিলাম এবং একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া গোপাল যে চোর কুঠরী হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিতে ছিরু চৌকিদারকে উঠাইয়া দিলাম। সেখানেও কিছু পাওয়া গেল না। অবশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে রান্না ঘরের পার্শ্বে একটা অন্ধকার ঘর দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সেই ঘরে ঐ এক দ্বার ভিন্ন অন্য দ্বার কিম্বা বাতায়ন ছিল না। ঘরটি সম্পূর্ণ অন্ধকার। আমাদের হস্তে প্রদীপ না থাকিলে বোধ করি তাহার মধ্যস্থিত দ্রব্যাদি ভালরূপে দেখিতে পাইতাম না। প্রদীপের আলোতে দেখিলাম যে এক প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানা তক্তা হেলাইয়া রাখা হইয়াছে। আমরা দুই জনে সেই তক্তার নিকট দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলাম; ছিরু অন্যমনস্কে তাহার হস্তের শড়কীর মাথা এক স্থানে দুই তক্তার মধ্যস্থিত ছিদ্রের ভিতর চালাইয়া দেওয়াতে তাহা কিঞ্চিৎদূর যাইয়া একটা দ্রব্যে ঠেকিয়া ঝন্ করিয়া উঠিল। ছিরু অমনি আমার হস্তে প্রদীপ দিয়া, একখানা তক্তা টানিয়া অপসারিত করিল এবং তাহার মধ্যে তক্তা দ্বারা আচ্ছাদিত কয়েকটা বস্তা উপর্য্যুপরি সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। আমরা তৎক্ষণাৎ উভয়ে আহ্লাদ ভরে "পেয়েছি, পেয়েছি" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঠিক সেই একই সময়ে রামকুমার চৌকিদার ঐরূপ শব্দে চীৎকার করিয়া আর এক ঘর হইতে আমাদের নিকট ধাবমান হইতেছিল। রামকুমারের লাম্পট্য দোষ ছিল, সে বেণেদের স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী শুনিয়া, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া অবশেষে আমি যে ঘরে স্ত্রীলোকদিগকে রাখিয়া কবাট বন্ধ করিয়া আসিয়াছিলাম, সেই ঘরে "মাল" আছে বলিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। কুরুচির ভাষায় সুন্দরী স্ত্রীলোককে "মাল" বলিয়া উক্ত হয়। রামকুমার মাল দেখিবার জন্য সজোরে কবাট ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র স্ত্রীলোকেরা তাহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রাসে জড়সড় হইয়া কক্ষ মধ্যস্থিত খড়ের পোয়ালের স্তূপের উপর পড়িয়া গেল এবং তাহাতে আল্‌গা পোয়ালগুলি শর্ শর্ শব্দ করিয়া স্থানভ্রষ্ট হওয়াতে, তাহার মধ্যে আমার আবিষ্কৃত বস্তার ন্যায় কয়েকটা বস্তা ব্যক্ত হইল। আমাদের বাঞ্ছিত "মাল" দেখিয়া রামকুমার নৃত্য করিতে করিতে আমার নিকট ঊর্দ্ধশ্বাসে উপস্থিত হইল এবং আমার সংবাদও অবগত হইয়া, আহ্লাদে মত্ত হইয়া আমাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। প্রাঙ্গনের চৌকিদারেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া কেহ আবিষ্কৃত দ্রব্যের ঘরে কেহ রামকুমারের ঘরে, প্রবেশ করিয়া দুই তিন জনে এক একটা বস্তা টানিয়া রোয়াকে আনিল এবং সেই খান হইতে উঠানে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উঠানের শানের উপর প্রত্যেক বস্তার আঘাতে ঝন্ করিয়া শব্দ হইল এবং সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ জন চৌকিদারের উল্লাসোত্তেজিত কণ্ঠ হইতে এককালে এক একটা জয়ধ্বনি উঠিল। এমন এক বার নহে। রামে এক, রামে দুই, রামে তিন করিয়া চৌদ্দ খানা বস্তার চৌদ্দটা ঝনাৎ শব্দে মিলিত হইয়া চৌদ্দ বার জয়ধ্বনি গগনে উঠিল। গগনে উঠিল, পোদ্দারের ইষ্টক নির্ম্মিত চারি চক ভেদ করিয়া গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া ধাবমান হইল। অধিবাসীরা প্রথমে ত্রাস যুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে চোরা মাল ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া তাহাদের মনে আনন্দোদ্ভব হইল। ক্রমে দুই এক জন করিয়া এত অধিক লোক উপস্থিত হইল যে, অবশেষে প্রাঙ্গণে তাহাদের স্থানাভাব হইয়া পড়িল। কিন্তু কি দর্শক, কি আমার সঙ্গী চৌকিদার, সকলেই আহ্লাদে প্রফুল্ল। বিশেষ রামকুমার চৌকিদার। সে ইহার মধ্যে কি প্রকারে বলিতে পারি না, এক ছিলাম গাঁজা টানিয়া আসিয়া, আমাকে বলপূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে উঠাইয়া মুখে "ওমা দিগম্বরী নাচো গো" গীত গাইতে গাইতে সকল চৌকিদারকে সঙ্গে লইয়া অপহৃত বস্তাগুলি কয়েক বার প্রদক্ষিণ করিল।

এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কাহারও ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হয় নাই, কিন্তু নৃত্যের পরক্ষণেই সকলের পেটের আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং আমি তাহা শুনিয়া আহারীয় দ্রব্যের জন্য রামকুমারের হস্তে চারি টাকা প্রদান করিলাম। সে টাকা লইয়া বাজারে গেল কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বাজারের কয়েকজন দোকানদার সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জানাইল যে, মনোহরকে ধৃত করাতে এবং গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে চোরা মাল বাহির হওয়াতে বাজারের দোকানী পসারীরা অত্যন্ত উপকার বোধ করিয়াছে, অতএব আমি অনুমতি করিলে, তাহারা কৃতজ্ঞচিত্তে বিনা মূল্যে আমার সঙ্গীগণকে জলখাবার দিতে প্রস্তুত আছে। আমি সম্মত হইলাম এবং চৌকিদারেরা সকলে আহার করিতে গমন করিল। তখন আমি গোপাল পোদ্দারের জবাব লিপিবদ্ধ করিলাম। সে কহিল ডাকাইতির কথা

সে কিছুই অবগত নহে, কিন্তু মনোহর এই চৌদ্দটা বস্তা বিক্রয় করাতে, সে তাহার মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া গৃহে রাখিয়াছে। ইহার পরক্ষণেই পূর্ব্বস্থলীর থানার সেই জমাদার পুনরায় আমার নিকট আসিয়া আমাকে এক নির্জ্জন স্থানে ডাকিয়া লইয়া বলিল যে "আপনি ত আপনার কার্য্য বেশ হাসিল করিয়াছেন, মনোহরকে ধরিয়াছেন এবং মালও বাহির করিয়াছেন, এখন ইচ্ছা করিলে কিছু টাকাও পাইতে পারেন। আপনি যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে এই সকল বস্তাগুলি গোপালের বাড়ীর মধ্যে পান নাই তাহার পিছাড়ার বাগিচার মধ্যে পাইয়াছেন, তাহা হইলে গোপালের পুত্র আপনাকে দুই হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছে"। ইহা শুনিয়া আমি তাহার কথায় কোন উত্তর করা উচিত বিবেচনা করিলাম না।

চৌকিদারেরা আহার করিয়া প্রত্যাগমন করিলে শুনিলাম যে, আমাদের আহ্লাদের গোলমালের সময় হলধর পলায়ন করিয়াছে। ভাবিয়া দেখিলাম যে, হলধর কর্ত্তৃকই আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি অধিকন্তু তাহাকে নিষ্কৃতি দিব বলিয়া আমি তাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম এবং আবশ্যক হইলে যখন ইচ্ছা তাহাকে ধৃত করিতে পারিব, এমতাবস্থায় আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কার্য্য না করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলাম।

তিনখানা শকটে বস্তাগুলি উঠাইয়া এবং মনোহর ও তাহার দুইজন সঙ্গী ও গোপাল পোদ্দারকে লইয়া আমরা সকলে নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বস্থলীর থানার সম্মুখে আসিয়া শুনিলাম যে দারোগা এবং তাহার অধীনস্থ আমলারা কেহ থানায় নাই; বোধ করি, তাহারা থানার নিকট হইতে অন্য জেলার দারোগা আসিয়া চোরা মাল ধরিয়া লইয়া যাওয়াতে লজ্জা বিবেচনা করিয়া আমার সহিত দেখা করিল না। পথিমধ্যে দেখিলাম যে গ্রামের অধিবাসীগণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অনেকে বিশেষ ব্রাহ্মণেরা আমার মস্তকে যজ্ঞোপবীত ছোঁয়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সকলে বলিল "যেন ছোড়া না হয়, এই দুরাত্মারা গ্রামে যেন আর ফিরিয়া আসিতে না পারে"। ইহাতেই প্রতীয়মান হইল যে মনোহরের দৌরাত্ম্যে গ্রামস্থ সকল লোক জ্বালাতন হইয়াছিল; নচেৎ সে ধৃত হওয়াতে সর্ব্বজনের মনে কেন অসীম আহ্লাদ হইবে এবং সে ফিরিয়া আসিতে না পারে তাহার নিমিত্ত কেনই বা সকলে এমন আকিঞ্চন প্রকাশ করিবে?

অতঃপর আমরা দিবা অবসান সময় নবদ্বীপ পৌঁছিয়াছিলাম। সেস্থানেও মনোহরকে দেখিবার নিমিত্ত দুই দিবস পর্য্যন্ত বহু জনতা হইয়াছিল। নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি, খ্যাতনামা ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, রত্ন বিশেষ কিন্তু স্বল্পায়ু গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অধ্যাপক মহাশয়েরা, যাঁহারা কখনও থানার ত্রিসীমায় আইসেন নাই, তাঁহারাও সেই দিবস মনোহর ও গোপাল পোদ্দারকে দেখিবার নিমিত্ত থানায় পদার্পণ করিয়াছিলেন।

তদনন্তর উচিত সময়ে দস্যুগণ অপহৃত দ্রব্য সহিত শান্তিপুর এবং অবশেষে দাওরার বিচারের নিমিত্ত কৃষ্ণনগর প্রেরিত হইল। জজ ব্রাউন সাহেব মনোহরকে চির নির্ব্বাসনের ও তাহার দুই জন সঙ্গীকে চৌদ্দ চৌদ্দ বৎসরের ও গোপাল পোদ্দারকে দশবৎসরের কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং সদর নেজামত আদালতেও সেই দণ্ডাজ্ঞা স্থির রহিল। এই রূপে নবদ্বীপ অঞ্চলের শান্তির কণ্টক নির্ম্মূল হইল এবং আমার তিন শত টাকা পুরস্কার ও পঁচিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি ও সদর থানায় বদলি হইল।

কিন্তু মনোহরের কীর্ত্তি এখনও সমাপ্ত হইল না। আরও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে।

সদর নিজামতের হুকুম আসার পর রীত্যনুসারে মনোহর আলিপুরের জেলখানায় প্রেরিত হয় ও তথা হইতে কয়েক মাস পরে পঞ্চাশ ষাট জন পঞ্জাবী ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দায়মালী কয়েদির সঙ্গে, নির্ব্বাসনের নিমিত্ত ব্রহ্মদেশের থায়েটমিউ নগরে ক্লারিসা নামক জাহাজে চালান হয়। সমুদ্র মধ্যে মনোহর তাহার সঙ্গী কারাবাসীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এক বিপ্লব উপস্থিত করে এবং জাহাজের কাপ্তান ও অন্যান্য সাহেবকে অসতর্ক অবস্থায় পাইয়া বধ করে, কেবল জাহাজ চালাইবার নিমিত্ত কয়েকজন দেশী খালাসীর প্রাণ রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন রাজার রাজ্যে জাহাজ চালাইতে আদেশ করে। কিন্তু বিদ্রোহীদিগের দুর্ভাগ্যবশত এক রণতরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই মানওয়ারের কাপ্তেন তাহাদিগকে ধৃত করিয়া অকয়েব বন্দরে লইয়া যায় এবং তথায় মনোহর প্রভৃতির বিচার হইয়া ফাঁসী হয়।*

* 'নবজীবন', তৃতীয় ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা, আশ্বিন, ১২৯৩

চিত্র-জগতের পঞ্চশস্য

শ্রীমতী প্রতিভা শীল

স্থানান্তরে এ্যালিস ফে'র যে ছবিখানি প্রকাশিত করা হয়েচে, তার চলচ্চিত্রে অভিনয় সম্বন্ধে কিছু জানতে পাঠক-পাঠিকার এক-আধটু কৌতূহল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশদভাবে সমস্ত কথা না জানাতে পারলে-ও আভাষে আমরা তাঁর 'সি লারণ্ড য়্যাবাউট সেলার্স' পুস্তক অভিনয়ের গল্পটীর কতকাংশ আলোচনা করব। তিনি যে একজন 'ফক্স্ আর্টিষ্ট' এবং তাঁদের কাছে বহুদিনের চুক্তিতে আবদ্ধ আছেন, একথা সম্ভবতঃ কোন চিত্রামোদীর অবিদিত নাই। তিনি একজন সুশ্রী এবং সুগায়িকা অভিনেত্রী তা-ও অনেকেই জানেন।

MADGE EVANS *and* RAMON NOVARRO *in* "HUDDLE"

রেম্যান্ নোভারো এবং ম্যাজ্ ঈভান্স্

'অল্ কোয়ায়েট্' পুস্তকের বিখ্যাত অভিনেতা লিউ আয়ার্সকে নিয়ে বইখানির রোমান্সের সূচনা করা হয়েচে। ব্যাপারটী সংক্ষেপে এই রকম :—

লিউ আয়ার্স তার দু'টি বন্ধু ডুরাণ্ট এবং মিচেলকে নিয়ে এশিয়াটক্ বন্দরে জাহাজ নোঙর করলেন। তাঁর বন্ধুদ্বয় তাঁকে জাহাজ থেকে নামবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। তিনি বল্লেন : বাজে সময় নষ্ট না করে, সেই সময়টা জাহাজের অন্য কিছু কাজে ব্যয় করলে ভবিষ্যৎ উপার্জ্জনের পথ কিছু সরল হবে। এই বলে বন্ধু দু'টিকে বিদায় করলেন।

কিন্তু কিছু পরে খাদ্যের সংস্থানে নেমে, একটী 'কাফে' অর্থাৎ হোটেলে গিয়ে হঠাৎ তাঁর এ্যালিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। এই সাক্ষাৎ সময়ে তাঁর বন্ধু দু'টীও সেখানেই ছিলেন। একটী সাধারণ বালিকা ভেবে, তাঁরা রগড় করবার জন্যে, এ্যালিসকে আড়ালে ডেকে, আয়ার্সকে নিয়ে একটু খেলাবার জন্য বলে দিলেন। কিন্তু তরুণীর কথার ভাবে বুঝতে পারলেন যে, প্রথম দর্শনেই তাঁদের প্রেম সঞ্চার হয়েচে।

এ্যালিসকে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা যায় কি না এই পরামর্শ করবার জন্য তখন আয়ার্স তাঁদের মত ত নিলেনই, এমন কি অন্যান্য বন্ধুদেরও মত নিলেন। কিন্তু সকলেই বল্লেন : নাবিকের বিবাহ করবার কোন অধিকার নাই। অগত্যা আয়ার্স এ্যালিসকে চিঠি লিখলেন যে, তিনি যেন তাঁর কথা ভুলে যান, কিন্তু এ্যালিসকে ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে দুরূহ ব্যাপার, এমন কি সারা-জীবনে সেটা সম্ভবপর হবে কি না, সে সম্বন্ধে-ও তিনি সুনিশ্চিত নন্।...চিঠি দিলেন তিনি তাঁর বন্ধুদ্বয়ের একজনকে, মালিকের কাছে পৌছে দিতে।

মিচেল এবং ডুরাণ্ট দু'জনে মতলব করে চিঠিখানি খুলে পড়লেন। দু'জনে খুব হাসাহাসি করে সে চিঠি-খানি বার করে নিয়ে, আয়ার্সের নাম দিয়ে লিখে দিলেন :

আমরা দু'জনে লুস্ এঞ্জেলে মিলিত হবো, সেখানেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

...আয়ার্সের জাহাজ হনলুলুতে পৌঁছলে, সেখানে সত্যিই একখানা এ্যালিসের পত্র গেল: আমি শীঘ্র লস্-এঞ্জেলে যাত্রা করচি।

এবারেও একটু চালাকি খেলে বন্ধুদ্বয় চিঠিখানি চেপে দিলেন। তারপর এ্যালিসের জাহাজ এসে পৌঁছবার পর সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন: আয়ার্স উপস্থিত এ্যাডমিরালের কিছু আদেশ পালনে ব্যস্ত আছেন, তাই আপনাকে অভ্যর্থনা করতে আমাদেব পাঠিয়ে দিয়েচেন।

এরপর আয়ার্স যে-হোটেলে সাধারণতঃ খাওয়া-দাওয়া করেন, সেখানে এ্যালিসকে নিয়ে গেলেন এবং মতলব করলেন, ওঁদের দু'জনকে হঠাৎ আর একবার দেখা করিয়ে দেবেন। তারপর তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ রাস্তা ঠিক করে নেবেন। কিন্তু নিয়তির খেলা বোঝা ভার। এ্যালিস শুনতে পেলেন, পাশের কামরায় আয়ার্স আর একটী তরুণীর সঙ্গে আলাপ করচেন এই বলে যে, তিনি 'ওরিয়েন্টে' একটী মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং দু'জনার মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু সে সমস্তই মিটে গেচে।

এরপর সত্যিই যখন এ্যালিসের সঙ্গে আয়ার্সের সাক্ষাৎ হ'ল এবং তাঁর দর্শনে আয়ার্স উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, তখন এ্যালিস স্পষ্ট তাঁকে বললেন যে, তিনি তাঁকে মোটেই চিনতে পারচেন না।...

মিচেল এবং ডুরাণ্ট বেগতিক দেখে শেষ পর্য্যন্ত অন্য পথ গ্রহণ করলেন। আয়ার্সের কাছে অগ্রসর হয়ে বললেন: অনধিকার প্রবেশের জন্য এ্যালিসকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম হয়েছে। তিনি আপনাকে বিবাহ করবেন এই সর্ত্তে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। আবার এ্যালিসকে বললেন: আপনাকে বিবাহ করতে চান বলে আয়ার্সকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম হয়েচে।

শেষ পর্য্যন্ত বিব্রত হয়ে আয়ার্স 'ফে'-কে ক্ষুণ্ণচিত্তে বিবাহ করতে বাধ্য হন। বিবাহ শেষে বন্ধুদ্বয় সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করে দেন। তখন তুমুল হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

* * *

হাস্যরসিক অভিনেতা হারল্ড লয়েডকে নামিয়ে 'ফক্স্ ফিল্ম কোম্পানী' নববর্ষে 'ক্যাট্স্ প' পুস্তকখানি ডালি দিয়েচেন। অভিনয়ের দিক্ দিয়ে খুব খারাপ না হলেও বইখানির গল্পাংশ মোটেই সুবিধার নয়। তার চেয়ে 'মেরী গ্যালাণ্টী' এবং 'ফার্ষ্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার' পুস্তক দু'খানি কি গল্পাংশে বা অভিনয়ে অনেক উচ্চাঙ্গের। শেষের খানি ঐতিহাসিক ব্যাপার এবং বিগত মহাযুদ্ধের ছবি হলে-ও,

রেম্যান্ নোভারো এবং ম্যাজ্ ঈভান্স

ডিরেক্টার অনেকখানি সম্মান দাবী করতে পারেন এবং মুক্তকণ্ঠে এও স্বীকার করা যায়, 'অল্ কোয়ায়েট' পুস্তকের ঠিক সমকক্ষ না হতে পারলে-ও তারপরেই এই বইখানির স্থান হওয়া উচিত। উপস্থিত বইখানি 'এম্পায়ারে' দেখান হচ্চে।

* * *

সবাক এবং নির্ব্বাক উভয় চিত্রে রেম্যান্ নোভারো যেভাবে নিজের যশ অক্ষুণ্ণ রেখেচেন, কোন অভিনেতা-ই সম্ভবতঃ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন নি। দীর্ঘ একযুগ একভাবে 'ষ্টার' পর্য্যায়ভুক্ত থেকে অভিনয় করে যাওয়া, সম্ভবতঃ একমাত্র তিনিই সম্ভব করেচেন। উপস্থিত তিনি একখানি নাটক রচনায় ব্যস্ত আছেন। তিনি

আশ্বাস দিয়েচেন এই পুস্তকে তাঁর জীবনের যাবতীয় ক্ষুদ্র-মহৎ ঘটনা সন্নিবেশিত থাকবে এবং এ-ও তিনি বলেচেন যে, বইখানি প্রথমেই তিনি লণ্ডনে অভিনয় করবেন।

তাঁর 'লাফিং বয়' পুস্তকখানি সবেমাত্র শেষ করে তিনি এই নাটকের কাজে হাত দিয়েচেন। এই 'লাফিং বয়' বইখানিতে অভিনয় এবং 'মেক আপ'-এর দিক দিয়ে তাঁকে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়েচে। কেন না, যে স্থানে বই-খানি তোলা হয়েচে, সেখানে সূর্য্যদেব মাত্র ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় কতকক্ষণের জন্য দেখা দেন এবং সেখানে এত ধূলো যে, দিনের মধ্যে তিনবার পোষাক পরিবর্ত্তন করতে হয়েচে। বইখানিতে নোভারো একটী ভারতীয় চরিত্র অভিনয় করেচেন। চিত্র-জগতে সে অভিনয় সত্যই অতুলনীয়।

* * *

বিখ্যাত ডিরেক্টার টড্ ব্রাউনিং, ওয়ালেস্ ব্যেরীর সঙ্গে এক সার্কাসে হাতী খেলিয়েছিলেন। আজ তাঁরা দু'জনেই 'মেট্রো'র কাছে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ।

* * *

রবার্ট ইয়ং অভিনেতা হবার আগে খবরের কাগজে, ডাক্তারখানায়, ব্যাঙ্কে এবং দালালের কাজ করেছিলেন। স্কুলে 'রবিনহুড' চরিত্রে অভিনয় করে এই লাইনে প্রথম তাঁর হাতে খড়ি হয়।

* * *

দেবতার সন্তুষ্টির জন্যে বা বরাত ফেরাতে আমরাই শুধু হীরা, মুক্তা, চুণী, গোমেদ ইত্যাদি ধারণ করি না। পাশ্চাত্ত্য দেশে-ও এ-সব অন্ধবিশ্বাস কিছু কিছু আছে। বিখ্যাত অভিনেত্রী জীন হার্লো হাতের আঙুলে হাতীর চুলের একটী আংটী ব্যবহার করেন। তাঁর বিশ্বাস, ঐ জিনিসটা কর্ম্ম সিদ্ধি করায়।

* * *

'ব্যাণ্ড প্লেজ্ অন্' পুস্তকের অভিনেত্রী বেটী ফারনেস্ নিজের পরণের কাপড়-চোপড় নিজের হাতে তৈরী করেন।

* * *

রাধা ফিল্মের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' প্রায় শেষ হয়ে এসেচে। কালীফিল্মের 'প্রফুল্ল' এবং 'পাতালপুরী' দু'খানি পুস্তকই পাদপ্রদীপের সাম্‌নে ফুটে ওঠবার প্রতীক্ষায় আছে।

প্রতিভা শীল

পুস্তক-পরিচয়

প্রেমের বিচিত্রধারা—লেখক—শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মন্মথ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—অরিন্দম এ্যাণ্ড কোম্পানী। ১০, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা।

একখানি গল্পের বই। গল্পের বই বল্‌তে যে সমস্ত চিরাচরিত হাসিকান্নার ঘটনার বিবরণী আমাদের স্মৃতি-পথে ভীড় করে' আসে, এখানি তা' নয়—এর মধ্যে অনেকখানি নূতনত্ব আছে।

সাহিত্য-স্বষ্টির গোড়ার কথা হচ্ছে রসতত্ত্ব আর রসবস্তু। 'প্রেমের বিচিত্রধারা'তে ফুটে উঠেছে এই রসবস্তুরই প্রভাব। সে হিসাবে শৈলেনবাবু আর মন্মথ-বাবুকে বস্তুতান্ত্রিক বলা চল্‌তে পারে। আদিরসের পরিবেশন-প্রাচুর্য্যে বইখানির প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা হ'য়ে উঠেছে পরম লোভনীয়। কোথাও দেখি রূপ-মোহান্ধ পিতা নিজের কন্যাকে বিয়ে কর্‌ছে; কোথাও অল্পবয়স্কা সুন্দরী জননী উদরান্নের আশায় রুগ্ন সন্তানকে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে রেখে নায়কের কণ্ঠলগ্না; কোথাও—কিন্তু থাক্, আর দরকার নেই।

জানাতে আনন্দ বোধ কর্‌ছি যে, শৈলেনবাবু আর মন্মথবাবু তাঁদের এই গল্পগুলির চরিত্র আর ঘটনা সম্বন্ধে সাহায্য নিয়েছেন—য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে। নইলে সত্যিই চিন্তার কথা হ'য়ে পড়েছিল বৈকি! হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে শুনি পাশের বাড়ীতে সানাই বাজ্‌ছে। কী ব্যাপার? না, 'হাবির বাবা, হাবিকে আজ বিয়ে কর্‌বে—হাবির মা তারই দধি-মঙ্গল উৎসব কর্‌ছেন।' এ যদি আজ ভারতীয় সাহিত্যের 'কন্‌সেপ্‌সন্' হ'ত, তবে তো—

'প্রেমের বিচিত্রধারা' বইখানি নবীন লেখকদ্বয়ের নূতন উদ্যম এবং প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে আশাতিরিক্ত ভাল হয়েছে। স্বচ্ছ হয়েছে এর ঘটনাবিন্যাস, প্রাঞ্জল হয়েছে এর বর্ণনাচাতুর্য্য, আর দুঃসাহসিক লিপি-কুশলতায় এনেছে এর সু-সমাপ্তি।

ভাল লেগেছে এঁদের বই। কিন্তু তবুও শৈলেনবাবু আর মন্মথবাবুকে সাহিত্যের বারোয়ারী-সভায় স্বাগত অভিনন্দন জানাবার পূর্ব্বে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আর গোপনে এই কথাটা আর একবার তাঁদের জানিয়ে দিতে চাই যে, তাঁদের সাহিত্য-স্বষ্টির সাবলীল ভঙ্গীটুকু 'প্রেমের বিচিত্র-ধারা'র আদিরসাত্মক বন্ধুর পথযাত্রা থেকে সত্য এবং সনাতনের সমতল পথে পদার্পণ করুক।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

শার্লি টেম্পল্

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪১ | দ্বাদশ সংখ্যা

ছি বেইমান!

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বজিত ও অমিতাভের অফিসের ছুটি নাই, অথচ বাবা বৈদ্যনাথের নিকট না গেলেই চলিবে না। কেন না, অনুরাধা ও অনুপমা স্বপ্নে দেখিয়াছে—বাবা তাহাদের দুইজনেরই হাতে একদিনে একসময় পূজাগ্রহণ না করিলে আর বাঁচিবেন না। ভূভারতে তাহাদের মত না কি তাঁহার ভক্ত আর কেহই নাই। ইত্যাদি···

কথাগুলা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, এ কথা আর কেহ জানুক আর না জানুক আমার নিকট অবিদিত ছিল না। শুষ্ক হৃদয় নিঙাড়িয়া কোথা হইতে এক্‌ফোঁটা জল কখন যে চোখের কোণে আসিয়া পড়িয়াছিল ভাবিয়া পাইলাম না।

রক্তের সম্পর্কে কৃপণতা করিলেও ভক্তের সম্পর্কে বিধাতাপুরুষ আমার প্রতি যে একান্ত অকৃপণ, এ কথা না মানিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। নতুবা বিশ্বজিত অমিতাভ ত আমার কেহই নহে। কয় বৎসর পূর্ব্বে পরিচয় দূরের কথা, নামও শুনি নাই। আজ কি না, তাহাদেরই যুবতী পরিবার লইয়া দূর দেওঘর উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল। আবার সে যাত্রার মধ্যে লুকান রহিল আমারই কল্পনাকে রূপ দিবার উদগ্র কামনা।

সেকেণ্ড ক্লাসের একখানা গাড়ী আগে হইতেই রিজার্ভ করা হইয়াছিল। সকলে আসিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। বিশ্বজিত ও অমিতাভ গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। বলিল—বৈদ্যনাথের ভরসায় ওরা বেরুলেও আপনার ভরসায় আমরা ওদের ছাড়লাম, ভূপতি-দা'! দেখ্‌বেন, যেন ফিরে পাই।

অনুরাধা ও অনুপমা কৃত্রিম রাগে ফুলিয়া উঠিল; বলিল—বেহায়া কোথাকার, লজ্জা করে না! যাচ্ছি দেব-স্থানে, তবু মনে অবিশ্বাস! যাব না আমরা।

কিন্তু তাহাদের নামিয়া পড়িবারও কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। হাসিয়া বলিলাম—এতবড় অকেজোর ওপর অতটা দায়ীত্ব না রাখাই উচিত ছিল ভাই, বল্‌লাম ত তোমরা চল, কিন্তু···

ফের ওই কথা! তুমি জান না ভূপতি-দা', ওরা বৌএর চেয়ে চাকরীকেই বড় বলে মানে। বৌ গেলে আবার পাওয়া সোজা, কিন্তু চাকরী গেলে...

বিশ্বজিত বলিল—কথাটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার মত বলো নি, সত্যিই চাকরীর যে বাজার, তা'তে...

ফণিনীর মত ফোঁস করিয়া উঠিয়া অনুরাধা কি বলিতে যাইতেছিল, ট্রেণ ছাড়ার হুইসিল দিতেই সে কথা বন্ধ হইয়া গেল।

চাহিয়া দেখিলাম—আসন্ন বিদায়ের সম্ভাবনায় চারিজনের চক্ষুই সজল হইয়া উঠিয়াছে। কি মধুর, কি পবিত্র এই মিলন-মুহূর্ত্ত!

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। যতদূর দেখা যায়—চারিজনেই পলকহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল। যখন আর কিছুই দেখা গেল না, তখন অনুরাধা ও অনুপমা গাড়ীর ভিতর মুখ ফিরাইল। তখনও মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রুকণা তাহাদের ভরন্ত গাল দু'টীতে টল্‌টল্ করিতেছে। আমাদের হাসিতে দেখিয়া মুখ দুইখানি লজ্জায় লাল হইয়া গেল। আবার তাহারা মুখ ঘুরাইয়া জানালার বাহিরে মুক্ত আকাশের পানে ফিরাইল।

দুষ্টামী করিয়া বলিলাম—এখনই কাঁদ্‌তে সুরু করে দিলি দিদি, এ ক'টা দিন কেমন করে থাক্‌বি বল্‌ ত? বাবা বৈদ্যনাথেরই না হয় আর কিছুদিন চোখের জল পড়ত!

—যাও, তুমি বড় ইয়ে—কাঁদব কেন, একটা পোকা পড়ল চ'খে, তাই...

এতবড় সত্য কথার প্রতিবাদ করা সঙ্গত বোধ করিলাম না।

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তিনটা প্রাণী আমরা একখানি কামরায় বসিয়া গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। বর্ত্তমান যেন আমাদের কেহই নয়, অনাগত ভবিষ্যতেরই সহিত আমাদের সম্পর্ক!

অনুরাধা বলিল—বা রে, কথা কইছ না যে ভূপতি-দা', এমনই মুখ গোঁজ করে যাবার জন্যই বুঝি গাড়ী চেপেছি।

বলিলাম—কথা বলার পালা যে আজ তোদেরই বোন্।

—বেশ যা' হোক্। আমরা বকে মর্‌ব, আর তুমি বুঝি চুপ করে শুন্‌বে? সে হচ্ছে না।

—কিন্তু হবে বলেই যে আজ দু' বোনে যুক্তি করে আমাকে এখানে টেনে এনেছিস! আর জন্মে তোরা আমার মা-ই ছিলি। নইলে এত ভালবাসতে শিখ্‌লি কেমন করে বল্‌ ত? কবে বলেছিলাম—তোদের দু'টিকে নিয়ে ইচ্ছা করে সারারাত রেলে গল্প করি। সে কথাটুকুও মন থেকে মুছে যায় নি। এতবড় জাগ্রত দেবতা, বাবা বদ্দিনাথের নামে মিথ্যা বানিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছিস্!

—ও মা কোথা যাব! তাই না কি, কি বলিস অনুরাধা?

—ব'য়ে গেছে অত মনে করতে! মা গো, শুধু শুধু বুড়ো মা-ই বা হতে যাব কেন! বোনে বুঝি ভালবাস্‌তে পারে না। যাক্, এখন যখন রেলে চলেছি, গল্প করতে দোষ কি? গল্প বলো শুনি।

দেখিলাম—দুইজনেরই মুখ লজ্জারক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।

গল্প করিতে করিতে কখন যে আমরা গন্তব্য-পথের সীমা শেষে আসিয়া পৌছিয়াছি বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ 'জেসিডি' ষ্টেশনের পাণ্ডার কলরবে চমক ভাঙিয়া গেল।

যেন ছোটখাটো একটী যুদ্ধ চলিয়াছে আমাদের ত্রয়ীকে লইয়া। পাণ্ডা মহাপ্রভুরা সকলেই প্রতিপন্ন করিতে

চাহিতেছেন—তিনিই প্রথম আসিয়া আমাদের শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই আমাদের পাণ্ডা করিতে হইবে।

হলপ করিয়া বলা আমাদের পক্ষেও সম্ভব নয় যে, কোন্ প্রভু আসিয়া আমাদের মাথায়—শ্রীশ্রীপদযুগল সর্ব্বপ্রথম স্থাপন করিয়াছেন। কেন না, আমরা যে কল্প-লোকে এতক্ষণ বাস করিতেছিলাম, সেখানে আর যাহারই প্রবেশ অধিকার থাকুক, পাণ্ডা মহোদয়দের নাই।

রাস্তার উপর একটী ছিন্নবাস ভিখারীর মত পাণ্ডার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম—তাহার চোখ দু'টিতে মিনতি মাখান। যেন বিলম্বে আসিয়া দাঁড়ানর জন্য সে নিজেকে নিজেই ধিক্কার দিতেছে।

কেন জানি না করুণায় অন্তর ভরিয়া গেল। বলিলাম—আমার পাণ্ডা আছে। ওই যে, উনি এসে গেছেন। চলো রাধা, অনু, আমরা ওঁর সঙ্গে গাড়ী বদল করি।

লোকটীর চোখে যে আনন্দের দীপ্তি দেখিলাম তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। ছুটিয়া আসিয়া তিনি আমাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতেই যুদ্ধের ইতি হইয়া গেল। অন্য শীকারের উদ্দেশে প্রভুপাদরা আবার ছুট্ দিলেন।

হাতযোড় করিয়াই সুরু করিলেন—মা-জী যখন গরীবের বাড়ী পায়ের ধুলা দিতে চান তখন এর চেয়ে আমার আর ভাগ্যের কথা কি আছে। যেতেই হবে।

খাওয়া-দাওয়ার ঝঞ্ঝাট্ না করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম—কিন্তু তাহাতেও তিনি কর্ণপাত করিলেন না। অসুখ ত গরীবের বাড়ী বারমাসই, তাই বলে...

আর বাধা দিলাম না। খরচাবাবদ গোটাকতক টাকা হাতে গুঁজিয়া দিয়া ধর্ম্মশালার একটা ঘরে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কথা রইল রান্না-বাড়া হইয়া গেলেই সেখান হইতে আসিয়া তিনি লইয়া যাইবেন। তথাস্তু।

অনুরাধা বলিল—বেশ হ'ল, এমনই গরীবই আমি খুঁজ্‌ছিলাম দাদা।

অনুপমা বলিল—যাবার সময় একখানা কাপড় দিতে হবে। ছেঁড়া নেকড়া পরে আছে যেন!

বাড়ীখানি জীর্ণ। ভগ্নাবশেষ স্তূপগুলি এদিক-ওদিকে খসিয়া পড়িয়া অতীত-গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে মাত্র। মনটা ইহাদের দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম—অনুরাধা ও অনুপমার হৃদয়ও সমবেদনায় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উপায় কি?

অনুমান মিথ্যা নহে। বেচারী শুধু গরীব নয়, বিপন্নও। আজ কয়দিন হইল দুইটী পুত্রের অসুখ, বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। কাজেই খাওয়া-দাওয়াও প্রায় বন্ধ। আজ মরিয়া হইয়াই বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন—কিন্তু আমরা দয়া না করিলে, ইত্যাদি...

আশার অতিরিক্ত করিয়াই দু'টী বোন্ আমার পূজার আয়োজন করিল। বুঝিতে বিলম্ব হইল না এ আয়োজন দেবতার উদ্দেশে নহে। ওই দরিদ্র ব্রাহ্মণেরই উদ্দেশে সংগৃহীত হইয়াছে।

সহসা রাধা প্রস্তাব করিয়া বসিল—আজকের খাওয়াটা ওঁর ওখানেই করা যাক্ দাদা—কি বলো?

আপত্তির কিছু ছিল না, তবে বাড়ীতে অসুস্থ রহিয়াছে বলিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। পাণ্ডা-জী একেবারে

এত অল্প সময়ের মধ্যে মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজনটা এমনভাবে হইয়া উঠিবে ইহা আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই। তাই রন্ধনকারিণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলাম। ব্রাহ্মণকে অভুক্ত রাখিয়া আমাদের আহার করা সম্ভব নয়। কাজেই প্রথম প্রস্থ পরিবেশন করিয়া পাণ্ডা-জীও আমাদের সহিত আহারে বসিয়াছিলেন।

কি একটা জিনিষ প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহার স্ত্রী নিজেই পরিবেশন করিতে আসিলেন। মাথা হেঁট করিয়াই বসিয়াছিলাম। হঠাৎ একটা শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম—পাত্রখানি পরিবেশনকারিণীর হাত হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং ঘোমটার মধ্য দিয়া প্রাণপণ প্রযত্নে তিনি তাঁহার বিবর্ণ মুখখানি ঢাকিয়া রাখিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

সম্মুখে সর্প দেখিলেও বোধ করি এতটা বিহ্বল হইয়া পড়িতাম 'না। মুহূর্ত্তে বর্ত্তমানের সমস্ত অস্তিত্বই আমার ম্লান হইয়া আসিল। কতক্ষণ কি ভাবে কাটিয়াছিল জানি না, সহসা অনুরাধার কথায় চমক ভাঙিল—ও মা, দাদা কি চোখেও দেখ্‌তে পাচ্ছ না, জলে লুচি ডুবুলে যে বড় ?

নিজেকে সংযত করিয়া লইলাম। খাওয়া-দাওয়ার পালা কোনমতে শেষ হইয়া গেল। খাতা লইয়া পাণ্ডা-জী নাম-ধাম টুকিয়া লইবার জন্য সাম্‌নে আসিয়া বসিয়াছিলেন।

ছেলে আসিয়া বলিল—বাবুজি, মায়ী বোলাতি হায়।

পাণ্ডা-জী উঠিয়া গেলেন। তারপর ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—পাগল, বাবুজি, আমার বৌটা একদম পাগল আছে। বলে কি জানেন, আপনার নাম আর খাতায় লেখাতে হবে না। এ খাতায় আমার বাবা তারও বাবা যে আপনাদের নাম-ধাম সব লিখে রেখে এসেছেন, ওর কথায় আমি তা' তুলে দেব ?

বলিলাম—উনি ঠিকই বলেছেন পাণ্ডা-জি; আমার নাম লিখে কোন লাভ নেই, কেন না, এ জীবনে বিয়ে করা আর আমার হবে না। যদি কখন নিজে আমি, চেনাই ত রইল।

পাণ্ডা-জী শুনিতে চাহিবেন না জানি, তথাপি তাঁহাকে নিরস্ত করা ছাড়া উপায় কি ? আমার অপরাধের বোঝা ত অল্প নহে, শাস্তি তাহার তুলনায় কিই বা হইল। ইহা মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে।

বিদায়ের ক্ষণ আসন্ন হইয়া আসিল। অত্যন্ত সংগোপনেই পাণ্ডা-জীর হাতে কতকগুলা কাগজ গুঁজিয়া দিয়াছিলাম—তাহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আপনি ভুলে কি দিয়েছেন দেখুন বাবুজী।

বলিলাম—না, ভুলে দিই নি পাণ্ডা-জী—এ আপনার পক্ষে বেশী হলেও আমার পক্ষে কিছু নয়—ভগবান আমাকে টাকা অনেক দিয়েছেন। যদি দরকার হয়···

চাহিয়া দেখিলাম—অনুরাধা ও অনুপমার নয়নে বিস্ময় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। উঠিক—মানুষের জীবনটাই যে অসম ছন্দে গড়া।

মনের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। পাণ্ডার ছেলেটী আসিয়া পিতাকে গৃহাভ্যন্তরে ডাকিয়া লইয়া গেল। কারণ অস্পষ্ট নহে—পরিষ্কার বুঝিলাম—আমার দান সে গ্রহণ করিবে না।

পাণ্ডা-জী ফিরিয়া আসিলেন—এবার সত্য-সত্যই তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে। হাতে শুধু নোট কয়-খানি নয়, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ছেলেটীকে যে ঘড়িটী উপহার দিয়াছিলাম, তাহাও ফেরৎ আসিয়াছে।

পাণ্ডা-জী বলিলেন—না বাবু, ও কিছুতেই নিতে দেবে না। কত বোঝালুম, বাবুজীর কৃপা হয়েছে, ওদের দয়ায়ই আমরা বেঁচে আছি, বলে—ভিখ্ নেব না। চুলোয় যাক, ছেলেটা রুগ্ন,—ভাবলুম, ডাক্তার ডেকে কাল দাওয়াই করাব, তা' আর হ'ল না। বাঁচে ভাল, মরে বৈদ্যনাথ-জীর ইচ্ছা।

নোটগুলি সে আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিল। একটীও কথা বলিলাম না। খানিক নিস্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ছেলেটীকে ডাকিয়া কাছে আনিয়া তাহার হাতে সেগুলি দিতে দিতে বলিলাম—এগুলো তোমার। মামার জিনিষে ভাগ্নের অধিকার আছে সব চেয়ে বেশী। আমি তোমায় সেই দাবীতেই দিলাম—নিয়ে যাও।

বালক ছুটিয়া মায়ের নিকট গিয়া হাজির হইল। দাবী নামঞ্জুর হয় নাই। বালক আর ফিরিয়া আসিল না। অনুরাধা ও অনুপমার দৃষ্টিও ঘরের দিকে নিবদ্ধ ছিল—তাহারা সেখান হইতে ঘুরাইয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ করিতেই বলিলাম—চলো, ট্রেণের সময় হয়ে এল !

পাণ্ডা-জীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন—ভাবনা করবেন না বাবু-জী, পা চালিয়ে গেলে ট্রেণ নিশ্চয়ই ধরা যাবে !

—তাই চলুন। বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

আসিবার সময় একান্ত নির্লজ্জের মত ঘরের দরজার পানে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিলাম—অনাহার-শীর্ণা যৌবন-বৃদ্ধা শিপ্রা দরজার বাজু ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

খানিকটা পথ আগাইয়া আসিয়াছিলাম। পিছন হইতে মৃদুকণ্ঠে কে ডাকিল—মামুজী ! চাহিয়া দেখিলাম—

শিপ্রার পুত্র ! তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে সে বলিল—মায়ী আপুকো বোলাতি হায়।

ধীরে ধীরে তাহাকে কোলে লইয়া আবার শিপ্রার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।

ইহারই মধ্যে শিপ্রা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া একখানি নীলাম্বরী পরিয়াছে। দপ্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল—বিগত দিনের কথা। এ কাপড়খানি আমিই তাহাকে দিয়াছিলাম না ?—

শিপ্রা আমার পায়ে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখে একটী কথা কহিল না, না কহুক—তাহার চোখের কথা আমার নিকট অজ্ঞাত নাই। সে আমাকে ক্ষমা করিয়াছে, আমার সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইয়াছে, ইহার পর আর আমি কিছুই চাহি না।

পাণ্ডা-জী তখন বাহিরের দরজার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বলিলেন—আর দেরী করলে গাড়ী পাওয়া যাবে না বাবু-জী !—

ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। অনুরাধা ও অনুপমা আমার সঙ্গেই বাড়ীতে ঢুকিয়াছিল। তাহারাও নীরবে আমার অনুগমন করিল। একটী কথাও কহিল না। মুখ দেখিয়া বুঝিলাম—নির্ম্মল হৃদয় আকাশে তাহাদের কৌতূহলের ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। পাণ্ডা-জীর মুখেও উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি কতবার আমার হাতের দিকে চাহিতেছিলেন—টাকাগুলি আমার ফেরৎ দিয়াছে কি না দেখিবার জন্য। বলিলাম—ওখানে যা' দিয়েছি, সে খোকাবাবুদের। আপনার জন্যে···বলিয়া পকেট হইতে আরও কয়েকখানি নোট বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিতেই তিনি—আবার কেন বাবু-জী, আবার কেন ? বলিতে বলিতে তাহা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

আবার আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছি। তিনটী প্রাণী ব্যতীত কামরার মধ্যে আর কেহই নাই। অজগরের মত ট্রেণটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া নিজের গন্তব্য-পথের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে।

অনুরাধা বলিল—কই, এখন বলতে সুরু করলে না ?

অনুপমা বলিল—না বলে আর খোসামোদ করিস নি ! শুনতে চাই না আমরা।

না বলিয়া আর উপায় কি ? কিন্তু কোথা হইতে আরম্ভ করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম—সে অবসরটুকুও তাহারা দিতে রাজী নয়। সুরু করিলাম।—বছর দশেক আগের কথা। একদিনে মা, বাবা, দাদা ও তিনটী বোন্‌কে কলেরার কোলে তুলিয়া দিয়া সংসারটা মিথ্যা ভাবিতে সুরু করিয়াছি। এমনই একদিন মনে হইল,—তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইব। ভাবার যা' বিলম্ব ছিল—যেই মনে হওয়া অমনই ঘরের বাহির যেন আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। পয়সার অভাব ছিল না। বৃদ্ধ সরকারের নিকট হইতে কতকগুলি চাহিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। অর্দ্ধোদয়-যোগ আসন্ন, প্রয়াগে স্নান করিয়া যেখানে হোক্ যাইব স্থির করিয়া প্রয়াগের উদ্দেশেই যাত্রা করিলাম।

কিন্তু স্নান করিয়া লক্ষ জন্মের পাপ বিমোচন করিবার অদৃষ্ট আমার নয়। কাজেই ঠিক যোগ মুহূর্ত্তে গঙ্গাতীরে থাকিয়াও জলস্পর্শ করিতে পারিলাম না। ভিড়ের মধ্যে হইতে দলিত, স্পৃষ্ট, মৃতপ্রায় একটী কিশোরীকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া কতকটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কিন্তু তখনও মেয়েটী জ্ঞানশূন্য। কোঁচার খুঁট্ দিয়া অনেকক্ষণ বাতাস করিতে করিতে ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিল—ভাইয়া ?

বোধ করি, সে তাহার ভাইয়ের সহিত যোগ-স্নানে আসিয়াছিল। ভিড়ের তাড়নায় দু'জনে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং বেচারী নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। বলিলাম—ভয় নেই, ভাইকে তোমার এখনই খবর দেওয়াচ্ছি।

মুখে বলিলাম সত্য, কিন্তু খবর দেওয়া অসম্ভব। এই জন-সমুদ্রের মধ্যে তাহার ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিতে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া আর কি হইতে পারে।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—তোমার বাড়ী কোথায় বল্‌তে পার?

মেয়েটীর কথায় বুঝিলাম এখান হইতে ক্রোশ দশ-বার পথ। রেলের কোন সুবিধা নাই। তাহারা পদব্রজে আসিয়াছে। সে উঠিয়া বসিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। দারুণ বেদনায় মুখ বিকৃতি করিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

বুঝিলাম—কোনরূপ যানের ব্যবস্থা না করিলেই নয়। দেখা যাক্, যদি তাহার ভাইকে একান্ত না পাই নিজেই পৌছিয়া দিয়া আসিব।

স্নান-যাত্রীর ভিড় কমিয়া গেল। বহু অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মেয়েটীর কোন আত্মীয় বা পরিচিতের সন্ধান মিলিল না। অনেক কষ্টে একখানি গোযান সংগ্রহ করিয়া তাহাতে তাহাকে উঠাইয়া নিজে পদব্রজে তাহার নির্দ্দেশিত পথে অগ্রসর হইলাম। সারারাত্রি পথ চলিয়া ভোরের ঝোঁকে যখন মেয়েটীর বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম, তখন তাহাকে লইয়া আনন্দের হট্টগোল পড়িয়া গেল।

আমাকে কি বলিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাহা তাহার বাপ-মা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলেন না।

পথের মায়া ছাড়িয়া তাঁহাদের স্নেহনীড়ে বাধা পড়িতেও বিলম্ব হইল না। গৃহস্বামী রামকৃষ্ণ ধার্ম্মিক, সুপণ্ডিত। আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া লইয়া এমন সুন্দর এবং প্রাণস্পর্শী ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, আমি অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না।

গৃহস্বামিনী আদেশ করিলেন—ছ'মাসের পূর্ব্বে এখান হইতে নড়িবার নাম করিয়াছি কি মরিয়াছি।

কিশোরী বলিল—ছ'মাস কি মা, ছ' বচ্ছরেও ওঁর যাওয়া হবে না।

বলিলাম—কিন্তু...

সে কথায় কাণ না দিয়া কিশোরী আমার থাকিবার জন্য যে ঘরটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই সাফ্ করিতে লাগিয়া গেল।

কোন কথা না বলিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যার পর ঘরে ঢুকিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ঘর গুছান হইয়াছে যেন ছবির মত। আমার বাক্সটী খুলিয়া কাপড়-জামা সব গুছাইয়া আনলার উপর তুলিয়া রাখিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই। কি কি গুলা একান্ত নোংরা হইয়াছে, তাহা একধারে তুলিয়া রাখিয়াছে কাচিতে দিবার জন্য।

আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—মা গো, এমন নোংরা তুমি!

হাসিয়া বলিলাম—তোমার মত পরিষ্কার ত কেউ ধমক দেয় নি কাজেই। কিন্তু এমন চমৎকার করে তুমি ঘর গুছুতে শিখলে কোথা থেকে বল ত?

—জানি না, যাও। বলিয়া গ্রীবা হেলাইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে খাইতে বসিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। সমস্ত-গুলি রান্নাই বাংলা দেশের অনুরূপ হইয়াছে। এবং রন্ধনও হইয়াছে চমৎকার। গৃহিণী বলিলেন—মেয়েটাই সব রেঁধেছে বাবা। আমায় হাত দিতে দেয় নি। বলে—আমাদের দেশের রান্না খেলে তোমার পেট ভরবে না। ও যে তোমাদের বাংলাতেই জন্মেছে। বাবু ছিলেন ইষ্টিশন মাষ্টার, বাঙালী বাড়ীই ত ও রাতদিন থাকৃত।

কিশোরীর কথা-বার্ত্তায় এতক্ষণ বিস্ময় অনুভব করিতে-ছিলাম। এইবার নিশ্চিন্ত হইলাম।

রাত্রে ঘরে আসিয়া দেখি—মাথার শিয়রে একটী ফুলের তোড়া এবং বিছানার চারিপাশে ফুল ছড়ান রহিয়াছে।

কিশোরীকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না। তাহার মা বলিলেন—ও বেটী পাগ্‌লী আছে বাবা, বলে ফুল থাকৃলে রাত্রে ঘুম হয়—তাই···শেষের দিকটা তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল কেন, বুঝিতে পারিলাম না।

ভোরের আলো তখন হয় ত ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। দেখি—চায়ের কাপ লইয়া কিশোরী মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বলিলাম—ব্যাপার কি, এর মধ্যে চা!

নইলে উঠ্‌বে ত সেই দুপুরে। এখানে ভোরে বেড়াতে হয়। না হলে শরীর সারে না। শরীর চাঙ্গা থাকৃলে তবে ত সন্ন্যাসী সাজ্‌বে। উঠে পড়।

নিরুপায় হইয়া চা-পান করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

যাই, যাই করিয়া যাওয়ার দিন ক্রমে অনিশ্চিত হইয়া উঠিল। স্নেহ-বঞ্চিতের নিকট স্নেহ-প্রাপ্তির আকর্ষণ যে কতবড়, ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝিবে ?

দিনকয়েক পরের কথা। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে যেন মাথার উপর বিশ মণ পাথর চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে। পা-হাত নাড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই।

মাথার চুলের মধ্যে কাহার শীতল স্পর্শ সে দুঃসময়ে অমৃত প্রলেপেরই মত মনে হইল। চোখ চাহিয়া দেখিলাম—স্বপ্ন দেখিতেছি যেন! কিশোরী আমার শিয়রে বসিয়া সেবা-নিরতা।

বলিলাম—তুমি ?

কিশোরীর মুখ লজ্জায় আবীর-রাঙা হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম—প্রতিদিন রাত্রেই সে আমাকে দেখিয়া যায়। আজও তেমনই আসিয়াছিল। আমি অজ্ঞান হইয়া চৌকী হইতে ভূমে গড়াইয়া পড়ায় সে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই।

বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া শয্যায় শুইয়া শুইয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে করিতে আবার জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম।

কয়দিনে দেহের অসুখ সারিয়া গেল। কিন্তু মনের অসুখ দিনের পর দিন বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহা চোখে পড়ে নাই, এখন তাহা সহজেই চোখে পড়িতে লাগিল। আমার মনের কথার সমর্থন কিশোরীর প্রতি ব্যবহারের মধ্যে সুস্পষ্ট রহিয়াছে অনুভব করিয়া মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিতে লাগিলাম।

প্রায় ক্রোশ দুই দূরে হাট। সেদিন ইচ্ছা করিয়াই হাটে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় যখন ফিরিয়া আসিলাম—অবসন্নতায় তখন সারা অন্তর ভারী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনের মধ্যে উৎসাহের অন্ত নাই।

কিশোরী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কেমন, বারণ করলুম, শুনলে না যেমন। খুব কষ্ট হয়েছে ত ?

বলিলাম—হ'ত, যদি না এ'টা পেতুম। কেমন হয়েছে বল ত ? বলিয়া একখানি নীলাম্বরী তাহার হাতে তুলিয়া দিলাম।

আনন্দে তাহার মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিল—পূজোর কাপড় বুঝি ?

মনে পড়িয়া গেল আজ ষষ্ঠী। বোধনের বাজনা দূর রাজবাড়ী হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। বলিলাম—কেমন হয়েছে বল্‌লে না ?

তোমার দেওয়া জিনিষ কখন খারাপ হয়। বেশ হয়েছে। সে কাপড়খানা লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া—মাকে দেখিয়ে আসি আমি। বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার গমন-ভঙ্গীর দিকে অর্থভরা-দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম।

রাত্রে সামান্য মাথা ধরিয়াছিল। বাহিরে তাহার শতগুণ প্রকাশ করিয়া শয্যায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। অনুমান মিথ্যা হইবার নয়। সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে কিশোরী আসিয়া আমার শয্যাপ্রান্ত দখল করিল। রান্নাঘর মুখো হইল না।

মাথার মধ্যে চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি দিয়া কপালটা টিপিয়া দিতে সুরু করিল। বলিল—কথা ত শুনবে না। এখন ভুগ্‌লে কে দেখ্‌বে বল ত ?

বলিলাম—তুমি !

—মন্দ নয়, আমি না হয় দেখ্‌লুম, কিন্তু ভুগ্‌বে কে ? কষ্ট হবে কার ? তোমার মত ছেলেমানুষ নিয়ে পারা যায় না দেখ্‌ছি। বলিয়া মাথাটায় ঈষৎ চাপ দিল।

না পারিবার কথাই বটে! সাগ্রহে তাহার হাতটা টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিহরিয়া

খেলার হাফ্ টাইমের সময় প্রভাত যুবকের নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা অর্জনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সবই বৃথা। যুবক সুচতুর, সুকৌশলী। মিষ্ট মিষ্ট দুই একটী কথার এমন উত্তর দিল, যে প্রভাত খুঁজে পেল না, পরের কথা কি জিজ্ঞাসা করবে, কেমন করে কথা চালাবে। মাত্র এইটুকু জানলে, যে বর্ষীয়সীটী এই যুবকের ঠাকুরমা, তাঁরা বাঙালী, রাঁচিতে চেঞ্জে এসেছেন, নভেম্বর পর্য্যন্ত থাকবেন। বর্ষীয়সীর সংসারে ঐ যুবকটী ভিন্ন আর কেউ নেই—ঠিক দাদুর সংসারের অনুরূপ।

প্রভাত লক্ষ্য করলে যে যুবক ঘন ঘন রুমালে মুখ মুচছে, অথচ মুখে বা কপালে ঘাম নেই। অনবরত এরূপ করা দুকারণে সম্ভব, হয় মুদ্রাদোষ, না হয় বিশেষ উদ্দেশ্য। যুবক যেরূপ চালাক চতুর, তাতে মুদ্রাদোষ সম্ভব বলে মনে হ'ল না। তা হ'লে বিশেষ উদ্দেশ্যটী কি হ'তে পারে? আজ সকালের কথা মনে হ'ল; দাদু পাশে থাকতেন যদি, চুপোচুপি ব'লে দিতেন, কেন বারংবার রুমাল ব্যবহার করছে। ভাবতে ভাবতে প্রভাতের নজর পড়লো যুবকের গোঁফের উপর। মনে হ'ল আসল গোঁফ নয়, কৃত্রিম; রুমাল দিয়ে মুখ মুছবার ছলে, টিপে বসিয়ে রাখছে, পাছে গোঁফটী না খসে পড়ে যায়। ইয়ং ম্যান্—ফলস্ গোঁফ পরে কেন? ঠোঁটের ওখানটা কি কাটা আছে?...উহুঁ। কোন সাদা দাগ আছে! উহুঁ। তবে কোন্ দোষ লুকাবার জন্যে এই গোঁফের আশ্রয় নিয়েছে? প্রভাতের মাথার ভিতর একটার পর আর একটা থিওরির ঝড় ব'য়ে যেতে লাগল; স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই হ'ল না। যার সম্বন্ধে এ সব ভাবনা, সে কিন্তু মৃদু মৃদু হাসছে—যেন প্রভাতের ভাবনা স্রোতে গা ভাসান দিয়ে চলেচে। হঠাৎ যুবক বলে উঠলো—

"দেখলেন, রাইট বড় মিস্ করছে; লেফ্ট কিন্তু ঠিক আছে। রাইট যদি লেফটের মত হ'ত তা হ'লে গোল অব্যর্থ"।

কথাটা অতি সামান্য, কিন্তু দেশ কাল পাত্র হিসাবে প্রভাতের মাথার ভিতর বেশ জোরে একটা ধাক্কা দিল। সে ভেবে দেখল্ যে তার লেফ্টে সেই যুবক; সে হয়ত তাকে যুবক বলে মনে করেই আসছে। পয়েণ্ট মিশ্ করছে; তা না হলে...

যেন মস্ত বড় একটা হাতুড়ী প্রভাতের মস্তিষ্কে দু'এক ঘা বসিয়ে দিল। চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে যুবকের মুখের পানে তাকাল; অ্যাঁ...তবে কি...

ভাবনার ধারা ঠিক এই পর্য্যন্ত এসেছে; একটা হেস্ত নেস্ত হয় হয়, আর দেরী নেই, ঠিক এই সন্ধিক্ষণে রেফরীর হুইসিল বাজলো—খেলা শেষ। লাটসাহেব বিজয়ী টীমকে প্রকাণ্ড একটী শীল্ড দিলে। সেখানে বিস্তর ভিড়। এই অবসরে ঠাকুরমার সঙ্গে যুবকটী অন্তর্ধান হ'য়েছে। প্রভাত তার দাদুকে নিয়ে, ভিড় ঠেলে, গাড়ীতে উঠলো।

গাড়ীতে খানিকক্ষণ কোন কথাই হ'ল না। শেষে দাদু নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—

"ভায়া কি ভাবছ, বলবো?"

"তুমি আর বলবে কি দাদু, আমি সেই যুবকটীর কথাই ভাবছি। তাকে কেমন কেমন বোধ হ'ল, অথচ কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। তুমি যদি আমার পাশে বসতে, নিশ্চয় কিছু বলতে পারতে।"

"আমি যতবার তোমার দিকে চেয়েছি, দেখি, তুমি তার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছ, আর সে মিটি মিটি হাসছে।"

"শোন তবে বলি—"

প্রভাত বলতে সুরু করল; গাড়ী এসে বাংলোয় পঁহুছিল। ড্রয়িং রুমে, চা'র সঙ্গে প্রভাতের কাহিনীটী দাদুর বড় উপাদেয় লাগল।

কথা শেষে প্রভাত উঠে, বারাণ্ডায় বই নিয়ে বসলো। দাদু ঝুঁকে পড়ে, চোখে চশমা এঁটে, একখানা স্লিপে কী লিখতে লাগলেন। লেখা শেষ হলে, উঠে গিয়ে, স্লিপখানি প্রভাতকে দিয়ে এলেন। স্লিপখানিতে দাদু একটী কবিতা লিখে ফেলেছেন—

সুন্দর বদন নিরখি নিরখি
হিয়ার হরষ ভৈ গেল জোর
কিন্তু পুরুষ কি নারী বিচারিতে নারি
দুঃখের রহিল নাহি কিছু ওর।

এমন সুন্দর নধর অধরে
হা বিধি নির্দয় কেন দিলি গোঁফ ?
দাদু কহে ভায়া ধৈরয ধরহ
নাহি কোন ফল প্রকাশিয়া ক্ষোভ।
বিনা পণে ভায়া কিনিয়া ফেলেছ
যোজন গন্ধী, প্রেমরূপ সোপ্
হিয়া ভরি ভরি অশেষ যতনে
মাখিলে তাহারে পূর্ণ হ'বে হোপ্।

কবিতা পড়ে প্রভাত হেসেই অস্থির। দাদুকে কি বলতে ঘরের ভিতর এসে, চাকর রতনের কাছে শুনলে, দাদু খিড়কী দিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন। কাজেই, খানিক চুপ করে থেকে, আবার বই নিয়ে বসলো; কিন্তু বই ভাল লাগলো না। কবিতাটী বার বার পড়ে—আর হাসে। দাদু একটু পরে ফিরে এলেন। তাঁরও বোধ হয় বেড়ান ভাল লাগে নি।

"কি হে ভায়া হাসছ যে ?"

"কি করি দাদু, এমন কবিতা পড়ে কার না হাসি পায় ?"

"চল খাবে চল, কবিতায় পেট ভরবে না।"

দাদুর পশ্চাতে যেতে যেতে, কবিতার স্লিপখানি ভাঁজ করে বাম পকেটে রাখতে গিয়ে, প্রভাতের হাতে ঠেকলো একখানা কার্ড। বের করে দেখলে, তাতে লেখা রয়েছে নাম—

এ, পি। এ, কে। আর্ আশী।

"ও দাদু, এ কি ? এ কার কার্ড ?"

"তোমার পকেটে ছিল নাকি ?"

"হাঁ, এই পকেটে।"

দাদু গম্ভীর হ'লেন। প্রভাত সাধ্য সাধনা করতে লাগলো যে দাদু আর একবার শার্লক হোম্‌স হ'য়ে বলে দিন কোথা হ'তে এই কার্ড এল, কার নাম, কি নাম ইত্যাদি···

খেতে খেতে দাদু জিজ্ঞাসা করলেন—

"ভায়া, সেই যুবকের নাম জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে ?"

"হাঁ, কিন্তু সে বলে নি।"

"বলে নি বলেই, তোমার পকেটে এই কার্ডখানি দিয়েছে।"

"সে দিয়েছে ?"

"হাঁ, সে তোমার বাঁ দিকে ব'সেছিল, তাই তোমার বাঁ পকেটে কার্ড দিয়েছে; যখন বসেছিলে তখনই দিয়েছে। অবশ্য ভিড়ের ভিতর তোমার যে কোন পকেটে দিতে পারত—তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছুই থাকত না।"

"কি বিপদ, জিজ্ঞাসা করে আদায় করতে পারলুম না, পকেটে কার্ড ফেলে নাম জানাল। আমার অজ্ঞাতে ? পিক্-পকেট না কি ?"

"তাই বটে; ভায়ার কিছু না কিছু পিক্ করেছে দেখছি; অন্ততঃ মনটা।"

"যাঃ—ও—দাদু।"

"আচ্ছা নামটা কি হতে পারে ?"

"ছদ্মবেশের ছদ্ম নাম...তার জন্য মাথা ঘামিও না, দাদু।"

"তা হ'লে, তোমার ঘুম হবে না যে, ভাই।"

"কি যে বলো !"

"বেশ, আমি নিরস্ত হলুম।"

খাওয়া শেষ হ'ল। দুজনে সোফায় বসে বই পড়তে লাগলেন। ক্ষণপরে দাদু দেখলেন, প্রভাতের হাত হ'তে বই পড়ে গেছে,—সে কার্ডখানি উল্টে পাল্টে দেখছে। দাদু হেসে বললেন,—

"যার কার্ড, সে হয় বাঙালী—মাদ্রাজী, না হয় বাঙালী—পাঞ্জাবী, না হয় বাঙালী-পাঞ্জাবী-মাদ্রাজী।

প্রভাত ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে শুতে চলে গেল। দাদুও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

তিন

পরদিন, প্রভাত কেমন একটু অন্যমনস্ক হ'ল। খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে, দাদু বললেন "ভায়া, একটু ঘুরে এস—যাও সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়' দিকিন।"

প্রভাতেরও তাই ইচ্ছা হচ্ছিল। কোথায় যাবে কিছুই

না স্থির করতে পেরে, বরাবর চললো; যেখানে হ'ক থামবে, যার কাছে হ'ক যাবে,—না হয় চলবে, থামবে না—যতক্ষণ না পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। খুব জোরেই সাইকেল চললো। মোরাবাদী পাহাড়ের তলায় এসে, সাইকেল ফেলে, রাস্তার ধারে বিশ্রাম করতে লাগল। মনে হল, পাহাড়ের উপরে উঠে, আবার খানিক বিশ্রাম করে, বাড়ী ফিরবে। তখন বেলা একটা, রোদ পড়লে বাড়ী ফেরা উচিত।

একে বলে ভাগ্যচক্র! কেইবা বলেছিল তাকে এখানে আসতে, আর কেনই বা সে উঠলো পাহাড়ের উপর!

উপরে উঠে দেখে, সেই যুবকটী একখানি বড় পাথরের উপর পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে; অন্যমনস্কে কি যেন ভাবছে। প্রভাতের নীরব আগমন তার চিন্তা তরঙ্গ ভঙ্গ করতে পারে নি। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রভাত বলে উঠলো—

"এই যে, আপনি এখানে? কি সৌভাগ্য আমার এখানে আপনার দেখা পেলুম।"

"আসুন, আসুন, আমি আপনাদের কথাই ভাবছিলুম; কাল বোধ হয় আমার উপর বিরক্ত হ'য়েছিলেন, আমি আপনার সীট অধিকার করেছিলুম।"

"এ কি বলছেন···আমায় লজ্জা দিচ্ছেন কেন?"

"শুনে, সুখী হলুম। আচ্ছা, আমার বোধ হ'য়েছিল, কাল, আপনি আমাকে কোন কিছুর জন্যে যেন সন্দেহ করছিলেন। ঠিক বলুন...এ কি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন। এইখানেই বসুন; পাথরখানা খুব বড়—দুজনে বেশ বসা যায়। বলেন ত উঠে দাঁড়াই—এক সঙ্গে যদি না বসেন।"

"না, না—অমন কথা বলবেন না; এই আমি—আমি —আপনার পাশেই বসলুম।"

"কেমন হাওয়া দিচ্ছে,—ভাল লাগছে আপনার?"

"চমৎকার!"

"দেখুন, দৈব একবার; ঠিক কাল যেমন বসেছিলেন, সে রকম আজও? আমার ডান দিকে আপনি, আপনার বাঁ দিকে আমি।"

"এতে আর কি!"

"তেমন কিছু নয়—তবে—নাঃ দূর্ ছাই—ও কথা থাক্।

আপনি আজগুবী গল্প পড়েছেন?"

"পড়েছি।"

"মানুষ···ইচ্ছে করলে রূপ বদলে পাখী হ'য়ে যেতে পারে এ কথা পড়েছেন।"

"হাঁ পড়েছি।"

"আচ্ছা, ধরুন আমি যদি এখনই টিয়া পাখী হ'য়ে উড়ে যাই, আপনি কি করেন?"

"আমায় যদি মন্তরটা শিখিয়ে দেন, তবে আমি টিয়া হ'য়ে আপনার সঙ্গে উড়ি।"

"বটে; যদি না শেখাই!"

"তা হ'লে ওড়বার আগে আপনাকে ধরে ফেলে খাঁচায় রেখে, পুষি।"

"হুঁ, আচ্ছা কেন বলুন দেখি, আপনি···

না থাক্···কাজ কি?"

"বলুন বলুন, থামলেন কেন?"

"নাঃ অনেক সময় মনের কথা মুখে আনা উচিত নয়—

"তা হ'লে রাগ করলেন?"

"ওগো মহাশয়, আপনার ওপর রাগ সম্ভব নয়।"

"প্রমাণ?"

"প্রমাণ আপনি স্বয়ং।—কাল ঘন ঘন আমার মুখের দিকে চাইছিলেন কেন? কি বলতে বলতে থেমে গেল্লেন, বোধ হয় আমরা উঠে পড়েছিলুম বলে বলা হ'ল না। ঠাকুরমা নোটিশ করেছেন আমাকে বকলেন যে আমি, আপনার সঙ্গে বোধ হয় কোন অন্যায় ব্যবহার করেছি ব'লে—"

"এঃ বড় লজ্জা দিলেন আপনি। ছি...ছি···আমার জন্যে আপনি বকুনি খেলেন! দোষ করেছি আমি আপনার মুখের দিকে ঘন ঘন চেয়ে। নিয়ে যেতে পারেন আমাকে আপনার ঠাকুমার কাছে? আমি তাঁকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলি।

"বেশ ত', চলুন আমার সঙ্গে ঠাকুরমা আপনাকে পেলে মহা খুসী হবেন। বিকেলে টেনিস্ খেলবো।"

প্রভৃতি রাজী হ'ল। দুজনে পাশাপাশি পাহাড় হ'তে নামতে লাগল। হঠাৎ যুবকটী ব'লে উঠলো—

"দেখুন মস্ত একটা ভুল হয়েছে। আমি ভুলে গিছলুম, যে আপনার ও আমার, একটা নাম আছে। ধরুন আপনার নাম প্রভাত কুমার রায়।

"অ্যাঁ! আমার নাম জানলেন কেমন ক'রে? তা হ'লে আমিও বলি, আপনার নাম "আর আশী"।"

যুবক এই নাম শুনে হো হো ক'রে হেসে উঠলো। প্রভাত অপ্রতিভ হ'য়ে বললো—

"সে কি মশাই, এ আপনার নাম নয়? এই কার্ডখানা আপনি আমার পকেটে, আমার অজ্ঞাত ফেলে দেন নি?"

"স্বীকার করলুম কার্ডখানা আমিই আপনার পকেটে ফেলে দিয়েছি—কিন্তু বড় ভুল হ'য়ে গিয়েছে মিঃ রায়, ওখানা একটু ঘুরিয়ে লেখা—..."

"ওঃ, তাই আমি সারারাত চেষ্টা ক'রে আপনার নাম ঠাহর করতে পারলম না···

"সা—রা—রাত! বলেন কি? ছি ছি, কেন মরতে ওই কার্ডখানা দিয়েছিলুম...বড়ই দুঃখিত, মিঃ রায়। আমায় ক্ষমা করুন।"

"আঃ কি করেন!"

"ওই কার্ডখানায় আমার নামের অক্ষরগুলো একটু ছড়িয়ে আছে। একটু কাছে করে নিলেই হবে।"

প্রভাতের হাতের উপর কার্ডখানি ছিল; অক্ষরগুলির উপর আঙুল বুলিয়ে বলতে লাগল—

"এ" কি না "এভিয়ন", পি, কে, আর আশী" কিনা "পাকড়াশী"।

"কি সর্ব্বনাশ, কিছুতেই ধরতে পারি নি? এভিয়ন পাকড়াশী?"

"নামটা ছিল, মিঃ রায়, "আভানন"; কিন্তু আমি তাকে আধুনিক যুগোপযোগী ক'রে রেখেছি "এভিয়ন"। দরকার হ'লে, বদলাতেও কোন আপত্তি নেই।"

"মশাই আপনি অসাধারণ বুদ্ধিমান!"

"এই আরম্ভ করলেন, তা হলে···

প্রভাতের মনের ভিতর যা হচ্ছিল, তা প্রকাশ করা যায় না। যুবকের চাউনি, কণ্ঠস্বর, সুকোমল স্পর্শ, গতি ভঙ্গিমা, প্রতিমুহূর্ত্তে যেন বলছিল; ওরে অবোধ! গোঁফ, কোট-ব্রীচস-বুটে, ভুলে গেলি, চিনতে পারলি না? কিন্তু কি করে সে প্রমাণ করে তার চক্ষু ঠিক, কি মন ঠিক। সে ব্যাকুল হ'য়ে আগে কম্পিত পদে ধীরে ধীরে যুবকের সঙ্গে পাহাড় হ'তে নেমে এল। যুবক হাসতে হাসতে তার মোটর চালিয়ে দিল। প্রভাত সাইকেলে তার পশ্চাতে চললো।

চার

পাকড়াশীদের বাড়ী পৌঁছে প্রভাত যখন দেখল যে তার দাদু আর ঠাকুরমা বসে গল্প করছেন, তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। চা'র সহিত জলযোগ হ'ল। একটু বিশ্রামের পর, দাদু বললেন—

"তুমি বাহির হবার পরই আমি কার্ডখানার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করলুম—যে এখানা এ, পাকড়াশীর। শুনেছিলুম যে মিসেস পাকড়াশী রাঁচি এসেছেন, মিঃ পাকড়াশী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, কিন্তু মিসেস্ পাকড়াশীকে কখনও দেখি নি, তাই সে দিন ফুটবলের মাঠে তাঁকে চিনতে পারি নি, যদিও আমি তাঁর পাশে বসেছিলুম। এর জন্য আমায় মার্জ্জনা করবেন, মিসেস্ পাকড়াশী।"

"না—না—ও কথা বলছেন কেন?"

"যাক্, তার পর এখানে হাজির। তোমার ব্যাকুল মন, তোমায় যে মোরাবাদী পাহাড়ে নিয়ে যাবে, সেটা কতক আন্দাজ করেছিলুম। এখানে এসে যখন শুনলুম যে এ, পি তোমায় চেনে শুনে, যদিও তুমি তাকে চেন না; অধিকন্তু সেও সেখানে গেছে, তখন "এ পি আর পি আরের মিলন-মধুর একটী সুর শুনতে পেলুম। সে সুর মন-মাঝে কল্পনা, না বাস্তবে মূর্ত্ত, তাই দেখবার আশায় অপেক্ষা করেছিলুম। ব্যাধ যদি প্রবল হয়, তার পাখী ধরে নিয়ে তার বাড়ী ফিরবে। আর পাখী যদি বলবান্ হয়, তবে ব্যাধকে

ছোঁ মেরে নিয়ে তার বাসায় পঁহুছুবে। মিসেস পাকড়াশী, আমার হার হ'য়েছে, আপনার জিত, যে হেতু পাখী ব্যাধকে ধরে নিয়ে এসেছে। এখন ব্যবস্থা করুন।"

ঠাকুমা আর দাদু উঠে দাঁড়ালেন। প্রভাত আর এ-পি কাজে কাজেই উঠে পড়লো। দুজনে হেঁয়ালী ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না—বিশেষ প্রভাত। ঠাকুমা বললেন—

"শোন প্রভাত, তোমার দাদুর সম্মতিক্রমে আমি আজ আমার দৌহিত্রী মিস্ অভাননী পাকড়াশীকে তোমার হাতে সমর্পণ করলুম। কাল যথারীতি বিবাহ। আজ হ'তে আভা আর গোঁফ পরবে না, পুরুষের পোষাক ছেড়ে দেবে; কেমন আভা, এই না কথা ছিল?"

এখন আর আভা মুখ উঁচু করে রাখতে পারলে না। প্রভাতের আবেগ কম্পিত, হাতের ভিতর, আভার হাতের আঙ্গুলগুলি চঞ্চল হ'য়ে উঠলো, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

এই অবসরে বুড়োবুড়ি কোথায় অদৃশ্য হ'ল। আভা ধীরে ধীরে মুখ তুলে, স্মিত-হাস্যে প্রভাতের আনন্দ বিস্ফারিত আঁখি দুটীর পানে তাকিয়ে রইল।

শ্রীবজ্রাচার্য্য
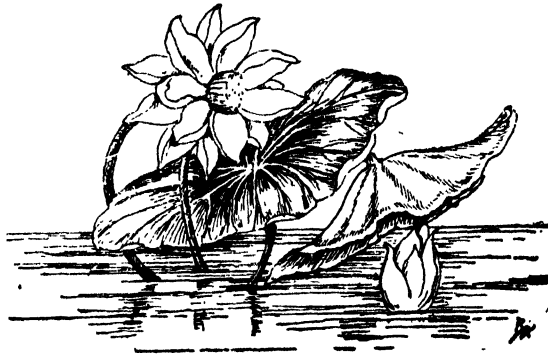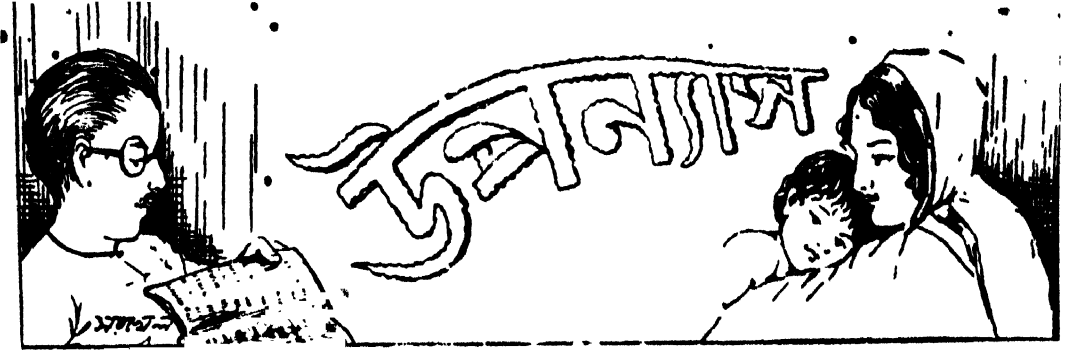
অভিশপ্তা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

নয়

মোকদ্দমাটা চল্‌ল অনেক দিন ধরে।

এমন একটা রহস্য জনক খুনের মামলা, তারপর খুনী একজন অল্পবয়সী স্ত্রীলোক, কাজেই বিচারের ফলাফল জান্‌বার জন্য সাধারণ অতিমাত্র উৎসুক হয়েছিল।

সকলেই ভাব্‌ছে অপরাধীর প্রাণদণ্ড না হোক্ দ্বীপান্তর অনিবার্য্য। কিন্তু রেখার স্থির বিশ্বাস তরী মুক্তি পাবে।

এ বিশ্বাস তার রাখার জন্যই সুনীত প্রাণপণে চেষ্টা করছিল তরীকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করতে।

এই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ তরুণ ব্যারিষ্টারকে অপরাধীর তরফে দাঁড়াতে দেখে আশ্চর্য্য বোধ করছিল সকলেই। ভিতরের ব্যাপার শিশির ভিন্ন আর কেউ জান্‌ত না, পিতাকেও সে কথাটা জান্‌তে দেয়নি তাঁর বিরাগের ভয়ে।

সুনীত ভয় পাচ্ছিল রেখার শরীর ও মনের অবস্থা দেখে, সে কি বল্‌তে কি বলে ফেলে শেষে কেস্‌টা গোলমাল করে দেয় যদি।

কিন্তু তা হল না, পুলিশের ডায়েরীতে রেখার জবানবন্দী যেমন ছিল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে এবং সেশনে-ও তাই বলে গেল বেশ ধীর ভাবে।

তরী ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ কোর্টে ঠিকই বলেছিল, কিন্তু সেখানে এসে সরকারী উকীলের জেরায় পড়ে সে একটু ঘাবড়ে গেল।

—রোজ রাত্রে তরী যখন বাগানে ঘর দেখ্‌তে যায় না, তার চাবি থাকে মিহিরের কাছে; তখন সেদিন বৃষ্টি বাদল অন্ধকারে গিয়েছিল কি মনে করে? মনিবের হুকুমে কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে তরী দত্তমশায়ের দিকে চাইলে, দেখ্‌লে তিনি কট্‌মট্ করে তার পানেই তাকিয়ে আছেন। তরী থতমত খেয়ে মাথা নেড়ে বললে,

—উঁহু, উনি বলেন নি, আমি নিজেই গেছলুম, হঠাৎ মনে হয়ে গেল…

—কেন? হঠাৎ মনে হ'বার কারণ? ও ঘরে এমন কোনো দামী জিনিস পত্র ও ছিল না, যা' চুরী যেতে পারে।

—তাঁতো ছিল না, কিন্তু—

তরী একটু থেমে, ঢোক্ গিলে, আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লে—এম্‌নি মনে হ'ল,—আমি গেছলুম পুকুর ঘাটে, তার পর ভাবলুম ও ঘর খানাও একবার দেখে যাই, কি জানি দাদাবাবু যদি যাবার সময় তালা না লাগিয়েই… মানুষের ভুল হয় নাকি?

—তা হ'তে পারে, কিন্তু তুমি আগে তো এ রকম বলোনি,—এই পুকুর ঘাটে যাবার কথাটা—

—না, তখন মনে ছিল না ভুলে গিয়েছিলুম...

—এখনো ভুল করছ, পুকুর ঘাটে যাবার পথ তো ঠিক ওটা না, তুমি সোজা গিয়েছিলে বাগানের ঘরেই, মিহিরবাবু সেখানে আছেন জেনেই...তাঁ'কে যেতে মানা করবে বলে।

তরী এবার চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—

—ওমা! ওকি কথা গো! আমি যাব মানা করতে কেন? যাদের করবার তারাই করলে না, আমি কোথাকার কে? আমার কিসের গরজ?

—কিন্তু এর আগে পুলিশ ইনস্পেক্টারের কাছে তুমি বলেছিলে, মিহিরবাবুর এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়ানোর জন্যে তুমি বারণ করেছ কতবার...সেই রকম সেদিন ও বল্‌তে গেছলে বোধ হয়?

তরী এবার নীরব। তার চেহারা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে উকীল বল্‌লেন—মনে করে দেখো,—ঐ রকম একটা মতলব নিয়ে তুমি যখন গেলে তখন মিহিরবাবু বসে লিখ্‌ছিলেন। তুমি গিয়ে বকাবকি আরম্ভ করে দিলে, কেমন?—ঠিক কি না? তারপর বকাবকি হ'তে হতে ঝগড়া বেধে গেল, শেষকালে তুমি রাগ সাম্‌লাতে না পেরে ঐ দা' খানা তুলে নিয়ে...

বাধা দিয়ে তরী আহত আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—ওঃ! না, না, না! আমি তো রাক্ষুসী নয়! অমন করে জলজ্যান্ত মানুষটাকে...না, না, দোহাই ধর্ম্মের! মা কালীর দিব্যি গেলে বল্‌ছি—আমি শুধু ধরে তুলতে গেছনুম, তাতেই রক্তারক্তি হয়ে গেল দু'হাত ভরে।

—কিন্তু একথা তোমার বিশ্বাস করি আমরা কেমন করে? তুমি যে ওকে খুন করোনি, শুধু তুলতেই গিয়েছিলে, তার সাক্ষী—

—সাক্ষী সাবুদ আমার কেউ নেই, সেখানে কেউ ছিল না, জন প্রাণীও না; আকাশে একটা নক্ষত্র ও ছিল না! কিন্তু ভগবান্ যিনি আজও দিন রাত্তির করছেন, তিনিই জানেন আমি নির্দ্দোষী।

তরী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠ্‌ল।

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতার মধ্যে একটা কোলাহল শোনা গেল—কি, ওকি হল? মেয়েটা অমন করে কেন? —ইস্! 'ফেন্ট্' হয়ে পড়ল বুঝি! আহা! ছেলে মানুষ ঘাব্‌ড়ে গেছে, ব্যাপারটা তো সোজা নয়!

সুনীত শঙ্কিত হয়ে দেখ্‌লে রেখার মুখ মৃতের মত রক্তলেশ হীন, নিষ্পলক চক্ষুর তারা একেবারে স্থির।

শিশির তাড়াতাড়ি এসে ধরে না ফেল্‌লে সে পড়ে যেত।

* * *

মূর্চ্ছিত রেখাকে ধরাধরি করে এজলাসের বাইরে একান্তে এনে মুখে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দেওয়া হ'ল কতক্ষণ, তবু জ্ঞানোন্মেষ হল না।

শিশির উদ্বিগ্ন হয়ে বল্‌লে,—বাবা, সুনীতদা বল্‌ছেন একবার ডাক্তার ডেকে দেখাতে, অনেকক্ষণ হয়ে গেল...

শোকে তাপে, মামলা মোকর্দ্দমার ঝঞ্ঝাটে বৃদ্ধ দত্ত মশাইর মাথার ঠিক্ ছিল না, তার পর মিহিরের হত্যাকারিণী তরীকে যে রেখাই তলে তলে বাঁচাবার চেষ্টা করছে, এ কথাটা জেনে পর্য্যন্তই রেখার প্রতি তাঁর সে মমতার ভাবটুকু অপহৃত হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যহীনা রেখা এখন তাঁর দুই চক্ষের বিষ।

কাজেই, শিশিরের কথায় তিনি অদূরে উদ্বিগ্ন মুখে দণ্ডায়মান সুনীতের দিকে সরোষ কটাক্ষে তাকিয়ে বিরক্তি ভরে বলে উঠ্‌লেন—যার গরজ পড়ে থাকে সে ডাকুক্ ডাক্তার, আমি পারব না কিছু! অত বড় হাতী যেন, ছেলেটাই যে চলে গেল, এক ফোঁটা ওষুধ কি জল পর্য্যন্ত তার মুখে দিতে পার্‌লুম না, আর এখন কেউ যাচ্ছেন মূর্চ্ছা, কারো দাঁত কপাটী লেগে যাচ্ছে—ও সব আহ্লাদেপণা আর ভাল লাগে না আমার! মরছি নিজের জ্বালায়!

সুনীত শুষ্কমুখে বল্‌লে,—

—তাহলে কি করা যায় এখন। রেখা দি'র জ্ঞান না হলে নিয়ে যাওয়া হবে কেমন করে?

[illegible]—থাক্ না তোমার রেখা দি', সেখানে গিয়ে আমার [illegible] ঘর তুলে দেবেন না তো। যার সম্পর্কে সম্পর্ক, সেই [illegible]া, তখন দরকার কি? তোমার সুনীতদা'কে বলো [illegible] হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে, আমি আর দেরী করতে পারব না, বাড়ীতে জন মনিষ্যি নেই, কে কমনে থেকে ঢুকে মাথাটা খেয়ে যাক্ আমার! হুঃ! এই তো সুযোগ! বলে কারো সর্ব্বনাশ, কারো পোষ মাস! জানিতো সব!

সুনীতের ক্ষুব্ধ চিত্ত বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। এই লোকটাই রেখার অভিভাবক! এরই অধীনে ও তত্ত্বাবধানে থেকে ওকে সারা জীবন কাটাতে হবে! কি দুর্দ্দৈব!

সুনীত শিশিরকে ডেকে বল্‌লে,

—তোমার ফাদারকে জিজ্ঞাসা করো, রেখাকে হসপিট্যালে না পাঠিয়ে যদি আমি নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখি একটু সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাতে ওঁর আপত্তি আছে কি?

দত্ত মশাই কথাটা শুনে ত্বরিতে বল্‌লেন,—

—স্বচ্ছন্দে! আমি তো তাহলে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচি বাবা! এই ঝঞ্ঝাটের ওপর রোগের কন্না করে কে? বাড়ীতে থাক্‌বার মধ্যে এক আমি একলা বুড়ো মানুষ, কোন্ কোন্ দিক্ সামলাই বলো! আর ও মেয়েটার যা দশা হয়েছে ও এখন বাঁচে কিনা, তাই সন্দেহ!

মেয়েটার যা-ই হোক্, দত্ত মশাই কিন্তু গলার কাঁটা নামিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। অলক্ষণা রেখাকে তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না।

দশ

সেই থেকে রেখার প্রবল জ্বর, শয্যাগত অবস্থা। ডাক্তার আশঙ্কা করছেন জ্বরটা সহজ নয়—ব্রেণ ফিভার।

শিশির সর্ব্বদা তার কাছে থাকতে পারে না, মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নিয়ে যায়—পিতার অজ্ঞাতে।

সুনীত রোগীর চিকিৎসার জন্য ভাল ডাক্তার, শুশ্রূষার জন্য নার্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তাছাড়া নিজে ও দেখা শোনা করছে সর্ব্বক্ষণ, ক্লান্তি নেই বিরাম নেই এতটুকু, তার অক্লান্ত সেবায়, আপ্রাণ চেষ্টায় রেখার জীবনসঙ্কটের মুহূর্ত্তগুলি কেটে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে।

সুনীতের বিপর্য্যস্ত চিত্ত আশার নৈরাশ্যে, সংশয় শঙ্কায় দুল্‌ছে, দিন কাটে তো রাত কাটে না!

সেদিন সকাল বেলা নার্সকে একটু বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে সুনীত রোগীর পাশে বসেছিল। রেখার অবস্থা আজ অনেক ভাল। জ্বর কম, রাত্রে ঘুমও হয়েছে মন্দ নয়; শ্বাস প্রশ্বাসের গতি দেখে মনে হয় সে এখনো ঘুমুচ্ছে।

রেখার ক্ষীণ দেহখানা ক্ষীণতর হয়ে শয্যার সাথে মিশে গিয়েছে যেন। নিশীথের এলিয়ে পড়া শ্বেত পদ্মের মত ম্লান পাণ্ডুর মুখখানির পানে চেয়ে চেয়ে সুনীত ভাব্‌ছিল কতদিনকার কত কথা!

শেষ রাতের স্নিগ্ধ নিথর ক্ষীণ জ্যোৎস্না-রেখাটীর মত করুণ-সুন্দর এই রেখা, একেই কেন্দ্র করে সুনীতের বাল্যের আশা, যৌবনের আকাঙ্ক্ষা উন্মেষিত, স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল একদিন, আবার একদিন এই রেখাই তার চলার পথ থেকে, হাত ছাড়িয়ে সরে গিয়েছিল বড় অতর্কিতে!—তার অন্তরের সমস্ত পুলক রস নিঃশেষে নিংড়ে নিয়ে, জীবনটাকে একেবারে নীরস বিস্বাদ করে দিয়ে! সে আবার ফিরে এসেছে তারই কাছে—কিন্তু ওকে ধরে রাখ্‌বার অধিকার…

রেখার বাসিফুলের পাপড়ীর মত বিবর্ণ ঠোঁট দুখানি নড়ে উঠ্‌ল ঈষৎ। চোখ দুটী মেলে সে ধীরে ডাক্‌লে,—

—শিশির!

সুনীত আশ্বস্ত হয়ে আরো কাছে সরে বল্‌লে,

—কি বল্‌ছ রেখা?

সুনীতের মুখপানে চেয়ে সে চুপ্ করে রইল। তার কপালের এলোমেলো চুলগুলি গুছিয়ে দিতে দিতে সুনীত স্নেহ-করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—কেমন আছ রেখা? এখনো কষ্ট হচ্ছে কি?

—না, ভারি দুর্ব্বল করেছে।

—তাতো করবেই, অসুখটা তো কম হয় নি!

—অসুখ?

—হ্যাঁ, এখন তো ভাল আছ, না? এইবার সেরে উঠ্‌বে তুমি, আর ভই নেই।

ফিডিং কাপে করে একটুখানি বার্লির জল রেথাকে খাইয়ে রুমালে মুখ মুছিয়ে দিয়ে সুনীত বল্‌লে—চুপ্‌ করে শুয়ে থাকো এবার।

—সুনীত দা!

রেখা এদিক ওদিক দেখে বিস্ময়ের সহিত বললে—আমি কোথায় এসেছি; এ কার বাড়ী সুনীত দা'?

—এ আমার বাড়ী, তুমি আমার বাড়ীতে রয়েছ রেখা!

—কেন? জ্যাঠামশাই কি···

—তিনিই তোমায় রেখে গেছেন চিকিৎসার জন্য।

—আমার কী অসুখ হয়েছিল?

—জ্বর—

—ও! তাই! জ্বরের ঘোরেই বোধ হয় আমি···

রেখা থেমে গিয়ে কি যেন বিস্মৃত স্মরণের চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। নার্স এসে বল্‌লে—ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে—মা?

—হ্যাঁ, কিন্তু এইমাত্র বার্লি দিলুম যে।

—তা হ'লে একটু বাদে,—ওকে বেশী কথা বল্‌তে দেবেন না, উত্তেজনা হতে পারে।

নার্স চলে গেলে, রেখা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এ মেয়েটী কে সুনীত দা'?

—ও নার্স—

—নার্স? কেন?

—তোমার সেবার জন্যে, পুরুষ যে হাত পা থাক্‌তে ও অক্ষম! আজ যদি মা থাক্‌তেন—

সুনীতের জননী প্রবাসী পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের অল্প কিছুদিন পরেই স্বামীর অনুগামিনী হয়েছিলেন। সুনীত এখন একা। একটা ক্ষুব্ধ গভীর নিঃশ্বাস ফেলে সে বল্‌লে,

—তোমার শুশ্রূষার এখন বিশেষ দরকার। আমি তো সময় পাই না, পেলেও কিছু গুছিয়ে কর্‌তে পারি না—

—তুমি সব পারো সুনীত দা'! তুমি আমার যা করেছ—

—চুপ্‌ করো রেখা! তুমি এখন ভয়ানক দুর্ব্বল।

রেখা চুপ করে চোখ বুজিয়ে রইল। কিন্তু খানিক পরেই আবার সুনীতের পানে চেয়ে সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে—সুনীত দা, তরীর কি হ'ল?

সুনীত ব্যস্ততার সহিত বলে উঠ্‌ল—সে সব পরে বল্‌ব রেখা! এখন তুমি আর কথা বলো না ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

—এই একটী কথা, তরী কি—?

—তরী বেকসুর খালাস পেয়েছে, তুমি স্থির হও, লক্ষ্মীটী!

—আঃ! তুমি আমাকে বাঁচালে সুনীত দা'! সত্যি, তুমি বড় ভাল, বড় ভাল!

সুনীতের দিকে পাশ ফিরে, শীর্ণ হাত দুখানি তার কোলের ওপর রেখে, রেখা চোখ বুঁজিয়ে চুপটী করে শুয়ে রইল অসহায় শিশুর মত।

সুনীতের চোখে জল এসে পড়্‌ল। হায়! এই নীড়-হারা পাখীটীকে সে যদি বুকে করে রাখতে পারে, ঝড় ঝাপ্টা থেকে বাঁচিয়ে—

* * * *

রেখার অবস্থা এখন ভাল, জ্বর নেই, দুর্ব্বলতা ও কম্‌ছে ক্রমশঃ। এ তার পুনর্জীবন বল্‌তে হয়।

দুপুর বেলা সুনীত মাসিক পত্র থেকে গল্প পড়ে রেখাকে শোনাচ্ছিল। একটা ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী। শুন্‌তে শুন্‌তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রেখা বল্‌লে,

—থাক্‌ সুনীত দা!

—কেন? ভাল লাগছে না?

—ভাল লাগছে—কিন্তু কষ্ট হয় বড়।

—তাহলে আর একটা...

—থাক্‌ তুমি এমনিই গল্প করো না, সেই আমাদের ছোটবেলাকার কথা, তখন জীবনটা কি সহজ সরল ও সুন্দর ছিল!

—এখনো তাই আছে রেখা, তুমি মনে করলেই তো পারো।

সুনীতের মুখের ওপর থেকে চকিতে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে রেখা বললে,

—পাঠাল! তা কি আর হয়? অতীত—অতীত! আমার এ অভিশপ্ত জীবনে···

—কিসের অভিশাপ? তুমি নিজেকে খামখাই অপরাধী করছ কেন রেখা? তোমার কি দোষ? যার যেমন কর্ম্মফল ভুগতেই হবে। ওকি? অমন করে শিউরে উঠলে যে?

—না, গা'টা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল যেন। শিশির আর আসে নি?

—না, সে আজকাল বাড়ীতেই থাকে কিনা! পড়াও আর চলবে না তা'র, কি করে পড়ে বলো? বাড়ীতে শোকার্ত্ত বুড়ো বাপ, তা'কে দেখা, তারপর কাজকর্ম্ম সব সামলানো—

—তাই তো, এ সময় আমার সেখানে থাকাটা উচিত ছিল যে।

—সেখানে থাকলে তোমাকে আর এযাত্রা উঠতে হত না।

—তাহলে ও, আমার একটা কর্ত্তব্য···

—কর্ত্তব্য তোমারি আছে বুঝি? ও'দের নেই? সেদিন তোমাকে যে-অবস্থায় ফেলে তোমার জ্যাঠামশাই চলে গেলেন; তাতে মনে হয় না লোকটার মনুষ্যত্ব আছে; তুমি যে কেমন করে—

রেখার বেদনার্ত্ত মুখের পানে তাকিয়ে উত্তেজিত সুনীত নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরভাবে বললে—

—কিছু মনে করো না রেখা, জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ীতে তোমার আর গিয়ে কাজ নেই, বুঝলে? তিনি আমাকে বলে পাঠিয়েছেন—

—কি বলে পাঠিয়েছেন?

—এই, তোমার টাকাকড়ির হিসেব টিসেব সব বুঝে নিতে, মানে তোমার সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনো সংস্রব রাখতে তিনি চান না আর কি?

রেখার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। চোখ দুটী ছল ছল করতে লাগল। সুনীত ব্যথিত হয়ে বললে,

—দুঃখ হচ্ছে? কেন রেখা? সেখানে তোমার আর কোন্ সুখের আশা···এতো তোমার মুক্তি!

রেখা চমকে উঠল। এ তার মুক্তি? হাঁ, মুক্তি সে একদিন চেয়েছিল, কিন্তু সেটা এমন ভীষণ! ওঃ! না, না! তার অন্তরের কথা আর কেউ না জানুক তুমি তো জানো হে অন্তর্য্যামী!

—রেখা!

স্তম্ভিত রেখার একখানি হাত হাতের মুঠোয় ধরে সুনীত দরদ মাখা স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বললে—

—কি ভাবছ এত? কিসের ভাবনা তোমার? তুমি আর কোথাও যেও না, আমার কাছে থাকো,—আমি যতদিন বেঁচে আছি...পৃথিবীতে আমারি বা আমার বলতে কে আছে আর?—

—তাই থাকব সুনীত দা'! ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই, তবু দুঃখিনী অনাথা বোনটি বলে—তার অপরাধ ভুলে যদি স্থান দাও তুমি···

রেখা আর বলতে পারলে না, কম্পিত কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে গেল উচ্ছ্বসিত মর্ম্মবেদনায়!

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা
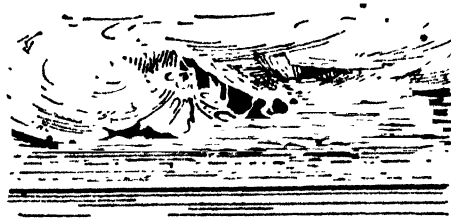
শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

পশ্চিমের কোন এক ক্ষুদ্র সহরের একেবারে এক প্রান্তে ছোট্ট একটি বাড়ী। সম্মুখ দিয়া লাল কাঁকড়ের পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া বহুদূরে কোথায় গিয়া যেন মিশিয়া গিয়াছে। তাহারই পার্শ্বে বিস্তৃত প্রান্তর শেষে সুউচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী। বাড়ীটির পশ্চাৎদিকে বহুকালের একটি নেড়া বটগাছ, তার অজস্র ডাল পালা মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাত্রে সেইদিকে চাহিলে ভয় হয়, মনে হয়, ঐ রাক্ষস যেন তাহার বহু হাত বাড়াইয়া এই ক্ষুদ্র বাড়ীটাকে নিরন্তর গ্রাস করিতে চাহিতেছে।

শীতের অন্ধকার রাত্রি। বাহিরের সেই অন্ধকার হয়ত বা হাত দিয়াই স্পর্শ করা যায়। তাহার উপর সমস্ত দিনব্যাপী অজস্র বারিপাতে সেই শৈত্যকে যেন আরও তীব্র, তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত ধরণীটাই যেন আজ আর্ত্ত হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া মরিতেছে। কাল আকাশের কোলে মাঝে মাঝে শুধু একটু আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে, বিদ্যুতের ক্ষণিক চমকে। দুই একটা মেঘের গর্জ্জন, বাতাসের হুঙ্কার আর সেই নেড়া বটগাছটার উপর হইতে একটি শকুন ছানার পরিত্রাহি চীৎকার এই সব মিলিয়া রাত্রিটাকে যেন আরও বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে।

বাতাসের দোলানীতে নেড়া বটগাছটার ডালপালাগুলো সব কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, প্রান্তর মাঝে শাল গাছগুলো সব দুলিয়া দুলিয়া নাচিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। চঞ্চল প্রকৃতি আজ যেন একেবারেই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।

ভিতরে যাহারা ছিল, তাহাদের মন বাহিরের ঐ চঞ্চল প্রকৃতির এই চাঞ্চল্যের চাইতে একটুও কম চঞ্চল ছিল না। চঞ্চল ত হইবেই। সুরেশ ও অমলার একমাত্র শিশুপুত্র, স্নেহের ঐ বন্ধনটুকুও তাহারা আজ বুঝি হারাইতে বসিয়াছে।

সুরেশ ও অমলা বসিয়াছিল রুগ্নপুত্রের মুখের পানে চাহিয়া। শুধু আজকের এই রাত্রিটাই নয়। বহুরাত্রিই তাহারা এইভাবে কাটাইয়াছে। হয়ত সারাজীবনও তাহারা এমনি করিয়া কাটাইতে পারে যদি তাহাতে খোকা তাহাদের সারিয়া উঠে।

পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া অমলার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া যায়। সে ত আর দেখিতে পারে না ঐ ক্ষুদ্র শিশুর যন্ত্রনা-মাখা কাতর মুখখানি! কি করিবে, কেমন করিয়া পুত্রের মুখের ঐ বেদনার রেখাগুলো সব মুছিয়া দিবে?

ভাবিতে গিয়া অমলার বুক ফাটিয়া যায়।

তাহাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে সুরেশ। বলে, ছিঃ, কেঁদনা অমলা, উপরে ঐ যে একজন রয়েছেন, আমরা ত তাঁর চরণে কোন অপরাধই করিনি তার জন্য তিনি আমাদের এত বড় সাজা দিতে পারেন? তুমি দুঃখ করোনা অমলা, তাঁর আশীর্ব্বাদে খোকা আমাদের ভাল হয়ে উঠবেই!

কিন্তু সান্ত্বনা দিতে গিয়াও নিজের চোখের জল সে রোধ করিতে পারে না।

স্বামীর চক্ষে অশ্রু দেখিয়া অমলা আরও ভাঙ্গিয়া পড়ে। বলে, আমি সইতে পারব না গো, এ শাস্তি আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

চোখের জল তাহার দুই গণ্ড ছাপাইয়া বাহির হইতে থাকে।

সুরেশ কোন কথা কহে না। কি কহিবে, কি বলিয়াই বা অমলাকে সে মিথ্যা সান্ত্বনা দিবে।

কিন্তু খোকামণি! খোকামণিকে কি সত্যই তাহারা বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না!

যদিচ তাহারা আজ হতাশে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তথাপি ডাক্তার যিনি, তিনি ত এখনও হতাশ হন নাই। তিনি ত আশা নাই এমন কথা বলিতেছেন না। তবে? তবে তাহারাই বা কেন হতাশে এমন করিয়া পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে!

কিন্তু ডাক্তারের কথা, ওতো শুধুই সান্ত্বনার কথা। সত্যের কি কিছু উহাতে আছে?

এই ত একমাসের উপর খোকাকে লইয়া তাহারা এই পশ্চিমে আসিয়াছে কত আশা বুকে করিয়া। কিই বা হইল! এই এক মাসের মধ্যে খোকাত কিছুমাত্র ভালর দিকে গেল না। দিন দিন সে ত খারাপের দিকেই চলিয়াছে। ডাক্তারের সান্ত্বনার তবে কিই বা মূল্য রহিল!

কিন্তু এমন ও ত হয়। খোকার চেয়ে বহু খারাপ অবস্থা হইতে ও ত কত শিশু সারিয়া উঠে। তাহাদের মত খোকাও ত সারিয়া উঠিতে পারে।

তাই হউক। ওগো তাই যেন হয়, খোকাকে যেন তাহাদের না হারাইতে হয়।

ভগবানের চরণোদ্দেশে বার বার মাথা খুঁড়িয়া বলিতে থাকে, তাই কর দয়াময়! খোকাকে আমাদের ফিরিয়ে দাও।

দেওয়ালের গায়ের ক্লকটায় তখন অনেকটা বাজিয়া গিয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া অমলা সুরেশকে বলিল, খোকার পাশে তুমি একটু গড়িয়ে নাও। এমনি করে আরও হয়ত কত রাত জাগতে হবে। কিন্তু শরীর তোমার ভেঙ্গে পড়লে কি হবে বল ত? আমি ত জেগেই রয়েছি, এবার তুমি একটু গড়িয়ে নাও।

সুরেশ খোকার মুখের পানেই চাহিয়া থাকে। ঘুমাবার কথা তাহার মনে হয় না। ঘুম তাহার আসে নাই, আসিবেও না। কিন্তু অমলাকে বিশ্রাম দিবার নিতান্ত প্রয়োজন। রাত্রি জাগিয়া, শুশ্রূষা করিয়া এক-প্রকার না খাইয়া উহার শরীরের অবস্থা দিন দিন যা হইতেছে, সুরেশ ত তাহা দেখিতে পাইতেছে। তাই সে কহিল, আমার ত ঘুম পাচ্ছে না অমলা! আমি জেগেই থাকব, তুমি আমার পাশটীতে শুয়ে একটুখানি চোখ বোঁজ দেখি।

পরিশ্রমে, ক্লান্তিতে চোখ তাহার সত্যই ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। তথাপি চোখ ত সে বুজিতে পারে না, পারিবেও না। চোখ বুজিলে যদি খোকা তাহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়, চোখ মেলিয়া যদি খোকাকে সে আর দেখিতে না পায়—তবে? না, তা সে করিবে না। তাহারা বসিয়াই রহিল।

বাহিরের মতামাতি তখন থামিয়া গিয়াছে। শকুন ছানাটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া হয়ত বা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শুধু বৃষ্টিটা তখন ও সম্পূর্ণরূপে থামে নাই।

ক্লকটায় তিনটা বাজিয়া গেল। সুরেশ চমকিয়া উঠিল, কি আশ্চর্য্য, বসিয়া বসিয়া সে যেন তন্দ্রায় ঢুলিয়া পড়িয়াছিল! চোখ মেলিতে গিয়া সে দেখিতে পাইল, অমলা খোকার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে…কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ভাল করিয়া চাহিতেই সে আর তাহাকেও দেখিতে পাইল না! অমলাও যেন কখন খোকার পার্শ্বে তাহার মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খোকার দিকে চাহিয়া দেখিল, সে-ও ঘুমাইতেছে। ললাটে তাহার মৃদু ঘাম দেখা গিয়াছে। গায়ে হাত দিয়া বুঝিল জ্বরটা ছাড়িয়া যাইতেছে…কিন্তু খোকাকে বাতাস করিতে অমলার মত তবে কাহাকে সে দেখিল? হয়ত তাহাকেও নয়। রাত্রি জাগরণের দৃষ্টির সম্মুখে হয়ত কোন ছায়াছবি ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

সুরেশ উঠিল। আড়াইটার সময় খোকাকে যে ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, তাহা খাওয়াইতে আধ ঘণ্টা মিছামিছি দেরী হইয়া গেল। ভাবিতে গিয়া তাহার নিজের উপর কেবল রাগ হইতে লাগিল।

না, ঔষধ খাওয়ানই হইয়াছে। শিশিতে শেষ দাগ যে ঔষধ ছিল, তাহা নাই...অমলাই খাওয়াইয়াছে—

কিন্তু খাওয়াইয়াছে ত'? ডাকিয়া তুলিল অমলাকে। সুরেশের ডাকে অমলা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বসিল। এবং বসিয়াই সে খোকার মুখের পানে ঝুঁকিয়া পড়িল।

সুরেশ কহিল, খোকা ভাল আছে, কিছু ভয় নাই তোমার সে কহিল, খোকাকে আড়াইটায় ওষুধ তুমি ত খাইয়ে দিয়েছ?

আড়াইটায় ওষুধ! অমলা ঘড়ির দিকে চাহিল, দেখিল তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। এখনও খোকার ঔষধ তবে খাওয়ানো হয় নাই! কহিল, আমি ত খাওয়াইনি, ঘুমিবেই বা কখন পড়লুম...কিন্তু তুমিও কি খাইয়ে দাও নি?

সুরেশ কহিল, না, আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তারপর ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু শিশিতে যে ঔষধটুকু নাই—

অমলা বিস্ময়ে কহিল, ঔষধ নাই শিশিতে?—মানে?

সুরেশ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সে খোকাকে ঔষধ খাওয়ায় নাই, অমলাও না, ওঘরে রহিয়াছে ভজুয়া আর রামধনী। তাহারা ও আসিয়া খোকার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতে পারে না, সম্ভব ও নয়। তবে?...

কিন্তু খোকার মুখের ঔষধের তীব্র গন্ধটুকু তখনও লাগিয়া রহিয়াছে। তবে কে খাওয়াইল...কেন খাওয়াইল?

তাহার চোখের সম্মুখে আবার ভাসিয়া উঠিল তন্দ্রা ভাঙ্গিতেই যে ছবি সে নিমেষের জন্য দেখিতে পাইয়াছিল —তবে কি সে ছবি, শুধু তাহার ক্লান্ত চোখের স্বপন-ছবিই নয়?

ভাবিতে গিয়াই তাহার সারা মুখে বিস্ময় ও ভয়ের একটা সুস্পষ্ট চিহ্ন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

তাহার পর দুইদিন কাটিয়া গিয়াছে। খোকার অবস্থা যেন একটু উন্নতির দিকে দেখা যাইতেছে।

অমলাও সুরেশের মুখে আবার আশার আলো দেখা দেয়। সেদিনকার সে ঔষধ খোকার মুখে কে যে ঢালিয়া দিয়াছিল তাহার মীমাংসা আজও হয় নাই। ঘুম ভাঙ্গিতে অমলার মত তাহাকে সুরেশ দেখিয়াছিল, সে যে কে ভাবিয়া তাহার ও কুল কিনারা সে পায় নাই। অমলাকে মিথ্যা করিয়া বুঝাইতে হইয়াছে, ও ঔষধ আমিই খাইয়ে দিয়েছিলাম। ঘুমের ঘোরে সে কথা তখন আমার মনে ছিল না।

অমলা ও তাই বুঝিয়াছে।

কিন্তু সুরেশের মন মাঝে মাঝে সেই কথা ভাবিয়া কাঁপিয়া উঠে। কত কাহিনী তার মনের মাঝে একবার করিয়া উঁকি মারিয়া যায়...সেদিন তাহাকে সে দেখিয়াছিল সে কি? মানুষ?...স্বপন ছবি?... না ও—

ভাবিতে গিয়া সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

এই যে বাড়ীটি, এখানে আসিয়াই ইহার সৌন্দর্য্য, নির্জ্জনতায় সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আজ এই বাড়ীটি তাহার চক্ষে যথেষ্ট পীড়াদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল রাত্রে সে সত্যই অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করে। নিদ্রা শেষে চোখ মেলিতেই যেন তাহার কেমন একটা আতঙ্ক হয়। যদি কিছু দেখে...যদি কিছু ঘটে!

না, সে এ বাড়ী ছাড়িয়াই দিবে। খোকা একটু ভাল হইলেই তাহারা অন্যত্র বাসা বাঁধিবে।

দিনের পর দিন গড়াইতে লাগিল। একটু ভালর দিকে যাইয়া খোকার অবস্থা সেই যে এক ভাবে রহিয়া গেল, তাহার আর পরিবর্ত্তন হইল না।

এতদিন পর ডাক্তার ও যেন একটু হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। চেষ্টার তাহার কোন ত্রুটীই নাই, অথচ নিশ্চিন্ত তিনি হইতেছেন কই?

শীতকাল! কিন্তু এ পোড়া দেশে এসময়েও বৃষ্টির বিরাম নাই। আজ দুইদিন ধরিয়া আবার এখানে অবিশ্রাম বৃষ্টি নামিয়াছে। সঙ্গে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসেরও যোগ ছিল। সেই বাতাস যেন ছুঁচের মত সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিতে থাকে।

বহুদিন পরে খোকা আজ কথা কহিয়াছে। সুরেশের দিকে চাহিয়া সে কহিল, খুলে দাও না বাবা ঐ জানলাটা একবার।

পায়ের দিকে সেই জানলাটা। খুলিয়া দিলে দৃষ্টি গিয়া পড়িবে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে, আর দূরের ঐ পহাড়ের গায়ে। কিন্তু বাহিরে চলিতেছে, ঝড়বৃষ্টির খেলা। জানলা খোলা চলে কি করিয়া?

সুরেশ খোকার দিকে চাহিয়া কহিল, কি হবে জানলা খুলে খোকামণি?

খোকা বলে, মাঠ দেখব আর পাহাড় দেখব বাবা!

বাহিরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে খোকামণি—সুরেশ কহিল।

অমলা পুত্রের কপালে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া কহিল, তোমার অসুখ সারলেই আমরা তোমায় নিয়ে, মাঠ ভেঙ্গে ঐ পাহাড়ের কাছটায় বেড়াতে যাব—কেমন?

ছোট্ট একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া খোকা কহিল, আচ্ছা।

তারপর মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার সেই বৃষ্টির ছড়াটা বল না একবার, সেই বৃষ্টি—বৃষ্টি—বৃষ্টি—

সুরেশ খোকার দিকে চহিয়া ভাবে, খোকা যদি বাঁচিয়া থাকে তবে বড় হইলে হয়ত বা সে একজন কবিই হইবে।

অমলার চক্ষু সজল হইল উঠে। পুত্রের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সে সুর করিয়া খোকাকে শুনাইতে বসে, বৃষ্টির সেই ছড়াটা—

বৃষ্টি—বৃষ্টি—বৃষ্টি
তুমি বিধির সুন্দর সৃষ্টি। ইত্যাদি

বৈকালের দিকে ঝড় বৃষ্টি কমিয়া গেল। ছড়া শুনিতে শুনিতে সেই যে খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, এখনও তেমনি ভাবেই সে ঘুমাইতেছে। সুরেশ গিয়াছে ডাক্তারের কাছে ঔষধ আনিতে,—এখনই ফিরিয়া আসিবে।

মেঘশূন্য সন্ধ্যা-আকাশে দুই একটা নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এখনকার এই আকাশ দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিবে না যে তিনচার ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ আকাশই মেঘের ঘনঘটায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

খোকা তখনও ঘুমাইতেছে।

পাশের ঘরে অমলা খোকার জন্য পথ্য তৈয়ারী করিতেছিল। খোকার কাছ হইতে সে এই মাত্র উঠিয়া আসিয়াছে।

গৃহের প্রদীপটা জ্বলিতেছিল ক্ষীণভাবে। সেই আলোকে সমস্ত কক্ষটা আলোকিত হইতে পারে নাই। আলো আর ছায়া পরস্পর যেন হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেওয়ালের ঘড়িটায় অবিশ্রাম টিক্-টিক্ শব্দ হইতেছিল। খোকার নিঃশ্বাসের শব্দও হইতেছিল। খোকার নিঃশ্বাসের শব্দও ঘরের মাঝে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

পথ্য লইয়া অমলা আসিয়া দাঁড়াইল এ ঘরে, এবং আসিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল। হাত হইতে তাহার বাটীটি মেঝের উপর পড়িয়া ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল। অমলা পড়িয়া যাইতেছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ঔষধ লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল সুরেশ। অমলার চীৎকার শুনিয়া সে ঘরে ছুটিয়া আসিল এবং অমলাকে ধরিয়া ফেলিল।

অমলা কোন কথা না কহিয়া কেমন ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে সুরেশের মুখের প্যানে কেবল চাহিতে লাগিল।

তাহার সেই দৃষ্টি দেখিয়া সুরেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে অমলা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে। তখনই তাহার চোখের সম্মুখে আবার ভাসিয়া উঠিল সেইদিনের নিমেষের দেখা সেই ছবি...অমলা ও তবে কি তাহাকে দেখিয়াছে...ও কে? কেন আসে! কি সম্বন্ধ উহার তাহাদের সঙ্গে?...

এক্ষণে অমলার আবার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল খোকার কাছে। না—নিঃশ্বাস এই ত তাহার বহিতেছে! কিন্তু খোকা যে অসম্ভব

ঘামিতেছে, একি অসম্ভব ঘাম! ঘামে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে।

সুরেশ শুক্‌না কাপড় দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিল। কিন্তু একটু পরেই আবার তেমনি ভাবেই ঘাম ঝরিতে লাগিল।

সুরেশ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ডাক্তার—ডাক্তার—ডাক্তারের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু খোকাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া তাহার যাওয়াও চলে না। তাই চিঠি দিয়া ভজুয়াকে পাঠাইয়া দিল ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার আসিলেন। খোকাকে পরীক্ষা করিয়া ইন্‌জেক্‌সন্ দিলেন। কিন্তু খোকা বৃষ্টির ছড়া শুনিতে শুনিতে সেই যে চোখ বুজিয়াছিল, সে চোখ আর সে খুলিল না। সারারাত্রি একভাবে থাকিয়া ভোরের দিকে অমলা ও সুরেশের বক্ষে শেলাঘাত করিয়া হয়ত বা সেই বৃষ্টির দেশেই সে যাত্রা করিল।

ছোট একটী কুঁড়ি—ইহাকে হারানর যে কি ব্যথা, তাহা যে না হারাইয়াছে সে হয়ত ইহা বুঝিতে পারিবে না।

খোকা-সোনাকে কেন্দ্র করিয়া সুরেশ ও অমলা কত সোনার স্বপ্ন রচনা করিত—করিয়া আনন্দ পাইত। আর আজ? বালির উপর তাহারা ঘর বাঁধিয়াছিল, সে ঘর তাহাদের ভাঙ্গিয়াই গেল।

খোকাকে বুকে করিয়া কত আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাহারা এ দেশে আসিয়াছিল—এইবার দেশের দিকে ফিরিতে হইবে, কিন্তু এই খালি বুক লইয়া তাহারা ফিরিবে কি করিয়া?

খোকাকে হারাইয়া অমলা সেই যে শয্যা লইয়াছিল, সেই শয্যা ছাড়িয়া সে আর উঠিতে চাহে না। তাহাকে লইয়া সুরেশ পড়িয়াছে আরও মুস্কিলে। নিজের এই অশান্ত মন লইয়া সে কি বলিয়াই বা অমলাকে নিত্য সান্ত্বনা দিবে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া অমলা এই মাত্র একটু চুপ করিয়াছে। তাহার একখানি হাত ছিল সুরেশের কোলের উপর। সুরেশ সে হাত খানার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। চোখ তাহারও অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরের মাঝে অন্ধকারের পর অন্ধকার আসিয়া জমাট বাঁধিতেছিল। সে খেয়াল তাহার ছিল না। মন তাহার ছুটিয়া বেড়াতেছিল হয়ত খোকারই পশ্চাতে…

হঠাৎ পার্শ্বের ঘর হইতে কাহার যেন চাপা গলার শব্দ ভাসিয়া আসিল। ঐ ঘরেই খোকার মৃত্যু হইয়াছে। একবার, দুইবার, তিনবার—হ্যাঁ, সুরেশ স্পষ্টই শুনিল—অমলাও শুনিল, ওঘরে নারী কণ্ঠে কে যেন কাঁদিতেছে—খোকা—খোকারে—

ও কি!—বলিয়া অমলা সুরেশের হাত সজোরে চাপিয়া ধরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অমলার দৃঢ় মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল। অন্ধকারে সুরেশ বুঝিতে পারিল যে অমলা ভয় পাইয়াছে এবং মুর্চ্ছিত ও হইয়া পড়িয়াছে।

সুরেশ ভজুয়াকে ডাকিয়া একটা আলো লইয়া আসিতে কহিল।

আলো লইয়া আসিতেই সুরেশ দেখিতে পাইল, অমলার মুখখানা একেবারে পাংশু হইয়া গিয়াছে। চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে অমলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল! চোখ মেলিয়া সুরেশের দিকে সে যেন কেমন করিয়া চাহিতে লাগিল। সুরেশ কহিল, ভয় নাই অমলা, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়—

পার্শ্বের সেই ঘর খোকার মৃত্যুর পর হইতে বন্ধই ছিল। সুরেশ আলো লইয়া সে ঘরে গেল, কিন্তু কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না। সেই নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি, অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে।

অনেক ভাবিয়াও সুরেশ ইহার কুলকিনারা পায় না। এই বাড়ীতে আসিয়া সেই অশরীরী নারী মূর্ত্তিটি তাহাদের চোখের সামনে যে-কয়বারই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন শুধু তাহার ব্যগ্রহৃদয়ের স্নেহের মূর্ত্তিটাই তাহাদের চোখে পড়িয়াছে। সে যেই হউক, খোকাকে সে যে ভাল

...সিত, স্নেহের বুকে যে যে তাঁহাকে দেখিয়াছিল। তাহার প্রমাণ সেত দিয়াছেই...সময় চলিয়া যায় দেখিয়া, মায়ের যত্ন নিয়া সে তাহার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিয়াছিল। সে কথা সুরেশ তখন না বুঝিলেও এখন যে তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। তাহার পুর খোকার শেষ দিনের সন্ধ্যায়, তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া হয়ত বা কতখানি উৎকণ্ঠা নিয়া সে তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাকে বাতাস করিতেছিল। অমলাই ত তাহা দেখিয়াছিল। এমনিভাবে খোকাকে বাতাস করিতে সুরেশও একদিন তাহাকে দেখিয়াছিল। তাহার পর খোকাকে হারাইয়া তাহাদের মত সেও ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে। অমলার বুকফাটা কান্নার মতই ত সে কান্না!—তবে?

সুরেশ কেবল ভাবিতে থাকে, কে ঐ অশরীরী নারী! ...তাহাদের সঙ্গে তাহার কিই বা সম্বন্ধ?...

সুরেশ যাহা ভাবিয়া পাইবে না, তাহা দেখিতে হইলে এই বাড়ার সম্মুখ হইতে কুড়ি বছর আগেকার ফেলা একখানি যবনিকা আমাদের তুলিয়া দিতে হয়।

যবনিকা তুলিয়াই দিলাম—

সুন্দর একটা নারী, তেমনি সুন্দর একটী পুরুষ।

এক তরুণ দম্পতী।

এই বাড়ীতে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। অমলাদের মতই একটী রুগ্ন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া।

ইহাদের ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। তাই এই পশ্চিমাঞ্চলের কোন সুচিকৎসকেই না ডাকিয়া ইহারা ক্ষান্ত হয় নাই। ইহাদের লোকজনেরও কোন অভাব ছিল না, তাই শিশুর সেবা শুশ্রূষার দিক দিয়া কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই।

কিন্তু ভগবান যাহাকে তাহার কাছটিতে লইতে চাহিতেছেন, মানুষের সাধ্য কি তাহাকে ধরিয়া থাকে। রাখিতে ইহারাও পারিল না।

অমলাদের খোকার মত এ শিশুও একদিন চলিয়া গেল, সুনিপুণ চিকিৎসকের সমস্ত চিকিৎসার কৌশল ব্যর্থ করিয়াই?

পুত্রকে হারাইয়া তরুণ কাঁদিল, কিন্তু তরুণী মা তাহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। আর পারিল না বলিয়াই ভালমন্দ কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া সে তাহার সুকোমল নবীন জীবনটী অবেলায় পৃথিবীর বুক হইতে সরাইয়া ফেলিল।

হয়ত সে ভাবিয়াছিল, সে যাইবে সেখানে—যেখানে তাহার পুত্র গিয়াছে।

কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষে যাহা আশাকরে, মৃত্যুর পর তাঁহা সফল হইবে কি না, মৃত্যুর পূর্ব্বে, কবে কে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছে?

এই নারী যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিল, সে আকাঙ্ক্ষা তাহার অপূর্ণ রহিয়াই গেল। পুত্রের নিকট তাহার আর পৌছান হইল না। শুধু অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া তাহাকে এই বাড়ীতেই রহিয়া যাইতে হইল।

ইহার পর সুরেশের পুত্রের শয্যার পার্শ্বেই যে তাহাকে প্রথম দেখা গিয়াছে তাহা নহে, এই বাড়ীতে এই কুড়ি বৎসর ধরিয়া যখন যাহারাই আসিয়াছে, তাহাদের কোন শিশু যখনই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, তখনই এই অশরীরী নারীকে এমনি ভাবে দেখা গিয়াছে—

কে জানে, আর কতদিনই বা সে তাহার এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া পৃথিবীর বুকে মিথ্যা ঘুরিয়া মরিবে!

নির্ম্মলকুমার রায়

অনুরাগ

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

সুবর্ণকে আমি ভালবাসি নাই, তবে তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ভালবাসিবার বয়স আমার আদপেই অন্তর্হিত হয় নাই এবং যৌবনের মতই কচি ও আনকোরা আছে··· কিন্তু তবুও একটা দিনের খানিকক্ষণের আলাপেই কাহাকেও ভালবাসিয়া ফেলিবার মত রঙীন নেশা আমার নাই।

সুন্দরী নয়···রূপসী নয়, অথচ আকর্ষণের—আর সে আকর্ষণকে অবহেলা করিতে জগতের কোন' তরুণই পারিয়া ওঠে না।

আমিও পারি নাই—

দেহ-ভরা রূপ থাকিলেই নারী সুন্দরী হয় না···সুন্দরী সে,—

মোহময়ী আকর্ষণ যে-নারী জাগাইয়া তোলে প্রতি অবয়বের লাস্য মাদকতায়, জাগ্রত যৌবনের সতর্ক চটুলতায়।

যার আঁখির ভাষা, দেহের কাঁপন, কথার সুর পুরুষকে মুগ্ধ করে, মোহমত্ত করিয়া তোলে...

সুবর্ণ সেই টাইপেরই মেয়ে।

ওর মত কায়দা-দুরস্ত ফ্যাসানের মেয়ে আমি খুব কম দেখিয়াছি।

ওর শাড়ীর কায়দা, রঙের ম্যাচ্ আর সবার ওপর ওর ঘাড় দুলাইয়া চোরা চোখে চাহিয়া আলাপের ভঙ্গী—ভারী মিষ্টি!

এক কথায় বেশ ষ্টাইলিষ্ট্।

আমার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, একটা ষ্টেসনের একটা প্লাটফরমে—

হয়ত শীতকাল হইবে—বোধ হয় একস্-মাসের সময়।

আমি যেন কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম, কলিকাতায় ফিরিব। ট্রেণের প্রতীক্ষায় প্লাটফরমটা পায়চারী করিয়া লইতেছি, ও আসিল।

আমারই কাছে আসিয়া আমাকে কহিল, আপনি কাইণ্ডলি আমার একখানা টিকিট এনে দেবেন! এক্সমাস কনসেসান্ ক'লকাতার।

তরুণী নারীর অনুরোধ আমি তো কোনদিন উপেক্ষা করিতে পারি না, আমার বয়েসের কেউই পারে না।

আমি ওর টিকিট আনিয়া দিলে, ও কহিল—থ্যাংকস্, আমি কিন্তু এ ট্রেণে যাবো না—রাত্রের মেলে যাবো, বারোটার সময়। রাত্-দুপুরে এক টিকিটের ঝঞ্ঝাট! তাই আগেই সেরে নিলুম।

আমার টিকিট হইয়া গিয়াছিল, তবু কি জানি কি আশার নেশায় কহিলাম, আমিও ঐ মেলেই যাবো। টাইমটা নোট ক'রতে এসেছিলুম। ও যেন খুসী হইয়াই বলিল, বাঃ বেশ হবে। এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। তারপর কহিল, আপনি কি এই খানেই থাকেন?

বলিলাম, না। ক'লকাতাতেই আমার বাড়ী। এখানে বেড়াতে এসেছিলুম।

একটু হাসিয়া ও কহিল, আর আমি যাচ্ছি এক্সমাস্ এন্‌জয় ক'রতে।

বলিলাম, আমাদের আর এক-ঘেয়ে একটানা ক'লকাতা ভালো লাগে না। কাজেই—

ও বলিল, অথচ আমরা কিন্তু ফাঁক পেলেই ক'লকাতা ছুটি হাওয়া খেতে।

তারপর মৃদু একটু হাসিল।

আমাকেও হাসিতে হইল।

অবশেষে আমায় নমস্কার দিয়া ও নিয়া, ও চলিয়া গেলে আমি এক আনা বাদ দিয়া আমার টিকেট রিফণ্ড

করিলাম। তারপর সুবর্ণরই ক্লাসের একখানা সিঙ্গেল কিনিয়া আনিলাম।

সেই স্কুল পালানোর জীবন হইতে অ.দ্য অবধি অনেক উপন্যাসই পড়িয়াছি কিন্তু উপন্যাসের কোন মেয়ের মত কাউকেই দেখি নাই। আজ কিন্তু আমার মনে হইল, ও আমার সেই সব পঠিত গল্প গুলির কোন একটীরই মেয়ে। কল্পনায় যাহার অনুসরণ করিয়া একদিন লেক্‌রোডে, কি ইন্‌ষ্টিটিউটে যাহাকে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আর আমার নির্জ্জন গৃহমাঝে অতি তন্ময় হইয়া তারিফ্ দিয়া বলিয়াছিলাম...বাঃ বিউটীফুল!

আজও পুনরায় ইচ্ছা হইল, সেই সুরেই বলিয়া উঠি, বিউটীফুল!

মেল ছুটিয়া চলে। যেন কোন' বিরহী বুকের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত। একটা দম লইয়া ছোট বড় কতকগুলো ষ্টেসনকে এক লহমায় পিছে হটাইয়া দিয়া একটা জংসানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। যেন বুক তার খালি হইয়া গিয়াছে। চলিবার, সাড়া দিবার কোন শক্তিই নাই।

সুবর্ণ বলে, আমার এই ট্রেনে চ'ড়তে ভারী আরাম লাগে, কিন্তু তাই বলে প্যাসেন্‌জার গাড়ী গুলো নয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যদি এইসব মেল কি এক্‌স্‌প্রেসের ড্রাইভার হতুম তাহ'লে বেশ হ'ত। খুব জোরে—যত জোরে চ'লতে পারে আমি চালিয়ে দিতুম।

বলিলাম, মাপ্ ক'রবেন—তাহ'লে বাংলা দেশের টিবি, ইন্‌সোম্‌নিয়া সাহিত্যিক্ রোগগুলোর ভেতরে আরও একটী নতুন রোগের সৃষ্টি হ'ত,—নাভি-শ্বাস।

ও হাসিল—

তারপর বলিল, না সত্যিই এর চেয়ে কি জোরে যেতে পারে না? বলুন—.

পারে হয়ত। কিন্তু সবেরই তো একটা বাঁধা ধরা আইন আছে।

আইন...আইন।

উঠতে ব'সতে, কথা ব'লতে, সব কিছুতেই আইন। আমাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে...আমার ভারী বিরক্ত লাগে!

আমার হাসি পাইল। তুমিই যখন তোমার ক্লাসে মেয়েদের লইয়া বই খুলিয়া বসো, তখন অপরূপ গম্ভীর হইয়া আইন, শৃঙ্খলা ও Disicipline বজায় রাখিয়া চলো, চলিতে বলো ও বুঝাও...অথচ ক্লাসের বাইরেই তোমার মন একেবারে চঞ্চল খুকীর মতই লঘু।

জীবনের যৌবন—মানুষের সাধ্য কি তার প্রভাব এড়াইয়া চলে:

ট্রেণে জায়গা করিয়া লইবার পর প্রথম-আলাপেই জানিয়াছিলাম, সুবর্ণ মিস্‌ট্রেস্। গার্ল-হোষ্টেল আর ষ্টুডেন্ট-দেব লইয়াই তার জীবনের পরিধি।

সুবর্ণ বলিল, ভাল কথা, আপনি ক'লকাতায় কোথায় থাকেন?

দমদম—

আমি বালিগঞ্জ; আপনি একপ্রান্তে আর আমি একপ্রান্তে।...আচ্ছা আপনি—পয়েম?

না, আমি আর্টিষ্ট্।

পেণ্ট করেন। বেশ—কিন্তু দেখুন, আপনারা বড় ভুল করেন। আমাদের যা' তা' ক'রে পেনট্ ক'রে একেবারে মাটী ক'রে দেন। শাড়ীর সিটিং, কি কলার ম্যাচ কিম্বা বডির ফিগার অনেক কিছুই নিখুঁত ক'রতে পারেন না। কোথায় আপনাদের হাতে আমরা হবো আরও চ্যারমিং, না একেবারে যাচ্ছেতাই করেন। আমি কিন্তু সত্যি—এসব বিষয়ে বড় চ'টে যাই।

সামনা-সামনি এ রকম সমালোচনার জবাব দেবার অবস্থা আমার কোন দিনই হয় নাই, বিশেষ কোন' আপ-টু-ডেট্ মেয়েকে। এক মিনিট পরে একটু চুপি চুপিই বলিলাম, আমাদের দলের একজন ত' আপনার সামনেই। চ'টে গেলে যা ক'রতে চাইতেন, না হয়—

সুবর্ণ বলিল, আমি আপনাকে ফ্রেণ্ডলি ব'লচি, সত্যি

আপনারা একটু কেয়ার নিয়ে ষ্টাডি ক'রলেই সব মানান-সই হয়। আর এখনকার দিনে এগুলো উচিতও।

আমার বাঁ চোখের মণি ঘুরাইয়া একবার দেখিয়া লইয়া মনে মনেই বলিলাম, চ্যারম্ আর অ্যাট্রক্‌সান্‌-এর এতখানি ম্যাচ সবার কাছে রেয়ার বন্ধু। তোমায় না হয় আজই পেয়েচি।

চুপ করিয়া রহিলাম।

স্বর্ণও—

বন্ধ শার্শীর গায়ে মাথাটা হেলাইয়া দিয়া, পা দুটো সোজা করিয়া মেলিয়া শাল দিয়া ঢাকিয়া ও বসিয়াছিল।

ওর ডান দিকে আমি—

এই দুটো বেঞ্চ লইয়াই কম্‌পার্টমেণ্ট।

সামনের পাসেজের মুখে দরজাটা আমরা খুলিয়াই রাখিয়াছিলাম, সেইটা দিয়া উভয় পার্শ্বের 'কম্প' হইতে লোকে আসা যাওয়া করিতেছিল, আমাদের দিকে বেশ করিয়া চাহিয়াই—

আমার মনে বেশ খানিকটা আত্মপ্রসাদই আসিয়াছিল। আমি জানি নারীর সহিত পুরুষের সাথীত্ব অপর পুরুষের ঈর্ষা জাগায়—লোভাতুর পেটুকের মত হাঁ করিয়া চায়, আমি নিজেও কতবার ওমনি করিয়াই চাহিয়াছি। আজ কিন্তু সেকেন্দারের মত শ্লাঘায় আমার বুক বড় হইয়া উঠিল।

মনে হইল বলি, ওরে তোরা চেয়ে দেখ্ দুর্ভাগ্যের দল!

স্বর্ণর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ওর চোখ দুটী নিমীলিত হইয়া আসিয়াছে। সামনের দিকে একটী জানালার কাঁচ নামানো ছিল।

দেখিলাম, গভীরতর অন্ধকারকে মথিত করিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট উর্দ্ধশ্বাস গতিতে। আবার স্বর্ণর দিকে ফিরিলাম—

চমৎকার মেয়ে! প্রিয়া হইবার মতই!

ওর যৌবন জাগ্রত, আর সে জাগরণে লাইফ্ আছে। ওর প্রতি অবয়বে মাধুরী ও মাদকতা মাখানো, যেন ইসারা করিয়া ডাকে।

একটী বারের জন্য ওর কপালের ওপরকার চুলগুলোর ওপর ঠোঁটটা বুলাইয়া লইতে ইচ্ছা হয়। আমার যৌবন হাতছানি দেয়, ক্ষণেকের জন্য ওর সন্নিকটে গিয়া ওর দেহের সুরভি আঘ্রাণ করিয়া আসি।

মন কামনাতুর হয়—শুধু একটুখানি মৃদু স্পর্শের জন্য...

আমার মনের এ কামনাকে আমি নিন্দা করি না—কেন না আমি পুরুষ, আমার যৌবন আজিও মরিয়া যায় নাই। বিশ্বাসের বিচ্যুতি !!

একটা জংসান ষ্টেসন পার হইতে গিয়া গাড়ীতে একটা দোলা লাগিল।

আমাদের শরীরে একটা ঝাঁকুনী!

স্বর্ণ সচকিত হইয়া চাহিল। বলিল, বেশ তন্দ্রা এসে গেছ্‌লো।

বলিলাম, বেশ তো ঘুমোন না।

-না, গল্প করি।

গাড়ী থামিয়া গেল।

দু'পুর রাত—

রেলের বাবুরা সরকারী জমার ওপরে আলোয়ান, মাথায় কম্ফর্টার তাহার উপর টুপী পরিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্লাটফরম জমকাইয়া বেড়াইতেছেন।

শিশির-ভেজা টীনের সেডের নীচে জনকয়েক যাত্রী জড়সড় মারিয়া আছে।

স্বর্ণ বলিল, আসুন একটু চা খাওয়া যাক্। বড্ড শীত।

এই চা'-আলা!...

দাম কিন্তু আমি দেব, ও আমাকে দিতে দিবে না। কিন্তু আমি শুনিলাম না। অবশেষে ও পান ও সিগারেট কিনিয়া বলিল, আমার পান আর আপনার সিগারেট।

সিগারেট আমি খাই, কিন্তু না খাইলেও চলে—কিন্তু এখন আর আপত্তি করিলাম না।

হয়তো এ প্রীতির দান!

পিরিচে চা ঢালিয়া ও কহিল, আজকাল কিন্তু কাপে খাওয়াই ফ্যাসান। কিন্তু আমি পারি না, গরম লাগে।

হাসিলাম।

গাড়ী ছাড়িল।

কি জানি কেন, আমার ইচ্ছা হইল এই মুহূর্ত্তে ওকে আপন করিয়া লই! একেবারে অতি আপন— সমগ্র দুনিয়ায় লোক যে আপন হওয়ার লোভে প্রাণের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মরিতেছে...যে দুবার কামনায় বিশ্বের নরনারী যুগ-যুগান্ত পরস্পরের আকর্ষণ অনুভব করিতেছে, যে আপনত্বের অন্তরঙ্গতা লইয়া কিউপিড্ অনন্তকালের জন্য বাঁচিয়া আছে! কিন্তু পারিলাম না।

হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া স্নবর্ণ বলিল, আর তিন ঘণ্টা, তারপর আমাদের শেষ।

ওর ওই চাহনীটা আমি আজও মনে করিয়া রাখিয়াছি!

আর তিন ঘণ্টা—

হঠাৎ আমার হাতটা ধরিয়া স্নবর্ণ বলিল, দেখুন ত চোখে কি প'ড়ল?

দেখিলাম, এরই মধ্যে ও কখন উঠিয়া সেই খোলা জান্‌লার নিকট গিয়াছিল, কয়লার গুঁড়া পড়িয়াছে।

রুমাল চিকণ করিয়া পাকাইয়া ঠিক করিয়া দিলাম।

কী স্নকোমল সে স্পর্শ!

স্নবর্ণ বলে, আপনি বিয়ে ক'রেছেন?

না—

তবে ছবি আঁকার মডেল পান কোথায়?

বলি, মনে মনে গ'ড়ে নিই।

খুশী হইয়া স্নবর্ণ বলে, আমার ছবি আঁকবেন? আমি দেখ্‌বো, আমার বন্ধুদের দেখাবো।

ওর এই ভুরুর ভঙ্গী আমায় মোহিত করিল।

হঠাৎ স্নবর্ণ আপন মনে বলিল, আর নিঃসঙ্গ ভালো লাগে না।

হোষ্টেল আর ষ্টুডেণ্টদের নিয়েই সারা জীবন কাট্‌লো নিতান্ত বৈচিত্র্য-বিহীন হ'য়ে। তবুও মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য পাই আমার মেয়েদের কাছে, যাদের আমি পড়াই। কী করে যে ওরা পড়ে জানি না!

...অথচ প্রায়ই দেখি কারুর বিছানার নীচে, কারুর বালিসের তলায়, লভ্ লেটার। অথচ ওরা থাকে সর্ব্বরকম শাসন ও বন্ধনের মধ্যে। দু'বছর আগে এ-চিন্তা আমার ছিল না, কিন্তু আজ মনে হয় এক আধখানা চিঠি নিঃসঙ্গ জীবনে মন্দ নয়। অন্ততঃ মনের সেটিসফেকসন পাওয়া যায়।

ওর মনের গোপন-কথা আমি বুঝিলাম। বলিলাম, যদি অধিকার দেন, বন্ধু হিসাবে ভবিষ্যতে আপনার খবর নিতে পারি!

ও বলিল, বন্ধু...বন্ধু—। বেশ তাই, আপনি আমার বন্ধুই আজ থেকে।

তারপর ওর হাত আমার দিকে বাড়াইয়া দিল, আমি আমার হাতের মুঠিতে চাপিয়া নিলাম।

ট্রেন বেলঘোরিয়া পার হইয়া গেল! দেখিতে দেখিতে কলিকাতা আসিয়া পড়িল।

স্নবর্ণ মৃদু হাসিয়া বলিল, বেশ আসা গেল দুজনে! আপনাকে বকিয়ে বকিয়ে বিরক্ত ক'রে ছেড়েছি।

বলিলাম, মোটেই না। আপনার সাথীত্ব পেয়ে আমি খুবই খুশী হ'য়েছি, নইলে নেহাত বোবার মতই আসতে হ'ত।

বলিল, আপনি আমার সঙ্গে দেখা ক'রবেন তো?

আমি সম্মতি দিলাম।

ট্যাক্‌সীতে উঠিয়া ও আমায় দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। আমিও হাত তুলিলাম।

তারপর গাড়ী আমার দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া গেল। আমার চোখের সম্মুখ হইতে একরাশ আলো সহসা সরিয়া গেল। প্রীতি-পুলকের উচ্ছল কাকলীতে যে হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল, অকস্মাৎ সে হৃদয়ে আমি অসীম শূন্যতা অনুভব করিলাম। আজ আমি বুঝিলাম, পুরুষ কেন নারীকে চায়! যৌবন কেন রূপসী সঙ্গিনীর সন্ধানে আকুল হইয়া ওঠে!

আমার বুকে এই যে আবেগ, এই যে নব চেতনা, এই যে প্রাণের স্পন্দন, ইহার মর্ম্ম আজ উপলব্ধি করিলাম। জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বয়সকে আজ চিনিয়া লইলাম।

আমি বুঝিলাম, আমারই মত এ ডাক স্নবর্ণের অন্তরেও পৌঁছিয়াছে। আর সে-পরিচয় দিয়াছে ওর প্রতি কথায়, ওর ভুরুর খেলায়, ওর গ্রীবার ভঙ্গীতে, ওর দেহের স্পন্দিত সঙ্কেতে! আর মাঝে মাঝে ওর গালের টুক্ টুকে আভায়!......

ইচ্ছা হইল, যদি কাহাকেও ভালবাসিতে হয় তবে ওরই মত দেখিয়া ভালবাসিব।

পাঁচুগোপাল মিত্র

গঙ্গা

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক শীল

এত বড়ো গঙ্গাস্নানের যোগ নাকি সচরাচর ঘটিয়া উঠে না,—সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে সম্ভব হইয়াছে ; তাই ফাঁক-তালে কিছু পুণ্য সঞ্চয়ের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু মসীজীবি বাঙালী কেরাণীর ভাগ্যে, বিশেষ করিয়া আমার অদৃষ্টে, সেই ফাঁকতালের এতটুকু ফাঁক-ও বুঝি বিধাতা রাখিয়া দেন নাই ! কারণ আমাকে প্রত্যহ ভোর ছয়টা হইতে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত অফিস করিতে হয়।

গৃহিণী-ও পুণ্য সঞ্চয়ের এই প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই এই একটী দিনের ছুটী লইবার জন্য বিশেষ করিয়া ধরিয়া পড়িয়াছিল। খুব বাগাইয়া দরখাস্ত লিখিলেও এবং সহস্র অনুরোধ জানাইলে-ও, হ্যাট-কোট-ধারী স্বজাতীয় ম্যানেজার সাহেবের নিকট কিন্তু আমার সকল আবেদন ব্যর্থ হইল। তাই দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া একটী চার আউন্স ঔষধের শিশি পকেটস্থ করিলাম। উদ্দেশ্য, কলুষ নাশিনীর ঐ পুণ্যবারি কিছু শিশিস্থ করিয়া সমধর্ম্মিণীকে ত্রি-কোটী পাপ হইতে মুক্ত করিব।

...কর্ম্মক্লান্ত দেহে মন্থর গতিতে জগন্নাথ ঘাট ধরিয়া উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। সমগ্র দিনের সংগ্রামের পর বোধ করি ঘাটগুলি-ও কিছু ঝিম্ মারিয়া আসিয়াছিল। তবে মোড়ে মোড়ে আকস্মিক দুর্ঘটনার কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত ঠিকা ডাক্তার-খানা গুলির ডে-লাইটের প্রচণ্ড আলোকচ্ছটা শ্রান্ত মস্তিষ্ককে আরো বিপন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। পথে স্নানার্থী যাত্রী অপেক্ষা ভলেন্টিয়ারের সংখ্যাই কিছু বেশী মোটা মনে হইতে লাগিল—তাহাদেরই কলরবে ঘাটগুলির নির্জ্জনতা কিছু কিছু প্রশমিত হইয়াছে

কাশীমিত্রের ঘাটে আসিয়া থামিলাম। এই পর্য্যন্তই আসিব পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে ঠিক দিয়াছিলাম। না বলিলে গোপন করা হইবে ; ইহার ভিতরেও একটী উদ্দেশ্য ছিল। স্থির করিয়াছিলাম, স্নানের পরিবর্ত্তে মাথা মুখ ধুইয়া গৃহিণীর জন্য শিশিতে জল লইয়া শ্মশানেশ্বর দর্শন করিয়া বাড়ী অভিমুখে রওনা হইব।

ঘাটে উঠিয়া প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া মাথা মুছিতেছি, একটী ক্ষিন্নস্বরে সচকিত হইয়া উঠিলাম। প্রকাণ্ড গুঁড়িটার বিশাল ছায়া পড়িয়া সে-স্থানটী বেশ একটু আঁধার করিয়া তুলিয়াছে। প্রসারিত দৃষ্টি মেলিয়া দেখিলাম, কাদায় ধুলায় মাখামাখি হইয়া একটী বিড়াল-শিশু আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আছে। বোধকরি অত্যধিক নিপীড়িত হইয়াই জোরে চীৎকার করিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত বেচারী হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাড়াতাড়ি সরিয়া দেখিলাম, আমিই তাহার লাঙ্গুল চাপিয়া ধরিয়া ছিলাম। মনে বড় কষ্ট হইল। বিদ্রূপ করিয়া হয়ত কেহ বলিবেন, কষ্ট হইবারই কথা, কেন না জন্মার্জ্জিত অনেকগুলি পাপের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া এত বড় একটা পাপের প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই সুখের নয়,—কষ্টেরই। কিন্তু সত্য বলিতে কি আমার মনে একথা মোটে উদয় হয় নাই। নিজের শৈশব-জীবনের নিঃসহায় অবস্থার কথা মনে পড়িয়াই এইরূপ ভাবোদ্রেক হইয়াছিল। অতি শৈশবেই মাতা-পিতা আমাকে এক পিসীমার হাতে অর্পণ করিয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছিলেন। যাক্ সে অনেক কথা।...

বিড়াল-শিশুটীকে খুব সাবধানে তুলিয়া লইলাম। দেখিলাম ভয়ানক দুর্ব্বল,—কর্ত্তব্য হিসাবে ধুক্-ধুক্ করিয়া হৃৎপিণ্ড চলিতেছে ;—যেন তাহার-ও কোন শক্তি নাই বোধহয় সারাদিন কোন আহার জুটে নাই ; পরিবর্ত্তে হয়ত জুটিয়াছে লক্ষাধিক লোকের পদযুগলের মৃদু নিপীড়ন !

কল্পনা-চক্ষে দিনের বেলাকার ভয়ানক ভিড়ের দৃশ্য যেন দেখিতে লাগিলাম।

কোমল-হস্তে ধূলা ঝাড়িয়া বিড়ালটীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে এখন উহাকে লইয়া কি করিব মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। যদি বাড়ীতে লইয়া যাই, গৃহিণী উহাকে কিরূপ চক্ষে বরণ করিবে, কল্পনা করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল, আমার অনুপস্থিতিতে কিছুদিন পূর্ব্বে গৃহিণী একটী ময়না কিনিয়াছিল। উৎফুল্লচিত্তে আমাকে সেটী দেখাইতে আসিলে আমি বিরক্ত হইয়াছিলাম এবং দলছাড়া হইয়াই পাখীটা অত্যধিক চীৎকার করে মনে মনে ঠিক করিয়া তাহার দিন দুই পরে গৃহিণীর অজ্ঞাতে খাঁচার দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলাম।...হঠাৎ বিড়ালটী কি ভাবিয়া হাত হইতে লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সতর্ক-হস্তে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য লুফিয়া লইতে গিয়া গঙ্গাজলপূর্ণ শিশিটী সাটের পকেট হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। এই আকস্মিক ঘটনায় নির্ব্বাক্ এবং হতভম্ব হইয়া গেলাম। অযাচিতভাবে পাওয়া এই বিড়াল-শিশুটীকে মধ্যস্থ করিয়া আমার বাস্তব-জীবনে বিধাতার কোন ইঙ্গিত আছে কিনা সঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে তাহারই মুসাবিদা করিতে লাগিলাম।

আমার চা'র বৎসরের কন্যা ত্রিধারা তখনো জাগিয়া ছিল। বাড়ীতে পা দিতেই ছুটিয়া আসিয়া আমার একখানি হাত ধরিয়া আধ আধ ভাষায় বলিয়া উঠিল, বাবু, জল এনেচ'? হাসিয়া বলিলাম, কিসের জল রে পাগল?

...রেশমের মতো লম্বা লম্বা চুল দোলাইয়া দুষ্টু মিমাখা প্রসারিত চক্ষে সে বলিল; কেন, গঙ্গার জল! মা নাইবে, আমি নাইবো!

বুঝিলাম, রূপকথার গল্প শোনার ন্যায় মাতার মুখে পুণ্যসঞ্চয়ের সোজা রাস্তার সন্ধান তাহার তরুণ মস্তিষ্কের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বলিলাম; বড্ড রাত হয়ে গেল, তাই আর ওদিকে যাইনি'রে ক্ষ্যাপা! তোরা এখন যদি চান্ করিস্ ত' চ'।

গৃহিণী বিভাবতী অদূরে দাঁড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতেছিল। আমার কথা শুনিয়া বলিল; সত্যিই তুমি যাওনি নাকি?—

কথার মাঝে ঠং করিয়া ঘড়ি বাজিয়া সকলকে সচকিত করিয়া দিল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া গৃহিণী বলিল; আর গিয়েই বা কী হবে? যোগের সময় ত দশ মিনিট আগেই শেষ হয়ে গেচে।...সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ ভার হইয়া উঠিল।

বিভিন্ন রস সৃষ্টি করিবার মানসে হাসিয়া কহিলাম; যোগের সে-জল ত' আর এরই মধ্যে শুকিয়ে যায়নি। এখনো ত সেই জলই রয়েছে। তখন আর অতো ভাবনা কিসের?

ক্রোধভরে সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়া গৃহিণী কহিল, যাও-যাও, তোমার ওসব ঠাট্টা-বিদ্রূপ সব সময়ে ভাল লাগে না। এত রাত অবধি কোথায় কাটিয়ে আসা হোল?—

চাদরের নীচে বিড়ালশিশুটী অনেকক্ষণ হইতেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল, অনেক কষ্টে প্রশমিত রাখিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল একটা হাস্যরসের আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া হঠাৎ বিড়ালশিশুটী আবিষ্কার করিয়া মাতা-পুত্রীকে একযোগে তাক্ লাগাইয়া দিব। কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্যাপার এইরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে প্রমাদ গণিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আর পারা গেল না, বিড়ালটী নিতান্ত বিদ্রোহ করিয়াই অনেকটা জোরের সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া হাত হইতে মাটীতে পড়িয়া গেল।

গৃহিণীর চক্ষে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল কিন্তু কন্যা ত্রিধারা এই নূতন অতিথিটীর আবির্ভাবে অসম্ভব রকম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বারেকের জন্য গঙ্গাস্নানের কথা, নানাবিধ অভিমান-আব্দারের কথা ভুলিয়া সে তার ক্ষুদ্র হাত দুখানি বাড়াইয়া তাহাকে কোলে লইবার জন্য আকুল হইল।

বিভাবতী এ-জিনিষটাকে সুচক্ষে লইল না। পূর্ব্বের গম্ভীরভাব বজায় রাখিয়া বজ্রমুষ্টিতে ত্রিধারাকে টানিয়া লইয়া পিঠে ধপাধপ্ দুইঘা চড়াইয়া বলিল; হতভাগা মেয়ের যা দেখ্‌বে তাই-ই নিতে ইচ্ছে হয়!—বলিয়া হাত ধরিয়া হিড়্-হিড়্ করিয়া টানিতে টানিতে বাহিরে লইয়া গেল!

কোথা হইতে এ কী সংঘটিত হইল খুঁজিয়া পাইলাম না। হতবাক্ হইয়া নিশ্চল পুতুলের মতো সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দিন দুই পরে। বিড়ালশিশুটীর ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া মনে শান্তি ছিল না, গৃহিণীর সহিত বাক্যালাপ ত একপ্রকার বন্ধ বলিলেই চলে। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তাহার কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বন্ধই করিয়া দিয়াছিলাম। ইহাতে ফল বিড়ালের দিক দিয়া মন্দ হয় নাই। প্রথমে প্রথমে তাহাকে ঘেটোমড়া, আঁস্তাকুড়-খেকো, ল্যাংলা প্রভৃতি নানাবিধ কদর্য্য বিশেষণে বিভূষিত করিলেও, বোধকরি আমাকে সন্তুষ্ট করিবার মানসেই তাহার প্রতি পরদিন হইতে বিভাবতী প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

রবিবার বলিয়া অফিস্ বন্ধ ছিল। দুপুরে খাইতে বসিয়া দেখিলাম, বিড়ালটীকে যত্ন করিয়া বোধ হয় সাবান মাখান হইয়াছে এবং গলায় দুইটা নূতন ঘুঙুর-ও দুলিতেছে। এসব লক্ষ্য করিয়াও কোন কথা বলি নাই বলিয়া, একটা বড় বাটীতে দুধভাত আনিয়া সশব্দে তাহার সম্মুখে রাখিয়া বিভাবতী বলিল; কেরাণীবাবুর বেরাল তুমি, দুধভাত না হলে রুচবে কেন? গে'লো মজা করে!...বলিয়া শব্দ করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। অনেক কষ্টে হাসি সম্বরণ করিলাম। পুনরায় কী একটা তরকারি দিতে আসিয়া কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বিভা বলিল, পোড়ারমুখো বেরালের খাওয়ার ছিরি দে'খ্, একেবারে গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলেচে! পেটটা একেবারে ঠিকুরে বেরিয়ে পড়েচে;—কতকাল খায় নি কে জানে? কেমন মনিবের বেরাল, দেখতে হবে?...

জবাব না দিয়া পারিলাম না। গল্প শুনিয়াছিলাম, শৈশবে বিভাবতী দুধ-ভাতের খুব প্রিয় ছিল। কাজেই ঐ পয়েন্টে আঘাত না করিয়া থাকি'তে না পারিয়া বলিলাম; দুধ-ভাতের বহর দেখে মনিবের পরিচয় যে কিছু-কিছু পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে কোন সন্দেহ-ই নেই।

এইভাবে ধীরে ধীরে উভয়ের মনের মেঘ অনেকখানি কাটিয়া গেল।

তৃতীয় দিন অফিস হইতে ফিরিয়া দেখি, আমার পুরাতন ফ্লানেলের পাঞ্জাবী কাটিয়া যোড়া-তাড়া দিয়া একটী ছোটখাটো গদি তৈয়ারী হইতেছে। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; বুড়ো বয়সে এ আবার কী খেয়াল হোল? পুতুলের বিছানা তৈরী হচ্চে নাকি?...

ফিরিয়া অবধি কি জানি কেন, গৃহিণীকে আজ অতি-মাত্রায় প্রফুল্ল দেখিতেছি। সস্মিত-মুখে সে জবাব দিল, পুতুল খেলবার বয়েস অনেকদিন পেরিয়ে গেচে, এখন যা জ্যান্তপুতুল এনেচ তাকে নিয়েই খেলি কিছুদিন। কথায় বলে, মাঘের শীত বাঘের গায়; এ ত' বেরাল! কাল রাত্তিরে যা ঠক্‌ঠক্ কাঁপছিল!...সত্যি, ভারী মায়া হচ্ছিল আমার।

বিড়ালের ব্যাপার শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই চুপ করিয়া গেলাম। বিভাবতী আপন মনে বলিয়া চলিল; জানো আজ তোমার বেরাল, আমার একটা মস্ত উপকার করেচে। আরশুলাগুলোকে সত্যি আমার কী বিশ্রি ভয় করে, আর ও-পোড়ারমুখো নির্ব্বিবাদে আমার চোখের ওপর তিন-তিনটেকে মেরে ফেললে!...আর হ্যাঁ, তুমি কি ওর একটা নাম-ও রাখবে না? তোমার মেয়ে কিন্তু এরি মধ্যে ওর একটা মজার নাম রেখেচে, শুনেচ? তুমি শুনে, না হেসে থাকতে পারবে না।

বলিলাম; কি রকম?

বিভাবতী বলিতে লাগিল; হাসি-ও পায় আবার দুঃখু-ও ধরে। সেদিন গঙ্গাজলের বদলে ওকে দেখে ও মনে করেছিল, ওই-ই বুঝি গঙ্গাজল; তাই বলে, মা, এ গম্মা,—আমরা নাইবো।

আমি বলি; ও গঙ্গা কিরে? তখন আবার কাঁদে, বলে, হাঁ, ও গম্মা!

শ্রীমতী গ্রেস মুর

হাসিয়া বলিলাম; মন্দ কি? তোমার মেয়ে ত' মন্দ নাম রাখেনি. ওর! ওর নাম গঙ্গাই থাক্ না!...

এমন সময়ে দেখি বিড়াল-শিশুর দুইটা কাণ একটা মুঠায় ধরিয়া হাসিতে হাসিতে ত্রিধারা আমার কাছে আসিতেছে। বলিল; বাবু, গন্না ভারী দুত্তু!

আশ্চর্য্যের কথা, তাহার এই নারব অত্যাচারে গঙ্গা এতটুকু বিচলিত হয় নাই বা কোন প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করে নাই। নিতান্ত ভাল-মানুষটীর মত চোখ মুদিয়া আছে!...ত্রিধারাকে কোলে তুলিয়া লইলাম।

গঙ্গা এখন বেশ বড়-সড় হইয়াছে এবং বিভাবতীর অত্যধিক আদরে মস্ত বাবু হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল হয় আমার বিছানা, না হয় ত্রিধারার বিছানা ব্যতীত অন্য কোন স্থান তাহার পছন্দ হয় না। তাহার গলার আওয়াজ শুনিয়া-ও আজকাল সেই কুড়ান বিড়াল-শিশু বলিয়া মনে হয় না। রাত্রে তেতলার ছাদের উপর তাহার বন্ধু-বান্ধবের সকলার আওয়াজকে তাহার ডাক ছাপাইয়া উঠে।...নানাবিধ অকর্ম্মেও আজকাল সে পাকা হইয়া উঠিয়াছে। রান্নাঘর হইতে দুধ, মাছ অবাধে চুরি করিতে শিখিয়াছে এবং কাহাকে-ও ভাগ না দিয়া একলা সবখানি গিলিবার শক্তি-ও তাহার বেশ জন্মিয়াছে।...

* * সেদিন শনিবার। মনের অবস্থা বিশেষ প্রসন্ন ছিল না, অফিসে একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছি, ইহার ফলে চাকরী-ও হয়ত যাইতে পারে। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া, কি করিব খুঁজিয়া না পাইয়া বিভাবতীর নিকট হইতে ছবি আঁকিবার সাজ সরঞ্জামগুলি চাহিলাম।

বলিতে ভুলিয়াছি, স্কুল-জীবন হইতেই ছবি আঁকিবার আমার একটা প্রবল বাতিক ছিল। দিন কতক আর্ট স্কুলে আসা-যাওয়া-ও করিয়াছিলাম।

তাকের উপর. যেখানে পেন্ট-বক্স, ছবির বাণ্ডিল প্রভৃতি থাকিত, সেখানে না পাইয়া বিভাবতী খাটের নীচে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমার সকল ক্রোধ তাহার উপর পড়িল। বলিলাম; খাটের নীচে জিনিস গুলো কি হাত-পা গজিয়ে চলে যাবে? কোথায় রেখেছিলে বার করো না।

বিভা কোন কথা জবাব না দিয়া, খাটের নীচে তোরঙ্গ-বাক্স হঠাইয়া খুঁজিতে লাগিল। সন্ধ্যার স্বল্প অন্ধকারে, কিছু পরে সে ছিন্ন-ভিন্ন ছবির বাণ্ডিল এবং রং-এর বাক্সটী বাহির করিল।

যে ছবিগুলিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অতি যত্নের সহিত তুলিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাদের অবস্থা দেখিয়া প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল।

'ইঁদুরের পিঠা চুরি' শীর্ষক ছবিখানি, যাহা একদিন, এমন কি কিছু টাকার পরিবর্ত্তে-ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিপিনকে দিই নাই, আজ সেখানির অবস্থা দেখিয়া সমস্ত বুক যেন বেদনায় টন্-টন্ করিতে লাগিল। ছবিখানির প্রায় সর্ব্বত্র গঙ্গার থাবার হিংস্র ছাপ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এসব-ই যে গঙ্গার কীর্ত্তি,—বিশেষ করিয়া গৃহিণীর অত্যধিক আব্দারের পরিণাম; তাহা বুঝিতে একদণ্ড-ও বিলম্ব হইল না। ক্রোধে-দুঃখে-ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া রং-এর বাক্স প্রভৃতি লইয়া সশব্দে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলাম, গিয়েছে যখন, তখন সবই যাক্ একসঙ্গে।

বিভাবতী আমার বিসদৃশ ব্যবহারে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময়ে দেখি বাসন্তী রং-এর কাপড় পরিয়া, মাথায় এবং কপালে ঘুরাইয়া একটী সবুজ রং-এর শিল্কের ফিতা বাঁধিয়া ত্রিধারা আসিতেছে। বাম বগলে তাহার একটী সেলুলয়েড্-এর ডল্ পুতুল ঝুলিতেছে, দক্ষিণ হস্তে কাপড়ের পাড় দিয়া গঙ্গার গলা বাঁধিয়া ধরা। মনিবয়ানী চালে সে তাহাকে বলিতেছে; গন্না চ', বাবু এয়েচে, দেখ্‌পি না?...গঙ্গা-ও নিতান্ত প্রভুভক্ত জীবটীর মতো, অত্যন্ত ভালমানুষ সাজিয়া গুটি-গুটি তাহার সহিত আসিতেছে।

যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এতখানি ক্রোধের সৃষ্টি এবং মূলত না হইলে-ও ভাগ্যচক্রে আজ এতখানি ক্ষতির জন্য যে সম্পূর্ণ দায়ী, তাহাকে ঠিক সম্মুখে বন্ধন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সকল ক্রোধ সমবেত হইয়া যেন তাহার

উপর গিয়া পড়িল। হিংস্র ব্যাঘ্রের মতো লাফাইয়া গিয়া ত্রিধারার হাত হইতে দড়িটা কাড়িয়া লইয়া উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম ; হতভাগা বেরাসকে আজ শেষই করে ফেলব। ত্রিধারা ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বিভা পর্য্যন্ত প্রমাদ গণিল।

জানালার গরাদের সহিত বাঁধিয়া একগাছা বেতের চাবুক আনিয়া গঙ্গাকে নির্দ্দয় প্রহার করিতে লাগিলাম। গঙ্গা নিদারুণ ভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শুনিয়াছি, বন্ধনাবস্থায় কাহাকেও প্রহার করিতে নাই। কিন্তু ছবি এবং অফিসের ব্যাপারে মনের অবস্থা এমন বিরূপ ছিল, যে ও-কথা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। গঙ্গা ম্যাঁ-ও ম্যাঁ-ও শব্দে চীৎকার করিয়া বারবার ত্রিধারার দিকে ছুটিয়া যাইতে চায়, কিন্তু গলায় টান পড়িতেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। ভয়ে, সমবেদনায় ত্রিধারা কাঁদিয়া আকুল, বিভাবতীর চক্ষু-ও জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

...মনের গুরুভার অনেকখানি লঘু করিয়া, বেত-গাছা মাটীতে ফেলিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরে ঘুরিয়া আসিয়া দেখি, ত্রিধারার কোলে গঙ্গা নির্জীবের মতো পড়িয়া আছে, আর তাহার মুখটী ধরিয়া সে ডাকিতেছে ; গন্না, গন্না ; চেয়ে দেখ্ ! বাবু এই সময় আপিস্ গেচে।...তাহার দুটী ছোট গাল বহিয়া জল পড়িতেছে !

মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। একটা অজ্ঞান পশুর উপর এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করা উচিত হয় নাই। বিশেষ করিয়া ত্রিধারার ক্ষুদ্র প্রাণের অন্তরতম কথাটী জানিতে পারিয়া মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে ত্রিধারার কাছে যাইয়া গঙ্গাকে তুলিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইলাম। ত্রিধারা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাহাকে প্রশান্ত করিবার মানসে বলিলাম ; তোর গঙ্গাকে আর মারব না রে পাগল ; ভয় নেই তোর !

তবু তার কোমল অন্তঃকরণ আমাকে বিশ্বাস করিতে চাহিল না ! তাই একবার আমার মুখের দিকে এবং একবার গঙ্গার দিকে, বারংবার দেখিতে লাগিল।

গঙ্গার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া বিভাকে একটু গরম দুধ আনিতে বলিলাম। হন্ হন্ করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে সে বলিয়া গেল ; গরু মেরে এখন জুতো দান হচ্চে !

কয়েক দিন পরের কথা। আজ তিন দিন হইল ত্রিধারা জ্বরে পড়িয়াছে। ধরিতে গেলে জন্মিবার পর এই তাহার প্রথম অসুখ। কিন্তু প্রথম হইতেই মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে। জ্বরের ঝোঁকে সে কেবলি গন্না-গন্না করিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। গঙ্গাকে একদণ্ড সে দূরে রাখিতে ইচ্ছুক নয়। জ্বর-কাতর রক্তচক্ষু মেলিয়া শিয়রে মাতার কাছে গঙ্গাকে দেখিয়া আপনমনে কখনো বলে ; চলে আয়, বাবু মারবে।

বিভাবতী কন্যার রকম-সকম দেখিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া যায় ! আমার মুখ দিয়া কথা সরে না। এক এক সময় ভাবি, হায়রে হতভাগ্য পশু ! কেনই বা তোকে কুড়াইয়া আনিলাম, আবার কেনই বা অমন প্রহার করিলাম ? নিজের মনেই নানা প্রকার ভাঙি-গড়ি, কিন্তু কোন' শেষ মীমাংসা করিতে পারি না।...

...ডাক্তার ভয় দেখাইলেন ; কেস্ শক্ত, যে-রকম ব্রেণ য়্যাফেক্টেড্, একটা কিছু ভাল-মন্দ ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। এক মিনিট-ও বিরাম না দিয়া তিনি মাথায় বরফ দিবার হুকুম দিলেন।

ডাক্তারের আশঙ্কাই ফলবতী হইল। পঞ্চম দিনে সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বমুহূর্ত্তে, অর্থাৎ সেদিন প্রায় যে-সময়ে গঙ্গাকে প্রহার করিয়াছিলাম সেইরূপ সময়ে, "গন্না-গন্না চলে আয় ; বাবু মারবে" বলিতে বলিতে বুকের উপর গঙ্গাকে লইয়া, শিয়রে জননী এবং পদপ্রান্তে আমাকে সাক্ষী রাখিয়া ত্রিধারা চিরতরে থামিয়া গেল। বিভাবতী অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়িল ; আমি কি করিলাম, সঠিক মনে নাই। বোধ হয় ছুটিয়া পলাইয়াছিলাম, চৈতন্য সজাগ ছিল কিনা বলিতে পারিব না।

কিছুক্ষণ পরে দেখি, বাসি ফুলের পাপড়ির মতো ত্রিধারা গভীর মহানিদ্রায় অভিভূতা, বিভা তখনো মূর্চ্ছিতা; আর গঙ্গা উৎকট চীৎকার করিয়া ত্রিধারাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি ঘরে ঢুকিতে সে এমন বিকট দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল, যে মনে ভয় হইতে লাগিল।

কালের অবিনশ্বর চক্রের নিকট সকলকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হইয়া গেছে ত্রিধারা চিরতরে আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। মনের বা সংসারের অবস্থার কথা বর্ণনা করিবার স্পৃহা আর জাগে না।

·· আশ্চর্য্যের কথা, ত্রিধারার মৃত্যুর পর গঙ্গাকে আর এ-বাড়ীর ত্রিসীমানায় দেখিতে পাই নাই। তবে প্রায়-দিনই মধ্যরাত্রে ত্রিধারার ঘরের অর্থাৎ যে-ঘরে আমরা শয়ন করিতাম, তাহার ছাদের উপর ম্যাঁ-ও ম্যাঁ-ও করিয়া ঘণ্টা খানেকের জন্য বোধকরি সে আর্ত্তনাদ করিয়া যাইত।

বিভাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমার মনের ভাণ্ডারে ছিল না। তাই তাহাকে ভুলাইবার জন্য এ-ঘর ত্যাগ করিয়া অন্য ঘরে শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু তথাপি গঙ্গার উৎপাতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলাম না। সে বাড়ীময় ঘুরিয়া ম্যাঁ-ও ম্যাঁ-ও রবে চীৎকার সুরু করিয়া দিল।

আজ কয়দিন হইতে, প্রায় সারারাত-ই চীৎকার করিয়া সে, পাড়া মাথায় করিয়া তুলে। প্রতিবেশীরা অনুযোগ করেন, কেহবা ব্যবস্থা দেন; 'বস্তাবন্দী করে আদরের গঙ্গাকে গঙ্গা-পার করে দিয়ে আসুন না মশাই! সবাই একটু ঘুমিয়ে বাঁচি!'···

সেদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই গঙ্গার চীৎকার শোনা গেল। উপর্য্যুপরি কয়দিনের বিরক্তিতে মন বড় বিষাইয়া আছে। স্থির করিলাম, আজই যা হয় একটা হে স্তু-নেস্ত করিব।

···একগাছা মোটা বাঁশের লাঠি লইয়া ছাদে উঠিলাম। কুয়াসা ভেদ করিয়া শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ দেখা দিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই গঙ্গা আরো জোরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পাঁচীল টপ্‌কাইয়া পলাইয়া গেল। নামিয়া আসিয়া আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।···

মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল!—কে যেন দ্বারে আঘাত করিতেছে! ম্যাঁ-ও ম্যাঁ-ও চীৎকারে বুঝিলাম, গঙ্গা। সে একবার করিয়া চীৎকার করে এবং এক-একবার বিকট জোরে দ্বারে থাবা মারে। হ্যারিকেন জ্বালিয়া একটি লাঠি লইয়া দ্বার খুলিতেই, সে ছুটিয়া আমাদের পূর্ব্বের শয়ন ঘরের জানালা দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। অগত্যা প্রমাদ গণিয়া আজকের মত খিল দিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলাম। কাল উহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিব ভাবিতে লাগিলাম।···

পরদিন প্রাতে উঠিয়া স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছি, ও-ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ছল্‌-ছল্‌ চোখে বিভা বলিল; দেখবে এসো।

যাইয়া দেখি, ত্রিধারা ঠিক যেখানটিতে শয়ন করিত, সেইখানে বিছানার উপর গঙ্গা চিৎ হইয়া শিঁট্‌কাইয়া পড়িয়া আছে, আর তাহার মুখের চারিপাশে চাদরের খানিকটা স্থান রক্তে লাল হইয়া আছে!···

চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম; তোর 'গঙ্গাকে' আর তোর বাবু মারবে না, ধারা!—সে তোরই কাছে চলে গেছে!

শ্রীকার্ত্তিক শীল

কারাগার

শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র সাহা

উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া মলিনা কহিল, আমি তো ভাঙিনি মা।

ভাঙোনি?

না মা...

শ্বশ্রু রাজুবালা আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিশ্রী কর্কশ স্বরে কহিল, না-মা! ভারি সোহাগ দেখান হচ্ছে—মরি গ'লে যাই আর কি! ভাঙোনি তো কে ভেঙেছে শুনি? আমি?...না-মা! আহা! অমনি ভুলে গেলেম আর কি?...বলি ক'খানা জিনিষ তোমার বাপ ভদ্দরলোক দিয়েছে যে পট্-পট্ ক'রে ভাঙবে—অ্যাঁ...?

মলিনার কচি কোমল বুকখানির ভিতর ক্রমাগত যেন কি ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। বোধ করি, শত চেষ্টা করিয়াও সে তাহাকে নিরোধ করিতে পারিতেছিল না। অথচ এই গালাগালি, এই তীব্র রূঢ় ভর্ৎসনা তাহার অপরিচিত নয়—এ তাহার নিত্যকার কাজের প্রাপ্য প্রশংসা পুরস্কার! অরুণোদয়ের প্রথম প্রভাত হইতে রজনীর নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এ তাহাকে শুনিতে হয়—নিত্য!

বিবাহের দিনে তাহার কচি কোমল বুকের একপ্রান্তে নিভৃতে কুহকিনী আশা নিঃশব্দে কল্পনার রঙীন তুলিতে যে মায়ালোক সৃষ্টি করিয়াছিল, অত্যন্ত অকস্মাৎ নিদ্রা ভঙ্গে সুখ স্বপ্নের মতই তাহা কখন উড়িয়া গিয়াছে। অত্যন্ত অকস্মাৎ জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়া তাহাকে বুঝিতে হইয়াছে, ভুল—ভুল—মহাভুল! সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—কবি কল্পনা; স্বামীর প্রীতি-ভালবাসা উপন্যাসের মনোরম বিষয় বস্তু; শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহ-দরদ—হিতোপদেশের কথার মত। পণ্ডিতগণের রচনা প্রাণহীন, নীতি বাণীমাত্র। সত্যকার সংসারে এ সব কিছুই নাই... একটা দুঃস্বপ্ন! বিবাহের বৎসরকাল পর হইতেই প্রতি রক্তকণার বিনিময়ে মলিনা ইহাই নিশ্চিত জানিয়াছে—ক্রীতদাসী অপেক্ষা এ সংসারে বেশী কিছু অধিকার তাহার নাই—চাহিবার নাই—পাইবার নাই।

তথাপি সে নীরবেই তাহা সহ্য করিয়াছে। অত্যাচার—লাঞ্ছনার মাত্রা যতই বাড়িয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বংসহা বসুমতীর মতো সে তাহা নির্ব্বিকার-চিত্তে সহ্য করিয়াছে... হিন্দুঘরের আদর্শ কুলবধূ যে সে! কখনো প্রতিবাদ করে নাই, অতি দুঃখে—অতি যন্ত্রনায় অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদও করে নাই। অবিচার, অত্যাচার, নির্ম্মম উৎপীড়ন, নীরবে নিজের ন্যায্য পাওনা মনে করিয়াই সে সহিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু আজ তাহার সেই অবিচল সহিষ্ণুতার বাঁধ একটু আল্গা হইয়া গেল। কেন গেল তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিল না—হয় তো তাহার বুঝিবার শক্তিটুকু নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

মলিনা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া আর্দ্র-কণ্ঠে কহিল, সত্যিই তো আমি জানিনি মা, মিছেমিছি...

মিছেমিছি···?

তাই মা! ঠাকুরপো'কে আম কেটে দিয়ে আমি তো আপনার মাথায় তেল দিয়ে দিচ্ছিলেম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে দেখি···

রমেশ ভেঙেছে না? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? ইস্, দুধ দিয়ে কি কালসাপই না পুষেছি! মাগো, আমায় বলে কিনা মিথ্যাবাদি। বলি, তোমার বাপ বুঝি খুব সত্যিবাদি...

মলিনা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, অপরাধ ক'রে থাকি মা, আমায় শাস্তি দিন। আমার বাবা তো কোন অপরাধ করেন নি? তাঁকে...

একশোবার বল্‌বো, দু'শোবার বল্‌বো—পাঁচশো বার বল্‌বো। মেয়ে দিয়েছে তা জানে না? ত্রুটী পেলেই বল্‌বো! পাথর খানা কুচি কুচি ক'রে ফেলেছে!

হাড়হাবাতে, গতরখাগী মেয়েমানুষ! আবার সোহাগ দেখান হচ্ছে...

মলিনার দুই চোখ বহিয়া অসহায় তপ্ত অশ্রু ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। রাজুবালার দুই পায়ের ওপর লুটাইয়া পড়িয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, আমি সত্যিই ভাঙ্গিনি মা···

তবে রে আবাগীর বেটী—ছোট লোক চামার কোথাকার! বলিয়া রাজুবালা সাজোরে পা ঝাড়িয়া ফেলিতেই মলিনা ছিট্‌কাইয়া গিয়া অদূরের ভারি পাথরের উপর টপ্ করিয়া পড়িয়া গেল। তাহার মাথাটা এত জোরে ঠুকিয়া গেল যে মলিনা আর্ত্তনাদ করিয়া চোখ বুজিয়া সেইখানে ঢলিয়া পড়িল। রাজুবালা নিমেষে একবার ভ্রূকুটী করিয়া আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বেলা তখন প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। ওপাড়ার রাসমণি কি একটা কাজে আসিয়া এই দিকে নজর পড়িতেই শিহরিয়া উঠিল। ব্যাপারটা কি সে তাহা আদৌ জানিত না, তাই বিচলিত হইয়া সোরগোল করিয়া উঠিল, রাজু, রাজু—ও রাজু...

রাজুবালা বোধ করি তখন সবেমাত্র পা ছড়াইয়া অতঃপর কি করা যায় তাহাই ভাবিতে ছিল। বাধা পাইয়া বিরক্তির সহিত জবাব দিল, কি হয়েছে?

ততক্ষণ রাসমণি পাশের ঘটী হইতে মলিনার মাথায় জল দিতে দিতে পাখা অভাবে আঁচল দিয়া বাতাস করিতে লাগিয়া গিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া কহিল, শীগ্‌গির পাখাটা নিয়ে আয়! বৌটা কি ক'রে পড়ে গিয়ে একবারে মরে গেছে আর কি!

ইহার পর আর বসিয়া থাকা যায় না। রাজুবালা একখানা পাখা হাতে করিয়া সম্মুখে আসিতেই রাসমণি গভীর বেদনায় কহিল, ইস্ কতটা কেটে গিয়েছে! একটু দেখ্‌তে হয় না ভাই? রোগা শরীর—ছেলেটা হ'বার পর থেকে আর কি কিছু ওর শরীরে আছে? খাটুনী একটু কমিয়ে দিতে হয়।

রাজুবালা বাঁ-হাতের দুইটা আঙুল গালে ছোঁয়াইয়া গভীর বিস্ময়ে বলিল, কপাল দিদি! খাটুনী বল্‌ছো—ওকে আর কী কাজ করতে দিই? নিজের শরীর নিয়েই চল্‌তে পারে না, তার আবার কাজ! খোকা জন্মাবার পর থেকে ওতো বসেই আছে। তবুও শত্তুরে...কি কাজটা ভাই; যেমন কপাল করে এসেছি তাই তো হ'বে? এতো করেই কি সুনাম নাছে?

রাসমণি রাজুবালার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তিক্ত কণ্ঠে কহিল, কে তোমার দুর্নাম কর্চ্ছে বৌ? বৌটা ম'লে তোমাদেরই ক্ষতি, তাই বল্‌ছিলাম। আছে তো ওর হাড় ক'খানা—শরীর যখন চল্‌ছেই না, তখন দাওনা পাঠিয়ে ওকে দু'চারদিনের জন্য ওর বাপের বাড়ী?

রাজুবালা চোখদুইটা কপালে তুলিয়া কহিল, দিদি, তুমি শুধু বৌয়ের অসুখ আর খাটুনীটাই দেখলে—আমার কথাতো আর ভাবলে না? অসুখ কার না হয়? আজ দু'মাস ধরে আমিই তো ভুগ্‌ছি—খেয়ে সোয়াস্তি নেই, শুয়ে সোয়াস্তি নেই,—তাই বলে বাপের বাড়ী যেতে হ'বে বইকি?...আমার রমেশ পরেশের অসুখ হয় না? ওসব কিছু নয় দিদি! অসুখের চেয়ে ওর ভিট্‌ক্যামি আছে বেশী।

কিন্তু ওর শরীর তা বলে না বৌ! যদি না পাঠাও, বৌও যাবে, ছেলেও যাবে। ঐ হাড় ক'খানা আর কদ্দিন ধরে ওর প্রাণ বেঁধে রাখ্‌তে পারবে? কচি ছেলে, রোগা মা, আর দেরী করো না বৌ, একটা ভাল দিন দেখে···

বাধা দিয়া রাজুবালা বিরক্তির সহিত কহিল, থামো দিদি, থামো! এতবড় সংসার কি অম্নি চলবে?

ওঃ, তাই বলো!—রাসমণি বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

মলিনার খোকার জ্বর। জ্বর রোজ লাগিয়াই আছে, জন্মিবার পর হইতেই। কোন দিন ওর মুখে এক ফোঁটা ওষুধ পড়ে নাই,—অতি বড় অসুখের সময় এক ফোঁটা দুধও ছেলেটার ভাগ্যে জুটিয়াছে কিনা সন্দেহ। অথচ বাঁচিয়া আছে, সেও এক আশ্চর্য্য! মলিনা ইহা জানে এবং জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়া বেশ ভাল করিয়াই জানে। তবু নিরুপায়। মা হইয়া একমাত্র

ছেলেটাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে তুলিয়া দিতে হইতেছে, যন্ত্রনায় হয়তো তাহার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া যাইতেছে,—তবুও কথা বলিবার উপায় নাই, অভিযোগ করিবার কিছু নাই। একটা কুকুরের চেয়েও বেশী সহানুভূতি বোধ করি তাহাদের উপর নাই। অথচ কেন এমন হইল, কি অপরাধে স্বামী ও শাশুড়ীর কুদৃষ্টি তলে পড়িয়া তাহারা এমন হেয় অবজ্ঞাত, তাহাও সে জানে না। অতীতের কত কথাই মনে পড়ে……একটা বেদনাময় দুঃস্বপ্নের মতো। তাহার সব ছিল—একদিন সে এই সংসারের আনন্দ ছিল, তাহার কোন বাসনাই অপূর্ণ রহিত না। শাশুড়ী স্নেহ করিতেন, স্বামী তাহার প্রসন্ন হাসির আশায় দিবানিশি লালায়িত রহিতেন, আত্মীয় পরিজন এক কণা কৃপা পাইবার আশায় তাহার মুখের দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিয়া থাকিত। সব ছিল……কিছুই নাই! একদিন অতি বড় সুখের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর সে দেখিতে পাইল, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে—সব এক ফুৎকারে নিভিয়া গিয়াছে, তাহার সুখনিশার অবসান হইয়াছে!

দুঃস্বপ্ন……

কিন্তু খোকার জরটা আজ আর ভাল বোধ হইতেছে না। রোজ ত' এমন হয় না! তিন দিন—তিন দিন হইল জ্বর ছাড়ে নাই, বাড়িয়াই চলিয়াছে। বুক জোড়া সর্দ্দি, কাসি, নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছে না—দম আটকাইয়া আসিতেছে। কচি মুখখানা আগুনের মতো লাল—অসহ যন্ত্রণায় কোমল মুখখানিকে বিশ্রী কঠোর করিয়া তুলিয়াছে—চোখ দুইটার দিকে তাকানো যায় না…বুকের শব্দটা যেন এতদূর হইতেও শোনা যাইতেছে—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ঢিপ্ ঢিপ্।…কেমন অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে।

মলিনা চাহিয়া চাহিয়া আশঙ্কায় বেদনায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, খোকান—খো-ক—

বলি ও বৌমা, বসে বসে ছেলেকে যে ভারি সোহাগ কর্চ্ছো, এদিকে বাসী পাট কে করে? কখন হয়? তোমাকে ঘরে এনে তো বাপু লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধানই হয়েছে…

মলিনা চমকিয়া উঠিল। ব্যাধ ভয়ে ভীতা পক্ষিণী যেমন শাবকের জীবনাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া শাবককে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরে তেমনি করিয়া মলিনা খোকাকে বুকের আড়াল দিয়া বেদনা-ক্লান্ত-কণ্ঠে কহিল, মা…

বল বল, অসুখ হয়েছে, উঠ্‌তে পার্‌ছো না! বড় লোকের ঝি! কি গতরই করেছিলে বাপু!…তাও যদি বাপ্ দুটো চারটে দাসী বাঁদী দিতেন?…হুঁ…

মলিনা কাঁদিয়া ফেলিল, খোকার জ্বর…

ব্যস্! একবারে সাতখুন মাপ্! খোকার জ্বর, তবে আর কি—বাসি ঘরদোর ঝাঁড় দেবার দরকার নেই। উনুনে আগুন দিয়েই বা কি হ'বে—সব উপোস থাকুক্? বলি জ্বর কারো হয়, না…

বাঁ হাত দিয়া জল-ভারি চোখ দুইটা বার কয়েক মুছিয়া ভাঙ্গা গলায় মলিনা কহিল, একটু কম্‌লেই যাচ্ছি মা…

রাজুবালা মুখ ভেঙচাইয়া বলিল, থাক্, আর মা বলে সোহাগে কাজ নেই। ঢের হ'য়েছে! বলি এখন এসব করবে—না, এই দাসী বাঁদীকেই করতে হ'বে?

অতি সন্তর্পনে খোকার মাথার বালিশটা ঠিক করিয়া অশ্রুনিরুদ্ধকণ্ঠে মলিনা কহিল, একটু না কম্‌লে কি ক'রে যাই মা, ও যেমন কর্‌ছে…

রাজুবালা ভ্রূকুটী করিয়া কহিল, কেমন কর্‌ছে…কি আর করবে শুনি? বলি আগ্‌লে বসে থেকে আপ্‌নি চোখের জল ফেল্‌লেই ওকে ধরে রাখ্‌তে পারবে?…ঐ হাতের মধ্যে বুঝি আরও আশা আছে? ওতো মরবেই…

মলিনার সর্ব্বশরীর থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! মর্ম্মভেদী আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, মা…

…রাত্রির রান্নাটাও তাকেই করিতে হয়। ছেলেটী কয়েকবার কোকাইয়া, কয়েকবার রোগক্ষিন্নকণ্ঠে 'মা-মা' করিয়া ডাকিয়া বোধ করি গলা শুকাইয়া গিয়া এই বার তন্দ্রাচ্ছন্নই হইয়া পড়িয়াছে। মলিনা পাগল পাথরের মতো সে কান্নার মর্ম্মন্তুদ ব্যথা সহ্য করিয়াছে। খোকার বুকফাটা কান্না মলিনার কোমল মাতৃহৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে, তবুও সে একবারও খোঁজ লয় নাই।

প্রতীক্ষা করিয়াছে ইহার চেয়েও যদি বেশী...কান্নার মাঝখানে ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটুকু পর্য্যন্ত যদি নিঃশেষ হইয়া যায়। মলিনার আপাদমস্তক থর্-থর্ করিয়া উঠিল—মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল—চোখের সামনের অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের ঘূর্ণায়মান তরল স্রোতে যেন সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপুল হইয়া গেল...অসীম যন্ত্রণায় মলিনা বুক চাপিয়া ধরিল, সমস্ত মুখ ব্যাপিয়া গাঢ় বেদনা কঠিন হইয়া ফুটিয়া উঠিল,—উদগতপ্রায় কয়েক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া এক রকম জোর করিয়াই খুন্তী দিয়া কড়াইয়ের ওপরকার মাছটা নাড়িয়া মসী-লিপ্ত আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, দীপালোকিত সহস্র কলহাস্যমুখরিত আনন্দোজ্জ্বল দিনের বিস্মৃত-প্রায় একটী মধুর ছবি···খোকার জন্মদিন। এই বাড়ীর ওপর দিয়া সেদিন আনন্দের কি কলকল্লোলই না বহিয়া গিয়াছিল! দ্বারে নহবৎ বসিয়াছিল! ভিখারীতে ভিখারীতে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছিল, আত্মীয় স্বজনের কলতানে অবর্ণনীয় আনন্দ উৎসবে সমস্ত বাড়ীখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিনের লক্ষ্য ছিল মলিনা। সেদিন তাহার কত আদর, কত যত্ন,···তাহার ক্ষুদ্র, তুচ্ছ একটী বাসনা-পূর্ণ করিতে সে দিন সকলের কি আগ্রহ, কি আনন্দ! এই অনাদৃত খোকা ছিল সেদিন আনন্দের ঝর্ণা—বাড়ীর প্রাণ!

আর আজ?

মলিনার চিন্তাক্লিষ্ট শীর্ণ পাণ্ডুর গণ্ড বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু নামিয়া আসিল। একটী মর্ম্মভেদী হাহাকার বুকের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দলিত, পিষ্ট, বিমথিত করিয়া বোধ করি জীর্ণ হাড়গুলিকে পর্য্যন্ত গুঁড়াইয়া দিয়া সশব্দে ফাটিয়া পড়িল।

একটী বছর··শুধু একটী বছর আগের কথা! এই একটী বছরে তাহার সুখের, তাহার স্বপ্নের মায়া-সৃষ্ট তাসের প্রাসাদ কোন্ মুহূর্ত্তের একটী ফুৎকারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।···

...খোকার জন্মের পরদিন ব্যাঙ্ক ফেল মারিল।··

সকলেই বলিল, খোকার দোষেই,—খোকার বাতাসেই! খোকার অন্নপ্রাশনের আগের দিন মলিনার শ্বশুর কলেরায় মারা গেলেন। শনি—শনি, সাক্ষাৎ শনি এই খোকা! জন্মিয়াই সংসারে সম্পদ, সুখ, শান্তি,—এমন কি তাহার অগ্নিময় বুভুক্ষিত দৃষ্টিতলে বাড়ীর কর্ত্তাটীও একটী ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত নিঃশেষ হইয়া গেল! ঐ ছয় মাসের শিশু কি করিয়া এত বড় একটা সংসার শনির দৃষ্টি দিয়া পুড়াইয়া দিল! কিন্তু কে বুঝিবে তাহার প্রাণের হাহাকার—তাহার মর্ম্মান্তিক মরণ যন্ত্রণা। যে দুই-একজন সহানুভূতি জানাইতে আসিয়াছিল, রাজুবালার ক্রূর অগ্নিময় দৃষ্টির সম্মুখে তাহারা দাঁড়াইতে পারে নাই। দূর হইতে তাহাদের অসহায়-কাতর-দৃষ্টি মলিনার বুকে আরও গভীর ক্ষতই সৃষ্টি করিল। মলিনার অসহায় কাতর দৃষ্টি, তাহার অশ্রু, মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ রাজুবালাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। স্বামীর মৃত্যু ও দারিদ্র্য যে এই কুক্ষণ-জাত অভাগা শিশু হইতেই হইয়াছে আজ কুসংস্কারের মত এই অমূলক বিশ্বাস তাহার সমস্ত চিত্তকে শিশু ও বধূর বিরুদ্ধে কী পৈশাচিক জীঘাংসায় উত্তেজিত করিয়া তুলিল। রাজুবালার জ্ঞানটুকুও যেন লোপ পাইয়া গেল। প্রাণহীন পিশাচের মতো কি মন্ত্র বলে মলিনার অমন স্বামী—তাহাকে দূরে সরাইয়া লইয়া গেল। দিনান্তে একটীবার দেখা হয় না, হৃদয়ের অন্তঃস্থলের পুঞ্জীভূত শত শত দুঃখের তুচ্ছ একটা কাহিনীও তাঁহাকে শোনাইবার অবসর, মলিনা খুজিয়া পায় না! হায়রে একনিষ্ঠ মাতৃভক্তি! পত্নীর প্রাণঢালা ভালবাসা কি কিছুই নয়? স্বামীর ধর্ম্ম—কর্ত্তব্য বলিয়া জগতে কি কিছুই নাই?...মলিনার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সে নিজের দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা—স্বামীর অবহেলা সমস্তই ভুলিল। ভুলিতে পারিল না খোকাকে। এই জ্ঞানহীন শিশু, কি ইহার দোষ, ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মলিনার তাহা বোধগম্য হইল না। মলিনা পাগলের মতো সভয়ে, আতঙ্কে মাতৃহৃদয়ের বিশাল স্নেহ-আশঙ্কা দিয়া খোকাকে ঘিরিয়া রাখিল...শাশুড়ীর বিষ দৃষ্টি তল হইতে খোকাকে দূরে রাখিবার জন্য সদা সতর্ক দৃষ্টি মেলিয়া রহিল। কিন্তু

বিধি যার বাম—সে কি করিবে? অসহায় বন্দিনী কুলবধূ সে, কি করিতে পারে? শুধু ক্রন্দন—শুধু হাহাকার, আর্ত্তনাদ……রাজুবালার বিষ দৃষ্টিতলে বাসি ফুলের মতো খোকা শুকাইয়া উঠিতে লাগিল।……

মলিনার দুই চোখ ছাপাইয়া অসহায় অশ্রু শ্রাবণ ধারায় নামিয়া আসিতে লাগিল। তাহার দিশাহারা আশঙ্কা-উদ্বেলিত মাতৃহৃদয় হইতে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ উঠিল, মা—মাগো!……

—বলি ও বড় লোকের মেয়ে, রাঁধতেই যদি পারবে না, বাপের বাড়ী থেকে রাঁধুনী নিয়ে এলেই পারতে? স্বামী তো আর বড়লোক নয়, যে রাঁধুনী—চাকরাণী দেবে?…অ্যাঁ, চোখের মাথাই না—হয় খেয়েছ—নাকটাও পচে গেছে নাকি? মাছটা পুড়ে মরা পোড়া গন্ধে যে বাড়ী ভরে গেলো?…… এ যেন হয়েছে আমার বিষম জ্বালা!

মলিনা শিহরিয়া উঠিয়া দেখিল, সত্যই মাছটা একবারে পুড়িয়া গিয়াছে।

ভয়ে মলিনার মুখ শুকাইয়া গেছে। কম্পিত-হস্তে তাড়াতাড়ি কড়াইটা নামাইতে যাইতেছিল, রাজুবালা বাধা দিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিল, ফের যদি কড়াতে হাত দেবে তো ছেলের মরা মুখ দেখ্‌বে……গতরখাকী, হাড় হাবাতে, অলক্ষ্মীর বাথাল—আমার বুকটা জ্বালিয়ে খেলে! নাম—নাম এখান থেকে……

মলিনা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, পা দুইটা অসম্ভব রকম কাঁপিতেছিল বুকের ভিতরকার অসহ্য যন্ত্রণা যেন চোখ দুইটাকে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিল। মলিনা পড়িয়া যাইতেছিল, পাশের বাঁশের খুঁটী ধরিয়া কোন রকমে তাল সামলাইয়া লইয়া বারন্দা হইতে নামিতেই রাজুবালা মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, অ্যাঁ, পরেশকে বল্‌বো কি? চিংড়ী মাছ গুলো দিয়ে কত ক'রে বলে গেল—মা কাল্গিয়া রাঁধো, কালিয়া খাব! রাক্ষুসী মাগীর লক্ষ্য থাকে না? ছেলেটী তো এরই মধ্যে ওঁকে খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত—এইবার দেখ্‌ তুই।

মলিনার দুই কাণের মধ্যে কে যেন অকস্মাৎ গলিত তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিল। সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া টলিতে টলিতে ঘরে ফিরিয়া গিয়া খোকার জ্বরতপ্ত দেহ আকুলআবেগে বুকের উপর জোরে টানিয়া লইয়া ঝরঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, খোকারে,—খো—কা! বাবা!…

অবহেলা, অচিকিৎসা এবং আত্মীয় স্বজনের অভি-সম্পাত মাথায় করিয়া যে শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটুকু শুদ্ধমাত্র মাতার জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার বক্ষের রক্ত পান করিয়াই কোন রকমে টিকিয়া থাকে, তাহা যদি অকস্মাৎ একদিন সত্যই নিভিয়া যায়, তাহা হইলে অসহায় মাতার চোখে কি জল আসে? কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের যে বুকখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহাতে কি আর পুত্রের বিয়োগ বেদনা বাজে?

গভীর রজনীর অন্ধকার তলে পুত্রের মৃত্যু-শিয়রে বসিয়া মলিনা মনে প্রাণে বুঝিল, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাহার খোকা যে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবে তাহা হয়তো আর ফিরিয়া গ্রহণ করিবে না! চোখের সামনের অন্ধকারময় জগৎ আরও নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবে, আকাশ বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবে, নিষ্কম্প তরু-লতা অন্ধকারে মাথা লুকাইয়া হয়তো আরও নিঃশব্দে কাঁদিবে—বাড়ীর কুকুর বেড়ালটীও হয়তো কয়েক মুহূর্ত্ত থমকিয়া শোকের গভীর নিঃশ্বাস ফেলিবে,—হয়তো বা তাহাদের চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিবে…অথচ—অথচ তাহার আশা, আনন্দ উৎসব—শরীরের রক্ত বিনিময়ে যে মাংসপিণ্ডকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য—মণ্ডিত করিয়া তুলিবার স্বপ্ন সে একদিন দেখিয়াছিল, আশার কুহকিনী মায়ায় যে ক্ষুদ্র মাংস পিণ্ডকে বুকে ধরিয়া এই কয়মাস কত সুখ, কত আনন্দ পাইয়াছে—সেই তাহার শিশু, তাহার বুকের ধন, চোখের আলো—তাহার স্থির, অচঞ্চল দৃষ্টি সম্মুখে চিরতরে নিভিয়া যাইবে—এই কক্ষের কোন' প্রান্তে ক'দিন পরে শিশুর ক্ষীণ একটা ছায়াও তাহার চোখে পড়িবে না, অতিমৃদু নিঃশ্বাসের প্রাণ

...টানো সৌরভও অনুভব করিতে পারিবে না...হয়তো খোকার ক্ষীণ স্মৃতিটুকুও মনের কোণ হইতে মুছিয়া যাইবে...তাহার শরীরের চলমান রক্ত উন্মাদের মতো হৃৎপিণ্ডের উপর আছাড়াইয়া পড়িয়া হয়তো বা স্থির হইয়া যাইবে, চোখ দুইটা ঠিক্‌রাইয়া পড়িবে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া আসিবে...তবু—তবু—এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে পারিবে না, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পাইবে না—অতি ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেও হয়তো বা কাহারও অকল্যাণ হইবে। জগতের পরিত্যক্ত একটা মূর্ত্তিমতী অকল্যাণ সে...তাহার কোন অধিকারই নাই।

মলিনা মূক বেদনায় বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার—আকাশ ঘিরিয়া মৃত্যুর দূত যেন মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিবার পথ খুঁজিতেছে! সজাগ তারাগুলি নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে আর একটী সঙ্গী পাইবার আশায় জানালার ফাঁক দিয়া বোধ করি বা তাহারই খোকনের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে! প্রকৃতি নিস্তব্ধ!—বোধ করি আকাশচারী মৃত্যুদূতের নিঃশব্দ আগমনের গভীর আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

মলিনা শিহরিয়া উঠিল। খোকাকে বুকে জাপটাইয়া ধরিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, খো...

মুখ দিয়া স্বর ফুটিল না, গলাটা কে যেন ভাঙিয়া দিয়াছে।...ভগবানের নাম লইতে ও আজ মলিনার ঘৃণা বোধ হইল। পাথরের দেবতা—মৌন, মূক, অক্ষম। অসহায় আর্ত্তের বুক ফাটা আর্ত্তনাদে ও তাহার পাষাণ বুক টলে না। মৃত্যু-আশঙ্কা-কাতর অভাগিনী মাতার রক্তাশ্রুতে-ও সে নির্ম্মম নিষ্ঠুর দেবতার পাষাণ বুকে একটী দাগ ও পড়েনা! চায় না—চায় না সে অমন দেবতার দয়া!...বিনা দোষে, অকারণে যে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীনের মত এই পুষ্প তুল্য কোমল প্রাণ নিষ্পাপ শিশুকে দিনের পর দিন অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, চায়না সে অমন পিশাচের নিষ্ঠুর করুণা!...তার চেয়ে...

তাহার দুই চোখ বহিয়া তপ্ত অশ্রু নামিয়া আসিতে লাগিল।

...শুধু একবার যদি স্বামীকে পাইত। একবার, শুধু—একবার! যে তাহার বালিকা জীবনে প্রথম পুলক সঞ্চার করিয়াছিল—মাতৃত্বের অনাস্বাদিত সুধাবেশে পার্থিব জগৎকে অপার্থিব আনন্দে ভরিয়া দিয়াছিল, আজ যদি সেই প্রথম দিনের পরম মিত্র—পরম শত্রুকে একবার মুখোমুখি পাইত!...মলিনার সমস্ত অন্তর বেদনায় তীব্র হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। অব্যক্ত বেদনায় বুকটা জোরে চাপিয়া ধরিয়া খোকার শীর্ণ গণ্ডের উপর নিজের কাতর মুখখানি রাখিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত মলিনা যেন অভিভূতের মতো পড়িয়া রহিল।...কিছু না—কিছু না! কোন প্রতিহিংসা নাই, প্রতিশোধের স্পৃহা নাই! বিচার করিবার সে কে? শুধু তাঁহার দান তাঁহারই চরণে ফিরাইয়া দিয়া চোখের জলে তাঁহার চরণ ধুইয়া দিয়া একবার শেষবার বলে, নাও, ওগো নাও—তোমার জিনিষ তুমি ফিরিয়ে নাও। আমি অশক্ত—অযোগ্য...

মলিনা—মনু...

মলিনা চোখ তুলিয়া চাহিয়া আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। কে, কে ঐ অন্ধকারের কালো দেহ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে? ও কে—যমদূত? তাহার খোকাকে লইতে আসিয়াছে? ওরে—ওরে—ওরে মূর্খ, ওরে দাম্ভিক, মাতার স্নেহ-ভরা মমতা-ভরা বুক হইতে খোকাকে কাড়িয়া লইবি তুই?...কিন্তু একি! হাত দুইটা কাঁপে কেন? খোকাকে বুঝি আর ধরিয়া রাখা যায় না! মাথাটা কেমন বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে—খালি অন্ধকার, অজস্র তরল অন্ধকার যেন সব গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে! ঐ—ঐ বুঝি তাহার খোকাও অন্ধকারে তলাইয়া গেল!...বুকটা কে চাপিয়া ধরিল—নিঃশ্বাস যে আর ফেলা যায় না! মলিনা ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া হতচেতনের মত সম্মুখে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পরেশ সশঙ্ক সকরুণ অর্দ্ধোচ্চারিত শব্দে কহিল, চুপ-চুপ মলিনা, ও জেগে উঠবে—আর হয়তো দেখতে পাবো না! জানতো... কই খোকা—দাও—দাও...

মলিনা অট্ট হাস্য করিয়া উঠিল। হাঃ হাঃ হাঃ! খোকাকে নেবে তুমি—তুমি—তুমি? তোমার জন্যই

মানুষ করেছি না? বুকের রক্ত তোমার জন্যেই খাইয়েছি না? নাও—নাও—নেবে? এসো দেখি? হাঃ হাঃ হাঃ!

মনু—মনু ··

দূর—দূর! চলে যাও! ঘুমিয়েছে—খোকা আমার ঘুমিয়েছে—বহুদিন পরে ঘুমিয়েছে। ওকে আর ডেকো না—বড় কষ্ট—বড় কষ্ট পেয়ে খোকন আমার...

মলিনা—মলিনা, আমি—একবার—একবার...

তুমি—তুমি—তু...নিষ্ঠুর! পিশাচ! খোকার মৃত্যু দেখতে এসেছ? এতেও তৃপ্ত হওনি ?···দেখো—দেখো—চোখ মেলে দেখো—প্রাণ ভরে দেখো!...না, না—তুমি একা দেখলে হ'বে না,—তোমার মাকে ডাকো—আর কেউ যদি থাকে ডাকো—সবাই মিলে দেখো—শনি—তোমাদের শনি আজ...ওঃ...খোকোন—খো-ক-ন...

মলিনার দীর্ঘ দিনের কষ্ট অর্জ্জিত চৈতন্য আজ পুত্রের মৃত্যুশয্যার শিয়রে স্বামীর পায়ের তলে অকস্মাৎ বিগত-চেতন হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

পরেশ কয়েক মুহূর্ত্ত বজ্রাহতের ন্যায় সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই করুণ মর্ম্মান্তিক দৃশ্যের নিষ্ঠুরতা, মর্ম্মান্তিক অনুশোচনায় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না যে কি হইল। তাহার পর যখন বুঝিল, তখন মলিনাকে বুকে করিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া খোকার গায়ে হাত রাখিয়াই আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, খোকা—খোকা—ওরে বাবা···

মুহূর্ত্ত পরে রাজুবালার গগনবিদারী চীৎকারে সকলে শিশুবিয়োগের কথা জানিল বটে কিন্তু অভাগিনী মলিনা জানিল যে মুহূর্ত্তের হতচৈতন্যের মধ্যে তাহার কি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

মনীন্দ্রচন্দ্র সাহা

নষ্টচন্দ্র

শ্রীমতী নিভা নিয়োগী

"হাঁ রে প্রভা! শুনতে পাচ্ছিস্ নে? তোর মা যে তোকে ডাক্‌ছে" ব'লে হেমেনের মা সান্ধ্য-প্রদীপ নিয়ে চণ্ডী-মণ্ডপ চ'লে গেলেন।

এইবার প্রভার চমক ভাঙ্গল। "যাই মা" বলে উচ্চ-কণ্ঠে সাড়া দিয়ে হেমেনকে বল্‌লে—"আচ্ছা আজ তবে যাই, কাল কোন্ ট্রেণে যাবে?"

"খুব সম্ভব আসাম মেলে" ব'লে আর অপেক্ষা না করে প্রভা দ্রুতপদে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল।

হেমেন সম্প্রতি কলিকাতা থেকে বি-এ পড়ছে। সংসারে আছেন শুধু তার মা! অবস্থা স্বচ্ছল।

একজন কর্ম্মচারী, একজন পরিচারক ও একজন দাসী নিয়ে তিনিই সংসারের তত্বাবধান করেন। প্রতিবেশী-গণেরও সহানুভূতি পেয়ে থাকেন, তবে বেশীরভাগই পাল-পার্ব্বণে।

আজ তু'দিন হ'লো হেমেন তার মার অসুখ সংবাদ পেয়ে বাড়ী এসেছে।

অসুখ বিশেষ মারাত্মক নয়, ম্যালেরিয়া জর। রোজ বিকেলে হাত পা জালা করে। গাও একটু গরম হয়। বারণ করা সত্বেও প্রভা হেমেনকে তাঁর অসুখ সংবাদ দিয়েছেন।

প্রভার পিতা মনোহর চক্রবর্ত্তী হেমেনের কুল-পুরো-হিত ও পিতৃবন্ধু। তিনি পৌরহিত্য করে কোনরূপে মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান করেন। গ্রামে যদিও আরও কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে তবু এই তুটী পরিবার পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত।

প্রভাদের বাড়ী হেমেনের বাড়ীর সংলগ্ন ব'ললেই হয়। মাঝে একটা ফুলবাগান উভয় বাড়ীকে পৃথক করে রেখেছে। মেয়েরা ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে খিড়কীর পথে এ বাড়ী ও বাড়ী যাতায়াত করে।

প্রভা হেমেনের ঘর হ'তে বেরিয়ে এসে খিড়কীর দরজা দিয়ে ফুল বাগানে প্রবেশ করেই দেখ্‌তে পেল, গাছের আড়াল থেকে শারদ চন্দ্র যেন মুচ্‌কি হাস্‌ছে। ফুলগুলির তো কথাই নেই, তারা আবার হাওয়ার সঙ্গে হাস্‌তে হাস্‌তে লুটো পুটি খাচ্ছে।

প্রভার চরণগতি মন্থর হ'য়ে এ'লো। মনে হ'লো, যেন তার মনের গোপন কথাটি এরা জেনে ফেলেছে। আরও কত কথা তার মনে জাগ্‌তো কিন্তু চিন্তাস্রোতে বাধা দিল এবার তা'র মা'র রুক্ষকণ্ঠের আহ্বান। সে শ্রান্ত-পদে বাগান পার হয়ে বাড়ীতে প্রবেশ ক'রতেই তার মা রান্নাঘর হ'তে বেরিয়ে এসে ব'ল্‌লেন "তোকে না সুকাল সকাল বাড়ী ফিরতে বলেছিলাম, আজ নষ্টচন্দ্র, দেখ্‌তে নেই। তা দেখে এলেন বোধ হয় ধিঙ্গি মেয়ে! মিথ্যা-মিথ্যা একটা কলঙ্ক উঠুক্ বেশ হবে তখন, জাত মান সব খোয়াব তোর জন্যে?"

উনি বাড়ী এলে জলপড়া খাস্ কিন্তু, গুরুজনের কথা একটু মানিস্ লো মানিস্।

সত্যই তো প্রভা বাগানে, চাঁদের হাসি দেখ্‌ছিল—তবে কি তার মিথ্যা কলঙ্ক উঠবে? কেন সে ক'রেছে কি? চাঁদ তো সবাই দেখে—আজ জগতের লোক কি চোখ বুজে আছে? যাক্ সে উত্তর ক'রল, "আচ্ছা, আচ্ছা—বাবা এলে জল পড়া খেলেই হবে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে রোজ সন্ধ্যায় দাবার ঘুঁটীর থলেটি নিয়ে ওপাড়ার মহেশ দত্তের বৈঠক-খানায় চলে যান। কোন দিন ফেরেন রাত দশটায় কোন দিন বা বারটা বেজে যায়।

প্রভা ক্ষুণ্ণ মনে বসে রইল পিতার আগমন প্রতীক্ষায়। সে দিন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে মহেশ দত্ত অশ্বচক্র ক'রে

ছেড়েছেন। লজ্জায় ঘৃণায় ঝগড়া দ্বন্দ্ব করে একটু সকাল সকালই বাড়ী ফিরলেন।

প্রভা পিতাকে দেখ্‌তে পে'য়ে তাঁ'র হাত হ'তে দাবার থ'লেটি নিয়ে যথাস্থানে রেখে এসে বললে "বাবা! আজ নাকি নষ্ট-চন্দ্র? না জেনে দে'খে ফেলেছি একটু জল পড়ে দাও না?"

পিতার মন তখনও সেই অশ্বচক্রের আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হচ্ছিল। তিনি বল্‌লেন "আচ্ছা! নিয়ে আয়তো মা দাবার থলেটা।"

"দাবার থলে আবার এত রাত্রে কি হবে বাবা? আমায় জল পড়ে দাওনা; পঞ্জিকা আন্‌বো।"

"নিয়ে এসো" বলে তিনি চিন্তিতমনে তামাক সাজ্‌তে ব'স্‌লেন।

প্রভা পঞ্জিকা ও একঘটী জল নিয়ে এলো—এইবার তিনি পঞ্জিকা নিয়ে ব'ললেন—"একটু জল হাতে নিয়ে পূব মুখো হ'য়ে ব'সো। বল "সিংহঃ, প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ।"

প্রভা মনে মনে 'সিংহঃ হতঃ সুকুরমা'—এই কয়টা শব্দ মাত্র বলতে পেরেছিল কিন্তু লজ্জায় আর কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে জলটুকু পান করে চলে গেল। তারপর আহারাদি করে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগ্‌লো "মন্ত্র তো সবটুকু বলতে পারিনি যদি সত্যি সত্যি মিথ্যা কলঙ্ক ওঠে" একথা মনে হতেই তার শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। ঘুমের জন্য খুব খানিক এপাশ ওপাশ ক'রতে লাগল, কিন্তু ঘুম এলো না।

প্রভা শুনেছি যদি কারও কোন জিনিষ গোপনে নষ্ট করা যায় তবে পরদিন তা'র গালাগালিতে নাকি নষ্টচন্দ্র দর্শন জনিত কলঙ্কাদি দোষ নষ্ট হয়।

সে মনে মনে এই চিন্তা ক'রতেই তার মনে হ'লো, ও পাড়ার মহেশ দত্তের বাগানে এক কাঁদি অনুপমকলা পোক্ত হয়ে আছে। উহা যদি নষ্ট করতে পারি তবে বেশ হয়। দত্ত গৃহিণী যে মুখরা, পরদিন সে পিতৃপুরুষ নরক গামী না ক'রে ছাড়বেনা! কিন্তু উপায় কি? এত রাত্রে তো আমি সেখানে একা যেতে পা'রবো না। আর পা'রলেই বা কি? গাছ কেটে কলা নষ্ট করা বড় সহজ কাজ নয়। হঠাৎ তার খেয়াল হ'লো হেমেন দা'র সাহায্য নিলে হয় না?

খুব সন্তর্পণে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। খিড়কী দরজার পাশে আস্তে আস্তে খিল খুলে কম্পিত পাদ-বিক্ষেপে হেমেনের শয়ন কক্ষের জানালার নীচে এ'সে দেখতে পেলে ঘরের আলো। মনে সাহস হ'লো; মৃদুস্বরে ডাক্‌লে "হেমেন দা!" হেমেনের তখনও ঘুম পায় নি, জেগেই ছিল।

প্রভার মৃদু আহ্বানে চম্‌কে উঠে বাগানের সামনের খিড়কী খুলে বেরিয়ে এসে ব'ল্‌লো, "প্রভা! এত রাত্রে একলা? কেন কি হয়েছে?"

"চল ঘরে যাই সব বলছি" বলে প্রভা হেমেনের সঙ্গে ঘরে ঢুক্‌ল। রাত প্রায় একটা। সবাই তখন ঘুম-ঘোরে অচেতন! হেমেন বল্‌লে—"কি বলবে বল—চুপ করে রইলে কেন?"

এবার প্রভা উত্তর ক'রল আমি এসেছি যে জন্যে শোন—আজ সন্ধ্যা বেলা যখন বাড়ী যাই হঠাৎ কি জানি কেন চাঁদের পানে চেয়েছিলুম। বাড়ী গিয়ে শুনি যে আজ নষ্টচন্দ্র দেখ্‌তে নেই। দেখলে মিথ্যা কলঙ্ক হয়। শুনেছি আজকে যদি কারো কিছু অনিষ্ট করা যায় আর সে যদি গালাগালি দেয় তবে দোষ কেটে যায়। তাই ভেবে ভেবে স্থির করেছি ওপাড়ার মহেশ দত্তের পোক্ত অনুপম কলার কাঁদি তোমার সহায়তায় কে'টে নিয়ে আসবো। পা'রবেনা একটু কষ্ট ক'রতে আমার জন্যে? চল যাই এক্ষুনি। তোমার পায়ে পড়ি'—ব'লে সত্যি সত্যি প্রভা হেমেনের পায়ে পড়ে কাঁদতে লা'গ্‌লো।

হেমেন সস্নেহে প্রভার হাত ধরে তুলে ব'ল্‌লে, "প্রভা! তুমি কি ক্ষেপে গেলে? নষ্টচন্দ্র দেখলে কী হয়? ওসব বাজে, একটা কুসংস্কার মাত্র! যেমন রাহু-চণ্ডাল চন্দ্রকে গ্রাস করার ফলে চন্দ্রগ্রহণ হয়—আর সেই কারণে বাড়ীর পাক পাতিল-গুলো পর্য্যন্ত অশুচি হয়! এও ঠিক তেমনই একটা কুসংস্কার। ছি ছি, তুমি একটা কুসংস্কারকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে আজ যা ক'রে ব'সেছ, তাতে

কলঙ্ক একটা উঠবে বলেই আমার মনে হচ্ছে। যদি সেই ভয় হ'য়ে থাকে এক্ষুনি বাড়ী ফিরে যাও। আমার কথা শোন।"

হেমেনের বড় ভয়; পাছে এ সময় এ অবস্থায় তা'র শোবার ঘরে প্রভাকে কেউ দেখে ফেলে। যদি হেমেনের দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে একটী সরলপ্রাণা তরুণীর কাছে তাই সেই আবার তাকে ব'ললো "প্রভা! চল তোমায় বাড়ী রেখে আসি।"

হেমেন এ কার্য্যে সম্মতি দেবে কিনা এ চিন্তা প্রভার মনে উদয় হয় নি। বাল্যাবধি সে তার ছোট বড় সকল রকম আব্দারই রক্ষা করে আসছে। সুতরাং আজও সেই ভরসায় সে এত বড় একটা দুঃসাহসের কাজ ক'রে বসেছে। কাজটা তার পক্ষে খুবই অন্যায় হ'য়েছে। কেউ দে'খে ফেল্‌লে, একটা কলঙ্ক উঠতে পারে—তা'র সৌষ্টব ও সুষমায় পূর্ণ দেহ-শ্রীতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ জ্ঞান তা'র জন্মেছে। কিন্তু খেয়াল যখন ঘাড়ে চাপে তখন ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা মোটেই থাকেনা। তাই প্রভা তার খেয়াল চরিতার্থ ক'রতে প্রস্তুত। এতে ভাল মন্দ যাই ঘটুক না কেন!

"না, না, তোমার আর কষ্ট ক'রতে হবে না—আমি একাই যেতে পা'রবো" ব'লে প্রভা ঘর হ'তে বেরিয়ে প'ড়লো!

হেমেন এই খেয়ালি মেয়েটিকে বরাবর জানে। সে আজ একটা কিছু ক'রবেই। এমতাবস্থায় সে নিশ্চিন্ত হ'তে না পেরে প্রভার পেছনে পেছনে পথের সাথী ছোরা খানাকে নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত বেরিয়ে প'ড়লো। যখন বাগান পার হ'য়ে সদর রাস্তায় প্রভা দাঁড়ালো তখন সে যে মহেশ দত্তের বাড়ীতেই যা'বে হেমেন ইহা বেশ বুঝতে পা'রলো। সুতরাং আর নিজেকে অপ্রকাশ রাখা চলে না। একটু ঘুরে তারপর হেমেন সহসা আবির্ভূত হ'লো ঠিক প্রভার সামনে।

"চম্‌কালে নাকি?" ব'লে হেমেন প্রভাকে পাশ ক'রে ব'ললে, "চল তোমার কলঙ্ক ভয় দূর করে আসি।"

প্রভা কোন' প্রত্যুত্তর না ক'রে হেমেনের অনুগমন করলে। প্রথমেই নজর প'ড়লো মহেশ দত্তের শয়ন গৃহের মিট্‌মিটে আলো—উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়ে। কিন্তু দত্তমহাশয়ের নাসিকা গর্জ্জন ধ্বনি দূর ক'রে দিল তা'দের যত ভয় ও ভাবনা। নিশ্চিন্ত মনে তা'রা বাগানে প্রবেশ করলো। প্রভার নির্দ্দেশ মত অল্প আয়াসে একটী কলাগাছ ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে প'ড়লো—ছোরাখানার সাহায্যে।

সেই শব্দে দত্ত গৃহিণীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ধড়্‌মড়্ করে উঠে, সজোরে দত্ত মহাশয়ের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললে—"ওগো শু'নছ, একবার ওঠ দেখে এসো বাইরে কিসের শব্দ হ'লো।"

"উঃ, আঃ, বিরক্ত করোনা ব'লে দিচ্ছি, বলে তিনি পাশ ফির্‌লেন। দত্ত গৃহিণীর এমন সাহস নেই যে বাইরে গিয়ে দেখে আসে ব্যাপারখানা কি! সে ভয়ে জানালাটীও বন্ধ ক'রে দিল।"

হেমেন ইতি মধ্যে কলার কাঁদি কেটে প্রভার সাথে বেরিয়ে এলো এবং সন্তর্পণে কলাগুলি ছোরার আঘাতে দ্বিখণ্ডিত ক'রে ছড়াতে ছড়াতে সদর রাস্তায় এসে অদূরে গ্রাম্য চৌকিদারের হাঁক শুনতে পেল্‌। এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হতে না হতেই দেখে লণ্ঠন হাতে চৌকিদার তাদের দিকেই আসছে।

প্রভার এই কার্য্যে প্রথমতঃ যতটা উৎসাহ ছিল, এখন উৎসাহ গিয়ে তার স্থানে ভয় দেখা দিয়েছে। তার মুখে একটা কথাও নেই সে চলেছে হেমেনের সাথে, যেন এঞ্জিন সংলগ্ন একখানা গাড়ী। এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে ঠিক তার পেছনে পেছনে।

চৌকিদারকে আসতে দেখে তার বুকের ভেতর ঢিপ্ ঢিপ্ করতে সুরু করেছে। পাছে তাকে চিন্‌তে পারে এই ভয়ে সে কম্পিত হস্তে টেনে দিল একটু মাথার কাপড়।

চৌকিদার হেমেনকে অতরাত্রে সম্মুখে দেখে পদধূলি গ্রহণ করে বিনাবাক্যালাপে সরে দাঁড়াল।

বিস্মিত চৌকিদার ভাব্‌তে ভাব্‌তে গন্তব্য পথে চ'লে গেল "এত রাত্রে হেমেনবাবু প্রভা দিদিমণির সঙ্গে কোথা থেকে আসছে? আর দিদিমণির ঘোমটা টানাই বা কেন?"

বাড়ী পৌঁছেই চৌকিদার ঘটনাটী বেশ করে তার পরিবারের কর্ণগোচর করতে ভুললো না। সে সমস্ত শুনে বললে "এই দেখেই আশ্চয্যি হ'লে? দু'দিন সবুর কর আরও কত দেখবে। দুজনে যে ভাব! তা বড় লোকের সব শোভা পায়।"

"আঃ থামোনা, আমাদের ও সব কথায় দরকার কী? কেউ শুনতে পেলে দু'দশ ঘা জুতোও পড়বে পিঠে, আর এ গ্রামে বাস করাও ঘুচে যাবে" বলে দুজনেই চুপ চাপ ঘুমিয়ে পড়লো।

প্রত্যুষে দত্ত গৃহিণী কলাবাগানের পথে টুকরো টুকরো কলা দেখতে পেয়েই ঢুকে প'ড়লো বাগানে। সেখানে গিয়ে তার নাকফুলের আশায় এবারকার মত জলাঞ্জলি দিয়ে ফিরে এলো কাঁদতে কাঁদতে। বড় আশা ছিল সামনে পূজোয় সে ঐ কলা বেচে একটী পাথর বসানো নাক-ফুল কিনবে।

গৃহ প্রাঙ্গণে এসে, তখনও দত্ত মহাশয়ের নাক ডাকছে শুনে দুঃখে ক্ষোভে রাগে উচ্চকণ্ঠে প্রথমত স্বামীকে তৎপরে চোরকে উদ্দেশ করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি ক'রতে লাগলো। গৃহিণীর ঝঙ্কারে এবার দত্ত মহাশয় দুর্গা দুর্গা ব'লে শয্যা ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হলেন। বেরিয়ে এসে ব'ল্লেন "বলি হয়েছে কী? সকাল বেলা অত গলা ডাকাচ্ছ কেন শুনি?"

দাঁত মুখ খিচিয়ে গৃহিণী জবাব দিলে "হয়েছে তোমার মাথা। অমন সুন্দর পোক্ত কলা!—বলতেই শোক উথলে উঠে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

দত্ত মহাশয় বল্লেন "কলা! কেন বাদুড়ে খেয়েছে বুঝি? তা অমন দু'একটা খেয়ে থাকে। তাতেই এত জল।" ব'লে রসিকতা ক'রে বুঝিবা চোখ মুছাতে যেই নিকটে যাওয়া অমনি এক ঝ্যাট্কা। "মর বেহায়া মিন্সে! আমার সঙ্গে লেগ না ব'লছি, ভাল হবে না। সব তাতেই ঠাট্টা ইয়ারকি? যেমন এক কাঁদি কলা কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়ে চোর দিয়ে খাওয়ালে, আমি যদি ভাল মানুষের মেয়ে হই তো তোমার কাছে এই পূজোয় পাথর বসান নাকফুল আদায় করে ছাড়বো। দেখে নিও।"

এতক্ষণে দত্ত মহাশয়ের গতরাত্রের তাঁর ডাকির কথা মনে পড়লা। যাক্ যা হবার হয়েছে বলে গণ্ডুষ নিয়ে বিমর্ষচিত্তে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় কলার টুকরো দেখে তাঁর স্মরণ হলো "কালকে না নষ্ট-চন্দ্র গেছে।"

দেখতে দেখতে কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হ'ল। অনেক অনেক ছেলেবুড়োকে ঘটানাস্থলে উপস্থিত হতে দেখা গেল। ছেলেদের চোখ মুখ আনন্দোজ্জ্বল। বয়োবৃদ্ধ গণের মুখ ভার—চিন্তাক্লিষ্ট। "যাক যা হ'বার হয়ে গেছে" বলে যে যার কাজে চলে গেল।

বিকেলে চৌকিদারবধূ এসে ফিস্ ফিস্ করে দত্ত গৃহিণীকে বল্লে, "বৌঠাকরুণ! কাল রাত্রে আরও যে কত লীলা খেলা হয়েছে তা'র খবর রাখ কিছু?"

"না, নিজের দুঃখে নিজে মরে যাচ্ছি বাছা। যে সর্ব্বনেশে আমার সর্ব্বনাশ করেছে সতী মায়ের যদি সতী মেয়ে হই সর্ব্বনাশ তার হ'লো ব'লে দেখে নিও।"

"সে আর হবে না?"

"নিশ্চয়ই হবে" চৌকিদার বধূ সহানুভূতি প্রকাশ করে বলল "শোন কালকের আর একটা কাণ্ড। কিন্তু ভাই দেখ যেন, কাউকে ব'ল না। লোকে ব'লে, মেয়ে মানুষের পেটে কথা পচে না। তাই ভয় হয় পাছে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে পড়ে।

"বলই না ছাই, কি এমন কথা? আমায় কি তুমি জান না। আমি দিব্বি ক'রে বলছি কাউকে কিছু ব'লব না।"

তৎপরে হেমেন বাবু ও প্রভার রাত দুটার সময় নৈশ ভ্রমণ সম্বন্ধীয় যাহা তার স্বামীর কাছে শুনেছিল সব বলে আবার একটু অলঙ্কারও দিয়ে দিল—তারা তোমার বাইরের ঘর হতে যেন বেরিয়েছিল। "ওমা! বলিস কি? সত্যি নাকি?"

"সত্যি, সত্যি। স্বচক্ষে দেখেছে দণ্ডবতও ক'রেছে। প্রভা দিদি কিন্তু মুখে ঘোমটা টেনে দিয়েছিল।" পুনঃ পুনঃ সতর্ক ক'রে চৌকিদারবধূ বাড়ী গেল।

এইতো প্রতিশোধ নেবার উত্তম সুযোগ! দত্ত গৃহিণী তৃতীয় পক্ষ। দীর্ঘ রাত্রি পর্য্যন্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তার স্বামীকে নিয়ে দাবা খেলে, এটা তার মোটেই সহ্য

ইস্তা নী... [illegible] তো বুড়োর হাতে পড়েছে। তায় আবার সারাদিন সংসারের হাড় ভাঙ্গা খাটুনী। তাও যদি স্বামী নিয়ে সন্ধ্যার পর একটুখানি আমোদ আহ্লাদ করতে পেতো। কিন্তু সে-সাধে রোজ বাদ সাধে ওই বিট্‌লে বামুন!

দত্তগৃহিণী এই সবে দু'বছর হয় দত্ত গৃহে পদার্পণ করেছে। এমন সুযোগ একদিনের তরেও সে পায়নি যাতে দূর করে দিতে পারে দাবা খেলার আড্ডাটা তার বাড়ী থেকে।

যখন ভগবান, এতদিন পরে মুখ চাইলেন তখন সে কি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? সন্ধ্যার পরই তাকে প্রতিবেশীগণের ঘরে ঘরে ফিরতে দেখা গেল। কথাচ্ছলে প্রভা ও হেমেন বাবুর গতরাত্রের ঘটনাটী সবিস্তারে বর্ণনা করে এলো এবং ইহাও বলতে ভুলে যায়নি, যে রাত্রে তার ভাল ঘুম হয়নি—জানালা দিয়ে ওদের গমনাগমন সে স্বচক্ষে দেখেছে।

হেমেন প্রভাকে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসে একটু ঘুমুতে চেষ্টা ক'রল, কিন্তু ঘুম আর আসে না। চৌকিদারের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হওয়ায় নিষ্পাপ মনেও কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

রাত্রি জাগরণ কালে যদিও সে শারীরিক সুস্থতা বোধ কচ্ছিল না, তবুও সে বেলা নটায় আসাম মেলেই কলিকাতায় চলে গেল।

হেমেন নির্দ্দিষ্ট দিনেই গেল বটে, কিন্তু তার ক'দিন অপেক্ষা করেই যাওয়া উচিত ছিল। সে থাকলে গ্রামের পরনিন্দা-প্রিয়গণ কথাটা সালঙ্কারে প্রচার করতে সাহস পেতো না।

সুযোগ পেয়ে তারা বেশ বলে বেড়াচ্ছে যে "সে সেয়ানা ছেলে, সট্‌কে পড়েছে। ভেবেছে দু'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকলেই কথাটা চাপা পড়ে যাবে। অহঙ্কারে তো ভাল করে কথাই কন না। অথচ ভেতরে এত!"

মুখে মুখে কথাটা ক্রমে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে পড়লো। প্রভাকে কেউ দেখলেই মুখ টিপে টিপে হাসে।

"একি বিধি লিপি! কি ক'রতে গিয়ে কি হলো'? দশ জনে যা বলবার তাত' বল্‌ছেই, কিন্তু মা-বাবার মুখের দিকে যে চাইতেই পাচ্ছিনে। এখন মরণ হলেই বাঁচি। হেমেন দা তো আমায় বিশেষ করে নিষেধ করেছিলেন। দোষ আমারই, আমিই, তার কথা শুনিনি।"

কয়েকদিনের মধ্যেই প্রভা ভাবতে ভাবতে অসুস্থ হয়ে পড়লো। তারপর উঠ্‌তে বসতে মায়ের খোঁটা—'কুলের কালী', 'কালামুখী' প্রভৃতি নিত্য নতুন সম্ভাষণ অঙ্গের ভূষণ হয়ে পড়েছে। দিন দিন প্রভার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেউ বড় সেদিকে লক্ষ্য করে না। যখন ক্রমে উত্থানশক্তি একরূপ লোপ পে'ল তখন স্মরণ হলো তাদের গ্রাম্য কবিরাজ ডাকৃতে।

পূজার বন্ধে হেমেন বাড়ী এসেই সেই কথাটা শুনল। যার জন্যে সময় সময় তার আশঙ্কা হতো, না জানি তাদের নিয়ে কি অপ্রিয় আলোচনার বৈঠক হয়, এখন সে যে-আশঙ্কা করেছিল কার্য্যে, তাই হয়েছে বরং কিছু অতিরঞ্জিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূজার ক'দিন কেটে গেল। কিন্তু প্রভা কোথায়? তবে কি...সব শুনে মা তাকে আস্‌তে বারণ করেছে? চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চোখ মুখের ভাব দেখে প্রভার খবর নিতে কেমন দুর্ব্বলতা এসে পড়লো। একি ব্যাপার, সকলের মুখেই যেন প্রচ্ছন্ন হাসি বিরক্তি ব্যঞ্জক।

সে একদিন খেতে বসে একথা ওকথার পর মা'কে জিজ্ঞাসা ক'রল "মা, কই পুজোর মধ্যে প্রভাকে তো একদিনও দেখলেম না। তার মাকেও দেখিনি। অসুখ হয়নি তো?"

"কি জানি বাবা, লোকে কত কি বল্‌ছে" এইটুকু শুনেই হেমেন প্রাণ খোলা হাসি হেসে বল্লে "মা! আমিও এসেই শুন্‌তে পেয়েছি। কথাটা আসলে কিছুই নয়। তুমি তোমার ছেলেকে সকলের চেয়ে বেশী জান। বলতো তোমার মনে কী হয়? কথাটা যে ভাবে প্রচার হয়েছে তাতে তোমারও সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভেতরের খবর আজ পর্য্যন্ত আমি আর প্রভা ভিন্ন কেউ জানে না। ব'লে সব কথা তার মাকে ব'লল, এবং ইহাও সে

বল্‌তে ভুললে না যে সে নানারকম যুক্তি তর্ক দ্বারা কিছুতেই তার মনের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে পারেনি! যখন সে একাই অন্ধকারে সদর রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো তখন অনন্যোপায় হয়েই তার কার্য্যের সহায়তা তাকে করতে হয়েছে।"

হেমেনের মা সব শুনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন "তুই সে-দিন চলে না গেলে কি এতটা হতো? প্রভার যা অবস্থা হয়েছে তাকে আর চেনাই যায় না। শুনেছি আজ ক'দিন থেকে তার অসুখ খুব বেড়ে গেছে। হাজার হলেও সে ছেলে মানুষ। সইবে কেন তার এত লাঞ্ছনা? কথাটা আমি একদিন প্রভাকে নিরালায় ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম; এমন একটা বিশ্রী কথা উঠলো কেন? সে কোন উত্তর না দিয়ে শুধু কাঁদতে লাগলো। কেবল এইটুকু বলে গেল "সব মিছে কথা বড়মা"। সেই থেকে আর সে কোথাও বের হয় না! তার মায়ের তো যত রাগ আমারই উপর। যাক যা হবার হয়ে গেছে বলুক গে যে যত পারে।

হেমেন প্রভার অসুখ শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলো—তাকে দেখবার জন্যে। তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে একটা পান মুখে দিয়ে সে বাগানের পথে তাদের খিড়কীর নিকট গিয়ে পৌঁছিল। কোনরূপে আত্ম-সম্বরণ করে ডাকলে "কাকিমা!" প্রভার মা তখন রান্না ঘরেই ছিল। ডাক শুনে বেরিয়ে এলো এঁটো হাতেই। কিন্তু সামনে হেমেনকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

হেমেন বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্নেহময়ী খুড়িমার এই অভাবনীয় আচরণে। তারপর প্রভাকে দেখবার আশা ত্যাগ করে যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে গেল।

বিকেলে কবিরাজের মুখে প্রভার অবস্থার কথা শুনে কাল-বিলম্ব না করে ডাক্তার রায়কে তার করে দিলে দার্জ্জিলিং মেলে আস্‌তে। রাত দু'টার সময় ডাক্তার রায় এলে তখনই তাঁকে নিয়ে হেমেন চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'লো, মনে সৎসাহস সংগ্রহ করে।

প্রভার তখন থেকে থেকে 'ফিট্' হচ্ছে। বাড়ীর সবাই জেগে আছে।

হেমেন, চক্রবর্ত্তী-মহাশয়কে ডেকে, ডাক্তার রায়কে নিয়ে প্রভার ঘরে গেল।

হেমেনকে দেখে কেঁদে উঠলো প্রভার মা। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে, ডাক্তার রায় মনোনিবেশ করলেন রোগ নির্ণয়ে। ডাক্তারের মুখ চোখের ভাবে হেমেনের গা কাঁপছিল, সে প্রভার বিছানাতেই বসে পড়লো। তাঁর যন্ত্রাধার হ'তে 'ইন্‌জেক্‌সান্' করার যন্ত্রাদি শীঘ্র বের করে দিতে হেমেনকে বললেন। হেমেন বের করে দিল ডাক্তারের হাতে। তিনি তখনই একটা ইন্‌জেক্‌সান করে দিলেন। সকলেই কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে রইল। হেমেনের উৎকণ্ঠা কতক দূর হ'লে ডাক্তার রায় একটু হেসে তা'কে ব'ল্লেন—"আপনি এত অধৈর্য্য হলে তো চ'লবে না। ঔষধের বাক্সটা এদিকে দিন। একটা শিশি দিতে বলুন।" শিশি প্রভার পাশের দেওয়ালের তাকের উপর ছিল। হেমেন সন্তর্পনে প্রভার গায়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে তাক্ হতে শিশি নাবিয়ে এনে পরিষ্কার করে দিলে। ঔষধ তৈরী করে ডাক্তার রায় হেমেনকে বল্‌লেন "খাইয়ে দিন এক দাগ চামচ দিয়ে।" অল্প অল্প করে ঔষধ খাওয়ানর পরেও প্রভা অচৈতন্য অবস্থায় ছিল।

ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দেওয়াই ছিল। ভোরের আলো এসে পড়লো প্রভার মুখে। বেশ ফুরফুরে হাওয়া ভেসে আসছে পাশের বাগান হ'তে। সেই হাওয়ায় প্রভার মুখে চোখে এসে পড়তে লাগল কপালের শুষ্ক এলোমেলো চুলগুলি।

হেমেন সযত্নে সেগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যথাস্থানে সন্নিবেশিত ক'রছিল। আর ডাক্তার রায় বসে বসে বই দেখছিলেন।

এমন সময় প্রভা হেমেনের মুখ পানে চেয়ে, ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো "হেমেন দা!" বলেই উত্তেজনার আধিক্যে পুনরায় মূর্চ্ছা গেল।

প্রভার মা এতক্ষণ নীরবেই বসে ছিল, সে এবার

কেঁদে [illegible] ডাক্তারের ইঙ্গিতে হেমেন তাঁকে হাত ধরে ঘরের বাইরে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রতে লাগল।

ডাক্তার রায় মূর্চ্ছা অপনোদনকল্পে অভিজ্ঞ নার্সের মত যা কিছু ক'রবার নিজেই করতে লাগলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় প্রভার জ্ঞান সঞ্চার হ'লো। এবার চোখ মেলে দেখতে পেলো ডাক্তার রায়কে, একজন অচেনা অজানা লোক,—তবু চেয়ে রইল তার পানে অনিমিষে, যেন কতদিনের পরিচয়।

ডাক্তার রায় একমাত্রা ঔষধ নিজেই খাইয়ে দিলেন। প্রভা ঘুমিয়ে পড়লো এবার খুব শীগগির।

ডাক্তার রায় বাইরে গিয়ে হেমেনকে বললে, প্রভার মাকে পাঠিয়ে দিতে। ঘুম ভাঙ্গলে তার সঙ্গে বেশী কথা বলা না হয়। তারপর হেমেনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

হেমেন বাড়ী গিয়ে ডাক্তার রায়ের সহিত চা খেয়ে পুনরায় প্রভার বাড়ী চলে এলো। এসে ডাক্তার রায় হেমেনকে বাইরে অপেক্ষা ক'রতে বলে প্রভার ঘরে গিয়ে দেখে, এখন তার বেশ জ্ঞান হয়েছে। এবার কিন্তু ডাক্তারকে দেখে প্রভা চোখ বুজেছিল।

"আপনি একটু দুধ গরম করে নিয়ে আসুন" বলে প্রভার মাকে বিদায় করে হেমেনকে ডেকে প্রভার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে ডাক্তার রায়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত প্রভার অসুখ সম্বন্ধে গল্প করতে লাগলেন।

হেমেন ঘরে গিয়ে প্রভা হেমেনকে দেখে প্রভার পাশে বসতেই বলল "হেমেনদা! আমি বাঁচবো তো?" সে সস্নেহে প্রভার হাতখানা ধরে বললে "এইত তুমি সেরে গেছ। আর কোন ভয় নেই।"

প্রভা চারিদিকে চেয়ে কি যেন দেখে নিয়ে বললে, "হেমেনদা! আমার কি হবে?"

"কি আর হবে! তুমি মিছামিছি আর ভেবনা। আমিই তোমার কলঙ্ক ভঞ্জন ক'রব।"

প্রভার রোগক্লিষ্টমুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো অভাবনীয় আশার আশায়।

শ্রীমতী নিভা নিয়োগী
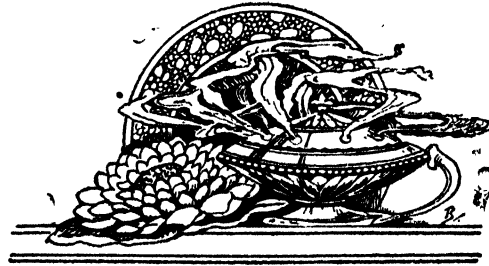
আশাপথ

শ্রীহেমাঙ্গিনী দে

নীলাচলের নীলসাগরের তীরে জমিদার বাবুর দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখস্থ গৃহের বারান্দায় একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া একটী তরুণী অনিমেষ লোচনে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আছে। জ্যৈষ্ঠের অসহ্য গরম। মধ্যাহ্ন হইতেই হাওয়া প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, সমুদ্র কতকটা স্থির ভাব ধারণ করিয়া যেন একখানি নীল গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। উপরের অসীম দিগন্ত ব্যাপী আকাশ গায়ে নীলের চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দিয়াছে। পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়া রবির লোহিত আভা, এবং মৃদু-মৃদু বাতাসে ফুলিয়া ওঠা সিন্ধুর নীলজলের সেই লোহিত কিরণ পড়িয়া ফাঁপা ঢেউ-গুলি যেন নীল ভেলভেটের গালিচার উপর ফিকে গোলাপী রংয়ের ফোটাফুলের কারুকার্য্যের ন্যায় অনন্ত শোভা বিস্তার করিয়াছে।

তরুণীর গায়ে একটী সুইসের উপর সাদা ফুল তোলা অর্দ্ধহাতা জ্যাকেট্, পরিধানে একখানি মিনাপাড় সাড়ি, দু'হাতে দু'গাছি সোনার ব্যাঙ্গেল, গলায় একটী সোনার সরু মব্‌চেন্, কানে দুটী লাল চুনীর দুল পায়ে ঘাসের চটি। মৃদুল হাওয়ার পরশে রেশমের মত কালো চুলের এক একটা গুচ্ছ তাহার সুন্দর মুখে কপালে পড়িয়া, এক খানি ভাস্কর খোদিত প্রতিমার মতই দেখাইতেছে।

এই সুন্দরী, জমিদার নীলমণি মিত্রের কন্যা পুষ্যা। এই একমাত্র আদরিনী কন্যা তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধি কারিণী।

মিত্র মহাশয় জন্মভূমিতে বৎসরে একবার করিয়া যাইতেন। সুদক্ষ বিশ্বাসী দেওয়ান সদানন্দের হাতে তাঁর জমিদারির কার্য্যের ভার দিয়া, তিনি শৈশবে মাতৃহারা কন্যা পুষ্যাকে লইয়া তাঁহার কলিকাতার লেক্ রোডস্থ ভবনেই থাকিতেন।

মিত্র মহাশয় কন্যাকে কলেজে পড়াইয়া বি এ পাশ করাইয়াছিলেন। প্রতি বৎসর গরমের সময় পুষ্যাকে লইয়া তিনি দারজিলিং, সিম্‌লা, আলমোড়া ও শিলং আদি পার্ব্বত্য-প্রদেশে বেড়াইতে যাইতেন। কোন কোনবার পুরী ওয়ালটেয়ার ও যাইতেন।

সাত বৎসর হইল জমিদার মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়া-ছেন। মৃত্যু সময়ে বিচক্ষণ দেওয়ান সদানন্দের হাতে কন্যাকে সঁপিয়া দিয়া গেলেন। পুষ্যাকে বলিলেন, মা, বড় অসময়ে আমাকে যেতে হো'ল, বড় ইচ্ছা ছিল তোমাকে সুপাত্রে অর্পণ করে যাব। কিন্তু নিয়তির উপরে কারও হাত নাই। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে যেতে হচ্ছে। তুমি বেশী কাতর হ'য়ো না। আমার অভাবে তোমাকেই এই বিশাল জমিদারির তত্ত্বাবধান করতে হইবে। এখন এ রাজ্যের রাণী তুমি; যা করবে তোমার সদানন্দ কাকার সঙ্গে পরামর্শ করে তবে ক'রো। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত তুমি! জানি তুমি জীবনে কখনও ভুলের পথে পা দেবে না। যা'কে তোমার স্বামী পদের উপযুক্ত মনে করবে, তাকেই পতিত্বে বরণ কোর। খুব সাবধানে থেকো, কারণ সংসার বড় পিচ্ছিল। যেন হীরক ভ্রমে কাচে হাত দিয়ে, চির-কাল অনুতাপানলে দগ্ধ হ'য়ো না।

দুই

পিতার মৃত্যুর সাত বৎসর পরে পুষ্যা বলিল, কাকা অনেকদিন হোল পুরী যাই নি! এবার গরমের সময় পুরী যা'বো।

সদানন্দ বলিল, বেশ'ত মা। যখন যাবে বোলো।

বৈশাখের প্রচণ্ড গরমে যখন কলিকাতা মহানগরী উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, পুষ্যা, সদানন্দকে লিখিল কাকা,

বড় অসহ্য গরম পড়িয়াছে এখানে ; এইবার আমার পুরী যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিন্। সদানন্দ লিখিল, আমি দুই চারিদিনের মধ্যেই গিয়া তোমার যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

পুষ্যার দেশের বাড়ীতে তার দূরসম্পর্কীয় এক জেঠাই-মা নবকালী, ও এক নিস্তারিণী মাসি ছিলেন। সদানন্দ তাহাদের দুইজনকে, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টাদশ বর্ষীয় বিনোদকে ও পুরাতন সরকার বৃদ্ধ নবীনকে পুষ্যার সহিত দিবার জন্য, সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

হাওড়ায় ট্রেণ হইতে নামিয়া দেখিলেন, গিরিধারী সিং দ্বারবান্ অপেক্ষা করিতেছে। সদানন্দকে দেখিয়াই গিরিধারী সিং সেলাম দিল।

সদানন্দ গিরিধারী সিংকে জিজ্ঞাসা করিল, কোঠা কা খবর সব আচ্ছা হ্যায় ?

গিরিধারী সিং বলিল, জী, হাঁ।

পরে বলিল, মায়িজী আপকো'য়াস্তে মোটর ভেজ্ দিয়া, ষ্টেশন্ কো বাহার মে খাড়া হ্যায়, চলিয়ে।

সদানন্দ সকলকে সঙ্গে লইয়া গিয়া মোটরে উঠিল।

মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। গেটের নিকটে, পুষ্যা উপর হইতে দেখিল, তাহার সদানন্দ কাকা আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। ততক্ষণে তাহারা বাটীর ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে।

সদানন্দ বলিল, কৈ গো আমার মা, কৈ ?

পুষ্যা বলিল, এই যে কাকা !

সদানন্দ বলিল, পুষ্যারাণীর সকল জায়গায় যাবার এত আগ্রহ। আর দেশের বাড়ীতে কবে যাবে মা ?

পুষ্যা বলিল, কাকা, দেশে যে আপনি আছেন ! তাই আমি নিশ্চিন্ত থাকি।

সদানন্দ বলিল, আমি এখন বুড়ো হয়েছি মা; তোমার প্রজারা যে এখন তাদের রাণীকে চায়।

পুষ্যা বলিল, আপনি যতদিন আছেন ততদিন নয়, পরে না আমি আছিই। চলুন কাকা, আর জেরা করবেন না। স্নান করে নিন্। বিনোদ যাও স্নান করগে। বলিয়া পাঠাইয়া মাসীমাকে সঙ্গে লইয়া অন্দরে চলিয়া গেল।

আহারাদি করিয়া বিশ্রামের পর সদানন্দ পুষ্যার সহিত দেখা করিবার জন্য চাকরকে দিয়া ভিতরে খবর দিলেন।

পুষ্যা বলিল, কাকাকে আসতে বল্।

কিছুক্ষণ পরে দেওয়ানজী, পুষ্যার গৃহে আসিয়া পুরী যাইবার সম্বন্ধে কথপোকথন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, তা'হলে আজ সেখানকার চাকরকে একটা পত্র লিখিয়া দি ; আর কাল'কে গিয়া গাড়ী রিজার্ভ করিয়া আসিব।

পরের দিন একখানি ফার্ষ্ট ক্লাস্ গাড়ী রিজার্ভ করিয়া আসিয়া বলিলেন, তা'হলে কালকে তোমাদের যাবার ব্যবস্থা করি। তোমার সঙ্গে তোমার জ্যাঠাইমা, মাসীমা, বিনোদ, সরকার মশাই-ও যাবেন ! আর গিরিধারী সিংকে ও তোমার সঙ্গে দেব !

পুষ্যা বলিল, না কাকা, এত লোক সঙ্গে যাচ্ছে, আবার গিরিধারী সিং কি করবে ? গিরিধারী সিং এখানে থাক্ ; তা' না'হলে এই কলিকাতার বাড়ীতে কে থাক্‌বে ?

সদানন্দ বলিল, ঠিক্ কথা। তবে তোমার কোন অসুবিধা না হয়।

পুষ্যা বলিল, না, আমার কোন অসুবিধা হবে না। যদি সে রকম অসুবিধা কিছু বুঝি, তখন আপনাকে লিখব।

সদানন্দ পুষ্যার পুরী যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া নবকালী, নিস্তারিণী, বিনোদ ও সরকার মশাই'কে দিয়া, তাহাদের পুরী এক্স প্রেসে তুলিয়া দিলেন। বিনোদ'কে বলিয়া দিলেন, দেখো তোমার দিদিমণির যেন কোন রকম কষ্ট না হয়।

পুষ্যাকে বলিলেন, মা, পুষ্যারাণী খুব সাবধানে থাকবে। আর যখন যা আবশ্যক সর্ব্বদা লিখবে। পত্র দিতে বিলম্ব করো না। প্রতিদিন পত্র দিও, এই বুড়ো ছেলেকে যেন ভাবিও না মা। পুষ্যা অশ্রু সজল চক্ষে মস্তক হেলাইয়া সম্মতি জানাইল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিতে যতদূর দেখা যায় জানালায় মুখ বাড়াইয়া পুষ্যা দেখিতে লাগিল।

ষ্টেসনে লোকজন লইয়া পিতৃতুল্য বৃদ্ধ সদানন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। যখন পুষ্যাকে আর দেখা গেল না ; তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে মোটরে গিয়া উঠিলেন। এই মমতাময়ী

মেয়েটীর জন্য তাহার লোকজন সকলের চক্ষেই অশ্রু দেখা দিল।

তিন

কয়েকদিন পরে একদিন সকালে উঠিয়া নবকালী বলিল, হ্যাঁ পুষ্যা; আজ প্রায় আটদিন হ'ল পুরীতে এসেছি; কিন্তু এখন ও পর্য্যন্ত ঠাকুর দর্শন ভাগ্যে ঘট্‌ল না, আজকে একবার চল না।

পুষ্যা বলিল, আচ্ছা জ্যাঠাইমা, তুমি বুড়ো মানুষ, কেন মিছামিছি অতদূর ছুটাছুটী করবে। তার চেয়ে তুমি যখন আহ্নিক করবে, চক্ষুবুজে তোমার ঠাকুরকে ধ্যান ক'র দেখি, তুমি অন্তরের মধ্যেই তাঁর দর্শন পাবে। মন শুদ্ধ কর জ্যাঠাইমা; তা'হলে দেখ্‌বে তুমি যেখানে বসে তাঁকে ডাকবে, সেইখানেই তাঁকে দেখতে পাবে। তোমায় আর কোথাও বাইরে যেতে হবে না।

নবকালী বলিল, অতশত তোমাদের খ্রীষ্টানী মতলব বুঝি না বাবু। আমরা সে'কেলে মানুষ, ভগবানকে ভয় করি, এখনকার মত লেখাপড়া শেখা নাস্তিক নই।

পুষ্যা দেখিল জ্যাঠাইমা বড় রাগিয়াছে, তখন বলিল, আচ্ছা জ্যাঠাইমা তোমরা কালকে বিনোদের সঙ্গে গিয়ে দেখে এস।

নবকালী বলিল, তুমি যাবে না?

পুষ্যা বলিল, আমি পরশু নরেন্দ্র সরোবরের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেই সময় দর্শন করে এসেছি।

সেদিন আর যাওয়া হইল না দেখিয়া নবকালী ভাঁড়ার ঘরে গিয়া রান্নার যোগাড় করিতে বসিল।

এমন সময় নিস্তারিণী মাসী স্নান্ করিয়া আসিয়া বলিল, কৈ দিদি; আজ দর্শনে যাবে বলেছিলে যে?

নবকালী টানাস্বরে বলিল, যাবত মনে করেছিলুম দিদি! কিন্তু গিন্নিরাণীর হুকুম হ'ল কালকে বিনোদের সঙ্গে যেতে। জান নিস্তার দিদি, সেই যে কথায় বলে, মেঘ হয়ে রোদ্দুর হয়, তার বড় চড়চড়ানি, আর অল্পবয়সে গিন্নি হলে তার তেমনি ফড়ফড়ানি। এ হয়েছে তাই। আগেকার শাস্তরের কথাগুলো কি মিথ্যে দিদি?

নিস্তার বলিল, তা'ত সত্যি কথা। যখন ওর খাচ্ছ, তখন যা বলবে শুনতে হবে বৈকি!

তখন নবকালী আর কি করে, সেইখান্ হইতেই হাত জোড় করিয়া জগন্নাথ দেবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিল, বাবা আজ আমাদের তোমাকে দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল; যেতে পারলুম না বলে পাপ নিও না। যেমন পরভাতি করে রেখেছ, কি করবো ব'ল? দেখ নিস্তার দিদি, এই যে আজকে আমরা দর্শনে যাব বলে, যাওয়া হল না, এতে ঠাকুরের কোপে পড়তে হবে!

নিস্তার মহা বিজ্ঞের মত বলিল, কেন, আমাদের যাবার ইচ্ছে ত খুব ছিল। যে যেতে দিলে না পাপ তার। কথায় আছে, কেউ করে পুণ্যি-কর্ম্ম, কেউ হয় হাঁতা; হাড়ির কোদালে তার, কাটা যায় মাথা।

সে কথা শুনিয়া নবকালী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, সত্যি নাকি দিদি?

নিস্তার বলিল, এতখানি বয়েস করেছ তাও জান না! তখন সমস্ত পাপ পুষ্যার স্কন্ধে চাপাইয়া দুইজনে নিশ্চিন্ত-মনে গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

চার

বিকাল বেলা পুষ্যা যখন সমুদ্রের শোভা অনিমেষ লোচনে দেখিতে ছিল, সেই সময় বিনোদ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দিদিমণি বেড়াতে যাবেন না?

পুষ্যা বলিল, হ্যাঁ যাব বৈ কি! তুমি একটু দাঁড়াও ভাই, কাপড়টা ছেড়ে নি! এই বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাথ্‌রুমে গিয়া মুখ হাত ধুইয়া আসিল। ঘরে গিয়া একখানি ইরাণী সাড়ি, ও তাহারই জ্যাকেট গায়ে দিয়া প্রসাধন শেষ করিয়া, জুতা পরিয়া বাহির হইল।

দুজনে সমুদ্রের ধারে আসিয়া পুষ্যা বিনোদকে, বলিল, চল, বিনোদ, আজ আমরা একটু বালুখণ্ডের দিকে যাই। বিনোদ বলিল, দিদিমণি; আজ বেশীদূরে বেড়াতে যাবেন না। আকাশে মেঘ উঠেচে।

পুষ্যা বলিল, না আমরা বেশীদূরে যাব না। একট ঘুরে বাড়ী চলে যাব!

কিছুদূর গিয়া পুষ্যা দেখিল আকাশে বেশ মেঘ জমিতেছে ও অল্প অল্প ঝড় উঠিতেছে। তখন বলিল, বিনোদ বাড়ী চল ভাই, আকাশের যেরকম গতিক, আর বেশী দূর গিয়ে কাজ নাই।

তাহাদের ফিরিবার মুখে ঝড়ের গতি বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সাগর বক্ষ তুমুলভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল। পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউগুলি রণোন্মত্ত দৈত্য-শিশুর ন্যায় ক্রোধে জ্ঞান হারা হইয়া মেঘরূপী আর এক অসুরের সহিত প্রবল যুদ্ধ ঘোষণা করিল। প্রচণ্ড হাওয়ায় বালির স্তূপ উড়িয়া ভ্রমণকারীদের চোখে মুখে অঙ্গে কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া দিশাহারা করিয়া দিল। পুষ্যা ভয়ে জ্ঞানশূন্যা হইয়া কোথায় যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া ঐ খানেই নিকটে একখানি বাড়ী দেখিতে পাইয়া তাহার নীচেকার বারান্দায় দুজনে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঝড়ের মুখে বালির ঝাপটা আসিয়া পুষ্যাকে বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া বিনোদ বাড়ীখানির বন্ধ দরজায় আঘাত করিয়া বলিল, বাড়ীতে কে আছেন মশায়! এখনকার মত আমাদের একটু আশ্রয় দিন।

আঘাতের শব্দ পাইয়া ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিল একটী প্রিয়দর্শন যুবক।

যুবক দরজা খুলিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, একটি তরুণী, ও সবেমাত্র যৌবনের পথে পদার্পণ করিয়াছে একটি কিশোর। তাহাদেরই দরজায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে।

যুবক বলিল, আপনারা ভিতরে আসুন!

বিনোদ ও পুষ্যা ভিতরে গেল।

যুবক তাহাদের ভিতরে লইয়া গিয়া ঘরে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনারা কতক্ষণ বেরিয়েছেন?

বিনোদ বলিল, আমরা কিছুক্ষণ আগে বেরিয়েছি; তখন দুর্য্যোগ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এই দিকে বেড়াইতে আসিবার পরেই এ দুর্য্যোগের সৃষ্টি।

পুষ্যাকে লক্ষ্য করিয়া যুবকটী অর্থাৎ তুষার বলিল আপনি এই ছেলেমানুষের সঙ্গে একা বেড়াতে বেরিয়েছেন? পুষ্যা বলিল, আমি রোজ'ইত যাই, আজকে এ রকম দুর্য্যোগের সম্মুখে পড়তে হবে বলে জানা ছিল না!

ক্রমশঃ ঝড়ের গতি মন্দীভূত হইয়া আসিলে, তাদে কথার আওয়াজ পাইয়া উপর হইতে একজন বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, কার সঙ্গে কথা কইচিস্ রে তুষার?

তুষার বলিল, দিদিমা নীচে এস।

দিদিমা নীচে আসিলে, তুষার বলিল, এঁরা ঝড়ের মুখে বড় বিপদে পড়েছিলেন, তাই এঁদের ডেকে আমার ঘরে বসিয়েছি।

কোন আশ্চর্য্য বস্তু দেখিলে মানুষ যেমন অবাক্-নেত্রে চাহিয়া থাকে, পুষ্যাকে দেখিয়া তুষারের দিদিমা সেইরূপ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। বিস্ময় একটু কমিলে, পুষ্যার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হওয়াতে বলিলেন, আহা এই বয়সেই এই রকম হয়েছে গা, কিন্তু বয়েস্! তা' হ্যাঁ বাছা, তোমার মা বাপ আছে।

পুষ্যা বলিল, না।

বৃদ্ধা বলিল, কতদিন এই রকম হয়েছে!

পুষ্যা বৃদ্ধার কথা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল; আপনি কি বলছেন? আমি বুঝ্তে পারছি না।

তখন বৃদ্ধা বলিল, আমি জিজ্ঞেস্ করছি যে তোমার মা বাপ থাক্তে বিধবা হয়েছ না তারা যাবার পরে হয়েছ?

তুষার ভিতরে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল, দিদিমা, কি ব'কৃছ? ওঁর এখন ও বিয়ে হয় নি!

দিদিমা বলিল, ওমা! তবে বুঝি তোমরা বেহ্মজ্ঞানী? না হ'লে এত বড় মেয়ে মাথায় সিঁদুর নেই পায়ে জুতা, এসবত বেহ্মজ্ঞানীর ঘরে'ই হয়।

পুষ্যা মাথা হেঁট করিয়া রহিল, তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

দিদিমার কথা ক্রমশঃ ভদ্রতার সীমা ছাড়াইতেছে দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া তুষার বলিয়া উঠিল, দিদিমা তোমার শঙ্করা নোংরা কাপড়ে জল তুলে নিয়ে গেল, গামছা পরে নি।

দিদিমা সেই কথা শুনিয়া তীব্রগতিতে ঘর হইতে

বাহির হইয়া শঙ্করার চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে উপরে চলিয়া গেল।

তুষার তখন পুষ্যাকে বলিল, দেখুন আমার দিদিমা বড় সেকালে মানুষ; অতশত বোঝেন না বা কোথায় কি রকম কথা কইতে হয় জানেন না। ওঁর ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি; ওঁকে ক্ষমা করবেন।

পুষ্যা বলিল, আপনি কেন অত' কিন্তু হচ্ছেন? উনি বুড়ো মানুষ; ওঁদের কালে ঐ রকমই রীতি নীতি ছিল; সেইজন্য সাদাসিধা ভাবে মনের কথা বলে দিয়েছেন। তা'তে কি হয়েছে?

পুষ্যার মুখ দেখিয়া ও কথা শুনিয়া তুষারের মনের বোঝা হাল্‌কা হইয়া গেল।

পুষ্যা বিনোদকে বলিল, এইবার চল, ঝড় কমে গেছে।

তুষার বলিল, এখন ও আকাশ কাল হয়ে আছে। চলুন আমি আপনাদের পৌছে দিয়ে আসি।

পুষ্যা একটু হাসিয়া বলিল, না আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আমাদের বাড়ী এখান থেকে বেশীদূর নয়। আপনি একদিন আমাদের বাড়ী যাবেন; আমাদের বাড়ী রেখে তবে চক্রতীর্থে যেতে হয়। আমাদের বাটীর নাম ভিক্টোরিয়া হল।

তুষার বলিল, ঐ ভিক্টোরিয়া হল আপনাদের বাড়ী! শুনেছিলাম ঐ বাড়ীখানি যেন কোন্ জমিদারের!

বিনোদ বলিল, হ্যাঁ, উনিই সেই জমিদারের মেয়ে. জমিদার নীলমণি মিত্রের কন্যা, পুষ্যা মিত্র।

পুষ্যা বিনোদকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পাঁচ

তুষার ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কি কোমলতাপূর্ণ এই মেয়েটীর স্বভাব! অত বড় জমিদারের মেয়ে তাহা বাহ্যিক দেখিয়া কিছুই বুঝিবার যো নাই! কি সুন্দর মুখ খানি; বিশেষ করিয়া চক্ষুদুটী। যেন কোন স্বপ্নময় ভাবে বিভোর হইয়া আছে। সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়; পুষ্যার সুন্দর মুখখানি তুষারের মনোরাজ্য জয় করিয়া বসিল। সে ধ্যানমগ্ন যোগীর মত পুষ্যার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া গেল।

তাহার সে ধ্যান ভঙ্গ হইল দিদিমার উচ্চ কণ্ঠে; দিদিমা উপর হইতে ডাকিলেন, তুষার, একবার আয়ত, ওটা কি বলে দেখ ত'।

তুষার উপরে উঠিয়া দেখে, দিদিমা রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে শঙ্করের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

শঙ্করা বলিতেছে, গালি দিবি কাঁইকিড়ি, মু কাম না করিবি, মাহিনার তঙ্কা দি'স, চলি জীবি।

তুষার দেখিল মহাবিপদ। একটা বিপদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সে নিজেই এই বিপদের সৃষ্টি করিয়াছে।

দিদিমার নিষ্ঠার উৎপাতে সপ্তাহে একটী করিয়া চাকর যায়। শঙ্করা মাত্র পনের দিন কাটাইয়াছে।

দিদিমা'কে ঠাট্টা করিবার জন্য শঙ্করাকে কৃত্রিম কোপ্ দেখাইয়া বলিল, চ' বেটা নীচে' চ, তুই দিদিমার উপর কথা কইচিস্। নীচে, আসিয়া তাহার হাতে একটী আধুলি দিয়া বলিল, বুড়ামার কথায় রাগ করিস্ নি! যা, এই পয়সা নিয়ে পানগুণ্ডি খাস্।

শঙ্করা একেবারে আট আনা পয়সা বক্‌সিস্ পাইয়া, তাহার তাম্বুল রাগে রঞ্জিত ঝিঙা বিচির মত দন্ত বাহির করিয়া মনিবের পায়ে আভূমি প্রণত হইয়া পড়িল। তাহার এই শান্ত প্রকৃতির মনিবটীকে সে খুব ভালবাসিত।

বিনোদ রাস্তায় নামিয়াই পুষ্যাকে বলিল, দিদিমণি, তুষার বাবুর দিদিমা কি খাণ্ডাজ বুড়ী বলুন ত! আপনাকে যখন ঐ রকম ভাবের কথাগুলো বলছিল; আমার তখন কি মনে হচ্ছিল জানেন! মনে হচ্ছিল, বুড়ীকে পাঁজা কোলা করে তুলে ঐ সমুদ্রের তোড়ের মুখে ফেলে দি!

পুষ্যা বলিল, ওঁরা আগেকার মানুষ কি'না; সূক্ষ্মবুদ্ধি খুব কম। বিনোদ বলিল, কিন্তু তুষার বাবু খুব ভাল লোক, দেখে মনে হয় না যে, বুড়ীর নাতি। বুড়ী যেন মান্ধাতার ঠাকুমা, নয় দিদিমণি?

পুষ্যা হাসিয়া বলিল, তুমি কি মান্ধাতার ঠাক্'মাকে দেখেছ বিনোদ?

বিনোদ বলিল, না। তবে কিনা ঐ কটকটে লোক-

...লোক... যেই বহুকালের মান্ধাতাদের কথা মনে পড়ে। ...তাই লোকে ঐ সব উদাহরণ দেয়।

পুষ্যা বাড়ী আসিতেই নবকালী ও নিস্তারিণী বলিল, এয়েছ মা, বাঁচলাম! আমরা ত' ভেবে অস্থির, এই জলে ঝড়ে, ছেলে মেয়ে ছুটে কোথা গেল। এই ঝড়ের মুখে কোথায় ছিলে পুষ্যা?

পুষ্যা বলিল, জ্যাঠাইমা আমরা এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলুম।

জ্যাঠাইমা বলিল, তা বেশ করেছিলে মা, জল ঝড়ের মুখ থেকে যে মানুষের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলে, খুব ভাল করেছিলে বাছা। যাও কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেল গে।

পুষ্যা কাপড় ছাড়িয়া চাকরকে চা তৈয়ার করিতে বলিল।

চাকর চা দিয়া গেলে, চা খাইয়া পুষ্যা শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, আজকের ঝড়ের সঙ্গে তুষারের কথা! এই ভাবনায় সে যেন বেশ একটু আনন্দ পাইল।

পরের দিন বিকাল বেলা পুষ্যা বেড়াইতে বাহির হইয়া আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। বাড়ীর অদূরেই বালুর চড়ের উপর বসিয়াছিল; নিকটেই বিনোদ পায়চারি করিতেছিল। অস্তমিত সূর্য্যের শান্ত স্নিগ্ধ লোহিত ধারা তার সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সে যেন সর্ব্ব অবয়ব দিয়া এই কিরণ ধারা গ্রহণ করিতেছে।

সম্মুখে সমুদ্র,—নির্ম্মল, নীল। সেই উজ্জ্বল নীল বারিধি-রাশির মধ্যে ঢেউগুলি যেন হীরার হারের মতই ঝলমল করিতেছে। এ সৌন্দর্য্য কোন্ আদিকাল হইতে অন্তকাল অবধি মানুষের মনে চির নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়া মোহিত করিয়া দিয়াছে, দিতেছে, ও দিবে! পুষ্যা বাহ্যজ্ঞান্ শূন্যা হইয়া একমনে এই সৌন্দর্য্য দেখিতেছে।

পুষ্যাকে সচকিত করিয়া তুষার ডাকিল, আপনি এই-খানে বসে আছেন।

তুষারের ডাকে পুষ্যার চমক ভাঙ্গিল। বলিল নমস্কার! আপনি কি বেড়াতে বেরিয়েছেন।

তুষার বলিল, হ্যাঁ ঠিক বেড়ান যদিও নয়; তবে কতকটা তাই বটে।

পুষ্যা বলিল; তবে এইখানে বসুন তুষার বাবু। কালকে সমুদ্রের এক তাণ্ডব নৃত্য দেখেছিলেন, আর আজকের?

তুষার বলিল, আপনি বুঝি তন্ময় হয়ে তাই দেখছেন?

পুষ্যা বলিল, এ তন্ময়তা কি আমার একার? যে কোন মানুষই সাগরের এই অভিনব লীলা দেখে তন্ময় হয়ে যাবে তুষার বাবু!

তুষার বলিল, বড় সত্য কথা বলেছেন আপনি। সেই বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে অতুলনীয় সৃষ্টি দুটী। একটী এই সমুদ্র, অপরটী হিমালয়। ইহাদের তুলনা-হীন সৌন্দর্য্য যে প্রাণ দিয়া অনুভব না করিতে পারে, তার মনুষ্য জন্মই বৃথা।

তাহারা দুইজনে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, ভ্রমণ-কারী দুই চারিজন তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে দেখিয়া পুষ্যা বলিল, আমাদের বাড়ীতে চলুন। ওই সামনেই আমাদের বাড়ী।

তুষার বলিল, চলুন। দেখুন, আপনার বাড়ীর সামনে দিয়ে আমি প্রায়ই বেড়াতে যাই; কিন্তু কোন দিন ত' আপনাকে দেখি নি। কালকের ঝড়ের দেবতা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, কি বলুন?

পুষ্যা বলিল, মানুষের নিজের ইচ্ছার মধ্যে কিছুই করবার যো নাই। যে দিন যা হবার, তা' আগে থেকে প্ল্যান তৈয়ারী হয়ে আছে, সময় এলেই তা' ঠিক্ পূর্ণ হয়ে যায়। চলুন উপরে। বিনোদ, তুষার বাবুকে উপরে নিয়ে যাও, আমি আসছি।

তুষার বলিল, আজ থাক্, অন্য একদিন আসব।

ছয়

প্রত্যহ পুষ্যাদের বাড়ীর দিকে বেড়াইতে যাওয়া তুষারের যেন একটা নেশার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইল। কোন দিন্ সমুদ্রের ধারেই পুষ্যার সহিত দেখা হইত; আর যেদিন দেখা না হইত, পুষ্যাদের বাড়ীতে যাইত।

এই প্রত্যহ আসার কালে উভয়ে উভয়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল।

তুষার যদি একদিন না আসিত তাহা হইলে পুষ্যার অন্তর বড় চঞ্চল হইয়া উঠিত!

আবার তুষারও বিকাল হইলে পুষ্যার নিকট যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত।

সেদিন তুষার ও পুষ্যা, দুজনে গল্প করিতে করিতে বালুখণ্ডের দিকে আগাইয়া যাইতেছে দেখিয়া বিনোদ বলিল, দিদিমণি, আজ আবার যদি ঝড় আসে!

পুষ্যা বলিল, পাশেই তুষার বাবুর বাড়ী আছে, বলিয়া যেমন তাহারা সে দিকে চাহিয়া দেখিয়াছে, দেখে তুষারের দিদিমা আর একটি বৃদ্ধা সঙ্গিনীর সহিত গল্প করিতে করিতে তাহাদের দিকেই আসিতেছে! বিনোদ দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, এই রে, ঝড়ের কালে দম্‌কা হাওয়া।

পুষ্যা বলিল, চোপ্!

বিনোদ বলিল, যে জন্যে আমাকে বকচেন তিনি কোথায়; ঐ দেখুন। পুষ্যা চাহিয়া দেখে, তুষার তখন দিদিমার দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

সাত

সে দিন তুষার, সমুদ্রের ধারে পুষ্যাকে না দেখিতে পাইয়া, তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া উপরে গিয়া দেখিল, পুষ্যা একা বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, বেড়াতে যাবেন না?

পুষ্যা বলিল, বিনোদ নাই।

তুষার বলিল, চলুন, আজ ষ্টেশনের দিকে বেড়িয়ে আসি।

পুষ্যা বলিল চলুন।

তুষার বলিল, আমার সঙ্গে একা যেতে আপনার বাধা আছে কি?

পুষ্যা বলিল, আপনি ক্ষেপেছেন নাকি! বাধা কিসের? ওষ্ঠাধরে হাসি চাপিয়া বলিল, তবে ভাবছি যদি দিদিমা বেড়াতে যান। তখন ত' আপনি যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। আর আমি পথিমধ্যে উচ্চ...কা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

তুষার সেদিনের কথায় লজ্জিত হইয়া বলিল, একটু বিশেষ দরকারে পড়ে যেতে' বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখি, আপনারা কেউ নেই।

তুষারকে দুঃখিত, লজ্জিত দেখিয়া পুষ্যা বলিল, চলুন আজ আপনার সঙ্গেই যাব!

তুষার বলিল, মন্দ না, শাপে বর হো'ল।

পুষ্যা ও তুষার বেড়াইতে যাইবার জন্য বাহির হইতেছে; সেই সময় বিনোদ আসিয়া পড়াতে তুষার বলিল, এই নিন্ আপনার বডিগার্ড এসেছে!

পুষ্যা বলিল, না, আজ আপনি আমার বডিগার্ড, চলুন।

বিনোদ বলিল, দিদিমণি কোথায় যাচ্ছেন?

পুষ্যা বলিল, এই তুষার বাবুর সঙ্গে আজ একটু বেড়িয়ে আসি। বলিয়া তাহারা ষ্টেশনের দিকে বেড়াইতে গেল।

পথে আরও অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক, তাহাদের মেয়ে ছেলে লইয়া সমুদ্রের দিকে বেড়াইতে যাইতেছে। এক দলের মধ্য হইতে দুটী বালিকা পিছাইয়া পড়াতে যেটী বড় সে ছুটিয়া তাহার মায়ের কাছে গিয়াছে; এমন সময় ছোটটী তাহা দেখিতে পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে একেবারে পুষ্যার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল।

তুষার বলিল, খুকী।

খুকী একবার তুষারের মুখের দিকে, ও একবার পুষ্যার মুখের দিকে চাহিয়া "দে ছুট"।

তুষার বলিল, পড়ে যাবে খুকী, পড়ে যাবে।

আর খুকী; খুকী ততক্ষণ তাহার দিদির নিকটে গিয়া বলিতেছে, দেখ্ দিদি, ঐ লোকটার বৌয়ের গায়ে আমি পড়ে গেছনু।

তুষার শুনিতে পাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, ওরা কি বলছে শুনেছেন?

পুষ্যার মুখে কে যেন আবির মাখাইয়া দিল। সে

বলিল, [illegible] বলুক না কেন, আপনি সে কথায় কান দি[illegible]

তুষার বলিল, মিস্ মিত্র, বল্‌লে ওবা আর দোষ হোল আমার! এ রকম বিচার ভাল। তবে ঐ শোনা-টুকুই যে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ তা আপনাকে বলে রাখছি। যদি ঈশ্বর করেন ঐ মেয়েটী যা বল্‌লে কোন দিন তা সফল হয়, তবেই আমার জীবনকে সার্থক বলে মেনে নে'ব।

তাহারা যখন ষ্টেশনের দিক্ হইতে বেড়াইয়া ফিরিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

পুষ্যাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া, তুষার বলিল, মিস্ মিত্র, তবে বিদায়! তবে আজ আমার জীবনের সুপ্রভাত, মনে রাখবেন।

আট

সদানন্দের পত্র পাইয়া পুষ্যা কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগে ব্যস্ত হইল।

সেদিন তুষার আসিয়া যখন শুনিল পুষ্যা এইবার কলিকাতায় ফিরিবে; তখন তাহার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল।

পুষ্যা বলিল, দুই একদিনের মধ্যেই যাব।

তুষার বলিল, মিস্ মিত্র, বড় আনন্দে ছিলাম আমি। একটা দীর্ঘশ্বাস অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মর্ম্মভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পুষ্যা ব্যথায় কাতর চক্ষু দুটী তুলিয়া তুষারের মুখপানে চাহিয়া দৃষ্টি অবনত করিল।

তুষার দুই পদ অগ্রসর হইয়া পুষ্যার কোমল কর পল্লব ধারণ করিল এই প্রথম!

পুষ্যা পাষাণ মূর্ত্তির মত স্তব্ধ ও অচল হইয়া রহিল।

ধীরে ধীরে বলিল, বড় ভুল করছেন তুষার বাবু!

তুষার বলিল, হ্যাঁ আমি জানি! বামন হয়ে চাঁদ ধরবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু মিস্ মিত্র—

পুষ্যা বলিল, তুষার বাবু, আপনি গোড়াতেই ভুল করেছেন! প্রথম দিনেই আপনার দিদিমার আমার উপর কি রকম ধারণা বুঝেছিলেন ত'?

তুষার বলিল, সে ভাবনা আমার।

তুষারের মুখের ভাবে ও কথার ধরণে পুষ্যার বুকের ভিতর অবধি দুলিয়া উঠিল। সে তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। মনের সমস্ত শক্তিকে যেন নিঃশেষে হরণ করিয়া লইল।

একটু অপেক্ষা করিয়া তুষার বলিল, আমি আপনার পাণি প্রার্থনা কচ্ছি মিস্ মিত্র। আপনি জানেন নিশ্চয়, বেশ গুছিয়ে মিষ্টি করে কথা বলার ক্ষমতা আমার নাই। অনেক দিন থেকে'ই মনের এই কথাটী আপনাকে জানাবো ভেবেছিলাম। আপনি সম্মত হ'লে, আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে কর'বো। আমার ভিতরে হয়'ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র এমন অনেক জিনিস আছে, যা আপনার পছন্দ না হতে পারে। কিন্তু সে সব ত্রুটী—

বাধা দিয়া পুষ্যা বলিল, কী সব বলচেন আপনি?

আমি যে বিয়ে করব না প্রতিজ্ঞা করেছি।

তা'হলে আমার জীবনটাকে কি মরুভূমি করে দেবেন, মিস্ মিত্র?

পুষ্যা বলিল, এখন'ত আর সময় নেই তুষার বাবু, আমি এখন বাড়ী ফিরছি, দেশে থেকে ঘুরে কলিকাতায় যাব!

পুষ্যা চলিয়া গিয়াছে। তুষারের মন বাড়ী ফিরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। পুরী আর মোটেই ভাল লাগে না। দিদিমাকে বলিল, আর এখানে বেশীদিন থেকো না দিদিমা। বড় বেশী ম্যালেরিয়া হচ্ছে।

দিদিমা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, সত্যি নাকি রে? বলিল,

তাহ'লে কাজ নাই বাপু, যাবার ব্যবস্থা কর্। আর এসেছি' ও ত' প্রায় তিন মাস হোল।

নয়

লেক্ রোডে সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলের পশ্চিম ধারের একখানি গৃহ সাহেবী ফ্যাসানে টেবিল, চেয়ার, সোফা প্রভৃতি আসবাবে সজ্জিত। র‍্যাক্‌গুলি বিবিধ বইয়ে পরি

পূর্ণ। সমস্ত বইগুলির উপরে সোনার জলে লেখা, পুষ্যা মিত্র বি-এ। টেবিলের উপর ফুলদানিতে কয়েকটা ডাল পাতা শুদ্ধ সদ্য তোলা গোলাপ, গৃহ-স্বামিনীর সুরুচির পরিচয় দিতেছে। পুষ্যা একখানি সোফার উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। তার কুসুমাস্তৃত জীবনের পথে কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করিতেছে কেবল তুষারের কথা। সে যতই তার মূর্ত্তি মন হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করে, ততই সে মূর্ত্তি তার অন্তরের আসনে আপনার মৌরসী পাট্টা করিয়া লয়।

চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, একটী বাবু আসিয়াছেন। পুষ্যা বলিল, নিয়ে এসো তাঁকে।

ঘরে ঢুকিল তুষার। সে আত্মবিস্মৃত হইয়া পুষ্যার দিকে চাহিয়া রহিল।

পুষ্যা বলিল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন?

নম্রকণ্ঠে তুষার বলিল, বস্‌ছি। কিন্তু ভয় হয়, শেষ পর্য্যন্ত এই দাবী থাকবে কিনা।

হাসি গোপন করিয়া পুষ্যা বলিল, না থাকবার কারণ যদি কিছু ঘটে, তাহলে বলতে পারি না। নৈলে—

তুষার বলিল, আপনি বড় নিষ্ঠুর!

হঠাৎ সোফা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া খিল্‌-খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার একখানি হাত আকর্ষণ করিয়া সেই সোফায় বসাইয়া পুষ্যা বলিল, এইবার হয়ত মধুর বলে মনে হবে!

তুষার কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বাটীতে গিয়া তুষার সেই দিন'ই তাহার দিদিমা'র নিকট পুষ্যাকে বিবাহ করিবার কথা বলিল।

দিদিমা ত' শুনিয়া অগ্নিমূর্ত্তি। বলিল, সেই ধিঙ্গি মাগী; তা'কে তুই বিয়ে করবি? বিয়ে করবি, না, নিকে করবি বল্‌ দেখি হতভাগা।

তুষার বলিল, তুমি যদি ঐ মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে না দাও, তা'হলে আমি আর বিয়ে করবো না!

দিদি'মা বলিল, ও'রে পোড়ার মুখো।...সেই ডাইনী মাগী তোকে গুণ করেছে' রে...তুই আর তা'দের বাড়ী যেতে পাবি না। শেষকালে উচ্ছ... ...রা মাগীকে বিয়ে করে বাপ্‌ পিতামো... ...আবা... তুষার! বৃদ্ধা কন্যার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন।

তুষারের মুখখানার উপর কে যেন আঘাত করিয়া গেল। তীব্র বেদনায় তাহার অন্তর টন্‌-টন্‌ করিয়া উঠিল।

দুই দিন পরে তুষার যখন আসিল, পুষ্যা তাহার গম্ভীর মুখ দেখিয়াই চক্ষু নত করিল।

তুষার বলিল, আমি কত বড় আশা করেছিলুম তা শুধু জানেন ভগবান! বড় অসহায় আমি।

পুষ্যা বলিল, আমার সংস্পর্শে এসে হয়ত আপনার অমঙ্গল হতে পারে, আমাকে ভুলে যান তুষার বাবু।

তুষার ডাকিল, পুষ্যা!

পুষ্যা বলিল, তোমাকে ভুল বুঝি নি তুষার বাবু! কিন্তু তোমার দিদিমার অমতে হয়ত কিছুই করতে পার না তুমি। বলিয়া সে মাথা নীচু করিল।

তাহার মুখে এই প্রথম 'তুমি' সম্বোধনে অপূর্ব্ব পুলকে তুষার শিহরিয়া উঠিল।

পরে প্রশান্ত ভাবে বলিল, পুষ্যা আমি আর এখানে থাকব না। আমি মনে মনে ঠিক্ করেচি, বম্বে যাব। কিন্তু যাবার আগে তোমার কাছে একটা ভিক্ষা চাই।

পুষ্যা বলিল, ব'লো।

তুষার বলিল, আমি তোমার একখানা ছবি আঁকব। তোমাকে রোজ কিছুক্ষণ করে আমার কাছে সিটিং দিতে হবে।

পুষ্যা বলিল, তুমি ছবি আঁকতে পারো?

তুষার তখন তার জামার বোতাম খুলিয়া দেখাইল, একটি সরু সোনার হারে, একটী কিশোরীর মূর্ত্তি,...কেবল একটা মুখ, কণ্ঠ অবধি। সে মুখের সহিত তুষারের মুখের অনেক সাদৃশ্য আছে। তুষার বলিল, আমার মায়ের ছবি।

পুষ্যা বলিল, তোমার ছবির হাত খুব সুন্দর।

তুষার বলিল, অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল, নিজের

...তে তোমার ... ছবি আমার মনের মত করে তুলে ...

পুষ্যার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বলিল, তুষার বাবু!

তুষার পুষ্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

পরের দিন তুষার রং তুলি লইয়া ছবি আঁকিতে আসিল। পুষ্যা বলিল, আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলুম।

তুষার বলিল, পুষ্যা, আমাকে এখন তোমার জন্য বহুদূরের আশাপথ চেয়ে থাকতে হবে। কারণ, তোমার ভেতর দিয়ে আমি আমাকে ফুটিয়ে তুলতে চাই। আমার আশাপথের ভাব নিয়ে তুমি আমার মডেল হও।

পুষ্যা বসিয়া থাকিত, বিভোর হইয়া।

তুষার তুলির পর তুলি টানিয়া রং ফলাইত; যে দিন ছবি পূর্ণ হইল; তুষার বলিল, কি সুন্দর ভাব নিয়েছিলে পুষ্যা, ঠিক আমার ধ্যানের দেবীর মতই।

পুষ্যা ছবি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সে যেন জন্ম জন্মান্তরে ঐ তুষারের ধ্যানেই বিভোর হইয়া তার প্রেমের প্রতীক্ষা করিতেছে।

তুষার বলিল, পুষ্যারাণী, আমার ছবির নাম দিলাম 'আশা-পথ'। এই নির্ম্মল ভালবাসাকে আমি ক্লেদ-পূর্ণ করতে চাই না। বলিয়া পুষ্যার দক্ষিণ হস্তখানি করতলে ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিল, আমার ধ্যানের দেবী তুমি, আমি যতদিন তোমাকে পরিপূর্ণ ভাবে না পাব, ততদিন তোমার ধ্যানে তন্ময় হয়ে বহুদূরের আশাপথ চেয়ে থাকব। তুষারের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, পুষ্যা তবে যাই।

পুষ্যা উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া বলিল; যাই বলতে নাই, বল আসি।

তুষার বলিল, ও আশা এখনও আছে পুষ্যা?"

পুষ্যা বলিল, নিশ্চয়ই, আবার তোমায় আসতে হবে।

তুষার ব্যথিত অন্তরে ছবিখানি লইয়া দরজার দিকে পা বাড়াইল। যখন তুষারকে আর দেখা গেল না, পুষ্যা ভূমিতলে পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, "ওগো ফিরে এস, ফিরে এস।"

হেমাঙ্গিনী দে
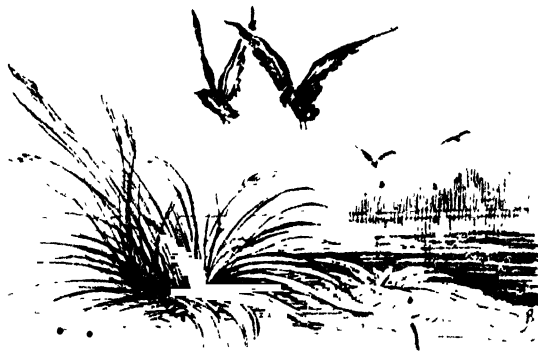
চিত্র জগতের পঞ্চশস্য

শ্রীমতী প্রতিভা শীল

গ্রেস্ মুর

সোণালি চুলের গোছা, ক'টা নীল চোখযুক্ত সুদর্শনা অভিনেত্রী গ্রেস্ মুরের যে-ছবিখানি অন্যত্র প্রকাশিত হয়েচে, তাঁর জীবনে মোটামুটি কি-কি ঘটেচে, অল্পবিস্তর তার আলোচনা করব। প্রথমতঃ মুখের আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়, ইনি খুব চালাক প্রকৃতির। সত্যিই তাই, গান গাইতে, বাজনা বাজাতে, তলোয়ার ঘোরাতে, সাঁতার কাটতে, রাঁধতে এবং সর্ব্বশেষ—অভিনয় করতে ইনি বেশ ভালই পারেন। কিন্তু তথাপি ইনি সন্তুষ্ট নন, ইনি চান আরো বড়ো হতে—আরো নতুন কিছু শিখতে। এই সুশ্রী অভিনেত্রীটী উপস্থিত 'কলোম্বিয়া পিক্চারের' সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ আছেন, তা সম্ভবতঃ বলা বাহুল্য।

বিখ্যাত ধনী ব্যাঙ্কার আর-এল্-মুর, এঁর পিতা—জন্মস্থান জেলিকো। গ্রেস্ মুরের শৈশবাবস্থা কাম্বারল্যাণ্ড পর্ব্বত শ্রেণীতে কাটে, পরে ইনি চীনে চলে যান। সেখানে একটী মিশনারী সঙ্ঘে মিশে ইনি গান বাজনায় ওস্তাদ হয়ে ওঠেন। এমন কি কতদিন 'ঈভনিং সার্ভিস্' পর্য্যন্ত একা পরিচালনা করেচেন। ইনি বলেন, গান বনের পশুকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করে, কাজেই গান না শেখা মানুষের পরিচায়ক নয়।

কিছু দিন বাদে তাঁর এ ঝোঁক্ একটু মন্দা হয়ে আসে এবং শেস পর্য্যন্ত একটী বালিকা বন্ধুর সঙ্গে নিউইয়র্কে চলে যান। ছ'মাস পরে এঁর পিতা নিউইয়র্কে এসে ওঁকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। এমন সময়ে এঁর স্বরভঙ্গ হয় এবং বহু পরিশ্রমের পর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল স্বর ফিরে পান। ১৯২১ অব্দে 'আপ্ দি ক্লাউড্স্' পুস্তকে প্রথম অভিনয় করেন। এই বইখানি লাইব্রিকে সাত মাস একাদিক্রমে অভিনীত হয়।

...১৯২৫ অব্দে প্যারিসে 'আর্ভিং বার্লিন'এর সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়। ইনি মুরকে আরো ভালরকম গলা সেধে একটী গানের প্রতিযোগিতায় আবির্ভূত হতে বলেন। উপর্য্যুপরি তিনবার এই প্রতিযোগিতায় তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ফলে 'মেট্রোপলিটানে' তাঁর একটী চাকরী হয়। এখানে ইনি তিনটী সীজন্ থাকেন এবং তাতে 'লা-বোহেমি', 'ফষ্ট' এবং 'রোমিও জুলিয়েট' এই ক'খানি পুস্তকে অভিনয় করেন।

...গুর সঙ্গে "এ লেডীস্ মারালস্ ... অভিনয় করবার জন্যে হলিউডে আসেন। উক্ত বইখানিতে তাঁর সুন্দর গান এবং অভিনয়ের জন্য 'কলোম্বিয়া' শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে দীর্ঘদিনের চুক্তিতে বেঁধে ফেলেন। তাঁর এখানকার অবদানও তুচ্ছ নয় বরং বেশ প্রশংসনীয়। গত বৎসর আমেরিকায় জগতের দশজন শ্রেষ্ঠ

Von Hindenburg, the Kaiser and Ludendorff confer behind the lines. This is a scene from "The First World War," produced by Fox Film and bringing to audiences many official and uncensored films never before screened.

"ফাষ্ট ওয়ালর্ড ওয়ার" পুস্তকের একটা দৃশ্য।
ভন হিণ্ডেনবার্গ, কাইজার এবং লডেন বুর্ফ।

তিনি 'নিউমুন' পুস্তকে আবার একটা 'অফার' পান। শেষোক্ত এই বইখানিতে তাঁর যশ বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমালোচকরা তাঁর এত সুখ্যাতি করেন, যে সুন্দরীর মধ্যে ইনিও নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন, বোধকরি কথাটা বলা এখানে অবান্তর হবে না।

জীন পার্কার

'মেট্রোর' আধুনিক উদীয়মানা অভিনেত্রী জীন্ পার্কারের জীবনী আলোচনা করতে গেলে এ কথাটা বলা উচিত, যে মাত্র দু'বছরের মধ্যে তিনি যা যশ অর্জ্জন করেচেন হলিউডের কোন' অভিনেত্রীর ভাগ্যেই তা বোধ হয় ঘটে নি।

মাত্র দুবৎসর পূর্ব্বে তিনি ছিলেন স্কুল বালিকা,—আজ

Jean Parker and Robert Young in "Lazy River"

"লেজী রিভার" পুস্তকের একটা দৃশ্য। জীন্ পার্কার এবং রবার্ট ইয়ং।

একটা বড় দরের অভিনেত্রী। এঁর উচ্চ আশা অসীম, প্রচেষ্টা অসাধারণ। এবং এই দুটী জিনিষ অবলম্বন করেই আজ ইনি এত বড়ো হয়ে উঠেচেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, তাঁর মনটী এখনো সেই ছেলেবেলাকার মনের মতই কোমল এবং সুন্দর আছে। ইনি ফুল এবং রোদ খুব ভাল বাসেন। বলেন, এই দুটী প্রকৃতির আবনশ্বর সম্পদ,—শ্রেষ্ঠ অবদান।

শৈশবে এঁর পিতার অবস্থা এতো খারাপ ছিল যে অতি অল্প বয়সেই এঁকে কাজে বেরোতে হয়েচে। দৈবচক্রে এল, এ, গ্রীণের শিক্ষকতায় ইনি নাচ, গান শেখেন এবং এবং নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি বলে তাতে আরো অন্যান্য-রূপ সংযোগ করে আরো সুন্দর করে তোলেন। শেষ পর্য্যন্ত ইনি গান রচনা এবং সুর সংযোজনা আরম্ভ করেন।

...মুভিতে যোগ দেবার সময় ইনি ডিরেক্টারকে বলেন, আমি একজন খাঁটী আর্টিষ্ট হতে চাই। তাঁর সে আশা কতদূর ফলবতী হয়েচে, কোন' চিত্রামোদীরই তা জানতে বাকী নেই।

তাঁর কথা বলার ভঙ্গী এবং চলার ভঙ্গীতে আকৃষ্ট করেই তিনি 'মেট্রোতে' চুক্তিবদ্ধ হন। 'ডাইভোর্স ইন্ ফ্যামিলি' বইখানি এঁর অভিনয়ের প্রথম পুস্তক। দ্বিতীয় পুস্তক 'রাসপুটিন।' এই বইখানিতে ইনি নিজের সাজ সজ্জা নিজে করে আবির্ভূত হন। এর অভিনয়ের ভঙ্গী দেখে 'কলোম্বিয়া কোম্পানী' দু-একখানি তাদের পুস্তকে অভিনয় করবার জন্যে আহ্বান করেন। একখানি হচ্চে, 'হোয়াট্ ইনোসেন্স' আর একখানি 'লেডী ফর্ এ ডে'। দু-খানি পুস্তকেই তিনি তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেচেন।

এর পর 'আর-কে-ও' কোম্পানীর হয়ে ইনি 'লীট্ল্ উইমেন্' বইখানি অভিনয় করেন। 'মেট্রোতে' তাঁর সর্ব্বশেষ পুস্তক হচ্চে, 'হ্যাভ্ এ হার্ট!' এই পুস্তক খানিতে এঁর অভিনয় অতুলনীয়।

* * *

শার্লি টেম্পল

'ফক্সের' শিশু তারকা,—শার্লি টেম্পল। এই বিয়াল্লিশ ইঞ্চি এবং বিয়াল্লিশ পাউণ্ডের ছোট্ট অভিনেত্রীটীকে পেয়ে 'ফক্স' কোম্পানী সত্যই লাভবান্ হয়েচে। কেন না এই রকম সর্ব্বগুণ সমন্বিত শিশু অভিনেত্রী সচরাচর মেলে না। 'ফক্সের' দু-তিন খানি পুস্তকে এর মধ্যে শার্লি অভিনয় করেচে, তার মধ্যে "বেবী টেক্ এ বাউ" খানি সত্যই

...এণ্ড চীয়ার' পুস্তকে ...ভিনয় ... নয়। তা ...সের দিক দিয়ে বিচার করে, তার কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করা আমাদের অন্যায়।

শালি যখন মাত্র চার বছরের, তখন থেকে সে তার নাম লিখতে শিখেচে এবং নামের অক্ষর গুলো অন্যত্র দেখালেও চিনতে পারে। এটা সাধারণ মেধার কথা নয়। আরো একটা মজার কথা এই যে, একজন বিশেষজ্ঞের পরিচালনায়, সে যখনই হাঁটতে শিখেচে, তখন থেকেই নাচ গান শিখতে আরম্ভ করেচে। ভাল রকম কথা বের ...না বলে, এখন নাচের দিকেই তার ঝোঁক বেশী।

অভিনয়ের সময় শালিকে ধরে রাখা মুস্কিল হয়ে পড়ে। তার শিশু-হৃদয় সমস্ত বইখানিতে আগা-গোড়া অভিনয় করবার জন্যে উতল হয়ে ওঠে। কাজেই তার অভিনয়াংশ শেষ হলেই কর্তৃপক্ষগণ তাকে বাড়ী না পাঠিয়ে পারেন না।

জুন ভাসেক্

শ্যালি আইলারস্

ফ্লোরেন্স ডেস্মণ্ড।

ভবিষ্যতে এর কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করা কোন' চিত্রামোদীরই অন্যায় নয়।

* * * *

'যক্ষ ফিল্ম কোম্পানীর' "ফার্ষ্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার" ছবিখানির দৌলতে আমরা মাত্র যাঁদের নাম শুনেছি, তাঁদেরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেচে। একখানি ছবিতে হিণ্ডেনবার্গ, কাইজার এবং লডেনবর্ফকে দেখা যাচ্চে। যুদ্ধকালে এঁদের মাত্র আমরা নামই শুনেছিলেম। এই ছবিখানি শীঘ্রই "ছায়ায়" দেখান হবে বলে প্রকাশ।

* * * *

"দেবদাস" শীঘ্রই নিউথিয়েটার্সের যে কোন চিত্র-ভবনে মুক্তিলাভ করবে বলে শুনেছি। কর্তৃপক্ষ এখনো সঠিক কোন তারিখ দেননি। কালী ফিল্মের 'পাতালপুরীর' ও প্রায় সেই অবস্থা।

প্রতিভা শীল

পুস্তক পরিচয়

উন্মোচন—মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য ও শ্রীভূপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কার্য্যালয়—৬৬, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উন্মোচনের বর্ষ আরম্ভ হয়েছে ফাল্গুন থেকে। এর প্রথম সংখ্যা আমরা সমালোচার জন্য পেয়েছি। প্রথম সংখ্যায় এঁরা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জ্জটি প্রসাদ, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীদাস প্রভৃতি সাহিত্যরথী এবং মহারথী বৃন্দের রচনা। উন্মোচনের প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন সুবিখ্যাত শিল্পী, যামিনী রায়। এই প্রচ্ছদপট খানি হয়েছে উন্মোচনের অন্যতম মর্য্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

বার্ষিক মাত্র দু' টাকা চার আনা। মূল্যে দিয়ে এ রকম সুসাহিত্য পরিবেশন বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। বর্ত্তমানের তথাকথিত আধুনিকতা-প্লাবিত বঙ্গ সাহিতে রচনা নির্ব্বাচনে এ রকম নিষ্ঠাপূর্ণ সংযমের জন্য সম্পাদক দ্বয়কে আমরা আশীর্ব্বাদ করি ও প্রার্থনা করি তাদের প্রচেষ্টা ফলবতী হোক্ এবং দেশে বিদেশে কাগজখানি স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হোক্।

প্রাপ্তি স্বীকার

'অলক-শোভা মেডিকেটেড্ ক্যান্থারাইডিন্ হেয়ার অয়েল'—আমরা ডাঃ শীলের আবিষ্কৃত একটী এই তেল ব্যবহারের জন্য উপহার পেয়েচি। সত্যই তেলটী বেশ সুন্দর হয়েচে, কারণ এর গন্ধটুকু ভারী মিষ্টি এবং যে কোন শিরোরোগে এটী অদ্ভুত কাজ করে। সর্ব্বসাধারণকে, বিশেষ করে গল্প-লহরীর পাঠক পাঠিকা-দের একবার তেলটী পরীক্ষা করে দেখতে বলতে পারি।

সম্পাদক—

গঃ লঃ